শ্রীরামলাল বরাট

জন্মভূমি।

৪র্থ ভাগ। } পৌষ। ১৩০০। { ১ম সংখ্যা।

গ্যাস।

পাথুরে কয়লার গল্প বলিতে, দুই একবার আমি গ্যাসের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম,—যে গ্যাসের দ্বারা কলিকাতা সহর রাত্রিকালে আলোকিত হয়। একশত বৎসর পূর্ব্বে কয়লা-গ্যাসের চলন কোথাও ছিল না, বিলাতেও ছিল না। গ্যাসে আবার আলো হয়, একথা কেহ জানিতও না। বিলাতে মরডক, ফরাসি দেশে লেবন, এই দুইজন লোক, প্রায় একই সময়ে কয়লা-গ্যাসের গুণ জানিতে পারিয়াছিলেন। মরডক কয়লা খনিতে কাজ করিতেন। কয়লা খনি হইতে কয়লা লইয়া, সেই কয়লা লৌহ পাত্রের ভিতর বন্ধ করিয়া, বাহির হইতে তাহাতে উত্তাপ দিয়া, তিনি গ্যাস প্রস্তুত করেন। তাহার পর, নলের দ্বারা সেই গ্যাস আপনারি বাটীতে লইয়া যান্। এই গ্যাসের আলোকে তাঁহার বাটী আলোকময় হইয়াছিল।

এখন যেমন এ-দেশে, তখন সেইরূপ বিলাতে লোকে সহজে নূতন বিষয় ব্যবহার করিতে চাহিত না। অধিক দিনের কথা নয়, একশত বৎসরের কথা বলিতেছি। সুতরাং বল বুদ্ধিতে বিলাতের লোক তখন যেরূপ ছিলেন, আমরাও প্রায় সেইরূপ ছিলাম। কিন্তু আজ? আজ তাঁহারা দিন দিন নূতন বিষয়ের উদ্ভাবন করিতেছেন, উন্নতির উপর উন্নতি করিতেছেন। এই সমস্ত উন্নতির প্রভাবে বল বুদ্ধিতে তাঁহারা অনেক আগে চলিয়া গিয়াছেন। আমরা যেখানে ছিলাম, সেই খানেই পড়িয়া আছি। তাই আজ আমাদের কাছে কোল সাঁওতাল, আবর, বর্ব্বর যেরূপ, বিলাতের লোকের কাছে আমরাও সেইরূপ। এই একশত বৎসরের মধ্যে বিলাতের লোকের সহিত আমাদের আকাশ-পাতাল পার্থক্য হইয়া পড়িয়াছে। তাই, এক্ষণে তাঁহারা আমাদিগকে অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে পরিগণিত করেন। মিষ্টভাষী ধীর ধর্ম্মপরায়ণ,—এখানে সে "সভ্যতার" কথা হইতেছে না। যে সভ্যতার প্রভাবে, মানব জাতি ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, ব্যোমের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে, সেই সভ্যতার কথা বলিতেছি। পাঠক! যে উপায়ে, ইউরোপের লোক সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছেন, কিসে সেই সমস্ত উপায়ের দিকে তোমাদিগের মন নিয়োজিত করিব, তাই চিন্তা!

পরীক্ষা দ্বারা মরডক সাহেব যখন দেখিলেন যে কয়লা-গ্যাসের দ্বারা ঘর আলোকিত

পারে, তখন সেই কথা তিনি বন্ধু-নিকট প্রকাশ করিলেন। নিজে অর্থহীন ছিলেন। পেটেন্ট লইয়া নিজে নূতন বিষয় প্রচলিত করিবার তাঁহার ছিল না, সেজন্য তিনি অপরের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। সুতরাং নিরুপায় হইয়া যতদুর সাধ্য, তিনি নিজেই গ্যাসের আলো প্রচলনে যত্নবান হইলেন। আজ ইহার ঘর, কাল তাহার কারখানা, তিনি গ্যাস দ্বারা আলোকিত করিতে লাগিলেন। পৃথিবীতে মিথ্যা যেরূপ চিরকাল তিষ্ঠিতে পারে না, অল্পদিন ধূমধাম করিয়া পরিশেষে যেরূপ সত্যের নিকট পরাজিত হয়, সেইরূপ কুসংস্কারও চিরকাল লোকের মনমুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। মনুষ্যের যেটী প্রকৃত উপকারী ও লাভজনক, প্রথম প্রথম অবহেলা করিলেও কালে তাহার আদর হয়। গ্যাস-আলোকের ব্যবহার ধীরে ধীরে বাড়িতে লাগিল।

মনে করিওনা যে, যাঁহারা লেখাপড়া জানেন, বিদ্যা বুদ্ধিতে যাঁহারা উন্নত, নূতন বিষয়ের গুণ তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন। তাহা নয়। আজকাল যাহা হউক, সেকালে নূতন বিষয়ের প্রথমেই তাঁহারা বিরোধী হইতেন। প্রথম যখন কলের গাড়ির প্রস্তাব হয়, তখন সেই কথা শুনিয়া বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মুখে আর হাসি ধরে না। রেলগাড়ির স্রষ্টা ষ্টিফেনসন সাহেব বলিয়াছিলেন যে, "আমার কলের গাড়ি ঘণ্টায় ছয়ক্রোশ চলিতে পারিবে।" বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা তাঁহাকে পাগল মনে করিলেন। ঘোড়ায় টানিবে না, উটে টানিবে না, আর গাড়ি আপনা-আপনি ঘণ্টায় ছয় ক্রোশ পথ দৌড়িয়া যাইবে! এও কি কখনও হয়? বিজ্ঞানশাস্ত্র-মতে কার্য্যকারণ বাহির করিয়া তাঁহারা প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, এ কথা কখনই হইতে পারে না। বিজ্ঞানশাস্ত্র দ্বারা অনেক বিষয় প্রমাণিত হইতে পারে। সম্প্রতি রাসায়নিক-শাস্ত্র দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস স্বয়ং ঈশ্বর ছিলেন। না হয়, নিদান পক্ষে ঈশ্বরের অবতার ছিলেন। দশ অবতার ত ফুরাইয়া গেল। অবতারগিরি আর খালি নাই। এখন কল্কিদেব যে কি করিবেন, সেই ভাবনা। তাইতো!

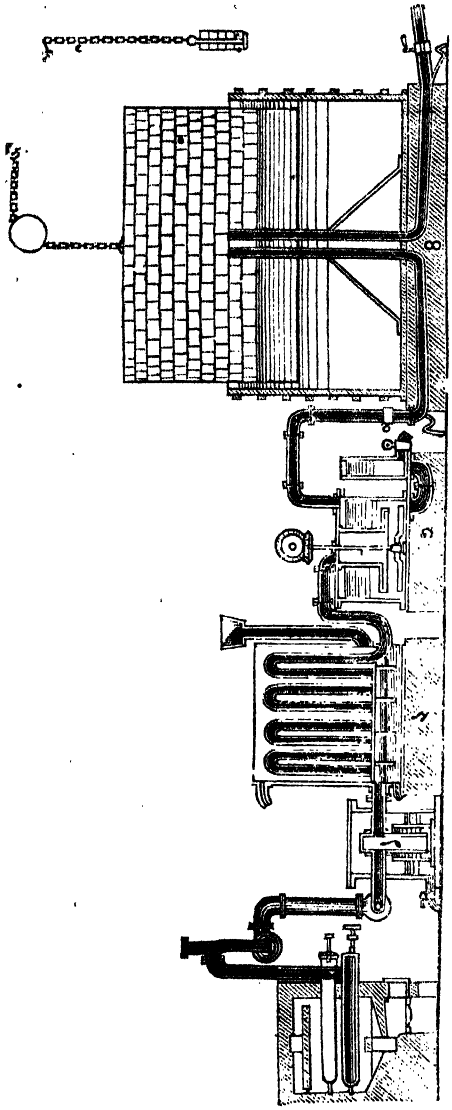
গ্যাসের দ্বারা যখন অনেক বাড়ী ও কল-কারখানা আলোকিত হইল, তখন ইহা দ্বারা গ্রাম নগরের পথ-ঘাটও আলোকিত করিবার প্রস্তাব উঠিল। সেই সময় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা আপনাদিগের বিদ্যা প্রকাশ করিলেন। প্রথম উপহাস করিলেন, তাহার পর গ্যাসের দ্বারা মনুষ্য জীবনের যে কি ঘোরতর অনিষ্ট হইবে, তাহা প্রমাণিত করিলেন। কিন্তু উইণ্ডসর নামক এক ব্যক্তি গ্যাসের গুণ বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। পণ্ডিতদিগের মূর্খতা ও সাধারণের কুসংস্কারের সহিত তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। আট বৎসর ধরিয়া গ্যাসের কার্য্য-কারিতা, তিনি ক্রমাগত লোককে বুঝাইতে লাগিলেন। যখন লোকে বুঝিল যে, তৈলের আলোক অপেক্ষা গ্যাসের আলোক অধিক প্রভাশালী, তখন গ্যাসের দ্বারা লণ্ডন নগর আলোকিত করিবার নিমিত্ত তিনি একটী কোম্পানি খুলিলেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে এই কোম্পানি স্থাপিত হয়। আজও ইহার কার্য্য চলিতেছে। ইহা হইতে অংশীদারেরা অনেক অর্থ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু প্রথম প্রথম ইহার কার্য্য সুচারুরূপে চলে নাই। প্রথম প্রথম রাসায়নিক পণ্ডিতদিগের হস্তে ইহার ভার অর্পিত হইয়াছিল। কেবল পুথিগত বিদ্যা দ্বারা সাংসারিক কার্য্য ভালরূপ নির্ব্বাহিত হয় না। তাঁহাদের হস্তে কোম্পানি মুমূর্ষু অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে, এই সময়,

কোম্পানি, গ্যাস আবিষ্কারক মরডকের একজন শিষ্যকে পাইলেন। তাঁহার কেবল পুথিগত বিদ্যা ছিল না। মরডকের অধীনে থাকিয়া গ্যাসের কার্য্য তিনি নিজে হাতে করিয়াছিলেন। কোম্পানির কার্য্য-ভার গ্রহণ করিয়া গ্যাস প্রস্তুত বিষয়ে তিনি নানারূপ উন্নতি সাধন করিলেন। কারখানায় গ্যাস প্রস্তুত করিয়া নলের দ্বারা নগরের রাস্তায় ও লোকের বাড়ী-বাড়ী গ্যাস লইয়া যাইলেন। প্রতি রাত্রিতে যে বাড়ীতে যত টুকু গ্যাস ব্যবহার হয়, তাহা মাপিবার যন্ত্র আছে। গ্যাস বায়ুর মত অতি লঘু পদার্থ, সুতরাং ইহা ওজন-দরে বিক্রীত হয় না। পো পালির মাপে যেরূপ ধান বিক্রীত হয়, গ্যাসও সেই ভাবে বিক্রীত হইয়া থাকে। গ্যাস বিক্রয় করিয়া কোম্পানির বিলক্ষণ লাভ হইতে লাগিল। লণ্ডনে এক্ষণে কুড়িটীর অধিক গ্যাস-কোম্পানি আছে। কিন্তু এই আদি কোম্পানিটীই সকলের অপেক্ষা বড়। অনেক সময়ে—বিশেষতঃ কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে লণ্ডন নগর কুজ্ঝটিকায় আবৃত হয়। দিনের বেলায় কোলের-মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই সময় দিনের-বেলায় গ্যাস জ্বালিয়া কাজ করিতে হয়। আবার আমাদের দেশের চেয়ে শীতকালে সেখানে দিন আরও ছোট। এদিকে সাতটার কম সূর্য্য উদয় হয় না, ওদিকে চারিটার পরই সন্ধ্যা উপস্থিত হয়। সুতরাং এদেশ অপেক্ষা সেখানে গ্যাসের খরচ অধিক। ইহা ছাড়া অনেকে সেখানে গ্যাসের দ্বারা রন্ধনাদি কার্য্য নির্ব্বাহিত করিয়া থাকেন।

প্রথম গ্যাস কোম্পানির বিলক্ষণ লাভ হইতেছে দেখিয়া, বিলাতের অপরাপর সহরে অনেক কোম্পানি স্থাপিত হইল। কেহ বা কয়লা গ্যাসে রাস্তা ঘাট ও লোকের বাড়ী আলোকিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ বা তৈল হইতে গ্যাস প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কেহ বা গ্যাসকে বাক্স বন্ধ করিয়া, গাড়ি [illegible] দিয়া আমদানি রপ্তানি করিতে প্রবৃত্ত হই[illegible] শেষোক্ত দুই কাজ ভালরূপে চলিল না। [illegible] হইতে যে গ্যাস প্রস্তুত হয় না, তাহা [illegible] তবে কয়লা সস্তা, তৈল মহার্ঘ্য। তৈল হ[illegible] গ্যাস করিলে খরচ পোষায় না। যেখা[illegible] পাথুরে কয়লা নাই, সেখানে গ্যাসের আবশ্যক হইলে, কাজেই তৈল হইতে প্রস্তুত করিতে হয়। মহারাজ রামসিংহ তৈল হইতে গ্যাস প্রস্তুত করিয়া জয়পুর সহরের রাস্তায় আলো দিয়াছিলেন। বাক্সে বন্ধ করিয়া যাহারা গ্যাস আমদানি রপ্তানি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের লাভ হয় নাই। এইরূপে গ্যাস লইয়া আজ কাল ইষ্ট-ইণ্ডিয়েন রেলগাড়ি আলোকিত করা হইতেছে। যাহারা কয়লা হইতে গ্যাস করিয়া নলের দ্বারা রাস্তা ও লোকের বাড়ীতে লইয়া বেচিতে লাগিলেন, তাঁহাদের বিলক্ষণ লাভ হইতে লাগিল। এক্ষণে বিলাতে প্রায় প্রতিগ্রামে, প্রতিনগরে গ্যাসের কারখানা আছে। অনেক বড়মানুষ, যাঁহাদের বাটী গ্রাম বা সহর হইতে দূরে অবস্থিত, তাঁহারা নিজের গ্যাসের কারখানা করিয়া আপনাদের গৃহাদি আলোকিত করেন। গ্যাস করিবার নিমিত্ত বিলাতে প্রতি বৎসর প্রায় ত্রিশকোটি মণ পাথুরে কয়লা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লণ্ডন সহরে প্রতি বৎসর প্রায় পাঁচ কোটি টাকার গ্যাস বিক্রীত হয়।

পাথুরে কয়লায় তাপ দিলে যে সমুদয় পদার্থ উবিয়া বা উড়িয়া যায়, তাহাই ধরিয়া কয়লা-গ্যাস প্রস্তুত হয়। হাইড্রোজেন ও কারবণ বাষ্প ব্যতীত ইহা আর কিছুই নয়। সর্ব্বোত্তম কয়লা, যাহা পাথরের মত দেখিতে, যাহাতে কারবণের ভাগ অনেক অধিক, তাহা হইতে ভাল গ্যাস হয় না। যে কয়লায় তৈলের ভাগ অধিক; অর্থাৎ কিনা বাইটুমিনস্ কয়লা, তাহা

গ্যাসের কারখানা।



হইতেই ভাল গ্যাস হয়। গ্যাস প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কয়লা বাহিরে রাখা ভাল নয়, কারণ বৃষ্টির জল পাইলে, সে জল বাষ্প হইয়া গ্যাসের সাহত মিশ্রিত হইয়া যায়। সেই জলকে পুনরায় গ্যাস, হইতে পৃথক্ করিতে হয়। পাথুরে কয়লায় আগুন ধরাইলে উপর দিয়া প্রচুর পরিমাণে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধূম নির্গত হয়। ইহাই জ্বালাইবার গ্যাস। তবে ইহার সহিত অনেক কয়লার গুঁড়া মিশ্রিত থাকে। সেই কয়লা-চূর্ণ হইতে ঘরে ঝুল পড়ে ও তাহার অনেক অংশ ধূমের সহিত বাহিয়ে গিয়া ভূতলে পতিত হয়। সাহেবেরা যে কাদার পাইপে তামাক খান, পাথুরে কয়লা গুঁড়া করিয়া যদি তাহার ভিতর রাখা যায় ও কাদা দিয়া যদি তাহার মুখটী বন্ধ করিয়া দেওয়া যায় এবং তাহার পর যদি পাইপের সেই কয়লা-পূর্ণ ভাগটী আগুনে রাখা যায়, তাহা হইলে দেখিবে যে, পাইপের নল দিয়া ধূম নির্গত হইতেছে। তাহাই গ্যাস। সেই ধূমে আগুন দিলে জ্বলিতে থাকে। যেরূপ পাইপের মুখে কয়লা চূর্ণ রাখিয়া উত্তাপ দিলে গ্যাস বাহির হয়, সেইরূপ বড় বড় লৌহ বা মৃত্তিকা পাত্রে পাথুরে কয়লা বন্ধ করিয়া বাহির হইতে উত্তাপ দিলে প্রচুর পরিমাণে গ্যাস বাহির হইতে থাকে। ঐরূপ লৌহ বা মৃত্তিকা পাত্রকে রিটর্ট (Retort) বলে। পূর্ব্বে লৌহপাত্রে কাঁচা কয়লা বন্ধ করিয়া গ্যাস প্রস্তুত হইত। এক্ষণে অনেক স্থানে মৃত্তিকা পাত্র ব্যবহার হইয়া থাকে। কারণ দিবা রাত্রি অগ্নি উত্তাপে মৃত্তিকা পাত্র শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায় না। এক্ষণে লোকে প্রচণ্ড উত্তাপ সংযোগে শীঘ্র শীঘ্র প্রচুর পরিমাণে গ্যাস প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। কিন্তু ধীরে ধীরে উত্তাপ সংযোগে লোকে যদি আস্তে আস্তে গ্যাস প্রস্তুত করে, তাহা হইলে সে গ্যাসের আলো অতি উত্তম হয়। কিন্তু পৃথিবীতে আজ কাল সব তাড়াতাড়ি ও হুড়াহুড়ি। ভালই হউক আর মন্দই হউক, তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়ি করিয়া কাজ না করিলে এক্ষণে আর লাভ হয় না।

গ্যাস প্রস্তুত করিবার পাত্রগুলি সচরাচর প্রায় ১০।১২ হাত লম্বা হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহার উপর ও তলভাগ দুই দিকই খোলা রাখিয়া থাকেন, তবে সহজে বন্ধ

করিবার নিমিত্ত ঢাকন আছে। কাঁচা কয়লা হইতে গ্যাস উড়িয়া যাইলে সেই কয়লা আমাদের রাঁধিবার কোক্‌কয়লা হয়। পাত্রের দুই মুখ খোলা রাখিবার অভিপ্রায় এই যে, ইহা হইতে সহজেই কোক্‌কয়লা বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে ও পাত্রের ভিতর ময়লা পড়িলে দুই দিক দিয়া পরিষ্কার করিতে পারা যায়। পাত্রগুলি কখনও ঠিক গোল, কখনও বা লম্বাভাবে গোল। গ্যাস-কারখানায়, পাত্রগুলিকে ভূমি হইতে উচ্চ করিয়া সারি সারি সাজাইতে হয়। একটী একটী সারিতে বারটী পাত্র রাখিতে পারা যায়। গ্যাস প্রস্তুতের সময় প্রথম, পাত্রের তলদেশ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। তাহার পর কয়লা পূর্ণ করিয়া উপরটীও বন্ধ করিয়া দিতে হয়। কেবল উপরের দুই ধারে দুইটী ছিদ্র থাকে। গ্যাস উঠিয়া যাইবার নিমিত্ত সেই ছিদ্রে নল সংযোজিত থাকে। এইরূপে পাত্রগুলি কয়লা পূর্ণ ও বন্ধ হইলে তাহার পর ইহার বাহিরে অগ্নি জ্বালিতে হয়। নীচে হইতেও জ্বাল দিতে পারা যায় ও পাত্রের দুই পাশেও আগুন জ্বালিতে পারা যায়। এক পঙ্‌ক্তির সব পাত্রগুলিতে সমান ভাবে যাহাতে উত্তাপ লাগে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। অসমান ভাবে উত্তাপ লাগিলে কোনটীর ভিতরের কয়লা কাঁচা রহিয়া যায়, আর কোনটীর কয়লা অধিক পুড়িয়া যায়। এইরূপ হইলে নানা দোষ। তাহার মধ্যে প্রধান এইটী যে, পাথুরে কয়লার সঙ্গে অল্প পরিমাণে গন্ধক থাকে, এই গন্ধক বাষ্পে পরিণত হইয়া, গ্যাসের সহিত মিশ্রিত হয়, তাহাতে গ্যাস অতি হানিজনক হইয়া পড়ে।

গ্যাস উঠিয়া যাইবার নিমিত্ত সচরাচর প্রতি পাত্রের উপর দুইটী করিয়া নল সংযোজিত থাকে। পাত্রের ভিতর গ্যাস প্রস্তুত হইলে শীঘ্র শীঘ্র এই নল দিয়া উঠিয়া যাওয়া আবশ্যক। বিলম্ব হইলে পাত্রের গায়ে গ্যাসের [illegible] পড়ে, তাহাতে পাত্র শীঘ্র নষ্ট হইয়া [illegible] আর গ্যাসের আলোক প্রদান শক্তি [illegible] যায়। পাত্রের ভিতর সমস্ত কয়লা যখন [illegible] রূপে ভাজা হইয়া যায় ও তাহা হইতে [illegible] সমুদয় গ্যাস নির্গত হইয়া যায়, তখন সে[illegible] কয়লাকে কোক কয়লা বলে। কোক কয়লা হইতে বাষ্পীয় ভাগ নির্গত হইয়া গিয়াছে বলিয়া, ইহা দেখিতে ভাজা কয়লা বলিয়া বোধ হয়। কাঁচা কয়লা অপেক্ষা ইহা লঘু ও ইহাতে কারবণের ভাগ অধিক। ইহা জ্বালাইবার সময় অধিক ধূম বা গন্ধ নির্গত হয় না, সে নিমিত্ত ইহা রন্ধনাদি কার্য্যে বিশেষ উপযোগী। সমুদয় গ্যাস বাহির হইয়া যাইলে, তখন পাত্রের দুই মুখ খুলিয়া দিয়া, এই ভাজা বা কোক কয়লা বাহির করিয়া লইতে হয়। এই সময় যে নল দিয়া গ্যাস উপরে উঠিয়া যায়, সেই নলের মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। তাহা না করিলে, হয় এই নলের মুখ দিয়া গ্যাস বাহির হইয়া পড়ে, আর না হয় বাহিরের বায়ু গিয়া নলের ভিতর প্রবেশ করে। বাহিরের বায়ু গিয়া গ্যাসের সহিত মিশ্রিত হইলে গ্যাসের আলোক প্রদান শক্তি কমিয়া যায়। সে নিমিত্ত কলিকাতায় যেরূপ ড্রেন সংযোগে S অক্ষরের মত নলের একস্থান বাঁকা করা হয়, গ্যাসের নলেও অনেকে সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। নলটী উপরে উঠিয়া পুনরায় নামিলে এইরূপ বাঁকা ভাবে গঠিত হয়। এই স্থানের তলভাগটী নল অপেক্ষা বিলক্ষণ মোটা, একটী গর্ত্ত বলিলেও চলে। ইহাকে হাইড্রলিক মেন (Hydraulic main) বলে। এই গর্ত্তের ভিতরে সর্ব্বদা জল বা আলকাতরা থাকে। কয়লা ভাজিবার পাত্রে গ্যাস প্রস্তুত হইয়া প্রথম নলের মুখ দিয়া উপরে উঠে, তাহার পর এই গর্ত্তের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। এখানে আসয়া সম্মুখে জল বা

...তরা দেখিতে পায়। পাত্রে যদি গ্যাস ...ত ঘন ঘন প্রস্তুত না হইত, আর নীচে ... যদি ইহার সবলে ঠেল না ধরিত, তাহা ...লে গ্যাস এই আলকাতরা পার হইয়া আগে ...ইতে পারিত না। কিন্তু পাত্রের ভিতর ক্রমাগত কয়লা ভাজা হইতেছে, ক্রমাগত তাহা হইতে গ্যাস উদ্ভূত হইয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, আগের দিকে ক্রমাগত ঠেল ধরিতেছে। সে নিমিত্ত পশ্চাতের গ্যাস আগের গ্যাসকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া এই আলকাতরার ভিতর প্রবেশ করাইতেছে। আলকাতরার ভিতর প্রবেশ করিয়া গ্যাসকে সেখানে বসিয়া থাকিবার যো নাই। একে তো আলকাতরা অপেক্ষা গ্যাস লঘু, সুতরাং আপনা-আপনি ভাসিয়া পড়িতেই, হইবে, তাহার পর আবার সেই পশ্চাত হইতে ঠেল। গ্যাস আলকাতরার ভিতর প্রবেশ করিয়াই বুদ্‌বুদ আকারে উপরে ভাসিয়া পড়ে। উপরে উঠিলে আর ভাবনা নাই। এখন বরাবর নলের সোজা পথ। এখন সেই পথ দিয়া গ্যাস নিরুদ্বেগে ভ্রমণ করিতে থাকে। কোক বাহির করিবার নিমিত্ত পাত্রের মুখ খুলিবার সময় নল হইতে গ্যাস পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারে না। কারণ ফিরিয়া আসিবার নিমিত্ত পশ্চাৎ হইতে এরূপ ঠেল বা বল নাই। ফিরিয়া আসিতে গিয়া সম্মুখে সেই আলকাতরা দেখিতে পায়, আলকাতরা পার হইবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং পুনরায় অগ্রমুখ হইয়া ফিরিয়া যায়। সেই কারণে বাহ্য বায়ুও আলকাতরা পার হইয়া গ্যাসের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে না।

কয়লা ভাজা হইয়া প্রথম যে গ্যাস প্রস্তুত হয়, তাহা কিন্তু বিশুদ্ধ নহে। কয়লায় যে তৈল প্রভৃতি পদার্থ থাকে, ঘোরতর অগ্নির উত্তাপে প্রথম তাহা বাষ্পাকার ধারণ করে ও গ্যাসের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। তাহার পর শীতল হইলেই জমিয়া যায়। জমিয়া যে পদার্থ হয়, তাহাকে "তার" বা আল্কাতরা বলে। আল্কাতরা জমিয়া গিয়া গ্যাস হইতে পৃথক হইয়া যাইলেও গ্যাস বিশুদ্ধ হয় না। তখনও গ্যাসের সহিত আমোনিয়া, গন্ধক, কার্ব্বনিক অম্ল প্রভৃতি পদার্থ বাষ্পাকারে মিশ্রিত থাকে। ঐ সকল পদার্থ কোথা হইতে আসে? ইহারা কাঁচা পাথুরে কয়লায় থাকে। কয়লা যখন ভাজা হয়, তখন ইহারা বাষ্পাকার ধারণ করিয়া গ্যাসের সহিত মিশ্রিত হয়। শীতল হইলেই যেরূপ আল্কাতরা জমিয়া গ্যাস হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে, ইহারা সেরূপ হয় না। ইহারা বাষ্পভাবে থাকিয়া বরাবর গ্যাসের সহিত অবস্থিতি করে। সুতরাং গ্যাস হইতে ইহাদিগকে পৃথক্ করা বড়ই কঠিন, এমন কি একেবারে পৃথক্ করা অসাধ্য বলিলেও হয়। তবে যতদূর সাধ্য, পৃথক্ না করিলে চলে না। কারণ গ্যাসের সহিত ঐ সকল দ্রব্য, লোকের ঘরে পুড়িলে নানারূপ অনিষ্ট সাধন করে। সুতরাং গ্যাস নলের ভিতর যাইলেই ইহাকে যতদূর সাধ্য, বিশুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যত্ন পাইতে হয়। প্রথম গ্যাস হইতে আল্কাতরা পৃথক করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে হয়। কারণ আল্কাতরা মিশ্রিত গ্যাস অধিক দূরে যাইতে দিলে, সেখানে আল্কাতরা জমিয়া নল সব বুজিয়া যাইবে। গ্যাস হইতে আল্কাতরা পৃথক হইয়া যাইলে, তাহার পর বাষ্পভাবাপন্ন আমোনিয়া, গন্ধক প্রভৃতি পদার্থকে দূর করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইতে হয়। ক্রমে ক্রমে গ্যাসকে বিশুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ইহাকে অনেক নল ও নানারূপ যন্ত্রের ভিতর দিয়া ভ্রমণ করাইতে হয়। এখন, জলস্রোতের মুখে যেরূপ বাঁধ দিলে হয়, সেইরূপ এই সকল যন্ত্র সত্বর গ্যাসের অগ্রসর হইবার পক্ষে বিঘ্ন উপস্থিত করে। যেরূপ বাঁধের নিকট প্রথম অনেক জল না জমিলে আর বাঁধ ছাপাইয়া যাইতে পারে

না, সেইরূপ একটী একটী যন্ত্রের নিকট প্রথম অনেক গ্যাস না জমিলে আর সে যন্ত্র পার হইয়া যায় না। সম্মুখে এইরূপ বিলম্ব হইলে, পশ্চাৎদিকে গ্যাসের স্রোত হীনবল হইয়া পড়ে। হাইড্রলিক মেনের সেই আলকাতরা পার হইতে কষ্ট হয়। কয়লা-ভাজা পাত্রে গ্যাস জমা হইয়া পড়ে। এরূপ হইলে নানাদিকে বিপত্তি; সুতরাং পশ্চাৎদিক হইতে গ্যাসকে আরও বলে ঠেলিয়া না দিলে আর উপায় নাই। সচরাচর বাহির হইতে বাষ্পীয় বলে এই কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। হাইড্রলিক মেনের সেই আল-কাতরার নিকট গ্যাস যাইবার পূর্ব্বে একস্থানে ঐ যন্ত্রটী সংস্থাপিত থাকে। বাষ্পীয় বলে ঐ যন্ত্র ক্রমাগত গ্যাসকে আগের দিকে ঠেলিয়া দিতে থাকে। তাহাতে গ্যাস অনায়াসে আল-কাতরা পার হইয়া যায়, সম্মুখের অপরাপর বাধা বিঘ্ন সমুদয়ও দ্রুতবেগে পার হইয়া যায়।

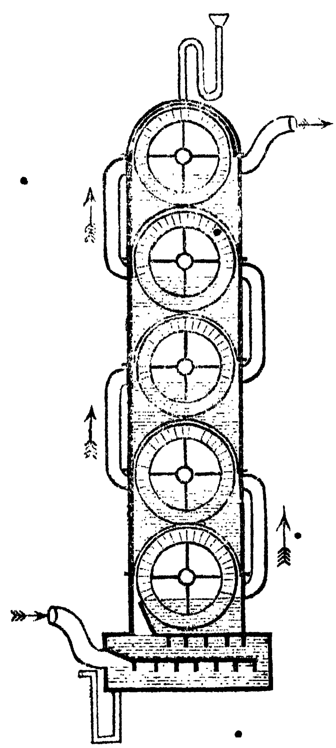
গ্যাস তো এখন নলের ভিতর দিয়া উপরে উঠিলেন ও হাইড্রলিক মেনের সেই আলকাতরা পার হইয়া আগে চলিতে লাগিলেন। এখন স্বয়ং গ্যাসে যে প্রচুর পরিমাণে আলকাতরা মিশ্রিত থাকে, ইহাকে সেই আলকাতরা হইতে পরিষ্কার করিতে হইবে। গ্যাস যখন উত্তপ্ত থাকে, তখন আল্কাতরা ইহার সহিত বাষ্প ভাবে মিশ্রিত থাকে। তাহার পর ক্রমে যখন গ্যাস শীতল হয়, তখন আল্কাতরা জমিয়া গিয়া গ্যাস হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। নলের ভিতর গ্যাস আনিবার পর অনেক আলকাতরা ইহা হইতে আপনা-আপনি পৃথক হইয়া পড়ে ও হৌজে গিয়া জমা হয়। তাহার পর গ্যাস আরও শীতল হইলে অবশিষ্ট আলকাতরা বাহির হইয়া যায়। উত্তপ্ত গ্যাসকে সহসা শীতল করিতে নাই। তাহা করিলে নলের গায়ে লবণের মত আর একটী পদার্থ জমিয়া যায়। সেই লবণের মত পদার্থ জমিয়া নলের ছিদ্র বুজিয়া যাইবার সম্ভাবনা। এই পদার্থে ন্যাফথালিন (Naphthaline) ন্যাফৎ যে মূল্য নাই তাহা নহে। নেকড়ার করিয়া ইহা বাক্সের ভিতর রাখিলে মাকড়ে কাপড়-চোপড় কাটিতে পারে; কিন্তু গ্যাস প্রস্তুতের সময় নলের ভিতর থালিন জমিতে দিলে নলের বড় অনিষ্ট হয়। তাহা ছাড়া আবার, গ্যাসের কিয়ৎ পরিমাণে আলোক প্রদায়িনী শক্তি জমিয়া এই ন্যাফ-থালিনের সৃষ্টি হয়। সে জন্য যে গ্যাস হইতে ন্যাফথালিন বাহির হইয়াছে, সে গ্যাস উত্তম নয়। এই কারণে উত্তপ্ত গ্যাসকে সহসা শীতল করিতে নাই, ক্রমে ক্রমে শীতল করিতে হয়। কয়লা ভাজিবার পাত্র হইতে বাহির হইয়া নলের ভিতর গ্যাস উঠিলে, তাহাকে একেবারে শীতল না করিয়া আরও অনেকগুলি নলের ভিতর দিয়া তাহাকে চালাইতে হয়। নলে নলে গ্যাসকে একবার উঠাইতে একবার নামাইতে ক্রমে শীতল হইতে থাকে। অবশেষে স্নিগ্ধ নল ও স্নিগ্ধ পাত্রের ভিতর দিয়া গ্যাসকে ভ্রমণ করাইলেই ইহা হইতে সমুদয় আল্কাতরা পৃথক হইয়া পড়ে। অনেকগুলি খাড়া নল যাহার গায়ে বাহ্য বায়ু লাগিয়া ভিতরের গ্যাসকে শীতল করে, তাহাকে স্নিগ্ধ নল বলে। কোনও কোনও কারখানায় এই নলের ভিতর কোককয়লা অথবা ইটের খোয়া থাকে। তাহার সহযোগে গ্যাস হইতে আলকাতরা শীঘ্র পৃথক হইয়া পড়ে। আবার কোথায় বা স্নিগ্ধ নল সমুদয় শায়িত ভাবে জলের ভিতর ডুবানো থাকে। তাহাতে গ্যাস হইতে আরও শীঘ্র আল্কাতরা পৃথগ্‌ভূত হয়। এইরূপে নানাস্থানে আল্কাতরা জমি হৌজে আসিয়া জমা হয়। তাহার পর সেথা হইতে তুলিয়া ইহা বিক্রীত হয়। বিলা পূর্ব্বে আল্কাতরার মূল্য অতি যৎসামান্য ছিল একণে ইহা হইতে ম্যাজেণ্টা প্রভৃতি নীল,

নানারূপ রঙ প্রস্তুত হইতেছে। ইহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। আরও ... এই আল্কাতরা হইতে স্যাকেরিণ না... একপ্রকার চিনি প্রস্তুত হয়। ইহা অ... পৃথিবীতে ঘোর মিষ্টপদার্থ আর দ্বি... নাই।

আল্কাতরার হাত হইতে মুক্ত হইবার পর গ্যাসকে আমোনিয়া হইতে পৃথক করিতে হয়। গ্যাসের সহিত নিষেদল বাষ্পভাবে মিশ্রিত থাকে। যদি লোকের বাড়ী গিয়া গ্যাস ও নিষেদল বাষ্প এক সঙ্গে জ্বলে, তাহা হইলে পিত্তল কাঁসা নির্ম্মিত দ্রব্যাদিতে কলঙ্ক পড়িয়া বিশেষ ক্ষতি । আমোনিয়া গ্যাস একটী যৌগিক পদার্থ, মূলপদার্থ নহে। ইহা একভাগ নাইট্রোজেন ও তিনভাগ হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত। আমোনিয়া গ্যাস যখন পুড়িতে থাকে, অর্থাৎ যখন ইহা বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইতে থাকে, তখন দুই দিকে নূতন দুইটী যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয়। নাইট্রোজেনের সহিত প্রথম অল্প অক্সিজেন মিশিয়া নাইট্রস এসিড, তাহার পর আরও অক্সিজেন মিশিয়া, নাইট্রিক এসিড বা সোরার দ্রাবক প্রস্তুত হয়। অপরদিকে হাইড্রোজেনের সহিত অক্সিজেন মিশিয়া জল হয়। জল হউক তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই, কিন্তু ঘরের ভিতর নাইট্রিকএসিড উৎপন্ন হইলে বিশেষ ক্ষতি আছে। ঘরের বায়ু দূষিত হয়, তাহা ছাড়া পিত্তলাদি ধাতু-নির্ম্মিত দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়া যায়। সে নিমিত্ত গ্যাস হইতে আমোনিয়া পৃথক করা আবশ্যক। আরও কথা এই, আমোনিয়া হইতে নিষেদল প্রস্তুত হয়। নিষেদল কিছু আর অকর্ম্মণ্য দ্রব্য নয়, ইহার মূল্য আছে। বিলাতে পূর্ব্বে অধিক নিষেদলের ব্যবহার ছিল না। ...কালে মিশরদেশে উষ্ট্রের বিষ্ঠা হইতে নিষেদল প্রস্তুত হইত। তাহাই বিলাতে অল্প পরিমাণে আমদানি হইত। গ্যাস প্রস্তুত করিতে করিতে সুচতুর বিলাতবাসিগণ দেখিলেন যে, তাঁহাদের এই গ্যাসের ভিতরই প্রচুর পরিমাণে আমোনিয়া রহিয়াছে। বাহির করিতে পারিলেই টাকা হয়। তাই এই আমোনিয়া বাহির করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। বিলাতবাসীরা দেখিলেন যে, জলের সহিত আর আমোনিয়া গ্যাসের সহিত বিলক্ষণ সদ্ভাব আছে। দেখা হইলেই দুই জনে কোলাকোলি মিশামিশি করিতে ভাল বাসে। জল আমোনিয়া গ্যাসের সহিত এত মিশিতে ভাল বাসে যে, একভাগ জল ৭৭০ গুণ আমোনিয়া বাষ্পের সহিত না মিশিলে আর পরিতৃপ্তি লাভ করে না। বটে! তুমি আমোনিয়া বাষ্প, কয়লা গ্যাসকে ভাল বাসো সত্য, তাই কয়লা গ্যাসের সহিত মিশিয়া আছ। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে, তুমি জলকে অধিক ভাল বাসো। জল পাইলে তুমি গ্যাস ছাড়িয়া জলে গিয়া মিশিবে। তোমার নিকট আমরা জল আনিয়া দিব, জলের সহিত তোমাকে আমরা মিলাইব। প্রথম প্রথম লোকে বড় বড় জলের হৌজ করিয়া তাহার এক দিকে গ্যাস ডুবাইয়া দিতে লাগিল, অপর দিকে এক একটী তালের মত বড় বড় বুদবুদ হইয়া গ্যাস ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। এইরূপে গ্যাসের আমোনিয়া জলে ধৌত হইয়া যাইল, অর্থাৎ কিনা আমোনিয়া জলের সহিত গিয়া মিশিল। কিন্তু এরূপ ধৌত করা বিলম্বের কাজ। হৌজের নিকট উপস্থিত হইয়া ধৌত হইবার নিমিত্ত গ্যাসকে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়। পশ্চাৎ দিকে গ্যাসের দ্রুতগতি মন্দ হইয়া পড়ে। এরূপে গ্যাস ধৌত করার আরও একটী দোষ এই যে, গ্যাসের চারিপিট জলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পায় না। তালের মত বড় যে বিম্বগুলি হয়, তাহার বাহির-পিট কেবল জলে ধৌত হয়, ভিতরের দিকে জল

লাগে না। ভিতরের দিকে যে আমোনিয়া থাকে, তাহা আর জলের সহিত মিশিতে পায় না, সুতরাং গ্যাসে আমোনিয়া রহিয়া যায়। সেজন্য আর একজন লোক বৃষ্টির সৃষ্টি করিলেন। কলের বলে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িবে, আর ই বৃষ্টি ভেদ করিয়া গ্যাস উপরে উঠিতে থাকিবে। তাহাতে গ্যাসের চারিপিট ধুইয়া যাইবে। আমোনিয়া বাষ্প গিয়া জলের সহিত মিশিবে। এ উপায়টী অনেক পরিমাণে সফল হইল বটে, কিন্তু ইহাতেও একটী দোষ প্রতীয়মান হইল। প্রকৃতপক্ষে কয়লা গ্যাস হইল এক প্রকার হাইড্রো কারবণ, অর্থাৎ হাইড্রোজেন ও কারবণ মিশ্রিত একটী যৌগিক পদার্থ। এই হাইড্রো-কারবন পুড়িয়াই উত্তাপ ও আলোক হয়। মুষলধারে বৃষ্টি ভেদ করিয়া যাইবার সময় কেবল যে গ্যাস হইতে আমোনিয়া পৃথক হইয়া পড়ে তাহা নহে, ইহার হাইড্রো-কারবণও অনেক নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং গ্যাসের আলোক ও উত্তাপ-প্রদায়িনী শক্তি কমিয়া যায়। সে নিমিত্ত আর একজন আর একটী উপায় উদ্ভাবন করিলেন। অনেকগুলি বড় বড় খাড়া নলের ভিতর কোক-কয়লা রাখিয়া, তাহা দিয়া গ্যাস চালাইয়া দিলেন। গ্যাস চলিবার সময় তাহার উপর আস্তে আস্তে ঝুর ঝুর করিয়া জল বর্ষণ করাই-লেন। সেই জলের সহিত আমোনিয়া মিশ্রিত হইল, কিন্তু হাইড্রো-কারবণ নষ্ট হইল না। কিন্তু গ্যাস হইতে আমোনিয়া পৃথক করিবার নিমিত্ত আর একজন একটী চমৎকার কল প্রস্তুত করিয়াছেন। কলটী আর কিছুই নয়, নলের ভিতর কতকগুলি চক্র। এই চক্রের গায়ে ব্রুশ থাকে। চক্রটী ঘুরিবার সময় ব্রুশগুলি জলে ভিজিয়া যায়। ইহার ভিতর দিয়া গ্যাস যাইবার সময় সেই জলে আমোনিয়া লাগিয়া যায়। কিন্তু এই কলটীর দাম অনেক, প্রায় ৪৫০০০ টাকা। কিন্তু মূল্য অধিক হইলে কি হয়, ইহা ব্যবহার করিলে লাভ আছে। ধৌত এই আমোনিয়া মিশ্রিত জল বা বিক্রয় হয়। ইহা হইতে লোকে ন্নি প্রস্তুত করে। যে গ্যাস-কারখানায় আমো ধুইবার জন্য ৪৫০০০ টাকার একটী কল ব্যঃ হইতে পারে, সেখানে এত নিষেদল উ হয় যে, তাহা বেচিয়া এক বৎসরের মা কলের দাম উঠিয়া যায়। এ কলটী এইরূপ—

আমোনিয়া ধুইবার কল।

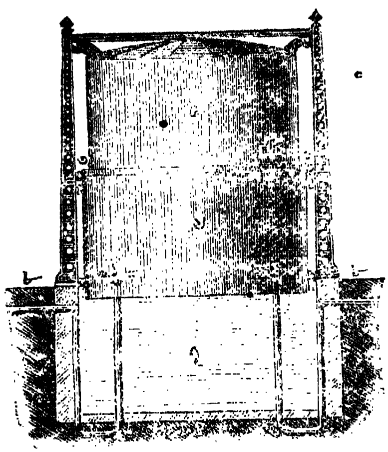


গ্যাস হইতে আমোনিয়া পৃথক হইলে ইহা হইতে গন্ধক ও কারবণিক এসিড পৃথক করিতে হয়। কারবণিক এসিড অল্প পরিমাণে থাকে ও ইহা বিশেষ অপকারী নহে। কিন্তু গন্ধক অতিশয় অপকারী। গন্ধক থাকিলে গ্যাস হইতে ঘোরতর দুর্গন্ধ বাহির হয় ও ঘরের দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়া যায়। সম্পূর্ণভাবে গ্যাস

গন্ধক দূর করা অতি দুঃসাধ্য কাজ। চু ভিতর দিয়া গ্যাস পরিচালিত করিলে গ্যাস ছাড়িয়া চূণের সহিত সংযুক্ত হইয়া য কারবণিক এসিডও ইহার সহিত মি য়া যায়। এই উপায়ে অনেকে গ্যাস পরিষ্কার করিয়া থাকেন। লৌহ চূর্ণের ভিতর দিয়া গ্যাস পরিচালিত করিলে গ্যাস হইতে গন্ধক পৃথক হইয়া পড়ে।

এইরূপে গ্যাস পরিষ্কৃত হইলে, তাহার পর ইহাকে জমা করিয়া রাখিতে হয়। গ্যাস জমা করিবার পাত্র এইরূপ—

গ্যাস পাত্র।



গ্যাস রাখিবার পাত্র আর কিছুই নয়, কেবল বড় একটী লৌহ নির্ম্মিত গোলাকার বাক্স। ইহার তলদিক খোলা, বন্ধ নয়। মনে করিলে এই পাত্রটী উঠাইতে নামাইতে পারা যায়। ইহার নিম্নভাগে বড় একটী জলের হৌজ থাকে, সেই হৌজের ভিতর দিয়া গ্যাসের নল আসিয়া তাহার মুখ জলের উপর একটু জাগিয়া থাকে। কারখানায় গ্যাস প্রস্তুত হইয়া যখন এই নলের মুখ দিয়া বাহির হইতে থাকে, তখন লৌহ-পাত্রটী নামাইয়া দিতে হয়। ইহার চারি ধার হৌজের জলে ডুবিয়া যায়। নলের মুখ দিয়া গ্যাস আসিয়া ক্রমে পাত্রটী পূর্ণ হয়। ইহার চারি ধার জলে ডুবিয়া থাকে বলিয়া গ্যাস বাহির হইয়া যায় না। আবশ্যক মতে এই পাত্র হইতে রাস্তায় ও লোকের বাড়ীতে নলের দ্বারা গ্যাস প্রেরিত হয়।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

গরীব গর্দ্দভ ও ম্রিয়মাণ মেষ।

(১)

গর্দ্দভ মূর্খ ও বুদ্ধিহীনের উপমাস্থল। গর্দ্দভ অপেক্ষা অপমান-সূচক গালি আর নাই। ঘৃণার্হ জীব বলিয়া আমরা কখনও গর্দ্দভে আরোহণ করি না, সচরাচর ইহাদিগকে অতি নীচ কার্য্যে ব্যবহার করি। কিন্তু বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিৎ বফুন (Buffon) বলিয়াছেন যে, যদি অশ্বজাতির অস্তিত্ব না থাকিত ও গর্দ্দভকে অশ্বের ন্যায় যত্নের সহিত প্রতিপালন করা হইত, তাহা হইলে গর্দ্দভ বর্ত্তমান অবস্থা হইতে এতদূর উন্নতি লাভ করিত যে, আসিয়া খণ্ডের পশ্চিমাংশস্থিত প্যালেস্টাইন্ (Palestine) প্রভৃতি প্রদেশসমূহে উহার যেরূপ সম্মান ও আদর, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সেইরূপ হইত। বাইবেলে দেখা যায় যে, স্বয়ং যীশুখৃষ্ট গর্দ্দভে চড়িয়া পৃথিবীর পাপরাশি বহন করিয়া বেড়াইতেন। তাহাতে সে মহাপুরুষের মর্য্যাদাহানি হয় নাই। পঞ্জাবের স্ত্রীরা গর্দ্দভে আরোহণ করেন, গর্দ্দভ তাঁহাদিগের আদরের জিনিশ। প্রবাসী বন্ধুবান্ধবের পরস্পর সাক্ষাতে তাঁহাদিগের মধ্যে প্রথম আলাপ হইল, 'আপনাদের গাধা-গাধী ভাল আছে ত?' আর, আমাদের দেবতা শীতলাদেবীর বাহন গর্দ্দভ, ইহাও বোধকরি সকল হিন্দুই জানেন। কত ব্যয় করিয়া অশ্ব প্রতিপালন করিতেছি। কিন্তু রীতিমত আহার, তত্ত্বাবধান, নিয়মমত পরিশ্রম প্রভৃতি প্রভূত আদর যত্নে

থাকিয়াও সুযোগ পাইলেই অশ্ব বোম ছিঁড়িয়া পলায়। আর গর্দ্দভ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায়—দুঃখে উহার কাতরতা নাই, অত্যাচারে ভ্রূক্ষেপ নাই, পরিশ্রমে শ্রান্তি বোধ নাই। গর্দ্দভের এবংবিধ গুণ থাকিতেও সকলেই উহাকে ঘৃণা করে। আমাদের অজ্ঞতা ও গর্দ্দভের দুরদৃষ্ট বশতঃই গর্দ্দভ এত ঘৃণার্হ জন্তু। গর্দ্দভকে কেহ চিনে না বলিয়াই উহার এত অনাদর। উহার যে কত বুদ্ধি তাহা ক্রমে বলিতেছি। এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন :—

"The contempt which certain fabulists have heaped on the character of the Dunkey is more absurd than the respect which our humorist Sterne had for this creature. I can not strike this animal. Their is such patience, such resignation written in its looks and its behavior—all that pleads so much for it that it disarms me."

যাঁহারা গর্দ্দভের কার্য্যাবলী যত্ন সহকারে পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাঁহারাই উহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা অবগত আছেন। অনেক বিখ্যাত ভ্রমণকারী, পারস্যদেশীয় উচ্চজাতীয় গর্দ্দভদিগকে অতি সুন্দর জন্তু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গর্দ্দভের বুদ্ধি উহার স্বভাব ও কার্য্যে প্রকাশিত হয়।

গর্দ্দভ অশ্বজাতীয় জন্তু। অশ্বের গঠন প্রণালী ও কঙ্কালের সহিত গর্দ্দভের গঠনপ্রণালী ও কঙ্কালের অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য আছে। অশ্বের ন্যায় গর্দ্দভেরও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আছে। অধুনা ইউরোপের মধ্যে স্পেনদেশীয় গর্দ্দভই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমেরিকা মহাদেশের দক্ষিণাংশেও অনেক উচ্চশ্রেণীর গর্দ্দভ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশই গর্দ্দভের আদি বাসভূমি। সম্ভবতঃ ইহারা প্রথমতঃ আরবদেশ হইতে মিশরে ও তৎপরে ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে নীত হয়। আরিষ্টটেল (Aristotle) বলেন যে, তাঁহার সময়, গলে (বর্ত্তমান ফ্রান্স) গর্দ্দভ দেখা যাইত না। তিনি আরও [illegible] যে, শীতপ্রধান দেশ ইহাদিগের বংশবৃদ্ধি[illegible] একেবারেই অনুকূল নহে। এই [illegible] বোধ হয় অত্যন্ত হিমপ্রধান দেশে [illegible] অপেক্ষাকৃত খর্ব্বাকৃতি ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে[illegible]

গর্দ্দভ চারি পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বাড়ে ও কুড়ি হইতে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। গর্দ্দভী একাদশ মাস গর্ভধারণ করে ও তৎপরে একটীমাত্র সন্তান প্রসব করে। ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট অপত্যস্নেহ দৃষ্ট হয়। গর্দ্দভের ঔরসে ও অশ্বিনীর গর্ভে অশ্বতর উৎপন্ন হয়।

গর্দ্দভের দুগ্ধ অতি উপকারী। প্রাচীন গ্রীকেরা তাহা ব্যবহার করিতেন। ভাল দুগ্ধের প্রয়োজন হইলে সুস্থকায় ও হৃষ্টপুষ্ট গর্দ্দভী সংগ্রহ করা আবশ্যক; নতুবা দুগ্ধপানে কোনও ফল হয় না। যে গর্দ্দভীর দুগ্ধ পান করিতে হইবে, তাহার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ঘাস, খড় ও গম ভিন্ন অন্য কোনও দ্রব্য তাহাকে খাইতে দেওয়া উচিত নহে। দোহনান্তে দুগ্ধ যাহাতে বায়ু-সংস্পর্শে শীতল হইয়া না যায়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ তাহা হইলে উহা অল্পক্ষণেই বিকৃত হইয়া যায়।

গর্দ্দভ বড় পরিচ্ছন্নতাপ্রিয়। লোমশ জন্তুদিগের মধ্যে গর্দ্দভই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার। আমরা যে সকল গৃহ-পালিত জন্তু দেখিতে পাই, পোকানিবারণের সহস্র যত্নসত্ত্বেও তাহাদিগের শরীরে এক প্রকার পোকা হইয়া থাকে। কিন্তু গর্দ্দভের শরীরে কখনও পোকা হয় না। উহার পরিচ্ছন্নপ্রিয়তাই তাহার প্রধান কারণ। গাত্র[illegible] কণ্ডুতি-নিবারণার্থ অশ্ব যেরূপ জলকাদা কিছু[illegible] বাছিয়া গড়াগড়ি, দেয় গর্দ্দভ কখনও সেরূপ [illegible] না। প্রয়োজন হইলে ইহারা ঘাসের উপর [illegible] পড়ে। কর্দ্দমে যাইতে কিংবা পা ভিজা[illegible] গর্দ্দভ একান্তই অনিচ্ছুক।

[illegible] ভর প্রকৃতি অতি ধীর ও শান্ত। কা[illegible] কাহারও মতে "It is compared to a [illegible]sopher who supports with calmne[illegible] the bitterness of life. The ass is [illegible]ype of good men who renounce the [illegible]omp and vanities of the world."

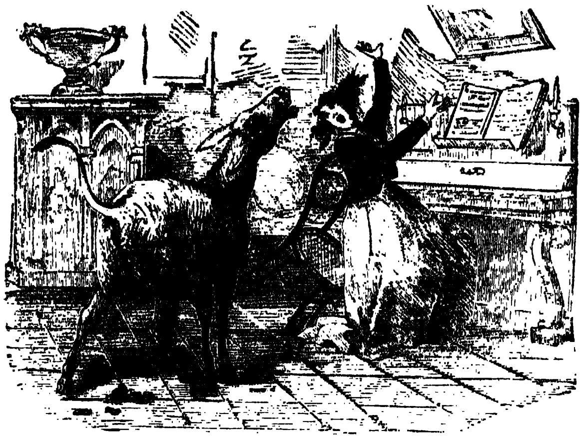
গর্দ্দভ আলস্য ভাল বাসে না। ইহারা স্বভাবতঃ অত্যন্ত চঞ্চল ও প্রফুল্ল। কিন্তু প্রভুর ৎপীড়নে ইহাদের চাঞ্চল্য ও প্রফুল্লতা নষ্ট হইয়া যায়। উপযুক্ত আহার না পাইলেও গর্দ্দভ কর্ম্ম করিতে অসম্মতি প্রকাশ করে না। ইহারা বিবেচনাপূর্ব্বক সাবধানতার সহিত কর্ম্ম করে। র্দ্দভ প্রভুর বড় অনুগত হয় এবং জনতার মধ্য হইতে প্রভুকে চিনিয়া লইতে পারে। প্রভু নিকটে আছে কি না ঘ্রাণশক্তি দ্বারা গর্দ্দভ তাহা বুঝিতে পারে। গর্দ্দভের দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণ এবং ঘ্রাণ, শ্রবণ ও স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রবল। র্দ্দভ বড় সঙ্গীত-প্রিয়!

এক শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের পার্শ্বস্থ কোনও প্রাচীর বষ্টিত ভূমিখণ্ডে কতকগুলি অশ্ব ও একটী র্দ্দভকে রাখিয়া দেওয়া হয়। পাছে পশুগণ কানও কৌশলে ফটকের খিল খুলিয়া বাহিরে আসিয়া পরিপক্ক শস্য নষ্ট করিয়া ফেলে, এই ভয়ে ক্ষেত্রস্বামী ত্বরায় সেই স্থানে একজন লাক প্রেরণ করেন। রক্ষক আসিয়া যাহা দখিল, তাহাতে সে একেবারে বিস্মিত হইল। র্দ্দভটী কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া স্বীয় দন্ত দ্বারা ড়কা আঁকড়াইয়া ধরিল এবং বন্ধ করিবার বপরীত দিকে মস্তক নাড়া দিয়া অবিলম্বে তাহা খুলিয়া বহির্গত হইবার পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। নিকটে দাঁড়াইয়া বুদ্ধিমান অশ্বগণ রভাবে তাহাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট পশুর এই দ্ধির কার্য্য অবলোকন করিতেছিল।

কোনও ভারবাহকের একটী গর্দ্দভ ছিল। প্রত্যহ একটী নির্দ্দিষ্ট পথে গর্দ্দভটীকে লইয়া যাইত এবং গমনকালে একখানি মদের দোকান হইতে কিঞ্চিৎ মদ্য ক্রয় করিয়া আপনি পান করিত ও কিয়দংশ তাহার শ্রমশীল অনুচরটীকে দান করিত। কালক্রমে ভারবাহকের মনের এমনি পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল যে, সে শপথ করিয়া মদ্যপান ত্যাগ করিল। এ পরিবর্ত্তনে তাহার অনুচর আন্তরিক সুখী হইতে পারিত, যদ্যপি তাহাকে নিজের অংশটুকুর জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে না হইত। মদ্যত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে গর্দ্দভের প্রভু সে দোকানগৃহও ত্যাগ করিল। সে উক্ত স্থানে আসিলেই গর্দ্দভ প্রভুর সঙ্কেতের অপেক্ষা না করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িত—প্রভুর সহস্র তাড়নাতেও তাহার চৈতন্য হইত না। গর্দ্দভের উপস্থিত হাস্যোদ্দীপক ঔদ্ধত্যে প্রভুর পূর্ব্বাবস্থা মনে হইল এবং নিজে মদ্যপানের জন্য কিরূপ ব্যাকুল হইত, গর্দ্দভের আচরণ দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিল। সেই অবধি নিজে সুরাবিদ্বেষী হইলেও গর্দ্দভকে কিয়ৎপরিমাণ কিনিয়া দিত। গর্দ্দভও তখন পূর্ব্বের ন্যায় শান্ত হইয়া কার্য্য করিতে লাগিল। এই ঘটনা হইতে জানা যায় যে, মনুষ্যের ন্যায় নিকৃষ্ট জন্তুগণ সম্পূর্ণরূপে অভ্যাসের অধীন।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চমাসে কাপ্তেন ডণ্ডাসের একটী গর্দ্দভকে মাণ্টা দ্বীপে পাঠাইবার জন্য জাহাজে তুলিয়া দেওয়া হয়। গর্দ্দভ পথ চিনিয়া যাইতে পারে কিনা, দেখিবার জন্য গেটা দ্বীপের নিকটে আসিয়া গর্দ্দভটীকে জলে ফেলিয়া দিয়া পোতখানি আপন পথে চলিয়া গেল। সমুদ্র তখন বড়ই ভীষণ। সেই মহাসাগরের অনন্ত বারিরাশির উত্তাল তরঙ্গমালা অতিক্রম করিয়া রক্ষা পাওয়া ক্ষুদ্রপ্রাণী গর্দ্দভের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। কেমন করিয়া কি হইল লোকে কিছুই বুঝিল না। কিছুদিন পরে একদিন প্রাতঃকালে গর্দ্দভ জিব্রল্টারের এক বণিকের গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সঙ্গীত-প্রিয় গর্দ্দভ।



মাণ্টায় যাইবার পূর্ব্বে গর্দ্দভ সেইখানেই ছিল। বণিক গৃহের বাহিরে আসিয়া গর্দ্দভকে দেখিয়া প্রথমতঃ কিছু বিস্মিত হইলেন। পরক্ষণেই মনে করিলেন, হয়ত কোনও কারণে সে জাহাজে গর্দ্দভের যাওয়া হয় নাই। তিনি গর্দ্দভটীকে রাখিয়া দিলেন। কিছুদিন পরে পোতখানি যখন জিব্রল্টারে ফিরিয়া আসিল, তখন সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইল। গর্দ্দভ শুধু যে নিরাপদে সন্তরণ দিয়াছিল তাহা নহে, চালকের সাহায্য ব্যতিরেকে এবং মনুষ্যের ন্যায় কোন দিক্‌নিরূপণ যন্ত্র না দেখিয়া একশত ক্রোশ সমুদ্রপথ চিনিয়া এবং জিব্রল্টারের বিষম জল-প্রণালী অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বস্থানে আসিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এক ব্যক্তির একটী গর্দ্দভ ছিল। তিনি প্রতিদিন গির্জ্জায় যাইবার সময় গর্দ্দভটীকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। গির্জ্জার অধিকারিণী অতি সুন্দর গান গাহিতেন। গর্দ্দভ মনোযোগ পূর্ব্বক জানালার ধারে দাঁড়াইয়া প্রত্যহ গান শুনিত। একদিন রমণীর সুকণ্ঠে গর্দ্দভ কিছু অধিক মাত্রায় পুলকিত হইয়া স্বস্থান ত্যাগ করত উপাসনাগৃহে প্রবেশ করিয়া মনের আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

---

(২)

গর্দ্দভের ন্যায় মেষও বড় দুর্নামের ভাগী। তিরস্কারকালে মেষ বা মেড়া শব্দ প্রয়োগ করিলে তিরস্কৃতের অপমানের একশেষ হয়। মেষের চলিত নাম মেড়া—মেড়া মেষশব্দের অপভাষা। এই অপভাষার প্রকৃত ভাষ্য করিলে দেখা যায় যে, মেষ বুদ্ধিহীন, মূর্খ ও কাপুরুষ প্রভৃতির উদাহরণস্থল। প্রাচীনকালে মেষের অত্যন্ত মর্য্যাদা ছিল। মেষ তখন মুকুটধারী রাজন্যবর্গের ঐশ্বর্য্যস্বরূপ ছিল। এখন আর সে দিন নাই। এখন রূপান্তরিত ভাবে মেষের মর্য্যাদা বাড়িয়াছে। মেষমাংস এখন Rich food বলিয়া পরিগণিত। তাই, মাংস খাইয়া উহার বুদ্ধি আছে কি না তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করা কেহ উপযুক্ত বিবেচনা করেন না—যেন সকলেই দৈববলে উহার বিষয় জানিতে পারিয়া উহার বুদ্ধিহীনতা সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দিবার অনেক উপায় আছে, কিন্তু বুদ্ধিমানকে নির্ব্বোধ বলিয়া আপনাদিগের বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দেওয়া মনুষ্যোচিত কার্য্য নহে। একটু যত্ন করিয়া পশ্বাদির বিবরণ পাঠ অথবা কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তির [illegible] প্রকাশিত হইবে।

...ন আকাশে নানাবিধ বিহঙ্গ-কুল উড়িয়া ... যেমন জলে অশেষ প্রকার মৎস্য ক্রীড়া ক...সেইরূপ এই পৃথিবীতে নানাজাতীয় মেষ দৃ...চর হয়। এক জাতি অপর জাতি অ...া আকারে প্রকারে অনেক বিভিন্ন। কা...রও গাত্র কোমল লোমে আবৃত, কাহারও শরীরে পশমের লেশমাত্র নাই, কেহ বা দীর্ঘ লাঙ্গুল-বিশিষ্ট, কাহারও কর্ণ গর্দ্দভের কর্ণের অনুরূপ। স্পেন দেশীয় মেরিণোর (Merino) ন্যায় সুন্দর মেষ পৃথিবীর আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। জর্ম্মানেরা উক্ত শ্রেণীর মেষপালকে যত্ন পূর্ব্বক পালন করিয়া তাহাদের স্বাভাবিক গাত্রাভরণ দ্বারা বাণিজ্য ও শিল্পের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছেন। কেমন করিয়া মেরিণোগণের উৎপত্তি হইল, তাহা জানিতে হইলে রোমানদিগের বৃত্তান্ত পাঠ করা কর্ত্তব্য। সম্রাট ক্লডিয়সের (Claudius) শাসনকালে রোমে কলিউমিল্লা (Columilla) নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাস করিতেন। বিটীকায় (Bootica) তাঁহার খুল্লতাতের বসতি ছিল। তিনি একদা আফ্রিকা হইতে কতকগুলি মেষ স্পেনে কেডিজ্ (Cadiz) নগরীতে আনয়ন করিয়াছিলেন। ঐ সকল মেষের লোম মোটা হইলেও বর্ণ অতি সুন্দর। তিনি সেই মেষগুলিকে কতকগুলি সূক্ষ্মলোমাবৃত মেষের সহিত আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তাহাদিগের ঔরসে যে সকল সন্তান হইল, তাহাদিগকে লইয়া পুনরায় কতকগুলি টারেণ্টাইন্ বংশোদ্ভূত (Tarentine stock) শাবকদিগের সংস্পর্শে রাখিয়া দিলেন। অতঃপর তাহাদিগের ...ান-সন্ততি সূক্ষ্মলোম ও সুন্দর বর্ণ, এই ...বিধ সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইল। তাহারাই ...রিণো নামে অভিহিত। কলিউমিল্লার ...তাত যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই নূতন ... সৃষ্টি করিলেন, অনতিকাল মধ্যে তাহা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল এবং অনেক স্থলেই মেরিণো জাতীয় মেষের উৎপত্তি হইল। মেরিণো মেষগণ অতিশয় শ্রমশীল ও কষ্ট সহিষ্ণু। রোমরাজ্য যখন অসভ্যগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহাদিগের অত্যাচারে সমস্ত দেশ যখন উৎসন্ন যাইতেছিল, তখনকার সেই বিষম বিশৃঙ্খলতায় পড়িয়া সুখী টারেণ্টাইন্ সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব পৃথিবী হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে অত্যাচারে মেরিণোজাতীয় মেষপালের কোনও অনিষ্ট হয় নাই। গথ, ভাণ্ডাল (Goths, vandals) প্রভৃতি অসভ্যগণ যখন স্পেন জয় করিল, তখনও ইহারা সচ্ছন্দে নানা রঙ্গে ইতালীর উত্তরসীমা সুশোভিত উচ্চ আল্প্‌স্ পর্ব্বতের শিখরে শিখরে ক্রীড়াশীল। এই সকল সুন্দর মেষ হইতেই পরে ইউরোপে নানা শ্রেণীর মেষের উৎপত্তি ও বিস্তৃতি হইয়াছিল। যে সকল মেষের লোম হইতে সুন্দর ও বহুমূল্য বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া ইউরোপের নানা স্থানের বাণিজ্যাগার পরিশোভিত করে, তাহারা সকলেই সেই মেরিণোবংশাবতংস বলিয়া পরিগণিত।

গৃহপালিত মেষ অতি ভীরু ও নিরীহস্বভাব হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর মেষকে তত বুদ্ধির কার্য্য করিতে দেখা যায় না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, মনুষ্য দ্বারাই ইহাদিগের সমস্ত অভাব মোচন হয়। বন্য মেষদিগের মধ্যে বুদ্ধির অদ্ভুত কার্য্য দৃষ্ট হয়। মধ্য আসিয়ার আরগালি (argali) এবং দক্ষিণ ইউরোপের মফ্লন (muffon) অতিশয় বুদ্ধিমান জন্তু। মফ্লণ সম্বন্ধে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন—

"A glance at the muffon might puzzle even one of the Judges of the Smithfield club to decide whether the creature mostly resembles a sheep or a goat; but there can be no mistake about the energy daring and courage of the animal."

কার্য্যক্ষেত্রে মেষদিগের সাহস ও বুদ্ধি বিকসিত হইয়া থাকে। অনেক সময় শিকারী কুকুর ইহাদিগের শাবককে আক্রমণ করিলে ইহারা সন্তানকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যোদ্ধার ন্যায় শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। সিরিয়া দেশীয় মেষপালের মধ্যে একটী মেষের নাম ধরিয়া ডাকিলে সে তৎক্ষণাৎ আহ্বানকারীর নিকটে আইসে। শিক্ষা দ্বারাই এই সকল কার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। নির্ব্বোধ হইলে শিক্ষায় কোনওরূপ ফল ফলিত না।

মেষের তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। একদা শাবকসহিত একটী মেষকে এডিনবার্গ (Edinburg) হইতে পার্থসায়ারের (Perthshire) অন্তর্ব্বর্ত্তী কোনও নগরে পাঠান হইয়াছিল। মেষটী যেদিন ষ্টার্লিং এ (Sterling) পঁহুছিয়াছিল, সেদিন হাটবার। হাট, লোকে লোকারণ্য। পাছে জনতা ভেদ করিয়া আসিতে তাহার কিম্বা শাবকটীর কোনও রূপ বিপদ উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় সে স্থানান্তরে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে জনতা কমিয়া গেলে সে নিরাপদে চলিয়া গেল। মেষ নির্ব্বোধ হইলে এরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিতে কখনই পারিত না।

একদা এক জনহীন প্রদেশের মধ্য দিয়া কোনও পর্য্যটক দ্রুতপদে গমন করিতেছিলেন। এমন সময় একটী মেষ অদ্ভুত ভাবে চীৎকার করিতে করিতে তাঁহার নিকটে আসিল এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। পর্য্যটক কৌতূহলী হইয়া তাহার সঙ্গে কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন, উক্ত মেষের শাবকটী বড় বড় দুই খণ্ড প্রস্তর মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে—কিছুতেই আর উঠিতে পরিতেছে না। পর্য্যটক তৎক্ষণাৎ শাবকটীকে রক্ষা করিলেন এবং অবোধ পশুর এবংবিধ কার্য্য দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও হর্ষান্বিত হইলেন।

আর একটী মেষ তাহার শাবককে রক্ষা করিতে না পারিয়া নিকটস্থ মাঠ অপর একটী মেষকে ডাকিয়া আনিয়া সন্[illegible] রক্ষা করিয়াছিল। মেষের উপস্থিত বুদ্[illegible] কতদূর তীক্ষ্ণ তাহা উপরোক্ত ঘটনা পাঠ লেই সম্যক বুঝিতে পারা যায়। কেমন ক[illegible] প্রাণিগণ অপর প্রাণীকে কিংবা পরস্পরের মধে অভাব জানাইতে পারে, সে সকল দার্শনিক জটিলতার মধ্যে (metaphysical maze) প্রবেশ করিবার কোনও আবশ্যক নাই।

শ্রীহরনাথ বসু।

ম্যালেরিয়া-মঠ।

না জানি কতেক মধু, ম্যালেরিয়ায় আছে গো,
বদন কহিতে নারে সই ;
লেপের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
মরি! যেন যন্ত্রিয়া কই।

জপিতে জপিতে নাম, অমনি আইল গো,
কখন,—না জানি ;
মুহু মুহু মোলায়েম, অনঙ্গে উধাও গো,
ম্যালেরিয়া রাণী।

প্রেম-পরতাপে সই পাগল করিল গো,
অঙ্গের পরশে কৈছে হয়!
অস্থি-চর্ম্ম-সার দেহ রসের আবেশে গো,
কহনা, পরাণ কৈছে রয়।

শ্রীপাট ম্যালেরিয়া মঠে, ইদানী এ অধীনের অবস্থিতি। ম্যালেরিয়া-রসে বিভোর আছি। মহাশয়েরা যদি কেহ এ রসের কিছু রসাভাস গ্রহণ করিতে সাহসী হন, স্বস্তিবাচন করুন।

মহারাণী ম্যালেরিয়ার জন্ম কিরূপে,—তাঁ[illegible] যোনি—বা অযোনি-সম্ভবা ;—তাঁহার কর্ম্মভূ[illegible]

...য়,—বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, ...ত; এসিয়া, ইয়ুরোপ, আফ্রিকা, আমে- ...,—বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে,—অথবা স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ...ত্র;—তদীয় সাম্রাজ্যের সীমা কোথায় এবং ...সননীতি কিরূপ,—কনজারভেটিব, প্রোগ্রে- সিব বা আলট্রা-রেডিক্যাল, তান্ত্রিক বা মান্ত্রিক; পরন্তু, মাদাম-ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি ও উন্নতির হেতু ও হাতিয়ার কি কি? ইত্যাদি স্থূল ভৌতিক এবং ভৌগোলিক বিবরণ আমার ভাবনার বিষয়ীভূত নহে। এ সকল তথ্য যাঁহারা জানিতে অভিলাষী, তাঁহারা জ্ঞান বা অজ্ঞান লাভার্থে যদৃচ্ছা, ধান্য-ক্ষেত্রে ও মৃত্তিকা-নিম্নে, রেলওয়ে-বাঁধে ও পুষ্করিণীর-পঙ্কে, মরা-নদীতে ও চরা-বাঁওড়ে, পানা-পুকুরে ও পলিত-পত্র-স্তূপে এবং সর্ব্বোপরি শুবে-বাঙ্গালার ভাবী ভিলেজ-ড্রেনেজ অভ্যন্তরে গমন করুন। সে কালের পাকা পোলিটিসিয়ন রাজা দিগম্বর মিত্র হইতে এ কালের পাতি-স্যানিটেরিয়ান্ সুরেন্দ্র বাবু পর্য্যন্ত সমগ্রভূমি সটান ছাড়িয়া দিলাম, যিনি যে-টী-খুসি-সেটি ম্যালেরিয়া-থিওরী কুড়াইয়া লউন। গোরা মিস্তিরির তৈয়ারি ম্যালেরিয়া-থিওরীও ঢের আছে। ইচ্ছা ও আবশ্যক হয়, আপনারা তাহারও অনুশীলন করিতে পারেন; কিন্তু উচ্ছিষ্ট স্পর্শেরই বা প্রয়োজন কি? আপনারা নিজে-নিজেও নিজের নিজের এক একটা থিওরী খাড়া করিলেও পারেন। থিওরী ত আর বড় ...বনী কিছু নয়, একটা ঠাওর। চারি চৌহদ্দী ...রিয়া একটা ঠাওর করিলেই হইল। তোমার ...থওরী বা ঠাওর যতই অসম্ভব, উদ্ভট বা ...বাদাড়ে হউক না, মুখজোর থাকিলে, ঠকিয়াও ...কিবে না, ইহা নিশ্চিত।

মাদাম-ম্যালেরিয়ার সহিত, তোমাদের ...নও থিওরী ঠাওরেরই সম্বন্ধ আমার নহে। ...হার সহিত আমার অথবা আমার সহিত তাঁহার অতি মিষ্ট সম্পর্ক; মর্ম্মান্তিক এবং আধ্যাত্মিক-সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধ এখন চিরস্থায়ী, মকররি এবং মৌরসী। ইহা দশশালা বন্দো-বস্তের জের নহে; ইহা মৌলিক-মৌরসী। ইহা জমিদারের জমিদারির পারমানেণ্ট সেটেলমেণ্ট অপেক্ষাও পাকা। ইহা সূর্য্যা-স্তের নিয়মে নিলাম হয় না। জমিদারির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, "কেদাস্ত্রাল সার্ভে" ও "রেকর্ড অব রাইটে" ব্যথা পায়; আমার এই মৌরসী-ম্যালেরিয়ার মধুর রস নিম্ব, কুইনাইন, অহিফেন, আর্সেনিকেও বিন্দুমাত্র ব্যথিত নয়।

আমি জানি মিসাস্ ম্যালেরিয়া অতি সম্ভ্রান্ত কুল-সম্ভূতা মহিলা। তিনি পুষ্করিণীর পঙ্কে পলিত-পত্রে, ধান্যক্ষেত্রে, বদ্ধ-সলিলে বা সর্পিময় স্থানে বাস করিবার পাত্রী নহেন। তিনি তোমাদের জ্ঞান বিজ্ঞানের, ঠাওর থিওরীর অতীত। তোমরা বঙ্গীয় বিলেজে বিলের ভিতরে পাকা-ড্রেণ গাঁথিবে গাঁথ, ধানের ক্ষেতে জাঙ্গাল উঠাইবে উঠাও, আজ পাড়াগাঁয়ে "ওয়াটার পাইপ" গাড়িবে গাড়। তোমাদের এ সব উদ্ভট কীর্ত্তিতে কেবল করদাতাই ডরায়, শ্রীমতী ম্যালেরিয়া ঠাকুরাণী ডরান না। তিনি তোমা-দের এই স্যানিটারি শোভা-সমন্বিত সহরের বুকের উপর বসিয়া সংগোপনে কাণে কাণে আমার সহিত এ কথা কহিয়াছেন। 'কাণে কাণে কথায়' বিশ্বাস না কর; ঢাক ঢোল পিটিয়া খোল করতাল বাজাইয়া কমিসন বসাও, ম্যালেরিয়া-মূর্ত্তিমতী হইয়া সাক্ষ্যপ্রদান করি-বেন; সদস্যদিগের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করি-য়াও প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছেন। শ্রীমতীর প্রাইবেট সেক্রেটারী স্বরূপ আমি এ কথা প্রকাশ করিতেছি।

কিন্তু মাদামের সহিত আমার এত পীরিত কত দিন? শুভদৃষ্টি, চারি চোখে চাওয়া-চাহি, প্রেমানলের এতটা মাখামাখি কি রূপে, কোন্

সূত্রে, কোথায় হইল? আমি কি পুণ্যসলিলা পানা-পুকুরে যাইয়া যাগ যজ্ঞ করত তাঁহাকে জাগাইয়াছি? অথবা মরা নদীর সলিলে শৈবালে শ্মশানে তাঁহাকে, শব-সাধনে সজীব করিয়া সুমিষ্ট প্রেম পাতাইয়াছি? কিংবা ধান্যক্ষেত্রে গিয়া আমি তাঁহার ধ্যানে বসিয়াছিলাম? না, মহাশয়, কোথাও গিয়া কিছু করি নাই। 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি'।

ভারতরাজ্যের রসময়ী রাজধানী, নমস্যা নগরনগরীকুলের কমনীয়া পাটরাণী, সর্ব্বশোভা-সমন্বিতা, সর্ব্বৌষধি-শ্রী-সম্পন্না, সর্ব্বস্বাস্থ্য-প্রদায়িনী, স্যানিটারি ড্রেণ-গর্ভা, ওয়াটারপাইপ-প্রসূতী, অতি বড় ইলেক্টিব্ মুন্সিপালটীর মাতা এই মহা মেট্রপলিস কান্তিমতী কলিকাতা সহরে, অষ্টপ্রহর উত্তাপ—শুষ্ক, শুষ্কাদপি শুষ্ক খটখটে, (Dry) দ্বিতল কক্ষে পর্য্যঙ্কোপরে মাদাম ম্যালেরিয়াকে পাইয়াছি অথবা মাদাম আমায় পাইয়াছেন। আমি মযুজে আছি।

মরি! কি মধুর, কি মনোরম, কি পুলক-প্রফুল্লতাপ্রদ, কি প্রাণাগ্রভাগ-স্পর্শী, কি আরাম-আবেশ-আবল্য-আয়েসময়, কি প্রিয়পিয়াসময়, কি শীত-সন্তাপ-সঙ্গীতময়, ষড়ৈশ্বর্য্যময়, অষ্ট-আনন্দময় এবং দশদশাময় সেই মযুজ। শ্রীমতী ম্যালেরিয়া-সহবাস-জনিত সেই স্বর্গীয় সম্ভোগ!

কভু রাজসিক, কভু তামসিক কখনও বা সাত্বিক ভাবে ভোর হইয়া আছি। যুগপৎ কম্প, স্তম্ভ ও রোমাঞ্চ হইতেছে,—কদম্বপুষ্পবৎ ফুটিয়া উঠিতেছি। প্রতি রোমকূপে প্রত্যেক রোম কাঁটার মত মাথা উঁচু করিয়াছে;—রোমাবলী—কঙ্কালসার দেহ-যষ্টিরূপ কদম্বের কিবা অপূর্ব্ব কমকান্তি উৎকর্ণ কেশর!! কম্পনে কলেবর "কুকুর-কুণ্ডলী" কাজেই কদম্ব। মরি মরি! কি কুসুম-সন্নিভ শোভা!

কভু দাহ হইতেছে, কভু স্তম্ভ হইতেছে, কভু স্বেদ ও স্বরভঙ্গ হইতেছে, কখনও বেপথু ও বৈরাগ্য হইতেছে। কখনও বা অ[illegible] উপস্থিত। অঙ্গের উত্তাপে পানা-পুকুর[illegible] যায়, কোথা বা লাগে তোমার কয়লা[illegible] তেঁতুল ঘুঁচুর আর গরাণ কাঠের আগুন[illegible]

অঙ্গের আগুন স্বেদে ছয়লাব হইয়া[illegible] তেছে। স্বরভঙ্গ, কিন্তু সঙ্গীত সদা বিরা[illegible] সঙ্গীত শ্রীমতীর বড় প্রিয়। শ্রীমতী আসিলে সঙ্গীত আসে। খেয়াল, ধ্রুপদ, টপ্পা, তেলেনা কালনাংড়া, কীর্ত্তন, ঢপ, থিয়েটারী, গাড়োয়ানী বৈরাগ্য ও ব্রাহ্মসঙ্গীত—সব। সঙ্গীত-স্রোতে সঙ্গে কভু হাস্য, কভু অশ্রু-স্রোত, কখনও [illegible] শেষোক্ত উভয়ে গলাগলিভাবে যুগপৎ প্রবাহিত

পরন্তু, যখন প্রলয় উপস্থিত, তখন পরিবা[illegible] শুদ্ধ লোকের প্রাণান্ত, খট্টার উপর আছড়া পিছুড়ি।

কিন্তু, এ-বা কয়টা ভাব! সমগ্র ভাব-রাজ বুকে করিয়া রসসিন্ধু লেপের ভিতর উছলায়মান এক এক ঝাঁকে বিশ পঁচিশটা করিয়া [illegible] ভাসিয়া উঠিতেছে! কোন্‌টা ধরিবে কোন্‌ট ছাড়িবে? ইহার এক একটায় এক এক ডজন সম্পাদক পয়দা করা যাইতে পারে। ভাবের অজাগর ভিক্ষা নয়, যে ভাবুক ভাব ধরিবার বোঁড়সী ফেলিয়া, বৃদ্ধ বকের মত বসিয়া আছেন ত আছেনই। কবে কোন্ জন্মে মান্ধাতা মন্বন্তরে একটা ভাব বিঁধিয়াছিল, তারপর মোগলের আমলে একটা ভাব আসিল, পরে ভাব আর একেবারেই আসিল না। ম্যালেরিয়া-মঠে ভাবের গাঁদি। সঞ্চারী ভাব, ব্যভিচারী ভাব—শান্তি, ভাব-সাবল্য, ভাব-শৈথিল্য, ভাব-সন্ধি, ভাবাভাব, ভাব-বিভাব কত চাও? অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, নিন্দা, কুৎসা, প্রশংসা, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মত্ততা, বিকার, বিবাহ, প্রেম, প্যাসন, বাত, পিত্ত, কফ, জড়তা, জ্বালা, মৃত্যু, রতি, উপরতি; ট্রাজিডি ও কমিডি; কি চাও, ক[illegible] চাও? অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা

...শিত্ব, কামাবসায়িতা,—অষ্টশক্তি সর্ব্ব-...র্ভমতী,—এই মধুর মঠে। শক্তিসম্পদ ও ...ভুব। কোণে কানাচেই কিল কিল ...ছে। বাক্য-বাঁধনে, ভাষার লতা পাতায় ...ত পারিলেই বাস! নির্জ্জলা, নিছক, ...নরেট কবিতা! কনক্রিট এবং সলিড পোইট্রী। একটানে অমরত্ব! কেহ কৃত্তিবাসের কন্যা—পৌত্রী, কেহ কাশীদাসের দৌহিত্র-বধূ, কেহ কবিকঙ্কণের নাতিনী-জামাই; কেহ শেলির শ্যালিকা, কেহ বা বায়রণের বাহিরিণী। ভাল কারিকর জুটিলে এ মঠে, মাইকেল, মিণ্টন, কালিদাস, সেক্সপীয়র আদির উত্তরাধিকারিণীও অনায়াসে অনেক নির্ম্মিতা হইতে পারেন। নব্যবঙ্গের 'ত্রিনীতি' কবি-ত্রয়ের কুটুম্বকুটুম্বিনী এ মঠ স্পর্শমাত্রই হওয়া যায়।

মঠ ত মঠ;—মঠের মধ্যেও মঠ। এক মঠে আছি;—অসংখ্য মঠ উপর্য্যুপরি অঙ্গে ধারণ করিতেছি। শ্রীমতী মাদাম ঠাকুরাণী, অধীনের আপাদ-মস্তক লোমে লোমে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে, হাড়ে-হাড়ে, মজ্জায়-মজ্জায় এক একখানি আনন্দ-মঠ বানাইয়াছেন। মরি! যেন একখানি মৌচাক। মধু-মক্ষিকার মত মধু সংগ্রহ করিতে হয় না; পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া, কেবল মধু পান করার যে পরিশ্রম।

আনন্দ-মঠে আমি পাণ্ডা, পুরোহিত, প্রহরী বা পূজারী নহি;—মঠের আমি সুন্দরীমোহন মোহান্ত। ম্যালেরিয়ার মদনানল অহরহ উপভোগ করিতেছি। তাঁহার মধুর রসে নেহাত মাতোয়ারা আছি। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য নয়,—নির্ভেজাল মধুর। সে মধুর মিষ্টত্বই বা কি? মিছরির পানার অক্ষয় ফোয়ারা। জমাট মিষ্টত্ব। জল কত দিবে? গেলাস গেলাস, ঘটি ঘটি, কলস কলস, পুকুর পুকুর, দিয়াও পার নাই। দিবা মাত্রই মধুর রসে বিলীন! তখনি ...বৎ পিয়াস! শ্রীমতীর এমনি ভালবাসা!

সূর্য্যের উদয়ের মত, সন্ধ্যার সমাগমের মত, ঘড়ির কাঁটার মত, "ফলারে" ব্রাহ্মণের মত, আপিসে কেরাণীর মত, শনিবারে বঙ্গবাসীর মত শ্রীমতী মাদাম অতি নিয়মিত ভাবে প্রতিনিয়ত তাঁহার আনন্দ-মঠে আগমন করেন। একদিনও একটু এদিক্-ওদিক্ হয় না। একটী পল অনুপল, মিনিট সেকেণ্ডেরও সবুর হয় না। শ্রীমতী ইংরেজের মত Punctual, ফরাশীর মত Positive; বিল সরকারের মত অবিশ্রান্ত; ক্ষুধা তৃষ্ণার মত স্বাভাবিক; শ্রীমতী স্বয়ং সময়ের মত সাময়িক এবং দশমিকের মত পৌনঃপুনিক।

আমি বলি, ভদ্রে! কেন এ অভাগ্যের উপর এতটা ভালবাসা, এরূপ উচ্চদরের প্রেম? আমি ত এ প্রেমানুরাগের এই তীব্র ভালবাসা, এত অত্যুগ্র অযাচিত অনুগ্রহের মর্ম্ম কিছুই বুঝি না; ইহার প্রতিদানেও আমি কিছু দিতে সমর্থ নহি। তবে কেন আপনি এতটা পথ হাঁটিয়া, এত ক্লেশ করিয়া এই কাঙ্গালের কুটীরে আসেন? আর এখানে আসিয়া আপনার কেবল কর্ম্মভোগই বৈ ত নয়। সম্ভোগের ত হেথায় কিছুই নাই। দেখুন, এই অকাল-বৃদ্ধ দেহ জরা-জীর্ণ, ভগ্ন, অবসন্ন,—অতি কুৎসিত কঙ্কাল মাত্রে পরিণত হইয়াছে। মেদ, মাংস, শোণিত, রস-কস ইহাতে ত আর কিছুই নাই। চক্ষু কোটরস্থ, বক্ষ বিবরগত, উদর স্ফীত, হস্তপদের পরিধি এক একটী অঙ্গুলীপ্রমাণ হইয়াছে। দেহের ভগ্নাবশেষ আছে কেবল পাণ্ডুবর্ণ চামড়ায় ঢাকা কয়েক খানা হাড়, দেহ-যষ্টি নুইয়া ধনুকবৎ বিবর্ত্তিত। সম্ভবতঃ অতি শীঘ্রই এই ধনুকে টঙ্কার পড়িয়া প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইবে। অতএব হে যশস্বিনি! আপনি কেন এই অন্ধকার-কক্ষে প্রেমাভিসারে প্রতিদিন আগমন করত সায়ংকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করেন? এ প্রেমের প্রতিদান

করিতে আমার কিছুই নাই। কেন আপনার এই অযাচিত অনুগ্রহ। আপনি এ প্রণয় প্রত্যাহার করুন; আমিও প্রত্যাখ্যান করিতেছি।

মাদাম মুখপানে চাহিয়া মৃদু মুচকি হাসিয়া, কর-কমল স্পর্শে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপাইয়া, আদরে, আধ আধ অভিমান ও অহঙ্কারে, কিন্তু অতিশয় অনুরাগ ভরে কহেন,—

"ভাল বাসিবে ব'লে ভাল বাসিনে।"

আমি শুনিয়া অবাক্। মাদাম মোলায়েম কণ্ঠে, মধুর মধ্যমানে সঙ্গীত-প্রবাহ পরিপুষ্ট করিয়া আমার প্রশ্নে প্রণয়িনীর প্রণয়-পীযূষ-মাখা উত্তর দেন,—

"ভাল বাসিবে ব'লে ভাল বাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বৈ জানিনে।"
চর্ম্মে ঢাকা অস্থি-রাশি, "আমি বড় বালবাসি,
তাই দেখিবারে আসি, দেখা দিতে আসিনে॥"

শ্রীমতী যখন আসেন, তখন বস্তুতই বলিতেছি,—বস্তুতই তখন,—

আধ আঁচর খসি, আধ বদনে হাসি,
আধই নয়ন তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি, আধ আঁচর ভরি ইত্যাদি

আধ 'আঁচরের' অমিয়া-মাখা বাতাসেই সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে, হস্তপদ বরফ অপেক্ষাও শীতল হয়; প্রেমালিঙ্গনের পূর্ব্বেই, অঙ্গমাত্র স্পর্শে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চ হয়, শিরা-ধমনি উৎকর্ণ ও উদ্‌গ্রীব হয়, শোণিত-স্রোত মস্তকে উছলিয়া উঠে; বক্ষ উদ্বেলিত, কটি-দেশ কটকটাম্বিত, গ্রীবা অবনত, চক্ষু মুদ্রিত, দেহ-যষ্টি কুঞ্চিত এবং মহাপ্রাণী প্রকম্পিত হইয়া অসীম আকাঙ্ক্ষা-অনুরাগে শয়নার্থে শয্যা, পানার্থে সলিল এবং আবরণার্থে কন্থা, লেপ, কম্বল অন্বেষণ করে। শ্রীমতী শরীরে ভর করেন।

আসিয়া শিয়রে ধীরে ধীরে ধীরে
বুলাইল পদ্ম-হস্ত মুখে, চক্ষে, নাসিকায়, শিরে

পরশের বশে
প্রাণ-বন্ধ খসে
জীবনের রাজ্যে মরণ আসে ফিরে [illegible]ত-
শ্রীমতী তাঁহার জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ[illegible]র প্রেমাঞ্জন পরাইয়া দেন;—

সে যে ভাবাঞ্জন
নিখিল রঞ্জন
চমৎকার গুণ তার নাহি যায় বলা।

জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া যায়। প্রেমাঞ্জনে প্রস্ফুট হইয়া জড়জগৎ ভুলিয়া যায়। অমরাবতীর সুধা-সরোবর ছেঁচিয়া আনিবার জন্য একটানে উচ্চ হইতে উচ্চতর আকাশে উঠে। শ্রীমতী সেই প্রেমাঞ্জন প্রণয়-পাত্রের অঙ্গে অঙ্গে লেপিয়া দিয়া, তাহার নবদ্বার নিরোধ করত প্রগাঢ় আলিঙ্গন করেন। আধ্যাত্মিক আলিঙ্গন!—তাহার তীব্র তড়িৎ, অপার্থিব ইলেক্‌ট্রিসিটি, তাহার স্বর্গীয় সর্দ্দি, নারকীয় অগ্নি, তাহার অনির্ব্বচনীয় উত্তাপ মধুর, মর্ম্মান্তিক, সূক্ষ্ম, সাঙ্ঘাতিক। এই অনুপম আলিঙ্গনে,—

মরণে ছায়া, বিকাশিয়া কায়া
জীবনে ধরিতে চায়, হাত বাড়াইয়া।
আবেশে ভুর ভুর
নেশায় চুর
মধুর মদ্যে প্রাণ মাতোয়ারা।
বলে "হ্যাদে ও মরণ!
প্রিয় জন
তুমিই ত এখন, ঠিক আমার মনের মতন,
এস, দুই গালে দুটি করিয়া চুম্বন
করি দৃঢ় আলিঙ্গন,
ভাল লাগেনাকো আর
মর্ত্ত্যপুর।
দিয়াছি তু খাপ,
কিবা পরিতাপ,
দেখি পরিমাপ
পাতাল কত দূর।

...তী সূক্ষ্ম শরীরেই প্রায় সমাগতা হন। ...মি তাঁহার স্থূল শরীরও কিছু কিছু ...ছে। তদীয় সহবাস-জনিত যোগবলেই ... সাময়িক দর্শন ঘটিয়াছে। শ্রীমতীর ...দীর্ঘ, অতি দীর্ঘ, দীর্ঘ হইতেও দীর্ঘ। উচ্চাকাশের পর উচ্চতর, উচ্চতম আকাশ ভেদিয়া, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম ইথর আলোড়ন করিয়া সেই দিব্যদেহ দোদুল্যমান। দেবী অর্দ্ধ-চন্দ্রাক্ষী, নবনেত্রা, অযুতহস্তা, দ্বিপদা, জরাসুর বাহনা, টেলিগ্রাফ-গমনা, সর্ব্বালঙ্কার-শোভনা, অসিতবর্ণা লোলজিহ্বা, সুন্দরী, ভয়ঙ্করী। নয়গোটা নাসা ও নয়গোটা নয়ন হইতে অষ্টাদশ প্রকারের অগ্নি অনবরত উদ্গীর্ণ হইতেছে। একই বদন বিবিধ আকারে ব্যাদন হইতেছে। অযুত হস্তের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থিত হস্তাবলী, আয়ুর্ব্বেদ, চরকসংহিতা, নিদান, বাগ্‌ভট-আদি শাস্ত্রে ও সাহিত্যে যত রকম রোগের লক্ষণ নির্ণীত, তাহা এবং তদতিরিক্ত অনেক প্রকারের ব্যাধি ধারণ করিয়া আছে। বামপার্শ্বস্থিত ভুজনিচয়ের কোনটীতে অ্যালোপ্যাথী, কোনটীতে হোমিওপ্যাথী, ইলেক্‌ট্রোপ্যাথী, হাইড্রোপ্যাথী, হেকেমি, হাতুড়িয়ামি, পেটেণ্টী, আবধৌতিক, আধিভৌতিক-আদি বিবিধ প্রকারের চিকিৎসা-প্রণালী। কোন হস্তে হাসপাতাল ডিস্পেন্সারী, কোন হস্তে ফারমেসী, কোনও হস্তে ভৈষজ্য-ভাণ্ডার, কোন হস্তে হেকেমি দাওয়াইখানা ;—বোতল-শিশি, পিল-পাউডার, পাঁচন-অবলেহ দেবীর এক এক হস্তে অবস্থিত। মাদামের কোন হস্তে বিজ্ঞান, কোন হস্তে বিশ্লেষণ-যন্ত্র, কোন করে লেবরিটারী, কোন করে রাসায়নিক রস-পাত্র। তাঁহার কোন হস্তে পুষ্করিণীর পঙ্ক উদ্ধারের অস্ত্র, কোন হস্তে ওয়াটার পাইপ পুঁতিবার খনিত্র এবং স্যানিটারি ড্রেণ কাটিবার কোদালি।

শ্রীমতীর এই বিরাটমূর্ত্তি। এই বিরাট বিশ্বোদর ও বিপুল কলেবর কিন্তু তিনি একটী অতি ক্ষুদ্র গ্লোবিউলাস্থুর অভ্যন্তরেও আচ্ছন্ন ও আত্মস্থ করিয়া রাখিতে পারেন। মাদাম মায়াবিনী।

মাদাম বলেন,—"আমি ম্যালেরিয়া, আমায় লোকে মন্দ বলে; বলে,—আমি বিশ্বসংসার, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ মরুভূমি করিতেছি। কিন্তু আমা হইতে যে বিশ্বসংসারের ও বঙ্গভূমির কত উন্নতি হইতেছে, তাহা কেহ দেখে না। দেখ, কত কত জ্ঞান-বিজ্ঞান, উদ্ভাবন-আবিষ্কার আমা হইতে সংসাধন হইতেছে। দেশ-দেশান্তর হইতে, আমার বীজ ধরিয়া তাহা বিশ্লেষ করিবার জন্য, বড় বড় বৈজ্ঞানিক বঙ্গদেশে আসিয়া অতিবুদ্ধির পরিচয় দিতেছে; আমি তাহাদের বুদ্ধি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর পথে পরিচালনা করিতেছি। আমি না থাকিলে, আমি আবির্ভূতা না হইলে এই বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও তাহাদের বিসূচিকা-সূক্ষ্ম বুদ্ধি কোথায় থাকিত, কেমনে জন্মিত? মেডিকেল সায়ান্সের এত শ্রীবৃদ্ধিই বা কেমন করিয়া হইত। পক্ষান্তরে দেখ, আমি কত বড় বড় উচ্চচূড় শিল্পালঙ্কার-শোভিত সৌধমালা নির্ম্মাণ করিয়াছি। তাহার মধ্যে নানা রঙের, নানা ঢঙের, কত কত কিছমের আরোক-আসবাব, শিশি-বোতল, কেস্-কৌটা সাজাইয়াছি। এ সব আমার ডিস্পেন্সারী,—দয়া দাক্ষিণ্যের বিপুল বহির্বিকাশ! দেশ মধ্যে এমন একটী গ্রাম, এমন একটী পল্লী দেখাইয়া দাও, যেখানে আমি ডিস্পেন্সারী বসাই নাই! আমি মর্ত্ত্যলোক মরুভূমি করিতেছি বটে; আমার প্রসাদাৎ প্রতিনিয়ত দেখ দেখি কত কত রকমের বড় বড় গাড়ী, জুড়ী, ঘড়ী, ভুঁড়ী পালিত, বর্দ্ধিত ও উৎপন্ন হইতেছে! ইহা কি সংসারের উন্নতি নয়, শ্রীবৃদ্ধি নয়? আমার বিহনে পেটেণ্টী ও

প্যাথি-ওয়ালারা কোন্ পথে যাইত বল দেখি? আহা! উহারা আমার পোষ্য, আমার সহযাত্রী, আমার সুখের পায়রা। আমি পোষ্যপ্রতি-পালয়িত্রী, স্বজন-শুভ-সাধিকা। অথচ সর্ব্বভূতে আমার সমদর্শন। আমার চুলচেরা বিচার। তোমরা সবিশেষ বিবেচনা করিয়া বল দেখি, আমি এই বঙ্গদেশ মরুভূমি করিয়াছি অথবা চাঁদের হাট করিয়া তুলিতেছি? জঙ্গলের মধ্যেও যে আজ জলের কল, উহা কে বানাইল? কান মলিতেছ আর জল ঢালিতেছ, এ কাহার কৃপায়? আমি আছি বলিয়াই ত আজ অজ্-পাড়াগাঁয়ে পাকা-নর্দ্দমার বন্দোবস্ত,—গো-ভাগাড়ে গোলাপ ফুলের চারা কেয়ারি! বক্ষে হস্ত দিয়া বল দেখি, এ সব কি মৎকৃত—ম্যালেরিয়া-অনুষ্ঠিত অমর-কীর্ত্তি নয়? আমি বঙ্গদেশ মরুভূমিই করিতেছি বটে? বাঙ্গালী যদি কখনও মানুষ হয়, ম্যালেরিয়ার হাতেই হইবে। আমিই তাহাদিগকে মনুষ্যত্বে উত্তোলন করিব। বঙ্গদেশ আমার প্রিয়ভূমি, আমার আহ্লাদের আনন্দমঠ বটে; কিন্তু আমি সর্ব্বত্র সর্ব্বঘটেই আছি। আমি ইয়ুরোপে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, আমেরিকায় রাঙাজ্বর, আফ্রিকায় নীলাজ্বর, আসামে কালাজ্বর, ব্রহ্মে বিষমজ্বর। আমি কোথায় নই? আমার হাতে মানুষ মরে বটে, কিন্তু শীঘ্র মরে না। সকল ভোগ উপভোগ করিয়াই মরে। তা দেখ, জন্মিলে মরণ আছেই আছে। দিন-দুনিয়ায় আসিয়া অমর কে বল? মৃত্যু যখন হইবেই হইবে, তখন আমার মারফতে মৃত্যুতে ইষ্ট বৈ, অনিষ্ট নাই;—সুখ-সোয়াস্তি, আরাম-উপকার ও উন্নতি প্রচুর পরিমাণেই আছে।"

"আছে কি না আছে, তুমিই বল।" সুন্দরী বক্তৃতা শেষ করিয়া সোহাগভরে আমার চিবুক দুটী চুম্বন করিয়া উপরোক্ত প্রশ্ন করিলেন।

আমি বলিলাম,—শ্রীমতি! তুমি "ফিলজফার। তোমার এ ফিলজফির সহিত আ[illegible] করা এ শরীরে অসাধ্য। তুমি যাহা ব[illegible] ঠিক।"

অযুতহস্তা আমার আরও অধিকতর [illegible]ইয়া ধরিয়া বলেন,—"তাহাই যদি ঠিক [illegible]র তুমি আমায় পর ভাব কেন, পর বল কেন[illegible]"

আমি আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া, হাই তুলিয়া বলি,—"তুমি আমার পর না হইতে পার, আমি ত তোমার পর বটে।"

শ্রীমতী শ্রীমুখের শত শতটা সুতীক্ষ্ণ চুম্বনে আমার সর্ব্বাঙ্গ চুম্বিত করিয়া কহেন,—"ছি ছি! অমন কথা বো'লো না, তুমি আমার পর? তুমি আমার পরমাত্মীয়, প্রিয়পাত্র। তুমি আমার অতীব আরামের বস্তু।" শ্রীমতী আদর করিয়া কহেন,—"তুমি আমার বিশ্রামের তাকিয়া আফিনের গুড়ুক, স্ফূর্ত্তির ফুল-কফি, ফুল-কফির ভেট্‌কি।

আমি বলি,—"সুন্দরি! তুমি আমায় তাকিয়া বল, গুড়ুক বল, ফুলকফি হইতেও আমার আপত্তি নাই; কিন্তু আমায় ভেট্‌কি মাছ করো না। দোহাই তোমার। আমি জলে যাইতে পারিব না, বড় শীত। একেই জ্বরের কাঁপুনিতে কাঁপিতেছি। ইহার উপর এখন জলে গিয়া মাছ হইয়া জালে পড়া আমার অসাধ্য। তার পর মিউনিসিপাল-মেছুনীর হস্তে মার্কেটে উঠাও মহা-কেলেঙ্কারী। অতএব মৎস্য হওয়া সম্বন্ধে আমায় মাপ কর।"

প্রেমিকা আরও আদরে কহেন,—"আচ্ছা, তবে তুমি আমার বড়দিনের প্রণয় পুডিং, ক্রিসমাস্ কেক্, পাঁউরুটীর মাখন, পৌষ-পার্ব্বণের পিষ্টক; তুমি আমার শীতের বেগুন পোড়া।"

আমি বলি, "অ, মন্দ নয়। কিন্তু সব ক[illegible] খাদ্যদ্রব্য। একেবারেই যদি উদরস্থ কর, [illegible] আর আদর করিবে কা'কে?"

রসভঙ্গ হইতে দিবার পাত্রী নহেন। ... আরও প্রশস্ত করিয়া কহেন,—"তবে ...ার ব্যবসার বিজ্ঞাপন, বাণিজ্যের ...য়ের গহনা, স্বাবর স্ত্রী-ধন; তুমি ... সংবাদ-পত্রের সবস্‌ক্রিপ্সন। তুমি ... সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, আমার প্রবন্ধের ...গাঢ়তা; তুমি আমার সাহিত্যের সুরুচি।"

তা, শ্রীমতীর সহিত আমার এমনি সুমিষ্ট, ...চিরস্থায়ী প্রিয়সম্বন্ধই দাঁড়াইয়াছে বটে। ...ইন্দু-পরিণয়ের মত তাহা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, ...কাট্য;—ঐহলৌকিক ও পারলৌকিক সম্বন্ধ। ...প্রিয় ঠাকুরাণী পরলোকের পথ প্রতি মুহূর্ত্তেই ...প্রশস্ত করিতেছেন। তবে এক আধদিনের জন্য ...য তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ-বিরহ না হয়, ...এমন নয়। তাঁহার পোষ্যদিগের পোষণার্থেই ...এ বিরহ ঘটে। কিন্তু বিরহ কিছু কিছু না ...হইলেও পীরিতের জলুস, পীরিতের পবিত্রতা ...ফুটে না।

প্রেম বিচ্ছেদে কি যায়?

বিরহ না হ'লে স্নেহে নহে সুখোদয়।
...মিলনে থাকিলে পরে, ভাবে নাকো কেহ কারে;
পড়িলে বিচ্ছেদ-নীরে অঙ্কুর বাড়ায়।

কেবল "অঙ্কুর বাড়ায়" না; প্রেমখানিকে ...একটা মহাবৃক্ষে পরিণত করে। সে কেমন, ...অনেকেই জানেন, আমিও সবিশেষ জানি। ...কারণ দুই চারি দিন বিচ্ছেদের পর বিধুমুখী ...এসে এমন চাপন চাপেন যে, বড় চালাকি নয়। ...সে "চঞ্চলা চপলা জিনি, যেন কাল-ভুজ-...ঙ্গিনী"রও বাড়া। একদিন এইরূপ পুনর্মিলনের ...প্রেমাভিনয় কালে আমি শ্রীমতীকে সম্বোধন ...করিয়া বলিলাম যে, "শ্রীমতি! তুমি অতঃপর ...আমার ছাড়। আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব বেচিয়া ...যা কিছু হয়, এক কিস্তিতেই তোমার পোষ্য-...দের পায়ের উপর রাখিয়া দিতেছি। তুমি ...আমায় হয় পরিত্যাগ কর; নতুবা এই পাপ-পৃথিবী হইতে পরিত্রাণ করিয়া একেবারেই তাহার পরপারে লইয়া চল।"

শ্রীমতী বলিলেন,—"কেন তুমি এক কিস্তিতে সব দিবে? আমার কাছে চুলচেরা বিচার। তুমি ক্রমে ক্রমে কিস্তি কিস্তিতেই, যাহা তোমার দেয়, দিবে। তবে তুমি পারে যাইতে চাহিতেছ, তাহা সময়ে ফেয়ার নৌকা ঘাটে আসিলেই ঘটিবে। কিন্তু তুমি আমার সবিশেষ প্রিয়পাত্র, বার বার তোমার কথা কাটা ভাল দেখায় না,—ভালবাসার সেটা লক্ষণই নয়;—তা চল, আমি নিজেই তোমায় কতকদূর লইয়া যাইতেছি। মাঝগাঙেও যদি নৌকা পাই, তোমায় তাহাতে তুলিয়া দিয়া আসিব। নহিলে এ যাত্রা যাওয়া হইবে না। তবে এই শীতের, এই আগামী উত্তরায়ণের মধ্যেই যে তোমায় দক্ষিণপুরে লইয়া যাইব, তাহাতে বড় কিছু বেশী সংশয় নাই।"

এই বলিয়া শ্রীমতী সমঠ আমায় লইয়া উর্দ্ধে ছুটিলেন। ছুট ত ছুট। এক লম্ফে লঙ্কা পার। চন্দ্রলোক সূর্য্যলোক ছাড়াইয়া, জনলোক, তপোলোক তেরিক দিয়া, মাদাম ম্যালেরিয়া ঠাকুরাণী ঠিক সেই খানটায় যাইয়া দম ধরিলেন, যেখানটা জিওগ্রাফীতে "যমের জাঙ্গাল" বলিয়া বিখ্যাত। এই জাঙ্গাল যমপুর ও নরপুরকে পৃথক্ করিয়া দিতেছে। বৈতরণী ইহার বামপদ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত। ইহার দক্ষিণাংশে যমলোক। এই জাঙ্গাল যমলোক ও নরলোক উভয়েরই সীমান্ত প্রদেশ। যেমন আফগান-রুষের পামির-পাঁজদে। মাদাম আমায় লইয়া এইখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। আমার ইচ্ছা আরও উঠি। কিন্তু মাদাম মানা করিলেন। বলিলেন,—"অসময়ে যাওয়া হইবে না। অদ্য রাত্রে তোমায় এইখানেই থাকিতে হইবে। কাজেই আমি না-যমালয়ে, না-নরালয়ে, "ন যযৌ ন তস্থৌ" হইয়া ট্র্যানজিটে রহিলাম। এ এক Transendental transit.—স্বর্গীয় সূক্ষ্ম

সন্ধিস্থল। এ স্থলের অভূতপূর্ব্ব বিবরণ বিবৃত করিতে পারিতাম, কিন্তু শ্রীমতী আসিয়াছেন, এখন আর আমি অন্য বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারি না। অতএব এই স্থানেই বিদায়। যদি উত্তরায়ণের এ দিকে দক্ষিণ অঞ্চলে না যাই, পুনরায় সাক্ষাৎসম্ভাবনা হইলেও হইতে পারে।

ম্যালেরিয়া-মঠের

কস্যচিদ্ মোহন্তস্য।

ওথেলো।

(১)

ভেনিস্ নগরের বিচার-সভার সভ্য অতুল-ঐশ্বর্য্যশালী ব্রাবান্‌সিও নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দেস্‌দিমনা নাম্নী পরম রূপবতী ও গুণবতী এক কন্যারত্ন ছিল। একাধারে রূপ, গুণ ও অর্থের আধিক্য দেখিয়া বহু বহু রূপবান্ যুবক, ঐ অনুপমা কুমারীর পাণিগ্রহণে অভিলাষী হন। কিন্তু সর্ব্বজনবাঞ্ছিতা দেস্‌দিমনা সুন্দরী, স্বজাতীয় সম্ভ্রান্ত যুবকবৃন্দের রূপ মোহে অভিভূতা হন নাই। কারণ তিনি, মানুষের বাহ্য শোভা অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ গুণরাজিকে অধিক মূল্যবান্ বোধ করিতেন। এ গুণের প্রশংসা করাটা যত সহজ, অনুকরণ করাটা তত সহজ নয়। দেস্‌দিমনা অশেষগুণে গুণবতী,—তাই বাহ্য সৌন্দর্য্য-শোভার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, আন্তরিক প্রণয়ানুরোধে, এক কৃষ্ণকায় কাফ্‌রিকে পতিত্বে মনোনীত করিলেন। দেস্‌দিমনার পিতা ঐ কাফ্‌রিকে স্নেহ-চক্ষে দেখিতেন, কাফ্‌রিও প্রতিনিয়ত তাঁহার বাটীতে আসিতেন।

কুরূপ কদাকার কাফ্‌রি হইলেও, দেস্‌দিমনা অপাত্রে প্রণয় স্থাপন করেন নাই। কাফ্‌রি ওথেলোর এমন কোন সদ্‌গুণের অভাব ছিল না, যাহাতে তিনি উন্নত-হৃদয়া দে[illegible] প্রণয়-পাত্র হইতে না পারেন। ওথেলো [illegible] সাহসী সৈনিক-পুরুষ ছিলেন। প্রধান [illegible] পতি-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া, তুরকী-সমরে [illegible] বার তিনি অসম-সাহসিকতা ও প্রভূত বী[illegible] পরিচয় দিয়াছেন। রাজ-পদস্থ যাবতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে মহা সম্মান ও একান্ত বিশ্বাস করিতেন।

---

(২)

মহাবীর ওথেলো কেবলই যে, একজন সমর-কুশল বীর-পুরুষ ছিলেন এমন নহে,—দেশ-পর্য্যটনেও তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। সে কৃতিত্বের পরিচয়,—তন্ন তন্ন করিয়া, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল বিষয়ে দৃষ্টি,—তাহা হইতে প্রভূত অভিজ্ঞতা লাভ;—এবং সর্ব্বোপরি সেই পর্য্যটন-কাহিনী অতি সরল ও বিশদভাবে এবং প্রীতিপ্রদ প্রণালীতে অপরের নিকট বর্ণন। বস্তুতঃ, গুছাইয়া গল্প বলিতে পারে অতি অল্প লোক। গল্প বলিয়া শ্রোতাকে মোহিত করা, একটা কম গুণ নয়। ওথেলোর এই গুণটী যথেষ্ট ছিল। শুধু ভ্রমণবৃত্তান্ত কেন, আত্মজীবন বৃত্তান্তও তিনি সুন্দররূপ বলিতে পারিতেন। বুঝি, কেবল এই গুণেই একদিন তিনি ত্রৈলোক্য-সুন্দরী, অশেষগুণে-গুণবতী, সর্ব্বজন-বাঞ্ছিতা দেস্‌দিমনাকে পত্নীরূপে লাভ করিতে সমর্থ হন।

কুমারী দেস্‌দিমনা, স্ত্রীজাতি-স্বভাব-সুলভ, গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। অহর্নিশ ওথেলোর কাছে বসিয়া, একাগ্রমনে গল্প শুনিতেন। গল্প শুনিবার পিপাসা তাঁহার মিটিত না। ওথেলো-ও অতি বিশদভাবে তাঁহার আশৈশব মনোহর জীবন-বৃত্তান্ত ও পর্য্যটন কাহিনী বর্ণন করিতেন।—কিরূপে তিনি [illegible] করিয়াছিলেন, কিরূপে যুদ্ধ জয় করেন, কিরূপে মহা বিপদে পতিত হন, জল-পথে এবং স্থল-

বা তাঁহাকে বিপর্য্যস্ত হইতে হইয়া-[illegible] একে একে সকল কথা বলিতেন।—কখন বা [illegible]ানের মুখে পড়িয়াছেন,—প্রাণ যায়-যায় হইয়াছে ; কখন বা শত্রু কর্ত্তৃক বন্দী হইয়াছেন, দাসরূপে আত্ম-বিক্রয় করিয়াছেন ; এবং পরিশেষে কি উপায়ে নিষ্কৃতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন,—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিয়া যাইতেন। ইহা ব্যতীত দেশ-বিদেশের অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ঘটনা এবং বিচিত্র দৃশ্যাবলীও বর্ণন করিতেন।—ভীম-পরাক্রম ভীষণ সিংহ-ব্যাঘ্রাদি-বেষ্টিত মহারণ্য, সৌন্দর্য্যময় গগনস্পর্শী পর্ব্বত, অতল জলধি, পর্ব্বতীয় অসভ্য জাতি, মনুষ্য-ভক্ষক নর-রাক্ষস, আফ্রিকার অপরূপ মনুষ্য, ইত্যাদি বিবিধ রহস্যপূর্ণ উপাখ্যানের অবতারণায়, ওথেলো, দেস্‌দিমনাকে মোহিত করিতেন। দেস্‌দিমনা এরূপ তন্ময়ী অবস্থায় এই সকল গল্প শুনিতেন যে, আহার নিদ্রা বা গৃহস্থালী কাজ-কর্ম্মের কথা ভুলিয়া যাইতেন। গৃহস্থালীর কোন বিষয়ের জন্য যদি কখন কেহ তাঁহাকে ডাকিত, তিনি অতি সত্বর সে কাজ সমাধা করিয়া আসিতেন এবং সমধিক উৎসুকতার সহিত 'তারপর' বলিয়া আবার গল্প শুনিতে বসিতেন।

---

(৩)

এইরূপ এক এক করিয়া, খুঁটিয়া খুঁটিয়া, অনেক দিন ধরিয়া, ওথেলো দেস্‌দিমনাকে আত্মজীবন-বৃত্তান্ত শুনাইলেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে প্রণয়-সঞ্চার হইল। উভয়েই উভয়ের নিকট আত্ম-বিক্রয় করিলেন। একদিন দেস্‌দিমনা কহিলেন, "প্রিয়তম! তোমার এই মনোহর সুদীর্ঘ জীবন-বৃত্তান্ত তুমি অংশে-অংশে আমাকে বলিয়া আসিয়াছ ;—আমার একান্ত ইচ্ছা, একদিন তুমি উপন্যাসের-মত আনুপূর্ব্বিক আমাকে শোনাও। তোমার এই বিবিধ ঘটনাময় জীবন-বৈচিত্র্য অতি শিক্ষাপ্রদ। প্রার্থনা করি, একদিন আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ কর।"

ওথেলো, প্রণয়িনীর মনোরথ পূর্ণ করিলেন। কিন্তু যখন তিনি যৌবনের বিষাদময় কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন, সে সময় দেস্‌দিমনা চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারিলেন না।

ওথেলোর আত্মকাহিনী বর্ণন শেষ হইলেও, দেস্‌দিমনা বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। পরে সবিষাদে কহিলেন, "প্রিয়তম! তোমার এ জীবন-কাহিনীর অধিকাংশ বিস্ময় ও করুণরসে পূর্ণ। এ দুঃখময় কাহিনী না শোনাই ভাল ছিল। যাই হউক, ভগবান্ যদি আমাকে রমণী না করিয়া তোমার-মত বীর-পুরুষ করিতেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে পরম সৌভাগ্যবতী বোধ করিতাম। ধন্য তুমি! তোমার বাক্-চাতুরীও ধন্য! হে প্রিয়তম! যদি তোমার কোন বন্ধু আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হন, তিনি যেন তোমার মত সুরসিক বাক্‌পটু হন। তাহা হইলে অনায়াসে আমি তাঁহার প্রেম-পাশে বদ্ধ হইব।"

প্রেমময়ী দেস্‌দিমনার এরূপ সরল প্রেমের আভাস পাইয়া, ওথেলো একেবারে আকাশের-চাঁদ হাতে পাইলেন। তখন পরম-পুলকিত-হৃদয়ে, মুক্ত-অন্তরে কহিলেন,—"প্রাণাধিকে! আজ আমি কৃতার্থ হইলাম। তোমার আশ্বাস-বাক্যে আজ আমার প্রাণ শীতল হইল। এখন বল প্রাণেশ্বরি! তুমি আমার হইবে?"

দেস্‌দিমনা আর আত্মগোপন করিতে পারিলেন না,—ওথেলোকে পতিত্বে বরণ করিতে সম্মত হইলেন।

---

(৪)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শারীরিক সৌন্দর্য্যে ওথেলো কাঙ্গাল ছিলেন। তারপর, দেস্‌দিমনার পিতার তুলনায় বিষয়-বৈভবও তাঁহার অতি অল্পই ছিল। এ অবস্থায়, ধন-কুবের ব্রাবান্‌সিও একমাত্র কন্যারত্নকে ওথেলোর হস্তে সমর্পণ করিতে কিছুতেই সম্মত হইবেন না। তিনি কন্যাকে স্বাধীন অবস্থায় রাখিয়াছিলেন, বটে, কিন্তু তাঁহার আশা ছিল, দেস্‌দিমনা যথাসময়ে, জাতীয় ধর্ম্ম অনুসারে, তাঁহারই যোগ্য রূপবান্‌, গুণবান্‌ ও সমৃদ্ধিশালী যুবাকে নায়করূপে মনোনীত করিবেন। কিন্তু বৃদ্ধের সে বড় আশায় ছাই পড়িল। কৃষ্ণকায় কুরূপ হইলেও, ওথেলোর আভ্যন্তরীণ গুণে মুগ্ধা হইয়া, দেস্‌দিমনা তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ভেনিস্‌ নগরের যাবতীয় বিবাহার্থী রূপ-গুণ-সম্ভ্রম-সমন্বিত যুবাকে ওথেলোর তুলনায়, তিনি কুরূপ, কদাকার ও হীন বোধ করিলেন।

যথাসময়ে, সঙ্গোপনে, উভয়ের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। বিবাহ গোপনে হইল বটে, কিন্তু কথাটা অধিক দিন অপ্রকাশ রহিল না। ব্রাবান্‌সিওর কাণে এ কথা উঠিল। তখন তিনি কোপ-প্রজ্বলিত হইয়া, উপায়ান্তর না দেখিয়া, প্রতিহিংসাবশে, ওথেলোর নামে মহাসভায় অভিযোগ করিলেন। অভিযোগের মর্ম্ম এই,—ওথেলো তাঁহার বিনা অনুমতিতে, কৃতঘ্নের ন্যায়, তাঁহার কন্যা দেস্‌দিমনাকে যাদুকরি-মন্ত্রে মুগ্ধ করিয়া বিবাহ করিয়াছে!

---

(৫)

দৈবক্রমে এই সময়ে ভেনিস্‌-রাজকীয়-কার্য্যে, মহাবীর ওথেলোর সাহায্য বিশেষ আবশ্যক হইল। সংবাদ আসিল, দুর্দ্ধর্ষ তুরকী-সেনা বিপুল বল-বিক্রমে, ভেনিস-অধিকারভুক্ত সাইপ্রস দ্বীপ আক্রমণ করিতে আসিতেছে। উপস্থিত বিপদে অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত ভেনিস্‌-রাজসভা একমাত্র ওথেলোর [illegible] চাহিতেছিলেন। কারণ—সুদক্ষ, রণকুশল, সাহসী, মহাবীর ওথেলো ব্যতিরেকে বিপদে পরিত্রাণ পাইবার আর উপায় নাই।

ওথেলো যথাসময়ে বিচার-সভায় আনীত হইলেন। তাঁহার উপর এককালীন দুইটী গুরুতর দায় পড়িল;—একদিকে ব্রাবান্‌সিওর অভিযোগ, অন্যদিকে রাজকীয় যুদ্ধ-ব্যাপারে লিপ্ত হওয়া।

ব্রাবান্‌সিও সমৃদ্ধিশালী, মহা সম্ভ্রান্ত ও বিচারসভার অন্যতম সভ্য। বিচারসভা বিশেষ বিচক্ষণতা ও ধীরতার সহিত বৃদ্ধ ব্রাবান্‌সিওর আবেদন শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ এরূপ অধৈর্য্য ও অযুক্তির সহিত আপন মতের পোষকতা করিতে লাগিলেন যে, ওথেলো অতি সহজেই আপন দোষ নিরাকরণ করিতে সমর্থ হইলেন। ওথেলো বলিলেন, "আমি কেবল মাত্র সরল গল্প বলিয়া দেস্‌দিমনাকে পত্নীভাবে লাভ করিতে পারিয়াছি। কেবল আমার জীবন-কাহিনী শুনিয়া, দেস্‌দিমনা আপন ইচ্ছায় আমার প্রেম-পাশে বদ্ধ হইয়াছেন।"

ওথেলো বিনয়-নম্র-বচনে, এমন সরলভাবে আদ্যোপান্ত বিবরণ বলিলেন যে, প্রধান বিচারপতি ও সভ্যগণের সহজেই তাহা বিশ্বাস হইল। বিশ্বাস হইল যে, ওথেলো সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ;—দেস্‌দিমনা উপন্যাস শ্রবণে মোহিতা হইয়াই তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। সকলেই বুঝিলেন,—ওথেলো গুণবান্‌, দেস্‌দিমনাও অতি গুণবতী; নায়কের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্য দেখিলে নায়িকা সহজেই মুগ্ধ হয়; এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে;—কুহক বা ইন্দ্রজাল,—এ কথার-কথা।

দেস্‌দিমনাও বিচার-সভায় উপনীত ছিলেন। তিনিও মুক্তকণ্ঠে স্বামীর কথার পোষকতা করি-

বিচার-সভা।



লেন। কহিলেন, "পিতার ঋণ অপরিশোধনীয়। জন্মদান, শিক্ষা ও আজন্ম প্রতিপালনে, সন্তান চিরদিন তাঁহার নিকট বাধ্য। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও আমার মহৎ কর্ত্তব্য-কর্ম্ম আছে। স্বামীর অনুগতা থাকাই সতী-স্ত্রীর ধর্ম্ম। আমি এখন সেই ধর্ম্ম পালন করিব। আমার জননীও একদিন এইরূপ সতী-ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন।"

বৃদ্ধ ব্রাবানৃসিও দেখিলেন, আর কথা-কাটাকাটি করা বৃথা। মিথ্যা ওজর-আপত্তিতে আর কোন ফল নাই। তখন নিরুপায় হইয়া অগত্যা অতি ক্ষুণ্নমনে, ব্যথিত-হৃদয়ে, কন্যার আশা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু সর্ব্বজন সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "কি বলিব, আইনে এমন কোন ধারা নাই যে, কন্যাকে নিজ ক্ষমতাধীনে রাখি। যদি তাহা থাকিত, তাহা হইলে আমি কখনই এরূপ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতাম না। যাই হোক, আমার পরম সৌভাগ্যের কথা যে, আমার আর পুত্র-কন্যা নাই। যদি থাকিত, তাহা হইলে এই অভাগিনী কন্যার আচরণ দেখিয়া, ঠেকিয়া-শিখিয়া, না জানি, তাহাদের উপর পিশাচবৎ কতই নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতাম। আর ওথেলো, তুমিও জানিয়া রাখিও, দেস্‌দিমনা আমাকে ঠকাইয়াছে, তোমাকেও ঠকাইতে পারে!"

---

(৬)

ওথেলো এই সমূহ বিপদে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া, তুরকী যুদ্ধে, অধিনায়করূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই যাত্রার সকল আয়োজন হইল। পতিপ্রাণা দেস্‌দিমনা রমণী-স্বভাব-সুলভ নব-বিবাহিত স্বামীকে লইয়া, এ ক্ষেত্রে আমোদ-উল্লাসে মত্ত হইলেন না, বা যুদ্ধের নামে ভয় পাইয়া কোনরূপ আব্‌দার বা 'বায়না' করিলেন না,—সন্তুষ্টচিত্তে স্বামীর-মতে মত দিলেন;—অধিকন্তু নিজেও স্বামি-সমভিব্যাহারিণী হইতে ইচ্ছা করিলেন।

তাহাই স্থির হইল। অনতিবিলম্বে সৈন্য-সামন্ত লইয়া, ওথেলো সস্ত্রীক সাইপ্রস দ্বীপে যাত্রা করিলেন। গন্তব্যস্থানে পঁহুছিয়াই শুনিলেন যে, প্রবল ঝড়-বৃষ্টি-ঝঞ্ঝাবাতে, বিপক্ষ-পক্ষ তুরকী-সৈন্য, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সহসা তাহাদের আক্রমণের কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু হায়, নিষ্ঠুর ভবিতব্য!—

ওথেলো বহিঃশত্রু তুরকীর আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইলেন বটে, কিন্তু হৃদয়ে একটা ঘোরতর সংগ্রামের সূত্রপাত হইল। বহিঃশত্রুর পার আছে, কিন্তু ভিতর-শত্রুর তীব্র-দংশন অসহনীয়। ওথেলো এখন সেই ভিতর-শত্রুর করতলগত হইতে চলিলেন। তিনি অকারণে, মিথ্যা-সন্দেহে, আপন মনে অশান্তি আনিলেন; সঙ্গে সঙ্গে পতিপ্রাণা, নিষ্কলঙ্ক-হৃদয়া দেস্‌দিমনারও সর্ব্বনাশ করিতে বসিলেন। কে, কি ভাবে বিষ ঢালিল, পাঠক ক্রমেই তাহা দেখিতে পাইবেন।

(৭)

সেনাপতি ওথেলোর যতগুলি সৈনিক-বন্ধু ছিলেন, ফ্লোরেন্স-দেশীয় মাইকেল ক্যাসিও তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসী ও প্রীতি-পাত্র। এই সৈনিক-যুবক অতি সচ্চরিত্র, রূপ-বান্, মিষ্টভাষী ও সুরসিক। রমণীগণের মন হরণ করিবার শক্তি তাঁহার যথেষ্ট ছিল। সুতরাং সেনানীগণের মধ্যে কাহারও পত্নীর চরিত্রের প্রতি সন্দেহ হইলে, অগ্রে ক্যাসিওর উপর অবিশ্বাস হইবারই কথা। কিন্তু উদার-স্বভাব মহামতি ওথেলো কাহারও প্রতি সন্দেহ করিতেন না। নীচকর্ম্মে তাঁহার যেমন বিতৃষ্ণা, অন্যব্যক্তিরও সেইরূপ, বিবেচনা করিতেন।

প্রীতিভাজন ক্যাসিওকে তিনি, দেস্‌দিমনার সহিত প্রণয়-ব্যাপারে মধ্যস্থ স্বরূপ রাখিলেন। অর্থাৎ ঐ যুবকই দম্পতিযুগলের দাম্পত্য-প্রেমের বন্ধন দৃঢ় করিতে নিযুক্ত হইলেন। কারণ, ওথেলো প্রণয়ি-জনোচিত মনোহারিণী মধুর ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন না। নায়িকাগণ যে সব কথায় সুখী হন, তাহা তিনি জানিতেন না। সুতরাং অনুনয়-বিনয়-মান-সোহাগের নিমিত্ত তিনি বিশ্বস্ত ক্যাসিওকে, পত্নীর নিকট পাঠাইতেন। ক্যাসিও-ও, নিষ্পাপ হৃদয়ে, প্রভু-পত্নীর মনোরঞ্জনার্থ সর্ব্বদা যাতায়াত করি উদার-হৃদয়, মহামতি ওথেলোর মহান্ চরি ইহাতে আরও উজ্জ্বল হইতে লাগিল। অতি সরলতার মূর্ত্তিমতী প্রতিমা, সদাশয়া দেস্‌দিম নাও, ক্যাসিওকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতে লাগিলেন। স্বামী যাহাকে ভালবাসেন ও বিশ্বা করেন, স্ত্রীও যে তাহাকে ভাল বাসিবেন ও বিশ্বাস করিবেন, তাহার আর বিচিত্র কি ক্যাসিও সর্ব্বদাই দেস্‌দিমনার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এবং নানাপ্রকার নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদ, গাল-গল্প ও উপকথা কহিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতেন। ওথেলো ও দেস্‌দিমনা কিছু-দিন খুব মনের সুখে কাল কাটাইলেন।

(৮)

এইবার বিষ ধরিবার সূত্রপাত হইল। কার্য্যের সুবিধার জন্য তিনি বিশ্বাসভাজন মাইকেল্ ক্যাসিওকে আপন সহকারিপদে নিযুক্ত করিলেন। ইয়াগো নামক এক ব্যক্তি অনেক দিন হইতে ঐ পদের আশা করিয়া আসিতেছিল। ক্যাসিও অপেক্ষা সে, শুধু বয়সে প্রবীণ নহে,—ওথেলোর অধীনে সেনানী-পদেও সে, ক্যাসিওর পূর্ব্বে নিযুক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু তাহার বিশ্বাস, ক্যাসিও অপেক্ষা সে কৃতী। সুতরাং ইয়াগো বুঝিত, প্রধান সেনা-পতির সহকারি-পদ অগ্রে তাহারই প্রাপ্য। কিন্তু অদৃষ্ট প্রতিকূল! ইয়াগোর সে মুখের-গ্রাস ক্যাসিও কাড়িয়া লইল। আর যায় কোথায়?—যতটা আক্রোশ, যতটা ক্ষোভ, যতটা হিংসা, যতটা ক্রোধ—সবগুলা একত্রিত করিয়া পাপিষ্ঠ ইয়াগো ক্যাসিওর সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইল। প্রথম প্রথম রহস্তের অছিলায় মর্ম্মভেদী শ্লেষোক্তি, যার-তার নিকট ক্যাসিও অতি অপদার্থ—এই টুকু প্রমাণ করিবার চেষ্টা,—শেষ্কালিয়মানের মুখ দিয়া বিষ-উদ্গিরণ।

ষ্ঠ ইয়াগোর সে কূট-বুদ্ধির পরিচয়, পাঠক ই পাইবেন।

ইয়াগো যেখানে-সেখানে, যার-তার কাছে য়া বেড়াইতে লাগিল, "ক্যাসিও ত একজন মেয়ে মানুষের মধ্যে। রমণী-সমাজে তাহার মান-সম্ভ্রম, আদর-প্রতিপত্তি শোভা পায় বটে! কিন্তু যুদ্ধ-বিষয়ে সে কি জানে, কি বুঝে? কেমন করিয়া সৈন্য সাজাইতে হয়, কি কৌশলে ব্যূহ রচনা করিতে হয়, ক্যাসিও তাহার কি ধার ধারে? এ সকল বীরোচিত কার্য্যে, তাহাকে আমি একটী বালিকার অধিক কৃতিমান্ মনে করি না।"

দুষ্টবুদ্ধি ইয়াগো এইরূপে গায়ের-ঝাল ঝাড়িতে লাগিল। সেনাপতি ওথেলো, ক্যাসিওকে ভাল বাসিতেন, সে তাহা সহিতে পারিত না। অধিকন্তু তাহার একটা ভুল-বিশ্বাস ছিল যে, তাহার স্ত্রী দুশ্চরিত্রা এবং সে বিষয়ে সে, ওথেলোকেই সন্দেহ করিত। এই দুই কারণে ওথেলো তাহার অত্যন্ত ঘৃণার-পাত্র হইয়াছিলেন। একাধারে প্রতিহিংসা, পরশ্রীকাতরতা, ক্ষোভ, রোষ, অশান্তি, পাপে উন্মত্ত হইয়া মহাপাপী ইয়াগো, এমন এক প্রাণঘাতী ভীষণ ষড়যন্ত্র করিল যে, সে ফাঁদে পড়িয়া ওথেলো, দেস্‌দিমনা এবং ক্যাসিও—তিন জনেরই মহা সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে।

ক্রুরমতি ইয়াগো অতি ধূর্ত্ত ও কূট-বুদ্ধি-জীবী এবং মনুষ্যপ্রকৃতির অতি অন্তরতম নিভৃত স্থানে প্রবেশ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে জানে। কোথায়, কি ভাবে আঘাত করিলে, কোন্ ফল হয়, তাহা তাহার অজ্ঞাত নাই। ফল কথা, ইয়াগো মনুষ্য-চরিত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ। পাপিষ্ঠ এটা বেশ বুঝে যে, দৈহিক যন্ত্রণা যতই গুরুতর হউক না কেন, জাঁতের-ঘা অপেক্ষা গুরুতর নহে;—তাহার শতাংশের একাংশও নহে। ইয়াগো এখন সেই 'জাঁতের ঘা'র উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। যদি কোন ক্রমে একবার ক্যাসিওর প্রতি ওথেলোর ভালবাসার পরিবর্ত্তে হিংসা উৎপাদন করিতে পারে, তবে তাহার প্রতিহিংসা চূড়ান্তরূপে চরিতার্থ হয়। সে বিষের-আগুনে নিশ্চয়ই ক্যাসিও কিংবা ওথেলো পুড়িয়া মরিবে। চাই কি, দু'জনেও মরিতে পারে। সয়তান ইয়াগোর তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি কি?

পাপিষ্ঠের মনোভাব এখন এইরূপ। মনের মধ্যে এই কালানল সঞ্চিত করিয়া মহাপাপী কালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

---

(৯)

সাইপ্রস দ্বীপে সেনাপতির সস্ত্রীক আগমন ও বিপক্ষ-পক্ষ তুরকী-সৈন্যের আকস্মিক ছত্রভঙ্গ,—এই দুই কারণে সেনা-নিবাসে একদিন এক আনন্দোৎসব হইল। সকলেই সুস্বাদু পানাহার ও আমোদ-উল্লাস করিতে লাগিল। সেনা-নিবাসে সুরার স্রোত বহিল, সকলেই প্রভু ও প্রভু-পত্নীর 'জয়-জয়কার' করিতে লাগিল।

রাত্রিকাল। আজিকার রাত্রে মাইকেল ক্যাসিও সেনা-নিবাসের শান্তিরক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। সেনাপতি ওথেলো তাঁহাকে আদেশ দিয়াছেন যে, "সৈনিকগণের মধ্যে কেহ যেন অধিক মাত্রায় সুরাপান না করে, কিংবা হল্লা-কোলাহল করিয়া না বেড়ায়;—অপিচ তাহাদের উপদ্রবে স্থানীয় অধিবাসিবর্গ ভীত বা উত্ত্যক্ত না হয়।"

পাপিষ্ঠ ইয়াগো আজ তাহার সেই ভীষণ দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিবার সঙ্কল্প করিল। রাত্রি একটু অধিক হইলে, সে, কপট ভক্তি ও ভালবাসার ভান করিয়া, প্রথমতঃ সেনাপতি ওথেলোর খুব প্রশংসা করিতে লাগিল। অতঃপর 'আজিকার আমোদের দিনে একটু সুরাপান না করিলে ভাল দেখায় না'—বার বার

এই কথা বলিয়া ক্যাসিওকে সমধিক সুরাপানে প্রবৃত্তি দিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, শান্তি রক্ষণ-কার্য্যের সময় সুরাপান মহা অপরাধ বলিয়া গণ্য। ক্যাসিও প্রথমতঃ ইহাতে আপত্তি করিলেন এবং ইয়াগোর অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিবেন না বলিয়া দুঃখিত, ইহাও জানাইলেন। কিন্তু কেমন গ্রহের ফের, অথবা দ্রব্যের মোহিনীশক্তি যে, ইয়াগোকে আর অধিকক্ষণ কষ্ট পাইতে হইল না,—কালের বশে, আর অদৃষ্টের দোষে, ক্যাসিও আপনার পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিলেন। সাধ করিয়া কালসর্প হৃদয়ে ধারণ করিলেন। "এই এইটুকু খাও" বলিয়া ইয়াগো সুরাপাত্র পূর্ণ করে, আর ক্যাসিও-ও অমনি কলের পুতুলটীর-মত ঢক করিয়া সেটুকু গলাধঃকরণ করিয়া ফেলেন। এইরূপ, একটুর-পর-একটু, এক-গেলাসের-পর আর-এক-গেলাস করিয়া 'মাত্রা' বিলক্ষণ চড়িতে লাগিল; এদিকে সুরও বেশ জমিয়া আসিল। ইয়াগোর উৎসাহবাক্যে ও প্রমত্তসঙ্গীতে সমধিক উৎসাহিত হইয়া, ক্যাসিও বারংবার মুক্তকণ্ঠে প্রভুপত্নীর যশোগান করিতে লাগিলেন। এইরূপে চৈতন্য হারাইয়া আপন কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন। শেষ, অতি ঘোরতর মাতাল হইয়া পড়িলেন।

পাপিষ্ঠ ইয়াগো বুঝিল, এই ঠিক সন্ধিস্থান। সয়তান, তাহার সয়তান-ধর্ম্ম পালন করিল। জলন্ত আগুনে ইন্ধন দিবার অভিপ্রায়ে এই সময়ে সে এক ব্যক্তিকে ইঙ্গিতাভাষে কি জানাইল। সে আসিয়া, ক্যাসিওকে অকস্মাৎ ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিল। আগুন গর্জ্জিয়া উঠিল। ক্রোধোন্মত্ত ক্যাসিও শাণিত কৃপাণ-হস্তে ভর্ৎসনাকারীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। সুতরাং সৈন্যগণের মধ্যে মহা-কোলাহল পড়িয়া গেল। মণ্টানো নামক জনৈক প্রবীণ ও বিশিষ্ট কর্ম্মচারী মধ্যস্থ ভাবে এই গোলযোগ মিটাইতে আসিয়া অস্ত্র হইলেন। সুর আরও জমিয়া গেল।

---

(১০)

দুরাত্মা ইয়াগো—যে, এই সকল অনর্থের মূল,—ঘটনাটী অতি গুরুতর প্রমাণ করিবার উদ্দেশে, ভয়সূচক গভীর ঘণ্টা-নিনাদ আরম্ভ করিয়া দিল। অকস্মাৎ কোন ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে এই সঙ্কেত-সূচক দুর্গ-ঘণ্টা নিনাদিত হয়; কিন্তু খলমতি ইয়াগো সামান্য কলহকে গুরুপাকে তুলিবার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করিল। তাহার ফল হইল এই যে, সেনাপতি ওথেলো সেই ভয়সূচক ঘণ্টা-নিনাদে জাগ্রত হইয়া, তৎক্ষণাৎ বীরবেশে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ব্যাকুলভাবে ক্যাসিওকে কারণ জিজ্ঞাসিলেন।

ওথেলোকে সম্মুখে দেখিয়া, ভয়ে ও লজ্জায় ক্যাসিওর মত্ততার কিছু হ্রাস হইল। তিনি প্রকৃতিস্থ হইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আত্ম-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া, লজ্জায় তিনি কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। সয়তান ইয়াগো এই অবসরে স্বধর্ম্ম পালন করিল। উপস্থিত গোল-যোগের আমূল বৃত্তান্ত এরূপ ভাব-ভঙ্গীতে বর্ণন করিল যে, তাহা আসল অপেক্ষাও অতি গুরু-পাকে দাঁড়াইল। অথচ মুখে এমন ভাবের কথা বলিল সে, ঘটনাটা এমন-কিছু গুরুতর নয়, আর সে ইচ্ছা করিয়া ক্যাসিওর দোষ উল্লেখ করিতেছে না,—তবে সেনাপতির প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় বলিয়া দিতেছে। বলা বাহুল্য, পাপিষ্ঠ আত্মদোষটা বে-মালুম ঢাকা দিল,—সকল দোষ—সকল অনর্থ, বাগ্‌ভঙ্গি কৌশলে, অতিরঞ্জিতভাবে, দুর্ভাগ্য ক্যাসিওর ঘাড়ে চাপাইল। ক্যাসিওর তখন আর কথা কহিবার ক্ষমতা নাই। গম্ভীর-প্রকৃতি, কর্ত্তব্য-কর্ম্মে দৃঢ়-চিত্ত, সেনাপতি ওথেলো, তৎক্ষণাৎ ক্যাসিওকে

চ্যুত করিলেন। এইরূপে পাপিষ্ঠ ইয়াগো, হার প্রথম দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিল। সরলচিত্ত ক্যাসিওর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া, খল, কালরাত্রিতে তাহার ভবিষ্যৎ বিষম ফাঁদের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল।

---

(১১)

ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে-মৃতপ্রায়, হতভাগ্য ক্যাসিও সম্ভ্রমজনক সহকারি-সেনাপতির পদ হারাইয়া, শোকাকুলচিত্তে মুখস-পরা বন্ধু, পাপিষ্ঠ ইয়াগোর নিকট আত্মদুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "হায়, আমি নির্ব্বোধ! ক্ষণিক সুখে উন্মত্ত হইয়া নিজ শিব চরণে দলন করিলাম! কয়েক মুহূর্ত্তের পাপে আমার এই সর্ব্বনাশ ঘটিল! আমি চিরদিনের মত অধঃপাতে গেলাম! আর কোন্ মুখে সেনাপতির নিকট গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব এবং বলিব যে, আমাকে পুনরায় পদস্থ করুন? সেনাপতি ক্রোধে ও ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া বলিবেন,—'এই সেই মদ্যপায়ী পিশাচটা আসিল!' হায়, আমার দুঃখের কি অবধি আছে?"

ক্যাসিও এবংবিধ অনুতাপ করিতে লাগিলেন। ধূর্ত্ত ইয়াগো, এই অবসরে আর এক চাল চালিল। কৃত্রিম সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কহিল, "ভাই হে। এমন পা পিছলায় অনেকের। আমোদ করিয়া একটু মদ্যপান করিয়াছিলে, এই না তোমার দোষ? তা এজন্য আর এত অনুশোচনা কেন? সময়-বিশেষে একটু-আধটু মদ খাইলে দোষ কি?"

তারপর আবার কহিল, "যা হউক, তুমি এখন এক কাজ কর। দেখ, সেনাপতি এখন সহধর্ম্মিণীর কিছু-অধিক অনুরক্ত। সুশীলা দেস্‌দিমনাকে তিনি প্রাণাধিক ভাল বাসেন। দেস্‌দিমনাই এখন সকল বিষয়ের কর্ত্রী। সত্য কথা বলিতে গেলে তিনিই এখন আমাদের 'জেনারেল,'—ওথেলো নাম মাত্র। তা দেখ, দেস্‌দিমনাকে ধরিতে পারিলে, তোমার আর কোন ক্ষোভ থাকিবে না। সেনাপতি, প্রিয়তমা পত্নীর কথা কখনই ঠেলিতে পারিবেন না। তুমি গিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া স্নেহময়ী দেস্‌দিমনাকে ধর। তিনি নিশ্চয়ই তোমার জন্য স্বামীর কাছে অনুনয়-বিনয় করিবেন এবং ওথেলো-ও নিশ্চয়ই এ যাত্রা তোমাকে ক্ষমা করিয়া, পুনঃ পদস্থ করিবেন। এ কথা তোমায় স্বরূপ বলিলাম।"

বস্তুতঃ, কথাটা স্বরূপ বটে;—সরল ভাবে লইলে ইয়াগোর এই যুক্তিটা যে খুব মূল্যবান্, তাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু হইলে কি হয়,—খলের হৃদয় যে বিষে ভরা আছে;—সুযোগ পাইলেই যে, সে যাকে-তাকে দংশন করিবে

---

(১২)

ইয়াগোর পরামর্শ-মত, ক্যাসিও, প্রভু-পত্নী দেস্‌দিমনার নিকট আত্ম-অপরাধ স্বীকার করিয়া পুনঃ পদ প্রাপ্তির প্রার্থনা করিলেন। সদাশয়া দেস্‌দিমনাও অঙ্গীকার করিলেন যে, তাঁহার জন্য স্বামীর নিকট যার-পর-নাই অনুনয়-বিনয় করিবেন। যথা সময়ে তিনি কথা-মত কাজ করিলেন;—ওথেলোকে বিশেষ আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করিয়া কহিলেন, "ক্যাসিওকে এবারকার মত ক্ষমা করিতে হইবে। তিনি যথেষ্ট অনুতপ্ত ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছেন। আমার অনুরোধ, পুনরায় তাঁহাকে পদস্থ কর।"

ন্যায়-পরায়ণ ওথেলো উত্তর করিলেন, "তাহা কিরূপে হইতে পারে? ক্যাসিওর অপরাধ সামান্য নহে;—এত শীঘ্র কিরূপে তাঁহাকে মার্জ্জনা করি?"

দেস্‌দিমনা তথাপি কহিলেন, "আমার অনুরোধ। এ অনুরোধটি তোমায় রক্ষা করিতেই হইবে। আজি হউক, কালি হউক, কবে তাঁহাকে

সাধু ও সয়তান।



পুনঃ পদস্থ করিবেন বলুন? বিশেষ বেচারীর লঘু-পাপে গুরু-দণ্ড হইয়াছে;—এমত স্থলে তাঁহাকে ক্ষমা করায় অবিচার হইবে না।"

ওথেলো এবারও কোন সন্তোষজনক উত্তর দিলেন না। স্বামি-সোহাগিনী দেস্‌দিমনা কিছু অভিমান ভরে, ক্ষুণ্ণ-অন্তরে কহিলেন, "তবে তুমি আমার কথা রাখিলে না? আচ্ছা, আমারও একদিন এমন দিন আসিবে, যেদিন তোমাকে ইহা অপেক্ষাও গুরুতর অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু দেখ, ক্যাসিও আমাদের বড় অনুগত; বিশেষ তোমার বড় প্রিয়। এমন কত দিন হইয়াছে, কথাচ্ছলে, প্রণয়প্রসঙ্গে আমি তোমার কোন নিন্দা করিলে, ক্যাসিও অন্তরের সহিত তোমার পক্ষসমর্থন করিয়াছেন। আহা! এমন ভাল লোককে সামান্য একটা কারণে পদচ্যুত ক।। উচিত নয়।"

এবার আর ওথেলো প্রণয়িনীর কথা ঠেলিতে পারিলেন না,—কহিলেন, "আচ্ছা, তোমার অনুরোধে আমি স্বীকার করিলাম, উপযুক্ত সময় বুঝিয়া ক্যাসিওকে পুনঃপদস্থ করিব।"

---

(১৩)

বিধির নির্ব্বন্ধ!—এদিকে এমন এক ঘটনার সূত্রপাত হইল, যাহাতে অচিরাৎ নরকের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে! একদিন ক্যাসিও প্রভু-পত্নী দেস্‌দিমনার নিকট অতি বিনীতভাবে পুনঃ পদপ্রাপ্তির প্রার্থনা করিয়া প্রস্থান করিতেছেন, এমন সময় অকস্মাৎ গৃহের অপর পার্শ্ব দিয়া ইয়াগো সমভিব্যাহারে ওথেলো তথায় উপস্থিত হইলেন। দেশ-কাল-পাত্র—ত্রিযোগ-মিলন। অমনি সুযোগ বুঝিয়া সয়তানের স্বধর্ম্ম পালন। খলের মুখ দিয়া বিষ-বহ্নি উদ্গারণ হইল, "আমি এ-সব ভালবাসি না।" স্বর খুব মৃদু; কিন্তু হইলে কি হয়,—ঐটুকু স্বরে সমুদ্র-প্রমাণ বিষ! পাপিষ্ঠ ইয়াগো প্রাণঘাতী বিষের-বাতি জ্বালিল!

মহামতি ওথেলো, কথাটা শুনিয়াও শুনিলেন না। যদি বা শুনিলেন, তাহা মনে রহিল না। মনে-রহিবার-মত কথা নয় বলিয়া রহিল না। কিন্তু অবিলম্বে বিষের-বাতি উজ্জ্বলরূপে জ্বলিয়া উঠিল। দেস্‌দিমনা কার্য্যানুরোধে তথা হইতে অপসৃত হইলে পর, পাপিষ্ঠ ইয়াগো যেন কৌতূহল বশে ওথেলোকে জিজ্ঞাসা করিল,

শয়! আপনাদের বিবাহের পূর্ব্বে ক্যাসিও আপনাদের গুপ্ত-প্রণয়ের কথা নিত ?"

ওথেলো উত্তরিলেন, "হাঁ, জানিত বৈ কি! ক্যাসিওই মধ্যস্থ হইয়া আমাদের পরস্পরের প্রীতি বর্দ্ধন করিয়া দেয়। কেন বল দেখি ?"

সয়তান অমনি একটিবার মাত্র ভ্রুকুটী-ভঙ্গী করিল ও সেই সঙ্গে একটিমাত্র "হুঁ" শব্দ করিল।

বাস্। ঐ এক ভ্রুকুটী ও 'হুঁ' শব্দে সয়তানের সকল মনসাধ মিটিল। তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।

হঠাৎ যেন ওথেলোর চমক ভাঙ্গিল। তিনি যেন কিছু নূতন দেখিলেন। ইয়াগো যেন তাহাকে আরও কিছু নূতন দেখাইবে!

অকস্মাৎ ওথেলোর মনে পতিব্রতা দেস্দিমনা সংক্রান্ত কিছু দেখা দিল। "আচ্ছা, ইতিপূর্ব্বে না ইয়াগো আপনা-আপনি কি বলিতেছিল ? বলিতেছিল না, আমি এ সব ভালবাসি না!—ইয়াগো কি ভালবাসে না ?"

বিষ ধরিয়াছে, আর রক্ষা নাই। ওথেলো আবার ভাবিলেন, "আচ্ছা, এই মাত্র না আমি ও ইয়াগো ঘরে আসিতে আসিতে ক্যাসিও চলিয়া গেল ? দেসদিমনার সহিত ত তার—"

অমনি মনে হইল, "এইজন্যই বুঝি ইয়াগো আপনা-আপনি বিরক্তিভাবে বলিতেছিল, "আমি এ-সব ভাল বাসি না'!"

ধীরে ধীরে, সংশয়-তিমিরে ওথেলোর মন আচ্ছন্ন হইতেছে। দুষ্টমতি ইয়াগো তাহা বুঝিল। বুঝিল যে, এই সন্ধিস্থান। এইবার তাল ঠিক রাখিতে পারিলেই মনস্কামনা পূর্ণ হয়!

ওথেলোর মনে হইল, ইয়াগো অতি সজ্জন, তাহার মনে কোনরূপ কপটতা নাই,—বোধ হয়, কেবল ভদ্রতার খাতিরে তাহার অন্তর্নিহিত অশুভ-বার্ত্তা আমার গোচর করিতেছে না। এই ভাবিয়া তিনি প্রকাশ্যে কহিলেন, "আচ্ছা ইয়াগো! সত্য করিয়া বল, তোমার মনে কি কোন কুভাবের উদয় হইয়াছে ?"

পাপিষ্ঠ অমনি কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বিনীতভাবে উত্তর করিল, "আপনাকে আর সে কথা শুনিয়া কাজ নাই। আমার মনে যদি কোন অশুভ-চিন্তা দেখা দিয়া থাকে, তাহা আমাতেই থাক্। কিন্তু যিনি যত বড় লোকই হউন না কেন, সময়-বিশেষে, এমন চিন্তা সকলেরই মনে উদয় হয়!" এক সঙ্গেই নিজের কৈফিয়ৎ ও নিজের সাফাই গাহিয়া, পাপিষ্ঠ আরও বিনীতভাবে কহিল, "দেখুন, মন্দ-কথা না শোনাই ভাল। বিশেষ, আমার মনে যে ধারণা, চাই কি, তাহা ঠিক না হইতেও পারে। আমার মনের কথা শুনিলে আপনার কোনরূপ আনন্দ বা ইষ্ট নাই। কিন্তু তাহাও বলি, গুণী ব্যক্তির যশঃসৌরভ, সামান্য একটা সন্দেহ-সূচক বাক্যে বিনষ্ট হয় না।"

এইরূপ ইঙ্গিত-আভাষে, দুর্ম্মতি-পরায়ণ ইয়াগো, ওথেলোকে উত্তরোত্তর সংশয়াপন্ন ও কৌতূহলী করিতে লাগিল। যখন দেখিল, বিষ বিলক্ষণরূপে ধরিয়া আসিয়াছে, তখন আরও চতুরতার সহিত হাত-মুখের ভঙ্গি করিয়া, বাহিরে দেখাইল, যেন ও কিছু নয়, ওর জন্য মন খারাপ করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু কার্য্যে ওথেলোকে চকিত, বিস্মিত ও মর্ম্মপীড়িত করিয়া তুলিল। বলিল, "যাহা শুনিতে চাহেন বলিতে পা র, কিন্তু সাবধান, আমার কথা শুনিয়া হঠাৎ স্ত্রীর চরিত্রে সন্দিহান হইবেন না!"

কথাটা ওথেলোর বুকের ভিতর বিঁধিল। তিনি বলিলেন, "আমি জানি, আমার স্ত্রী সুন্দরী, আমোদ-প্রিয়, নৃত্য-গীত-কৌতুকে বিশেষ পারদর্শিনী এবং লোক-সংসর্গ ভাল বাসে;—মনে পবিত্রতা ও ধর্ম্মভাব থাকিলে, এ গুলি গুণমধ্যে

সত্য হয়, নচেৎ দোষের কথা বটে। আচ্ছা, অগ্রে আমি পরীক্ষা করিয়া দেখি, দেস্‌দিমনা সতী কি কলঙ্কিনী?"

এক-গাল হাসিয়া পাপিষ্ঠ ইয়াগো কহিল, "তা ত বটেই,—তা ত বটেই।" কিন্তু ঐ এক-গাল-ভরা "তা ত বটেই" হাসিতে, ঝলক-ঝলক বিষ বহির্গত হইল। সয়তানের রঙ্গটা দেখিলে?

সয়তান কহিল, "তা ত বটেই।—অগ্রে পরীক্ষা না করিয়া কোন গুরুতর কার্য্যে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। এই ত কথার-মত কথা। তা ভাল, যদি আপনি সহধর্ম্মিণীকে কোনরূপ পরীক্ষা করিতে চান, তবে যে সময় ক্যাসিও ও তাঁর একত্র থাকিবেন, সেই সময় করিবেন।"

অতঃপর সুরটা অন্যরূপে ধরিয়া কহিল, "কি জানেন মহাশয়, আমি যে কোনরূপ বিদ্বেষবশে বলিতেছি, তাহা নয়,—কিন্তু স্ত্রী-চরিত্রে অধিক বিশ্বাসবান্ হওয়াটা কিছু নয়;—বিশেষ ইটালীর স্ত্রীলোকদের প্রতি। আমি ইটালীদেশবাসী,—আমি অবশ্যই আপনার অপেক্ষা আমার স্বদেশের বৃত্তান্ত অধিক জানি; তাই সাহসপূর্ব্বক বলিতেছি, ভেনিস্-সুন্দরীগণ, স্বামীর চ'খে ধূলা দিয়া এমন অনেক লীলা-খেলা করেন, যাহা এক সর্ব্ব-নিয়ন্তা ভিন্ন আর কেহ দেখিতে পায় না।"

সয়তানের আকণ্ঠ বিষ-ভরা; যতই নাড়া-চাড়া পাইতে লাগিল, ততই বিষ উদ্গীরণ হইতে লাগিল। অবশেষে চাতুর্য্য সহকারে আবার কহিল, "দেখুন মহাশয়, বলিতে সাহস করি না,—পতিব্রতা দেস্‌দিমনা অবশ্যই সতীসাধ্বী; কিন্তু এই মজাটা দেখুন, বাপের চ'খে কেমন ধূলা দিয়া, তিনি আপনাকে পতিত্বে বরণ করিতে সমর্থ হন। শেষে আপনিই ঐন্দ্রজালিক খ্যাতি পাইলেন। তাই বলিতেছিলাম, ইটালিয়ান্ সুন্দরীগণকে সহসা বিশ্বাস করাটা কিছু নয়।"

এক মুহূর্ত্তে, এক নিশ্বাসেই একেবারে সমুদ্র-প্রমাণ বিষ উদ্গীরণ হইল। চা[illegible] বিষময় হইয়া গেল। বুঝি, বায়ুর গতি[illegible] হইল। ক্রোধ, ক্ষোভ, অভিমান, বি[illegible] মোহে, ধীরমতি ওথেলো এবার অধৈর্য্য হইলেন হিতাহিত-জ্ঞান হারাইলেন। সয়তানের মর্ম্ম-ভেদী তীক্ষ্ণযুক্তি কেবলই তাঁহার বুকের ভিতর বাজিতে লাগিল,—"ঠিক কথাই ত বটে, দেস্‌-দিমনা যখন অভূতপূর্ব্ব কৌশলে, পিতা-বন্ধু-আত্মীয়-স্বজন সকলের চক্ষেই ধূলি দিতে পারিল, তখন যে স্বামীর চক্ষেও ধূলি দিতে না পারিবে, তাহার অর্থ কি?"

বুকের ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল। মহানুভব ওথেলো আত্মহারা হইলেন। সয়তান ইয়াগো, স্ব-ধর্ম্ম পালন করিয়া পরিণামে যে কি সর্ব্বনাশ করিল, ক্রমেই সে সকল কথার আলোচনা করা যাইতেছে।

---

(১৪)

এইবার পাপিষ্ঠ ইয়াগো আর এক চাল চালিল। ওথেলোর দুঃখে মহানুভূতির ছল করিয়া কহিল,—"দেখুন, আমিই আপনার ক্রোধ ও ক্ষোভের কারণ হইলাম। কিন্তু যতক্ষণ কোনরূপ প্রমাণ না পাইতেছেন, ততক্ষণ মন খারাপ করাটা কিছু নয়।"

ওথেলো, কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া কহিলেন, "ইয়াগো, যদি তুমি আমার পত্নী-সম্বন্ধে আর কোন কথা জান, ত অকপটে বল।"

খল, যেন কাহারও নিন্দাবাদ করিতে একান্ত অনিচ্ছুক, এইভাবে, ক্যাসিওর বিরুদ্ধে নানা কথা পাড়িতে লাগিল। পরে ধাঁ করিয়া কথাটা উল্টাইয়া বলিল, "মহাশয়, আপনার পত্নী সম্বন্ধে একটা কথা বলিবার আছে। বিবেচনা করিয়া দেখুন,—ধরিলাম, আপনি গুণবান্; কিন্তু তাহা বলিয়া কি রূপ ও গুণ—দুইটার

তু...য় ভেনিস্ নগরীর যাবতীয় যুবক আপনা আ...ক্ষা হীন? এইখানেই দেস্‌দিমনা-সুন্দরীর স...ৎ বিবেচনার পরীক্ষা হয়। তাঁহার মনের ব...ও বুঝা যায়। আমার বিবেচনায়, স্ত্রীলোকের এ রকম স্বেচ্ছাচারিতা, গুণ নয়।"

সয়তান, শতেক রকমে বিনাইয়া-বিনাইয়া সুর ধরিতে লাগিল। ওথেলোকে কহিল, "দেখুন, এইবার আপনি পত্নীকে পরীক্ষা করিতে পারেন। ক্যাসিওর প্রতি, সময়ক্রমে আপনি অনুগ্রহ করিবেন বলিয়াছেন, কিন্তু একটু অপেক্ষা করুন, দেখিতে পাইবেন, দেস্‌দিমনা-সুন্দরী, তাঁহার জন্য কিরূপ সাগ্রহ-হৃদয়ে আপনার কাছে অনুরোধ প্রার্থনা করেন।"

খল, এদিকে আর এক ষড়যন্ত্র করিল। তৎক্ষণাৎ ক্যাসিওর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরামর্শ দিল, "দেখ ক্যাসিও, এই সুসময়! এই-বারি গিয়া করুণহৃদয়া প্রভু-পত্নীকে ধর, তোমার সুরাহা হইবে।"

আবার এদিকে ওথেলোর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিল, "মহাশয় যতক্ষণ,অবধি চূড়ান্ত-রূপ পরীক্ষা করিতে না পারিতেছেন, সে পর্য্যন্ত সুশীলা সহধর্ম্মিণীকে নির্দ্দোষ বলিয়াই জানা উচিত।"

কিন্তু মহামতি ওথেলোর হৃদয়ের পরতে পরতে যে বিষের বাতি জ্বলিয়াছে, এখন আর দুটা ফাঁকা কথায় তাহা নির্ব্বাপিত হইবার নয়! তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বীর-হৃদয়, পূর্ব্বে যেরূপ যুদ্ধ-সংক্রান্ত বিষয়ে মাতিয়া উঠিত, এখন সে আনন্দ-উল্লাস ও মত্ততা এক-কালে লোপ পাইল।

প্রাণাধিকা পত্নীর ব্যভিচারাশঙ্কায় তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। কখন মনে হইতে লাগিল দেস্‌দিমনা নির্দ্দোষ, কলঙ্কশূন্য; কখন বা মনে হইল, না ইয়াগোর কথাই সত্য, দেস্‌দিমনা কলঙ্কিনী! কখন বা ইয়াগোকে সত্যবাদী সরল-চিত্ত বোধ করিলেন, কখন বা পাপিষ্ঠকে সয়তান বোধে, সকলই মিথ্যা বোধ করিতে লাগিলেন। সন্দেহ-দোলায় আন্দোলিত হইয়া ধীরমতি ওথেলো মনে মনে ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগি-লেন। আপনার সহিত আপনি সংগ্রাম করিয়া শান্তি, সুখ, স্বাস্থ্য সকলই হারাইতে বসিলেন।

মনের এমনই অবস্থায় ওথেলো একদিন ইয়াগোকে বলিলেন, "আচ্ছা, আমার পত্নীর চরিত্র-দোষ সম্বন্ধে কি কি প্রমাণ তুমি অবগত আছ, স্পষ্ট করিয়া বল।"

অমনি হঠাৎ বুকের ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সরলতার মূর্ত্তিমতী প্রতিমা, দেস্‌দি-মনার অন্তর্নিহিত প্রগাঢ় প্রেম ও ভালবাসা স্মরণ করিয়া মহামতি ওথেলো গর্জ্জিয়া উঠি-লেন। কহিলেন, "দেখ্ ইয়াগো, যদি তোর কথা মিথ্যা হয়, তবে নিশ্চয় জানিস্, অবিলম্বে তোকে ইহলোক হইতে অন্তর্হিত করিব!"

ওথেলোর হঠাৎ এই ভাব দেখিয়া ইয়াগো বিস্মিত হইল। মর্ম্মপীড়িত ওথেলো উদ্‌ভ্রান্ত-ভাবে আবার গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"দূর হ, আমার সম্মুখে আর আসিস্ নে। তুই আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে বসিয়াছিস্। আমি যদি কিছু না শুনি, না বুঝি, তবে সে যেমনই হউক না, আমার ক্ষতি কি?"

ইয়াগো। প্রভু, এ কি!

ওথেলো। সে কখন্ কি করে, কখন্ ক্যাসিওকে লইয়া ঘৃণিত আমোদ-প্রমোদে মত্ত হয়,—আমি ত তাহার কিছুই জানিতাম না! আমি দেখি নাই, ভাবি নাই,—কি ক্ষতি হইয়াছিল? গত রাত্রে সুখে ঘুমাইয়াছি।—কেমন প্রফুল্ল ছিলাম। আমি তাহার ওষ্ঠাধরে ক্যাসিওর চুম্বন দেখি নাই! যাহার রত্ন অপ-হৃত হইয়াছে, সে যদি রত্নের অভাব বোধ না

করে, তাহার তাহা জানিতে দিও না;—সেও বুঝিবে, তাহার কিছুই অপহৃত হয় নাই!

ইয়াগো। এ সকল শুনিয়া আমি দুঃখিত হইতেছি।

ওথেলো। যদি আমার সমভিব্যাহারী সৈন্য-সামন্ত সকলেই দেস্‌দিমনাকে উপভোগ করিত, যদি সে কথা আমি না জানিতাম, আমি তাহাতেও সুখী হইতাম। হায়! এখন?—এখন শান্তি, সুখ! যাও হৃদয় হইতে তোমরা চিরদিনের জন্য চলিয়া যাও। আনন্দ, বিদায়! বিদায়! সৈন্য-সামন্ত, যুদ্ধ-বিগ্রহ, আশা-ভরসা, যাও, সব যাও, সকলে বিদায় হও। জয়পতাকা, যুদ্ধাশ্ব, বিজয়-ভেরী-নিনাদ,—যাও সব বিদায় হও! ওথেলো আর নাই, তোমরা ওথেলোর কেহ নও! যাও, সব যাও!

এইবার খল কিছু অভিমানভরে, কৃত্রিম কোপসহকারে কহিল, "বটে! আমি সত্য কথা কহিয়া দোষী হইলাম! আচ্ছা বলুন দেখি, আপনি কি কখন আপনার পত্নীর হস্তে একখানি বিচিত্র রুমাল দেখিয়াছেন?"

একটা বিকট নিশ্বাস ফেলিয়া অতি কষ্টে ওথেলো উত্তর করিলেন, "হাঁ, আমিই দেস্‌দিমনাকে একখানি সুরম্য রুমাল দিই। সেখানি আমার প্রণয়-স্মৃতির প্রথম উপহার। কেন বল দেখি?"

খল, অধিকতর কৌতূহল সহকারে কহিল, "হাঁ, তবে ঠিক হইয়াছে;—সেই মূল্যবান্ রুমালখানি দিয়া আমি একদিন ক্যাসিওকে মুখ মুছিতে দেখিয়াছি।"

এইবার পূর্ণমাত্রায় বিষ ধরিল। সয়তানের সকল সাধ মিটিল। অবিলম্বে নরকের আগুন গর্জ্জিয়া উঠিবে।

গম্ভীর-স্বরে, ততোধিক স্থিরপ্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক কঠোর মূর্ত্তিতে ওথেলো কহিলেন, "ইয়াগো, যদি তোমার এ কথা সত্য হয়, তবে আমার আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। [illegible] বুঝিব, দেস্‌দিমনা সতী নয়—ঘোর কল[illegible]ী। পাপিষ্ঠ ক্যাসিওই তাহার—"

মুখ ফুটিয়া সকল কথা বাহির হইল [illegible]—একটা বিকট নিশ্বাসেই তাহা লয় পাইল।

অতঃপর গর্জ্জিয়া কহিলেন, "যদি তোমার কথা সত্য হয়, তবে আজ হইতে তিন দিনের মধ্যে, দুর্ম্মতি-পরায়ণ ক্যাসিওর প্রাণসংহার করিব, আর সেই পাপীয়সী দেস্‌দিমনাকেও কোন উপায় অবলম্বনে ইহলোক হইতে অন্তর্হিত করিব। তবে আমার প্রাণের-জ্বালা জুড়াইবে!"

---

(১৫)

যখন মানুষ ঘোর প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়, তখন তাহার বিবেচনা-শক্তি আদৌ থাকে না। তখন মানুষ তিলকে তাল বোধ করে। ওথেলোর ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। সামান্য একখানা রুমালের কথা শুনিয়া, ধীরমতি ওথেলো দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইলেন। মনে ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিল, দেস্‌দিমনা কলঙ্কিনী, ক্যাসিও-ই তাহার উপপতি। একবার মনে এ প্রশ্নটা উদয় হইল না যে, রুমাল-রহস্যটা কি এবং কিরূপেই বা তাহা ক্যাসিওর হস্তগত হইল? ফলতঃ, ক্যাসিও ও দেস্‌দিমনা উভয়েই নির্দ্দোষ; কাহারও মনে কোনরূপ কু-অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু বিধিলিপি কে খণ্ডন করিবে? ঘটনা-চক্রে সত্যই মিথ্যা এবং মিথ্যাই সত্য হয়। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। পাপিষ্ঠ ইয়াগো, তাহার পৈশাচিক ষড়যন্ত্র সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে, তৎপত্নী এমিলিয়াকে একদিন বলে, "দেখ, তুমি দেস্‌দিমনার কাছে গিয়া তাঁহার সেই অপূর্ব্ব রুমালখানা কয়েকদিনের জন্য প্রার্থনা কর। বলিও, তুমি সেই খানি দেখিয়া আর একখানা রুমাল প্রস্তুত করিবে। ইহাতে যদি না পাও, তবে চুরি করিয়া আনিবে।" এমিলিয়া তাহাকে

স[illegible] হয় নাই। কিন্তু এক দিন ঘটনাক্রমে সে রুমালখানা দেস্‌দিমনার হস্তচ্যুত হয়। এমি-লি[illegible] সেই অবসরে তাহা কুড়াইয়া লয়। স্বামীর দুরভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া, এমিলিয়া তাহা স্বামীকে দান করেন।” কিন্তু ধূর্ত্ত ইয়াগো এই-রূপে রুমাল পাইয়া হতভাগ্য ক্যাসিওর আবাসে রাখিয়া দেয়। ক্যাসিও-ও অজ্ঞানতাবশতঃ তাহা ব্যবহার করে। সয়তানের কৌশলটা দেখিলে ?

---

(১৬)

মর্ম্মপীড়িত ওথেলো, ইয়াগোর মুখে রুমাল-বৃত্তান্ত শুনিয়া তৎক্ষণাৎ দেস্‌দিমনার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং শিরঃপীড়ার অছিলা করিয়া কহিলেন, “আমার সেই রুমালখানা একবার দাও দেখি, মাথাটা বাঁধিব।”

পতিব্রতা দেস্‌দিমনা তৎক্ষণাৎ একখানি রুমাল আনিয়া স্বামীর হস্তে দিলেন। তাহা দেখিয়া ওথেলো কহিলেন, “না—না, এ রুমাল নয়, সেই যে আমি প্রণয়োপহার-স্বরূপ তোমাকে দিয়াছিলাম, সেই রুমালখানা আন।”

কিন্তু সে রুমাল আর কোথায় পাওয়া যাইবে? তাহা যে সয়তানের ষড়যন্ত্র-সিদ্ধির নিমিত্ত নিয়োজিত হইয়াছে! দেস্‌দিমনা অনেক খুঁজিলেন কিন্তু কোথাও পাইলেন না। শুনিয়া ওথেলো, কৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত কহিলেন, “সে কি! বল কি! তবে যে তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ! সে ত যে-সে রুমাল নয়!—ইজিপ্টের একজন ডাকিনী আমার জননীকে সেই রুমাল দিয়াছিল। সেই ডাকিনী মানুষের মনের-কথা বলিতে পারিত। রুমাল দিয়া আমার জননীকে বলে, ‘যত্নপূর্ব্বক ইহা রক্ষা করিও। যতদিন এই রুমাল তোমার কাছে থাকিবে, ততদিন তোমার স্বামী তোমাকে আন্তরিক ভাল বাসিবেন, কিন্তু রুমাল কোন-রূপে হারাইলে বা নষ্ট হইলে কিংবা কাহাকে বিলাইয়া দিলে বিপরীত ফল ফলিবে। তোমার স্বামী তোমাকে যার-পর নাই বিষ-নেত্রে দেখি-বেন। পূর্ব্বে যতটা অনুরাগ ছিল, ঠিক ততটা বিরাগ আসিবে।’ হায়! মা-আমার সেই রুমালখানি সযত্নে আমাকে দিয়া বলিয়া যান, ‘বৎস! যদি কখন বিবাহ কর, এই বিচিত্র রুমালখানি পত্নীকে উপহার দিও।’ এতদিন আমি মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়া আসিয়াছি; সেই রুমালখানিকে অমূল্য-রত্নের-মত সযত্নে রক্ষা করিয়াছি,—এখন তুমি তাহা হারাইলে ?”

সভয়ে, কম্পিত-হৃদয়ে দেস্‌দিমনা কহিলেন, “ইহা কি সত্য ?”

“সত্য।—রুমাল খানি মায়িক—ছায়াবাজীর ন্যায়। তুমি জান না যে, তুমি কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছ! পৃথিবীতে এক ভবিষ্যৎবক্তা, দুই শত বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনিই নানারূপ দৈব-কর্ম্ম সাধন করিয়া এই অপরূপ, অদ্ভুত-শক্তিসম্পন্ন রুমাল প্রস্তুত করেন।”

সরলা দেস্‌দিমনা, রুমালের এই অপূর্ব্ব ইতিবৃত্ত শুনিয়া ভীত, চকিত, স্তম্ভিত, বিস্মিত ও মোহিত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, “হায়, এ কি করিলাম! বুঝি, নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করিলাম!—বুঝি, এই রুমাল-অন্ত-র্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর স্নেহ-ভালবাসাও অন্তর্হিত হইবে!”

ওথেলো, রুমালের ইতিবৃত্ত কহিয়া, বার বার পত্নীকে উত্তেজনা করিতে লাগিলেন,—“কোথায় সে রুমাল আছে, বাহির করিয়া আন।”

সরলা দেস্‌দিমনা তখন আর উপায়ান্তর না দেখিয়া, বিধিমতে স্বামীকে সান্ত্বনা ও স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। অতঃপর স্বামীকে প্রসন্ন করিবার আশায়, মধুমাখা কোমল কণ্ঠে কহি-লেন, “স্বামিন্! আমি বার বার তোমাকে ক্যাসিওর প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিতে অনুরোধ করি, অথচ তাহাতে তোমার ইচ্ছা নাই,—

এই জন্যই কি আমাকে এরূপ ভয়-বিভীষিকা দেখাইলে?"

সোহাগভরে স্বামীকে এই কথা বলিয়া, পর-দুঃখকাতরা দেস্‌দিমনা পুনরায় ক্যাসিওর পক্ষ-সমর্থন করিয়া, তাহার যশোগান আরম্ভ করিয়া দিলেন। জ্বলন্ত আগুনে ইন্ধন পড়িল। ক্যাসিওর প্রতিই ওথেলোর জাতক্রোধ; এখনি আবার কলঙ্কিনী পত্নীর মুখে সেই পাপিষ্ঠের গুণ-গান শুনিতে হইল!

এবার ওথেলোর সেই স্বাভাবিক গম্ভীর মূর্ত্তি বড়ই ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করিল। তিনি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দেস্‌দিমনা দেখিলেন, ওথেলোর এ ভাব এই নূতন।

পতিব্রতা মনে মনে ভাবিলেন, "আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি, যাহাতে স্বামীর স্নেহে বঞ্চিত হইব? কৈ, অপরাধ ত মনে হয় না। তবে কি ভেনিস্ হইতে রাজকীয় কোন দুঃসংবাদ আসিয়া থাকিবে, যাহাতে স্বামীর-আমার এরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য হইয়াছে? অথবা, মানুষ ত দেবতা নয়, সকল সময় তাহার মতি-গতিও একরূপ থাকে না। আরও পুরুষ, বিবাহের অগ্রে প্রণয়িনীকে যে চক্ষে দেখে, বিবাহের পরে আর সে ভাব থাকে না। আমি হতভাগিনী, আমার কপালে চিরদিন স্বামি-সোহাগ সহিবে কেন?"

সরলা, পতিব্রতা, দেস্‌দিমনা এইরূপ আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন।

ওথেলোর সন্দেহ তথাপি বদ্ধমূল হইতে চাহে না;—আরও প্রমাণ চাই,—নহিলে বিশ্বাস হয় না। পাপিষ্ঠ ইয়াগো তখন আর এক উপায় উদ্ভাবন করিল। সুবিধামত ক্যাসিওকে নিকটে পাইয়া ওথেলোকে বলিয়া রাখিল, "আপনি একটু নিভৃতে থাকুন, আমি ক্যাসিওকে দেস্‌দিমনার কথা জিজ্ঞাসা করিব; সেও আপন মনে সকল কথা ব্যক্ত করিবে, আপনিও স্বকর্ণে সব শুনিবেন।" তাহাই হইল। ক্যাসিও বি[illegible] নাম্নী একটী রমণীর অবৈধ প্রণয়ে আ[illegible] ছিলেন। ইয়াগো সুযোগ বুঝিয়া তাহা[illegible] কথাপ্রসঙ্গে ক্যাসিওর নিকট হইতে শুনিয়া লইল, পরস্পরের প্রতি ভালবাসা কত প্রবল। দুর্ভাগ্য ওথেলো অন্তরাল হইতে অন্যরূপ বুঝিল, বুঝিল যে, ক্যাসিওর প্রণয়িনী আর কেহ নহে,—সে দেস্‌দিমনা! ইয়াগোর দুরভিসন্ধি পূর্ণ হইল।

এবার ওথেলোর অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর হইল। আর প্রমাণের আবশ্যক নাই!

---

(১৭)

মর্ম্মপীড়িত, চিন্তা-জর্জ্জরিত ওথেলো দেস্‌দিমনার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইতে লাগিল। মনের ভাব আর গোপন করিতে না পারিয়া, উদ্বেলিত-হৃদয়ে কহিলেন, "দেস্‌দিমনা, সত্য করিয়া বল, শপথ করিয়া বল, তুমি অবিশ্বাসিনী নহ!"

দেস্‌দিমনা। ঈশ্বর তাহা জানেন।

ওথেলো। ঈশ্বর জানেন, তুমি অবিশ্বাসিনী, তুমি দ্বিচারিণী!

দেস্। স্বামিন্! আমি অবিশ্বাসিনী?—আমি দ্বিচারিণী?

ওথেলো। হাঁ, দেস্‌দিমন্! অ-হ-হ! দূর হও! দূর হও! দূর হও!

দেস্। হায়! কি দুর্দ্দিন! স্বামিন্! কাঁদ কেন? আমিই কি তোমার এ অশ্রুর কারণ?

ওথেলো। হায়! আজ যদি ঈশ্বর আমাকে অনন্ত দুঃখের মাঝে ফেলিয়া দিতেন; আজ যদি শত লোকের নিন্দাবাদ, শত প্রকার আপদ্‌-বিপদ আমার মাথায় পড়িত; দারিদ্র্যের কশাঘাতে যদি প্রাণত্যাগ হইত; চিরজীবনের জন্য যদি সকল আশা-ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া বন্দী

হইত্;—তথাপি এ হৃদয়ে এমন স্থান পাইতাম যেখানে এতটুকুও শান্তি মিলিত; এতটুকুর জন্যও প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে পারিতাম। কিন্তু হায়! নিশ্চল মূর্ত্তির-মত দাঁড়াইয়া থাকিব; কাল, অঙ্গুলি বাড়াইয়া, ঘৃণাভরে আমার পানে চাহিবে,—তাহাও সহ্য করিতে পারিতাম! সে কথা যাক্!—কিন্তু যে উদ্যানে এ হৃদয়-তরু রোপণ করিয়াছি; যেখানে থাকিয়া হৃদয়ের স্ফুর্ত্তি বা পরিণতি হইবে, আশা করিয়াছি; যে স্রোতস্বতীতে এ জীবন-প্রবাহ ছুটিয়াছে,—সেখান হইতে, প্রাণের চির-আকাঙ্ক্ষা, সে পবিত্র হৃদয় হইতে দূরীভূত, চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত! সে হৃদয়ে পাপের আসন!—চঞ্চল হইও না, মুখ বিবর্ণ করিও না; পার, নরকের ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তিতে চাহিয়া দেখ!

দেস্। স্বামিন্! আমার প্রতি তোমার ঐ অবিশ্বাস, ইহাই আমি জানি।

ওথেলো। কি বলিব দেস্‌দিমন্! যদি তুমি জন্মগ্রহণ না করিতে, বুঝি ছিল ভাল!

দেস্। হায়, কি পাপ করিয়াছি, বুঝিতে ত পারিতেছি না!

ওথেলো। কি পাপ করিয়াছ? কেমন করিয়া বলিব? ঈশ্বরও কর্ণ আচ্ছাদন করিবেন! চন্দ্র মলিন হইবে! বাতাস, যখনই যাহা পায়, তাহাতেই চুম্বন করে; কিন্তু সে কথা শুনিলে, পৃথিবীগর্ভে বাতাসও লুকাইয়া পড়িবে! দ্বিচারিণি! কি পাপ করিয়াছ, জিজ্ঞাসা কর?

দেস্। ঈশ্বর জানিতেছেন, তুমি মিথ্যা অপবাদ দিতেছ।

ওথেলো। তুমি অবিশ্বাসিনী নহ?

দেস্। যদি এ হৃদয়ে তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকে স্থান না দিয়া, পাপের স্পর্শ হইতে এ হৃদয় যত্নে রক্ষা করিয়া, অবিশ্বাসিনী হইতে না হয়, তবে স্বামিন্! আমি অবিশ্বাসিনী নহি!

ওথেলো। কি, তুমি দ্বিচারিণী নহ?

দেস্। না।

ওথেলো। আমি তোমায় বিশ্বাস করি না। তুমি অবিশ্বাসিনী, তুমি দ্বিচারিণী, তুমি নরক!—

ওথেলোর মুখে আর কথা ফুটিল না। একটা বিকট নিশ্বাস ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

---

(১৮)

এইবার এমিলিয়া তথায় প্রবেশ করিল। সরলা দেস্‌দিমনা এমিলিয়াকে বড় ভালবাসিতেন। তাহাকে মনের কথা কহিতেন। এমিলিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল, "ঠাকুরাণি! এখন কেমন?"

দেস্। সত্য বলিতেছি, আমি অর্দ্ধনিদ্রিত!

এমিলিয়া। প্রভুর অবস্থা এখন কিরূপ?

দেস্। কাহার?

এমি। কেন, আমার প্রভুর?

দেস্। কে তোমার প্রভু?

এমি। কেন ঠাকুরাণি, যিনি তোমার জীবন-সর্ব্বস্ব, তিনিই ত আমার প্রভু!

গভীর দুঃখে মুখখানি কাঁদ-কাঁদ করিয়া দেস্‌দিমনা কহিলেন, "না এমিলিয়া, আমার কেহ নাই। আমাকে কোন কথা বলিও না। হায়! আমি কাঁদিতেও পারিতেছি না। কিছু উত্তর দিতেও পারিব না। একটী মিনতি করি;—এমিলিয়া, আজ রাত্রে, আমার শয্যায়, সেই বিবাহকালীন পরিচ্ছদগুলি রাখিয়া দিও। দেখিও, ভুলিও না।

এমিলিয়া প্রভু-পত্নীর মনোভাব কিছু বুঝিতে না পারিয়া, কোন কথা বলিতে সাহস না করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অতঃপর দেস্‌দিমনা মনে মনে কি ভাবিয়া

কহিলেন, "আমি যে এইরূপ ব্যবহার পাইব, ইহা ঠিক—খুবই ঠিক।"

---

(১৯)

অ-হ-হ! আজ বড় সর্ব্বনাশের দিন! সয়তান ইয়াগোর পাপ-অভিসন্ধি আজ কার্য্যে পরিণত হইবে। যে বিষের আগুনে মহাপ্রেমিক ওথেলো জ্বলিয়া-পুড়িয়া খাক হইতেছেন, আজ চিরদিনের মত সেই আগুন নির্ব্বাণ হইবে।

কাল রাত্রি। ওথেলো, ইতি মধ্যে একবার দেস্‌দিমনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। সহধর্ম্মিণীকে অনুমতি করিয়া গিয়াছেন, "রাত্রি হইয়াছে, তুমি গিয়া শয়ন কর। আমিও শীঘ্রই সেখানে যাইতেছি। কিন্তু সে গৃহে দাস-দাসী কেহ যেন না থাকে।"

অভাগিনী দেস্‌দিমনা, মনে কত-কি বিষয় ভাবিতেছেন, এমন সময় সহচরী এমিলিয়া তথায় উপস্থিত হইল। এমিলিয়া প্রভু-পত্নীর সুখ-দুঃখে সমভাগিনী। ব্যথিত-হৃদয়ে কহিল, "ঠাকুরাণি, এখন কেমন দেখিলে? বোধ হয় যেন পূর্ব্বের অপেক্ষা অনেকটা নরম।"

দেস্। তিনি এখনই আমাকে শয়ন-গৃহে যাইতে বলিয়া গেলেন। আরও বলিয়া গেলেন, তুমি কি আর-কেহ সেখানে থাকিতে পাইবে না।

এমিলিয়া কিছু বিস্মিত ভাবে কহিল, "আমি থাকিতে পাইব না?"

দেস্। না এমিলিয়া, তাঁহার আজ্ঞা এইরূপ। আমার শয়ন-পরিচ্ছদ দাও। এখন তিনি যেরূপ বলিয়া গেলেন, সেই মত কাজ করি। বিদায় দাও।

এমিলি। আমার মনে হয়, তুমি যদি কখন তাঁহাকে না দেখিতে!

দেস্। না এমিলি, এমন কথা বলিও না।—দাও, এই পরিচ্ছদগুলি খুলিয়া দাও।—তিনি যতই রাগ করুন, যতই ভীষণ মূর্ত্তিতে আমার সম্মুখে দাঁড়ান, তবু এমিলি, তাঁহার সে মূর্ত্তিতেও আমি নূতন সৌন্দর্য্য দেখি!

এমিলি। তোমার আজ্ঞামত, সে পরিচ্ছদ-গুলি, তোমার শয্যায় রাখিয়া দিয়াছি।

দেস্। হায়, আমাদের মন কেমন খারাপ! দেখ এমিলি, যদি আমি তোমার অগ্রে মরি, তবে আমার এই অনুরোধ, তুমি সেই পরিচ্ছদে আমার দেহ আবৃত করিয়া দিও।

এমিলিয়া চলিয়া গেল; দেস্‌দিমনাও শয্যাগারে প্রবেশ করিলেন।

---

(২০)

এইবার বড় ভীষণ দৃশ্য! পাপিষ্ঠ ইয়াগো যে বিষের সৃষ্টি করিয়াছিল, এইবার তাহা পূর্ণ-প্রকোপে আপন আধিপত্য বিস্তার করিল। অ-হ-হ! নিষ্ঠুর ভবিতব্য!

কাল-রাত্রি। পালঙ্কোপরি দেস্‌দিমনা নিদ্রিতা। দীপাধারে দীপ জ্বলিতেছে। অকস্মাৎ উদ্‌ভ্রান্তবেশে, সংহার-মূর্ত্তিতে ওথেলো তথায় উপস্থিত হইলেন। হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া মর্ম্মপীড়িত ওথেলো কহিতে লাগিলেন,—"ইহাই কারণ বটে; কিন্তু সে কথা বলিব না। হে পুণ্য-নক্ষত্র-মণ্ডলি! সে কথা তোমাদের শুনিয়া কাজ নাই। সে কথা আমি বলিতে পারিব না। ইহাই কারণ বটে।—কিন্তু তথাপি আমি দেস্‌দিমনার শোণিতপাত করিব না; কিংবা এ তুষার-নিন্দিত দেহ অস্ত্র-চিহ্নিত করিব না। তবু তাহাকে মরিতেই হইবে। কি জানি, আমি যেমন প্রতারিত হইয়াছি, তেমনি, সে, আরও অনেককে প্রতারিত করিতে পারে। অগ্রে আলোক নিবাইয়া দিই এবং তারপর,—আগে আলোক নিবাইয়া দিই। বর্ত্তিকালোক! যদি তোমাকে নিবাইয়া দিই,

হইতে আবার তোমাতে আলোক সঞ্চার করিতে পারি; কিন্তু—কিন্তু স্বভাব-সুন্দরীর অপূর্ব্বসৃষ্টি,—তুমি দেস্‌দিমন্‌!—আমি জানি না, সে আগুন কোথায় পাইব, যাহাতে তোমার নির্ব্বাণ-জীবনে পুনর্ব্বার আলোক সঞ্চার করিতে সমর্থ হইব। যখন তোমাকে বৃন্তচ্যুত করিব, আর তোমায় জীবন দিতে পারিব না,—তোমায় শুকাইতেই হইবে।—বৃক্ষে থাকিতে-থাকিতে একবার তোমার আঘ্রাণ লই।"

(দেস্‌দিমনার মুখ-চুম্বন)

কি অমৃত—কি মদিরা!—এত সুধা! ন্যায়ের দণ্ড চূর্ণীকৃত করিতে ইচ্ছা হয়!—আর একবার, আর একবার।—(মুখ-চুম্বন) অগ্রে তোমায় মারিয়া ফেলি, তারপর তোমায় ভালবাসিব। আর একবার এবং ইহাই শেষ। (মুখ-চুম্বন) আ-হা-হা! এত মধুর হইয়াও এত ভীষণ হইল! আমি কাঁদিব, অবশ্যই কাঁদিব,—কিন্তু সে অশ্রু বড় নিষ্ঠুর!—দেস্‌দিমনা জাগ্রত হইয়াছে।"

দেস্‌দিমনা। কে তুমি? স্বামিন্‌?—তুমি?

ওথেলো। হাঁ, দেস্‌দিমনা।

দেস্। তুমি কি শয়ন করিবে?

ওথেলো। দেস্‌দিমন্‌, তুমি আজ রাত্রে উপাসনা করিয়াছিলে?

দেস্। স্বামিন্‌! করিয়াছিলাম।

ওথেলো। যদি তুমি কোন পাপ করিয়া থাক, এবং সে জন্য ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া না থাক, তবে এই অবসর,—এই সময় তাহা করিয়া লও।

দেস্। স্বামিন্‌! তুমি এ কি কথা বলিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না।

ওথেলো। যাহা বলিলাম, সত্বর করিয়া লও, ততক্ষণ আমি বেড়াইতেছি। তুমি যদি পাপের জন্য অনুতাপ করিয়া না থাক, তোমার সেরূপ জীবন আমি নষ্ট করিব না। ঈশ্বর করুন, তোমার তেমন জীবন যেন আমার নষ্ট করিতে না হয়। তুমি প্রার্থনা করিয়া লও।

দেস্। তুমি কি আমায় মারিয়া ফেলিবে?

ওথেলো। হাঁ।

দেস্। ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন।

ওথেলো। আমিও অন্তরের সহিত বলি, ঈশ্বর তোমায় রক্ষা করুন।

দেস্। যদি তুমি এরূপ বলিলে, তবে আমি আশা করিতে পারি, আমায় হত্যা করিবে না!

ওথেলো। উঁ হুঁ!

দেস্। কি জানি, তবু আমার ভয় হইতেছে। যখন তোমার চক্ষু দুটী এমনিতর ঘুরিতে থাকে, তখনি তোমায় ভীষণ দেখায়! কেন বা ভয় করি, তাহা জানি না। কারণ, আমি যে কি পাপ করিয়াছি, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু তবুও আমার ভয় হইতেছে।

ওথেলো। পাপের কথা এখনও ভাব!

দেস্। তোমায় ভালবাসি, ইহাই যদি পাপ হয় এবং এই পাপেই যদি মরিতে হয়, তবে সে মৃত্যু নিতান্তই অস্বাভাবিক।—দেখিতেছি, তুমি ওষ্ঠাধর দংশন করিতেছ, কেন এমন? নিশ্চয়ই কোন ভীষণ ভাব তোমায় এরূপ উত্তেজিত করিতেছে। আমার আতঙ্ক হইতেছে। কিন্তু তবু—তবু আমি আশা করি, আমার কোন ভয় নাই।

ওথেলো। চুপ কর।

দেস্। চুপ করিলাম। কিন্তু বল, হইয়াছে কি?

ওথেলো। সেই রুমালখানা,—যাহা আমি অত্যন্ত ভালবাসিতাম ও তোমায় দিয়াছিলাম, তুমি সেখানা ক্যাসিওকে দিয়াছ!

দেস্। না,—আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, না, ক্যাসিওকে দিই নাই। তাহাকে বরং ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা কর।

ওথেলো। সুচরিতে! সাবধান! তুমি মৃত্যু-শয্যায় আছ, মিথ্যা বলিও না!

দেস্। মৃত্যু-শয্যায় আছি, কিন্তু এখনই কিছু মরিব না।

ওথেলো। হাঁ, এখনই। অতএব পরিষ্কার রূপে, সত্য করিয়া, পাপ স্বীকার কর; কিছু লুকাইও না। তোমায় এখনই মরিতে হইবে।

দেস্। তবে ঈশ্বর আমায় রক্ষা করুন।

ওথেলো। তাহাই হউক।

দেস্। এবং তুমিও আমায় অনুগ্রহ কর।—আমি আমার জীবনে কখনও তোমার কাছে কোন দোষ করি নাই, ক্যাসিওকে কখন তোমার মত ভালবাসি নাই, কিংবা কখনও কোন প্রেম-উপহার দিই নাই।

ওথেলো। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, ক্যাসিওর হস্তে সেই রুমাল দেখিয়াছি। মিথ্যা-বাদিনি, সে কথা অস্বীকার কর?

দেস্। হয় ত বা কোন রকমে সে তাহা পাইয়া থাকিবে, আমি দিই নাই।—এখানে তাহাকে ডাকাও, সে সত্য স্বীকার করুক।

ওথেলো। সে স্বীকার করিয়াছে।

দেস্। কি স্বীকার করিয়াছে?

ওথেলো। স্বীকার করিয়াছে, তুমি তৎ-কর্ত্তৃক উপভুক্তা হইয়াছ।

দেস্। সে কখনই এরূপ বলিবে না।

ওথেলো। না,—বলিবার সামর্থ্যও তাহার আর নাই।—সাধু ইয়াগো সেরূপ করিবার ভারও পাইয়াছে।

দেস্। কি, ক্যাসিও আর নাই?

ওথেলো। তাহার মাথায় যত চুল, যদি তত অধিক তাহার জীবন হইত, তবে ওথেলোর প্রতিহিংসা-গর্ভে সে সকলই বিনষ্ট হইত।

দেস্। হায়, ক্যাসিও প্রতারিত হইয়া প্রাণ হারাইল, আমিও মজিলাম!

ওথেলো। দূর হ' দুশ্চারিণি! আমারই সম্মুখে তাহার জন্য কাঁদিতেছিস্?

দেস্। হায়, আমায় নির্ব্বাসন কর; কিন্তু স্বামিন্! প্রাণে মারিও না।

ওথেলো। চুপ কর, দুশ্চারিণি!

দেস্। কা'ল আমায় মারিও, আজিকার রাত্রিটুকু বাঁচিতে দাও।

ওথেলো। চুপ,—যদি এমন করিবে,—"

দেস্। অর্দ্ধ ঘণ্টামাত্র অপেক্ষা কর।

ওথেলো। না,—যখন প্রস্তুত হইয়াছি, আর বিলম্ব না।

দেস্। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না একটী প্রার্থনা করি!

ওথেলো। না,—তাহারও আর সময় নাই!

(সবলে চাপিয়া ধরণ)

এমিলিয়া। (গৃহান্তর হইতে)—প্রভু! প্রভু!

ওথেলো। এ কিসের গোলযোগ?—এখনও মরে নাই? এতদূর নিষ্ঠুর হইয়াছি, এখনও আমার আবার দয়া? না,—এ যন্ত্রণা তোমায় অধিকক্ষণ ভোগ করিতে দিব না।

(আরও চাপিয়া ধরণ)

এমিলিয়া। (পুনর্ব্বার) প্রভু! প্রভু!

ওথেলো। কে তুমি?

এমিলিয়া। প্রভু! আমি! আমি একটা কথা বলিতে আসিয়াছি।

ওথেলো। হাঁ, দেখিতেছি এমিলিয়া;—দেস্দিমনা মরিয়াছে,—দেখিতেছি এমিলিয়া, ক্যাসিওর মৃত্যু-সংবাদ আনিয়াছে।—গোল-মালটা খুব হইয়াছিল বটে।—হাঁ! একটুকুও আর নড়িতেছে না। একেবারে নিস্তব্ধ!—এমি-লিয়া কি এ ঘরে আসিবে? আসিতে দেওয়া কি উচিত? যদি তাহাকে আসিতে দিই, সে আসিয়াই আমার স্ত্রীর সহিত কথা কহিবে। আমার স্ত্রী! আমার স্ত্রী! আমার আবার স্ত্রী!

কেথ্রু আমার স্ত্রী নাই! ওঃ, অসহ্য! কি ভয়ানক মুহূর্ত্ত!!

এমিলিয়া। (পূর্ব্ববৎ গৃহান্তর হইতে) প্রভু, প্রার্থনা করিতেছি, একটী কথা বলিব।

ওথেলো। ওঃ, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এস, কি সংবাদ বল।

(দ্বার খুলিয়া দেওন, এমিলিয়ার প্রবেশ)

এমিলিয়া। প্রভু, এইমাত্র একটা ভীষণ হত্যাকাণ্ড ঘটিল।

ওথেলো। কে? ক্যাসিও হত হইয়াছে?

এমিলি। না, ক্যাসিও অন্য একজনকে হত্যা করিয়াছে।

ওথেলো। দেখিতেছি, হত্যাকাণ্ড বিপরীত হইয়াছে, পুনর্ব্বার প্রতিহিংসার আগুন জ্বলিবে!

দেস্। ওঃ! নিরপরাধে হত্যা!

এমিলি। একি! এ কা'র শব্দ শুনি?

ওথেলো। শব্দ? কৈ,—কা'র?

এমিলি। এ যে আমার ঠাকুরাণীর স্বর! কে কোথায় আছ, শীঘ্র এস! ঠাকুরাণি! স্নেহময়ী দেস্‌দিমনা! ঠাকুরাণি! কথা কও, আর একটীবার কথা কও!

দেস্। নিরপরাধে আমি মরিলাম!

এমিলি। হায়, কে এ সর্ব্বনাশ করিল?

দেস্। কেহ নয়,—আমি নিজে। বিদায়!—আমার স্নেহময় স্বামীকে বলিও।—বিদায়! (মৃত্যু)

ওথেলো। কে উহাকে হত্যা করিবে?

এমিলি। হায়, কে জানে কে?

ওথেলো। তুমি ত শুনিলে, সে আত্মহত্যা করিয়াছে, আমি তাহাকে বধ করি নাই।

এমিলি। তিনি এইরূপ বলিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহা কি সত্য?

ওথেলো। সে মিথ্যাবাদিনী, জলন্ত নরকে গিয়াছে,—আমিই তাহাকে হত্যা করিয়াছি!

এমিলি। তিনি দেবী,—তুমি নরাধম!

ওথেলো। সে পাপের পথে গিয়াছিল, দুশ্চারিণী হইয়াছিল।

এমিলি। তুমি মিথ্যাবাদী, নরাধম!

ওথেলো। সে বিশ্বাসঘাতিনী!

এমিলি। এরূপ বলিতে মুখে বাধিল না?—তিনি স্বর্গের দেবী!

ওথেলো। ক্যাসিওর নিকট সে দেহ ও রূপ বিক্রয় করিয়াছিল, তোমার স্বামীকে বরং জিজ্ঞাসা কর। ন্যায়তঃই তাহাকে দণ্ড দিবার জন্য, আমি এই ভীষণ কার্য্য করিয়াছি। তোমার স্বামী এ সমস্তই জানে।

এমিলি। আমার স্বামী?

ওথেলো। তোমার স্বামী।

এমিলি। আমার স্বামী বলিয়াছে যে, তিনি চরিত্রহীনা?

ওথেলো। হাঁ; ক্যাসিওকে সে অবৈধ ভালবাসা দিয়াছিল। যদি সে ভাল হইত, সুচরিত্রা হইত, পৃথিবী বুঝি আমার স্বর্গ হইত! এ ভীষণ পরিণামও ঘটিত না।

এমিলি। আমারই স্বামী বলিয়াছে?

ওথেলো। তোমারই স্বামী আমাকে সর্ব্বপ্রথমে ইহা বলিয়াছে। তোমার স্বামী অতি সচ্চরিত্র, পাপে তাহার অত্যন্ত ঘৃণা।

এমিলি। আমারই স্বামী বলিয়াছে?

ওথেলো। বার বার এরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? আমি ত বলিতেছি, তোমারই স্বামী বলিয়াছে!

এমিলি। হায়, ঠাকুরাণি! তোমার অতুল প্রেমের উপর দুষ্টের উপহাস!—আমার স্বামী বলিল, ঠাকুরাণী আমার দুশ্চরিত্রা?

ওথেলো। তোমারই স্বামী বলিয়াছে! বুঝিলে কি? আমার প্রিয়বন্ধু, তোমার স্বামী, সাধু ইয়াগো বলিয়াছে:—বুঝিলে কি?

এমিলি। যদি আমার স্বামী এরূপ বলিয়া

থাকে, তবে সে অত্যন্ত মিথ্যা বলিয়াছে; সে যেন ইহার সমুচিত প্রতিফল পায়। হায় ঠাকুরাণি! কি মূর্খের প্রতিই তোমার ভালবাসা ছিল!

ওথেলো। কি!—

এমিলি। যাহা পার, কর; তুমি কখনই দেসদিমনার উপযুক্ত নহ!

ওথেলো। চুপ কর।—তুমি আগে এরূপ ছিলে না।

এমিলি। তুমি আমার কি করিবে? তোমার কোন সাধ্য নাই। মূর্খ, নিষ্ঠুর, ক্রূর তুমি! কি করিয়াছ, দেখ দেখি!—আমি তোমার ও তরবারির ভয় করি না;—ডাকিব, এ দারুণ হত্যাকাণ্ড সকলকে বলিব!—কে আছ, শীঘ্র এস! হত্যা! হত্যা! হত্যা! 'মুর' আমার ঠাকুরাণীকে হত্যা করিয়াছে।

(ইয়াগোর সহিত অন্যান্যের প্রবেশ)

এমিলি। ইয়াগো! আসিয়াছ? তুমি খুব ভাল কাজই করিয়াছ! লোকে এ হত্যাকাণ্ড তোমারই ঘাড়ে চাপাইবে।

অন্যান্য সকলে। ব্যাপার কি? হইয়াছে কি?

এমিলি। (ইয়াগোর প্রতি) যদি মানুষ হও, তবে এই হতভাগ্যকে সব বুঝাইয়া দাও। এ বলিতেছে, তুমিই নাকি ইহাকে বলিয়াছ, ইহার স্ত্রী দুশ্চরিত্রা ছিলেন! তুমি এরূপ বলিয়াছ, আমি বিশ্বাস করি না। তুমি এমন চণ্ডাল হইতে পার না!

ইয়াগো। আমার যেরূপ মনে হইয়াছিল, সেইরূপই বলিয়াছিলাম, তার বেশী কিছু বলি নাই।

এমিলি। কিন্তু তুমি কি কখন বলিয়াছ যে, তিনি দুশ্চরিত্রা ছিলেন?

ইয়াগো। হাঁ, বলিয়াছি।

এমিলি। তুমি মিথ্যা বলিয়াছ,—দারুণ মিথ্যা,—ভয়ানক মিথ্যা বলিয়াছ! ক্যাসিওর সহিত তিনি দুশ্চরিত্রা! বলিয়াছ কি, ক্যাসিওর সহিত তিনি দুশ্চরিত্রা?

ইয়াগো। হাঁ, ক্যাসিওর সহিত। যাও, চুপ কর; এমন করিয়া কথা কহিও না।

এমিলি। না,—চুপ করিব না, আমি নিশ্চয়ই বলিব। আমার ঠাকুরাণী এখানে হত হইয়া পড়িয়া আছেন।

সকলে। ঈশ্বর রক্ষা করুন।

এমিলি। তোমারই কথায় এই হত্যা ঘটিয়াছে!

ওথেলো। আপনারা চমকিত হইবেন না, ইহা সত্য।

সকলে। এ যে দারুণ সত্য! ভীষণ কার্য্য!

এমিলি। কি পাপ! ক প্রতারণা! কি দুষ্ট-অভিসন্ধি। কি পাপ!—আমি তখনই বুঝিয়াছিলাম!—ওঃ! আমি এ দারুণ দুঃখে আত্মহত্যা করিব! পাপ! পাপ! সয়তানি! চণ্ডালতা!!

ইয়াগো। একি! তুমি পাগল হইয়াছ নাকি? যাও, আমি বলিতেছি, গৃহে যাও।

এমিলি। মহাশয়গণ! আমায় বলিতে অনুমতি দিন। ইয়াগোর কথা শুনিতে আমি বাধ্য, কিন্তু এখন নহে,—হয়ত—হয়ত ইয়াগো আর আমি গৃহে ফিরিব না!

ওথেলো। ওঃ! ওঃ! ওঃ!

(শয্যায় পতন)

এমিলি। থাক, ঐ খানেই শয়ন করিয়া থাক! আর উঠিও না! মর্ম্মভেদী চীৎকার করিতে থাক! কি অপার্থিব রত্নই তুমি নষ্ট করিলে!

ওথেলো। (উঠিয়া) না,—সে মিথ্যাবাদিনী সে দুশ্চরিত্রা! এ দৃশ্য বড় করুণ বটে, কিন্তু ইয়াগো সমস্তই জানে। জানে যে, ক্যাসিও

সহিত সহস্রবার কি দারুণ লজ্জাকর ব্যাপার ঘটিয়াছে! ক্যাসিও-ও তাহা স্বীকার করিয়াছে। আবার প্রথম প্রণয়-উপহার আমি তাহাকে যাহা দিয়াছিলাম, সে তাহা ক্যাসিওকে দিয়াছিল। আমি স্বচক্ষে সেই রুমাল ক্যাসিওর হস্তে দেখিয়াছি।

এমিলি। হে ঈশ্বর! হে দেবতাগণ!

ইয়াগো। চুপ কর।

এমিলি। ইহা প্রকাশ হইবে, হইবে, হইবে! আমি চুপ করিব? না, কখনই না! স্বর্গ, মর্ত্ত্য সকলেই আমাকে ধিক্কার দিক্, তবু আমি বলিব।

ইয়াগো। কথা শোন, চুপ কর, গৃহে যাও।

এমিলি। না, নিশ্চয়ই না।

(ইয়াগো, এমিলিয়াকে হত্যা করিতে উদ্যত)

সকলে। ধিক্! স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ!

এমিলি। মূর্খ মূর! যে রুমালের কথা বলিতেছ, তাহা দৈবক্রমে আমিই পাই, পাইয়া আমার স্বামীকে দিয়াছিলাম। কারণ সে কতবার কাতরতার সহিত আমায় অনুরোধ করিত যে, আমি দেস্‌দিমনার অসাক্ষাতে তাহা চুরি করিয়া লই!

ইয়াগো। মিথ্যাবাদিনি! দুশ্চরিত্রে!—

এমিলি। ঠাকুরাণী ক্যাসিওকে দিয়াছেন?—না! আমিই তাহা পাইয়া আমার স্বামীকে দিয়াছিলাম!

ইয়াগো। তুই মিথ্যা বলিতেছিস্!

এমিলি। (ওথেলোর প্রতি) শপথ করিয়া বলিতেছি, না,—মিথ্যা নহে!—হতভাগ্য স্ত্রীঘাতক! তেমন পুণ্যবতী ভার্য্যা লইয়া তুই কি করিবি? "তুই শূকর, রত্ন চিনিবি কেন?"

(ইয়াগোর, এমিলিয়াকে হত্যা করিয়া পলায়ন)

ওথেলো। আকাশে কি বজ্র নাই? রে চণ্ডাল!—

এমিলি। আমি মরি। তোমরা আমায় ঠাকুরাণীর পার্শ্বে রাখিয়া দাও।

অন্যান্যের মধ্যে একজন অপরের প্রতি।—ওথেলোর অস্ত্র আমি লইয়াছি। এই লও; তোমারই নিকট রাখিয়া দাও। দ্বার বন্ধ করিয়া রাখ। কোনক্রমে যেন এ হতভাগ্য পলায়ন না করে। পার, মারিয়া ফেলিও। আমি সেই হতভাগ্যকে ধরিয়া আনি। (প্রস্থান)

এমিলি। ঠাকুরাণি! একটীবার কথা কও। আর কি কথা কহিবে না? আমিও চলিলাম। মূর! ঠাকুরাণী-আমার সতী সাধ্বী! প্রাণের সমান তোমায় ভাল বাসিতেন! আমি যাই—যাই!! (মৃত্যু)

ওথেলো। দেখ, আমি অস্ত্রশূন্য নহি।—বাধা দিতে আসিও না,—বৃথা চেষ্টা, এমন দিনও আমার গিয়াছে, যে দিন এই ক্ষুদ্র বাহু, এই অস্ত্র লইয়া, তোমার মত এমনি শত-গুণ-অধিক বাধা-বিঘ্নের মধ্যে আপনার পথ পরিষ্কার করিয়া লইয়াছে।—কিন্তু হায়, সে অহঙ্কার এখন বৃথা! নিয়তি-ই সর্ব্বত্র বলবতী!—এখন আমার আর সে দিন নাই।—তোমার ভয় নাই, এ অস্ত্র তোমার বিরুদ্ধে ধারণ করি নাই। এখানেই আমার জীবন-নাটকের শেষ দৃশ্য! এখানেই আমার পর্য্যটনের শেষ!—ভয় কি? ওথেলোর বিরুদ্ধে মনুষ্য তৃণমাত্র!—ওথেলো এখন কোথায় যাইবে?—মন্দভাগিনি! তোমায় এখন কেমন দেখাইতেছে! কি মলিন! তোমার এ দৃষ্টির পানে আর চাহিতে পারি না! কি শীতল তোমার দেহ!—আর দেখিতে পারি না!—তবু এ দৃশ্য স্বর্গীয়!—আমি ইহা দেখিবার কে? প্রেতগণ! আয় তোরা, মার্, মার্, কশাঘাত কর্;—এ হতভাগ্যকে এ স্বর্গের ছবি আর দেখিতে দিস্‌নে! ঘূর্ণ-বাতাসে, দে, আমাকে

উড়াইয়া দে! আগুনে আমায় পোড়াইয়া মার! তরল অগ্নি-সমুদ্রে, দে, আমায় ডুবাইয়া দে! ওঃ! দেস্‌দিমন্! জীবন-সর্ব্বস্ব! দেস্‌দিমন্! দেস্‌দিমন্ আর নাই! ওঃ!!

(অন্যান্য সকলের, ইয়াগোকে বন্দী করিয়া লইয়া ও ক্যাসিওকে চেয়ারে বসাইয়া লইয়া প্রবেশ)

অন্যান্যের একজন। সে হতভাগ্য কোথায়?

ওথেলো। তুমি যার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, সে ওথেলো;—এখানে আমি।

আর একজন। ক্রূর সর্প হইতেও ভীষণ—সে পাপিষ্ঠ ইয়াগোকে এখানে আন।

ওথেলো। আমি উহার মুখের পানে চাহিতে পারিব না, পায়ের দিকে দেখিতেছি।—কিন্তু সে সব রূপকথা বলিয়া মনে হইতেছে। (ইয়াগোর প্রতি) যদি তুমি যথার্থই প্রেত হও, আমি তোমায় মারিতে পারিব না।

(ইয়াগোকে আঘাত)

আর একজন। উহার অস্ত্র কাড়িয়া লও।

ইয়াগো। আমার শোণিতপাত হইয়াছে মাত্র, আহত হই নাই।

ওথেলো। সে জন্য আমি দুঃখিত নহি। আমি ইচ্ছা করি, তুমি বাঁচিয়াই থাক; আমার মনে হয়, মরণেই সুখ!

আর একজন। ওথেলো, তোমার গুণ-গরিমা আমাদের কিছুই অবিদিত নাই;—তুমি তেমন হইয়াও এ পাপের সংস্পর্শে এমন হইয়া গেলে! আমরা তোমায় কি বলিব?

ওথেলো। কেন?—যাহা ইচ্ছা বলিতে পার। বলিও, দেস্‌দিমনাকে হত্যা করিয়াছি। কিন্তু ঘৃণায় করি নাই, তাহাও সম্মানের সহিত করিয়াছি!

আর একজন। তুমি কি ক্যাসিওকে মারিবার জন্য, ইয়াগোকে অনুমতি দিয়াছিলে?

ওথেলো। হাঁ!

ক্যাসিও। প্রভু, দাসের কি অপরাধ

ওথেলো। সে ভ্রম ঘুচিয়াছে; তুমি আমায় ক্ষমা কর। কিন্তু ক্যাসিও, তুমি ঐ সয়তানকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, এমন করিয়া, ও, আমার এ দেহ ও মন কেন মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল?

ইয়াগো। আমায় আর কিছু জিজ্ঞাসা করিও না। তুমি যাহা জান, তাহা জান; এখন হইতে আমি আর কোন কথা কহিব না।

অন্যান্য। (ইয়াগোকে লক্ষ্য করিয়া) আমরা সমস্ত বুঝিয়াছি —এই সমস্ত অনর্থের মূল—এই হতভাগ্য মহাপাপী। এও প্রায় সকলই স্বীকার করিয়াছে, কতক এর চিঠি-পত্র পড়িয়াও আমরা অবগত হইয়াছি।

ওথেলো। ক্যাসিও, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি;—রুমালখানা তোমার হস্তগত হইয়াছিল কিরূপে?

ক্যাসিও। আমি তাহা আমার গৃহেই পাইয়াছিলাম। ইতিপূর্ব্বে ইয়াগো নিজেই স্বীকার করিয়াছে, কোন বিশেষ কারণে, সে, তাহা আমার গৃহমধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিল।

ওথেলো। ওঃ! আমি কি মূর্খ!

অন্যান্য। ওথেলো, এ দেশ হইতে তোমার ক্ষমতা আমরা লইয়াছি। ক্যাসিও এখন সাইপ্রসের শাসন-কর্ত্তা। এই সয়তান ইয়াগোর জন্য পৃথিবীতে যে কিছু অতি ভীষণ, অতি কঠিন, অতি কঠোর শাস্তি থাকে, তাহা বিহিত হইবে। আর ওথেলো, যে পর্য্যন্ত না তোমার সমস্ত দোষ ভেনিস্‌-দরবারে বিচার হয়, সে পর্য্যন্ত তুমি বন্দী থাকিবে।—এস।

ওথেলো। বিলম্ব কর; একটা কিংবা দু'টা কথা বলিবার আছে। ভেনিসের জন্য আমি যে কিছু করিয়াছি, ভেনিসে তাহা অবিদিত নাই।—কিন্তু থাক্, সে কথা আর তুলিব না।—কিন্তু যখন তোমরা চিঠি-পত্রে এই সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিবে, আমার অনুরোধ,

সয়তানের সর্ব্বনাশ-সাধন।



আমায় যেমন দেখিতেছ, ঠিক এমনই আমার কথা লিখিও। কিছু বাড়াইও না, বা কমাইও না, কিংবা হিংসা বা দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া কিছু লিখিও না। লোকের কাছে বলিও, ওথেলো বড়—বড় ভালবাসিত! সে ভালবাসা বড় গভীর।—সে ভালবাসা বুদ্ধিমানের ভালবাসা নহে, হৃদয়বানের ভালবাসা! ওথেলো, একদিন নহে, কিন্তু দিন দিন, মুহূর্ত্ত মুহূর্ত্তে, সয়তানের—চণ্ডালের উত্তেজনায়, অবিশ্বাস ও সন্দেহকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিল! বলিও,—অসভ্য, বর্ব্বর, যেমন রত্ন না চিনিয়া, দুই হাতে করিয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করে, ওথেলোও তেমনি না চিনিয়া, না বুঝিয়া, সে অমূল্যরত্ন হেলায় নিক্ষেপ করিয়াছে! বলিও, হতভাগ্যের চক্ষু হইতে অজস্রধারে অশ্রু প্রবাহিত হইয়াছে! এই সব ঠিক করিয়া লিখিও বা বলিও। আর বলিও যে, হতভাগ্য এত ভালবাসা দিয়া, সেই অপূর্ব্ব সুন্দরীকে, সেই প্রাণের প্রতিমাকে হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল;—তাহাকে হত্যা করিয়া প্রাণের জ্বালা জুড়াইতে, ইহা ব্যতীত আর কিছু পাইল না!—

(অস্ত্রাঘাতে আত্মহত্যা)

সকলে। কি সর্ব্বনাশ!

ওথেলো। (মৃত দেস্‌দিমনার প্রতি) তোমায় মারিবার পূর্ব্বে, তোমার মুখ-চুম্বন করিয়াছিলাম, এখনও আর কিছু নয়,—চুম্বন করিয়াই মরি!

(দেস্‌দিমনার দেহোপরি পতন ও মৃত্যু)

ক্যাসিও। ইরূপ হইবে, আমিও আশঙ্কা করিয়াছিলাম, কিন্তু ভাবিয়াছিলাম, উঁহার হস্তে অস্ত্র ছিল না।

অন্যান্য সকলের একজন ইয়াগোর প্রতি।—সয়তান! পাপ! চণ্ডাল! দেখ, চেয়ে দেখ. এই শয্যার উপর তোর কীর্ত্তি-ধ্বজা! আর দেখা যায় না!—ঢাকিয়া ফেল, ঢাকিয়া ফেল, বস্ত্রাবৃত কর! (ক্যাসিওর প্রতি) আপনি এখন এখানকার শাসন-কর্ত্তা। এ চণ্ডালকে যে শাস্তি বিহিত হয়, আপনিই দিবেন, নিশ্চয় দিবেন। আমি এখন যাই। ভেনিসে ফিরিয়া গিয়া, এ দুঃখময় কাহিনী, দুঃখপূর্ণ-হৃদয়ে প্রকাশ করি!

ওথেলো-দেস্‌দিমনার জীবন-নাটক এইখানেই শেষ হইল।

তারপর,—না, আর না!

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

চাঁদ।

যুগে যুগে কত আঁখি নিমেষ ভুলিয়া,
চাহিত তোমার পানে—চাহিছি যেমন!
সৃষ্টি-যবনিকা যবে খুলিল প্রথম
পূরিত বিস্ময়ে নর তোমারে হেরিয়া;
রণান্তে নিশীথে অভিমন্যু নিরখিয়া
চাহি চাহি কত কথা ভাবিত বিরলে,
ওই জন্মভূমি তার, ওরি সুধাজলে
শিশু-খেলা খেলিত সে সুখে সাঁতারিয়া;
বাউর, সংজ্ঞানহীন সুধারস পানে
য়ুনানী যুবক কত দেখিত স্বপন,—
ভাবিত রমণী তুমি—এত সুধারাশি
কাহার হৃদয়ে আর—ত্যজিয়া গগন
চিরবাস—সুধাময় অধরে সুহাসি
নামিছ চুমিতে তারে কিরণ বিমানে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

পুরাণ-কথা।

যুধিষ্ঠিরের সময়-নিরূপণের জন্য মুখ্যতঃ একবার এবং প্রসঙ্গতঃ একবার চেষ্টা করিয়াছি; কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা সুবিজ্ঞ পাঠকই বলিতে পারেন।

ঐতিহাসিক বিষয় এত জটিল যে, সহজে পরিষ্কৃত করা দুঃসাধ্য। আমার পূর্ব্বে, আমার সমকালে ও আমার পরে অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তি, এই সুপ্রসিদ্ধ এবং অসামান্য সময়ের সুনিশ্চয় করিতে যত্ন করিয়াছেন, আমিও করিয়াছি, কিন্তু ঘোর কাটিবার নহে। সকলেই, অন্ততঃ অনেকেই মনে মনে ভাবিতেছেন এবং ভাবিয়াছেন,—"আমার আবিষ্কার উত্তম, আমার মত যুক্তি-যুক্ত।" কিন্তু হয় ত অপর বিবেচকের অপক্ষপাত-দর্শনে তাহার সারবত্তা তেমন উপলব্ধ হয় না। তাহা হইলেও এ সব বিষয়ের বিশেষ অনুশীলন একান্ত কর্ত্তব্য। অনুশীলন, বিচার, বিতর্ক ব্যতিরেকে এ সব তত্ত্বের মীমাংসা হইতে পারে না। এ সকল অপ্রত্যক্ষ বহু প্রাচীন ঘটনার সময় নিরূপণ করিতে হইলে, পুরাণ-কথায় সবিশেষ মনোযোগী হইতে হয়। সুতরাং আজ আমরা 'পুরাণ-কথা' কহিতে আরম্ভ করিলাম; প্রয়োজন বোধ হইলে, পরেও করিব।

আমরা যথাসাধ্য সপ্রমাণ করিয়াছি, কলির দ্বাদশ শতাব্দীতে যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে—১১৭৫ কলি-গতাব্দে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ। রাজসূয় যজ্ঞের পর বনবাস, তৎপরে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাংশেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ, ইহা আমার অভিমত। কিন্তু আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার সুবিজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শী শ্রীযুত বঙ্কিম বাবু, তাঁহার কৃষ্ণ-চরিত্রে লিখিয়াছেন,—

"যাবৎ পরিক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥
৪।২৪।৩২ *

"নন্দের পুরানাম নন্দ মহাপদ্ম। বিষ্ণুপুরাণে ঐ ৪ অংশের ২৪ অধ্যায়েই আছে,—

"মহাপদ্মঃ তৎপুত্রাশ্চ একবর্ষশতমবনীপতয়ো ভবিষ্যন্তি। নবৈব তান্ নন্দান্ কৌটিল্যো ব্রাহ্মণঃ সমুদ্ধরিষ্যতি। তেষামভাবে মৌর্য্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। কৌটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।

"ইহার অর্থ—মহাপদ্ম এবং তাঁহার পুত্রগণ একশতবর্ষ পৃথিবীপতি হইবেন। কৌটিল্য নামে ব্রাহ্মণ নন্দবংশীয়গণকে উন্মূলিত করিবেন। তাঁহাদের অভাবে মৌর্য্যগণ পৃথিবী ভোগ

* বঙ্কিমবাবু, পূর্ব্বে বলিয়াছেন, এ শ্লোকটি বিষ্ণুপুরাণের। লেখক।

...বেন। কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন।

"তবেই যুধিষ্ঠির হইতে চন্দ্রগুপ্ত ১১১৫ বৎসর। চন্দ্র-গুপ্ত অতি বিখ্যাত সম্রাট্—ইনিই মাকিদনীয় যবন আলেক্জন্দর্ ও সিলিউকস্ নৈকটরের সমসাময়িক। ইনি বাহুবলে মাকিদনীয় যবনদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত করিয়াছিলেন, এবং প্রবলপ্রতাপ সিলিউকস্‌কে পরাভূত করিয়া তাঁহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার মত দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ তখন কেহই পৃথিবীতে ছিলেন না। কথিত আছে, তিনি অকুতোভয়ে আলেক্জন্দরের শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আলেক্জন্দর্ ৩২৫ খৃষ্টাব্দে * ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

"চন্দ্রগুপ্ত ৩১৫ খৃঃ অব্দে রাজ্যপ্রাপ্ত হয়েন। অতএব ঐ ৩১৫ অঙ্কের সহিত উপরিলিখিত ১১১৫ যোগ করিলেই যুধিষ্ঠিরের সময় পাওয়া যাইবে। ৩১৫ + ১১১৫ = ১৪৩০ খৃঃ পূঃ তবে মহাভারতের যুদ্ধের সময়।

"অন্যান্য পুরাণেও ঐরূপ কথা আছে। তবে মৎস্য ও বায়ুপুরাণে ১১১৫ স্থানে ১১৫০ লিখিত আছে। তাহা হইলে ১৪৬৫ পাওয়া যায়।

"কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ যে ইহার বড় বেশি পূর্ব্বে হয় নাই, বরং কিছু পরেই হইয়াছিল, তাহার এক অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। সকল প্রমাণ খণ্ডন করা যায়—গণিত-জ্যোতিষের প্রমাণ খণ্ডন করা যায় না,—'চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ।'"

"সকলেই জানে যে বৎসরের দুইটী দিনে দিবারাত্র সমান হয়। সেই দুইটী দিন একের ছয় মাস পরে আর একটী উপস্থিত হয়। উহাকে বিষুব বলে। আকাশের যে যে স্থানে ঐ দুই দিনে সূর্য্য থাকেন, সেই স্থান দুইটীকে ক্রান্তিপাত বা ক্রান্তিপাত-বিন্দু (Enquinoctial Point) বলে। উহার প্রত্যেকটীর ঠিক ৯০ অংশ (90 degrees) পরে অয়ন পরিবর্ত্তন হয় (Solistice), ঐ ৯০ অংশে উপস্থিত হইলে সূর্য্য দক্ষিণায়ন হইতে উত্তরায়ণে বা উত্তরায়ণ হইতে দক্ষিণায়নে যান।

"মহাভারতে আছে, ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু। তিনি শরশয্যাশায়ী হইলে বলিয়াছিলেন, যে আমি দক্ষিণায়নে মরিব না, (তাহা হইলে সদ্গতির হানি হয়); অতএব শরশয্যায় শুইয়া উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে ভীষ্ম বলিতেছেন,—

"মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।"

"তবে, তখন মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন, এখনও মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হয়, কেন না ১লা মাঘকে উত্তরায়ণ দিন এবং তৎপূর্ব্বদিনকে মকর-সংক্রান্তি বলে। কিন্তু তাহা আর হয় না। যখন অশ্বিনী-নক্ষত্রের প্রথম অংশে ক্রান্তিপাত হইয়াছিল, তখন অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র বলিয়া গণিত হইয়াছিল, তখন আশ্বিন মাসে বৎসর আরম্ভ করা হইত এবং তখনই ১লা মাঘে উত্তরায়ণ হইত। এখনও গণনা সেইরূপ চলিয়া আসিতেছে, এখন ফসলী সন ১লা আশ্বিনে আরম্ভ হয়, কিন্তু এখন আর অশ্বিনী নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত হয় না; এবং এখন ১লা মাঘে পূর্ব্বের মত উত্তরায়ণ হয় না। এখন ৭ই পৌষ বা ৮ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর) উত্তরায়ণ হয়। ইহার কারণ এই যে, ক্রান্তিপাতবিন্দুর একটা গতি আছে, ঐ গতিতে ক্রান্তিপাত, সুতরাং অয়নপরিবর্ত্তনস্থানও, বৎসর বৎসর পিছাইয়া যায়। ইহাই

* আমরা বলিতে বাধ্য, এই সব স্থল ৩২৫ পূঃ পূঃ অব্দ ইত্যাদি হইবে। নচেৎ হিসাবে ও ইতিহাসে অমিল হয়। যাহা হউক, কৃষ্ণচরিত্রের দশপত্রব্যাপিনী ভ্রম-সংশোধনী এ সব স্থলে হস্তক্ষেপ করেন নাই, দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। পুরাণ কথার লেখক মহাশয়ও এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, ইহা হয় লেখকের অজ্ঞতা, না হয় দোকানি। ভাষ্য।

পূর্ব্বকথিত Precession of the Equinoxes—, হিন্দুনাম "অয়নচলন"। কত পিছাইয়া যায়, তাহারও পরিমাণ স্থির আছে। হিন্দুরা বলেন, বৎসরে ৫৪ বিকলা, ইহাও পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সামান্য ভুল আছে। ১৭২ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে হিপার্কস্ নামা গ্রীক্-জ্যোতির্ব্বিদ্ ক্রান্তিপাত হইতে ১৭৪ অংশে চিত্রা-নক্ষত্রকে দেখিয়াছিলেন। মাস্কেলাইন্ ১৮০২ খৃঃ অব্দে চিত্রাকে ২০১ অংশে ৪ কলা ৪ বিকলায় দেখিয়াছিলেন। ইহা হইতে হিসাব করিয়া পাওয়া যায়, ক্রান্তিপাতের বার্ষিক গতি সাড়ে পঞ্চাশ বিকলা। বিখ্যাত ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ Leverrier ঐ গতি অন্য কারণ হইতে ৫০.২৪ বিকলা স্থির করিয়াছেন এবং সর্ব্বশেষে Stockuell গণিয়া ৫০.৪৩৮ বিকলা পাইয়াছেন। এই গণনা প্রথম গণনার সঙ্গে মিলে। অতএব ইহাই গ্রহণ করা যাউক।

"ভীষ্মের মৃত্যুকালেও মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, কিন্তু সৌর-মাঘের কোন্ দিনে তাহা লিখিত নাই। পৌষ মাঘে সচরাচর ২৮ কি ২৯ দিন দেখা যায়। এই দুই মাসে মোটে ৫৭ দিনের বেশী প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু এমন হইতে পারে না, যে তখন মাঘ মাসের শেষ দিনেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। কেন না তাহা হইলে, 'মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ' কথাটী বলা হইত না। ২৮শে মাঘ উত্তরায়ণ ধরিলেও এখন হইতে ৪৮ দিন তফাৎ। ৪৮ দিনে রবির গতি মোটামুটি ৪৮ অংশ ধরা যাইতে পারে, কিন্তু ইহা ঠিক বলা যায় না, কেন না রবির শীঘ্রগতি ও মন্দগতি আছে। ৭ই পৌষ হইতে ২৯শে মাঘ পর্য্যন্ত রবিস্ফুট বাঙ্গালা পঞ্জিকা ধরিয়া গণিলে ৪৪ অংশ ৪ কলা মাত্র গতি পাওয়া যায়। ঐ ৪৪ অংশ ৪ কলা লইলে, খৃঃ পূঃ ১২৬৩ বৎসর পাওয়া যায়। ৪৮ অংশ পুরা লইলে, খৃঃ পূঃ ১৫৩০ বৎসর পাওয়া যায়। ইহা কোন মতেই হইতে পারে না, যে ইহার পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণ হইতে যে খৃঃ পূঃ ১৪৩০ পাওয়া গিয়াছে, * তাহাই ঠিক বোধ হয়। ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই বলিবেন না, যে মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। তাহা যদি হইত, তবে সৌর চৈত্রে উত্তরায়ণ হইত। চান্দ্র মাঘও কখনও সৌর চৈত্রে হইতে পারে না।"

বঙ্কিম বাবুর প্রথম যুক্তির মূল,

"যাবৎ পরিক্ষিতো জন্ম—"

ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণীয় শ্লোক। এসম্বন্ধে অনেক কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি;—তথাপি আজ আর একবার কিছু বলিতে হইতেছে। উক্ত শ্লোকের প্রতিরূপ শ্লোক ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে ২য় অধ্যায়ে আছে।

"আরভ্য ভবতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু শতং পঞ্চ দশোত্তরম্।"

বিষ্ণুপুরাণে আছে, "জ্ঞেয়ং";
ভাগবতে আছে, "শতং"।

বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকার্থ—"পরিক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের রাজ্যাভিষেক কাল ১০১৫ বৎসর অন্তর।"

ভাগবতের শ্লোকার্থ,—(স্থূল ভাবে) "পরিক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের রাজ্যাভিষেক কাল ১১১৫ বৎসর অন্তর।"

বঙ্কিম বাবু, বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালা অর্থ ও আপনার মন্তব্য স্থির করিয়াছেন ভাগবত-অনুসারে। কেন তিনি এমন করিলেন, তাহা তিনিই

* কৃষ্ণচরিত্রে 'খৃঃ' নাই, খ'এ র-ফলা হ্রস্ব ইকার এবং বিসর্গ আছে। খ'এ র-ফলা অক্ষর বঙ্গবাসী প্রেসে না থাকাতে 'খৃঃ' করা গেল, ভরসা করি, সকলে দোষ মার্জ্জনা করিবেন। অক্ষর-যোজক।

বলিতে পারেন। যাহা হউক, পরিক্ষিৎ-জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক কাল ১০১৫ বৎসর অন্তরও নহে, ১১১৫ বৎসরও নহে, ১০৫০ বৎসরও নহে। তাহা হইলে, বিষ্ণুপুরাণের এই বচনের সহিত বিষ্ণুপুরাণের আর একস্থলের বিরোধ হয়, ভাগবতের উক্ত বচনের সহিত ভাগবতের অপরাংশের বিরোধ হয়। "অমুক রাজা এত বৎসর রাজ্য করিলেন, অমুক এত বৎসর রাজ্য করিলেন,"—এইরূপ হিসাব করিয়া পরিক্ষিতের সময় হইতে নন্দের রাজ্যাভিষেক-কাল—১৪৯৮ বৎসর পরবর্ত্তী। বিষ্ণুপুরাণ—৪ অংশ ২৪ অধ্যায়ে এবং ভাগবতে ৯ম স্কন্ধে স্পষ্ট করিয়া প্রতিপাদিত আছে।

এই বিরোধ-পরিহারের জন্য শ্রীধরস্বামী ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ ২য় অধ্যায় ২৬ শ্লোকের টীকায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এই-রূপ—"এই যে পরিক্ষিৎ-জন্ম হইতে নন্দরাজ্যের আরম্ভ কাল ১১১৫ বৎসর অন্তর বলিয়া উল্লিখিত হইল, তাহা একটা মোটামুটী সংখ্যানির্দ্দেশ মাত্র; অর্থাৎ ১১১৫ বৎসর অন্তর ত বটেই; না হয় আরও অধিক; ১১১৫ বৎসরের কম ত নহে। ফল কথা, কিন্তু নন্দরাজ্য পরিক্ষিৎ-জন্ম হইতে ১৪৯৮ বৎসর পরবর্ত্তী। নতুবা, বিরোধ হয়। নবম স্কন্ধে বলা হইয়াছে;—পরিক্ষিতের সম-কালবর্ত্তী মার্জ্জারি * হইতে, জরাসন্ধ-বংশীয় রাজারা মগধে সহস্র বৎসর রাজ্য করিবেন। তৎপরে প্রদ্যোতন রাজারা ১৩৮ বৎসর, পরে শিশুনাগ বংশ ৩৬০বৎসর তথায় রাজত্ব করিবেন, তারপর নন্দরাজ্য।" মিলাইয়া দেখ, ১৪৯৮ হইবে। এরূপ লেখা-যোকা-হিসাব ভুল বলা যায় না।" বিষ্ণুপুরাণের হিসাবে আর ভাগবতের হিসাবে ঠিক মিল আছে।

এইজন্য, 'শতং পঞ্চ দশোত্তরম্' ইহার অর্থ আমি করিয়াছি "পাঁচশত দশ বৎসর"। তাহা হইলে বিরোধ নাই। পরিক্ষিৎ-জন্ম হইতে নন্দরাজ্যাভিষেক কাল ১৫১০ বৎসর পরবর্ত্তী। পরিক্ষিৎ মার্জ্জারি হইতে ১২ বৎসরের পরে হইতে পারেন। মার্জ্জারি হইতে নন্দরাজ্য ১৪৯৮ বৎসর পরে, আর পরিক্ষিৎ হইতে ১৫১০ বৎসর পরে। *

এই বিষয়টী উত্তমরূপে আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যাইবে, বঙ্কিম বাবুর ১ম যুক্তি অকিঞ্চিৎকর।

২য় বা শেষ যুক্তিও ভাল নহে। বিশেষতঃ সে যুক্তির প্রধান অবলম্বন জ্যোতিষ, মদীয় মতের বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করিতে সমর্থ নহে। একে একে সব কথা বুঝাইয়া বলিতেছি,—

১ম কথা। উত্তরায়ণ আরম্ভ এখন পৌষ মাসে হয় বটে; কিন্তু উত্তরায়ণবিহিত ক্রিয়া-কাণ্ড মাঘমাস হইতেই হয়; পৌষে উপনয়ন চূড়াকরণ হয় না। কেননা, শ্রুতিতে স্পষ্ট আছে, মাঘ মাস হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত তিন ঋতু, উত্তরায়ণ—দেবগণের দিন। তদ্ভিন্ন ছয় মাস দক্ষিণায়ন, দক্ষিণায়নে উপনয়নাদি নিষিদ্ধ আছে। কোন্ কালে একবার মাঘ মাসের প্রথম দিনে উত্তরায়ণ হইয়াছিল বলিয়া শ্রুতিতে, সে-ই মাঘ প্রভৃতি ছয় মাসকে যে উত্তরায়ণ বলা হইয়াছে—এ কথা বড় সঙ্গত হয় না। তেমন উত্তরায়ণ ত পৌষ হইতেও হইতে পারে। শ্রুতির মধ্যে পৌষকে উত্তরায়ণ বলিয়া ধরা না হয় কেন?—এই সব কারণে স্মার্ত্তগণ স্থির করিয়াছেন, সূর্য্যের উত্তর দিকে গমন, যে সময়েই হউক, উত্তরায়ণ-বিহিত কর্ম্ম মাঘ হইতে আষাঢ় এই ছয় মাসের মধ্যেই

* বিষ্ণুপুরাণ মতে 'সোমাপি'।

* ১২৯৮ সালের পৌষ মাস 'পুরাবৃত্ত' প্রবন্ধ এবং ১৩০০ সালের বৈশাখ মাসের 'মাস ও বৎসর' প্রবন্ধ দেখ।

হইবে। ইহা বুঝাইবার জন্যই "তপাশ্চ তপস্যশ্চ" ইত্যাদি শ্রুতি উক্ত ছয় মাসকেই উত্তরায়ণ বলিয়াছেন *। অতএব, আমরা সাহস-সহকারে বলিতে পারি, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের সময় অথবা ভীষ্মের মৃত্যু সময়ে, সূর্য্যের উত্তর দিকে গমন যে মাসের যে দিন হইতেই আরব্ধ হউক না কেন, মাঘ মাস শ্রুতিসিদ্ধ উত্তরায়ণ বলিয়া মৃত্যুর পক্ষে তখনও প্রশস্ত ছিল। সেইজন্যই ভীষ্মদেব বলিয়াছিলেন,—"মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির!"

এখন যে কারণে পৌষের শেষে উপনয়নাদি হয় না এবং সূর্য্যের দক্ষিণ দিকে গমন হইবার পরেও আষাঢ় মাসের মধ্যে, উপনয়নাদি হইতে পারে; ভীষ্মও সে-ই কারণে, মাঘমাসকে প্রকারান্তরে উত্তরায়ণ বলিয়াছেন। সে কারণ পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

২য় কথা। ২য় যুক্তির সারাংশ হইতে বুঝা যায়, 'অয়ন-পরিবর্ত্তনারম্ভ সকল মাসের সকল দিনেই হইতে পারে, কেবল কালভেদ মাত্র। আজ পৌষ মাসের ৮ই উত্তরায়ণ আরম্ভ হইতেছে, আর ৭০০ সাত শত বৎসর পরে অগ্রহায়ণ মাসের ২৭শে ২৮শে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইবে। আবার তিন সহস্র বৎসর পরে কার্ত্তিক মাসেই উত্তরায়ণ আরম্ভ হইবে। এইরূপে এখনকার যাহা উত্তরায়ণ, কালক্রমে তাহাই দক্ষিণায়ন, আর যাহা দক্ষিণায়ন, তাহাই উত্তরায়ণ হইতে পারে। এই যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়াই বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন,—"তাহা যদি হইত, তবে সৌর চৈত্রে উত্তরায়ণ হইত।"

এ মত কিন্তু হিন্দুজ্যোতিষ শাস্ত্রের বিরুদ্ধ; হিন্দু-জ্যোতিষ-মতে, ২রা পৌষ * হইতে মাঘ পর্য্যন্ত উত্তরায়ণারম্ভের কাল। যুগযুগান্তরেও ইহার অন্যথা হয় না। উত্তরায়ণারম্ভের এক সীমা হইল, ২রা পৌষ অপর সীমা হইল ২৭শে মাঘ। ২৮শে মাঘ বা ১লা পৌষেও কদাচ উত্তরায়ণারম্ভ হইবে না। সেই ২রা পৌষ হইতে ২৭শে মাঘ, আবার ২৭শে মাঘ হইতে ২রা পৌষ—থোড়-বড়ি-খাড়া; খাড়া-বড়ি-থোড়। ২৭শে মাঘে অয়ন পরিবর্ত্তন হইবার কাল সমাপ্ত হইলে, ২৬শে মাঘে অয়ন পরিবর্ত্তন হইতে থাকে, তৎপরে ২৫শে; ইত্যাদি।

সংক্রান্তির মধ্যে এক মকরসংক্রান্তিতেই কোনকালে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়, এইজন্য মকর-সংক্রান্তির নাম, উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি, আর সংক্রান্তির মধ্যে এক কর্কটসংক্রান্তিতেই দক্ষিণায়ন হয়, এইজন্য কর্কটসংক্রান্তির নাম দক্ষিণায়ন-সংক্রান্তি অর্থাৎ শাস্ত্রে মাঘ-সংক্রান্তি এবং শ্রাবণ-সংক্রান্তিই অয়ন-সংক্রান্তি নামে অভিহিত হইয়াছে।

বঙ্কিম বাবুর মতে সকল সংক্রান্তিই অয়নের পক্ষে সমান। অতএব, মাত্র উক্ত দুই সংক্রান্তির অয়নসংক্রান্তি নাম হইবার কোন বিশেষ কারণ নাই। সে যাহা হউক, ২রা পৌষ এবং ২৭শে মাঘ যে উত্তরায়ণারম্ভের দুইটী শেষ সীমা, ইহা হিন্দু-জ্যোতির্ব্বিৎমাত্রেই অবগত আছেন। আমার মতে, ভীষ্মের মৃত্যু সময়ে ১৬।১৭ই মাঘ উত্তরায়ণারম্ভ হইত। প্রথমে, বর্ত্তমান সময় হইতে ২৭শে মাঘ পর্য্যন্ত অয়নচলনানুসারে হিসাব করিয়া লও, পাইবে প্রায় ৩২০০ বৎসর; তারপর ২৭শে হইতে পিছাইয়া পিছাইয়া ১৬।১৭ই মাঘে উত্তরায়ণকে লইয়া আসিতে আরও ৭০০

* এই শ্রুতি স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্যের তিথিতত্ত্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই শ্রুতির অনুসারী স্মৃতিবচনও স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

* কোনবার ৩রা পৌষ সীমা হয়, ২রাও পাইতে হয় না।

শত বৎসর লাগিবে; তাহা হইলেই এখন হইতে ৩৯০০ শত বৎসরের সময় বা কলির একাদশ শতাব্দীতে * কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ বা যুধিষ্ঠিরের সময়—ইহা বেশ বুঝা যাইবে।

বঙ্কিম বাবুর মতে ভীষ্ম, মাঘের ২৮শে তারিখে যুধিষ্ঠিরকে ডাকিয়া বলিয়াছেন, "মাঘ মাস পড়িয়াছে!" তা, মুমূর্ষু ভীষ্ম অচেতন ছিলেন বোধ হয়! নতুবা মাস যাইবার সময় এমন কথা বলা ভীষ্মের সাজে কৈ? আমার মতে বরং সঙ্গতি আছে, মাঘের ১৬।১৭ই তারিখ, ২৮শে অপেক্ষা অনেক পূর্ব্ব। আর চান্দ্র-মাঘ অভিপ্রায়ে যদি ভীষ্ম মাঘ মাস পড়িয়াছে বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে, এই কথাটী সকলের পক্ষেই সঙ্গত হয়। শুক্ল পক্ষের অষ্টমীতে ভীষ্মের মৃত্যু হয়। তৎপূর্ব্বে শুক্ল প্রতিপদ হইতে চান্দ্রমাঘ আরম্ভ; ভীষ্মের মৃত্যুতিথি চান্দ্রমাঘের ৮ই তারিখ। মাঘ মাস পড়িয়াছে, মাঘের ৭।৮ই তারিখে এ কথা বলা অসঙ্গত হয় না।

৩য় কথা। যদিই স্বীকার করি, 'অয়নচলন' সকল মাসের সকল দিনেই হয়, উত্তরায়ণ, কখন মাঘে, কখন ফাল্গুনে ইত্যাদি হয়, তাহা হইলেই বা আমার ক্ষতি কি?

"মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ" অর্থাৎ 'মাঘ মাস পড়িয়াছে' এই কথাটী সঙ্গত রাখিবার জন্য যদি মাঘ শব্দে চান্দ্রমাঘ লইতে হয়, তবে, সৌর ফাল্গুন মাসেও ও-কথা বলা খাটিতে পারে। ৭।৮ই ফাল্গুনেও কোনবার মাঘী শুক্লঅষ্টমী হইতে পারে। সৌর ফাল্গুন আর চান্দ্রমাঘের আরম্ভও একদিনে হইতে পারে। বঙ্কিম বাবুর মতে ৭ই কি ৮ই ফাল্গুনে যে সময় উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত, তাহা বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় ৩৯০০ বৎসর পূর্ব্বে। সেই সময়ে ভীষ্মের মৃত্যু এ কথা বলিলে, তিনি কি বলিবেন?

তাই বলি, বঙ্কিম বাবুর কোন যুক্তিতে আমার মত খণ্ডিত হয় নাই। পুরাণের বচন-প্রভাবে বঙ্কিম বাবুর মত কিন্তু টিকে নাই। বঙ্কিম বাবুর ২য় যুক্তির আলোচনায় আমি যে ৩টী কথা বলিয়াছি, তাহার সংক্ষেপ ভাব এই,—

১ম। উত্তরায়ণে বিহিত কার্য্য,—মাঘাদি ছয় মাসে হইবে। প্রকৃত উত্তরায়ণ না হইলেও ক্ষতি নাই; কেননা, এ সময় পারিভাষিক উত্ত-রায়ণ; অতএব মাঘ মাসে বা মাঘ মাসের প্রথমে ভীষ্মের মৃত্যু দেখিয়া প্রকৃত উত্তরায়ণ-আরম্ভের কাল নির্ণয় করা যায় না।

২য়। পৌষ মাঘ ভিন্ন অন্য মাসে কদাচ উত্তরায়ণ হয় না। যখন ১৬।১৭ই মাঘ প্রকৃত উত্তরায়ণের আরম্ভ ছিল, সে-ই সময়ে, সেই তারিখে ভীষ্মের মৃত্যু হয়। পুরাণ-বচনের সহিত বিরোধপরিহার করিয়া গণনা করিলে, সেই সময়কে কলির একাদশশতাব্দী বলিয়া ধরা যায়।

৩য়। ভীষ্মোক্ত শ্লোকের অর্থসঙ্গতির খাতিরে, মাঘ শব্দে চান্দ্রমাঘ ধরিলে, ৮ই ফাল্গুন ভীষ্মের মৃত্যু হয় বলিব। বঙ্কিম বাবুর চক্রবৎ 'অয়ন-চলন' মানিলেও, সেই তারিখে উত্তরায়ণ-আরম্ভ বলিলে, আমার পক্ষ সম্পূর্ণ দৃঢ় থাকে। এই জ্যোতিষের প্রমাণ যখন পুরাণমতের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারিল না, তখন পুরাণ-মতই প্রধান। বঙ্কিমবাবু-প্রদর্শিত জ্যোতিষ-সাক্ষ্যের কোন ফলই নাই। অতএব, পুরাণের মতানুসারে জ্যোতিষের অবিরোধে আমরা বলি, খৃঃ পূঃ ১৪০০ অব্দে নহে—খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দে অর্থাৎ কলির একাদশ শতাব্দীতে যুধিষ্ঠিরের

* এক্ষণে কলির পঞ্চাশ শতাব্দীর শেষ অর্থাৎ ৪৯৯৪ কল্যব্দ।

প্রাদুর্ভাব। * ৫০০০ বৎসর নহে বটে, আমাদের প্রায় চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বের লোক মহারাজ যুধিষ্ঠির। বৃথা ভ্রমে পড়িয়া বঙ্কিম বাবু, যুধিষ্ঠিরের কালনির্ণয়ে প্রায় ৬০০ ছয় শত বৎসরের গোল করিয়াছেন।

ইহা বলা আবশ্যক যে, ৩য় কথায় যে বিচার করিয়াছি, তাহা তর্কশাস্ত্র-প্রদর্শিত বাদমাত্র। ১ম প্রদর্শিত যুক্তিদ্বয়েই নির্ভর করিবে।

তবে,—

"মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো
মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।"

এই শ্লোকটী চান্দ্রমাস অভিপ্রায়েই প্রযুক্ত হইয়াছে। সৌর মাঘের ১৯শে কি ২০শে তারিখে উত্তরায়ণ হইলেও, চান্দ্রমাস অভিপ্রায়েই "মাঘমাস প্রবৃত্ত হইল" এই কথা ভীষ্ম বলিয়াছেন। মাঘে—১৯শে বা ২০শের পর, তৎকালে উত্তরায়ণ হইত, এ কথা বলাই যাইতে পারে না, বারান্তরে তাহা প্রমাণিত করিব।

১৯শে বা ২০শে মাঘ উত্তরায়ণ আরম্ভ বলিলে, আমার সিদ্ধান্তে ব্যাঘাত নাই। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত আছে। কেননা, খৃঃ পূঃ ৭৮ শত অব্দেই ১৯শে বা ২০শে মাঘ উত্তরায়ণ ছিল, ইহা বঙ্কিম বাবুর অভিপ্রায়।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

---

* এই প্রবন্ধে ৪৭ পৃঃ ১২ পংক্তি হইতে ভ্রমক্রমে লিখিত হইয়াছে,—

"দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ১১৭৫ কলি-গতাব্দে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ, দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাংশে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ।"

ফলকথা, "একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে—১০৭৫ কল্যব্দে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ, একাদশ শতাব্দীর শেষাংশে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ।" (লেখক)।

বৃহৎ ওলাউঠা-সংহিতা।*

নামেই কতকটা পদার্থ-জ্ঞান হয়। নামেই বুঝা যাইতেছে, বৃহৎ ওলাউঠা-সংহিতা কি পদার্থ। কিন্তু কেবল পদার্থ-জ্ঞানেই, ইহার সম্যক্ পরিচয় হয় না; তাহার জন্য সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

বৃহৎ ওলাউঠা-সংহিতা পরম পদার্থ। সেই জন্য এতৎসম্বন্ধে নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশের অতীব আবশ্যকতা অনুভূত হইয়াছে। ভাষা-বাক্যের প্রচুর প্রয়োগ ভিন্ন, ইহার প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার সুদূর-পরাহত। যত কথায় বা যতটা ভাষায়, ইহার প্রকৃত-তত্ত্বের সম্যক্ প্রচার সম্ভব, জন্মভূমিতে অবশ্য তাহার স্থান-সংকুলন হইবে না; সুতরাং যথাসাধ্য সংক্ষেপেই, সাধারণের কতকটা হৃদয়ঙ্গম করাইবার মত করিয়া, ইহার পরিচয় প্রদান করিতে হইল।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-শাস্ত্র-মতে, ওলাউঠা রোগের চিকিৎসা-বিধান ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় আবশ্যক-তত্ত্বের সার-সংগ্রহই হইতেছে,—বৃহৎ ওলাউঠা-সংহিতা। স্থূল কথা,—ওলাউঠা সম্বন্ধে বহুবিধ তত্ত্ব, ওলাউঠার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, প্রথম শিক্ষার্থীর ওলাউঠা শিক্ষা, রোগি-তত্ত্ব, বাল-বিসূচিকা এবং ওলাউঠা নিবারণার্থ ফলপ্রদ উপায়-নিচয় ইত্যাদি লইয়াই বৃহৎ ওলাউঠা-সংহিতা।

আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ কিংবা অনার্য্য এলোপ্যাথির সহিত, তুলনায় সমালোচনা করিতে চাহি না। সে শক্তিও নাই। তবে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা স্বনামে ধন্যা। শতবর্ষমাত্র হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা এ মর্ত্ত্যভূমে প্রচারিত

---

* শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী এল, এম, এস, কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য দুই টাকা। কলিকাতা ১৫০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে গ্রন্থকারের কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

হইয়াছে।* ইহারই মধ্যে ইহা সমগ্র বিশ্ব-প্রসারিণী।

হোমিওপ্যাথির মূল মন্ত্র, "Similia similibus curantur" অর্থাৎ সুস্থ শরীরে কোন ঔষধ সেবন করিয়া তদ্দরুণ শরীরে যে সমস্ত লক্ষণ জন্মে, সেই সমুদয় লক্ষণযুক্ত যদি কোন পীড়া কাহার হয়, তবে সেই পীড়া উক্ত লক্ষণোৎপাদক ঔষধে অবশ্য আরোগ্য হইবে। স্থূল কথা,—যাহাতে উৎপত্তি, তাহাতেই নিবৃত্তি। আমাদের আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের যাহা "বিষস্য বিষমৌষধং", "সমঃ সমং শময়তি" "সদৃশং সদৃশেন শম্যতে" "সমে সমে" ইত্যাদি, তাহাই হোমিওপ্যাথির Similia similibus curantur. এই মহামন্ত্রের আভাস প্রায় সকল শাস্ত্রেই পাওয়া যায়। ভাগবতেও আছে,—

আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্॥

যে দ্রব্য হইতে যে রোগ উৎপন্ন হয়, কেবল সেই দ্রব্য সেবন করিলেই, তাহার শান্তি হয় না। কিন্তু যদি তাহা উপযুক্ত ঔষধে মিশাইয়া দেওয়া যায়, তৎক্ষণাৎ উপকার দর্শে।"

প্রথম স্কন্ধ, পঞ্চম অধ্যায়।

আর্য্য-শাস্ত্রের এ মহা মন্ত্র হানিমান সাহেবের দৃষ্টিগোচর হউক বা স্বতঃই ইহা তাঁহার মনে উদিত হউক, তিনি এতৎসাধনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি এ যুগে, হোমিওপ্যাথির প্রতিষ্ঠায় পূর্ণ কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তি জগৎময় দেদীপ্যমানা।

হোমিওপ্যাথি ঔষধের বিন্দু-ক্রিয়া অতীব অদ্ভুত। শক্তি-মাহাত্ম্য যাঁহারা বুঝেন না, হোমিওপ্যাথি চিকিৎস্যা-প্রণালীতে লক্ষ্য করিলে, তাঁহাদের মোহ ভাঙ্গিবে। সামান্য জড়-কণা কত শক্তি ধরে, কিরূপ ভাবে বিদ্যুৎবেগে নরদেহে কার্য্য করে, হোমিওপ্যাথি ঔষধ প্রয়োগকালে, তাহা বেশ উপলব্ধি হয়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদিগকে কত ভাবে কত প্রকার মুদ্রাদি দেখাইয়া নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যে উদ্দেশ্যে এই সব আদেশ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অধম অকৃতি সন্তান আমরা নিজের অজ্ঞানতা-নিবন্ধন তাহা বুঝি না; না বুঝিয়া সেই সব আচার-অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া বসি। ইহাতে অনিষ্ট আমাদেরই হইতেছে। দেশের রোগশোক বৃদ্ধি পাইলে, শেষে জলবায়ুর প্রতি দোষারোপ করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হই; কিন্তু আমাদের আচার-অনুষ্ঠান অভাবে আমাদের ক্রমে শক্তিক্ষয় হইতেছে। শক্তি-সঞ্চয় আমরা নিজের দোষে করিতে পারিতেছি না। তাহাই যে রোগ-শোকের নিদানীভূত কারণ, আমাদের সে জ্ঞান নাই। সম্যক্ না হউক, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-প্রণালীতে দ্রব্যশক্তির অনন্ত মহিমার কতক পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। এই জন্যই হোমিওপ্যাথির প্রতি আমাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা।

অধুনা হোমিওপ্যাথির ফলোপধায়কতার পরিচয় পদে পদে পাইতেছি। পৃথিবী জুড়িয়া ইহার প্রতিষ্ঠা। পৃথিবীর পনের আনা নর-নারী ইহার পক্ষপাতী। ৩০।৩২ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা সহরে বেরিণী সাহেব হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রচার করেন। বহুবাজার-ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের দত্ত পরিবারস্থ ৺রাজেন্দ্রলাল দত্ত বেরিণীর নিকট হোমিওপ্যাথির মহা-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া, স্বদেশীয়ের চিকিৎসা-ব্রতে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। আধুনিক হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক-প্রবর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এক সময় হোমিওপ্যাথির মহা শত্রু ছিলেন। ৺রাজেন্দ্রলাল দত্ত ও

---

* ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে জর্ম্মণির অন্তঃপাতী মিসেন নগরে হোমিওপ্যাথি-আবিষ্কর্ত্তা সামুয়েল হানিমানের জন্ম হয়। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রণালী প্রচার করেন।

৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ই নাকি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় তাঁহার প্রবৃত্তি উন্মেষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

এইরূপ রাষ্ট্র আছে, ডাক্তার সরকার হোমিওপ্যাথির উপর ভয়ানক ব্রীত-শ্রদ্ধ ছিলেন। হোমিওপ্যাথির নাম হইলেই তিনি ক্রোধে অন্ধ হইতেন। একদিন তিনি, বিদ্যাসাগর মহাশয় ও রাজেন্দ্র বাবু, গাড়ী করিয়া, ৺অনারেবল দ্বারকানাথ মিত্রের বাড়ী হইতে আসিতেছিলেন। সেই সময়, বিদ্যাসাগর ও দত্ত মহাশয়ের সহিত তাঁহার হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল। বহু তর্কের পর, তিনি বলেন,—"আমি অগ্রে ভাল করিয়া হোমিওপ্যাথির গুণাগুণের পরীক্ষা করি, তাহার পর যাহা হয় করিব।" ইহার কিয়দ্দিন পরে তিনি হোমিওপ্যাথির ঘোরতর পক্ষপাতী হইয়া উঠেন; এবং এলোপ্যাথি পরিত্যাগ করিয়া, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় তাঁহার প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি পূর্ণ মাত্রায় উত্থিত হয়। বেরিণী সাহেব কলিকাতায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার এক রকম প্রথম প্রবর্ত্তক; কিন্তু এখানে এ সম্বন্ধে তিনি আদৌ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার পরম প্রীতিপ্রদ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার সময়, এক জন এদেশীয় বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন, "মহেন্দ্রের যখন প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তখন জানিও, আমি পাঁচ হাজার টাকায় পকেট পূর্ণ করিয়া ঘরে চলিলাম।"

সে কয় দিনের কথা। অঙ্গুলি পর্ব্বে গণনা হয়। এই কয় দিনে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার কীদৃশ প্রতিপত্তি প্রসারিত হইয়াছে, তাহা ত আর পাঠককে বুঝাইতে হইবে না। এখন বহুসংখ্যক এলোপ্যাথি চিকিৎসক, এলোপ্যাথি-চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহাদের চিকিৎসাগুণে, হোমিওপ্যাথির উপর লোকের দিন দিন শ্রদ্ধা-ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিয়া, যাঁহারা অধুনা প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়াছেন, "বৃহৎ ওলাউঠা-সংহিতা"-প্রণেতা ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী তাঁহাদের মধ্যে এক জন।

ইনি পনের বৎসর চিকিৎসা করিতেছেন; পূর্ব্বে পাবনায় ছিলেন; দুই বৎসরও হয় নাই, কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসা করিতেছেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহার যেরূপ পসার-প্রতিপত্তি হইয়াছে, তেমন আর কাহারও হয় নাই বলিলেও বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার এইরূপ অভাবনীয় পসার-প্রতিপত্তি, তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যেরই প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

চন্দ্রশেখর বাবু সুচিকিৎসক; অধিকন্তু সুলেখক। সুচিকিৎসক হওয়া সৌভাগ্যের কথা; তদুপরি সুলেখক হওয়া বহু-সৌভাগ্যের বিষয়। যিনি আলোচ্য বিষয়, সাধারণের বোধগম্য বিশদ ভাষায় বিবৃত করিতে পারেন; যিনি প্রকৃত অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে কোনরূপ ত্রুটি রাখেন না; যিনি পরকীয় ভাষার বাক্যাবলী স্বকীয় ভাষায় যথারূপে প্রয়োগ করিতে জানেন; পরকীয় ভাষার যে সব শব্দ স্বকীয় ভাষায় বিরল-প্রয়োগ, স্বজাতীয়ের বা স্বদেশীয়ের জন্য প্রকৃত সমার্থ দিয়া, যিনি স্বভাষায় সেই সব শব্দের প্রতিরূপ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তিনি সুলেখক। চন্দ্রশেখর বাবুর সুলেখকত্বের পরিচয় বৃহৎ ওলাউঠা সংহিতায় পদে পদে। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার "চিকিৎসা বিধানেও"* সে পরিচয় পাইয়াছি।

* এ পুস্তকও গ্রন্থকারের কার্য্যালয়ে পাওয়া যায়। মূল্য পাঁচ টাকা।

বৃহৎ ওলাউঠা সংহিতা চিকিৎসক, অচিকিৎসক সর্ব্বজনেরই পঠনীয় ও প্রয়োজনীয়। ওলাউঠা বিষম কাল-ব্যাধি। ওলাউঠায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাই অপেক্ষাকৃত ফলোপধায়িনী। অধুনা প্রায়ই ওলাউঠায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ব্যবস্থা দেখিতে পাই। এই বৃহৎ ওলাউঠা-সংহিতায় সেই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার সুক্ষ্মানুসূক্ষ্ম তত্ত্ব প্রকটিত হইয়াছে। বিশেষতঃ গ্রন্থকার ওলাউঠা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যত প্রধান প্রধান গ্রন্থ ও চিকিৎসা-পত্রিকা দেখিয়াছেন, ইহাতে তাহাদের প্রায় সমস্তগুলিরই সারাংশ সংগৃহীত হইয়া প্রদত্ত হইয়াছে। অপিচ পৃথিবীস্থ বহুসংখ্যক অভিজ্ঞ চিকিৎসক মহাশয়দিগের বহুল অভিজ্ঞতার ফলও ইহাতে সংহিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের পঞ্চদশ বর্ষের যে অভিজ্ঞতা, তাহাও যথেষ্ট পরিমাণে ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদুপরি মনু, চরক, সুশ্রুত ইত্যাদি গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু সংগৃহীত হইয়াছে। এমন গ্রন্থ সাধারণ্যে সমাদৃত না হইলে, দেশের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।

আর এক কারণেও গ্রন্থের গরীয়ান্ গুরুত্ব উপলব্ধি হয়। ওলাউঠায় গ্রন্থকারের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ওলাউঠায় তাঁহার মঙ্গলও করিয়াছে। বাল্যকালে তাঁহার জননী ওলাউঠায় স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার চৌদ্দ বৎসর বয়সে মাতৃ-সদৃশা মাতৃষসা ঠাকুরাণীর ওলাউঠায় মৃত্যু হয়। গ্রামে সুচিকিৎসক ছিল না। মাতৃষসার চিকিৎসা হয় নাই। সেই দুঃখে গ্রন্থকার চিকিৎসক হইয়াছেন। যে রোগে মাতা ও মাতৃষসার মৃত্যু হইয়াছে, গ্রন্থকার চিকিৎসক হইয়া, সেই রোগের আমূল তত্ত্ব সংগ্রহে আত্মজীবন সমর্পণ করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় বৃহৎ ওলাউঠা-সংহিতার গুরুত্ব সম্বন্ধে, কিঞ্চিৎমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে কি?

গ্রন্থকার চন্দ্রশেখর বাবুর বিচার-শক্তি বহু-প্রশংসনীয়। গবেষণায় ও সূক্ষ্ম-তত্ত্বালোচনায়, তিনি প্রভূত শক্তিশালী। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-শাস্ত্র ভিন্ন, অন্য চিকিৎসা-শাস্ত্রেও তাঁহার দৃষ্টি আছে। বাঙ্গালী-বিরল বহুগুণ তাঁহাতে বিদ্যমান। তত্ত্বালোচনায় বিচার করিবার ও বুঝাইবার তাঁহার কেমন শক্তি আছে, একটী দৃষ্টান্তে তাহা পাঠককে বুঝাইব।

অনেকের বিশ্বাস, সাক্ষাৎ সংহারস্বরূপা মহা-কালরূপিণী এসিয়াটিক ওলাউঠা, এ দেশের পীড়া। গ্রন্থকার-বলেন,—"এ পর্য্যন্ত তাহার কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রাচীন কালে এই পীড়া আমাদের দেশে কখন ছিল না। আয়ুর্ব্বেদে যে সমস্ত পীড়ার বর্ণনা ও চিকিৎসা আছে, তাহা প্রায় সকলই অত্যুৎকৃষ্ট; কিন্তু তাহাতে ওলাউঠা সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে সে প্রকার কিছু নাই বলিলেই হয়। এতৎসম্বন্ধে গ্রন্থকার যে বিচার করিয়াছেন, তাহা এইখানে উদ্ধৃত হইল,—

"যদিচ অনেকে 'বিসূচিকাকে' এসিয়াটিক্ ওলাউঠার সমসংজ্ঞা বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু প্রকৃত দার্শনিকের চক্ষে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে, এসিয়াটিক্ ওলাউঠা কখনই বিসূচিকা নহে। আয়ুর্ব্বেদ নিদান হইতে নিম্নে, স-বঙ্গানুবাদ বিসূচিকার লক্ষণ উদ্ধৃত হইল, এতৎপাঠে বিসূচিকা যে ওলাউঠা নহে, তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে।

অনাত্মবন্তঃ পশুবদ্ভুঞ্জতে যেঽপ্রমাণতঃ।
রোগানীকস্য তে মূলমজীর্ণং প্রাপ্নুবন্তি হি ॥১১
অজীর্ণমামং বিষ্টব্ধং বিদগ্ধঞ্চ যদীরিতম্।
বিসূচ্যলসকৌ তস্মাদ্ভবেচ্চাপি বিলম্বিকা ॥১২
সূচিভিরিব গাত্রাণি তুদন্ সন্তিষ্ঠতেঽনিলঃ।
তস্মাজীর্ণেন সা বৈদ্যৈর্বিসূচীতি নিগদ্যতে ॥১৩
ন তাং পরিমিতাহারা লভন্তে বিদিতাগমাঃ।
মূঢ়াস্তামজিতাত্মানো লভন্তেঽশনলোলুপাঃ ॥১৪
মূর্চ্ছাতিসারো বমথুঃ পিপাসা
শূলো ভ্রমোদ্বেষ্টনজৃম্ভদাহাঃ।
বৈবর্ণ্যকম্পৌ হৃদয়ে রুজশ্চ
ভবন্তি তস্যাং শিরসশ্চ ভেদঃ ॥১৫

দুষ্টাশয় ব্যক্তি লোভপরতন্ত্র হইয়া আত্মসুখাকাঙ্ক্ষায় পশুবৎ যে অপরিমিত দ্রব্য ভোজন করে,

তদ্দ্বারা সে ব্যক্তি বিসূচ্যাদি রোগসমূহের মূল কারণ স্বরূপ অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হয় ॥১১॥

বিষ্টব্ধ, আম ও বিদগ্ধ এই যে তিন প্রকার অজীর্ণ রোগ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তাহা হইতে বিসূচী, অলসক ও বিলম্বিকা এই সমস্ত রোগ উৎপন্ন হয় ॥১২॥

অজীর্ণ রোগে যে ব্যক্তির বায়ু প্রকুপিত হইয়া সূচিকা-বিদ্ধের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে বেদনা উৎপাদন করে, বৈদ্যগণ তাহার সেই অজীর্ণ রোগের নাম বিসূচিকা কহিয়া থাকেন। পরিমিত ভোজনকারী আয়ুর্ব্বেদ-বিশারদেরা কখন এই রোগে পীড়িত হয়েন না; কেবল অজিতেন্দ্রিয়, মূঢ় লোকেরাই পশুবৎ অপরিমিত ভোজনাভিলাষী হইয়া এতদ্রোগে অভিভূত হইয়া থাকে ॥১৩।১৪॥

এই বিসূচী রোগে মনুষ্যের মূর্চ্ছা, অতিসার, বমি, পিপাসা, উদরের বেদনা, ভ্রম, উদ্বেষ্টন, জৃম্ভণ, শরীরের দাহ, বিবর্ণতা ও কম্প, হৃদয়পীড়া ও শিরঃশূল এই সকল লক্ষণ প্রকাশ প্রায় ॥ ১৫ ॥

যঃ শ্যাবদন্তোষ্ঠনখোঽল্পসংজ্ঞো
বম্যর্দ্দিতোঽভ্যন্তরযাতনেত্রঃ।
ক্ষামস্বরঃ সর্ব্ববিমুক্তসন্ধি-
র্যায়ান্নরঃ সোঽপুনরাগমায় ॥ ১৬ ॥

অলসক ও বিসূচী রোগে যাহার নখ শ্যামবর্ণ হয়, জ্ঞান থাকে না ও অতিশয় বমন নিমিত্ত চক্ষুঃ বসিয়া যায় এবং স্বরের ক্ষীণতা ও সর্ব্বাস্থিসন্ধি শিথিলীভূত হইয়া যায়, তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

এইক্ষণ এসিয়াটিক্ ওলাউঠার অবস্থা-চতুষ্টয় সহিত এই বিসূচিকার পূর্ব্বরূপ, রূপ, সংপ্রাপ্তি তুলনা কর। দেখিবে ইহাতে ওলাউঠার অম্বাবু বা পান্তা-ভাতের জল সদৃশ মল ও বমন (rice water ejections) সেই ভয়াবহ কোলাপ্স, ঘর্ম্ম, ক্র্যাম্পস্ বা আক্ষেপ, মূত্রাভাব এবং প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি প্রধানতম লক্ষণ ও অবস্থাচয়েরই অভাব। যেমন কোন গ্রন্থে যদি কোন সর্পের সহস্র উৎকৃষ্ট বর্ণনা থাকে এবং তাহাতে যদি তাহার ফণা, ফণাপৃষ্ঠস্থ পদচিহ্ন, বিষদন্ত, বিষ এবং কৃষ্ণবর্ণ এই পঞ্চ বর্ণনা সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না থাকে, তবে আমরা তাহাকে কেউটিয়া বা জাতি-সর্প বলিয়া, কখনই স্বীকার করিতে পারি না; ঐ পঞ্চ লক্ষণের একটী লক্ষণ বিবর্জ্জিত সর্প যেমন কখনও কেউটিয়া সর্প নহে; সেইরূপ ঐ কোল্যাপ্সাদি লক্ষণ-শূন্য অতিসার ও বমন এসিয়াটিক ওলাউঠা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

গ্রন্থকারের তত্ত্বসংগ্রহ শক্তিরও একটু পরিচয় লউন,—

"এসিয়াটিক্ ওলাউঠা যে ৪০০।৫০০ বৎসরের অধিক কালীন পীড়া নহে, নিম্নলিখিত তালিকাটী পাঠ করিলে তাহা জানিতে পারিবে। এই ওলাউঠা যে যে সময়ে যে যে স্থানে প্রথম দেখা দিয়াছিল, তাহার নিদর্শন লিপি—১৫০৫ খৃঃ অব্দে কলিকটে; ১৫৪৩, ১৫৬০, ১৫৮৯ খৃঃ অব্দে গোয়া এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে; ১৬২৯ ব্যাটাভিয়া দ্বীপে; ১৭৮২ মান্দ্রাজ সহরে; ১৭৯৬ করমণ্ডল উপকূলে; ১৮১৭, ১৮১৮, পঞ্জাব, যশোহর এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য বহু স্থানে; ১৮২৩ রুশিয়া রাজ্যে; ১৮৩১ ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ড; ১৮৩২ উত্তর আমেরিকায়। অতএব রীতিমত পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝিতে পারিবে, যে ওলাউঠা ভারতবর্ষে প্রকৃতরূপে যে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা এখনও এই ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে শতবর্ষ হয় নাই।

ওলাউঠা কয় প্রকার, কোন্ প্রকৃতিতে ওলাউঠার কিরূপ অবস্থা হয়, ওলাউঠার কোন্ অবস্থায় কিরূপ ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্ব বৃহৎ ওলাউঠা সংহিতায় নিহিত আছে। চিকিৎসক কেন, একজন চিকিৎসানভিজ্ঞ ব্যক্তিও এই বৃহৎ ওলাউঠা-সংহিতার সাহায্যে অনেকটা ওলাউঠার চিকিৎসা করিতে পারেন, এ কথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি। কেবল নীরস কঠোর চিকিৎসা-তত্ত্বের ব্যবস্থাবিধান লইয়া, বৃহৎ ওলাউঠা সংহিতা নহে; এমন অনেক বহুতর বিষয় এমনই সুখপাঠ্য প্রাঞ্জল ভাষায় অবতারিত হইয়াছে যে, তাহা পড়িতে পড়িতে উপন্যাসভ্রম জন্মে। সে সব তত্ত্বের উদ্ধার সম্ভবে না; তবে ওলাউঠা রোগ যাহাতে কাহাকেও আক্রমণ করিতে না পায়, তাহার উপায়-সম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সাধারণের অবশ্য-জ্ঞাতব্য বলিয়া এইখানে তাহার উদ্ধার করিয়া দিলাম,—

ওলাউঠা-রোগীর ভেদ ও বমনাদি Dejections এই রোগোৎপত্তির মূল বীজ বা মূল বিষ; এ কথা অনেক স্থলে প্রমাণ করা গিয়াছে। এই বিষ উদরস্থ হইলেই এই পীড়া জন্মে। অন্য কোন প্রকারে এই রোগ জন্মে, আমাদের এইক্ষণে আর সে বিশ্বাস নাই। ভেদ ও বমনাদি কোন প্রকারে উদরস্থ হওয়া ব্যতীত হাওয়া বা

কোন প্রকার বায়ু বা বাষ্প সংযোগে এই রোগের উৎপত্তি হয়, আমরা এ কথা স্বীকার করি না। কলিকাতা মেডিকেল কলেজে অসংখ্য ওলাউঠার রোগী বৎসর বৎসর চিকিৎসিত হয়; সে স্থানে কোন শুশ্রূষাকারী বা চিকিৎসক ওলাউঠার রোগীর পরিচর্য্যা করিয়া এই রোগগ্রস্ত হইয়াছেন, এ কথা আমরা এ পর্য্যন্ত শুনি নাই। কোন প্রকার বায়ু বা বাষ্প যদি এই রোগের কারণ হইত, তাহা হইলে প্রাইভেট প্রাক্‌টিসেও অনেক চিকিৎসক অগ্রে এই রোগাক্রান্ত হইতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু একবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখ, চিকিৎসক এবং শুশ্রূষাকারীদিগের মধ্যে এই রোগের আক্রমণ অতি অল্পই দেখা যায়; ইহার প্রধান কারণ চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারীরা, এই রোগের মল ও বমনাদি সম্বন্ধে প্রায়ই বিশেষ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকেন। যাহা হউক প্রকৃত মীমাংসা এই যে, ওলাউঠার ভেদ ও বমনাদি কোন প্রকারে কিঞ্চিৎ উদরস্থ হইলেই এই রোগ জন্মিবে। এক বাড়ীর মধ্যে একজনের ওলাউঠা হইলে তাহার মল যেথানে সেথানে ফেলে; তাহাতে মাছি পড়িয়া সেই মাছি অন্নাদি খাদ্যদ্রব্যে বসে, বা ঐ মল ধূলি প্রভৃতি সংযোগে বা অন্য বহুবিধ অলক্ষ্যভাবে খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যে সংমিশ্রিত হইয়া উদরে প্রবেশ করে; তাহাতেই এক পরিবার বা পাড়ার মধ্যে ভয়ানক মহামারী ভাবে ওলাউঠা আরম্ভ হয়। ঐ প্রকার কোন এক জলাশয়ে ভেদ বমনাদিযুক্ত বস্ত্রাদি ধৌত হইলে ঐ জলাশয়ের জল যাহারা যাহারা পান করে, তাহাদের মধ্যে এই ওলাউঠার মহামারী উপস্থিত হয়। এইভাবে গ্রামকে গ্রাম ওলাউঠাক্রান্ত হয়। এক্ষণে এই রোগের ভেদ বমনাদি যাহাতে উদরসাৎ না হইতে পারে, তাহার উপায় বিধান করাই ওলাউঠার প্রকৃত প্রতিষেধক চিকিৎসা। সর্প যাহাতে দংশন করিতে না পারে, সেই উপায় করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তাহাতে নিশ্চয়ই বাঞ্ছিত ফল হয়। চিকিৎসক যেমন রোগী চিকিৎসা করিতে যাইবেন, অমনি তিনি রোগী দেখিয়া তাহার মল বমনাদি আচ্ছাদরাদি মিশ্রিত করিয়া অতি দূরতর স্থানে মৃত্তিকার নীচে পুতিয়া ফেলিতে উপদেশ দিবেন; যেন ঐ মলাদি অন্য ব্যক্তিদিগের উদরে কোন প্রকারে না যায়। ইহা চিকিৎসকের একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এতৎ সম্বন্ধে তিনি দৃষ্টি না রাখিলে পাপাশ্রিত হইবেন সন্দেহ নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক, কি কি উপায়ে ওলাউঠার মলবমনাদি উদরসাৎ হইতে পারে?

১। জলাদি নানাবিধ পানীয় সংযোগে।

২। অন্নাদি নানাবিধ খাদ্য সংযোগে।

৩। ধূলি ও অপ্রক্ষালিত হস্ত বা অপর কোন দ্রব্য সংযোগে।

বৃহৎ ওলাউঠা-সংহিতায় এমন অনেক তত্ত্বের আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় যে, এ পর্য্যন্ত কোন ইংরেজি-গ্রন্থে তাহার উল্লেখ মাত্র নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রন্থোক্ত "মারাত্মক জরযোগিনী ওলাউঠা" উল্লেখ করিতে পারা যায়। এ সব তত্ত্ব ইংরেজিতে অনুবাদ হইলে, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা চিকিৎসার গৌরব বৃদ্ধি হইবে। বাঙ্গালার তেমন সৌভাগ্য হইয়াছে কি?

গ্রন্থকার সম্পূর্ণ ইংরেজি-শিক্ষিত চিকিৎসক; কিন্তু তিনি যে সম্পূর্ণ স্বধর্ম্ম-পরায়ণ, বৃহৎ ওলাউঠা-সংহিতায় তাহার পরিচয়াভাস পাওয়া যায়। এক স্থলে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

"যখন যাহা আহার করিবে, তাহাই হৃদয়ের সহিত স্থিরচিত্তে অগ্রে ভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া দিয়া প্রসাদ ভাবে আহার করিবে; তবেই উহা অমৃতময় হইয়া শরীরে প্রবেশ করিবে। এতাদৃশ অভ্যাস অজীর্ণ ও ওলাউঠায় একটী উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক বলিয়া জানিবে। 'পেলুম্ থালে, দিলুম্ গালে, পাপ পুণ্য নাই কোন কালে' এ প্রকার আহার যেন না করা হয়। উহা পশুবৎ ব্যবহার। তুমি মনুষ্য; তোমার পশুবৎ ব্যবহার সহ্য হইবে না। মুনি ঋষিরা এবং সৎব্রাহ্মণেরা ঈশ্বরে নিবেদন না করিয়া কিছুই আহার করেন না। ইহা মহামুনিদেরই বিধি জানিবে, তাঁহাদের বিধি কখন অযুক্তিমূলক নহে।

আজিকার এ দুর্দ্দিনে, একজন ইংরেজি-শিক্ষিত চিকিৎসকের এ অমৃতোপম উপদেশ, বিচিত্র বলিয়া মনে হয়; কিন্তু একথার প্রত্যেক অক্ষরই জীবন্ত সত্য।

গ্রন্থের আংশিক পরিচয় মাত্র হইল; ইহাতেও বোধ হয়, পাঠক ইহার গুরুত্বানুভব করিয়াছেন। শেষে এক কথায় বলি, ওলাউঠা সম্বন্ধে এমন গ্রন্থ বোধ হয় এ পর্য্যন্ত হয় নাই।

শ্রীবিহারিলাল সরকার।

আমার জীবন-চরিত।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধ-ব্যাপারে গুপ্তচর এক প্রধান উপকরণ,—এক মহান্ পাশুপত অস্ত্র। আমার বিবেচনায়, ইংরেজের যুদ্ধ, গোয়েন্দা ব্যতীত, বোধ হয় এক দিনও চলে না। বিশেষ, সিপাহী-যুদ্ধের কালে ত কথাই ছিল না। তখন গুপ্তচরই প্রাণসর্ব্বস্ব, প্রাণধন, প্রাণনাথ ছিল। উপযুক্ত গুপ্তচরের সম্মান, আরাধ্য দেবতা অপেক্ষা অধিক ছিল। শুধু সম্মান নহে,—তাহার উপর ভাব, ভক্তি, ভালবাসা,—স্নেহ, মমতা, যত্ন,—অনন্ত, অপরিমেয় ছিল। গোয়েন্দা দেখিলে, পুলকে অঙ্গ পূর্ণ হইত। ইচ্ছা হইত, তাহার সহিত কোলাকুলি করিয়া, তাহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করি। তাহার বদন-চন্দ্র-বিনিঃসৃত বাক্য-সুধা, কর্ণ দ্বারা প্রাণ ভরিয়া পান করিতাম।

আমাদের অশ্বারোহী-সৈন্য-দল একরকম শিক্ষিত হইল। সেনাগণের স্ফুর্ত্তি, সাহস, তেজস্বিতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অন্তরে এবং মুখে,—ভিতরে এবং বাহিরে, সকলেই ইংরেজের জন্য যুদ্ধ করিয়া, ইংরেজের মঙ্গলনার্থ প্রাণ দিব বলিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিল। বিশেষ যেদিন, বিদ্রোহী-সৈন্য, নিশাশেষে আসিয়া, দস্যুর ন্যায় আমাদের ঘাটি আক্রমণ করে, এবং অধিকাংশ প্রহরীকে নিহত করত কয়েকজনের কাটামুণ্ড বিজয়-চিহ্ন-স্বরূপ লইয়া যায়, সেইদিন হইতে বিদ্রোহী-সেনার উপর আমাদের অশ্বারোহী-দলের ক্রোধ চতুর্গুণবৃদ্ধি হয়। প্রত্যেক অশ্বারোহীর অন্তরে প্রতিশোধ লইবার চিন্তা অহরহ জাগরূক। ভাব দেখিয়া, আমার হৃদয়ে আহ্লাদ আর ধরে না।

একদিন কথা-প্রসঙ্গে ধওকল-সিং-প্রমুখ কয়েক জন সর্দার আমাকে কহিল, "বাবু-সাহেব! আমাদিগকে আজ্ঞা দিন্," আমরা সদলে সজ্জিত হইয়া, হল্‌দোয়ানিতে গিয়া, বিদ্রোহিগণকে আক্রমণ করি। প্রায় সাড়ে পাঁচশত সওয়ার আমরা একত্র মিলিত হইয়াছি। আকার-প্রকারে, বল-বীর্য্যে প্রত্যেক সওয়ারই এক একজন বীরপুরুষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বিদ্রোহিগণকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে সকলেরই হৃদয়ের একান্ত অভিলাষ। আপনি এরূপ সুযোগ, এরূপ শুভ সময় সহজে আর পাইবেন বলিয়া বোধ হয় না। আমরা সাড়ে পাঁচশত সওয়ার যদি ভীমবেগে, মার্‌মার্ শব্দে বিদ্রোহীদের ছাউনিতে গিয়া পড়ি, তাহা হইলে কখনই তাহারা আমাদের সে বেগ সহ্য করিতে সক্ষম হইবে না। ছত্রভঙ্গ হইয়া তাহারা নিশ্চয়ই পলায়ন-পরায়ণ হইবে। অতএব আমাদিগকে আক্রমণের আজ্ঞা দিন্।"

আমি। সে এক্তার আমার নাই। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই, আপনারা এত উতলা হইবেন না, কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য-ধারণ করুন। আপনাদের বল, বিক্রম এবং সুশিক্ষা দেখিয়া সাহেবগণ বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের এখনও এক বিশেষ অভাব আছে। উপযুক্ত, সুশিক্ষিত, বিশ্বাসী গুপ্তচর চাই। এখন যে দুই তিনজন চর আছে, তাহাদের দ্বারা ভাল কাজ হইতেছে না।

ধওকলসিং কহিল,—"তাহার আর অভাব কি?"

পরদিন আটজন গুপ্তচর মনোনীত হইল ইহারা বিশ্বাসী, কার্য্যদক্ষ, এবং চতুর-চূড়ামণি ইহাদের মধ্যে কেহ সন্ন্যাসী সাজিল, কে নাপিত হইল, কেহ গোয়ালা হইল,—একজ বেশ সেতার বাজাইতে জানিত, সে ব্যক্তি সেতার-বাদক হইয়া, বিদ্রোহী-সেনাদল মধ্যে

প্রবেশ করিল। এইরূপ বিভিন্ন সাজে সজ্জিত হইয়া, চারিজন গোয়েন্দা, নবাব খাঁ-বাহাদুরের গতিমতি-জানিবার জন্য বেরিলি সহরে গমন করিল; বাকী চারিজন ক্রমান্বয়ে হলদোয়ানিতে উপস্থিত হইল। যে গোয়ালা সাজিয়াছিল, সে দুধ-দই বেচিবার ভাণ করিয়া চলিল; নাপিত, ভাঁ'ড় হাতে করিয়া চলিল।

বেরিলীতে খাঁ-বাহাদুর কি করিতেছেন, তাহা জানিবার জন্ম আমরা উৎসুক ছিলাম। কয়েকদিন পরে একজন গোয়েন্দা তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া এইরূপ সংবাদ প্রদান করিল;—

"যে ব্যক্তি সেনাপতি হইয়া শেষরাত্রে আমাদের ঘাটি আক্রমণ করে, তাহার নাম হবিবউল্লা খাঁ। তিনি আমাদের থানাদারের ছিন্ন মস্তক স্বয়ং বেরিলিতে লইয়া আসেন এবং খাঁ-বাহাদুরকে বলেন, 'আমি ছয় ঘণ্টা কাল ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া ইংরেজ-সেনা পরাজিত করিয়াছি,—এবং জয়চিহ্নস্বরূপ ইংরেজের দেশীয় সেনাপতির মাথা কাটিয়া আনিয়াছি।' এ কথা শুনিয়া নবাব বড়ই সন্তুষ্ট হন এবং হবিবউল্লাকে তিনি এক সুন্দর বহুমূল্য পরিচ্ছদ দিয়া সম্মানিত করেন। বেরিলীতে একজন হিন্দুর এক উৎকৃষ্ট অট্টালিকা ছিল; হবিবউল্লা সেই বাড়াটী চাহেন; নবাব সে বাড়ী বাজেয়াপ্ত করিয়া লন; কিন্তু শেষে তাহা হবিবউল্লাকে না দিয়া নিজেই তাহা দখল করিতে লাগিলেন। ক্রোধে, ক্ষোভে হবিবউল্লা লক্ষ্ণৌ চলিয়া গেল।

"দেখিলাম, রাজত্বে কোনরূপ নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই, কেবল অত্যাচার অবিচার। নবাব-বাহাদুরের রাজ্যশাসন বিড়ম্বনা বলিলে, অত্যুক্তি হয় না। নবাব একদিক্ নিয়মবদ্ধ করিতে গেলে অন্যদিকে অনিয়ম হইয়া পড়ে। ভাণ্ডারে তাঁহার টাকা নাই। সৈন্যগণ দুই মাসের করিয়া বেতন পায় নাই। অন্যান্য সিবিল-কর্ম্মচারিগণের তিন মাসের করিয়া বেতন বাকী পড়িয়াছে। যখন টাকার জন্য বিশেষ টানা-টানি পড়িল, তখন আবার হতভাগ্য মিশ্র বৈজনাথের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। নবাবের কয়েকজন কর্ম্মচারী বৈজনাথের বাটী উপস্থিত হইয়া বলিল,—'তোমাকে নবাব শীঘ্র ডাকিতে-ছেন, আমাদের সঙ্গে চল। তোমার নামে গুরুতর অভিযোগ আসিয়াছে। নবাব বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ পাইয়াছেন, তোমার বাটীতে ইংরেজ লুক্কায়িত আছে; এবং তুমি নাইনি-তালস্থ কমিশনর সাহেবকে চিঠি-পত্র লিখিয়া থাক।'

"কর্ম্মচারিগণের কথায় বৈজনাথ, নবাব সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলে, নবাব কহি-লেন,—'তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ সমস্ত প্রমাণীকৃত হইয়াছে। তুমি যদি আপনার মঙ্গল চাও, তাহা হইলে এখনই জরিমানা স্বরূপ আমাকে পাঁচলক্ষ টাকা প্রদান কর, নচেৎ নিস্তার নাই।' বৈজনাথ যোড়হাতে উত্তর করিলেন,—'প্রকৃতই আমি নিরপরাধী, আমার গৃহে কোন ইংরেজ লুক্কায়িত নাই, এবং কমি-শনরকে চিঠি-পত্রও আমি লিখি নাই। আমাকে ক্ষমা করুন। বিশেষ, আমি পাঁচলক্ষ টাকা দিতে কোথায় পাইব?'

"টাকা দিতে একান্ত অস্বীকার করায়, মিশ্র বৈজনাথকে নবাব সাহেব কারাগারে রুদ্ধ করেন এবং অশেষ যন্ত্রণা দিতে থাকেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হয়। শেষে বৈজনাথ কারাধ্যক্ষ সাইফুল্লা খাঁকে কুড়ি হাজার টাকা ঘুস দিয়া, অতি গোপনে কারাগার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন।

"বৈজনাথের পলায়ন-বার্ত্তা শুনিয়া, নবাব ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন, এবং বৈজনাথের গৃহ-দ্বার লুণ্ঠন করিবার হুকুম দিলেন। কিন্তু দেওয়ান শোভারামের প্ররোচনায় লুণ্ঠনকার্য্য

হইতে সে যাত্রা ক্ষান্ত হন। এক্ষণে বৈজনাথ কোথায়, তাহা আমি জানি না। শুনিলাম, তিনি বেরিলী পরিত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তী কোন গ্রামে গিয়া লুকায়িত আছেন।

"এই ঘটনার কিছুদিন পরে, টাকা সংগ্রহের জন্য কি উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে, সে বিষয় লইয়া খাঁ-বাহাদুর খাঁ এবং তাঁহার অমাত্যবর্গ, প্রকাশ্য রাজদরবারে পরামর্শ করিতে বসিয়া গেলেন। শেষে স্থির হইল, একটী টাকশাল বসান প্রয়োজন। নানাদেশ এবং বেরিলী-নগর লুণ্ঠন করিয়া, বহুমূল্যের বহুরূপ রূপার এবং সোণার অলঙ্কার সংগৃহীত হইয়াছে। রাজ-ভাণ্ডারে বিস্তর সোণা-রূপার বাসনও আছে। কিন্তু এ সমস্ত জিনিষ সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন কাজেই আসিবে না। সেই গহনায় ও বাসনে টাকা এবং মোহর প্রস্তুত করিতে হইবে; টাকা এবং মোহরে সাহ-আলমের মূর্ত্তি অঙ্কিত হইবে। বেরিলীতে রামপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তির বাটীতে একটী টাকশাল ছিল। সেই টাকশাল বল-পূর্ব্বক নবাব-বাটীতে উঠাইয়া আনা হইল; এবং তাহাতেই টাকা ও মোহর হইতে লাগিল। এই নূতন টাকা ও মোহর প্রচলিত হইতে বিশেষ কষ্ট হইল না। কারণ টাকা ওজনে পুরা ষোল আনা অপেক্ষা কিছু বেশী ছিল। সুতরাং সকল অধিবাসী তাহা লইতে লাগিল। কিন্তু খাঁ-বাহাদুর খাঁর অপরিসীম আশা ইহাতে মিটিল না। প্রত্যহ তাঁহার অর্থের যত প্রয়োজন, টাকশালে প্রত্যহ তাহার সিকি টাকাও প্রস্তুত হইয়া উঠে না। সুতরাং এক্ষণে খাঁ-বাহাদুর অর্থাভাবে চারিদিক্ শূন্যময় দেখিতেছেন।

"মীর আলম খাঁ, খাঁ-বাহাদুরের একজন আত্মীয় ব্যক্তি। তিনি আসিয়া খাঁ-বাহাদুরকে সংবাদ দিলেন,—'নারা নামক মৌজার অধি-বাসী, বলদেব গীর গোসাঁই, ধনশালী ব্যক্তি। তাঁহার ভাণ্ডারে নগদ তিন লক্ষ টাকা মজুদ আছে।' এই সংবাদ পাইবামাত্র নবাব পর-দিন কুড়িজন অশ্বারোহী এবং পঞ্চাশ জন পদাতিক সঙ্গে দিয়া পেস্কার আখ্‌বর খাঁকে বলদেব গীরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে আখ্‌বর খাঁ সৈন্য সমভিব্যাহারে নারায় গিয়া পৌঁছিলেন। বলদেব গীর একজন সম্মানিত এবং বিশেষ প্রতাপশালী লোক ছিলেন। তাঁহার দ্বারদেশে তখন ষোল জন লাঠিয়াল ছিল এবং তিনি নিজেও একজন প্রতাপশালী সাহসী ব্যক্তি। তিনি নবাব-সৈন্যের আগমন-বার্ত্তা এবং তাঁহাদের দুরভি-সন্ধি বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ বাটীর দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং দ্বারবানগণকে কহি-লেন,—'তোমরা দ্বার রক্ষা কর। আমি স্ত্রীলোকগণকে রক্ষার জন্য অন্দরে চলিলাম।' নবাব-সৈন্য বহির্ব্বাটীতে আসিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু লৌহ-নির্ম্মিত বিষম কপাট কিছুতেই ভাঙ্গিতে পারিল না। বিশেষ দ্বারবানগণ ভিতর দিক্ হইতে এরূপ ইট্ পাট্‌খেল, পাথর অজস্র বর্ষণ করিতে লাগিল যে, নবাব-সৈন্য কিছু-তেই তথায় তিষ্ঠিতে পারিল না। এইরূপে অকৃতকার্য্য হইয়া, নবাব-সৈন্য খিড়কীর দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। আর রক্ষা নাই। বলদেব গীরের পরম সুন্দরী পত্নী তখন নিতান্ত কাতর হইয়া, বাটী হইতে পলাইবার চেষ্টা করি-লেন। কিন্তু তিনি পাষণ্ড আখ্‌বর খাঁ কর্তৃক ধৃত হইলেন। শুনিলাম, আখ্‌বর খাঁ তাঁহাকে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া সতী-রমণীর মুখচুম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছিল। মুসলমানের হস্তে স্ত্রীর এরূপ অবমাননা এবং লাঞ্ছনা শুনিয়া, বলদেব গীর বাঘের মত তথায় লাফাইয়া ঝাঁপা-ইয়া আসিয়া পড়িলেন' এবং তৎদণ্ডেই গুলি করিয়া আখ্‌বর খাঁকে শমন-সদনে পাঠাইয়া, অত্যাচারের প্রতিশোধ লইলেন। দেখিতে

দেখিতে সেই যোল জন লাঠিয়াল বলদেব গীরের নিকট উপস্থিত হইল এবং লাঠির চোটে বহুসংখ্যক নবাব-সৈন্যের মাথা গুঁড়া করিয়া ফেলিল। অবশিষ্ট সৈন্য রণে-ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

"নবাবের নিকটস্থ তহশীলদারের নিকট অবিলম্বে এই সংবাদ পৌঁছিল। তিনি পাঁচ শত সৈন্য লইয়া তৎক্ষণাৎ বলদেব গীর গোঁসাইয়ের গৃহ অবরোধ করিলেন। বলদেব, তহশীলদারকে আত্মসমর্পণ করিলেন। তহশীলদার ভদ্র ব্যক্তি। তিনি কোনরূপ কাহারও উপর অত্যাচার করিলেন না। তিনি বলদেব গীর, তাঁহার স্ত্রী এবং তাঁহার কয়েকজন আত্মীয়কে বন্দী করিলেন বটে, কিন্তু সকলকেই বিশেষ সম্মানের সহিত বেরিলীতে নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মুফ্‌তি সৈয়দ আহাম্মদের উপর এই ব্যাপারের বিচার-ভার অর্পিত হইল। তিন দিন কাল বিচার করিয়া, নানারূপ সাক্ষী ও প্রমাণ লইয়া, তিনি বলদেব গীরকে নির্দ্দোষ বিবেচনা করিয়া অব্যাহতি দিলেন। এইরূপ বিচার-ফল দেখিয়া পাঠানেরা বড়ই উত্তেজিত হইল। মৌলবী খাঁ আপন রেজিমেণ্ট হইতে কতকগুলি সৈন্য লইয়া হঠাৎ এক দিন বলদেব গীরকে আক্রমণ করত তরবারি দ্বারা তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। বিচারকর্ত্তা মুফ্‌তি সৈয়দ আহাম্মদও বড় বেশী নিরাপদে থাকিতে পারেন নাই। নবাব কর্ত্তৃক হঠাৎ তিনি একদিন পদচ্যুত হইলেন এবং পরম্পরায় তিনি শুনিলেন যে, পাষণ্ডগণ তাঁহাকেও একদিন হঠাৎ হত্যা করিয়া ফেলিবে। তিনি প্রাণভয়ে দূরবর্ত্তী পল্লীগ্রামে পলাইয়া গিয়াছেন। নবাব তাঁহার অন্বেষণার্থ চারিদিকে চর পাঠাইলেন; কিন্তু কোথাও তাঁহার দেখা পাওয়া গেল না।

"এইরূপ এবং অন্যরূপ নানা কারণে বেরিলীস্থ যাবতীয় হিন্দুসম্প্রদায় নবাবের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন এবং তাঁহারা প্রায় সকলেই অন্তরে, ইংরেজের আগমন প্রার্থনা করিতেছেন।"

বেরিলী হইতে একজন মাত্র গোয়েন্দা প্রত্যাগত হইয়া, উপরি-উক্ত কথা সকল প্রকাশ করিল। তৎপরে আরও এক সপ্তাহ গত হইল, অন্য কোনও গোয়েন্দা ফিরিল না। হলদোয়ানির সংবাদ জানিবার জন্য আমাদের বিশেষ উৎকণ্ঠা জন্মিল। একদিন আহারাদির পর বিশ্রাম করিতেছি, বেলা প্রায় ২॥ টা হইবে। একজন ভিক্ষুক আসিয়া উপনীত হইল। সে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় আকুল হইয়াছে জানাইল। তাহার দীর্ঘ দাড়ি, দীর্ঘ কেশ; মুখে তিন চারিটা আঁচিল। রং কৃষ্ণবর্ণ। আমি ক্ষুধার্ত্ত অতিথি দেখিয়া ভৃত্যকে আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিতে কহিলাম। তখন সেই অতিথি আমাকে হাসিয়া কহিল,—"বাবু সাহেব! চিনিতে পারিলেন না? আমিই সেই গুপ্তচর,—বিদ্রোহী-সেনার গতি-মতি অবগত হইবার জন্য হল্‌দোয়ানিতে গিয়াছিলাম।"

আমি সবিস্ময়ে, তাহার মুখপানে চাহিলাম,—বলিলাম, "তুমিই কি সেই? তোমার মুখে আঁচিল হইল কিরূপে?"

গুপ্তচর কহিল,—"ঐ আঁচিল কৃত্রিম। আমি বহুরূপী সাজিতে শিখিয়াছি। আমি স্ত্রীবেশ ধারণ করিলে, হঠাৎ আমায় কেহ চিনিতে পারে না। ঠিক স্ত্রীলোকের স্বরে আমি কথা কহিতে পারি।"

গুপ্তচরের মুখে আমি এই কথা শুনিয়া পুলকিতাঙ্গ হইলাম। তাহাকে ধন্য ধন্য বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলাম। শেষে জিজ্ঞাসিলাম, "হলদোয়ানির সংবাদ কি বল?"

গুপ্তচর বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল;—

"বিদ্রোহী-সেনাধ্যক্ষ মৌলবী ফজলহক্

সসৈন্যে স্বয়ং কালাডুঙ্গি আক্রমণার্থ ব্যস্ত হইয়াছেন। কারণ, বেরিলী হইতে নবাব খাঁ-বাহাদুর তাঁহাকে বারংবার চিঠি লিখিতেছেন যে, 'তুমি শীঘ্র গিয়া কালাডুঙ্গি এবং নাইনিতাল আক্রমণ কর এবং ইংরেজদিগকে অস্ত্র দ্বারা নিহত করিয়া ফেল।' শেষ চিঠি এই আসিয়াছে, 'যদি তুমি এ কাজ করিতে অক্ষম হও, তবে পদত্যাগ করিয়া বেরিলী চলিয়া আসিবে।' এই কথা ফজলহক্ শুনিয়া আপাততঃ কালাডুঙ্গি আক্রমণ করা সঙ্কল্প করিয়াছেন।"

আমি গুপ্তচরকে জিজ্ঞাসিলাম,—"তুমি কিরূপে এ সব বৃত্তান্ত অবগত হইলে ?"

গুপ্তচর কহিল,—"আমি গোয়ালা সাজিয়া তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক গ্রামে থাকিতাম। আপনাদের প্রদত্ত টাকা হইতে দুধ, দই, ছানা কিনিয়া লইয়া, প্রত্যহ বিদ্রোহীদের ছাউনিতে গিয়া ঐ সমস্ত সামগ্রী বেচিতাম। যে ব্যক্তি নগদ পয়সা দিতে অক্ষম হইত, তাহাকে ধারে দিতাম। ধারে জিনিষ দেওয়ায় আমার খুব পসারবৃদ্ধি হইল। ক্রমে মাখামাখি ভাব হইল। শেষে আমি বিদ্রোহীদের গোয়েন্দা হইয়া ইংরেজ-সেনার গতিমতি জানিবার জন্য কালাডুঙ্গিতে আসিয়াছি। আমার উপর তাহাদের খুব বিশ্বাস জন্মিয়াছে। আমাকে তাহারা খুব ভালবাসে।"

আমি। বল কি ? বল কি ? তোমার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিতেছি।

গুপ্তচর। আমি এখানে দুই তিন দিন থাকিয়া হলদোয়ানিতে যাইব। যেদিন তথায় পৌঁছিব, সেদিন রাত্রেই পথ-প্রদর্শক হইয়া, আমি কালাডুঙ্গি আক্রমণার্থ বিদ্রোহী-সেনাকে কালাডুঙ্গি অভিমুখে লইয়া আসিব। ঠিক সোজাপথে না আসিয়া, পশ্চিমদিক্ দিয়া যে বাঁকা পথ আছে, তাহা দিয়া আসিব। আপনারা তন্নিকটবর্ত্তী ঝোপের আড়ালে সসৈন্যে লুকাইয়া থাকিবেন। যেমন তাহারা ঐ পথ দিয়া যাইবে, আপনারা অমনি বাঘের মত লম্ফ দিয়া তাহাদের উপর পড়িবেন এবং কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবেন। সম্ভবতঃ বার শত বিদ্রোহী সেনা আমাদের সঙ্গে থাকিবে। আপনারা প্রস্তুত হউন। কিন্তু দেখিবেন,—অতি গোপনে, অতি নীরবে, অতি সাবধানে এ কার্য্য সাধন করিবেন। কোনও অশ্বারোহীকেই এখন এ কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই।

আমি সেই গুপ্তচরকে সঙ্গে লইয়া, বারওয়েল এবং হণ্টার সাহেবের নিকট আসিলাম। তাঁহারাও সেই গুপ্তচরকে বিশেষ সাদর-সম্ভাষণ এবং সম্মান দেখাইলেন। আর গুপ্তচরের কথা অনুমোদন করিয়া, নিশাযোগে তিন শত সৈন্যসহ তথায় লুকাইয়া থাকিবার জন্য আমাকে আদেশ প্রদান করিলেন।

অনুমতির জন্য তৎক্ষণাৎ কর্ণেল ক্রস্‌ম্যানকে নাইনিতালে পত্র লেখা হইল। তিনি পত্রের উত্তর না দিয়া স্বয়ং অশ্বারোহণে কালাডুঙ্গি আসিলেন। এবং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গুপ্তচরের মুখে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, বিদ্রোহী-সেনাকে গোপনে আক্রমণ করিবার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন।

গুপ্তচর দুই দিন থাকিয়া তৃতীয় দিনে হলদোয়ানি চলিয়া গেল। সেই দিন সন্ধ্যার পর আমরা নীরবে সজ্জিত হইতে লাগিলাম। তিন শত পঁচিশ জন আরোহী লইয়া আমি এবং বারওয়েল সাহেব সেই বাঁকা পথের দিকে ধীরে, ধীরে, অতি ধীরে যাত্রা করিলাম। সেই রাস্তার দুই ধারেই জঙ্গল ছিল। আমরা এক ধারে সেনাস্থাপন না করিয়া দুই ধারেই স্থাপন করিলাম। একদিকে দুইশত সওয়ার রহিল, অন্যদিকে একশত পঁচিশজন মাত্র রহিল। জঙ্গলে এরূপ ভাবে লুক্কায়িত রহিলাম যে,

এখানে সেনাদল আছে, তাহা ঠিক করিতে সহজে কেহ সক্ষম হইত না। শিক্ষিত ঘোটক-বৃন্দও আজ্ঞামত নীরবে রহিল। ক্ষুরে শব্দ পর্য্যন্ত করিল না। সেই বাঁকা পথের এক পোওয়া পথ দূরে আমরা অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। রাত্রি ২টা বাজিল। এমন সময় দেখি, বিদ্রোহী সৈন্য দলে-দলে বাহির হইয়াছে, এবং কালাডুঙ্গি অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ঘোর অন্ধকার রাত্রি। বিদ্রোহীদের সঙ্গে আলো আছে, কিন্তু তাহা তত উজ্জ্বল নহে; এবং সংখ্যাতেও তাহা কম। সেই রাস্তা বড়ই উঁচু নীচু এবং সঙ্কীর্ণ। কোন কোন বিদ্রোহী-সেনা দ্রুতগমন জন্য হোঁচট্ খাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিল।

আমরা বংশীরব করিলাম না। ইঙ্গিতমাত্র আমরা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া যাত্রা করিলাম। নিকটে আসিয়াই বেগে আক্রমণ করিলাম। উভয় দিক্ হইতেই এককালে আক্রমণ করা হইল। বিদ্রোহী-সৈন্য এরূপ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাহাদের কাঁধের বন্দুক কাঁধেই রহিল,—আর, এদিকে আমাদের এক এক তরবারির আঘাতে তাহারা ছিন্নমস্তক হইয়া ভূতলে পড়িতে লাগিল। ভয়ঙ্কর অন্ধকারে ভীষণ গোলযোগ বাধিল। শেষে শত্রু মিত্র স্থির করা দুরূহ হইয়া পড়িল। কিন্তু সুবিধা এই, অধিকক্ষণ যুদ্ধ করিতে হইল না। বিদ্রোহী-সেনা পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে কোথায় যে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইল, তাহার আর ঠিকানা রহিল না। এই যুদ্ধে তাহাদের ৮০ জন লোক হত হয়; আহতের সংখ্যা দেড় শতের কম নহে। আমাদের পক্ষে ৫ জনের অধিক হত হয় নাই;—১২ জন মাত্র আহত হইয়াছিল। আমার ইচ্ছা ছিল, মৌলবী ফজল-হকৃকে বন্দী করা। যখন বিদ্রোহিগণ আমাকে বন্দী করিয়া কালাডুঙ্গি হইতে হলদোয়ানিতে লইয়া যায়, তখন এই ফজলহকৃই আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। সুতরাং তাঁহার উপর আমার বিলক্ষণ রাগ ছিল। কিন্তু সে রাত্রে, সে ঘোর অন্ধকারে, ফজলহকৃকে খুঁজিয়া পাইব কোথায়? তিনি বোধ হয়, সর্ব্বাগ্রেই পলাইয়া থাকিবেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও আমার মনটা কেমন বিমর্ষ হইল।

একদিন পরে, সেই গুপ্তচর খুঁড়াইতে খুঁড়াইতে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত। আমি জিজ্ঞাসিলাম, এ আবার কি রকম ভাব? সে কহিল, "এবার ভাব বড় শক্ত। সেইদিন রাত্রে আমি বড়ই আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম। আমাদের সৈন্যের অস্ত্র দ্বারা আমার প্রাণনাশ হইয়াছিল আর-কি!! যাহা হউক, দৈব আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। শেষে পায়ে এই চোট লাগিয়াছে। আমার উত্থানশক্তি এক রকম রহিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"

ডাক্তার নন্দলালকে ডাকিলাম। তিনি আসিয়া তাহার পায়ে উত্তমরূপ ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। এই গুপ্তচরের সেবা-শুশ্রূষার ত্রুটী করিলাম না। এক মাস মধ্যে সে আরোগ্য হইল। তবে সে চিরকালের জন্য খোঁড়া হইয়া গেল। সিপাহী-যুদ্ধের অবসানে, ইংরেজের স্বরাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির পর, সে অনেক টাকা পুরস্কার পাইয়াছিল।

যে গোয়েন্দা নাপিত হইয়া বিদ্রোহীদের শিবিরে গিয়াছিল, সে আর ফিরিল না। বোধ হয়, ধরা পড়িয়া ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়া থাকিবে।

গুপ্তচরের কার্য্য বড়ই কঠিন। একটু পদস্খলনেই সর্ব্বনাশ। অন্যান্য গুপ্তচরের বিবরণ আগামী বারে বিবৃত করিব। কেবল লড়াই করিতে জানিলেই যুদ্ধে জয় লাভ করা যায় না;—কল-কৌশল সর্ব্বপ্রধান অস্ত্র;—তন্মধ্যে গুপ্তচর ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ।

জন্মভূমি।

৪র্থ ভাগ। } মাঘ। ১৩০০। { ২য় সংখ্যা।

রূপসী হিরণ্ময়ী।

১। যেন কেমন-কেমন।

বাঙ্গাল নিধিরাম মরিয়া গেলেন, তাহার পর কি হইল? হিরণ্ময়ীর কি হইল? অনেকে এই কথা জিজ্ঞাসা করেন। জিজ্ঞাসা করিতেও পারেন। কারণ, মাথার উপর ভগবান আছেন। হিরণ্ময়ীর মত কলঙ্কিনী যদি সুখে সচ্ছন্দে জীবনযাপন করে, তাহাহইলে ধর্ম্মাধর্ম্ম সব মিথ্যা, বিধাতার সৃষ্টি বৃথা। তবে ভাবিয়াছিলাম এই যে, সে হতভাগিনীর কথা লিখিয়া আমার লেখনী কেন আর কলঙ্কিত করি? তাই চুপ করিয়াছিলাম। কিন্তু সকলে বলেন যে, হিরণ্ময়ীর শেষ দশা কি হইল তাহা না বলিলে ধর্ম্মের অবমাননা করা হয়। তাই বলিতে হইল। কিন্তু লিখিতে আমার মন হইতেছে না, কলম সরিতেছে না।

হিরণ্ময়ী যখন বলিলেন,—"দেখ, দেখ! বাঙ্গাল কি করিতেছে দেখ! ঠাট করিয়া আবার বাবার কোলে শোয়া হইয়াছে!" তখন নবীন সেই ঘাটের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। হাতে পৈতা, অৰ্দ্ধ জলমগ্ন, ভূতলশায়ী নিধিরামের দিকে নিমেষের নিমিত্ত তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। নৌকা মোড় ফিরিল, আর তিনি কিছু দেখিতে পাইলেন না।

অধিক আর কিছু দেখিবার আবশ্যকও ছিল না। যাহা কিছু দেখিলেন, তাহাতেই যেন তাঁহার মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। হিরণ্ময়ীর সেই মৃদু মধুর কথা গুলি শেল সমান তাঁহার বুকে বাজিল।

নবীন বলিলেন,—"হিরণ্ময়ি! ঘোর সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আমার মন বলিতেছে, নিধিরামের অমঙ্গল ঘটিয়াছে। আমি আজ ঐ দেবতা-সমান ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণকে বধ করিলাম। তোমার বিদ্রূপ বাক্য শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। এখন বুঝিতেছি, তুমি ঐ দেবপুরুষের সেবা-দাসী হইবার উপযুক্ত পাত্রী নও, তাই তুমি তাঁহাকে পাইলে না। এখন মন দিয়া শুন, তোমাদের জন্য নিধিরাম কিরূপ কষ্টভোগ করিয়াছেন, কিরূপ ভয়াবহ বিপদ সমূহ হইতে রক্ষা পাইয়া তোমার পিতার উদ্ধার সাধন করিয়াছেন!"

নিধিরামের সমুদয় বিপদ ও ক্লেশের কথা নবীন হিরণ্ময়ীকে বলিলেন।

হিরণ্ময়ী উত্তর করিলেন,—"নিধিরাম আমাদের নিমিত্ত কষ্ট পাইয়াছেন সত্য, নানা বিপদে

পড়িয়াছেন সত্য। কিন্তু আমরাও কি তাঁহার কিছু করি নাই? যখন তিনি বিসূচিকা রোগ-গ্রস্ত হইয়া আমাদের বাটীতে আসিলেন, তখন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আমরা তাঁহার সেবা করিয়াছিলাম। যখন গোবিন্দ ও তাহার সঙ্গীদিগের লাঠির প্রহারে তিনি আহত হন্, তখনও আমরা সেইরূপ সেবা করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলাম। আমাদিগকে তিনি সাত শত টাকা দিয়াছিলেন, এই বৈ তো নয়! তা, আমরাও তাঁহার যাহা করিয়াছি, সাত শত টাকায় তাহা পরিশোধ হয় না। ভাবিয়া দেখিতে গেলে তিনি আমাদের কিছুই করেন নাই, বরং আমরা তাঁহার অনেক করিয়াছি।"

নবীন চুপ। একবার কেবল ক্ষণকালের নিমিত্ত তাঁহার মনে হইল,—"কালসাপিনী বুকে ধরিলাম!" কিন্তু হিরণ্ময়ীর রূপে তাঁহার মন এখন আচ্ছন্ন। তিনি এখন অন্ধ, উন্মত্ত। এখন তাঁহার স্থির বিশ্বাস যে, হিরণ্ময়ী দেবী-রূপা লক্ষ্মী স্বরূপা পবিত্রময়ী নারী। তিনি সত্যের আধার, সতীত্বের আদর্শ। তিনি যাহা বলেন তাহাই সত্য, তিনি যাহা করেন তাহাই ঠিক।

নবীন ও হিরণ্ময়ী ঘরে পৌঁছিলেন। নবীনের মাতা পিতা যথাবিধি সমাদরে পুত্রবধূকে ঘরে লইলেন। হিরণ্ময়ীর রূপে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। মেঘের কোলে সৌদামিনী অতি লাবণ্যময়ী। প্রতিবাসীগণ সকলে এক বাক্য হইয়া বলিলেন যে, হিরণ্ময়ীর রূপ সেই মেঘের কোলে সৌদামিনীর মত। সে রূপের পানে স্থির হইয়া চাহিবার যো নাই, চক্ষু ঝলসিয়া যায়, মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

নবীনের মাতা কিন্তু সেই অতুল রূপরাশি দেখিয়া সুখী হইলেন না। তাঁহার মনে যেন কেমন একটা ঘৃণার ভাব উদয় হইল। স্বামীকে তিনি বলিলেন,—"দেখ! বৌ-মার সব ভাল বটে, কিন্তু তাঁর চাউনিটা যেন কেমন-কেমন। যেন "কি দেখি কি দেখি, যেন কি করি" করি, সর্ব্বদা এই ভাব। বৌ মা বোধ হয় একটু চঞ্চলা হইবেন।"

২। মনের বাসনা।

হিরণ্ময়ী শ্বশুরবাড়ীতে ঘর-কন্না করিতে লাগিলেন। সেই চঞ্চলভাব ক্রমে বাড়িতে লাগিল, ঘুচিল না। সকলে দেখিলেন, যে, হিরণ্ময়ীর লজ্জা-সরমও কিছু কম। উচ্চরবে হাসিলে, কি কথা কহিলে, যদি শাশুড়ী বকিতেন, তাহা হইলে দুই এক দিন হিরণ্ময়ীর মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইত না, যেন এমন ধীর শান্ত স্ত্রীলোক আর জগতে নাই। কিন্তু সে কেবল দুই এক দিনের জন্য,—তাহার পর আবার যে সেই। জানালা দিয়ে উকি মারাটীও বিলক্ষণ ছিল। ধরণ চলন ভাব ভঙ্গী সকলই—আর দুঃখের কথা কি বলিব?—ভদ্রলোক গৃহস্থ কুল-বধূর মত নয়।

নবীন মাঝে মাঝে হিরণ্ময়ীকে বুঝাইতেন। নবীন বলিতেন,—"দেখ হিরণ্ময়ী! সকলেই তোমার নিন্দা করিতেছে। কাহারও মুখে তোমার সুখ্যাতি শুনি না। তোমার নিন্দা শুনিলে আমার মনে দুঃখ হয়। ধীর শান্ত হইবে, সকলে বলিবে যে, বৌ-টীর যেমনি রূপ, তেমনি গুণ। সে কথা শুনিতে ভাল, কি নিন্দা শুনিতে ভাল? তোমার বুদ্ধি আছে, তুমি কিছু নির্ব্বোধ নও। একবার স্থিরচিত্তে বুঝিয়া দেখ, কোন্‌টী ভাল?"

হিরণ্ময়ী মধুর হাসি হাসিয়া নবীনকে বুঝাইয়া দিলেন যে, শশুর, শাশুড়ী, প্রতিবাসিনীগণ, অর্থাৎ কিনা পৃথিবীর আর যাবতীয় লোক, সবাই মন্দ, সবাই মিথ্যাবাদী। সকলেই মিথ্যা মিথ্যা তাঁহার নিন্দা করিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে ভাল কেবল হিরণ্ময়ী এক আপনি নিজে, আর সবাই কুলোক।

হিরণ্ময়ীতে নবীন আচ্ছন্ন, নবীন অন্ধ উন্মত্ত। নবীন তাহাই বুঝিলেন।

নবীনকে এক দিন হিরণ্ময়ী বলিলেন,—"দেখ! এই আরসীই হইতেছে যত অনিষ্টের মূল। যখন আরসী দিয়া নিজের মুখ দেখি, যখন নিজের অতুল সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারি, তখন জগতের লোকের জন্য মনে বড় দুঃখ হয় আমি ঘরের ভিতর বদ্ধ হইয়া রহিলাম, জগতের লোক এ অপূর্ব্ব রূপ রাশি দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিতে পাইল না। মনে মনে ভাবি যে, আমার এই অনুপম রূপ দেখিলে জগতের লোক পাগল হইয়া আমার পদানত হয়। মুনি হউন, ঋষি হউন,যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারি।

নবীন উত্তর করিলেন,—"ছি হিরণ্ময়ী এরূপ কথা মুখে আনিতে নাই, এরূপ সাধ মনে স্থান দিতে নাই। তুমি ভদ্র লোকের মেয়ে, তুমি ভদ্র লোকের বৌ। এরূপ পাপ কথা আর কখনও মুখে আনিও না।"

হিরণ্ময়ী বলিলেন,—"লেখা পড়া শিক্ষা করা আমার বড় সাধ। যদি লেখা পড়া পাই, তাহা হইলে আর কিছুই চাই না। তাই লইয়া ভুলিয়া থাকি, ওরূপ কথা আর মনে উদয় হয় না।"

নবীন সেই দিন হইতে হিরণ্ময়ীকে লেখা পড়া শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। যখন পড়িতে লিখিতে শিখিলেন, নবীন তখন হিরণ্ময়ীকে মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি পুস্তক আনিয়া দিলেন। কিন্তু তাহা পড়িতে হিরণ্ময়ীর মন হইল না। নাটক, নভেল, বটতলার চটি, গানের পুস্তক, এই সকলে হিরণ্ময়ীর মতি।

এক দিন হিরণ্ময়ী একজন প্রতিবাসীর বাড়ী বিবাহ-বাসরে গিয়াছিলেন। সেখানে কিনুর মা গান করিতে আসিয়াছিলেন। কিনু ও কিনুর মা ব্যবসাদার লোক। কিনু ভিক্ষা করিয়া প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব করিয়া থাকেন। তাহাতেই তাঁহার সংসার নির্ব্বাহ হয়। কিনু সংবৎসর বাটীতে থাকেন না, পূজা করিবার নিমিত্ত দেশ-বিদেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান। পূজার পূর্ব্বে বাটী আসেন। বাটী আসিয়া একখানি প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া লন্। পূজা আচ্ছা নাম মাত্র। তবে ঢাকি ঢুলি থাকে, সমারোহে বাজনাটা হয়। একবার অষ্টমি পূজার দিনে কিনুর মা একটী পাত্র হাতে করিয়া একজন প্রতিবাসীর বাটীতে দা'ল চাহিতে গিয়াছিলেন। কিনুর মা বলিলেন,—"তোমরা বাছা আমাকে একটু দাল দিতে পার? বাজনদারদের দুটী ভাত দিতে হইবে। ব্যঞ্জন তরকারি কিছুই নাই। তাই মনে করিলাম, তোমাদের বাটী হইতে একটু দাল লইয়া বাজনদারদের এক মুঠা ভাত দিই।" প্রতিবাসিনী বলিলেন,—"সে কি কথা গো? তোমার হইল পূজা বাড়ী! আমাদের পূজা বাড়ী নয়। আমাদের বাড়ী তুমি দা'ল চাহিতে আসিয়াছ—সে কিরূপ কথা? এমন পূজা তোমাদের কি না করিলে নয়, বাছা?" কিনুর মা উত্তর করিলেন,—কিনু আমার পূজাটী যদি না করিবেন, তবে কিনু খাবেন কিটী কোরে?" কথা এই, পূজা করিবার নামে কিনু ভিক্ষা করিয়া যা অর্থ সংগ্রহ করেন, তাহার যৎ-সামান্য খরচ করিয়া বাকি পুঁজি করেন। কিনুর মাও অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন। তিনি গান গাহিতে পারেন। যদিও বৃদ্ধ হইয়াছেন, তথাপি একটু-আধটু নাচিতেও তাঁহার বিশেষ কোন আপত্তি নাই। তিনি না উপস্থিত থাকিলে লোকের বাসর জমে না। বাসর জাগিয়া তিনি টাকাটা-সিকাটা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন।

কিনুর মা'র সহিত হিরণ্ময়ীর সদ্ভাব। তাঁহার নিকট তিনি দুই চারিটা গান শিখিয়াছিলেন, একটু একটু নাচিতেও শিখিয়াছিলেন। আজ বাসরে হিরণ্ময়ী গান করিলেন, একটু নাচিলেনও। তাঁহার মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া, তাঁহার নৃত্যের ভাবভঙ্গি দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইল।

হিরণ্ময়ী বাটী আসিয়া নবীনকে বলিলেন, "দেখ, আজ আমার গান শুনিয়া সকলেই মোহিত হইয়াছিল। সকলেই বলিল,—'আহা, এমন গলা ত কখন শুনি নাই!' কিন্তু এ সব গুণ আমার বৃথা হইয়াছে। ঘরে ঠিক কারাগারের মত বদ্ধ হইয়া আছি। মনে সাধ হয় যে, পাঁচ জনকে আমার গান শুনাই। সকলেই আমার গানে মুগ্ধ হইবে।"

নবীন বলিলেন,—"হিরণ্ময়ি! তুমি পাগল নাকি? ছি ছি! ওরূপ কথা মুখে আনিও না। কুচরিত্রা স্ত্রীলোকদিগের মনে ঐরূপ বাসনা হয়। ছি ছি, ওরূপ কথা মুখে আনিও না।"

হিরণ্ময়ী উত্তর করিলেন,—"তাহাতে দোষ কি? মেয়েরা ত পাঁচ জনের সমক্ষে গান গাইয়া ও নাচিয়া থাকেন, তা বলিয়া তাঁহারা কি অসতী? লোকের একটা গুণ থাকিলে পাঁচজনকে দেখাইতে ইচ্ছা হয়।"

নবীন হিরণ্ময়ীতে আচ্ছন্ন। নবীন অন্ধ, উন্মত্ত! নবীন চুপ করিয়া রহিলেন।

কিছুদিন পরে হিরণ্ময়ীর একটী পুত্র সন্তান হইল। সকলে ভাবিলেন, এই বার হিরণ্ময়ী ধীর ও শান্ত হইবেন। অপত্য স্নেহে তাঁহার চপলতা দূর হইবে। কিন্তু তাহার কিছুই হইল না। সন্তানের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র স্নেহের উদয় হইল না। সন্তানের তিনি ঘোরতর অযত্ন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া শুনিয়া, নবীনের মাতা নিজে ছেলেটীকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ছেলেটীর নাম সকলে সুধীর রাখিলেন।

৩। গবেশচন্দ্র।

ধর্ম্ম-কথা যে হিরণ্ময়ী জানিতেন না, তাহা নহে। প্রতিবাসীদিগের জামাতা আসিলে তাহাদিগের নিকট তিনি কত ধর্ম্মকথা বলিতেন, কত সৎ উপদেশ দিতেন। সেই বিদেশীয় লোকেরা অনেকেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইতেন। তাঁহারা বলিতেন,—"আহা! এই স্ত্রীলোকটী সাক্ষাৎ সরস্বতী। যেমন রূপ, তেমনি গুণ, তেমনি ধীর, তেমনি মিষ্ট কথা, তেমনি ধর্ম্মজ্ঞান! নবীন বাবুর কি সৌভাগ্য যে, এই অমূল্য-নারী রত্ন তিনি লাভ করিয়াছেন!"

কিন্তু সকল জামাতার নিকট হিরণ্ময়ী যশ লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার ধর্ম্ম-কাহিনী ভেদ করিয়া কেহ কেহ তাঁহার মনের প্রকৃত ভাব অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার সেই লজ্জাবনত মুখে ঈষৎ চপলতার লক্ষণ দেখিয়াছিলেন, তাঁহার সেই অর্দ্ধ মুদিত ঘন পল্লব বেষ্টিত উজ্জ্বল নয়নদ্বয়ের কোণ হইতে আড়-দৃষ্টি নিরাক্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন,—"এই স্ত্রীলোকটাকে সহসা দেখিলে লক্ষ্মীরূপিণী বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে। একটু বুঝিয়া দেখিলে ইহাকে রাক্ষসীরূপিণী বলিয়া জ্ঞান হয়। রাক্ষসপুরীর বারবিলাসিনী নারীরূপে জন্ম লইয়াছে। তাই এত রূপ, তাই এত কপটতা। এ স্ত্রীলোকটা সৎকুলেই জন্ম লইয়া থাকুক, সদ্বংশেরই কুলবধূ হউক, আর রাজরাণীই হউক, পরিণাম ইহার অতি শোচনীয় হইবে।" ৬।

আত্মীয় স্বজন প্রতিবাসীদিগেরও সেই মত। তাঁহাদিগের নিকট হিরণ্ময়ীর ধর্ম্মকথা অনেক দিন হইয়া গিয়াছে। হিরণ্ময়ীর "ছোঁক ছোঁক" চঞ্চল ভাব দেখিয়া সকলে কখনও তাঁহাকে পাগল মনে করিতেন, কখনও তাঁহার দুরভিসন্ধির আশঙ্কা করিতেন। কিনুর মা আড়ালে বলিতেন,—"বৌটার ভাব যেন সদাই 'কারে খাই-কারে খাই, কারে গিলি-কারে গিলি'।"

সুলোক কুলোক সকল স্থানেই আছে। কুলোক থাকুক তাহাতে ক্ষতি নাই। স্ত্রীলোক যদি আপনার মান মর্য্যাদা, ধর্ম্ম কর্ম্ম, লজ্জা

সরম বজায় রাখিয়া চলিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে দেখিয়া মনে ভক্তির উদয় হয়, তাহার প্রতি কটাক্ষপাত করিতে সহসা কাহারও সাহস হয় না। স্ত্রীলোকের হাবভাবে চঞ্চলতা থাকিলেই বিপদ। তখন তাহার এক খানি-দোষ দশ খানি হইয়া উঠে। হিরণ্ময়ীর তাহাই হইল। ক্রমে হিরণ্ময়ীর কুযশ চারিদিকে রটিল। মন্দ লোকেরা হিরণ্ময়ীর প্রতি কুদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। কিন্তু হিরণ্ময়ীর শ্বশুর বড় মানুষ। সহসা কেহ হিরণ্ময়ীকে প্রণয়-ডোরে বাঁধিতে সাহস করিল না।

গ্রামবাসী গবেশচন্দ্রের সে ভয় ছিল না। গবেশের মান অপমানের ভয়ও ছিল না। গবেশ চিরকাল হিরণ্ময়ীর শ্বশুরের বিরোধী। মামলা মকদ্দমা, দাঙ্গা হঙ্গামা, দলাদলি সকল কার্য্যেই গবেশ হিরণ্ময়ীর শ্বশুরের বিপক্ষ। গ্রামের দুষ্টগণ সকলেই এই গবেশের দলে। সে নিমিত্ত গবেশকে সকলকে ভয় করিয়া চলিতে হইত।

গবেশ হিরণ্ময়ীর প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। গবেশ ভাবিলেন,—"স্ত্রীলোকটার যেরূপ চাল চলন দেখিতে পাই, তাহাতে ইহাকে বশ করা কঠিন কথা নহে। আমি দেখিতে মন্দ নই। বয়স আমার অধিক হয় নাই। গোটা কত ভাসাভাসা ধর্ম্ম কথা, তাহার সহিত দুই চারিটা প্রেমের কথা ও প্রেমের গান মিশাইয়া দিলেই এই হিতাহিত জ্ঞান রহিত স্ত্রীলোকটা আমার পদাশ্রিতা হইয়া পড়িবে। এখন বেটীর সঙ্গে দেখা করি কি করিয়া? বেটী যেরূপ পাগলিনী, তাতে এক আধ খানা চিঠি দিতে পারিলেই বেটী গড়াইয়া পড়িবে। তাই বা দিই কেমন করিয়া?" গবেশের এই ভাবনা হইল। হিরণ্ময়ীকে এক খানি চিঠি দিবার নিমিত্ত তিনি সুযোগে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল। মাসের পর মাস গত হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু হিরণ্ময়ীকে চিঠি লিখিতে গবেশ কোন সুযোগ পাইলেন না। চাকর-চাকরাণীকে বশ করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন; তাহাতেও কৃতকার্য্য হন নাই। কিনুর মাকেও বলিয়া দেখিলেন। কিনুর মা সাহস করিলেন না।

একদিন প্রাতঃকালে নিকটস্থ একখানি গ্রাম দিয়া গবেশ যাইতেছিলেন। পৌষ মাস, দারুণ শীত। ছেলেরা এক প্রকাণ্ড আগুন করিয়াছে, তাহার চারি ধারে বসিয়া আগুন পোহাইতেছে। ছেলেদের সঙ্গে এক জন লম্বা-চওড়া-মোটা বলবান্ পুরুষ বসিয়া আগুন পোহাইতেছিলেন। সেই পুরুষের মুখখানি গুরু গম্ভীর, অভিমানে পূর্ণ, অহঙ্কারে মটঃমটঃ। একটী ছেলে হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—"ভাই! এই পৌষ মাসের সকালে আমরা সকলেই শীতে কাঁপিতেছি। কিন্তু কর্ত্তার শীত নাই। কর্ত্তা যদি মনে করেন, তাহা হইলে, এখনি পানা-পুকুরে ডুব দিয়া আসিতে পারেন।" সেই পুরুষটীকে গ্রামের সকলে কর্ত্তা বলিয়া ডাকে। কারণ, তাঁহাকে একটু ফুলাইয়া দিলেই তিনি সকল কাজ করিতেই প্রস্তুত। ছেলেটীর সেই কথা শুনিয়া কর্ত্তা বাজখাঁই স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গামছা আছে?" ছেলেরা অমনি সব বলিয়া উঠিল,—"হাঁ, আছে বৈ কি!" অমনি একটী ছেলে আপনার বাড়ী দৌড়িয়া গেল, আর নিমেষের মধ্যে একখানি গামছা লইয়া আসিল। কর্ত্তা সেই গামছা খানি পরিয়া নিকটস্থ একটী পানা-পুকুরে গিয়া ডুব দিলেন। ছেলেরা সব হাততালি দিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। কর্ত্তা উপরে উঠিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। কত চেষ্টা করিলেন কিন্তু কাঁপুনিটী নিবারণ করিতে পারিলেন না। পাছে ছেলেদের কাছে বাহাদুরিটুকু যায়,

তাই কাজেই তাঁহাকে বলিতে হইল,—"একটু কাঁপে, কিন্তু শীত করে না।" গবেশ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া এই রহস্য আগা-গোড়া দেখিলেন।

আর একদিন বৈকাল বেলা গবেশ সেই গ্রাম দিয়া যাইতেছিলেন। ছেলেরা একটী মৌচাক ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতেছিল। পাঁকাটি জ্বালিয়া কত-কি করিয়া তাহারা মাছি তাড়াইতেছিল। কিন্তু মৌমাছি পলাইতেছিল না। এমন সময় কর্ত্তা আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া একটী ছেলে বলিয়া উঠিল,—"ভাই! আমরা কত কাণ্ড করিতেছি, তবু চাক ভাঙ্গিতে পারিতেছি না। কর্ত্তা যদি মনে করেন, তাহা হইলে এখনি প্রাচীরে উঠিয়া হাত দিয়া চাকটী ভাঙ্গিয়া আনিতে পারেন। বাজখাঁই আওয়াজে কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মই আছে?" অমনি সকলে বলিয়া উঠিল, "হাঁ, আছে বৈ কি।" অমনি দুই চারি জন দৌড়িয়া গিয়া একজনদের বাড়ী হইতে এক খানি মই লইয়া আসিল। কর্ত্তা মই দিয়া প্রাচীরে উঠিলেন। প্রাচীরের গর্ত্তে হাত দিয়া চাকটী ভাঙ্গিলেন। চাকটী হাতে লইয়া আস্তে আস্তে নামিয়া আসিলেন। চাক ভাঙ্গিবার সময় মৌমাছিতে তাঁহাকে চারিদিকে ধরিয়াছিল, সর্ব্ব শরীরে হুল ফুঠাইয়া ক্ষত বিক্ষত করিয়াছিল। কর্ত্তার মুখে কিন্তু কথা নাই। একবার উঃ কি আঃ কিছুই করিলেন না। কিন্তু সর্ব্ব শরীর ফুলিয়া উঠিল, সেটী লুকাইতে পারিলেন না। পাছে তাহাতে বাহাদুরির কিছু কম হয়, সেই জন্য আপনার গা পানে চাহিয়া ছেলেদের বুঝাইয়া দিলেন,—"ফোলে, জ্বলে না।"

সেই স্থানে দাঁড়াইয়া গবেশ সমস্ত ব্যাপার দেখিলেন। গবেশ ভাবিলেন, এ রহস্য মন্দ নয়। বুঝিলেন যে, এই কর্ত্তা একটী মহাপুরুষ, ইহাঁর দ্বারা তাঁহার কার্য্য সাধন হইবে। কর্ত্তাকে নিকটে ডাকিয়া গবেশ বলিলেন,—"মহাশয় দেখিতেছি অতি বীরপুরুষ। ভয় ডর আপনার কিছুই নাই। পৌষ মাসের প্রাতে পানা পুকুরে ডুব দিলে আপনার শরীর কাঁপে, কিন্তু শীত করে না। মৌমাছির হুলে আপনার সর্ব্ব শরীর ক্ষত বিক্ষত হইলে কেবল ফুলিয়া উঠে, কিছুমাত্র জ্বালা করে না। এত দেশ বেড়াইলাম, এত লোক দেখিলাম, কিন্তু আপনার মত মহাপুরুষ কখনও দেখি নাই।—অপরাধ লইবেন না, জিজ্ঞাসা করায় কোন দোষ নাই,—বলি, মহাশয়ের গাঁজাটা-আসটা খাওয়া আছে কি?"

মৌমাছির হুলে তো ফুলিয়াছিলেন বটেই, কিন্তু গবেশের প্রসংশায় কর্ত্তা আরও ফুলিয়া উঠিলেন। অহঙ্কারে তাঁর আর মাটিতে পা পড়ে না। কর্ত্তা উত্তর করিলেন,—"গাঁজা! গাঁজা তো প্রতিদিন খাইই, না খাইলে চলে না। তার উপর যে দিন আর যা জোটে, তাও খাই। নেশার দ্রব্য ছাড়িতে নিষেধ।"

গবেশ বলিলেন,—"তা বটে, তা বটে, নেশার দ্রব্য ছাড়িতে নিষেধ। কৈলাসে সেই যে গায়ে ছাই মাখিয়া, হাড়ের মালা গলায় দিয়া, কাণে ধুতুরা ফুল গুজিয়া, ষাঁড়ের উপর শিব বসিয়া আছেন, তাঁর অপমান করা হয়। নেশার দ্রব্য ছাড়িলে ঘোর পাপ হয়। আপনি আমার সহিত আসুন। নেশা করিয়া আপনাকে একটী কর্ম্ম করিতে হইবে। আপনি ভিন্ন সে কার্য্য আর কেহ করিতে পারিবে না!"

আনন্দিত মনে গবেশের সহিত কর্ত্তা চলিলেন। নিজ গ্রামে উপস্থিত হইয়া গবেশ কর্ত্তার নিমিত্ত নানারূপ নেশার দ্রব্য আয়োজন করিয়া দিলেন। কর্ত্তা মনের সুখে পেট ভরিয়া নেশা করিলেন।

অবশেষে কি কার্য্য করিতে হইবে, গবেশ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন। হিরণ্ময়ীদের বাটী দেখাইলেন। হিরণ্ময়ীদের খিড়কি দেখাইলেন। খিড়কীতে বাগান। বাগানটী চারিদিকে উচ্চ

প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রাচীরের মাথায় বোতল কুচি সন্নিবেশিত। প্রাচীরের বাহিরে দুই জনে একটী উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিলেন। সেখান হইতে হিরণ্ময়ীর ঘর দেখিতে পাওয়া যায়। সেই ঘর কর্ত্তাকে দেখাইয়া দিলেন।

গবেশ বলিলেন,—"কি উৎকট কার্য্য সাধন করিতে হইবে, এখন আপনাকে বলি। এই প্রাচীরটী আপনাকে লঙ্ঘন করিতে হইবে। তাহার পর ঐ যে ঘর দেখিতেছেন, ঐ ঘরের নিকট যে আম আছে, তাহার উপর আপনাকে উঠিতে হইবে। ঐ আম গাছের নিকট দোতালায় যে জানালা রহিয়াছে, তাহা দিয়া ঐ ঘরের ভিতর একখানি চিঠি ফেলিয়া দিতে হইবে। ঐ ঘরে একটী স্ত্রীলোক বাস করে। সন্ধ্যাবেলা তাহার স্বামী ঘরে থাকে না। সন্ধ্যাবেলা চিঠি ফেলিতে হইবে।"

কর্ত্তা দেখিলেন, কার্য্যটী অসম সাহসী বটে। কিন্তু দুরূহ কার্য্যে কর্ত্তা কখনও পরাঙ্মুখ হন্ না। কর্ত্তা সম্মত হইলেন। তাহার পরদিন সমুদয় আয়োজন হইল। সন্ধ্যার পর মই দিয়া কর্ত্তা প্রাচীরের উপর উঠিলেন। একখানি কম্বল অনেক বার পাট করিয়া বোতল কুচিতে ঢাকা দিলেন। দড়ি ধরিয়া প্রাচীর হইতে হিরণ্ময়ীদের খিড়কির বাগানে গিয়া নামিলেন। তাহার পর সেই আম গাছে গিয়া উঠিলেন। আম গাছ হইতে জানালা দিয়া হিরণ্ময়ীর ঘরে গবেশের চিঠি খানি ফেলিয়া দিলেন। চিঠি ফেলিয়া পুনরায় সেই প্রকারে ফিরিয়া আসিলেন।

গবেশের চিঠিখানি অতি সুদীর্ঘ। তাহাতে প্রথম ঈশ্বরের নানারূপ স্তুতিবাদ ছিল, তাহার পর হিরণ্ময়ীর অতুল সৌন্দর্য্যের প্রশংসা ছিল, তাহার পর নিস্বার্থ পবিত্র-প্রেমের প্রসঙ্গ ছিল, তাহার পর দুই একটা প্রেমের গান ছিল, অবশেষে গবেশের মনের কথা ছিল। গবেশের মনের কথা এই যে, তিনি হিরণ্ময়ীর রূপেগুণে একবারে মুগ্ধ হইয়াছেন। প্রেমময়ী হিরণ্ময়ীর সহিত একবার সাক্ষাৎ না হইলে তিনি বিষ খাইয়া মরিবেন, না হয় জলে ডুবিয়া মরিবেন, না হয় গলায় ছুরি দিয়া মরিবেন, যাহা হউক একটা কারখানা করিবেন। এ কথাও গবেশ লিখিয়াছিলেন যে, যে লোক আজ এই চিঠি দিল, কাল সে পুনরায় আর একখানি চিঠি লইয়া যাইবে। পত্রের প্রত্যুত্তর সেই লইয়া আসিবে। হিরণ্ময়ী যদি পত্রে ঢিল বাঁধিয়া নীচে ফেলিয়া দেন, তাহা হইলে সেই লোক কুড়াইয়া লইয়া আসিবে। এই পত্রের প্রতীক্ষায় গবেশ কেবল প্রাণ রাখিলেন, তা না হইলে কোন্‌কালে আত্মহত্যা করিয়া বসিতেন।

সন্ধ্যার পর খাটে শুইয়া হিরণ্ময়ী গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার ঘরের ভিতর একখানি কাগজ আসিয়া পড়িল। হিরণ্ময়ী প্রথম ভাবিলেন, বাতাসে বুঝি কাগজ খানি ঘরের ভিতর উড়িয়া আসিল। কিন্তু তখন সেরূপ বাতাস ছিল না। তাই তিনি উঠিয়া কাগজ খানি তুলিয়া লইলেন। দেখিলেন যে, একখানি চিঠি। আলোর নিকট যাইয়া চিঠি খানি পড়িলেন। পড়িয়া, প্রথম তাঁহার রাগ হইল, তাহার পর ভয় হইল। আর দুই এক বার পড়িয়া ক্রমে তাঁহার মন ভিজিয়া আসিল। কারণ পত্র খানিতে অনেক ঈশ্বরের স্তুতিবাদ ছিল, অনেক ধর্ম্ম কথা ছিল। হিরণ্ময়ী ভাবিলেন,—"লোকটী দেখিতেছি অতি পবিত্র চরিত্র, ধার্ম্মিক; কেবল ধার্ম্মিক নয়, আবার প্রেমিক,—বিশুদ্ধ পবিত্র প্রেমের মর্ম্ম অবগত আছে।"

অনেক দিন ধরিয়া হিরণ্ময়ী এইরূপ পবিত্র প্রেমের জন্য লালায়িত ছিলেন। তাই তিনি ছোঁক্ ছোঁক্ করিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু পৃথিবী অতি ভয়ঙ্কর স্থান। পবিত্র প্রেম এখানে অতি দুর্লভ। মনের মত পবিত্র

প্রেমিক লোক তিনি এপর্য্যন্ত খুঁজিয়া পান নাই। তাই, তাঁহার প্রাণে সুখ ছিল না। তাঁহার খাইয়া সুখ ছিল না, বসিয়া সুখ ছিল না, কিছুতে সুখ ছিল না। নবীনকে লইয়া কি পরিতৃপ্তি হয়? নবীন কেবল খবরের কাগজ ও পুস্তক লইয়া থাকে। না জানে গান, না জানে বাজনা। না জানে প্রেমের কথা, না জানে রসের কথা। হিরণ্ময়ীর মন এত দিন তাই আঁধার হইয়া ছিল, জীবন মরুভূমি হইয়া ছিল। আজ সেই আঁধার-মনে আলো দেখা দিল, ঊষর জীবনে রস সিঞ্চিত হইল। হিরণ্ময়ীর রূপ গুণ আজ সার্থক হইল। অন্ধ নবীন তাহার মর্ম্ম কি জানে? সেই রূপ গুণের প্রশংসা করিতে আজ তিনি এক জন যথার্থ প্রেমিক-পুরুষ পাইলেন।

তাহার পরদিন ঈশ্বরের স্তুতিপরিপূর্ণ, সাধুভাব পরিপূর্ণ, নিস্বার্থ প্রেম-কথা পরিপূর্ণ, গবেশকে হিরণ্ময়ী একখানি পত্র লিখিলেন। সন্ধ্যার সময় কর্ত্তা আসিয়া গবেশের আর একখানি পত্র হিরণ্ময়ীর ঘরে ছুড়িয়া ফেলিলেন, আর সেই সময় হিরণ্ময়ী ও আপনার পত্রখানিতে ঢিল বাঁধিয়া নীচে ফেলিয়া দিলেন। কর্ত্তা আম গাছ হইতে নামিয়া সেই পত্রখানি কুড়াইয়া লইলেন। এইরূপে প্রতিদিন চিঠি লেখা-লেখি হইতে লাগিল। পত্রে ক্রমে ঈশ্বরের মহিমা-গান কম হইয়া আসিল। পত্রগুলি কেবল প্রেমের কথায় পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। হিরণ্ময়ী বাটী হইতে বাহির হইয়া আসেন, অবশেষে গবেশ সেই প্রস্তাব করিলেন। হিরণ্ময়ী সম্মত হইলেন। কিছুদিন সেই পরামর্শ চলিতে লাগিল। ক্রমে সব ঠিক হইল। কোন্ দিন, কখন্, কিরূপে বাটী হইতে বাহির হইবেন, সকল কথা স্থির করিয়া হিরণ্ময়ী গবেশকে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রখানির প্রথমেই এই কয়টী কথা ছিল,—

"সঁপিনু তোমার পায়ে প্রাণ।
যায় যাক্ জাতি কুল মান॥"

সেই দিন সন্ধ্যার সময় কর্ত্তা আসিলে, হিরণ্ময়ী পূর্ব্বমত পত্রখানিতে ঢিল বাঁধিয়া উপর হইতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন! আজ সেই সময় হিরণ্ময়ীর একটু হাত কাঁপিল। কর্ত্তা আম গাছ হইতে নীচে নামিয়া পত্র খুঁজিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য! আজ চিঠি কোথায় গেল? কর্ত্তা চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, চিঠি আর কিছুতেই পান্ না! এমন সময় খিড়কির বাগানে কে যেন আসিতেছে, এইরূপ সাড়া পাইলেন। আর অধিক খুঁজিবার অবসর হইল না। কর্ত্তা শীঘ্র বাগান হইতে পলাইয়া গেলেন।

৫। বোকেন্দ্র।

জ্যৈষ্ঠ মাস। সে বৎসর ভাল আঁব হয় নাই। হিরণ্ময়ীর জানালার কাছে যে আঁব গাছটী ছিল, তাহাতে গুটিকত আঁব হইয়াছিল। হিরণ্ময়ীর শ্বশুর সেই আঁবগুলি গণিয়া রাখিয়াছেন। পাকিলে প্রথম ঠাকুরদের দিবেন, এই মানসে মাঝে মাঝে আসিয়া সেই আঁবগুলির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন। যে রাত্রিতে কর্ত্তা পত্র খুঁজিয়া পাইলেন না, তাহার পরদিন প্রাতঃকালে হিরণ্ময়ীর শ্বশুর সেই আঁব গাছ তলায় দাঁড়াইয়া আঁব দেখিতেছিলেন। একটী বড় আঁবের বোঁটা হইতে এক গাছি সূতা ঝুলিতেছে দেখিতে পাইলেন। সূতা গাছটির এক দিকে একটী ঢিল বাঁধা, অপর দিকে একখানি কাগজ। হিরণ্ময়ীর শ্বশুর ভাবিলেন, আঁব পাড়িবার নিমিত্ত কে ঢিল মারিয়াছিল। কিন্তু ঢিলটী ছোট ও সূতায় বাঁধা, আবার তার সঙ্গে কাগজ। কিছুই বুঝিতে পারেন না। একজন চাকরকে তিনি বলিলেন,—"দেখ্ তো রে। আঁবের

বোঁটায় ও কি রহিয়াছে?" চাকর গাছে উঠিয়া ঢিল সহিত চিঠিখানি পাড়িয়া আনিল। হিরণ্ময়ীর শ্বশুর দেখিলেন যে, চিঠিখানি গবেশের নামে। চিঠিখানি খুলিয়া পড়িলেন। চিঠি দেখিয়া তাঁহার মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল। তাঁহার গা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। তিনি সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। চাকরকে বলিলেন,—"সহসা আমার শরীর বড় অসুস্থ হইল, তুই আমাকে বাতাস কর্।"

কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, হিরণ্ময়ীর শ্বশুর বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন ও নবীনকে ডাকিতে পাঠাইলেন। নবীন আসিলে তাঁহার হাতে চিঠিখানি দিলেন। চিঠি পড়িতে পড়িতে নবীনের দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। চিঠি পড়া হইলে পিতা বলিলেন,—"নবীন! কুলাঙ্গারী পাপিয়সীকে আর ঘরে রাখা হইবে না, স্ত্রী-হত্যা করিব না। পাপিনীর মুখে চুণ-কালি দিয়া এই মুহূর্ত্তে বাড়ী হইতে দূর কর।"

নবীন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, নীরবে কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন,—"বাবা! হিরণ্ময়ী সামান্য অবোধ স্ত্রীলোক, বুঝিতে পারে নাই, না বুঝিয়া একটা কুকাজ করিয়া ফেলিয়াছে। এবার তাহাকে ক্ষমা করুন। এখনও সে অসতী হয় নাই। আমরা যদি এখন তাহাকে পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে তাহার দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকিবে না। সে দুর্দ্দশার কথা ভাবিলে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। আমি কি করিয়া তাহাকে পথে দাঁড় করাই? তাই বলি, বাবা, এবার হতভাগিনীকে আপনি ক্ষমা করুন্।"

নবীনের পিতা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। হিরণ্ময়ীকে তৎক্ষণাৎ বাড়ী হইতে দূর করিতে বার বার আজ্ঞা করিতে লাগিলেন। বাপের পায়ে ধরিয়া নবীন কত মিনতি করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি হিরণ্ময়ীকে ক্ষমা করিতে স্বীকৃত হইলেন না।

অবশেষে নবীন বলিলেন,—"হিরণ্ময়ীকে যদি একান্তই আপনি বাড়ী হইতে দূর করিবেন, তবে আমিও সেই সঙ্গে আপনার বাড়ী হইতে দূর হইব। সংসারের এই অকূল-সমুদ্রে হিরণ্ময়ীকে আমি ভাসাইতে পারিব না।"

ক্রোধে তাঁহার পিতা উত্তর করিলেন,—"এই দণ্ডেই। এরূপ পাপিয়সী কুল-কলঙ্কিনীকে যে স্ত্রী বলিয়া ভাবিতে পারে, সেরূপ পুত্রের মুখ দেখিতে আমি চাহি না। কেবল তুমি কেন? তোমার ঐ ছেলেটাকেও লইয়া আমার বাড়ী হইতে দূর হও। আজ হইতে জানিলাম যে, আমি নির্ব্বংশ হইয়াছি।"

নবীনের মাতা কত কাঁদিলেন। নবীনকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার পিতার রাগ শীঘ্রই পড়িয়া যাইবে, তিনি সব ক্ষমা করিবেন। কিন্তু নবীন বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, সে রাগ আর পড়িবার নয়, হিরণ্ময়ীর এ দোষ ক্ষমা হইবার নয়। স্ত্রী ও পাঁচ বৎসরের শিশু সুধীরকে লইয়া তিনি বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। হিরণ্ময়ীর গহনা প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু তিনি ছাড়িয়া আসিলেন। পৈত্রিক এক কণা মাত্র বস্তুও তিনি সঙ্গে লইলেন না।

নবীনের পিতা অল্পদিন পরে সমুদয় বিষয়-বিভব বিক্রয় করিয়া সপরিবারে কাশী যাইলেন। লজ্জায় ঘৃণায় মনোদুঃখে তাঁহাদের শীঘ্রই মৃত্যু হইল। দেব-সেবার নিমিত্ত সমুদয় টাকা তাঁহারা নিয়োজিত করিয়া যাইলেন। পৈত্রিক সম্পত্তির নবীন একটী পয়সাও পাইলেন না।

বাটী হইতে বাহির হইয়া নবীন যে কোথায় যাইবেন, তাহা স্থির করিতে পারেন না। তাঁহার শ্বশুর-বাটীতে আর এখন কেহ নাই। নিধিরামের পরলোক হইলে অল্পদিন পরে এককড়ির মৃত্যু হইল। তাহার পর তাঁহার

শিশু সন্তানটীও গেল। অবশেষে হিরণ্ময়ীর মাতারও পরলোক হইল। সে ভিটায় এখন আর কেহ নাই।

পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিবেন এই মানসে নবীন কলিকাতায় আসিলেন। সামান্য একটী বাসা ভাড়া করিয়া সেই স্থানে বাস করেন, আর সমস্ত দিন কর্ম্মকাজের নিমিত্ত ঘুরিয়া বেড়ান। যৎকিঞ্চিৎ নবীনের হাতে যে টাকা ছিল ও কলিকাতায় আসিয়া যৎসামান্য যাহা কিছু তিনি উপার্জ্জন করিলেন, তাহা দ্বারাই অতিকষ্টে দিনপাত হইতে লাগিল। সুধীর অতি আদরের ছেলে। পিতামহ পিতামহী তাহাকে অতি যত্নে লালনপালন করিতেছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া সুধীরের আর সে যত্ন নাই। একে খাইবার থাকিবার কষ্ট, তাহার উপর আবার হিরণ্ময়ীর মায়া-মমতার অভাব। সুধীরের প্রথম জ্বর হইল। সেই জ্বর প্লীহা যকৃতে পরিণত হইল। নবীন যথাসাধ্য ডাক্তার দেখাইলেন, বৈদ্য দেখাইলেন। কিছুতেই কিছু হইল না।

দুঃখে পড়িয়া হিরণ্ময়ীর আচরণ কিছু মাত্র সংশোধিত হইল না। আমোদ প্রমোদ রসরঙ্গের ইচ্ছা তাঁহার মনে বরং আরও বলবতী হইল। তাঁহাদের বাসার নিকট একটী স্ত্রীলোকের বাড়ী ছিল। এই বাটীতে একজন পুরুষ আসিয়া মাঝে মাঝে হারমোনিয়ম্ বাজাইতেন। জানালা দিয়া হিরণ্ময়ী দেখিতেন, আর প্রাণ ভরিয়া হারমোনিয়মের মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিতেন।

হিরণ্ময়ী "বীরাঙ্গনা" কাব্য পড়িয়াছিলেন। তিনি একজন বীরাঙ্গনা হইবেন, তাঁহার মনে এই সাধ হইল। সেই ভাবে সেই অজানিত পুরুষকে একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রখানি বড়, তবে তাহার সার-মর্ম্ম এই,—"তোমার মধুর বাদ্যে আমার মন মোহিত হইয়াছে। আমি পাগলিনী, উদাসিনী, প্রেম-ভিখারিণী হিরণ্ময়ী। তোমার নিকট আমি প্রেম ভিক্ষা করিতেছি। প্রেম দান করিয়া আমার প্রাণ তুমি পরিতোষ কর।" অবশ্য হিরণ্ময়ী পবিত্র প্রেম ভিক্ষা করিয়াছিলেন; তাহাতে আর সন্দেহ কি?

যেমন হিরণ্ময়ীর পবিত্র প্রাণ, সেই লোকটীরও সেইরূপ পবিত্র প্রাণ। বিশেষতঃ তাঁহার দয়ার শরীর। কাল বিলম্ব না করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ হিরণ্ময়ীকে পবিত্র প্রেমদান করিলেন। প্রতিদিন নবীন বাটী হইতে বাহির হইলে, হিরণ্ময়ী সেই স্ত্রীলোকের বাটীতে গমন করেন। সে স্থানে সেই লোকটীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। সুবিধা পাইলে সে লোকটিও কখন কখন হিরণ্ময়ীর বাটীতে শুভাগমন করেন।

পবিত্র প্রেম কি না? বলিতে দোষ কি? এক দিন হিরণ্ময়ী অতি সোহাগে নবীনকে বলিয়া ফেলিলেন,—"দেখ, এই পাশের বাটীতে একটী স্ত্রীলোক থাকে। অতি সচ্চরিত্রা, অতি ধীর, অতি ভাল স্ত্রীলোক। আর তাঁহার বাটীতে একটী বাবু আসেন, তাঁর নাম যোকেন্দ্র। তিনি যে কি ভদ্র, আর কত ভাল, তা আর তোমাকে কি বলিব? তাঁর মুখে সদাই ধর্ম্ম-কথা। আমাকে তিনি কত সদুপদেশ দিয়া থাকেন। তাঁর গল্প শুনিতে আমি বড় ভালবাসি। তিনি আমাকে বাজনা শিখাইবেন বলিয়াছেন। তিনি আমাকে বড় স্নেহ করেন।"

নবীন এই কথা শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। নবীন বলিলেন,—"হিরণ্ময়ি, বল কি? তুমি কি লজ্জা সরমের মাথা একবারে খাইয়াছ? হিতাহিত জ্ঞান কি তোমার একবারেই নাই? পিতৃ আজ্ঞা অমান্য করিয়াছি, আমার কপালে যে কি আছে, তা বলিতে পারি না। খবরদার, খবরদার! আর ঐ স্ত্রীলোকের বাটীতে যাইও না। যোকেন্দ্রের সহিত আর

সাক্ষাৎ করিও না, তাহা হইলে তোমার মান সম্ভ্রম, ইহকাল পরকাল সব নষ্ট হইবে।"

হিরণ্ময়ী স্বামীর নিকট বার বার ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, স্ত্রীলোকটীর বাটীতে আর তিনি যাইবেন না। আর তিনি কখনও বোকেন্দ্রর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না।

তাহার পরদিন নবীন বাটী আসিয়া দেখিলেন যে, ঘরে এক খানি উত্তম বোম্বাই সাড়ি রহিয়াছে। নবীন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ সাড়ি কোথা হইতে আসিল?" হিরণ্ময়ী বলিলেন,—"কিনিয়াছি।" নবীন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"টাকা কোথায় পাইলে?" হিরণ্ময়ী উত্তর করিলেন,—"এখন ধারে কিনিয়াছি, পরে টাকা দিলে চলিবে।" নবীন বলিলেন,—"হিরণ্ময়ি! এ কাজ তুমি ভাল কর নাই। দেখিতেছ, এখন আমার কিরূপ দুঃসময়; এসময় কি কোন মূল্যবান দ্রব্য কিনিতে আছে?"

দুই এক দিনে নবীন জানিতে পারিলেন যে, হিরণ্ময়ী সে সাড়ী ক্রয় করে নাই। বোকেন্দ্র তাঁহাকে সেই সাড়ি দিয়াছে। সেই কথা শুনিয়া নবীন বলিলেন,—"হিরণ্ময়ি! আর আমার সহ্য হয় না। পিতৃ-অভিশাপ এইবার ফলিল, তুমি এই মুহূর্ত্তে ও সাড়ি ফিরিয়া দাও।"

হিরণ্ময়ী বলিলেন,—"আমি এক দিন এক দিন গঙ্গা স্নান করিতে যাই। যখন আমি গাড়িতে চড়ি, তখন আমার রূপ দেখিয়া রাস্তায় কাতার দিয়া লোক দাঁড়ায়। সে সময় সামান্য এক খানি বিলাতি কাপড় পরিয়া আসিতে আমার লজ্জা করে। তুমি আমাকে এইরূপ এক খানি বোম্বাই সাড়ি কিনিয়া দাও, তাহা হইলে এখনি আমি বোকেন্দ্রর সাড়ি ফিরিয়া দিতেছি।"

নবীন আর কোন উত্তর করিলেন না তাঁহার মনে বড় ধিক্কার জন্মিল। এইবার সংসারের প্রতি তাঁহার ঘৃণা হইল। এখন কেবল সুধীরের জন্য তিনি সংসারে রহিলেন। সুধীর একটু সুস্থ হইলে, তাহাকে লইয়া অতি দূরদেশে গিয়া এক বারে নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবেন, মনে মনে এই সঙ্কল্প করিলেন। হিরণ্ময়ী গুপ্ত ভাবে বোকেন্দ্রের নিকট গমনাগমন করিতে লাগিলেন। দুই তিন দিন তাঁহার সহিত গাড়ি চড়িয়া সহরে বেড়াইতেও গিয়াছিলেন।

৬। সুধীর।

সুধীরের পীড়া উপশম হইল না। সুধীর ক্রমে নির্জ্জীব হইয়া পড়িতে লাগিল। নবীন দেখিলেন যে, সুধীরের আর রক্ষা নাই। সুধীরের শোকে তিনি আকুল হইয়া পড়িলেন।

এক দিন প্রাতঃকালে সুধীর বলিল,—"বাবা, আজ আর তুমি বাহিরে যাইও না। আজ আমার শরীর ভাল নাই। বুকের ভিতর কিরূপ করিতেছে। প্রাণ ভরিয়া আমি নিশ্বাস লইতে পারিতেছি না।"

নবীন দেখিলেন যে, সুধীরের আসন্ন কাল উপস্থিত। চক্ষের জল কোনও রূপে সম্বরণ করিয়া তিনি বলিলেন,—"না বাবা! আজ আমি বাহিরে যাইব না আজ আমি তোমার কাছে বসিয়া থাকিব। সুধীর, বাবা, তোমার কি কিছু খাইতে সাধ হয়? কুপথ্যই হউক আর সুপথ্যই হউক, আজ তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই তোমাকে খাইতে দিব।"

সুধীর উত্তর করিল,—"না বাবা, আর আমার কোনও জিনিস খাইতে সাধ নাই। যখন বৈদ্যের ঔষধ খাইতেছিলাম, তখন, বাবা, বড় ক্ষুধা ছিল। এক দিন পেট ভরিয়া ভাত খাইতে তখন বড় সাধ হইত। এখন আর সে ক্ষুধা নাই, সে সাধ নাই। পোরে করিয়া তোমরা আমাকে দুটী ভাত রাঁধিয়া দিতে। তাহাতে বাবা, আমার পেট ভরিত না, কিছুই হইত না। সব ভাত কটী খাইয়া পাতের

চারিদিক খুঁজিয়া দেখিতাম, যদি একটীও ভাত কোথাও পড়িয়া থাকে। কোনও দিন একটী আধটী পাইতাম, কোনও দিন, বাবা, একবারেই পাইতাম না। পাথরটী আঙুল দিয়া কতবার চাটিতাম। খাওয়া হইয়া যাইলেও কতক্ষণ পর্য্যন্ত পাতের নিকট বসিয়া থাকিতাম, পাত ছাড়িয়া উঠিতে ইচ্ছা করিত না।"

মায়ের পানে চহিয়া পুনরায় সুধীর বলিলেন,—"মা, তুমি একটু ওঘরে যাও, বাবার সঙ্গে আমার চুপি চুপি কথা আছে। তুমি এখানে থাকিলে আমি বলিব না।"

হিরণ্ময়ী অন্য ঘরে যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নবীন তাঁহাকে বলিলেন,—"যাও, এখনি ওঘরে যাও। এসময় সুধীরের বাক্য শুনিবার তুমি উপযুক্ত পাত্রী নও।" হিরন্ময়ী উঠিয়া অপর ঘরে যাইলেন।

তখন সুধীর বলিল, "বাবা! তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। আমি কি এই মায়ের পেটে জন্মিয়াছি?"

নবীন উত্তর করিলেন,—"হাঁ, বাবা, উনিই তোমার গর্ভধারিণী।"

সুধীর বলিল,—"তবে, বাবা, আমার মা অমন কেন? আর আর ছেলেদের মা তো এরূপ নয়! মা মা বলিয়া আর সব ছেলেরা যখন বাড়ী যায়, তখন তাদের মায়েরা তাদের কত আদর করে। তাদের মায়েরা তাদের কোলে করিয়া কত মিষ্ট কথা বলে। আমার মা আমাকে কেবল দূর-ছাই করেন। আমি মনে করি, আমি বুঝি দুষ্ট ছেলে, ভাল ছেলে নই, তাই আমি মায়ের আদর পাই না। তা, বাবা, আমি তো কখনও কোন দোষ করি নাই। তোমরা যা বল, তাই তো আমি শুনি। ঠাকুরদাদা ঠাকুরমা তো আমাকে খুব ভাল বাসিতেন। তুমি তো আমাকে খুব ভালবাসো। আর সকলে তো আমাকে খুব ভালবাসে। কেবল মা-ই কেন আমাকে ভাল বাসেন না? সেই পোরের ভাত যখন ফুরাইয়া যাইত, পাত ছাড়িয়া যখন যাইতে মায়া হইত, পাতের নিকট অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতাম, তখন মা আসিয়া আমাকে মারিতেন। দেখ দেখি বাবা, আমার শরীরে এখন আর কি আছে? হাড় কয়খানি কেবল একটু চামড়া দিয়া ঢাকা আছে। ইহার উপর, মা আমাকে মারিতেন, আমার হাড়ে বড় লাগিত। এক এক দিন, মা আসিয়া জোর করিয়া আমাকে নড়া ধরিয়া তুলিতেন। তিন চারি দিন আমার হাতে ব্যথা থাকিত। সে সব কথা মনে করিলে, বাবা, কান্না পায়।"

সুধীর কাঁদিতে লাগিল। নবীনও কাঁদিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া নবীন বলিলেন,—"সুধীর! চুপ কর, আর কাঁদিও না। যাহাতে তোমাকে আর কখনও কেহ না মারে, তাহা আমি করিব।"

সুধীর একটু হাসিয়া বলিল,—"পাঁচ বৎসর পার হইয়া আমি এই ছয় বৎসরে পড়িয়াছি বুঝি? কিন্তু বাবা, আজ আর আমি ছেলে মানুষ নই। মা আর আমাকে মারিবেন না, তাহা আমি জানি। কেন, তাও জানি। আজ আমার কত-কি মনে আসিতেছে। চক্ষু বুজিলে আজ আমি কত-কি দেখিতেছি। রও, একবার চক্ষু বুজি। কি দেখি, তোমাকে বলি।"

সুধীর চক্ষু বুজিল ও মুদিত চক্ষে পিতাকে বলিতে লাগিল,—"সুন্দর লোক সব দেখিতে পাইতেছি। পুরুষ মানুষ, মেয়ে-মানুষ, ছেলে, মেয়ে, কত! আহা! ইহাঁরা কি সুন্দর দেখিতে! ইহাঁদের মুখে কি মধুর হাসি! সূর্য্যের মত ইহাঁদের রূপ, তবে চাহিয়া দেখিতে পারা যায়। ইহাঁদের দেখিলে মনে সুখ হয়। ইহাঁরা হাসিয়া হাসিয়া আমাকে আদর করিয়া ডাকিতেছেন। ইহাঁদের কাছে যাইতে আমার বড় সাধ হইতেছে। উনি কে? ঐ সুন্দর পুরুষ? আপনার

নাম নিধিরাম? নিধিরাম কে, বাবা? নিধিরামের কথা তো কখনও শুনি নাই। নিধিরাম কে, জানি না। কিন্তু উনি আমাকে বড় ভাল বাসেন, কোলে লইবার নিমিত্ত হাত বাড়াইতেছেন। আবার ইনি কে? বাবা, ইনি আমার ঠাকুরদাদা, ওঁর নাম এককড়ি, তোমার নিকট যাঁহার গল্প শুনিয়াছিলাম। যিনি মরিয়া গিয়াছেন। আমার দিদিমাও এঁর সঙ্গে আসিয়াছেন। আর, বাবা, আমার সেই ছোট মামাটী দিদিমার কোলে রহিয়াছে। আমাদের বাড়ীর সেই ঠাকুরদাদা ঠাকুর-মাকেও দেখিতেছি। আমাকে কোলে লইয়া আদর করিবার নিমিত্ত সকলে এখানে আসিয়াছেন। এঁরা সব মরিয়া গিয়াছেন। দেখ দেখ, বাবা, তুমিও ঐ একটু দূরে দাঁড়াইয়া আছ। আর সকলে হাসিতেছেন, আর সকলে মনের সুখে আছেন। তুমি কেন ঘাড় হেঁট করিয়া অত দূরে দাঁড়াইয়া আছ? আমার মা কৈ? আমার মাকে তো ইহাঁদের ভিতর দেখিতেছি না? নিধিরাম আমাকে ডাকিতেছেন। বলিতেছেন, আমার সঙ্গে একটু এস। নিধিরাম আমাকে কোলে লইলেন। আমাকে কোলে লইয়া উড়িয়া চলিলেন। এ আবার কোথায় আসিলাম? এখানে দেখিতেছি সব অন্ধকার, এখানে ভয়ানক দুর্গন্ধ, এখানে কে কাহাকে মারিতেছে? এখানে সব লোক কাঁদিতেছে। ও কে? ঐ পিশাচী, রাক্ষসী? যাহার বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া আমার প্রাণে বড় ভয় হইতেছে? বাবা গো! ঐ পিশাচী, রাক্ষসী, আমার মা!"

ভয়ানক চীৎকার করিয়া সুধীর অজ্ঞান হইয়া পড়িল। দাঁত-কপাটি ভাঙ্গিয়া, বাতাস করিয়া, মুখে জল দিয়া নবীন তাহার চেতন করিলেন। কিন্তু সুধীরের নিশ্বাস লইতে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। সুধীরের প্রাণ-বায়ু ক্রমেই ফুরাইয়া আসিল।

সুধীর বলিলেন,—"বাবা! আর কথা কহিতে পারি না। হাঁপ লাগিতেছে। আর একটি কথা তোমাকে বলি, তার পর ঘুমাইব। দেখ, বাবা, নদীর জল যেমন বহিয়া যায়, আমার প্রাণটী যেন সেইরূপ কুল কুল করিয়া বহিয়া যাইতেছে। নদীর জল ফুরায় না, কিন্তু আমার প্রাণটী শীঘ্র ফুরাইয়া যাইবে। তাহাতে, বাবা, কোনও অসুখ নাই। সর্ব্বশরীরে যেন বেশ সুখ পাইতেছি! আমি একটু ঘুমাই। ভাল করিয়া আমাকে শোয়াইয়া দাও।"

সুধীর ভাল করিয়া শুইল, আর অজ্ঞান হইয়া পড়িল। ক্রমে নিশ্বাস প্রশ্বাস হীনবল হইয়া আসিল। অবশেষে শিশুর প্রাণবায়ু একবারে ফুরাইয়া গেল। তখন নবীন সুধীরকে কোলে তুলিয়া লইলেন। নবীনের অশ্রুধারায় সুধীরের সর্ব্বশরীর ভিজিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে নবীন সুধীরকে আপনার বুকে তুলিয়া লইলেন। প্রাণসম প্রিয় পুত্রকে নিজেই দাহ করিবার নিমিত্ত গঙ্গাতীরাভিমুখে চলিলেন। সঙ্গে কেবল একটী প্রতিবাসী ছিল।

৭। পরিণাম।

পুত্র শোকে হিরণ্ময়ী ঘরে খাটের উপর শুইয়া আছেন। কাপড় দিয়া চক্ষু মুছিতেছেন। চক্ষে এক ফোঁটা জল নাই। কেবল কাপড় দিয়া মুছিয়া মুছিয়া চক্ষু দুইটী একটু রক্ত বর্ণ করিয়া ছিলেন। তাহা না করিলে লোকে কি বলিবে? এই সময়ে বোকেন্দ্র সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শোকাকুলা হিরণ্ময়ীকে তিনি বুঝাইতে লাগিলেন, নানা রূপ সদুপদেশ দিলেন।

বোকেন্দ্র বলিলেন,—"এই সংসার অনিত্য। মৃত্যু সকলের হইবে, মৃত্যুর হাত কেহই এড়াইতে পারিবে না। সে জন্য শোক করা বৃথা।

এই সংসারে ধর্ম্মই হইল মনুষ্যের সহায়। ধর্ম্ম বিনা মনুষ্যের আর অন্য গতি নাই। সে নিমিত্ত আমোদে প্রমোদে যতই ভুলিয়া থাকা যায়, ততই ভাল।”

ধর্ম্ম কথা হইয়া যাইলে তাহার পর বোকেন্দ্র কিঞ্চিৎ পবিত্র প্রেমের কথা পাড়িলেন। সঙ্গে ফুল আনিয়াছিলেন, সেই গুলি মনের সাধে হিরণ্ময়ীকে পরাইলেন। সেই ফুল পরিয়া হিরণ্ময়ীর রূপে দশ দিক আলোকিত হইল। বোকেন্দ্র হিরণ্ময়ীর রূপ গুণের বার বার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হিরণ্ময়ীর মুখে পুনরায় হাসির উদয় হইল। মনের সুখে হিরণ্ময়ী বোকেন্দ্রর নিকট ধর্ম্ম-কথা ও পবিত্র প্রেম-কথা শুনিতে লাগিলেন।

বিদায় হইবার পূর্ব্বে বোকেন্দ্র বলিলেন,—“হিরণ্ময়ি! পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছি, সংসার অনিত্য। ঈশ্বরের লীলা বুঝা ভার। তোমার রূপে গুণে আমি বড়ই মুগ্ধ হইয়াছি। তোমাকে নিজস্ব ভাবে না পাইলে আমি কিছুতেই সুখী হইব না। এক্ষণে তুমি বিধবা হও, এই আমার প্রার্থনা। বিধবা বিবাহের আমি সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। বিধবা বিবাহ প্রচলিত না হইলে সমাজ সংস্কার হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। সমাজ একবারে উৎসন্ন যাইতেছে। সেইজন্য আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, তুমি শীঘ্র বিধবা হও। তোমাকে বিবাহ করিয়া দেশে আমি সৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করি। তুমি এক কর্ম্ম করিবে। কাগজের ভিতর এই যে শুভ্রবর্ণ চূর্ণটী দেখিতেছ, ইহার একটু একটু প্রতি দিন নবীন বাবুকে খাওয়াইবে। তাহা হইলে তোমার ও আমার বিশেষ মঙ্গল হইবে। ঈশ্বরকে ধ্যান করিয়া হারমোনিয়ম বাজাইয়া, নাচিয়া গাইয়া, চিরকাল, আমরা আমোদ-প্রমোদে কাটাইব।”

হিরণ্ময়ী বুঝিতে পারিলেন। শুভ্রবর্ণ সেই চূর্ণের কাগজটি হাতে লইলেন। বোকেন্দ্র চলিয়া যাইলে কিছুক্ষণ পরে সেই প্রতিবাসী অজ্ঞান অচেতন নবীনকে পাল্কি করিয়া বাটী আনিলেন। চিতায় আগুন দিয়া ঘাটে নবীন হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন। এখনও নবীনের জ্ঞান হয় নাই। সেই প্রতিবাসী ডাক্তার আনিয়া দিলেন। ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। হিরণ্ময়ী ঔষধের সহিত সেই শুভ্রবর্ণ চূর্ণের কিয়দংশ মিশ্রিত করিয়া নবীনকে সেবন করাইতে লাগিলেন। তিন দিন পরে নবীনের সংজ্ঞা হইল। জ্ঞান হইল বটে, কিন্তু নবীন ডাক্তারের নিকট অন্য প্রকার নানারূপ অসুখের পরিচয় দিতে লাগিলেন। দুই এক দিন নবীনের কথা শুনিয়া ও অপরাপর লক্ষণ দেখিয়া ডাক্তারের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। নবীন যে ঔষধ খাইতেছিলেন, তাহার কিয়দংশ তিনি বাটী লইয়া যাইলেন। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, তাহাতে শঙ্খ বিষ মিশ্রিত রহিয়াছে। ডাক্তার খানায় ভ্রম ক্রমে এই বিষ ঔষধের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে কি না, সেই সন্ধান করিলেন। জানিতে পারিলেন যে, ডাক্তারখানায় ভুল হয় নাই।

এইরূপ অনুসন্ধান করিয়া ডাক্তার তাড়াতাড়ি নবীনের বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখিলেন যে, নবীনের মৃত্যু হইয়াছে। নবীনের মৃত দেহটী এক ঘরে পড়িয়া রহিয়াছে! অপর একটী ঘরে হিরণ্ময়ী ও বোকেন্দ্র ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন করিতেছেন! ডাক্তার সেই ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিলেন,—“পাপিয়সি! তুই তোর স্বামীকে বধ করিয়াছিস্। আর, তুই দুরাচার! তাহার সহায়তা করিয়াছিস! রও, এখনি পুলিশ ডাকিতেছি। তোদের দুই জনকে যত দিন না ফাঁসি কাঠে ঝুলাইতে পারি, তত দিন আমার শান্তি নাই।”

এই কথা শুনিয়া হিরণ্ময়ী ও বোকেন্দ্রর সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, তাহাদের মুখ শুকাইয়া গেল। বোকেন্দ্রের শরীর শিহরিয়া উঠিল। ছাতে উঠিবার নিমিত্ত সেই ঘরের নিকট সিঁড়ি ছিল। তাড়াতাড়ি ছাতে উঠিয়া পলাইবার আশায় বোকেন্দ্র ছাত হইতে লাফ দিল। বোকেন্দ্রের দুইটী পা ভাঙ্গিয়া গেল। বোকেন্দ্র সেই স্থানে পড়িয়া রহিল। ডাক্তার পুলিশ ডাকিয়া আনিলেন। পুলিশ আসিয়া বোকেন্দ্রকে হাঁসপাতালে লইয়া যাইল। চারি দিন পরে হাঁসপাতালে বোকেন্দ্রের মৃত্যু হইল।

হিরণ্ময়ীকে পুলিসে ধরিল। মোকদ্দমা হইল। স্বামী হত্যা অপরাধে হিরণ্ময়ী যাবজ্জীবনের নিমিত্ত দ্বীপান্তরিত হইল। হিরণ্ময়ীর সুখের শরীর। কারাগারের কঠিন পরিশ্রম সে করিতে পারিবে না। দ্বীপ রক্ষার নিমিত্ত গোরা-বারিক আছে। কর্ম্মচারীরা কৃপা করিয়া হিরণ্ময়ীকে সেই গোরাদিগের পরিচর্য্যায় নিয়োজিত করিল। গোরাদিগের পরিচর্য্যায় সে জঘন্য পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িল। সুতরাং এখন তাহাকে অপরাপর কয়েদির মত কঠিন পরিশ্রম করিতে হইল। পাঁচ বৎসর হিরণ্ময়ী কয়েদ খাটিল। কয়েদ খাটিয়াও অহরহ প্রহরীদিগের বেত খাইয়া হিরণ্ময়ীর সে রূপের আর চিহ্নমাত্রও রহিল না। পাঁচ বৎসর পরে কারাগারের অধ্যক্ষ সাহেব কতকগুলি কয়েদি ও কয়েদিনীদিগের বিবাহ দিবার মানস করিলেন। একদিকে সারি সারি পুরুষ কয়েদি দাঁড় করাইলেন, অপরদিকে স্ত্রী কয়েদি দাঁড় করাইলেন। সাহেব বলিলেন,—"যাহার যাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহার গিয়া হাত ধর।" একজন কাফ্রি আসিয়া হিরণ্ময়ীর হাত ধরিল। এখানকার বিবাহের এই রীতি, মন্ত্র তন্ত্র আর কিছুই পড়িতে হয় না। সেই দিন হইতে হিরণ্ময়ী কাফ্রির পত্নী হইল। দুই জনে এক সঙ্গে কয়েদ খাটিতে লাগিল।

অল্পদিন পরে স্ত্রীর সতীত্ব বিষয়ে কাফ্রির মনে সন্দেহ হইল। কাফ্রি হিরণ্ময়ীকে উঠিতে বসিতে প্রহার করিতে লাগিল। কাফ্রির প্রহারে হিরণ্ময়ীর শরীর জর-জর হইল। দিবা রাত্রি প্রহার করিয়াও কিন্তু কাফ্রির মনে শান্তি হইল না। স্ত্রী লইয়া সে একখানি ছোট নৌকাতে উঠিল। নৌকা খানি অকূল সমুদ্রে ভাসিয়া চলিল। কাফ্রি মনে করিয়াছিল যে, নৌকা খানি ভাসিতে ভাসিতে হয় ব্রহ্ম দেশে, না হয় ভারতবর্ষের কোনও স্থানে গিয়া লাগিবে। পর্ব্বত সমান তরঙ্গের উপর নৌকাখানি নাচিতে নাচিতে চলিল। কোন্‌দিকে যাইতেছে কাফ্রি তাহার কিছুই জানে না। এইরূপে আট দিন কাটিয়া গেল। অনাহারে ও তৃষ্ণায় দুই জনেই মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। নবম দিনের রাত্রিতে নৌকা খানি তরঙ্গ তাড়নায় সবলে ভূমিতে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। অতি ক্লেশে কাফ্রি ও হিরণ্ময়ীর প্রাণ বাঁচিল। দুই জনে গিয়া উপরে উঠিল। দেখিল যে, চারিদিকে নিবিড় অরণ্য, মনুষ্যের বসবাস নাই। ফল কথা, নৌকাখানি ব্রহ্মদেশ কি ভারতবর্ষে না গিয়া সেই আন্দামান দ্বীপের আর একধারে গিয়া পড়িয়াছিল। আন্দামান দ্বীপের যে ধারে কারাগার আছে, সেই ধারে কেবল বসতি। দ্বীপের অবশিষ্ট অংশ ঘোর জঙ্গলে আবৃত। এই জঙ্গলে খর্ব্বকায় কৃষ্ণবর্ণ উলঙ্গ একপ্রকার অসভ্য জাতি বিচরণ করে। প্রাতঃকাল হইলে তাহাদের একদল কাফ্রি ও হিরণ্ময়ীকে দেখিতে পাইল। তাহারা তৎক্ষণাৎ কাফ্রির প্রাণবধ করিয়া হিরণ্ময়ীকে ধরিল। বোতলকুচি দিয়া প্রথমে তাহারা হিরণ্ময়ীর মস্তক মুণ্ডন করিয়া দিল, তাহার পর গেরিমাটি গুলিয়া তাহার সর্ব্বশরীরে লেপন করিল, অবশেষে কাপড় ফেলিয়া দিয়া তাহার কোমরের চারিদিকে কেয়াপত্র পরাইল। এইরূপ বেশভূষা হইলে, কে হিরণ্ময়ীকে বিবাহ করিবে, এই কথা লইয়া

অসভ্যদিগের মধ্যে বাদানুবাদ হইতে লাগিল। পরস্পরের বিবাদ নিবারণের নিমিত্ত অবশেষে তাহারা সকলেই হিরণ্ময়ীকে বিবাহ করিল হিরণ্ময়ী পঞ্চান্ন জন অসভ্যের ধর্ম্মপত্নী হইল গোরা বারিকে থাকিতে হিরণ্ময়ীর যে পীড়া হইয়াছিল, অসভ্যদিগের মধ্যে কখনও সে পীড় ছিল না। হিরণ্ময়ীর আগমনে তাহাদের মধ্যে এক্ষণে সেই পীড়ার আবির্ভাব হইল। অপর স্থানে এ পীড়া সাংঘাতিক নয়, কিন্তু অসভ্য শরীর এরূপ গঠিত যে, সেই পীড়া বশতঃ তাহার পটপট মরিয়া যাইতে লাগিল।

এক সময়ে আন্দামান দ্বীপের নিবিড় অরণ্য এই অসভ্য জাতিতে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু হিরণ্ময়ীর এমনি গুণ যে, ইহার সংস্রবে বিনাশ বিনা আর কথা নাই। এই মায়াবিনী রাক্ষসরূপিণী পাপীয়সীর সংস্রবে যে কেহ আসিবে, সেই সমূলে নির্ম্মূল হইবে। হিরণ্ময়ীর প্রদত্ত পীড়াবশতঃ অসভ্যেরা প্রায় একবারে নির্ম্মূল হইয়া আসিয়াছে। অল্প সংখ্যক মাত্র এক্ষণে জীবিত আছে, আর অল্পদিনে যে এ জাতির জন প্রাণীও থাকিবে না, তাহা নিশ্চয় কথা। এই নূতন পীড়া বশতঃ অসভ্যেরা যখন মরিতে আরম্ভ হইল, তখন তাহারা দেখিল যে, হিরণ্ময়ীই তাহাদের বিনাশের হেতু। তখন তাহারা হিরণ্ময়ীর নাক কান হাতের ও পায়ের অঙ্গুলি সব কাটিয়া দিল, দুইপাটি দাঁত সমুদয় পাথর দিয়া ভাঙ্গিয়া দিল, ও সর্ব্বশরীর মাঝে মাঝে ছেঁকা দিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিল। তাহার পর সেই সব ক্ষত স্থানে উত্তমরূপে বালুকা ও প্রস্তর দিয়া ঘসিয়া তাহার উপর এক প্রকার বৃক্ষ পত্রের রস দিয়া দিল। হিরণ্ময়ী জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় হিরণ্ময়ীকে তাহারা রাত্রিকালে কারাগারের সন্নিকটে ছাড়িয়া গেল। প্রাতঃকালে কারাগারের প্রহরীরা হিরণ্ময়ীকে দেখিতে পাইয়া ধরিল ও সাহেবের নিকট লইয়া গেল। কয়েদ হইতে পলাইবার অপরাধ জন্য সাহেব হিরণ্ময়ীকে পাঁচ শত বেত মারিতে আজ্ঞা করিলেন। একবারে পাঁচ শত বেত মারিলে পাছে মরিয়া যায়, সে নিমিত্ত পনর দিন অন্তর পঞ্চাশ করিয়া বেত মারা হইতে লাগিল। ক্ষত স্থান ছাড়িয়া শরীরের অপরাপর অংশে নিয়মিতরূপে এই বেত পড়িতে লাগিল। শরীরের শোণিত পূর্ব্ব হইতে দূষিত ছিল, সে কারণেই হউক, কি অসভ্যদিগের সেই বৃক্ষ রসের গুণেই হউক, অথবা বেত্রাঘাত জনিতই হউক, হিরণ্ময়ীর নাকে কাণে, মুখে, হাতে, পায়ে, সর্ব্বশরীরে যেস্থানে ক্ষত ছিল, সেই স্থানেই পচ্ ধরিল। নাক মুখ পচিয়া হিরণ্ময়ীর এরূপ বিকৃতি কদাকার বিকট মূর্ত্তি হইল যে, তাহা দেখিলে আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যায়। হিরণ্ময়ীর সর্ব্বশরীর ধীরে ধীরে গলিয়া খসিয়া যাইতে লাগিল।

এই সকল ক্ষতস্থানে অসংখ্য কীট জন্মিল। কোনও স্থানে হিরণ্ময়ী ক্ষণকালের নিমিত্ত বসিলেই তাহার শরীর হইতে পোকা পড়িয়া সেই স্থানটীতে "বিল্ বিল্" করিয়া বেড়াইত। হিরণ্ময়ীর গলিত শরীরে এরূপ দুর্গন্ধ যে, নাকে কাপড় না দিয়া তাহার নিকট যায় কার সাধ্য। পাছে অন্য কয়েদিরা এই ভয়াবহ পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হয়, সেই ভয়ে সাহেব হিরণ্ময়ীকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। হিরণ্ময়ীর চলৎশক্তি এক প্রকার রহিত হইয়াছিল। পায়ে ছিন্ন বস্ত্র বাঁধিয়া কোনও মতে একটু আধটু চলিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইতে লাগিল। কিন্তু হিরণ্ময়ীর শরীর হইতে এরূপ দুর্গন্ধ বাহির হয় ও সে যেখানে দাঁড়ায় কি বসে, সেই স্থানটী এরূপ পোকায় পরিপূর্ণ হইয়া যায় যে, সবাই তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়। হিরণ্ময়ীর ভিক্ষা মিলা ভার হইল। অনাহারে হিরণ্ময়ী কাতর হইয়া পড়িল। অবশেষে হিরণ্ময়ী ভাবিল,—"যদি আমি একবার আমার

বাপের দেশে যাইতে পারি, তাহা হইলে সেখানে আমার ভিক্ষা মিলিবে। প্রতিবাসীরা আমাকে ঘৃণা করিবে না, আমাকে দুটী করিয়া ভাত দিবে।"

এই মনে করিয়া, পায়ে অনেক নেকড়া জড়াইয়া, হিরণ্ময়ী গঙ্গার ধার ধরিয়া পিতৃ দেশাভিমুখে যাত্রা করিল। পথে ভিক্ষা করিতে করিতে, অতি কষ্টে, বহুদিন পরে, হিরণ্ময়ী দেশে গিয়া উপস্থিত হইল। দেশে গিয়া দেখিল যে, তাহার পিতার বাটীতে এখন আর ঘর দ্বার কিছুই নাই, কেবল মাটির ঢিপি পড়িয়া রহিয়াছে। হিরণ্ময়ী প্রতিবাসীদিগের দ্বারে দ্বারে গিয়া বলিল,—"ওগো! আমি সেই এককড়ির কন্যা হিরণ্ময়ী। আমার এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। তোমরা আমাকে দুটী করিয়া ভাত দাও। ক্ষুধা তৃষ্ণায় আমার প্রাণ বাহির হইতেছে।" প্রতিবাসীরা তাহাকে ভাত দিল বটে, কিন্তু তাহার শরীরের দুর্গন্ধে প্রপীড়িত হইয়া শীঘ্রই তাহাকে তাড়াইয়া দিতে বাধ্য হইল। হিরণ্ময়ীকে এক জন একটী ছেঁড়া মাদুর দিল, একজন একখানি সরা দিল, একজন একটী ভাঁড় দিল। এই গুলি লইয়া হিরণ্ময়ী বাপের ভিটায় সেই ঢিপির উপর গিয়া রহিল। সেই ছেঁড়া মাদুরে হিরণ্ময়ী শয়ন করে, দয়া করিয়া কেহ কিছু খাবার দিলে সেই সরা করিয়া আহার করে, আর ভাঁড়টীতে জল খায়। কিন্তু ভাত জলও ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। তাহার গায়ের গন্ধে ও কীটের ভয়ে সকলেই তাহার নিকট যাইতে ভয় করে, সহজে তাহাকে কেহ ভাত জল দিতে যাইতে ইচ্ছা করে না।

অল্পদিন পরে, একদিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে, গঙ্গা-তীরে যে স্থানে নিধিরামের মৃত্যু হইয়াছিল, হিরণ্ময়ীর মৃতদেহটী সেই স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া রাত্রিকালে কোনও রূপে বুকে হাঁটিয়া সেইস্থানে আসিয়া হিরণ্ময়ী আত্মহত্যা করিয়াছে। হিরণ্ময়ীর বাপের বাটীর নিকট একটী কুচিলার গাছ ছিল। জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণের জন্য হিরণ্ময়ী প্রতিদিন একটু করিয়া কুচিলার বীজ খাইত। আজ সেই বীজ অধিক পরিমাণে খাইয়া আপনার প্রাণনাশ করিয়াছিল। সেই গলিত দেহের দুর্গন্ধে ঘাটে সে দিন কেহ স্নান করিতে পারিল না। তাহার পরদিন মুর্দ্দফরাশ আসিয়া, নাকে কাপড় জড়াইয়া, হিরণ্ময়ীর মৃতদেহ পা দিয়া জলে ঠেলিয়া দিল। হিরণ্ময়ীর দেহ জলে ভাসিতে ভাসিতে কোথায় চলিয়া গেল।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

ত্রিবেণী সঙ্গমে।

(১)

উষা সমাগমে, নভ-দীপ-মালা,
ক্ষীণ, নির্ব্বাপিত প্রায়।
উত্তর সমীর, মৃদুল বহিছে,
মৃদু শীত স্পর্শে কায়।
মোহিনী প্রকৃতি শান্ত মূর্ত্তিময়ী
অতুল কুহক বলে
হৃদয়ের তার মধুরে পরশে
—মধুর তান উথলে!
নীরব প্রভাতি! সঞ্জীবন গীত!
উঠিছে লহরী প্রায়,
ব্যাপিতেছে ক্রমে কল্পনা সমীরে
চরাচর সমুদায়।

(২)

এমন সময়ে ত্রিবেণী সঙ্গমে
প্রভাত ভ্রমণ তরে।
যথায় যমুনা জাহ্নবীর সনে
মিলিতেছে প্রেমভরে।

জন্মভূমি।

পুরাকালে যথা সরস্বতী নদী
ঢালিত প্রণয় ধার
কালের প্রবাহে মিশেছে সে ধারা
চিহ্ন নাহি দেখি আর।
হিন্দু তীর্থ-রাজ প্রসিদ্ধ প্রয়াগ
পবিত্রতাময় ঠাঁই
সৈকত ভূমিতে প্রবাহিত নদী
অন্য চিহ্ন কিছু নাই।
আর্য্য মনোবল দীপ্তিমান হেথা!
যে শকতি পরশনে,
সিকতা সলিল বিচিত্রে মণ্ডিত
পবিত্রতা আর রণে।
নির্জ্জীব পদার্থে জীবন্ত শকতি
ভাতিত হিন্দুর মনে,
লক্ষ লক্ষ লোক মিলে এই ভূমে
যে শকতি আকর্ষণে।
শুভযোগে যেন ভোজ-বাজি ক্রিয়া!
প্রবাহে মানব ধারা;
স্বদেশী বিদেশী গৃহী উদাসীন
বিদূরিতে পাপ ভারা।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, নিষাদ চণ্ডাল
দীন দুঃখী ধনবান,
অভেদে মিলিছে ত্রিবেণী সঙ্গমে
নাহি আত্মপর জ্ঞান।
ধনের গরিমা জাতির গৌরব
হেথায় হইছে ম্লান;—
ত্রিবেণী সঙ্গমে সম অধিকারে
সকলে করিছে স্নান।

(৩)

দেখিতে দেখিতে পূরব গগনে
সমুদিত দিবাকর।
মধুর কিরণ, ছুটিল অমনি
পড়িল ধরণী পর।
হাসিল অবনী যথা প্রণয়িনী
প্রেমাসার পরশনে।
কলরব করি ধায় জীবকুল
জীবিকার অন্বেষণে।

(৪)

পড়িল কিরণ দুর্গশিরোপরে
সঙ্গম উপরে স্থিত।—
বিরাগোদ্দীপক এ পবিত্র ভূমে
দুর্গ কেন বিনির্ম্মিত?
যথায় মানব রিপুর কলহ
করে আসি প্রশমন,
তথায় কি হেতু দুর্গের উপরে
ঘাতক আয়ুধগণ?
দুর্ব্বল মানব! দুর্গ অস্ত্রগণ
সাধে কোন প্রয়োজন
মনোবল যদি হয় অস্তমিত!
—বৃথা রণ আয়োজন!
যবন সম্রাট বিরচিত দুর্গ,
— কোথায় যবন-রাজ?
পতন সময়ে দুর্গের দৃঢ়তা
সাধিয়াছে কোন কাজ?

(৫)

পড়িল কিরণ ত্রিবেণী সলিলে
মাধুরী ফুটিল তায়।
তর তর তর প্রবাহিত নীর
নিমজ্জিছে লোক কায়।
যমুনার জল কালিম বরণ
মিলে শুভ্র গঙ্গাজলে;
শুভ্র কাদম্বিনী সমুদিত যেন
নীলবর্ণ নভস্থলে!
কিম্বা প্রাতে যথা দূরস্থিত গিরি
মুদ্রিত গগন-পরে।
অথবা যেমতি ইন্দীবর দল
সরোবর শোভা করে।
দুদিক হইতে ক্রীড়াময়ী ধারা
আলিঙ্গিছে পরস্পর,

ত্রিবেণী সঙ্গমে

সখী মনোবেগ আসিয়া মিলিছে
সখীর হৃদয়োপর।
হেলিছে দুলিছে নাচিছে ঘুরিছে
গাইতেছে কুল কুল,
বীচিমালা সনে মধুরে নাচিছে
উপাসক-দত্ত ফুল।
মনোবৃত্তি যেন করিতেছে খেলা
মিলিত হৃদয়োপরে
অপরূপ প্রেম, উভে আত্মহারা
মিলি বহে দূরান্তরে।
তীরে বসি দ্বিজ জাহ্নবীর স্তব
করিতেছে বিকীর্ত্তন
হৃদয়েতে যাহা অতীত কাহিনী
করিতেছে উদ্দীপন।

(৬)

হে গঙ্গাযমুনে! হিমাচল-সুতা
পবিত্রতা স্বরূপিণী
বিমল সলিলা কলঙ্ক-নাশিনী
রোগতাপ নিবারিণী।
আর্য্য-প্রতিভায় নৈতিকশকতি
ভাতিত তোমার জলে
পরশিলে তোমা হৃদয়ের যেন
স্বচ্ছতা লহরী খেলে।
মানস-জননী! লক্ষ লক্ষ লোক
তব প্রেম আকর্ষণে
কুপথ ত্যজিয়া সত্য সাধুপথে
ধাইছে আনন্দ মনে।
স্নেহময় তব মধুর আসার
শীতল করিছে প্রাণ
উর্ব্বরিয়া সদা ভারতের ভূমি
করিতেছ শস্য দান।
জীবনেতে দেবী শতেক প্রকারে
সাধিতেছ উপকার,
অন্তিম সময়ে নিবারিছ তাপ
করিয়া ক্রোড়প্রসার।

সভ্যতা জননী ভারতেতে তুমি
ভারতের ইতিহাস,
তোমার সহিত বিচিত্রে জড়িত
হইয়াছে পরকাশ।
তব কূলে বসি আর্য্য-ঋষিগণ
আরাধিলা ভগবান,
অশেষ সাধনে লোকহিত হেতু
আহরিলা দিব্য জ্ঞান।
রোপিলা যতনে যে জ্ঞানের বীজ
হ'ল যাহে সমুদিত,
ষড় দর্শনাদি মহীরুহ নানা
ফল ফুলে সুশোভিত।
তব কূলোপরে, গ্রাম রাজধানী
উদিল মুদিল কত,
শ্রেষ্ঠ স্থান যত ভারত মাঝারে
এখনও বিরাজিত।
তব কূলোপরে সোমবংশ ক্রীড়া
যাদবের অভ্যুদয়;
কুরু পাণ্ডবীয় বিচিত্র ব্যাপার
গৌরবের অভিনয়।
তব কূলোপরে মহারণ কত
বীরতার পরিচয়,
ভারত-সমর— অদ্ভুত কাহিনী
আর্য্যজাতি বলক্ষয়!
পাণিপথ ক্ষেত্রে হিন্দু ভাগ্য-রবি
হইয়াছে অস্তমিত,
শ্রেষ্ঠ যাহা কিছু ভারত মাঝারে
এবে সব সমাহিত।
সাক্ষী তুমি দেবী! ভূত বর্ত্তমানে
—কি আছে আর এখন!
পতিত ভারত! একতা বিহীন
ভারত সন্ততিগণ।
যথা তব কূলে বালুকার রাশি
ছিল পূর্ব্বে সংযোজিত,

গিরি শিরোপরে, কাল বিবর্ত্তনে
এখন পদ দলিত।
প্রত্যেক বায়ুতে উড়িতেছে তারা
নাহিক স্নেহ-বন্ধন ;
দেখনা দেখনা সেই দশাগ্রস্ত
তোমার সন্ততিগণ !
বল গো জননী ! করিয়া বিনাশ
দুর্ভাগ্যের অন্ধকার,
ভারত গগনে সৌভাগ্য মিহির
উদিবে কি পুনঃ আর ?

শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র

শব্দশক্তি-রহস্য।

কোন একটী শব্দের কোন একটী পদার্থ বুঝাইতে যে শক্তি আছে, ঈশ্বরেচ্ছাই ঐ শক্তির নিয়ামিকা,—ইহা পূর্ব্বতন বহু বহু পণ্ডিতের মত। নব্য নৈয়ায়িকগণ ত নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিবেন যে, জগদীশ হইতেই শব্দশক্তি প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু ইচ্ছাময় জগদীশ্বর মনুষ্য-দিগকেও স্বাধীন ও স্বেচ্ছানুবর্ত্তী করিয়া সৃষ্টি করায়, তাহারাও স্বেচ্ছা ও সুবিধাবশে অনেকানেক শব্দের চিরপ্রচলিত শক্তির পরিবর্ত্তন ও তাহাতে নূতন নূতন শক্তির সংযোজন করিয়াছে। শব্দের ঐ সকল শক্তিপ্রকাশ * দেবভাষায় অনেকে করিয়াছেন। মনুষ্যের ভাষায়, বিশেষতঃ বাঙ্গালী মনুষ্যের ভাষায় অর্থাৎ বাঙ্গালায় তাহা কেহ করেন নাই।* সকল ভাষাতেই, শব্দের বাচ্যাবাচ্য বোধ বা কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান যাহার নাই, লক্ষ্য স্থির যাহার নাই বা ব্যঙ্গ যে বুঝে না, তাহার পদে পদে ভ্রম-প্রমাদ ঘটে। বাঙ্গালাভাষাতেই বা তাহা ঘটিবে না কেন ? বিশেষতঃ বাঙ্গালাভাষার উপজীব্য অনেক। এই ভাষার শব্দরাশি ও তাহাদের শক্য, লক্ষ্য প্রভৃতি অর্থ কতক পৈতৃক, কতক স্বোপার্জ্জিত, কতক ভিক্ষোপার্জ্জিত, কতক কাল মাহাত্ম্যলব্ধ, কতক বা রাজানুগ্রহলব্ধ। কৌতুকপ্রিয় পাঠক ঐ সকল রহস্যের পরিচয়ে প্রমোদিত হইতে পারেন বিবেচনায় তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

শব্দের শক্তিগ্রহে যে সকল উপায় পূর্ব্বাবধি প্রচলিত আছে, এ সকল স্থলেও তাহার বড় ব্যতিক্রম হয় নাই। বৃদ্ধব্যবহারই অনন্য সকলের মূল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তৎপরে প্রসিদ্ধশব্দের সমভিব্যাহার বশতঃ নানার্থশব্দের শক্যার্থ-নিশ্চয়ের যে নিয়ম আছে, নিম্নলিখিত বাক্যে ঐ নিয়মও সুন্দর রক্ষিত হইয়াছে, দেখুন।

১। তাঁহার ফলাহারের নিমন্ত্রণ

নিমন্ত্রণ একটী অতি সুপ্রসিদ্ধ শব্দ *। এই সুপ্রসিদ্ধ শব্দের সাহচর্য্যবশতঃ এখানে ফলাহার শব্দে লুচি-কচুরি-মিষ্টান্নাদি ভোজন-ব্যাপার বুঝাইবে, আম-জাম-তাল-নারিকেলাদি ফল-ভক্ষণ-ব্যাপার বুঝাইবে না।

ভাষ্য ;—উল্লিখিত বাক্যে ফলাহার শব্দের যে প্রথমোক্ত অর্থই হইবে, তাহা স্বীকার করি। কিন্তু উহার যে প্রথমোক্তরূপ অর্থ হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ কি ? ফল শব্দে যে মোণ্ডা-মিঠাই-লুচি-কচুরি বুঝায়, তাহার বীজ কি ?

যদি বল উৎকৃষ্ট ফলাহারে আম্র, কাঁঠাল, কমলা, কিস্‌মিস্, মনাক্কা, বেদানা প্রভৃতি উত্তমোত্তম ফলের বাহুল্য দেখা যায়। তন্নিমিত্তই

* দার্শনিক ও শাব্দিকগণ, 'রহস্য' মনে করিয় ক্ষমা করিবেন। জ, স।

* অতি সুমধুরও বটে।

উক্ত ব্যাপারের ফলাহার সংজ্ঞা হইয়াছে, এরূপ বলিতে পার না। মহা-প্রামাণিক হলায়ুধ কৃত* কুলীনকুলসর্ব্বস্বগ্রন্থে উত্তম ফলাহারের লক্ষণে ফলের কোন উল্লেখ নাই। যথা ;—

"ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি, দুচারি আদার কুচি,
কচুরি তাহাতে খান-দুই।
ছকা আর শাকভাজা, মতিচুর বোঁদে খাজা,
ফলারের জোগাড় বড়ই॥
নিখুতি জিলাপি গজা, ছানাবড়া বড় মজা,
শুনে সক সক করে নোলা।
হরেক রকম মোণ্ডা, যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা,
যত খাই তত হয় তোলা॥
খুরি পুরি ক্ষীর তায়, চাহিলে অধিক পায়,
কাতারি কাটিয়ে শুকো দই।
অনন্তর বাম হাতে, দক্ষিণা পানের সাতে,
উত্তম ফলার তাকে কই॥"

যদি বল, গৌণীবৃত্তিস্বীকারে উহার সমাধান করা যায় ;—অর্থাৎ ফলের আকারাদি সাদৃশ্য মিঠাই-মোদকাদিতে আছে বলিয়া ঐরূপ প্রয়োগ হইতে পারে। যেমন, কেহ অকর্ম্মা অবিবেচক লোকের উপরি ক্রুদ্ধ হইয়া গর্দ্দভ বলিয়া তাহাকে তিরস্কার করে ও গর্দ্দভের অবিবেচকতা অক্ষমতাদি সাধর্ম্ম্য উহাতে আছে বলিয়া ঐ শব্দ সুপ্রযুক্তই হইয়া থাকে। তাহাতে আপত্তি হয় যে, যেমন ফলাহারের কিঞ্চিদবয়ব মিঠাই মোদকাদির সহিত ফলের সাদৃশ্যবশতঃ ফলাহারপদ প্রয়োগ করিতেছ, উহার অন্ত অবয়ব লুচি-কচুরির সহিত পত্রের সাদৃশ্য থাকায় 'পত্রাহার' এইরূপ প্রয়োগ হয় না কেন? তাহার উত্তরে যদিও বলা যায় যে, "প্রধানেন ব্যপদেশা ভবন্তি" অর্থাৎ প্রধানের নামানুসারেই নামকরণ হইয়া থাকে, এই ন্যায়ানুসারে ফল পত্রের মধ্যে ফলই প্রধান বলিয়া এবং ফলের আকারাংশে ও মাধুর্য্যাংশে উভয়েরই সাদৃশ্য পাওয়া যাইতেছে বলিয়া ফলেরই গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু এ সকল তর্কানুগামিনী কল্পনা অপেক্ষা সত্যানুসারিণী অনুমিতিই শ্রেষ্ঠ। তাহাতে এই পাওয়া যায়, সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় যখন মনুষ্যের শিল্পকৌশলোদ্ভূত পদার্থের প্রাচুর্য্য হয় নাই, তখন খাদ্য পদার্থ মধ্যে ফলই উৎকৃষ্ট ছিল। এখনও তাহা নয় এমন নহে। সুতরাং ফলাহারই তখন শ্রেষ্ঠাহার ছিল ও উক্ত শ্রেষ্ঠাহারই ফলাহার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ক্রমে মনুষ্যেরা বুদ্ধি-বলে শিল্পকৌশলে মিষ্টান্নাদির নানা শ্রেষ্ঠ খাদ্য সৃষ্টি করিলেও তার ফলাহার সংজ্ঞাই রহিয়া গেল। কেননা, প্রাচীন প্রয়োগের সহসা অন্যথা হয় না। এই অনুমান সঙ্গত বোধ হয় না কি?

এইরূপ জলপান ও জলযোগ শব্দও বিতর্কণীয়।

২। বড়লোক।

এই শব্দটী দীর্ঘ আকৃতি বিশিষ্ট মনুষ্য বুঝাইতে প্রযুক্ত হয় না। ধন সম্পত্তিশালী ব্যক্তিই ঐ শব্দের বাচ্য। কালের সহকারিতা সর্ব্বত্র থাকিলেও এসকল পরিবর্ত্তনে কাল-মাহাত্ম্য বা কলি-প্রাবল্যই মুখ্য কারণ বলিয়া বোধ হয়।

এইরূপ "ছোটলোক" শব্দটী জানিবে।

৩। ভাল মানুষ।

পরস্বগ্রহণে পরাঙ্মুখ, আত্ম-অবস্থায় সন্তুষ্ট, বিবাদ-বিসংবাদে নির্লিপ্ত, বৈরনির্যাতনে অনিচ্ছু, কষ্ট-সহিষ্ণু ব্যক্তিই এক্ষণে ভাল মানুষ শব্দের বাচ্য। উক্ত গুণযোগবশতঃ মনুষ্য ছাড়িয়া গোজাতিতেও উহার ব্যবহার দেখা যাইতেছে। যেমন, আমার গরুটী নিতান্ত ভাল মানুষ ;— ছাড়িয়া দিলেও পরের ক্ষেতে যায় না।

* নব্য পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, সর্ব্বস্বান্ত গ্রন্থমাত্রই হলায়ুধ-প্রণীত। লেখক।

এরূপে তিনি অনেকের সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছেন। সম্পাদক।

৪। বৈষ্ণব।

যাহারা কৃষ্ণে ভক্তি করিত, পূর্ব্বে তাহাদিগকে বৈষ্ণব বলিত। এখন বিপরীত হইয়াছে। এখন যাহারা গৌরভক্তি করে, তাহাদিগকেই বৈষ্ণব কহে।

যুক্তি। কে না জানে যে, কালা অপেক্ষা গোরার পূজ্যতা অধিক ?

৫। ঠাকুর।

ঠাকুর বলিতে পূর্ব্বে দেব-বিগ্রহকে বা প্রত্যক্ষ দেবতা পিতাকে বুঝাইত। এখন ঠাকুর বলিলে প্রায় পাচক ব্রাহ্মণই বুঝায়। কখন কখন পূজারি ব্রাহ্মণকেও বুঝায়।

শৌচ, শুদ্ধাচারাদি গুণযোগ উক্ত সর্ব্বত্রই আছে। বিগ্রহকে যে স্নাত, অনুলিপ্ত, শুদ্ধবেশভূষান্বিত করিতে হয়, নিজেও সেইরূপ হইয়া তাঁহার পূজা করিতে হয়। কারণ "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ" ইহাই শাস্ত্র। বাটীর মধ্যে বুড়া বাপই কেবল সন্ধ্যাহ্নিক শৌচাচার করিতে অবশিষ্ট আছেন। আর খাদক ব্রাহ্মণেরা যেমনই হউক, পাচক ব্রাহ্মণ অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া নিত্য বস্ত্রত্যাগ স্নানাদি বাহ্যশৌচ অনেকাংশে করে। পূজক ব্রাহ্মণের ত তিলক, মালা, শুভ্রস্থূল যজ্ঞোপবীতত্বাদি আছেই।

৬। কুকুর।

ঠাকুরের যেমন লাঘব হইয়াছে, কুকুরের তেমনি কিছু গৌরব হইয়াছে। এটী কিন্তু পদের ব্যবহারে নহে, পদার্থের ব্যবহারে। এবং ঐ পদার্থটী স্বদেশী নহে, বিদেশী *

* এস্থলে উল্লেখ করা উচিত যে, কবিবর ৺ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত একটী মহৎ ভুল করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।" ইহার এইরূপ সংশোধন আবশ্যক, "কতরূপ স্নেহ করি, বিদেশী কুকুর ধরি, স্বদেশের ঠাকুর ফেলিয়া"।

যুক্তি। ইহা হওয়াই উচিত। কেননা, শ্ববৃত্তি এখন অধিকাংশ লোকের স্ববৃত্তি হইয়াছে।

৭। গুরু।

গুরুর ক্রমেই অধোগতি হইতেছে। গুরু-ট্রেণিং, চৌপগুরু প্রভৃতি তাহার স্থল। বাবুরা কেহ কেহ আদর করিয়া গুরুকে গরুও বলেন। কেন না, উভয়েরই পোষ্যস্বরূপ সাদৃশ্য আছে।

৮। বর্ণভেদ।

বর্ণের যতরূপ ভেদ ছিল, ক্রমেই তাহা কমিতেছে। দীর্ঘ ঋ, ৯ প্রভৃতি অদৃষ্টবশে অদৃষ্ট হইয়াছেন। ব্রাহ্মণাদি বর্ণগত ভেদও কমিতেছে। বর্ণভেদ বলিতে ব্রাহ্মণাদি জাতিসমূহের ভেদ, এ অর্থও বোধ হয় ভবিষ্যৎকালে না বুঝাইতে পারে। নীল, পীত, লোহিতাদি রঙ্গের ভেদ, প্রধানতঃ ঐ শব্দের এই অর্থই তখন বুঝাইবে।

যুক্তি। সর্ব্ববর্ণাভাবই শ্বেত। যথায় সর্ব্ববর্ণের অভাব আছে, তথায় শ্বেতবর্ণ বুঝিতে হয়। সুতরাং যথায় শ্বেতবর্ণের রাজত্ব, তথায় ভিন্নবর্ণের লোপ হইয়াছে এইরূপ বুঝাই স্বভাবসঙ্গত।

৯। বাবু।

পূর্ব্বে বাবুশব্দ সমধিক গৌরবসূচক ছিল বলিয়া সাধারণ্যে উহার ব্যবহারের উপায় ছিল না। এক্ষণে উহার শক্তির যেমন হ্রাস হইয়াছে, তেমনি উহার ভূরি প্রয়োগও হইয়াছে।* কিন্তু ভূরি প্রয়োগ হইলেও ঐ পদার্থ চিনিয়া লইবার কোন অসুবিধা হয় নাই। যেমন গল-কম্বলাদি দেখিয়া গোর পরিচয় হয়, তেমনি বৈদেশিক পরিচ্ছদের পারিপাট্যে ও অন্যান্য

* সাহেবেরা বলেন যে, তাঁহাদের ভাষাতেও কি একটা বাবুর অনুরূপ শব্দ আছে। ক্ষতি কি ? ঐক্যেই সৌহৃদ্য বৃদ্ধি।

লক্ষণে, যেমন স্বধর্ম্মে অনাস্থা, অন্য সময়ে মুখে বিষম তেজস্বিতা ও কার্য্যকালে ভীরুতার সহিত পরাঙ্মুখতা ও অঙ্গে নিতান্ত বলহীনতা এই সকলেও বাবুপদার্থের জ্ঞান হয়।

টীকা। বাবু শব্দের উত্তর স্ত্রীপ্রত্যয় হইবে না। দাদাবাবু, দিদিবাবু ইত্যাদি প্রকারই হইবে।* রাজকীয় ভাষাও এইরূপ প্রয়োগের সপক্ষতা করে। যথা,—He-goat, She-goat.

১০। ঘোড়ার ডিম।

কিছুই নহে, অবাস্তব পদার্থ, এইরূপ বুঝাইতে পূর্ব্বে আকাশ-কুসুম বা তদর্থবোধক কোন শব্দের প্রয়োগ ছিল। এখন আমরা বলি "ঘোড়ার ডিম"। আবার যাঁহারা উক্ত বাক্যব্যয়ের প্রয়াস স্বীকারেও অসম্মত, তাঁহারা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াই কার্য্য সমাধা করেন।

যুক্তি। পূর্ব্বে লোকে অর্চ্চনাপ্রিয় ছিল। কথাবার্ত্তাতে এবং কর্ম্মে পুষ্পের ব্যবহার বেশী হইত। এখন লোকে ভোজন-প্রিয় ও ডিম্বও প্রিয়ভক্ষ্য হইয়াছে, কাজে ও কথাবার্ত্তায়ও তাই ডিম্বের ব্যবহার বেশী হইয়াছে।

১১। মহাবীর।

এই শব্দটীর বাচ্যভেদ নাই। একালেও যাঁহারা সমুদ্রলঙ্ঘনে পটু, কদলী প্রভৃতি ফলপ্রিয় সব্যসাচী অর্থাৎ উভয় হস্তে ভোজনে অভ্যস্ত ও সর্ব্বভুক্ অর্থাৎ যাঁহাদের খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই, তাঁহারাই মহাবীর। যদিও দেশভেদে বর্ণের কিছু ভেদ হয়, যেমন কেহ কেহ কালামুখো এবং তদনুসারে মানেরও তারতম্য আছে, কিন্তু সকলকেই মহাবীর বলে। কেহ কেহ সমুদ্র চক্ষেও দেখেন নাই—কেবল ভোজনেই সব্যসাচী ও সর্ব্বভুক্, তাঁহারাও মহাবীর। এরূপ যে হইবে, শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে। তথাহি অনাগত-বিধাতা কৃত্তিবাস পণ্ডিত রামায়ণে লিখিয়াছেন,—

বড় বড় বানরের বড় বড় পেট,
সমুদ্র লঙ্ঘন কালে মাথা করে হেঁট।

মহাবীরের একটু পরিবর্ত্তন এই হইয়াছে যে, তাঁহারা পূর্ব্বে ভারতের কোন কোন অংশে পূজ্য ছিলেন, এখন ভারতের সর্ব্বত্রই ন্যূনাধিক পরিমাণে পূজ্য হইয়াছেন।

১২। বিলাতী।

যাহা কিছু উৎকৃষ্ট, বিলাতী বলিলে তাহাই বুঝিতে হইবে। যেমন বিলাতী কুল, বিলাতী খেজুর ইত্যাদি। অথচ উহাদিগের কোন পুরুষে কেহ বিলাতে জন্মগ্রহণ করে নাই।

যুক্তি। ভবের হাটে নামগুণেই বস্তু বিকাইয়া যায়।

১৩। চাকর ও চাকরী।

চাকর শব্দ পূর্ব্ববৎ অগৌরব সূচকই আছে। কিন্তু চাকরগিরি এই অর্থে চাকরী শব্দ অগৌরবের না হইয়া বিলক্ষণ গৌরবসূচকই হইয়াছে।

টীকা। পদবিচ্ছেদ পূর্ব্বক পাঠ করিলে চাকর শব্দের অর্থ ভেদ হয়, অগৌরবও দূর হয়। যথা চা-কর।

১৪। ভৃত ও ভ্রাতা।

ভূতের আধিক্য হওয়ায় ভৃত শব্দের বাচ্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। যুক্তি সুগম।

ভ্রাতাও সেই সঙ্গী। ভ্রাতৃভাব দেশব্যাপ্ত হইয়াছে।

১৫। বেদ।

বেদ শব্দের আধুনিক অর্থ আলোক-প্রাপ্ত-শিক্ষিত-সম্মত চাষাদিগের ভয়হর্ষাদি জনিত অবোধ্য গান।

উপসংহার। গড়ে হিসাব করিয়া দেখা যায়, বাঙ্গালাতে শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে

* ঐ সকল কুল-কর্ম্মজিনীর স্ত্রীত্ব আছে কি না সন্দেহেই বোধ হয় স্ত্রীপ্রত্যয় প্রচলিত হয় নাই।

ঐ ভাষা-ভাষী বাঙ্গালী সাধকেরও শক্তিবুদ্ধি অবশ্য স্বীকার্য্য। সে-কেলে বাঙ্গালী রঘুনাথ-রঘুনন্দন-শ্রীনন্দনাদি বা মুকুন্দরাম-কৃত্তিবাস-কাশীদাসাদি অথবা প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি কোন কোন বিষয়েই শক্তিশালী।

অন্তিমকালে এই প্রবন্ধ-পাঠকারী নানা-শ্রেণীস্থ পাঠক মহোদয়গণের নিকট কৃতাঞ্জলি-পুটে আমার নিবেদন, তাঁহারা যেন আমায় ক্ষমা করেন। তাঁহারা দেখিতেছেন যে, আমার এ প্রবন্ধে রহস্য ভিন্ন আর কিছুই নাই। প্রবন্ধের নামেই রহস্য রহিয়াছে। রহস্য ছাড়াইয়া যদি কোনস্থানে গালাগালিই হইয়া থাকে, তা ঘরের লোককে না দিয়া পরকে দিতে যাইয়া কি মার খাইয়া মরিব?

শ্রীশারদাপ্রসাদ শর্ম্মা।

মর্ম্মকথা।

বুঝেছি—ঠেকেছি বিধিমতে!—
কেন আর মিছে মায়া, কুহকী কল্পনা-ছায়া,
দেখাও আঁধারে আলো—আলেয়ার মত,
ছেড়ে দাও—কেঁদে বাঁচি, নির্ম্মম-জগত!
যত ব্যথা দে'ছ মনে—সরলতা প্রতিদান,
ধিকি ধিকি তুষানলে পুড়িতেছে এ পরাণ;
হৃদয়ে আঁকিয়া গেছে কঠোর মুরতি তব,
বিষমাখা বাক্যবাণ মরিলেও না ভুলিব! * * *
তবুও বাঁচিতে হ'বে, হাসিতে—কাঁদিতে হ'বে,
গোঁজামিলে দিন যা'বে—মুখে-মনে আর;
এমনি গ্রহের ফের, সারাটা জীবনে 'জের!'—
হা অদৃষ্ট! বিধিলিপি!—এই কি সংসার?
মুখে প্রেম ভালবাসা, হৃদে বিষ প্রাণনাশা,—
পুড়িব—পোড়াব কত পরাণ সরল,—
কোথা তুমি?—অন্তর্যামি!—ভকত-বৎসল!

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব। *

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিনে ইংলণ্ডের মহারাণী এলিজাবেথ কম্পারলণ্ড জনপদের আর্ল এবং দুইশত পনর জন সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী ও বণিককে পনর বৎসর কাল প্রাচ্য জনপদে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রদান করেন। এইরূপে প্রাচ্য ভূখণ্ডে বাণিজ্য করিবার জন্য ইংলণ্ডে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে ব্যবসায়ী বণিকের দল সংগঠিত হয়। ইহাঁরা ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ এবং সুমাত্রা যাবায় সর্ব্ব প্রথম মরীচ ও মস্‌লার ব্যবসায়ে মনোযোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু শেষে এই সকল দ্বীপের অধিবাসিগণ পরিধেয় বস্ত্র ক্রয়ের জন্য ব্যগ্র হওয়াতে কোম্পানী ঐ সকল দ্বীপে সুরাট ও মলবারির বস্ত্রের আমদানি করিয়া মরীচ ও মস্‌লা ক্রয় করিতে থাকেন। এই সূত্রে সুরাট মলবারে কোম্পানীর ব্যবসায় আরম্ভ হয়, এবং এই সূত্রে কোম্পানীর ব্যবসায়িগণ ভারতের উপকূলে সমাগত হইয়া কাম্বে ও সুরাটের কাপড় ও কালিকো ক্রয় করিতে থাকেন। সার্দ্ধ দুই শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের বণিক কোম্পানীকে কাপড় যোগাইয়াছিল, নিয়তির বিচিত্র লীলায় এখন সেই ভারত ইংলণ্ডের বণিকদিগের নিকট কাপড় লইতেছে। মানচেষ্টার এখন সুরাট ও মালবের স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতবাসিগণ এখন মলবারের শিল্প চাতুরী বিসর্জ্জন দিয়া, সুরাট ও ঢাকার বস্ত্র-গৌরবের বিষয় বিস্মৃতির অতল

* সুধী সমাজের সুপরিচিত শ্রীযুক্ত বাবু সারদা চরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল মহাশয় এই বিষয়ে একটী ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। উপস্থিত প্রবন্ধ উহার অনুবাদ। সারদা বাবুর ইংরেজী প্রবন্ধের ভাবাবলম্বনে অনুবাদ হইয়াছে।

সাগরে ডুবাইয়া, লজ্জা নিবারণ শীতাতপ হইতে দেহ রক্ষার জন্য সর্ব্বতোভাবে ইংলণ্ডের মুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছে। ভারতীয় শিল্পের অবনতি ও অধঃপতন এবং গ্রেটব্রিটনের শিল্পের অভাবনীয় উন্নতির ইতিহাস যদি প্রকৃষ্ট পদ্ধতি-ক্রমে লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে উহা ভারত-বাসীদিগের শিক্ষাপ্রদ হইতে পারে। কিন্তু উক্ত বিবরণ বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসননীতির যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তৎসমুদয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং সংক্ষেপে আইন-আদালতের বিষয় পর্য্যালোচনা করাই উপস্থিত প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

১৭৫৭ অব্দে রাজনৈতিক বিষয়ে ইংরেজ-দিগের সহিত ভারতবাসীর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ইহার পূর্ব্বে দক্ষিণাপথে ফরাসিদিগের ক্ষমতা-নাশের জন্য ইংরেজদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। মাদ্রাজের ও কর্ণাটের ঘটনায় ইংরেজদিগকে অনেক সময় ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল ঘটনায় ভারতবর্ষে প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজদিগের আধি-পত্য স্থাপনের সূত্রপাত হয় নাই। ইংরেজও ভারতের রত্নসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সন্ধি-বিগ্রহের মন্ত্রণায় মনোনিবেশ করেন নাই। তাঁহারা তখন ব্যবসায়ী বণিকের শ্রেণীতেই নিবে-শিত ছিলেন। ডুপ্লের ও বুসির প্রভুত্বপ্রিয়তা প্রযুক্তই তাঁহারা তখন ভারতবর্ষীয় অধিপতির সহিত সম্মিলিত হইয়া আপনাদের স্বার্থরক্ষায় উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্লাইবের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল। ক্লাইব ইংরেজ বণিক-কোম্পানীর কেবল বাণিজ্য ঘটিত স্বার্থ-রক্ষার জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নাই। ফরাসি গভর্ণর ডুপ্লে যেমন অরাজক অবস্থায় ভারতবাসীদিগের সাহায্যে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপনের বাসনা করিয়াছিলেন, ক্লাইবের বাস-নাও বোধ হয়, তদনুরূপ ছিল। কিন্তু ক্লাইব সে সময়ে ইংরেজ কোম্পানির একজন সামান্য কর্ম্মচারী ছিলেন। যাহা হউক, স্পষ্ট বলিতে গেলে ক্লাইবের সময় হইতেই রাজনৈতিক বিষয়ে ইংরেজদিগের সহিত ভারতবাসিদিগের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। চিরস্মরণীয় পলাসীর প্রশস্ত ক্ষেত্রে এই সম্বন্ধের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৫৭ অব্দের ২৩শে জুন পলাসীর যুদ্ধ ঘটে। ক্লাইব ইংরেজ সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া, যুদ্ধে জয়লাভ করেন। এই যুদ্ধের ফলে মীরজাফর নাম মাত্র বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার হন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজকোম্পানিই সর্ব্বাধিপত্য লাভ করেন। যাঁহারা ব্যবসায়ে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহারা ঐ দিন হইতে সমৃদ্ধিপূর্ণ ও জনবহুল ভূখণ্ডের সর্ব্বনিয়ন্তা প্রভু হন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁহাদের ক্ষমতা জাহ্নবীর জলপ্রবাহ-বিধৌত প্রদেশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। ঘটনাক্রমে একদল বিদেশী বণিক ভারতের দুরবগাহ রাজনীতির পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হন। যে ক্ষুদ্রদল মোগলসম্রাট এবং সুবাদারদিগের অনুমতিক্রমে বাস করিতেছিল, তাহারা বারংবার আপনাদের বিজয়িনী সেনা লইয়া, ভারতের শস্যসম্পত্তিময় ভূখণ্ড বিধ্বস্ত করে, আপনাদের ইচ্ছানুসারে এক রাজাকে পদচ্যুত করিয়া আর এক রাজার হস্তে রত্নসিংহাসন সমর্পণ করিতে থাকে এবং আপনাদের ব্যবস্থানুসারে সাম্রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার তিনজন নবাব পদচ্যুত হন। চতুর্থ নবাব রাজ্য হইতে নিষ্কা-শিত হন। ইংরেজ-সৈন্যের পরাক্রমে তৈমুরের বংশধর বাঙ্গালার নবাবের অধিকৃত জনপদের সীমান্তভাগ হইতে তাড়িত হন।

মোগলসাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষে রাজশক্তির অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যের বিকাশ হয়। কেবল এক ১৭১৯ অব্দেই দিল্লীতে দুইবার বিপ্লব ঘটে।

প্রতিবিপ্লবেই এক এক জন নূতন সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময়ে ভারতবর্ষে যে সকল ঘটনার আবির্ভাব হয় এবং লর্ড ক্লাইব, তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ও তাঁহাদের কর্ত্তা বিলাতের ডিরেক্টরেরা যে সকল পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত করেন, তৎসমুদয় জানিতে হইলে পলাসী-যুদ্ধের অব্যবহিত পরে, ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ ছিল, একবার তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত।

নাদিরসাহ এবং আহম্মদসাহ দোররাণীর আক্রমণে বিধ্বংসকার্য্য সবিশেষ সত্বরতার সহিত সম্পন্ন হয়। ১৭৫১ অব্দে লাহোর এবং মুলতান প্রদেশ আফগানদিগের অধীনতা স্বীকার করে। শতদ্রুর পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী জনপদ দোররাণী বংশীয়দিগের অধিকৃত থাকে। অবশেষে রণজিৎ-সিংহের প্রতিভায় এই ভূখণ্ড শিখরাজ্যে পরিণত হয়। অযোধ্যার নবাব সফদরজঙ্গ দিল্লীর সৈনাপতি গাজীউদ্দীনের কৌশলে, মলহররাও হোলকারের অর্থলোভী সৈনিকদিগের সহায়তায় ১৭৫৩ অব্দে দিল্লীর সহিত সংশ্রবের উচ্ছেদ করেন। এইরূপে অযোধ্যা দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া স্বপ্রধান হয়। পর বৎসর দিল্লীর হতভাগ্য সম্রাট গাজীউদ্দিন কর্ত্তৃক পদচ্যুত হন। তাঁহার নেত্রদ্বয় উৎপাটিত হয়। দ্বিতীয় আলমগীর তদীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৭৫৬ অব্দে নিষ্ঠুর-প্রকৃতি আফগান-সৈন্য আবার দিল্লী বিলুণ্ঠন করে। মোগলের চিরসম্মানিত পদ অস্তিত্ব-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। সাহসী বীরপুরুষ দিগের মধ্যে যে কেহ প্রথমে তৈমুরবংশীয়-দিগের রাজধানী আক্রমণ করিলেই, তৈমুর-বংশীয়গণ তাহার কার্য্য-সাধক যন্ত্র স্বরূপ বা বন্দী হইতে থাকেন। দোররাণী-ভূপতি এবং মহা-রাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে কিছুকাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। কিন্তু দোররাণী-রাজ পঞ্জাব পাইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি দিল্লীর রত্নসিংহাসনের আকাঙ্ক্ষা করেন নাই।

সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রকুলোদ্ভব রাজপুত ভূপতিগণ আর মোগলের সামন্ত-শ্রেণীতে পরিগণিত ছিলেন না। তাঁহারা কার্য্যতঃ মোগলের রাজধানীতে ষড়যন্ত্রের দুরবগাহ কুটিল ভাব ও শোণিতপাতের সহিত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ ও মধ্যভারতবর্ষে মহারাষ্ট্রীয়গণ এবং নিজাম, প্রাধান্য রক্ষণ করিতেছিলেন। শিবাজীর ক্ষমতা ও প্রভুত্ব বহুকাল হইতে পেশবার হস্তগত হইয়াছিল। শিবাজীর বংশধরেরা সেতারায় নাম মাত্র রাজকীয় পদগৌরবের অধিকারী ছিলেন। পেশবা পুনার আধিপত্য করিতেছিলেন। মহারাষ্ট্র-চক্রে তাঁহার অসীম প্রাধান্য ছিল। এক সময়ে দক্ষিণাপথে যাহারা গোচারণে মনোনিবেশ করিয়াছিল, কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, তাহারাই এখন মহারাষ্ট্র ভূপতির মন্ত্রগুণে প্রভূত সাহস-সম্পন্ন বিলুণ্ঠনকারী এবং নির্ভীক সেনাপতির শ্রেণীতে নিবেশিত হইয়া-ছিল। কালক্রমে এই শ্রেণী হইতেই বিভিন্ন রাজবংশের উদ্ভব হয়। হোলকার এবং সিন্ধিয়া, মালব অধিকার করেন। ভোঁসলা বেরারের অধিকারী হয়েন। গইকবাড় বরদায় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। হয়দারাবাদের মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠাতার অযোগ্য বংশধর সলাবৎজঙ্গ ফরাসী-সেনাপতি বুসীর প্রতিভা ও ক্ষমতায় আত্ম প্রাধান্য অপ্রতিহত রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ১৭৫৭ অব্দ হইতে এই ক্ষমতাশালী ফরাসী তাঁহার মন্ত্রিত্ব ও তদীয় সৈন্যের পরিচালনা হইতে অপসারিত হয়েন। সলাবৎজঙ্গ অবশেষে বহু ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক ইংরেজদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া হয়দারাবাদে আত্মপ্রাধান্য রক্ষা করেন। ভারতের সর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তস্থিত তাঞ্জোর ও ত্রিচিনাপল্লীর মহারাষ্ট্রীয় ভূপতি

এবং মহীশূরের হিন্দু রাজা পেশবাকে নির্দ্দিষ্ট চৌথ দিতেন। এই সময়ে কেবল হায়দরআলী ধীরে ধীরে উন্নতির সোপানে পদার্পণ করিতেছিলেন। কর্ণাটের নবাব ইংরেজের ক্ষমতায় রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। কিন্তু ইহাঁকেও সময়ে সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে কর-স্বরূপ অর্থ সমর্পণ করিতে হইত। ফলতঃ বর্ণনীয় সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা আপনাদের ক্ষমতার চরমোৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। কাবেরীর তটদেশে, সিন্ধুর সৈকত ভূমিতে সর্ব্বত্রই অবিসংবাদিতরূপে তাহাদের প্রাধান্য স্বীকৃত হইত। সিন্ধু হইতে কাবেরী পর্য্যন্ত সীমার মধ্যে যে সকল জনপদ তাহাদের অধিকৃত ছিল না, তৎসমুদায়ের ভূপতিগণও তাহাদিগকে কর দিতেন। সমগ্র মহারাষ্ট্র চক্রের সঞ্চিত বিপুল বিষয়ই একজন কর্তৃক পরিচালিত এবং সম্মানে, সম্পদে ও শক্তিতে জাতীয় প্রাধান্য-রক্ষণ-রূপ এক উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত হইত। কিন্তু ১৭৬১ অব্দের ৭ই জানুয়ারি এই পরাক্রান্ত জাতির উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত হয়। উত্তর ভারতে পাণিপথের যে প্রশস্ত ক্ষেত্রে মহম্মদ ঘোরী হিন্দুদিগের স্বাধীনতার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন, যে ক্ষেত্রে শূরবংশীয় আফগান সম্রাটের পরাজয়ের সহিত পুনর্ব্বার তৈমুরবংশীয়গণ ভারত সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন, ১৭৬১ অব্দের ৭ই জানুয়ারি, সেই পাণিপথের শেষ যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়গণ হতবল হইয়া পড়ে। পেশবার পুত্র বিশ্বনাথ রাওর মৃত্যুতে এবং যুদ্ধস্থল হইতে সদাশিবরাওর পলায়নে মহারাষ্ট্র সৈন্য ও জাঠদিগের (ইহারা শূদ্রবংশীয়; সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় হইতে ক্রমে ইহাদের বলবৃদ্ধি হইতেছিল) পরাভব ও পশ্চাৎ গমনের চিহ্ন সূচিত হয়। হিন্দুগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার করে। মহারাষ্ট্রীয়দিগের জাতীয় একতাবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সমগ্র ভারতে তাহাদের আধিপত্য স্থাপনের সুখস্বপ্নও চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হয়। এই সময়ে মুসলমানদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া ছিল। অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত পতাকা এবং কোরাণ আর ভারতে অভিনব রাজশক্তির প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয় নাই। বাঙ্গালা, অযোধ্যা, হায়দরাবাদ, কর্ণাট প্রভৃতি প্রদেশে মুসলমান ভূপতিগণ আধিপত্য করিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও ফরাসী বা ইংরেজের আশ্রিত ও অনুগৃহীত ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের পরস্পর সম্মিলনেরও সম্ভাবনা ছিল না। এদিকে বুসী হায়দরাবাদ হইতে অপসারিত হইয়াছিলেন; ১৭৫৯ অব্দে সেনাপতি স্যার আয়ার কূটের পরিচালিত ইংরেজ-সৈন্য বন্দিবাসের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল। ইহার পর পন্দিচেরী ইংরেজদিগের অধিকৃত হইয়াছিল। এই সকল কারণে ভারতবর্ষে ফরাসীদিগের প্রাধান্য স্থাপনের আশাও অন্তর্হিত হয়। বারান্তরে এ সকল কথা আলোচিত হইবে।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

গুটিকৃত ধাতু।

ভারতবর্ষের কোথায় পশ্চাৎ লিখিত ধাতুগুলি পাওয়া যায়, সংক্ষেপে সেই কথা বলিতেছি। আবশ্যক হইলে পরে সে গুলির কথা বিস্তৃত ভাবে লিখিব।

রৌপ্য। রৌপ্য সচরাচর গন্ধক, সীস প্রভৃতি অপরাপর পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে রৌপ্যের আকর ভালরূপ নাই, সে জন্য এইধাতু অন্যদেশ হইতে আমদানি হইয়া থাকে। কথিত আছে যে, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে মালাবার প্রদেশ হইতে রৌপ্য চীন প্রভৃতি দেশে প্রেরিত হইত।

এ কথা কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারা যায় না। এক্ষণে ভারতবর্ষের কোনও স্থানে আকর হইতে লোকে রৌপ্য বাহির করে না। এ দেশে সীসের আকরের সহিত অল্প পরিমাণে রৌপ্য মিশ্রিত হইয়া থাকে। সীসের আকরকে গ্যালিনা (Galena) বলে। এই আকরে সীস ও গন্ধক অধিক পরিমাণে থাকে; সামান্য ভাবে রৌপ্য থাকে। মান্দ্রাজ প্রদেশে কডাপা ও করণূল জিলায়; মধ্য প্রদেশে শম্বলপুর, হোশঙ্গাবাদ জিলায়; বঙ্গদেশে সাঁওতাল পরগণা, ভাগলপুর, বীরভূম, মানভূম, হাজারিবাগ জিলায়; হিমালয়ের নানা স্থানে ও ব্রহ্মদেশের পার্ব্বত্য অঞ্চলে, গ্যালিনা বর্ত্তমান আছে। কোথাকার গ্যালিনায় কি পরিমাণে রৌপ্য আছে, তাহা অতি সাবধানে নিরীকৃত হইয়াছে। যতগুলি সীসের আকর রাসায়নিক ভাবে পরীক্ষিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে করণূল জিলার কোইল কোণ্টলা নামক স্থানের আকর সর্ব্বোত্তম বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। এখানকার ২৭ মণ আকর হইতে ১২ সের রৌপ্য বাহির হইয়াছিল। অপরাপর স্থানের আকর হইতে ২৭মণে কোথাও এক ছটাক, কোথায় এক সের এইরূপে রৌপ্য বাহির হইয়াছিল। বঙ্গদেশে মানভূম জিলায় ঢাডকার আকর হইতে ২৭ মণে প্রায় ৪ সের রৌপ্য বাহির হইয়াছিল। এরূপ আকর হইতে কেবল রৌপ্য বাহির করিতে যাইলে লাভ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। সীস বাহির করিতে পারিলে লাভ হইতে পারে। সেই কার্য্যের সহিত যে টুকু রৌপ্য বাহির হইয়া পড়ে, তাহা উপরি লাভ।

তাম্র। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে খনি হইতে তাম্র উদ্ধৃত হইত। নানা স্থানে বৃহৎ বৃহৎ পরিত্যক্ত খনি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে অতি সামান্য ভাবে আকর হইতে তাম্র সংগৃহীত হইয়া থাকে। প্রধানতঃ তাম্র ও গন্ধক মিশ্রিত সোণামুখী নামক প্রস্তরই তাম্রের আকর। ইহাকে গলাইয়া লোকে তাম্র বাহির করিয়া লয়। সোণামুখী পাথর মাটি খুঁড়িয়া খনির ভিতর হইতে বাহির করিতে হয়। তাম্রের খনিতে শীঘ্র জল বাহির হইয়া পড়ে। এদেশের খনিকেরা দমকল ব্যবহার করিতে জানে না, সুতরাং তাহারা ভাল করিয়া কাজ করিতে পারে না। যথোচিত পরিশ্রম করিয়াও তাম্র-খনি কার্য্যে তাহাদের কষ্টে দিনপাত হয়। সে নিমিত্ত ভারতবর্ষে আকর হইতে তাম্র বাহির করা ক্রমে বন্ধ হইয়া যাইতেছে ও বিদেশ হইতে তাম্র আমদানি হইতেছে। মান্দ্রাজ প্রদেশে, ত্রিচিনা পল্লি, বেল্লারি, কডাপা, করণূল, বনল্লোর প্রভৃতি জিলায় প্রচুর পরিমাণে তাম্রের আকর আছে। প্রাচীন কালে এই সকল স্থানে বহুল পরিমাণে তাম্র উদ্ধৃত হইত। নানা স্থানে বৃহৎ বৃহৎ পরিত্যক্ত খনি পড়িয়া রহিয়াছে। আধুনিক মতে ইংরাজেরা তামা বাহির করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে লাভ না হইয়া বরং ক্ষতি হইয়াছিল। সুতরাং খনিকার্য্য এক্ষণে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মধ্য প্রদেশে রাইপুর, জব্বলপুর, নরসিংহপুর, চান্দা প্রভৃতি জিলার নানা স্থানে অনেক তামার আকর আছে। কয়েক বৎসর হইল, নর্ম্মদা নদীর একটী চড়া হইতে আকর লইয়া তাহা হইতে তামা বাহির করিয়া একজন সাহেব বিলাতে পাঠাইয়া ছিলেন। খরচ উঠিয়া ছিল, কিন্তু বিশেষ লাভ হয় নাই। সে নিমিত্ত এ কাজ তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন। মধ্য প্রদেশে যে সর্ব্বোত্তম তাম্রের আকর আছে, তাহাতে একশত ভাগে ৪৮ ভাগ তাম্র থাকে, অবশিষ্ট ৫২ ভাগ মৃত্তিকা, লৌহ প্রভৃতি অপরাপর পদার্থ। মধ্য ভারতের দেশীয় রাজ্য সমূহের ভিতরও প্রচুর পরিমাণে তাম্রের আকর আছে। রিবা, বুন্দেলখণ্ড, অলবার, ভরতপুর, জয়পুর, আজমীর

উদয়পুর, বুন্দি, বিকানীর, প্রভৃতি স্থানের পার্ব্বত্য ভাগে তাম্রের আকর আছে। জয়পুর এলাকায় আরাবলি পর্ব্বতে, শিঙ্খানা নামক স্থানে এখনও লোকে আকর হইতে তাম্র প্রস্তুত করে। ক্ষেত্রি নামক স্থানেও প্রচুর পরিমাণে তাম্র উদ্ধৃত হয়। বোম্বাই প্রদেশে ধারবাড় জিলায় অল্প পরিমাণে তাম্রের আকর আছে। বঙ্গদেশে, ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা, বীরভূম, মানভূম, সিংহভূম, হাজারিবাগ ও লোহার দাগা জিলায় প্রচুর পরিমাণে তাম্রের আকর আছে। বৈদ্যনাথের নিকট তাম্রের আকর আছে। ৪৫ বৎসর পূর্ব্বে এই আকর প্রথম আবিষ্কৃত হয়। দুই একজন সাহেব পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, এই আকরের সহিত রৌপ্যও মিশ্রিত আছে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৮৯ খৃঃ) যেরূপ স্বর্ণ লইয়া হুলস্থূল পড়িয়াছিল, সেইরূপ সেই সময়ে বৈদ্যনাথের তাম্রের আকর লইয়াও হুলস্থূল পড়িয়াছিল। কিন্তু এ আকর হইতে বিশেষ কোনও লাভ হয় নাই। এই আকরে একশত ভাগে পশ্চাৎ লিখিত পদার্থ সমূহ মিশ্রিত আছেঃ—তাম্র ৩৮ ভাগ লোহ ১৭, সীস ১, রৌপ্য ½, গন্ধক ১৭, অবশিষ্ট বালুকা, মৃত্তিকা ইত্যাদি। মানভূম জিলায়, মানবাজারের নিকট একটী পরিত্যক্ত পুরাতন তাম্রের খনি আছে। কে কবে এই খনি আবিষ্কার করিয়াছিল, এক্ষণে তাহার কিছু ঠিক নাই। সিংহভূমে নানা স্থানে প্রচুর পরিমাণে তাম্রের আকর আছে। অতি প্রাচীনকাল হইতে লোকে এই স্থানের আকর হইতে তাম্র বাহির করিত। ইংরাজেরাও বার বার এই কার্য্য চালাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভালরূপ লাভ হয় নাই। ধলভূম ও সেরাইকেলা রাজার এলাকায় অনেক তাম্রখনি আছে। এস্থানে তাম্রখনির কার্য্য করিলে লাভ হইবার সম্ভাবনা। সিংভূম ও ধলভূম এলাকায় বরগণ্ডা নামক স্থানে একটী ইংরাজ-কোম্পানি তাম্র-খনির কার্য্য করিতেছেন। ১৮৯১ সালে তাঁহারা ১,৩২,৫০০ টাকা মূল্যের তাম্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন। হাজারিবাগ জিলায়ও অনেক প্রাচীন তাম্রখনি আছে। এ স্থানের আকরে একশত ভাগে ৩৪ ভাগ তামা, ৩৪ ভাগ লৌহ, ও ৩২ ভাগ গন্ধক থাকে। হিমালয় পর্ব্বতে, বিশেষতঃ কুমাউন ও গড়ওয়াল জিলায়, উত্তম আকর আছে ও অনেক স্থানে পরিত্যক্ত খনিও দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও কোনও স্থানে এখনও সামান্য ভাবে তাম্র সংগৃহীত হইয়া থাকে। নেপালের খনি সমূহ হইতেও অল্প পরিমাণে তাম্র প্রস্তুত হয়। কিন্তু ক্রমে সর্ব্বত্রই এই কার্য্য বন্ধ হইয়া যাইতেছে। দারজিলিং জিলায় অনেকগুলি তাম্রখনি আছে। ভূটান, আসাম, ব্রহ্মদেশ—সকল স্থানেই তাম্রের আকর অল্লাধিক বর্ত্তমান আছে।

সীস। সীস বিশুদ্ধ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। সচরাচর ইহা গন্ধকের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। এরূপ আকরকে গ্যালিনা (Galena) বলে। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে প্রচুর পরিমাণে সীস উৎপন্ন হইত। এক্ষণে একার্য্য প্রায় একবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মান্দ্রাজ প্রদেশে, কডাপা জিলায়, জঙ্গমরাজপল্লি নামক গ্রামে বৃহৎ সীসের খনি আছে। এখানকার আকরে ১০০ ভাগে ৬৭ভাগ সীস থাকে। তাহার সহিত যৎসামান্য রৌপ্যও মিশ্রিত থাকে। ২৭মণ আকর হইতে ৩০ তোলা রৌপ্য বাহির হয়। করণুল, বেল্লারি প্রভৃতি জিলায়ও সীসের আকর আছে। নাগপুর, রিবা, বুন্দেলখণ্ড, অজমীড়, অলবাড়, উদয়পুর প্রভৃতি স্থানে সীসের আকর আছে। আজমীড় জিলায় তারাগড় নামক পর্ব্বতে আজ পর্য্যন্ত লোকে আকর হইতে সীস বাহির করে। বোম্বাই প্রদেশে পাঁচমহল নামক স্থানে পূর্ব্বকালে সীসের খনি ছিল। এক্ষণে একার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। হিমালয় পর্ব্বতে

অনেক স্থানে আজ পর্য্যন্ত সীসের খনির কার্য্য হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে, ভাগলপুর, মুঙ্গের, সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, হাজারিবাগ, লোহারদাগা প্রভৃতি জিলায় নানা স্থানে সীসের আকর আছে। সাঁওতাল পরগণায় শঙ্কেরা পাহাড়, তুরি পাহাড়, বাইঞ্চ কি, পাঁচ পাহাড় প্রভৃতি নানা স্থানে প্রচুর পরিমাণে সীসের আকর বর্ত্তমান আছে। এখানকার আকরের একশত ভাগে ৪২ ভাগ সীস, ১৫ ভাগ গন্ধক, ও যৎসামান্য রৌপ্য থাকে। ভাগলপুর জিলায় গৌরিপুর, খড়িখর, প্রভৃতি স্থানে সীসের খনি আছে। কয়েক বৎসর পুর্ব্বে এই জিলায় বাঁকা নামক স্থানে একজন সাহেব সীসের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু লাভ হইল না। সুতরাং তাঁহাকে অল্প দিনেই কাজ বন্ধ করিয়া দিতে হইল। মুঙ্গের জিলায় চকাই ও খড়কপুর পাহাড়ে, মানভূম জিলায় ঢাডকা প্রভৃতি স্থানে, হাজারিবাগ জিলায় মহাবাগ, বরাগুণ্ডা, মেহানদাদি, মুকুন্দগঞ্জ পরসেয়া হিসাটুতে; লোহারদাগা জিলায় বরিখাপ, সিলি, ইত্যাদি নানা স্থানে সীসের আকর বর্ত্তমান আছে। মধ্যপ্রদেশে, আসামে, ব্রহ্মদেশে সর্ব্বত্রেই অল্লাধিক সীসের আকর দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মদেশ হইতে এখনও সামান্য ভাবে সীস বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে।

দস্তা (Zinc) দস্তা বা জস্তা সচরচর গন্ধকের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এই ধাতু অতি বিরল। হাজারিবাগ জিলায়, রাজপুতানায় ও হিমালয়ের কোন কোন স্থানে ইহা সীসের আকরের সহিত সামান্য ভাবে বর্ত্তমান থাকে। রাজপুতানায়, উদয়পুর এলাকায় জওয়ার নামক স্থানে সেকালে লোকে আকর হইতে দস্তা বাহির করিত। কিন্তু একথা ঠিক কি না, তাহা ভালরূপে মীমাংসা হয় নাই।

টিন। ভারতবর্ষে এ ধাতুও বিরল, সুতরাং ইহা বিদেশ হইতেই আনীত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে, হাজারিবাগ জিলায় নরঙ্গা নামক স্থানে টিনের আকর আছে। এই অঞ্চলে যাহারা প্রস্তর গলাইয়া লৌহ বাহির করে, তাহারা একবার লৌহের আকর গলাইতে গলাইতে এক প্রকার শুভ্র ধাতু দেখিতে পাইয়াছিল। রৌপ্য মনে করিয়া সেই ধাতু তাহারা রাণীগঞ্জে বিক্রয় করিবার নিমিত্ত লইয়া আইসে। রাণীগঞ্জের একজন সাহেব এই কথা শুনিয়া সেইস্থানে গমন করেন। সেই ধাতু যে টিন ও টিনের আকর যে-সেস্থানে বর্ত্তমান আছে, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া পালগঞ্জের রাজার নিকট হইতে তাহার স্বত্ব কিনিয়া খনিকার্য্য আরম্ভ করিলেন। যাহা হউক, সাহেব কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অল্প দিনেই তাঁহাকে কাজ বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছিল। ব্রহ্মদেশে, টেনেসেরিম, মারগুই প্রভৃতি অনেক স্থানে টিনের খনি আছে।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

আমার জীবন-চরিত।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

কিছুদিন পরে অন্য একজন গুপ্তচর বেরিলী হইতে প্রত্যাগত হইল। তাহার নিকট এইরূপ সংবাদ অবগত হইলাম;—নবাব খাঁ বাহাদুর প্রায় বিশ হাজার সেনা একত্র করিয়াছেন। ইহার মধ্যে অর্দ্ধেক সৈন্য সুশিক্ষিত। নানাদিক হইতে বিদ্রোহী সিপাহী আসিয়া তাঁহার দলে যোগদান করিয়াছে। নবাব আরও সৈন্যবৃদ্ধির চেষ্টায় আছেন; কিন্তু ধনাগার শূন্য বলিয়া, তাঁহার সৈন্যবৃদ্ধির আশা ফলবতী হইতেছে না। তিনি নাইনিতাল আক্রমণের জন্য প্রায় দশ হাজার সেনা পাঠাইয়াছেন।

তিনি প্রকাশ্য রাজদরবারে সর্ব্ব-সমক্ষে প্রায়ই বলিয়া থাকেন, নাইনিতাগস্থ ইংরেজ-সমূহকে বিনষ্ট করিতে না পারিলে, আমার নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিবার আশা কিছুমাত্র নাই। বারওল সাহেব জিজ্ঞাসিলেন,—"হিন্দু মুসলমানে সদ্ভাব কেমন?" গোয়েন্দা বলিতে আরম্ভ করিল;—"সহরে হিন্দুর দুরবস্থা দেখিয়া বুক ফাটিয়া যায়। গো-রক্তে হিন্দুর মন্দির রঞ্জিত হইতে দেখিয়াছি। যদি কোন হিন্দু ইহার প্রতিবাদ করিতে যায়, তাহা হইলে মুসলমানের তরবারির প্রহারে সে তৎক্ষণাৎ দ্বিখণ্ডিত হয়। সাধারণতঃ তিলক কাটিয়া বা গলায় মালা দিয়া, কোন হিন্দু একাকী পথ চলিতে সাহস করে না। দল বাঁধিয়া হিন্দুগণ রাজপথে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ইদানীং কোনও হিন্দু-স্ত্রী, কি পাল্কীতে, কি গাড়ীতে, বাটীর বাহির আর হন না। বিশেষ, গোঁসাই ব-দেবগীরের হত্যাকাণ্ডের পর, মুসলমানগণের সাহস বৃদ্ধি হইয়াছে। যে মুসলমান-বিচারক, গোঁসাই বলদেবগীরকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিয়া মুক্তি প্রদান করেন, সেই মুসলমান-বিচারকই কেবল ঐ মুক্তিপ্রদান-হেতু পদচ্যুত হইল দেখিয়া, মুসলমান-গুণ্ডাগণের, মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বিক্রম বাড়িয়া উঠিয়াছে। ভীষণাকার গুণ্ডাগণ বক্ষ ফুলাইয়া, তীক্ষ্ণধার তরবারি হস্তে লইয়া, বিশাল রক্ত-চক্ষু বিস্ফারিত করত, সদাই পথে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। নিশাকালে অধিকাংশ রাজপথেই আলোক দেওয়া হয় না; ঘোর অন্ধকারে নিশাচর গুণ্ডাগণের শয়তানি দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তখন ছুরি, ছোরা, তরবারি, লাঠি প্রভৃতির খেলা অনবরত চলিতে থাকে। হিঃ হিঃ হোঃ হোঃ হাসি,—বিকট হুহুঙ্কার রব, দ্রুতগমন, পতন, অভ্যুত্থানের দুপ দুপ, হুড়-হুড়, ধুপ-ধাপ শব্দ—এই সমস্ত ব্যাপারে তিমিরাবৃতা রজনী সদাই পরিপূর্ণা। নারীরূপিণী রাক্ষসীরও অভাব নাই। ইহারা আরও ভীষণা। অতীব উন্মত্তা, এবং লজ্জা-ভূষণ-বিবর্জ্জিতা। বলিলে বিশ্বাস করিবেন কিনা জানি না,—ইহাদের মধ্যে কেহ উলঙ্গিনী, পূর্ণ-দিগম্বরী—মায়াবিনী, কাম-চারিণী!!—অন্ধকারে প্রকাশ্য রাজপথে পর-পুরুষকে আলিঙ্গন দানে উদ্যতা। শ্রবণ-পথ রুদ্ধ করুন, নয়ন মুদ্রিত করুন! এ পৈশাচিক প্রক্রিয়ার কথা কেহ শুনিবেন না, কেহ দেখিবেন না। গুণ্ডাগণের এই সকল রমণী লইয়া রজনীযোগে পথে পথে রঙ্গভঙ্গ হইয়া থাকে।

"পূর্ব্বে ইংরেজ-রাজত্ব কালে, যে স্থলে কস্মিন্ কালে গোহত্যা হইত না, এক্ষণে দিবসে সর্ব্বজন সমীপে, মহাসমারোহে বাদ্য-বাজনার সঙ্গে সঙ্গে, তথায় গোহত্যা হইয়া থাকে। কখন জীবন্ত বা অর্দ্ধমৃত গরুর ছাল খুলিয়া, তক্তারামায় বিবাহার্থী বরকে যেরূপ ভাবে লইয়া যায়, সেইরূপ ভাবে সেই মুক্ত-ত্বক গোকে লইয়া, মুসলমানগণ পল্লী প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে।"

আমি কাণে হাত দিয়া বলিলাম,—"আর না,—তোমার অন্য কিছু বলিবার থাকে ত বল।"

বারওয়েল সাহেব কহিলেন,—"আমার একটা কথা জিজ্ঞাস্য এই, নবাব খাঁ-বাহাদুর এ সব অত্যাচার অনুমোদন করিতেছেন কি? দেওয়ান শোভারাম শুনিয়াছি, একজন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু; এবং তাঁহার ক্ষমতাও অতুল; তিনিই বা কেন নীরব আছেন? কোন প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছেন না কেন?—এ সকল বিষয়ের যদি কোন সন্ধান আনিয়া থাক, তবে তাহা আমাদিগকে বল।"

গোয়েন্দা। শুনুন,—বলি। নবাব খাঁ-বাহাদুরের অধিকাংশ সৈন্যই মুসলমান। তিনি মুসলমান পাইলে, হিন্দুকে সেনাদলে ভর্ত্তি করিতে চাহেন না। তবে উপযুক্ত শিক্ষিত, বলবান্ হিন্দুসেনাকেও তিনি উপেক্ষা করেন না;

কারণ তিনি জানেন, হিন্দুসৈন্য বড়ই বিশ্বাসী এবং কর্তব্যপরায়ণ। এইরূপে একচতুর্থাংশ হিন্দুসেনা, নবাবের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ-লাভ করিয়াছে। প্রথম-প্রথম হিন্দুসেনা আসিলে মুসলমান রেজিমেণ্টেই ভর্ত্তি করা হইত। কিন্তু হিন্দুগণ মুসলমান-দলে থাকিতে ভাল বাসিত না;—তাহাদের আহারের, রন্ধনের অসুবিধা হইত। পাঁচশত মুসলমানের মধ্যে একশত মাত্র হিন্দু কেমন করিয়া তিষ্ঠিবে! হিন্দুসেনা-গণ নবাবের নিকট দরখাস্ত করে যে, আমরা মুসলমান-দলে থাকিতে পারিব না; হিন্দুর স্বতন্ত্র রেজিমেণ্ট গঠিত হউক। প্রথমে নবাব এ কথায় আদৌ কর্ণপাত করিলেন না। নবাবের ঔদাস্য দেখিয়া, অনেকগুলি হিন্দুসেনা চাকুরি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তখন নবাবের চৈতন্য হইল। দেওয়ান শোভারামের পরামর্শে হিন্দু-সেনার স্বতন্ত্র দল সংগঠিত হইল। একদিন একদল হিন্দুসেনা বেরিলী সহরমধ্য দিয়া মাঠে ছাউনি অভিমুখে যাইতেছে। কয়েক জন দুর্বৃত্ত মুসলমান একজন ভদ্র-হিন্দুর গৃহে গোমুণ্ড ফেলিবার উদ্যোগ করিতেছে। তখন সন্ধ্যা সমাগত হইয়াছে। একজন বৃদ্ধ হিন্দু দ্বিতল গৃহের বারেন্দায় দাঁড়াইয়া কাতর-কণ্ঠে যোড়হাতে তাহাদিগকে এ কাজ করিতে নিষেধ করিতেছেন। কিন্তু পাষণ্ডগণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতেছে না, বরং অট্ট অট্ট হাসিয়া, বৃদ্ধকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেছে। বৃদ্ধ বলিতেছে, "তোমাদের কাছে আমি কি দোষ করিয়াছি যে, তোমরা আমার উপর এইরূপ অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ।" বাস্তবিক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৃদ্ধ উহাদের নিকট কোনও দোষের দোষী নহে। শেষে জানিতে পারিলাম, বৃদ্ধের পুত্রের সহিত সহরের এক ব্যক্তির মনান্তর ছিল। ইংরেজের রাজত্ব-কালে জমী-জায়গা লইয়া সেই পুত্রের সহিত মোকদ্দমাও হইয়াছিল। মোকদ্দমায় পুত্র জয়লাভ করে। এক্ষণে সেই মুসলমান, বৃদ্ধকে এবং তাহার পুত্রকে জব্দ করিবার মানসে, গুণ্ডা দ্বারা গো-মুণ্ড বৃদ্ধের বাটীতে ফেলাইতেছে। গুণ্ডাগণ সুরাপানে উন্মত্ত এবং অসুর অবতার। দেখিতে দেখিতে একজন গুণ্ডা বৃদ্ধের ছাদে একটা গোমুণ্ড ফেলিল। আর মুখে বলিতে লাগিল, "আর দুইটী যে গোমুণ্ড আছে, তন্মধ্যে একটী তোর জন্য—অপরটী তোর ছেলের জন্য।" যখন এইরূপ বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে, তখন ঐ হিন্দু-সেনাদল সেই স্থানে সমুপস্থিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ এই সুযোগ পাইয়া করুণ-স্বরে, চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিতে লাগিলেন, "আজ হিন্দুর ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমস্তই রহিত হইল। এদেশে হিন্দুর বাঁচিয়া থাকা বৃথা। হিন্দুর মৃত্যুই মঙ্গল। এদেশে কি এমন কোন হিন্দু নাই—বীর্য্যবান্, জ্ঞানবান্, স্বধর্ম্ম-পরায়ণ হিন্দু নাই,—যিনি আজ এই ঘোর বিপদে-পতিত এই হিন্দুপরিবারকে রক্ষা করিতে পারেন?"

নিম্ন হইতে সেই হিন্দু-সৈন্যদল উত্তর দিল,—"ভয় নাই, ভয় নাই! আমাদের দেহে এক বিন্দু রক্ত যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ তোমাকে রক্ষা করিব। হিন্দুর স্বধর্ম্ম-নাশ, আমরা চক্ষে দেখিতে পারিব না।"

প্রায় বারজন গুণ্ডা তথায় উপস্থিত ছিল। হিন্দুসেনাগণ তাহাদিগকে বলিল,—"যদি মঙ্গল চাও, যদি আপন প্রাণ রক্ষা করিতে চাও, তবে এস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও। এবং শপথ করিয়া, নাকে খত দিয়া বল, এমন কর্ম্ম আর কখন করিবে না।"

মুসলমান গুণ্ডাগণ উন্মত্ত ছিল। তাহাদের তখন দিগ্বিদিক-জ্ঞান কিছুই ছিল না। হিন্দুর মুখে এই অবমান-সূচক কথা শুনিয়া, তাহারা নিমেষ মধ্যে কটীবন্ধ হইতে শাণিত ছোরা বাহির করিয়া, একেবারে সেই ছোরা হাতে

লইয়া হঠাৎ হিন্দুসেনাকে আক্রমণ করিল। হিন্দু-সেনা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। বিশেষ সেখানে পথ সঙ্কীর্ণ। অন্ধকারময়। এক এক শ্রেণীতে চারিজন-চারিজন হিন্দু-সেনা দাঁড়াইয়া কিছু কম অর্দ্ধ পোয়া পথ যুড়িয়া ছিল। সেই গুণ্ডাগণের আক্রমণে প্রথম শ্রেণীর চারিজন হিন্দুসেনা বিকট চীৎকার করিয়া ভূতলশায়ী হইল। গুণ্ডাগণ তাহাদের উদরে, বক্ষে, এবং গ্রীবাদেশে এরূপ সতেজে ছোরা বসাইয়াছিল যে, চারিজন হিন্দু-সেনা ভূতলে পড়িয়া, অল্পক্ষণ মধ্যে পঞ্চত্ব পাইল। দেখিতে দেখিতে আরও চারিজন হিন্দু-সেনা বিষম অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়া ছটফট্ করিতে লাগিল। এক মহা-কল্লোল-কোলাহল উত্থিত হইল। কিন্তু হিন্দু-সেনা অল্প-ক্ষণ মধ্যেই প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল। কিন্তু সেই ঘোর অন্ধকারে শত্রু-মিত্র চেনা ভার। হিন্দু দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইল; এবং বন্দুকের সঙ্গীন এমন ভাবে ঘনঘন সন্নিবেশ করিল যে, গুণ্ডাগণ তাহা ভেদ করিয়া আর অগ্রগামী হইতে পারিল না। যে গুণ্ডা অগ্রগামী হয়, সেই গুণ্ডাই তৎক্ষণাৎ অমনি, সঙ্গীন-বিদ্ধ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে পাঁচ জন উন্মত্ত গুণ্ডা নিহত হইল। এদিকে গুণ্ডার দল কিন্তু ক্রমশ পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। অন্যান্য পল্লীর গুণ্ডাগণ এ সংবাদ পাইয়া এ দলে যোগদান করিল। শেষে প্রায় পঞ্চাশ জন গুণ্ডা দূর হইতে একটা মহা হল্লা করিয়া, "মার্ মার্" রবে হিন্দু-সেনাকে আক্রমণ করিতে চলিল। হিন্দু-সেনাগণ ব্যাপার বিষম বুঝিয়া, সেই গুণ্ডাদল লক্ষ্য করিয়া, অজস্রধারে গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। গুণ্ডাগণ গুলির আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। কে কোথায় তখন যে পলাইল, তাহার আর ঠিক রহিল না। শেষে দেখা গেল, যোল জন গুণ্ডা গুলির আঘাতে মাটিতে পড়িয়া ছটফট্ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে তাহাদের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। দেখিতে দেখিতে রাজপথ গুণ্ডাশূন্য হইল। তখন অন্ধকারের সহিত নীরবতার সংযোগ হইল। হিন্দু-সেনাদল যেন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, শেষে আপন গন্তব্য-পথাভি-মুখে ধীরে ধীরে যাত্রা করিল। আমি যে বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলাম, সে বাটীর জানালা রুদ্ধ করিলাম। রাত্রে কি ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা জানি না, কারণ আমি সে রাত্রে সে স্থানে ছিলাম না। অন্য গুপ্ত গলিপথ দিয়া আসিয়া নবাব-বাটীর নিকটস্থ কোন গৃহে আশ্রয় লইয়া রহিলাম।

প্রভাত হইল। সূর্য্যদেব ষোল কলায় সমুদিত হইলেন। আজ নবাব, নির্দ্দিষ্ট ক্ষণের পূর্ব্বেই; রাজদরবারে সিংহাসনে আসিয়া, উপ-বেশন করিলেন। আজ দরবারে মহা-সমারোহ। সভাতে সহরের প্রধান প্রধান বারজন হিন্দু আসিয়া, যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন। প্রায় বিংশতি জন প্রধান মুসলমান আসিয়া সমবেত হইলেন। সকলেই নীরব, কাহারও মুখে বাঙ্নিষ্পত্তি নাই। শেষে নবাব খাঁ-বাহাদুর আল্লার নাম করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন;—"কেন এমন হয়? হে আল্লা! কেন এমন হয়? হিন্দু-মুসলমানে—ভেয়ে-ভেয়ে,—এত বিবাদ, এত রক্তপাত কেন হয়? হিন্দু আমার দক্ষিণ হস্ত, হিন্দু আমার দক্ষিণ নয়ন, হিন্দু আমার দক্ষিণ কর্ণ;—হিন্দুর বলবীর্য্যের সাহায্য পাইয়াই আমি এই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হইয়াছি। হিন্দুকে আমি ভালবাসি, ভক্তি করি। শোভারাম পরম ভক্তিমান্ হিন্দু; তাঁহাকে আমি রাজত্বের প্রধান পদে, স্বীয় প্রধান অমাত্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। হীরালাল, গোকুলানন্দ, ব্রজকিশোর প্রভৃতি সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণগণকে উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত করিয়াছি। আজ রাজ-দরবারে মুক্তকণ্ঠে

ঘোষণা করিতেছি, যদি কোন মুসলমান, বিনা কারণে কোন হিন্দুর উপর অত্যাচার করে, অথবা নিষিদ্ধ স্থানে গোহত্যা করে, তবে তাহাকে আমি গুরুতর দণ্ড দিব। "হিন্দু-মুসলমান এক," "হিন্দু-মুসলমান এক"—ইহাই অদ্য হইতে হিন্দু-মুসলমানের উভয় কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইতে থাকুক! আজ হইতে ভেদজ্ঞান উঠিয়া যাউক! আজ হইতে হিন্দু মুসলমান এক-দেহ, এক-প্রাণ হউক!"

নবাবের মুখ-নিঃসৃত এই বক্তৃতার মর্ম্ম অবশ্যই বুঝিয়া থাকিবেন। পূর্ব্বদিনের রাত্রে সেই হত্যাকাণ্ডের পর সহরের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত হিন্দু এবং ছদ্মদল হিন্দু-সেনা, রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরে নবাব-বাটীতে সমাগত হন; এবং মুসলমান কর্ত্তৃক উৎপীড়নের কথা কাতর-বচনে ব্যক্ত করেন। সেই আবেদনের ফলেই আজ এই বক্তৃতা। আমি গোয়েন্দাকে জিজ্ঞাসিলাম,—"তুমি ত এক মাসের অধিক বেরিলীতে ছিলে। নবাব, মুখে যেমন হিন্দুদের প্রতি সদয়, অন্তরেও কি সেইরূপ সদয়?"

গোয়েন্দা। নবাব গোঁড়া-মুসলমান। হিন্দুদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু হিন্দুর প্রতি তিনি প্রকাশ্যে বড়ই সৌজন্য দেখাইয়া থাকেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা যে, হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপিত হয় এবং এ বিষয়ে তিনি বিশেষ চেষ্টাও করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তিনি চেষ্টা করিলে কি হইবে? কার্য্যত কিছুই দাঁড়ায় না। ফল কথা, নবাব তাঁহার মুসলমান অনুচরবর্গকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। বাস্তবিকই নবাব বিপদে পড়িয়াছেন। নবাব উভয়ের মন রাখিতে গিয়া এক্ষণে উভয় দলেরই বিরাগ ভাজন হইয়াছেন। সেদিনের আর একটা তামসিক ব্যাপার শুনুন। নবাব উভয় দলের বিরাগভাব প্রশমিত করিবার জন্য এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি হিন্দুদের জন্য একটী বৃহৎ পতাকা বা পবিত্র ধ্বজ এবং মুসলমানদের মহম্মদীয় ঝণ্ডা অর্থাৎ পবিত্রধ্বজ তুলিয়া তাহার তলদেশে প্রধান প্রধান হিন্দু এবং মুসলমানকে আহ্বান করিতে মনস্থ করিলেন। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সেই দিন বৈকালে শোভারাম, গোকুলানন্দ, নেওয়ালানন্দ প্রভৃতি কয়েক জন ব্রাহ্মণ এবং গণেশ রায়, হরসুখ রায় প্রভৃতি কয়েকজন কায়স্থকে সঙ্গে লইয়া নবাব নগরভ্রমণে চলিলেন। বলা বাহুল্য, হিন্দুগণ আপন ধ্বজের তলদেশের সন্নিকট দিয়া যাইতে লাগিলেন; মুসলমানগণ মহম্মদীয় ঝণ্ডার তলায় অবস্থিতি করত যাত্রা করিলেন। স্বয়ং নবাব মহাসমারোহে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করত সহর প্রদক্ষিণ করিলেন। আর মধ্যে মধ্যে ধ্বনি উঠিতে লাগিল,—"হিন্দু-মুসলমান এক,—রাম-রহিম এক—শ্রীকৃষ্ণ-আল্লা এক" এবং এই সঙ্গে ইহাও ঘোষণা হইল,—"যে সকল বয়ঃপ্রাপ্ত বলিষ্ঠ হিন্দু আছে, তাহারা অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক হিন্দুর ধ্বজের তলদেশে উপস্থিত হউক; অস্ত্রধারী মুসলমানগণ মহম্মদীয় ঝণ্ডার তলদেশে সমবেত হউক এবং ইংরেজের উচ্ছেদ-কামনায় সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউক।" অনেক দর্শক একত্র হইল। সে জনতা অতিক্রম করিয়া, পথ চলে সাধ্য কার? মহা হৈ হৈ শব্দে হিন্দুর পবিত্র ধ্বজ রামগঙ্গাতীরে প্রোথিত করা হইল এবং সেই দিনই সহরের নিকটস্থ বাগানে মহম্মদীয় ঝণ্ডা পোঁতা হইল। রামগঙ্গাতীরে দেওয়ান শোভারাম হিন্দুমতানুযায়ী আহারীয় সামগ্রী,—লুচি, সন্দেস, ক্ষীর—বিতরণ করিতে লাগিলেন। বাগানে কালিয়া, কাবাব, কোর্ম্মা প্রভৃতির বণ্টন হইতে লাগিল। নবাব খাঁ-বাহাদুর এই সকল কার্য্য সমাধা পূর্ব্বক রাত্রি প্রায় এক প্রহরের পর বাটী ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু ইহাতে ফল যে

বিশেষ কিছু ফলিল, তাহা বোধ হয় না। আমার বিশ্বাস, হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব এক কড়াও বৃদ্ধি হইল না।

এইরূপে সেই দিন সেই গুপ্তচরের নিকট হইতে এইরূপ নানা কথা শুনিয়া বড়ই তৃপ্তিলাভ করিলাম। স্মারক-লিপিতে সমস্ত কথা লিখিয়া রাখিলাম।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

এই ভাবেই কালাডুঙ্গিতে কাল কাটিতে লাগিল। সৈন্যগণকে শিক্ষাদান, দূতমুখে গুপ্ত সংবাদ শ্রবণ, উদ্ধারের উপায় চিন্তা,—এই সমস্ত ব্যাপার লইয়াই সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতাম। এ ছাড়া, আমাদিগকে সর্ব্বদাই রণ-সাজে সজ্জিত হইয়া থাকিতে হইত। যুদ্ধের পোষাক পরিয়া রাত্রে ঘুমাইতাম। অশ্বশালায় সমুদায় অশ্বের উপর জিন্ প্রভৃতি সর্ব্বদা লাগান-ই থাকিত। বল্লম, তরবারি, বন্দুক—রাত্রে শিয়রে রাখিয়া নিদ্রা যাইতাম। প্রত্যহ রাত্রে তিনবার করিয়া ঘোড়-দৌড় হইত। অর্থাৎ প্রায় একশত অশ্বারোহী রাত্রি ১০টা, ২টা এবং সাড়ে চারিটা—এই তিন সময়ে কালাডুঙ্গির চারি ধারে দ্রুতবেগে এবং সদম্ভে বেড়াইত। শত্রুপক্ষ কখন্ হঠাৎ আমাদিগকে আক্রমণ করে, ইহাই আমাদের ভয় ছিল।

সময়ে সময়ে আহারীয় দ্রব্যের অভাব হইত। ইংরেজের হাতে টাকার স্বচ্ছলতা নাই; আর, মোরাদাবাদ, রামপুর, কাশীপুর অঞ্চল হইতে নাইনিতালাভিমুখে রসদের রপ্তানি হইলেও, মাঝে মাঝে মধ্যপথে বিদ্রোহিগণ তাহা লুঠিয়া লইত। প্রথমতঃ টাকা কম, দ্বিতীয়তঃ রসদের আমদানি কম। এই উভয় কারণে অনেক সময় ঘৃত, আটা, ডাল প্রভৃতি, আমরা পূর্ণ মাত্রায় পাইতাম না। কিন্তু জঠর-জ্বালা নিবৃত্তি করিবার জন্য এক প্রশস্ত উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলাম। আমরা প্রায়ই বড় বড় হরিণ শীকার করিয়া আনিতাম। কালা-ডুঙ্গিতে পক্ষীরও অভাব ছিল না। আটার অল্পতা দোষ, মাংসের আধিক্য-গুণে দূর হইত। এইরূপে দেহের পুষ্টি-সাধনও বিলক্ষণ হইতে লাগিল।

মাঝে মাঝে মনে একটা দুর্ভাবনা উপস্থিত হইত। আমরা কোথায় আছি? কোথায় আত্মীয় স্বজন-পরিবার, আর কোথায় আমরা! আজ বনবাসা, আজ পর্ব্বতের অধিত্যকাবাসী! উদ্ধারের কি উপায় সহজে হইবে না? ইংরেজের পুনরায় রাজত্ব করিতে আর বিলম্ব কত? বিদ্রোহিগণেরই শেষে যদি বল অধিক হয়? সুবিধার মধ্যে এই টুকু যে, বিদ্রোহিদলের কর্ত্তা নাই। কিন্তু শেষে যদি একজন কর্ত্তা আসিয়া যুটেন, তখন উপায়? বিদ্রোহীদের নৌকা আছে, হাল আছে,—মাঝি নাই; কিন্তু মাঝি যুটিতে কতক্ষণ! আজ কলিকাতায় কি হইতেছে জানি না,—কাশীতে কি হইতেছে জানি না,—লক্ষ্ণৌ নগরে কি হইতেছে জানি না;—তথাকার সমগ্র ইংরেজ কি সমূলে বিনষ্ট হইয়াছেন? না,—এখনও তাঁহারা বিদ্রোহিগণের সহিত অকাতরে যুঝিতেছেন? আজ দিল্লীর অবস্থা কিরূপ? দিল্লী হইতে ইংরেজদল বিতাড়িত, দূরীভূত,—ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষ নিদারুণ অস্ত্রাঘাতে শতধা খণ্ডীকৃত! আজও কি দিল্লী সহরে মুসলমান বাদসাহের প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে? রক্ষার বুঝি আর উপায় নাই। বুঝি ডুবিলাম—মরিলাম! আবার মনে হইত,—ভয় কি? বোকা বিদ্রোহিগণ কখনই বিজয়লাভ করিতে পারিবে না। অল্পদিন মধ্যে আবার বিজয়লক্ষ্মী ইংরেজের অঙ্কশায়িনী হইবে। এইরূপ আশা এবং নিরাশায় কাল কাটিতে লাগিল। আমরা যে, সদাই যোদ্ধৃবেশে সাজিয়া থাকিতাম, তাহ

নিরর্থক নহে। আরও পাঁচ বার বিদ্রোহি-সেনা আমাদের প্রতি আক্রমণোদ্যত হইয়া অগ্রসর হইয়াছিল। গুপ্তচর দ্বারা সংবাদ পাইয়া, পূর্ব্বাহ্নেই,—তাহাদের কালাডুঙ্গি আগমনের পূর্ব্বেই,—আমরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া, মহা হৈ হৈ রবে, তাহাদের প্রতি ধাবিত হইতাম। বিদ্রোহিগণ আর সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পারিত না; আমাদিগকে দেখিয়াই পশ্চাৎ ফিরিয়া পলাইয়া যাইত। আমরা কিছুক্ষণ মহা লম্ফ-ঝম্ফ করিয়া, বহু আস্ফালন করিয়া দুই দশটা ফাঁকা আওয়াজ করিয়া, ঘরে ফিরিয়া আসিতাম।

আবার হঠাৎ একদিন রামপুরের নবাব ১৭৫ জন অশ্বারোহী পাঠাইয়া দিলেন। ইহার তিন দিন পরেই কাশীপুর-রাজ শিবরাজ সিংহের নিকট হইতে একশত সওয়ার আসিল। এইরূপে আমাদের প্রায় আট শত অশ্বারোহীর অধিক হইল। কিন্তু এত অধিক সৈন্য লইয়া আমরা কি করিব? প্রথমত, অর্থাভাব; দ্বিতীয়ত, উপযুক্ত শীত বস্ত্রের অভাব; তৃতীয়ত, তাঁবুর অভাব; চতুর্থত, উত্তম বন্দুকের অভাব; পঞ্চমত, খাদ্য সামগ্রীর অসচ্ছলতা। সুতরাং অশ্বারোহীর সংখ্যা অধিক হইয়া পড়ায়, আমাদের যেন একটা মহাবিপদ উপস্থিত হইল। একদিন কালাডুঙ্গির সেই বৃহৎ বাঙ্গালায় সাহেবদের এক কমিটী বসিল;—আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। নানা বাদানুবাদের পর শেষে স্থির হইল, সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করাই কর্ত্তব্য। সেনাদের মধ্যে যাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ভাল নহে, যাহাদের ঘোড়া ভাল নহে, যাহারা বৃদ্ধ হইয়াছে, যাহারা রুগ্ন, যাহারা ক্ষীণ-শরীর—তাহাদিগকে রাখিবার প্রয়োজন নাই। এইরূপ ১৭০ জন সওয়ারকে, বেতন চুকাইয়া দিয়া জবাব দেওয়া হইল। আর, জবাব দেওয়া হইল,—সেনাগণের মধ্যে যাহারা মুসলমান ছিল। ইহাতে ৫৫ জন সওয়ার কমিল। এখন কিঞ্চিৎ অধিক ছয়শত বাছাই-করা, খাঁটি হিন্দু, অশ্বারোহী মজুদ রহিল। এই নবাগত সেনাগণ অল্পদিন মধ্যেই ইংরেজী রীতি অনুসারে কাওয়াজ এবং ড্রিলে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিল।

একদিন একটা লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছে। পথে কাহাকেও কিছু সে বলে না,—কেবলই সে দৌড়িতেছে। প্রাতঃকাল। আমি সৈন্যদের শিক্ষাকার্য্য পরিদর্শন করিতেছি। সে লোকটা আমারই দিকে আসিতে লাগিল। তদ্দর্শনে আমিও তাহার দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রগামী হইলাম। আমি অশ্বারোহণে সে বেগে দৌড়িয়া আসিয়াই আমার অশ্বের সম্মুখে নিপতিত হইল। একেবারে ভূতলশায়ী হইল। তাহার মুখে আর কথা সরে না;—যেন অচেতন-প্রায়। আমি ঘোড়া হইতে নামিলাম। সেই ব্যক্তিকে চিনিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি এত দৌড়িয়া আসিতেছ কেন? এত বেগে দৌড়িয়া আসিতে আছে কি? এখনি যে মারা পড়িয়াছিলে!"

শীত-ঋতুর প্রাতঃকালে তাহার অঙ্গ দিয়া ঘাম বাহির হইতেছে। পতনকালে তাহার নাকে আঘাত লাগিয়া, রুধির নির্গত হইতেছে। এ ব্যক্তি আমাদের গুপ্তচর। আজ প্রায় দুই মাস কাল হল্‌দোয়োনিতে বিদ্রোহী-সেনার সহিত বসবাস করিতেছিল।

শীঘ্রই সেই গুপ্তচর সামলাইয়া উঠিল। মুখে কথা ফুটিল। আমি জিজ্ঞাসিলাম—"কি হইয়াছে? সংবাদ কি?" সে কহিতে লাগিল,—"সংবাদ শুভ। বিদ্রোহি-সেনা, হল্‌দোয়ানি ছাড়িয়া পলাইতেছে। গতকল্য রাত্রি দুইটা হইতে তাহারা পলায়নের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। মোট-পুঁটুলি বাঁধিতেছিল। তাঁবুর খোঁটা খুলিতেছিল। ঘোড়া সাজাইতেছিল। কামান লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল।

আমি ঘোড়ার ঘেসেড়া-রূপে তথায় চাকুরি লইয়াছিলাম। রাত্রি যখন সাড়ে তিনটা, তখন হঠাৎ হুকুম হইল, আর বিলম্ব নাই,—দশ মিনিটের মধ্যে এস্থান ছাড়িয়া চারপুরা নামক স্থানাভিমুখে যাত্রা করিতে হইবে। এ আজ্ঞা প্রচার হইবামাত্র সেনাগণ বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল। কারণ, অধিকাংশ সেনা, তখনও আপন আপন আস্‌বাব গুছাইয়া উঠিতে পারে নাই। তাড়াতাড়িতে মহা গোলিযোগ বাধিয়া গেল। অন্ধকার রাত্রি। আলোকের ভাল বন্দোবস্ত নাই। শেষ-রাত্রির বোঁ বোঁ বাতাসে অধিকাংশ দীপ নিবিয়া গেল। তখন এক কল-কল হলহল ধ্বনি উত্থিত হইল। কে কাহার যে পুঁটুলি কাড়িয়া লইতে লাগিল, তাহার কিছু ঠিক হইল না। কেহ দৌড়িতে লাগিল। কেহ হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করিল, কেহ কাহারও সহিত পুঁটুলি লইয়া মারামারি আরম্ভ করিল, কেহ কাহারও পায়ের চাপনে পড়িয়া "গেলাম গেলাম" করিতে লাগিল। প্রায় ছয় সাত হাজার লোক একত্র জমাট-বাঁধা। সে ঘোর অন্ধকারে মহাভিড়ের কথা কত কহিব! দুই চারিটা তেজস্বী ঘোড়া, এই সময়ে হঠাৎ কেমন আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়া ভীমবেগে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। সাধ্য কার যে, তখন সেই অশ্বগণকে কেহ ধরে? অশ্বের বিপুল বিক্রমেও দুই চারিটা লোক খুন হইতে লাগিল। প্রলয়কালের এক মহান্ "বিতিকিচ্ছি" ব্যাপার হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বংশীধ্বনি হইল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে যাত্রা করিবার আদেশ চারিদিকে প্রচার হইল।

শৃঙ্খলা রহিল না। সর্ব্বত্রই এলোমেলো, ছোড়ভঙ্গ-ভাব। কে যে কোন্ দিকে কোন্ মুখে যাইতেছে, তাহার নির্ণয় নাই। কে যে কাহার গায়ে পড়িতেছে, তাহার ঠিক নাই। কে যে কাহার সহিত কোন্ পথে চলিয়াছে, তাহারও স্থিরতা নাই। এই সময়ে এক লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হইল। কয়েকটা তাঁবু একেবারে দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিল। "দেখ্ দেখ্, গেল, গেল,"—এইরূপ ধ্বনি করিতে করিতে কতকগুলি লোক সেই দিক পানে ছুটিল। তখন চারিদিকে মূর্ত্তিমান্ বিশৃঙ্খলতা বিরাজ করিতে লাগিল। আমিও উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া, একদিক দিয়া পলাইলাম। ঘোর অন্ধকার রাত্রে পথ হারাইয়াছিলাম; নহিলে, ইহার বহু পূর্ব্বে আমি এখানে আসিতে পারিতাম। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই,—আপনারা শীঘ্র অগ্রসর হইয়া যদি বিদ্রোহি-সেনাকে এখনি আক্রমণ করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারেন। কারণ, তাহারা এখন শৃঙ্খলা-বিহীন,—এবং অধিক দূরও যাইতে পারে নাই।"

আমি। তাহারা কোথায় যাইতেছে? তাহাদের হঠাৎ এরূপ পলাইবার কারণ কি?

গোয়েন্দা। হঠাৎ পলায়নের কারণ কিছুই জানি না। তাহারা যাইতেছে,—চারপুরায়। এস্থান, হলদোয়ানি হইতে আট-নয় ক্রোশ হইবে। সে যাহা হউক, আর বিলম্ব করিবেন না,—শীঘ্র সজ্জিত হইয়া পলায়মান বিদ্রোহি-সেনাকে আক্রমণ করুন।

আমি। আমি স্বয়ং এরূপভাবে আক্রমণের অনুমতি দিতে পারি না। বারওয়েল সাহেব, হণ্টার সাহেব আছেন;—এরূপ গুরুতর বিষয়ে তাঁহাদের সহিত যুক্তি করা আবশ্যক।

তৎক্ষণাৎ সেই গোয়েন্দাকে লইয়া মিঃ বারওয়েল এবং মিঃ হণ্টার—সাহেবদ্বয়ের নিকট গেলাম। সকল কথা আমার নিকট শুনিয়া, তাঁহারা আমাকেই এইভাবে প্রশ্ন করিলেন,—"আপনি কি বলেন? বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করা উচিত কি না?"

আমি। না। বিদ্রোহীদের ছয় সহস্রের

অধিক সেনা একত্র মিলিত। ইহার মধ্যে দুই হাজারের অধিক অশ্বারোহী; চারি হাজার পদাতি। ৫টী তোপ তাহাদের সঙ্গে আছে। আমাদের এ অল্পসংখ্যক অশ্বারোহী লইয়া, তাহাদের উপর আক্রমণ করা উচিত নহে। হিতে বিপরীত হইতে পারে। আমাদের এখানে অন্ততঃ যদি তিনশত পদাতি-সেনা থাকিত, তাহা হইলেও একদিন আক্রমণ করা চলিত।

সাহেবদ্বয় কহিলেন,—"আমাদেরও অভিপ্রায় তাহাই।"

গোয়েন্দা কিন্তু করযোড়ে কহিতে লাগিল,—"বিদ্রোহি-সেনাগণ ভীরু, কাপুরুষ। তাহারা, যুদ্ধের নামে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইবে। অতএব আপনারা কালবিলম্ব না করিয়া, অতি-শীঘ্র আক্রমণ করুন। ইহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিতে পারিলে, অনেক রসদ, অনেক তাঁবু, অনেক ঘোড়া এবং অনেক অস্ত্র আপনাদের হস্তগত হইবে।"

আমি কহিলাম,—"আমাদের সেনাপতি কর্ণেল ক্রেসম্যান ব্যতীত এরূপ ভাবে শত্রুকে আক্রমণ করিবার জন্য হুকুম দিতে, আর অন্য কেহই সক্ষম নহেন। বিদ্রোহি-সেনা যদি আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিত, তাহা হইলে আমরা আত্ম-রক্ষার্থ আত্ম-হুকুমেই সকল কাজ করিতে পারিতাম। কিন্তু ইহা ত তাহা নহে।"

তৎক্ষণাৎ কর্ণেল ক্রেসম্যানের নিকট নাইনিতালে আমরা এ সংবাদ পাঠাইলাম।

গোয়েন্দাকে লইয়া আমি আপন বাঙ্গালায় আসিলাম।

বৈকালে কর্ণেল ক্রেসম্যান, কর্ণেল ট্রুপ এবং কমিশনার আলেকজন্দার—এই তিন জন প্রধান ব্যক্তি কালাডুঙ্গিতে আগমন করিলেন আমাদের সহিত রুদ্ধগৃহে গোপনে, তাঁহাদের পরামর্শ হইল। নানা বাকৃবিতণ্ডার পর ইহাই স্থির হইল, বিদ্রোহি-সেনাকে এসময় আক্রমণ করিবার আবশ্যকতা নাই;—আমরা আপাতত হল্‌দোয়ানি দখল করিয়া লইব। তথায় আমাদের প্রধান সেনা-নিবাস হইবে। কালাডুঙ্গিতে একশত প্রহরী ঘাটি রক্ষা করিবে মাত্র।

নাইনিতাল হইতে চারিটী তোপ আসিল, চারি শত গুর্খা পদাতিসৈন্য আসিল এবং আমাদের সমস্ত অশ্বারোহি-সৈন্য,—সর্ব্বশুদ্ধ এগার শত রণনিপুণ সৈন্য একত্র মিলিত হইয়া, পরদিন অতি প্রত্যুষে কালাডুঙ্গি হইতে হল্‌দোয়ানি যাত্রা করিলাম।

বীরবর কর্ণেল ক্রেসম্যান সর্ব্বাগ্রে অশ্বারোহণে যাইতে লাগিলেন। আমি তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে অশ্বারূঢ় থাকিয়া, তাঁহার আদেশ পালনার্থ কেবল প্রস্তুত হইয়া থাকিলাম। বিজয়-ব্যাণ্ড বাজিতে লাগিল। যুদ্ধার্থী সেনাদলের শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

আনী-বেশান্ত।

আনী বেশান্ত বিলাতী বিবি। খাস বিলাতে ইহাঁর জন্ম। খাস বিলাতেই ইনি লালিত, পালিত এবং শিক্ষিত। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, দেশে এত রমণী থাকিতে বিবির চরিত্র বর্ণনা করিতে আমার প্রয়াস কেন? প্রথম উত্তর,—দেশের দুর্ভাগ্য; আমারও দুর্ভাগ্য। দ্বিতীয় উত্তর,—এ বিবি অসামান্যা রমণী।

খৃষ্টীয় ১৮৪৭ সনে অক্টোবর মাসে অপরাহ্ণ বেলা ৫টা ২৪ মিনিট—২২ সেকেণ্ডের সময় বিলাতে ইহাঁর জন্ম হয়। বিলাতবাসী জন্মান্তর মানেন না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল ইহ-জন্মে ভোগ করিতে হয়, সেই কর্ম্মফলই অদৃষ্ট; এ

আনী-বেশান্ত।



ধারণা, এ সংস্কার তাঁহাদের নাই। পুরুষকারই ইহাঁদের নিকট প্রধান। জীবনের ঘটনাচক্রে এ পুরুষকারের দ্বারা ইহাঁরা কিছু বুঝাইতে পারেন না। তাই এ সম্বন্ধে কেমন একটা অন্ধকার ইহাঁদের ভিতর লাগিয়া আছে। মানবজন্মের এ রহস্য কি, সৃষ্টিপ্রকরণের এ গূঢ় ব্যাপার কি, বিলাতী বুদ্ধির আজিও তাহা গোচর হয় নাই। আজিও তাহা বুদ্ধির গোচর হয় নাই বলিয়াই বিলাতবাসী ম্লেচ্ছ-জাতি, জগতের আদিমাতা ভারতবর্ষের উপর কর্তৃত্বভার পাইয়া, এখন সময় সময় তাহার অপব্যবহার করিতেছেন। ভারতের গৌরব কি, ভারত জগতমধ্যে শ্রেষ্ঠ কেন, জাতিমাত্রেরই পূজনীয় কেন, ম্লেচ্ছেরা আজিও এ কথা বুঝিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞানতিমিরে আজিও তাঁহারা আচ্ছন্ন আছেন। তাই কথায় কথায়, আচার ব্যবহারে ভারতশিরে পদাঘাত করিয়া থাকেন; জগৎ-উদ্ধারের কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে কর্ম্মলোপ করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। দোষ তাঁহাদের নাই, সকলই কালচক্রের গতি, লীলাময়ের লীলা, সংসারের ক্ষণভঙ্গুরত্বের প্রমাণ। ভারতের উত্থান সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই হইয়াছিল; আর আজিও যে ভারত-বাসীর এত অধোগতি ও ম্লেচ্ছরাজ্যের এত উন্নতি, তাহাও সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। আমরা অকৃতী, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, ইহা বুঝি না, তাই

অহংজ্ঞানে মত্ত হইয়া মানবের কৃতিত্ব বা অকৃতিত্ব ইহাতে দেখিতে পাই। ভগবানের ইচ্ছায় যাহা হইয়াছে, তাঁহারই ইচ্ছায় আবার তাহার পরিবর্ত্তন হইবে। আমরা মায়াবদ্ধ জীব, মায়ামরীচিকা দেখিয়া মিথ্যা দৌড়াদৌড়ি করিয়া তৃষ্ণায় প্রাণ হারাইতেছি মাত্র।

ম্লেচ্ছজাতি জন্মান্তর মানেন না;—ইহজন্মে অদৃষ্ট লইয়া, কিন্তু তাঁহাদিগকে জগতে আসিতে হয়; পূর্ব্ব-পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত কর্ম্মফল তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হয়। বিবি বেশান্তকেও এই কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইতেছে এবং হইবে। ইহজন্মে ম্লেচ্ছেরা পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল ভোগ করেন; কিন্তু তাঁহাদের ইহজন্মের কৃতকর্ম্মের ফলাফল সম্বন্ধে অনেকের সংশয় আছে।

ভারত—কর্ম্মভূমি। ভারতে কর্ম্ম করিলেই তাহাতে অদৃষ্ট জন্মে, কুফল সুফল লাভ হয়। কিন্তু ভারত ভিন্ন অপর দেশে কর্ম্ম করিলে সে কর্ম্মে অদৃষ্ট জন্মে না, তাহাতে কোন ফললাভই হয় না। কিন্তু ম্লেচ্ছভূমি কি ভারতভূমির অন্তর্গত? এখন আমরা, উত্তরে হিমাচল, পশ্চিমে আফগানস্থান ও বেলুচিস্থান, দক্ষিণে আরবসাগর, ভারত-মহাসাগর এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ ও বঙ্গোপসাগর, এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডকে ভারতবর্ষ বলিয়া থাকি। কিন্তু ইহাই কি ভারতবর্ষ? না বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ বলিয়া পরিচিত স্থানও ভারতবর্ষের অন্তর্গত? এই কথার মীমাংসা না হইলে আজি যাঁহারা ম্লেচ্ছভূমে বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের ইহজীবনের কর্ম্মফলে অদৃষ্ট সৃষ্টি বা সঞ্চিত হইতেছে কি না কে বলিবে? কিন্তু এ গুরুতর মীমাংসা করিতে আজি বসি নাই। কাজেই এই মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব না।

আমরা বিবি বেশান্তের জন্মলগ্ন হইতে কোষ্ঠী বিচার করিয়া দেখিয়াছি। তাহাতে পঞ্চম বর্ষ বয়সে কেন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইল, স্বগৃহ ছাড়িয়া কেন তিনি পরগৃহে যাইয়া প্রতিপালিত হইলেন, বিংশতি বর্ষে কেন তাঁহার বিবাহ হইল, স্বামি-সুখে কেন তিনি বঞ্চিত হইলেন, কিসের জন্য তাঁহার চঞ্চলা মতি ঘন ঘন পথ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল, এখন কোন্ কোন্ গ্রহের ফলে তিনি বিদেশে, দূর দেশে ঘুরিতেছেন, এ সকলই আমরা বুঝিতে পারিয়াছি। যিনি বুঝিতে চাহেন, নিজের মন-গড়া কথা দিয়া নহে, জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে বহুল প্রমাণ তুলিয়া, তাঁহাদিগকে একথা বুঝাইতেও রাজি আছি। আর বেশান্তের লগ্নচক্রে দৃষ্টি করিয়া আমরা বুঝিয়াছি, ইহার পর তাঁহার জীবনে কি ঘটিবে, তিনি কবে সুখ দুঃখ পাইবেন, কবে তাঁহার মৃত্যু ঘটিবে। জন্মের কথা ফুরাইল। এইবার বাল্য সংস্কারের কথা।

সংস্কার বড় বিষম জিনিস। কোথা হইতে কেমন করিয়া বালকের মন অধিকার করিয়া বসে, বালকের তাহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই। সংসারে প্রবেশ করিয়া যে সংস্কার লাভ হইয়াছে, উহা যে মানবপ্রকৃতির অংশ নহে, অনেকে বড় হইয়াও তাহা বুঝে না; তবে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কারের কথা স্বতন্ত্র। অনেকে এই সংস্কারকে মানবের প্রকৃতি ভাবিয়া, সংস্কারসমষ্টিকে ভগবদ্দত্ত সহজ-জ্ঞান ভাবিয়া, তাহারই আদেশে, তাহারই বশে সংসারে চলিতে চেষ্টা করে; আর নিজে চেষ্টা করিতে পারুক না পারুক, অন্যকে এই সহজ জ্ঞানের বশে চলিতে উপদেশ দেয়। বিভিন্ন লোকসমাজের স্বভাব প্রকৃতিতে দৃষ্টি করিলে এ ভ্রম-ধারণা সহজেই কাটিয়া যায়। বিবি বেশান্তের এ ধারণা কাটিয়াছে।

বাল্যসংস্কার পিতা মাতার নিকটই বহুল পরিমাণে উপার্জ্জিত হইয়া থাকে। বেশান্তের পিতা মাতা কিন্তু বিভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন।

বালিকার সংস্কার যে দুইটী বিভিন্নমুখ প্রবল স্রোতে চলিয়াছে, বেশান্তের জীবনে ইহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার একটী পিতার নিকট উপার্জ্জিত সংস্কার-স্রোত; অপরটী মাতার নিকট উপার্জ্জিত সংস্কার-স্রোত। এই দুইটীই বেশান্তের জীবনে এক অপরের উপর, অপর একের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছে বটে; কিন্তু মাতৃদত্ত সংস্কার-স্রোতই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আর আজ সেই স্রোতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কারের অনুকূল বাতাস পাইয়া, বেশান্ত তরণীকে সুপথে লইয়া চলিয়াছে।

বেশান্তের পিতা ব্যবসায়ে খৃষ্টান পাদ্‌রী; খৃষ্টান সমাজের ধর্ম্মযাজকতা খৃষ্টান-রাজ্যে একটা ব্যবসায়বিশেষ। একজনের পাঁচটী সন্তান হইলে, তিনি কোনটীকে ওকালতী করিবার, কাহাকেও চাকরী করিবার, কাহাকেও বণিকগিরি করিবার বা নাবিকগিরি করিবার শিক্ষা যেমন দিয়া থাকেন, তেমনই কাহাকেও যাজকতা করিবার শিক্ষাও দিয়া থাকেন। এই বালকই পরে ধর্ম্মযাজক হয়। যে সমাজে বর্ণগত জাতিভেদ নাই, জাতিভেদ ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষাগত, আচারগত, ব্যবসায়গত, সে সমাজে এমনই হইয়া থাকে। এই জন্যই বলিলাম, বেশান্তের পিতা ব্যবসায়ে খৃষ্টান সমাজের ধর্ম্ম-যাজক ছিলেন। ব্যবসায়ে ধর্ম্মযাজক হইলেও খৃষ্টানী ধর্ম্মে ইহাঁর বিশ্বাস ছিল না। ইনি খৃষ্টানী ধর্ম্মে, খৃষ্টানী ধর্ম্মানুমোদিত ভগবানে অবিশ্বাসী ছিলেন। কেন তাঁহার মতি এরূপ হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারিব না। কিন্তু বেশান্ত কেন অতি বালিকাবয়সেই ঈশ্বরে অবিশ্বাসিনী হইয়া উঠেন, তাঁহার পিতৃপ্রকৃতির পরিচয় পাইয়াছি বলিয়াই তাহা বুঝিতে পারি। বেশান্তের মাতা কিন্তু ধার্ম্মিকা।

বিলাতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই উপার্জ্জন করেন; সংসার চালাইবার ভার গ্রহণ করেন। সকল সংসারে এরূপ নহে। কিন্তু প্রয়োজন হইলে এরূপ ভাবের অভাব হয় না। আনীর পিতার উপার্জ্জনে সংসার চলিত না। অভাবে কুলাইত না বলিয়া এরূপ হইত—না, এ উপার্জ্জন অন্যরূপে ব্যয়িত হইত, তাহা আমরা জানি না। তবে এইটুকু মাত্র জানি যে, সংসার প্রতিপালনের জন্য আনীর মাতাকে অর্থোপার্জ্জন করিতে হইত। তিনি এইরূপে অর্থোপার্জ্জন করিতেন।

বিলাতে আপন শিশু-সন্তানকে শিক্ষার্থ অনেকে পরের নিকট রাখিয়া দেন। যাঁহাদের রীতিচরিত্র সম্বন্ধে সুখ্যাতি আছে, এমন লোকের হস্তেই এ ভার পড়িয়া থাকে। এখন এ ব্যবহারের অপব্যবহার হইতেছে। কোন ব্যবহারটারই বা না হয়? আনীর মাতাকে যাঁহারা ধার্ম্মিকা বলিয়া জানিতেন, তাঁহারা আপন সন্তানকে উহাঁর নিকট রাখিয়া দিয়াছিলেন। এই বালকদিগের আহারের বরাদ্দ বাসাভাড়ার বাবদ, শিক্ষা-ব্যয় বাবদ আনীর মাতা যে অর্থ পাইতেন, তাহাতে তাঁহার নিজ সংসারের সাহায্য হইত। আনীর বালিকা বয়সের সূক্ষ্ম-তত্ত্ব আমরা জানি না; কিন্তু তাঁহার কার্য্যকলাপে লক্ষ্য করিলে অনুমান হয়, শিশুকালে বালিকা পিতারই অনুরাগিণী ছিলেন; পিতৃ-সকাশেই অধিকাংশ সময় কাটাইতেন। পিতা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। পিতৃসংস্কার কন্যায় অর্শিল। বালিকা, বালিকা-বয়সেই ঈশ্বরদ্বেষী হইয়া উঠিলেন; অন্ততঃ ঈশ্বর-দ্বেষভাবই তাঁহার হৃদয়ে অধিকতর প্রীতি সম্পাদন করিত। মিলটন বিলাতী কবি। "পারাডাইস লষ্ট" বা স্বর্গের পরাজয় নামে তাঁহার একখানি কাব্য আছে। সয়তান বা দানবরাজ ঈশ্বরের সহিত কিরূপ বিবাদ করিয়াছিল, ইহাতে তাহাই বর্ণিত আছে। বালিকা সয়তানচরিত্রের পক্ষপাতিনী

হইল। সে, কবিকথিত সয়তানের বাক্যগুলি মুখস্থ করিল। তাহাই তাহার জপমালা হইল। সে সর্ব্বদাই তাহারই আবৃত্তি করিত, ঈশ্বরে অবজ্ঞা দেখাইত। এই প্রকারে ঈশ্বর-সম্বন্ধে একটা সংস্কার বাল্যকালেই তাহার মনে গাঢ় অঙ্কিত হইল। আনী বীরপনার অভিনয় শিখিল, বীরত্বের সংস্কার তাহার অন্তরে পশিল,—বালিকার বালিকা-স্বভাব ঘুচিয়া গেল। লজ্জা, মৃদুতা, প্রভৃতি স্ত্রীজনোচিত ব্যবহার তাহাকে পরিত্যাগ করিল। ইহার আরও একটা কারণ ছিল। মাতার নিকট যে সব বালক শিক্ষা পাইত, আনী তাহাদের সঙ্গেও মিলিয়াছিল; তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া—বালকের, পুরুষের স্বভাব পাইয়াছিল। সে ইহাদের সঙ্গে বৃক্ষে আরোহণ করিত, ক্রিকেট খেলিত, ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিত। স্বাভাবতই চঞ্চলা—আনী, শিক্ষাবশে ও এইরূপ সংসর্গে পড়িয়া আরও চঞ্চলা হইয়া উঠিল। স্রোত এইমুখেই চলিয়াছে, এমন সময় একটা বাধা পড়িল। তাহার জীবন-স্রোতে, পিতৃদত্ত-সংস্কার ফিরিয়া গেল।

একদিন একটী রমণী আনীর মাতার নিকট আসিয়াছিলেন। আনীর প্রখরা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া, আনীর মাতার সংসারের কষ্ট বুঝিয়া তিনি আনীকে আপন বাটীতে লইয়া গেলেন। পিতার মৃত্যুর পর, আনী মাতার নিকট শিক্ষিতা হইতেছিলেন। মাতৃ-চরিত্র হইতে সংস্কার লাভ করিতেছিলেন। অল্পে অল্পে অথচ অতি ধীরভাবে তাঁহার পূর্ব্ব-সংস্কার মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। এমন সময়ে এই রমণী আসিয়া আনীকে নিজ বাটীতে লইয়া দুহিতা নির্ব্বিশেষে তাঁহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এই রমণীও ধার্ম্মিকা যীশুধর্ম্মে অনুরক্তা। ইঁহার নিকট শিক্ষা পাইয়া, ইঁহার সংসর্গে বাস করিয়া, ইঁহার আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মকার্য্য প্রতিনিয়ত দৃষ্টি করিয়া, আনীর মতি পরিবর্ত্তিত হইল। সে সয়তানের কথা ভুলিয়া গেল, এখন ভক্তের কথা শিখিল। ভক্ত-হৃদয়ের ভক্তিপূর্ণ উচ্ছ্বাসবাক্যই এখন তাহার কণ্ঠস্থ হইল। সে এখন তাহারই আবৃত্তি করিতে লাগিল। জীবনের এক অভিনয় শেষ হইয়া আর এক অভিনব অভিনয় আরম্ভ হইল। এ ভাবেও কিন্তু বেশী দিন চলিল না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আনীর বুদ্ধিবৃত্তি যতই বিকশিত হইতে লাগিল, সে ততই বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইল। খৃষ্টানী ধর্ম্মগ্রন্থ সকল সে একে একে পড়িতে আরম্ভ করিল, তাহার বিচার করিতে লাগিল, দোষ ধরিতে লাগিল। ক্রমে তাহার মনে আবার সংশয় জন্মিতে লাগিল। খৃষ্টানী ধর্ম্ম-পুস্তকপাঠে সে সংশয় ঘুচিল না। খৃষ্টানী ধর্ম্ম-যাজকগণের অবকাশমত উপদেশ লইয়াও সে সংশয়, সে মীমাংসা করিতে পারিল না। তাহার প্রাণ বড়ই আকুল হইল। কেমনে আকুল প্রাণকে শান্ত করিবে, কি উপায়ে আপন মনের এই ধর্ম্মসংশয়ের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিবে—দিবা রাত্রি, জাগরণে স্বপনে তাহার ইহাই চিন্তা হইল। পরিশেষে সে এক উপায় ঠিকও করিল। মনে মনে ভাবিল, হয় ত ধর্ম্মযাজকগণ সময়াভাবে তাহাকে ভাল করিয়া উপদেশ দেন না; হয় ত প্রাণ খুলিয়া সকল কথা বলেন না; অতএব এক জন ধর্ম্মযাজককে সে যদি একচেটিয়া করিয়া লইতে পারে, তাঁহার সমস্ত সময়—না হউক, অধিকাংশ সময়ই যদি সে তাহার সঙ্গে কাটাইতে পারে;—এক জন ধর্ম্মযাজক যদি তাহার প্রাণের "মানুষ হন, প্রাণ খুলিয়া আপন ভাবিয়া সকল কথা তাহাকে বলিতে পারেন,—তাহা হইলে হয়ত তাহার হৃদয়ের পিপাসা—ধর্ম্মসংশয় মিটিতে পারে। এই আশায় মুগ্ধ হইয়া আনী বিংশতি বর্ষ বয়সে বেশান্ত নামক এক জন ধর্ম্মযাজকের পত্নীত্ব স্বীকার করিল। সে পত্নীত্ব-সম্বন্ধ অনেক দিন

ঘুচিয়াছে, কিন্তু এখনও তিনি সেই পতির নামেই পরিচিত আছেন। এ এক কারখানা; এ এক অপূর্ব্ব সমাজ-রহস্য! এই প্রকার সমাজ-রহস্য এখন অল্পে অল্পে আমাদের সমাজেও প্রবেশ লাভ করিতেছে। কিন্তু ইহার পরিণাম অতি শোচনীয়। আনী পাদ্রী বেশান্তের পত্নীত্ব স্বীকার করিলেন। আহারে, বিহারে ধর্ম্ম-যাজকের সঙ্গলাভ করিলেন। প্রাণের পিপাসা কিন্তু কিছুতেই মিটিল না। বেশান্ত সাহেব পাদরী, খৃষ্টান-সমাজের নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মযাজক। নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য উপদেশ দিয়া, পরকে ধর্ম্মমতে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, পরের মনে গুরুতর ধর্ম্মসংশয় উপস্থিত হইলে সামান্য সময়ে তাহার মীমাংসা করিয়া দিতে-ছেন; কিন্তু ঘরে অষ্টপ্রহর উপদেশ দিয়াও, দিবারাত্রি আপনার চরিত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াও আপন পত্নীর ধর্ম্মসংশয় তিনি মিটাইতে সমর্থ হইলেন না। স্ত্রী যাহা চাহেন, যাহার জন্য ধর্ম্মযাজককে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, স্ত্রীর সে আশা মিটিল না। প্রাণে প্রাণ মিশিল না। এ বিবাহে স্ত্রী-পুরুষ কাহারও সুখ হইল না। বিবাহের পর স্ত্রীর একটী পুত্রসন্তান হইল। পুত্রের পর কন্যা। এই কন্যাটী যখন অতি শিশু, তখন তাহার উৎকট পীড়া হইল। শিশু পীড়ার যন্ত্রণায় অস্থির। যন্ত্রণায় সে কেবল ছটফট করিতেছে। স্নেহময়ী জননী শিশুকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত কখন তাহাকে কোলে লইতে-ছেন, কখন পায়চারি করিয়া লইয়া বেড়াইতে ছেন, কখন শয্যোপরি রাখিতেছেন, কখন বা দোলায় রাখিয়া দোল দিতেছেন। শিশুর যন্ত্রণার কিন্তু কিছুতেই বিরাম নাই। মাতাকে এই সব যন্ত্রণা চক্ষে দেখিতে হইতেছে চিকিৎসক দিয়া যথাসাধ্য চিকিৎসা করিয়া নিজে সেবা শুশ্রূষার পরম পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া কিছুতেই তিনি শিশুর যন্ত্রণা নিবারণ করিতে পারিতেছেন না। কন্যার যন্ত্রণা কমাইতে পারিতেছেন না। কন্যা যন্ত্রণায় ক্রন্দন করিতেছে, চীৎকার করিতেছে, হাত পা নাড়িয়া এপিঠ ওপিঠ করিয়া যন্ত্রণা জানাইতেছে। শিশুর যন্ত্রণায় মাতার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। তাহার এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। কন্যার যন্ত্রণা যখন কিছুতেই উপশম হইল না, তখন মাতার মনে ভগবানের কথা উঠিল। শিশুসন্তানের পীড়ার সময়, আত্মীয় স্বজনের কষ্টের সময়, সাধারণতঃ বিপদের সময়েই ভক্তি-মানের হৃদয় সহজেই ভগবানের দিকেই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। আনীর মনে প্রথমতঃ সন্তানের শান্তি কামনাতেই হয় ত ভগবানের কথা উদয় হইয়াছিল। কিন্তু মনে রাখিবেন, আনীর পূর্ব্ব সংস্কারের কথা, তাঁহার সেই বাল্যকালের সয়তান প্রভৃতির কথা। আরও মনে রাখিবেন, তাঁহার মন তখনও ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সংশয়-দোলায় দুলিতেছে। সে সংশয়ে আর একটা সংশয় জুটিল। ভগবানের নাম স্মরণ হইবামাত্র তিনি ভাবিলেন, ভগবান করুণার নিধান, সর্ব্বজীবে দয়াময়। তখনই তাঁহার মনে সংশয় হইল যে, তাঁহার এই কন্যা শিশু; এ শিশুর পাপপুণ্য বোধ নাই। সুকাজ কুকাজ করিবার ক্ষমতা নাই, ভাল মন্দের বিচার নাই। তবে এ শিশু কেন ভগবানের নিগ্রহভাজন হইল? তিনি এই কথাই মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মযাজক স্বামীকে একবার মীমাং-সার জন্য তিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু কন্যার সেই দারুণ পীড়ার সময় এই ভাবনাতেই যে তিনি বিচলিত হইয়া-ছিলেন, তাহা তাঁহার চরিত্র লক্ষ্য করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। আনীর প্রশ্নের মীমাংসা হইল না। শিশু—অতিশিশু—পাপপুণ্য বোধরহিত শিশু—কর্ম্মক্ষমতাবিহীন শিশু—কি কারণে—এ জগতে আসিয়া কষ্ট পায়, কিসের ভোগ

সে ভোগে, কেনইবা ভোগে, সমস্ত খৃষ্টান শাস্ত্রগ্রন্থ আলোড়ন করিয়া বড় বড় খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগের সহিত বিতর্ক করিয়াও আনীর এ প্রশ্নের মীমাংসা হইল না। শেষে তিনি মনে মনে ভাবিলেন, তবে কি ভগবানে দয়া নাই? তবে দয়ার নিদান বলিয়া জগতে যে তাঁহার পরিচয় আছে, সে কথা কি মিথ্যা? যদি দয়া না থাকিল, তবে ভগবান রহিলেন কোথায়? তাঁহার মনে হইল, তবে কি ভগবানও নাই? এই বিষয় তাঁহার মনে যতই উদয় হইতে লাগিল, এই বিষয় যতই তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ভগবানের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ হইতে লাগিল। পাদরীপুঙ্গবেরা আনীর এ ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয় দূর করিতে পারিলেন না। এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আনী ক্রমে ভগবানে ঘোর অবিশ্বাসিনী হইয়া উঠিলেন। খৃষ্টানী ধর্ম্মযাজকেরা, খৃষ্টানী ধর্ম্মশাস্ত্র, সে সময়ে আনীর সে সংশয় দূর করিতে পারেন নাই; আজ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার-বশে তাঁহার সে সংশয় দূর হইয়াছে। জন্মান্তরে এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে বিশ্বাস হওয়ায়, তাঁহার সে সংশয় কাটিয়া গিয়াছে। যে সংশয়ের মীমাংসা করিতে পারেন নাই বলিয়া আনী খৃষ্টানী ধর্ম্ম ছাড়িয়া নাস্তিক হইয়াছিলেন, আজ হিন্দুশাস্ত্রের বিন্দুমাত্র আভাষ পাইয়াই তাঁহার সে সংশয় কাটিয়া তাঁহাকে ভগবানে পূর্ণ বিশ্বাসিনী করিয়াছে। তিনি বুঝিয়াছেন, শিশু অবোধ, ক্ষমতাশূন্য, হিতাহিত-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত;—শিশু কেন রোগে ভোগে, কেন দুঃখদারিদ্র্য যন্ত্রণায় নিপীড়িত হয়, কেন কষ্ট পায়?

শ্রীমতী নাস্তিক হইলেন। নাস্তিক হইয়া তিনি নাস্তিকতার প্রচার করিতে লাগিলেন। পাদরীর ঘরে এ কাণ্ড! খৃষ্টান-সমাজে একটা "ছি-ছি" পড়িয়া গেল। ধর্ম্মযাজক স্বামী পাদরী-বেশাম্ভের লোকসমাজে মুখ-দেখান ভার হইল। লোকের টিটকারী ক্রমে তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিবাহের পর হইতে স্বামী-স্ত্রীর প্রাণে প্রাণ মিশে নাই। ঘর করিতে হয় বলিয়াই ইঁহারা একত্র বসবাস করিতে-ছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর উপস্থিত আচরণ দেখিয়া পাদরী-স্বামী আর সহ্য করিতে পারিলেন না। এতদিন যে অগ্নি ভস্মরাশির স্তরে স্তরে গুমরিয়া গুমরিয়া ক্রমে ঊর্দ্ধদিকে উঠিতেছিল; আজ শ্রীমতীর নাস্তিকতার আচারে তাহা জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় পরিণত হইল। এক দিন পাদরী-স্বামী শ্রীমতীকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার এ ব্যবহার আর সহ্য হয় না। হয় তুমি ঘরে বসিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম কর, না হয় আমার বাটী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যাও।" শ্রীমতী হিন্দুরমণী নহেন। স্বামীকে উচ্চবাক্য বলিতে নাই; স্বামীর অতি-বড় দোষকেও ক্রোধ-নেত্রে দেখিতে নাই; স্বামী সর্ব্বদা এবং সর্ব্বথা পূজনীয়; স্বামী রমণীর সর্ব্বারাধ্য দেবতা;—বিলাতী রমণী বেশান্ত এ শিক্ষা পান নাই। তিনি তখনও ইংরেজের মেয়ে, ইংরেজের পত্নী, ইংরেজ-রমণী। স্বামীর তেজোময় বাক্যে, তেজস্বিনী ইংরেজ-রমণী তখন তেজঃপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। স্বাধনা ইংরেজ-রমণী স্বামী-বাক্যের প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "কপটাচারের প্রশ্রয় আমি দিতে পারিব না। যেখানে কপটাচার প্রশ্রয় পায়, সেখানে আমি থাকিতে চাহি না। আমি ঘর হইতে বাহির হইলাম!" সেই বাহির, আর এই বাহির। বিবি বেশান্ত সেই দিন হইতে স্বামি-গৃহে পদার্পণ করেন নাই। ইহার পর মোকদ্দমা হইয়া বিলাতী সমাজ-সম্মত বিবাদবিচ্ছেদ ইঁহার হইয়া গিয়াছে।

বিবি বেশান্ত ভগবানের অনুগৃহীতা। নাস্তিক হইলেন, ভগবানের অনুগ্রহ কিন্তু তাঁহার প্রতি কমে নাই। খৃষ্টান ধর্ম্ম হারাইয়া পরোপকার ধর্ম্মকেই আপনার ধর্ম্ম করিয়া

লইলেন। লোকের দুঃখ কিসে দূর হয়, দারিদ্র্যের কিসে হ্রাস হয়, লোক কি করিলে অন্নকষ্টের সময় এক মুঠা অন্ন পায়, দারুণ শীতে পৃষ্ঠের উপর কেমন করিয়া একখণ্ড বস্ত্র দিতে পায়, সমাজ কিসে সংরক্ষিত হয়, ইহাই তাঁহার কর্ম্ম, ইহাই তাঁহার জীবনের প্রধান ধর্ম্ম ও অবলম্বন হইল। কার্য্যক্ষেত্রের অভাব হইল না। আমরা এ দেশে বসিয়া ভাবি, এ দেশের সাহেব-সুবাকে দেখিয়া মনে করি যে, বিলাত কেবলই বুঝি এ কালের স্বর্গ, বিলাতে কেবলই বুঝি নিরবচ্ছিন্ন সুখের আবাস। প্রকৃত কথা কিন্তু তাহা নহে। বিলাতের এক দিকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং ভোগ-বিলাসের যেমন পরাকাষ্ঠা; অপর দিকে অন্নকষ্ট ও দুঃখ দারিদ্র্যের তেমনই চরম দশা। বিবি বেশান্ত বিলাসে না মজিয়া, আপনার ভোগবিলাসে মত্ত না হইয়া, লোকের এ দুঃখ দারিদ্র্য, অন্নকষ্ট, উপবাস দেখিতে লাগিলেন। আর কিসে ইহার প্রতিকার হয়, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ভগবানে অবিশ্বাসিনী হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার হৃদয় সঙ্কীর্ণ হয় নাই। মরিলে সকলই ফুরাইবে ভাবিয়া তিনি ইহজীবনকে তখন সর্ব্বস্ব ভাবেন নাই। স্বার্থসুখই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, নিজে সুখবিলাসে জীবন কাটাইতে পারিলে আপনার জীবন সার্থক হইল, এ কথা তাঁহার মনে আদৌ উদিত হয় নাই। সমাজধর্ম্ম তখন তাঁহার প্রধান ধর্ম্ম হইল। সমাজ কিসে সুশৃঙ্খলে চলে, সমাজে কিসে সকলেই সমভাবে শান্তি-সুখভোগ করিতে পারে, ইহাই তাঁহার প্রথম এবং প্রধান চিন্তা হইল। এই জন্য তিনি দুঃখীদিগের দুঃখবিমোচনার্থ অনবরত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যেখানে দুঃখের কথা শুনেন, যেখানে লোকের কষ্টের কথা শুনেন, যেখানে শুনেন, লোকের অন্নাভাবে উপবাস হইতেছে, শ্রম করিতে চাহিয়াও শ্রমের কার্য্য মিলিতেছে না, বিবি বেশান্ত সেখানে যাইয়াই উপস্থিত হন। সেখানে যাইয়া নিজের চক্ষে তাহাদের কষ্ট দেখেন, সে কষ্টের কারণ অনুসন্ধান করেন এবং সে কষ্টের কিসে প্রতিকার হয়, তাহা দশ জনকে বুঝাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। জন্মান্তরের কথা, জন্মান্তরীণ কর্ম্মফলের কথা তখনও তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। তাই তিনি তখন বুঝিতে পারেন নাই, এক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়া, এক জায়গার লোক হইয়া, একদেশবাসী হইয়া, কেন কতকগুলি লোক বিলাসের সুখসাগরে মজিয়া থাকে, আর কেন কতকগুলি তাহাদিগের উচ্ছিষ্টের প্রত্যাশী হইয়াও সেই উচ্ছিষ্টাবশেষ মিলাইতে পারে না? সমাজে সকলেই কেন সমান হয় না? সেই কথা বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই—কেন এমন হয়, সেই সময় তাহার মীমাংসা করিতে পারেন না বলিয়াই, সমাজকে সমভাবে গঠিত করিবার নিমিত্ত এই অসাধ্যসাধন করিবার জন্য তিনি ঐকান্তিক যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু মানবের ইহজন্মের কর্ম্মফলে যাহা সৃষ্ট হয় নাই, মানবের ইহ-জীবনের কর্ম্মফলে তাহার বিপর্য্যয় হইবারও নহে; সেই জন্য বিবির ও তাঁহার অপর সকলেরই এই সম্বন্ধে যত্নচেষ্টা সকলই বিফল হইয়াছে।

যত্নচেষ্টা বিফল হউক, কিন্তু তখন আপন শক্তিতে বিলাতে তিনি শ্রমজীবিগণের বড়ই প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তাহাদের শক্তিতে তিনি বিলাতে এক জন শক্তিশালিনী রমণী বলিয়া পরিচিতা হইয়াছিলেন। পুরুষকারের প্রাধান্যে যাহা ঘটিতে পারে, তাঁহার ভাগ্যে সে সময়ে তাহা ঘটিয়াছিল।

কিছু দিন পরিশ্রমের ফলে বিবি বুঝিলেন, যে, কেবল বক্তৃতাফলে বা বাক্যব্যয় করিয়া সমাজের এ দুঃখ-দারিদ্র্য তিনি নিবারণ করিতে পারিবেন না। তখন বিলাতী বুদ্ধিতে যাহা

ঘটিতে পারে, তাঁহারও তাহা ঘটিল। তাঁহার মনে হইল যে, সংসারে যত জীব আছে, অন্ততঃ বিলাতে যত জীবের জন্ম হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাদের সকলের অন্নসংস্থান হওয়া সম্ভবপর নহে। এই জন্য লোকের যথেষ্ট কষ্ট এবং দুঃখ। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে এ দুঃখদারিদ্র্য ক্রমশই বাড়িয়া যাইবে, কমিয়া যাইবার আশা কিছুমাত্র নাই। এই জন্য তিনি ঐ সময়ে লোকসংখ্যা কমাইবার উদ্দেশ্যে, কি করিলে লোকসংখ্যা কমিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে স্ত্রী পুরুষের সহবাস সম্বন্ধে এক পুস্তিকা-প্রণয়ন করেন। এ পুস্তিকার জন্য তাঁহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। যে সকল হিন্দু-সন্তান হিন্দুর আচার ব্যবহার মানেন না, কিংবা শাস্ত্রের উপদেশ মানিয়া চলেন না, বিলাতী মতে এ দেশে যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দিতেছেন, এই উপলক্ষে বলিয়া রাখি যে, সমাজের লোকসংখ্যা সমান রাখিবার জন্য আর্য্য ঋষি-তপস্বিগণ কি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, সেই বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য।

বিবি বেশান্ত নাস্তিক। তিনি দরিদ্রের পক্ষপাতিনী, বিলাসীর বিদ্বেষিণী। এজন্য বিলাতী সমাজে তাঁহার সমূহ নিন্দা হইয়াছিল। সমাজে যাঁহারা পদস্থ এবং সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা ইহাঁর সহিত মিশিতেন না। শুধু মিশিতেন না ইহা নহে,—ইহাঁকে অপদস্থ, ইহাঁকে হতমান করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। ইহাঁর কার্য্যাকার্য্যের নিন্দা করিতেন। কিন্তু এততেও বিবি বেশান্তের প্রতাপ বিলাতী সমাজে কমে নাই। বিশেষতঃ অসামান্য বুদ্ধিমতী এবং বিদুষী বলিয়া বিদ্বৎসমাজে তাঁহার সবিশেষ সুখ্যাতি ছিল। যাঁহারা বিদ্বান, যাঁহারা সাহিত্যের গৌরব করিয়া থাকেন, তাঁহারা বিবিকে আদর করিতেন। বিবির সৌভাগ্যের সৃষ্টি ইহা হইতেই হইয়াছে। ষ্টেড সাহেব বিলাতী বিদ্বৎসমাজের একজন বড়লোক। তিনি ইতিপূর্ব্বে বিলাতী "পেলমেল গেজেট" সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। ষ্টেড-সাহেব বিবি বেশান্তকে বিশেষরূপই চিনিতেন।

এইবার বিবি বেশান্তের অদৃষ্ট ফিরিল; তাঁহার জীবননাটকের আর এক অভিনয় আরম্ভ হইল। কোথা হইতে কি ঘটনা কেমন করিয়া আসিয়া মিলিতেছে দেখ। আর কি শক্তিবলে কোন্ কার্য্য সাধিত হইয়াছে, লক্ষ্য কর। লক্ষ্য করিয়া বিমুগ্ধ হও। আর যাঁহার শক্তিবলে এই সব ঘটনা ঘটিতেছে, সেই ভগবানকে করযোড়ে দণ্ডবৎ কর।

মাডাম ব্লাভাট্স্কির নিবাস রুষিয়ায়। তিনি থিয়সফিষ্ট দলের প্রবর্ত্তিকা। থিয়সফিষ্ট ধর্ম্ম কি, তাহা জানি না; থিয়সফিষ্ট ধর্ম্মের গ্রন্থ আমি বেশী পড়ি নাই। কাজেই সে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য কি, দোষগুণ কি, তাহা আমি বলিতে পারিব না। সে কথা বলিতে চাহিও না। এই ব্লাভাট্স্কি থিয়সফিষ্ট ধর্ম্মের মহত্ত্ব প্রচার উদ্দেশ্যে থিয়সফিষ্ট ধর্ম্মের তত্ত্ব নিহিত করিয়া "Secret Doctrine" নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। যাঁহারা মনোনিবেশপূর্ব্বক এই গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, ঐ গুপ্তবিদ্যাগ্রন্থে হিন্দুদিগের আত্মবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যার আভাস আছে। মাডাম ব্লাভাট্স্কি তাঁহার ঐ গ্রন্থের এক খণ্ড সমালোচনার্থ ষ্টেড সাহেবকে প্রদান করেন। ষ্টেড সাহেব বুঝিলেন, বিলাতের সমগ্র বিদ্বৎসমাজের মধ্যে বিবি বেশান্তই একমাত্র ইহার সমালোচনা করিতে সমর্থ। বিবি বেশান্তের বিদ্যাবত্তার পরিচয় ইহাতে বুঝিয়া লউন।

ষ্টেড সাহেব বিবি বেশান্তকে মাডাম ব্লাভাট্স্কি প্রণীত ঐ গুপ্তবিদ্যাগ্রন্থ সমালোচনা করিতে দিলেন।

ঈশ্বরে অবিশ্বাসিনী বেশান্ত পুস্তক পড়িতে

আরম্ভ করিলেন। পুস্তক পড়িতে পড়িতে তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল; তাঁহার নাস্তিকতায় বাধা পড়িল। তিনি পুস্তক মধ্যে এক অপূর্ব্ব আলোক দেখিতে পাইলেন। আর সেই আলোকাভাস পাইয়া বাল্য হইতে অর্জ্জিত এবং যৌবনে প্রস্ফুটিত আপনার নাস্তিকতায় বিসর্জ্জন দিলেন। বেশান্তের মনের গতি ভিন্নরূপ হইল। জন্মান্তরের আভাস, কর্ম্মফলের মাহাত্ম্য, হিন্দুশাস্ত্র-গ্রন্থের শ্রেষ্ঠতা, রুষ-রমণীর গুপ্ত-বিদ্যার গ্রন্থ পড়িয়া, বিলাতী বিবির মনে উদয় হইল, সকলেই ভগবানের লীলা। এ লীলা কে বুঝিবে? যে লীলা কণামাত্র উপলব্ধি করিলেও লোকে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, সে লীলার খেলা ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র, অধমাদপি অধম, নীচাদপি নীচ, আমরা বুঝি না;—তাই জন্মের পর জন্ম, কোটি কোটি জন্ম এই সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি; আসিতেছি ও যাইতেছি, আবার আসিতেছি।

ব্লাভাট্স্কির গ্রন্থ পড়িয়া বিবি বেশান্তের মন ফিরিয়াছে; তিনি ব্লাভট্স্কিকে আপনার গুরুরূপে গ্রহণ করিলেন। তাঁহারই দলভুক্ত হইয়া থিওসফিষ্ট-ধর্ম্মের অধ্যয়নে রত হইলেন। শুনিয়াছি, থিওসফিষ্ট-ধর্ম্মে হিন্দুর অনেক কথা আছে। এই সব গ্রন্থ পড়িয়া ইহার কথা আলোচনা করিতে করিতে বিবি বেশান্ত ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের অনুরাগিণী হইয়া পড়িয়াছেন। তাই আজ তিনি আপনাকে হিন্দু-রমণী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। হিন্দু-ধর্ম্মের, হিন্দু-সমাজের প্রত্যেক আচার ব্যবহারের সমর্থন করিতেছেন; এ সকলই মানবের মঙ্গলের নিমিত্ত; সমাজের হিত-সাধনের নিমিত্ত প্রণীত হইয়াছে বলিয়া দশকে জানাইতেছেন।

আর্য্যভূমি ভারতভূমি ম্লেচ্ছাধিকারে ম্লেচ্ছ-ভাবে যখন অভিভূত হইয়া পড়িতেছে, আর্য্য সন্তান হিন্দু-সন্তানগণ যখন আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষ ঋষি-তপস্বীদিগের প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে দোষারোপ করিতেছেন, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণসন্তান যখন আপনার ব্রাহ্মণত্ব হারাইয়া ম্লেচ্ছত্বে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছেন, আজ ঠিক সেই সময়েই ম্লেচ্ছভূমি হইতে ম্লেচ্ছের কন্যা, ম্লেচ্ছের পত্নী ম্লেচ্ছ-সমাজের আদর্শ-রমণী ম্লেচ্ছত্ব ভুলিয়া গিয়া ম্লেচ্ছ আচারের পদে পদে দোষ দিয়া, ম্লেচ্ছশিক্ষায় ম্লেচ্ছ সভ্যতায় সর্ব্বনাশের বিভীষিকা দেখাইয়া, ভারতবর্ষে আসিয়া সনাতন ধর্ম্মের প্রচার করিতেছেন। ভারত-সন্তানগণকে ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রাচার মানিবার জন্য কাতরকণ্ঠে করযোড়ে অনুরোধ করিতেছেন। ভারতের উন্নতিতে জগতের উন্নতি ভাবিয়া ভারত রক্ষার নিমিত্ত, যাহার জন্য ভারত—ভারতের সেই ধর্ম্ম এবং সমাজ রক্ষার নিমিত্ত মূঢ়মতি ভারতসন্তানকে উন্মত্তের ন্যায় আত্মহারা হইয়া মিনতি করিতেছেন। এ দৃশ্য দেখিলে কোন্ হৃদয়বান্ ভারত-সন্তানের চক্ষে জল না আইসে? তাই আবার বলি, এ ভগবানের লীলা, দেখিবার ও দেখাইবার জিনিষ বটে!

বিবি বেশান্ত সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ম্লেচ্ছ রমণী আসিয়াছিলেন, আর্য্যভূমে, আর্য্যসন্তানকে তাহাদিগের কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতে। উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে কি না, জানি না।

বিবি বিলাত হইতে প্রথমে মাদ্রাজে আসেন। মাদ্রাজ হইতে তিনি কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় তিনি পাঁচ দিন ছিলেন। চারি রাত্রি এবং চারি দিন। ঐ চারিদিনই দিবারাত্রি হিন্দুসন্তানের নিকট তিনি হিন্দুদের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রথম দিন কলিকাতার টাউনহলে তিনি 'জগতে ভারতের কার্য্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। দ্বিতীয় দিন "অদ্বৈতবাদ," তৃতীয় দিন "হিন্দুধর্ম্মের সহিত থিওসফিষ্ট

ধর্ম্মের সম্বন্ধ" চতুর্থ দিন "থিয়সফিষ্ট ধর্ম্মের উন্নতি ;—" কথা কয়দিনই এক। ম্লেচ্ছবিজ্ঞানে, কেবল অজ্ঞানেরই পুষ্টি হয়, ইহাতে উন্নতি হইতে পারে না, আর হিন্দুধর্ম্মই মহৎ,—ইহাই তাঁহার কথা। তিনি বলিয়াছেন, ভারত-সন্তানের, ভারতের আর্য্য-ঋষিগণের ধর্ম্ম সনাতন ; কালবশে নিয়তির লীলায় উহা সময়ে সময়ে জড়ীভূত হইতে পারে, কিন্তু উহা কখনই বিনাশ পাইবে না। ভারতের এই ধর্ম্ম সনাতন। জগতের অপরাপর জাতি ইতিপূর্ব্বেও ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের নিকট জ্ঞানলাভ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও জগতের অপরাপর জাতিকে ভারতীয় ধর্ম্মের নিকট শিক্ষালাভ করিতে হইবে। ভারতীয় ধর্ম্মে অজর, অমর, নিত্য আত্মার উন্নতির কথা আছে ; জগতের আর কোন ধর্ম্মে এমন কথা নাই। আর ভারতীয় ধর্ম্ম ভগবানের নিজকৃত। ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ঋষি কর্ত্তৃক প্রণীত। ভারতীয় দর্শন তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক সংগঠিত। ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল বেদ অপৌরুষেয়। এই জন্য ভারতের ধর্ম্ম জগতে চিরকাল জীবন্ত থাকিবে। জগতে আর কুত্রাপি এমন স্থান নাই, এই জন্যই সে সব স্থানের উত্থান আছে, পতন আছে, উন্নতি আছে, অবনতি আছে। যে বিলাতী সাম্যবাদের শিক্ষা পাইয়া আর্য্য-সন্তানেরা জাতিভেদে উপেক্ষা করিয়া থাকেন ; বিবি বেশান্ত এককালে সেই বিলাতী সাম্যবাদেরই অবতার ছিলেন।

শ্রীমতী সেই বিলাতী সাম্যবাদের প্রচারই আপনার জীবনের সর্ব্বস্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু সেদিন তিনি বিকৃতমতি হিন্দুসন্তানের সম্মুখে বুক ফুলাইয়া বলিয়াছেন যে, তোমরা বিলাতী সাম্যবাদের মায়া-মোহে মুগ্ধ হইও না তোমাদের জাতিভেদ বড় উচ্চাঙ্গের জিনিষ। অন্যান্য সমাজ কৃত্রিম সমাজ বিভাগের উপর অধিষ্ঠিত ; কিন্তু তোমাদিগের এ জাতিবিভাগ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলের জন্য, আত্মার ক্রমোন্নতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহা মানবের সৃষ্টি নহে, ভাগবতী সৃষ্টি।

তিনি বলিয়াছেন যে, হিন্দুসমাজ আধ্যাত্মিকবলে বলীয়ান। হিন্দুসমাজের জাতিভেদে ঐ আধ্যাত্মিকতা প্রতিষ্ঠার পরিচয়ই পাওয়া যায়। এই সমাজে বাহ্য ধনের, বাহ্য ক্ষমতার, বাহ্য সুখ-স্বচ্ছন্দের, বাহ্য ভোগ-বিলাসের, বাহ্য প্রতাপবলের সম্মান তাদৃশ নাই ;—এ সমাজের সম্মান আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতায়। ব্রাহ্মণ এ সমাজের শ্রেষ্ঠ। আধ্যাত্মিকবলে বলী বলিয়াই, আধ্যাত্মিক উন্নতিতে উন্নত বলিয়াই, ব্রাহ্মণ এ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে দিন ব্রাহ্মণসন্তান আপনার এ আধ্যাত্মিক জ্ঞানচর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া অপরাপর জাতির ন্যায় সাংসারিক সামান্য ক্ষমতা লাভের নিমিত্ত লালায়িত হইলেন, সেই দিনই তাঁহার অধঃপতনের সূত্রপাত হইল। আজ যে ব্রাহ্মণ-সমাজের অধঃপতন দেখিতে পাইতেছ,—আজ যে দেখিতে পাইতেছ, ব্রাহ্মণ-সন্তান শকট চালাইতেছেন, হল চালনা করিতেছেন, কেরাণিগিরি করিতেছেন বা অন্যান্য ইতর বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, ইহা এই জন্যই। নতুবা যে ব্রাহ্মণ-সন্তান এখনও আপনার পিতৃ-পুরুষগণের পথেই পড়িয়া আছেন, আধ্যাত্মিক চর্চ্চাতেই অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করিতেছেন, সমাজে এখনও তাঁহার সম্মান আছে। ভারতের আবার যদি কখন উন্নতি হয়, ভারত, জগতে যদি আবার কখনও আপনার মাহাত্ম্য প্রচার করিতে পারে, আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে, তাহা হইলে ভারত-সন্তানকে আবার আধ্যাত্মিক চর্চ্চাতেই মনোনিবেশ করিতে হইবে। শ্রীমতী হিন্দু-সমাজের যেমন প্রশংসা করিয়াছেন, বাহ্য-বিষয়-সর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য-সমাজের তেমনই নিন্দা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বাহ্য বিষয়ের উন্নতিতে যে

উন্নতি, তাহা প্রকৃত উন্নতি নহে। তাহাতে লোকের প্রকৃত সুখবৃদ্ধি হয় না, বরং দুঃখ-বৃদ্ধি হয়। তাহাতে লোকের সরলতা বাড়ে না,—বাড়ে কৃত্রিমতা। তাহাতে কষ্ট বাড়ে, পরস্পরের দ্বেষ হিংসা বাড়ে, স্বাতন্ত্র্য-বৃদ্ধি হয়। মানবের মন মানবের জন্য আকৃষ্ট হয় না। শ্রীমতী ঐ উন্নতির কথায় বলিয়াছেন যে, বাহ্য-বিষয়-সর্ব্বস্ব উন্নতিশীল পাশ্চাত্য সমাজে প্রকৃত সুখ কিছুই নাই। তিনি আপনার ঐ কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য পাশ্চাত্য ইয়ুরোপ ভূমির বর্ত্তমান অবস্থার কথা যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতই হৃদয়বিদারক। সেই সব বর্ণনার একটী বর্ণনা শুনুন।

শ্রীমতী বলিয়াছেন,—"লণ্ডন ইংলণ্ডের রাজধানী। বিদেশীয়ের নিকট লণ্ডন লক্ষ্মীর বর্ত্তমান লীলাভূমি। কিন্তু লণ্ডনে যেরূপ দুঃখ কষ্ট আছে, জগতের আর কুত্রাপি আছে কিনা সন্দেহ। ইনি বলিয়াছেন, ভারতসন্তানগণ, ভারতের ত্রিকালদর্শী ঋষি-তাপসের বংশধরগণ, তোমরা বাহিরের লোক। বিলাতের ভিতরের তত্ত্ব তোমরা জান না। সে তত্ত্ব জানিবার তোমাদের সম্ভাবনা নাই। তোমাদের দেশের যে দুই একজন বিলাতে প্রবাস করিতে গমন করেন, সে তত্ত্ব লইবার সাবকাশ তাঁহাদের হয় না। সে দুঃখ কষ্ট তাঁহাদের চক্ষে পড়ে না। আমি নিজে ভুক্তভোগী। আমি নিজে স্বচক্ষে সে সব কষ্ট দেখিয়াছি। কল্পিত কথায়, মনোরঞ্জিত বাক্যে তোমাদিগের মন ভুলাইতে চাহি না। বিলাতে আমাদিগের বাস। বিলাতী সমাজ আমি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছি। লণ্ডনের যেখানে দুঃখের কথা আমি শুনিয়াছি, সেইখানেই গিয়াছি এবং সেই দুঃখ কষ্ট দেখিয়া আমার যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, সেই অভিজ্ঞতা-বলেই আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্যাড়ম্বর বা চাকচক্যে তোমরা মুগ্ধ হইও না। ঐ বাহ্যাড়ম্বর এবং ঐ চাকচক্যের পশ্চাদ্দেশে দুঃখ-দারিদ্র্যের বিভীষণ মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডনসহরের একাংশ দেখিবে, ঐশ্বর্য্যের লীলাভূমি, তথাকার ধনৈশ্বর্য্য, ভোগবিলাস, বাহ্যাড়ম্বর দেখিলে তোমার চক্ষু ঝলসিয়া যাইবে। কিন্তু সেই লণ্ডনের অপর অংশে যাও, দেখিবে, অঙ্গ জমিয়া যায়, দেহের অভ্যন্তরের রক্তস্রোত ধমনী মধ্যে বদ্ধ হইয়া যায়—পৌষের সেই দারুণ হিমানীপাতেও সহস্র সহস্র লোকের অঙ্গে আচ্ছাদন নাই; অন্নকষ্টে লোকে দিনের পর দিন উপবাস করিতেছে। রোগে, শোকে, লোক জীর্ণ শীর্ণ; দেখিবে, একমুষ্টি অন্নের জন্য বিলাতী-মহিলাকুল দলে দলে আপনার সতীত্ব-রত্নে বিসর্জ্জন দিতেছে। তাই বলি, স্বার্থপরতা, পাশব স্বার্থপরতা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাণ। দয়া-দাক্ষিণ্য, পরোপকার, পরহিতৈষিতা, পর-দুঃখানুভূতি পাশ্চাত্য সভ্যতার অঙ্গ নহে।" এই সব চিত্র ধরিয়া শ্রীমতী হিন্দু-সন্তানকে কত সদুপদেশই দান করিয়াছেন। তাঁহার এ উপদেশ-বাক্য মরুভূমে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে কিনা, ভগবানই জানেন।

হিন্দুধর্ম্মের অন্যান্য অনেক কথাই তিনি বলিয়াছেন। বেদ-উপনিষদের কথা বলিয়াছেন, হিন্দু রমণীর শ্রেষ্ঠতার কথাও বলিয়াছেন। বিবির শেষ অনুরোধ—"ভারত-সন্তান! তোমরা বাহ্য-বিষয়-সর্ব্বস্ব পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচক্যে মুগ্ধ হইও না। অকিঞ্চিৎকর ভোগবিলাসে মত্ত হইও না। তোমাদিগের পিতৃপুরুষগণের প্রদর্শিত পবিত্র পথ অবলম্বন কর। সরল-ভাবে যৎসামান্য ভোগ-বিষয় অবলম্বনে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে শিখ। অধ্যাত্ম বিষয়ে মনোনিবেশ কর। আপনার পুত্র-পৌত্রগণকে ভারতের আধ্যাত্ম্য বিষয়ে শিক্ষা দেও। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিষ গৃহে আনিয়া আর গৃহ অপবিত্র করিও না;

আপনার জীবন অন্যের আদর্শতুল্য কর। দেশে প্রাধান্য স্থাপন কর। দেব-দেবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। তাঁহাদের পূজা কর। হিন্দুর শাস্ত্রাদেশ মানিয়া চল। সামাজিক আচার অনুষ্ঠান অবহেলা করিও না। আপনার নিত্য কর্ম্ম সদাচারে সু-সম্পন্ন কর। লোকের বিদ্রূপে ভয় করিও না। আপনি অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছ, বুঝিয়া সৎপথ অবলম্বন কর। করিয়া আপনাদিগকে হিন্দু-সন্তান বলিয়া পরিচয় দাও; আর এই পরিচয় দিয়া ভারতের পূর্ণ-প্রতিষ্ঠা স্থাপনের চেষ্টা কর।"

বিবির চরিত্র সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাধুচিন্তা।

চতুর্থ প্রস্তাব।

গত ভাদ্রমাসীয় জন্মভূমিতে সাধুচিন্তা-প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলাম। সেবারে সাধুচিন্তার তৃতীয় প্রস্তাব পর্য্যন্তই প্রকাশিত হয়। অনবকাশাদি বাধাপ্রযুক্ত এযাবৎ তাহার পরবর্ত্তী বিষয়গুলির প্রস্তাবনা করিতে পারি নাই; এবার হইতে তদ্বিষয়ে যথাসম্ভব চেষ্টা করিব।

প্রকাশিত তৃতীয় প্রস্তাবে যে ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিকের লক্ষণাদি লিখিত হইয়াছে, বর্ত্তমান চতুর্থ প্রস্তাব তাহারই ব্যাসবাক্য স্বরূপ। উল্লিখিত লক্ষণাদির সংক্ষিপ্ত মর্ম্মমাত্রই পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, সর্ব্বসাধারণের পক্ষে তাহা সুপর্য্যাপ্ত হইতে পারে না। মনস্বী পাঠকের পক্ষে প্রচুর বোধ হইলেও যাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার অভিলাষে সাধুচিন্তার অবতারণা, তাঁহারা সংক্ষিপ্ত বাক্যে প্রবোধিত হইবার উপযুক্ত নহেন; পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নীচাশয়গণের ইন্দ্রজালবৎ কুহকে বিমোহিত হইয়া যাহারা ধর্ম্মরাজ্যে বিপন্ন হইতেছে, ধর্ম্মজ্ঞানে ঘোর পাপানুষ্ঠান করিয়া যাহারা নরকের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছে পূর্ব্বোল্লিখিত দুষ্টাশয়গণের দুরভিলাষ পরিপূরণার্থে গৃহলক্ষ্মী ভার্য্যাদির সহিত ধন, মান, জাতি সমর্পণ করিয়া নিজের এবং সনাতন আর্য্য-সমাজের সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটাইতে পারে; তাহাদিগের প্রবোধের নিমিত্ত, দারুণ অত্যাচার হইতে নিস্তারের নিমিত্ত, সাধুচিন্তা-প্রসঙ্গের আরম্ভ করিতেছি। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ তাঁহাদের নিমিত্ত নহে। অতএব এ প্রসঙ্গের সমস্ত বিষয়ই একটু বিস্তৃত মতে বলা আবশ্যক বোধ করি।

তৃতীয় প্রস্তাবে, ধর্ম্মলক্ষণ-প্রকাশক মনু-শ্লোকব্যাখ্যায় কয়েকটী বিষয়েই অনেকের হৃদয়ে কিছু কিছু সংশয় বা বাধা বোধ হইতে পারে, এবার সেই কয়েকটী বিষয় বিশদ করার চেষ্টা করিব। তাহা এই—১ম ঈশ্বর-উপাসনার সহিত ধর্ম্ম বা সাধুতার অন্বয়-ব্যতিরেক সম্বন্ধ নাই অর্থাৎ ঈশ্বরোপাসনা করিলেই ধার্ম্মিক হইবে, তাহা না করিয়া যিনি যে অবস্থায় থাকুন, যাহাই করুন, তিনি অধার্ম্মিক থাকিবেন—এমত নির্দ্ধারণ নাই; উপাসক হইলেও ঘোর অধার্ম্মিক হইতে পারেন, আবার উপাসনা ব্যতীতও ধার্ম্মিক-চূড়ামণি হইয়া বিরাজ করিতে পারেন।

এই কথাটী দ্বারা সমাজের দুই শ্রেণীর লোকের ভিন্ন ভিন্ন দুইটী ভাব উদিত হওয়া সম্ভব। যাঁহারা আমাদের দেশীয় নাস্তিক অর্থাৎ জ্ঞান-বিবেক-চিন্তাদি-পরিশূন্য, অলস, সুতরাং সর্ব্বকর্ম্ম-বিবর্জ্জিত পুরুষ, তাঁহাদের হৃদয়ে বিশেষ আশ্বস্ত ভাব হইতে পারে; কেননা, তাঁহারা ঐরূপ পাশবভাবে থাকিয়াই ধার্ম্মিকচূড়ামণি হইতে পারিলেন। আর যাঁহারা বিদেশীয় মতে ধর্ম্মতত্ত্বের অভিজ্ঞ অথবা

দেশীয় বিদেশীয় উভয়থাই সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাঁহারা অকস্মাৎ বজ্রধ্বনি শ্রবণের ন্যায় চমকিত হইবেন এবং এই প্রবন্ধের লেখককে একজন শাস্ত্রবিরোধী, নাস্তিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন। কারণ অন্য কোন দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্র, উপাসক ভিন্ন মানবকে ধার্ম্মিক বলেন নাই, তাঁহাদের মতে ঈশ্বরোপাসনা মাত্রই ধার্ম্মিকের লক্ষণ। আর দেশীয় অজ্ঞসমাজেও, যে কোনরূপে একমাত্র ঈশ্বরের নাম করাকেই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া অবগত আছে, অতএব উল্লিখিত বিষয় ইহাঁদের যাবজ্জীবন সঞ্চিত সংস্কারের সম্পূর্ণ বিপরীত, সুতরাং বিস্ময়বোধ না হইবার সম্ভাবনা কি? যদি বাস্তবিকই এইরূপ ঘটে, তবে তাঁহাদের উভয় পক্ষেরই সম্পূর্ণ ভ্রম হইবে; এক বস্তুকে অন্যরূপে বুঝিয়া তাঁহারা প্রকৃতার্থে বঞ্চিত হইবেন। এজন্য নিম্নে ইহার বিবরণ প্রদর্শিত হইতেছে,—

ঈশ্বরের উপাসনা ব্যতীতও ধার্ম্মিক বা সাধু হইতে পারে, এ কথা বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের পক্ষে নূতন বা আশ্চর্য্যাবহ বিষয় হইতে পারে, কিন্তু পণ্ডিতমণ্ডিত প্রাচীন আর্য্যসমাজের পক্ষে তাহা নহে। তাঁহাদের নিকট ইহা চন্দ্র সূর্য্যের মত সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ চিরপরিজ্ঞাত বিষয়।

আর্য্যশাস্ত্র মতে ধার্ম্মিক হইবার অনেক-প্রকার উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার যে কোন একটীর আশ্রয় লইলেই মানবগণ ধার্ম্মিক হইতে পারেন। তন্মধ্যে ঈশ্বরোপসনাও একতম উপায়-বিশেষ মাত্র। কিন্তু তাহার মধ্যেও কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে। কোন কোনরূপ উপাসনাতে ধার্ম্মিক হওয়ার পরিবর্ত্তে নরকের কীট হইতে পারে, আবার কোন উপাসনাতে কখন ধার্ম্মিক হওয়া কেন, সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্তই হইতে পারেন। যথারীতি উপাসনা করিলেই তাহা মুক্তির কারণ হইয়া থাকে, কিন্তু রীতির পরিবর্ত্তনে তাহাই মানবের নরকদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। অতএব উপাসনার মধ্যেও বিশিষ্ট উপাসনাই ধর্ম্মসাধন কারণ সমূহের মধ্যে অন্যতম একটী কারণ মাত্র। এতদ্ব্যতীত আরও চারিটী উপায় বা পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে। যথারীতি, তাহার যে কোনটীর আলম্বন করিলেই জীব ধার্ম্মিক হইতে পারে। কেবল ধার্ম্মিক কেন, জীবরাজ্যের উন্নতির পরাকাষ্ঠা অনুভব করিয়া অবশেষে নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করিতে পারেন। ঈশ্বর-আরাধনা দ্বারা যে ফল সংসাধিত হয়, ঠিক সেই ফল লাভ করিতে পারে। অথচ তাহার একটীর মধ্যেও ঈশ্বরোপাসনার নাম গন্ধ নাই। উপাসনা বলিলে লোকে যাহা বোঝে, তাহার লেশমাত্রও নাই। তাহাতে ভক্তির কথা নাই, প্রেমের কথা নাই, পূজা নমস্কার নাই, স্তব কবচ নাই, কোনরূপ অনুনয় বিনয়ও নাই। সেই পন্থা কয়েকটী এই,——১ম আত্মযোগপন্থা। ২য়;—প্রকৃতিসংস্থানপন্থা। ৩য়—মন্ত্রযোগপন্থা। ৪র্থ—অদ্বৈত যোগ। শাস্ত্রানুসারে নিজের জীবতত্ত্ব অবগত হইয়া যোগশাস্ত্রানুযায়ী যোগানুষ্ঠান দ্বারা তাহার সাক্ষাৎকার বা অপরোক্ষ অনুভব করার নাম আত্মযোগপন্থা। এই পন্থার অন্য নাম সাঙ্খ্যযোগ। সাঙ্খ্যদর্শনে আদিগুরু মহাত্ম কপিলদেব কর্তৃক এই পন্থা প্রদর্শিত হইয়াছে। মহর্ষি পঞ্চশিখ, মহর্ষি আসুরি, আপনা আপন সাঙ্খ্য দর্শনে ইহারই বিস্তার করিয়াছেন। ঈশ্বর-কৃষ্ণও সাঙ্খ্যকারিকা নামক সপ্ততিশ্লোকাবলী দ্বারা এই পন্থার অনুবাদ করিয়াছেন। ভগবান্ পতঞ্জলিদেবও স্বীয় পাতঞ্জল দর্শনের প্রথম ভাগে এই পন্থারই চিত্র করিয়াছেন। গোতমের ন্যায়-দর্শন এবং বৈশেষিকদর্শনও এই পন্থারই সমর্থক। তৎপরে ভগবদ্গীতা গ্রন্থেও দ্বিতীয়াধ্যায়ের একাদশ শ্লোক হইতে অষ্টত্রিংশ শ্লোক পর্য্যন্ত ভগবান্ স্বয়ং এই আত্মযোগ বা সাঙ্খ্যযোগপন্থার উপদেশ করিয়াছেন। এই পন্থার মূলভিত্তি বেদ।

বেদের মস্তক স্বরূপ কঠ, মুণ্ডক ও বাজসনেয়াদি উপনিষৎ হইতে এই পন্থা অবতীর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতাত পুরাণ, তন্ত্র ও সংহিতা প্রভৃতি হিন্দুর যাবৎ ধর্ম্মগ্রন্থেই এই মতের অনুমোদন দেখিতে পাওয়া যায়।

এই পন্থার মধ্যে ঈশ্বরোপসনার নাম গন্ধই নাই। প্রত্যুত ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞানেরও বিশেষ আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হয় নাই। এখন বল দেখি, পাঠক! তবে কি উপায় করিবে? উপাসক না হইলেই যদি ধার্ম্মিক হইতে না পারে, তবে এই সকল গ্রন্থগুলির কি উপায় হইবে? ইহাদের বক্তাদিগকে কি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবে? যাঁহারা তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট আত্মজ্ঞানপন্থার অনুগামী মহাপুরুষ, তাহাদিগকেই বা কিরূপ ব্যক্তি বলিতে অভিলাষ কর? অধার্ম্মিক, অসাধু, নাস্তিক প্রভৃতি সংজ্ঞা প্রদান করিতে চাও কি? যদি তাহাই কর, তবে তোমার নিকটে কোন আপত্তি করিতে সাহসী হই না। কপিল, বেদব্যাস, গোতমাদি সমস্ত ঋষিগণ এবং অবশেষে গীতার বক্তা ও বেদের কর্ত্তা স্বয়ম্ভু পর্য্যন্ত যাঁহাদের মতে ধার্ম্মিক-পদবী লাভের উপযুক্ত নহেন, মাদৃশ নরকের কীট মানবের পক্ষে তাঁহাদের নিকট কিছু বক্তব্যই নাই।

এই হইল, আত্মযোগপন্থার সজ্ঞিপ্ত বিবরণ; এখন প্রকৃতি-সংন্যাসপন্থার মর্ম্ম বলা যাইতেছে

প্রকৃতিসংন্যাসপন্থা কর্ম্মযোগ এবং সাঙ্খ্যযোগের নিতান্ত ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কান্বিত; এজন্য ইহাকে তাহাদেরই প্রকারভেদ বলিলেও অসঙ্গত হয় না। সচরাচর প্রচলিত গ্রন্থে সেইরূপ ব্যবহারই দেখিতে পাওয়া যায়।

স্থূলদেহ হইতে লিঙ্গশরীর পর্য্যন্ত যাবৎ জড়ব্যূহের যাবৎ ক্রিয়াকলাপের কর্তৃত্ব, সত্ত্বাদি ত্রিগুণের প্রতি সংন্যস্ত করিয়া নিজে উদাসীনভাবে অবস্থিতি করার নামই প্রকৃতিসংন্যাস পন্থা। ইহাতেও আত্মযোগপন্থার ন্যায় যোগ, সমাধি ও ধ্যান-ধারণাদি আছে। অধিকন্তু, জাগ্রদবস্থায় সর্ব্বদা চিন্তা করার নিমিত্ত প্রকৃতিতে (সত্ত্বাদিগুণে) কর্তৃত্ব-সংন্যাস করা নিরূপিত আছে, এ নিমিত্ত ইহা আত্মযোগ হইলেও প্রকৃতিসংন্যাস নামে অভিধানের যোগ্য। তাই ভগবদ্গীতাতে স্বয়ং ভগবান্ আত্মযোগ হইতে একটু বিভিন্ন করিয়া দ্বিতীয়াধ্যায়ের উনচল্লিশ শ্লোক হইতে তৃতীয়াধ্যায়ের উনত্রিশ শ্লোক পর্য্যন্ত এই পন্থার বর্ণনা করিয়াছেন। সাঙ্খ্যপাতঞ্জলাদি গ্রন্থেও পরিব্যাপ্তরূপে এ বিষয় বিস্তৃত আছে। কিন্তু ইহাতেও ঈশ্বরোপাসনা বা ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানের সহিত কিছুমাত্র সংস্রব নাই। ইহাতে জানিতে হয়, কেবল নিজের জীবতত্ত্ব আর ত্রিগুণাদি-তত্ত্ব, চিন্তাধ্যানাদিও তাহাকেই করিতে হয়। এই পন্থাদ্বয়ের সুবিস্তৃত বিবরণ ধর্ম্মব্যাখ্যাতেই যথাশক্তি প্রকাশ করিয়াছি। শাস্ত্রের প্রমাণ-প্রয়োগাদিও সেই খানে উদ্ধৃত আছে। এই পন্থার অনুসরণে যেরূপে নির্ব্বাণমুক্তি পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। অতএব সাঙ্খ্যযোগের বা আত্মযোগের যোগীকে অধার্ম্মিক ও অসাধু না বলিলে ভগবদাদিষ্ট প্রকৃতিসংন্যাসপন্থাবলম্বী মহাপুরুষকেও বোধ হয়, তাহা বলিতে সাহস করিবে না।

পঞ্চম প্রস্তাব।

প্রকৃতি-সংন্যাসপন্থা-প্রদর্শিত হইল; এখন তৎপরবর্ত্তী মন্ত্রযোগের স্থূলমর্ম্ম বলা যাইতেছে।

মন্ত্রযোগ;—অন্তর্ম্মাতৃকা, গুহ্য-মাতৃকা, যোঢ়া, গুহ্য-যোঢ়া এবং জপ অন্তর্জপাদিরূপ মন্ত্রঘটিত ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া। এই ক্রিয়া যোনিমুদ্রা, মন্ত্র-চৈতন্য এবং ষট্চক্র-ভেদাদি যৌগিকব্যাপার-সমন্বিত। এই মন্ত্রযোগ অথর্ব্ববেদ এবং সমস্ত তন্ত্র-শাস্ত্রের এক প্রকার মজ্জাস্বরূপ

বলিলেও হয়। ইহা দ্বারাও নির্ব্বাণ মুক্তি-লাভের বিষয় বর্ণিত আছে।

মন্ত্রযোগানুষ্ঠানে, কেবল মন্ত্রেরই ক্রিয়া আবশ্যক। ইহাতে মন্ত্রেরই ক্রিয়া, মন্ত্রেরই জপ, মন্ত্রেরই চিন্তা, মন্ত্রেরই আরাধনা, মন্ত্র লইয়াই সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়, কিন্তু ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণাদি উপাসনা বা পূজা অর্চ্চা কিংবা স্তব স্তোত্র, অনুনয় বিনয় এবং ভক্তি প্রেমাদির কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। কিঞ্চিৎ আবশ্যক কেবল ঈশ্বরজ্ঞানের। তাহাও না থাকিলে যে, মন্ত্রযোগের বিশেষ কোন বাধা হয় এমন নহে, কিন্তু থাকিলে কিছু আনুকূল্য হয়। এ নিমিত্ত উল্লিখিত সাঙ্খ্যযোগ আর প্রকৃতি-সংন্যাস যোগের ন্যায় ইহাকে একবারে স্বাধীন বা ঈশ্বর-শূন্য পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় না। কিন্তু তাঁহার উপাসনাদি হইতে ইহা একবারেই সুদূরে অবস্থিত। অথচ এই মন্ত্রযোগ, জীবের মুক্তিসাধনের একটী মুখ্যতম উপায়।

মন্ত্রযোগের সমস্ত অবস্থা বিবৃত করিলে এ রহস্য অনায়াসে বিদিত হওয়া যায়, কিন্তু ইহা সাধারণের নিকট অপ্রকাশ্য বিষয়। যাঁহারা মন্ত্রযোগের যোগী, সেই বিষয়ের কর্ম্মী, অথবা বিশুদ্ধ জ্ঞানবান্ পাত্র, তাঁহাদিগের নিকটেই মন্ত্রযোগ প্রকাশ করা যায়। কারণ তাঁহারা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ। সুতরাং ইহার আর অধিক বিস্তার করা গেল না।

এখন অদ্বৈতযোগ-পন্থার বিষয় শ্রবণ কর। অদ্বৈতযোগ-পন্থাতে, মন্ত্রযোগ অপেক্ষায়, ঈশ্বরের সহিত অধিকতর সংস্রব আছে। অধিকতর কেন, সম্পূর্ণ সম্পর্কই আছে। ঈশ্বরের সহিত অদ্বৈত-যোগের অন্বয়-ব্যতিরেক সম্বন্ধ। ঈশ্বর-জ্ঞান না থাকিলে অদ্বৈতযোগ সাধিত হইতে পারে না; ঈশ্বর-জ্ঞান হইলে, উপযুক্ত অনুষ্ঠান দ্বারা নিশ্চয়ই অদ্বৈতযোগ লাভ করা যায়। ইহার প্রথমে জড়তত্ত্ব-জ্ঞান হওয়া আবশ্যক, তৎপরে জীবতত্ত্বের জ্ঞান, তৎপরে ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান। এই তিন বস্তুর তত্ত্বজ্ঞান হইলে নিজের দেহাদি জড়তত্ত্বের সহিত ঈশ্বরের জড়ভাগের এবং নিজের চৈতন্যের সহিত ঈশ্বর-চৈতন্যের অভেদজ্ঞানের অভ্যাস করার নামই অদ্বৈত-যোগ। কথান্তরে ইহাকে বেদান্ত-জ্ঞানাভ্যাস, মহাবাক্যার্থাভ্যাস বা তত্ত্বমসি-বাক্যার্থাভ্যাস ইত্যাদি বলা গিয়া থাকে। বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তলবকার এবং মাণ্ডুক্যাদি উপনিষদ্‌গণ, এই পন্থা উপদেশের আদি গুরু। পরে বেদান্তদর্শন এবং পাতঞ্জলের পরভাগ ইহার সমর্থন করিয়াছেন। পরম পূজ্যপাদ শ্রীমান্ মধুসূদন সরস্বতী, শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্য এবং শ্রীমান্ ত্রৈলিঙ্গস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই অদ্বৈত-পন্থার সেবক এবং ইহা দ্বারাই নির্ব্বাণ-পদে উত্থিত হইয়াছেন। হিন্দুদিগের এমত শাস্ত্রই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাতে অতি গৌরবের সহিত এই পন্থার বর্ণনা করা হয় নাই। প্রায় যাবৎ উপনিষদ্‌গণই এই অদ্বৈত-জ্ঞানরূপ কহিনূর মণি হস্তে লইয়া নৃত্য করিতেছেন, আগম নিগম যামলাদি তন্ত্রগণও ইহার সঙ্গে সঙ্গে যোগদান করিয়াছেন, মনু প্রভৃতি সংহিতাগণেরও এই একই কথা। ষট্‌ত্রিংশৎ মহাপুরাণ উপপুরাণও তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতেছেন।

এই পন্থার উপকরণ কেবল মাত্র অদ্বৈতজ্ঞান আর যোগসমাধির অনুষ্ঠান এবং সংসারের দুঃখময়ত্ব অনুভব। এতদ্ব্যতীত ভক্তি, প্রেম, নতি, প্রণাম বা নামকীর্ত্তন, নামস্মরণ ও স্তব-স্তোত্রাদিরূপ উপাসনার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই, ঈশ্বরের মহিমাদিকীর্ত্তন বা চিন্তনেরও প্রয়োজন নাই; প্রয়োজন কেবল অদ্বৈত ভাবনার। শয়নে, স্বপ্নে, জাগরণে কেবল অদ্বৈত অনুভবের চেষ্টা করিতে হয়, তাহার নিমিত্তই

যোগ করিতে হয়, সমাধি করিতে হয়। নিজকে ঈশ্বররূপে বুঝাই অদ্বৈতপন্থা।

তবে বল দেখি, পাঠক! এখন কি উপায় করিবে! কাহাকে অধার্ম্মিক বলিবে, কাহাকে ধার্ম্মিক বা সাধু বলিয়া মনোনীত করিবে! মন্ত্রযোগনিরত এবং অদ্বৈতযোগে নিমগ্ন মহাপুরুষগণকে অধার্ম্মিক অসাধু বলিয়া অভিহিত করিতে সাহসী হইতে পার কি? ইহাদের মধ্যে তো ঈশ্বরের প্রেম-ভক্তি, পূজা-অর্চ্চাদি উপাসনা-ব্যাপারের নাম গন্ধও নাই? বোধ হয় তাহা পারিবে না! যদি না পার এবং এই চতুর্ব্বিধ পন্থার পথিকগণকে, ধার্ম্মিক বা সাধু-পুরুষ বলিয়া বিবেচনা কর, তবে স্থির হইল যে, ঈশ্বরোপাসনা, ঈশ্বরে ভক্তি-প্রেম এবং ঈশ্বর-তত্ত্বের জ্ঞান অথবা বিশ্বাসের ভাগটা সহ, একবারে বাদ দিলেও হিন্দুর শাস্ত্রমতে, যুক্তিমতে, বিচারমতে ধার্ম্মিক বা সাধু হইতে পারে। সুতরাং ঈশ্বরজ্ঞান বা উপাসনাদির সহিত হিন্দুধর্ম্মের অন্বয়-ব্যতিরেক সম্বন্ধ নাই অর্থাৎ উপাসক হইলেই ধার্ম্মিক হইবে, আর না হইলে ধার্ম্মিক হইতে পারিবে না, এরূপ কোন বাঁধাবাঁধী সম্পর্ক নাই, এবিষয় হিন্দুর চিরকাল প্রচলিত সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত বাক্য।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

বাঙ্গালা ভাষা।

মুখবন্ধ।

বাঙ্গালা ভাষার গঠন-সম্বন্ধে একটা কথা অল্পে অল্পে উঠিতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় নানা ভাষার শব্দ প্রচলিত আছে। কতকগুলি শব্দ আছে, যাহা বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য কোন ভাষাতেই দেখা যায় না। আর আছে কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ, কতকগুলি আরবী শব্দ, কতকগুলি পারসী শব্দ, কতকগুলি উর্দ্দূ শব্দ, কতকগুলি হিন্দী শব্দ। ইদানী আবার কতকগুলি ইংরেজী শব্দও বাঙ্গালায় চলিত হইয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও অন্য অন্য জাতীয় আগন্তুক শব্দ বোধ হয় বাঙ্গালা ভাষায় আছে।

বাঙ্গালা ভাষার একটু একটু প্রতিপত্তি যেন হইতেছে। বহুতর গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়াছে এবং হইতেছে। মাসিক, সাপ্তাহিক প্রবন্ধ-পত্র ও সংবাদ-পত্রও বাঙ্গালা ভাষায় এখন চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় অনেক বক্তা বক্তৃতাশক্তি প্রকাশ করিয়া বেড়াইতেছেন। ইহা ছাড়া, দলিল-দস্তাবেজ, বিষয়-কর্ম্ম-সংক্রান্ত সমস্ত লেখাপড়া এবং চিঠিপত্র বাঙ্গালা ভাষায় যাহা লেখা হয়, তাহার কথা এখানে ধরিলাম না, ধরিবার প্রয়োজনও নাই। এ গুলিকে নিম্ন-অঙ্গের ব্যাপার বলিয়াই ধরিলাম না। গ্রন্থাদি উচ্চ-অঙ্গের বিষয়। সেই গুলিকে উপলক্ষ্য করিয়াই আমার যাহা বক্তব্য, বলিতেছি।

ভাষা-সম্বন্ধে একটা কথা উঠিতেছে যে বলিয়াছি, তাহা ঐ উচ্চ-অঙ্গের ভাষা-সম্বন্ধে। কথাটা এই যে, বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতের প্রাধান্য থাকা আবশ্যক কি না, উচিত কি না এবং আবশ্যক ও উচিত হইলে বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণের অধিকার এবং আধিপত্য কি পরিমাণে থাকা উচিত? সমস্যা খুব কঠিন, তাহার সন্দেহ নাই।

এই সমস্যার পূরণ করিতে আমি সক্ষম নহি। অনায়াসে বা অল্পায়াসে ইহার পূরণ হইবে বলিয়াও আমার মনে হয় না। কিন্তু এ পক্ষে যাঁহারা যত্ন করিতেছেন, তাঁহাদের চিন্তার বিষয় বহুতর আছে। তেমন কতকগুলি বিষয় আমার মনে অনেক দিন হইতে উঠিয়াছে। সেইগুলি আমি বলিতে চাই। ভাষার নিমিত্ত যাঁহাদের যত্ন-চেষ্টা আছে, তাঁহারা বিবেচনা করিবেন, এই আমার অনুরোধ

বলিয়াছি যে, সমস্যা বড় গুরুতর। কেননা, ভাষাতে জাতির পরিচয় পাওয়া যায়, ধর্ম্মের পরিচয় পাওয়া যায়, সমাজ-সংস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়, সামাজিক রীতি-নীতি আচার-ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। তবেই দেখুন, ব্যাপারটা উপেক্ষণীয় নহে। অনেক দূর পর্য্যন্ত ভাবিয়া চিন্তিয়া ভাষা-ঘটিত সমস্যার মীমাংসা করিতে হয়।

এখনকার বাঙ্গালীর যে জাতি, এখনকার বাঙ্গালা ভাষারও সেই জাতি। ইংরেজের আমলে, ইংরেজের অধীনে থাকিয়া, ইংরেজের সংস্পর্শে আসিয়া অল্পাধিক ইংরেজী শিখিয়া এখনকার বাঙ্গালী না-হিন্দু, না-ফিরিঙ্গী, না-ইংরেজ, না-কিছু। এখনকার বাঙ্গালায় লেখা গ্রন্থ ও প্রবন্ধও সেইরূপ। গ্রন্থ পড়িয়া দেখুন, প্রবন্ধ পড়িয়া দেখুন, গ্রন্থ বা প্রবন্ধের জাতি খুঁজিয়া পাইবেন না। গ্রন্থের ভাষায় আস্তিকতাও নাই, নাস্তিকতাও নাই; খৃষ্টানীও নাই, অখৃষ্টানীও নাই। মোটের উপর, কি একরকম যে দেখা যায়, তাহা বলিবার যো নাই; বর্ণনা করিবারও উপায় নাই। কেহ মনে করিবেন না যে গালি দিবার জন্য এরূপ বলিতেছি। দোষ কি গুণ, কিছুই বলা আমার অভিপ্রেত নহে। যাহা স্বরূপ, তাহাই বলিতেছি এইমাত্র।

ইদানী কয়েক বৎসর হইতে ইংরেজীতে শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে স্বল্পপরিমাণে সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা হইতেছে। বোধ হয়, সেই জন্যই কাহারও কাহারও ইচ্ছা হইয়াছে যে, বাঙ্গালা ভাষার উপর সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং সংস্কৃত অভিধান সমধিক-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হউক। ফলে কি দাঁড়াইবে, জানি না। কিন্তু সংস্কৃতের আধিপত্য বাড়াইবার পক্ষে বিস্তর বিঘ্ন-বাধা আছে, তাহা জানি। সম্প্রতি সেই বিঘ্ন-বাধার কথাই বলা যাউক।

প্রথম বিঘ্ন এই যে, বাঙ্গালা ভাষার বর্ণমালা নাই। দ্বিতীয় বিঘ্ন, বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ নাই; এবং তৃতীয় বিঘ্ন, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান নাই।

বর্ণমালা নাই।

বাঙ্গালায় বর্ণমালা বলিয়া এখন যাহা চলিত আছে, তাহা বাস্তবিক বাঙ্গালা ভাষার বর্ণমালা নহে। প্রায় সংস্কৃত বর্ণমালাই বাঙ্গালা বলিয়া চলে, অথচ বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োজন তাহার দ্বারা ঠিক সিদ্ধ হয় না। কতকগুলি বর্ণ প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালার কাজে লাগে না। জোর করিয়া তাহা-দিগকে লাগান হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালা ভাষায় তাহাদের স্থান আছে বলিয়া বিবেচনা হয় না।

এদিকে আবার বাঙ্গালা ভাষার কার্য্যোপ-যোগী কতকগুলি বর্ণের একেবারেই অভাব আছে। নানাপ্রকার কষ্ট-কল্পনা করিয়া যোড়া দিয়া, তালি দিয়া, কাজ সারিতে হয়। এমন অনর্থক বর্ণ যে আছে এবং আবশ্যক বর্ণ যে নাই, এইবার তাহার প্রমাণ দিতেছি।

কিন্তু প্রমাণে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বর্ণ কি পদার্থ, বর্ণের কি প্রয়োজন, ইহা বুঝিয়া রাখা আবশ্যক।

মানুষের কণ্ঠ হইতে যে সকল পৃথক্ পৃথক্ স্ফুট-ধ্বনি বাহির হয়, সেই প্রত্যেক ধ্বনির যে প্রতিমূর্ত্তি, তাহাই বর্ণ। সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যে সম-সংখ্যক ধ্বনির প্রয়োগ নাই। কোন দেশে কোন জাতির ভিতর এমন কতক-গুলি ধ্বনির প্রয়োগ আছে, যাহার প্রয়োগ অন্য দেশে বা অন্য জাতিতে নাই। এইজন্য, কোথাও ধ্বনির সংখ্যা অধিক, কোথাও ধ্বনির সংখ্যা অল্প। কোথাও বা ধ্বনির সংখ্যা মোটের উপর অল্প হইয়া একাংশে অধিক অর্থাৎ মোট ধ্বনির সংখ্যা অল্প হইলেও তাহারই ভিতর এমন কতকগুলি ধ্বনি আছে, যাহা অধিক-

ধ্বনি-সম্পন্ন দেশে বা জাতির মধ্যে পাওয়া যায় না।

এইবার চলিত বাঙ্গালা বর্ণমালা ধরিয়া দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক, তাহা হইলেই আমার বক্তব্য পরিষ্কার করিয়া বুঝা যাইবে।

অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, ং, ঃ। ক, খ, গ, ঘ, ঙ। চ, ছ, জ, ঝ, ঞ। ট, ঠ, ড, ঢ, ণ। ত, থ, দ, ধ, ন। প, ফ, ব, ভ, ম। য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ক্ষ——এই ত বাঙ্গালা বর্ণমালা? ইহা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালার বর্ণমালা নহে, বাঙ্গালার বর্ণমালা হইতেও পারে না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই বর্ণমালাকে বাঙ্গালার বর্ণমালা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। ৠ, ৡ, ক্ষ তিনি বাদ দিয়াছিলেন এবং ড়, ঢ়, য়, ঁ এই চারিটী বাড়াইয়া তিনি এক নূতন বর্ণমালা চালাইয়া গিয়াছেন। এখনকার ছেলেরা তাহাই শিখিতেছে।

বিদ্যাসাগরের অভিপ্রায় এই বুঝা যায় যে, বাঙ্গালা ভাষায় যখন ৠ, ৡ প্রয়োগে আইসে না, তখন বাঙ্গালা বর্ণমালার ভিতর ৠ, ৡ আছে, ইহা বলাই অন্যায়। অতএব ঐ দুইটী বর্ণ বাঙ্গালা বর্ণমালায় স্থান পাইতে পারে না। এদিকে আবার বাঙ্গালায় ড় লাগে, ড-য়ে কুলায় না; ঢ় লাগে, ঢ-য়ে কুলায় না; য় লাগে, য-য়ে কুলায় না; ঁ লাগে, অনুস্বার বা অন্য সানুনাসিক বর্ণে কুলায় না। অতএব এই চারিটী নূতন বর্ণ বসাইয়া বিদ্যাসাগর বাঙ্গালার এক অভিনব বর্ণমালা প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। ক্ষ,—এই বর্ণত কিছুরই মধ্যে নহে। দুইটী ব্যঞ্জনবর্ণ-সংযোগে হইার উৎপত্তি। ইহাকে একটী স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে সমুদায় যুক্তাক্ষরকেই পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। বোধ হয়, এই বিবেচনাতেই বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালার বর্ণমালা হইতে ক্ষ কাটিয়া দিয়াছেন।

বিদ্যাসাগরের এই ব্যবস্থাই এখন চলিতেছে। ছেলেরা ইহাই এখন মানে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের এই ব্যবস্থার মূল কিংবা যুক্তি আমি খুঁজিয়া পাই না।

বিদ্যাসাগর বলেন, বাঙ্গালায় ৠ, ৡ নাই। কিন্তু বাঙ্গালায় মোটেই হ্রস্ব, দীর্ঘের ভেদ আছে কি? শুধু ৠ ৡ বলিয়া কেন, আমি বলি যে, হ্রস্ব দীর্ঘ দুই প্রকার স্বর মোটেই বাঙ্গালাতে নাই। নাই, তাহার প্রমাণ এই যে, বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহিবার সময় হ্রস্ব, দীর্ঘ ভেদ করে না। ভেদ যদি করিত, তাহা হইলে সর্ব্বত্র বানানের ঐক্য থাকিত। দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝান একটু কঠিন। তবু চেষ্টা করা যাউক, বোধ করি প্রণিধান করিলে আমার মনের ভাব অবশ্যই কিছু কিছু বুঝা যাইবে।

স্বর বর্ণ।

'আমি'—বাঙ্গালায় এই একটী শব্দ আছে। যেরূপ বর্ণ-বিন্যাস করিয়া এই শব্দটী লিখিলাম, তাহাতে প্রথমে একটী দীর্ঘস্বর আছে,—আ। তাহার পর একটী হ্রস্বস্বর—ই—মকারে সংযুক্ত আছে। আদ্যস্বর ঐ যে 'আ'—উহাকে কি দীর্ঘ করিয়া আমরা উচ্চারণ করি? আ—মি এইরূপ উচ্চারণ করি কি? তাহা ত করি না! উচ্চারণ যাহা করি, তাহাতে আদ্যস্বর 'আ' হ্রস্ব বলিয়াই কাণে ঠেকে। ইংরেজী But কিংবা Tub প্রভৃতি শব্দে u যে ধ্বনি দেয়, 'আমি' এই শব্দের 'আ' প্রায় সেই ধ্বনিই দিয়া থাকে। সে ধ্বনি বাস্তবিক হ্রস্ব। ঐ 'আ' স্বরের প্রকৃত হ্রস্বস্বর যে 'অ', সংস্কৃত ভাষায় অ-কারেরও ঠিক ঐ উচ্চারণ। বাঙ্গালায় 'অ' 'আ'-কারের হ্রস্ব নহে। বাঙ্গালায় 'অ' এক স্বতন্ত্র স্বর। আমরা যেরূপ করিয়া 'আমি' শব্দ উচ্চারণ করি, সংস্কৃত

বর্ণমালা ধরিয়া তাহার বানান করিলে 'অমি' এইরূপ লিখিতে হয়।

'আম' এই শব্দেও আকার আছে। 'আমি' এই শব্দের 'আ, এবং 'আম' ঐ শব্দের 'আ মিলাইয়া দেখ, উচ্চারণগত কত প্রভেদ। ইহাতে দেখা যায় যে, 'আমি' এই শব্দের আকার এবং 'আম' এই শব্দের আকারের উচ্চারণে তারতম্য আছে। এই তারতম্যকে হ্রস্ব, দীর্ঘ বলিতে হয় বল; কিন্তু হ্রস্ব, দীর্ঘ বলিতে হইলে হয় তদনুসারে দুইটী অক্ষর বা বর্ণ রাখিয়া যেখানে যেটী লাগে, সেইটী বসাইয়া বানান বদলাইতে হয়, না হয়, বানান না বদলাইয়া একই বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন সমাবেশ অনুসারে ভিন্ন ভিন্নরূপে উচ্চারিত হইবে, এই নিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে হয়। অর্থাৎ হ্রস্ব, দীর্ঘ দুই প্রকার বর্ণ রাখিতে হইলে 'আমি' না লিখিয়া 'অমি' লিখিতে হয়। নতুবা এইরূপ একটী নিয়ম করিতে হয় যে, আদ্য আকারের পরবর্ত্তী স্বর ই, কিংবা উ থাকিলে সেই অকারের উচ্চারণ সঙ্কুচিত হয়। তবেই দেখ যে, হয় বর্ণমালার পরিবর্ত্তন করিতে হইল, না হয় উচ্চা- ণের নিয়ম বাঁধিতে হইল। কোন্‌টী করা ভাল, কিংবা কোন্‌টী করা উচিত, তাহা আমি বলিতে চাহি না। কিন্তু দুইয়ের একটী করা আবশ্যক, তাহার সন্দেহ নাই

আবার বাঙ্গালায় যদি ৠ, ৡ, উঠাইয়া দিতে হয়, তাহা হইলে ঋ, ঌকেও উঠান উচিত। কেননা, বাঙ্গালায় ঋ, ঌ স্বরবর্ণ স্বরূপে মোটেই উচ্চারিত হয় না। রয়ে ইক্কার, লয়ে ইকার দিলে যেমন উচ্চারণ হয়, ঋ, ঌয় ঠিক সেইরূপ উচ্চারণ করা হইয়া থাকে।

বাঙ্গালায় দুই প্রকার 'এ' আছে। যখন আমরা বলি,—"বেশ ত," তখন 'বেশ' শব্দের বয়ে যে 'এ'কার আছে, সে এ-কারের যেমন উচ্চারণ, 'বেল' এই শব্দের বয়ে এ-কারের উচ্চারণ তেমন নয়। বেলের 'এ' দীর্ঘ, 'বেশ ত' এর 'এ' হ্রস্ব। বাঙ্গালা বর্ণমালা ঠিক করিতে হইলে হয়, দুটী 'এ' করিতে হইবে, না হয়, উচ্চারণের কোন নিয়ম বাঁধিতে হইবে।

এখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, উচ্চারণ- সম্বন্ধে যদি নিয়ম বাঁধা যায়, তাহা হইলে হ্রস্ব, দীর্ঘ দুইটী আ; হ্রস্ব, দীর্ঘ দুইটী ই; হ্রস্ব, দীর্ঘ দুইটী উ রাখিবার আবশ্যক হয় না। আবার পৃথক্ পৃথক্ গুলির জন্য পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ যদি করা যায়, তাহা হইলে একটী হ্রস্ব 'আ', একটী হ্রস্ব 'এ', একটী হ্রস্ব 'ও' গড়িবার আবশ্যক হয়। একার সম্বন্ধে যেমন দৃষ্টান্ত দিয়াছি, ওকার সম্বন্ধেও তেম্নি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। আর হ্রস্ব-ই কি, দীর্ঘ-ই কি, ঋ, ঌ, মোটেই ত আর বাঙ্গালা বর্ণমালায় থাকিতে পারে না।

ঊকার এবং ওকারেরও ঐদশা। অই বা ওই এবং অউ বা ওউ লিখিলে ঐকারের এবং ঔকারের কাজ ঠিক চলিয়া যায়। শুধু চলিয়া যায়, এমনই বা কেন বলিতেছি, চলাই ত দেখিতেছি। কেহ বয়ে ঔকার দিয়া বৌ লেখেন, কেহ বা লেখেন, বউ; উভয় স্থলেই লেখক বিদ্বান্। তবে দুই প্রকার বানান হয় কেন? ইহার ব্যবস্থা আবশ্যক, প্রতিকার হওয়া আবশ্যক।

বাঙ্গালা বর্ণমালায় একটী স্বরবর্ণ নিতান্তই আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজী 'ব্যাগ' শব্দ বলিলে ্যা-র যে উচ্চারণ হয়, বাঙ্গালায় সেই উচ্চারণ দিবার আবশ্যক। এখন '্যা' দিয়া যে কাজ সারা হয়, সেই কাজ করিবার একটী বর্ণ চাই। ঁ্যা যদি লিখি, ত মহাগোল। আমরা য-ফলা আকারের মাথায় ঁ দিয়া ঁ্যা লিখিলাম, এই ত বিতিকিচ্ছি। কেহ হয় ত, আরও বিতিকিচ্ছি করিয়া অ-কারের গায়ে য-ফলা আকার দিয়া তাহার মাথায় ঁ দিয়া ঁ্যা লেখেন; যথা—অ্যাঁ। সংপ্রতি 'এ' এই অক্ষরকে দুই কাজ করিতে হয়। বয়ে একার, টয়ে আকার

দিলে, কলিকাতার লোকে পড়ে—ব্যাটা। নদীয়া জেলার লোকে পড়ে—বেটা। তবেই দেখ, একটী যা চাই।

আরও একটী স্বরবর্ণ চাই। হয়, 'আমি' এই শব্দে যে আকার আছে, সেই আকারের পরিবর্ত্তে 'অ' লিখিয়া কাজ সারিতে হয় এবং তাহাকে এখন আমরা যেমন 'অ' বলি, তাহার পরিবর্ত্তে 'আমি'র আকারের যে উচ্চারণ, সেই অনুসারে উচ্চারণ করিতে হয়; না হয়, 'অ'কে "অ" বলিয়া একটী হ্রস্ব-আ তৈয়ার করিয়া লইতে হয়।

আরও আছে। বাঙ্গালায় এক রকম অর্দ্ধ ই বা অর্দ্ধ উ আছে, তাহারও অনুরূপ বর্ণ থাকা আবশ্যক। চা'ল, ডা'ল ইত্যাদি অনেক শব্দে সেই অর্দ্ধ-ই-কার এবং অন্যান্য শব্দে অর্দ্ধ উ-কার প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

উপরে যে সব কথা বলা গেল, এইবার তাহার সংগ্রহ করা যাউক। (১) সংস্কৃত বর্ণমালার স্বরবর্ণগুলি লইলে বাঙ্গালা বর্ণমালার কাজ ঠিক চলিতেছে না। (২) বাঙ্গালায় যে যে স্বরধ্বনির প্রয়োগ হয়, তাহার তালিকা দিতেছি;—

হ্রস্ব অ, „ — অকারের চলিত উচ্চারণ বদলাইয়া হ্রস্ব-আকারের উচ্চারণ অনুসারে অকারের উচ্চারণ করিলেই এ অভাবের পূরণ হইতে পারে।

আ

ই

ঈ

উ

ঊ

হ্রস্ব এ, দীর্ঘ এ — এই দুইয়ের মধ্যে একটীর জন্য একটী নূতন বর্ণ গড়িতে হইবে।

যা — এই উচ্চারণের একটী বর্ণ চাই। ঐ আমাদের অনর্থক আছে ঐকারের উচ্চারণ এইরূপ করিয়া লইলে হয় না?

অ — এখন ইহার যেমন উচ্চারণ, তাহা যদি বদলাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে 'ঔ' এই মূর্ত্তি দিয়া চলিত অ-কারের কাজ হইতে পারে। কেননা, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ঔ বাঙ্গালায় অনর্থক আছে।

অর্দ্ধ ই বা অর্দ্ধ উ — বর্ণ আবশ্যক; চাল নাই লিখিলে এখন বুঝা যায় না যে, লেখকের প্রকৃত অভিপ্রায় কি; স্বরের চাল নাই কি রন্ধনের চাল নাই?

এইগুলি হইল, বাঙ্গালার স্বরবর্ণ। সংস্কৃত বর্ণমালার উচ্চারণ-স্থানের ক্রম-পরম্পরা অনুসারে সংস্কৃত স্বরগুলি সাজান আছে। বর্ণমালা-রহস্য নামক প্রবন্ধে ইহা দেখাইয়াছি। বাঙ্গালায় সেরূপ ক্রম অবলম্বন না করিলেও চলে। আমার মনে হয় যে, বাঙ্গালার স্বরবর্ণ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে।

প্রথম শ্রেণী,—দেড়চা। আ হ্রস্ব, দীর্ঘ ভেদে দুইটী।

দ্বিতীয় শ্রেণী,—চেপ্টা। ই, এ, যা; হ্রস্ব, দীর্ঘ ভেদে ছয়টী।

তৃতীয় শ্রেণী,—গোল। উ, ও, অ। হ্রস্ব, দীর্ঘ ভেদে ছয়টী।

চতুর্থ শ্রেণী,—অর্দ্ধস্বর। একটী।

বাঙ্গালা ভাষায় এই পনরটী হইল স্বরবর্ণ। অনুস্বার, বিসর্গ আছেই। স্বরবর্ণের ভিতর ইহাদিগকে ধরিতে চাও, ত সতরটী স্বর হইবে আর এই সঙ্গে চন্দ্রবিন্দুকেও লইলে আঠারটী হইবে।

আর যদি হ্রস্ব, দীর্ঘের পৃথক্ মূর্ত্তি না রাখিয়া উচ্চারণ-সম্বন্ধে কোন নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে উপরি লিখিত চারি শ্রেণীতে, হইবে আটটী স্বরবর্ণ। অনুস্বার, বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু সমেত ধরিলে হইবে এগারটী।

শুধু স্বরবর্ণ ধরিয়া বিচার করাতে দেখা গেল

যে, সংস্কৃত বর্ণমালার স্বরবর্ণগুলি লইলে বাঙ্গালা বর্ণমালায় স্বরবর্ণের কাজ চলে না। এক স্বরবর্ণ সম্বন্ধেই বাঙ্গালায় পৃথক্ বর্ণমালা আবশ্যক, ইহা দেখা গেল। ঠিক কিনা?

ব্যঞ্জন বর্ণ।

এইবার ব্যঞ্জন বর্ণের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। ক হইতে ম পর্য্যন্ত সকল বর্ণই বাঙ্গালায় আবশ্যক হয়। ইহার মধ্যে কেবল ঙ, ঞ এবং ণ এই তিন বর্ণ পৃথক্‌রূপে বা স্বতন্ত্র ভাবে বাঙ্গালায় চলে না। ঙ, ঞ, এই বর্ণের কাজ ং-অনুস্বারেই চলিয়া যায়। ঞ-য়ের কাজ দন্ত্য ন করে। মূর্দ্ধন্য ণ-কারে ট, ঠ, ড, ঢ যুক্ত হইলেই মূর্দ্ধন্য ণ য়ের প্রকৃত উচ্চারণ কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু বোধ হয় যে, মূর্দ্ধন্য ণ উঠাইয়া দিলেও বাঙ্গালা উচ্চারণে বিশেষ ক্ষতি অনুভব হয় না। ন-কারেই সর্ব্বত্র কাজ চলিতে পারে।

বিদ্যাসাগর বাঙ্গালায় য ধরিয়াছেন, আবার একটা য় বাড়াইয়াছেন। প্রয়োজন কিছু দেখি না। বর্গীয় জ থাকিলেই এ 'য'-য়ের কাজও সমান চলিয়া যায়। কেননা, জ এবং য উচ্চারণে ঠিকই এক। তাহাই যদি হইল, তবে এক উচ্চারণের নিমিত্ত দুইটা মূর্ত্তি রাখিয়া অর্থাৎ দুইটা বর্ণ স্বীকার করিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে বিব্রত করা কেন?

য় আবশ্যক। ঐ মূর্ত্তিতেই থাকুক, অথবা যকে ঐরূপ উচ্চারণ করিতে শিখাও, ফল একই হইবে। য আর য় দুইটা না থাকিলেই হইল। র, ল ঠিক আছে। অন্তস্থ য় যেমন আবশ্যক, অন্তস্থ বএরও তেমনি আবশ্যক। বর্গীয় ব এবং অন্তস্থ ব, বাঙ্গালায় একই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করায় আমাদিগকে অনেকস্থলে বিব্রত হইতে হয়। 'ওয়াসীল' এই শব্দের 'আসীল' এই অংশ টুকু বাদ দিলে যেটুকু থাকে, সেই টুকুতে অন্তস্থ-ব-এর প্রকৃত উচ্চারণ পাওয়া যায়। সেই উচ্চারণ যখন বাঙ্গালায় চলিত আছে, তখন তাহার অনুরূপ একটী বর্ণও আবশ্যক। এইটী গাড়য়া লইতে হইবে।

শ, ষ, স, এই তিনটীর বাঙ্গালায় থাকিবার প্রয়োজন নাই। স্থানশব্দে দন্ত্য-সএর যে উচ্চারণ, দন্ত-সকে সেই উচ্চারণে উচ্চারিত করিয়া লইলেই ঠিক হয়। তদ্ভিন্ন আর একটী 'শ' আবশ্যক। তালব্য শয়ের মূর্ত্তি ইচ্ছা হয় তাহাই লও, মূর্দ্ধন্য ষয়ের মূর্ত্তি লইতে ইচ্ছা হয়, তাহাই লও। আমার বিবেচনা হয় যে, তালব্য শয়ের মূর্ত্তি বজায় রাখাই ভাল। হ ঠিক আছে। ক্ষ উঠাইয়া দাও, আপত্তি নাই। ড়, ঢ়, বাঙ্গালায় আবশ্যক।

ব্যঞ্জন বর্ণগুলিকে সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালার ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে নিম্নলিখিতরূপে সাজান যাইতে পারে।

ক, খ, গ, ঘ। চ, ছ, জ, ঝ। ট, ঠ, ড, ঢ। ত, থ, দ, ধ। প, ফ, ব, ভ। য়, র, ল, (অন্তস্থ) ব, ড়, ঢ়, হ। ণ, ম। শ, স। ব্যঞ্জনবর্ণ হইল এই একত্রিশটী। ইহা ছাড়া আর একটী ব্যঞ্জনবর্ণ বাঙ্গালা ভাষায় আবশ্যক। ইংরেজী Z যে উচ্চারণ দেয়, মুসলমানদের আমল হইতে সে উচ্চারণ বাঙ্গালায় চলিতেছে। এখন জ-কারের দ্বারা ঐ বর্ণের কার্য্য সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু জ-কারের উচ্চারণ তেমন নহে। তবেই হয়, ঐ উচ্চারণ বাঙ্গালা হইতে উঠাইয়া দিতে হইবে, নতুবা ঐ উচ্চারণের নিমিত্ত একটী বর্ণ গড়িতে হইবে।

বর্ণমালা-প্রকরণে এই সকল বিষয় বিচার্য্য। গাঢ় মনোনিবেশ, অন্তর্দৃষ্টির প্রখরতা, জাতীয় স্বভাব-চরিত্রের অনুশীলন এবং ভবিষ্যতে দূরদৃষ্টি না থাকিলে এই প্রবন্ধের বিশেষ বিচারে কাহারও প্রবৃত্তি হইবে না, সামর্থ্যেও সংকুলান হইবে না। কেন এমন বলিতেছি, তাহার

একটা কারণ দর্শাইবার যোগ্য। সে কারণ এই যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সহিত সংস্কৃত বর্ণমালার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যজ্ঞাদি-ব্যাপারের নিমিত্ত, মন্ত্রাদি-প্রয়োগের নিমিত্ত, উপাসনাদি-ক্রিয়ার নিমিত্ত সংস্কৃত বর্ণমালার স্বরূপ এবং প্রকৃতি সম্যক্‌রূপে অবগত হওয়া বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মী মাত্রেরই আবশ্যক। মাত্রা-সম্বন্ধে অপরাধ, স্বর-সম্বন্ধে অপরাধ সংস্কৃতে সহ্য হয় না। সংস্কৃত বর্ণমালার সহিত সম্যক্ পরিচয় না থাকিলে, সংস্কৃত শাস্ত্রের সহিত পরিচয় অসম্ভব হয়। সংস্কৃত শাস্ত্রের সহিত পরিচয় না থাকিলে বর্ণাশ্রমের সংস্কৃত-ধর্ম্ম কখনই রক্ষিত হইবার নহে। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গালীর উপযোগী করিয়া যদি বাঙ্গালায় বর্ণমালা প্রস্তুত করা যায়, তাহা হইলে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাবলম্বী বাঙ্গালার ধর্ম্মহানি হইবার আশঙ্কা আছে। এখন সংস্কৃত বর্ণমালা বাঙ্গালী পণ্ডিত-নামধারীর কাছেও যে প্রকারে বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলেই আমার কথার সার্থকতা উপলব্ধি হইবে। বাঙ্গালীর ধর্ম্মহানি হইয়াছে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। বাঙ্গালীর কাছে সংস্কৃত বর্ণমালার দুর্দ্দশাই তাহার প্রমাণ।

যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার সংগঠনাদি বিষয়ে যত্নশীল বা চিন্তাযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা আমার দর্শিত উভয় পক্ষেই মনোযোগ বিধান করেন, ইহা আমার একান্ত অনুরোধ।

অতঃপর অবসর-ক্রমে ব্যাকরণ ও অভিধান সম্বন্ধে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রদীপ। *

প্রদীপের দ্বিতীয় সংস্করণ অদ্যকার সমালোচ্য। দ্বিতীয় সংস্করণ বটে; কিন্তু ইহাতে প্রথমটীর সাত আটটী কবিতা আছে; তাহাও আমূল পরিশোধিত; এমন কি নূতন কবিতাও বলা যায়। কবিকৃত অন্য কাব্য "কনকাঞ্জলি" ও "ফুলের" দুইটী কবিতা স্থান পাইয়াছে। অবশিষ্টগুলি নূতন।

সংস্করণ অপেক্ষা সংযোজনই অধিক। তা হউক; সংস্করণ ও সংযোজন সম্পূর্ণ ও সুন্দর। প্রদীপ অধুনা এক অভিনব পদার্থ। প্রদীপের প্রভাও এবার পূর্ব্বাপেক্ষা প্রোজ্জ্বলীকৃত।

প্রথম সংস্করণেই গ্রন্থকার অনেকটা কবি-যশোভাগী হইয়াছেন; সুতরাং প্রদীপের দ্বিতীয় সংস্করণ কিছু বিচিত্র বিষয় নহে। তবে আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য-পাঠকের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে, প্রদীপের দ্বিতীয় সংস্করণ কবির সৌভাগ্যসূচক বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। ইংলণ্ডে কবি কোলরিজকৃত "Christabel" নামক কাব্যের এক বৎসরে তিন বার; এবং টমাস্ কাম্বেলকৃত 'The Pleasures of Hope" নামক কাব্যের চারি বার সংস্করণ হইয়াছিল। তখন ইহাঁদের কবি-যশের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

প্রদীপের দ্বিতীয় সংস্করণের মুদ্রাঙ্কণ অতি শোভনীয় ও সুন্দর। বহু বৎসর মুদ্রাঙ্কণ-কার্য্যে ব্রতী বটে; কিন্তু প্রদীপের দ্বিতীয় সংস্করণের ন্যায় মুদ্রাঙ্কণ এ পর্য্যন্ত কমই দেখিয়াছি। বাঙ্গালী মুদ্রাঙ্কণকারীর মুখোজ্জ্বল হইয়াছে।

প্রদীপ গীতি-কাব্য। তবে "গীত-গোবিন্দ" যেরূপ গীতি-কাব্য, প্রদীপ সেরূপ নহে। এক

* শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

প্রসঙ্গে "গীতগোবিন্দ"; বহু প্রসঙ্গে প্রদীপ। প্রদীপে সপ্তবিংশতিটী প্রসঙ্গ সন্নিবেশিত। বিষয় বিভিন্ন; ভাবও বিভিন্ন। এক একটী ভাবপ্রবাহে এক একটী প্রসঙ্গ; এক একটী প্রসঙ্গে এক একটী কবিতা। ইহা ইংরেজিমতে গীতি-কাব্য; সংস্কৃতমতে নহে। লয়রাগাদিশুদ্ধ শ্লোকবিশেষ এক স্থানে উপনিবদ্ধ হইলে, সংস্কৃতের গীতি-কাব্য হয়। যথা,—পদকল্পতরু, পদামৃতসমুদ্র ইত্যাদি। প্রদীপের কবিতা লয়রাগাদিশুদ্ধ নহে।

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান যুগের কবি ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ, কোলরিজ, কিটস্, সেলি, ল্যাণ্ডর, ব্রাউনিঙ, টেনিসন প্রভৃতির কাব্যই, আধুনিক বঙ্গীয় গীতি-কাব্যাবলীর আদর্শ। এ সব কাব্যের গুণাবলী বহু প্রকার। ভাষা সংযত ও সংস্কৃত; ভাব হৃদয়োদ্দীপক; স্বল্পাক্ষরে বহু-ভাব ব্যঞ্জিত; ভাবপ্রবাহের তলে তলে গূঢ় দার্শনিক তত্ত্বের লীলা-বিন্যাস অধ্যুষিত; সৌন্দর্য্য-সুষমা দূরে দূরে, আড়ালে আড়ালে অবস্থিত; কেবল সুতীক্ষ্ণ সুতীব্র দৃষ্টিরই গোচরীভূত। কবিতা বহু-নৈপুণ্যময়ী। সে নৈপুণ্য পরিমার্জ্জিত ভাবুকের সম্মুখে নূতন ভাবের এবং চিন্তার উদ্দীপনা করিয়া দেয়। সে নৈপুণ্যে শিল্প-কুশলতার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। স্বল্পায়তনে শিল্প-সৃষ্টির অপূর্ব্ব নৈপুণ্য। সে নৈপুণ্যে একাধারে কবির কল্পনা, জগতের নিত্য সত্য ক্রিয়া এবং ভাবময়তার উদ্দীপনা সুশৃঙ্খলায় সু-সম্বদ্ধ।

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান যুগে প্রায় সকল কবি, এইরূপ অভিনব-কাব্য-সৃষ্টিরই অনুবর্ত্তী। তবে কবিতার প্রকৃতি, প্রণালী ও পদ্ধতিতে এবং গঠনে ও সংস্করণে, অবশ্য পরস্পরে ঈষদধিক অসামঞ্জস্য আছে। গ্রীসের অধঃপতনকালে এইরূপ কাব্যসৃষ্টির উৎপত্তি। বায়রণ ভিন্ন পথে চলিয়াছিলেন। বহু-ব্যাপক বিষয় লইয়াই তাঁহার কাব্য। ইংলণ্ডের অনেক সাহিত্য-চর্চ্চী ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রমুখ কবিকুলেরই ভক্ত; বায়রণে বীতশ্রদ্ধ।

অধুনা বঙ্গে এক সম্প্রদায় পাঠকও, বিলাতী সেলি-কিটসের আদর্শে রচিত "প্রদীপ"বৎ কাব্যেরই সম্পূর্ণ অনুরাগী। অক্ষয় বাবুর ন্যায় এক সম্প্রদায় গীতি-কাব্যকার এবং কাব্যকারিণীও উত্থিত হইয়াছেন। কৃতিত্বে কিন্তু সকলে সমান নহেন। কেহ কেহ স্বল্পাক্ষরে বহু ভাব প্রকাশের চেষ্টা করিতে গিয়া "ফ—চু" করিয়া বসেন। *

অক্ষয় বাবুর গীতি-কাব্য,—প্রদীপ, বিলাতী আদর্শেই প্রস্তুত। অক্ষয় বাবু যে ধরণের কবিতা লিখিয়াছেন, তাহার প্রথম পথ-প্রদর্শক কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। দ্বিজেন্দ্র বাবু বিহারী বাবুর, রবি বাবু দ্বিজেন্দ্র বাবুর এবং অক্ষয় বাবু রবি বাবুর পরবর্ত্তী। রবি বাবুই বলুন, আর অক্ষয় বাবুই বলুন, তাঁহাদের কবিতা-রচনার প্রকৃতি বা ছন্দোবন্ধের প্রণালী ইংরেজী কবিকুল হইতে অনুকৃত।

অক্ষয় বাবু গীতি-কবিতায় সিদ্ধ-হস্ত। গীতি-কবিতায় তিনি কবি-যশস্বী। মহা-কাব্য রচনা সম্বন্ধে, তাঁহার শক্তির উপর অনেকেরই সন্দেহ আছে। থাকুক সে সন্দেহ। প্রদীপে কবিতা-গুলি যে ভাবে বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহাতে এক খানি কাব্যেরই আভাস আসে। অক্ষয় বাবু নিজে বলিয়াছেন,—"এই বিন্যাস-নৈপুণ্য রবার্ট ব্রাউনিঙে শিক্ষা; কিন্তু কবিতাগুলি সম্পূর্ণ মৌলিক।"

শত-কণ্ঠে বলি, কবিতাগুলি নানা কারণে তাঁহার নিজস্ব; † তবে কবিতা-রচনার পদ্ধতি

* ফরাসডাঙ্গা চুচুড়া-নিবাসী এক গাঁজাখোর খুব সংক্ষেপেই কথা-বার্ত্তা কহিত। এক দিন তাহাকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে,—"তোমার বাড়ী কোথায়?" সে উত্তর দেয়,—"ফ—চু।"

† এখানে মৌলিক যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, আমি সেই অর্থে "নিজস্ব" শব্দ ব্যবহার করি। আমার "নিজস্ব ও পরস্ব" প্রবন্ধ তাহার প্রমাণ। "Orioin"

বা ছন্দোবন্ধের প্রণালী ইংরেজিরই অনুকরণ প্রদীপের কবিতা,—"রমণী" পড়িলে, ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থের "She was a Phantom" নামক কবিতাটী স্মরণ-পথে উদিত হয়।

রমণীতে আছে,—

"প্রাণান্তক জীবন-সংগ্রামে
তুমি বিধাতার আশীর্ব্বাদ।
নিত্য জয়-পরাজয়ে পাছে পাছে ফিরিতেছ
অঞ্চলে লইয়া সুখ-সাধ।"

এই কয়টী ছত্র পড়িয়া, ওয়ার্ডসওয়ার্থের এই কয়টী কথা মনে আসে,—

"A traveller between life and death;
The reason firm, the temperate will,
Endurance, foresight, strength,
and skill;
A perfect Woman, nobly planned,
To warm, to comfort, and command;"

প্রদীপের "অভেদে-প্রভেদ" কবিতার সৃষ্টি-পদ্ধতি, কোলরিজের "Dejection" নামক কবিতাটী স্মরণ করাইয়া দেয়। ভাব-স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ, সন্দেহ নাই; তবে "অভেদে-প্রভেদে"র মধ্যে মধ্যে "রমণি" সম্বোধন, "Dejection"এর "Oh Lady" সম্বোধনের স্মৃতি-উদ্দীপক।

এইরূপ ইংরেজী কবিতার প্রকৃতি, পদ্ধতি ও প্রণালীর ছায়া প্রদীপের প্রায় সকল কবিতায় পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু আবার বলি, প্রদীপের কবিতাগুলি নানা কারণে তাঁহারই "নিজস্ব"। একটী কবিতার প্রকৃতি-পদ্ধতি সংস্কৃত কবিতার অনুকরণ। প্রদীপের "নিশীথ গীতে" আছে,—

"যা বায়ু তাহার কাছে—
সে বুঝি ঘুমায়ে আছে,
নিয়ে যা গানটী মোর ধীরে ধীরে তার কাছে।
* * * *

অর্থেই বোধ হয় মূল; "Original" অর্থে মৌলিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। "Origin" বা "Original" শব্দে যাহা বুঝায়, মূল বা মৌলিক শব্দে তাহা বুঝায় না।

এ কবিতায় মেঘদূতের যক্ষকর্ত্তৃক মেঘ-প্রেরণের ভাব মনে আসে না কি? এইরূপ জড়ত্বের জীবত্বানুভব কবি-শক্তিরই সীমান্তর্ভূত। সেলির "Ode to the West Wind" নামক কবিতাও তাহার প্রমাণ।

"বিন্যাস-নৈপুণ্য রবার্ট ব্রাউনিঙে শিক্ষা," এ কথায় অক্ষয় বাবুর উদারতারই পরিচয়। সে শিক্ষা হউক; না হইলেও ক্ষতি ছিল না; কিন্তু রবার্ট ব্রাউনিঙের কবি-সীমন্তিনী এলিজাবেথ বারেট ব্রাউনিঙের দুই একটী দোষ প্রদীপের কবিতায় প্রবেশ করিয়াছে। বারেট ব্রাউনিঙের কবিতায় ব্যাকরণ-ভ্রম ও ছন্দোদোষ আছে। অতি বিরল হইলেও, প্রদীপেও সে দোষ ঘটিয়াছে। ব্যাকরণদোষ,—যথা, "তমান্ধ" "স্রোতহীন" "হে মহাযোগী!" ইত্যাদি। তমঃ শব্দ বিসর্গান্ত; অন্ধের সঙ্গে সন্ধিতে তমোন্ধ হইবে। "স্রোতহীন" সম্বন্ধেও ঐ কথা। সম্বোধনে যখন "রাণি" "কল্পনে" "নারি" ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন "মহাযোগিন্" হইল না কেন? সংস্কৃত শব্দে সংস্কৃত সন্ধি, লিঙ্গ, কারক প্রভৃতি মানিয়া চলা উচিত। মতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ,—

"স্বর্গ-চ্যুত, নরক-উত্থিত, নিয়তি-তাড়িত নরমতি।" স্বর্গ-চ্যুতা, নরক-উত্থিতা হইল না কেন? হইলেও কিছু শ্রুতিকটু হইত না। অক্ষয় বাবু অনেক স্থলেই সংস্কৃত সন্ধি, লিঙ্গ, কারক প্রভৃতির নিয়ম মানিয়াছেন। তাই ইহার জন্য অনুযোগ।

ছন্দোদোষের দৃষ্টান্ত দেখাই,—

"ঐ দূরে ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী
তুলিয়া কোমল দেহ খানি
ছড়ায়ে মানের আধ-বাণী।"
* * * *

"ছড়ায়ে মানের আধ-বাণী"তে আসিয়া বীণার তার ছিঁড়িয়াছে। তার-ছেঁড়ার মর্ম্মভেদী স্বর বড়ই কষ্টকর।

"একবার ভাঙ্গাইয়া ঘুম,
চুম্বি নিমীলিত নয়ন-কুসুম,"

দ্বিতীয় ছত্রে ছন্দঃপতন হইয়াছে।

দুই একটী কবিতার ছন্দোবন্ধে শ্রুতি-কঠোরতা আছে। দৃষ্টান্ত দিই,—

"পাড়ে পাড়ে চকা চকী ব'সে আছে দুটী দুটী;
বলাকা মেঘের কোলে ভাসে;
কচিৎ গ্রাম্য বধূ শূন্য কুম্ভ লয়ে কাঁধে
তরুশ্রেণী তলা দিয়া আসে।
ক্বচিৎ অশ্বত্থতলে ভিজিছে একটী গাভী
টোকা মাথে যায় কোন চাষী।"

ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির পদার্থ লইয়া সহজ ভাষায়, সোজা কথায় কবিতা লিখিয়াছেন। কিন্তু সে ছন্দোবন্ধ কেমন সুমিষ্ট! সে ভাব কেমন গভীর! প্রদীপের স্থানে স্থানে ছন্দোবন্ধে স্বেচ্ছাচারিতাও আছে।

প্রদীপের আদ্যন্তে সুন্দর, সুমার্জ্জিত, সুমিষ্ট শব্দসংযোগই দেখিতে পাই। তাহার ভিতর "লট-পট্‌," "ঝোপে-ঝাপে" গ্রাম্য শব্দ প্রয়োগ শ্রুতিসুখকর নহে। "আবাহন" কবিতায় "যত্ন-শ্রম" "পরাক্রম" "যাগ-যজ্ঞ কর্ম্ম" "শিক্ষা দীক্ষা" "ভক্তি জ্ঞান" প্রভৃতি সুরুচিব্যঞ্জক শব্দসারে হত্যা-আত্মহত্যা এ অরুচিব্যঞ্জক বাক্য মিশিল কেন? শব্দ-প্রকৃতির প্রয়োগ দোষ।

প্রদীপের এ সব দোষ অবশ্য গুণানুপাতে ধর্ত্তব্যই নহে। "একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষিবাঙ্কঃ।" কবি কাম্বেলের গীতি-কবিতায় দুই একটী সামান্য ব্যাকরণদোষ আছে; কিন্তু সেই কবিতা এমনই প্রাণময়ী, এমনই উদ্দীপনাশালিনী; এমনই তাহার ছন্দোবন্ধের তেজস্বিতা এবং ভাবের প্রগাঢ়তা যে, পাঠক তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া, সে ব্যাকরণের দোষগ্রহে অবসরই পায় না। কাম্বেলের কাব্য-গুণ, প্রদীপে প্রচুর।

অক্ষয় বাবু প্রকৃত কবি; তাঁহার "প্রদীপ"ও প্রকৃত কাব্য। আমেরিকার দার্শনিক কবি এমার্‌সন বলিয়াছেন,—"কবির গান কবির তন্ময়ত্বের পরিচায়ক; কিন্তু দার্শনিকেরও ভাব্য।" প্রদীপের যে কোন কবিতা তুলিয়া এ কথার প্রমাণ করিতে পারি।

"ক্ষুদ্র বন-ফুল-বাসে,
সারাটা বসন্ত ভাসে;
ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিমূলে দুলে প্রলয়-প্লাবন;
ক্ষুদ্র শুকতারা কাছে,
চির ঊষা জেগে আছে;
ক্ষুদ্র স্বপনের পাছে অনন্ত ভুবন।"

ক্ষুদ্রত্ব-মহত্ত্বের এ সম্বন্ধতত্ত্ব, দার্শনিকেরও ভাব্য বিষয় নহে কি?

জোরওয়াষ্টার বলেন,—"পরোক্ষ পদার্থের প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতি দেখান; কবির কার্য্য;" আর বেকন বলেন,—"বস্তু-দর্শন-জাত হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা প্রকটনই কবির কার্য্য।" ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মুক্তকণ্ঠে বলিব, অক্ষয় বাবু কবি। তিনি গ্রন্থের সূত্রপাতে 'উপহার" শীর্ষক কবিতায় নিরাশার তপ্ত শ্বাস ফেলিয়া লিখিয়াছেন,—

"গীত অবশেষে নিশ্বসিল কবি
বল কি গায়িব আর—
মরমের গান ফুটিল না ভাষে,
বাজিল না হৃদি তার।"

এ আকাঙ্ক্ষা-অতৃপ্তির প্রকটনেও কবিত্ব-শক্তির পরিচয়; কিন্তু কবির এ নিরাশ-বাণী নিরর্থক। যদিও প্রদীপের দুই এক স্থানে ভাববিকাশে দুরূহতা ঘটিয়াছে; কিন্তু তাঁহার সকল কবিতায় হৃদয়ের পূর্ণ ছবি যে সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহা তত্ত্বদর্শী কাব্যামোদি-মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

নিজ কর্ম্মদোষে পরিত্যক্ত প্রিয় পরিজনের পুনর্মিলনে কি ভাবোচ্ছ্বাসের উদ্রেক হয়, তাহার এক পূর্ণ চিত্র দেখিয়াছি, সংস্কৃত কাব্য "অভি-

জ্ঞান-শকুন্তলে” আর দেখিলাম, বাঙ্গালা কাব্যে প্রদীপের “পুনর্মিলন” কবিতায়। ইহ-সংসারে সর্ব্ব সুখৈশ্বর্য্যে ডুবিয়াও আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি নাই। বুদ্ধ-চরিত্রে তাহার পূর্ণ বিকাশ। অক্ষয় বাবু সে অতৃপ্তির অশরীর আর্ত্তনাদের সুবিশাল চিত্র আঁকিয়া দেখাইয়াছেন,—প্রদীপের কবিতা—“জীবন-সংগ্রামে।” অধিক স্থান পাই নাই; নতুবা দেখাইতাম, সে কি অপূর্ব্ব সুবিশাল চিত্র!

স্থান নাই; নতুবা দেখাইতাম, প্রকৃতির অন্তস্তলে কবির কি অন্তর্ভেদিনী অন্তদৃষ্টি; দেখাইতাম, স্বভাব-বর্ণনে তিনি কিরূপ শক্তিশালী; বুঝাইতাম, রসময়ী ভাষা-লীলায় দার্শনিক তত্ত্বের কি প্রাণোন্মাদিনী উত্তেজনা। তাঁহার কবিতার একটী তুলিয়া একটী রাখিবার নহে। মোক্ষমুলর বলেন,—বিজ্ঞান সার্ব্বজনিক; কবিত্ব জাতীয়ত্বের পরিচায়ক। অক্ষয় বাবুর বিজ্ঞানতত্ত্ব সার্ব্বজনিকত্ব এবং কবিতার ভাবনিবহ জাতীয়ত্বের নিদর্শন।

“তপনের রশ্মি-বলে চলে যথা গ্রহগণ।”

“লুটিছে বরবালীলা শুভ্র উর্ম্মিধার।”

এ সব বিজ্ঞানতত্ত্ব সার্ব্বজনিক নিশ্চিতই।

“মাঠে নব শ্যাম ক্ষেতে কচি ধান গাছগুলি
মাথাগুলি জাগাইয়া আছে।
কোলেতে লুটিছে জল টল্‌মল্ থল্‌থল্,
বুকে বায়ু থর থর নাচে।”

এ সব ত জাতীয়ত্বের পরিচয়।

ইংরেজি কবিতা-রচনার প্রণালী ও পদ্ধতি, প্রদীপের কবিতায় অনুকৃত বটে; কিন্তু হিন্দুর পুরাণে, তন্ত্রে ও দর্শনে কবি দৃষ্টিহীন নহেন। প্রত্যেক কবিতায় তাহার প্রমাণ।

“নিজ-করে গড়ে ও প্রতিমা,
নিজে বিধি মুগ্ধ নেত্রে চাহি।”

এ ত পৌরাণিক তত্ত্ব।

“এস, ভেদি ব্রহ্মরন্ধ্র,
হে আনন্দ—ভূমানন্দ।
উৎপাটিয়া মর্ম্মস্থল
সদ্য রক্তে ঝল্ ঝল্—
এস আত্ম-বিনাশিনি, পরার্থ জীবিতে
সত্য শিবে, সৌন্দর্য্য সম্মিতে।”

এ ত তান্ত্রিক তত্ত্ব।

“প্রকৃতির অবিকৃতি পুরুষ হৃদয়ে”

এ ত দার্শনিকতত্ত্ব।

অলঙ্কারবিন্যাসেও কবির কৃতিত্ব পরিচয় পদে পদে,—

“রমণি রে, সৌন্দর্য্যে তোমার
সকল সৌন্দর্য্য আছে বাঁধা,
যেন বিধাতার দৃষ্টি জড়িত প্রকৃতি সনে;
দেব-প্রাণ বেদ-গানে সাধা।”

কি সুন্দর উপমা!

“জগতের দুখ, নাথ, যত তুচ্ছ ভাব
তত তুচ্ছ নয়।
কে জানে, প্রলয়ে কবে এই বিশ্ব ধ্বংস হবে,
হের, নিত্য সহে প্রাণী সে দূর প্রলয়।”

কবি-হৃদয়ের কি প্রাণোন্মাদিনী সর্ব্বতোমুখী সহানুভূতি। প্রকৃতির জড়ে জীবে কবির হৃদয়ে সহানুভূতি সহজাতা।

আর স্থান নাই; আক্ষেপ সম্পূর্ণই রহিল, পূর্ণকৃতিত্ব বুঝাইতে পারিলাম না। তবে শেষ কথা বলিয়া রাখি,—প্রকৃতির স্থূল দেহ ভেদ করিয়া তদীয় অন্তরাত্মাবিকাসের নিয়তই চেষ্টা যদি কবির হয়, তাহা হইলে বলিব, অক্ষয় বাবু কবি। যেজীবনী-শক্তিতে এবং কারণবশে প্রকৃতির স্থিতি, তাহার অন্বেষণই যদি কবির কার্য্য হয়, তাহা হইলে বলিব, অক্ষয় বাবু কবি। প্রদীপ বঙ্গসাহিত্যে গীতি-কাব্যের উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিল। প্রদীপ বঙ্গ-সাহিত্যের এক দিক উজ্জ্বল করিয়া, চির-প্রজ্বলিত থাকিবে।

শ্রীবিহারিলাল সরকার।

জন্মভূমি।

৪র্থ ভাগ। } ফাল্গুন। ১৩০০। { ৩য় সংখ্যা

চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত।

সংসারে যখন কিছুই 'চিরস্থায়ী' নয়, তখন একটা বৈষয়িক বন্দোবস্তকে 'চিরস্থায়ী' বলা ব্যাকরণ-দুষ্ট না হইলেও, ন্যায় বা "লজিক" বিরুদ্ধ বটে। তবু, বৈষয়িক হিসাবে, কথাটা না ব্যবহার করিলেও চলে না। বন্দোবস্ত-কর্ত্তা, বন্দোবস্ত-কর্ত্তার বংশাবলী, জাতি, ব্যবসায় ও রাজ্যপাট যতকাল বজায় থাকে এবং তাহার সহিত বন্দোবস্ত-গ্রহীতা, তাহার উত্তরাধিকারী ও বন্দোবস্তের বিষয়ীভূত বস্তু, যতকাল বিদ্যমান থাকে; অন্ততঃ ততকাল "চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত" 'চিরস্থায়ী' ন্যায়-ধর্ম্মানুসারে চিরস্থায়ী হওয়া উচিত। চিরস্থায়িত্বের এই অর্থেই, বোধ হয়, সরকার বাহাদুর কর্ত্তৃক, জমিদারের সহিত জমিদারী সম্পত্তির চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত হয়।

অতি সাধারণ এবং অপেক্ষাকৃত অল্পদিনের ঐতিহাসিক কথা; অতএব ইতিহাসের অতি অমনোযোগী পাঠকেরও মনে থাকা সম্ভব,—ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়ে, লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে, ইংরেজ-রাজ কর্ত্তৃক জমিদারের সহিত জমিদারী সম্পত্তি ও স্বত্বের চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত হইয়াছিল খৃষ্টীয় ১৭৯৩ সালে; আর সেদিন খৃষ্টীয় ১৮৯৩ সাল গত হইয়া গিয়াছে; অতএব এই চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের বয়ঃক্রম এখন একশত বৎসর অতীত হইয়া একশত এক বৎসরে পড়িয়াছে। যাহা চিরস্থায়ী, তাহার পক্ষে একশত বৎসর কাল আর অধিক কি? অত্যল্পই মাত্র সময় বটে;—কাল-স্রোতে এক শতাব্দ একটা সংখ্যা-চিহ্ন-মাত্র। কিন্তু, এ চিহ্নটা এখন আর খুব দীর্ঘ-জীবী মানুষেরও জীবনকাল বা বয়ঃক্রম-সমষ্টি সাধারণতঃ "নাগাল" পায় না; একশত বৎসরের মধ্যে মনুষ্যবংশের একাতীত পুরুষ অতীত হইয়া বহু পুরুষের বাজার বসে। বিশ্বে বহু কর্ত্তন, পরিবর্ত্তন ও সংযোজন হয়। শত বৎসরের প্রত্যক্ষ-স্মৃতি 'সুদূর-পরাহত'; শত বর্ষের ঐতিহাসিক স্মৃতিও কম কুয়াসাময় নহে। দৃষ্টান্ত—এই চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের ইতিবৃত্ত নিজেই। শত বৎসরের মধ্যেই উহার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সরকার-পক্ষ করেন উহার এক ব্যাখ্যা; জমিদার-পক্ষ করিয়া থাকেন ব্যাখ্যা বিভিন্নরূপ; রায়ত-পক্ষের নিজের নিজস্ব ব্যাখ্যা অবশ্য কিছুই নাই;—নিয়তি বশে এ দেশীয় রায়ত নির্ব্বাক; চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তে রায়তি অধিকার 'অজ্ঞাত

পঙ্কের' আবৃত অঙ্ক,—বীজগণিতের অজ্ঞাত রাশি। পরিজ্ঞাত রাশির অনুপাতে অঙ্ক কষিয়া ঐ অজ্ঞাত-রাশির রহস্য-নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে এই অঙ্ক কষিয়া থাকেন; অতএব অঙ্ক-ফল এক হয় না; আগা-গোড়া অমিল হয়;—পরস্পরে পৃথক্ পৃথক্, বিপরীত ও বিরোধীই হইয়া থাকে।

এমনতর অবস্থায় একশত বৎসর বয়স্ক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আজ এক বিন্দু আলোচনা করা অন্যায় না হইতে পারে। কিন্তু আমাদের এ আলোচনা—আলোচনাই। আসল তত্ত্বের আবিষ্কার—যদি তাহা কখনও সম্ভব হয়, কারিকর লোকদিগের কর্তৃকই সম্ভাবিত হইবে। বিশেষতঃ যাহা ঐতিহাসিক এবং রাজ-নীতিক, বৈষয়িক-পণ্ডিত এবং ব্যবহার-ব্যবসায়ীদিগেরই তাহা বিতর্ক, বিতণ্ডা ও বিবাদের বিষয়, তাহার প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিতে বসা আমাদের পক্ষে বিড়ম্বনাও বটে; অতএব আমরা সেদিক দিয়াও যাইব না; অগ্রেই অঙ্গীকার করিলাম।

বঙ্গে চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের সময়ে দেশের এবং ইংরেজ-রাজত্বের অবস্থা কিরূপ ছিল,—জমিদার ব্যক্তি কে,জমিদারী বস্তু কি এবং রায়তি স্বত্বের রহস্য কি প্রকার,—পরন্তু, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃতি, পরিণতি, পূর্ব্ব অঙ্কুর এবং পরবর্ত্তী বিকাশ ও বিবর্ত্তন কীদৃশ,—তথা, উহার ঐতিহাসিক অঙ্গ এবং রাজনীতিক ও অর্থব্যাবহারিক ফলাফল কেমন আর বর্ত্তমান সমস্যা কি,—এই সকল বিষয়, অতিমাত্র সংক্ষেপে, এই প্রবন্ধে অল্প-বিস্তর আলোচ্য। বিষয় অতি বিস্তৃত ও বৃহৎ, জন্মভূমির স্থান সীমাবদ্ধ; —সুতরাং আমরা উহার সকল অঙ্গোপাঙ্গের সমান আলোচনা করিতে পারিব, এমন প্রত্যাশা অবশ্যই কেহ করিবেন না। পক্ষান্তরে নিরীহ ও নিরপেক্ষ ইতিহাস-অধ্যায়ীর নিরপেক্ষতার আলোকে বা অন্ধকারে (কেননা, ভ্রম-প্রমাদ পদে-পদেই সম্ভব) এ আলোচনা করা যাইবে। কোনও পক্ষের বা কোনও স্বার্থের সমর্থন বা প্রতিবাদ করা এ আলোচনার উদ্দেশ্য নহে।

যাউক। দেখা চাই, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমকালে, একশত বৎসর পূর্ব্বে কিরূপ ছিল—রাজার, রাজ্যের, দশের এবং

দেশের অবস্থা।

মোগল-সাম্রাজ্য অবসন্ন,—তাহার প্রায় অবসান হইয়াছে,—মোগল-বংশ অন্তর্জ্জলী কূপে পা দিয়াছে,—কেবল কবরস্থ করিলেই হয়। মোগল সাম্রাজ্য শত দিকে শত শত খণ্ডে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন; স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতীয় বলবান্ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহা ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া লইয়াছে। মোগল-সাম্রাজ্য শতধা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু মুসলমান-রাজত্ব তখনও বিলুপ্ত হয় নাই; মার্ত্তণ্ড মারহাটা-বিক্রমও তখন তীব্রতেজে তেজীয়ান্। বিপুল রাজ্যপাট, সুশিক্ষিত সৈন্য ও অক্ষুণ্ন স্বাধীনতার অধীশ্বর তখনও তাঁহারা। সিন্ধিয়া, হোলকার-আদি তখনও ভারতের ভাগ্যনির্ণয়ের অধিনায়ক। মোগল-সামর্থ্য সংহারপুরে গিয়াছে; কিন্তু মোসলেম-শক্তি আর্য্যাবর্ত্তে ও দক্ষিণাপথে সতেজ। (খৃঃ) ১৭৮২ সালে হয়দার আলির মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু তস্য পুত্র সুলতান টিপু তীব্র তড়িৎবেগে সমরানল ছুটাইতেছেন,—অনল অসহ্য অদম্য, তাহা সংবরণ নিবারণ বা নির্ব্বাণ করিতে ইন্দ্রজিৎ ইংরেজও তখন অক্ষম; টিপুর তুষানলে তেজীয়ান্ ইংরেজের নশ্বর তরুণ রাজ্যতরু জর জর হইতেছে,—ইংরেজ-বাহিনী পতঙ্গবৎ সে পাবকে পুড়িয়া মরিতেছে। লক্ষ্ণৌয়ে নবাব—উজীর রাজত্ব করিতেছেন; হায়দ্রাবাদে বেরারে স্বাধীন-রাজ্য, নবাবী মেজাযত। কর্ণাট, ফরাকাবাদ, ত্রিবাঙ্কোর, তাঞ্জোর প্রভৃতি প্রকৃত বলশালী;—তখনও সম্পূর্ণ স্বাধীন;

কোথায়ও মুসলমান নবাব, কোথাও বা হিন্দু-রাজা রাজদণ্ড চালনা করিতেছেন। বিচ্ছিন্ন মোগল-সাম্রাজ্যের খণ্ড উপখণ্ড উপভোগার্থে অনেকেই অভিলাষী, অগ্রসর, উদ্‌গ্রীব। কিন্তু মোগল-রাজ্যলক্ষ্মী সর্ব্বাঙ্গীন ঠাটে ইংরেজ-শিবিরে প্রবেশ করিয়াছেন; ইংরেজের টেবিলে খানা খাইতেছেন; ইংরেজী-অশ্বে অষ্টপ্রহর ছুটিয়া ভারতের নানাদিগ্‌দেশে ইংরেজের বিজয়-পতাকা উড়াইতেছেন। ভারতে ইংরেজরাজ্য অঙ্কুর হইতে অনেক দূর উত্থিত, তাহা তরুণ-বৃক্ষে পরিণত, আত্ম-তেজে তেজীয়ান্, অনমনীয়;—ইংরেজের ইঙ্গিতে, আনুকূল্যে ও অনুগ্রহে, তখন কত লোক রাজ-ঐশ্বর্য্য পাইতেছে, রাজা হইয়া যাইতেছে। কোম্পানী-বাহাদুর বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী পাইয়াছেন; মাল খাজনা আদায়-তহশীল ও দেওয়ানী কার্য্য করিতেছেন; কিন্তু তখনও দেশের ফৌজদারী শাসন নবাবের হস্তে। মুর্শিদাবাদ-মশনদে নবাব নাজিম হীনবল, কিন্তু তখনও একেবারে হতমান হন নাই। মান্দ্রাজের উত্তর-সরকারের শাসনভারও ইংরেজের হস্তগত হইয়াছে। ওয়ারণ হেষ্টিংস হতভাগ্য শাহ আলমের সহিত ক্লাইবের সন্ধিসূত্র ছেদন করিয়া ফেলিয়াছেন; দেওয়ান বাহাদুরই দেদীপ্যমান রাজা বাহাদুর। শাহ আলম বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার করস্বরূপ আর এক কপর্দ্দকও পান না; সন্ধি-সর্ত্তের তিনলক্ষ পাউণ্ড ক্লাইব-পেনের এক আঁচড়ে উড়িয়া গিয়াছে। হেষ্টিংস হৃত-সর্ব্বস্ব সম্রাটের নিকট হইতে আলাহাবাদ, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ কাড়িয়া লইয়া নবাব উজীরের হস্তে তখনকার মত বিক্রয় করিয়াছেন। কাশী-অধিপতি চেতসিংহের চেতনাহরণ হইয়া গিয়াছে; অযোধ্যার বেগম বিলুণ্ঠিত-বৈভব। বেনারসে ইংরেজ-রেসিডেণ্ট বসিয়াছেন; রেসিডেণ্টেরই রাজত্ব;—বার্ষিক বেতনমাত্র বার হাজার, কিন্তু বার্ষিক আয় বার লক্ষ। কোম্পানীর কর্ম্মকারক কারপরদাজগণ স্ব স্ব খাতে সর্ব্বত্রই দুই হস্তে দেশের ধনধান্য লুণ্ঠন করিতেছেন। উৎকোচ এবং উপরি পাওনার দিকে প্রায় সকলেরই নজর। কেবল কালেক্টর ও নিম্ন-শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা নহে; কাউন্সিলের মেম্বর পর্য্যন্ত উপহারে, উৎকোচে, বেনামি বাণিজ্যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু কোম্পানীর নিজ কোষে অর্থকৃচ্ছ্র; বাণিজ্যের উপস্বত্ব, ও রাজ্যের রাজস্বেও সমস্ত ব্যয় স্বচ্ছন্দে সঙ্কুলান হইতেছে না। বিলাতে ওয়ারন হেষ্টিংসের শাসন-ব্যভিচারের বিচার চলিতেছে। লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর জেনারল,—কোম্পানী বাহাদুরের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মকারক ও সেনানায়ক হইয়া ভারতে আসিয়াছেন; ভারত শাসন করিতেছেন। বণিক্ কোম্পানী, কমলার কৃপায়, কেবল মাত্র অল্পকাল তখন রাজা হইয়াছেন। চলিতেছিল—বেচা-কেনা-বাণিজ্য; হঠাৎ হইয়া পড়িল—রাজ্য-শাসন, রাজস্ব-আহরণ, প্রজা-পালন। কুমারের কামার-বৃত্তি। কোম্পানীর সাহেব কারপরদাজগণ প্রায় সকলেই বণিক্। বণিক্ বাণিজ্য-পণ্যই বুঝে,—তখন রাজকার্য্য ও রাজস্বের বুঝিবে কি? রাজত্ব-ব্যাপদেশে বাণিজ্য-কার্য্য বিলক্ষণ খর্ব্বই হইল। রাজ্য-বিস্তার ও পররাজ্য-বিজয়,—আত্ম-রক্ষণ বা পরস্ব-লুণ্ঠনের ব্যয় ভারতের সর্ব্বত্র;—আয়ের সর্ব্বপ্রধান আকর—বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যাদির ভূমি-রাজস্ব। কিন্তু, বণিক্-রাজ ভূস্বামি-জনোচিত ভূমি-তত্ত্ব তখনও আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। সুতরাং সুবে বঙ্গের ভূমি তৎকালে 'সজলা সফলা শস্যশ্যামলা' সত্ত্বেও, তাহার উপস্বত্ব কোম্পানীর পক্ষে অনিশ্চিত হইয়া পড়িতেছিল। এখনকার মত, তখন লোকের ভূমি-বুভুক্ষা হয় নাই। দেশে শস্যাভাবও ছিল না। আবশ্যকানুরূপ

ভূমিতে বঙ্গে হলচালনা করিয়া এত শস্য জন্মিত যে, তাহা প্রচুর, প্রভূত। তাৎকালিক শস্য-স্বচ্ছলতা সম্বন্ধে অদ্যাপি জনশ্রুতি আছে যে, এক টাকার ধান্য ক্রয় করিয়া তাহা দুই তিনটা বলদে বহিয়া লইয়া যাওয়া ভার হইত; তবুও বিক্রেতা ক্রেতাকে বলিত, 'তুমি বোধ হয় কম-পরিমিত লইয়াছ; আমার ধান্যরাশি যে যেমন তেমনি আছে; তুমি বহন করিয়া লইয়া যাইবার ভয়ে আমার ধান্যে তোমার গৃহীত ধান্য মিশাইয়া দিয়াছ নাকি?'

তখন রেল ছিল না, এত রাস্তা-ঘাট, হাট-বাটও ছিল না। রপ্তানি-রাহুর গ্রাসে, তাহার অবিরাম ভীষণ নিশ্বাসে দেশের শস্যসম্ভার উড়িয়া যাইত না। স্থানীয় শস্য স্বস্থানেই থাকিত। সুতরাং খাদ্য-শস্য যারপর নাই শস্তা ছিল; মুদ্রাই ছিল তখন বিলক্ষণ মহার্ঘ। সুতরাং হলে-লাঙ্গলে মেদিনী-মাতার সর্ব্বাঙ্গ খনন করিতে হইত না। ভূপৃষ্ঠে বিস্তর উর্ব্বর-ভূমি অনাবাদী পতিত ছিল; আবাদ করিবার আবশ্যক হয় নাই। দেশের অনেকখানি দেহ জলে, বিলে ও জঙ্গলে আবৃত ছিল। বনভূমি নৈসর্গিক শোভায় নয়ন-মন পুলকিত করিত, তাহার বক্ষ খনন করিয়া উদর পূরণ করিবার প্রয়োজন তখনও কাহারও হয় নাই। তখন ঘৃতের সের ছিল দুই আনা; যব, গম, চাউলের মণ ছিল দশ বার আনা; তখন আট আনা মাসিক মাহিনায় জন-মজুর পাওয়া যাইত। এক কথায়, তখন মুদ্রাই ছিল মহার্ঘ, দ্রব্যজাত ছিল সস্তার শস্তা, সুতরাং শ্রমও ছিল শস্তা।

মুদ্রা মহার্ঘ্য। কিন্তু কোম্পানী বাহাদুরের দরকার মুদ্রারই তখন বেশী। সমরের ব্যয়, রাজ্য-বিস্তারের ব্যয়। দেশে দ্রব্যজাত ছিল; কিন্তু তাহা ইচ্ছামাত্র মুদ্রায় পরিণত করিবার মর্ম্মান্তিক মোহ-মন্ত্র তখন ছিল না। রপ্তানিরূপ রাক্ষসের চলা-ফেরা করার সুগম সড়ক ছিল না অগ্রেই বলিয়াছি। বাঙ্গালী বিহারী তখনও একেবারে নির্ব্বীজ হয় নাই; দেশে দস্যু-ডাকা'-তের দৌরাত্ম্যও বিলক্ষণ ছিল। অনেক পথে কোম্পানীর ডাক চলাই দায়। পক্ষান্তরে, দেশে বহু বিস্তৃত উর্ব্বরভূমি অনাবাদী ছিল বটে; কিন্তু তাহা আবাদ করে কে, আবাদ করার প্রয়োজনই বা কি? খাদ্য-শস্যের ত আর অভাব ছিল না। কৃত্রিম সভ্যতানিবন্ধন লোকের তখন অসংখ্য অতিরিক্ত অভাবও আসিয়া জুটে নাই। কৃষক তখন কাপুড়ে ছাতা মাথায় দিতে বা র‍্যাপার উড়াইতে শিখে নাই। ইতর-ভদ্র জন-সাধারণ বাবুগিরির বৃথা ব্যয় হইতে খুব দূরে বাস করিতেন।

এই কারণে এবং উপরি-উক্ত কারণ-পরম্পরায় অপরিমিত আবাদের আবশ্যকতা ছিল না। অপেক্ষাকৃত অল্প ভূমি আবাদ করিয়া যে শস্য হইত, তদ্দ্বারা রাজার রাজস্ব দিয়া, সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়াও অতিথি-অভ্যাগতের সৎকার করিয়া, সাধারণতঃ অনেক শস্য অবশিষ্ট থাকিত, লোকে জঙ্গল ও জলা জমি চাষ-আবাদ করিবে কেন?

একদিকে এই; অপর দিকে তখন গোল-মালের মহল। রাষ্ট্র-বিপ্লবে, তাহার বিবর্ত্তনে বা অভিনব ইংরেজী-বিকাশে, রায়ত জমিদার উভয়েই সন্দিগ্ধ,—শঙ্কিত। রায়ত তাহার জমিদারকেই রাজা বলিয়া বুঝিত; অন্য বা আসল রাজার বড় বেশী ধার ধারিত না। রায়ত কোম্পানী-বাহাদুরকে চিনে নাই; জমিদারও তখন আগন্তুক ইংরেজ-রাজের আচার-ব্যবহারে অভ্যস্ত হন নাই। জমিদার তখন আপন আপন জমিদারির মধ্যে এক একটী ক্ষুদ্র রাজা-বিশেষ। রাজা যখন যিনিই হউন, জমিদারির স্বত্বাধিকার স্থায়ী বা অস্থায়ীই হউক, জমিদারেরা তখন আপন আপন অধিকার মধ্যে একাধিপত্য করিতেন। রায়ত-শাসন ও পালনের রাজদণ্ড

প্রকৃত-প্রস্তাবে তাঁহাদেরই হস্তে ছিল। খাস-বঙ্গে তখনকার প্রবল-প্রতাপ জমিদার ছিলেন—বর্দ্ধমান, নদীয়া, বীরভূম, বিষ্ণুপুর, রাজসাহী ও যশোহরের রাজারা। ইঁহাদের বিপুল-বিস্তৃত জমিদারি ছিল। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারির পরিমাণ অন্নদা মঙ্গলে উল্লিখিত আছে,—

রাজ্যের উত্তরসীমা মুরশিদাবাদ।
পশ্চিমের সীমা গঙ্গা-ভাগীরথী খাদ॥
দক্ষিণের সীমা গঙ্গা-সাগরের ধার।
পূর্ব্বসীমা ধুল্যাপুর বড়গঙ্গা-পার॥

ইহা ভিন্ন ভাগীরথীর পশ্চিম পারে কুবাজপুর নামে একটী বৃহৎ পরগণা কৃষ্ণনগরাধিপের অধিকারে ছিল। ভবানন্দ মজুমদারের সময় হইতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পরেও কতককাল পর্য্যন্ত এই জমিদারী নদীয়া-রাজ্যের অধিকারে ছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১১৮২ সালে। চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত হয় ১৭৯৩ সালে। কৃষ্ণচন্দ্র নবাবী ও ইংরেজী দুই আমলেই জমিদারি করিয়া যান।

চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের অনতিকাল পূর্ব্বে এবং সমকালে দেশের ও জমিদার-জমিদারীর সাধারণ অবস্থা এই। তৎকালে কোম্পানী বাহাদুরের রাজনীতিক ও রাজস্ব-নীতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহাও আমরা কতক বিবৃত করিয়াছি। কিন্তু মুসলমানের বাদসাহী-আমলে জমিদারিতে জমিদারের এবং জোতজমায় রায়তের স্বত্বাধিকার কি পরিমাণে ছিল, ইহার সবিশেষ আলোচনা আবশ্যক; নহিলে অতীতের সহিত বর্ত্তমানের তুলনায় সুবিধা হইবে না। অগ্রে দেখা যাউক, মূলত জমিদার ব্যক্তি কে এবং তাঁহার স্বত্বাধিকারের বনিয়াদ ও বিস্তৃতি বাদশাহী-সময়ে কিরূপ ছিল।

জমিদার।

জমিদার শব্দ, আখ্যা ও পদ * মুসলমান সময়ের সৃষ্টিই বলিতে হয়। এই শব্দের অর্থ, আখ্যার অধিকার এবং পদের প্রভুত্ব ও দায়িত্ব তৎকালে এতটা কাঁচা-পাকা মাল-মশলায় মিশ্রিত হইয়া গঠিত হইয়াছিল যে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া 'জমিদার' কথাটার বিশদ ব্যাখ্যা করা, প্রকৃত প্রস্তাবেই বড় কঠিন। জমিদারের প্রভুত্ব প্রচুর ছিল, প্রতাপও প্রভূত ছিল। কিন্তু সে প্রভুত্বের ও প্রতাপের মূল-ভিত্তি মুসলমান আমলে খুব পাকা ছিল এমন বলা যায় না। বাদশাহী বন্দোবস্তের অনেক বিষয়েরই যেমন গোড়া আল্গা ছিল, জমিদারের সহিত জমিদারি বন্দোবস্তের বনিয়াদও তেমনি আল্গা ছিল; অথচ জমিদারেরা স্ব স্ব এলাকার মধ্যে একাধিপত্য, স্বাধীন-রাজবৎ রাজত্ব করিতেন। তখনকার কাঁচা বন্দোবস্তে জমিদারদের যে প্রভুত্ব ও প্রতাপ ছিল, এখনকার পাকা বন্দোবস্তে, বলা বাহুল্য, তাহার কিছুই নাই। তবুও জমিদারির বনিয়াদ পাকা ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বাহ্নে কোম্পানির কারপরদাজ সাহেবেরা জমিদার-তথ্য ও জমিদারি-সমস্যা সাফ বুঝিতেই পারেন নাই। তখনকার জমিদার ও রায়ত অর্থে অনেক ইংরেজ ইংরেজী "ল্যাণ্ডলর্ড" ও "টেনেন্ট"ই বুঝিয়াছিলেন, এখনও বুঝেন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা তাহা ছিল না এবং এখনও উহা ঠিক তাহাই নহে। কোম্পানীর তাৎকালিক জনৈক যোগ্য রাজস্ব কর্ম্মচারী মিঃ জন হার্ব্বার্ট হারিংটন তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "এনালিসিস" গ্রন্থে লিখেন;—

The Zemindar appears to be a Landlord of a peculiar description, not definable by any single term in our language

"ইংরেজী ভাষায় এমন কোনও প্রতিবাক্য নাই, যাহা দ্বারা এককথায় এদেশীয় ভূম্যধিকারী জমিদার শব্দের অর্থ বোধ হইতে পারে।" বস্তুতঃ ঠিক তাহাই বটে।

* হিন্দু রীতি ও শাস্ত্রানুসারেই এ পদের প্রবর্ত্তন। ন, ল।

হারিংটন তাৎকালিক জমিদারকে ভূম্যধিকারী (Land Lord) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু, অনেক ইংরেজ-লেখক তাহাও করেন না। তাঁহাদের বিবেচনায় জমিদার ভূম্যধিকারী ছিলেন না; ভূমির কর-সংগ্রাহক নবাব-নিয়োজিত রাজকর্ম্মচারী মাত্র ছিলেন। বস্তুতঃ তখনকার জমিদারী বন্দোবস্তের বনিয়াদ ও সর্ত্ত সনন্দ সাধারণতঃ যেরূপ ছিল, তাহাতে এরূপ বিবেচনা যে একেবারেই অন্যায় ও যুক্তিহীন, এমনও বলা যায় না। ফলতঃ প্রথম কল্পে জমিদার কেবল কর-সংগ্রাহক বা তহশীলদার মাত্র ছিলেন বটে; এবং অন্যান্য রাজ কর্ম্মচারীর ন্যায় তাঁহার বহাল-বরতরফও হইত; কমিসন ও নিষ্কর জায়গীরে তাঁহাকে পারিশ্রমিক বেতনও পাইতে হইত; কিন্তু কালক্রমে কার্য্যকুশলতায় বা সরকারী 'খরখাই' প্রভাবে জমিদারের পদ ও জমিদারি-স্বত্ব পুরুষানুক্রমিক হইয়া পড়িয়াছিল; ভূমির কর-সংগ্রাহক ফলিতার্থে ভূম্যধিকারীতেই পরিণত হইয়াছিলেন। জমিদারির উপর তাঁহার ও তদীয় বংশাবলীর দস্তর মত দাবিও দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। বন্দোবস্তের বনিয়াদ যাহাই হউক, ব্যবহারে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা বিলক্ষণই পাকা। তবে বাদশাহদিগের "মেজাজ সরিফ" ও খুসির উপরেই জমিদারের জমিদারি থাকা না থাকা নির্ভর করিত বটে; কিন্তু সে কেবল জমিদারি কেন? জীবনমরণও তখন মনিবের মেজাজের উপর নির্ভর করিত।

স্যর চার্লস উইলকিন্স কর্ত্তৃক তদীয় গ্লোসারিতে জমিদার সম্বন্ধে যাহা উক্ত এবং মাননীয় স্যর এণ্টনী ম্যাকডোনেল কর্ত্তৃক সরকারি মিনিটে যাহা সম্প্রতি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও তাৎকালিক জমিদারি-স্বত্বের পুরুষানুক্রমিক স্থায়িত্বাধিকার অস্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু জমিদারের সহিত সাধারণতঃ বাদশাহী বন্দোবস্তের মূল-ভিত্তি কিরূপ ছিল, এখন দেখা যাউক।

জমিদার ভূমির কর-সংগ্রাহক রূপে নবাব, সুবেদার বা বাদশাহ কর্ত্তৃক নিযুক্ত। যোগ্যতা বা অযোগ্যতা অনুসারে বহাল-বরতরফের অধীন। প্রতি বৎসর রাজ-দরবারে পেশকোষ ও নজরানা দিয়া ফারমান্ বা সনন্দ লইতে বাধ্য। জমিদারের কর্ত্তব্য রায়তের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করা, রায়তকে রক্ষণাবেক্ষণ করা, জমিদারির মধ্যে শান্তিরক্ষা ও সুবিচার করা, রাস্তা-ঘাট ঠিক রাখা এবং আবশ্যক মতে উহার জন্য কর আদায় করা। রায়তের সহিত নিরিখ-আদির নূতন বন্দোবস্ত করার এক্তিয়ার জমিদারের ছিল না। তাহা তোডর মলের সময় হইতে বাদশাহ কর্ত্তৃক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রায়তের সহিতই করা হইত। কানুন অনুসারে জমিদার তাহার রদ বদল করিতে পারিতেন না। কানুন অনুসারে পারিতেন না বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ না করিতেন এমন নহে। যথানিয়মে রাজসরকারে রাজস্ব দাখিল করার জন্য জমিদার দায়ী ও একরারবদ্ধ ছিলেন। একরার খেলাপ হইলে বা রাজস্ব বাকি পড়িলে, জমিদারি ডাক নিলামে বিক্রয় হইত না বটে; কিন্তু যাহা হইত, তাহাও বড় বাঞ্ছনীয় নহে। মাল-খাজানা বাকী পড়িলে জমিদার গ্রেপ্তার হইতেন, কারাগারে কয়েদ হইতেন, কষ্কি খাইতেন, বিবিধ শারীরিক শাস্তির বিষয়ীভূত হইতেন। একা জমিদার নহেন, জমিদারের গোষ্ঠী-গোত্রকেও সময়ে সময়ে এরূপ শাস্তি সহ্য করিতে হইত। কথিত আছে, নদীয়ারাজ, স্বয়ং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, কয়েকবার এইরূপ বিপদে বিরক্ত হইয়াই মুসলমান-রাজ্য উচ্ছেদে কৃতসঙ্কল্প হন এবং শেঠদিগের ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়া তাহার সাধনার্থে কোম্পানীর অর্থাৎ

ক্লাইবের আনুকূল্য করেন। জমিদারকে শারীরিক নির্যাতন ও কারা-ক্লেশ দিয়াও যদি বাকি-বকেয়া আদায় না হইত, তাঁহার জমিদারি অন্যের হস্তে অর্পিত হইত অথবা জমিদারি হইতে মাল-খাজনা ওয়াশীলের জন্য অন্য লোক নিযুক্ত বা অন্য বন্দোবস্ত করা হইত। জমিদার হয় ত শ্রীঘরেই পচিতেন।

জমিদার বেতন পাইতেন "কমিসনে" (কিন্তু সকল স্থলেই যে কমিসন ব্যবস্থা ছিল, এমন বলা যায় না)। কমিসন আদায়ী টাকায় শতকরা ৫৲ হইতে ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া হইত। ইহা ভিন্ন জমিদার নিষ্কর আলতাম্‌গা বা জায়গীরও পাইতেন। জমিদার জমিদারি হস্তান্তর করিতেও পারিতেন; কিন্তু ইহা নবাব-সুবার মঞ্জুরি সাপেক্ষ ছিল। সবিশেষ আদেশ ব্যতীত জমিদারি হস্তান্তর হইতে পারিত না। কার্য্যানুরোধে জমিদারের স্থলে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া রাজস্ব ওয়াশীল করিতে হইলে, জমিদারের গুজরাণার্থে বৃত্তি-বরাদ্দের ব্যবস্থা ছিল। উত্তরাধিকার স্বত্বে স্ত্রীলোক জমিদার ও নাবালগ কার্য্যক্ষম না হওয়া অবধি এরূপ বৃত্তি পাইতেন। জমিদার-অধিকৃত জমিদারির রায়তওয়ারি হিসাব-কিতাব রাখিবার জন্য বাদশাহী হইতে পাটয়ারি ও কানুনগো নিযুক্ত করিবারও ব্যবস্থা ছিল।

একদিকে এই। অপরদিকে জমিদার স্বকীয় জমিদারির মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা। তাঁহার নিজের আদালত ও কারাগৃহ ছিল। দেওয়ানী ফৌজদারী দ্বিবিধ বিচারই তিনি করিয়া অপরাধীর দণ্ডবিধান করিতেন মোকদ্দমার ডিক্রি ডিসমিস দিতেন। দেওয়ানী বিচার করিতেন, তাঁহার দেওয়ান; ফৌজদারীর বিচার করিতেন ফৌজদার। ইঁহাদের দ্বারা অবিচার হইলে জমিদারের নিজের নিকট তাহার আপিল হইত। জমিদার অবিচার করিলে নবাবের নিকট আপিলের ব্যবস্থাও ছিল; কিন্তু সে কার্য্য করিতে প্রায়ই কেহ কখনও সাহসী হইত না। জমিদার নিজের নায়েব-গোমস্তা, রায়ত ও দণ্ডিত আসামীকে আপন আপন কারাগারে বন্দী রাখিতেন; তাহাতে কাহারও কথাটী কহিবার যো ছিল না। কৃষ্ণনগর রাজকোর্টে চোরের বড়ই কঠিন শাস্তি হইত। তাহারা বেত খাইত, বন্দী হইত, বিবিধ শারীরিক সাজা পাইত। কেবল ইহাই নহে, তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া হইত ধান,—এখনও শুনা যায়। এমন কি, ইংরেজ-রাজত্ব কালে, রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের আমল পর্য্যন্তও কৃষ্ণনগরে দেওয়ানী ফৌজদারী মামলার সাবেক দস্তুর বিচার হইত, "ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতে" উক্ত আছে। আমরাও, বড় অধিক দিন নহে, জমিদার ও জমিদারের নায়েব-গোমস্তাদিগকে দেখিয়াছি, তাঁহারা রায়তের দেওয়ানী বা ফৌজদারী নালিশ লইয়া তাহার ডিক্রি-ডিসমিশ ও অপরাধীর অর্থদণ্ড করিয়াছেন। তবে কারাদণ্ডের ব্যবস্থা অনেক কালই উঠিয়া গিয়াছে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও জমিদারের "চুণ-গুদমের" কথা শুনা যাইত। কুঠিয়াল সাহেবদের কারাগৃহের সংবাদ পাওয়া যাইত। কিন্তু সে সব গোপন-কাণ্ড। মুসলমান আমলে রায়তের রায়তি স্বত্ব কিছু ছিল কিনা এবং তাহা কিরূপ ছিল, এখন দেখা যাউক।

রায়ত।

জমিদারের আধিপত্য ও প্রভূত প্রভুত্ব-সত্ত্বেও জমির উপর জোতদার-রায়তের রায়তি-স্বত্ব বিলক্ষণই ছিল বলিয়া বোধ হয়। জমিদারেরা বাদশাহী হইতে যে সব সনন্দ পাইতেন, তাহাতে স্পষ্ট আদেশ থাকিত যে, জমিদার নিরিখবৃদ্ধি করিতে পারিবেন না; রায়তের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট রাজস্বের অধিক এক

কপর্দ্দকও লইতে পারিবেন না; সর্ব্বতোভাবে রায়তের ও রায়তি স্বত্বের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। অভিনব 'আবওয়াব' বা বাজে আদায় এক পয়সাও করিবেন না। রায়তদিগকে সতত সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখিবেন। কাহারও নিষ্কর ভূমিতে কর বসাইবেন না; কোন প্রকারেই হস্তক্ষেপ করিবেন না। জমিদারির উন্নতি-সাধনে নিয়ত নিযুক্ত থাকিবেন; ইত্যাদি। ফারমানে এ সব কথা লেখা থাকিত; জমিদারকেও এ সকল বিষয়ে অঙ্গীকার করিতে হইত, একরার-নামা দিতে হইত। পুনশ্চ যে পরগণার বা চাকলার যত রাজস্ব আদায় করিয়া দাখিল করিতে হইবে, তাহাও ফারমানে লিখিত থাকিত। ফারমানে নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব যেমন প্রায়ই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইত না; রায়তের দেয় রাজস্বের হার তেমনি পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিবার ক্ষমতা জমিদার পাইতেন না। নদীয়া-রাজের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান-ম্যানেজার "ক্ষিতীশ-বংশাবলী" প্রণেতা লিখেন;—

"নির্দ্ধারিত রাজস্বের প্রায়ই হ্রাস-বৃদ্ধি হইত না, পুরুষানুক্রমে প্রায় এক পরিমাণেই থাকিত। রাজা রুদ্রের অধিকার হইতে তাঁহার প্রপৌত্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত ইহাঁদের সকল পরগণার রাজস্ব একরূপ ছিল, ইহা রাজবাটীর কাগজে স্পষ্ট প্রকাশ আছে।"

তবে নজরানা বা পেশকোষ স্বরূপ সময়ে সময়ে নবাব-দরবারে টাকা দিতে হইত বটে; কিন্তু জমিদারেরাও আবার সময়-বিশেষে বাকী-বকেয়ার বিস্তর টাকা "মাফি" পাইতেন। সুতরাং নেহাত অন্যায় আচরণ ও জমিদারের গোপন অত্যাচার ব্যতীত রায়তের রাজস্ববৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না। বঙ্গে ও বিহারে এপর্য্যন্ত বাদশাহী সময়ের যত ফারমান দেখিয়াছি, তাহাতে রায়তি স্বত্বের কথা সর্ব্বত্রই উল্লেখ আছে। পরন্তু জমিদারকে ভূম্যধিকারী বা জমির "প্রোপোরাইটর" মালিক বলিয়াও কোনও ফারমানে অভিহিত হইতে দেখি নাই। জমিদারেরা সচরাচর "চৌধুরী" অভিধানেই ফারমানে উক্ত হইয়াছেন। ভারতচন্দ্রের কাব্য-বিখ্যাত নদীয়া-রাজবংশের আদিপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার, বাদশাহ-সেনাপতি মহারাজ মানসিংহের সেবা করিয়া জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে যে জমিদারি পাইয়াছিলেন, তাহার ফারমানে তাঁহাকে একাধারে জমিদারীর "চৌধুরায়ী" ও "কানুনগুয়ী" ভার দেওয়া হইয়াছিল। মালিকান স্বত্বের কোন কথাই তাহাতে উল্লেখ নাই।

দেবীদয়া অনুসারে, ভবানন্দ মজুন্দারে,
হইয়াছে কানুন-গোই ভার।

জমিদারেরা কোনও ফারমানে মালিক বলিয়া উক্ত না হউন, মালিকান স্বত্ব তাঁহাদের যথেষ্ট ছিল, ইহাও কিন্তু নিশ্চয়। নহিলে তাঁহারা দেবত্তর, ব্রহ্মত্তর, লাখরাজ আদি নিষ্কর ভূমি দান-খয়রাত করিতেন কিরূপে? ফলতঃ জমিদারের স্বত্বাধিকার বড়ই গোলমেলে ছিল। পক্ষান্তরে, তখন পতিত ও অনাবাদী ভূমির পরিমাণ এত অধিক ছিল যে, তাহা আবাদের জন্য ও সৎকার্য্যার্থে দান খয়রাত করাতে কোন আপত্তি উত্থাপন হইত না। এরূপ দান তখনকার বাদশাহ হইতে তাঁহার রাজস্ব-কর্ম্মচারীদিগের প্রায় সকলেই করিতেন। ভূমিদান তখনকার প্রথাই ছিল।

নিষ্কর ভূমিরই যখন এমন স্বচ্ছলতা, তখন করদ ভূমি সম্বন্ধে আর কথা কি? বস্তুতঃ তাহার বিঘ্ন-বিপত্তি, এখনকার মত, তখন কিছুই ছিল না। প্রজাপত্তন করিয়া অনাবাদী ভূমির জোত-আবাদের জন্যই ভূম্যধিকারীরা তখন ব্যস্ত ছিলেন; রায়ত উচ্ছেদ করা সকলেরই স্বপ্নাতীত ছিল। সুতরাং রায়তের দখলি স্বত্বাস্বত্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কিছুই হাঙ্গাম ছিল না। ভূমির রাজস্বই যখন প্রকারান্তরে অপরিবর্ত্তনীয়, তখন ভূমির উপর পাকা স্বত্বাধিকার অধিক আর কি আবশ্যক? তখন কার্য্যতঃ রায়তের দখলি স্বত্ব

ছিল, তবে দখলি স্বত্বের একটা কাগজী ছায়া ছিল কিনা বলা যায় না; কিন্তু তাহা না থাকিলেও কার্য্যত কিছুই আসিয়া যায় নাই, কারণ রায়তকে নিজ জোত হইতে বেদখল হইবার সম্ভাবনাই ছিল না। রায়তই বা দখলি স্বত্বের জন্ম লালায়িত হইবে কেন? উর্ব্বরক্ষেত্রের ত আর অভাব ছিল না। পক্ষান্তরে জমিদারি-ফারমানেই যখন জমিদার মালিক বলিয়া উক্ত হইতেন না, তখন নামে বা নিয়মে রায়তেরই বা কোনও মকররি স্বত্বের উল্লেখ থাকার অবকাশ কোথায়? উপরেই বলিয়াছি, উহা নামতঃ না থাকুক, কার্য্যতঃ ছিল। ফলতঃ অতীত ঘটনার অনুমানে যতটা বুঝা যায়, তাহাতে ভূমি মাত্রেরই মালিকান স্বত্ব তখন কেবল একমাত্র সম্রাটেরই ছিল, অন্যে কিঞ্চিন্মাত্র কর দিয়া এবং নিষ্কর তাহার উপস্বত্ব ভোগ-দখল করিতেন; কার্য্যতঃ তাহার দ্বিতীয় মালিকই ছিলেন।

ভূমির রাজস্ব-নিরিখ বিঘা প্রতি গড়-পড়তা দুই আনা হইতে চারি আনার অধিক ছিল না। অনেক স্থলে বাস্ত-ভিটার কর ছিল না; বাগাতের কর কিছু বেশী ছিল;—বিঘাভূমি আট আনা হইতে, এক, দেড়, দুই টাকার অধিক ছিল না। মালের জমিরই এই নিরিখে খাজনা ছিল; নিষ্কর ভূমির নিরিখ ইহা অপেক্ষাও কম ছিল আর নিষ্কর ভূমির পরিমাণ বা "রাকবা"ও ছিল অনেক। প্রতি গ্রামেই তাহা পাওয়া যাইত। এখনকার হিসাবে বিচার করিলে সকলকেই বলিতে হইবে, ভূমির তখন কেবল নামমাত্র কর ছিল; এ বাজারে তাহা নিষ্করেরই মধ্যে। তবে তখন কিছু কিছু আবওয়াব ছিল বটে। কিন্তু সে আবওয়াব কৃষককে প্রায় বহন করিতে হইত না। তাহা ব্যবসায়ী ও শিল্পীদিগের উপরেও বর্ত্তিত।*

মুসলমান আমলে জমিদার ও রায়তের অবস্থার আভাস এই। ইহার পর বা ইতিমধ্যেই ইংরেজের আমল;—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী-প্রাপ্তি ও রাজস্ব আদায় আরম্ভ;—চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কাল। দেখা চাই, তখন কোম্পানী বাহাদুরের রাজস্ব-নৈতিক অবস্থা কিরূপ।

কোম্পানী বাহাদুর।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী ভার পাইলে, ২৪ বৎসর পরে, চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত হয়। কোম্পানী-বাহাদুর কি প্রণালীতে সে কয় বৎসর রাজস্ব কার্য্য চালাইয়াছিলেন?—সাহেবি সরঞ্জামে মূলতঃ মুসলমানী প্রণালীতেই এতাবৎ কাল কার্য্য চলিয়াছিল। দেওয়ানী পাওয়ার অব্যবহিত প্রথম চারি বৎসর অবিকল পূর্ব্বপ্রথা ও ব্যবস্থানুসারে এদেশীয় লোকজন দ্বারা কার্য্য চলে; জমিদারেরা 'যথা-পূর্ব্ব তথা-পর' মালগুজারি আদায় দেন। চারি বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৭৬৯ অব্দে কোম্পানী বাহাদুর, মফঃস্বল তদন্ত ও তদারকের জন্য এক সম্প্রদায় "সাহেব সুপারভাইজর" নিযুক্ত করেন। ইহাঁদের পদ বিভাগীয় বড়কর্ত্তা গোছের হয়। অন্যান্য কার্য্য ব্যতীত ভূমি এবং ভূমি-রাজস্বের তথ্যানুসন্ধান ও প্রকৃতি-তদন্তের ভার ইহাঁদিগকে দেওয়া হয়। ইহাঁদের নিয়োগ-পত্রে স্পষ্ট উল্লেখ এবং আদেশ আছে যে, ইহাঁরা জমিদারের কার্য্য-কলাপ পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিবেন; জমিদারের অত্যাচার ও অতিরিক্ত আদায় নিবারণ ও রায়তি-স্বত্বের রক্ষা করিবেন। জমিদারের

* আবওয়াব অনেক রকমের ছিল। কয়েকটার নাম করা যাইতেছে। হিসাবানা, খরচা, বাজি, মাজনি, শেলামি, মতকারকা, পশমাহী, ঘাটওয়ালী, কেওয়ালী, চেরাগী, মুন্সিফি ইত্যাদি। ইহা ভিন্ন কামার, কুমার, ছুতার, শাঁড়ার, গোয়ালা, ধোপা, নাপিত, প্রভৃতি সকলকেই স্ব স্ব ব্যবসার জন্য কিছু কিছু কর দিতে হইত। এখন যেমন "লাইসন টেক্স।"

একাধিপত্যে এই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী-আঘাত। উল্লিখিত আদেশ-পত্রের দুই চারি পংক্তির মর্ম্মানুবাদ দেওয়া যাইতেছে। কারণ এ বিষয় ঐতিহাসিকেরা সবিশেষ উল্লেখ করেন নাই; ইহা কেবল সরকারি সেরেস্তাতেই প্রাপ্তব্য।

"নিষেধ-নিবারণ-বিধির বর্ত্তমান অযোগ্যতা ও শিথিলতায় জমিদার কি পরিমাণে অতিরিক্ত কর আদায় করিয়া আত্মসাৎ করে,—এ বিষয় নির্ণয় করিতে তোমরা,—সুপারভাইজরগণ, সবিশেষ মনোযোগী হইবে।"

"তোমরা ইহা বিশিষ্টরূপে রায়তদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবে যে, জমিদারের অত্যাচার হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত তোমরা নিযুক্ত হইয়াছ। রায়তের যাবতীয় অভাব-অভিযোগ তোমরা গ্রহণ ও সুবিচার করিয়া নিবারণ করিবে। তোমরা রায়তদিগের রক্ষক ও আশ্রয় স্বরূপ ইহাও রায়তদিগকে বুঝাইয়া দিবে; আর বুঝাইয়া দিবে যে, তাহারা যে দুঃখ কষ্ট বিড়ম্বনা এতদিন সহিয়াছে, তাহা মধ্যবর্ত্তী কারণ বা কর্ম্মচারীদের অনুষ্ঠিত এবং কোম্পানী বাহাদুরের অপরিজ্ঞাত ও অননুমোদিত। রায়ত, নির্দ্দিষ্ট উচিত রাজস্ব ফেলিয়া দিলেই চুকিয়া যাইবে, তাহার অতিরিক্ত কিছুই দিতে হইবে না; সে তাহার পরিশ্রম-লব্ধ দ্রব্যজাত স্বচ্ছন্দে ভোগ-দখল করিতে পারিবে, ইহাও রায়তের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবে। পরন্ত, কোম্পানীর করুণ শাসনকে তাহারা যাহাতে শ্রদ্ধা করিতে শিখে, তাহাও সর্ব্বতোভাবে করিবে।"

"পুনশ্চ;—রায়তদিগকে ইহা বিলক্ষণরূপে বুঝাইবে যে, তাহাদের করবৃদ্ধি করা কোম্পানী বাহাদুরের আদৌ উদ্দেশ্য নহে। করবৃদ্ধি ত হইবেই না, অন্যায় কর ও বে-আইনি আবওয়াব একেবারেই উঠাইয়া দেওয়া হইবে। রায়তের বর্ত্তমান বিভ্রাট নিবারণ করিয়াই, কোম্পানী বাহাদুর ক্ষান্ত হইবেন না; ভবিষ্যতেও যাহাতে আর তাহার সম্পত্তি-স্বত্বাধিকার আক্রান্ত ও আঘাতপ্রাপ্ত না হয়, তাহাও করিবেন।"

এ করুণা কেবল কথাতেই থাকিয়া গিয়াছিল। এই সময় ছেয়াত্তরের মন্বন্তর হয়; কোম্পানী এক মুষ্টি অন্নদান করেন নাই।

ইহার তিন বৎসর পরে গবর্ণর জেনারল ওয়ারেণ হেষ্টিংস সুপারভাইজর পদের পরিবর্ত্তে রাজস্ব বিভাগে কালেক্টর নিযুক্ত করেন এবং সাত বৎসর পরে, প্রজা-জমিদারের সম্বন্ধ নির্ণয় ও নির্দ্ধারণ কল্পে এক কমিটি নিয়োজিত হয়। কমিটি যে রিপোর্ট করেন, তাহাতে জমিদার রায়তের সম্বন্ধ খুব সুচারু ও সুখের ছিল বলিয়া লিখিত হয় নাই। প্রত্যুত জমিদার, রায়তের নিকট হইতে অতিরিক্ত আদায় করেন ও প্রজাপীড়ন করেন, তাহাতে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ওয়ারণ-হেষ্টিংসের গবর্ণমেণ্ট ও কাউন্সিলের মেম্বরগণ উহার প্রতিবিধান ও প্রশমন কল্পে ব্যস্ত হন। কাউন্সিলের সুপ্রসিদ্ধ স্বাধীনচেতা মেম্বর স্যর ফিলিফ ফ্রান্সিস লিখেন;—

"The idea of guarding the raiyats against arbitarary exaction is just and attainable."

মিঃ বারওয়েল লিখেন;—"Unless the rights of the common people are well defined and well secured, I am persuaded all our speculations will only tend to enrich the Zemindars."

এসব কথারই একমাত্র মর্ম্ম এই যে, জমিদার প্রজাপীড়ক এবং জমিদারের পীড়ন হইতে রায়তকে রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। এই সকল কথা কি পরিমাণে সত্য এবং 'সারেজমিনের' সর্ব্বত্র তদন্ত করিয়া কর্ত্তব্য কিনা, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। তবুও এই সকল পূর্ব্ব-কথা হইতে অগত্যাই স্বীকার করিতে হয় যে, তৎকালে জমিদারেরা রায়তের উপর নেহাত নিরীহ ব্যবহার করিতেন না। আপন আপন আবশ্যক ও ইচ্ছামত আবওয়াব ও অতিরিক্ত খাজানা নিষ্কাসন করিতেন। তবে তন্নিবন্ধন জমিদারের সহিত রায়তের যে শত্রুতা-সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল বা রায়ত, জমিদারের অ-বশ্য হইয়া উঠিয়াছিল, এমন বোধ হয় না; এমন অনুমান করিবার কোনও কারণ দেখি না। আমরা

ইত্যগ্রে কোম্পানী কর্ত্তৃক সুপারভাইজর নিয়োগের যে সনন্দপত্রের উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতেও জমিদারের প্রজা-পীড়নের কথা আছে। কিন্তু প্রজার সহিত জমিদারের আত্মীয়তাভাব এবং জমিদারের উপর রায়তের নির্ভরতা-ভাব যে বিদ্যমান ছিল, ইহাও প্রসঙ্গতঃ উক্ত আছে। উক্ত আছে যে, রায়তের জমিদার-নির্ভরতার অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করিয়াই জমিদার রায়তের নিকট অতিরিক্ত আদায় করিতেন। অর্থাৎ

"They (the Zemindars) greatly exceed the bounds of modertion, taking advantage of the personal attachment of their people."

ফলতঃ জমিদার যতই অতিরিক্ত আদায় করুন; রায়তের তাহা তখন 'গা-সহা' ছিল। 'গা-সহা' করিয়াছিল কম করে ও অন্ন নিরিখে ও অপর্য্যাপ্ত শস্য-সম্ভারে। রায়ত তখনও জমিদারের হাতে ছিল। সে যাহা হউক, কোম্পানী বাহাদুরের আমলদারি হইতে এ নাগাদ পর্য্যন্ত (মধ্যে কয়েক বৎসর ব্যতীত) রায়ত-জমিদারের সম্বন্ধনির্ণয় ও সে সম্বন্ধের ন্যায়সঙ্গত সুচারু গঠনের জন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ব্যস্ত আছেন এবং তজ্জন্য চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের পূর্ব্বে প্রভূত চেষ্টা এবং পরে বিবিধ আইন-কানুন বিধি-ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও তাহার জন্য আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ হইয়াছে; এ মুহূর্ত্তে সে সম্বন্ধে ঘোর আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। তথাচ কিন্তু তৎকাল হইতে সে সম্বন্ধ সম্যক্ নির্ণীত ও সুচারুরূপে গঠিত হয় নাই। কলিযুগের মধ্যে আদৌ তাহা হইবে কি না, ভগবানই বলিতে পারেন। তবে বাদশাহী আমলের সাবেক সম্বন্ধ উল্টাইয়া গিয়াছে বটে। তাহার পরিবর্ত্তে কি সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে, তাহা রাজসরকার, জমিদার ও রায়তেরাই বলুন। অন্যে যেরূপ দেখিতে পাইতেছে, তাহাতে সে সম্বন্ধ সরিকি সম্বন্ধ। সরিকি সম্বন্ধ সর্ব্বথা শত্রুতাব্যঞ্জক। যাউক। আমরা পুনর্ব্বার ইতিবৃত্তের সূত্র গ্রহণ করি।

দেওয়ানী প্রাপ্তির পর কতককাল পর্য্যন্ত "সম্বন্ধ-নির্ণয়" ও রাজস্ব সম্বন্ধীয় অন্যান্য সমস্যার* নির্ঘণ্ট চলিল। কিন্তু কেবল সমস্যা লইয়া থাকিলে, ক্ষুধিরের উপায় হয় না। সরকারী রাজস্ব দিন দিন অনিশ্চিত হইতে লাগিল। অথচ কোম্পানী বাহাদুরের নেহাত টাকার টানাটানি। লর্ড কর্ণওয়ালিস বুঝিলেন, জমিদারদের সহিত একটা বাঁধাবাঁধি বন্দোবস্ত ব্যতীত নিয়মিতরূপে সুনিশ্চিত রাজস্ব-সংগ্রহের উপায় নাই। তিনি বিলাতি ধরণে চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত-নীতি অবলম্বন করিবার মানস করিলেন। এ নীতি তিনি বাটী হইতে আসিবার সময়েই পকেটস্থ করিয়া আনিয়াছিলেন। পরন্তু অবস্থা গতিকে "নেহাত গরজে" পড়িয়াই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করিতে হইল। তাৎকালিক অবস্থাজ্ঞ কোনও বিশিষ্ট ইংরেজ লেখক লিখেন;—

It was such as to leave the Governor-General hardly any option at all. There was difficulty in some districts in getting well qualified persons to engage for the realization of the public revenew."†

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত করা ব্যতীত গবর্ণর-জেনারালের আদৌ আর

* ইজারা বন্দোবস্ত ও ১৭৭২ সালে কমিটি অব সারকুট করিয়া রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টা হয়।

† Opinion of late Mr. James Pattle of the Bengal civil service 1793--1845; quoted by Mr. Seton Karr in his work on Cornwallis.

কোন উপায় ছিল না। অনেক জেলায় রাজস্ব আদায়ের জন্য উপযুক্ত লোকেরই অভাব হইয়াছিল।

কথিত আছে, কোন কোনও বৃহৎ জমিদার, কোম্পানীর এই বন্দোবস্ত-সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন ছিলেন। সুতরাং বন্দোবস্তের জন্য দরবারে উপস্থিতও হন নাই। অনুপস্থিতি-নিবন্ধন নাকি তাঁহাদের জমিদারির "গবর্ণমেণ্ট রেবিনিউ" অধিকমাত্রায় নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বস্তুতঃ তখনকার জমিদার-সম্প্রদায় যে এজন্য আগ্রহাতিশয় দেখাইয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। বরং কর্ণওয়ালিস্ সচেষ্টিত হইয়া এ ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন, এমন অনুমান করা যাইতে পারে। পরন্তু, কর্ণওয়ালিসের কার্য্যটা যে অত্যন্ত ক্ষিপ্রহস্তে কৃত হইয়াছিল, ইহাও বলিতে হয়।

প্রথম আমলে কোম্পানী জমিদার বা ইজারাদারদের সহিত কোথাও একশালা, কখনও বা চারিশালা পাঁচশালা বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। এরূপ বন্দোবস্ত হেষ্টিংস্ হইয়া কর্ণওয়ালিস্ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু, এতাবৎকাল ব্যাপিয়া একটা পাকা চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের আলোচনা-বিবেচনা ও বাক্-বিতণ্ডা বিলাতে ও এখানে চলিতেছিল। এ বিষয়ে সাহেবেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়াছিলেন। একদল চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের সপক্ষে, অপর দল উহার বিপক্ষে। স্বয়ং ওয়ারণ হেষ্টিংস্ ছিলেন বিপক্ষদলে, সুতরাং স্যরফিলিপ ফ্রান্সিস্ ছিলেন সপক্ষদলে। কোর্ট অব ডিরেক্টরেরা প্রথমতঃ বাদশাহী পূর্ব্বাগত-প্রথার পক্ষপাতী হন, * পরে জানি না, কেন সে মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই আলোচনা-বিবেচনার সঙ্গে সঙ্গে মফস্বলে তদন্ত-তদারকও চলিতেছিল। উদ্দেশ্য—মহলের প্রকৃত জমাবন্দী নিরূপণ করা। জরিপ জমাবন্দী সেই বহুকাল পূর্ব্বে, আকবরের আমলে হইয়াছিল; তাহার পর আর সে কাজ হয় নাই। সুতরাং তখন, মহালের জমা-জমির নিরূপণ করা বড় সোজা কাজ নহে;—সে কাজ কিছুমাত্র সম্পন্নও হয় নাই। কিন্তু কোম্পানীর কারপরদাজদের এমনি জমিদারি-বুদ্ধি তখন ছিল যে, ডাকনিলামে মহল চড়াইয়া হস্তবুদ সাব্যস্ত করিতে বসিয়াছিলেন। বণিক্-বুদ্ধি বিক্রয়ের "বিড"ই তখন কেবল বুঝিত কিনা! কিন্তু বুদ্ধিমন্তদের এই "বিড"-ব্যবস্থায় সম্ভ্রান্ত জমিদারেরা স্বভাবতই বিরক্ত হন ও উহার বিরুদ্ধে বিলাত পর্য্যন্ত দরখাস্ত প্রেরণ করেন।

১৭৮৮ অব্দে তথা-কথিত মফস্বল-তদন্ত শেষ হয়। শেষ হয়—কালেক্টর সাহেবদের লম্বা লম্বা রিপোর্টে। ফলতঃ আসল তথ্য কিছুই আবিষ্কৃত হয় নাই; কাগজপত্রের অভাবে, হইবার উপায়ই ছিল না। স্যর জন সোর তখনকার একজন অভিজ্ঞ ও পরিপক্ব সিবিলিয়ান,—কর্ণওয়ালিসের

* কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা ১৭৮৬ সালের ১২ই এপ্রিলের ডেস্প্যাচে নিম্নলিখিত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন;—Not to introduce any novel system or to destroy those rules and maxims which prevailed in the well-regulated periods of the native princes, an adherence to which must be most satisfactory to the natives and most conducive to the safety of our dominion. অর্থাৎ "সুশাসক দেশীয় রাজাদিগের সময়ে যে সকল রীতি-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তাহা ধ্বংস করিয়া অভিনব প্রণালী প্রচলন করা হইবে না। পুরাতন প্রথাই দেশীয় প্রজার প্রীতিকর হইবে এবং তাহাই আমাদের রাজ্য নির্ব্বিঘ্ন করিবে।—"

এই অভিজ্ঞতানুরূপ কার্য্য হইলে বোধ হয় রায়ত জমিদারের সম্বন্ধ লইয়া এত বেগ পাইতে হইত না। কতক পুরাতন ও কতক নূতনের মিশ্রণ করিতে যাওয়াতেই শাসন কার্য্যের সর্ব্বত্রই মুস্কিল বাধিতেছে।

দক্ষিণ হস্ত, সর্ব্বপ্রধান সহকারী। * সোর কর্তৃক কালেক্টরদিগের রিপোর্ট-রাশি হইতে সার মথিত হইয়া লাট কর্ণওয়ালিস সমীপে পেশ হয়। কর্ণওয়ালিস তদুল্লিখিত জমাবন্দী ভিত্তি করিয়া জমিদারদের সহিত দশশালা বন্দোবস্ত করেন। এ বন্দোবস্ত হয় এই ১৭৮৯ অব্দেই। পরন্তু, ১৭৯৩ অব্দের ১২ এপ্রেল তারিখে এই দশশালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তে পরিণত করা হয়। বলা বাহুল্য, দশশালা বন্দোবস্ত শেষ না হইতেই চিরস্থায়ী ব্যবস্থা হইয়াছিল।

উপরি-উক্ত ভিত্তির উপর চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত করিতে স্যর জন সোর প্রাণপণে আপত্তি উত্থিত করেন। কর্ণওয়ালিস তাহা গ্রাহ্য করেন না। তৎকর্তৃক এই কারণ প্রদর্শিত হয় যে, সোরের অভিমতানুরূপ জমা-জমি ও মহালের হস্তবুদ সাব্যস্ত হওয়া সুদীর্ঘকাল-সাপেক্ষ। পরন্তু, সুদীর্ঘকালেও কোম্পানীর নিজ কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন হওয়া দুরূহ; কেননা, কোম্পানীর রাজস্ব-কার্য্যে উপযুক্ত ইংরেজ কর্ম্মচারীর অভাব; কতকালে সেরূপ উপযুক্ত লোক তৈয়ার হইবে, তাহাও অনিশ্চিত। অতএব আর অপেক্ষা করা নহে। চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত হইল। এখন জমিদারদিগের দ্বারাই জরিপ-জমাবন্দী করাইয়া ক্রমে জমিদার-রায়তের ন্যায্য স্বত্বাধিকার ও সম্বন্ধ গঠিত করা যাইবে। বন্দোবস্তী সর্ত্তে তাহা করিবার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে; ইত্যাদি।

কর্ণওয়ালিসের এই আশা সর্ব্বত্র কিরূপ এবং কতদূর কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, তাহা ঠিক বলা যায় না। কেননা, এই বক্ষ্যমাণ বিষয় লইয়াই সম্প্রতি বিহার-জমিদার-সম্প্রদায়ের সহিত সরকার বাহাদুরের বিতণ্ডা চলিয়াছে।

কর্ণওয়ালিসের এই চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত উত্তম, কেননা, এতদ্দ্বারা অনেক সুফল ফলিয়াছে। ইহাতে অধিকতর সুফল ফলিত, যদি ইহা বিলাতি ধরণে না করা হইত। বন্দোবস্তটা বিলাতি ছাঁচে করিয়া গিয়াই কর্ণওয়ালিস নিজে প্রবঞ্চিত হইয়াছেন এবং পরবর্ত্তী গবর্ণমেণ্টকেও প্রবঞ্চিত করিয়াছেন। কোম্পানী বাহাদুর এদেশীয় জমিদারিত্ব যেমন তখন বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই;—এদেশীয় জমিদারেরাও তেমনি চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের বিলাতি ধাতুটুকু কখনও ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। কাজেই কর্ণওয়ালিসের আশানুরূপ ফল হয় নাই ও হইতেছে না। কারণ দেশী দেহে বিলাতি ধাতু খাটে না। কর্ণওয়ালিসের বন্দোবস্তের মধ্যে সেই বিলাতি ধাতুটুকু কি, পরিষ্কার করিতে এ প্রবন্ধে স্থান কুলাইবে না।

ডাক্তার হণ্টার বলেন, কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের যে কিছু দোষ-গুণ, সমস্তই স্যর জন সোরে বর্ত্তান উচিত; কেননা, এ বন্দোবস্তের সকল বিষয়ের জন্যই স্যর জন দায়ী। ডাক্তারের এ উক্তি "ওয়াজিব" বলিয়া বোধ হয় না। বরং ইহাই ব[illegible]তে হয় যে, বন্দোবস্তের যদি কোনও দোষ থাকে, তাহার জন্য কর্ণওয়ালিস দায়ী এবং যত কিছু গুণ আছে, তাহা স্যর জন সোরের। কিন্তু এই বন্দোবস্তের বিধান ও অন্যান্য বিবরণ কি?

বন্দোবস্তের বিবরণ।

বন্দোবস্ত বিহার অপেক্ষা খাস বাঙ্গালায় অধিক হারে হইয়াছিল, ভূতপূর্ব্ব একটিং ছোট লাট স্যর এণ্টনি ম্যাকডোনেল স্বীকার করেন। বঙ্গীয় জমিদারদিগের লাভাংশে, তৎকালে সমস্ত রাজস্বের উপর শতকরা দশ টাকার অধিক পড়ে নাই। শতকরা ৯০৲ টাকা গিয়াছিল গবর্ণমেণ্ট রেবিনিউ বা রাজস্বে। এ হারের বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হইলেও এখনকার হিসাবেও খুব

* ইনি পরে লর্ড টেনমাউথ ও কিছুদিনের জন্য গবর্ণর জেনারেল হন।

কঠিন কড়াকড়, ইহা অবশ্যই বলিতে হয় তবে শতকরা এই দশ টাকা লাভ ব্যতীত জমিদারদিগের "নানকর" ও নিজ জোত মহল ছিল এবং ক্রমে পতিত জমি উঠিত করিয়া তাঁহাদের প্রভূত আয় দাঁড়াইয়াছে; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সুক্ষয় বন্দোবস্ত যে সুকঠিন হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্যর এণ্টনি লিখেন, এই কঠিন বন্দোবস্ত নিবন্ধনই চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের অব্যবহিত কালের মধ্যে, সরকারী মালগুজারি সরবরাহ করিতে না পারায় বঙ্গীয় জমিদারদের অনেকের জমিদারি উচ্চ নিলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কোম্পানীর মোট রাজস্ব দাঁড়ায় সর্ব্বশুদ্ধ সিক্কা ২,৬৮,০০,৯৮৯৲ টাকা। এ অঙ্ক ডাক্তার হণ্টারের ইতিহাস হইতে গৃহীত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সর্ত্ত ও একরার অনেক, তাহাদের সকলের উল্লেখ ও আলোচনা করার স্থান নাই। সংক্ষেপে প্রধান প্রধান দুই চারিটা কথা বিবৃত করা যাইতেছে।

১৭৯৩ সালের ২২ মার্চ্চ তারিখের প্রোক্লামেসন বা সরকারী ইস্তাহারে বন্দোবস্তের বিবিধ অঙ্গীকার, গবর্ণমেণ্টের এক্তিয়ার ও জমিদারের স্বত্বাধিকার বিঘোষিত হয়। এই ইস্তিহার পরে উক্ত সালের ১নং রেগুলেসনে পরিণত ও বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এই ইস্তাহারের সর্ব্বপ্রধান সূত্র এই যে, দশশালা বন্দোবস্তে যে জমা বা জমাবন্দীতে গবর্ণমেণ্ট জমিদারদিগের সহিত জমিদারি বন্দোবস্ত করেন, সেই জমা বা জমাবন্দী চিরকালের জন্য কায়েম ও স্থায়ী রহিল; অচল, অনড় ও অটল হইল; তাহার উপর কোনও কালে গবর্ণমেণ্টের কেহ এক ক্রান্তিও গবর্ণমেণ্ট-রাজস্ব হিসাবে বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। পরন্তু, এই বন্দোবস্তে জমিদার জমিদারির পুরা মালিকান স্বত্ব পাইলেন; সরকারের বিনা আদেশে এবং আপন আপন ইচ্ছামত জমিদারি বা তাহার কোনও অংশোপাংশ দান, বিক্রয় ও যে কোনও প্রকারে হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের হইল এবং বাদশাহী আমলে যে সময়ে সময়ে সনন্দ লইবার বিধি ছিল, তাহাও উঠিয়া গেল। কিন্তু বাদশাহী আমলে জমিদারদের যে রাজকীয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী এক্তিয়ার ছিল, তাহার কিছুই রহিল না। মোটের উপর বিবেচনা করিলে এই বন্দোবস্তে জমিদারের সম্পত্তি-স্বত্বাধিকার খুব পাকাপাকি হইল এবং বাড়িলও বটে; কিন্তু শক্তি বিলক্ষণই কমিল। স্বত্বাধিকার পোক্ত ও বর্দ্ধিত হওয়ার সঙ্গে শাসন-শক্তি তিরোহিত হইল।

এই বন্দোবস্তে অতিরিক্ত কর আবওয়াব ও বাজে আদায় উঠিয়া গেল। সরকারী রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদার সম্বন্ধে সূর্য্যাস্ত-বিধি প্রবর্ত্তিত হইল।

পক্ষান্তরে এ বন্দোবস্তে রায়তি স্বত্বাধিকার স্পষ্টতঃ কিছু স্থির না হইলেও তজ্জন্য সময়ে সময়ে আইন কানুন করিবার এক্তিয়ার গবর্ণমেণ্ট হাতে রাখিলেন। পরন্তু (১) প্রত্যেক প্রজাকে পরগণা-হারে কালেক্টর সাহেবের অনুমোদিত পাট্টা দিবার; (২) কালেক্টরীতে জরিপি কাগজাত দাখিল করিবার এবং (৩) পাটওয়ারি দ্বারা প্রজাওয়ার হিসাব রাখিবার সবিশেষ আদেশ জমিদারদিগের উপর হইল।

বলা বাহুল্য, এই সকল আদেশ সর্ব্বত্র সমান রকম প্রতিপালিত হয় নাই। বিশেষতঃ পাট্টা-প্রদান—বিধি অতি অল্পই আমলে আসিয়াছিল। এ সম্বন্ধে জমিদার-সম্প্রদায়ের ঔদাসীন্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া তাৎকালিক রাজপুরুষদিগের দায়িত্ব ঘুচে না। অবশ্যই বলিতে হয়, তাঁহারাও এ বিষয়ে অবহেলা করিয়াছিলেন।

বন্দোবস্তের বিকাশ।

চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত, তাহার প্রারম্ভ হইতে, বর্ত্তমান কালাবধি বিবিধ প্রকারে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে এবং বিকশিত হইতে চাহিতেছে। এই বিবিধ বিকাশ—বহু প্রকারের বিভিন্ন বিভিন্ন বিধি-ব্যবস্থায়, আইনে এবং রেগুলেশনে। সে সকলের সবিস্তার বর্ণন ও সমালোচন করিবার স্থানাভাব। বন্দোবস্ত-সম্বন্ধে এতাবৎকালের বিবিধ বিধি-ব্যবস্থায় তাহার মূল-প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত না হউক, আনুষঙ্গিক অনেক বিষয় ভিন্ন ভিন্ন প্রথা ও পন্থায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহা অবশ্যই বলিতে হয়।

স্যর এণ্টনি ম্যাকডোনেল তাঁহার উপরিউক্ত সুপ্রসিদ্ধ ও বহু বিতর্কিত অভিনব "মিনিটে" লিখেন,—সিপাহী-মিউটিনীর পূর্ব্বে, জমিদার ও রায়ত-সম্বন্ধীয় যত আইন-কানুন প্রস্তুত হয়, তাহার সমস্তই জমিদার-সম্প্রদায়ের সপক্ষে ও জমিদারি-স্বার্থ লক্ষ করিয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

অতএব সিপাহী-মিউটিনীর পর হইতে একাল পর্য্যন্ত জমিদার ও প্রজা-সম্বন্ধীয় যত আইন-কানুন হইয়াছে ও হইতেছে, সে সমস্ত অল্লাধিক ভাবে রায়ত-সম্প্রদায়ের সপক্ষে ও রায়তি-স্বার্থ লক্ষ্য করিয়া;—এ সিদ্ধান্ত, উপরিউক্ত উক্তিতে এবং উপস্থিত অবস্থা দেখিয়া, অবশ্যই করা যাইতে পারে। রায়তি-স্বার্থ সমর্থন ও সংরক্ষণ উদ্দেশে এখন আইন-কানুন হইতেছে সন্দেহ নাই। তবে তদ্দ্বারা রায়ত আশানুরূপ উপকৃত হইতেছে কিনা, সে স্বতন্ত্র কথা।

স্যর এণ্টনির উক্তি অযথার্থ নহে। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিসের জনৈক জীবনী-লেখক ও সমালোচক ভূতপূর্ব্ব বেঙ্গল সিবিলিয়ান সিটনকার সাহেব তদীয় গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সিপাহী-বিদ্রোহ বঙ্গে অগ্রসর হইতে ও আত্ম-বিক্রম দেখাইতে না পারার প্রধান কারণ, বাঙ্গালার চিরস্থায়ী জমিদারী-বন্দোবস্ত। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পোটিদারী * বন্দোবস্ত যে আগুন নির্ব্বাপিত না করিয়া প্রজ্বলিত করিয়াছিল, সে আগুন, বঙ্গীয় জমিদারী-পদ্ধতির প্রভাবেই, বঙ্গে পৌঁছিয়া, কোম্পানী-বাহাদুরের একটী তৃণও পোড়াইতে পারে নাই।

মিঃ সিটনকারের উক্তি এই। অথচ সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে নীলকর সাহেবদিগকে এসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্টর করিয়া, বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট পরোক্ষে বাঙ্গালী প্রজাপীড়ন করিতেও ক্রটী করেন নাই, ইহা কে না জানে? তবুও কিন্তু বাঙ্গালার মাটীতে সিপাহী-বিদ্রোহের বিষ প্রবেশ করিতে পারে নাই।

এখন সিটনকারের কথা যদি সত্য হয়, তবে সিপাহী মিউটিনীর পরবর্ত্তী আইন-কানুন জমিদার-স্বার্থের সবিশেষ পক্ষপাতী কেন হয় নাই,—ইহা এক সমস্যা। কিন্তু এ সমস্যা সমালোচনার স্থান নাই।

খৃঃ ১৭৯৪ হইতে ১৭৯৮ সাল পর্য্যন্ত জমিজমা সংক্রান্ত যে কিছু রুল-রেগুলেসন জারি হয়, তাহা আমরা স্পর্শও করিলাম না। ১৭৯৯ সালে অতি বিখ্যাত কানুন

হপ্তম

জারি হয়। এই সময়ে অর্থাৎ চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত প্রবর্ত্তিত হওয়ার তিন চারি বৎসর মধ্যেই, জমিদারেরা মফস্বল মালগুজারি আদায় করিতে একান্ত অক্ষম হইয়া পড়েন। কারণ

* পোটী = খণ্ড; পোটীদারি = এজমালি জমিদারি। অর্থাৎ একই তালুকের বহু বহু এবং বিভিন্ন বিভিন্ন অংশীদার কিম্বা পোটীদার। পোটীদারির অপর নাম 'ভাইচর' কিনা বহু ভাই বা জ্ঞাতি মিলিয়া যেখানে "চরে"। পোটীদারি-প্রথা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এবং কিয়ৎ পরিমাণে বিহারে প্রচলিত। এখন বাটোয়ারা আইনে পোটীদারি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারিতে পরিণত হইতেছে।

কি, ঠিক অবধারণ করা কঠিন। কেহ বলিতে পারেন যে, জমিদারদের হাতে পূর্ব্বে যে শাসন, শক্তি ছিল, চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের পর হইতে তাহা না থাকাতে, তাঁহারা টাকা আদায় করিতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু কেহ কেহ বলেন (এই কেহ কেহর মধ্যে, স্যর এণ্টনি ম্যাক্‌ডোনেল একজন) যে, চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের পাট্টাপ্রদান-বিধির ব্যত্যয় ও পরগণা-নিরিখের অতিরিক্ত মালগুজারি দাবি করাতেই রায়ত অবাধ্য হইয়াছিল ও ধর্ম্মঘট করিয়া জমিদারের খাজানা বন্ধ করিয়াছিল। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট-রেবিনিউ না দিতে পারায় জমিদারের জমিদারি বিকাইতেছিল। কেবল জমিদারের জমিদারি বিকান নয়; গবর্ণমেণ্টকেও ইহাতে মহা শঙ্কিত হইতে হইয়াছিল। কারণ এই কারণে, আবার রেবিনিউর অনিশ্চয়তা উপস্থিত প্রায়। অথচ টাকার মহা খাঁকতি। কোম্পানীর "ডিবিডেণ্ট" কমিলে রক্ষা নাই। তাহার উপর টীপু সুলতানের সহিত সংগ্রামে অ-সুমার অর্থব্যয় হইতেছে। এসময়ের গবর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি। ওয়েলেসলি কোম্পানীর রেবিনিউ রক্ষার্থে, রাজস্ব আদায়ের জন্য কানুন হপ্তম অর্থাৎ ১৭৯৯ সালের ৭ আইন (Reg VII) জারি করিয়া জমিদারের হস্ত দৃঢ় করিলেন। কানুন হপ্তমে রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে জমিদারের হস্তে আবার শাসন-শক্তি আসিল। এই আইনানুসারে, রায়তকে মারিয়া, পিটিয়া, বাঁধিয়া, বন্দী করিয়া, রায়তের যথাসর্ব্বস্ব ক্রোক দিয়া ও ভিটা-মাটী উজড় করিয়া মাল খাজনা আদায় করিবার এক্তিয়ার জমিদারের হইল। অত্যাচার অতিপীড়নও আরম্ভ না হইল এমন নহে।

কানুন হপ্তমে রায়তমহলে হাহাকার উঠিল। কিন্তু এ আইন ১৮১২ সাল পর্য্যন্ত প্রবল থাকে। লর্ড মিণ্টোর আমলে ইহার পরিবর্ত্তে কানুন পঞ্চম জারি হয়। কানুন পঞ্চম ১৮১২ সালের ৫ আইন (Reg V.) ইহা হপ্তমের কনিষ্ঠ সহোদর। ইহা দ্বারা জমিদার ক্রোক-সাজোয়ালে প্রজার নিকট হইতে পোত আদায় করিতে পারিতেন। কেবল তাহাতে শারীরিক শাস্তি দিতে পারিতেন না। কানুন পঞ্চমেও প্রজাপীড়ন প্রবল রহিল।

অন্যান্য আইন।

প্রজাকে পাট্টা-প্রদান-বিধি ও পাটওয়ারি দ্বারা কাগজপত্র-সংরক্ষণাদেশ (Sec, 62, Reg VIII of 1793) জমিদারদিগের দ্বারা কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় ১৮১৭ সালে পাটওয়ারি আইন ((Reg: XII of 1817) পাস হয়। কিন্তু এ আইন আদৌ কখন আপন উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। বঙ্গে পাটোয়ারি-প্রথা নাই। বিহারে তাহার ভগ্নাবশেষ মাত্র আছে। এ আইন অদ্যাবধি আছে; কিন্তু বাজে ও বাতিল কাগজের সামিল হইয়া জীবন্মৃতবৎ বিদ্যমান। ১৮১৯ অব্দে পত্তনি-আইন (Reg: VIII) পাশ হয়। এ আইন বর্দ্ধমানরাজ হইতে উদ্ভূত বলা যাইতে পারে।

১৮২০ হইতে ১৮৫৮ পর্য্যন্ত রাজস্ব ও রায়ত-জমিদারসংক্রান্ত যত আইন-কানুন হইয়াছিল, তাহাও এস্থলে স্পর্শ করিবার প্রয়োজন নাই। সিপাহী-মিউটিনীর অব্যবহিত পরে, ১৮৫৯ সালে জমিদারি ও রায়তি স্বত্বাধিকার সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ ১০ আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইহাকে রায়তি-স্বত্বের "ম্যাগনা কার্টা" কেহ কেহ কহিয়া থাকেন। কিন্তু সে বিষয় আলোচনা করিবার অবসর নাই, সে অনেক কথা। তবে রায়তি-স্বত্বের প্রতি (বিলাতি ভাবে) কিছু লক্ষ্য রাখিয়া যে, এ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, ইহা অবশ্যই বলিতে

হয়। এই দশ আইনের পরিণতি ১৮৬৯ সালের আট আইন এবং ১৮৬৯ সালের আট আইনের পরিণতি ১৮৮৫ সালের বর্ত্তমান বেঙ্গল টেনেন্সি এক্ট; আর এই এক্টের একখানি শাখা স্যর এণ্টনি ম্যাকডোনেলের "রেকর্ড অব রাইট" বা "ল্যাণ্ড- রেকর্ডবিল"।

বিলাতি বীজে, বিলাতি বৃক্ষই জন্মে বিলাতি বৃক্ষে বিলাতি ফলই ফলে; দেশী ফল ধরে না। বিলাতি ধরণের বন্দোবস্ত হইতে বিলাতি রকমের আইন উদ্ভূত হওয়াকে তুমি দারি বা রায়তি স্বত্বের উপর আঘাত বলিতে চাও বল, কিন্তু সে আঘাতের অবসর কর্ণওয়ালিস নিজেই রাখিয়া গিয়াছেন; বীজ তৎকর্ত্তৃকই বপিত হইয়াছিল। এখনকার এই সকল আইনের অঙ্কুর চিরস্থায়ী-বন্দোবস্ত-পত্রের ৮ম দফায় ও বন্দোবস্ত-কর্ত্তার মিনিট-মন্তব্যের বহুস্থলেই প্রাপ্তব্য। সে সকল কথার কিছুমাত্র আলোচনাও আমাদের উদ্দেশ্য নহে। এস্থলে কেবল একটা কথা কিছু স্পর্শ করিব। লর্ড কর্ণওয়ালিশ তাঁহার ১৭৮৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বরের মিনিটে লিখেন;—I understand the word permanency extend to the Jumma only and not to the details of the Settlement; for many regulations will certainly be here—after necessary for the further security of the ryots in particulars. ইত্যাদি। অর্থাৎ চিরস্থায়িত্ব কেবল জমা-সম্বন্ধেই বর্ত্তিবে; বন্দোবস্তের তপশীল সকলে বর্ত্তিবে না; কারণ রায়তকে রক্ষা বা নিরাপদ করিবার জন্য, পরে অনেক আইন-কানুন পাশ করার প্রয়োজন হইবে।"

ভাল, আইনের প্রয়োজনীয়তা সূচিত হইয়াছিল অনেকানেক আইন পাশও হইতেছে। কিন্তু, জমাজমির উপর."সেস" বার হওয়ার পর জমার চির স্থায়িত্ব কি ঠিক বজায়আছে? রোড-সেস আদি অবশ্য সাধারণ টেক্স,—সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু, সবিশেষ ভাবে উহা জমাবন্দীর উপর বার হইয়া এবং কেবল মাত্র জমাজমীর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া, কর্ণওয়ালিসের প্রতিজ্ঞা কি পরিমাণে অটুট রাখিয়াছে, বিজ্ঞেরাই বিচার করিবেন।

শত বর্ষ পরে।

একশত বৎসর পূর্ব্বের অবস্থা আমরা উপরে কিঞ্চিৎ অঙ্কিত করিয়াছি। কিন্তু একশত বৎসর পরের অবস্থা কি?—একশত বৎসর পরের অবস্থা—বর্ত্তমানেরই দৃশ্য। দেশের বর্ত্তমান দৃশ্য সকলেরই চক্ষে দেদীপ্যমান। অতএব সে বিষয়ে অধিক আলোচনার আবশ্যক নাই। তখন কোম্পানী বাহাদুর সবে কেবলমাত্র দেওয়ানী পাইয়াছিলেন; এখন সে দেওয়ানী বিশাল-রাজ্যে পরিণত। ইংরেজ-রাজ্ঞী সত্রাজ্ঞী সমগ্র ভারতের রাজরাজেশ্বরী। মোগল বাদশাহী আকাশে বিলীন, বিলুপ্ত, বিস্মৃত; দুই চারিটা অট্টালিকা ব্যতীত, তাহার অস্তিত্বের চিহ্নমাত্রও নাই। মুসলমান নবাবী নিবিয়া গিয়াছে। মারহাট্টা-বিক্রমের জলবিম্ব জলে মিলাইয়া গিয়াছে। স্বাধীনতা ও শাসন-স্বতন্ত্রতার শেষ-চিহ্ন—ভগ্নাবশেষও নাই। আসাম, ব্রহ্ম, মণিপুরাদি বিজিত হইয়া ভারত-সাম্রাজ্যের অন্তভূত। নেপাল, সিকিম, আফগান নমিত। ব্রিটিশ-বিক্রমে

ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ।

পর্টুগীজ ভারত হইতে এককালে পলায়ন করিয়াছে; ফরাসী নামে মাত্র আছে। অন্তঃশত্রু নাই; বহিঃশত্রুও বিরল। তখন অনাবাদি ভূমিতে দেশ ব্যাপিয়া ছিল; এখন উহা সূচ্যগ্র পরিমাণে পাওয়া ভার; শস্যক্ষেত্রের হার দুই আনা হইতে দশ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। রেলে খালে রাস্তায় দেশ এখন পূর্ণ, প্লাবিত।

সুয়েজ কেনালে বিলাতের পথ সোজা ও সুগম হইয়াছে। অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য দুইই দুরন্ত বেগে চলিয়াছে। রপ্তানীর রহটে দেশের দ্রব্যজাত ইন্দ্রচন্দ্র-লোকেও চলিয়া যাইতেছে। ক্ষেত্র হইতে শস্য সংগৃহীত হইতে না হইতেই যেন কি ইন্দ্রজাল-প্রভাবে উড়িয়া যায়! দেশ হইতে এখন প্রতিবৎসর পঞ্চাশ কোটী টাকার শস্য-সম্ভার বিদেশে যায়। অতএব এখন আর তখনকার মত নাই। তখন ছিল দ্রব্য শস্তা, মুদ্রা মহার্ঘ; এখন হইয়াছে মুদ্রা শস্তা, দ্রব্য মহার্ঘ। তখন ছিল টাকায় চারি মণ ধান্য, এখন এক মণ ধান্যের দাম দুই টাকা। চাউলের মণ ৫৲ টাকা। ঘৃতের সের দুই আনা হইতে দেড় টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। দাউলের মণ তিন সিকা হইতে তিন টাকারও অধিক হইয়াছে; যব-গোধূমের দর তাঁহারও বেশী বাড়িয়াছে। শ্রমের দরও বাড়িয়াছে। মুদ্রাও শস্তা হইয়াছে। ইংরেজ শাসনে দেশে শান্তিও আছে। কিন্তু তখনকার হিসাবে এখন দেশের সুখ, সাংসারিক স্বচ্ছলতা কি পরিমাণে বাড়িয়াছে, তাহা দেশস্থ ইতর ভদ্র সর্ব্ব-সাধারণেরই বিবেচ্য।

কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির কয়েক বৎসর মাত্র পরে দেশে যে মহা দুর্ভিক্ষ—ছেয়াত্তরের মন্বন্তর * হইয়াছিল, প্রায় সেরূপ দুর্ভিক্ষ এখন প্রতিনিয়তই উপস্থিত হয়। তবে তখন কোম্পানী বাহাদুর কেবল করবৃদ্ধিরই জন্য সবিশেষ ব্যস্ত ছিলেন, দেশের দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই; এখন দুর্ভিক্ষ হইলে, গবর্ণমেণ্ট দুঃখীকে অন্নদানের চেষ্টা করিয়া থাকেন; তথাচ দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষই বটে। বিশেষতঃ এখনকার দুর্ভিক্ষ ঘন ঘন বারমাস দুর্ভিক্ষ বলিলেও বলা যায়; কেননা, কবে না চাউলের মণ পাঁচ টাকা? অথচ দেশের ধনবৃদ্ধি হইয়াছে। ধনবৃদ্ধি হউক আর না হউক, খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বিষম বৃদ্ধি হইয়াছে। সুতরাং জমিদারের জমিদারির মূল্যেরও বৃদ্ধি হইয়াছে। জমিদারির মৌদ্রিক আয়ও বিলক্ষণ বাড়িয়াছে। বিহারে শুনিলাম,—এই আয় শতকরা ৮০৲ টাকা হইতে একশত টাকারও অধিক হইয়াছে। অতএব আশ্চর্য্য নহে যে, অনেক ইংরেজ এখন চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের কথা স্মরণ করিয়া, উহাতে সরকার বাহাদুরের ভয়ানক ঠকা হইয়াছিল বলিয়া আপশোস্ করিয়া থাকেন। কিন্তু শতবর্ষ পূর্ব্বের অবস্থা বারেক ভাবিয়া তাঁহাদের আক্ষেপ করা উচিত। গবর্ণমেণ্ট নিজে অবশ্য এ সম্বন্ধে কোনও কথা কহেন না; তিনি এখন রায়তি-স্বত্বাধিকার উদ্ধারে ব্রতী। এ ব্রতের ফল যাহা হইতেছে, উপরেই উল্লেখ করিয়াছি। অর্থাৎ রায়ত-জমিদারের সম্বন্ধ সন্তোষকর না হইয়া শত্রুতা-ব্যঞ্জকই হইয়াছে।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।



* "১১৭৬ সালে (১৭৬৯ খৃঃ অব্দ) এই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়; এজন্য ইহা ছেয়াত্তরের মন্বন্তর বলিয়া বিখ্যাত। ইহার প্রকোপে বঙ্গের এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী অনাহারে মারা পড়ে। নয় মাসের মধ্যে প্রায় এক কোটী লোকের মৃত্যু হয়। এ সময়ে কোম্পানীর শস্যাগারে বিস্তর শস্য সঞ্চিত ছিল; কিন্তু কোম্পানী এক মুষ্টিও কাহাকে দেন নাই। ইহা অপেক্ষা কলঙ্ক আর কি হইতে পারে? স্বয়ং ডাক্তার হণ্টার একথা লিখিয়াছেন। এই দুর্ভিক্ষের দুই বৎসর না যাইতে কোম্পানী শতকরা দশ টাকা কর বৃদ্ধি করেন। দুর্ভিক্ষের বৎসরের জন্যও প্রজা পাই-পয়সা মালগুজারি মাফ পায় নাই।

প্রাণের গান।

(১)

জীবনের সাধ কত ফুটে,—
কত উর্দ্ধে উঠে, কত ছুটে।
অনন্ত সে গতি—অনন্তে সে ধায়,
নিত্য ভ্রাম্যমাণ গ্রহগণ-প্রায়,
নিত্য ঘুরে ফিরে,—লক্ষ্য নাহি পায়!

(২)

অবসাদে কণ্ঠশ্বাস তবুও বিরাম নাই,
এ কিরে মায়ার ফের কামনার কত খাঁই!
কিবা কার্য্য, কি কারণ,
কেবা করে নিরূপণ?
একি তৃষা, একি আশা,জীবনের মোহ-ফাঁদ।
পলকে গরল উঠে তবুও অমিয়-সাধ!

(৩)

পদে পদে ভ্রম ভাঙ্গে স্বপ্ন-ঘোর কেটে যায়;
কত বিশ্ব ফুটে, কত বিশ্ব টুটে,
বাসনা-তরঙ্গে ছুটে, কেবা আনে গণনায়?
অনন্ত আঁধার, অনন্ত বিস্তার,
অকূল পাথার, নাহি পারাপার,
তবুও আলোক-আশা, তবু পারে যেতে চায়!

(৪)

সাগর-সঙ্গম আশে, সোণার তরণী ভাসে,
ডুবে কিন্তু মাঝ-দরিয়ায়!
এমন ডুবেছে কত, এ লীলা ত অবিরত,
তবু নিত্য বাসনা জাগায়!
বিধি তব লীলা বুঝা দায়!

(৫)

ব'লে দাও দয়াময়, কোথা সে কামনা-লয়,
কোথা পুরে কামনার খাঁই?
কোথা ব'ল পূর্ণ তৃপ্তি কোথা ব'ল পূর্ণ দৃপ্তি
কোন্ পূর্ণে অপূর্ণ মিশাই!

শ্রীবিহারিলাল সরকার।

ছায়া।*

অগ্নিই কেবল স্বর্ণের দোষ বা গুণ পরীক্ষা করিতে সমর্থ। জগতের যত শোক, যত দুঃখ, যত কষ্ট,—তাহাতেই মানব-চরিত্রের পরীক্ষা হইয়া থাকে। দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়া, যাহাকে কখনও চলিয়া আসিতে হয় নাই, তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিলেও, সম্যক্‌রূপে তুমি তাহাকে বুঝিতে পারিবে না,—কিছু বাকি থাকিবেই। শোক, তাপ, দুঃখ যন্ত্রণা, মানুষের হৃদয় খুলিয়া দেয়। যদি কাহারও হৃদয় দেখিতে চাহিবে, সুখের কিরণে তাহা দেখিও না; দুঃখ যন্ত্রণার ভিতর দিয়াই তাহা দেখিও। আমাদিগের আর্য্যকবিগণ তাঁহাদিগের কাব্য মধ্যে এত দুঃখ-যন্ত্রণার কথা লিখিয়া গিয়াছেন, এত দুঃখের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন যে, আর কোন দেশের কোন কবি সেরূপ করেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা তাঁহাদিগের কাব্য-চিত্রিত নায়কনায়িকাগণের প্রকৃতহৃদয় পাঠকের চক্ষে ধরিবার জন্য, পৃথিবীর যত ক্লেশ, যত যন্ত্রণা, তাঁহাদিগের উপর চাপাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইতে চাহেন, বিশুদ্ধ স্বর্ণ যেমন অগ্নিপরীক্ষা হইতে আপন উজ্জ্বল কিরণে প্রকাশিত হইয়া, আপনার নির্ম্মলত্বের পরিচয় দিয়া থাকে, উন্নত ও মহৎ হৃদয়ও তেমনি শত দুঃখের ভিতর দিয়া চলিয়া, কাহারও এবং কোনও অবস্থার দ্বারা অনুশাসিত না হইয়া, আপনার বলে, আপনি চলিয়া যায়।

* ছায়া—মহাকবি ভবভূতি বিরচিত 'উত্তর-চরিত' নাটকের তৃতীয় অঙ্ক। উত্তরচরিত-পাঠক ইহা জানেন যে, মহাকবির এই নাটক মধ্যে, এই তৃতীয় অঙ্ক, কাব্যাংশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মহাকবির, মহতী কল্পনার অপূর্ব্ব সৃষ্টি,—এই ছায়া। রবি-কিরণ হইতে এই ছায়াতলে বসিয়া, সন্তপ্ত-হৃদয় জুড়াইয়াছি। এ ছায়া যে কেমন, তাহাই লিখিতে বসিয়াছি।

ইউরোপীয় কাব্যেও দুঃখ-যন্ত্রণার অনেক চিত্র আছে। কিন্তু দুঃখভোগেও তেমন সহিষ্ণুতা, তেমন ধৈর্য্য, তেমন সর্ব্বমাঙ্গল্যে বিশ্বাস,—আর বলিব কি, তেমন আনন্দ, ইউরোপীয় কাব্যে আছে কিনা সন্দেহ! * আর্য্য-কবি, দুঃখের উপর দুঃখের মাত্রা চড়াইয়া দিয়া, অন্ধকারের উপর আরও অন্ধকার ঢালিয়া দিয়া, তাঁহার নায়ক-নায়িকাকে উজ্জ্বলতর আলোকে প্রকাশিত করেন। তাঁহাদিগকে এমনই দেখিতে হয় যে, যেন কোন বাহ্য ঘটনা তাঁহাদিগকে অণুমাত্র অনুশাসিত করিতে সমর্থ হয় নাই!

রামচন্দ্র বনবাস হইতে ফিরিয়া আসিলেন, সীতার সহিত মিলিত হইলেন, রাজ্যলাভ করিলেন; কিন্তু সুখভোগ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। এত দুঃখ যন্ত্রণার ভিতর দিয়া, এত কঠোর পরীক্ষার মাঝে ফেলিয়া দিয়াও কবি তাঁহাকে ছাড়িলেন না, কবির বুঝি এখনও আকাঙ্ক্ষা মিটিল না। তিনি আবার এক যন্ত্রণার মধ্যে রামচন্দ্রকে নিক্ষিপ্ত করিলেন। এ কঠোর যন্ত্রণা—এ ভীষণ পরীক্ষা দেখিয়া, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড স্তম্ভিত হইল! রামচন্দ্র নিরপরাধা সহধর্ম্মিণীকে বনবাস দিলেন! কি দারুণ আঘাত যে, তাঁহার বুকে লাগিল,—তাহা আর কে বুঝিবে? কিন্তু মর্ম্মাহত হইলেও কি রামচন্দ্র কোন দিন কর্ত্তব্য-সাধনে, রাজকার্য্য-পালনে, প্রজাশাসনে, কোন দিন কোন প্রকার অবহেলা করিয়াছেন? সীতা-বিরহ তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে লাগিয়াছে, সীতাশোকে তাঁহার বুকে দিবানিশি আগুন জ্বলিতেছে, কিন্তু তখনও তিনি শরণার্থীর আশ্রয়, পাপের দণ্ডকর্ত্তা, প্রজামণ্ডলীর রক্ষক! তখনও তিনি সেই মহানুভব মহাবীর রামচন্দ্র! কবি দেখাইলেন, এত দুঃখেও তাঁহার রামচন্দ্রের ভাবান্তর হইল না! বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অবাক্ হইয়া সেই দিকে চাহিয়া রহিল!

রামচন্দ্র সীতাকে বনবাস দিলেন। সে সব কথা বলিয়াছি। * তাহার পর বলিয়াছি, কবি সেইখানেই নিরস্ত হন নাই, এখন সেই সব কথা বলিব।

সীতা বনাগমন করিলেন। লক্ষ্মণ সীতাকে বাল্মীকির আশ্রমসমীপে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন অসহায়া, গর্ভিণী সীতা আপন অবস্থা বুঝিলেন, হাহাকারে অরণ্যানী পূর্ণ করিলেন। পাঠক, কল্পনার চক্ষে, সেই নিবিড় অরণ্য মাঝে সেই অসহায়া, পূর্ণগর্ভা, সীতাদেবীর সেই করুণ-মূর্ত্তিখানি দেখ,—কখন কি তাহা ভুলিতে পারিবে? রাজার নন্দিনী, রাজার পুত্রবধূ,—আজ তাঁহার এই দশা! অনন্ত দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্যই কি বিধাতা তাঁহাকে সৃজন করিয়াছেন?

প্রসব-বেদনায় অস্থির হইয়া, নিদারুণ মনঃ-ক্ষোভে, সীতা গঙ্গাপ্রবাহে ঝাঁপ দিলেন। সেখানে তাঁহার দুইটী পুত্র জন্মিল। ভগবতী পৃথিবী ও ভাগীরথী, সীতাকে সেই অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া, দুইটী সন্তান সমেত সীতাদেবীকে পাতালে লইয়া গেলেন। পরে সন্তান দুইটী স্তন-দুগ্ধ পরিত্যাগ করিলে, তাহারা বাল্মীকির আশ্রমে রক্ষিত হইল।

এদিকে, সীতাকে বনবাস দিয়া, রাম রাজ-কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। প্রেমময়ী সীতা-মূর্ত্তি কি তাঁহার হৃদয় হইতে মুছিয়া গেল? তাহাও কি সম্ভব? প্রতি মুহূর্ত্তেই সীতার কথা ভাবিতেন, সীতার বিরহ-যন্ত্রণা প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে দগ্ধ করিত। তথাপি, রামচন্দ্র আপনার রাজধর্ম্ম বিস্মৃত হন নাই! সীতার শোকে, রাজধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেন নাই! তিনি

* চন্দ্রনাথ বাবুর "হিন্দুত্বে" "দুঃখবাদ" দ্রষ্টব্য।

* গত শ্রাবণ মাসের "জন্মভূমি"তে প্রকাশিত "চিত্র-দর্শন" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

রাজ্যশাসনে মনোনিবেশ করিলেন, সামান্য জনের ন্যায় শোকে মুহ্যমান হইয়া, কর্ত্তব্যে অবহেলা করিলেন না।

রামচন্দ্র, অশ্বমেধ-যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতু যজ্ঞাশ্বরক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। একদিন, দৈবাদেশে, রাম অবগত হইলেন, শম্বূক নামে এক শূদ্র তপস্যা করিতেছে। শূদ্রের তপস্যায়, রাজ্যমধ্যে অকাল-মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে। রাম, সেই শূদ্র তপস্বীর শিরশ্ছেদমানসে নানাদেশ ভ্রমণ করিলেন। শেষে পঞ্চবটী বনে আসিয়া, শম্বুকের সহিত সাক্ষাৎ হইল; রাম, শম্বূককে বিনষ্ট করিলেন।

শম্বূক দিব্য পুরুষ। রামের প্রহারে তিনি শাপমুক্ত হইলেন। তখন উভয়ে, পঞ্চবটীর নানাস্থান ঘুরিতে ঘুরিতে, অনেক দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।*

এ সেই পঞ্চবটী! এইখানে, রাম, সীতাকে লইয়া, কত সুখেই অরণ্যবাস-ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন! এইখানে, তাঁহাদের জীবনে, কি মহাঘটনাই ঘটিয়াছিল! আজ কতদিনের পর, রামচন্দ্র সেই পঞ্চবটী-বনে! নির্ব্বাপিত অতীত-স্মৃতি, আজ সহসা, বর্ত্তমানের মূর্ত্তিতে তাঁহার হৃদয়-দ্বারে জাগিয়া উঠিল! তিনি পঞ্চবটীর চারিদিক্ দেখিতে লাগিলেন।

যেখানে যেমনটী ছিল, তেমন আর সকল স্থানেই নাই। পূর্ব্বে যেখানে সরোবর দেখিয়াছিলেন, এখন সেখানে অরণ্যানীতে ভরিয়া গিয়াছে, সরোবর কতদূরে সরিয়া গিয়াছে যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ সকল দেখিয়াছিলেন, তাহারা এখন বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে, ফুলফলে ভরিয়া গিয়াছে। কোন স্থান পাদপ-শ্রেণীর ঘনসন্নিবেশে সতত-শীতল ও শ্যামবর্ণ হইয়া রহিয়াছে; কোন কোন প্রদেশ এতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে যে, আর তথায় দৃষ্টি চলে না। কোথাও নির্ঝরিণীর শ্রুতিমধুর শব্দে চারিদিক্ পূর্ণ হইতেছে, স্থানে স্থানে পুণ্যতীর্থ, মুনিগণের আশ্রমপদ, সুন্দর শৈলমালা, পুণ্য-তোয়া নদী সকল, লক্ষিত হইতেছে। হায়! একবার যেমন দেখিয়াছি, তেমন কি আর দেখা যায়! কালের হস্তে সকলই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কেবল অতীতের সে ছবি হৃদয়মাঝে যে রেখাপাত করিতে সমর্থ হইয়াছে, কালের সাধ্য কি, হৃদয় হইতে সে স্মৃতি মুছিয়া ফেলিবে?

অরণ্যমাঝে ঘুরিতে ঘুরিতে পূর্ব্বস্মৃতি রামের মনে জাগিতে লাগিল। হায়! সীতাকে লইয়া, এই অরণ্যবাসেই তিনি গৃহী, অরণ্যচারী প্রভৃতি সকল সুখেরই অধিকারী হইয়াছিলেন। এই অরণ্যবাসে থাকিয়াও তাঁহার প্রিয়তমা স্বর্গসুখের অধিকারিণী ছিলেন। হায়! আজ সে লক্ষ্মী নাই, সে লক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধানে সকলই গিয়াছে! বিজয়াদশমী দিনে আনন্দময়ী মহামায়া-প্রতিমা গঙ্গাবক্ষে বিসর্জ্জন দিয়া, গৃহে যখন শূন্য চণ্ডীমণ্ডপে তাকাই, প্রাণ ফাটিয়া যায়! রামচন্দ্রও আজ স্বীয় হৃদয়পানে তাকাইয়া, তেমনই দেখিলেন। কতদিনের কত কথা, রামের মনে পড়িতে লাগিল। কোথায় প্রিয়াকে লইয়া বসিয়া থাকিতেন, কোন্ নদী-সৈকতে বৃক্ষমূলে বসিয়া, প্রিয়তমার সহিত কত গল্প করিতেন, কোন্ লতিকার কুসুমরাশি চয়ন করিয়া, স্নেহময়ীর কেশদাম সাজাইয়া দিতেন, পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, পরস্পরের আলিঙ্গনসুখে, কোন স্থানে বসিয়া, শ্রান্তিদূর করিতেন,—কত ভাবনাই তাঁহার হৃদয় মাঝে জাগিতে লাগিল।

* রামায়ণপাঠে অবগত হই, রামচন্দ্র পঞ্চবটী-বনে শম্বূককে বিনষ্ট করিয়া, অগস্ত্যাশ্রমে চলিয়া যান। ভবভূতি, রামচন্দ্রকে পঞ্চবটী-বনে পাইয়া, অমনি অমনি বিদায় করিতে পারিলেন না। তিনি পঞ্চবটী-বনে, রামচন্দ্রকে লইয়া, যাহা যাহা দেখাইলেন, তাহারই বিকাশ—এই ছায়া নামে তৃতীয় অঙ্কে। কাব্যাংশে ইহা অতি সুন্দর। তাহার কতকটা, পাঠককে বুঝাইতে আমার এই স্বল্প প্রয়াস।

সন্ধ্যার আকাশে একটী একটী করিয়া, যেমন নক্ষত্রগুলি ফুটিয়া উঠে, তাঁহার হৃদয়প্রদেশেও তেমনি করিয়া, কতদিনের কত ঘটনা প্রকাশিত হইতে লাগিল। সীতা-বিরহ তাঁহার পদে পদে মনে পড়িতে লাগিল; তিনি শোকে অধীর হইলেন। ব্রণের মুখ ফাটিয়া, শোণিতধারা যেমন বাহির হয়, রুদ্ধ শোকপ্রবাহও আজ অবসর বুঝিয়া, তেমনি অপ্রতিহতবেগে ছুটিল। হায়! মহাবীর রামচন্দ্র আজ শোকপ্রবাহে ভাসিলেন! কোথায় সীতা? সীতা মিলিবে কি?

শম্বূক বিদায় হইলেও পুনর্ব্বার আসিয়া রামকে জানাইলেন যে, অগস্ত্য রামের আগমন শুনিয়া, তাঁহাকে আশ্রমে আমন্ত্রিত করিয়াছেন। রাম অগস্ত্যাশ্রমে চলিলেন।

আজ দ্বাদশ বৎসর হইল, রাম, সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এতদিন হইলেও কি সীতা-বিসর্জ্জন-শোক ভুলিতে পারিয়াছেন? "বৎসরে কি কালের মাপ!" সে আগুন কি কখন নিবিবে? রামের শোক কিরূপ?—

"অনির্ভিন্নগভীরত্বাদন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ।
পুটপাকপ্রতীকাশো রামস্য করুণো রসঃ॥"

কোন পাত্রের মুখ দৃঢ়রূপে বদ্ধ থাকিলে, তন্মধ্যস্থিত পাবক যেমন অবস্থায় থাকে, রামের হৃদয়ে, সীতা-শোকও তেমনিভাবে অবস্থান করিতেছে। প্রচণ্ড শোকানল দিবানিশিই তাঁহার অন্তর দগ্ধ করিতেছে। তিনি নাকি নিতান্ত গম্ভীর-প্রকৃতি, তাই বাহিরে তাহার কিছুমাত্র প্রকাশ নাই। এতদিন রাজ্যে থাকিয়া, রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া, তাঁহার শোক কিছু প্রশমিত ছিল। আজ পঞ্চবটী-বনে আসিয়া, পূর্ব্বস্মৃতি-পীড়িত হইয়া, তাঁহার শোক-প্রবাহ উথলিয়া উঠিল। কে তাঁহাকে আজ রক্ষা করিবে? হায়! সীতা কি মিলিবে না? জীবনের জীবন-স্বরূপিণী সীতা ভিন্ন, এ উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ কে প্রশমিত করিবে?

জনস্থান-প্রবাহিনী নদী সকল দেখিল, আজ বড় বিপদ। সীতা-বিরহে, না জানি, রামের আজ কি সর্ব্বনাশই উপস্থিত হয়! তখন মুরলা-নাম্নী নদী গোদাবরীকে বলিতে চলিল,—"দেবি, আজ রামের বড় বিপদ, তুমি তাঁহাকে সাবধানে রক্ষা করিও। সীতা-শোকে, যখন যখন তিনি অচেতন হইয়া পড়িবেন, সেই সেই সময় তুমি সলিলপূর্ণ কমল-কেশর-সুরভি-সুশীতল তরঙ্গ-বায়ু দ্বারা অল্পে অল্পে তাঁহার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া দিও।"

এদিকে, সীতাদেবীও জনস্থানে আসিয়াছেন। ভগবতী-ভাগীরথী শুনিয়াছেন, শম্বূক-বধের নিমিত্ত রাম জনস্থানে আসিবেন। রাম জনস্থানে আসিলে, সীতাশোকে মুহ্যমান হইবেন, কে জানে কি অনিষ্ট ঘটিতে পারে? তাই কোন গৃহকর্ম্মচ্ছলে, সীতাকে সঙ্গে লইয়া, তিনি সরিদ্বরা গোদাবরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

সীতা জানেন না যে, রাম জনস্থানে আসিয়াছেন। তিনি জানেন, আজ লব-কুশের দ্বাদশ বার্ষিকী জন্মতিথি-উৎসব; দেবী ভাগীরথী তাঁহাকে রঘুকুল-দেবতা সূর্য্যদেবের পূজা করিতে এই জনস্থানে পাঠাইয়াছেন। ভাগীরথীর প্রভাবে, সীতা সকলের অদর্শনীয়া হইলেন, কিন্তু তিনি সকলকে দেখিতে পাইবেন।

তখন সেই ছায়ারূপিণী সীতা জনস্থানে চলিলেন। তমসা-নাম্নী নদীকে সীতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন। ভাগীরথীর আদেশে, তমসা, সীতার পার্শ্ববর্ত্তিনী রহিলেন। এই ছায়াময়ী সীতা হইতে, কবি তাঁহার এই উৎকৃষ্ট নাটকের তৃতীয় অঙ্কের নাম রাখিয়াছেন—ছায়া। এই ছায়া, পাঠক কি চিনিয়াছ? "এই ছায়া, সেই বহুকাল-বিস্মৃতা, পাতাল-প্রবিষ্টা, শীর্ণদেহমাত্রবিশিষ্টা, রামমনোমোহিনী সীতার ছায়া।" শোকসন্তাপ হইতে

রামকে রক্ষা করিবার জন্য, ভাগীরথী এই ছায়া জনস্থানে পাঠাইলেন।

সীতাকে ছায়াময়ী করিয়া, কবি, আশ্চর্য্য কৌশল অবলম্বন করিলেন! সীতা ও রামের এ স্থানে সাক্ষাৎ হওয়া বিধি নহে; মূল-রামায়ণেও তাহা নাই। অথচ পঞ্চবটী-বনে আসিয়া, জনস্থান দর্শনে, রামের হৃদয়ে যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল,—কবি তাহাও দেখাইতে যেমন ব্যগ্র, রাম-বিরহে, আজন্ম-দুঃখিনী সীতাদেবীর কারুণ্যে-ও-মধুর মূর্ত্তিখানি দেখাইতেও তিনি তেমনি ব্যগ্র। আবার কেবল তাহাই নহে। রাম ও সীতা, দুইজনকে পাশাপাশি রাখিয়া, দুইজনের মূর্ত্তি দেখাইতে তিনি অধিকতর ব্যগ্র। রামকে আজ দ্বাদশ বৎসরের পর দেখিতে পাইলে, সীতার হৃদয়ে যে তরঙ্গ উঠিবে, কবি তাহাও দেখাইতে চাহেন। কিন্তু তাহা হইবে কিরূপে? দেখা ত হইতে পারে না! এইজন্য রামের দর্শন হইতে দূরে রাখিতে, তিনি সীতাকে ছায়াময়ী করিলেন। ছায়া-সীতা সকলকে দেখিতে পাইবেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইবে না। আবার শোক-সন্তপ্ত রামচন্দ্রকে রক্ষা করারও প্রয়োজন। কে তাঁহাকে আজ রক্ষা করিবে? দশানন-বিজয়ী মহাবীর রামচন্দ্র আজ সীতা-শোকে এমনই হইবেন যে, সীতা ভিন্ন সে শোকানল কেহই নিবাইতে পারিবে না! কবি, সেইজন্য, এই ছায়াময়ীকে জনস্থানে আনিলেন। আশ্চর্য্য কৌশলে, তিনি সকল দিক্ বজায় রাখিলেন।

রামচন্দ্রকে তিনি অন্য মূর্ত্তিতে আনিতে পারেন না। সবই গোলমাল হইয়া যাইত। আনিতে পারা সম্ভব হইলেও, কবির হয়ত মনে হইয়াছিল—"বেগবান্ হৃদয়কে বিশ্বাস নাই।" *

সীতা যে কারণে ছায়া-রূপিণী হইলেন, আমি তাহা বলিয়া আসিয়াছি। এখন একটা কথা এই,—ছায়া বলিলে, আমরা সাধারণতঃ যাহা বুঝি, এখানে তাহা বুঝিলে চলিবে না। যাহা অসার, অনিত্য, অস্থায়ী, তোমরা তাহাকেই বল ছায়া! ছায়ার প্রকৃত অর্থ, ছায়ার আকৃতিতে লুকান আছে! দার্শনিকের চক্ষু লইয়া, ছায়ার আকৃতি পানে তাকাইও, প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইবে। বুঝিতে পারিবে, আপনার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতে না পারিলে, ছায়া হওয় যায় না! * ছায়া, অসার পদার্থ বলিও না।

সীতা আজ ছায়াময়ী হইয়াছেন। ছায়াময়ীর কথাগুলি শুনাইবার জন্য, কবি, সীতার পার্শ্বে, তমসাকে রাখিয়া দিয়াছেন। পাঠক সেই পূর্ণগর্ভা সীতাকে চিত্রদর্শন করিতে করিতে নিদ্রালসা দেখিয়াছেন; বাল্যে, বিবাহের পর যে রামবাহু সীতার উপাধান; যৌবনে, অরণ্য-বাসে, বৃক্ষতলে—পর্ণকুটীরেও যে রামবাহু সীতার উপাধান, সেই চিত্রদর্শন সময়ে, সেই রামবাহুই উপাধান করিয়া, যে নিদ্রিতা সীতা-মূর্ত্তি দেখিয়াছ, তাহার পর আজ দ্বাদশ বৎসর গিয়াছে! তখনকার সেই মূর্ত্তি, আর আজ? আজ আর সে রূপ নাই, সে সৌন্দর্য্য নাই, সে কিছুই নাই!

"পরিপাণ্ডু দুর্ব্বলকপোলসুন্দরং
দধতী বিলোলকবরীকমাননম্।
করুণস্য মূর্ত্তিরিব বা শরীরিণী
বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী॥"

সীতা, জনস্থানে প্রবেশ করিলেন। রাম-

---

* তোমরা হয়ত বলিবে, রামচন্দ্রের প্রতি এ প্রকার অবিশ্বাস, কবির উচিত হইত না। যদি সমালোচকের আসন গ্রহণ করিয়া বসিতাম, হয়ত বলিতে সাহস করিতাম যে, মহাকবি ভবভূতির হস্তে রামচরিত্র সকল স্থানে, সম্যক্‌রূপে রক্ষিত হয় নাই এবং এ প্রকার অবিশ্বাস করিলে, ন্যায়-সঙ্গত বিচারের কোন ব্যতিক্রম ঘটিত না। কিন্তু সে কথা যাউক।

* চন্দ্রনাথ বাবুর "ত্রিধারা"র—"ছায়া" দ্রষ্টব্য।

বিরহে তাঁহার মনোহর কপোলদেশ নিতান্ত পাণ্ডুবর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়াছে, কবরী বিলোল হইয়া, মুখের উপর পতিত হইয়াছে; তাঁহাকে মূর্ত্তিমান্ করুণরসের আকৃতি, অথবা শরীরধারিণী বিরহব্যথা বলিয়া বোধ হইতেছে!

পতিবিরহে সতীর কি দুর্দ্দশাই হইয়াছে:—

"কিসলয়মিব মুগ্ধং বন্ধনাদ্বিপ্রলূনং
হৃদয়কুসুমশোষী দারুণো দীর্ঘশোকঃ।
গ্লপয়তি পরিপাণ্ডু ক্ষামমস্যাঃ শরীরং
শরদিজ ইব ঘর্ম্মঃ কেতকীগর্ভপত্রম্॥"

শরৎকালের সুতীব্র রবিকিরণ যেমন কেতকী পুষ্পের হৃদয় বিশোষিত করে, সেইরূপ সুদারুণ দীর্ঘ শোক সীতার সুকোমল হৃদয়-কুসুমকে বিশোষিত করিয়াছে, এবং বৃন্তবিচ্ছিন্ন মনোহর কিসলয়ের ন্যায় ইহাঁর বিরহকৃশ পাণ্ডুবর্ণ শরীরকে নিতান্ত বিশীর্ণ করিয়াছে!

এ মূর্ত্তি কি কখন ভুলিবার?

সীতা জনস্থানে প্রবেশ করিলেন। সূর্য্যদেবের পূজার জন্য, তিনি কুসুমচয়নে ব্যগ্রহস্তা; কিন্তু হাঁ! এ ত সেই জনস্থান! এইখানে না সীতা রামসমভিব্যাহারে কতদিন অতিবাহিত করিয়াছেন? রাজলক্ষ্মী বনবাসিনী হইয়া, পতির সোহাগে থাকিয়া, কি সুখেই না সকল দুঃখ যন্ত্রণা কাটাইয়াছিলেন? সে ত এই জনস্থান! তাঁহার জীবননাটকের এক অপূর্ব্ব অঙ্ক, এই খানেই অভিনীত হইয়াছে! আজ আবার কতদিনের পর, সীতা সেই জনস্থানে আসিলেন!

বনদেবী বাসন্তীও আজ জনস্থানে রহিয়াছেন। তিনি সীতার সেই পূর্ব্ব অরণ্যবাসের সখী। বাসন্তীর সহিত কত আমোদ প্রমোদেই তিনি দিন কাটাইতেন। ইতিপূর্ব্বে বাসন্তী, সীতা-নির্ব্বাসন-বৃত্তান্ত সমস্তই অবগত হইয়াছেন। কিন্তু তিনিও জানেন না যে, সীতা জনস্থানে আসিয়াছেন, কিংবা তিনিও সে ছায়া-সীতা দেখিতে পাইবেন না।

পূর্ব্ব অরণ্যবাসকালে, সীতা এই জনস্থানে থাকিয়া, একটী করিশাবককে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। সেই করিশিশু আজও সেইখানে আছে। সে এই মাত্র আপন বধূসঙ্গে জলপানে গিয়াছিল; এক মত্ত যূথপতি আসিয়া অকস্মাৎ তাহাকে আক্রমণ করিল। বাসন্তী তাহা দেখিতে পাইয়া, চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

সেই চীৎকার, সীতার কর্ণে গেল। বাসন্তীর কণ্ঠস্বর তিনি চিনিলেন। মহাভ্রমে তিনি পতিতা হইলেন! সেই জনস্থান, সেই প্রিয়সখী বাসন্তী, সেই তাঁহার যত্নপ্রতিপালিত করিশিশু, চারিদিকে সেই পূর্ব্বস্মৃতি,—সীতার ভ্রম হইল! তিনি বর্ত্তমান ভুলিয়া গেলেন। আকুলপ্রাণে কাঁদিয়া উঠিলেন,—"আর্য্যপুত্র! আমার পুত্র-করিশাবকটীকে রক্ষা কর!"

কি ভ্রান্তি!

স্নেহময়ী সীতা, হৃদয়গুণে বনের পশুপক্ষী গুলিকেও আপন করিয়া লইয়াছিলেন। আহা! সীতার হৃদয় কত ভালবাসই বাসিতে পারে, কত ভাবনাই ভাবিতে পারে! করিশিশুর জন্য তিনি ব্যথিতা হইলেন, ব্যথিতপ্রাণে আর্য্যপুত্রকেই ডাকিয়া ফেলিলেন! আর্য্যপুত্র ভিন্ন, সীতা আর কি জানেন? আর্য্যপুত্রই তাঁহার জপ, তপ, তাঁহার ধ্যান ধারণা, তাঁহার সব। আবার সেই জনস্থান, সেই প্রিয়সখী বাসন্তীর কণ্ঠস্বর,—ভ্রান্তি হইবেনা ত কি?

কিন্তু হায়! "আর্য্যপুত্র কোথায়? আজ দ্বাদশ বৎসর হইল, দেখা নাই!" সীতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তখন তমসা সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন।

এদিকে, রাম, অগস্ত্যাশ্রম হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। পঞ্চবটী-ভ্রমণ করিবার ইচ্ছায়, একস্থানে রথ রাখিতে বলিলেন।

সীতার কর্ণে রামের কণ্ঠস্বর

পৌঁছিল। সে চিরপরিচিত মধুরকণ্ঠ, সীতার কর্ণকুহর দিয়া মর্ম্ম স্পর্শ করিল, সীতা জাগিয়া উঠিলেন।

"অম্ব হে! জলভরিদমেহথণিদগম্ভীর-মংসলা কুদো ণু এসা ভারদী? ণিগ্ধসভরন্তকন্ন-বিবরং মংপি মন্দভাইণীং ঝত্তি উস্মাবেদি।"

—"আহা! জলপূর্ণ মেঘের শব্দের ন্যায়, এই গম্ভীর কণ্ঠস্বর কোথা হইতে আসিল? এ স্বর যে কর্ণবিবরে প্রবেশ মাত্র এ হতভাগিনীকে আনন্দিত করিয়া তুলিল!"

আজ কতদিনের পর রামের কণ্ঠস্বর, সীতা শুনিলেন। সে কণ্ঠে কি সুধা ছিল, তৃষিতহৃদয় সীতার প্রাণ যেন জুড়াইয়া গেল! তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন।

এ ভাব দেখিয়া, তমসার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। তিনি সাশ্রুনয়নে, অথচ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"অয়ি বৎসে!

"কিমব্যক্তেঽসি নিনদে কুতস্ত্যেঽপি স্বমীদৃশী।
স্তনয়িত্নোর্ময়ূরীব চকিতোৎকণ্ঠিতা স্থিতা॥"

"মেঘের ডাকে ময়ূরী যেমন চকিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে, কেন বাছা, তুইও তেমনি একটা অপরিস্ফুট শব্দ শ্রবণে তেমনি ব্যাকুলা হইলি?"

সীতা বলিলেন,—"কি বলিলে ভগবতি! এ শব্দ অপরিস্ফুট? আমি যে কণ্ঠস্বরেই বুঝিয়াছি, এ আমার আর্য্যপুত্রের কণ্ঠস্বর!"

সীতার কি ভুল হইতে পারে? সীতা কি এ কণ্ঠস্বর কখন ভুলিতে পারেন? শত দুঃখ কষ্টের মাঝেও রামচিন্তাই তাঁহার সর্ব্বস্ব। হৃদয়ের মধ্যে যাহাকে দিবানিশি ধ্যান করি, তাহার কোন-কিছু কি ভুলিতে পারি? তোমার আমার নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া অনেক জিনিষ ভুলিয়া যাই, কিন্তু রমণীহৃদয়ে যে কখনও বিন্দুপরিমিত স্থান পাইয়াছে, সে আর সে হৃদয় হইতে শীঘ্র বিলুপ্ত হইবার নহে। ভালবাসার পদার্থকে, রমণীর ন্যায়, কয় জন ভালবাসিতে পারে? তেমন আত্মবিস্মৃত হইয়া, জগৎবিস্মৃত হইয়া, ভালবাসার পদার্থকে অন্তরে ভাবা, পুরুষের সাধ্য নহে! প্রিয়জনের কথাটী, হাসিটী, এমন কি কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত, রমণী এমনই করিয়া চিনিয়া রাখে যে, তোমার আমার সে সাধ্য নাই যে, চিনিয়া বুঝিতে পারি। কথাটা এই যে, পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকের অন্তর্লীনতা বড় বেশী। স্ত্রীলোক স্নেহের বস্তুকে কেবল চোখের উপর রাখিতে চাহে, দূরে রাখিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। তাই যখন প্রিয়জনের সহিত বিচ্ছেদ ঘটে, প্রিয়জন যখন প্রবাসে, রমণী তখন অন্তরের অন্তরে লুকাইয়া, কেবল কল্পনার বলে প্রিয়জনকে প্রত্যক্ষ করেন। সে কল্পনা বড় সাধারণ কল্পনা নহে। পুরুষকে সে কল্পনা লইয়া থাকিতে হইলে, পুরুষের সংসার করিতে হইত না। অন্তর্লীনতা স্ত্রীজাতির বেশী বলিয়াই, তাহারা প্রিয়জনের চিন্তায় একেবারে তন্ময়ী হইয়া থাকিতে পারে, আর তাই তাহার কিছুই ভুলে না। তেমন করিয়া ভাবিতে, মনে রাখিতে, অল্প ইঙ্গিতে চিনিতে কি বুঝিতে,—পুরুষ কস্মিন্‌কালেও পারে না। সীতা কণ্ঠস্বরেই রামচন্দ্রের কণ্ঠস্বর বুঝিবেন, বিচিত্র কি?

তখন তমসা দেখিলেন, আর লুকান বৃথা; তিনি বলিলেন,—"শুনিয়াছি, শূদ্রতপস্বী শম্বূক বধের নিমিত্ত রামচন্দ্র এই জনস্থানে আসিয়াছেন।"

রামচন্দ্র জনস্থানে আসিয়াছেন, সীতাও সেই জনস্থানে! আজি দ্বাদশ বৎসরের পর! আবার কেবল কালের পরিমাণ নহে, রাম এই দ্বাদশ বৎসর সীতাকে বনবাস দিয়াছেন বনবাস দিয়াছেন, তাহাও বিনাপরাধে! রামচন্দ্র আসিয়াছেন শুনিয়া সীতার আনন্দও হইল না,

দুঃখও হইল না, কিংবা অভিমানও হইল না। তিনি বলিলেন কি?—

"দিট্ঠিআ অপরিহীণরাঅধম্মো ক্খু সো রাআ।"

"সৌভাগ্যক্রমে সে রাজা রাজধর্ম্মে অবিচলিত আছেন।"

এমন কি আর শুনিব? দ্বাদশ বৎসরের পর, স্বামী নিকটে, আবার সে দ্বাদশ বৎসরই বা কেমন! এতদিনের পর, রামচন্দ্র আসিয়াছেন শুনিয়াও ঐ কথা!—এমন আর শুনিব কি? তোমায় আমায় হয় ত মনে করিয়াছিলাম, রামের আগমন সংবাদে সীতা আনন্দে গলিয়া যাইবেন, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, ছুটিয়া রামের কাছে যাইবেন, "কৈ প্রাণাধিক" বলিয়া রামের পদতলে পড়িবেন; নয় ত অভিমানে গর-গর করিতে করিতে বলিবেন,—"হা আর্য্যপুত্র! এই কি তোমার ধর্ম্ম? আমি কোন্ অপরাধে অপরাধিনী যে, তুমি আমাকে বনবাস দিলে?" কিন্তু সীতা এ সকল কিছুই করিলেন না। রাম আসিয়াছেন শুনিয়া, বলিলেন কি না,—"সৌভাগ্যক্রমে সে রাজা রাজধর্ম্মে অবিচলিত আছেন!" তাই বলিতেছিলাম, এমন আর শুনিব কি? আবার বলি, এমন না হইলে কি ভারতবাসীর বুক চিরিয়া এ সতী-প্রতিমা এমন করিয়া হৃদয়ে স্থান পাইতেন?

ছায়াময়ী সীতা রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইলেন। কেমন দেখিলেন?—

"হা কধং পহাদচন্দমণ্ডলাবণ্ডুরপরিক্খামদুব্বলেণ আআরেণ, অঅং সোম্মগম্ভীরাণুভাবমেত্তপচ্চভিআণিদো অজ্জউত্তো জ্জেব।"

"আহা! প্রিয়তমের শরীর প্রভাতের চন্দ্রের ন্যায় বড় কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়াছে; কেবল সেই সৌম্য ও গম্ভীর প্রভাব ইঁহাতে অবশিষ্ট আছে, তাহা দেখিয়াই আর্য্যপুত্র বলিয়া চিনিতে পারিতেছি।" রামের এই অবস্থা দেখিয়া, সীতার প্রাণ আকুল হইল, তিনি তমসার কণ্ঠ জড়াইয়া বলিলেন,—"আমায় ধর!" এই বলিয়াই তিনি মুর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তমসা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন।

রাম পঞ্চবটী দেখিতে দেখিতে আকুল হইলেন। সীতা-বিরহ তাঁহার পদে পদে মনে পড়িতে লাগিল। আকুল-ক্রন্দনে তিনি জনস্থান পূর্ণ করিলেন। "হা সীতা! হা রামের জীবন-সর্ব্বস্ব!" বলিতে বলিতে চারিদিকে ছুটিলেন। ভাগীরথী যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। রাম বলিতে লাগিলেন,—"এই জনস্থানে আসিয়া, কি প্রবল মোহেই অভিভূত হইলাম! হৃদয়ের শোকানল দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল! হা সীতা, হা বিদেহরাজপুত্রি! তুমি কোথায়?" বলিতে বলিতে তিনি মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তখন সীতা কাতরা হইয়া তমসার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন,—"ভগবতি! রক্ষা করুন, আমার আর্য্যপুত্রের জীবনদান করুন।" তমসা বলিলেন,—"কল্যাণি! তুমি স্পর্শ কর, তোমারই স্পর্শে, তোমার স্বামী বাঁচিবেন।"

তমসা যথার্থই বলিয়াছেন, সীতার স্পর্শ ব্যতীত সীতা-বিরহে-মুর্চ্ছিত রামচন্দ্রের চৈতন্য-সম্পাদন আর কে করিবে? হিমানীর প্রচণ্ড পীড়নে যে বৃক্ষবল্লরী মৃতপ্রায় হইয়াছে, বসন্তের কোমল স্পর্শ ব্যতীত কে তাহাতে সজীবতা আনিয়া দিবে?

সীতা বলিলেন,—"জং হোদু তং হোদু, জহা ভঅবদী ভণাদি।" "যা হৌক, তা হৌক, এখন ভগবতী তমসা যাহা বলিতেছেন, তাহাই করি।" * এই বলিয়া, ছায়াময়ী, রামকে স্পর্শ

* তমসার কথায় সীতা বলিলেন,—"যা হউক, তা হউক, ভগবতী তমসা বলিতেছেন, অতএব আমি স্পর্শ করি।"—এ কথাটার অর্থ কি? পরমারাধ্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন, "সীতা ভাবিতেছেন,—'আমার পাণিস্পর্শে আর্য্যপুত্র বাঁচিবেন কিনা জানি

করিলেন। সে স্পর্শে রামের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল।

রাম বুঝিতে পারিলেন না, কি হইয়া গেল! কেহ কি তাঁহার শরীরে হরিচন্দন লেপিয়া দিল? না কেহ চন্দ্রকিরণ-রস তাঁহার শরীরে ঢালিয়া দিল? আহা হা! এমন স্পর্শ কি আর হয়? এ যে সেই চিরপরিচিত সীতা-কর-স্পর্শ! রামের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল বটে, কিন্তু এ স্পর্শসুখে বুঝি আবার নূতন মোহ উপস্থিত হয়!

তিনি নিশ্চয় বুঝিলেন, ইহা সীতারই কর-স্পর্শ! কিন্তু সীতা ত কোথাও নাই! তখন রাম আবার আকুল ক্রন্দনে জনস্থান পূর্ণ করিলেন।

ছায়াময়ী সীতাকে রাম ত দেখিতে পাইতেছেন না। কি যন্ত্রণা দেখ দেখি! যাহার জন্য প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, হৃদয় একান্ত উৎকণ্ঠিত সে নিকটেই রহিয়াছে, তাহার করস্পর্শজনিত সুখলাভও হইতেছে,—অথচ সে থাকিয়াও নাই, নয়ন তাহাকে পাইতেছে না! এমনই-তর কষ্টের মাঝে ফেলিয়া দিয়া, আর্য্যকবি কি আনন্দই পাইতেছেন! যে বলিয়াছিল, এইরূপে সীতাকে কাছে কাছে রাখিলে, সীতা-বিরহ-ক্লিষ্ট রামের অনেক যন্ত্রণার লাঘব হইবে, সে কি তবে ভুল বুঝিয়াছিল?

পাঠক, সীতার সেই করিশাবকটী ভুলিবেন

না, কিন্তু ভগবতী বলিতেছেন বলিয়া আমি স্পর্শ করিব'।" ইহাতে অবশ্য ইহাই বুঝাইতেছে, পাণি-স্পর্শ সফল হইবে কিনা, সীতার সেই সন্দেহ হইতেছে। শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু বলেন, এ অর্থে ওকথা ব্যবহৃত হয় নাই। তাঁহার মতে, "সীতা ভাবিতেছেন, 'রামকে স্পর্শ করিবার আমার কি অধিকার? রাম আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি আমাকে বিনাপরাধে বিসর্জ্জন করিয়াছেন—বিসর্জ্জন করিবার সময় একবার আমাকে ডাকিয়াও বলেন নাই যে, আমি তোমাকে ত্যাগ করিলাম। আজি বার বৎসর আমাকে ত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ-রহিত করিয়াছেন, আজি আবার তাঁহার প্রিয়পত্নীর মত তাঁহার গাত্রস্পর্শ করিব কোন্ সাহসে? কিন্তু তিনি ত মৃতপ্রায়! যা হউক, তা হউক, আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিব।"

রাম চৈতন্যলাভ করিলে, তমসা ও সীতার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমরা ইহাই বুঝি যে, পাণিস্পর্শ সফল হইবে কিনা, সে সন্দেহ সীতার হয় নাই। সে হিসাবে, বঙ্কিম বাবুর অর্থই আমাদের সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বঙ্কিম বাবু সীতার কথার যেরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহাতে সীতার দুর্জ্জয় অভিমান প্রকাশ পাইতেছে। "রামকে স্পর্শ করিবার আমার কি অধিকার? তিনি আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, ... আজি বার বৎসর আমাকে ত্যাগ করিয়া সম্বন্ধ-রহিত করিয়াছেন, আজি আবার তাঁহার প্রিয়-পত্নীর মত তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিব কোন্ সাহসে!"—এ সকল দুর্জ্জয় অভিমানের কথা। বঙ্কিম বাবুর অপূর্ব্বসৃষ্টি যে "ভ্রমর", তাহাতেও এত অভিমান আছে কিনা সন্দেহ। এ অভিমানের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব রহস্য আছে, হিন্দু-কবি ভিন্ন হিন্দুরমণীর সে অভিমানের রহস্য আর কেহ দেখাইতে পারে কি না জানি না। কিন্তু একটা কথা এই যে, সময় ও ঘটনা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সীতার ঐ অভিমান কি ওখানে খাটে? পত্নীর প্রতি সহস্র অত্যাচার করিয়া, সহস্র প্রকারে অপরাধী হইলেও, পতি যখন মৃতপ্রায়, পত্নী কি তখন তাহার স্বামীর পূর্ব্ব অপরাধ স্মরণ করিয়া থাকে? সব ভুলিয়া গিয়া, মৃতপ্রায় পতির জীবন-লাভের জন্য সাধ্বী কি না করিতে পারেন? আবার যেমন স্বামী স্ত্রী নহেন,—রাম ও সীতা! রাম "হা সীতা, হা সীতা" করিয়া মূর্চ্ছিত, আর সীতা ভাবিতেছেন,—"তোমাকে স্পর্শ করিবার আমার অধিকার নাই, তুমি আমাকে বিনাপরাধে ত্যাগ করিয়া আজ বার বৎসর সম্বন্ধ-রহিত করিয়াছ। কিন্তু তুমি মৃতপ্রায়, যা হউক, তা হউক, আমি স্পর্শ করিব।" একথা না বলিয়া, বোধ হয় এইরূপ ভাবিলে, ঠিক সীতার-মত ভাবাই হইত,—"আমারই জন্য আর্য্যপুত্র মূর্চ্ছিত। আমি স্পর্শ করিলে কি ইনি বাঁচিয়া উঠিবেন। স্পর্শ করিলে, আর্য্যপুত্র রাগ করিবেন না ত? রাগ করেন, করুন, আমি ইহাঁকে স্পর্শ করিব।" সীতা যেন কত অপরাধিনী, তাই ভয়ে ভয়ে যেন রামকে স্পর্শ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। পরিত্যক্তা সীতার স্পর্শে রামচন্দ্র কুপিত হন হউন, সতী বুক পাতিয়া তাহাও গ্রহণ করিতে পারেন; তাই বলিলেন,—"যা হউক, তা হউক, আমি স্পর্শ করিব।"

না। সে আপন বধূ-সঙ্গে জলপানে যাইলে, একটা মত্ত যূথপতি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল; তাহার রক্ষার্থ, বনদেবী বাসন্তী চীৎকার করিয়াছিলেন,—সে কথা বলিয়াছি। এখন আবার বাসন্তীর সেই চীৎকার। করিশিশুটীকে রক্ষা করিবার জন্য রামচন্দ্র উঠিলেন। বাসন্তীর সহিত রামের সাক্ষাৎ হইল, পরস্পর পরস্পরকে চিনিলেন।

রামচন্দ্র দেখিলেন, সীতার করিশিশুটী ইতিমধ্যে শত্রুজয় করিয়াছে; এক্ষণে স্বীয় প্রিয়তমা করিণীর সহিত ক্রীড়া করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া, রাম বলিলেন,—"বৎস, সর্ব্বত্র বিজয়ী হও।"

বাসন্তীও "ছায়াময়ী" সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। ভাগীরথীর প্রভাবে আজ কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না। সীতা, তমসাকে বলিলেন,—"দেবি! চল, আমরাও আর্য্যপুত্রের অনুসরণ করি।"

রাম দেখিতেছেন, করিশিশুটী তাহার প্রিয়তমার সহিত কত ক্রীড়া করিতেছে। কখন সে মৃণালখণ্ড লইয়া প্রণয়িনীকে খাওয়াইতেছে, কখন বা শুণ্ডাগ্রে কমল-সুরভি-সলিল টানিয়া লইয়া তাহাকে পান করাইতেছে। কখন বা প্রণয়িনীকে স্নান করাইয়া দিতেছে এবং স্নানের পর রবিকিরণ হইতে প্রিয়তমাকে ছায়া দিবার জন্য মৃণালপত্রের ছত্র, তাহার মাথার উপর ধরিতেছে! রাম বাসন্তীকে বলিতেছেন,—"সখি! দেখ, এ কেমন প্রিয়ার মনোরঞ্জন করিতে শিখিয়াছে!"

সীতা, করিশাবকটীকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—"এঁ্যা! এত বড়টী হইয়াছে?" এই অরণ্যবাসে থাকিয়া, সীতা পুত্রনির্ব্বিশেষে এই করিশিশুটীকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন,—সে আজ কতদিনের কথা! সেই করিশিশুটী এত বড় হইয়াছে? সীতা যেন অবাক্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। এই করিশাবক যখন অতি শিশু ছিল, নবীন-মৃণাল-পত্রের ন্যায় স্নিগ্ধ ও সুকোমল নবোদ্গত দন্ত দ্বারা সে কেমন বনবাসিনী সীতাদেবীর কর্ণাভরণ হইতে লবলী-পল্লব টানিয়া লইত! সেই আজ এত বড়টী হইয়াছে, সেই আজ প্রতিদ্বন্দ্বী গজপতিকে হারাইয়া দিয়াছে! সীতা আনন্দান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"আহা, বাছা আমার দীর্ঘজীবী হউক, এই মধুরদর্শনা করিণীর সঙ্গে চিরদিনই একত্রে থাকুক,—কখন যেন ইহাদের বিচ্ছেদ না হয়!"

বিচ্ছেদের ভয়টা সীতার কত! এমন যন্ত্রণাই বা আর কে পাইয়াছে?

করিশাবকটী দেখিয়া, দুঃখিনী সীতার লব-কুশ পুত্র দুটীকে মনে পড়িল। আহা! তাহারাও এতদিনে কত বড় হইয়াছে! সীতা কি কেবল স্বামিসহবাস-সুখে বঞ্চিতা? পুত্রমুখ-দর্শনেও দুঃখিনী বঞ্চিতা! এমন দুঃখিনী কি আর কোথাও দেখিয়াছ?

সন্তান দুইটীর কথা মনে করিয়া, সীতা বলিলেন,—"হায় রে দুঃখিনীর পুত্র দুটী! কেন তোরা এ অভাগিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলি? আহা, বাছাদের সে চাঁদমুখে কি সুধাহাসিই লাগিয়া রহিয়াছে, আর্য্যপুত্র একবার বাছাদের সে চাঁদমুখ চুম্বন করিলেন না!"

মায়ের প্রাণে একি কম দুঃখ?

সীতা বলিতে লাগিলেন,—"ভগবতি তমসে! পুত্র দুটীর কথা মনে পড়াতে এই দেখ, আমার স্তনযুগল হইতে দুগ্ধধারা নির্গত হইতেছে, আর আমি তাহাদের পিতার সম্মুখে আছি বলিয়া, যেন বোধ হইতেছে, আমি সংসারী হইয়াছি।"

এই অল্প কথায়, সীতা-চরিত্র কি মধুর ফুটিয়াছে! কি সুন্দর স্বাভাবিক উক্তি!

বাসন্তী, রামকে একে একে কত স্থান, কত স্থানের কত দৃশ্যই দেখাইতেছেন। সীতা একটী ময়ূর পুষিয়াছিলেন। সেটী আজও জীবিত

আছে। বাসন্তী, রামকে তাহা দেখাইয়া দিলেন। ময়ূরটী নিজ প্রিয়ার সহিত এক কদম্বশাখাতে বসিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে, কখন বা মধুর শব্দ করিতেছে। সীতা নিজহস্তে সেই কদম্ব বৃক্ষটী পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, তখন সবে মাত্র তাহাতে দু'একটী পুষ্পোদ্গম হইয়াছিল। এখন তাহা ফুলপত্রে ভরিয়া গিয়াছে। তাহারই শাখায় বসিয়া, ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করিতেছে। সীতা ময়ূরটীর পানে চাহিয়া, সজলনয়নে বলিলেন,—"হাঁ, এই আমার সে পুত্রটী বটে।" রামের মনে পড়িল,—সীতা করতালি দিতেন, তালে তালে মণ্ডলাকারে ময়ূরটী কেমন নৃত্য করিত, তাহার নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সীতার চক্ষুও কেমন পল্লব মধ্যে ঘুরিত!—হায় রে, আজিও ত সেই কদম্ব-তরু, সেই কদম্ব-শাখাতে সেই ময়ূর,—তবে সে সুখ, সে আনন্দ নাই কেন?

বাসন্তী, রামকে ডাকিলেন। একস্থানে চারিদিকে কদলীবন, তাহার অভ্যন্তরে একখণ্ড শিলা পতিত রহিয়াছে, রাম সেইখানে সীতাকে লইয়া শয়ন করিতেন। সেই শিলাতলে বসিয়া, সীতা হরিণ-শিশুগুলিকে তৃণ খাওয়াইতেন,—আজও তাহারা তাহা ভুলে নাই, আজও সেই পূর্ব্বপ্রেমের টানে, এখনও তাহারা সেইখানে আসে।—বনের পশুপক্ষী, তাহারা ত কিছুই ভুলে না,—হায় রে! আমরাই কেবল ভুলি!

বাসন্তী রামকে সেইখানে বসিতে বলিলেন। রাম কি সে স্থানে বসিতে পারেন? চক্ষুজলে তাঁহার বুক ভাসিতে লাগিল। তিনি অন্যত্র বসিলেন।

রাম, সীতাকে বনবাস দিয়াছেন, প্রিয়সখী বাসন্তীর প্রাণে নাকি বড়ই লাগিয়াছে, তাই বিবিধ প্রকারে তিনি রামের মনে কষ্ট দিতে লাগিলেন। হায়! স্নেহময়ী সীতার প্রাণে তাহা সহিবে কেন? তিনি বাসন্তীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। পাঠক! মনে রাখিবেন, তমসা ভিন্ন আর কেহ ছায়াময়ী সীতাকে দেখিতে কিংবা তাঁহার কথা শুনিতে পাইবে না। বাসন্তী জানেনও না যে, তাঁহার প্রিয়সখ সীতা তাঁহাদেরই কাছে কাছে রহিয়াছেন।

রামের অবস্থা দেখিয়া, বাসন্তীর একটু দয়াও হইল। সীতা-নির্ব্বাসন যদিও তাঁহার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু সীতাশোকে মুহ্যমান রামচন্দ্রের সে মূর্ত্তি দেখিয়া, কেই বা স্থির থাকিতে পারে? বাসন্তী, সীতাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"সখি! কোথায় আছ, একবার আসিয়া দেখিয়া যাও, তোমার বিরহে, তোমার রামের কি দশাই ঘটিয়াছে! তুমি যাঁহার কোমল কমল-নিন্দিত অঙ্গ-সন্দর্শনে চক্ষু পরিতৃপ্ত করিতে, যাঁহাকে বার বার দেখিয়াও তোমার দেখা-সাধ মিটিত না, সখি! একবার আসিয়া দেখিয়া যাও, তোমার সে রাম আর নাই! তোমার শোকে তিনি এমনই মলিন ও কৃশ হইয়াছেন যে, আজ অতি কষ্টেই তাঁহাকে চিনিতে হয়! কিন্তু তবু সখি! তাঁহার স্বভাবসুন্দর মূর্ত্তিটী আমাদের সেইরূপই মধুর-দর্শন রহিয়াছে!"

ছায়াময়ী বলিতে লাগিলেন,—"তাহা দেখিতেছি সখি!—হা দৈব! আর্য্যপুত্র আমায় ছাড়িয়া থাকিবেন, আমিও তাঁহার দূরে থাকিব,—স্বপ্নেও এ কথা কে ভাবিয়াছিল? এখন আমি আঁখি-জলের অবসরে, জন্মের-মত আমার জীবনসর্ব্বস্বকে দেখিয়া লই!"

রামকে দেখিতে দেখিতে সীতার চক্ষু জলপূর্ণ হইতেছে। আঁখিজল গড়াইয়া পড়িতেছে, আবার কোথা হইতে জলে আঁখি ভরিয়া যাইতেছে। মাঝখানের সেই অবসরটুকুতে সীতা জন্মের মত তাঁহার জীবনসর্ব্বস্বকে দেখিয়া লইতেছেন। দুঃখিনী সীতার আঁখিযুগল চিরদিনই ত এমনই জলভরা থাকিবে; আজ

একবার কে হৃদয়দ্বারে—অশ্রুপথে দাঁড়াইয়া বলিবে,—"অশ্রু! আজিকার জন্য থাক, আজ দাতা তাঁহার দুর্লভ জনকে একবার জন্মের মত দেখিয়া লইবেন!"

রাম, বাসন্তীকে পার্শ্বে বসাইলেন। বাসন্তী, রামকে নানাপ্রকারে সীতাবনবাস-জনিত দুঃখে মর্ম্মপীড়িত করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, কুমার লক্ষ্মণের কুশল ত?"

রামের কাণে সে কথা পৌঁছিল না। রাম তখন ভাবিতেছেন,—

করকমলবিতীর্ণৈরম্বুনীবারশষ্পৈ-
"স্তরুশকুনিকুরঙ্গান্ মৈথিলী যানপুষ্যৎ।
ভবতি মম বিকারস্তেষু দৃষ্টেষু কোঽপি
দ্রব ইব হৃদয়স্য প্রস্তরোদ্ভেদযোগ্যঃ॥"

—"আমার প্রিয়তমা জানকীর করকমল-বিকীর্ণ জলে পরিপুষ্ট এই বৃক্ষরাজি, তাঁহার করকমল-বিকীর্ণ নীবার শস্যে পরিপুষ্ট এই বিহগ সকল, তাঁহার করকমল-বিকীর্ণ তৃণে পরিপুষ্ট এই মৃগসকল,—এ সকল দর্শন করিয়া কি-এক বিকার উপস্থিত হইতেছে, তাহাতে আমার এই পাষাণ হৃদয়কেও শতধা বিদীর্ণ করিতেছে!"

বাসন্তী—অকরুণা-বাসন্তী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহারাজ, কুমার লক্ষ্মণের কুশল ত?"

এবার রামের কর্ণগোচর হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—"এ কি? আমার সেই প্রিয়সখী, বাসন্তী,—তিনি আজ আমাকে "মহারাজ" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন কেন? ইহা ত নিতান্ত অপ্রণয়ের কথা। আর কুমার লক্ষ্মণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন,—তাহাও বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে,—তবে দেখিতেছি; বাসন্তীও সীতা-বৃত্তান্ত সকলই অবগত হইয়াছেন।" রাম অধিক কিছুই বলিলেন না, কেবল বলিলেন,— "লক্ষ্মণের কুশল"।

বাসন্তী। মহারাজ, আপনি কেন এই পাষাণ-হৃদয়ের কার্য্য করিলেন?—

"ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে"

'তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি আমার নয়ন-যুগলের কৌমুদী, তুমি আমার অঙ্গের অমৃত,'—এইরূপ কত মধুর বচনে সেই মুগ্ধস্বভাবা বালাকে বিমুগ্ধ করিতে; মহারাজ! তুমি কি না তাহাকেই—" বাসন্তী আর বলিতে পারিলেন না, সীতা-পরিত্যাগের কথা মুখে সরিল না, তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। রাম তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন। মূর্চ্ছা-ভঙ্গে, বাসন্তী বলিলেন,— "আপনি কিজন্য এমন নিষ্ঠুরের কাজ করিলেন?" ছায়াময়ী বলিতেছেন,—"সখি! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও।"

রাম। লোকে যে মার্জ্জনা করিল না।

বাসন্তী। কি জন্য?

রাম। লোকেই জানে কি জন্য।

তখন তমসা আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে বলিলেন,—"হাঁ, লোকের প্রতি আক্রোশ করিয়া, নিরপরাধা সহধর্ম্মিণী পরিত্যাগ উচিতই হইয়াছে।"

বাসন্তী বলিতে লাগিলেন,—"নিষ্ঠুর! দেখিতেছি, যশই তোমার প্রিয়! যশোলাভের বশবর্ত্তী হইয়াই, তাদৃশ পাষাণের কার্য্য করিয়াছ! কিন্তু সে যশই বা তোমার কোথায় রহিল? জান কি, সে পরিত্যক্তা—অসহায়া, পূর্ণগর্ভা সতীর কি দশা হইয়াছে! জান কি, সে বাঁচিয়া আছে কিনা? হায়! এমনই করিয়াই কি তোমার যশের সঞ্চার হইল?"

রাম কি যশের প্রার্থী হইয়াই, সীতা-নির্ব্বাসনরূপ এই দারুণ কর্ম্ম করিয়াছিলেন? রামের লোকানুরঞ্জন-বৃত্তি কি তবে যশোলিপ্সার নামান্তর মাত্র? প্রাণ থাকিতে আমরা সে কথা কখন বলিতে পারিব না। রাম যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন, সীতা-বিসর্জ্জন ভিন্ন

তিনি আর কি করিতে পারিতেন? সীতা, শত্রুপুরীতে বাস করিয়াছিলেন, সীতা-চরিত্রে প্রজামণ্ডলীর সন্দেহ জন্মিল। সীতার যে অগ্নি-পরীক্ষা হইয়াছিল, প্রজারা তাহা দেখে নাই। রামচন্দ্র জানিতেন, তাঁহার সীতা অকলঙ্কচরিত্রা, শুদ্ধ-স্বভাবা। তিনি জানিয়া-শুনিয়াও পত্নী পরিত্যাগ করিলেন। না করিলে, তিনি কি করিতে পারিতেন? দুইটী উপায় ছিল। ১ম, সীতাকে লইয়া রাজ্য-পালন; ২য়, সীতাকে লইয়া রাজ্য-ত্যাগ। এ দু'য়ের একটীও যুক্তি-সঙ্গত নহে, তাহাই দেখাইতেছি।

১ম, সীতাকে লইয়া রাজ্য-পালন। রাম জানিতেন, সীতা নিষ্পাপহৃদয়া; তাঁহাকে লইয়া থাকিলে, নিশ্চয়ই তিনি ধর্ম্মে পতিত হইতেন না। তিনি রাজা, তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া, বাধা দিতেও কেহ সাহস করিত না। লোক-নিন্দায় কর্ণপাত না করিয়া, অনায়াসে তিনি সীতাকে লইয়া রাজ্য-পালন করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি রাজা, রাজার কর্ত্তব্য সাধারণ-কর্ত্তব্য নহে। "আপনার চরিত্র দেখাইয়া, প্রজাকে সদ্দৃষ্টান্ত দান করা রাজার কর্ত্তব্য।" এ অবস্থায়, সীতাকে লইয়া রাজ্য-পালন করিলে কি হয় ভাব দেখি! প্রজা-মণ্ডলী ভাবিবে, রাম ত কলঙ্কিনী চরিত্রহীনা ভার্য্যা লইয়া সংসার করিতেছেন, তবে আমরা চরিত্র বা নীতি মানিব কেন? দুর্নীতি ও পাপের দণ্ডকর্ত্তা যিনি, যদি তিনিই নীতি মানিলেন না,—আমরা কেন মানিব? প্রজা দুর্নীতি-পরায়ণ হইবে, পরদার হরণ, পরদার গমন প্রভৃতি পাপে রাজ্য পূর্ণ হইবে। সেই পাপের যে অনিবার্য্য ফল, তাহাও ফলিবে। লোকে লোকে শত্রুতা বাড়িবে, বিদ্বেষ-বহ্নি গৃহে গৃহে জ্বলিবে, দেশে রাজ্যবিপ্লব ঘটিবে।—সীতাকে লইয়া রাজ্যপালন কি কর্ত্তব্য?

২য়, সীতাকে লইয়া রাজ্যত্যাগ। যখন সীতাকে লইয়া রাজ্যপালনের কোন সুবিধা নাই, তখন রামচন্দ্র কেন সীতাকে লইয়া রাজ্যত্যাগ করিয়া যান না? রাম তাহাও পারিতেন। ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন,—তিন ভ্রাতা আছেন, কাহার-না-কাহার উপর রাজ্যভার দিয়া, তিনি যাইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা হইলেও বা কি হইল? রাম যে সীতাকে লইয়া বনবাসে যাইবেন, তাহাতেই বা সুখ কৈ? তাহাতেই কি রাম সুখী হইবেন,—না, সীতার আনন্দ হইবে? স্ত্রীর চরিত্রে অপবাদ, সত্যই হউক, মিথ্যা হউক, এ কথা ধ্রুব সত্য যে, "আর্য্যনারীর চরিত্রে কেহ মিথ্যা রটনা করিলেও আর্য্যনারী কলঙ্কিতা হন।" রাম সেই স্ত্রীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কিনা, সেই স্ত্রীকে লইয়া বনবাসে! এই কি রাম-চরিত্র? প্রজাপালক, সত্যধর্ম্মাবতার, মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রের কি এই চরিত্র? আর আর্য্যরমণী, সহিষ্ণু-প্রতিমা, সতীকুলের আদর্শস্থানীয়া, সেই সীতাদেবীও কি এইরূপে ঘৃণিতা, লাঞ্ছিতা, অবমানিতা হইয়া, কিনা স্বামীর জন্য, স্বামীর প্রজাপালন-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেওয়াইয়া স্বামীকে লইয়া বনবাসিনী হইবেন? এমন কথা কি বলিতে আছে? আর্য্যরমণী স্বামি-পরিত্যক্ত হইয়াও আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করিতে পারেন, কিন্তু কেবল তাঁহারই জন্য যে তাঁহার স্বামী ধর্ম্ম, নীতি, কর্ত্তব্য—সকলই বিসর্জ্জন দিবেন,—এ কথা তাঁহার একান্ত অসহ্য। ধর্ম্ম ও সত্যপালনের জন্য পতির মৃত্যু হয়, আপনি অনন্ত দুঃখ-যন্ত্রণার পাত্রী হন, তাহাও তাঁহার বাঞ্ছনীয়, কিন্তু ধর্ম্মপালনে একান্ত ভীরু, কর্ত্তব্য-সাধনে নিতান্ত অক্ষম,—এমন স্বামীর জীবন, এমন সাহচর্য্য, আর্য্যরমণীর বাঞ্ছনীয় নহে। এ কথা যে না বুঝে, আর্য্যরমণীর চরিত্র—সীতার চরিত্র সে বুঝে না। সীতাকে লইয়া রাজ্যত্যাগে লাভ কৈ?

এখন, সীতাকে ত্যাগ ভিন্ন, রাম আর কি

করিতে পারেন? দর্শনশাস্ত্র-পড়া, নীতিবেত্তা তার্কিক বলিবেন,—"আচ্ছা বুঝিলাম, সীতা-ত্যাগ ব্যতীত রামের অন্য উপায় নাই। কিন্তু রামের কাজটা যে ধর্ম্মবিগর্হিত হইল, তাহা ত স্বীকার করিবে?" আমরা তাহাও স্বীকার করিব না। রামচন্দ্র রাজা। যদি আত্ম-চরিত্র দেখাইয়া, প্রজামণ্ডলীকে কঠোর শিক্ষাপ্রদান, রাজার ধর্ম্ম হয়,—তবে বলিব—রামচন্দ্র ধার্ম্মিক। যদি আত্ম-বিসর্জ্জনে ধর্ম্ম থাকে, তবে বলিব,—রামচন্দ্র ধার্ম্মিক। এমন চরিত্র কি আর হয়? ধন্য ভারতবর্ষ, যে দেশে এমন মহানুভব পুরুষ-সিংহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন! আর ধন্য আমরা যে, সেই মহাকবি আমাদেরই, যিনি এই রাম-চরিত্র লইয়া, এই বিশ্ব-পূজিত মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন *

বাসন্তী যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, রামচন্দ্রকে তাহাই বলিলেন। রাম, সীতাকে বনবাস দিয়া, এইরূপে আত্মপ্রবোধ দিয়াছিলেন যে, যাহা হউক, লোকরঞ্জন হইয়াছে; লোকরঞ্জনই তাঁহার কুলধর্ম্ম, সীতা-বিরহে তাঁহার মর্ম্মচ্ছেদ হয় হউক, তাঁহার কুলধর্ম্ম রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বাসন্তী বলিলেন, সীতা-বিসর্জ্জনে ত কুলধর্ম্ম রক্ষিত হয় নাই, প্রজারঞ্জনের মূলেই ত রামের যশোলিপ্সা প্রবলা; আর তাই কি সে যশের আকাঙ্ক্ষাই ফলবতী হইয়াছে? যদি সীতার সেই অসহায় অবস্থায় মৃত্যু ঘটিয়া থাকে?—সে মৃত্যুর হেতু কে?

রাম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, নিশ্চয়ই কোন হিংস্র জন্তু কর্ত্তৃক, জ্যোৎস্না-নিন্দিত, স্নিগ্ধ ও মৃণাল-সুকোমল সেই প্রিয়তমার দেহ বিনষ্ট হইয়াছে! রাম মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন, জনস্থান সে ক্রন্দনে পূর্ণ হইল। বাঁধ ত ভাঙ্গিয়াই ছিল, এখন হু হু করিয়া অগাধ জলরাশি অপ্রতিহতবেগে কূল ভাসাইয়া চলিল!

ছায়াময়ী বলিতেছেন,—"না, আর্য্যপুত্র! সে দুঃখিনী আজও বাঁচিয়া আছে, মরে নাই।"

রাম, "হা সীতা!" "হা জানকি!" বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সীতাও ব্যথিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন তমসা সীতাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন,—"রাম কাঁদিতেছেন কাঁদুন, কান্নাই এখন উহাঁর উচিত। কারণ,

"পূরোৎপীড়ে তড়াগস্য পরীবাহঃ প্রতিক্রিয়া।
শোকক্ষোভে চ হৃদয়ং প্রলাপৈরেব ধার্য্যতে॥"

অগাধ জলরাশি যখন তড়াগে উচ্ছলিত হইয়া উঠে, তখন বাঁধ কাটিয়া দেওয়া যেমন জল-নিঃসারণের উপায়, তেমনি অসহ্য শোকাবেগে হৃদয় অবসন্ন হইলে, বিলাপ বা ক্রন্দনে তাহার অনেক উপশম হইয়া থাকে।"

রাম কতই কাঁদিলেন।—"হায়!—

"দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগং দ্বিধা ন তু ভিদ্যতে
বহতি বিকলঃ কায়ো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্।
জ্বলয়তি তনূমন্তর্দ্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ
প্রহরতি বিধির্মর্ম্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্॥"

দারুণ দুঃখে আমার হৃদয় বিদলিত করিতেছে, কিন্তু ইহা ত দুইভাগে বিদীর্ণ হইতেছে না! এ বিকলদেহে বারবার মোহ হইতেছে, কিন্তু চৈতন্য ত একেবারে বিলুপ্ত হইতেছে না! অন্তর্দ্দাহে শরীর জ্বলিতেছে, ইহা একেবারে ত ছাই হইয়া যাইতেছে না! বিধাতা মর্ম্মগ্রন্থি ছেদন করিয়া প্রহার করিতেছেন, এ জীবন ত একেবারে ছেদন করিতেছেন না!"

* যদি কথাটা পাড়িলাম, আরও একটা কথা না বলিয়া শেষ করিতে পারিতেছি না। শিক্ষিত সম্প্রদায় এ সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া এখন বলেন এই যে, রামায়ণের এই উত্তর-ভাগটা প্রক্ষিপ্ত, রামের সীতা-বিসর্জ্জন-ব্যাপার মিথ্যা। আপদ-বালাই সব ঘুচিয়া গেল। এ বিষয়ে আমি আর কিছুই বলিব না, আমাদের বঙ্গসাহিত্যের গুরুস্থানীয় শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয় বাবু তাঁহার "নবজীবনের" ২য় খণ্ডে, "উদ্ভট কথা"র তৃতীয় শাখায় এ বিষয়ে যথেষ্ট বলিয়াছেন, পাঠককে সেই প্রবন্ধ পড়িতে অনুরোধ করি।

যাহাদিগের মনোরঞ্জনের জন্য, যাহাদিগের কথায়, রাম, সীতাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, কখন বা তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে প্রজামণ্ডলি। আমি অনেক সহিয়াছি, আর পারি না, এই হতভাগ্যের প্রতি তোমরা প্রসন্ন হও!"

বলিয়াছি ত ভীষণ ঝড় উঠিয়াছে, এখন সেই বাত্যান্দোলিত গঙ্গাবক্ষ কি ভয়ানকরূপে আলোড়িত হইতেছে, পাঠক! দেখ।

বাসন্তী, রামকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে বলিলেন। রাম বলিলেন,—"সখি! কি বলিতেছ? ধৈর্য্যাবলম্বন? আজি বার বৎসর হইল, দেবী এই জগৎ শূন্য করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে, তথাপি রাম কি জীবিত নাই? দিবানিশি প্রিয়া-বিরহ-শোক আমার অন্তর দগ্ধ করিতেছে, আমি কি তাহা সহ্য করিতেছি না?—ধৈর্য্য আর কাহাকে বলে?"

বাসন্তী। "দেব! জনস্থানের অন্যান্য বিভাগ দেখুন, চিত্ত-বিনোদন হইতে পারে।"

সীতা নিষেধ করিতেছেন, আমরাও নিষেধ করি, বাসন্তি! আর দেখাইয়া কাজ নাই। রামের চিত্ত-বিনোদন আর কিসে হইবে?

বাসন্তী দেখাইলেন,—"দেব!—

"অস্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভবস্তন্মার্গদত্তেক্ষণঃ
সা হংসৈঃ কৃতকৌতুকা চিরমভূদ্গোদাবরীসৈকতে
আয়ান্ত্যা পরিদুর্ম্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্য বদ্ধস্তয়া
কাতর্য্যাদরবিন্দকুট্মলনিভো মুগ্ধঃ প্রণামাঞ্জলিঃ॥"

সীতা গোদাবরী-সৈকতে গিয়া, হংস লইয়া তাহাদের জলক্রীড়া দর্শনে কৌতুক করিতে করিতে বিলম্ব করিতেন; তুমি এই লতাগৃহে থাকিয়া, তাঁহার পথ চাহিয়া রহিতে; সীতা আসিয়া তোমাকে নিতান্ত চিন্তিত দেখিয়া, মনে ভাবিতেন, না জানি আর্য্যপুত্রের নিকট কত অপরাধ করিয়াছি,—এই ভাবিয়া নিতান্ত আকুলভাবে পদ্মকলিকা তুল্য অঙ্গুলি দ্বারা কি সুন্দর প্রণামাঞ্জলি বন্ধন করিতেন।"

বাসন্তি! এই কি রামের চিত্তবিনোদের উপায়?

রাম আর থাকিতে পারিলেন না, আবার শোকানল জ্বলিয়া উঠিল, আবার তাঁহার হাহাকারে জনস্থান পূর্ণ হইল। রাম যেদিকে চাহেন, সীতার মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। স্নেহময়ীর সেই প্রেমমূর্ত্তি, পরিত্যক্তা বনবাসিনীর সেই করুণমূর্ত্তি, চারিদিক্ হইতে যেন রামের সমক্ষে প্রকাশিত হইতে লাগিল। রাম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না,—"কৈ সীতা, কোথা সীতা! এই যে তোমায় দেখিতে পাইতেছি! চণ্ডি, দয়া কর, একবার দেখা দাও!—মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করিল, আমি আর কিছুই দেখিতে পাই না!" রাম আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ছায়াময়ী, সন্তপ্ত-হৃদয় রামচন্দ্রকে আবার ছায়া দিলেন। বাসন্তী এইরূপে রামকে মর্ম্ম-পীড়িত করিতেছেন, সীতা মনে মনে কত তিরস্কার করিলেন; রামের ক্রন্দনে আপনিও কাঁদিয়া অধীরা, "আমার জন্যই ত আর্য্যপুত্রের এই দশা" ভাবিয়া সতী কাতরা। ছায়াময়ী আবার রামচন্দ্রের ললাট স্পর্শ করিলেন।

সে স্পর্শ কেমন?

বুঝি রামের মত তেমনি অবস্থায় না পড়িলে, তেমন স্পর্শ, জগতে উপমা দিয়া বুঝান যায় না, সে স্পর্শ,—জগতের যেখানে যাকিছু সুন্দর, মধুর, পবিত্র, কোমল ও স্নিগ্ধ আছে, সেই সকলেরই একত্র সমাবেশ করিয়া তাহারই স্পর্শের মত যে স্পর্শ, তেমন স্পর্শ-সুখ বুঝি আর কিছুতেই বুঝা যায় না। সেই সুখ-স্পর্শ,—সুনির্ম্মল, সুস্নিগ্ধ বসন্তানিলের মত অদৃশ্য-স্পর্শের স্বর্গীয় সুখ, রামচন্দ্রের আর এক নূতন মোহ আনিয়া দিল। তাঁহার মনে

হইল, কে যেন তাঁহার অন্তরে-বাহিরে অমৃত-সিঞ্চন করিল। তিনি বলিলেন,—"সখি বাসন্তি! বুঝি ভাগ্য প্রসন্ন হইল।"

বাসন্তী। দেব! সে কিরূপ?

রাম নিমীলিত-নয়নে থাকিয়াই বলিলেন,—"আর কি সখি! সীতাকে পাইয়াছি।"

বাসন্তী। কৈ, জানকী কোথায়?

রাম। আমি স্পর্শ-সুখেই জানিয়াছি; দেখ দেখি, তিনি সম্মুখে কি না?

বাসন্তী। দেব! এমন মর্ম্মচ্ছেদী প্রলাপ-বাক্যে এ হতভাগিনীকে কেন দগ্ধ করেন? আমি যে প্রিয়সখীর দুঃখে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছি।

রাম বিশ্বাস করিলেন না যে, সেখানে সীতা নাই। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"সখি! আমি ত মিথ্যা বলিতেছি না,—আমি পূর্ব্বে বিবাহ-কালে প্রিয়তমার যে কঙ্কণ-শোভিত সুকোমল পাণি গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং চিরদিনই যথেচ্ছ যাহার অমৃত-শীতল স্পর্শ-সুখ অনুভব করিয়াছি, সেই শিশির-সুমধুর মনোহর নবনীকন্দল-সদৃশ সুখ-স্পর্শ পাণি আজও পাইয়াছি। বিশ্বাস না হয়, সখি! তুমিও ধরিয়া দেখ।"

ছায়াময়ী মনে মনে বলিলেন,—"আর্য্য-পুত্র! আজিও তুমি সেই আর্য্যপুত্রই আছ।"

বিবাহকালে, প্রিয়তমার যে পাণিস্পর্শ করিয়াছিলেন, রামচন্দ্রের আজিও সে স্পর্শ-সুখ মনে আছে। কখন কেহ কি তাহা ভুলিতে পারে? সেই একদিনের, এক মুহূর্ত্তের স্পর্শে, জীবনে নূতন আবরণ পড়িয়া যায়; আধ-আলো, আধ-ছায়াপূর্ণ স্বপ্নরাজ্য হইতে, জীবন, উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত, অনাবৃত পৃথিবী মাঝে আপনার পথ পায়,—জীবনেও কেহ কখন কি সে মুহূর্ত্ত, সে মুহূর্ত্তের সে স্পর্শ, সে স্পর্শের সে অনির্ব্বচনীয় সুখ, ভুলিতে পারে? আবার, বড় দুঃখের মাঝে পড়িয়া, বড় অসহায় অবস্থায় উপনীত হইয়া, কতবার আমরা সেই মুহূর্ত্ত স্মরণ করিয়া, প্রাণে বল পাই, হৃদয়ে উৎসাহ পাই, জীবনে আশা পাই। কেহ কখন সে মুহূর্ত্ত ভুলিতে পারে কি? সে মুহূর্ত্ত, "অনন্ত-মুহূর্ত্ত"!

সীতা ভাবিতেছেন,—"আর কেন? আমি এই বেলা পলায়ন করি।" আহা! সীতাও যে রামের স্পর্শে মুগ্ধ! পলায়ন করিবার কি আর সামর্থ্য আছে? রামের অঙ্গস্পর্শে তিনি পুলকিতা, কম্পিতা ও ঘর্ম্মাক্তদেহা হইলেন। "মরুন্নবাম্ভঃপ্রবিধূতসিক্তা কদম্বযষ্টিঃ স্ফুটকোরকেব।" পবনকম্পিত, নববারিসিক্ত, স্ফুটকোরক কদম্বশাখা যেমন দেখায়, সীতাকে ঠিক তেমনি দেখিতে হইল। তখন সীতার বড় লজ্জা হইল। তিনি তমসাকে দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"না জানি, আমার এ ভাবান্তর দেখিয়া, তমসা কি মনে করিতেছেন! হয়ত ভাবিতেছেন, সেই পরিত্যাগ, আবার তাঁহারই অঙ্গ স্পর্শে এত অনুরাগ!"

রাম ক্রমে বুঝিতে পারিলেন, সীতা ত সেখানে নাই! তখন তিনি আবার শোকাভিভূত হইলেন।

যেখান হইতে রাক্ষসপতি রাবণ, সতী-লক্ষ্মী সীতা-দেবীকে হরণ করিয়া, রথে তুলিয়া লইয়াছিল, যেখানে সেই বিহগরাজ জটায়ু, রাবণের লৌহ-রথ চূর্ণীকৃত করিয়াছিল, বাসন্তী রামকে সেই স্থান দেখাইয়া বলিলেন,—"দেব! ঐ দেখুন, ঐ স্থান হইতেই দুরাত্মা রাবণ দেদীপ্যমানা সীতাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিল।"

রামের ভ্রান্তি জন্মিল। যেন দেখিলেন, রোরুদ্যমানা অসহায়া সীতাকে লইয়া, রাবণ পলাইতেছে! অমনি সবেগে উঠিয়া, রাম চীৎকার করিলেন,—"আঃ পাপিষ্ঠ! সীতাপ-হারিন্! আমার সীতাকে লইয়া কোথায় যাস্?"

বাসন্তী তাঁহার ভ্রম ভাঙ্গিয়া দিলেন। রাম বলিতে লাগিলেন,—"প্রিয়তমা আমার যখন রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হইয়াছিলেন, তখন শক্র-বধের চিন্তায়, তাঁহার বিরহে তত ক্লেশ পাই নাই; আর বুঝিয়াছিলাম, শক্র বিনষ্ট হইলেই বিরহ দুঃখ ঘুচিবে। হায়! এখন যে আর এ বিরহের শেষ নাই!"

শেষ নাই!—এ কথা বলিও না। সুখ বল, দুঃখ বল, সকলেরই শেষ আছে। শেষ না থাকিলে, এ জীবনভার একান্ত অসহনীয় হইত বড় দুঃখের মাঝে পড়িয়াই মনে হয়, বুঝি ইহার শেষ নাই। কিন্তু কে কবে এ বিশ্বাস বুকে বাঁধিয়াছে যে, সত্য সত্যই তাহার শেষ নাই! কেবল দুঃখ বলিয়া কেন, সুখের দাবানলও আছে, তাহাতে দগ্ধ হইয়াও কেহ কেহ তাহার শেষ দেখিতে চাহিয়াছে! শেষ সকলেরই আছে। তবে রামের এ সীতা-বিরহও কি একদিন শেষ হইবে?

রাম বাসন্তীর নিকট বিদায় চাহিলেন।

তখন সীতা নিতান্ত ব্যথিতা হইলেন। তমসাকে বলিলেন,—"দেবি, আর্য্যপুত্র চলিলেন যে!"

তমসা। চল্ বাছা, আমরাও যাই।

সীতা। ভগবতি, ক্ষমা করুন, আর একটু দাঁড়ান, দুর্লভজনকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই।

এ দেখার কি শেষ আছে?

সীতা শুনিলেন, রাম বাসন্তীকে বলিতেছেন,—"অশ্বমেধের জন্য আমার এক সহধর্ম্মিণী হইয়াছে। সে সহধর্ম্মিণী, সীতার সুবর্ণময়ী ..."

রামের প্রেম-পরিপূর্ণ অন্তর দেখিবে ত এইবার দেখিয়া লও! কঠোর কর্ত্তব্য-সাধনের জন্য, নিষ্ঠুর নরাধমের মত যে হৃদয়, যে প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিয়াছে, অকৃত্রিম ও স্বর্গীয় প্রেমের সহিত, নব প্রেমিকের মত, সেই হৃদয়, সেই প্রতিমাকে আবার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রতিষ্ঠিতা করিয়া, সমগ্র হৃদয় ভরিয়া রাখিয়াছে! এমন কোমলে কঠোর আর কোথাও কি দেখিয়াছ? ধন্য কর্ত্তব্য-পালন, আর ধন্য প্রেম! সীতা-নির্ব্বাসন স্মরণ করিয়া, যখন রামকে নিষ্ঠুর বলিবে, তখন এই কথা স্মরণ করিও যে, রামের নূতন সহধর্ম্মিণী—সীতার সুবর্ণময়ী প্রতিমূর্ত্তি!

শুনিয়া সীতার চক্ষে জল পড়িতে লাগিল। আনন্দের সহিত বলিতে লাগিলেন,—"অজ্জউত্ত! দাণীং সি তুমং, অম্হএ উক্খাণিদং দাণীং মে পরিচ্চাঅলজ্জাসল্লং অজ্জউত্তেণ।"

"আর্য্যপুত্র! এখন তুমি তুমি হইলে। এতদিনে তুমি আমার পরিত্যাগ-জনিত অপমানশল্য উন্মোচন করিলে!"

কথাটার অর্থ বুঝিও। সীতা নির্ব্বাসিতা হইলেও তিনি যে স্বামি-সোহাগে বঞ্চিত হইয়াছেন, সে সন্দেহ তাঁহার মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও হয় নাই। পাছে লোকে মনে করে, পাছে মুনি-পত্নীরা ভাবেন যে, সীতা-নির্ব্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে সীতার প্রতি রামের স্নেহ প্রভৃতি সকলই গিয়াছে, সেই ভাবিয়াই সীতা দুঃখিতা। এ দুঃখ বা এ ভাবনাটা খুব স্বাভাবিক। স্বামী, পত্নীর উপর শত অত্যাচার করুন, সতীর তাহাতে মনোমালিন্য নাই; কিন্তু যদি শুনিয়াছেন, স্বামী তাঁহাকে ভাল বাসেন না, দিনান্তেও একবার হৃদয়ে স্থান দেন না,—আবার সেই তাচ্ছীল্য-ব্যবহার যদি লোকের মুখে-মুখে ফিরিতে থাকে, তবেই পত্নীর যথার্থ দুঃখ, যথার্থই তিনি হতভাগিনী! স্বামীর সোহাগ, স্বামীর স্নেহ, আর্য্য-রমণীর একমাত্র বাঞ্ছনীয় পদার্থ। আজ রামের যজ্ঞস্থানে, সুবর্ণময়ী সীতা-মূর্ত্তি দেখিলে, কাহার না মনে হইবে, রামের সমগ্র হৃদয় ভরিয়া, সে

মূর্ত্তি রাত্রিদিন বিরাজ করিতেছে? স্বামি-সোহাগেই আর্য্যরমণী আপনাকে এত ভাগ্যবতী মনে করেন। *

রাম জনস্থান হইতে চলিলেন। সীতা প্রাণ ভরিয়া রামচন্দ্রকে দেখিতে লাগিলেন। চক্ষু কি ফিরাইতে পারেন? ফিরাইয়া লইতে কত যত্ন করিতেছেন, হায়! পিপাসা ত মিটিতেছে না! "ণমো ণমো অপুব্বপুণ্ণজণিদ-দংসণাণং অজ্জউত্তচরণকমলাণং।"

"আমি অপূর্ব্ব পুণ্যফলে, আজ যাঁহার দর্শন লাভ করিলাম, সেই আর্য্যপুত্রের চরণ-কমলে বারবার নমস্কার করি"—এই বলিয়া সীতা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

তমসা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। সীতা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন,—

"কিঅচ্চিরং বা মেহন্তরেণ পুণ্ণিমাচন্দস্স-দংসণম্" "আমার এ মেঘান্তরে পূর্ণচন্দ্রের দর্শন আর কতক্ষণ ঘটিবে?"

ছায়াময়ীর ম্লান ছায়াখানি সরিয়া গেল! হৃদয়ে কিন্তু সে ছায়া রহিয়া গেল!

এই ছায়াতলে পাঠককে বসিয়া, একবার সেই "চিত্র-দর্শনের" সময়টা মনে করিতে বলি। সে জ্যোৎস্নাও নাই, সে মৃদু-সমীরণও নাই, সে নির্ম্মল আকাশ নাই, সে প্রশান্ত গঙ্গাবক্ষ নাই,—চিত্র-দর্শনের সে প্রেমলিপি, সে সুখ, সে কিছুই নাই। আকাশে যে মেঘ উঠিয়াছিল, প্রকৃতির শান্তি ভাঙ্গিয়া দিয়া যে প্রচণ্ড ঝটিকা উঠিয়াছিল, সুনির্ম্মল গঙ্গাবক্ষে যে প্রশান্ত ভাব বিনষ্ট করিয়া, প্রবল তুফান ছুটিয়াছিল,—তাহা দেখাইয়া আসিয়াছি। আজ এই ছায়া-তলে বসিয়া, সেই দুই চিত্র মনে মনে ভাবিয়া দেখ! যাহা কেবল বুঝিবার, তাহা বুঝাইবার সাধ্য আমার নাই।

সেই "চিত্র-দর্শন" ও এই "ছায়া," এই দুই দেখিয়া, ছায়াময়ীর পানে চাহিও, কবির অপূর্ব্ব-সৃষ্টি দেখিয়া মোহিত হইবে!

শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত।

* শ্রদ্ধাস্পদ অক্ষয় বাবু বলেন, "স্বামি-বিচ্ছেদ যেন কাহারও কপালে কখন না হয়; কিন্তু যদি কখনও হয়, তাহাতে যেন এমনই সোহাগ থাকে।"

বুদ্ধদেব।

নবীন সন্ন্যাসী।

অতীত নিশার্দ্ধ; মহা উৎসবের শেষে
নিদ্রা যাইতেছে পুরী; নিবিতেছে ধীরে
চারিদিকে দীপমালা; যাইছে ভাসিয়া
বসন্তের নীলাকাশে ফুল্ল তারা দল
বসন্তের, বহিতেছে বসন্ত অনিল।
কি গম্ভীর শান্তিময় মূর্ত্তি প্রকৃতির
ভাসিতেছে চারিদিকে নিস্পন্দ নীরব।
পিতার চরণে পুত্র হইয়া বিদায়
চলিলা আপন পুরে দেখিতে দেখিতে
সেই শান্ত নীলাকাশে লেখা নিয়তির;—
সেই নীলাকাশ মত হৃদয় আকাশ
শান্ত, নিরমল, স্থির, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত।
দাঁড়ায়ে আনন্দে স্থির, দেব-অবয়ব
রাখি বাতায়ন বক্ষে, রহিলা চাহিয়া
সেই নীলাকাশ বক্ষে শান্তি অনন্তের
কিছুক্ষণ। দেখিলেন, বসি দেবগণ
নীলাকাশে নভকায় পুজিছে তাঁহায়
প্রীতিপুষ্পে; মেলি শত তারকা নয়ন
অপেক্ষিছে প্রীতিভরে তাঁর নিষ্ক্রমণ।
পুষ্যা নক্ষত্রের সহ মিশি সুধাকর
করিয়াছে মহাযোগ পুণ্য প্রীতিময়;
গাইছে অনন্ত বিশ্ব প্রীতির সঙ্গীত;
কহিতেছে এক কণ্ঠে—"এই ত সময়!"
সুষুপ্ত ছন্দক ভৃত্যে করি জাগরিত,

কহিলা—"ছন্দক! যাও আন ত্বরা করি
সজ্জিত করিয়া অশ্ব 'কণ্টক' আমার।
আগত সময় মম, সিদ্ধ মনোরথ!"
স্বপ্নে যেন বজ্রাঘাত হইল মস্তকে
বিস্ময়ে ছন্দক কহে—"কহ, যুবরাজ!
কোথায় যাইবে এই নিশীথ সময়ে?"
"ছন্দক!"—সিদ্ধার্থ-ধীরে কহিলা গম্ভীরে—
"আজন্ম আমার প্রাণ যেই পিপাসায়
কাতর, যুড়াতে সেই পিপাসা আমার,—
যুড়াইতে মানবের, যুড়াতে আমার
জরা-মরণের দুঃখ, করিতে সাধন
জগতের শিব শান্তি, করিতে পূরণ
জীবনের স্বপ্ন, আজি ত্যজিব ভবন।"
এই বার স্বপ্নে নহে, পড়িল জাগ্রতে
ছন্দকের শিরে বজ্র কহিল কাতরে—
"হেন নিদারুণ কথা আনিও না মুখে
যুবরাজ! এই দেহ মৃণাল কোমল,
এই স্বর্ণকান্তি রূপ মদনমোহন,
এ কি যোগ্য তপস্যার? শিরীষ কুসুম
সহিবে কি দাবানল? কর পরিত্যাগ
এই দুরাকাঙ্ক্ষা হায়, আশ্রিত আমরা,
কর রক্ষা আমাদের দয়াবান তুমি!"
"ছন্দক!"—সিদ্ধার্থ খেদে করিলা উত্তর—
"কে সাধে এমন পত্নী প্রেম নির্ঝরিণী,
সদ্যোজাত প্রাণপুত্র, পিতা স্নেহময়,
মাতা প্রজাবতী মাতৃপ্রেম ভাগীরথী,
পারে ত্যজিবারে? সাধে পারে ত্যজিবারে
ত্রিদিব প্রতিম রাজ্য, প্রজা পুত্রোপম?
কিন্তু পত্নী, পুত্র, পিতা, মাতা, প্রজাগণ,
অনন্ত মানব জাতি, জন্ম জন্মান্তরে
সবে জরা-মরণের দুঃখ ঘোরতর
কেমনে সহিবে বল? নাহি অন্বেষিয়া
জরের উদ্ধার পথ, পুড়িবে স্বজন
জ্বালি বিলাসের বহ্নি—এ ত নহে প্রেম?
প্রেম শিব, প্রেম শান্তি, প্রেম নিরবাণ।
না,—ছন্দক! ত্যজি গৃহ যাব তপস্যায়।"
ছন্দক কহিল—"প্রভু! এক নিবেদন।
মানব তপস্যা করে জন্ম জন্মান্তরে
যে সুখ সম্পত্তি তরে, পেয়েছ সকল
বিনা তপস্যায় তুমি। এ রাজ্য সুন্দর
লোকপূর্ণ, রত্নপূর্ণ; পুর মনোহর;
ফলে পুষ্পে সুশোভিত, বিহগ-কূজিত,
জলজ-কুসুম-পূর্ণ-সরসী ভূষিত
প্রমোদ উদ্যান তব; কৈলাস প্রতিম
অট্টালিকা মনোহর; চারু অন্তঃপুর
রতন-কিঙ্কিণী জলে তরঙ্গে শোভিত,
সঙ্গীতে সুন্দরীবৃন্দে,—বিলাসে পূরিত।
রাজপুত্র—রাজা তুমি, প্রথম যৌবন,
তরুণ কোমল দেহ, শশাঙ্ক বদনে
শোভিছে—ভ্রমর কৃষ্ণ কুঞ্চিত কুন্তল।
এখনও অপূর্ণ ভোগ কামনা তোমার।
অমর-পতির মত এ অমরাবতী
কর ভোগ, কর ভোগ—কামনা পূরণ।
মধ্য অঙ্কে অভিনয় করিও না শেষ
এইরূপে, রঙ্গভূমি করিয়া শ্মশান।
যৌবনান্তে সম্ভোগান্তে করিও সন্ন্যাস
নিষ্কণ্টকে, কেহ নাহি করিবে বারণ।
হও ক্ষান্ত এইক্ষণ, রক্ষ-পৌরজন।"
"ছন্দক, ছন্দক!"—যুবা কহিলা উচ্ছ্বাসে—
"অসার সম্ভোগ সুখ অনিত্য অধ্রুব;
চঞ্চল চঞ্চলা মত, রিক্তমুষ্টি সম
অসার, অস্থায়ী জল-বুদ্বুদের মত,
দুর্ভোগ্য স্বপনসম, দুস্পৃশ্য সকল
সর্প-মস্তকের মত,—পূর্ণ মহাবিষে।
কে বল কখন কাম্য বস্তু উপভোগে
—কামিনী, কাঞ্চনে, রাজ্যে—তৃপ্তি কামনায়
পাইয়াছে এ জগতে? হায়! এ সম্ভোগ
মৃগ-তৃষ্ণিকার মত বাড়ায় পিপাসা,
অতৃপ্ত-কামনানলে দহে নিরবধি।
কোন্ কাম্যবস্তু নাহি করিয়াছি ভোগ—

সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য! কোন্ ভোগ-পুষ্পে
প্রমত্ত মধুপ মত করিনি চয়ন
ইন্দ্রিয়ের সুখমধু। কই তৃপ্তি কোথা?
মত্ত তিমিরেরি মত সম্ভোগ সাগরে
কি ক্রীড়া না করিলাম হায়! এত দিন?
কই তৃপ্তি কোথা? ভোগ-পুষ্পে পুষ্পে
মত্তমধুকর মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া
অতৃপ্ত কামনানলে মরিতে পুড়িয়া
আসিনু কি ধরাতলে? মানব-জীবনে
নাহি শান্তি? নাহি সুখ? মানব জীবন
কেবল কি মরীচিকা ভোগ কামনার?
না,ছন্দক!—আছে শান্তি, আছে নিত্য সুখ,
ভোগ-দাবানল হতে হইতে উদ্ধার,
জন্ম—জরা—মরণের দুঃখ-পারাবার
হইতে উত্তীর্ণ হায়! আছে মুক্তি-পথ।
খুঁজিব সে মুক্তি-পথ খুঁজিব নির্ব্বাণ
এই দাবাগ্নির; ধরা করিব শীতল।
আন অশ্ব! হও তুমি সহায় আমার।
উড়িবে যে পাখী ওই অনন্ত আকাশে
সোণার পিঞ্জরে তার, সোণার শৃঙ্খলে
মিটিবে কি সাধ? দ্বার কর অনর্গল,
অনন্ত আকাশে আমি যাইব উড়িয়া।"

ছন্দক কাঁদিয়া কহে—"হায়! দেব! তবে
নিশ্চয় কি এ সংসার শোকে ডুবাইয়া
যাইবে ছাড়িয়া তুমি?" "নিশ্চয় ছন্দক!"—
উত্তরিল দৃঢ় কণ্ঠে কুমার—"নিশ্চয়!
সুমেরুর মত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমার।
মস্তক উপরে বজ্র, তপ্ত লৌহ পথে
প্রজ্বলিত শৈলশৃঙ্গ হয় নিপতিত,
তথাপি প্রতিজ্ঞা নাহি করিব লঙ্ঘন।
শত পত্নী, শত পুত্র, শত মাতা পিতা,
দাঁড়ায় সম্মুখে যদি, শত মায়া বলে
করে অবরুদ্ধ পথ, ছন্দক! প্লাবিত
করে নয়নের জলে, পূর্ণ হাহাকার,
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম পালিব নিশ্চয়।"

আর না, আনিতে অশ্ব চলিল ছন্দক।
পশিলা সিদ্ধার্থ গৃহে জনমের মত
দেখিতে গোপার, নব প্রসূনের মুখ।
সূতিকা আগারে ধীরে করিয়া প্রবেশ
দেখিলা জ্বলিছে মৃদু মন্দ দীপাবলী
মৃদু আলোকিয়া কক্ষ! কুসুম-শয্যায়
আলুলায়িত কুন্তলা, স্খলিত বসনা,
নিদ্রা যাইতেছে গোপা বক্ষে সদ্য শিশু,
সোণার প্রতিমা বক্ষে সোণার কুসুম
পাইয়া আদরে যেন;—জিনি দীপদাম
করিয়াছে আলোকিত গৃহ দুই জন।
এবার সিদ্ধার্থ বক্ষ কাঁপিল না আর,
কেবল দুইটী বিন্দু অশ্রু দুনয়নে
আসিল, ভাসিল, ধীরে,—মায়ার চরণে
সিদ্ধার্থের সুশীতল শেষ উপহার।
দাঁড়াইয়া দ্বারে, শির রাখিয়া প্রাচীরে
অবসন্ন, দেহস্থির অবরুদ্ধ শ্বাস;
চাহিয়া চাহিয়া পত্নী পুত্র মুখ পানে
হইলেন ধ্যান মগ্ন। শুনিলেন কর্ণে
জরা-ব্যাধি-ব্যথিতের ঘোর হাহাকার;
ঘোর দুঃখ পূর্ণ ধরা, কত নর, নারী,
কত গোপা, কত শিশু, ব্যাপি ভবিষ্যত
পুড়িতেছে দুঃখানলে দেখিলা নয়নে।
হলো মায়া অন্তর্হিত, অশ্রু নয়নের
শুকাইল দুনয়নে। যুবা আত্মহারা
আসিলেন গৃহ-দ্বারে যথায় ছন্দক
সজ্জিত কণ্টকনামা অশ্বের সহিত
ছিল দাঁড়াইয়া শোকে নীরব নিশ্চল।
"কণ্টক! কণ্টক!"—অশ্বে ডাকিলা আদরে,
উঠিলেন এক লম্ফে সিদ্ধার্থ আকুল,—
শ্বেত মেঘ পৃষ্ঠে যেন শোভিল শশাঙ্ক
শরতের নিরমল! গ্রীবা বাঁকাইয়া
সুজাত সুশুভ্র অশ্ব বেগে বায়ুগামী
প্রভুর আদরে-গর্ব্বে নাচিয়া নাচিয়া
চলিল কোমল পদে ইঙ্গিতে নীরবে।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

সহমরণ

কত শত যুগ পূর্ব্ব হইতে ভারতে সহমরণ প্রথা ছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বেদে সহমরণের আভাস থাকাতেই ইহা সপ্রমাণ হয়।

হে নারি! তুমি মৃতের সমীপে শয়ান রহিয়াছ, উঠ। জীবিত লোকের নিকট এস। বিবাহেচ্ছু ও গর্ভাধান-কারীর পত্নী হও *

এই অনুবাদের উপর নির্ভর করিলেও মৃত-পতির পার্শ্বে পত্নীর শয়ন করার কথা বেদে আছে, ইহা বেশ বুঝা যায়। তার পর বুঝা গেল, বন্ধুবর্গের সান্ত্বনার কথা।

ব্রহ্মচর্য্য, সহমরণ এবং পত্যন্তর গ্রহণ সত্যযুগে এই তিন প্রথা প্রচলিত ছিল; ব্রহ্মচর্য্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট কল্প, পত্যন্তর গ্রহণ নিকৃষ্ট কল্প। ব্রহ্মচর্য্য—কঠোর ব্রহ্মচর্য্য চিরজীবন পালন করা বড় কঠিন।

চিরজীবন যন্ত্রণা ভোগ করা অপেক্ষা একেবারে দগ্ধ হওয়াই ভাল।—এই বিবেচনায় তখনকার স্ত্রীলোক অনেকেই সহমরণে প্রবৃত্তা হইতেন। কিন্তু এই সহমরণেচ্ছা—রমণীর আকস্মিক শোকজ মোহসম্ভূত অথবা ধর্ম্মমূলক, ইহা অবগত হইবার জন্যই বান্ধবেরা সহমরণেচ্ছু রমণীর বৈষয়িক প্রলোভনে সংসার-সুখের নিগূঢ় স্মৃতি জাগাইবার জন্যই বলিতেন,—"বিবাহেচ্ছু ও গর্ভাধানকারীর পত্নী হও।"

যাঁহারা তাহাতে ভুলিতেন, যাঁহাদের সহ-মরণেচ্ছা আকস্মিক, তাঁহারা ফিরিতেন; আর যাঁহারা যথার্থ সাধ্বী, তাঁহারা উপরত ভর্ত্তার সঙ্গিনী হইতেন। বেদ-বচনের ভাব হইতে ইহা সম্পূর্ণ বুঝা যায়।

বেদের পর অন্যান্য শাস্ত্রের অনুশীলনেও সহমরণের প্রাচীনত্ব স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

সতীর লক্ষণ কি,—ইহা আলোচনা করিলেও সতী-দাহের প্রাচীনতার উপলব্ধি হয়। যথা,—

"আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে, প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সাধ্বী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥"
হারীত।

সাধ্বীনামেব নারীণামগ্নি-প্রপতনাদৃতে।
নান্যো ধর্ম্মো হি বিজ্ঞেয়ো মৃতে ভর্ত্তরি কর্হিচিৎ॥
অঙ্গিরাঃ।

মহাভারতে সহমরণের সুপ্রচুর দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। মহাভারত যে, খৃষ্টাব্দ প্রচলিত হইবার অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের গ্রন্থ, তাহা প্রমাণীকৃত হইয়া গিয়াছে। এই মহা-ভারতেই পাণ্ডুপত্নী মাদ্রী, ধৃতরাষ্ট্র-পত্নী গান্ধারী, কপোতিকা, শ্রীকৃষ্ণপত্নী রুক্মিণী, হৈমবতী, জাম্ববতী প্রভৃতি বাসুদেব-প্রদ্যুম্ন-বলরামাদির ভার্য্যারা চিতারোহণ করিয়াছিলেন।

হিন্দু-ভূপতিগণ কর্তৃক সতীদাহ রহিত করি-বার নিমিত্ত কখন কোন উদ্যোগ হইয়াছিল, হিন্দুশাস্ত্রে তাহার কোন নিদর্শনই নাই। তবে হিন্দুজাতির স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইলে, যৎকালে ম্লেচ্ছগণ, ভারতের রাজদণ্ড পরিচালন করিতেন, তখন উহা স্থগিত করিতে কোন চেষ্টা হইয়াছিল কি? অনির্দ্দেশ্য কাল হইতে খৃষ্ট-জন্মের পর ৮০০ আট শত বৎসর পর্য্যন্ত হিন্দুগণের অখণ্ড প্রতাপ ছিল। তৎপরে অর্থাৎ ৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুসলমানদের রাজত্বকাল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে কেবল মোগল-জাতীয় সম্রাট আকবর * সহমরণ নিবারণের উদ্যম

* ঋগ্বেদ-সংহিতার ঋক্‌টী এই,—
উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকমিতাসুমেতমুপশেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভিসংবভূব॥
ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১০ মণ্ডল, ১৮ সূক্ত, ৮ম মং।

* আকবর, ১৫৫৬ হইতে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য করেন। ঠিক্ কোন্ সময়ে তিনি ঐ ব্যাপারে হস্ত-ক্ষেপ করেন, তাহার নিরূপণ করিতে পারা যায় নাই।

করিয়াছিলেন। তাঁহার গোঁড়ামি ছিল না বলিয়া যেরূপ ঘোষণা লোকে করিয়া থাকে, তাহাতে তাঁহাকে হঠকারী মনে করাই অবৈধ। অর্থাৎ তিনি হিন্দুদের ধর্ম্মমিশ্রিত সামাজিক ব্যাপারে বলপ্রয়োগ করেন নাই। সুতরাং অভিপ্রায়, আইনে পরিণত হয় নাই। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণের পতন ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজগণের অভ্যুত্থান হয়। ১৭৫৭ হইতে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরেজেরা আমাদের সামাজিক কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই।

লর্ড ওয়েলেস্‌লির অধিকার।

গবর্ণর লর্ড ওয়েলেস্‌লির শাসন সময়ের শেষভাগে সতীদাহ-নিবারণ চেষ্টা হইয়াছিল। তিনি ১৭৯৮ হইতে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাসক ছিলেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ৫ই ফেব্রুয়ারি ঐ বিষয়ের প্রথম চেষ্টা হইয়াছিল। উক্ত শাসনকর্ত্তার অনুজ্ঞাক্রমে ডাওডেস্‌ওয়েল সাহেব নিজামত আদালতের রেজিষ্ট্রার গুড্‌কে যে পত্র লেখেন তাহার মর্ম্ম এই ;—

"নিজামত আদালতের রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত গুড্ সাহেব মহোদয় সমীপেষু।

মন্ত্রি-সভাধিষ্ঠিত সম্মানাস্পদ গবর্ণর জেনেরল কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি আপনাকে জ্ঞাত করিতেছি যে, বিহারের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেটের প্রেরিত পত্রের যে প্রতিলিপি আপনার নিকট পাঠান গেল, তাহা আপনি নিজামত আদালতের বিচারপতির সমক্ষে পেস্ করিবেন। দেখিতে পাইবেন, উক্ত পত্রে বিবৃত হইয়াছে—কোন কামিনী, স্বীয় স্বামীর মৃতদেহের সহিত নিজ দেহ ভস্মীভূত করিতে প্রযত্ন করায়, উক্ত বিচারক তাঁহাকে ঐ কার্য্য হইতে বিরত করিয়াছেন। নিজামত আদালত অবগত আছেন,—ভারতবর্ষীয়গণের সুনীতি, ন্যায়-বিচার ও মনুষ্যত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া—তাঁহাদের ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার ও পূর্ব্ব-সংস্কার সকল সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়া—তাঁহাদের সমস্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাই, ইংরাজ-রাজের এক প্রধান নিয়ম। বিহারের মাজিষ্ট্রেটের প্রতিনিধি, স্বীয় পত্রে সেই রমণী সম্বন্ধে যে সমুদায় ঘটনা বিবৃত করিয়াছেন, সেই ঘটনা পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক এবং সেই রমণীর কিশোর বয়ঃক্রম, তদীয় পরলোকগত পতির শব-দাহকালে তাঁহার উন্মত্তাবস্থা বা অজ্ঞানতা বিশেষ ভাবে অনুশীলন করিয়া, সচিব-সভাধিষ্ঠিত বড় লাট সাহেব জানিতে চাহিয়াছেন, এই অনৈসর্গিকী ও অমানুষিকী প্রথা সমূলে উৎপাটিত করা যাইতে পারে কি না। কেননা, ইহা সম্যক্ বিদিত হওয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তিনি ইহাও বিবেচনা করিয়াছেন, এদেশীয় ধর্ম্ম, আচার প্রভৃতির নিয়মাবলীর অনুরোধে যদি এই প্রথা রহিত করা অসম্ভব বোধ হয়, তাহা হইলে এমন কোন উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যদ্দ্বারা সহগমনোদ্যতা নারীদিগকে, তাঁহাদের আত্মীয়েরা অসঙ্গত উপায়ে পতির অনুগমনে উত্তেজিত করিতে না পারেন। আর বিহারের মাজিষ্ট্রেট যে লিখিয়াছেন, সহমরণোদ্যতা নারীকে তদীয় আত্মীয়েরা মাদক-দ্রব্য ব্যবহার করাইয়াছিলেন ; এই গর্হণীয় কার্য্যের যাহাতে সম্পূর্ণরূপে নিরাকরণ হইতে পারে, এ বিষয়েও আমাদিগকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

"অতএব নিজামত আদালতকে অনুরোধ করা যাইতেছে,—এই প্রথা, হিন্দুদের কতদূর ধর্ম্মানুমোদিত, উক্ত আদালত, যেন তাহা সর্ব্বাগ্রে পণ্ডিতগণের মতামত গ্রহণপূর্ব্বক নির্ণয় করেন। আর, এই প্রথা যদি হিন্দুধর্ম্মনীতির অননুমোদনীয় হয়, তবে বড় লাট সাহেব আশা করিতে পারেন, এক্ষণে না হউক, বর্ত্তমান সহমরণ-প্রথা ক্রমশঃ বিলোপ প্রাপ্ত হইবে। এই প্রথা, আবহমান-কাল-প্রচলিত ও হিন্দু-

ধর্ম্মের অবিরোধী, এপ্রযুক্ত উহার সমূলোচ্ছেদ অসম্ভব বা অবিধেয়,—নিজামত আদালত যদি এই প্রকার বিবেচনা করেন, তবে বড় লাট সাহেব নিজামতকে এই মাত্র অনুরোধ করেন যে, যাহাতে ঐ নিন্দনীয় কার্য্য-সমুদয়ের সম্যক্ নিবারণের সদুপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে, নিজামতকে তাহা করিতে হইবে। ফলতঃ, যে কোন প্রকার উপায়েই হউক, সহমরণোদ্যতা অবলাগণকে মাদক দ্রব্য ও ঔষধ ব্যবহার হইতে বিনিবৃত্ত করিতে হইবে। আর, তরুণ বয়স হেতু অথবা অপর কোন হেতু বশতঃ নিজহিতাহিত-অবধারণে অসমর্থা নারীগণকে যাহাতে কাল-গ্রাস হইতে পরিত্রাণ করা যাইতে পারে, তদুপায় অবলম্বন করা আবশ্যক।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দ, ৫ই ফেব্রুয়ারি। } ভবদীয় একান্ত বশ্য— ডাওডেস্‌ওয়েল, বিচার-বিভাগের অধ্যক্ষ।"

ইহার পর, ঐ অব্দের ৪ঠা মার্চ্চে নিজামতের পণ্ডিতবৃন্দকে নিম্নোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য যে অনুরোধ-পত্র প্রেরণ করা হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই,—

"নিজামত আদালতের পণ্ডিতগণের প্রতি প্রশ্ন :—

"যেহেতু, হিন্দুদের মধ্যে সময়ে সময়ে এইরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখা যায় যে, কোন লোকের মৃত্যু হইলে, তৎ-পত্নী, পরলোকগত স্বামীর চিতায় স্বামীর সহিত অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া থাকেন, সেই হেতু আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে, ঐরূপ কার্য্যে শাস্ত্রের বিধি কিরূপ? মৃত ভর্ত্তার অনুগমন—শাস্ত্রসম্মত, কি শাস্ত্র-বিরুদ্ধ? সহগমনের ব্যবস্থাই বা কি কি? পঞ্চদশ দিবসের মধ্যে আপনাদিগকে ইহার উত্তর দিতে হইবে।—১৮০৫ খৃষ্টাব্দ, ৪ঠা মার্চ্চ।

নিজামতের পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্ম্মা, যে উত্তর দেন, তাহার তাৎপর্য্য এই,—

"নিজামত আদালত কর্তৃক প্রেরিত প্রশ্ন, সম্যক্ আলোচনা করিয়া আমি যথাজ্ঞান তাহার উত্তর দিতেছি।

"যাঁহারা সহমৃতা হইবার জন্য প্রস্তুত হন, তাঁহাদের অতি শিশু সন্তান থাকিলে, অন্তরাপত্য ঘটিলে, রজোনির্গম-কাল হইলে অথবা নাবালিকা থাকিলে, তাঁহারা স্বামীর চিতায় ভস্মীভূত হইবার যোগ্যা নহেন। উহার অভাব হইলে, অর্থাৎ উক্ত প্রতিবন্ধকগুলি না ঘটিলে, সহমৃতা হইবার পক্ষে কোন নিষেধ নাই। এই নিয়ম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চাতুর্ব্বর্ণ্যের উপর বর্ত্তিবে। যে স্ত্রীর শিশু-তনয় বা তনয়া থাকে, তিনি যদি শিশুর প্রতিপালনে কোন রমণীকে আপন প্রতিনিধি-স্বরূপ পান, তবে তাঁহার সহগমনে কোন বাধা নাই। উৎকট ঔষধ বা মাদক দ্রব্য ব্যবহার করাইয়া কামিনীর অনভিমতে সহমরণে উত্তেজিত করা অশাস্ত্রীয় ও লোকাচার-বিরুদ্ধ। এইরূপে অচৈতন্য বা উন্মত্ত করাও অবৈধ। সহমরণকালে নারীদিগকে সঙ্কল্প ও অন্যান্য কোন কোন বিধির অনুষ্ঠান করিতে হয়। অঙ্গিরা, ব্যাস ও বৃহস্পতি প্রভৃতি মহামুনিগণ ইহার প্রবর্ত্তক।

"মানব-দেহে সার্দ্ধ ত্রিকোটী লোম আছে। যাঁহারা স্বামীর অনুগামিনী হইয়া থাকেন, তাঁহারা ঐ কেশের সংখ্যানুরূপ বর্ষকাল (যত লোম, তত অব্দ অর্থাৎ সাড়ে তিন কোটী বৎসর) ব্যাপিয়া স্বামি-সহবাসে দ্যুলোকে অবস্থান করিতে পারেন। যেমন আহি-তুণ্ডিক, গহ্বর হইতে বিষধরকে টানিয়া বাহির করে, সহমৃতা নারীরা সেইরূপ নরক হইতে নিজ নিজ পতিদিগকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, পরিশেষে তাঁহাদিগের সহিত স্বর্গলোকে বিচরণ করেন। শিশুসন্ততিবতী, গর্ভবতী, ঋতুমতী ও অপ্রাপ্তবয়স্কা অঙ্গনাদের সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে বর্জ্জন-বিধির নির্দ্দেশ হইল, তাহা ঔর্দ্ধ ও

অন্যান্য ঋষিরা, সগর রাজার প্রভৃতিকে বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

শ্রীঘনশ্যাম শর্ম্মা।"

নিজামত আদালতের বেতনভোগী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম শর্ম্মা মহাশয়ের প্রাগুক্ত উত্তর-প্রাপ্তির পর নিজামত আদালত হইতে পুনরায় যে অতিরিক্ত প্রশ্ন, উক্ত পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ,—

যদি কোন মহিলা, সহগমনে উদ্যতা হইয়া তাহা হইতে নিরস্ত হন, তবে তাঁহার পরিণাম কি হইবে? তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহার প্রতি কীদৃশ ব্যবহার করিবেন?"

ঘনশ্যাম শর্ম্মার উত্তরের মর্ম্ম এই,—

"যদি কোন কামিনী, সহমৃতা হইবার উদ্দেশ্য করিয়া সঙ্কল্প ও আর সকল ক্রিয়া না করিয়া থাকেন, তবে শাস্ত্রানুসারে তাঁহাকে কোন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না। এই অবস্থায় তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারেন। শাস্ত্রে তাহার কোন নিষেধ বিধি নাই। কিন্তু যদি কোন নারী সঙ্কল্প-বাক্য পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিয়াও, তাহা হইতে নিবৃত্ত হন, তবে তাঁহাকে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্তের পর তাঁহার জ্ঞাতি-কুটুম্বাদি আত্মীয়কুল, তাঁহাকে সমাজে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

"শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যে নারী সাংসারিক মায়া বশতঃ পতির চিতারোহণে বিরত হন, তিনি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত বিনা পাপোমুক্ত হইতে পারেন না।"

শ্রীঘনশ্যাম শর্ম্মা।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে, তিনজন গবর্ণরের রাজত্বকাল। লর্ড ওয়েলেস্‌লি, লর্ড করন্‌ওয়ালিস ও সার জর্জ্জ বর্লো এই তিনজন ঐ অব্দে শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লির অধিকারের শেষে সতীদাহ বিষয়ে এই পর্য্যন্ত কার্য্য হইয়াছিল। ঐ অব্দেই লর্ড করন্‌ওয়ালিস দ্বিতীয় বার গবর্ণর হইয়া আইসেন, তাঁহার সময়ে কোন কার্য্য হয় নাই। সার্ জর্জ্জ বার্লো ১৮০৫—১৮০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাসনকর্ত্তার পদারূঢ় থাকেন। এ সময়েও কিছুই অনুষ্ঠিত হয় নাই।

রামমোহন রায়ের প্রথম চেষ্টা।

১৮১০ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায়, "সহমরণ-সংবাদ" নামক পুস্তক লেখেন। ঐ অব্দেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ার সহগমন ঘটে। তদর্থে তিনি সহমরণের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হন। ঐ পুস্তকে রামমোহন রায় সহমরণকে হত্যা (খুন) শব্দে উল্লেখ করিয়াছিলেন।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে আবার ইহার আন্দোলন চলিতে লাগিল।

বুন্দেলখণ্ডের মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ওয়ানক্লোপ সাহেব ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ৩রা আগষ্ট নিজামত আদালতের রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত টরনবুল সাহেবকে যে পত্র লেখেন, তাহাই সতীদাহের সংখ্যা খর্ব্ব করিয়া আনিবার প্রকৃষ্ট উপায় স্বরূপ হইয়া উঠে। নিম্নে তাঁহার পত্রখানির ভাবার্থ প্রদত্ত হইল,—

"শ্রীযুক্ত টরনবুল সাহেব,
নিজামত আদালতের রেজিষ্ট্রার
মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়, সম্প্রতি এক সতীদাহ হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে উক্ত কর্ম্ম হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিবার উদ্যোগ করিয়াও, কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় নাই। তৎসম্বন্ধে এখানকার কার্য্যালয়ে কোন আদেশের অস্তিত্ব না থাকায়, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তদ্বিষয়ে

মেজেষ্টর কিছু করিতে পারেন কি না? আরও জিজ্ঞাসা করি, কি উপায়ে সহমরণ হইতে হিন্দু-অঙ্গনাগণকে নিরস্ত করা যাইতে পারে?

বুন্দেলখণ্ডের ফৌজদারি কাছারি। ১৮১২খৃঃ ৩রা আগষ্ট } ভবদীয় নিতান্ত অনুগত ওয়ান্‌ক্লোপ, মাজিষ্ট্রেট।

এই অব্দে ৩রা সেপ্টেম্বরে নিজামত আদালত, গবর্ণর জেনেরলকে কোন কোন বিষয় জ্ঞাপন করেন।

ওয়ান্‌ক্লোপ সাহেবের পত্রের ফল ফলিল। তাঁহার লেখার জন্যই নিম্ন-লিখিত নিয়ম কতটা বিধিবদ্ধ হইল। পশ্চাৎ গবর্ণর জেনেরলের লিখিত মূল নিয়ম পাঠককে দেখাইতেছি;—

"মন্ত্রি-সভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনেরল বিবেচনা করেন যে, এ বিষয়ে রাজকর্ম্মচারীরা নিম্নোক্ত স্থলেই কেবল হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন।

"১ম।—ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য বর্ণের নারীদিগের আত্মীয়গণ, যাহাতে স্ব স্ব আত্মীয়া নারীদিগকে সহমরণে প্রবৃত্তি দিতে বা বলপ্রয়োগ করিতে না পারেন, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

"২য়।—কোনরূপ মাদকদ্রব্য ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না।

"৩য়।—হিন্দুশাস্ত্রে যে বয়সে সহমরণ গমনে নারীর অধিকার, যথাসাধ্য সেই বয়ঃক্রম নির্ণয়ের প্রয়াস পাইতে হইবে।

"৪র্থ।—সহগমনোদ্যতা অঙ্গনা গর্ভবতী কি না জানিতে হইবে।

"৫ম।—যে স্থলে উপরি উক্ত কারণ বশতঃ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে সতী-দাহ অসিদ্ধ, সেই সেই স্থলে সতীদাহ নিবারণ করিতে হইবে।"

ঐ অব্দে ৫ই ডিসেম্বরে নিজামতের প্রতিনিধি রেজিষ্ট্রার বেলি সাহেব, গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি ডাওডেস্‌ওয়েল্‌ সাহেবকে এইরূপ ভাবে লেখেন,—

"শ্রীযুক্ত জর্জ ডাওডেস্‌ওয়েল্‌ সাহেব সরকারী বিচার-বিভাগের সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

"হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত কতিপয় আচার-ব্যবহার বহুকাল প্রচলিত থাকিয়া আপনা আপনি ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়াছে, অথবা হিন্দু-ভূপালগণের উদ্যোগে রহিত হইয়াছে;—সতীদাহ-প্রথা, হিন্দুধর্ম্ম-সম্মত হইলেও, হিন্দুজাতির ধর্ম্মের উপর গুরুতর আঘাত না করিয়া শীঘ্রই উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে কিনা, নিজামত আদালত উহার মূলানুসন্ধান করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলেন। অতীব সতর্কতা সহকৃত অনুসন্ধানের পর, উক্ত আদালতের কর্তৃপক্ষীয়েরা অবগত হইয়াছেন,—এই প্রথার উপর লোকের আনুরক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এত প্রবল যে, এ প্রদেশীয় সকল বর্ণের হিন্দুগণ, ইহাকে প্রচলিত রাখিবার জন্য সবিশেষ যত্নপর থাকিবে। অন্যান্য প্রদেশে বিশেষতঃ ত্রিহুতে ধর্ম্মজ্ঞান উন্নত থাকায়, সতীদাহ-প্রথা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে। কোন কোন জেলায় এই প্রথা, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের মধ্যে প্রবল দৃষ্ট হয়, অন্যান্য জাতির মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।

১৮১২ খৃষ্টাব্দ, ৫ই ডিসেম্বর। } নিবেদক বেলী, নিজামত আদালতের প্রতিনিধি রেজিষ্ট্রার।"

এই লিপিতে দৃষ্ট হইল, গবর্ণমেণ্ট ভিতরে ভিতরে কিরূপ চেষ্টা করিতেছিলেন।

অতঃপর অর্থাৎ ১৮১২ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বরের পর সাত মাসেরও ঊর্দ্ধ কাল অতীত হইল, তথাপি কেন চেষ্টা হয় নাই। পরিশেষে পর বর্ষে (১৮১৩ খৃষ্টাব্দ) ১৭ই এপ্রিলে এক 'রেগুলেশন্‌' অর্থাৎ নিয়ম প্রস্তুত হইল। ইহার পর প্রায় সার্দ্ধ বর্ষ অতিক্রান্ত হয়, অথচ এতদ্বিষয়ে কোন উদ্যোগই ঘটিতে পায় নাই।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কোন কার্য্য হওয়ার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না।

মার্কুইস অব্ হেষ্টিংস্ বা লর্ড ময়রার কাল।

১৮১৫—১৮২৩ খৃষ্টাব্দ।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দ।—এইবার আমরা অন্য গবর্ণরের রাজত্বকালে গিয়া উপনীত হইতেছি। এই সময়ে মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস্ গবর্ণর। তিনি লর্ড ময়রা নামেও পরিচিত। ১৮১৫ হইতে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দ অবধি তাঁহার শাসন-কাল। এই সময়েই সহমরণ রহিত করিবার জন্য রাজ-পুরুষগণের আভ্যন্তরিক উদ্যোগ বিলক্ষণ চলিতে থাকে। কেননা, এই বর্ষে (১৮১৫ খৃঃ) ৪ঠা জানুয়ারির সার্কুলার আদেশানুসারেই সতীদাহের এক তালিকা সংগৃহীত হয়। তাহাতে অবগত হওয়া যায়, কোন্ কোন্ বিভাগে কত সতী ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। এই তালিকা সংগ্রহ না হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংরেজ-রাজ ভাবিতেন, বুঝি লক্ষ লক্ষ প্রাণীই সহমৃতা হইয়া থাকে। তাই রাজপুরুষেরা মৃতের সংখ্যা নিরূপণে ব্যাকুল থাকিলেন। তাঁহাদের তদানীন্তন চেষ্টা, মনের ভাব-ভঙ্গী, ভারতীয় প্রজাকুল কোন উপায়েই বুঝিতে পারিলেন না। সুতরাং ইংরেজ শাসন-কর্ত্তারা ধীরে ধীরে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ছয়টী বিভাগে সহমৃতা নারীর এইরূপ তালিকা পাওয়া গিয়াছিল,—

(১) ঢাকা	বিভাগে	৩১	সহমৃতা
(২) বারাণসী	"	৪৮	"
(৩) মুরশিদাবাদ	"	১১	"
(৪) পাটনা	"	২০	"
(৫) কলিকাতা	"	২৫৩	"
(৬) বেরিলী	"	১৫	"

উল্লিখিত তালিকা-দৃষ্টে রাজ-পুরুষগণের চক্ষু-কর্ণের বিরোধ-ভঞ্জন হইল। তখন তাঁহারা সুদৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে সহমৃতার সংখ্যা ঐ তালিকায় জানা গেল, ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বৎসরে ঐ চেষ্টা হয় নাই।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দ।—এখনও লর্ড ময়রার অধিকার। এই বৎসরে ৯ই সেপ্টেম্বরে এক নিয়ম প্রচারিত হয়। তাঁহারই শাসন-সময়ে ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী সভাপতির অনুজ্ঞা-ক্রমে নিজামত আদালত কর্ত্তৃক মেজেষ্ট্রেটদিগের ও পুলিশের কর্ম্মচারি-বৃন্দের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্ধারণের জন্য যে নিয়ম প্রচারিত হয়, তাহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের বিরক্ত হইবার কোন হেতুই বর্ত্তমান ছিল না। কেননা, তখনও তাঁহারা আমাদের ধর্ম্ম-সামাজিক নিয়মে হস্তক্ষেপ করেন নাই। এখনও প্রজারা, রাজার অভি-প্রায় অবধারণে যে অসমর্থ ছিল, তাহা সুকৌ-শল-সম্পন্ন ব্রিটিশ জাতির রাজনীতির প্রভাব বৈ আর কিছুই নয়।

এতক্ষণের পর আমরা রাজা রামমোহন রায়ের কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলাম। পাঠ-কেরা যে রামমোহন রায়কে সতীদাহ উঠাইয়া দিবার মূল বলিয়া জানেন, তাঁহাকে আমরা এতক্ষণের পর লোকের দৃষ্টিগোচর করিলাম, ইহার কারণ কি? কারণ অবশ্যই আছে। অকারণ কোন্ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়? রাম-মোহন রায় মহোদয় প্রকৃতপক্ষে সহমরণ উঠাইবার প্রথম প্রস্তাবক বা প্রবর্ত্তক নহেন। তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। আমাদের বর্ণনা পাঠ করিলে, তাঁহাকে একজন প্রধান উদ্যোগী বলিয়া লোকের ধারণা হইবে।

রামমোহন রায়-কৃত চেষ্টা ও কার্য্য।

(১৮১৮ খৃষ্টাব্দ)।

রাজা রামমোহন রায়, এইবার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার

তাঁহার এক কারণ ঘটিয়াছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহনের দ্বিতীয়া বনিতা অলকমঞ্জরী বা অলকমণি ১২১৬ সালের ২৭ চৈত্র রবিবার শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে (১৮১০ খৃষ্টাব্দে ৮ই এপ্রিলে) স্বামীর অনুগমন করিয়াছিলেন। এই ঘটনার সময়ে তিনি গৃহে ছিলেন না। বিষয়-কর্ম্মোপলক্ষে তখন তাঁহাকে স্থানান্তরে অবস্থিতি করিতে হইত। ঐ ব্যাপার শুনিয়া * অবধি তাঁহার মনে মনে প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল, সহমরণ নিবারণার্থে তিনি প্রাণপণে উদ্যোগী হইবেন। কেহ কেহ বলেন, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রামমোহন রায়, আপনার মাণিকতলার বাটীতে যে "আত্মীয় সভার" প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাতে সতীদাহ উঠাইবার জন্য জল্পনা হইত। কিন্তু এবিষয়ের কোন প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তিনি ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে „সহমরণবিষয়ক প্রথম প্রস্তাব" বাঙ্গালায় মুদ্রিত করেন; ঐ বৎসরেই ৩০শে নবেম্বরে উহা ইংরেজিতে অনুবাদিত হয়। গঙ্গাতীরে তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া শবদাহ-ঘাটে সতীদাহ-নিবারণের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। পর বৎসরে (১৮১৯ খৃঃ) সহমরণের দ্বিতীয় পুস্তক প্রচারিত হয়। উহার অনুবাদ ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে গবর্ণমেণ্টের নিকট এক দরখাস্ত প্রেরিত হয়, অনেকে অনুমান করেন, ইহার ভিতর রাজা রামমোহন ছিলেন। ইহা অসম্ভব মনে হয় না। বিরুদ্ধ পক্ষে তাঁহার কর্তৃত্ব করা সমধিক সম্ভব পর, তাহার সন্দেহ নাই। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে তিনি "সংবাদ-কৌমুদী" নামে যে পত্রিকার প্রকাশারম্ভ করেন, তাহাতে সহমরণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব প্রকাশিত হইত। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সহমরণের তৃতীয় প্রস্তাব ও তাহার ইংরেজী অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। তৎকালে গবর্ণমেণ্ট হইতে রামমোহন রায়ের প্রশংসাও হইয়াছিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের জুলাইমাসের ইণ্ডিয়া গেজেটে এই মর্ম্মে ঘোষিত হইয়াছিল,—

"আমরা অবগত হইলাম, সতীদাহ-বিষয়ক বঙ্গভাষায় লিখিত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি, কোন এক বঙ্গীয় সংবাদপত্রে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। রামমোহন রায়ের এই গ্রন্থখানি, জন-সমাজে পুনঃ-প্রচারিত হওয়ায়, ইহা নিশ্চয়ই সুফল-প্রসূ হইবে।"

এখানে যে বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার নাম "সংবাদ-কৌমুদী।" রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দুইজনে উহার সর্ব্বপ্রথম সম্পাদক, প্রবর্ত্তক ও স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন। সহমরণ-বিষয়ক প্রবন্ধ মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইলে শেষোক্ত মহোদয় উহার সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া ১৮২২ খৃষ্টাব্দে "সমাচার-চন্দ্রিকা" বাহির করিতে আরম্ভ করেন।

যে সকল কার্য্যের নিমিত্ত রামমোহন রায়ের বিষয়ে ইণ্ডিয়া গেজেটে পুনশ্চ লেখা হইয়াছিল, তাহা পশ্চাৎ প্রদত্ত হইতেছে। অগ্রে ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশিত গবর্ণমেণ্টের সুখ্যাতি দেখাইতেছি। তাহার ভাবার্থ এইরূপ,—

"এ দেশীয় অতি প্রধান এক বিশ্বহিতৈষী ব্যক্তি, বহুদিন হইতে, সভ্য রাজপুরুষবর্গের মতের উত্তরসাধক ও মানবমণ্ডলীর হিতকারক-রূপে এই গুরুতর বিষয়ের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি প্রোৎসাহিত হইয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত, লিপির আকারে গবর্ণর জেনেরলের সমীপে দাখিল করিয়াছেন। তিনি ইদানীং গবর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে, গবর্ণর মহা অভ্যর্থনা সহকারে সোৎসুকচিত্তে তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করেন। আমরা অবগত হইলাম,

* যাঁহারা লিখিয়াছেন, "ঐ ব্যাপার দেখিয়া রামমোহন রায়ের মনে সহমরণ নিবারণের ইচ্ছা হয়," তাঁহাদের কথা ঠিক নয়।

গবর্ণর তাঁহাকে জানাইয়াছেন, এই রীতিটী তিনি রহিত করিবেন। কারণ উহা আমাদের প্রজা-সমূহের চরিত্রের দুরপনেয় কুৎসা। আর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সমর্থন করিতেছেন বলিয়া, ঐ প্রথায় রাজপুরুষবর্গেরও বীভৎস কলঙ্ককালিমা প্রকাশ পাইতেছে।"

আত্মীয় সভা।

রাজা রামমোহন রায়, সহগমন নিবারণের জন্ত যে যে উদ্যোগ করিয়াছিলেন, এখানে তাহার একটী তালিকা লিখিত হইল। তদ্দৃষ্টে তাঁহার কৃত কার্য্যের গুরুত্ব ও স্বরূপ নির্ণীত হইতে পারিবে।

পুস্তকাদির নাম।	কোন্ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত।		কোন্ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত।
১। সহমরণ-সংবাদ ...	১২১৬ সাল।	...	১৮১০ খৃষ্টাব্দ।
২। সহমরণ-বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব	১২২৫ সাল।	...	১৮১৮ খৃষ্টাব্দ।
৩। Translation of a conference between an advocate for, and an opponent of, the practice of burning widow alive, from the original Bengali.	1225 Bengali Era.		1818 Christian Era.
৪। সহমরণ-বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব	১২২৬ সাল।	...	১৮১৯ খৃষ্টাব্দ।
৫। A Second conference, between an advocate for, and an opponent of, the practice of burming widow alive.	1227 Bengali Era.	...	1820 Christian Era.
৬। সংবাদ-কৌমুদী ...	১২২৮ সাল।	...	১৮২১ খৃষ্টাব্দ।
৭। সহমরণ-বিষয়ক তৃতীয় প্রস্তাব	১২৩৭ সাল।	...	১৮৩০ খৃষ্টাব্দ।
৮। Anti-Suttee Petition to the House of commons.	1237 Bengali Fra.	...	1830 Chritian Era.
৯। Abstract of the arguments regarding the burning of widows considered an a religious rite.	" "	...	" "

লর্ড আমহার্ষ্টের কাল।

১৮২৩—১৮২৮। মার্চ্চ।

লর্ড আমহার্ষ্টের শাসন-সময়েই সতীদাহ-বিষয়ে হিন্দুনীতির ও হিন্দু আইনের প্রকৃতার্থ-বিজ্ঞাপক নিয়ম, বিধিবদ্ধ করণার্থে এক রেগুলেশন অর্থাৎ রাজনিয়ম প্রণীত হয়। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে তদ্বিষয়ে যে যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহাও তাঁহার আইনের অন্তর্গত হইয়াছিল। বারাণসীর প্রতিনিধি ম্যাজিষ্ট্রেট হামিল্টন্ সাহেব (R. N. C. Hamilton) উক্ত আইনের ধারা উদ্ধৃত করিয়া ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্টে ঘোষণা করিয়া দেন।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দ।—রাজা রামমোহন রায়ের কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণের পর হইতে গবর্ণমেণ্ট যেন একটুকু সুস্থ হইলেন। তাই আমরা তন্মধ্যে

আর আন্দোলনের বিশেষ নিদর্শন পাই নাই। লর্ড আমহার্ষ্ট, সতীদাহ সম্বন্ধে হিন্দু আইন ও হিন্দুনীতির প্রকৃতার্থ বিজ্ঞাপক নিয়ম প্রচার করেন। তাঁহার পূর্ব্বে যে সকল নিয়ম প্রচলিত ছিল, তত্তাবৎ বিধিবদ্ধ করণার্থে তিনি এক রেগুলেশন্ অর্থাৎ আইন প্রণয়ন করেন। বারাণসীর প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট উক্ত আইনের ধারা উদ্ধৃত করিয়া ঘোষণা করিয়া দেন।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দ।—১৩ই জানুয়ারিতে বেলি সাহেব (W. B. Bayley) এক সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেন, হারিংটন্ সাহেব (I. H. Harrington) ১৮ই ফেব্রুয়ারিতে এক প্রকাণ্ড মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই সতীদাহ রহিত করিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। হারিংটন একস্থানে বলিয়াছেন, "১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ৮ ধারা ও ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের ৮ ধারায় সতীদাহের কোন প্রতিবন্ধকতা করে নাই।"

বেলি সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ,—

"১৮২৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের দক্ষিণাংশে ও পশ্চিম অঞ্চলে কতকগুলি নারী সহমৃতা হইয়াছিলেন। তৎসংক্রান্ত বৃত্তান্ত ও অপরাপর লিপি ও বর্ণনার সহিত মেকনাটেনের যে পত্র বিগত ২১শে অক্টোবরে রাজকীয় গোচরে দাখিল হইয়াছে, তাহা আমি বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পড়িয়া দেখিয়াছি।

"১৮২১ খৃষ্টাব্দ হইতে যে সকল সতীদাহের বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের সতীদাহের সংখ্যা (অর্থাৎ ৬৩৯) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দুঃখের বিষয়, অন্যান্য জেলা অপেক্ষা রাজধানীর সন্নিকটস্থ জেলা সমূহে এই প্রথা সমধিক প্রচলিত।

"আমার বিবেচনায় গবর্ণমেণ্ট যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা এই নিষ্ঠুর প্রথা উঠাইয়া দিবার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। এবম্ভূত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যে ন্যায়-সঙ্গত, তাহার ভূরি ভূরি হেতু প্রদর্শন করা যাইতে পারে।"

১৮২৭ খৃষ্টাব্দ,
১৭ই জানুয়ারি। } বেলি।"

বেলি সাহেবের অভিপ্রায় পাঠ করিয়া ব্যবস্থাপক সমাজের সহকারী সভাপতি কম্বারমিয়ার, ঐ অব্দের ১লা মার্চ্চে এইরূপ ভাবে লেখেন,—

"নৃশংস সহমরণ-প্রথা, অবিলম্বে উঠাইয়া দেওয়ার নিমিত্ত বেলি সাহেব, যে প্রস্তাব করিয়াছেন, অর্থাৎ যে উপায় অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন, আমি তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দ, ১লা মার্চ্চ।

কম্বারমিয়ার,
সহকারী সভাপতি।"

এই সকল বিষয় ধীরভাবে পূর্ব্বাপর চর্চ্চা করিয়া গবর্ণর জেনেরল্ লর্ড আমহার্ষ্ট এইরূপ মতামত লিপিবদ্ধ করিলেন,—

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোন কার্য্য অসম্পূর্ণ সম্পাদিত হইলে, তাহাতে সুফল উৎপন্ন না হইয়া, বরং কুফল ফলিবারই অধিকতর সম্ভাবনা। সতীদাহ একেবারে স্থগিত করার কারণ কোন রাজনিয়ম বিধিবদ্ধ করিতে আমি ভাল বোধ করি না, সেই কার্য্যে আমি সম্মত নহি।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দ,
১৮ই মার্চ্চ। } আমহার্ষ্ট।"

পুনরায় এখানে আমাদিগকে ভিন্ন শাসনকর্ত্তার আমলে গিয়া উপস্থিত হইতে হইল। এই বারেই সতীদাহের মূলোচ্ছেদ হইবে।

লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের কাল।

১৮২৮। ৪ঠা জুলাই—১৮৩৫। ২০শে মার্চ্চ।

লর্ড আমহার্ষ্ট ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চে পদত্যাগ করিলে, বেলি সাহেব ঐ অব্দের ১৩ই

মার্চ্চ হইতে ৩রা জুলাই পর্য্যন্ত গবর্ণর হইয়াছিলেন। ৪ঠা জুলাইয়ে লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক গবর্ণরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি শাসনকর্ত্তা হইবার অল্পদিন পরেই অর্থাৎ ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর সহমরণ রহিত করিয়া দেন। ইহা রহিত করিবার জন্য তিনি রাজা রামমোহন রায়, সংস্কৃতজ্ঞ প্রসিদ্ধ হোরেশ্ হেমান্ উইলসন্, ম্যালকম্ প্রভৃতি গণ্য মান্য লোকের মতামত সংগ্রহ করেন। কেহই সহসা একেবারে উহা রহিত করিতে পরামর্শ দেন নাই। এ সম্বন্ধে তিনি হঠকারীর মত কার্য্য করিয়াছিলেন। এ বিষয়ের কৃতিত্বে কাহার বাহাদুরি, ইহা লইয়া অনেক মতভেদ ছিল; এমন কি, এখনও রহিয়াছে। মাক্‌ফার্লেন্ সাহেব, ভারত-সাম্রাজ্যের দুই খণ্ডে যে ইতিবৃত্ত রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি এই মর্ম্মে বলিয়াছেন যে, "লর্ড বেণ্টিঙ্কের কৃতিত্ব বেশী ছিল না। লোকে তাঁহাকে যেরূপ ভাবে, তিনি তদ্রূপ গুরুতর কার্য্য অল্প করিয়াছিলেন। কেননা, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী শাসনকর্ত্তারা তাঁহার জন্য অত্যল্প মাত্র কার্য্য অবশিষ্ট রাখিয়াছিলেন।"

মাক্‌ফার্লেন্ সাহেবের ঐ অভিমতিতে সম্মতি প্রকাশ করিতে অসম্মত হইয়া, গবর্ণমেণ্টের তদানীন্তন কোন সেক্রেটরি, সম্ভবতঃ গবর্ণমেণ্টের উত্তেজনাতেই "কলিকাতা রিভিউ" পত্রিকায় ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে উহাতে আপত্তি করিয়া প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদের মর্ম্ম এই,—"মাক্‌ফার্লেনের প্রোক্ত সকল কথাই অমূলক।" "কলিকাতা রিভিউ" পত্রের লেখক যিনিই হউন না কেন, তিনি মাক্‌ফার্লেন সাহেবের ভুল ধরিয়াছেন, তাহা ঠিক হয় নাই। মাক্‌ফার্লেনের বর্ণিত ঘটনার একটীমাত্রও অযথার্থ নয়।

যাহা হউক, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বরে সতীদাহ রহিত হইয়া যায়। দুর্দ্দিন হইলেও, উহা ভারতের ইতিহাসে লিখিত থাকিবার উপযুক্ত। যেদিনে হিন্দুর সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা চিরস্মরণীয় দিন। ঐ তারিখের দুই দিবস পরেই নিজামত আদালত, মাজিষ্ট্রেট ও জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সমীপে বিশেষ উপদেশসহ প্রতিলিপি প্রেরণ করেন। উহা ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ আইন নামে খ্যাত। অনন্তর রামমোহন রায়ের উদ্যোগে ১২৩৬ সালে ৪ঠা মাঘে (১৮৩০। ১৬ই জানুয়ারিতে) টাউনহলে সভা হইয়া বেণ্টিঙ্ককে অভিনন্দন প্রদান করা হয়। আর, রাজা রাধাকান্তদেব-প্রমুখ অগণ্য হিন্দু উহার প্রতিবাদ করিয়া বিলাতে "প্রিভি কৌন্সিলে" আবেদন করেন। ওদিকে রাজা রামমোহন রায়ও বিলাতযাত্রা করিলেন। তথায় যাইবার যে যে কারণ ছিল, আপীল অগ্রাহ্য করান, তাহার মধ্যে এক প্রধান কারণ। দীর্ঘকালের পর ঐ আপীল অগ্রাহ্য হয়। *

বেণ্টিঙ্কের সময়ে (১৮১৩ খৃষ্টাব্দে) হিন্দুপক্ষ হইতে একশত পৃষ্ঠা পরিমিত এক পুস্তক প্রকাশিত হয়। উহাতে অঙ্গিরা, পরাশর, হারীত প্রভৃতির বচন উদ্ধৃত ছিল। গবর্ণর জেনেরল, এই পুস্তকের বচনে দৃক্‌পাত করেন নাই।

এমন যে সহমরণ-নিবারণোদ্যোগী—উৎসাহী রাজা রামমোহন রায়, তিনিও আইনের সাহায্যে সহমরণ উঠাইবার প্রয়াসী ছিলেন না। সুতরাং আইনের বলে উঠাইবার জন্য বেণ্টিঙ্কেরই কার্য্যকারিতা ছিল। রামমোহন রায়ের উহাতে মত ছিল কিনা, পশ্চাৎ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

রাজা রামমোহন রায় মহোদয় গবর্ণর জেনেরল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ককে লিখিয়া-

* ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ১১ই জুলাইয়ে।

ছিলেন,—"কোনরূপ আইন করিতে গেলে, পাছে তাহাতে সর্ব্বসাধারণ ভীত হন, আমি এই আশঙ্কা করি। তাহা হইলে ব্রিটিশ-রাজের প্রকৃতি-পুঞ্জের অন্তরে এইরূপ বিতর্কবাদ উপস্থিত হইবে যে, যৎকালে শ্বেতপুরুষগণ, দেশমধ্যে আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তারের কারণ ব্যগ্র হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা সমদর্শিতা প্রদর্শিত করা ও আমাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করাই রাজনীতির অনুমোদিত কর্ম্ম বলিয়া ভাবিতেন; কিন্তু দেশমধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াই, তাঁহারা প্রথমতঃ আপনাদের অঙ্গীকার লঙ্ঘন করিলেন। অতঃপর হয় ত মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের মত ইংরেজরাজ আমাদের উপর আপনার ধর্ম্ম অর্থাৎ খৃষ্টানি মত প্রচলিত করিবেন।" ইহার পর গবর্ণর সাহেব, তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া বলেন,—"আমি এই প্রথার মূলোৎপাটনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছি, আমি অতি কঠোর দণ্ডবিধি প্রয়োগে উহা রহিত করিব, এইপ্রকার অবধারিত করিয়া রাখিয়াছি।"

রামমোহন রায়, ইহা শুনিলেন। রাজনীতিশাস্ত্রে তাঁহার যে দূরদৃষ্টি ছিল, তদনুযায়িনী অভিজ্ঞতা-বলে তিনি গবর্ণর জেনেরলকে মিনতি করিয়া বলিলেন,—"তবে আইনটী কেবল বঙ্গদেশেই প্রচলিত হউক। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে উহা যেন কার্য্যে পর্য্যবসিত না হয়। তাহার কারণ তৎপ্রদেশীয় প্রজারা বাঙ্গালী অপেক্ষা সমর-নিপুণ।"

১৮১৫ হইতে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ অবধি চতুর্দ্দশ বর্ষ ব্যাপিয়া কত নারী সহমৃতা হইয়াছিলেন, তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল। সহমরণের ইতিবৃত্তে এই তালিকা না থাকিলে, এই প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ হইবে, এই কথাটী বুঝিয়া দেখিলে, কেহ ইহার অবতারণাকে অপ্রাসঙ্গিক বলিতে সাহসী হইবেন না।

বিভাগের নাম।	১৮১৫	১৮১৬	১৮১৭	১৮১৮	১৮১৯	১৮২০	১৮২১	১৮২২	১৮২৩	১৮২৪	১৮২৫	১৮২৬	১৮২৭	১৮২৮
কলিকাতা বিভাগ ...	২৫৩	২৮৯	৪৪২	৫৪৪	৪২১	৩৭০	৩৭২	৩২৮	৩৪০	৩৭৩	৩৯৮	৩২৪	৩৩৭	৩০৮
ঢাকা বিভাগ ...	৩১	২৪	৫২	৫৮	৫৫	৫১	৫২	৪৫	৪০	৪০	১০১	৬৫	৪৯	৪৭
মুর্শিদাবাদ বিভাগ ...	১১	২২	৪২	৩০	২৫	২১	১২	২২	১৩	১৪	২১	৮	৯	১০
পাটনা বিভাগ ...	২০	২৯	৪৯	৫৭	৪০	৪২	৬৯	৭০	৪৯	৪২	৪৭	৬৫	৫৫	৫৫
বারাণসী বিভাগ ...	৪৮	৬৫	১৯	১৩৭	৯২	৯৩	১১৪	১০২	১২১	৯৩	৫৫	৪৮	৪৯	৩৩
বেরিলী বিভাগ ...	১৫	১৩	১০৩	১৩	১৭	২০	১৫	১৬	১২	১০	১৭	৮	১৮	১০
সমষ্টি	৩৭৮	৪৪২	৭০৭	৮৩৯	৬৫০	৫৯৭	৬৫৪	৫৮৩	৫৭৫	৫৭২	৬৩৯	৫১৮	৫১৭	৪৬৩

এখন ঢাকা বিভাগ, মুর্শিদাবাদ বিভাগ ইত্যাদি বলিলে, তাহার অন্তর্গত যে যে স্থান বুঝায়, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না।

কলিকাতা বিভাগে বর্দ্ধমান, হুগলী, যশোর, জঙ্গলমহল, মেদিনীপুর, মৌগং, নদীয়া, কলিকাতার উপনগরগুলি, চব্বিশ পরগণা, বারাসত, কটক, খুরদা পুরী, বালেশ্বর এই চৌদ্দটী প্রদেশ ছিল। বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ঢাকা সহর, ঢাকা-জেলালপুর, ময়মনসিংহ, সিলট, ত্রিপুরা, এই আটটী স্থান, ঢাকা-বিভাগের অন্তর্গত। মুর্শিদাবাদ বিভাগে—বীরভূম, ভাগলপুর, মুঙ্গের, দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ-সহর, রংপুর ও রংপুরের কমিশনরের অধিকৃত অঞ্চল, পুর্ণিয়া, রাজসাহী, বগুড়া ও রংপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের অধিকৃত স্থান এই দশটী প্রদেশ অবস্থিত। বিহার, পাটনা, গোরক্ষপুর, রামগড়, শারণ, শাহাবাদ, ত্রিহুত এই সাতটী প্রদেশ পাটনা বিভাগের অন্তঃপাতী। বেরিলি বিভাগে নিম্নোক্ত ১৬টী স্থান ছিল,—আরা, আলিগড়, বেরিলি, পিল্লীভিত, শাজিহানপুর, কানপুর (বিঠুর), ইটোয়া, ইটোয়ার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের অধীনস্থ ভূভাগ, ফরেকাবাদ, শিরুরা, মুরাদাবাদ, নগনা, মীরট, বুলন্দশহর, বেলাল, মজঃফরপুর ও শাহরণপুর। বারাণসী বিভাগে এলাহাবাদ ও বিঠুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের এলাকাধীন স্থান, ফতেপুর, বুন্দেলখণ্ডের উত্তর-বিভাগ, বুন্দেলখণ্ডের দক্ষিণ বিভাগ, বারাণসী, গাজিপুর ও গাজিপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের অধীনস্থ ভূভাগ, জৌনপুর, আজিমগড়, মৃজাপুর এই নয়টী প্রদেশ অবস্থিত ছিল।

এই প্রসঙ্গে একটী কথা বলিতেছি। হিন্দুর প্রথাটী রহিত হইয়াছে, তাহার সঙ্গে যে যে কথার সংস্রব, তত্তাবতের অনির্দ্দেশে প্রস্তাবের অঙ্গহানি না ঘটিতে পারে, এই হেতু বশতঃ এখানে তদ্ব্যাপারে মনোযোগী হইতে হইল।

অনেক ইংরেজীশিক্ষিত লোকের সংস্কার ও মত এই যে, বলপ্রয়োগ করিয়াই, সতীদিগকে দগ্ধ করা হইত। তদ্বিরুদ্ধে কয়েকটী প্রমাণ দিবার ইচ্ছা করিয়াছি।

একটী সহমরণের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতেছি। ইহা সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ মুনিরাম বিদ্যাবাগীশের সময়ের ঘটনা। মুনিরাম বিদ্যাবাগীশ ১১১৭। ১১১৮ সালে অর্থাৎ ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

"একদা কাল্‌নার নিকটবর্ত্তী এক গ্রাম হইতে তরুণ-বয়স্কা একটী তন্তুবায়-জাতীয়া রমণী কয়েকটী স্বজাতীয় লোক ও বিজাতীয় কয়েক জন রাজপুরুষ-সমভিব্যাহারে বিদ্যাবাগীশের পাঠশালায় উপস্থিত হয় এবং নয় দিবস পূর্ব্বে তাহার স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় দেহ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে সে সহমরণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে কি না বলিয়া ব্যবস্থা চাহে। বিদ্যাবাগীশ সহমরণের তাদৃশ অনুমোদন করিতেন না বলিয়াই হউক বা অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোকটীর প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়াই হউক, প্রথমে তিনি স্ত্রীলোকটীকে তাহার সঙ্কল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন এবং অনেক দিবস অতীত হইয়াছে, পতিবিয়োগ-শোকাবেগ সহপ্রায় হইয়া আসিয়াছে, এখন আর এ উদ্যম কেন, বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। তন্তুবায়-রমণীর চিত্ত স্থির-সঙ্কল্পারূঢ়, প্রতিনিবৃত্ত হইবার নহে। সে কাতর বচনে বাষ্পগদ্গদ স্বরে বলিতে লাগিল,—"মহাশয়! সময়ে উপস্থিত হওয়া আমার সাধ্যায়ত্ত ছিল না, পতির মৃত্যু-সময়ে নিকটে ছিলাম না। আত্মীয়েরা এ দুর্ঘটনার সমাচার যথাসময়ে দেন নাই। কাল-বিলম্বে সংবাদ পাইয়া ব্যবস্থার নিমিত্ত নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের

নিকট গিয়াছিলাম। তাঁহারাও কাল-বিলম্ব দোষ ধরিয়া ব্যবস্থা দেন নাই। আপনি বিখ্যাত শুনিয়া আপনার নিকটে আসিয়াছি। কালাতীত দোষে এইরূপ কর্ম্ম পণ্ড হইলে, তাহার অনুষ্ঠান-বিষয়ে শাস্ত্রে অবশ্য কোন যুক্তি থাকা সম্ভব। যবনরাজ্যে বাস। রূপ-যৌবনসম্পন্ন কুলকামিনী-জনের প্রতি যে অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আমার বয়স ও রূপ-লাবণ্য স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে কুলকামিনী ছিলাম, এক্ষণে মৃত পতির গুণ স্মরণ করিয়া গৃহের বাহির হইয়াছি। রাজ-পুরুষদিগের দৃষ্টিপথে পড়িয়াছি। ভাবী অশুভ ফল প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। আত্মহত্যা দোষে পতিত না হই বলিয়া শাস্ত্রের আশ্রয় এবং লোকান্তরিত স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইতে প্রার্থনা করিতেছি। তাহা হইলেই অভয়পদ পাইব। সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত আপনি; সকল খুলিয়া বলিলাম। দয়া করিয়া ব্যবস্থা দিউন।" বিদ্যাবাগীশ, তন্তুবায়-রমণীর পতিভক্তি ও বাক্‌শক্তি সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ মধ্যে একটী ব্যবস্থা-পত্র লিখিয়া দিলেন। বলি-লেন,—"শ্মশানে তোমার পতির চিতাগ্নির অবশেষ থাকিলে, চিতারোহণ করিতে পারিবে, এই ব্যবস্থা দিলাম এবং অদ্যাপি চিতায় যে অগ্নি আছে ও তোমার উদ্দেশ্য যে সুসিদ্ধ হইবে, তাহাও গণনা করিয়া দেখিলাম।" * এই ব্যবস্থা শুনিয়া স্ত্রীলোকটী একেবারে ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে করিতে কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল,—"পণ্ডিত মহাশয়! আমি অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিতেছি,—পতির চিতায় অগ্নি ধূমায়মান রহিয়াছে ও আমার ইষ্টসাধন হইয়াছে। আমি শূদ্র কন্যা, কি আর বলিব; এই মাত্র বলিতেছি,—আপনার মরণান্তে আপনার পত্নীও সহগমন করিবেন।"

"স্ত্রীলোকটীর সঙ্গে যে কয়েক জন রাজ-পুরুষ ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বর্দ্ধমানের নায়েব-সুবাদারের নিকট গিয়া এই বৃত্তান্ত জানাইল। পণ্ডিতের উত্তেজনায় স্ত্রীলোকটী শ্মশানে পুনর্ব্বার অগ্নি স্থাপন করাইয়া চিতা-রোহণ করিতে না পারে, এই বিষয়ে সতর্ক থাকিবার নিমিত্ত নায়েব-সুবাদার তৎক্ষণাৎ কয়েক জন অশ্বারোহী দূত প্রেরণ করিলেন। তন্তুবায়-রমণী, আত্মীয় ও রক্ষকগণ সঙ্গে পৌঁছিবার বহু পূর্ব্বে অশ্বারোহী দূতেরা উপ-স্থিত হইয়া চিতায় ধূমায়মান অগ্নি দেখিতে পায় এবং তদনুসারে সুবাদারের নিকটে আবেদন-পত্র পাঠাইয়া দেয়। তন্তুবায়-রমণী, বিদ্যাবাগীশের ব্যবস্থানুসারে বিধিপূর্ব্বক চিতা-রোহণ করিবার পরে নবদ্বীপের রাজা বিদ্যা-বাগীশকে আহ্বান করেন এবং ব্যবস্থাবিষয়ে তাঁহার যুক্তির প্রশংসা করিয়া বহুতর পণ্ডিতগণ সমক্ষে সম্মান বর্দ্ধন করেন।" *

এই তন্তুবায়-কন্যা, মুনিরাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে তাঁহার পত্নীর সহমরণ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিল, তাহা ঠিক্ ঘটিয়াছিল। "মুনিরাম, তিনটী পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হয়েন। তাঁহার মৃত দেহ নিজকৃত পুষ্করিণীর পাড়ে ভস্মীভূত হয়। ঐ সঙ্গে তাঁহার পত্নী সহমৃতা হয়েন। ইহাতে পূর্ব্বকথিত তন্তুবায়-কন্যার ভবিষ্য বাক্য সুসিদ্ধ হয়। সেই অবধি মুনি-রামের পুষ্করিণীটী "সতীর পুকুর" বলিয়া বিখ্যাত ছিল।" † (৮)

* এ সব স্থলের প্রকৃত ভাব কি, তাহা বুঝা যায় না। কেননা, কালাবলম্ব হইলেও চিতায় অগ্নি থাকুক অগ্নি নাই থাকুক, পত্নী অনুমৃতা হইতে পারে; এ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। জ, ন।

* প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত,— ৬—৭ পৃষ্ঠা দেখ।

† ঐ ১২ পৃষ্ঠা দেখ।

৬৬। ৬৭ বৎসর গত হইল, ২৪ পরগণা ভট্ট-পল্লীতে (ভাটপাড়ায়) একটী অদ্ভুত সতীদাহ ঘটে। ভাটপাড়া-নিবাসী গৌতম গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত গণেশ ভট্টাচার্য্যের বিদেশে মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুকালীন একান্ত অনুরোধানুসারে শবদেহ ভট্টপল্লী গঙ্গাতীরে আনীত হয়। দূরদেশ হইতে শবদেহ আনিতে প্রায় ১ সপ্তাহ অতীত হইয়াছিল। গণেশ-পত্নী চণ্ডীদেবী সহমৃতা হইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। চণ্ডীদেবীর বয়ঃক্রম তখন ২৫ বৎসরের অধিক নহে। চণ্ডীদেবীর পিতা ভাটপাড়ার সম্ভ্রান্ত নৈয়ায়িক বসিষ্ঠগোত্রীয় ব্রাহ্মণ নন্দকুমার বাচস্পতি। চণ্ডীদেবীর স্বামি-বিভব অল্প, পিতৃগৃহেই তিনি প্রায় অবস্থিতি করিতেন। স্বভাবগুণে পিতৃগৃহে তিনি সকলের প্রীতি পাত্রী ছিলেন। চণ্ডীদেবী আপনার একান্ত অভিলাষ পিতাকে জানাইলেন। বৃদ্ধ পিতা রোদন করিতে লাগিলেন। প্রকারান্তরে নিষেধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু—

"ক ঈপ্সিতার্থ-স্থির-নিশ্চয়ং মনঃ
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ।"

অত্যন্ত শোক দুঃখের সহিত পিতা কেবল ধর্ম্মভয়ে দুহিতার কার্য্যে সম্মতি প্রদান করিলেন।

তখন সহমরণের উপর গবর্ণমেণ্টের প্রখর দৃষ্টি পড়িয়াছে। সরকারী আদেশ ব্যতীত এ কার্য্য করিবার যো ছিল না। সুতরাং আদেশ আনিতে আরও দুই দিন অতীত হইল।

শবদেহ গঙ্গাযাত্রীর ঘরে রাখা হইয়াছিল। পচা শবের দুর্গন্ধে সে ঘাটে লোকের স্নান করা ভার হইয়াছিল। গণেশের মৃত্যুর নবম কি দশম দিন প্রাতঃকালে গঙ্গাতীরে চিতা সজ্জিত হইতে লাগিল। সকলের নিকট বিদায় লইয়া চণ্ডীদেবী প্রফুল্লমনে তথায় উপস্থিত হইলেন। আত্মীয়গণ অতি কষ্টে প্রাণবায়ু রোধ করিয়া সেই কট-জড়িত গলিত শবদেহ চিতোপরি আনিয়া দিলেন। চণ্ডীদেবী সেইখানে উপস্থিত হইয়া নির্ব্বিকারে কট-বন্ধন দূর করিয়া শবদেহ বাহির করিলেন। বলা বাহুল্য, সেই শবদেহ তখন গলিত, মাংসখণ্ড সকল খসিয়া পড়িতেছে। বড় বড় কীটরাশি মৃতদেহ ব্যাপ্ত করিয়াছে। শব-দর্শনে অনেকেরই বমন হইবার উপক্রম হইল। সতী চণ্ডী, সেই স্খলিত মাংস খণ্ড সকল স্বহস্তে পুনর্যোজনা করিতে লাগিলেন। প্রাতঃ-কাল হইতেই গঙ্গাতীরে জনতা বাড়িতে লাগিল, সহমরণ দর্শনের জন্য বহুলোক সমবেত হইল। ভট্টপল্লীর অপর পারে চুঁচুড়া। চুঁচুড়ার দক্ষিণ পার্শ্বে ফরাশডাঙ্গা। ফরাশডাঙ্গার এক প্রধান সাহেব, দূরবীণ দিয়া দেখিয়াই হউক, বা অন্য কোনরূপে সংবাদ পাইয়াই হউক, একজন বাঙ্গালী সমভিব্যাহারে পিনাসে চড়িয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বাঙ্গালী বাবুর দ্বারা জিজ্ঞাসা করাইলেন, সতীর সঙ্গে আমাদের কথা হইতে পারে কি না? আত্মীয়গণ, সতী চণ্ডীদেবীকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, এখন আমার আর লজ্জা কি? অনায়াসে কথা হইতে পারে। তখন সাহেব-সঙ্গী বাঙ্গালী অপেক্ষাকৃত নিকটে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! সাহেব বলিতেছেন, কি কষ্টে আপনি পুড়িয়া মরিতে-ছেন? আপনার যদি খাইবার পরিবার অসংস্থান থাকে,ত সাহেব মাসিক ৩০৲ টাকা আপনার চির-জীবনের জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন, আপনি গৃহে বসিয়া বৈধব্যাচার-সম্মত ধর্ম্মকর্ম্ম করুন।"

চণ্ডীদেবী বলিলেন, আমি খাইবার পরিবার দুঃখে সহমৃতা হইতেছি না, আমি পিত্রালয়ে বেশ সুখে থাকিতে পারি, আমি মরিতেছি ধর্ম্মের জন্য, অক্ষয় স্বর্গবাসের জন্য, স্বামীর সহিত একত্র অশেষ সুখ সম্ভোগের জন্য। রাজ্য

দিলেও আমি এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিব না। মাসিক ৩০্ টাকা ত কোন্ ছার।"

সাহেব সে কথা শুনিলেন, কত অনুনয় বিনয়, অনুরোধ উপরোধ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সতীর মন কিছুতেই ইহলোকে আকৃষ্ট হইল না। সাহেব নয়নে বস্ত্রাবৃত করিয়া পিনাসে উঠিলেন। এ দিকে চণ্ডীদেবী, যথাবিহিত কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া সেই গলিত-দেহ, কীটাকুলিত মৃত পতিকে সযত্নে আলিঙ্গন করিয়া চিতোপরি শয়ন করিলেন। পতির সহিত বন্ধন করিয়া দিতে নিষেধ করিলেন। গলিত দেহ হইতে জল নির্গত হইতে লাগিল, চিতাগ্নি শীঘ্র উত্তমরূপে প্রজ্জ্বলিত হয় না, তথাপি কিন্তু সতীর ভ্রূক্ষেপ নাই, স্পন্দন নাই। সতীদেহও মৃতবৎ নিস্পন্দ থাকিল। ক্রমে চিতা ধরিল, অগ্নি গর্জ্জিয়া উঠিল। দুইটী দেহ ভস্মাবশেষ হইল। পুলিসের লোক স্বচক্ষে দাঁড়াইয়া এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিল। প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তি দুই একজন এখনও জীবিত আছেন। *

যে ঘটনায় রামমোহন রায়ের সহমরণের উপর নজর পড়িল, তাহার উল্লেখ নিতান্তই আবশ্যক। সেই ঘটনাতেও স্বেচ্ছাকৃত মৃত্যু—বলপ্রয়োগে নয়।

১২১৬ সালে ২৭শে চৈত্র রবিবার পবিত্র শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে (১৮১০ খৃষ্টাব্দে ১৭ই এপ্রিলে) রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্মোহন রায়ের জীবনাবসান হইলে, তাঁহার দ্বিতীয়া ভার্য্যা অলকমঞ্জরী বা অলকমণি, স্বামীর জলন্তচিতায় প্রাণাহুতি প্রদান করেন। জগন্মোহন বাবুর মধ্যমা প্রিয়তমা এই প্রস্তাবে ঐ দুই নামেই নির্দ্দেশিত হইবেন। জগন্মোহনের যশোদা, অলকমণি বা অলকমঞ্জরী, অজ্ঞাতনাম্নী এক কামিনী ও দুর্গামণি এই চারিটী ভার্য্যা ছিল। সর্ব্বকনিষ্ঠা দুর্গামণি ভিন্ন আর সকলকেই অলকমঞ্জরী পতির সহগমনার্থ সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। এরূপ আহ্বানের কারণ কি? অনেকে হয় ত স্থূল দৃষ্টিতে বুঝিবেন, "ন দুঃখং পঞ্চভিঃ সহ" একাধিক লোক মিলিত হইয়া যাহা করা যায়, তাহা বাস্তবিক কষ্টদায়ক হইলেও, প্রীতিবিধায়ক জ্ঞান হয়, এই নীতির অনুসরণ এখানে সতী করিয়া থাকিবেন। ঘটনা কিন্তু তাহা নহে। সতীদের ধারণা ছিল—যে কামিনী, স্বামিসঙ্গিনী হন, তিনি পরজন্মেও সেই পতির প্রেয়সী হইয়া থাকেন। অধিকাংশ সতী, তাই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঈর্ষা করিয়া অপর সপত্নীদিগকে আপনার সঙ্গিনী হইতে অনুরোধ করিতেন না। সতী অলকমণি, সে ধাতুর গঠিতা রমণী নহেন। তাঁহার দেহে স্বার্থপরতার লেশমাত্রও ছিল না। কোন সপত্নীই তাঁহার সহকারিণী বা সহচারিণী হন নাই। প্রথমা নারী, অলকমঞ্জরীর আহ্বানের উত্তরস্বরূপ কহিয়াছিলেন, "আমি কেন পুড়ে মরব? অপঘাতে কেন মরতে যাব? বেঁচে থেকে স্বামীর জন্যে ব্রহ্মচর্য্য করব।" এখানে এক প্রশ্ন বা সন্দেহ হইতে পারে, কনিষ্ঠা সপত্নীকে অলকমণি কি কারণে আহ্বান করেন নাই? কনিষ্ঠা দুর্গামণির অষ্টম বর্ষীয় এক তনয় ছিল *। সুতরাং দুর্গামণি মরিলে, এই পুত্রের দশা কি হইবে, ভাবিয়া তিনি তাঁহাকে সহমরণে অনুরোধ করেন নাই। কারণ, দুর্গামণি, পতির সহগামিনী হইলে, স্বামীর, শশুরের ও অপরাপরের জলপিণ্ডের, তর্পণ-শ্রাদ্ধের কোন ব্যবস্থাই রহিবে না বুঝিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করা হয় নাই। শাস্ত্রেও এ

* এই ইতিহাসটী আমরা সংগ্রহ করিয়া দিলাম। স।

* এই পুত্রের নাম গোবিন্দপ্রসাদ—রামমোহন রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইঁহার সঙ্গে রামমোহন রায়ের মোকদ্দমা হইয়াছিল।

বিষয়ে নিষেধ আছে, তাহা এই সন্দর্ভের এক স্থানে বলা গিয়াছে। যে বর্ণনা করিয়া আসিলাম, তাহাতে কি বোধ হয় যে, অলকমঞ্জরীকে বলপূর্ব্বক দগ্ধ করা হইয়াছিল? কিন্তু কাহারও কাহারও মতে বলপ্রয়োগ করা হইয়াছিল। তাঁহাদের বর্ণনা এইরূপ,—

"চিতানল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, সহগামিনী স্ত্রীর আর্ত্তনাদ যাহাতে কাহারও কর্ণে প্রবিষ্ট না হয়, তজ্জন্ম প্রবল উদ্যমে বাদ্যভাণ্ড বাজিতেছে, সে প্রাণভয়ে চিতা হইতে গাত্রোত্থান করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু স্বজনেরা তাহার বক্ষে বাঁশ দিয়া চাপিয়া রাখিতেছে। এই সকল নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর কাণ্ড দেখিয়া রামমোহন রায়ের চিত্তে দয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিল এবং তদবধি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে পর্য্যন্ত না সহমরণ প্রথা রহিত হয়, সে পর্য্যন্ত তন্নিবারণের চেষ্টা হইতে তিনি কখনই বিরত হইবেন না।" *

ঐ বর্ণনা অযথার্থ। যখন ঐ ঘটনা ঘটে, তখন রামমোহন রায় কোথায়? তৎকালে তিনি স্বীয় জন্মভূমি-প্রদেশে (খানাকুল-কৃষ্ণনগরে) ছিলেন না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৮১০ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি রংপুরে অবস্থিতি করিতেন। এই ঘটনার ৪ চারি বৎসর পরে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন; তখনই "আত্মীয়সভা" প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় সহমরণের আলোচনা হইত।

এই কাণ্ড সংঘটিত হইবার পরে রামমোহন, নিজ জননীর সঙ্গে তুমুল বাদানুবাদ করেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, মাতার উত্তেজনাতেই মধ্যম বধূ অনলে দেহ ভস্মীভূত করিয়া থাকিবেন। ফলতঃ এ সম্বন্ধে রামমোহনপ্রভৃতির অণুমাত্রও দোষ ছিল না। তিনি ঐ কার্য্যে উদাসীনা ছিলেন। কেবল উদাসীনা বলি কেন, উহা তাঁহার অজ্ঞাতে সমাধা হইয়াছিল। তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র জগমোহনের বিয়োগে তিনি উন্মত্তার মত গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বহুদূর চলিয়া গিয়াছিলেন। কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে ধৃত করিয়া আনিয়া একটা প্রকোষ্ঠে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়া দেন। অতএব দৃষ্ট হইল, তাঁহার প্ররোচনা ছিল না।

তবে রামমোহন রায়ের বয়োজ্যেষ্ঠ জ্ঞাতিভ্রাতা ভাই নবকিশোর রায় মহাশয় উক্ত ব্যাপার আদ্যন্ত জানিতেন। কেবল জানিতেন না, তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্তই নির্ব্বাহ করিতে হইয়াছিল। তদানীং তিনি ঐ পরিবারের অবৈতনিক অধ্যক্ষ-স্বরূপ ছিলেন। তিনিও তাঁহাকে উক্ত কার্য্যে উৎসাহিত করেন নাই। তিনি পরম হিন্দু হইলেও, উক্ত নারীকে বলিয়াছিলেন,—"আপনি আমার বড় দাদার পত্নী। সুতরাং আপনি আমাদের মাতৃতুল্য। আপনি মরলে আমরা মাতৃহীন হব।" এইরূপ কত অনুনয় বিনয়—কত কাকুতি মিনতিই করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা হয় না। প্রত্যুত্তরে অলকমণি অটলভাবে বলিলেন,—"ঠাকুরপো! আমাকে নিষেধ ক'রো না। আমি আর এ সংসারে থাকতে পারিব না। আমি যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি।" প্রকৃত পতিব্রতার এই উক্তিই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। সাধ্বী অলকমঞ্জরী ন্যূনাধিক চল্লিশ বৎসরে সহমৃতা হন। ২৭শে চৈত্র অপরাহ্নে ঐ কার্য্য সম্পন্ন হয়। রঘুনাথপুরে চিতা সজ্জিত হইয়াছিল। যেখানে এই ঘটনা ঘটে, তথায় এখনও অশ্বত্থবৃক্ষ বিদ্যমান আছে। এই ঘটনা শুনিয়া রামমোহন রায়, সহমরণ উঠাইতে ব্যগ্র হন।

সতীদাহ প্রথা যেমন ক্রমিক চেষ্টা ও যত্নে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, সহবাস-সম্মতি আইন প্রভৃতির কথা মনে করিয়া অনেকে বাল্য-

* রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় বাবু রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা।

বিবাহ সম্বন্ধেও সেইরূপ আশঙ্কিত হইয়া থাকেন।

সতীদাহ—হিন্দুরমণীগণের অসামান্য গৌরবের সর্ব্বোচ্চ দৃষ্টান্ত। ইহা নৃশংসতা নহে, কাপট্য নহে, অধর্ম্ম নহে। বহু প্রমাণে তাহা স্থির করা যায়।

এহেন সতীদাহ প্রথা রোধ করিয়া ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট হিন্দু-সতীগণের ও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বিগণের হৃদয়ে যে গাঢ় কালিমা অর্পণ করিয়াছেন, তাহা কি কখন প্রক্ষালিত হইবে?

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

ন্যায়-দর্শন।

(১১)

আত্মা

নাস্তিকে আস্তিকে যাহা লইয়া বিশেষ বিবাদ, সেই পদার্থ এক্ষণে নিরূপিত হইতেছে। যাহা না জানিলে মুক্তি পাইবার যো নাই, যাহার তত্ত্বাবগম না থাকাতেই মানুষের দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ, ঈর্ষা উপস্থিত হয়, সেই আত্মার কথা এই প্রস্তাবে আলোচনা করিতেছি।

আস্তিক দর্শন সমূহেও আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ বিবাদ বিসংবাদ অবগত হওয়া যায়। বেদান্তী বলেন, একমাত্র আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই ঈশ্বর, তিনিই জীব। উপাধি ভেদে একের সংজ্ঞা অনেক।

যেমন ইতিপূর্ব্বে কালের বিষয় ন্যায়মতে বলা হইয়াছে, কাল এক হইলেও উপাধি ভেদে ক্ষণাদিরূপে ব্যবহৃত হয়।

আত্মা এক; অবিদ্যা ও মায়া উপাধি। অবিদ্যায় উপহিত আত্মা জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত; মায়ায় উপহিত আত্মা ঈশ্বরসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। আত্মার স্বরূপজ্ঞান যদ্দ্বারা তিরোহিত, তাহাই অবিদ্যা। ঈশ্বরের ক্ষমতা ও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি যাঁহার জন্য, তিনিই মায়া। অবিদ্যা মায়াতীত নির্ম্মল সত্য চৈতন্যই আত্মা—পরমাত্মা—ব্রহ্ম।

সাংখ্যমতে পরমাত্মা নাই। অনন্তজীবাত্মা আছে। জীবাত্মা কিন্তু ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখাদি বর্জ্জিত। সাংখ্যের জীবাত্মাও উপাধি বশেই সুখী দুঃখী ইত্যাদিরূপে পরিচিত। মীমাংসাতেও পরমাত্মার কথা নাই। ন্যায়, বৈশেষিক এবং পাতঞ্জলেই পরমাত্মার অস্তিত্ব। তবে পাতঞ্জলে ইনি ঈশ্বর নামেই ব্যবহৃত।

যাহা হউক, ন্যায়মতে আত্মা দ্বিবিধ; জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। জীবাত্মা অসংখ্য, পরমাত্মা এক। জগতে যত জীব—প্রাণী আছে, ততটী জীবাত্মা। এক জীবই কর্ম্মফলে কখন ভাল জন্ম কখন বা মন্দ জন্ম লাভ করে। পরমাত্মা সর্ব্বনিয়ন্তা। ঈশ্বর তিনিই, কিন্তু—জীবাত্মা জিনিশটী কি?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আত্মতত্ত্ব লইয়াই নাস্তিকগণের সহিত আস্তিকগণের বিবাদ। কিন্তু 'আমি' 'তুমি' ব্যবহার যখন সকলের মধ্যে প্রচলিত, তখন আত্মতত্ত্ব লইয়া বিবাদ, কথাটা কি? 'আমি তুমি' ব্যবহার যে জিনিশে হয়, তাহাই ত আত্মা। তবে কিরূপ বিবাদ? তাহা বলিতেছি,—

নাস্তিকেরা 'আমি তুমি' ব্যবহারের বিষয় বলে দেহকে। কেহ কেহ, ইন্দ্রিয় সমষ্টিকে বা মনকেও 'আমি তুমি' ব্যবহারের বিষয় বলিয়া থাকে। তাহাদিগের মতে দেহ, ইন্দ্রিয় বা মনই আত্মা, এতদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র আত্মা নাই। পাকা নাস্তিকেরা মনও মানে না। মনকে আত্মাও বলে না।

আস্তিকেরা বলেন, আত্মা এ সব ছাড়া আর এক বস্তু। নাস্তিকে আস্তিকে এই লইয়াই বিবাদ।

ন্যায় বলিতেছেন, আত্মা ইন্দ্রিয়াদির পরিচালক। ইন্দ্রিয় যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে আত্মারই অস্তিত্ব ও কৃতিত্ব অনুভব করিতে হইবে। কুঠারে বৃক্ষাদি ছিন্ন হয় বটে, কিন্তু তাহাতে কুঠারীরই কর্ত্তৃত্ব, কুঠারের নহে। কুঠার যেমন করণ বা যন্ত্র, ইন্দ্রিয়ও তেমনি করণ বা যন্ত্র। যন্ত্রী না হইলে যন্ত্র চলে না। ইন্দ্রিয়-যন্ত্রের যিনি যন্ত্রী, তিনিই আত্মা। কিন্তু এ যন্ত্রী কাহাকে বলিব? দেহকে বলিলে ক্ষতি কি?

স্থূল দেহই ইন্দ্রিয়াদির পরিচালক হউক। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই;—

আত্মা চেতন। চৈতন্য লইয়াই আত্মা। যে বস্তুর জ্ঞান স্বধর্ম্ম, তাহাই আত্মা। আত্মার বিশেষ লক্ষণ হইল এই,—সেই আত্মাই ইন্দ্রিয়াদির পরিচালক। জ্ঞান—স্থূল দেহের স্বধর্ম্ম হইতে পারে না; কেন না, মৃত্যু হইলে স্থূলদেহ থাকে, জ্ঞান স্থূলদেহের স্বধর্ম্ম হইলে, মৃত্যুর পরেও জ্ঞান থাকে না কেন? যেমন মৃত্যুর পরেও দেহের স্বধর্ম্ম বর্ণ অবয়ব-সংস্থান ইত্যাদি অক্ষুণ্ণ থাকে, তদ্রূপ জ্ঞান না থাকে কেন? অতএব, দেহের ধর্ম্ম জ্ঞান নহে। মৃত্যুর পর দেহ থাকিলেও, যাহার জ্ঞান,—সেই বস্তুর সহিত দেহের সম্বন্ধ না থাকাতেই জ্ঞান লোপ হয়। অতএব দেহ আত্মা নহে; ইন্দ্রিয়াদির পরিচালক দেহ নহে; জ্ঞান, দেহের স্বধর্ম্ম নহে। যাহার স্বধর্ম্ম জ্ঞান, তাহাই আত্মা, তাহা স্বতন্ত্র পদার্থ।

আপত্তি। ইন্দ্রিয়কেই ইন্দ্রিয়ের পরিচালক বলিব, জ্ঞান ইন্দ্রিয় নাশ হয় বলিয়াই মৃত্যুর পর জ্ঞান থাকে না। অতএব ইন্দ্রিয়ই আত্মা।

খণ্ডন। এ কথা বলা যায় না,—কেন না, আত্মাকে কোন্ ইন্দ্রিয় স্বরূপ বলিবে? চক্ষুঃ স্বরূপ বলিলে চক্ষুরিন্দ্রিয় নাশে, আমি ইত্যাদি ব্যবহার হইতে পারে না, কেন না 'আমি পদার্থই তাহার তখন নাই। এইরূপ শ্রবণেন্দ্রিয়াদির পক্ষেও জানিবে। আত্মাকে ইন্দ্রিয় সমষ্টি স্বরূপ বলিলে, গৌরব হয়, নানা জিনিশকে আত্মা বলিতে হয়। আর ইন্দ্রিয় সমষ্টিকে আত্মা বলিলেও, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান, চক্ষুরিন্দ্রিয় স্বরূপ আত্মাতে থাকে। শ্রাবণ প্রত্যক্ষরূপজ্ঞান, কর্ণেন্দ্রিয় বা শ্রবণেন্দ্রিয় স্বরূপ আত্মাতে থাকে,—এমন যদি হইল, তবে, চক্ষুরিন্দ্রিয় নষ্ট অর্থাৎ অন্ধতা হইলে, পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের স্মরণ না হউক, বধিরতা হইলে পূর্ব্ব শ্রুত বিষয়ের স্মৃতি না হউক। কেননা, স্মৃতির প্রতি সংস্কার এবং সংস্কারের প্রতি অনুভব কারণ। যে ব্যক্তির অনুভব, তাহারই সংস্কার এবং উদ্বোধক সাহায্যে সংস্কার বলে তাহারই স্মৃতি হইয়া থাকে। একের অনুভব এবং অন্যের স্মৃতি কখনই হয় না। তুমি যাহা সযত্নে পড়িয়াছ, তদ্বিষয়ে সংস্কার তোমার মনে আছে, কেহ তৎসম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, সেই জিজ্ঞাসারূপ উদ্বোধকের সাহায্যে পঠিত বিষয় তোমার স্মৃতিপথে উদিত হয়। কিন্তু যাহা তুমি পড় নাই, অপরে পড়িয়াছে, সে বিষয়ের স্মৃতি তোমার কি কখন হয়?

এই হইল সারকথা যে স্মৃতি ও স্মৃতির কারণীভূত অনুভব এক ব্যক্তিতে থাকা চাই।

প্রকৃত স্থলে মিলাইয়া দেখ;—"চক্ষুরিন্দ্রিয় যাহা অনুভব (প্রত্যক্ষ) করিয়াছে—সেই অনুভব জন্য স্মৃতি চক্ষুতেই হইতে পারে, চক্ষু নষ্ট হইলে, স্মৃতি হইবে কেমন করিয়া? একের অনুভবে অপরের ত স্মৃতি হয় না। সম্ভব থাকিলে, চক্ষুরিন্দ্রিয় কৃত অনুভবে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ই স্মরণ করিতে পারিত। চক্ষুরিন্দ্রিয় না থাকিলে দৃষ্টপদার্থ-বিষয়ক স্মৃতির অনুপপত্তি। কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এই যুক্তি। যদি বল, "চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ, সকল ইন্দ্রিয়েই থাকে। অর্থাৎ জ্ঞানাদি ইন্দ্রিয় সমষ্টির ধর্ম্ম। চোখে দেখিয়া যে জ্ঞান জন্মিল, তাহাও সকল

ইন্দ্রিয়েরই ধর্ম্ম। অতএব চক্ষুরিন্দ্রিয় নষ্ট হইলেও চাক্ষুষ-অনুভব জন্য স্মৃতি অন্য ইন্দ্রিয়েও হইতে পারে। চাক্ষুষ অনুভব—সেই অনুভব জন্য সংস্কার—যেমন চক্ষুতে, তেমনিই অন্য ইন্দ্রিয়েও থাকে কি না? যে ব্যক্তির অনুভব, স্মৃতি তাহারই হইল।"

তাহা হইলে আমরা বলি,—"কুষ্ঠরোগে যাহার ত্বগিন্দ্রিয় নষ্ট হইয়াছে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা এ সব ইন্দ্রিয়ও উপহত হইয়াছে, তাহারও ত আপনার পূর্ব্বাবস্থা—কত সুখের অবস্থা স্মরণ হয় এবং সেই স্মরণ সন্তাপে সন্তপ্ত হইয়া নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। কিন্তু তাহার সে স্মরণ হয় কিরূপে? কোন ইন্দ্রিয়ই ত তাহার নাই। অনুভবকর্ত্তা বিনষ্ট হইয়াছে, স্মরণ হইবে কাহার?"

"কেন?—মন আছে। মনও ত ইন্দ্রিয়।"

"তা বটে; কিন্তু মনকে আত্মা বলিতে পার না। কেন না, মন—সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম, পরমাণু স্বরূপ। অত সূক্ষ্ম বস্তুকে আত্মা বলা যায় না। কারণ, জ্ঞান, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি হইল আত্মার গুণ। অথচ এ গুলিকে মনে মনে বুঝা যায়, অর্থাৎ জ্ঞানাদির মানস প্রত্যক্ষ করা যায়। সুখ হইলে বুঝিতে পারি, দুঃখ হইলে বুঝিতে পারি, সেই বুঝাই হইল মানস প্রত্যক্ষ। যে দ্রব্য বড় নহে, তাহার গুণ কোন রকমেই লৌকিক প্রত্যক্ষ হইবার নহে। পৃথিবী প্রভৃতির পরমাণুর রূপ রস ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করা যায় না। লৌকিক মানস প্রত্যক্ষও করা যায় না। মানসপ্রত্যক্ষ কি, তাহা নিজে অনুভব করিয়া বুঝিলেই নিঃসংশয়ে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তিরই অন্তরের অবস্থা মনের দ্বারাই জ্ঞাতব্য। অন্তরের অবস্থা যে জানা যায়; এইরূপ জ্ঞানই মানসপ্রত্যক্ষ। পরমাণু প্রভৃতির রূপরসাদির ঐরূপ প্রত্যক্ষ হয় কি? না, কখনই হয় না। কেন হয় না? পরমাণু বড় দ্রব্য নয় বলিয়া পূর্ব্বেইত বলিয়াছি, যে দ্রব্য বড় নহে, তাহার গুণ প্রত্যক্ষ হইবার নহে।

অতএব মনকে আত্মা বলিতে পার না। আমি জ্ঞান-সম্পন্ন, আমি যত্নবান্, আমি দুঃখী এইরূপ ব্যবহার যাহাকে লইয়া হয়, সেই 'আমি পদার্থ—আত্মা—দেহ নহে, এক একটী ইন্দ্রিয় নহে, ইন্দ্রিয়সমষ্টি নহে, মন নহে;—তাহা অতি বড়—অত্যন্ত বৃহৎ অর্থাৎ আকাশের ন্যায় পরম মহান্। বড় বলিয়াই সুখ দুঃখাদির মানস প্রত্যক্ষ হয়। সেই আত্মা নিত্য-নিরাকার।"

আপত্তি।

"মৃত্যুর পর চৈতন্য থাকে না, অতএব স্থূল-দেহ আত্মা হইতে পারে না।" এই যুক্তি ঠিক নহে; কেন না, ঘুমাইলে জ্ঞান থাকে না, আত্মার মুক্তি হইলেও ন্যায়মতে জ্ঞান থাকে না, কিন্তু ন্যায়মতে যাহা আত্মা বলিয়া অভিপ্রেত, তাহার নাশ ত কখনই নাই। আত্মা থাকে, অথচ জ্ঞান থাকে না এমন অবস্থা ত ন্যায়শাস্ত্রেরও স্বীকৃত, তবে আমাদের দেহাত্মবাদে দোষ কি? দেহ থাকিলেও জ্ঞান থাকে না। এ কথা বলিতে আমাদের ক্ষতি কি?

আত্মা স্বতন্ত্র হইলেও জ্ঞানের কারণ না থাকিলে জ্ঞান হইবে না;—স্থূলদেহ আত্মা হইলেও কারণাভাব বশতঃ জ্ঞান হয় না। ফল হইল এই যে, প্রাণের অভাবই জ্ঞান না হওয়ার মূল। অতএব স্থূলদেহ আত্মা না হইবে কেন?

খণ্ডন।

এ কথা বলিতে পার না। স্থূলদেহকে আত্মা বলিলে, বালককালে অনুভূত বিষয়ের যৌবনে স্মৃতি হইতে পারে না। (অনুভব ও স্মৃতির কার্য্যকারণ ভাবের কথা পূর্ব্বেই সংক্ষেপে বলিয়াছি) বাল্যকালীন স্থূলদেহ ত যৌবনে

নাই, তখন স্মরণ হইবে কাহার ? যাহার অনুভব, সেই ব্যক্তি ভিন্ন অপরের ত স্মরণ হইবে না। পরিবর্ত্তনশীল দেহ যে কিছুকাল পরে সম্পূর্ণ নূতন হয়, ইহা বিজ্ঞানসম্মত। বিশেষ কোন রকম নিয়ম কল্পনা করিয়া এই অনুপপত্তি দূর করিলেও গৌরব অতিশয় হয়।

এক নিত্য আত্মা কতকাল কত জীবরূপে জন্মগ্রহণ করিতেছে,—জ্ঞান সুখাদির আশ্রয় সেই নিত্যবস্তু। তোমরা কিন্তু অনন্তদেহকে জ্ঞানাদির আশ্রয় বলিবে, স্মরণাদির উপপত্তির জন্য বিশেষ কার্য্যকারণ ভাব নির্ব্বাচন করিবে, ইহা কি কম গৌরব !

দ্বিতীয় কথা হইল অদৃষ্ট লইয়া। স্থূলদেহ-আত্মা হইলে অদৃষ্ট মানা চলে না। মরিলেই চুকিয়া গেল বলিতে হয়, নাস্তিকেরা বলেও তাই। কিন্তু তাহাতে ঘোরতর অসামঞ্জস্য ঘটে, একজাতীয় কর্ম্ম করিয়া বিভিন্ন ফললাভ ইত্যাদি বৈষম্য অনেক সময় স্থূলদৃষ্টির বিষয় হইয়া থাকে। সে বৈষম্যের কারণ অদৃষ্ট ব্যতীত আর কি ? দেহকে আত্মা বলিলে অদৃষ্ট মানা চলে না, সে বৈষম্যবাদেও কারণ প্রদর্শন করা যায় না।

সদ্যোজাত শিশুর স্তন্যপান-প্রবৃত্তি, সদ্‌ব্রাহ্মণ সন্তানের অসৎপ্রবৃত্তি প্রভৃতি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারের বা কর্ম্মের ফল। পূর্ব্ব শরীরে ও বর্ত্তমান শরীরে এক আত্মা না হইলে, কর্ম্মফল ভোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। কর্ম্মকর্ত্তা ও ফলভোক্তার ত ঐক্য চাহি। দেহ আত্মা হইলে পূর্ব্ব দেহের সঙ্গে বর্ত্তমান দেহের কোন সম্বন্ধই থাকে না।

তৃতীয় কথা,—যোগ সাহায্যে আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অনুভূত হয়।

চতুর্থ,—শাস্ত্রেও এ বিষয়ে প্রচুর প্রমাণ আছে।

লাঘব গৌরব, কার্য্যকারণের সামঞ্জস্য অসামঞ্জস্য এ গুলি বিচার করিলে স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস-সম্পন্ন হইতে হয়।

আত্মার লক্ষণ—

জ্ঞানাদি সমবায়ি কারণ-তাবচ্ছেদক জাতিমত্ত্ব।

জ্ঞান সুখ দুঃখাদির সমবায়ী কারণ (কারণ-বিশেষ) আত্মা। সমবায়ি কারণতাবচ্ছেদক জাতি আত্মত্ব। আত্মত্ব নিখিল আত্মাতে আছে, আত্মত্ব পরমাত্মা এবং জীবাত্মায় আছে। কেহ কেহ বলেন, পরমাত্মাতে আত্মত্ব জাতি নাই, আত্মত্বজাতি জীবাত্মগণে অবস্থিত। জীবাত্মা অসংখ্য। সকল জীবাত্মাই কিন্তু আকাশের ন্যায় পরম মহান্। সকল জীবাত্মাই নিত্য। আত্মায় ক্রিয়া নাই। জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, ভাবনানামক (স্মৃতির হেতু) সংস্কার, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম আত্মার এই চতুর্দ্দশ গুণ। 'আমি সুখী' 'আমি দুঃখী' ইত্যাদি ব্যবহারে সুখ দুঃখ সম্পন্নত্বরূপে আমি-পদার্থ জীবাত্মাকে মানসপ্রত্যক্ষ করা যায় না। যত্ন প্রভৃতি হেতুবিশেষ দ্বারা অনুমিত করা যায়। শব্দ প্রমাণ বেদ বচন ত আছেই। স্বর্গ নরক যা কিছু জীবাত্মাকে ভুগিতে হইবে। পরমাত্মা এক, আকাশবৎ পরম মহান্ অবাঙ্মনস গোচর।

সংখ্যা, পরিমাণ পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান, যত্ন এবং ইচ্ছা পরমাত্মায় বর্ত্তমান। পরমাত্মার জ্ঞান, যত্ন এবং নিত্য। এই অতি-গহন আত্মপ্রকরণ সংক্ষেপে বলিলাম।

আত্মার মুক্তি সম্বন্ধে পরে বলিব।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

আমার জীবন-চরিত।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

হল্‌দোয়ানি প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তথায় জনমানব নাই। মানবের কণ্ঠধ্বনি বা পদধ্বনি শুনিবার জন্য কাণ পাতিয়া রহিলাম। কিন্তু কোন ধ্বনিই শ্রুতিগোচর হইল না। সেই দ্বিতল-গৃহের দিকে চাহিলাম। যে গৃহে ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তি মৌলুভি ফজলহক্ বাস করিত, যে গৃহের মঞ্চোপরি বসিয়া, দুর্ব্বৃত্ত ফজলহক্ জলদ-গম্ভীর-স্বরে আমাকে তোপে উড়াইবার আদেশ দান করে, সেই দ্বিতল-গৃহের দিকে আবার তীব্র-দৃষ্টিতে কটমট চাহিলাম। মনে মনে কহিলাম, রে নর-রাক্ষস ফজলহক্! আজ তুমি কোথায়? পলাইলে কেন? থাক'ত, একবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াও না?"

সেই গৃহের সম্মুখে দুইটী বিশাল বৃক্ষ নয়ন-গোচর হইল। সেই বৃক্ষের তলদেশে আমি দুই রাত্রি বন্ধনদশায় যাপন করিয়াছিলাম। যে তক্তাপোষ-দ্বয়ে আমার হাত-পা বাঁধা ছিল, সে তক্তাপোষ দুইখানি তথায় আর দেখিতে পাইলাম না। আমি ঘোড়া হইতে নামিলাম। ফজলহকের সেই দ্বিতল-গৃহোপরি তীরবেগে উঠিলাম। গৃহের অভ্যন্তরে একখানি ভাঙ্গা খাট; খাটের উপর এক ছেঁড়া গদি দৃষ্ট হইল। গদির নীচে হইতে এক বাণ্ডিল কাগজ বাহির হইল। খুলিয়া দেখিলাম,—অনেকগুলি পত্র উর্দ্দূভাষায় লিখিত। শত্রুপক্ষীয়ের এই পত্রগুলি ভবিষ্যতে অনেক কার্য্যে আসিতে পারে ভাবিয়া তাহা সযত্নে লইলাম। গৃহ অনেক অনুসন্ধান করিলাম, আর কিছুই পাইলাম না।

কর্ণেল ক্রস্‌ম্যান সাহেবের নিকট আসিলাম। তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি হঠাৎ ঐ দ্বিতল-গৃহের উপর উঠিলে কেন?" আমি কহিলাম, "উহা মুসলমান-সেনাপতি ফজলহকের গৃহ ছিল। জনশূন্য গৃহে কোন আসবাব আদি পড়িয়া আছে কিনা, তাহাই দেখিতে গিয়াছিলাম।"

ক্রস্‌ম্যান। কোন দ্রব্য পাইলে কি?

আমি। কতকগুলি পত্র পাইয়াছি; উর্দ্দূতে লেখা। সম্ভবতঃ ইহা দ্বারা শত্রুপক্ষীয়ের অনেক রহস্য জানা যাইবে।

ক্রস্‌ম্যান। আপনি এই উর্দ্দূ পত্র ইংরেজীতে অনুবাদ করুন; এবং অদ্য রাত্রে সেই অনুবাদ পাঠ করিয়া আমাকে শুনাইবেন।

আমি। তথাস্তু।

প্রথম, সেনা-সমাবেশের স্থান নিরূপণ হইল। বিস্তৃত পর্ব্বতীয় ময়দানে সেনাগণকে তাঁবু খাটাইয়া থাকিবার আজ্ঞা দান হইল। অশ্বারোহী দল একদিকে রহিল, পদাতি-দল ঠিক তাহার বিপরীত দিকে শিবির স্থাপন করিল। একটী উচ্চস্থানে কামান দুইটীকে রাখা হইল,—উপযুক্ত প্রহরী-দল কামানের কাছে পাহারায় নিযুক্ত থাকিল।

হল্‌দোয়ানি গ্রাম নহে,—ইহা মণ্ডী বা বাজার নামে তখন খ্যাত ছিল। প্রায় পঁচিশ বিঘা চৌকোণা জমী;—এই জমীর চারিদিকেই এক সারি করিয়া ঘর; ঘরগুলি গায়ে গায়ে সংলগ্ন; জমীর মধ্য স্থলটা ফাঁক। অর্থাৎ সেই জমীটা গৃহরূপ প্রাচীর দ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত। সেই গৃহগুলি দোকান-ঘর; বহুসংখ্যক দোকানদার বিদ্রোহের পূর্ব্বে এইখানে বেচা-কেনা করিত; পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীরা আসিয়া তাহাদের আবশ্যকীয় জিনিস পত্র কিনিত। সপ্তাহের মধ্যে একদিন হাট বসিত। সেই চতুষ্কোণ ভূমির মধ্যস্থলে ফাঁকা জমীটীতে হাট হইত। এই হাটে দ্রব্য-সামগ্রী কিনিতে বহুদূর হইতে লোক আসিত। নানারূপ জিনিসের আমদানি হইত। সে প্রদেশে এইরূপ বচন তখন প্রচলিত

ছিল,—হলদোয়ানির হাটে যাহা পাওয়া যায় না, তাহা অন্য কোথায়ও মিলে না।

মণ্ডীর দুই দ্বার। বৃহৎ ফটক। এক দ্বার পূর্ব্বে, অন্য দ্বার পশ্চিমে। পূর্ব্বের দ্বার দিয়া সেই খোলা জমীতে প্রবেশ লাভ করিতে হয়, পশ্চিম দ্বার দিয়া বাহির হইতে হয়। প্রত্যেক দ্বারের নিকট সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিত।

আমরা যখন হোলদোয়োনিতে উপনীত হইলাম, তখন তথায় জনমানব নাই। দোকান ঘরগুলি অর্দ্ধ-ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে। ফটক দুইটীতে কবাটের কাঠমাত্রও নাই। দ্বারদ্বয় খোলা হাঁ হাঁ করিতেছে। বাসের জন্য, কয়েক খানি 'উহারই মধ্যে ভাল' দোকান-ঘর বাছিয়া লইলাম। আমার তৎকালের চির-সহচর ডাক্তার নন্দকুমার আমার পার্শেই দোকান ঘরে বাসা লইলেন;—এবং তাঁহার হাঁসপাতালের জন্য আর চারটী ঘর দখল করিলেন।

ভয়ঙ্কর শীত পড়িয়াছে। নাইনিতালের পাহাড়ে' শীত,—সন্ধ্যার পর হইতে হাড়গুল্ক কন্ কন্ আরম্ভ করে। তাঁবু অপেক্ষা দোকান-ঘরে শীত কম লাগিবে, এই ভাবিয়া আমি দোকান-ঘরে বাসের বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। সাহেবগণ কিন্তু দোকান ঘর পছন্দ করিলেন না;—তাঁহারা তাঁবু খাটাইয়া রহিলেন।

আমাদের কালাডুঙ্গি-অবস্থান কালে, প্রধান সেনাপতি ক্রেস্ম্যান সাহেব, নাইনিতালেই থাকিতেন,—মাঝে মাঝে এক আধ দিন কালাডুঙ্গিতে আসিয়া সেনাগণের শিক্ষাকার্য্য পরিদর্শন করিতেন। হলদোয়োনিতে কিন্তু তিনি আপনার আবাসভূমি নির্দ্দিষ্ট করিলেন। চারিটী বৃহৎ তাঁবুতে তাঁহার গৃহ তৈয়ারি হইল। এক তাঁবুতে শয়ন এবং ভোজন, এক তাঁবুতে বৈঠকখানা, তৃতীয় তাঁবু রন্ধন ঘর; চতুর্থ পাইখানা। দূরে আর একটী তাঁবুতে তাঁহার ভৃত্যবর্গ বাস করিতে লাগিল।

সকলের বাসা ঠিক হইলে, রন্ধনের উদ্যোগ। তার পর আহার। আহারান্তে আমি মণ্ডীর প্রত্যেক ঘর খুঁজিতে লাগিলাম। শত্রুপক্ষের যদি কিছু জিনিসপত্র পাই,—ইহাই অভিলাষ। কোথাও কিছুই পাইলাম না। কেবল একটী ঘরে কয়েক বস্তা আটা এবং কয়েক হাঁড়ি ঘৃত পাইলাম। আটা ঘি অতি উৎকৃষ্ট। আমাদের সৈন্যদল যেরূপ আটা ঘৃত পাইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা, এই শত্রুদল-পরিত্যক্ত ঘৃত আটা সহস্রাংশে শ্রেষ্ঠ। ঘৃত মিঠা খস্‌বুদার এবং দানাদার। আমি, নিজের আহারের জন্য, সেই ঘৃত এবং আটা আপন বাসায় আনিলাম। হলদোয়ানিতে কত দিন যে থাকিতে হইবে, তাহার ঠিক নাই;—সুতরাং উত্তম রসদ সর্ব্বাগ্রে সংগ্রহ করিয়া রাখা ভাল।

বৈকালে সেই উর্দ্দূ পত্রগুলি পড়িতে আরম্ভ করিলাম। পড়িতেছি, আর মনে মনে হাসিতেছি; মনের হাসি, মাঝে মাঝে, মুখেও প্রকাশ পাইতেছে। ডাক্তার নন্দকুমার কহিলেন, "আপনি কি পাগল হইলেন নাকি?—একা বসিয়া আপনা-আপনি এত হাসিতেছেন কেন? আমরা ত দুঃখের সমুদ্রে ভাসিতেছি; সম্মুখে এমন এক গাছি কুটা নাই যে, তাহা ধরিয়া, উদ্ধারের উপায় চিন্তা করি। এ বিপদে আপনার হাসি যে, কিসে আসিল, তাহা আমি বুঝিতেছি না।"

আমি। ওহে ভায়া, কাহাকেও বলিও না, "স্ত্রীলোক! স্ত্রীলোক!"—এ বিজন বনে "সুন্দরী স্ত্রীলোক!"

ডাক্তার নন্দকুমার চমকিয়া উঠিয়া, "কৈ, কৈ?"

আমি। স্ত্রীলোক এখন সম্মুখে উপস্থিত নাই, কিন্তু এই পত্রের ভিতর আছে।

নন্দকুমার। পত্রের ভিতর স্ত্রীলোক? এ আবার কি রকম কথা?

আমি। এই পত্রে স্ত্রীলোকের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

নন্দকুমার। আপনার সকল বিষয়েই হাসি-তামাসা।

আমি। নন্দবাবু! রাগ করিবেন না। প্রকৃতই স্ত্রীলোক-ঘটিত ব্যাপার উপস্থিত। এই পত্রগুলি আমি মৌলুবী ফজলহকের গৃহে কুড়াইয়া পাই। ভাবিয়াছিলাম, এই পত্রপাঠে কোন গূঢ় রাজনৈতিক বিষয়ের তত্ত্ব বা যুদ্ধ-সজ্জার সন্ধান পাইব। কিন্তু তাহার পরিবর্তে পাইলাম,—গুপ্ত প্রেমের কথা, কুলকলঙ্কিনীর কথা, বিচ্ছেদের কথা, মিলনের কথা,—রূপ বর্ণনা, গুণ বর্ণনা, বিরহ বর্ণনা,—গান, ছড়া, হেঁয়ালি,—এবং অশ্লীল, অনুচ্চার্য্য কথা।

ডাক্তার মহাশয় বোধ হয় মনে মনে একটু আনন্দিত হইয়া কহিলেন, "বলেন কি? বলেন কি? একখানি পত্র পড়ুন দেখি,—শুনি।"

আমি। এসব বড় বিশ্রী কথা, আপনার শুনিয়া কাজ নাই।

নন্দকুমারের আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পাইল। এদিকে তিনি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের গানকে অশ্লীল বলিতেন; আমি যদি গাইতাম,

কৈশোর যৌবন দুহুঁ মিলি গেল
শ্রবণ কি পথ দুহুঁ লোচন নেল।

তাহা হইলে তিনি বলিতেন, "এ সব সঙ্গীত কেন? ঈশ্বরবিষয়ক গান আরম্ভ করুন?" বিদ্যাসুন্দরের নামে তিনি খড়্গহস্ত ছিলেন। আমি যদি এইভাবে টপ্পা ধরিতাম,—

"ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিনে,
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।

তাহা হইলে তিনি রাগিয়া, সে স্থান হইতে উঠিয়া যাইতেন।

অদ্য কিন্তু ডাক্তার বাবু এ ভাব ভুলিয়াছেন। বিপরীত-ভাবে বিপরীত দিকে যাইতেছেন। আমি যখন কহিলাম, "এ বিশ্রী কথা আপনার শুনিয়া কাজ নাই,"—তিনি তখন অম্লান-বদনে উত্তর দিলেন, "তা হউক, আপনি পড়িয়া যান;—তা'তে দোষ কি?"

আমি। আপনার শুনিতে লজ্জা না হইতে পারে, আমার কিন্তু পড়িতে লজ্জা হইতেছে; এ কাজ আমি পারিব না।

নন্দকুমার। একান্ত সে কথাগুলা পড়িতে যদি লজ্জা বোধ হয়, তবে সে কথাগুলা বাদ দিয়া পত্র পড়িলে হানি কি? পত্র ত গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত অশ্লীল কথায় পূর্ণ হইতে পারে না;—স্থানে স্থানে যে দুই একটা অশ্লীল কথা আছে, তাহা না পড়িলেই চলিবে।

আমি। অশ্লীল কথা বাদ দিতে গেলে, এ পত্রে আর কিছুই থাকে না। যেমন পূর্ণচন্দ্র ব্যতীত পূর্ণিমা সম্ভবে না, সেইরূপ বিশ্রী কথা—খাঁটী বিশ্রী কথা ব্যতীত, এ পত্রের রচনাও সম্ভবে না।

নন্দকুমার। বটে! বটে! পত্র কি স্ত্রীলোকের হাতের লেখা? কি দুরদৃষ্ট! আমি যে হাতের লেখা উর্দ্দু পড়িতে জানি না।

আমি। এক সুন্দরী রমণী,—এক নব-যুবতী স্বহস্তে এই তিনখানি পত্র লিখিয়াছেন। অবশিষ্ট পাঁচ খানি পত্র, যে কামিনী লিখিয়াছেন, তাঁহার বয়স একটু বেশী এবং বামকর্ণে একটী আঁচিল আছে। তবে ইঁহার অগাধ ধনসম্পত্তি আছে।

নন্দকুমার কেবল আফ্‌শোষে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। আর, ম্লানমুখে মাঝে মাঝে একদৃষ্টে আমার পানে চাহিতে লাগিলেন। শেষে জিজ্ঞাসিলেন, "যাঁর বেশী বয়স বলিতেছ, তাঁর কত আন্দাজ বয়স হইবে?"

আমি। বয়স আর বেশী কি? এখনও বাইশ উত্তীর্ণ হয় নাই।

নন্দকুমার। তা বই কি!—ইহাকে বেশী বয়স বলে না। ইহার নগদ কত টাকা আছে?

আমি। নগদ তিন কোটি পঁচাত্ত লক্ষ টাকা; মোহরের সংখ্যা বিরানব্বই লক্ষ; ইহা ব্যতীত হীরা এবং মুক্তা দুই সিন্দুক আছে।

(আমার যাহা মনে আসিতে লাগিল, তাহাই তখন নন্দকুমারকে বলিতে লাগিলাম। আশ্চর্য্য এই,—নন্দকুমার তাহাই তখন পূর্ণ-মাত্রায় বিশ্বাস করিতে লাগিলেন।)

ডাক্তার নন্দকুমার মিত্রজ মহাশয় এবার ভাব-গদগদ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "এই বয়োজ্যেষ্ঠা কামিনাটী কি জাতি?"

আমি। কেন,—তোমায় কি কুল করিতে হইবে নাকি? এই কামিনীর উৎপত্তি বহু-বংশ হইতে।

নন্দকুমার। সকল বিষয়েই আপনার তামাসা।

আমি। তামাসা করি নাই,—তোমার অর্ব্বাচীনতায় "বলিহারি" দিতেছি। বারাঙ্গনার জাতি জানিবার জন্য তোমার এত আগ্রহ কেন? তুমি কি তাহার সহিত কুটুম্বিতা পাতাইতে চাও?

নন্দকুমার তখন ঘোর নেশায় অভিভূত। কহিলেন, জাতি জানিলে দোষ কি? তিনি হিন্দু, কি মুসলমান,—ব্রাহ্মণকন্যা, কি যবন-কন্যা,—এ জাতিতত্ত্ব অবগত হওয়া মনুষ্য মাত্রেরই উচিত।

আমি। পশুমাত্রেরই উচিত।

নন্দকুমার। তবে কি আমি পশু?

ডাক্তার নন্দকুমার যে কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা বুঝাইবার জন্য অদ্য সেই বহু কাল পূর্ব্বে সংঘটিত উপরি-উক্ত ঘটনাটী এস্থলে বিবৃত করিলাম। নন্দকুমার,—ভাল-মানুষ, সৎলোক, নিরীহ এবং পরদুঃখকাতর। কিন্তু তাঁহার কেমন একটু বাতিক ছিল। আমি যদি বলিতাম,—মধুকর-চুম্বিত প্রফুল্ল গোলাপ পুষ্প;—তিনি অমনি শিহরিতেন তাঁহার শ্রী এক কেমন ধরণ ছিল। এদিকে, কোন স্ত্রীলোকের কুৎসা-ঘটিত কথা হউক দেখি, তিনি অমনি হাঁ করিয়া সে গল্প গিলিতেন। এই দোষটী এবং ঘোড়া-চড়ার আতঙ্ক এবং স্বভাবতঃ ভীরুস্বভাব—এই ত্রিদোষ ছাড়া নন্দকুমারের আর কোন দোষ ছিল না। সাহেব-মহলে তিনি সুচিকিৎসক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কোন সৈন্যের কঠিন রোগ হইলে, তিনি একবারের স্থলে দশবার তাহা দেখিতেন। হঠাৎ রাগ নাই। এক কথা দশবার জিজ্ঞাসিলেও, তাঁহার রাগ নাই। সদাই প্রসন্নবদন,—কর্কশ কথা কালেভদ্রে কদাচিৎ তিনি প্রয়োগ করিতেন। অথবা কখনও করিতেন না, বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

নন্দকুমারের সহিত সে দিন একহাত খুব ঝগড়া করিলাম। কেন ঝগড়া, কাহার জন্য ঝগড়া, কিসের ঝগড়া তাহার কিছুই ঠিক নাই, কেবল কথার কাটাকাটি করিয়া, বৃথা ছল ধরিয়া ঝগড়া। নন্দকুমার ঝগড়ায় আমায় পারিবেন কেন? বিশেষ, তাঁহার প্রকৃতি ধীর। ক্ষণমাত্র যুদ্ধেই তিনি পরাস্ত হইয়া ক্ষমা চাহিলেন। বিবাদ মিটিল।

সেই সকল উর্দ্দূ-লেখা পত্র প্রকৃতই প্রণয়-পত্র। মৌলভী ফজলহক্ অতীব লম্পট। সেই মুসলমান-সৈন্যাধ্যক্ষের প্রকাশ্য উপপত্নীর সংখ্যা আট-নয়টীর কম নহে। ইহা ব্যতীত, পরস্ত্রী-হরণে ইনি সদাই তৎপর। একখানি পত্র, কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান-ঘরের কুলবধূকে বাহির করিয়া আনিবার উপায় সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। কুলবধূ, কুলে কালি দিয়া, পুরুষ-বেশে মৌলভী ফজলহকের নিকট হলদোয়ানি আসিতে সম্মত। আমি সে পত্র পড়িয়া মনে মনে বলিলাম, "ধন্য সৈন্যাধ্যক্ষ! তুমিই ধন্য! তুমিই না বীর-বেশ ধরিয়া বাহুবলে, ইংরেজদিগকে নাইনিতাল হইতে তাড়াইতে আসিয়াছিলে?"

আমি সন্ধ্যার পর নির্দ্দিষ্ট সময়ে কর্ণেল ক্রসৃম্যান সাহেবের নিকট উপনীত হইয়া কহিলাম, "পত্রগুলি প্রণয়পত্র—কেবল স্ত্রী-লোক ঘটিত কথা।" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "পত্রগুলি ছিঁড়িয়া ফেল।"

মে মাসের সংক্রান্তিদিনে, দুরন্ত গ্রীষ্মের সময়, দিবসে, দ্বিপ্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, বেরিলী-সহরে বিদ্রোহের প্রথম সূচনা হয়। গ্রীষ্মকাল অতীত হইল, বর্ষাকাল অতীত হইল, শরৎ আসিল,—আকাশে ষোলকলায় শশধর উদিত হইল,—ধরামণ্ডল হাসিল,—আমি কিন্তু তখনও প্রাণের দায়ে বিব্রত হইয়া ঘুরিতেছি,—উৎ-কণ্ঠিত-চিত্তে ইংরেজের কেবল শুভকামনা করিতেছি। শরতের পর হেমন্ত; হেমন্তের পর শীত। কালের ক্ষয় হইয়া নূতন কালের উদয় হইতেছে;—ঘুরিয়া ফিরিয়া এক ঋতুর পর অন্য ঋতু আসিতেছে,—আমি কিন্তু তাই আছি! পরিবর্ত্তন নাই, পরিবর্দ্ধন নাই, পরিশোধন নাই,—সেই বিদ্রোহী-দল-পরিবেষ্টিত হইয়া কেবল উদ্ধারের চেষ্টা করিতেছি।

প্রথম প্রথম হল্‌দোয়ানিতে আসিয়া স্থানের নূতনত্বহেতু একটু ছিলাম ভাল। কিন্তু যত, দিন যাইতে লাগিল, ততই বিরক্তি-বোধ হইতে লাগিল। সেই ড্রিল, সেই প্যারেড্, সেই গোয়েন্দার গল্প, সেই ডাল-রুটী-মাংস আহার, সপ্তাহের মধ্যে সেই দুইবার শীকার-সন্ধানে গমন, নন্দকুমারের সহিত সেই মাঝে মাঝে ভাব ও ঝগড়া,—কেবল এই উপকরণগুলি লইয়া আর কতদিন তিষ্ঠিব? ঐ বিদ্রোহী-সেনা আসিল, ঐ ঐ রসদ লুঠিয়া লইল, ঐ আমাদের দূরস্থ ঘাটি আক্রমণ করিল,—কেবল ইহা লইয়া আর কত দিন থাকিব? ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। মরি কি মারি,—তখন ইহাই মনে হইতে লাগিল। বিদ্রোহী-সেনা ভেদ করিয়া, বেরিলী-অভিমুখে ছুটিয়া যাই,—মনো-মধ্যে মাঝে মাঝে এমনও অভিলাষ জন্মিতে লাগিল। বাস্তবিকই দিন আর যায় না,—কেবল পথপানে চাহিয়া থাকি,—আজ চরমুখে কি সংবাদ পাই। ডাকের চিঠি নাই, জননী-ভার্য্যার সংবাদ নাই, আত্মীয়-স্বজনের সংবাদ নাই,—সুতরাং সদাই শুষ্কমুখ, বিষণ্ণবদন।

সত্য সত্যই সহ্য আর হয় না। পাঠকগণেরও বোধ হয় আর সহ্য হয় না। আমার এই ক্ষুদ্র জীবন চরিতে বৈচিত্র্য না দেখিয়া, কেহ কেহ বিরক্তও হইয়া থাকিবেন। কিন্তু উপায় নাই। লেখক সে সময় যে কিরূপ বিরক্ত হইয়া-ছিল,—তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার তাঁহার শক্তি নাই।

কিন্তু এই বিরক্তির দিন কি শীঘ্র ফুরাইবে না? শুভ দিন কি সহজে আর আসিবে না? ঘটনাবলীর বৈচিত্র্যে প্রাণ কি আর সুশীতল হইবে না? বিদ্রোহীদের সহিত ঘোর-সংগ্রামে, সম্মুখ-সমরে প্রাণের পিপাসা কি মিটাইতে পারিব না? বীরদর্পে, ভীরু বিদ্রোহী-সেনাদল-মাঝে পড়িয়া, অস্ত্রঘাতে খণ্ড খণ্ড করিবার কি সুযোগ পাইব না? একবার অন্তরে কালী কালী বলিয়া,—মুখে কালী কালী বলিয়া, হস্তে খড়্গ লইয়া, রণভূমে প্রবেশ পূর্ব্বক মনের আশা পূর্ণ করিবার কি অবসর ইহজন্মে আর পাইব না? জানিনা,—অদৃষ্টে কি আছে? হয় বিদ্রোহিগণ আসিয়া আমাদিগকে হনন করুক, না হয় আমরা গিয়া বিদ্রোহি-দলকে সমূলে নির্ম্মূল করি। হয় এ-দিক্, না হয় ও-দিক্—যাহা হয় একটা হইয়া যাউক। কিন্তু এমন করিয়া আর বসিয়া থাকিতে পারি না।

কোমল-প্রাণ পাঠকের অবশ্যই ধৈর্য্য থাকি-তেছে না।

সঙ্গীত।

(১)

খাম্বাজ—একতালা।

ঋতুরাজ বন-উপবনভারে,
কি বিহারে!
কুহরে কোকিল, শিহরে অখিল,
স্বর-জয়জয়কারে!

মৃদুল মৃদুল মলয়-বায়,
কাঁপে কুসুমিতা লতার কায়,
কায় কব কত, সৌরভ শত-
শিরে ধরে সহকারে!

মধুর পবন মধুরে ধায়,
মধু মাতোয়ারা ভ্রমরা গায়,
মধু-মদভরে, ভাসে চরাচরে,
অকৃতী আঁখির ধারে!

(২)

সিন্ধু-কাফি—খং।

নীল-নলিনদলে,
কেন সাধি, এস বাঁধি বঁধুয়ারে।
বাঁধিব মন, যতন করিয়ে,
হরিয়ে কেমনে লয় পরে;
আজি জাগ' সবে অনুরাগভরে।

মানস-সরস এত কি সরস রে
নীরস আর সকলে;
না হব চল সকল সখি
পরখি সে বারি,
নিরখি নিবারি আঁখি-পাপ-অনলে!

নলিনী মোরা কেন থাকি মলিনী,
প্রেম-মধু রাখি হৃদয়কমলে;
এস, মাখি পরিমল, কোমল কায়ে,
স্নেহ শীতল উপহারি মৃণালে!

শ্রীশা—

অপ্রত্যয়

প্রত্যয় বিলা'য়ে আমি কিনেছি তোমায়।
সুধা ফেলে সুধা ব'লে পিই মদিরায়।
প্রাণ-বায়ু বিসর্জ্জনে, হৃদে রাখি সযতনে,
ক্রমে এ হৃদয় মগ্ন তামসী-নিশায়।
ক্ষাণ চন্দ্র প্রত্যয়ের লুকা'ল কোথায়! ১

যে আদরে তোরে তার সুচতুর নাম।
বারাঙ্গনাসম তব বিমোহিনী ঠাম।
জ্বালায় জ্বলিয়ে মরে, তবু তোরে যত্ন করে,
নির্ব্বোধ বলিয়ে খ্যাতি তুমি যারে বাম
নর-হৃদি বিনে তব আছে কি হে ধাম? ২

লীলায় বিহর তুমি কামিনী কাঞ্চনে।
হেলায় কর হে পর অতি প্রিয় জনে।
তুমি নারী-হৃদি-বাসী, তাই তোরে ভালবাসি,
ফণিনী জানি হে নহি কাতর দংশনে
চতুরাবদন হেরি তৃষিত-নয়নে। ৩

কে পায় তোমায় হায় কাঞ্চন যথায়।
ঝন্ ঝন্ শব্দে পর কর বাপ মায়।
সতী নিজ পতি ডরে, পুত্র হ'য়ে প্রাণ হরে,
ভালবাসা প্রেম-আশা বাসা ছেড়ে যায়
ব্যাকুল মানব তব চরণে লোটায়। ৪

অপ্রত্যয়! প্রত্যয় কি করি তোরে আর!
পুড়া'য়ে ক'রেছ মম জীবন অঙ্গার।
প্রত্যয় করিয়ে রব, প্রত্যয় করিয়ে সব
প্রত্যয় করিয়ে যাবে মনের আঁধার
সুখে দুখে হে প্রত্যয় হব হে তোমার।— ৫

বালক-নয়নে পুনঃ হেরিব ধরণী,
কাচ ফেলে পাব পুনঃ নীলকান্ত মণি।
প্রফুল্লনয়নে চাব, প্রেম-পণে প্রেম-পাব
হৃদয়-নিকুঞ্জে পুনঃ হবে পিক-ধ্বনি
কুটিল কটাক্ষে নাহি বিঁধিবে রমণী। ৬

শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ।

জন্মভূমি।

৪র্থ ভাগ। } চৈত্র। ১৩০০। { ৪র্থ সংখ্যা।

হিন্দু।

হিন্দু শব্দ সংস্কৃত নহে, জাবনিক। হিন্দু শব্দের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা আমরা জানি না। কেহ কেহ বলেন, হিন্দুশব্দে গোলাম—ভৃত্য বা ক্রীতদাস। জবনেরা আমাদের এই সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী জাতিকে বিদ্বেষবশে হিন্দু বলিত, এক্ষণে সে-ই হিন্দু নামই আমাদের প্রচলিত। কেহ কেহ বলেন, 'সিন্ধু' শব্দ হইতে 'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি। যাহা ইণ্ডিয়ার মূল, তাহাই হিন্দুর মূল। প্রতীচ্যগণের নিকট, বর্ত্তমান ভারতবর্ষের সিন্ধুনদ সর্ব্বাগ্রে পরিচিত। সেই নদের নাম হইতে হিন্দু শব্দের উৎপত্তি। ভারতবর্ষ এই নাম প্রতীচ্যদিগের সম্পূর্ণ বিদিত থাকিলে, হিন্দু নামের পরিবর্ত্তে "ভারত"-ঘটিত কোন নাম আমাদের হইত, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। কেহ কেহ বলেন, হিন্দুকুশ পর্ব্বতের নিকট হইতে সমাগত বলিয়া প্রকাশ থাকাতেই 'হিন্দু' আখ্যা হইয়াছে। মুসলমান রাজগণের প্রদত্ত হিন্দু নাম এখন আমাদের অতি প্রচলিত। কি বিজাতীয় কি সজাতীয়—সকলের নিকটেই হিন্দু নাম পরিচিত। গৌরব ও ঘৃণা, সমাদর ও অবহেলা, পূজা ও অবমাননা, আমরা হিন্দু নামের সঙ্গেই পাইতেছি। হিন্দু নাম এখন আমাদের প্রিয়, অতিপ্রিয়, হিন্দু নামের সহিত এখন আমাদের অভেদ্য অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এই অসংস্কৃত জাবনিক শব্দ, এত প্রচলিত হইবার কারণ—হিন্দু নামের অনুরূপ কোন প্রকার সংস্কৃত নাম না থাকা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সঙ্কর জাতি, অন্ত্যজ জাতি, নীচতম জাতি সকলকে বোধ করে এমন শব্দ আর ত কিছু নাই।

পূর্ব্বকালে, বৌদ্ধ, মুসলমান ও খৃষ্টান প্রভৃতি জাতি ছিল না, একারণ—কেবল মানব বা মনুষ্য ইত্যাদি শব্দ দ্বারাই উচ্চ হইতে নীচ জাতি পর্য্যন্ত পাওয়া যাইত। এখন নানা ধর্ম্ম ও নানা জাতি ; এ সময়ে আমাদের জাতি সাধারণতঃ বুঝাইতে হিন্দু শব্দই পর্য্যাপ্ত।

যাউক ও-কথা। হিন্দু শব্দের মূল অর্থ যাহাই কেন হউক না, হিন্দু শব্দের ব্যবহার এক্ষণে, কীদৃশ জনসাধারণের প্রতি হইতেছে (১), অপরের প্রতি হইতে পারে কি না ? (২), ধর্ম্মের নাম হিন্দু-ধর্ম্ম কেন হইল ? (৩) এবং শাস্ত্র ও লোকব্যবহার হিন্দু সম্বন্ধে একরূপ কি না ? (৪) ; এই চারিটী বিষয়ের আলোচনা এই প্রবন্ধে করিব।

হিন্দু জাতির লক্ষণ নির্দ্দেশ না করিলে

এ সকল বিষয়ের আলোচনা করা অসম্ভব, সুতরাং প্রথমে তাহাই কর্ত্তব্য। কিন্তু এই লক্ষণ বড় জটিল। বাস্তবিকই ভাবিতে হয়, হিন্দু ...তের লক্ষণ কি? আচ্ছা, কতিপয় লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছি, তন্মধ্যে যেটী বিচারে বিশুদ্ধ হইবে, তাহাই গ্রহণ করা যাইবে।

১। যে জাতি শাস্ত্রে বিশ্বাসযুক্ত, তাহারই হিন্দু জাতি।

২। যাহারা শিব দুর্গা রাম প্রভৃতি দেব-দেবী.ক মানে, তাহারা হিন্দু।

৩। যে জাতি পুরুষানুক্রমে ভারতবর্ষের অধিবাসী, সে-ই জাতিই হিন্দু।

৪। গোহত্যা-পরাঙ্মুখ জাতিই হিন্দু।

৫। ভারতবর্ষের অধিবাসী হইয়া যাহারা দেব-দেবী পূজা করে, তাহারাই হিন্দু।

৬। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ এবং তন্ত্র; এই চতুর্ব্বিধ শাস্ত্রের মধ্যে কোন এক শাস্ত্রের মত যাহারা পুরুষানুক্রমে অবলম্বন করিয়া আছে, তাহারাই হিন্দু।

৭। যাহারা কোন পুরুষে উক্ত চতুর্ব্বিধ শাস্ত্রের অনুপদিষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না, তাহারাই হিন্দু জাতি।

প্রথম হইতে ছয়টী পর্য্যন্ত লক্ষণ বিশুদ্ধ নহে, অতএব পরিত্যাগ করা গিয়াছে; শেষ লক্ষণটী প্রচলিত ব্যবহারের উপযোগী। কেন? তাহা দেখাইতেছি—

১। আপন আপন শাস্ত্রে সকলেই বিশ্বাস-যুক্ত, অতএব সকল জাতিই হিন্দুপদবাচ্য হইতে পারে, অতএব প্রথম লক্ষণটী অতিব্যাপ্তি-দোষে দুষিত।

২। বিবি বেশান্ত প্রভৃতি অনেক বিভিন্ন জাতি শিব দুর্গা রাম প্রভৃতি মানিতেছেন, নব-দ্বীপের নিকটবর্ত্তী একঘর মুসলমানও দুর্গাপূজা করাইতেন, দুর্গা মানিতেন, দেব দেবী মানি-তেন; তাই বলিয়া তাঁহাদিগকে কি হিন্দু বলিয়া ধরা যাইবে? সুতরাং এ লক্ষণেরও মাত্রা অধিক, অর্থাৎ অতিব্যাপ্তি দোষ আছে।

৩। অনেক বন্য জাতি ভারতবর্ষে আছে, যাহারা পুরুষানুক্রমে ভারতবর্ষের অধিবাসী, তাহাদিগকে কি কেহ হিন্দু বলিয়া থাকে? এই সব বন্য জাতিতে তৃতীয় লক্ষণের অতি-ব্যাপ্তি এবং সাহেবদের মতে অসম্ভব। অর্থাৎ এ লক্ষণটী কোন হিন্দুতেও বর্ত্তে না। কেননা, হিন্দুজাতি ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী নহে। হিন্দুর পুরুষানুক্রমে বাস ভারতবর্ষে নহে। অনেক সাহেব এই কথা বলেন।

৪। অনেক বৌদ্ধে গোহত্যা কি কোন প্রাণিহত্যাই করে না। কিন্তু তাহারা ত হিন্দুপদবাচ্য নহে। এই হইল অতিব্যাপ্তি। পক্ষান্তরে খুব নীচজাতীয় হিন্দুরা অনেকে গোহত্যাও করে; অতএব সে স্থলে হইল অব্যাপ্তি।

৫। শুনিতে পাই, যবদ্বীপে হিন্দু আছে, কাবুলে হিন্দু আছে, বর্ম্মায় হিন্দু আছে, কিন্তু ঐ সকল স্থানকে সাহেবেরা ত ভারতবর্ষ বলেন না; তবে ভারতের অধিবাসী না হইলেও হিন্দু হওয়া যায়, ইহা বুঝা আছে। এখন হিন্দু জাতির পঞ্চম লক্ষণ মানিলে, অব্যাপ্তি হয়, ঐ সকল স্থানের হিন্দুকে হিন্দু বলা চলে না। পক্ষান্তরে নবদ্বীপের নিকটস্থ সে-ই এক ঘর মুসলমান, যাঁহারা দেব-দেবীপূজক, তাঁহা-দিগকে এবং কোন ভারতীয় মুসলমান বা খৃষ্টান যদি দেব-দেবী পূজা করে ত তাহাকেও হিন্দু বলিতে হয়।

৬। ষষ্ঠ লক্ষণ মানিলে, কলিকাতা অঞ্চলে হিন্দুজাতি দুর্লভ হইয়া উঠে। একণে দু এক পুরুষে সব শাস্ত্রের মতই পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং অনেকে বলেন, পুরাতন বৌদ্ধবংশও এখন হিন্দুর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, সুতরাং অবধারণ

করিয়া বলি কিরূপে যে, "যাহারা পুরুষানুক্রমে ঐ সব শাস্ত্রের কোন-না-কোন মত অবলম্বন করিয়া আছে, তাহারাই হিন্দু।"

৭। এই জন্ত সপ্তম লক্ষণের অবতারণা করিয়াছি। সপ্তম লক্ষণের ভাব—ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টি হইতে এই কাল পর্য্যন্ত যে বংশে, কোন পুরুষ ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করিয়া সন্তান উৎপাদন করিয়াছে বলিয়া স্পষ্ট প্রমাণ আছে, সে-ই সন্তান-ধারা—হিন্দু বলিয়া গণ্য হইবে না। যে সব বংশ এইরূপ বেদাদি শাস্ত্রোক্ত-অনুপদিষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিগণের শুক্র-শোণিত-সম্ভূত বলিয়া স্পষ্ট প্রমাণ নাই, তাহা হিন্দুজাতির বংশ বলিয়া অভিহিত। সে সব বংশে যাহাদিগের জন্ম, তাহারাও ধর্ম্মান্তর অবলম্বন না করিলে 'হিন্দু' বলিয়া গণ্য হইবে। এইরূপ বংশ ও ব্যক্তি লইয়া হিন্দুজাতির নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। ভারতবর্ষ ভিন্ন অপর দেশবাসী হিন্দুও এই প্রকার হিন্দুলক্ষণাক্রান্ত হইতে পারে। এখন যাহারা শাস্ত্রসম্মত আচার ব্যবহার পালন করে না, কিন্তু মুসলমান বা খৃষ্টান প্রভৃতির ধর্ম্ম পরিগ্রহ করে নাই, তাহারা সপ্তম লক্ষণানুসারে হিন্দুজাতির অন্তর্গত হইতে পারে। কোন্ বৌদ্ধবংশ এক্ষণে হিন্দু হইয়াছে, এ কথা অনেকে বলিলেও স্পষ্ট প্রমাণ নাই। অপর-ধর্ম্মাবলম্বী লোকে যে হিন্দু হইতে পারে না, তাহার কারণও সপ্তম লক্ষণের অনুসারী, হিন্দু সমাজের অভিপ্রায়। কর্ত্তাভজা, বাউল প্রভৃতি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শাখা প্রশাখাগণ হিন্দু হইয়াছে পুরাণানুবর্ত্তিতার জন্ত। তাহাদের মত ভাল হউক, মন্দ হউক, সে বিচার এ প্রসঙ্গে করিতেছি না; তবে এই বলিতেছি, তাহারা স্ব স্ব মতকে শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণব পুরাণের অনুবর্ত্তী বলিয়া বিশ্বাস ও প্রকাশ করে। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে নীচতম জাতি পর্য্যন্ত এই [illegible] হইতে পারে।

এই লক্ষণ দ্বারাই আমাদের আলোচ্য দুইটী বিষয়ের একরূপ মীমাংসা করা হইয়াছে।—অর্থাৎ কীদৃশ জনসাধারণ এক্ষণে হিন্দু নামে ব্যবহৃত, সপ্তম লক্ষণ দ্বারা তাহা বুঝান গিয়াছে। আর, অপর জাতিও উক্তরূপ হিন্দু-লক্ষণাক্রান্ত হইতে পারে না, অতএব হিন্দু-নামেও ব্যবহৃত হইতে পারে না, ইহাও বলা হইল। লক্ষণটী মোটামুটী। ব্যবহারোপযোগী হইলেও আমার ইহাতে একটু 'কিন্তু' আছে। 'কিন্তু'টুকু এই;—

সাঁওতাল প্রভৃতি বন্যজাতির মধ্যে অনেকেই ক্রমে 'নীচ জাতীয় হিন্দু' বলিয়া পরিচিত হইয়াছে ও হইতেছে। ইহারা পুরুষানুক্রমে কোন শাস্ত্রেরই ধার ধারে না। ইহারা অন্ত্যজ জাতি বা অন্ত্যাবসায়ী জাতির মধ্যে শাস্ত্রে পরিগণিত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পূর্ব্ব-কালে ধর্ম্ম আর ছিল না, বন্যদিগের সাধারণ ধর্ম্ম ঋষ্যনুমোদিত। অসাধারণ ধর্ম্ম তখন ছিল কিনা বলা যায় না। থাকিলেও তাহা সম্প্রদায়-বিশেষগত কুলধর্ম্মের মধ্যেই গণ্য ছিল।

সেই ধর্ম্ম পালনের অপরাধে তাহাদিগকে চণ্ডাল হইতে নিম্ন শ্রেণীতে অবনমিত করা হইত না। তাহাদিগেরও গুণ * তারতম্য বুঝিয়া জাতিভেদ করা ছিল। ভিল জাতি চণ্ডাল হইতে ভাল। অপর বন্যজাতি বা ম্লেচ্ছ-জাতি চণ্ডালের সমান, সুতরাং পূর্ব্বে চণ্ডাল পর্য্যন্ত জাতিকে এক শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়া এক নামে অভিহিত করিয়া আর তদপেক্ষা উচ্চ জাতিকে পৃথক্ শ্রেণীতে উপবেশন করান ঋষিগণ উচিত মনে করিতেন না। সাধারণ শব্দ প্রয়োগ করিতে হইলে, মানব, বা মানুষ ইত্যাদি বলিতেন। বিশেষ স্থলে, বর্ণ, আর্য্য, দ্বিজ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ইত্যাদি নাম

* সত্ত্ব, রজঃ তমঃ।

ব্যবহার করিতেন। এখন জাতিভেদের মূল হারাইয়া গিয়াছে। যা হউক এখনকার আইনে, বন্যজাতি শাস্ত্রানুসারে কৈবর্তের সমান হইলেও হিন্দু নহে, যেমন ছিল *। তা যদি হইল, তবে অনেক হীন জাতিই হিন্দুত্ব হইতে বিচ্যুত হয়। ইষ্টাপত্তি অনেকেই করিবেন †। কিন্তু যাহা সত্য সত্য হইয়াছে, সত্য সত্য হইতেছে এবং সত্য সত্য হইবে, তাহার অপলাপ করিব কিরূপে? যে জাতির এক শ্রেণীকে বন্য বলিয়া মনে করিতেছ, সে-ই জাতিরই অপর শ্রেণী দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে হিন্দুসমাজে মিলিয়া হিন্দু নামে তোমারই নিকট কীর্ত্তিত হইতেছে। এই এক কথা। দ্বিতীয় কথা এই,—

শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম লইয়া হইয়াছে, হিন্দুজাতির লক্ষণ। কিন্তু এই ধর্ম্ম কিরূপ ধরিতে হইবে? সাধারণ ধর্ম্ম ত সকল জাতিরই সমান। সকল ধর্ম্মাবলম্বীরাই তাহা কোন না কোনরূপে পালন করেন। অতএব বিশেষ ধর্ম্ম ধরিতে হইবে। মনে কর, বাপ্তাইজ হইতে হইলে জার্ডনের জল মাথায় দিতে হয়, স্থূলকথায় এ রকম কার্য্যকেই চতুর্ব্বিধ শাস্ত্রের অনুপদিষ্ট 'ধর্ম্ম' বলিয়া ধরিতে হইবে, কিন্তু তাহা হইলেও বিষম বিপদ। মনে কর, একজন প্রকৃত হিন্দু, সক করিয়া বা মজা দেখিবার জন্য অথবা ভ্রমক্রমে জার্ডনের জল মাথায় দিল, কিন্তু অভক্ষ্য ভক্ষণ, কি আমাদের শাস্ত্রে অবিশ্বাস, অথবা পরকীয় ধর্ম্মে অনুরাগ কিছুই তাহার হয় নাই; সে ব্যক্তি এবং তৎসন্তান সন্ততি, সপ্তম লক্ষণের বলে, হিন্দু-লক্ষণ-ভ্রষ্ট হইতে বাধ্য। লক্ষণটী মিলাইয়া দেখ, আমার কথা ঠিক কিনা। আর যে সব লক্ষণ করিতে যাইবে, তাহাতে আচার-ভ্রষ্ট ধর্ম্মভ্রষ্ট আধুনিক অনেক হিন্দুকে বাধা দিতে হইবে। কিন্তু তাহাত করা হয় না। হিন্দুজাতির মধ্যে তাহাদিগকে ত ধরা হইয়া থাকে। তাই বলিতেছিলাম, সপ্তম লক্ষণেও আমার 'কিন্তু' আছে। অতএব "খৃষ্টান মুসলমান প্রভৃতি সেই-সেই জাতি ভিন্ন যে জাতি, তাহাই হিন্দুজাতি"—এইরূপ জটিল ও বহুজন-মনোরঞ্জনে অক্ষম লক্ষণের আশ্রয় লইতে হয়। এই হইল, হিন্দুজাতির লক্ষণ। এইরূপ জাতির অন্তর্গত ব্যক্তি হইল হিন্দু। বর্ত্তমান সমাজের গরজে এইরূপ লক্ষণ অবলম্বন করিতে হইল; এ কথা কিন্তু বাঁরংবার বলিব। পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, লক্ষণ-অনুশীলনেই প্রথম দুই বিষয়ের আলোচনা হইয়া গিয়াছে। অন্য যাহা অবশিষ্ট থাকিল, তাহা পরে বলিতেছি।

এখন তৃতীয় বিষয়ের আলোচনা করা যাক্।

হিন্দুজাতির মধ্যে প্রচলিত ধর্ম্ম বলিয়া আমাদের ধর্ম্মের নাম হিন্দুধর্ম্ম হইয়াছে। খৃষ্টান মুসলমান প্রভৃতি জাতির নাম হইয়াছে ধর্ম্মের নাম হইতে। আর হিন্দুধর্ম্মের নাম হইয়াছে হিন্দুজাতির নাম হইতে। ঠিক বিপরীত। এই জন্যই মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেই, যে জাতির ছেলে হউক, মুসলমান হইবে; খৃষ্টানের পক্ষেও এই নিয়ম আছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিলে অর্থাৎ শিবপূজাদি আরম্ভ করিলেও অ-হিন্দুজাতি, হিন্দু হইতে পারে না। ফল কথা এই, মুসলমানেরা দেশ লইয়া জাতির নাম হিন্দু ও জাতি লইয়া ধর্ম্মের নাম হিন্দু রাখিয়াছে। ধর্ম্মের নাম হিন্দুধর্ম্ম

---

* রজকশ্চর্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
কৈবর্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ। যম।

† জলপাইগুড়ি অঞ্চলে একজন রাজবংশী (ক্ষত্রিয়) জাতীয় জমীদার মৃত্যুকালে দত্তকের অনুমতি দিয়া যান। জমীদার-পত্নী দত্তক লইলেন ভ্রাতুষ্পুত্র দত্তক সম্বন্ধে কি কি আপত্তি করে। শেষে বিলাতে তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়, রাজবংশী জাতি হিন্দু নহে, বন্য। অতএব হিন্দুশাস্ত্রসম্মত দত্তকে রাজবংশীর অধিকার নাই। সাহেবেরা এ পার্থক্য যে কেন করেন, তাহা বুদ্ধিমানের অবিদিত নাই।

হইয়াছে এই কারণে বটে, কিন্তু এক্ষণে হিন্দু-শব্দ জাতি ও ধর্ম্ম উভয় অর্থেই ব্যবহৃত। ভারতবর্ষে হিন্দুর সংখ্যা—এত। এ স্থলে হিন্দু-শব্দ জাত্যর্থবোধক। "অমুক লোকটী বেশ হিন্দু" এই কথায় হিন্দুশব্দের অর্থ হইল ধর্ম্মের পক্ষে। তা যাই হউক, হিন্দুধর্ম্ম-শব্দ যে জাতিমূলক, ইহা বেশ বলা যায়।

এই গেল তৃতীয় বিষয়। এক্ষণে দেখা যাক্ শাস্ত্র ও লোকব্যবহার হিন্দু সম্বন্ধে কিরূপ ?—

শাস্ত্রজ্ঞ মাত্রেই অবগত আছেন, হিন্দুশব্দ বা তদনুরূপ শব্দ কোন শাস্ত্রেই নাই। হিন্দু বলিয়া বিশেষরূপে নির্দ্দেশও শাস্ত্রে নাই। হিন্দু জাতি বলিয়া কোনরূপ নিগ্রহ বা অনুগ্রহ শাস্ত্রে দেখা যায় না। চণ্ডাল হিন্দু আর বন্যজাতি বা ম্লেচ্ছজাতি হিন্দু নহে, কিন্তু চণ্ডালের ধর্ম্মে ও ম্লেচ্ছের ধর্ম্মে বিশেষ কোন প্রভেদ শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ, চণ্ডালের সংসর্গে যে প্রকার পাপী হন, ম্লেচ্ছের সংসর্গেও সে-ই প্রকার পাপী হইয়া থাকেন। এইরূপ যে দিকেই দেখিবে, তাহাতেই বুঝিবে; হিন্দু নাম কল্পিত, শাস্ত্রের সঙ্গে উহার কোন সম্বন্ধ নাই। তবে এ সময়ে লোকব্যবহারে 'হিন্দু' স্বতন্ত্র হইয়াছে। ঋষিগণের বচনবিশ্বাসী বা নিরক্ষর ম্লেচ্ছজাতি হইতে, তৎসদৃশ চণ্ডালাদি জাতি হিন্দু বলিয়া আমাদের অধিক আত্মীয়, এইরূপ লোক-ব্যবহার হইয়াছে।

লোকব্যবহার যাহা হইয়াছে, তাহা চলে চলুক; কিন্তু জাতি সম্বন্ধে শাস্ত্রের মর্ম্ম যথা-সাধ্য এ স্থানে প্রকাশ করিতেছি।

শাস্ত্রে দ্বিবিধ ধর্ম্মের উল্লেখ আছে, সামান্য ধর্ম্ম ও বিশেষ ধর্ম্ম। বিশেষ ধর্ম্ম আবার, বর্ণ-ধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম ইত্যাদি ভেদে নানা প্রকার।

সামান্য ধর্ম্ম হইল,—

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।

মনু ১০ম অঃ ৬৩।

অহিংসা, সত্য, চৌর্য্য না করা, শুচি থাকা এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহ; এই কয়েকটী হইল সামান্য ধর্ম্ম। তবে যে সব জাতির হিংসাই হইল, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট জীবিকা, তাহাদিগের সেই হিংসা, হিংসাই নহে। তদতিরিক্ত হিংসা ত্যাগ হইলে অহিংসা।

এই সামান্য ধর্ম্মে সকলেরই অধিকার আছে।

বিশেষ ধর্ম্মে অধিকারিভেদ আছে; ব্রাহ্মণের ধর্ম্মে ক্ষত্রিয়ের অধিকার নাই, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মে বৈশ্যের অধিকার নাই, গৃহীর ধর্ম্মে ব্রহ্মচারী অধিকারী নহে; ইত্যাদি। বিশেষ ধর্ম্ম নানা; এ প্রসঙ্গে তাহা দেখাইবার প্রয়োজন নাই। তবে এই মাত্র বলা আবশ্যক যে, চতুর্ব্বর্ণের বিশেষ ধর্ম্মে হীন জাতির অধিকার নাই; চণ্ডালাদির যে বিশেষ ধর্ম্ম, তাহাতে ম্লেচ্ছ পর্য্যন্ত অধিকারী।

গঙ্গাস্নান, হরিনাম, শিবপূজা, শারদীয় দুর্গাপূজা এই সব ধর্ম্মকার্য্যে, ম্লেচ্ছ পর্য্যন্ত অধিকারী। তবে শৌচহীন হইলে কোন কর্ম্মেই অধিকার নাই। দেব দ্বিজে ভক্তি, গো-সেবা সকলেরই ধর্ম্ম। স্ত্রীলোকরক্ষা, বালকরক্ষা এবং গোরক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ করা চণ্ডাল ম্লেচ্ছ প্রভৃতি হীন জাতির স্বর্গ-প্রাপ্তির হেতু।

অন্ধাঃক্লীবা জড়া ব্যঙ্গাঃপতিতাযোগিনোঽন্ত্যজাঃ।
গঙ্গাং সংসেব্য পুরুষা দেবৈর্গচ্ছন্তি তুল্যতাম্।
প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃত মহাভারত।

ভাগবত, নারদীয়পুরাণ ও হরিভক্তিবিলাসে হরিনাম মানবমাত্রেরই পাপনাশক ও মঙ্গলপ্রদ ইহা বারবার উক্ত হইয়াছে।

যে কীর্ত্তয়ন্তি সততং দেব-দেবং মহেশ্বরম্।
ন মোহমধিগচ্ছন্তি যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
শিবপুরাণ।

সর্ব্বেষামধিকারোঽস্তি শঙ্করস্ত প্রপূজনে।
এবং নানা ম্লেচ্ছগণৈঃ পূজ্যতে সর্ব্বদস্যুভিঃ॥

শরৎকালীনপূজামধিকৃত্য ভবিষ্যপুরাণম্,—
ব্রাহ্মণার্থে গবার্থে চ দেহত্যাগোঽনুপস্কৃতঃ।
স্ত্রীবালাভ্যুপপত্তৌ চ বাহ্যানাং সিদ্ধিকারণম্।

মনু।

আমাদের ধর্ম্ম, মুষ্টিমেয় হিন্দুর জন্য নহে, সর্ব্ব জাতির জন্য। সকলেই আসিয়া এই ধর্ম্মতরুর ছায়ায় শীতল হইতে পারে। সকলের জন্যই এই ধর্ম্ম-মহানগরের মহাদ্বার সতত উন্মুক্ত। কেহ ভীত হইও না, কেহ পশ্চাৎপদ হইও না। অভিমান, অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া, শাস্ত্রের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, অবনত-মস্তকে এই মহাধর্ম্মের শরণাগত হও; হে বৌদ্ধ, মুসলমান, বন্য, খৃষ্টান! সকলেই এ ধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিতে পারিবে। তবে অধিকারি-ভেদ সকলকেই মানিতে হইবে, সামান্য ধর্ম্ম ও অধিকারানুরূপ বিশেষ ধর্ম্ম—সকলকেই পালন করিতে হইবে। তুমি লোকব্যবহারে হিন্দু হও, না হও, জাবনিক হিন্দু নামে তুমি সম্মানিত হও, না হও, শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের মধুর আস্বাদ লাভে কৃতার্থ হইবে। পরম মঙ্গলময় মহাধর্ম্মের মন্দিরে উপবিষ্ট হইয়া সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

তোমরা লোকের মুখে হিন্দু না হও, বিধাতার কাছে হিন্দু হইবে। কিন্তু মনে রাখিবে, শাস্ত্র যাহার যে ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাকে সেই ধর্ম্মই পালন করিতে হইবে।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

স্বপ্ন-কন্যা।

"No poet's fancy has spun from out his imagination a more glorious tale, or pictured in glowing words an epic of heroic love and transcendent valour to compete with the actual reality of the career of this simple maiden of old France."

Lord Ronald Gower.

পৃথিবীর পর পারে, অপার্থিব ভূমির আকাশ ব্যাপিয়া, অসীম স্বপ্ন-রাজ্য;—অপরিজ্ঞেয়তার অনতিস্বচ্ছ আবরণে ঢাকা!—দৃষ্টও নয় অদৃষ্টও নয়,—উভয়ের মধ্যবর্ত্তী;—অস্পষ্ট, আবছায়া-ময়,—আলোকে আঁধারে, দৃষ্টে অদৃষ্টে আচ্ছন্ন, দৃষ্ট অপেক্ষা অধিকতর অদৃষ্ট.—যেন অনন্তের অদূরবর্ত্তী এক মহাকাশে অবস্থিত; কিন্তু, অনাবিষ্কৃত। স্বপ্নভূমি আদৌ আবিষ্কারের অতীত; অথচ এই অতি-প্রত্যক্ষ পৃথিবীর সহিত কি এক সূক্ষ্ম সম্বন্ধসূত্রে সংযুক্ত। সূত্র সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম,—সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, অনন্ত; জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে অবিশ্রান্তরূপে অনুভূত। স্বপ্ন-রাজ্যের রহস্য কেহই জানে না; কিন্তু;—স্বপ্ন কে না দেখে! স্বপ্ন-রাজ্যের স্নিগ্ধকর এক সুবিশাল ছায়া সজাগ, জীবন্ত জড় জগৎ জুড়িয়া রহিয়াছে।

জাগরণের অন্তরালে সুপ্তি,—কেবল সুপ্তির সমভিব্যবহারে নহে,—অতি চেতনার অভ্য-ন্তরেও স্বপ্ন;—স্বপ্নের নিবিড় সান্দ্র ছায়া,—সুধাময়ী প্রচ্ছন্নমূর্ত্তি;—স্বপ্নের স্মৃতি,—বিস্মৃত বিচ্ছিন্ন স্মৃতি, সুবাসিত সমীরণ, মৃদুমন্দ মলয়া-নিল, স্বপ্নের মোহিনী মায়া; তাহার করুণা, কল্পনা এবং আবেগ অন্তর্ব্যাপিনী কামনা। স্বপ্ন সংসারের সৃষ্টি-শক্তি,—ইহ-পর-লোকের

সংমিলন-সূত্র—জন্মজন্মান্তরের মধ্যবর্ত্তী, মোহ অন্ধকারাবৃত, বিস্মৃতির সংক্ষুব্ধ সলিলময় এক মহা যোজক। স্বপ্ন স্বতঃ অবিরত সৃষ্টি-কার্য্যে রত;—নিগূঢ় কর্ম্ম-ফল-ক্ষেত্রে, যেন, বিধাতৃ-বিনিযোজিতা অধিষ্ঠাত্রী দেবী। স্বপ্ন-বশে, সুপ্তির স্বপ্নের ন্যায় জাগরণের স্বপনে, জীব আজীবন,—অশীতি লক্ষজন্ম, অনবরত গড়া-পেটায় ব্যস্ত। গড়ে, ভাঙ্গে, আবার গড়ে, পুনর্ব্বার ভাঙ্গিয়া আবার নূতন নির্ম্মাণ করে;—পুনঃপুনঃপুনঃ মুহুর্ম্মুহুর্ম্মুহুঃ স্বপ্নের সম্মোহন স্পর্শে, বিস্মৃতির ও বাসনার অসীম এবং অগাধ সলিল-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে, মানুষ তাহার মানস-পটে সত্য মিথ্যা, সুন্দর কুৎসিত, কত কতই বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত করে! সারি সারি সারি, সারবন্দী ছবি,—পরে পরে, স্তরে স্তরে, পরস্পরের পার্শ্বে এবং উপরে চিত্রের পর চিত্র, মানুষের মন যেন এক প্রকাণ্ড পিক্‌চার-গ্যালারি;—তথায় নিত্য নিত্য নিমেষে নিমেষে, স্বপ্ন-নির্ম্মিত নূতন নূতন ছবির আমদানী;—একখানি ম্লান ও মলিন হইতে হইতেই আর একখানি তাহার স্থানে উদয়, একটীকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আর একটীর গঠন, আলেখ্যের এক অঙ্ক মুছিয়া ফেলিয়া তথায় অপর অঙ্কের অঙ্কন,—ক্রমাগতই চলিয়াছে। কেবলই কি এক মনুষ্যজন্মে,—অসংখ্য সংখ্যাতীত যোনি-ভ্রমণেও উহা নয় কে বলিল!!

স্বপ্ন-রাজ্য শূন্যে; স্বপ্নকৃত সৃষ্টি শূন্য'পরে;—শূন্য তোমার সর্ব্বাগ্রগণ্য; অথচ তুমি বলিয়া থাক, "শূন্য আবার পদার্থটা কি?" শূন্যে এবং শূন্য হইতেই তোমার সাধ-আহ্লাদের এই সোণার সংসারটীর সব খানিই জানিবে। উহার সৃষ্টি শূন্যসংস্পৃষ্ট, স্বপ্নমূলক। স্বপ্ন অলীক, অর্থশূন্য নহে।

চেতনার রুক্ষ রৌদ্রময় রাজ্যে স্বপ্নের আধ-ঘুমন্ত ছায়াটুকুর লোভেই বোধ হয়, লোকে বাঁচিয়া থাকে; এ ছায়াটুকু না থাকিলে, যাতনাময় জগতে জীবের টিকিয়া থাকা ভার হইত। পাঞ্চভৌতিক চেতনার চাক্‌চিক্যে চক্ষু ঝলসিয়া যায়, প্রাণ চমকে,—স্বপ্নের ছায়া-মধ্যে মানুষ মানুষী মুখ লুকায়। যাতনার জীবন্ত, জ্বালাময়ী মূর্ত্তি, প্রত্যক্ষের অতি প্রচণ্ড রৌদ্র, ত্রিতাপের তীক্ষ্ণ তীব্র তেজ! জীবের জুড়াইবার স্থান কোথায়? কে সেই শীতল ছায়াময় স্থানটুকু লইয়া সতত তাহার সম্মুখে ঘুরেন? কে তাহার অজ্ঞাতে তাহাকে আদরে ক্রোড়ে তুলিয়া লন?

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু স্বপ্নরূপেণ সংস্থিতা"

তিনি। তিনিই, সেই ছায়াময়ী স্বপ্নমাতা; মৃদু মৃদু অতি মোলায়েম স্পর্শে,—জীবন্মৃতের প্রাণে কি এক অলৌকিক পুষ্পবাস বুলাইয়া দেন;—আপনার অঞ্চল খানি বাড়াইয়া দিয়া বলেন;—"বাছা! আমার এই আঁচলের আড়ালে এসে দাঁড়াও; এই ছায়ায় একটু শীতল হও।"

মায়ের অঞ্চল-ছায়ার মত জুড়াইবার স্থান জগতে আর কোথায় আছে! সংসার-সন্তাপের দাব-দাহে, স্বপ্নমাতার অঞ্চলাবরণ পাইয়াই জীব জীবিত থাকে। স্বপ্নের ছায়াময় রাজ্যের সহিত সংসারের এই কায়াময় রাজ্যের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

অজ্ঞাত দেশ, অজানা জায়গা, অপরিচিত মহাপ্রান্তর,—কোথায় স্বপ্নের ছায়াময় রাজ্য, আর কোথায় তুমি জড় জগতের শরীরী জীব! দূর দূর,—বহুদূর,—স্বপ্নলোক দেবলোকের কাছে! দেখি দেখি যেন,—দেখিতে পাই না; শুনি শুনি ঐ শব্দ,—স্বপ্ন-রাজ্যের অলৌকিক শব্দ,—শুনি শুনি শুনিতে পাই না,—অস্ফুট অস্পষ্ট, কিন্তু একেবারে অপরিচিত নয়;—ক্ষণে ক্ষণে যেন মনে হয়,—কবে কোন্ জন্মে ঐ শব্দ এই স্বর কাণে গিয়াছিল! পূর্ব্বপরিচয় যেন কিছু, উহার সহিত ছিল;—মনে পড়ে

পড়ে—পড়ে না; স্বপ্ন-রাজ্যে সংঘটিত সুদূর সম্বন্ধ-মানস-পট হইতে একেবারে এখন মুছিয়া গিয়াছে। সুদূর সম্বন্ধ স্মৃতির একটী অক্ষরের শতাংশের এক অংশ, একটী রেখার অত্যল্প ঈষন্মাত্র অস্পষ্ট চিহ্ন, মনের এক অন্ধকার কোণে হয়ত এখনও অবশিষ্ট আছে,—কিন্তু তাহা অবোধ্য, স্বপ্নের অস্পষ্ট শব্দ শুনিয়াও শুনিতে পাই না, শুনিলেও বুঝিতে পারি না; সে স্মৃতি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে; কত যুগ, কত মন্বন্তর মধ্যে ব্যবধান; সে মন নাই; অথবা মনের সে অংশ মুছিয়া গিয়াছে। স্বপ্ন-চ্ছায়ার সহিত কি ঐ অকস্মাৎ আসিয়া হৃদয়ে একটী আঘাত করিয়া অমনই তখনই সরিয়া গেল! স্বপ্নের ছায়া মহাশূন্যে মিশিয়া গেল; কিন্তু, ঐ মূর্ত্তি, ঐ মুখ যেন কখনও দেখিয়াছিলাম; এখন আর মনে নাই!

স্বপ্নের শব্দ, স্বপ্নের স্মৃতি, স্বপ্নের আদেশ,—স্বপ্নানীত পিতৃলোকের ও দেবলোকের বাণী; অতীতের এবং ভবিষ্যতের কাহিনী স্বাভাবিক; কিন্তু স্বভাবতঃ অস্পষ্ট, আলোক-আঁধারের কুয়াশায় আচ্ছন্ন,—আবছায়াময়। সে ছায়া আবার সাধারণতঃ ছিন্ন ভিন্ন;—শত সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে, খণ্ডাংশে বিভক্ত, বিশৃঙ্খল, বহুস্থানে এবং বহু বহু কাল ব্যবধানে বিক্ষিপ্ত;—কখনও একটী রেখা, ক্বচিৎ বা একটু রশ্মি তোমার অজ্ঞাতে অকস্মাৎ আসিয়া নয়ন-পথে পড়ে; মুহূর্ত্তে মেঘের মধ্যে বিজুলী খেলিয়া চলিয়া যায়, মেঘে ফুটিয়া মেঘেই মিলায়;—তুমি আলস্যে বা অসাবধানতায় অগ্রাহ্য করিয়া, সংসারের শত কার্য্যে ডুবিয়া অবিলম্বেই তাহা ভুলিয়া যাও।

সচরাচর স্বপ্নের বা স্বপ্নলোকের ছায়া এইরূপ,—পঞ্চভূতময় পৃথিবীতে এইরূপে প্রতিভাত। স্বপ্নের ইহা সাধারণ আভাস। কিন্তু উহার অসাধারণ প্রতিভাও কখন কখনও পৃথিবীপৃষ্ঠে পতিত হয়।

সময়ে সময়ে স্থান-কাল-পাত্র-বিশেষে স্বপ্নের ছায়া স্বচ্ছ, সুস্পষ্ট, উজ্জ্বল, শৃঙ্খলান্বিত এবং নিয়মিত। এই স্বচ্ছত্ব, সুস্পষ্টতা, ঔজ্জ্বল্য, শৃঙ্খলা এবং সুনিয়মের ন্যূনাতিরিক্ততা এবং তারতম্য হয়। যে সৌভাগ্যবান্ পুরুষ স্বপ্নের ছায়ালোক যে পরিমাণে দেখিতে পান এবং তাহার যতটুকু সদ্ব্যবহার করেন, তিনি সেই পরিমাণে অসাধারণ লোক। জগতের ইতিহাস ইহার সাক্ষী। মনুষ্য জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র, সাহিত্য ও সমাজের ইতিবৃত্ত, পরন্তু তাহার রাজনৈতিক ইতিহাস ইহা সপ্রমাণ করে।

যোগী যোগে,—সন্ন্যাসী সাধনায় স্বপ্নসিদ্ধ হন;—ক্বচিৎ সংসারীও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য-বলে সংসারাশ্রমে স্বপ্নের স্বচ্ছতা অনুভব করেন। দেবতা ভূর্লোকের হিতার্থে, হিত-কার্য্যসাধনার্থে, মানুষ-মানুষী-বিশেষে, স্বপ্ন দেখান; স্বপ্ন-সহযোগে সে কার্য্য সাধনোপযোগী শক্তি প্রদান করেন।

মুনি, মহর্ষি, মহাপুরুষ, পীর, পেগম্বর, প্রফেট্,—সেজ, শিয়ার, কবি, বীর;—সংসারে যাঁহারা অসাধারণ লোক বলিয়া অভিহিত, তাঁহাদের সকলেই স্বপ্ন-রাজ্যের সন্ততি;—সিদ্ধি ও সম্পাদিত কার্য্যের প্রকৃতি ও পরিমাণানুসারে কেহ শ্রেষ্ঠ, কেহ বা কনিষ্ঠ বলিয়া পরিচিত। ইঁহারা যে শক্তিপ্রভাবে বা যে প্রতিভার উত্তেজনায় পৃথিবীতে অলৌকিক বা অসাধারণ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম "Vision" বা "দিব্যচক্ষু" বা অমানুষী-দৃষ্টি, ভাষান্তরে "ইন্স্পিরেষণ"। বিবিধ আকারে এ শক্তির বিকাশ। ভিন্ন ভিন্ন দেবতা ভিন্ন অংশের অধিনায়ক বা অধিষ্ঠাতা। কিন্তু এ শক্তি মূলতঃ সর্ব্বক্ষেত্রে এবং সকল প্রকার আকারে স্বপ্ন-সম্ভূত।

স্বপ্ন-সমস্যার দার্শনিক-তত্ত্ব এ স্থলে আলোচনীয় নহে। আমরা স্বপ্ন-বিষয়ক কাব্যো-

পন্যাসও লিখিতেছি না। কিন্তু এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূতা স্বপ্নময়ী কন্যা সম্পূর্ণরূপে কাব্যোপযোগিনী। কিন্তু ইনি কবিকল্পিত নবন্যাসের নায়িকা বা আর কোনও অপার্থিব পদার্থ নহেন;—প্রত্যক্ষ পৃথিবীর পঞ্চতন্মাত্রময়ী, দেহ-মন-ইন্দ্রিয়ময়ী,—বালিকা, কিশোরী, যুবতী,—কুমারী। ইঁহার অত্যাশ্চর্য্য জীবন-বৃত্তান্ত কবি-কল্পিত নহে; প্রত্যুত কবি-কল্পনা হইতেও কদাচিৎ কোনও কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে বা মহাকাব্যে, এতাদৃশী-মহিমান্বিতা-নারী-চরিত্রের সৃষ্টি হইয়াছে! পাশ্চাত্য কাব্যোপন্যাসে ত হয়ই নাই;—প্রাচ্য-সাহিত্যে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ অঙ্কিত হইয়া থাকিবে,—কিন্তু এতাদৃশটী হয় নাই। অথচ ইনি আদৌ কবি-কল্পিতা কামিনী নহেন। স্বপ্নময়ী, ইহ-সংসারেরই সন্তান; ইঁহার জীবনী উপন্যাস নহে,—রৌদ্রময় রাজনৈতিক ইতিহাস;—অথচ উপন্যাস অপেক্ষাও কোমল, করুণ, আশ্চর্য্য, অলৌকিক, বৈচিত্র্য-বীরত্ব-বিভীষিকাময়,—ট্রাজিডির তীব্রতা অপেক্ষাও তীব্রতর।

অতীব দুঃখের বিষয়, ততোধিক লজ্জার কথা যে, ইংরেজের একমাত্র অমর কবি সেক্সপীয়র, স্বয়ং সেক্সপীয়র,—তাঁহার কোনও নাট্যকাব্যে * এই স্বপ্ন-কন্যার জীবন-কাহিনী অঙ্কিত করিতে যাইয়া কেবল কলঙ্ক কিনিয়াছেন। তিনি স্বদেশীয় স্বার্থপরতা বা তাৎকালিকা ইতরতা-প্রণোদিত হইয়া দৈববাণী-বাহিক, স্বদেশ-হিতৈষিণী সরলা কৃষকবালার স্কন্ধে কলঙ্কডালা দিতে গিয়াছেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। কলঙ্ক তাঁহার নিজের এবং নিজ-লেখনীরই হইয়াছে। তিনি কেবল ইতিহাসের অবমাননা করেন নাই, কাব্যাংশেও এ ক্ষেত্রে নিরতিশয় কলঙ্ক কিনিয়াছেন। যাঁহারা সেক্সপীয়র পাঠ করিয়াছেন, পরন্তু সেক্সপীয়রের নামমাত্রে, কাব্য-রস-স্পৃষ্ট হইয়া, যাঁহারা পুলকে নৃত্য করেন, সেক্সপীয়রের "ষষ্ঠ হেনরী" নামধেয় নাটকের প্রথম খণ্ডে অঙ্কিত Joan la Puecllo ওরফে Joan of Arc নাম্নী নায়িকার চরিত্র-চিত্রের প্রতি, তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করি। এই 'জোয়ান অব্ আর্কের" অতি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক জীবনীই এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত। ইনিই আমাদের অভিহিত 'স্বপ্নময়ী-কন্যা'। ইনি দেবীই হউন, আর দানবীই হউন, ইঁহার চরিত্র-অঙ্কনে, মহাকবি সেক্সপীয়র, একদিকে ঐতিহাসিক অসত্যপ্রচার এবং অপরদিকে, কাব্যগত রসের বিষম ব্যভিচার করিয়াছেন। জোয়ানীর চিত্র তিনি আরম্ভে যেরূপ আঁকিয়াছেন, তাহার সহিত উপসংহারের আদৌ সামঞ্জস্যাভাব। তৎকৃত এই চিত্র তৃতীয় শ্রেণীর কবির কুৎসিত চিত্র অপেক্ষাও কদর্য্য। পঞ্চদশ শতাব্দীর ইংরেজ-রাজনৈতিকেরা জোয়ান অব্ আর্কের দেহযষ্টির উপর পৈশাচিক পীড়ন করিয়া, দৈববাণী-বাহিকা বালিকা-বীরের জীবন্ত-দেহ তুষানলে দগ্ধ করিয়া যত পাপ করিয়াছিলেন,—রমণীর সর্ব্বস্ব ধন,—সেই নিষ্কলঙ্ক কুমারীর সতীত্বের উপর কলঙ্ক-কালিমা আরোপ করিবার প্রয়াস পাইয়া, সেক্সপীয়র তাহা অপেক্ষা অধিকতর পাপে পাপী হইয়াছেন। * কিন্তু সেক্সপীয়রের কাব্য-সমালোচনাও আমাদের উদ্দেশ্য নহে। পাশ্চাত্য পুরাবৃত্তের একটী অঙ্ক, একটী পরিচ্ছেদের একটী পৃষ্ঠা মাত্র আমরা পাঠ করিব। পুরাবৃত্তের এই পৃষ্ঠায় সংঘটিত ঘটনাবলী দ্বারা তাহার পরবর্ত্তী অনেক ঘটনাই অনুশাসিত। পরন্তু, ইয়ুরোপের একটী প্রথমশ্রেণীর সাম্রাজ্য-শক্তির ভাগ্য-লিপি, পুরাবৃত্তের এই

* King Henry VI. Part First.

* ভলটিয়ার ডিউমাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ফরাসী-লেখকেরাও জোয়ান অব্ আর্কের উপর, অজ্ঞতাবশতঃ অবিচার করিয়া গিয়াছেন।

পৃষ্ঠাতেই নির্ণীত হইয়াছিল। সেই ভাগ্য-লিপির নির্বন্ধিত্রী, পুরাবৃত্তের এই অঙ্কের ঘটনাবলীর পরিচালিকা এবং অধিনায়িকা এই প্রবন্ধের বিষয়। ইঁহার বৃত্তান্ত পড়িতে পড়িতে মুসলমান-নিপীড়িত রাজপুতনার হিন্দু ললনাদিগকেই অনেক স্থলে মনে পড়ে।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ;—প্রথমাংশ। ফরাসী-ভূমি পরাধীনতারূপ রাহু-গ্রস্ত। আংশিক গ্রাস,—অর্দ্ধগ্রাস,—প্রায় পূর্ণগ্রাস হয় হয় হইয়াছে। ফরাসী রাজধানী,—সমগ্র পৃথিবীর পাটরাণী পারীশ নগরে বৃটিশসিংহের বিজয়-পতাকা পত পত উড়িয়াছে। "রুল বৃটেনিয়া" ফ্রান্স-রাজ্যের প্রায় পনর আনা অংশ,—প্রধান প্রধান প্রদেশ এবং সমৃদ্ধিশালী নগর মাত্রই অপহরণ করিয়াছে ;—বহুস্থানে অধিকার ও আধিপত্য স্থাপন হইয়া গিয়াছে ; কোন কোনও নগর তখনও বেষ্টন ও আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে। ফরাসীজাতি বিজিত, বিড়ম্বিত। জাতীয়-শাসন গগনে বিলীন হইয়া গিয়াছে ;—বিজাতীয়-পীড়ন দিন দিন বর্দ্ধিত ও দৃঢ়বদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইংরেজরাজ পঞ্চম হেনরী ফরাসী-রাজকন্যার পাণিপীড়ন করিয়াছেন। ফরাসী-রাজ চার্লস উদ্বেগে এবং ইংরেজের উৎপাতে উন্মাদ,—উন্মাদ অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ফরাসী-রাজকুমার, যুবরাজ "ডফিন" চার্লস রাজধানী হইতে দূরীভূত ; নিজের পৈতৃক রাজ্য-মধ্যে লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়াইতেছেন। বিজয়ী রাজ-জামাতা হেনরী রাজ্য এবং রাজ-কন্যা দুইই দখল করিয়াছেন। যুবরাজ সৈন্য-সামন্তহীন বন্ধুবান্ধব-বিহীন,—চিনন দুর্গে জন কয়েক পারিষদ-বেষ্টিত হইয়া আমোদ আহ্লাদে মত্ত ;—দুর্ব্বল, নির্ব্বোধ, চঞ্চল, অব্যবস্থিত-চিত্ত, আলস্য-পরতন্ত্র ;—রাজ্যলাভাকাঙ্ক্ষী—স্বরাজ্যের অধিকারী। রাজ্যের আমীর ওমরা, রাজবংশের জ্ঞাতি-কুটুম্ব অনেকেই ইংরেজ-পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন ; ইংরেজের ধামা ধরিয়াছেন ; ইংরেজের হইয়া স্বদেশের ও স্বজাতির বিরুদ্ধে অসিচালনা করিতেছেন। ফরাসী জনসাধারণ বহুকালব্যাপী যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে,—অস্ত্রধারণে অক্ষম, উদাস। যুবরাজের পরামর্শদাতা ও পারিষদ যাঁহারা, তাঁহারা পরাজয় অপেক্ষা জয়ে অধিকতর ভীত। পঞ্চম হেনরী ইংলণ্ড ও ফ্রান্স দুই বিপুল রাজ্যের রাজ-মুকুটধারী রাজা। ইংলণ্ড স্বদেশ, সুতরাং তথায় অবস্থিত। ফ্রান্সে তদীয় প্রতিনিধি ডিউক অব্ বেড়ফোর্ড প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছেন। লর্ড টালবট ও লর্ড সাল্‌সবারী প্রভৃতি ফরাসীভূমে ইংরেজ-বাহিনীর অধিনায়ক ; ইঁহাদের আতঙ্কে ফরাসী প্রজা অজ্ঞান, আড়ষ্ট ; অষ্টপ্রহর প্রাণ হাতে করিয়া আছে। "টালবট" ও "সাল্‌সবারী" নাম শুনিবামাত্রই ফ্রান্সবাসী পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। ইংরেজ-ফরাসীর সহিত যেন ব্যাঘ্র-বালক সম্বন্ধ।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফ্রান্স রাজ্যের ও ফরাসীজাতির অবস্থা এই। এই সময়ে খৃষ্টীয় ১৪১২ অব্দে কোনও এক ফরাসী কৃষকের কুটীরে এক কন্যা জন্মে। কন্যার নাম "জেনী আর্ক" (Jeannea Arc *) এই কৃষক-কন্যা জেনী, ফরাসী জাতির সেই অধঃপতিত অতি হেয় অবস্থায় রাহুগ্রস্ত ফ্রান্স-রাজ্যে পুনর্ব্বার স্বাধীনতা ও শান্তি সংস্থাপন করেন। একটী গ্রাম্য বালিকা কিরূপে এই অসাধ্যসাধন করিলেন ?

ফ্রান্সে লোরেণ নামক প্রদেশ। লোরেণে ডোমরেমী নামে ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম। মিউস নাম্নী নদীর একটী ক্ষুদ্র শাখাপ্রবাহ ডোমরেমীর বক্ষ বহিয়া প্রবাহিত ;—এই ক্ষুদ্রপ্রবাহ ক্ষুদ্র

* সাধারণতঃ ইঁহাকে সকলে "জোয়ান অব্ আর্ক" বলে। এই কন্যা সমরপ্রাঙ্গণে পুরুষোচিত পরিচ্ছদ পরিধান ও শস্ত্র ধারণ করিতেন বলিয়া হয় ত "জেনী" হইতে "জোয়ান" ব্যুৎপন্ন হইয়া থাকিবে।

গ্রামকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। গ্রাম্য স্রোতস্বিনীর দক্ষিণ তীরে, একটী ক্ষুদ্র দুর্গ; দুর্গ,—কুটীর-পুঞ্জে পরিবেষ্টিত;—উহার (নদীর) উত্তর তীরে দেবালয়,—গ্রাম্য গির্জ্জা। গ্রাম্য নদী ও গ্রাম্য গির্জ্জার মধ্যবর্ত্তী স্থানে এক কুটীর;—এই কুটীরে জেনীর জন্ম;—৬ই জানুয়ারিতে তিনি জন্মেন। পিতার নাম ইশাবো আর্ক; জননী জাঁকো। কৃষক-পরিবার অবস্থাপন্ন, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। কুটীরের সান্নিধ্যেই বিস্তীর্ণ কৃষি-ক্ষেত্র; অশ্ব ও শকটশালা, গো-মেষাদির গৃহ।

জেনীর পিতা অবস্থাপন্ন গৃহস্থ; তাই বলিয়া জেনী নিষ্কর্ম্মা মেয়ে নয়। গৃহস্থালীর অনেক কাজ সে করে। গৃহকার্য্যে নিয়োজিত দাস দাসীকে সর্ব্বদাই জেনী সহায়তা করে; সময়ে সময়ে কৃষাণদিগের সঙ্গে ক্ষেত্রের কার্য্যও শিশু জেনী যথাসাধ্য করে। অশ্বশালা এবং শকটশালাতেও জেনী অনুপস্থিতা নয়; তথাকার শ্রমসাধ্য কার্য্যেও সে তাহার পিতার এবং ভ্রাতাদিগের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়ায়,—বালিকা-হস্তের বলটুকু, তাঁহাদের বলে মিশাইয়া দিয়া কাজ সারিয়া তুলে। জেনী সময়ে সময়ে মেষপালের রক্ষণাবেক্ষণ করে;—চারণ-ক্ষেত্রে তাহাদিগকে চৌকি দেয়। জেনী কর্ম্মিষ্ঠা, বলিষ্ঠা, বড়ই লক্ষ্মী মেয়ে।

বাহিরের কাজ কর্ম্ম করিয়া জেনী মায়ের কোলে যায়, চরকার কাছে বসিয়া রূপকথা শোনে। জেনী চরকা কাটে আর গল্প শোনে,—বালিকা ইহা বড়ই ভাল বাসে। দিবা অপরাহ্ন হইয়া যায়, রাত্রি দুই প্রহর বাজে, কত কত কতই ক্ষণ জেনী মায়ের কাছে বসিয়া আছে। চরকা চলিয়াছে, জেনী একমন একচিত্তে কাহিনী শুনিতেছে; দেব দেবীর কাহিনী, যুদ্ধের কাহিনী—সে-কালের কতই কথা। জেনীর আদরের নাম জেনেটী।

জেনেটী করুণাময়ী। দুঃখীর দুঃখ দেখিয়া কাঁদিয়া ভাসায়। দৌড়িয়া গিয়া তাহার যথাসাধ্য সাহায্য করে। জেনেটী অতিথি-পথিকের পরিচর্য্যা করে; নিজের গায়ের কাপড় লুকাইয়া পরকে দিয়া আপনি শীতে কাঁপে; পিতৃ-গৃহে সমাগত পথশ্রান্ত পথিককে আপনার শয্যাটী দিয়া নিজে মাটীর উপর শয়ন করে।

শৈশবকাল হইতেই জেনীর এই স্বভাব। শৈশবকাল হইতেই জেনী ধর্ম্মশীলা। স্বধর্ম্মের সমস্ত ব্রত নিয়ম সে পালন করে; উপবাস করে,—পূজা অর্চ্চনা, উপাসনা প্রার্থনায় তাহার ঐকান্তিক অনুরাগ; উহা নহিলে সে থাকিতে পারে না,—পূজা অর্চ্চনা উপবাসে জেনী এক দিনের জন্যও শ্রান্ত হয় না;—উহা যেন বালিকার বাল্যক্রীড়ার মত। জেনেটী ঘন ঘন দেবালয়ে যায়, দেবী মূর্ত্তির সম্মুখে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়া থাকে। বালিকা জেনীর এই ব্যবহার!

বালিকা জেনী বাল্যকালে এতাদৃক্ ধর্ম্মপ্রবণা বলিয়া সে বালক বালিকার সঙ্গ ও সমাজ ছাড়া নয়; পল্লীর সমবয়সী বালক বালিকাগুলিকে সে বড় ভাল বাসে; তাহাদের সহিত ক্রীড়া-কৌতুক নৃত্যগীত করে। ব্রহ্মচর্য্য-চারিণী বালিকা বাল্যসঙ্গ ছাড়া নয়।

কিন্তু, তবুও যেন এই বালিকা বড় চিন্তাশীলা। কেহ কোথায়ও নাই, জেনেটী নির্জ্জনে যুক্ত-করে, আকাশ পানে তাকাইয়া কি ভাবিতেছে;—অনন্তে আত্মা মিশাইয়া জেনেটী যেন কি অসীম স্বপ্ন দেখিতেছে!

সুবর্ণবর্ণ কচি কচি কুন্তলগুচ্ছ আলুলায়িত, বালিকার পৃষ্ঠোপরি পতিত। ধীর স্থির নিবিড়-নয়নে অনিমেষ অতলস্পর্শী ঊর্দ্ধদৃষ্টি, ক্ষুদ্র কর-পল্লব দু'টী অঞ্জলিবদ্ধ, বক্ষোপরি বিন্যস্ত; জেনেটীর মোলায়েম মুখ খানির উপর সুদূর স্বপ্ন-রাজ্যের সুবিমল কেমন এক কোমল ছায়া

আসিয়া পড়িয়াছে—সে ছায়া স্বচ্ছ, সুচিক্কণ, সুন্দর,—মেয়ের মুখ অধিকতর মোলায়েম করিয়াছে। যেন শারদীয়া উষার অর্দ্ধ-প্রস্ফুট সুনির্ম্মল একটী শেফালিকার মত সেই শৈশব-গম্ভীর মুখখানি,—নিঃশব্দ, নির্ম্মল, নিশ্চিন্ত, নিঃস্পন্দ! বালিকার নিমেষ-হীন নয়ন নিয়তির নির্ম্মম রাজ্য হইতে যেন কি নিগূঢ় প্রত্যাদেশের প্রতীক্ষা করিতেছে!—লাল টুকটুকে ওষ্ঠদ্বয় পরস্পরে দৃঢ় সংলগ্ন,—দেবলোক হইতে এক অপূর্ব্ব দিব্য দ্যুতি আসিয়া তন্নিয়স্থ কৈশোর হাসিটুকুর সহিত মিশিয়া কেমন এক কোমল-মধুর গাম্ভীর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে; আরক্তিম গণ্ডে, তুষার-ধবল কপোলে, বালিকার সুললিত ললাটে-দেশে স্বপ্নদেবী যেন স্বয়ং উপস্থিতা, অমিয়মাখা অঞ্চলখানি আধ আধ এলাইয়া ক্রীড়া করিতেছেন;—এক একবার কাণে কাণে কি গোপনীয় কথা কহিয়া সস্নেহে সন্তানের মুখ চুম্বন করিতেছেন! দশদিকে "নিসুতি" নিশীথের নিবিড় ছায়া প্রচ্ছন্নতার. পবিত্র প্রগাঢ়তা! সুপ্তির ক্রোড়ে সমগ্র সংসার সহ ফরাশী ভূমির সমাধি হইয়াছে;—জেনেটী,—জেনেটীর এই মোহ-মন্ত্র-মুগ্ধ-মধুরমূর্ত্তি উন্মুক্ত আকাশ তলে নিস্তব্ধ নিশীথকালে, ভূমি-স্পৃষ্ট-জানু, উপবিষ্ট! মহেশ্বরের মহাধ্যানে নিমগ্ন, অনিমেষে আকাশ পানে তাকাইয়া অনন্তদেবকে দেখিতেছে। অসীম স্বপ্ন-প্রবাহে সোণার জেনী যেন কোন্ অজ্ঞাত দেশে ভাসিয়া চলিয়াছে। যেন শ্বেত মর্ম্মরে ক্ষোদিত একখানি কৈশোরপ্রতিমা, যেন মধূখনির্ম্মিত একটী পুত্তলিকা-মূর্ত্তি; যেন স্বপ্ন-রাজ্যের ছায়ায় গঠিত একখানি বালিকা-দেহ স্বপ্নমায়ের কোলে বসিয়া স্বপ্নমাতার স্তন্য দুগ্ধ পান করিতেছে! সন্তানের শিরে দেব-লোক হইতে আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইতেছে।

কৃষক-বালা ক্ষুদ্র জেনেটীর এইরূপ জাগ্রত-স্বপ্ন শৈশবাবধিই হইত; সর্ব্বদাই হইত। অল্প অল্প অল্প, ক্রমে স্বপ্ন-রাণীর প্রচ্ছন্নমূর্ত্তি জেনীর সম্মুখে অধিকতর প্রকাশ। শৈশব হইতে জেনী যথার্থই স্বপ্ন-মাতার স্তন্য-দুগ্ধে পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন!

ঐ দেখ স্বপ্নের পালিতা কন্যা জেনী যীশু-খৃষ্টের ক্রুশ-পার্শ্বে পতিতা মূর্চ্ছিতা,— তাহার প্রাণবায়ু দেহ ছাড়িয়া এ পৃথিবী ছাড়িয়া কোন্ অজ্ঞাত পৃথিবীতে পিতৃলোকের দেবলোকের আজ্ঞা পালন করিতে গিয়াছে। দিনের পর দিন যায়—জেনী জাগে না। আবার দেখ, ঐ জেনী জাগিল। স্বপ্নরাণী কাল-সাগর পারের সুদূর পথ হাঁটিয়া জেনীর জীবনটুকু জড়-জগতে পুনঃ বহন করিয়া আনিলেন।

মূর্চ্ছাভঙ্গের পর আবার যে জেনী, সেই জেনী। জেনী মেষশাবক লইয়া খেলা করিতেছে। কৃষাণ কৃষাণীর পার্শ্বে বসিয়া শস্য-ক্ষেত্রের কণ্টক বাছিতেছে। কিন্তু জেনীর জীবন আর তাহার আত্মবশে নাই। সে জীবন তাহার স্বপ্নমাতা কর্ত্তৃক ফরাশীর স্বদেশ উদ্ধারার্থ দেবপদে উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। জেনী আর আত্মবশে নাই। গৃহে, ক্ষেত্রে, নদী-তীরে, প্রান্তরে,—চরকা কাটিতে কাটিতে, জননী-ক্রোড়ে কাহিনী শুনিতে শুনিতে, কাজ করিতে করিতে, মেষ চরাইতে চরাইতে জেনী অকস্মাৎ এ জগৎ ছাড়িয়া স্বপ্ন-জগতে গমন করেন। নেত্র ঊর্দ্ধে, করপুটবক্ষে জেনী জানুপরি বসিয়া কি অজ্ঞাত-উপাসনা-নিমগ্না। বালিকার সেই স্বপ্ন-প্লাবিত মূর্ত্তি কি সুন্দর! দেব-লোক-প্রেরিত জ্যোতি যেন অঙ্গে অঙ্গে ফুটিয়া উঠিতেছে। বালিকা যেন স্বর্গের আশীর্ব্বাদ-সলিলে অবগাহন করিতেছেন!!

পিতৃ-লোকের প্রত্যাদেশ, দেব-লোকের দৈববাণী,—স্বপ্নের শব্দ!! শব্দ, ঈষত্তর, ঈষৎ-অস্পষ্ট;—অত্যল্প-উচ্চ—আর একটু উচ্চতর, স্পষ্ট,—সুস্পষ্ট!

শব্দ সুস্পষ্ট, ছায়া স্বচ্ছ, স্বচ্ছতর। স্বপ্নরাণী তাঁহার প্রচ্ছন্নতার পরিচ্ছদটী সন্তানের সম্মুখ হইতে যেন কিঞ্চিৎ সরাইয়াছেন!

"জেনী! বাছা! জাগ, ফারাশীভূমি জাগাও।"

"লোরেণ-সীমায় সূর্য্য উঠিয়াছে। আঁধার ওক-অরণ্য হাসিতেছে! কুমারী কে তুমি? তুমি, তুমি, তুমি, তুমিই সেই!"

"রাজ-সিংহাসন বন্যসিংহে গ্রাসিয়াছে! সিংহের পেট চিরিয়া সিংহাসন বাহির কর;—বসিবার জন্য রাজকুমারকে পাতিয়া দাও!"

"উঠ, স্বপ্নময়ী উঠ। রাজবংশ খুঁজ। সমর-প্রাঙ্গণে দাঁড়াও। শোণিত-স্রোতে শোণিত-অঞ্জলি দিয়া সেণ্ট মাইকেলের তর্পণ কর।" *

কি সর্ব্বনাশ!!

গ্রাম্য-কৃষকের কন্যা; কাঁচা-মেয়ে; সামান্য মেষপালিকা; শতবর্ষের সুদৃঢ়-বদ্ধমূল ইংরেজ-শাসনের সুদীর্ঘ বিরাটবৃক্ষ উৎপাটন করিবে। সংসার-বিজয়ী ইংরেজ-সৈন্যের শোণিতে সেণ্ট মাইকেলের তর্পণ করিবে! বৃটিশসিংহের বুক চিরিয়া ফ্রান্সভূমির স্বাধীনতা বাহির করিবে! ইংরেজ-সম্রাটের মাথা নোয়াইয়া ফরাশী রাজমুকুট উদ্ধার করিবে! ক্ষুদ্র গ্রামের এই ক্ষুদ্র বালিকা!!

হায়! একি সাংঘাতিক স্বপ্ন!!

খৃষ্টীয় ১৪২৫ অব্দ;—জেনী সবে এই তের বছরে পড়িয়াছে। বালিকার প্রতি এই বিষম প্রত্যাদেশ!!

স্বপ্নময়ী স্বপ্নে আবৃত। স্বপ্নরাজ্যের নিগূঢ় রহস্য কে বুঝিবে! অদৃষ্টের দ্বার দৃঢ় রুদ্ধ! ভবিতব্য-লিপির অক্ষরাবলী—হায়! কে পড়িবে!!

স্বপ্ন-কন্যা স্বপ্নাবেশে আচ্ছন্ন,—স্বপ্নাবেগে আলোড়িত! সে আবেশের,—সে আবেগের দৃশ্য-পট কে আঁকিবে! কন্যার সেই কৈশোর স্বপ্নোদ্বেলিত হৃদয়োচ্ছ্বাস কবি-কল্পনার অতীত; বৈজ্ঞানিক তাহার কি বিশ্লেষণ করিবেন! সে উচ্ছ্বাস, সে উত্তেজনা, সে স্মৃতি, সে ছায়া, আর হায়! সেই শব্দ, সুরলোকের সেই শব্দ,—বাক্য-যোজনায় বা বর্ণবিন্যাসে কে বুঝাইবে? প্রকৃতি-দেবীর প্রচ্ছন্নতাবরণ সরাইবার সাধ্য যদি তোমার আমার থাকিত; প্রারম্ভের পবিত্র, অজ্ঞাত এবং অনাবিষ্কৃত কক্ষে যদি যাইতে পারিতাম; অন্ধকারের অভেদ্য দ্বার যদি

---

* ১৪২৫ হইতে ১৪২৮ অব্দ,—এই তিন বৎসর জোয়ান অব্ আর্কের প্রতি দেব বা পিতৃলোকের প্রত্যাদেশ প্রায়ই সময়ে সময়ে সমাগত হইত। জেনী কেবল স্বপ্ন দেখিতেন না, দেবাদেশের শব্দ শুনিতে পাইতেন বলিয়াও কথিত আছে। আরও কথিত আছে যে, এই কুমারীর প্রতি প্রত্যাদেশ প্রধানতঃ ফরাশী-সৈন্যবলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সেণ্ট মাইকেলের নিকট হইতে সমাগত হইত। প্রাচীন জনশ্রুতি ছিল যে, লোরেণ-প্রান্তস্থ-ওক-অরণ্য হইতে এক কুমারী আবির্ভূতা হইয়া ইংরেজের হস্ত হইতে ফরাশী উদ্ধার করিবেন। জোয়ানের নিকট প্রেরিত প্রত্যাদেশ এই জনশ্রুতির সম্যক্ সমর্থন করাতে, সুতরাং লোকে তাহাতে বিশ্বাসবান্ হয়। সর্ব্বোপরি জোয়ান অব আর্কের ইহা ধ্রুব ধারণা জন্মে যে, তৎকর্ত্তৃক ফরাশী-ভূমির অধীনতা-বন্ধন মুক্ত হইবে।

জোয়ান অব্ আর্ক কর্ত্তৃক দৈববাণী-শ্রবণ-সম্বন্ধীয় আখ্যায়িকা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক; জোয়ান অব্ আর্ক যে স্বীয় শক্তিতে অজেয় ইংরেজ-সৈন্য পরাজিত এবং শতবর্ষব্যাপী ইংরেজরাজত্ব উন্মূলিত করিয়া ফরাশী জাতির স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক প্রত্যক্ষ সত্য। তদানীন্তন দুর্ব্বল ফরাশী জাতির সেই সুদীর্ঘ দাসত্বের অবস্থায় এরূপ দুরূহ কার্য্য সামান্যা কৃষককন্যা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হওয়া একান্তই অসম্ভব। সুতরাং জোয়ানের দৈব-শক্তির উপর অগত্যাই বিশ্বাস আসিয়া পড়ে। কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক যে, দৈববল অন্তরালে থাকিলেও কার্য্যক্ষেত্রে জোয়ান, মানুষের স্বাভাবিক বল-বুদ্ধি ভিন্ন অন্য উপায় অবলম্বন করেন নাই।

উন্মুক্ত হইত; মহাকাল যদি মুহূর্ত্তের জন্য সরিয়া দাঁড়াইতেন; আর, হায়! আমরা যদি ভবিতব্যের ভাষা জানিতাম,—তবেই না বুঝিতে পারিতাম,—বালিকা তখন কি ভাবে বিভোর হইয়া, স্মৃতি-বিস্মৃতির, দৃষ্টাদৃষ্টের এবং সংসার ও স্বপ্নের সংমিশ্রিত, শতাবর্ত্তময়, সুখদ অথচ সাংঘাতিক স্রোতের উপর ভাসিতেছিল! তবেই না বুঝিতে পারিতাম, ভবিতব্য তখন তাহার সম্মুখে, কি পরিমাণে নিজের ভীষণমূর্ত্তি উন্মুক্ত করিয়াছিলেন! হায়! তবেই না বুঝিতে পারিতাম, স্বপ্নময়ী স্বপ্নাকাশের কোন্ সোপানে দাঁড়াইয়া সৃষ্টিসংহারের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন!

স্বপ্নবাহিনী স্বপ্ন-বেষ্টিতা। এক, দুই, তিন, চারি বৎসর। বাল্য অতিবাহিত; বালিকা কিশোরী; কৈশোর কালও ক্রমে উত্তীর্ণ। কিশোরী নব-যুবতী। জেনেটীর দেবদ্যুতি-বিধৌত দেহে নব-যৌবনের সঞ্চার হইয়াছে! স্বপ্নস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কন্যা, বয়ঃক্রমের সপ্তদশ বর্ষে উপস্থিত।

জেনীর জীবন দেবপদে উৎসর্গ;—দেব-কার্য্য-সাধনের জন্যই তাঁহার যৌবন। জীবনের অতি কঠোর কার্য্য এখন উপস্থিত। জেনীর যৌবন জনোচিত যৌবন-বিলাসের জন্য নহে;—ভীষণ রণক্ষেত্রে পিতৃলোকের প্রত্যাদেশ বহন করত ইংরেজবাহিনী বিতাড়িত করিয়া স্বদেশ উদ্ধার করিবার জন্য! আর হায়! নিয়তিবশে, এই নবযৌবনরাশি জলন্ত হুতাশনে আহুতি অর্পিত হইবার জন্য আজ জেনেটীর কৈশোর অঙ্গে অঙ্কুরিত। ভবিতব্যলিপি কে মুছিবে!

জেনেটী সুন্দরী,—সুন্দরী-সমাজেও সুন্দরী; শতটীর মধ্যে একটী। জেনী যুবতী, সপ্তদশ বর্ষীয়া। জেনী অবিবাহিতা,—কুমারী। কুমারীর বিবাহ সংসারে আর কাহারও সহিত হয় নাই;—হইয়াছিল একাধারে স্বদেশ-ভক্তি, স্বদেশের স্বাধীনতা, অসি-কৃপাণ এবং অস্ত্রের সহিত। কুমারীর কঠোর ব্রত উদ্‌যাপনের সময় আগত!

স্বপ্ন-প্লাবিত প্রত্যাদেশ পূর্ণ, প্রগাঢ়;—পুনঃ পুনঃ পুনঃ সমাগত! উত্তেজনা উগ্র,—অত্যুগ্র;—অসংবরণীয়!

উপায় কি? গ্রাম্য বালিকা গ্রামের বাহিরে কখনও যায় নাই। পিতৃগৃহের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী শস্য-ক্ষেত্র বই আর কিছুই দেখে নাই। গৃহ কুটীর শস্যক্ষেত্র আর গ্রাম্য গির্জ্জা,—ইহাই তাহার পৃথিবী, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড। ইহার তাহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সীমা। ইহাই বাহিরে আর কিছু বলিয়া সে বড় জানে না; যদিও তাহার কিছু শুনিয়া থাকে, সে তাহা দেখে নাই। শস্য-ক্ষেত্রের কৃষাণ-কন্যা সমর-ক্ষেত্রের কি জানে? রাজা, রাজদরবার, রাজ-নীতির কি বুঝে? গ্রাম্য-বালিকা সন্ধি বিগ্রহ সংগ্রামের, স্বদেশের ও বিদেশের কি জানে? তার বাপই জানে না; তা ত সে! জেনী "ক" হইতে "খ" পর্য্যন্তই জানে না; তা এ সকলের কি জানিবে!—জেনী যাইবে কোথায়!

তাহার চিরপরিচিত, প্রিয়, বড় আদরের গ্রামটুকু, গির্জ্জাটী, তাহার স্নেহ-প্লাবিত কুটীরের কোণটুকু, মায়ের ক্রোড়টুকু, চরকাটী, মেষ-শাবকগুলি, সমবয়সী বাল্য-বন্ধুগুলি ছাড়িয়া জেনী কোথায় যাইবে! তাহাকে কে লইয়া যাইবে! জেনী কিরূপে পথ হাঁটিবে। অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ সে ত জন্মেও কখনও করে নাই। ইংরেজ-জুজুর ভয়ে দেশের বড় বড় বীর বিবরে লুক্কায়িত। কাঁচা মেয়ে কেমনে পথে উঠিবে। আর পথে উঠিয়াই বা সে যায় কোথায়! কিন্তু কঠিন কঠোর আদেশ! জেনীর কেশে ধরিয়া যেন কে বলিতেছে,—

"যাও, যাও, যাও"—"এখনি গৃহের বাহির হও!"

* * *

মহা-কালের করাল কুক্ষি। ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নাম্নী নদীত্রয়ের সংগোপনীয় সঙ্গমস্থল,— অকূল কুয়াসা-সাগরে সমাবৃত। দিগ্দেশ কালাকাল পরিমাণ পরিমেয় পরিশূন্য এক শূন্য পারাবার, আধার-আধেয়-উপাধি-বিরহিত অসীম আকাশ, অনন্তে সংলগ্ন। এক মানব-কন্যা এই অসীম আকাশের শূন্য-সাগরে ভাসিতেছে। অদৃষ্টের অনন্ত উদরমধ্যে সে একাকিনী ভ্রমণ করিতেছে। অদৃষ্টের মহা মধ্যস্থলে অকস্মাৎ যেন ঐ কি দৃষ্ট। না কিছুই না। উহা অদৃষ্টের অজ্ঞাত একটী আঁধার তরঙ্গ। আঁধারের অভ্যন্তরে পূর্ণ, প্রস্ফুট ঘোর অন্ধকার-কালিমাময়ী এক দেবীমূর্ত্তি। দেবী অন্ধকারে অট্টহাসিনী। কাল জগৎ সংহার করিতেছেন। মহাকালী কালের কুক্ষি-উপরি দাঁড়াইয়া কালকে হনন করিতেছেন!! ভীষণ দৃশ্য! ভৈরবীর ভবভয়নাশিনী ভয়ঙ্করী আদ্যা-মূর্ত্তি। কাল কুক্ষির কূটস্থিতা মহাকালীর কালমর্দ্দিনী তামসময়ী করাল-প্রতিমা কন্যার সম্মুখে প্রতিভাত। কন্যা চমকিল।

কন্যা আতঙ্কে অস্ফুটস্বরে ডাকিল,—"মা!" করালবদনার খড়্গা-স্খলিত একবিন্দু জ্যোতি সেই বিরাট অন্ধকার-কক্ষে কন্যার কোমল অঙ্গ স্পর্শিল; অঙ্গে অজ্ঞাতে মিলাইয়া গেল। কন্যা কাতরে ডাকিল 'মা'!

স্বপ্নরাণী অদৃষ্টের অন্ধকার অবগুণ্ঠন আর একবিন্দু উত্তোলন করিলেন। কন্যা দেখিলেন, আকাশ-পটে অঙ্কিত! কি? আকাশগাত্রে অঙ্কিত সংহার এবং শোণিত; তাহার পার্শ্বে অঙ্কিত হুষ্টি, শান্তি, রাজসিংহাসন,—ফরাসী-জাতির রাজা!

অদৃষ্টাবগুণ্ঠন পুনঃ ঈষদ্ উন্মুক্ত,—একি ভীষণ ভবিতব্য! আকাশপ্রান্তে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড! উচ্চচূড় এক গৃহের বহিঃ বিবর হইতে, ভীমকায় এক রাক্ষস কুবিয়া বাহির হইল। রাক্ষসের আজানুলম্বিত ধর্ম্মের কপট কৃষ্ণাবরণ, হস্তে ধর্ম্মনামাঙ্কিত অধর্ম্মের ধ্বজা! কন্যার কেশে ধরিয়া হস্ত পদ বন্ধন করিয়া, এই রাক্ষস অনতি দূরস্থিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল!!!

"আইস বৎসে" বলিয়া অগ্নিদেব বক্ষ পাতিয়া দিলেন। দেব-দ্যুতিতে অগ্নিকুণ্ড অমৃতকুণ্ডে পরিণত হইল। কন্যা স্বপ্নস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে সে কুণ্ড ভেদ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল!

জেনী তাহার এই জাগ্রত স্বপ্নের কতক বুঝিলেন, কতক বুঝিলেনও না। কিন্তু জেনী আর সেই গ্রাম্য কুটীরে নাই! *

চিনন্-দুর্গ। দুর্গ দ্বারে কোথা হইতে কে এক কৃষককুমারী আসিয়াছে, যুবরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়।

রাজ্যহীন রাজদরবার, দুর্গাভ্যন্তর, প্রায় অন্তঃপুরবাসিনী অবলার মত অবস্থিত। আগন্তুকার কথা শুনিয়া দুর্গস্থ দরবারের দরবারীরা দুই চারিবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করিলেন। যেন এক বিন্দু বিস্ময় রসের আবির্ভাব হইল। যুবরাজের অন্যতম অমাত্য ডিউক অব আঞ্জু আগন্তুকার আলোচনা-প্রসঙ্গে অধরপ্রান্তে হাস্যরসের ঈষৎ রশ্মি ফুটাইয়া বলিলেন;—"শুনিলাম এই রমণী সুন্দরী।" এক ইহার অবসর বুঝিয়া বলিল,—"মাইরি বোলছি, যুবতী"!

অপর অমাত্য ডিউক অব এলেন্কো দেখিলেন, সমালোচনার স্রোতটা বড় সুপথে যাইবার গতি নহে। তিনি আগন্তুকার প্রকৃত পরিচয়ের কথা পাড়িয়া কথোপকথনের তরল স্রোতটা একটু প্রগাঢ়তার দিকে টানিয়া কহিলেন,—"হাঁ, ইনি সুন্দরী এবং যুবতীও বটেন। কিন্তু

* জোয়ানঅব্ আর্ক গৃহ হইতে ফরাসী-যুবরাজের রাজসভায় (চিনন্নগরে) এক সামন্ত (Knight of Sanconliurs) কর্ত্তৃক নীত হন। জোয়ানের ভ্রাতা-দ্বয় তাহার সঙ্গে গিয়াছিলেন।

এই রমণী দেবদাসী। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি,—অর্লিয়নস্ আপন চক্ষে ইঁহার অভূতপূর্ব্ব,—-—"

ইংরেজ-কারারুদ্ধ ডিউক অব অর্লিন্সের উপযুক্ত পুত্র কনিষ্ঠ অর্লিয়েন্স কক্ষান্তরে ছিলেন, ডিউক অব এলেঙ্কোর কথা শেষ হইতে-না-হইতেই রাজ-সভায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন—, "যুবরাজের জয় হউক। জয় নিশ্চয়ই হইবে। যে আগন্তুকার কথা এলেঙ্কো কহিতে-ছিলেন, ইঁহার অদ্ভুত শক্তি আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ইনি যথার্থই দেবদাসী। ফরাসী ভূমির পরিত্রাণের জন্য, দেবলোক হইতে দেবাদেশ বহন করিয়া আনিয়াছেন। ইনি কৌমার্য্যের কঠোর ব্রতধারিণী; পবিত্র দেহ-মন হৃদয়, বিশুদ্ধাত্মা ব্রহ্মচারিণী।" পারিষদদিগের মধ্য হইতে অপর এক ব্যক্তি উঠিয়া বলিলেন, "আমি শুনিয়াছি, ইনি নাকি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালের কথা কহিতে পারেন।"

"তা ইনি যিনিই হউন"—যুবরাজ রাজ-জ্যোতিহীন ম্লান মুখখানি এতক্ষণে স্ফুরিত করিয়া কহিলেন,—"তা ইনি যিনিই হউন, সর্ব্বজ্ঞতার পরিচয়টী সর্ব্বাগ্রেই লওয়া চাই! আঞ্জু! আপনি আমাদের স্থান অধিকার করুন। আমরা সকলের পশ্চাতে যাইয়া বসি। কুমারী আসিয়া চিনিয়া লউন, কে রাজা। তিনি রাজার সঙ্গেই ত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

যুবরাজ মলিন-বেশে সভাসদদিগের সকলের পশ্চাতে যাইয়া মুখাবনত করিয়া উপবেশন করিলেন। আঞ্জু রাজাসনে রাজার মত রাশভারি করিয়া বসিলেন।

আপাদ মস্তক শুভ্র-বসনাবৃতা, দক্ষিণহস্তে শ্বেতপতাকা, যেন কায়াহীন একটী ছায়া, স্বপ্ন-স্রোতের প্রবাহ বক্ষে করিয়া, সভামধ্যে উপনীতা। অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি!! দেবলোকের একটী দিব্য দ্যুতি যেন পবিত্র প্রভাত-বায়ুপূর্ণ করিয়া তথায় প্রতিভাত হইল। সকলে অবাক্, আত্মহারা!! আঞ্জু অতি চেষ্টায় চিন্তাসূত্র-গ্রথিত পূর্ব্বস্মৃতি পুনঃ জীবিত ও বাক্যস্ফুরিত করিয়া আগন্তুকাকে আহ্বান করিলেন;—

"আপনিই কি আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন?"

আগন্তুকা এ কথার কোনই উত্তর না দিয়া কোনও আহ্বান উপলক্ষ বা ইঙ্গিতেরই অপেক্ষা না করিয়া, ছদ্মবেশী যুবরাজের সম্মুখে ছায়াবৎ সরিয়া গেলেন। জানুস্পৃষ্ট হইয়া যুবরাজকে অভিবাদন করিলেন;—ধীর-সংযত স্বরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন;—"রাজন্! আপনি অনর্থক আত্মগোপন করিতেছেন কেন? আকাশপটে আপনাকে যে আমি অনেকবার অবলোকন করিয়াছি। আমি গ্রাম্য স্ত্রীলোক, গ্রাম্য কৃষকের কন্যা। গ্রাম্য কুটীরে জন্মিয়া, গ্রাম্য কুটীরেই লালিত পালিত হইয়াছি; রাজ-সভা কখনও দেখি নাই। রাজসভার সূক্ষ্ম কৌশলও অবগত নহি। কিন্তু এ কি দেখি! আপনি আত্মগোপন করিয়া অনুপযুক্ত স্থলে উপবিষ্ট। ডিউক অব আঞ্জু আপনার স্থান অধিকার করিয়া আমায় প্রতারিত করিতে অভিলাষী! আমি প্রতারিতা হইতে পারি; কিন্তু প্রভু! পিতৃলোকের প্রত্যাদেশ ত প্রতারিত হইবার নহে! ভবিতব্যকে কে ভুলাইবে!"

শঙ্কা-সংমিশ্র সম্ভ্রমে সমগ্র সভা শিহরিল। যুবরাজকে সম্বোধিয়া কুমারী পুনঃ কহিলেন,—"আমি আপনাকে দেবলোকের আদেশ অবগত করিতে আসিয়াছি। অন্তরালে তাহা ব্যক্ত করিবার প্রার্থনা করি।"

যুবরাজ আত্মহারা; অজ্ঞাতে চিত্রপুত্তলির মত উত্থিত হইলেন। যেন স্বপ্নবশে, স্বপ্নের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কুমারী সভাস্থ লোক-দিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক একবিন্দু অপেক্ষা করুন। ইনি

এখনই আবার আসিবেন। কুমারী কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। রাজপারিষদমণ্ডলীতে যেন প্রলয়-প্রবাহ বহিয়া গেল। কুমারী কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন; যেন এখানকার সবই তাঁর পরিচিত। অথচ জন্মাবধি এ স্থান তিনি কখনও দেখেন নাই। কথোপকথন নিমেষ মধ্যে সাঙ্গ হইয়া গেল। ছায়াময়ী স্বপ্নমধ্যে মিলাইলেন।

* * * *

সংসারে আর যাহা কিছুরই অভাব থাকুক; ইয়ার ও ইয়ারকির অভাব কোন কালেই নাই। বিশেষতঃ ফরাশী-জাতির পক্ষে ইয়ারকিটা জীবন-বহনের একটা মূল অবলম্বন। ফরাশী মরিবার কালেও একটু ইয়ারকি দিয়া লয়। ইংরেজ অন-ইয়ার; ফরাশী অতি-ইয়ার।

"ছুঁড়ীর কি সাহস!! ইহার সৌন্দর্য্য অপেক্ষা সাহসের কিংবা সাহস অপেক্ষা সৌন্দর্য্যের সুখ্যাতি করিব, মি—লর্ড?" এক ইয়ার ইয়ারকির সুরে ডিউক অব্ আঞ্জুকে কহিল।

আঞ্জু। তা দুইই সমান। এমন স্বপ্নময়ী শোভা আমি আর কখনও দেখি নাই। এমন অসীম সাহসও আজ মাত্র কেবল দেখিলাম। সাহসে এই সুন্দরী সভা জয় করিয়াছেন।

"ইংরেজকেও জয় করিবেন। অর্লিন্স কহিলেন;—"আপনারা যাহা দেখিয়া জড়ভরত হইয়াছেন, ইংরেজ তাহারই তীব্রতাপে মক্ষিকা-বৎ মরিবে, আর পালে পালে পলাইবে।"

"কিন্তু আমরা যে পরাজয় অপেক্ষা জয়কে আজকাল অধিক ভয় করি। ইংরেজের হাতে পরাজিত হইয়া তবুও পিতৃভূমির ভিটায় উপবাস করিতেছি; কিন্তু, জয়ে যে জীবনসংশয় পরাজিত ইংরেজ যে পাপ অপেক্ষাও প্রচণ্ড।" অমাত্য এলেস্কো অতি গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন।

ইয়ার আবার কহিল, সুন্দরীর "ত্রিকালজ্ঞতার ন্যায় ত্রিভুবনবিজয়ী যৌবনও বারেক পরীক্ষণীয়।"

আঞ্জু। যুবরাজ যৌবনেরও যথোচিত পরীক্ষক। কিন্তু, কে কার পরীক্ষা করে বলা যায় না। সটান সাহসের জোরে, পাইয়া ত বসিয়াছে দেখিতেছি খুব। রূপের ভারে ডফিনের দফারফা করিয়া আমাদিগকে শেষে খুন না করে। রকম বড় ভাল নয়। এই সর্ব্বনাশী-দের জিহ্বায় যমপুরের জীবন্ত জ্যোৎস্নার বসতি।

এলেস্কো। হাঁ তা বটে। কিন্তু কৌতুকের কথা নয়। অর্লিয়েন্স, তুমি কি মনে কর যে, প্রবীণ সেনাপতি যাহা যুক্তিসঙ্গত বলিতেছেন না; এক নিরক্ষরা না-বালিকা রমণীর কথায় সেই কার্য্যে নামা উচিত। না কখনই না। তা হইতেই পারে না।

অর্লিয়েন্স। ইনি দৈববাণী শুনিয়াছেন।

এলেস্কো। দৈববাণী সমর-বিদ্যা নহে। তাহাতে শিক্ষা চাই। এই সুন্দরীর সামরিক শিক্ষা কি আছে যে, আমরা ইহার ইঙ্গিতে সমর-সাগরে ঝাঁপ দিব।

আলয়েন্স। অপেক্ষা করুন। যুবরাজ যেরূপ বুঝেন এবং আপনাদের যাহা মন্ত্রণা হয়, তাহাই হইবে। যুদ্ধটা ত আর মুখের কথা নয়।

মো-সাহেব। মেয়ে মানুষের কি আর তা সাধ্য!

আলিয়েন্স। মোসাহেবেরই সাধ্য।

* * * *

"নির্জ্জন কক্ষে যুবরাজের সহিত কুমারীর কি কথাবার্ত্তা হইতেছিল?" আঞ্জু আমাত্যের আদবকায়দার সহিত যুবরাজকে জিজ্ঞাসিলেন।

যুবরাজ। আমি এই কুমারীর দৈবশক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইয়াছি। ইনি ইংরেজের সহিত

জোয়ান অব্ আর্ক।



যুদ্ধ করিতে উত্তেজিত করেন। অর্লিয়েন্স হইতে আক্রমণ আরম্ভ করিতে পরামর্শ দেন। রিয়ামে যাইয়া আমাদিগকে রাজমুকুট ধারণের অনুরোধ করেন।

আঞ্জু। যুবরাজের অভিপ্রায়?

যুব। আমাদের অভিপ্রায় অবশ্য মন্ত্রণা-সাপেক্ষ। কিন্তু ইহাঁর উত্তেজনা অমানুষিক।

এলেঙ্কো। অর্লিয়েন্সে ইংরেজ-আক্রমণ ও রিয়াম গমন উভয়ই শক্ত কার্য্য। ইহার একটীও রাজনীতি-অনুমোদিত হইতে পারে না।

যুব। কিন্তু ইনি নিজেই অর্লিয়েন্স উদ্ধারার্থ সৈন্যসংগ্রহ, সমর,—সমস্তই করিতে প্রস্তুত।

অর্লিয়েন্স। দশ দিন মধ্যে অর্লিয়েন্স উদ্ধার করিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছেন।

এলেঙ্কো। উত্তম। অগ্রে এই কার্য্য সম্পাদন করুন! তবে অন্য বিষয় বিবেচ্য। যুবরাজের যে অভিপ্রায় হয়।

যুব। আমার ঠিক ঐ অভিপ্রায়। যুদ্ধেও আমরা যাইব না। কুমারী নিজেই যা হয়, করিবেন।

মোসাহেব। তা, কুমারীটী কি চিরকুমারীই থাকিবেন না কি?

আঞ্জু। তুমি ইহাকে পাটরাণী করিবার প্রস্তাব করিতে চাও কি?

যুব। প্রস্তাবটা আমি নিজেই করিব

পাঁচবার ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু এই স্বপ্ন-কন্যার সম্মুখে সে প্রস্তাব-প্রণোদক প্রবৃত্তিটাই যেন নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। এই জেনী বা সত্য সত্যই দেবী বা মানবী হইবেন।

*　*　*　*

ইংরেজ-অবরুদ্ধ অর্লিয়েন্স নগরে এ কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! নির্জ্জীব নগরবাসী রণ-মদে নৃত্য করিতেছে! নগরবাসিনী রমণীরাও রণ-রঙ্গে রঙ্গিণী! নিমেষ মধ্যে যেন সৃষ্টি-শক্তির কি সংগোপনীয় মন্ত্রবলে, সমস্ত ফরাসী সৈন্য-বাহিনী অকস্মাৎ উত্থিত হইয়াছে। উত্থিত, গঠিত, শৃঙ্খলা-সমন্বিত সারি সারি দণ্ডায়মান সৈন্যশ্রেণী; নগরকক্ষ ফরাসী-সৈন্যপ্রবাহে প্লাবিত! এই বৃহৎবাহিনী কোথা হইতে কেমনে উত্থিত হইল! বিধাতা তুমিই বলিতে পার। শতবর্ষের মৃত ফরাসী জাতি মুহূর্ত্তে কোন্ মন্ত্রে জীবিত হইয়া উঠিল, স্বপ্ন-কন্যা জোয়ানী তুমিই জান!

অবরুদ্ধ নগর আশ্চর্য্যের অভাবে, অনাহারে, উপবাসে—হায়! কত দিনই কাটাইতেছিল; মুহূর্ত্তে রাশি রাশি শস্য-সম্ভার; বিবিধ খাদ্য-স্তূপ কোথা হইতে আসিল; কে আনিল; কেমনে আনীত হইল! নগরের আটদিক্ যে শত্রু-শিবিরে আবৃত আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে! এ অসাধ্যসাধন, স্বপ্নের ছায়াময়ী কন্যা, তুমিই কি করিলে?

নগরের রাজপথ বহিয়া একদিকে পুরুষ-পরিবৃত সৈনিক-বাহিনী; অপর দিকে রমণী-সেনার স্রোতস্বিনী; মধ্যস্থলে এই সৈন্য-প্রবাহের পরিচালিকা, পরিরক্ষিকা, প্রতিপালিকা, ধীর মন্থর গমনে চলিয়াছেন। শুভ্রবসনাবৃতা, শুভ্রকেতনহস্তা, শুভ্র-অশ্বোপরি উপবিষ্টা;—স্বপ্নরাজ্যের সেই ছায়া, যোগিনী জেনী, নিঃশব্দে সৈন্যবাহিনী চালাইয়া ধীর-মন্থর গমনে চলিয়াছেন॥

অবরুদ্ধ নগরের কত নর-নারী বালক-বালিকা রাজপথে আসিয়া দেবকন্যার চরণযুগল চুম্বন করিতেছে! তাঁহার সম্মুখে পতিত হইয়া নমস্কার প্রণিপাত করিতেছে। মধুর মা মা সম্বোধনে রাজপথ ধ্বনিত,—জননী জেনীর উদ্দেশে মধুর মা মা শব্দ নগরময়। কুমারী কোমল কোলা-হলের মধ্য দিয়া, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা, আহ্লাদ, উপহার ও আশীর্ব্বাদে প্লাবিত হইয়া ধীর-মন্থর গমনে দেবালয়ের উদ্দেশে চলিয়াছেন। সৈন্যসঙ্গে দেবপদে প্রণিপাত করিবেন!

ডোমরেমীর কৃষক-কুমারী ফরাসী-সেনার সৃষ্টি ও সংগঠনকারিণী; অধিনায়িকা, ফরাসী-জাতির উদ্ধারকারিণী!!

সৈন্যবাহিনীর বিজয়রবে নগরের আটদিক্ উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে! "জয় জোয়ানীর জয়! জয় ফরাসী জাতির জয়! ফরাসী-রাজ্য ফরাসী-রাজার জয়!!"

স্বপ্ন-কন্যা তাঁহার জীবনের ভীষণ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

বুদ্ধদেব।

গৃহত্যাগ।

গভীর নিশীথ এবে মহা প্রশান্তনে
নিমজ্জিত মহাপুরী। মহা উৎসবের
অবসানে নিদ্রাগত পুরবাসিগণ,
নিদ্রাগত দৌবারিক দুয়ারে দুয়ারে।
ভাবে নাই স্বপনেও উৎসব নিশীথে
নির্ম্মম হৃদয়ে মহাঃপ্রসূত প্রসূমী
হায় রে! যাইবে ছাড়ি এরূপে দুয়ার।

এই মহাপুরে বৃদ্ধ নৃপতি কেবল
জাগিতেছে শোকে অর্দ্ধ-জাগ্রত মূর্চ্ছিত,
ভাসিতেছে অনিবার নয়নের জলে।
কোমল চরণক্ষেপে নীরবে গম্ভীরে
চলিয়াছে ধীরে অশ্ব, চলিয়াছে ধীরে
ছন্দক পশ্চাতে শোকে গম্ভীর নীরব,
বহিতেছে অশ্রুধারা বক্ষে দর দর।
পূর্ণচন্দ্র-প্রভ অশ্বে পূর্ণচন্দ্র শত
জিনি' রূপে অশ্বারোহী বসিয়া নীরবে—
নাহি খেদ, নাহি দৈন্য, নাহি শঙ্কা ভয়,
নাহি মায়া মমতার রেখা মাত্র মুখে।
প্রফুল্ল প্রসন্ন মুখ, হৃদয়-গগন
নৈশ গগনের মত শান্ত সমুজ্জ্বল।
দেখিল ছন্দক যেন অগ্রে কুমারের
চলিয়াছে দেবগণ পুষ্প বরষিয়া,
বাজাইয়া দেববাদ্য, আনন্দ সঙ্গীতে
পরিপূর্ণ করি নৈশ ভূতল গগন।
শুনিল ছন্দক যেন পশ্চাতে কাতরে
মুর্ত্তিমতি শাক্যলক্ষ্মী বিমুক্ত-কবরী
কাঁদিছে বিবশা শোকে, কাঁদিতেছে পুরী।
অতিক্রম পুরী রাজপুত্র মুহূর্ত্তেক
দেখিলেন রাজপুরী। নীরবে গগনে
উঠিতেছে শশধর, রজত সলিলে
প্লাবিত করিয়া ধরা, শাক্য-রাজপুরী।
"যুবরাজ! যুবরাজ! বাষ্পরুদ্ধ স্বরে
কাঁদিয়া ছন্দক উচ্চে কহিল কাতরে—
"শৈশবের মাতৃকোল, খেলার প্রাঙ্গণ
কৈশোরের, যৌবনের চারু রঙ্গভূমি,
বৃদ্ধ পিতা, বৃদ্ধ মাতা, প্রেমের প্রতিমা
গোপা শাক্যকুলশোভা, সদ্যজাত শিশু
ভাসাইয়া ডুবাইয়া শোকের সাগরে
কোথায় চলিলে হায়! দেখ রাজপুরী
নিরমল জ্যোৎস্নার শ্বেত শুভ্র বাসে
কাঁদিতেছে হায়! নব বিধবার মত।"
কুমার প্রফুল্লমুখে কহিলা—"ছন্দক!
এ কি ভ্রম তব! দেখ দেবদেবীগণ
বরষি ত্রিদিব-পুষ্প অমল ধবল
পুষ্পাবৃত, পবিত্রিত করিয়াছে পুরী।
মানব মঙ্গল গীত গাইছেন সবে
আনন্দে আকাশে বসি; পূজিছেন সবে
বসাইয়া পদ্মাসনে বৃদ্ধ পিতা মাতা,
প্রজাবতী, গোপা, নব-প্রসূত নন্দন।"
আবার আনন্দে অশ্ব চলিল নাচিয়া
নবোদিত চন্দ্রালোকে। চলিতে চলিতে
অতিক্রমি রাজ্যসীমা, অতিক্রমি ক্রমে
ক্রোড্যদেশ, মল্লদেশ, রজনী প্রভাতে
প্রবেশিল বেণুবনে অলকার তীরে।
অবতরি ভূমিতলে কহিলা কুমার—
"ছন্দক! এ অশ্ব মম, এই আভরণ
ল'য়ে, ফিরে যাও গৃহে।" খুলি আভরণ
একে একে ছন্দকেরে করিলা অর্পণ,
কাঁদিয়া উঠিল ভৃত্য করি হাহাকার।
কত অনুনয়, কত করিয়া বিনয়,
বিলাপি কহিল শোকে—"হায়! প্রভু! আমি
"হইয়াছি শক্তিহীন—নাহি শক্তি মম।
নাহি বল মম, আমি হয়েছি দুর্ব্বল।
হায়! বৃদ্ধ নরপতি, বৃদ্ধা প্রজাবতী,
শোকে উম্মাদিনী গোপা জিজ্ঞাসিবে যবে—
'কোথা গিয়েছিলি লয়ে তুই গুণধরে?
আইলি রাখিয়া কোথা?' কি কহিব আমি?
সে বিশাল রাজপুরে সমুদ্র কল্লোলে
উঠিবেক হাহাকার যবে এ সংবাদে
কি কহিয়া নিবারিব সেই শোকোচ্ছ্বাস?
সে মহাশ্মশানে আমি যাইব কেমনে?
দয়া কর দাসে, তারে নেও সঙ্গে তব,—
ছন্দক এমন প্রভু কোথা পাবে আর?"
কুমার কহিলা—"ভাই! তুমি এইরূপে
হইবে কি বিঘ্ন মম উদ্ধারের পথে?
যেই সংসারের মায়া করি উৎপাটিত
আসিয়াছি এতদূর, আবার কি তুমি

এরূপে সে মায়াবীজ করিবে রোপণ ?
হও শান্ত, হইও না কাতর অধীর,
ছন্দক ! কপিলপুরে যাও ত্বরা করি
অশ্ব আভরণ সহ। জনক জননী
শোক-সন্তাপেতে দগ্ধ, করিও সান্ত্বনা।
কহিও—'কুমার তরে করিও না শোক।
আসিবে কুমার ফিরি লভি পূর্ণ-জ্ঞান,
লভিয়া বুদ্ধত্ব, শুনি ধর্ম্ম সুশীতল
হবে শান্ত চিত্ত, পাবে সুখ নিরমল।"
কাটিয়া ভ্রমর-কৃষ্ণ দীর্ঘ কেশজাল
নিজ খড়্গে তীক্ষ্ণধার, করি বিনিময়
ব্যাধের সহিত নিজ কৌষিক বসন
বহুমূল্য, শতচ্ছিদ্র কাষায় ব্যাধের
ম্লান জীর্ণ পরিলেন তিন খণ্ড করি।
নবীন সন্ন্যাসী-বেশ দেখিয়া প্রভুর
কাঁদিতে লাগিল ভৃত্য, কাঁদিল 'কণ্টক'
নীরবে নয়নবারি করি বরিষণ।
গ্রীবা আলিঙ্গিয়া তার কহিলা কুমার—
"কণ্টক! প্রভুর কার্য্য সাধিয়া যেরূপে
হইলে সিদ্ধার্থ তুমি প্রভু তব যেন
এরূপে আপন কার্য্য করিয়া সাধন
তাঁহার সিদ্ধার্থ নাম করেন সফল।
যাও বৎস! যাও ঘরে, বিদায় ছন্দক!"
কাঁদিতে কাঁদিতে ভৃত্য, অশ্ব পুণ্যবান
ফিরিল, উভয় শোকে ফিরিয়া ফিরিয়া
যতক্ষণ গেল দেখা সতৃষ্ণ-নয়নে
নবীন সন্ন্যাসী রূপ করিল দর্শন।
অদৃশ্য হইলে প্রভু, পড়িয়া ভূতলে
কণ্টক ত্যজিল প্রভু-বিরহে জীবন।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ।

দ্বাদশ বৎসর অন্তর মাঘ মাসে সর্ব্ব-তীর্থের মুকুট স্বরূপ প্রয়াগে কুম্ভমেলা হইয়া থাকে। এইরূপ যথাক্রমে হরিদ্বার, উজ্জয়িনী এবং গোদাবরী-তটে কুম্ভমেলা হয়। বিগত ১২৮৮ সালে মাঘ মাসে প্রয়াগে কুম্ভমেলা হইয়াছিল, আবার এই ১৩০০ সালে এখানে সেই যোগ সমুপস্থিত। কুম্ভের স্নান-মাহাত্ম্য বর্ণনাতীত, এই যোগ উপলক্ষে স্নান এবং নানা দেশাগত কন্দ-মূল-ফলভোজী, নিরাময়, পবিত্রচেতা সাধু সন্ন্যাসীদের সন্দর্শন করিলে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুঞ্জ পুঞ্জ কলুষকুল বিনষ্ট হয় বলিয়া, ভক্তের হৃদয়ে ভক্তি-কুসুম-মঞ্জরী আজ বিকশিত হইয়াছে। তাই তাঁহারা সংসার-সঙ্কটের পাপ-মোহ-কোলাহল ভুলিয়া, কষ্টকর ভীষণ কঠোরতা উপেক্ষা করিয়া ত্রৈলোক্য-পাবনী পুণ্যা তাপ-ত্রিতয়-সংহন্ত্রী সর্ব্ববিপদ্বিনাশিনী জাহ্নবীর পূত-পদে তাঁহাদের হৃদয়-উদ্যান-জাত প্রীতি ভক্তির শতদল দিবার জন্য সর্ব্বতীর্থ-সেবিত তীর্থরাজ প্রয়াগে সমুপস্থিত হইয়াছেন।

বার বৎসর পূর্ব্বে যে নয়নাভিরাম অপরূপ দৃশ্য এখানে দেখিয়াছিলাম, যাহা আজ পর্য্যন্ত স্মৃতিপট হইতে অপসারিত হয় নাই, সেই অনুপম মনোমুগ্ধকর ভাব এখনও অন্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভ্রমিতেছে। এবার কি তদনুরূপ দৃশ্য দেখিলাম ? কিন্তু যাহা দেখিলাম, তাহা কেমন করিয়া বলিব ? যে দৃশ্য বর্ণনা করা বোধ হয় অনেকের সাধ্যের অতীত, ক্ষুদ্র প্রাণী আমি তাহা কেমন করিয়া বলিব! তবে যতদূর সাধ্য, পাঠকদের অবগতির জন্য তাহাই এ স্থলে বলিব। আমাদের যত্ন এবং আয়াস কতদূর সফল হইবে, তাহা জানি না।

এবার মেলার বন্দোবস্ত কিছু নূতন প্রকার হইয়াছে। আমরা অগ্রে সেই কথাই বলিব ত্রিবেণী-তীরের পশ্চিমে সুদূর বিস্তৃত প্যারেড-ভূমি, তাহার মধ্যে রাস্তা। রাস্তার বামে আর্য্য-সমাজের পটমণ্ডপ, তাহার পর দুই পার্শ্বে নানা দেশ হইতে আনীত লোচন-লোভনীয় পণ্যপূর্ণ আপণশ্রেণী সারি সারি সাজান রহিয়াছে। ইহার মধ্যে মধ্যে মিষ্টান্নের দোকান; তাহাতে নানাবিধ সজ্জিত উজ্জ্বলবর্ণের খাদ্য দ্রব্য রসনাকে আকুল করিতেছে। ইহার মধ্যে ডিস্পেন্সারি, আর মধ্যস্থলে সহচর অনুচরে পরিবৃত হইয়া পুলিস "হানা" দিয়া বসিয়া আছেন। সাধারণের সুবিধার জন্য রাস্তার দুই ধারে জলের কল বসান হইয়াছে। ইহার উত্তরে অসংখ্য পর্ণকুটীর, তাহা কল্পবাসীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট। তাঁহারা এই এক মাস কাল এখানে বাস করিবেন। সঙ্গমস্থল এখান হইতে অনেক দূর, তজ্জন্য কল্পবাসীদের বিস্তর কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে জগৎ-প্রথিত, সম্রাট্-শ্রেষ্ঠ আকবর শাহের বাঁধ। বাঁধের দক্ষিণে আকবর শাহের অনন্তকাল-স্থায়ী কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ সুবিশাল দুর্গ কালের করাল হস্তকে উপহাস করিয়া আজও স্ফীতবক্ষে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু এখন সেই দুর্গশিরোপরি বৃটিশ-সিংহের বিজয়-কেতন পত পত শব্দে উড্ডীয়মান রহিয়াছে এবং সকলকে অব্যক্ত ভাবে যেন বলিয়া দিতেছে;—

> "যদুপতেঃ ক গতা মথুরা পুরী
> রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা॥
> ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃ স্থিরং
> ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥"

ইহার উত্তরে দারাগঞ্জ এবং পূর্ব্বে ত্রিবেণী। বাঁধ হইতে অবতীর্ণ হইলে বিস্তৃত ত্রিবেণীতট। বাঁধের নীচে সমতল ভূমি হইতে সঙ্গম-স্থানের নিকটবর্ত্তী স্থানটীর দুই পার্শ্ব বংশখণ্ড দ্বারা ঘেরা। ইহার মধ্য দিয়া সাধু সন্ন্যাসীরা অতি সমারোহের সহিত স্নান করিতে যান। ইহার দুই ধারে যাত্রীদের গতায়াতের পথ। তাহার পূর্ব্বে বহুদূরব্যাপী নানাবিধ পতাকা দ্বারা অলকৃত স্থান। সেখানে সংখ্যাতীত প্রয়াগীরা তক্তাপোষ পাতিয়া বসিয়া আছে। ইহার নিম্নে অপায়হন্ত্রী, ভক্তাভীষ্ট-প্রদায়িনী মোক্ষ-সুখদাত্রী ভাগীরথী তর তর রবে প্রবাহিত। এখানে এক নৌসেতু প্রস্তুত হইয়াছে। নৌসেতু পার হইলে অপর পারে রজত প্রস্তরবৎ অনন্ত প্রসারিত সৈকতভূমি। ইহার উত্তর দক্ষিণে সন্ন্যাসীদের আখড়া। মধ্যে বিস্তৃত পথ। যে স্থান এক সময়ে হাঙ্গর নক্র প্রভৃতি জলচরদের ক্রীড়াস্থল ছিল, আজ তাহা বহুবিধ গৃহপূর্ণ—যেন মহানগরীতে পরিণত হইয়াছে এবং তথায় বহু লোকের কোলাহলে নভঃস্থল আপূরিত করিয়া রাখিয়াছে। এই চরের দক্ষিণে সংসারত্যাগী, বিলাসবিদ্বেষী ভস্মলিপ্তাঙ্গ জটাজুটধারী সন্ন্যাসীদের আড্ডা। এখানে যে কত অবধূত, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মত্যাগী, উদাসীন, ঊর্দ্ধবাহু, দণ্ডী ইত্যাদি রহিয়াছেন, তাহা গণনাতীত এই সিকতাময় জাহ্নবীতটে, মাঘ মাসের দুর্জ্জয় শীতে কেহবা বিনা আতপত্রে, কেহবা সামান্য আতপবারণ লইয়া, অজিন-আসনে, কেহবা বিনা আসনে নিমীলিত-নেত্রে, তদ্গত-হৃদয়ে তন্ময়-প্রাণে আরাধনাসক্ত হইয়া উপবিষ্ট। কিন্তু সকলেই যে সম্যক্ নিস্পৃহ এবং স্বার্থশূন্য, তাহা নহে। ইহার নিকটে সুসজ্জিত ধূপ-ধূনাগন্ধে সুবাসিত দেব দেবীর কুটীর। ভিন্ন ভিন্ন কুটীরে বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। কোথায় অখিল-লোক-নমস্কৃত ভগবান্ জগন্নাথ, কোথায় দিব্যমালা-শোভিত, চন্দন-চর্চ্চিত নীলকলেবর শ্রীকৃষ্ণ, মধুরাধরে মোহন মুরলী, বামে নানা রত্নালঙ্কার-মণ্ডিতা, নয়নানন্দপ্রদায়িনী প্রেমময়ী শ্রীরাধিকা। কোথায় বা যোগী-হৃদয়-রঞ্জন বিঘ্ন-বিপদ-হর

বিষ্ণু। এইরূপ নানা মূর্ত্তি তথায় বিরাজিত। সকলেই সদ্যোনিচিত পুষ্পরাজি এবং বিল্বপত্রে প্রপীড়িত। ইহার পর পঞ্চায়তী বড় আখড়া। ইহাদের সঙ্গে বদ্ধুয়া আখড়া আছে; তাহার পর পঞ্চায়তী ছোট আখড়া। ইহাঁরা প্রায় সকলেই নানকপন্থী। ইহাঁরা রূপার খড়ম পূজা করিয়া থাকেন। ইহাঁদের মূলমন্ত্র "ও-হা-গু-রু" চারিযুগে যে চারি অবতার হন, তাঁহাদের আদ্য অক্ষর লইয়া এই "ওহা গুরু" হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের পীঠস্থান এলাহাবাদ কীডগঞ্জ। ইহাঁদের সঙ্গে প্রায় তিন সহস্র সাধু এবং সরঞ্জামও অল্প নহে। ইহাঁদের আখড়াতে এক বৃহৎ চন্দ্রাতপ, তাহার নিম্নে কারুকার্য্যযুক্ত মুক্তাঝালরভূষিত রক্তবর্ণ মখমলের ক্ষুদ্র চন্দ্রাতপ,—তাহার নীচে এবং বেদীর উপর ততোধিক সুন্দর মখমলমণ্ডিত সিংহাসনোপরি "গুরুগ্রন্থ সাহেব",তাহাই তাঁহারা পাঠ করিয়া থাকেন। পঞ্চায়তী আখড়ার নিকট একটী স্থান অনুচ্চ মৃৎপ্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। সেখানে অতিথি, অভ্যাগত, আহূত, অনাহূত সকলেই আহার করিয়া থাকেন। এই আখড়ার চারিজন মোহান্ত। তাঁহাদের নাম মতিরাম, সত্যপ্রকাশ, গোকুলদাস এবং প্রয়াগদাস। যে চারি তীর্থস্থানে কুম্ভের মেলা হইয়া থাকে, ইহাঁদের মধ্যে একজন মোহান্ত তিন বৎসর পূর্ব্বে তথায় গিয়া সর্ব্বপ্রকার বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। ব্যয়ও যথেষ্ট হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ের একজন মোহান্তের মুখে শুনিলাম, এখানকার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ প্রায় ১৪ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার এক অংশে ধর্ম্মপ্রাণ পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী সন্নিধ্যে এক পটমণ্ডপে রহিয়াছেন। ইহার অন্য স্থানে বৈরাগীদের আখড়া। ইহাদের সঙ্গে নির্ব্বাণী নির্ম্মোহী এবং দিগম্বরীরা আছেন।

সৈকতভূমির উত্তরাংশে নির্ব্বাণী, নিরঞ্জনী এবং নির্ম্মলীদের আখড়া। নির্ব্বাণীদের সঙ্গে নাগা আর নির্ম্মলীদের সঙ্গে বৃন্দাবনীরা আছেন। আমরা যে দিন নির্ম্মলীদের আখড়ায় উপস্থিত হই, সে দিন দেখিলাম, প্রায় ৬০০ শত সাধু আহারে বসিয়াছেন। এইরূপ কয়েক বারেই তাঁহাদের আহারকার্য্য সমাধা হয়। ইহাঁদের সঙ্গে প্রায় চারি সহস্র সাধু আছেন। সে দিন বার মণ আটার লুচি করিয়াও সকলের সঙ্কুলান হয় নাই। উপরে যে সকল সম্প্রদায়ের নাম করিলাম, তাঁহাদের মধ্যে আর এক দলের নাম "যুনা"—তাঁহাদের সঙ্গে ১৫০০ হাজার লোক। আর একস্থানে দণ্ডীদের আখড়া। তাঁহাদের সঙ্গে প্রায় ২০০ শত লোক। ইহাঁদের সকলের হস্তে এক একটী দণ্ড। এখানে অনেকগুলি অতি সঙ্কীর্ণায়তন কুটীর। কুটীরের মধ্যে অতি বিচিত্র গুহা, তন্মধ্যে এক একজন সাধু বাস করিয়া থাকেন। এই সম্প্রদায়ের মোহান্তদের নাম দণ্ডী-স্বামী এবং অনন্ত-আশ্রমী। আর এক স্থলে গিয়া দেখিলাম, একটী সুন্দর পটমণ্ডপ। তাহার মধ্যে সুন্দর শয্যায় সমাসীন দুইজন সাধু। একজনের নাম স্বামী শঙ্করানন্দ, অপরের নাম ভোলগির। ইহাঁদের বাসস্থান কাশী। ইহাঁরা সাধু অথচ ইহাঁদের সাজসজ্জা এবং বেশভূষায় পাশ্চাত্য সভ্যতার যথেষ্ট আমেজ রহিয়াছে। ইহাঁরা যোগী হইয়াও বিশেষ ভোগ বিলাসী বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। আর এক আখড়ায় কয়েক জন নাগা দেখিলাম, তাহারা সর্ব্বদাই উলঙ্গ। একজন স্থবির তাঁহাকে কয়েকজন লোক ঘেরিয়া বসিয়া আছে। আর একজন প্রৌঢ়, তাঁহার নিকটও দুই একজন লোক রহিয়াছে; কিন্তু তাঁহার চঞ্চল চক্ষু, স্থির নহে, ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে এবং তাঁর ভঙ্গীতে আত্ম-গরিমা সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হইতেছে। ইহার একস্থানে একজন যোগী আছেন, তাঁহার নাম গণেশানন্দ। তিনি কয়েক

দিন হঠযোগ দেখাইয়া অনেককে বিহ্বলচিত্ত করিয়াছিলেন।

এই সৈকতভূমির পূর্ব্বে গঙ্গার ন্যায় আর এক অতি সঙ্কীর্ণ ধারা প্রবাহিতা। তাহার পর ঝুঁসি। এই ঝুঁসি একটী অনুচ্চ শৈল বলিলেও বলা যায়। এখানে বারমাসই অনেক সাধু বাস করিয়া থাকেন এবং এই মেলা উপলক্ষে আরও অনেক বিষয় বাসনাশূন্য প্রতিগ্রহ-স্পৃহা-রহিত নির্ম্মলান্তঃকরণ সন্ন্যাসীও আসিয়াছেন। ইহার আরও দক্ষিণভাগের তলদেশে আর একটী সন্ন্যাসীদের আখড়া। ইঁহারা সিন্ধুদেশ হইতে সমাগত হইয়াছেন। সঙ্গে প্রায় ৪।৫ শত সাধু। ইঁহারা উদাসীন, কখন দারপরিগ্রহ করেন না। ইহার একস্থানে অনেকগুলি পট-মণ্ডপ এবং মধ্যে এক চন্দ্রাতপ। চন্দ্রাতপের নীচে উচ্চ বেদীর উপর কেশবানন্দজী উপবিষ্ট। তাঁহাকে শত শত সাধু ঘেরিয়া বসিয়া আছেন। তিনি অতি সুকণ্ঠ, হৃদয়-দ্রবকর সুললিত ভাবে গীতার ব্যাখ্যা করিতেছেন। আমরা বিমুগ্ধ-চিত্তে অনেক ক্ষণ তাহা শুনিতে লাগিলাম। তাহার পর দয়ালদাস স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তিনি সেই সৈকত-ভূমির উপর উপবিষ্ট। সম্মুখে পরিব্রাজক-শ্রেষ্ঠ কুমার শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সমাসীন হইয়া ধর্ম্মকথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। দয়ালদাস স্বামী এক জন প্রবীণ লোক। তাঁহার সেই সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া এবং হৃদয়স্পর্শী ধর্ম্মকথা শুনিয়া সাতিশয় প্রীত হইলাম। শুনিলাম, তিনি অকাতরে প্রায় প্রত্যহ শত শত লোককে আহার দিয়া বিমলানন্দ উপভোগ করিতেছেন। এই সকল স্থান দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমাগত হইল। আমরা কোন প্রকারে গঙ্গা পার হইয়া আবার সেই সন্ন্যাসীদের আখড়ায় উপস্থিত হইলাম। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। তথাকার সায়ংকালীন ভাব অতীব অদ্ভুত এবং অতি বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হইল। তথায় দেখিলাম, প্রত্যেক স্থান দীপমালায় প্রভাসিত এবং চারিদিকে বহুজাতীয় বাদ্যের সুমধুর নিক্বণে আপূরিত। যেখানে যাই, সেইখানে মনোহর সঙ্গীতধ্বনি, আর সকলেই আপনার ভাবে আপনি বিভোর। যে দিকে চক্ষু ফিরাই, সেই দিকে দেখি, শ্রদ্ধা ভক্তি যেন অমৃতধারে প্রবাহিত। আ মরি কি স্বর্গীয় ভাব !! আমরা ইহা দেখিয়া শুনিয়া যেন আত্মহারা হইয়া গেলাম। ইচ্ছা হইল না যে, এমন হৃদয়-প্রফুল্লকর স্থান পরিত্যাগ করিয়া বিষাদ-সন্তাপ-পূর্ণ নিরানন্দময় গৃহে আর ফিরিয়া যাই। যাহা হউক, এ মনোরম দৃশ্য বোধ হয় চিরদিন হৃদয়-পটে অঙ্কিত থাকিবে।

এই বালুকাময় তটের এক অংশে এখানকার ফুলপুরের সুগৃহীতনামা জমিদার প্রতাপ চন্দ্র শিবির সন্নিবেশ করিয়া আছেন। তিনি মাসাবধি প্রত্যহ সাধু, সন্ন্যাসী, দীন দুঃখী আর্ত্তদের আহার্য্য বিতরণ করত অশেষ পুণ্য-সঞ্চয় করিয়াছেন। আমরা শুনিলাম, ইহাতে তাঁহার প্রায় লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে। তিনি এই অর্থের যথার্থ সদ্ব্যয় করিয়া যে যশস্বী হইয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

এবার যেরূপ নূতন ধরণের মেলার বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তাহার আভাস একপ্রকার দিয়াছি; কিন্তু তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। এখানে সাধুদের মলমূত্র ত্যাগের জন্য অনেক প্রকার কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে এবং যাত্রীগণেরও পুলিসের নিকট গ্লানি-গঞ্জনা, নিপীড়ন-নির্যাতন সহ্য করিতে যে হয় নাই, এমন নহে। আর বিভিন্ন স্থানে মেলা হওয়াতে যদিও লোকের স্বাস্থ্যহানির ভয় তত ছিল না বটে, কিন্তু মেলার সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছে। আর যাত্রীরা স্নানের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনে অবগাহনান্তর দেবদেবী বা সাধুসন্দর্শন করিতে পারে নাই। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে,

কর্তৃপক্ষেরা সাধারণের সুবিধার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। আমরা দেখিয়াছি, মেলাতে পাছে মেঠাইওয়ালারা খাদ্যে কোন মন্দদ্রব্য মিশ্রিত করে, তজ্জন্য এলাহাবাদের কার্য্যকুশল কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ডাক্তার রায় মহেন্দ্রনাথ ও দেদার মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রতি মেঠাইওয়ালার দোকানে গিয়া খাদ্য সামগ্রী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। যাহা হউক, ঈদৃশ মহা সমারোহ ব্যাপারে বিশেষ যে কোন বিভ্রাট ঘটে নাই, ইহাই মঙ্গল।

গত ২৯শে পৌষ উত্তরায়ণ-সংক্রান্তি সেই দিন মেলা আরম্ভ এবং স্নানেরও প্রথম দিন। রাস্তায় লোকের জনতা যথেষ্ট, ভিড় অতিক্রম করিয়া যাওয়া সুকঠিন। কত লোক ত্রিবেণী-তীরাভিমুখে ছুটিতেছে, আবার কত লোক স্নান করত চন্দন-চর্চ্চিত হইয়া গৃহে ফিরিতেছে। আমরা যথাসময়ে তীরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই সময়ে নাগারা স্নান করিতে যাইতেছে। তাহাদের সঙ্গে কয়েকটী হস্তী, ঘোটক এবং উষ্ট্র। হস্তী-পৃষ্ঠে সন্ন্যাসীরা বিচিত্রবর্ণের বড় বড় পতাকা উড়াইয়া সঙ্গমস্থানে যাইতেছে। আমরাও সেই সঙ্গে ঘাটে উপনীত হইলাম। কিন্তু এখানে জনতা বড় ভয়ানক। ঠেসাঠেসি হুড়াহুড়ি এত অধিক যে, একস্থানে এক মুহূর্ত্ত তিষ্ঠিয়া থাকিবার উপায় নাই। একেবারে নিষ্পেষিত হইয়া যাইতেছে। যাহা হউক, সঙ্গম-স্থানটী অতি বিচিত্র অতি মনোরম। পূর্ব্বদিক্ হইতে নির্ম্মল-সলিলা শুভদর্শনা যমুনা নীল কাচসদৃশ জলপ্রবাহ লইয়া সর্ব্বসিদ্ধি-সমৃদ্ধি-প্রদায়িনী কলকল্লোলমালিকা মন্দাকিনী-সলিলে মিলিত হইয়াছেন। এই জন-চিত্তহারী আধা-নীল আধা-শ্বেতমূর্ত্তি, কিরূপ মহামহিমান্বিত, তাহা আমাদের বলিবার ক্ষমতা নাই। মহাকবি কালিদাস যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এ স্থলে উদ্ধৃত হইল,—

"ক্বচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈ-
র্মুক্তাময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা।
অন্যত্র মালা সিতপঙ্কজানা-
মিন্দীবরৈরুৎখচিতান্তরেব॥

ক্বচিৎ খগানাং প্রিয়মানসানাং
কাদম্বসংসর্গবতীব পঙ্ক্তিঃ।
অন্যত্র কালাগুরুদত্তপত্রা
ভক্তির্ভুবশ্চন্দনকল্পিতেব॥

ক্বচিৎ প্রভা চান্দ্রমসী তমোভি-
শ্ছায়াবিলীনৈঃ শবলীকৃতেব।
অন্যত্র শুভ্রা শরদভ্রলেখা
রন্ধ্রেষ্বিবালক্ষ্যনভঃপ্রদেশাঃ॥

ক্বচিচ্চ কৃষ্ণোরগভূষণেব
ভস্মাঙ্গরাগা তনুরীশ্বরস্য।
পশ্যানবদ্যাঙ্গি বিভাতি গঙ্গা
ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ॥"

নাগাদের স্নানের ঘটা কিছু বিচিত্র। তাহারা সম্পূর্ণরূপে অবগাহন করে না। তাহার পর বিভূতি-ভূষিত হইয়া দিগম্বরবেশে আখড়াদিকে অগ্রসর হয়। এই নাগাদের সঙ্গে পৃথুল-কলেবরা কৌপীন-মাত্র-পরিহিতা এক সন্ন্যাসিনীকে দেখিলাম। এই দলের পশ্চাতে আর এক দল সন্ন্যাসিনী, তাহারা যথাযোগ্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মন্থর-গতিতে চলিতেছে। নাগারা বল্লম পূজা করিয়া থাকে। সেই বল্লমকে স্নান করাইয়া মাল্য-চন্দনে ভূষিত করত স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতেছে। নাগারা তাহাদের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে কেবলমাত্র স্নানের সময় উলঙ্গ হইয়া যায়, নতুবা অন্য সময়ে কৌপীন পরিয়া থাকে। ইহাদের স্নানের পর আর এক দল স্নানার্থ সঙ্গমস্থলে চলিল। তাহাদের দলে লোকসংখ্যা অধিক। সঙ্গে কারু-কার্য্যযুক্ত বিচিত্র পতাকা, তাহাতে সায়ংকালীন সুবর্ণবর্ণের সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্ব

শোভা ধারণ করিয়াছে। ইহাদের সকলেরই ত্রিশূল-তিলক-লাঞ্ছিত কপাল, আর মুখে "সীতা-রাম"-ধ্বনি। ইহাদের অনির্ব্বচনীয় ভাবভাব দেখিয়া পল্লীগ্রামবাসিনী দুইটী প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক করযোড়ে ভজন গাহিতে লাগিল। তাহাদের ভক্তিপূর্ণ সুমধুর সঙ্গীত আজও যেন আমাদের কর্ণমধ্যে ভ্রমিতেছে। এই সম্প্রদায় চলিয়া গেলে নৌসেতু ভাঙ্গিয়া গেল। অমনি পুলের উপর দিয়া লোক গতায়াতের পথও বন্ধ হইল। হঠাৎ পুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এ কথা সকলে জানিতে পারে নাই। সুতরাং লোকেরা অপর পারে যাইবার চেষ্টা করাতে পুলিশ কর্ত্তৃক যে কিরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, পুলিসের দারুণ আঘাতে একজন ভূতলে পড়িয়া যায়। সেদিন এই বিপত্তির জন্য সাধুদের দারাগঞ্জের পুল দিয়া অনেক ঘুরিয়া আপনাদের আখড়ায় আসিতে হইয়াছিল।

তাহার পর ২৪শে মাঘ সোমবতী অমাবস্যা, স্নানের দ্বিতীয় দিন। সেদিন লোকের কিরূপ ভিড় এবং জনতা হইয়াছিল, তাহা চক্ষে না দেখিলে বলিবার উপায় নাই। উক্ত দিবস লোকের কোলাহলে এ স্থান বিকম্পিত হয়। উক্ত দিনে যানমাত্রেরই যেন মাহেন্দ্রযোগ। যাহারা একদিন আরোহী পাইবার জন্য কত সাধনা করিত, আজ তাহাদের সঙ্গে কথা কওয়া দায়। তাহারা এই সুযোগে অনেক পয়সা রোজগার করিয়াছে। সে যাহা হউক, আজ বোধ হইল, বাত্যোদ্বেলিত নদীতরঙ্গের ন্যায় দিগ্দিগন্তবাসী জনসমূহ চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রবাহিত হইয়া সেই কেন্দ্রমূল—আকবর শাহের বাঁধের উপর আসিতে লাগিল। এখানে আসিবামাত্র যাহার হাতে যেরূপ যষ্টি পাইল পুলিস তাহা কাড়িয়া লইয়া এক স্থানে স্তূপাকৃতি করিতে লাগিল। যষ্টিমাত্র-সম্বল যাত্রীরা তাহা হারা-ইয়া বিষণ্ণমনে তীরাভিমুখে চলিয়া গেল। তাহার পর মস্তক-মুণ্ডন। এই কার্য্যের জন্য এখানে একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। অনেকে সে স্থানে, কেহ বা অন্যত্র সেই কার্য্য সমাধা করিতে লাগিল, কিন্তু প্রত্যেককে দক্ষিণাস্বরূপ একটী সিকি সরকারকে দিতে হইয়াছিল। কত যত্ন-রক্ষিত কুঞ্চিত কেশ, সুদীর্ঘ কালস্থায়ী বিশাল শ্মশ্রু এবং মুণ্ডনের বাধাসত্ত্বেও অনেককেই এখান হইতে শিখাশোভী মুণ্ডিত শীর্ষ লইয়া গৃহে ফিরিতে হয়। আবার কত সুকেশীকে নীল-কাদম্বিনী-তুল্য চিকুরদামকে এখানে অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অমাবস্যার দিন মৌনী হইয়া স্নান করা প্রথা। অনেকেই এই রীতি অবলম্বন করিয়া স্নান করিয়াছেন। আবার ইহা জানা গিয়াছে, কোন কোন রসিক-চূড়ামণি সঙ্গীদের মৌনব্রতের দৃঢ়তা পরীক্ষা করিবার জন্য সরস বিদ্রূপাত্মক গল্প করিতে ত্রুটি করেন নাই। যাহা হউক, তাহার পর স্নানের ঘটা পড়িয়া গেল। কিন্তু আজ অনেকের ভাগ্যে সঙ্গম-স্নান ঘটিয়া উঠে নাই। স্নানের পর গো-দান, তাহার পর শ্রাদ্ধাদি, তাহাও কেহ পূর্ব্ব-দিন সারিয়া রাখিয়াছিলেন, আর কেহবা কায়-ক্লেশে সেদিন সারিয়া লইলেন। এদিন সাধু সন্ন্যাসী এবং যাত্রীদিগকে পুলিসের হস্তে নানা প্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, কোন প্রকারে সেদিনকার কার্য্য শেষ হয়।

২৯শে মাঘ শনিবার শ্রীপঞ্চমী, স্নানের তৃতীয় দিন। সে দিন আর দ্বিতীয় দিনের ন্যায় তত জনতা হয় নাই। গাড়য়ান এক্কাওয়ালাদের আর তত ওমর ছিল না; যৎকিঞ্চিৎ পাইলেই তাহারা বেণীতীরে পঁহুছিয়া দিয়াছিল। আমরা অতি প্রত্যূষে সেই যথার্থ-কাম-লোকযাত্রী, ত্রিদিব-কলুষ-হারিণী ভাগীরথী-তীরে উপস্থিত হই। তখন লোক-সমাগম তত অধিক হয়

নাই বলিয়া বিনা আয়াসে নৌকারোহণে সঙ্গম-স্থলে গিয়া স্নান করত আবার তীরে আসিলাম। সেই সময়ে নির্ম্মলীদের আখড়া স্নানের জন্য তীরে উপস্থিত হয়। পুলিস তাহাদের রাস্তা পরিষ্কারের নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিতে লাগিল। অশ্বপৃষ্ঠে কয়েকজন অজাতশ্মশ্রু পুলিস সাহেব চারিদিকে ছুটাছুটী করিয়া যাত্রীদের হঠাইয়া দিতেছিলেন। তবে তাঁহাদের অনুচরবর্গ অবাধে যাত্রীদের উপর নিপীড়ন করিতেছিল। এ দিনও যাত্রীদের অপর পারে যাইবার নিষেধ ছিল; সুতরাং তাহারা স্নানাদি করত দেব-দেবী দর্শনে বিমুখ হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসে।

সংক্রান্তির দিনেও অনেকে স্নান করিতে যায়। সেদিন লোক-সমাগম তাদৃশ হয় নাই। যাহা হউক, এক্ষণে কুম্ভের মেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। অনেক সন্ন্যাসী ও অনেক দোকানদারেরা যথাস্থানে চলিয়া যাইতেছে। আর যাহারা এখনও ত্রিবেণীতীরে আছে, তাহাদের সকলকে এই পূর্ণিমার পর সে স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে জনশূন্য ভূভাগ কিছু দিনের জন্য অতি সমৃদ্ধশালী শব্দময়ী মহানগরী বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা আবার মহাশ্মশানে পরিণত হইবে। এবার কুম্ভের মেলা শেষ হইয়া গেল। আবার বার বৎসরের পর এতাদৃশ মেলা হইবে কিনা তাহা বলা সুকঠিন। এবার লোকসংখ্যা সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন দশ লক্ষ, কেহবা তাহার অপেক্ষা অধিকও অনুমান করেন। কিন্তু এবার যাত্রী-দের সংখ্যা ইহার অপেক্ষা যে অধিক হইবে, তাহা অনায়াসে বলিতে পারা যায়। ইতিপূর্ব্বে প্রতিযাত্রীর নিকট হইতে করস্বরূপ এক একটী টাকা লওয়া হইবে এইরূপ গোল উঠিয়াছিল, তাহাতেই অনেক দীন দুঃখী আর আসিতে পারে নাই। পুণ্যার্থীয়াসী যাত্রীদের নিকট তীর্থক্ষেত্রে ট্যাক্স আদায়ের কল্পনা করা অতীব অন্যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এবার মেলার বন্দোবস্ত সর্ব্বপ্রকার সুবিধাজনক না হইলেও তত নিন্দনীয় হয় নাই। এখানে দুর্ঘটনার কথা বলিতে ভুলিয়াছিলাম। প্রথমে কল্পবাসীদের অনেকগুলি কুটীর অগ্নিদাহে ভস্মাবশেষ হইয়া যায়। তাহার পর সাধু সন্ন্যাসী এবং অনেক কল্পবাসীদের বিসূচিকা রোগগ্রস্ত হইয়া অনন্ত-ধামে নীত হইতে হইয়াছে। আবার পর্জ্জন্য-দেবও যাত্রীদের প্রতি বড়ই প্রতিকূলাচরণ করিয়াছেন। একে মাঘ মাসের নিদারুণ শীত, তাহাতে আবার কয়েক দিন অবিচ্ছেদে বৃষ্টি-পাত অতীব কষ্টকর হইয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ যাত্রীরা অকাতরে বুক পাতিয়া তাহা সহ্য করিয়াছে। ধন্য হিন্দুদের ধর্ম্মভাব, ধন্য তাহা-দের কষ্টসহিষ্ণুতা! এ দিকে ত এই ব্যাপার, অন্যদিকে রেলগাড়ীতে যাত্রীদের দুঃখ কষ্টের আর অবধি ছিল না। যথোপযুক্ত ভাড়া দিয়া মেষপালের ন্যায় মালগাড়ীতে বোঝাই হইয়া তাহাদিগকে এখানে আসিতে হইয়াছে। ইহার উপর আরও যে কত উৎপীড়ন, কত জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু এত সহ্য করিয়াও তাহারা অভীপ্সিত পথ হইতে এক পদও টলে নাই!!

এই বহুজন-পূজিত তীর্থের সারভূত প্রয়াগ-ধামে ত্রিবেণী-তীরে বিস্ময়কর অনির্ব্বচনীয় অনুপম বিস্ময়াত্মক দৃশ্য দেখিয়া কি যে শিখি-লাম, তাহা কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করিব, কে বা আমাকে বলিয়া দিবে? তাই বলি, ত্রিপুরারি-শিরোগৃহে নীললোহিত-মূর্দ্ধগে, তুমি বলিয়া দেও, মা, আজ কি শিখিলাম? জীব-জীবন পটে যাহা কিছু অঙ্কিত আছে, তাহা তুমি যেমন বুঝিবে, অন্যে তাহা ত বুঝিতে পারিবে না। তাই মা! তোমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি ত জান, হিন্দুদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব কত উন্নত, কত মহৎ! ধর্ম্মসারসর্ব্বস্ব হিন্দুরা ঈপ্সিত

ফললাভার্থ স্থির-নিশ্চয় মন হইলে তখন তাহারা সকল বাধা—সকল বিঘ্নকে তৃণবৎ জ্ঞান করিতে পারে, তাই আজ এই অদ্ভুত দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মা তুমি শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণা, তবে আজ তোমার চরণাশ্রিত ভক্তদের এত দুর্গতি এত দুর্দ্দশা কেন? তোমার মহিমা অনুপম অবিনাশী অনন্ত এবং অগম্য। যিনি তোমার সেই অপার মহিমা বুঝিয়াছেন, তিনি তোমার পবিত্র-তোয়-বাসী মীনকে ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিয়াছেন, তিনি শরট, করট, কৃশ-কুকুর হইয়া তোমার তীরে বাস করিবার অভিলাষ করিয়াছেন। কত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র তোমার তীরে দেহ ত্যাগ করিয়া অক্ষয় স্বর্গলাভ করিয়াছেন। কিন্তু মা কলি-কলুষ-হারিণি ত্রিলোক-তারিণি? আজ কেন তোমার ভক্তদের এমন শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে? বিষাদ-ঘনোদয়ে তাহাদের হৃদয় আজ আঁধার, তুমি তাপ-তপ্ত জীবের চির-স্নিগ্ধকারিণী, তুমি কৃপা-কটাক্ষপাতে শোকার্ত্তের মর্ম্মবেদনা রোগীর রোগযন্ত্রণা ঘুচাও মা। তাহাদের শুষ্ক-মরু-প্রাণে শান্তি-বারি বর্ষণ কর। মা, এই মরুময় সংসারে যাহাদের চির-সন্তাপিত প্রাণ, শান্তি-সুধা দান করিয়া তাহাদের বাঁচাও মা। যাহা হউক, মা আজ আর তোমাকে কোন কথা বলিব না, আজ আমাদের চিত্ত যেন বিভ্রান্ত হইয়াছে। একজন সুকবি অন্যত্র যে কথা বলিয়াছেন, তাঁহার সেই কথা এখানে লইয়া আমাদের বক্তব্য বিষয় উপসংহার করিব;—

"ত্বদ্ভাবসংপ্লাবিতচিত্তবৃত্তিঃ
মাতর্ম্ম পশ্যামি ভবে ত্বদন্যৎ।
একার্ণবগ্রস্তমিবাহমদ্য মে
সর্ব্বং জগন্মাতৃময়ং বিভাতি॥"

শ্রীসর্ব্বেশ্বর মিত্র।

"টেম্পেষ্ট্"।

(১)

সমুদ্র মধ্যে একটী দ্বীপ। প্রস্পারো নামক এক বৃদ্ধ ও মিরন্দা নাম্নী তদীয় এক অলোক-সামান্যা, ত্রৈলোক্যসুন্দরী কন্যা ভিন্ন এই দ্বীপে আর কাহারও বসতি ছিল না। মিরন্দা এত শৈশবে এ দ্বীপে আনীতা হইয়াছিল যে, একমাত্র আপন জনক ভিন্ন এ অবধি দ্বিতীয় মনুষ্যমূর্ত্তি সে অবলোকন করে নাই।

পিতাপুত্রীর বাসস্থান ছিল, এক গিরি-গুহা। এই গুহাটী অনেক বড়। ইহাতে অনেকগুলি কক্ষ ছিল। ইহার মধ্যে একটী কক্ষ, প্রস্পারোর পাঠাগার স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রস্পারো তথায় আপন পুস্তকাদি রাখিতেন। এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশ ইন্দ্রজাল-বিষয়ক। তদানীন্তন পণ্ডিতসমাজে এই ইন্দ্রজাল-বিদ্যার বড়ই গৌরব ছিল। অপিচ, এই বিদ্যাশিক্ষায় প্রস্পারোর বিশিষ্ট উপকার হইয়াছিল। বিধি-বিড়ম্বনে, মহামতি প্রস্পারো এই দ্বীপে আসিবার পর, অত্রস্থ প্রাণিগণের দারুণ দুরবস্থা-মোচনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে সাইকোর‍্যাক্স নাম্নী এক নির্দ্দয়া ডাকিনী এই দ্বীপে বাস করিত। কুহকিনী, কুহকবলে, ভূতযোনি গণের উপর আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। যে সকল শান্তপ্রকৃতি পরী, তাহার নিষ্ঠুর আদেশপালনে অসম্মত হইয়াছিল, পাপিষ্ঠা সাইকোর‍্যাক্স, তাহাদিগকে বিধিমতে নিপীড়িত করিয়া, তরুকোটরে অবরুদ্ধ রাখিয়াছিল। ডাকিনীর মৃত্যু হইলে পরও, ঐ পরীগণ তদ্রূপ অবস্থায় বৃক্ষ-কোটরে অবরুদ্ধ ছিল। মহামতি প্রস্পারো মন্ত্রপ্রভাবে তাহাদিগকে উদ্ধার করেন। তদবধি তাহারা চিরদিন সকৃতজ্ঞচিত্তে, অবনত-

মস্তকে প্রস্পেরোর আদেশ পালন করিত। এই সকল পরীর মধ্যে এরিয়েল সর্ব্বপ্রধান।

---

(২)

এরিয়েল শান্ত শিষ্ট ও সৎস্বভাব হইলেও কালিবনের উপর বড়ই অত্যাচার করিত,—অত্যাচার করিতে ভাল বাসিত। কালিবন, ডাকিনী সাইকোর‍্যাক্সের গর্ভজাত পুত্র। সাইকোর‍্যাক্সের উপর যতটা রাগ, যতটা আক্রোশ ছিল, এখন তৎপুত্র কালিবনের উপর এরিয়েল সেই জাতক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিল। কালিবন দেখিতে একটী 'কিম্ভুত-কিমাকার' জানোয়ার-বিশেষ। প্রস্পেরো, অরণ্য মধ্যে এই অদ্ভুত জীবটীকে দেখিতে পান; দয়া করিয়া তাহাকে আপন আবাসে আনেন এবং কথা কহিতে শিক্ষা দেন। অধিকন্তু তাহার প্রতি বিশেষ সদয় হন। কিন্তু "যেমনি মা, তেমনি ত ছা" হইবে;—সাইকোর‍্যাক্সের গর্ভজাত পুত্র, কাজেই অসৎপ্রকৃতি হইয়া উঠিল। দেখিয়া শুনিয়া প্রস্পেরো অগত্যা তাহার প্রতি ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। অরণ্য হইতে কাষ্ঠ আহরণ প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কার্য্যে তাহাকে নিয়োজিত করিলেন এবং তাহার তত্ত্বাবধানের ভার দিলেন—এরিয়েলকে।

আলস্যবশতঃ কালিবন যখন প্রভুর কার্য্যে উপেক্ষা করিত, এরিয়েল অমনি তাহাকে বিধি-মতে নিপীড়িত করিতে থাকিত। এক প্রস্পেরো ভিন্ন, এরিয়েলকে আর কেহ দেখিতে পাইত না; সুতরাং এরিয়েল অলক্ষিত ভাবে আসিয়া কালিবনের গায়ে চিমৃটী কাটিত; অথবা কর্দ্দম-পঙ্কে তাহাকে ফেলিয়া দিত। কখন বা মর্কটবেশ ধরিয়া, মুখ ভেঙ্গাইয়া, তাহাকে ভয় দেখাইত। কালিবন যেমনি সভয়ে তথা হইতে পলাইয়া যাইত, এরিয়েল অমনি সজারুর আকার ধরিয়া তাহার গন্তব্য পথে বাধা দিত।—সজারুর গায়ের উপর দিয়া গেলেই পায়ে কাঁটা ফুটিবে, কাজেই কালিবনের আর পা উঠিত না।—বেচারীর কষ্টের আর অবধি ছিল না। যখনই সে কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিত, এরিয়েল এইরূপে বিধিমতে তাহাকে নিপীড়িত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত।

---

(৩)

প্রভূত ক্ষমতাশালী পরীগণ বশীভূত থাকাতে, প্রস্পেরো তাহাদের সাহায্যে বায়ু-প্রবাহ ও সমুদ্র-তরঙ্গের উপরও আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রভুর আদেশক্রমে এক দিন ঐ পরীগণ অকস্মাৎ এক মহাঝড়ের আবির্ভাব করিল। এই দারুণ দুঃসময়ে সমুদ্রে একখানি অর্ণবপোত যাইতে-ছিল। প্রবল বাত্যান্দোলনে ও উত্তাল তরঙ্গ-মালায় সমুদ্র যেন সংহার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই জাহাজখানি 'ডুব-ডুব' বোধ হইতে লাগিল। প্রস্পেরো প্রাণা-ধিকা তনয়া মিরন্দাকে এ দৃশ্য দেখাইলেন। অধিকন্তু কহিলেন, "ঐ অপরূপ অর্ণবপোতে আমাদেরই ন্যায় অনেকগুলি মনুষ্য আছে।"

স্বভাব-সুকোমল করুণ-হৃদয়া মিরন্দা কাতর বচনে কহিল, "পিতঃ! যদি আপনারই ইচ্ছাক্রমে এই ভয়াবহ দারুণ ঝড় উত্থিত হইয়া থাকে, তবে অর্ণবস্থ সেই হতভাগ্যদিগের দুরবস্থা স্মরণ করুন! তাহাদের প্রতি প্রসন্ন হউন! দেখুন, দেখুন, জাহাজখানি বুঝি এখনই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়! হায়, হায়! হতভাগ্য জীবসমূহ! আমার যদি ক্ষমতা থাকিত, তবে আমি এই মুহূর্ত্তেই সাগরকে রসাতলে পাঠাই-তাম, পৃথিবী জলশূন্য করিতাম!—হায়! এই সুন্দর অর্ণবপোত সমেত এতগুলি জীবের

অমূল্য জীবন নষ্ট হইতে চলিল। অহো! ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে?"

---

(৪)

ঈষৎ হাস্যে প্রস্পরো উত্তর করিলেন, "বৎসে মিরন্দা! ব্যাকুল হইও না। কোন ভয় নাই। আমি এমন বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছি, যাহাতে অর্ণবপোত বা অর্ণবপোতস্থ মানবগণের কোন অনিষ্ট হইবে না। মা আমার! আমি যা করিলাম, সকলই তোমার মঙ্গলের জন্য। বৎসে! তুমি জান না, তুমি কে;—কোথা হইতে এই দ্বীপে আসিয়াছ। তুমি আমার সম্বন্ধে কেবল এই মাত্র জান যে, আমি তোমার পিতা;—আর অতি সামান্য অবস্থায় এই গুহায় বাস করিয়া আসিতেছি। এখানে আসিবার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত কি তোমার কিছু মনে পড়ে?—বোধ হয়, না।—কারণ সে সময় তোমার বয়স বড়-জোর তিন বৎসর মাত্র।"

স্নেহমাখা-স্বরে মিরন্দা কহিল, "হাঁ বাবা, আমার যেন কিছু কিছু মনে পড়ে।"

কন্যার শিরশ্চুম্বন করিয়া প্রস্পরো জিজ্ঞাসিলেন, "কি মনে পড়ে মা?—কোন অট্টালিকা অথবা মানুষ? বল বৎসে! পূর্ব্ববৃত্তান্ত তোমার কি স্মরণ হয়?"

মিরন্দা। স্বপ্নের ন্যায় অস্পষ্টভাবে যেন আমার কিছু-কিছু মনে হয়। আচ্ছা বাবা, চারি পাঁচ জন পরিচারিকা না সে সময় আমার লালন-পালন করিত?

প্রস্পরো। বৎসে! চারি পাঁচ জন কেন, তোমার পরিচর্য্যার জন্য আরও অধিক পরিচারিকা ছিল। যা হোক, এ কথাইবা কিরূপে তোমার ভাসা-ভাসা মনে আছে? ভাল, তুমি এখানে কিরূপে আসিলে, তাহা কিছু মনে হয় কি?

একটু ভাবিয়া সরলা বালিকা উত্তর করিল, না বাবা, আমার আর কিছু মনে হয় না।"

"তবে শুন বৎসে!"

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া প্রস্পরো আত্ম-জীবন-বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন।

---

(৫)

"তবে শুন বৎসে! আজ বার বৎসরের কথা বলিতেছি,—আমি মিলান দেশের রাজা ছিলাম। তুমি রাজ-কন্যা,—আমার একমাত্র সন্তান,—অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। এ্যাণ্টনিও নামে আমার এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল। তাহাকে আমি বড় ভাল বাসিতাম ও বিশ্বাস করিতাম। লোককোলাহল ও বৈষয়িক-কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নির্জ্জন-বাস ও শাস্ত্রপাঠ আমি ভাল বাসিতাম; সুতরাং তোমার খুল্লতাতের উপর রাজ্য-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের ভারার্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। সংসারের কোন কার্য্যই দেখিতাম না। রাজ্য, ধন, জন, সম্পত্তি—সকলই এ্যাণ্টনিওর করায়ত্ত হইল। ভাই আমার দুরাকাঙ্ক্ষা-পরবশ হইয়া স্বহস্তে সকল ক্ষমতা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইতে অভিলাষী হইল এবং আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী নেপল্‌স-রাজের সহায়তায় অচিরাৎ স্বীয় দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিল।"

মিরন্দা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তবে সে সময়ে তাহারা আমাদিগকে প্রাণে বধ করে নাই কেন?"

প্রস্পরো। বৎসে! অতটা সাহস করিয়া উঠিতে পারে নাই! না করিবার কারণও ছিল। কারণ, প্রজাবৃন্দ আমার প্রতি বড় অনুরক্ত ছিল। আমাকে প্রাণে বধ করিলে পাছে প্রজারা ক্ষেপিয়া উঠিয়া হিতে বিপরীত করে, এই ভয়ে অতটা করিতে পারে নাই। কিন্তু

প্রকারান্তরে তাহা সমাধা করিয়াছিল। তোমাকে ও আমাকে স্থানান্তরে পাঠাইবার অছিলায়, সমুদ্র মধ্যে লইয়া গিয়া এক ক্ষুদ্র তরীতে উঠাইয়া দেয়। আমাদিগকে চির-নির্ব্বাসন বা প্রাণে বধ করাই পাপিষ্ঠের আন্তরিক অভিপ্রায়। সে নৌকায় কোনরূপ খাদ্য দ্রব্য—এমন কি তৃষ্ণার জলটুকু অবধি ছিল না। আমরা অনাহারে, অকূল-পাথারে প্রাণত্যাগ করি, আর সে নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করে, এই তাহার অভিপ্রায়।—কিন্তু বিধির বিধান অন্যরূপ। গঞ্জালো নামক আমার এক সদাশয় প্রিয় অমাত্য সংগোপনে সেই নৌকার মধ্যে আমাদের প্রাণরক্ষোপযোগী দ্রব্যাদি দিয়া যান এবং সেই মহাত্মা আমার প্রাণোপম—রাজমুকুট অপেক্ষাও মূল্যবান্ কতকগুলি অমূল্যগ্রন্থ দিয়া আমার প্রাণরক্ষা করেন।

ব্যথিত-হৃদয়ে মিরন্দা কহিলেন, "হায় পিতঃ! সে দুর্দ্দিনে, না জানি, আমি আপনার কি গলগ্রহই হইয়াছিলাম!"

"না মা, এমন কথা বলিও না! সে দুর্দ্দিনে, সে অতিবড় ভারবহ জীবনে তুমিই আমার শান্তিদায়িনী, প্রাণ-রক্ষাকারিণী, দেবী-স্বরূপিণী হইয়াছিলে! মা রে, যখন তোর ঐ মধুমাখা সরল মুখারবিন্দে হাসির লহরী দেখিতাম, তখন আমি সমস্ত শোক-তাপ ও জ্বালা-যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইতাম।—তারপর শুন। ঈশ্বরেচ্ছায় আমরা একরূপ নিরাপদে এই দ্বীপে উপনীত হই। বহুকষ্টে তোমাকে লালন পালন করিয়া আজ এই এত বড়টী করিয়াছি। সর্ব্বাপেক্ষা আমার আনন্দের কথা এই, ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিয়া তোমার হৃদয় অলঙ্কৃত করিতে সমর্থ হইয়াছি।"

সজল-নয়নে, গদ্‌গদ স্বরে মিরন্দা উত্তর করিল, "জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করিবেন। আপনার ঋণ অপরিশোধনীয়। এক্ষণে পিতঃ, জিজ্ঞাসা করি, অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আপনি সহসা কেন এই প্রবল ঝড়-বৃষ্টি-ঝঞ্ঝাবাত আবির্ভাব করিলেন?"

প্রস্পেরো। অচিরাৎ সকল রহস্য জানিতে পারিবে। এই ঝড়ের কল্যাণে আমার সকল মনোরথ সফল হইবে। এক্ষণে এই অবধি জানিয়া রাখ যে, আমার চিরশত্রু নেপল্‌স-রাজ ও বিশ্বাসঘাতক, দুর্ব্বৃত্ত, আমার গুণের ভাই এ্যাণ্টনিও এই ঝড়ে পোতভ্রষ্ট হইয়া, ভয়-ব্যাকুলিত প্রাণে এই দ্বীপে উপনীত হইয়াছে।

সরলা, সংসার-জ্ঞান-বিহীনা মিরন্দা পিতার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া যুগপৎ বিস্ময় ও কৌতূহলে আপ্লুত হইল।

---

(৬)

কন্যার নিকট এই সকল দুঃখময়-কাহিনী প্রকাশ করিয়া, প্রস্পেরো একগাছি ঐন্দ্রজালিক দণ্ড দ্বারা মৃদুভাবে কন্যাকে স্পর্শ করিলেন। মন্ত্রপুত দণ্ড-স্পর্শে মিরন্দা চৈতন্য হারাইয়া তন্দ্রাভিভূতা হইল। এই সময়ে এরিয়েল নামে সেই পরী তথায় আবির্ভূত হইয়া ঝটিকা-বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কহিতে প্রবৃত্ত হইল। যদিও এই পরীগণ সকল সময়েই মিরন্দার অপ্রত্যক্ষীভূত ছিল, তথাপি প্রস্পেরো ইহা পছন্দ করিতেন না যে, তিনি শূন্যদেশ লক্ষ্য করিয়া কথোপকথন করেন, আর তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যা কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া, বিস্মিত ভাবে ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকে।

মিরন্দা তন্দ্রাভিভূতা হইলে, প্রস্পেরো এরিয়েলকে জিজ্ঞাসিলেন, "প্রিয় এরিয়েল, এক্ষণে আনুপূর্ব্বিক বল, কিরূপে তুমি আমার আদেশ প্রতিপালন করিলে?"

এরিয়েল ঝটিকা-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া কহিল, "জীবন-রক্ষার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া, জাহাজস্থিত আরোহিগণ প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া বিলাপ ও হাহাকার করিতে

লাগিল। নেপল্‌স-রাজপুত্র ফার্দ্দিনন্দ সর্ব্বপ্রথমে জলে ঝম্প প্রদান করিলেন। তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য ভাবিয়া, নেপল্‌স-রাজের পরিতাপের আর সীমা রহিল না। কিন্তু বাস্তবিক রাজপুত্রের প্রাণবিয়োগ হয় নাই। অন্য বিপদ দূরের কথা, তাঁহার মাথার একগাছি কেশও নষ্ট হয় নাই। সমুদ্র-জলে তাঁহার মূল্যবান্ পরিচ্ছদ আরও অধিক উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে। রাজপুত্র এক্ষণে এই দ্বীপের এক প্রান্তভাগে উপস্থিত আছেন। বিঘোরে, জনক প্রাণ হারাইয়াছেন ভাবিয়া, শোকে মুহ্যমান হইয়া রহিয়াছেন।"

প্রস্পারো আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "হাঁ, ঠিক হইয়াছে। এখন রাজপুত্রকে এখানে আনয়ন কর। আমার প্রাণাধিকা কন্যা রাজপুত্রকে দর্শন করিয়া সুখী হইবে।"

অতঃপর কহিলেন, "নেপল্‌স-রাজ ও আমার সহোদর এক্ষণে কোথায়?"

এরিয়েল। তাঁহারা দ্বীপের অপর প্রান্তে ক্ষুণ্ণমনে ফার্দ্দিনন্দের অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। স্বচক্ষে তাঁহাকে জলে ঝাঁপ দিতে দেখিয়াছেন, সুতরাং ফার্দ্দিনন্দের জীবনসম্বন্ধে তাঁহাদের আর আশা নাই। নাবিকগণও কেহ প্রাণে মরে নাই। কিন্তু এমন অবস্থায় সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া হতাশ-মনে বেড়াইতেছে যে, কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইতেছে না। সকলেই মনে করিতেছে, ভাগ্যক্রমে সেই-ই রক্ষা পাইয়াছে। আর জাহাজ খানিও তাহারা কেহই দেখিতে পাইতেছে না। সকলের অলক্ষিত ভাবে, নিরাপদে, সেখানি তট-সংলগ্ন করিয়া রাখিয়া দিয়াছি।

---

(৭)

মহামতি প্রস্পারো হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, "ভাল ভাল, তোমার কার্য্যে বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। তুমি আমার মনের-মত কাজ করিয়াছ। কিন্তু এখনও তোমায় অনেক কর্ম্ম করিতে হইবে।"

ক্ষুণ্ণমনে এরিয়েল উত্তর করিল, "মহাশয়, এখনও অনেক কাজ!"

অতঃপর আরও বিনীতভাবে কহিল, "প্রভু! এইবার আমার প্রতি কৃপা করুন। ভাবিয়া দেখুন, ইতিপূর্ব্বে আপনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, শীঘ্রই আমাকে অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন। মনে করিয়া দেখুন, আপনি আমাকে যখনই যে বিষয়ের আদেশ করিয়াছেন, কার্য্যের গুরুত্ব লঘুত্ব আদৌ বিবেচনা না করিয়া অম্লানবদনে তাহা সম্পন্ন করিয়াছি। কোন রকমে ফাঁকি দিই নাই, বা কোনরূপ বিরক্তি-ভাবও দেখাই নাই।"

ঈষৎ হাস্যে প্রস্পারো কহিলেন, "এরিয়েল, পূর্ব্বকথা তোমার কিছু মনে পড়ে কি? সেই নির্দ্দয়া ডাকিনী সাইকোর‍্যাক্সকে কি তোমার মনে পড়ে? তাহার জন্মস্থান কোথায়, বল দেখি?"

এরিয়েল। আজ্ঞে, এ্যালজিয়ার্স দেশে সে পাপিষ্ঠা জন্মগ্রহণ করে।

প্রস্পারো। হাঁ, বটে! দেখিতেছি, সকল কথা তোমার স্মরণ নাই। আচ্ছা, আমি তোমাকে সে সব কাহিনী শুনাইতেছি। এই পাপিষ্ঠা ডাকিনী আপন ঘৃণিত, জুগুপ্সিত ও মনুষ্য-সমাজের অশ্রাব্য দুষ্কর্ম্মের জন্য নাবিকগণ কর্ত্তৃক এই বিজন দ্বীপে নির্ব্বাসিতা হয়। এখানে আসিয়াও পাপিষ্ঠার সে অসৎস্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। সে তোমাকে নানারূপ কুক্রিয়ায় আসক্ত করিতে যত্ন পায়। তুমি সচ্চরিত্রা বলিয়া তাহার আদেশপালনে পরাঙ্মুখ হও। পাপিষ্ঠা প্রতিহিংসাবশে তোমাকে বৃক্ষ-কোটরে অবরুদ্ধ রাখে। তুমি সেই অবস্থায় অশেষ যন্ত্রণায় কালাতিপাত কর। তার পর মনে পড়ে কি? আমিই এখানে আসিয়া তোমার সে দুরবস্থা মোচন করি।

মুহূর্ত্ত মধ্যে এরিয়েল সমস্ত বুঝিল। বুঝিল যে, পরম উপকারক প্রভুর সহিত সে অকৃতজ্ঞের ন্যায় ব্যবহার করিতেছে। অমনি লজ্জাবনত মুখে উত্তর করিল, "প্রভু, যথেষ্ট হইয়াছে, আমায় ক্ষমা করুন;—আর লজ্জা দিবেন না। এক্ষণে আদেশ করুন, কি করিতে হইবে;—আমি নতশিরে, অম্লানবদনে তাহা পালন করিতেছি।"

এবার প্রস্পারো সদয় হইয়া স্নেহমাখা স্বরে কহিলেন, "ভাল, আমার এই আদেশ পালন কর; শীঘ্রই তোমাকে স্বাধীন করিয়া দিব।"

এরিয়েল হৃষ্টমনে, প্রভু-আজ্ঞা-পালনে, আপন জিদ দেখাইল।

---

(৮)

অনন্তর এরিয়েল ফার্দ্দিনন্দের সন্নিকটে উপস্থিত হইল। দেখিল, রাজপুত্র পিতৃশোকে কাতর হইয়া, বিমর্ষভাবে তৃণ-শয্যায় উপবেশন করিয়া আছেন।

এরিয়েল অতি মৃদুস্বরে কহিল, "রাজপুত্র, তোমাকে আমি শীঘ্রই এখান হইতে লইয়া যাইতেছি। কুমারী মিরন্দাকে তোমার এই অতুল রূপরাশি দেখাইয়া মোহিত করিব।"

এই বলিয়া ফার্দ্দিনন্দের অদৃশ্যে থাকিয়া, মনোমোহকর মধুর স্বরে গান ধরিল;—

"অতল জলধি-তলে জনক তোমার,
প্রাণহীন—সংজ্ঞাহীন আছে নতিমার্।
বিশাল যুগল আঁখি, অনিমেষে চেয়ে থাকি,
প্রবালে বিভ্রম দেখি, তাঁরে, হে ধীমান্।
জল-বালা স্তুতি করে, মধুমাখা সুধাস্বরে,
ঐ শুন ঘণ্টারব,—অমরার গান॥" *

বিমান-পথে এই অভূতপূর্ব্ব করুণ-গীতি শ্রবণ করিয়া ফার্দ্দিনন্দ্‌ যার-পর-নাই বিস্মিত ও মোহিত হইলেন। বুঝিলেন, তাঁহার স্নেহময় পিতা আর ইহসংসারে নাই। একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি ভূমি হইতে উঠিলেন এবং এই গীতি-শব্দ লক্ষ্য করিয়া তদনুবর্ত্তী হইলেন। যেখানে প্রস্পারো ও মিরন্দা এক বৃহৎ তরুচ্ছায়া-তলে বসিয়া কথপোকথনে নিযুক্ত, এরিয়েল, রাজপুত্র ফার্দ্দিনন্দকে সেই দিকে লইয়া চলিল।

সংসার-জ্ঞান-বিরহিতা, সরলা, প্রকৃতি-অঙ্কে-প্রতিপালিতা, বালিকা মিরন্দা অকস্মাৎ দেবমূর্ত্তি ফার্দ্দিনন্দকে দেখিয়া, নির্নিমেষ-নয়নে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। বলা বাহুল্য, বালিকা, আপনাকে ও পিতাকে ভিন্ন দ্বিতীয় মনুষ্য-মূর্ত্তি আর কখন দেখে নাই। মিরন্দাকে একান্ত বিস্মিতের ন্যায় চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রস্পারো কহিলেন, "মা! ও কি দেখিতেছ।"

মিরন্দা অধিকতর বিস্মিতভাবে কহিল, "পিতঃ, নিশ্চিত ইনি কোন দেব-যোনি! দেখুন, দেখুন, ইহাঁকে কেমন সুন্দর দেখাইতেছে! আ মরি মার, এত রূপ! পিতঃ, সত্য বলিতেছি, বিধাতার এমন অপূর্ব্ব সৃষ্টি আমি আর কখন দেখি নাই! বলুন, ইনি কি দেব-যোনি নন?"

ঈষৎ হাস্যে প্রস্পারো উত্তরিলেন, "না মা! এ দেব-যোনি নয়, বা আর কিছু নয়। এ, আমাদের মত খায়, ঘুমায় এবং আমাদের মতই ইহার হিতাহিত জ্ঞান আছে। সেই দারুণ ঝড়ে যে জাহাজ খানি জলমগ্ন হয়, এই ব্যক্তি সেই জাহাজে ছিল। শোক-দুঃখে কাতর হইয়া এ ব্যক্তি এখন শ্রীহীন হইয়াছে; নচেৎ তুমি ইহাকে রূপবান্ বলিতে পারিতে। সঙ্গি-ভ্রষ্ট হইয়া এ ব্যক্তি এখন সেই সঙ্গীদের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে।"

পিতা-পুত্রীতে এই ভাবে কথোপকথন হইতে লাগিল।

* রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকায় এই গানটী গীত হইবে।

(৯)

ফার্দ্দিনন্দ্‌কে দেখিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মিরন্দার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, মানুষ মাত্রেই গম্ভীর, আর সকলেরই শ্বেত শ্মশ্রু বিদ্যমান। কারণ বালিকা, এক পিতা ভিন্ন এ অবধি আর কাহাকেও দেখে নাই। এখন তাহার সে ভ্রম ঘুচিল। বুঝিল যে, ইহ সংসারে কমনীয়-কান্তি মনোহর যুবকও আছে।

ফার্দ্দিনন্দও যার-পর-নাই বিস্মিত হইলেন। এই বিজনদ্বীপে অলোক-সামান্যা, অতুল লাবণ্য-বতী মিরন্দাকে দেখিয়া তিনি মনে মনে ভাবিলেন, নিশ্চয়ই ইনি এই দ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এরিয়েলের যে সুললিত মধুময় গানে তিনি এখানে আনীত হইয়াছেন, ভাবিলেন, সে সুধামাখা স্বর ইঁহারই মুখ-নিঃসৃত। ভক্ত-বিস্ময়, শোক-শান্তি—এককালে সকল রসের আবির্ভাবে, তিনি মিরন্দাকে "দেবী" সম্বোধন করিলেন।

বালিকা বিনীত বচনে মুখখানি নত করিয়া কহিল, "হে প্রিয়দর্শন। আমি দেবী বা আর কিছু নহি ;—আমি সামান্যা মানবী।"

এই বলিয়া অকপটে আত্মজীবন-বৃত্তান্ত বলিবার উপক্রম করিয়াছে, এমন সময় প্রস্পরো কন্যাকে বাধা দিলেন ; কিন্তু বৃদ্ধ, উভয়ের ভাব-গতিক দেখিয়া মনে মনে অধিকতর আনন্দিত ও সুখী হইলেন। বুঝিলেন, প্রথম দর্শনেই উভ-য়েই উভয়ের রূপে মোহিত হইয়াছে ও পরস্পর পরস্পরকে ভাল বাসিয়াছে। কিন্তু প্রাণাধিকা কন্যার প্রণয়-পাত্রের প্রণয় পরীক্ষা করিবার জন্য আপাততঃ তিনি কিছু কঠোর হইলেন এবং উভয়ের মিলনপথে বাধা দিলেন। কৃত্রিম কোপ-সহকারে পরুষ-বাক্যে ফার্দ্দিনন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ওহে ছদ্মবেশী যুবক। আমার কাছে তোমার কোন চালাকি বা ফন্দি-ফন্দি টিকিবে না। আমি কি আর তোমার দুরভি-সন্ধি বুঝি নাই।—এ দ্বীপের অধীশ্বর কে, চর হইয়া তুমি তাহার সন্ধান লইতে আসিয়াছ। তা ভাল কথা,—এস, আমার অনুবর্ত্তী হও ;—তোমাকে এ ধৃষ্টতার উচিত ফল দিব। তোমার পদদ্বয়ের সহিত গ্রীবাদেশ বদ্ধ করিব ; লবণাক্ত সমুদ্র-জল পান করাইব ; আর শম্বুক-মাংস ও নীরস তরুমূল খাওয়াইয়া তোমাকে প্রাণে মারিব। দুর্ব্বৃত্ত। আমার সহিত তোমার শঠতা।"

"না—কখনই না।"

সদর্পে, নির্ভীক ফার্দ্দিনন্দ্‌ উত্তরিলেন, "না কখনই না। যতক্ষণ না তোমাপেক্ষা প্রবল শত্রুর করায়ত্ত হইব, ততক্ষণ তোমাকে গ্রাহ্য করিব না,—তোমার ব্যবস্থিত এই সকল নিকৃষ্ট খাদ্যও মুখে তুলিব না।"

এই বলিয়া নির্ভীক যুবক কটিদেশস্থ তীক্ষ্ণ তরবারি গ্রহণ করিয়া প্রস্পরোকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন ; কিন্তু বৃথা চেষ্টা।—প্রস্পরো তাঁহার মন্ত্রপূত ঐন্দ্রজালিক দণ্ড ফার্দ্দি-নন্দের অঙ্গে স্পর্শ করিবামাত্র, ফার্দ্দিনন্দের সকল শক্তি অন্তর্হিত হইল। হাতের তরবারি হাতেই রহিয়া গেল ;—যেখানে যেমন ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন, কলের পুতুলটীর মত, সেখানে ঠিক সেই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন ;—এক পা নড়িবার-চলিবার যো রহিল না।

---

(১০)

এ দৃশ্যে করুণহৃদয়া মিরন্দার অন্তর গলিল। বালিকা সকাতরে জনককে কহিল, "পিতঃ। আপনি কেন এরূপ নির্দ্দয় হইতেছেন ? দয়া করুন। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, এ ব্যক্তি ছদ্মবেশী বা কপট নহে। ইহার জন্য আমি দায়ী রহিলাম। আমার বিবেচনায় নিশ্চয় ইনি সরল-প্রকৃতি।"

কৃত্রিম কোপসহকারে ভর্ৎসনা বাক্যে

প্রস্পেরো উত্তরিলেন, "চুপ কর। পুনরায় যেন তোমাকে আমার শাসন করিতে না হয়। কি আশ্চর্য্য! তুমি স্বচ্ছন্দে প্রতারকের পক্ষসমর্থন করিতেছ? আঃ অবোধ-বালিকা! তুমি একমাত্র কদাকার কালিবনের সহিত তুলনা করিয়া এই যুবাকে পরম প্রিয়দর্শন মনে করিতেছ! কিন্তু নিশ্চয় জানিও, সুন্দর যুবক-সমাজের তুলনায়, এই আগন্তুকের রূপ কালিবনের ন্যায়!"

বস্তুতঃ, কথাটা কি ঠিক? না—তাহা নহে। এটা বৃদ্ধের একটা কৌশল,—কন্যার প্রণয় পরীক্ষা করা মাত্র। ফার্দ্দিনন্দ্ রূপবান্ যুবক, কুৎসিত নহে।

পিতার ভর্ৎসনায় কোমল-হৃদয়া মিরন্দা নতমুখে মৃদুস্বরে উত্তর করিল, "আমার পছন্দ এই রূপই থাক;—আমি আর অন্য রূপবান্ পুরুষরত্নকে দেখিতে চাই না।"

অতঃপর প্রস্পেরো ফার্দ্দিনন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ওহে যুবক, এই দিকে এস; আমার অবাধ্য হওয়া তোমার সাধ্যায়ত্ত নহে।"

ফার্দ্দিনন্দও সর্ব্বান্তঃকরণে উত্তর করিলেন, "বস্তুত নয়।" রাজপুত্র বুঝিতে পারিলেন না যে, কিসে কি হইতেছে। ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রে বাধ্য হইয়া, তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, বিস্মিতের ন্যায় প্রস্পেরোর অনুবর্ত্তী হইলেন। মধ্যে মধ্যে এক একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া স্বভাব-সুন্দরী, করুণার মূর্ত্তিমতী প্রতিমা, মিরন্দাকে দেখিতে লাগিলেন। গহ্বরে প্রবেশ করিলে পর, তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "হায়! একি হইল? আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? কোথায় আমি? আমার বলবীর্য্য সমস্তই লোপ পাইল! আমি বন্দী হইলাম! শোকে, তাপে, মনঃকষ্টে, হৃদয় জর্জ্জরিত হইতেছে। কিন্তু এত কষ্টের মাঝে, যদি দিনান্তেও ঐ মাধুরিময়ী সৌন্দর্য্য-প্রতিমাকে একবার দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমার আর কোন ক্ষোভ নাই!"

পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ-শাবক মনোমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গহ্বরে অবরুদ্ধ হইলেন।

---

(১১)

সৌভাগ্যবশতঃ, রাজপুত্র ফার্দ্দিনন্দ্‌কে অধিকক্ষণ এ গহ্বর-কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। প্রস্পেরো অবিলম্বে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং শ্রমসাধ্য কাষ্ঠবহনের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। বৃদ্ধ জানিতেন যে, প্রাণাধিকা কন্যা গহ্বরের বাহিরে ফার্দ্দিনন্দকে অবশ্যই দেখিতে পাইবে এবং এ অবস্থায় উভয়ের প্রণয়ের গাঢ়তাও পরীক্ষিত হইবে। বৃদ্ধ প্রকারান্তরে রাজপুত্রের শ্রমসাধ্য কার্য্যের কথা মিরন্দার নিকট উল্লেখ করিয়া, পাঠাভ্যাসের অছিলায়, একটু অন্তরালে থাকিয়া প্রণয়ি-যুগলের প্রণয় পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এ-দিকে রাজপুত্র ফার্দ্দিনন্দ্, প্রস্পেরোর আদেশমত কাষ্ঠবহনের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার এ কঠিন পরিশ্রম সহিবে কেন? অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন।

মিরন্দা এ দৃশ্য দেখিলেন। দেখিলেন যে, তাঁহার প্রিয়তম যার-পর-নাই শ্রম-ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। বালিকা দয়ার্দ্রচিত্তে কহিল, "হায়! একি দেখি!"

অতঃপর ফার্দ্দিনন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "প্রিয়তম! থাক্ আর কাজ নাই; এ কঠিন শ্রম কি তোমার সাজে? দেখ, আমার পিতা এখন পাঠাগারে পাঠাধ্যয়ন করিতেছেন। অন্যূন তিন ঘণ্টার মধ্যে তিনি পড়া ছাড়িয়া উঠিতেছেন না। অতএব আমার একান্ত অনুরোধ, তুমি ক্ষণকাল বিশ্রাম কর।"

ফার্দ্দিনন্দ একটু দুঃখের-হাসি হাসিয়া কহিলেন, "ন প্রিয়তমে! তা পারিব না।

ফার্দ্দিনন্দ ও মিরন্দা।



প্রভুর কার্য্য শেষ না করিয়া বিশ্রাম লইতে আমার সাহস হইতেছে না।"

এ কথায় মিরন্দা একটী ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "ভাল, তুমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর, আমি তোমার হইয়া একটু কাজ করি।"

ফার্দ্দিনন্দ্, বালিকার দয়া দেখিয়া মোহিত হইলেন। মনে মনে তাঁহাকে শত ধন্যবাদ দিলেন। অবশেষে কহিলেন, "প্রাণাধিকে! তাহাও কি কথন সম্ভবে? তোমার এ কুসুম-সুকুমার শরীরে এ গুরুভার সহিবে কেন?"

"প্রিয়তম! কেন সহিবে না? তুমি তোমার ঐ দেবতুল্য দেহে এত শ্রম করিতেছ, আর আমি কি সামান্য,—আমি করিতে পারিব না?"

প্রণয়ি-যুগলের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক, অনেক বাদানুবাদ হইল। মিরন্দা, ফার্দিনন্দকে সাহায্য করিতে আসিয়া, বেশীরভাগে তাঁহার কার্য্যে বাধা জন্মাইল; কারণ, উভয়ের প্রেম-কথায় অনেক সময় অতিবাহিত হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফার্দিনন্দের এই শ্রম-সাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত করা, প্রস্পরোর একটা কৌশল মাত্র। প্রণয়িযুগলের প্রণয় পরীক্ষা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। অতএব তিনি পুস্তক পাঠের অছিলায় প্রচ্ছন্নবেশে উভয়ের কথোপকথন শুনিতে ও কার্য্য-কলাপ দেখিতে লাগিলেন। কথায়-কথায় ফার্দ্দিনন্দ্, মিরন্দার নাম জিজ্ঞাসিলেন। পিতার নিষেধসত্বেও মিরন্দা আপন নাম ব্যক্ত করিয়া কহিল, "প্রিয়তম, আমি পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলাম।"

নেপথ্যে দাঁড়াইয়া প্রস্পারো একটু হাসিলেন। কন্যার প্রতি অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হওয়া দূরে থাক, তিনি ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন।

এই অবসরে ফার্দ্দিনন্দও মুক্তকণ্ঠে প্রেমপরিপ্লুতস্বরে কহিলেন, "প্রাণাধিকে, আমি অনেক রমণী দেখিয়াছি, কিন্তু তোমার ন্যায় অনুপম স্ত্রীরত্ন লাভ করা আমি সৌভাগ্য জ্ঞান করি।"

মিরন্দাও মধুমাখাস্বরে কহিলেন, "আমি এ জীবনে দ্বিতীয় রমণী দেখি নাই। সুতরাং সৌন্দর্য্য কাহাকে বলে জানি না। পুরুষের মধ্যে পিতাকে ও তোমাকে দেখিয়াছি। তোমার রূপেই আমি মুগ্ধ। তোমাকে ছাড়িয়া জগতের আমি আর কাহাকেও চাহি না। তবে ভয় হয়, পিতার অজ্ঞাতে তোমার সহিত এরূপ ব্যবহার করিয়া, হয়ত আমি অপরাধিনী হইলাম।"

প্রণয়িযুগল প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন। নেপথ্যে দাঁড়াইয়া প্রস্পারো আনন্দ-গদ্গদস্বরে মনে মনে কহিলেন, "না মা, তোমার আবার অপরাধ কি! আমি ত এই চাই। নেপল্‌স-রাজপুত্রের সহিত তুমি পরিণীতা হইবে, ইহা অপেক্ষা আমার আর সুখ কি!"

ফার্দ্দিনন্দ ও এবার মুক্তকণ্ঠে মিরন্দাকে আত্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। কহিলেন, "প্রাণাধিকে, আমি নেপল্‌সের ভাবী রাজা এবং তুমি আমার মহিষী!"

কোমলহৃদয়া মিরন্দার চক্ষে আনন্দাশ্রু নির্গত হইল। বালিকা মধুমাখাস্বরে কহিল, "প্রিয়তম, আমি জানি না, কেন এ সুসংবাদে আমার চক্ষে জল পড়িতেছে! তবে আমি ভগবানের পানে চাহিয়া এই মাত্র বলিতে পারি, যদি তুমি আমাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হও, আমিও আহ্লাদে তোমার ধর্ম্মপত্নী হইব!"

ফার্দ্দিনন্দ, মিরন্দাকে ধন্যবাদ দিতে-না-দিতে প্রস্পারো প্রকাশ্য ভাবে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিরন্দাকে কহিলেন, "বৎসে, ভীত হইও না। আমি তোমাদের সকল কথা শুনিয়াছি; শুনিয়া সুখী হইয়াছি। আর ফার্দ্দিনন্দ, আমি যে তোমার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিয়াছি, তাহার প্রতিদান-স্বরূপ আমার এই কন্যারত্ন তোমাকে দান করিলাম। বোধ হয়, এখন তুমি বুঝিতে পারিলে যে, কেবলমাত্র তোমাদের প্রণয় পরীক্ষার জন্য আমি এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলাম।"

অতঃপর উভয়কে কহিলেন, "তোমরা এখানে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহ; আমার একটু কাজ আছে, আমি আসি। যে অবধি না আমি ফিরিয়া আসি, তোমরা এখানে সাবধানে থাকিও।" * * *

প্রস্পারো প্রস্থান করিলেন। ফার্দ্দিনন্দ ও মিরন্দা মনের সুখে প্রেমালাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

---

(১২)

যথাস্থানে গিয়া প্রস্পারো এরিয়েল নামে সেই পরীকে আহ্বান করিলেন। প্রভুর আহ্বানমাত্র এরিয়েলও তৎক্ষণাৎ তথায় আবির্ভূত হইল। প্রস্পারো, তাঁহার সহোদর ও নেপল্‌স-রাজের সংবাদ জিজ্ঞাসিলেন। এরিয়েল কহিল, "প্রভু! সে নিগ্রহের কথা আর বলিব কি? ভয়-আতঙ্কে তাহাদিগকে একরূপ অচৈতন্য করিয়া রাখিয়াছি। অথচ তাহারা সকল কষ্ট-যন্ত্রণা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে। যখন তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া, ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইয়া, অতিমাত্র ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং ক্ষুৎ-পিপাসায় ক্লিষ্ট হইয়া খাদ্য প্রার্থনা করিল, তখন আমি চকিতের ন্যায় তথায় প্রচুর পরিমাণে ভোজ্য সামগ্রী উপস্থাপিত করিলাম; কিন্তু যেমনি হতভাগ্যগণ তাহা ভোজনে প্রবৃত্ত হইবে, আমি অমনি মায়াবলে ভয়াবহ পক্ষীর আকার ধারণ করিয়া, প্রকাণ্ড পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক, সেই সমস্ত ভোজ্যদ্রব্য লইয়া অন্তর্হিত

হইলাম। অতঃপর তাহাদিগকে অতিমাত্র ভীত, চকিত, স্তম্ভিত ও বিস্মিত দেখিয়া, সেই ভয়াবহ গম্ভীর বিকটস্বরে তিরস্কার করিলাম। কহিলাম,—"রে পাপিষ্ঠগণ! তোদের সেই পূর্ব্বকার পৈশাচিক নিষ্ঠুরাচরণ স্মরণ করিয়া দেখ্! তোরা রাজ্যলোভে ধর্ম্মজ্ঞান হারাইয়া বিনাপরাধে মহাত্মা প্রস্পেরোকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিস্—তাঁহার একমাত্র শিশুকন্যাকে তাঁহার সহিত সমুদ্রে নির্ব্বাসিত করিয়াছিস্, এখন তাহার ফল ভোগ কর্!"

এরিয়েল আবার কহিল, "মহাশয়! বলিব কি, এখন আপনার সেই পাপিষ্ঠ সহোদর এ্যাণ্টনিও এবং নেপল্‌স-রাজ যার-পর-নাই অনুতপ্ত হইয়াছে। এ অনুতাপ কৃত্রিম নহে—যথার্থ। আমি যে ভূতযোনি,—এ দৃশ্য দেখিয়া আমারও দুঃখ হইয়াছে।"

এরিয়েলের কথা শুনিয়া মহামতি প্রস্পেরোর হৃদয় আর্দ্র হইল। বৃদ্ধ এবার দয়ার্দ্রচিত্তে কহিলেন, "এরিয়েল, তবে তুমি এখনই তাহাদিগকে এখানে আনয়ন কর। তুমি ভূতযোনি হইয়া যখন তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইতেছ,—আর আমার এ রক্ত-মাংসের শরীর—আমি তাহাদেরই একজন,—আমার হৃদয় আর্দ্র হইবে না? যাও, আমার স্নেহের এরিয়েল, শীঘ্রই তাহাদিগকে এখানে আনয়ন কর!"

---

(১৩)

প্রভু-আজ্ঞা পাইয়া এরিয়েল তৎক্ষণাৎ গন্তব্য স্থানে উপনীত হইল। নেপল্‌স-রাজ, এ্যাণ্টনিও ও গঞ্জালোর অলক্ষ্যে, মায়াধর এরিয়েল ব্যোমপথে মৃদুমধুর বীণা বাদন করিতে লাগিল। সেই মায়াময় বীণার অপূর্ব্ব ঝঙ্কার, সকলকে আকৃষ্ট করিল। নেপল্‌স-রাজ, এ্যাণ্টনিও ও গঞ্জালো মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই বীণা-স্বরের অনুবর্ত্তী হইলেন। এরিয়েল অলক্ষ্যে থাকিয়াও, তাঁহাদিগকে একেবারে প্রভু-সমীপে উপনীত করিল। পাঠকের স্মরণ থাকিবে, এই গঞ্জালো একদিন প্রস্পেরো ও তাঁহার শিশুকন্যার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন;—যে দুর্দ্দিনে দুর্ম্মতি এ্যাণ্টনিও নেপল্‌স-রাজের সাহায্যে প্রস্পেরোকে তাঁহার শিশু কন্যার সহিত অসহায়ে, নিরুপায়ে অকূল-পাথারে ফেলিয়া প্রাণে মারিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, সদাশয় গঞ্জালো সংগোপনে তাঁহাদের প্রাণরক্ষার উপায় করেন।

ক্ষোভ, দুঃখ, ভয়ে চিত্ত-বিভ্রম হইয়া আগন্তুকত্রয় প্রস্পেরোকে চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু মহামতি প্রস্পেরো সকলকেই চিনিলেন। তিনি প্রথমেই আত্মপ্রকাশ করিয়া সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে সর্ব্বাগ্রে গঞ্জালোকে আলিঙ্গন করিলেন এবং বাষ্পগদ্গদস্বরে কহিলেন, "প্রিয় গঞ্জালো, তুমিই আমার জীবন-দাতা! তোমার ঋণ আমি এ জীবনে ভুলিব না, কখন পরিশোধ করিতেও পারিব না।"

এইবার সকলে তাঁহাকে চিনিলেন। এ্যাণ্টনিও ও নেপল্‌স-রাজ এইবার বুঝিলেন, তাঁহাদেরই অধর্ম্মে ও অত্যাচারে যিনি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অকূল পাথারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, সম্মুখেই সেই মহামতি পুণ্যাত্মা প্রস্পেরো বিদ্যমান! ক্ষোভ ও লজ্জার আর অবধি রহিল না।

এ্যাণ্টনিও বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে, কাতরস্বরে যার-পর-নাই অনুতাপ করিয়া অগ্রজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। নেপল্‌স-রাজও অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া কহিলেন যে, অন্যায় পূর্ব্বক তিনি এ্যাণ্টনিওর পক্ষ সমর্থন করিয়া মিলন-রাজ প্রস্পেরোকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। উভয়েই ক্ষোভ, দুঃখ, অনুতাপ ও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলেন।

বলা বাহুল্য, মহামতি প্রস্পেরো তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ক্ষমা করিলেন। এইবার এ্যাণ্টনিও ও নেপল্‌স-রাজ, প্রস্পেরোর সাধ্য-

প্রাপ্য রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবেন অঙ্গীকার করিলেন। প্রত্যুত্তরে প্রস্পরোও ঈষৎ হাস্তে নেপল্‌স-রাজকে কহিলেন, "আমিও আপনাকে এক মহামূল্য বস্তু উপহার দিব।"

এই বলিয়া তিনি পার্শ্বস্থ একটী কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। দ্বার উদ্ঘাটিত হইবামাত্র নেপল্‌সরাজ সবিস্ময়ে, পুলকিত অন্তরে দেখিলেন, তাঁহার প্রাণোপম পুত্ররত্ন ফার্দ্দিনন্দ্ এক অলোকসামান্যা অসমা সুন্দরীর সহিত অক্ষক্রীড়ায় নিযুক্ত!

পিতা-পুত্রের আনন্দের আর সীমা রহিল না। আনন্দে ও বিস্ময়ে তাঁহারা অভিভূত হইলেন। কারণ তাঁহারা পরস্পর মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, দারুণ ঝড়ে জলমগ্ন হইয়া উভয়েই প্রাণ হারাইয়াছেন। এক্ষণে এই আকস্মিক পুনর্ম্মিলনে উভয়েরই মনে যে কতখানি আনন্দের উদয় হইল, তাহা কেবল উভয়েই বুঝিলেন।

আর মিরন্দা?—বালিকার যত আনন্দ উল্লাস না হউক, বিস্ময়ে তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল! নির্নিমেষ-নয়নে আগন্তুকগণের পানে চাহিয়া বালিকা কহিল, "ওঃ, কি অপরূপ! আহা, কি মনোরম দৃশ্য! এই পবিত্র জীবগুলি কি সুন্দর! ধন্য সেই স্থান, যেখানে এই মনুষ্যগণ বাস করে!"

প্রকৃতি-অঙ্কে প্রতিপালিতা, সংসারজ্ঞান-বিহীনা, সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তিমতী প্রতিমা, সরলা বালিকার কি অপূর্ব্ব মধুময়ী উক্তি!

---

(১৪)

অলোকসামান্যা, মোহিনীপ্রতিমা মিরন্দাকে দেখিয়া, নেপল্‌স-রাজও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি সবিস্ময়ে পুত্রকে জিজ্ঞাসিলেন, "ইনি কে?—বোধ হয় কোন দেবী;—প্রথমতঃ আমাদের প্রতি বিরূপ হইয়া দুর্দ্দশা-গ্রস্ত করিয়াছিলেন; এক্ষণে আবার দয়াপরবশে আমাদিগকে সম্মিলিত করিয়া দিলেন!"

মৃদুহাস্তে ফার্দ্দিনন্দ্ কহিলেন, "না পিতঃ! ইনি দেবী নহেন, মানবী। আমারও প্রথম এইরূপ ভ্রম হইয়াছিল। ভগবানের কৃপায় ইনি এখন আমার সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন।"

অতঃপর আবার কহিলেন, "পিতঃ! সন্তানের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আমার কোন দোষ নাই;—আমি ভাবিয়াছিলাম, এ জীবনে আর আপনাকে পাইব না।—তাই আপনার বিনানুমতিতে ইহাঁকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছি। ইনি, এই অশেষ গুণশালী, সুবিখ্যাত মিলন-রাজ প্রস্পরোর দুহিতা। এ মহাত্মার গুণরাজীর কথা অনেক শুনিয়াছি; আজ ইহাঁকে চক্ষে দেখিয়া ধন্য হইলাম। এই মহাত্মার আশীর্ব্বাদেই আমি নবজীবন লাভ করিয়াছি। প্রাণাধিকা কন্যারত্ন দান করিয়া ইনি আমার পিতৃস্থানীয় হইয়াছেন।"

"তবে—তবে আমিও নিশ্চয় এই অনুপমা কন্যার জনক হইব!"

অতঃপর আত্মধিকার করিয়া নেপল্‌স-রাজ আবার কহিলেন, "হায়! আমি দুর্ব্বুদ্ধি-বশে কি কুকর্ম্মই করিয়াছিলাম! হাতে করিয়া এমন সোণার প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম,—এ চিন্তা যখনই আমার মনে আবির্ভূত হইবে, তখনই আমি মর্ম্মাহত হইতে থাকিব!"

"কাজ নাই আর ও-কথায়!"

মহামতি প্রস্পরো কহিলেন, "কাজ নাই আর ও-কথায়। অতীতের স্মৃতি বিস্মৃত হউন। সে দুঃখ-কাহিনী না তোলাই ভাল। ঈশ্বরেচ্ছায়, আজ আমাদের বড় সুখের—বড় আনন্দের দিন! আসুন, আজ আমরা প্রাণ ভরিয়া আনন্দ উপভোগ করি।"

অনন্তর সহোদর এ্যাণ্টনিওকে আলিঙ্গন করিয়া সদাশয় বৃদ্ধ কহিলেন, "ভাই আমার,

আর অনুতপ্ত হইও না। গত-সূচনা ভুলিয়া যাও। সত্য বলিতেছি, আমি তোমায় অন্তরের সহিত ক্ষমা করিলাম। দেখ, সকলই বিধির বিধান! আমি যে রাজ্যচ্যুত হইয়া অসহায়ে, নিরুপায়ে শিশুকন্যাকে লইয়া অকূল পাথারে ভাসিব এবং শেষে যে আমার সেই প্রাণের দুহিতা নেপল্‌সরাজের পুত্রবধূ হইবে, আর তোমাদের সহিত এইরূপে পুনর্মিলন ঘটিবে, এ সকলই সেই সর্ব্বনিয়ন্তার ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, খেদ কর কেন ভাই?"

প্রস্পরো যতই সদয় ব্যবহার দেখাইতে ও সৌজন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এ্যাণ্টনিও ততই অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইতে লাগিলেন। অশ্রুজলে তাঁহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। প্রভুভক্ত গঞ্জালোও এ অপূর্ব্ব দৃশ্যে আনন্দাশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি মুক্তপ্রাণে বরকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

---

(১৫)

এইবার মহাত্মা প্রস্পরো সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে, তাঁহাদের জাহাজখানি জলমগ্ন হয় নাই,—নিরাপদে তট-সন্নিকটে সংরক্ষিত হইয়াছে এবং নাবিকগণও সকলে জীবিত আছে। অধিকন্তু বলিলেন, "প্রাণাধিকা মিরন্দাকে সঙ্গে লইয়া আগামী কল্যই আমরা সকলে স্বদেশে যাত্রা করিব।"

অতঃপর কহিলেন, "ইতি মধ্যে সকলে মিলিয়া আসুন;—আমার এই সামান্য আবাসে যৎকিঞ্চিৎ আহারীয় দ্রব্য সংগৃহীত আছে, সকলে মিলিয়া সেবন করিয়া কিছু বিশ্রাম লাভ করিবেন। অতঃপর সান্ধ্য-আনন্দ-উৎসবে সকলকে আমি দীর্ঘ আত্ম-জীবনবৃত্তান্ত শুনাইব। এই জনশূন্য দ্বীপে উপনীত হওয়াবধি আজ পর্য্যন্ত যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, আনুপূর্ব্বিক কহিব।"

এই বলিয়া তিনি কালিবন নামক সেই জীবটীকে আহ্বান করিলেন এবং খাদ্য প্রস্তুত ও গহ্বর সজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন। কালিবনের সেই কিম্ভূত কিমাকার বিতিকিচ্ছি চেহারার কাট্‌মা খানি দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। প্রস্পরো কহিলেন, "এই বিজন দ্বীপে এই জীবটীই আমার একমাত্র সম্বল। ইহা দ্বারাই আমার সকল পরিচর্য্যা হয়।"

এইবার প্রস্পরো এরিয়েলকে স্বাধীন করিয়া দিলেন। এরিয়েলের আর আনন্দের অবধি রহিল না। সে, সুখের পায়রার ন্যায়, গায়ে টুসি দিয়া, কখন বিমানে, কখন শ্যামল তরু-তৃণে, কখন সুপক্ক ফলে, কখন মধুগন্ধ ফুলে, ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া বেড়াইবে মনস্থ করিল।

প্রস্পরো তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "প্রিয় এরিয়েল, আজ হইতে তুমি স্বাধীন হইলে।"

এরিয়েল সকৃতজ্ঞ-হৃদয়ে উত্তর করিল, "প্রভো! এজন্য আপনাকে শত ধন্যবাদ। এক্ষণে আমাকে এই অনুমতি করুন, আমি অনুকূল বায়ুভরে নিরাপদে পোতসমেত আপনাদিগকে গন্তব্যস্থানে পঁহুছিয়া দিই। অতঃপর আমি প্রভুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। তারপর যখন সম্পূর্ণ স্বাধীন হইব,—প্রভু জানেন ত, তখন কি সুখে, কত আনন্দে আমি দিনযাপন করিতে থাকিব!"

এই কথা বলিয়া এরিয়েল দিক্‌দিগন্ত কাঁপাইয়া এক মধুর গান ধরিল;—

"মধুকর যথা হরষ-অন্তরে
বিহরে, আমিও রহিব তথা।
কুসুম-কলিকা পাশে শোব আমি,
পেচকের রব শ্রবণে শুনি'।
বাদুড়-বাহনে বেড়াব বিমানে,
সুখে যাবে দিন নব-অনুরাগে।
হাসিয়ে খেলিয়ে, নাচিয়ে গাহিয়ে,
ফুলেভরা-ডালে রব চিরদিন॥" *

---

* খাম্বা মিশ্র—তাল একতালা।

এইবার প্রস্পেরো তাঁহার সাধের মায়াময় ঐন্দ্রজালিক পুস্তকাদি ও মন্ত্রপূত দণ্ড মৃত্তিকা-প্রোথিত করিলেন। তাঁহার আর কোন সাধ অপূর্ণ রহিল না। বিপক্ষ-পক্ষগণ পরাভূত, সহোদর বশীভূত হইল; অধিকন্তু নেপল্‌স-রাজের সৌহার্দ্দ লাভ করিয়া তিনি পরম প্রীতি লাভ করিলেন। প্রস্পেরোর অধিক আনন্দের কথা এই যে, তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যা মিরন্দা, নেপল্‌স-রাজের পুত্রবধূ—রাজপুত্র ফার্দ্দিনন্দের সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন। বৃদ্ধের আর আনন্দের সীমা রহিল না। এরিয়েলের সাহায্যে, তাঁহারা অবিলম্বে দেশে পঁহুছিলেন এবং মহা মহোৎসবে মিরন্দা ও ফার্দ্দিনন্দের শুভ পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

দুইটী সনেট।

ভাগীরথী।

ভাবি আমি নিশিদিন, অয়ি ভাগীরথি,
তব জন্ম-ইতিহাস; যবে মা প্লাবনে
তরাইলে সগরের বংশধরগণে;—
করুণার ধারা তুমি ধর্ম্ম-স্রোতস্বতী।
শুনিয়াছি লোকমুখে, যে রাখে ভকতি
রাঙা পায়, পাপ-মুক্তি পায় সে মরণে;
হোমানল-শিখাসম ভব-তপোবনে
উন্নতির ঊর্দ্ধলোকে সদা তার গতি।
তাই আমি, ত্রিপথগে, প্রত্যহ আসিয়া
পুণ্যনীরে করি স্নান; বাসনা মানসে,
শিখিব মা আত্মজয়, ফেলিব ছিঁড়িয়া
ধরার বন্ধন-রাশি জ্ঞান-দাবানলে;
অবশেষে সর্ব্বজয়ী, জয়মাল্য গলে,
বিচরিব বিশ্বময় বিপুল হরষে।

জীবন-সংগ্রাম।

নিতান্ত কি, হে দেবতা, এ দুরন্ত রণে
পরাজয় হ'বে মোর? আসিবে মুদিয়া-
স্পন্দহীন আঁখিপাতা, পড়িবে ঝরিয়া
আশার কুসুম-রাজি হৃদি-ফুলবনে?—
কিন্তু ভীত নহি আমি,—মন্ত্রের সাধনে
মৃত্যু ভয় ভাবি' কবি মরে কি ডরিয়া?
আলোক-প্রদানে দীপ যদি বা নিবিয়া
যায়, যাক্;—কবি তাহে দুঃখ নাহি গণে।
জানি আমি, যথাশক্তি যুঝি' যে সংসারে
ত্যজে প্রাণ, সেও জয়ী; তা'রও যশোগানে
গাহে লোক বীরবৃন্দ মাঝে। ভবালয়ে
এইরূপ, চক্রবৎ আলো অন্ধকারে,
কা'রও বা বিলয়ে, আর কা'রও অভ্যুদয়ে,
সিদ্ধ হয় বিধাতার উদ্দেশ্য মহান্।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

।

যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বজাতি মনুষ্যের ন্যায় সমভাবে আপনাদিগের বীরত্ব, সহিষ্ণুতা, শ্রমশীলতা প্রভৃতি অশেষবিধ গুণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া নরসমাজে সর্ব্বত্রই আদৃত ও জন্তুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হইয়াছে। মণ্ডার সত্যই লিখিয়াছেন;—"Had not custom dignified the lion with the title of the "king of beast" reason could nowhere confer that honour more deservedly than on the Horse." *

স্বাধীন অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইলে মনুষ্য-সমাজে, অশ্বের শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং শিক্ষার

* সিংহকে পশুরাজ বলা যদি মনুষ্যের রীতি না হইত, তাহা হইলে অন্য সকল পশু অপেক্ষা অশ্বই এই আখ্যা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য বিবেচিত হইত।

ইহাদিগের স্বাভাবিক গুণরাশি কিরূপ বিকশিত হইয়া থাকে, পৃথিবীর কুত্রাপি তাহা অবিদিত নাই। অশ্ব সর্ব্বতোভাবে মনুষ্যের উপকার করিতে তৎপর, কখনও তাহার আজ্ঞা-প্রতিপালনে বিমুখ নহে। অশ্বের সুন্দর গঠন, গম্ভীর প্রকৃতি, কার্য্যে উৎসাহ—সমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বাইবেল শতমুখে তাহার প্রশংসা করিয়াছেন।

অশ্বের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোথাও কোনরূপ বিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায় না। অশ্বের গঠন যেমন সুন্দর, কার্য্যকলাপও তেমনি বিস্ময়কর। ইহাদের ললাট বিস্তৃত, চক্ষুর্দ্বয় বৃহৎ ও জ্যোতিপূর্ণ, কর্ণ শরীরের উপযোগী—গর্দ্দভের ন্যায় অতিরিক্ত লম্বা কিংবা হস্তীর ন্যায় অত বিকৃতরূপে বৃহৎ নহে। অশ্বের স্কন্ধদেশ সুগঠিত, তদুপরি যে লোম উৎপন্ন হয়, তদ্দর্শনে ইহাদিগকে যথার্থই বীর-কেশরীর ন্যায় মনে হয়। পশ্চাভাগের দীর্ঘ লাঙ্গুল অপরাপর অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করে। অশ্বের শরীরের কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। প্রত্যেক চোয়ালের দন্তশ্রেণীর মধ্যে ছয়টী কর্ত্তন করিবার দন্ত থাকে, দুইটী বিদ্ধ করিবার দন্ত হয় এবং পেষণ করিবার দন্তগুলি চেপ্টা হয়। অন্ত্র অতি বৃহৎ; পাকস্থলী ক্ষুদ্র। অশ্বের মস্তিষ্ক সম্পূর্ণরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পক্ষী প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অল্পবুদ্ধি প্রাণিগণের মস্তিষ্কের ততদূর বৃদ্ধি হয় না। মস্তিষ্কের আয়তনের সহিত বুদ্ধির অতি নিকট সম্বন্ধ আছে—সেই কারণ অশ্বজাতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন। অশ্বের দৃষ্টিশক্তি অতি তীক্ষ্ণ। চক্ষুর্দ্বয় এমনি ভাবে অবস্থিত যে, অবনতমুখে আহার-কালে অশ্ব সোজাসুজি বহুদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পায়। রজনীতে ইহাদের দর্শনক্রিয়ার কোন রূপ ব্যাঘাত হয় না। অশ্বের শ্রবণশক্তি অত্যন্ত প্রবল এবং সামান্য শব্দ পর্য্যন্ত ইহাদের কর্ণে প্রবেশ করে। প্রবল শ্রবণশক্তি বুদ্ধিচাতুর্য্যের একটী লক্ষণ। কথিত আছে, যে সকল অশ্ব সামান্য শব্দে ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখে এবং কোনও মনুষ্য সম্মুখীন হইলে তাহাকে আঘ্রাণ করে, তাহারা অতি অল্প আয়াসে সুশিক্ষিত হয়। অশ্ব বহুদূর হইতে দ্রব্যাদির আঘ্রাণ গ্রহণ করিতে পারে। আস্বাদ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা অশ্বের বিলক্ষণ প্রবল। যাবতীয় তৃণজীবী প্রাণিগণের মধ্যে সুস্বাদু ও সুমিষ্ট দ্রব্য পাইলে অশ্ব যেরূপ পুলকিত হয়, অপর কোন প্রাণী ততদূর হয় কিনা সন্দেহ। ক্ষেত্রে অশ্বগণ অপরাপর পশ্বাদির ন্যায় যথেচ্ছ না খাইয়া বাছিয়া বাছিয়া তৃণ ভক্ষণ করে। অশ্বের অনুভব-শক্তি বিলক্ষণ আছে, কোন রূপ অপকারী পতঙ্গ ইহাদের চর্ম্মের উপর বসিলে তৎক্ষণাৎ গাত্র কুঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। অশ্বের স্বর বৈচিত্র্যময়। আমরা যেরূপ মনের অবস্থা অনুসারে কখনও সুকণ্ঠে গীত গাই, কখনও কাতরভাবে ক্রন্দন করি এবং কখনও বা ক্ষীণকণ্ঠে মনোভাব ব্যক্ত করি, অশ্বেরও সেইরূপ বিভিন্নাবস্থার সহিত কণ্ঠস্বর সম্বন্ধ থাকে। সাধারণতঃ ইহাদিগের কণ্ঠস্বর পাঁচ প্রকার। যে স্বর ক্রমে প্রবল হইতে প্রবলতর হয়, তাহা আহ্লাদ-ব্যঞ্জক। যে স্বর অতি গম্ভীর, তাহাতে কোনও মনোভাব ব্যক্ত করে। রাগদ্বেষাদি-জনিত স্বর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও ক্ষণস্থায়ী হয়। ভয়বিহ্বল হইলে নাসিকা হইতে স্বর নির্গত হয়। দুঃখ হইলে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসে এবং শ্বাস দীর্ঘ হয়। যে সকল অশ্বের স্বর সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিব্যঞ্জক, তাহারা উচ্চজাতীয় বলিয়া পরিগণিত।

অশ্বের বয়স নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ইহাদের দন্ত পরীক্ষা করাই প্রশস্ত উপায়। ভূমিষ্ঠ হইবার পর চার পাঁচ দিনের মধ্যেই অশ্বের সম্মুখের দন্ত বহির্গত হয়। আড়াই বৎসর বয়ঃক্রমকালে

সে দন্ত উন্মূলিত হইয়া অত্যল্পকাল মধ্যে তাহার পরিবর্ত্তে নূতন দন্ত হয়। পর বৎসর উভয় শ্রেণীর উভয় পার্শ্ব হইতে এক একটী করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ চারিটী দন্ত উন্মূলিত হয়। চারি বৎসরের সময় আরও চারিটী দন্ত পড়িয়া যায় এবং নূতন দন্তচতুষ্টয় তাহাদিগের স্থান অধিকার করে। শেষোৎপন্ন দন্ত চারিটী দেখিয়া অশ্বের বয়স স্থির করা যাইতে পারে—কারণ দন্তগুলির মধ্যস্থল গভীর হইয়া যায় এবং কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। পাঁচ বৎসরের সময় এই সকল দন্ত আর দৃষ্ট হয় না। ছয় বৎসরকালে পতিত দন্তগুলির স্থান পাংশুবর্ণ প্রাপ্ত হয়। অষ্টম বর্ষে সে চিহ্ন পর্য্যন্তও একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। বিদ্ধ করিবার অথবা পেষণ করিবার দন্ত দেখিয়াও অশ্বের বয়স ঠিক করা যাইতে পারে; কিন্তু মাড়ীর উপর হইতে বয়স নির্দ্ধারণের চিহ্ন সকল লুপ্ত হইলে বয়স ঠিক করা সুকঠিন। যে সকল অশ্ব আস্তাবলে থাকে, তাহাদিগের উক্ত চিহ্ন সকল অল্পকালে বিলুপ্ত হয়; যাহারা ময়দানে বিচরণ করে, তাহাদিগের মাড়ীর চিহ্ন অনেক দিন পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ অশ্বের গতি ত্রিবিধ—মন্দগতি, দ্রুতগতি ও সলম্ফদ্রুতগতি। মন্দ মন্দ গমন কালে পাদচতুষ্টয় যথাক্রমে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া থাকে। দ্রুতগমনকালে শুধু যে গতি দ্রুত হয় তাহা নহে, পশ্চাতের পদদ্বয় একেবারে অগ্রসর হয়। সলম্ফ গমনকালে সম্মুখের উভয় পদের সহিত পশ্চাতের পদদ্বয় সমভাবে এক একটী লম্ফে অতি দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে। শিক্ষা দ্বারা এই ত্রিবিধ গতি বিভিন্ন-রূপে পরিণত করা যাইতে পারে। গতি দেখিয়া অশ্বনির্ব্বাচন করিতে হইলে অনেক সতর্কতার আবশ্যক, যেহেতু উহাতে অশ্বের শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

অশ্বের গঠনতত্ত্ব বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। দেহের আয়তনের সহিত মস্তকের সমাঞ্জস্য থাকা আবশ্যক; চোয়াল এমনি ভাবে অবস্থিত হইবে যে, মস্তকের সহিত গলদেশের সম্মিলনে একটী কোণ হইবে। চক্ষু উজ্জ্বল ও তাহার আবরণ অতিসূক্ষ্ম হইবে। কর্ণ সূক্ষ্ম ও সোজা হওয়া আবশ্যক। যে সকল অশ্বের কর্ণ অত্যন্ত ঝোলা, তাহারা সচরাচর কিছু বুদ্ধিহীন ও অনিষ্টকারী হইয়া থাকে। সকল জাতীয় অশ্বেরই নাসারন্ধ্র বড় হওয়া আবশ্যক। রেথর, হণ্টার, রোডষ্টার প্রভৃতি যে সকল অশ্ব কেবলমাত্র নাসিকা দ্বারা শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের নাসারন্ধ্র ক্ষুদ্র হইলে বদ্ধশ্বাসে বহুদূর গিয়া শ্বাসত্যাগকালে বিপদের সম্ভাবনা। গ্রীবা পরিমিতরূপ লম্বা না হইলে ইহারা অধিক ভার গ্রহণে পরাঙ্মুখ হয় এবং স্বচ্ছন্দে তৃণাদি ভক্ষণ করিতে পারে না। বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক, কারণ ফুসফুস্ শ্বাসযন্ত্র প্রভৃতি প্রধান প্রধান যন্ত্রাদিও এই স্থানে অবস্থিত। যাহারা মন্দগামী এবং গমনকালে অল্পমাত্র বায়ু গ্রহণ করে, তাহাদের বক্ষ বৃত্তাকার হইবে এবং যাহারা দ্রুতগমন করে এবং রুদ্ধশ্বাস প্রযুক্ত একেবারে অধিক বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাদিগের বক্ষঃস্থল অধিক পরিমাণ মাংসপেশী ধারণের উপযোগী ও প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক। কটিদেশ প্রভৃতি শরীরের অন্যান্য স্থল সুগঠিত হইবে। অশ্বের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মনোযোগ পূর্ব্বক পরীক্ষা করিলে ইহার গঠন-কৌশল ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধ হইবে।

কোন্ সময়ে মনুষ্য-সমাজে অশ্বজাতি দৃষ্ট হইল, ইতিহাস-লেখকেরা তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। সম্ভবতঃ ঐতিহাসিক কালের প্রারম্ভ হইতে কোন কোন স্থানে এই সকল প্রাণী মূর্য্যাদা সম্পন্ন বলিয়া পরিগণিত ছিল। খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়,—নিম্রোদ

আফ্রিকার বিশাল মরুভূমি হইতে সর্ব্বপ্রথম অশ্বগণকে গৃহে আনয়ন করিয়া নানা কার্য্যে নিযুক্ত করে। মহাভারতে দেখা যায়, সমুদ্র-মন্থনকালে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের উৎপত্তি হইয়াছিল। বেদেও অশ্বের উল্লেখ আছে। আর যে কত পূর্ব্বে সমাজে অশ্বজাতির অস্তিত্ব ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই।

সংস্কৃত সাহিত্যে অশ্বজাতির গুণরাশির অনেক প্রশংসা আছে। * অতি প্রাচীন কালে ব্রিটনবাসীরা অশ্বের গুণরাজী ও প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্র অবগত ছিল না। সুদূর ইটালী হইতে যখন রোমানেরা নানারূপে সজ্জিত হইয়া অসভ্য ব্রিটনবাসীদিগকে আক্রমণ করিল এবং আপনাদিগের শিক্ষিত শ্রমশীল অশ্বদিগের ও বিবিধ যুদ্ধাস্ত্রের সাহায্যে অসভ্য আদিমনিবাসিগণকে পরাভূত করিল, তখনই সেই বিজিত-ব্রিটনবাসীরা অশ্বের ক্ষমতা ও আবশ্যকতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। এথেল্‌সট্যান্ ফ্রান্স হইতে কতকগুলি উচ্চজাতীয় জর্ম্মাণ-দেশীয় অশ্ব আনয়ন করিয়াছিলেন। প্রথম রিচার্ডের রাজত্বকালে ধর্ম্মযুদ্ধে নিযুক্ত হইয়া যে সকল ব্যক্তি প্যালেসটাইন্ গমন করিয়াছিলেন, প্রত্যাগমন কালে তাঁহারা তদ্দেশীয় কতকগুলি উচ্চজাতীয় অশ্ব সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই সকল আরবীয় ও ইউরোপীয় অশ্ব হইতে এক নূতন শ্রেণীর অশ্বের উৎপত্তি হইয়াছিল। জন্ আপন রাজত্ব কালে ফেলানুর্ডারস্ দেশীয় অশ্ব স্বরাজ্যে আনয়ন করিয়া পরম যত্নে পালন করিয়াছিলেন। এইরূপে ইংলণ্ডে অশ্বজাতির গৌরব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—সমরে অশ্বের প্রয়োজনীয়তা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গেল, রাজপথে শকটশ্রেণী অশ্বযুক্ত হইল, প্রশস্ত মাঠে ঘোড়দৌড়ের ক্রীড়া দর্শক-বৃন্দকে মোহিত করিতে লাগিল—অনতিকাল মধ্যে অশ্ব দ্বারা দেশের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইল।

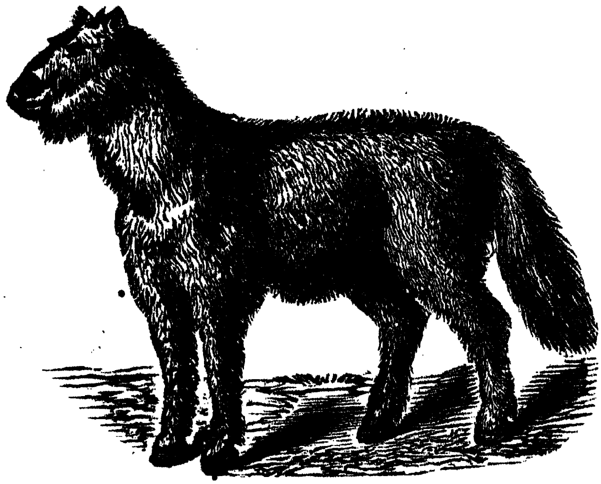
স্মিথ্‌সন সাহেবের মতে ইংলণ্ডদেশীয় অশ্ব আরবদেশীয় অশ্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং নানাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তাহাদের স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইংলণ্ডের ঘোড়-দৌড়ের অশ্ব সর্ব্বাংশে প্রায় আরবীয় অশ্বের অনুরূপ—উভয়ের মধ্যে আকৃতির, প্রকৃতির অতি সামান্য প্রভেদ দেখা যায়। সেই কারণ স্মিথ্‌সন্ ইংলণ্ডীয় অশ্বকে স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করিয়া যান নাই।

পৃথিবীর নানাস্থানে প্রচুর পরিমাণ অশ্ব বন্যাবস্থায় বিচরণ করিয়া বেড়ায়। দক্ষিণ আমেরিকার লাপ্লাটা নদীর কূলস্থিত প্রশস্ত সমতলক্ষেত্রে অসংখ্য অশ্ব দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক ভ্রমণকারী এই সকল অশ্বের স্বভাব বিশেষরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, উহাদিগের মধ্যে একটী দলপতি থাকে; কোনও বিপদ উপস্থিত হইলে দলশুদ্ধ দলপতির মন্ত্রণানুসারে চলে। পরস্পরের মধ্যে এইরূপ একপ্রাণতা আছে বলিয়া শত্রু আসিয়া সহজে উহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। সাইবিরিয়ার দক্ষিণস্থ দিগন্তব্যাপী মরুক্ষেত্রে অশ্বের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব। উত্তমাশা অন্তরীপ, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতি ও দুষ্টস্বভাব অশ্বগণের বাসস্থান। আফ্রিকার অপরাপর অংশেও ঐ সকল অশ্ব দেখা যায়। তত্রত্য অসভ্য আদিম নিবাসিগণ উহাদিগের প্রয়োজনীয়তা ও বশীকরণোপায় কিছুমাত্র অবগত নহে।

বন্য অশ্বগণ Tarpan নামে অভিহিত। ইহারা অত্যন্ত কুৎসিত। অশ্বের কোন লক্ষণই ইহাদের শরীরে নাই। ইহাদের গঠনপ্রণালী

* অশ্বেষ অবগুণাঃ। বাতকোপনাশৈর্ধ্যবলাগ্নি-কারিত্বম্। ইতি রাজবল্লভঃ।
(অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিলে বায়ুরোগ প্রশমিত হয়, অঙ্গের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়, বল ও অগ্নি বৃদ্ধি হয়।)

বন্য অশ্ব।



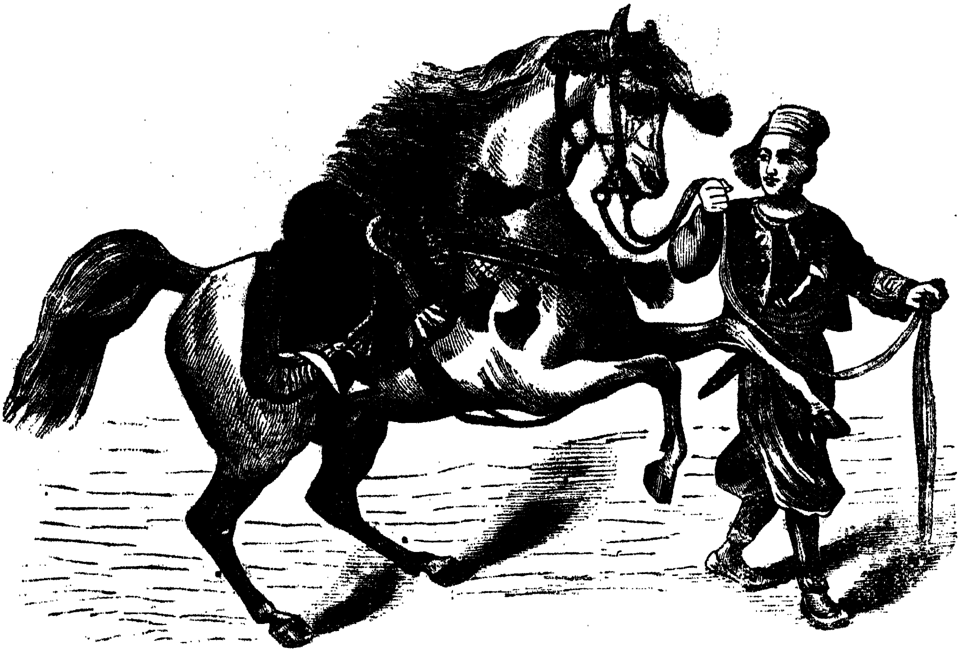
কতকটা মেষের অনুরূপ*। গাত্রে বড় বড় লোম উৎপন্ন হয়, কিন্তু সে লোমে কোন কার্য্যই হয় না। গর্দ্দভের ন্যায় ইহারা সহিষ্ণু ও কর্ম্মশীল ইউর‍্যাল পর্ব্বতের উপত্যকায় এই সকল অশ্ব প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। তথায় ইহারা একত্রে সহস্র সহস্র বিচরণ করে। ইহারা সহজেই বশীভূত হয় এবং সামান্য আহার পাইয়াও ইহারা অধিক পরিশ্রম করিতে পারে ইহা-দিগের প্রতি নানারূপ দুর্ব্ব্যবহার হইয়া থাকে। অনেক সময় আহার না দিয়াও ইহাদিগের পৃষ্ঠে গুরুভার দ্রব্য চাপাইয়া বহু দিন ধরিয়া বহু দূরে লইয়া যাওয়া হয়। টারটারগণ ইহাদিগকে নানা কার্য্যে নিযুক্ত করে। তাহারা ইহাদিগের পৃষ্ঠে আরোহণ করে। ইহাদিগের মাংস ভক্ষণ ও দুগ্ধ পান করে। ইহাদিগের দুগ্ধ হইতে কৌমিষ নামক এক প্রকার ঈষৎ কটু আরকের সৃষ্টি হইয়াছে।

অশ্বের বন্যাবস্থায় ও গৃহপালিত অবস্থায় অনেক প্রভেদ। গৃহপালিত অশ্বের আকৃতি প্রকৃতির সাদৃশ্য বড় কম। গৃহপালিত হইলে ইহাদিগের শরীর, মস্তক ও পদচতুষ্টয়ের তুলনায় কিছু স্থূল হইয়া পড়ে। ক্রমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আরও অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। গৃহ-পালিত অশ্ব সর্ব্বদা যে সকল রোগে আক্রান্ত হয়, বন্য অশ্ব কখনও সে সকল রোগগ্রস্ত হয় না।

এই পৃথিবীর নানাস্থানে নানাজাতীয় অশ্ব দৃষ্ট হয়। আরব-দেশীয় অশ্বের ন্যায় সুন্দর অশ্ব পৃথিবীর আর কুত্রাপি নাই। আরব-দেশের বিশাল মরুক্ষেত্রে ইহারা ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। ইহারা অত্যন্ত কর্ম্মশীল, সহিষ্ণু ও সাহসী। ইহাদের অঙ্গের কোথাও বিসদৃশভাব লক্ষ্য হয় না। কপাল প্রশস্ত, ভ্রূযুগ উন্নত, মুখমণ্ডল ক্ষুদ্র, নাসারন্ধ্র বৃহৎ, ওষ্ঠ পাতলা, চিবুক চেপ্টা, কর্ণ অনতিদীর্ঘ, চক্ষু উজ্জ্বল, বক্ষ বিস্তৃত, পদচতুষ্টয় শক্ত—সর্ব্বাঙ্গ সুগঠিত। ইহারা প্রচুর ভার-বহনে সমর্থ। অপরিসীম ক্ষমতা ও স্বভাবের সুলভ চাঞ্চল্য প্রযুক্ত বহু ভ্রমণেও ইহাদের ক্লান্তি জন্মে না। নানাগুণে আকৃষ্ট হইয়া নানা কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক আরবীয়েরা ইহাদিগকে

* আমি মেষকে পুংলিঙ্গ বলিতেছি না—মেষের তুল্য অবয়বাকৃতির নিদর্শন করিতেছি।

আরবীয় অশ্ব।

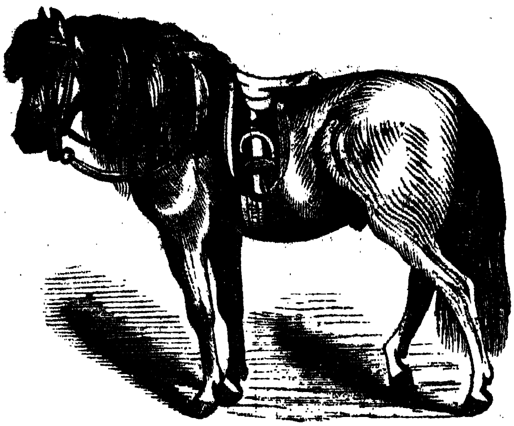


শিক্ষিত করিবার নিমিত্ত অনেক কষ্ট ও ব্যয়-বাহুল্য স্বীকার করে। পরম যত্নে প্রতিপালিত হইয়া এই সকল অশ্ব সর্ব্বতোভাবে প্রভুর হিতাকাঙ্ক্ষী ও বিশ্বাসী হয়। অপরাপর স্থানে নীত হইলে তথায় বংশানুক্রমে এই জাতীয় অশ্বের বুদ্ধি ও সৌন্দর্য্য হীনতা প্রাপ্ত হয়। সম্ভবতঃ জলবায়ুর তারতম্যে এইরূপ হইয়া থাকে। আরবীয় অশ্বের গুণরাশির আধিক্য হেতু উহারা সর্ব্বপ্রকার উচ্চ জাতীয় অশ্বের আদি পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বারবারি প্রদেশের অশ্বগণকে বার্ব্ব কহে। এলজিরিয়া মরকো প্রভৃতি ইহাদিগের আদি বাসস্থান। ইহারা আরবীয় অশ্ব হইতে কিছু খর্ব্বাকৃতি। ইহাদিগের গঠন আরবীয় অশ্ব অপেক্ষা সুন্দর হইলেও ইহারা তত শ্রমশীল ও দ্রুতগামী নহে। আরবীয় ও বারবারি এই উভয় দেশীয় অশ্ব হইতে আরও দুই এক অভিনব শ্রেণীর অশ্ব উৎপত্তি হইয়াছে। যে সকল বার্ব্ব পিরিনিস্ পর্ব্বতের উত্তরে নীত হইয়াছিল, তাহাদিগের সন্তান সন্ততি পিরিনিয়ন অশ্ব বলিয়া পরিচিত। পিরিনিয়ন অশ্ব ও আরবীয় অশ্ব হইতে নাভারিন অশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। স্পেনদেশীয় পিরিনিয়ন অশ্ব এন্ডালুসিয়ন নামে অভিহিত। সচরাচর ইহাদিগের বর্ণ পাংশু। ইহারা অতি সুন্দর ও কার্য্যপটু বলিয়া প্রসিদ্ধ। ক্রিমিয়া যুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সদেশীয় উচ্চ জাতীয় অশ্বগণ যখন হতবল হইয়া পড়িয়াছিল, বার্ব্বগণই তখন অক্ষতদেহে শত্রু দমন করিয়া অপরিসীম সাহসের পরিচয় দিয়াছিল।

ব্রিটেনী প্রদেশে এক জাতীয় অশ্ব আছে। তাহাদিগকে ব্রেটন কহে। তাহারা অতি ক্ষুদ্রাকৃতি, সরলস্বভাব ও বলশালী। আরব দেশের অশ্বের সহিত তাহাদের কতকাংশে সৌসাদৃশ্য আছে। অপেক্ষাকৃত বাল্যাবস্থাতেই তাহাদিগের আকৃতি ও প্রকৃতি উক্তরূপ থাকে। তাহাদিগের দেহের আয়তন বৃহৎ করিতে হইলে

পনি অশ্ব।



ইংলণ্ডদেশীয় অশ্বের সংস্পর্শে তাহাদিগকে রাখিয় দেওয়া আবশ্যক।

রুষিয়ার অশ্ব জাতি অতি উচ্চজাতীয় জন্তু। কি ক্ষমতা, কি গঠন, সকল বিষয়েই তাহারা প্রসিদ্ধ। এই সকল অশ্ব অতি দ্রুত গমন করিতে পারে এবং ইহাদের আকৃতি আমেরিকার এক জাতীয় অশ্বের অনুরূপ। আমেরিকার অশ্বের সহিত ইহাদের কোনরূপ সম্পর্ক আছে কিনা অনেক অনুসন্ধানেও এ পর্য্যন্ত তাহা জানা যায় নাই।

স্কটল্যাণ্ডের উত্তরস্থ দ্বীপশ্রেণীতে এক জাতীয় ক্ষুদ্রকায় অশ্ব আছে। তাহারা Shetland Pony নামে বিখ্যাত। তাহাদের আকৃতি এত ক্ষুদ্র যে, উচ্চতায় কখনও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড দেশীয় কুকুর অপেক্ষা অধিক বড় হয় না কিন্তু সেই ক্ষুদ্র দেহ লইয়া অক্লেশে তাহারা শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে সমর্থ হয়।

ইতালীয় অশ্বগণ পূর্ব্বে অতি শ্রেষ্ঠ জন্তু বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এখন পর্য্যন্ত নেপোলিটান নামক সুন্দর অশ্ব ইতালীতে দেখা যায়। তাহাদের মস্তক কিছু বড় এবং গলদেশ স্থূল হয়। তাহাদিগের সুন্দর গতি ও বিশাল বপুঃ অপরাপর দোষ আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। ইতালীয় ঘোড় দৌড়ে আরোহী থাকে না। অশ্বগণ আপনারাই পরস্পরকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করে।

রেসর অতি উচ্চজাতীয় অশ্ব। ইহাদিগের গঠন অতি সুন্দর। ইংলণ্ডে যে সকল রেসর উৎপন্ন হয়, তাহারা অতিশয় কার্য্যপটু, দ্রুতগমনে পৃথিবীর যাবতীয় অশ্বকে পরাস্ত করিতে পারে। ইংলণ্ড ও এসিয়ার রেসরের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। ইংলণ্ডের রেসরের উচ্চতা এসিয়ার রেসর হইতে কিঞ্চিৎ অধিক এবং উরুস্থল কিছু বেশী পরিমাণ লম্বা। ইংলণ্ডীয় অশ্বের যে সকল অপূর্ব্ব গুণ আছে, শিক্ষা ও জলবায়ু গুণেই তৎসমুদায় বিকশিত হয়।

সহিষ্ণুতা ও কার্য্যকারিতায় হণ্টারও অপর এক শ্রেণীর উচ্চ জাতীয় অশ্ব। হণ্টার অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে কিছু নিকৃষ্ট—রোডষ্টার নামক এক জাতীয় অশ্ব আছে। সফোক ও কেলান্‌ডায়ন্ দেশীয় অশ্ব হইতে ড্রে নামক এক নূতন শ্রেণীর অশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নানা শ্রেণীর অশ্ব ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রভূত কার্য্য করিতেছে। সমুদয় অশ্বের উল্লেখ করিতে হইলে একখানি বৃহৎ পুস্তিকা হইয়া পড়ে।

তাতার দেশীয় অশ্বকে Dziggtai কহে।

কেহ কেহ এই অশ্বকে গর্দ্দভ ও অশ্বের মধ্যবর্ত্তী এক শ্রেণীর জন্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

এই তাতারীয় অশ্বগণের কর্ণদ্বয় কিঞ্চিৎ লম্বাকৃতি বলিয়া মঙ্গোলিয়নেরা ইহাদিগের Dziggtai নাম রাখিয়াছে। পুচ্ছ এবং পৃষ্ঠ দেখিলেই অন্য জাতীয় অশ্ব হইতে এই জাতীয় অশ্ব চিনিতে পারা যায়। ইহাদিগের পুচ্ছান্তে লোম উৎপন্ন হয় এবং পৃষ্ঠদেশে মেরুদণ্ডের উপর একটী কৃষ্ণরেখা দৃষ্ট হয়। শীতকালে ইহাদিগের গাত্রে বড় বড় লোম উৎপন্ন হয়, আবার গ্রীষ্মকালে তাহা থাকে না। উভয় ঋতুতেই গাত্রের কোনরূপ প্রভেদ লক্ষ্য হয় না। ইহাদিগের উচ্চতা সাধারণ অশ্বের ন্যায়, মস্তক কিছু বড়। ইহারা অত্যন্ত দ্রুতগামী। অনেক উচ্চ-জাতীয় অশ্ব অপেক্ষা ইহারা শীঘ্র গমন করিতে পারে। কোনরূপে উৎপীড়িত না হইলে ইহারা বেশ শান্ত থাকে। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বাস করে—কুড়িটী, পঁচিশটী মিলিয়া এক একটী দল হয়। প্রত্যেক দলে এক একটী দলপতি থাকে। সকল সময়েই দলপতির সঙ্কেত মত দলশুদ্ধ চালিত হয়। কোন বিপদের কারণ উপস্থিত হইলে দলপতি শত্রুর চারিদিক্ তিন বার দ্রুতবেগে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক অনুচরবর্গকে পলাইবার সঙ্কেত করে। Mongul, Tengoose প্রভৃতি যে সকল জাতি মধ্য এসিয়ার বিস্তীর্ণ মরুভূমির প্রান্তভাগে বাস করে, তাহারা এই সকল অশ্বের মাংস ভক্ষণ করিবার জন্য ইহাদিগকে শিকার করিয়া বেড়ায়। তাহারা ইহাদিগের মাংস অতি সুখাদ্য বলিয়া গ্রহণ করে। এখনও পর্য্যন্ত ঐ সকল দেশীয় অধিবাসিগণ ইহাদিগকে বশীভূত করিতে পারে নাই। গৃহপালিত হইলে ইহারা অতি সুন্দর ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ টাটু বলিয়া পরিগণিত হইত। তাতারীয় অশ্বগণকে গৃহপালিত করিবার জন্য অনেক ভ্রমণকারীর প্রাণ পর্য্যন্ত গিয়াছে। অনেক যত্ন চেষ্টাতেও কেহ ইহাদিগকে বশীভূত করিতে পারে নাই। কোন বিখ্যাত ভ্রমণকারী ও প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, যেদিন এই জাতীয় অশ্ব গৃহপালিত হইবে, সেই দিন হইতে আর ইহাদিগের অস্তিত্ব থাকিবে না।

অশ্বজাতি সংক্রান্ত অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইল : এক্ষণে এই জন্তুর বুদ্ধিচাতুর্য্য, বল, বিক্রম প্রভৃতি অশেষবিধ গুণের দুই চারিটী গল্প বলিয়াই প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

অশ্বের বল অসীম। একদা প্রসিয়াধিপতি প্রথম ফ্রেডেরিক, ডিউক অব মারলবরোকে অভ্যর্থনার নিমিত্ত কতকগুলি কৌতুকের আয়োজন করিয়াছিলেন। তৎকালে অস্ত্রক্রীড়া চলিত ছিল না বলিয়া, একস্থানে একটী সিংহ, একটী ব্যাঘ্র, একটী ভল্লুক ও একটী অশ্ব ছাড়িয়া দেওয়া হইল। অনতিকাল মধ্যে তাহারা মহাসমরে প্রবৃত্ত হইল। প্রথমে অশ্বটী শান্ত ভাবে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল—ভল্লুকেরই জয় হইল। সেই দুর্দ্ধর্ষ জন্তু, শরীরের নানাস্থানে ক্ষতবিক্ষত হওয়ায় ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া অশ্বের প্রতি ধাবিত হইল। তখন অশ্বের গুপ্ত বল প্রকাশিত হইল। সে পশ্চাতের উভয় পদ উত্তোলন করিয়া ক্ষুর দ্বারা সজোরে শত্রুকে আঘাত করিল। ভল্লুক তাহা গ্রাহ্য না করিয়া পুনরায় অগ্রসর হইল। অশ্ব তখন এমনি বিষম জোরে আঘাত করিল যে, ভল্লুক ভগ্নচোয়াল হইয়া সমরে প্রতিনিবৃত্ত হইল। বিজয়ী অশ্ব সাধারণের নিকট আপনার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিল।

অশ্বের স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রবল। অনেক পথভ্রান্ত অশ্বারোহী দুর্গম স্থানে উপনীত হইয়া জীবনের আশায় একেবারে জলাঞ্জলি দিয়াছেন—অবশেষে তাঁহাদের অশ্ব পথ চিনিয়া তাঁহাদের রক্ষা-বিধানে সমর্থ হইয়াছে।

• ফ্র্যাঙ্ক্লিন্ সাহেব বলেন যে, একদা তিনি

অশ্বারোহণে কোন পার্ব্বত্য প্রদেশের মধ্য দিয়া গমনকালে পথভ্রান্ত হইয়াছিলেন। পথ নির্দ্দেশ করিতে আপনি অসমর্থ হওয়ায় তিনি অশ্বের লাগাম ছাড়িয়া স্থির ভাবে তৎপৃষ্ঠে বসিয়া রহিলেন। অশ্বও তখন প্রভুকে গন্তব্য পথে লইয়া গেল।

আর এক ব্যক্তি কোন সময়ে এক জনশূন্য অপরিচিত প্রদেশের মধ্য দিয়া অশ্বারোহণে প্রায় ১৫ ক্রোশ গমন করিয়াছিলেন। দুই বৎসর পরে পুনরায় তাঁহাকে সেই পথে আসিতে হইয়াছিল। অপরিচিতের পক্ষে সে স্থান বড় ভয়ানক। সন্ধ্যাকালে আকাশে মহা দুর্য্যোগ উপস্থিত হইল। ক্রমে রজনীর অন্ধকার, আকাশের দুর্য্যোগ ও পথের দুর্গমতা দেখিয়া অশ্বারোহী ব্যক্তি ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, ভীষণ অন্ধকার, পথ স্থির করা একান্ত অসম্ভব, সুতরাং মৃত্যু স্থির জানিয়া তিনি অশ্বপৃষ্ঠে স্থির ভাবে বসিয়া রহিলেন। অশ আপন মনে অন্ধকার ভেদ করিয়া ছুটিল। অশ্ব পূর্ব্ব প্রকারে ঐ পথ দিয়া গমন করিয়াছিল; প্রভুর দুর্দ্দশা দেখিয়া অতি দ্রুতবেগে অশ্ব সেই দুর্গম পথ অক্লেশে অতিক্রম করিয়া প্রভুকে রক্ষা করিল। অশ্বের অসাধারণ স্মরণশক্তির পরিচয় পাইয়া ভদ্র ব্যক্তি বিস্মিত হইলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে অশ্বগণ সৈন্যদিগের প্রধান সহায়। রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে ইহারা কদাচ বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করে না। যদি কোন অশ্বারোহী কামানের গোলার সম্মুখে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার অশ্ব কখনও শ্রেণী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে না; পূর্ব্বের ন্যায় অশ্বাদের [illegible] প্রতিপালন করে। *Grognir* বলিয়াছেন, যে, যখন কতকগুলি অশ্বারোহী সৈন্য এক যুদ্ধক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া [illegible], তখন তাহাদিগের [illegible] আরোহিশূন্য অশ্বকেও আসিতে দেখা গিয়াছিল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে Tyrolese ও Bavarion দিগের মধ্যে এক তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। ঐ সময়ে কতকগুলি Tyrolese বিদ্রোহী হইয়া ১৫টী ব্যাভেরিয়ান অশ্ব চুরী করিয়া আপনাদিগের ব্যূহে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু বিবাসী অশ্বগণ সদলক্ষে তাহাদিগের শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া আপনাদিগের সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন আরোহিগণ শত্রুহস্তে পতিত হইয়া ব্যাভেরিয়াণ কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইল।

অশ্বের বিবেচনা শক্তি ও উপস্থিত-বুদ্ধিতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। একদা রজনী-যোগে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অনেকগুলি নিমন্ত্রিত বন্ধুবান্ধব-পরিবৃত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার গৃহের একটী কপাট খুলিয়া গেল এবং একটী অনাহূত গৃহে প্রবেশ করিল; সকলে সশঙ্কিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, আগন্তুক এ ‧ টী চতুষ্পদ জন্তু বিশেষ। ইতিপূর্ব্বে আর কখনও সে ওরূপ ভাবে সকলের শান্তিভঙ্গ করে নাই। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, সে তাহার একটী প্রিয়ঘোটকী। প্রভুকে নিকটে দেখিবামাই ঘোটকী এক অদ্ভুত চীৎকার করিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। তিনিও কৌতূহলী হইয়া ঘোটকীর অনুসরণ করিলেন এবং কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন যে, ঘোটকীর শাবকটী জলাভূমির মধ্যস্থ এক স্থানে বিপদে পতিত হইয়াছে। ঘোটকী আপনি তাহার রক্ষা বিধানে অসমর্থ হওয়ায় বিবেচনাপূর্ব্বক এবং অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়া মনুষ্য-সাহায্যে তাহাকে রক্ষা করিল।

একত্রে বাস করিলে, বাল্যে যুদ্ধ এক সঙ্গে ক্রীড়া করিলে, একভাবে জীবনের যাবতীয় [illegible] [illegible] হইলে, কেবলমাত্র [illegible]

মধ্যেই যে অপার্থিব প্রেমের মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, এমত নহে; অশ্বগণের মধ্যেও সেইরূপ হইয়া থাকে। দুইটী Hanovoriben অশ্বের মধ্যে বিশেষরূপে সৌহৃদ্য ছিল। উভয়েই সেনানিবাসের মধ্যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ অশ্ব বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। কালক্রমে একটী যুদ্ধে হত হয়। যুদ্ধান্তে অপরটী আহার পাইয়া আগে না খাইয়া স্বীয় অনুচরের জন্য ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিল। নিকটস্থ অপরাপর অশ্বগণকে দেখিয়া তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও সুখোদয় হইল না। কেহ কোন ক্রমে তাহাকে আহারে প্রবৃত্ত করাইতে পারিল না। বন্ধুবিয়োগ-জনিত বিষম স্মৃতি অন্তর্হিত করিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা হইতে লাগিল। অবশেষে যখন সকলে দেখিল যে, অশ্ব অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন তাহারা বলপূর্ব্বক খাওয়াইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু কোন ফলই হইল না। নিদারুণ দুঃখে অনাহারে অশ্বের শরীর ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং অবশেষে পশু আত্মহারা হইয়া অনতিকাল মধ্যে সহচরের অনুগামী হইল।

কুইন্সল্যাণ্ডের অন্তর্ব্বর্ত্তী কোন প্রদেশে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার গৃহের অনতিদূরে দুইটী বৃদ্ধ ঘোটকী একটী শাবক লইয়া থাকিত। দুইটীতে স্বাধীন ভাবে পরম সুখে ও বন্ধুভাবে বহুকাল অতিবাহিত করিল। শীত ঋতু আগমন করিলে তাহারা কোন সুরক্ষিত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিত; গ্রীষ্মাগমে একটী ক্ষুদ্র ঝিলের তীরবর্ত্তী প্রদেশে আনন্দে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। তথায় এক মেষপালকের একখানি পরিত্যক্ত পর্ণকুটীর ছিল। উক্ত ব্যক্তি ভ্রমণ-মানসে সেই কুটীরখানির নিকট দিয়া গমনকালে একটী শব্দে শঙ্কিত হইয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিতে পাইল, সেই ঘোটকীশাবকটী অতি কাতর কণ্ঠে চীৎকার করিতেছে এবং অস্থিরচিত্তে এক একবার একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া কুটীর মধ্যে উঁকি মারিয়াই অধিকতর কাতরভাবে যেন কাহারও সাহায্য-প্রার্থনায় দ্রুতবেগে কুটীর প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেছে। তখন সে কুটীরের সম্মুখে আসিয়া দেখিল, কুটীরাভ্যন্তরে এক ঘোটকী বিশ্রাম করিতেছে এবং দ্বারদেশে তাহার সহচরী স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এই সকল দেখিয়া আগমনকারী বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কুটীর মধ্যে প্রবেশানন্তর নিদ্রিত ঘোটকীর গাত্রে পুনঃপুনঃ আঘাত করিল,—তাহাতে তাহার চেতনা হইল না। তখন সে ঘোটকীর আর সন্নিকটে গিয়া দেখিল যে, সে চিরনিদ্রায় অভিভূত—আকৃতির কোনরূপ বিকৃতি হয় নাই—সে যেন শান্ত ভাবে শ্রমবেদনা দূর করিতেছে। এইরূপ দর্শন করিয়া সে তথা হইতে প্রস্থান করিল এবং তিন দিবস পরে পুনরায় সেই স্থলে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার হৃদয় যথার্থই বিগলিত হইল। কুটীরের সম্মুখ—যেখানে তিন দিন পূর্ব্বে সে মৃত-ঘোটকীর সহচরীকে দেখিয়াছিল, সেইখানে তাহার অনাথ শাবকটী পড়িয়া আছে, আর সেই ঘোটকী বন্ধুবিহনে আত্মপ্রাণে জলাঞ্জলি দিয়া প্রাণাধিকা সঙ্গিনীর পার্শ্বে শয়ন করিয়া তাহারই সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে।

ভালবাসার এত গাঢ়তা, বিরহের এমন উন্মত্ততা, উন্মত্ততার এমন শোচনীয় পরিণাম বুঝি মনুষ্য সমাজে নিতান্ত বিরল।

শ্রীহরনাথ বসু।

রাধিকা-বিলাপ।

এত কে জানিত সখি, হায়!—
যে মনোরঞ্জন-ধন, জীবন-যৌবন মন,
সকলি ত সঁপেছিনু তায়,
কে জানিত সে যে এত ঠেলিবে দু'পায়। ১

ছিনু যবে শ্যাম-সোহাগিনী,—
মধুমত্ত কুঞ্জবনে মত্ত-ময়ূরের সনে
নাথ-নব-জলধরে নেহারি সজনি,
নাচিত হৃদয় কত তখন জানি নি!
তখন জানি নি সে যে এত নিদারুণ,
তখন জানিনি তার প্রাণহর গুণ! ২

বয়ান ভাসিছে আঁখি-জলে,—
কঠিন মানের পণ সকাতর প্রাণধন
রাধিকা-রমণ পদতলে;
তখন ভুলেছি ভুলে হৃদয়-কমলে।
কে জানিত ফণি হ'য়ে দংশিবে সে পরে,
কে জানিত সে যে এত বিষম অন্তরে। ৩

শূন্য ব্রজ শ্মশান সমান,
উদাস যমুনা গীতে হা-হুতাশ জাগে চিতে
পূর্ব্বস্মৃতি চিতাপ্রায় জ্বলে তায় প্রাণ;
হা মাধব! নিদয় পাষাণ!
মাধবী তমাল পিক ভৃঙ্গ ফুল অলি,
কেমনে দহন হ'য়ে দহিলে সকলি! ৪

ভূপতি এখন মথুরায়,—
প্রেমের সোহাগে তার কুব্জা সুন্দরী সার,
এবে আর ভাবে কি রাধায়?
অদৃষ্টের দোষ মোর দোষ দিব কায়!
কি জানিত হাসিমাখা ছিল এত ছল,
কৃষ্ণ-প্রেমে কলঙ্কিনী রহিনু কেবল!!

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত।

আমার জীবন-চরিত।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

হলদোয়ানিতে গোয়েন্দার সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি হইল। অনেক লোকই গোয়েন্দা হইতে চায়। কারণ, গোয়েন্দা-গিরি কার্য্যে সফল-কাম হইলে, পুরস্কার লাভের বিশেষ সম্ভাবনা। গুপ্তচরের কাজ কিন্তু বড় কঠিন কাজ। আর, যে-সে লোককেও এ কাজে নিযুক্ত করা উচিত নহে। এদিকে আবেদনকারীর সংখ্যা অধিক হওয়াতে, গুপ্তচরের সংখ্যা ক্রমশঃ আপনাআপনিই অধিক হইয়া পড়িল। কর্ণেল ক্রেসম্যান্ আমাকে তামাসা করিয়া বলিতেন, "বাবুজি! আপনি দেখিতেছি, ক্রমশ গোয়েন্দার একটী রেজিমেণ্ট তৈয়ারি করিয়া ফেলিবেন।"

কোন কোন গোয়েন্দা ফাঁকি দিত। নির্দ্দিষ্ট স্থানে না গিয়া, অম্লান-বদনে বলিত, গিয়াছি। জেরায়, ধরাও পড়িত, বেত খাইত, অথবা কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা সহ্য করিত। একদিন এক-জন গোয়েন্দা আসিয়া হণ্টার সাহেবের নিকট মহা গল্প জুড়িয়া দিয়াছে; কতরূপ অঙ্গভঙ্গি করিতেছে; হাত-পা নাড়িতেছে; চক্ষু ঘুরা-ইতেছে। দূর হইতে দেখিয়া আমি নিকটে গেলাম। সে বলিতেছে, "আমাকে বিদ্রোহি-গণ কিছুই চিনিতে পারে নাই। আমি এরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলাম, বিদ্রোহিগণ, আমি যাহা বলিতাম, তাহাই বিশ্বাস করিত।" আমি জিজ্ঞাসিলাম, "তাহাদের বন্দুক কত আছে, তাহার হিসাব লইয়াছ কি?"

গোয়েন্দা। হাঁ। যাহার জন্য গিয়াছি, সে কাজ সমাধা না করিয়া কি আমি অমনি ফিরিয়া আসিয়াছি?

আমি। বন্দুকের সংখ্যা কত?

গোয়েন্দা। নয় হাজার ছাব্বিশ।

আমি। কিরূপে তুমি বন্দুক গণনা করিতে?

গোয়েন্দা। যখন কেহ কোথাও থাকিত না, সে সময়, তাহাদের ঘরে ঢুকিয়া বন্দুক গণিতে বসিতাম।

আমি। তুমি তাহাদের ঘরে ঢুকিলে অন্য কেহ তোমাকে কোন কথা বলিত না কি?

গোয়েন্দা। না,—আমার উপর সকলের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, সুতরাং কেহই কিছু বলিত না।

আমি। তুমি কি তখন সঙ্গে করিয়া দোয়াত কলম লইয়া যাইতে?

গোয়েন্দা। দোয়াত কলম লইয়া যাইবার দরকার কি? সেখানে দোয়াত কলম পাইবই বা কোথা?

আমি। গণিয়া যাহা হইত, তবে তাহা মনে করিয়া রাখিতে?

গোয়েন্দা। আজ্ঞে, হাঁ।

আমি। এরূপ কয় দিন গণিয়াছিলে?

গোয়েন্দা। নয় দিন কাল।

আমি। তোমারত স্মরণ শক্তি খুব প্রখর দেখিতেছি।

গোয়েন্দা। আমরা মূর্খ লোক; তাদৃশ লেখা পড়া জানি না; কিন্তু একবার যাহা গণিব, তাহা কস্মিন কালে ভুলিব না।

আমি। বটে, অতি আশ্চর্য্য ত! পনের দিনের ধারাবাহিক গণনা তোমার মনে আছে! তুমিই উপযুক্ত গোয়েন্দা।

গোয়েন্দা। (যোড় হাতে) আজ্ঞে, তা আছে বৈকি? ১৫ দিন কেন, যদি পনের বছর হইত, তথাচ আমি ভুলিতাম না।

আমি। আচ্ছা, বাপু! বলত, তুমি প্রথম দিন কত বন্দুক গণিয়াছিলে?

গোয়েন্দা থতমত খাইল। হন্টার সাহেবের মুখ হইতে হাসি বাহির হইল। আমি গুপ্তচরকে কহিলাম, "বল বল শীঘ্র বল, বিলম্ব করিতেছ কেন?"

গোয়েন্দা। আজ্ঞে,—আজ্ঞে,—৭১২টী বন্দুক।

আমি। দ্বিতীয় দিন কত গণিয়াছিলে?

গোয়েন্দা আবার বিলম্ব করিতে লাগিল। আমার মনে হইতে লাগিল, গোয়েন্দা বুঝি মনে মনে কি হিসাব করিতেছে। আমি কহিলাম, "তুমি এত বিলম্ব করিতেছ কেন? এবং মনে মনে হিসাবই বা কি করিতেছ? খবরদার! ফের যদি বিলম্ব করিবে,—তবে এই বেত তোমার পৃষ্ঠের উপর পড়িবে। শীঘ্র বল।

গোয়েন্দা। দ্বিতীয় দিন,—৯২০।

আমি। তৃতীয় দিন কত? বলিতে বিলম্ব করিতে পাইবে না; যেমন আমি প্রশ্ন করিব, তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে হইবে। তোমার ১৫ বৎসরের পুরান কথা সমস্তই মনে থাকে, আর পনের দিনের টাট্‌কা কথা কি মনে থাকে না?—ইহার জন্য ভাবিতে হয় কেন?—

এই কথা বলিয়া আমি বেত ঘুরাইতে লাগিলাম।

গোয়েন্দা। তৃতীয় দিনে ৫০০ শত।

আমি। চতুর্থ দিনে কত?

গোয়েন্দা। ২৫৮।

আমি। পঞ্চম দিনে।

গোয়েন্দা। ৬৯৯।

আমি। ষষ্ঠ দিনে?

গোয়েন্দা। ২৭০০ দুই হাজার।

আমি। সপ্তম দিনে?

গোয়েন্দা। ৩১৯।

আমি। অষ্টম দিনে?

গোয়েন্দা। ৫১২।

আমি। নবম দিনে?

গোয়েন্দা। ৯০৬।

হন্টার সাহেব মনে মনে টিপি-টিপি

হাসিতেছেন। হাসিবেগ সংযত করিয়া আমাকে ইংরাজীতে কহিলেন,—"বাবু-সাহেব, বেশ মজা হইয়াছে। এক্ষণে পুনরায় আপনি উহাকে 'প্রথম দিন কত বন্দুক গণিয়াছিলে, দ্বিতীয় দিন কত বন্দুক গণিয়াছিলে,—এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন। তাহা হইলে ও ব্যক্তি আপনি-আপনিই ধরা পড়িবে।"

আমি ইংরেজীতে সংক্ষেপে উত্তর দিলাম,—"না।"

হণ্টার সাহেব। (ইংরেজীতে) ও ব্যক্তি ঐ আট দিনকাল ক্রমান্বয়ে যত বন্দুক গণিয়াছে বলিল, উহাকে একবার তাহা ঠিক দিতে বলুন,—তাহা হইলেই সে আপনার মিথ্যা-কথারূপ জালে বদ্ধ হইবে।

আমি হাসিয়া ইংরেজীতে কহিলাম, "না, সে কথা এখন থাক্,—আরও একটু মজা করা যাউক।"

ধূর্ত্ত গোয়েন্দা, আমাদের ভাব-ভঙ্গি দেখিয়া বুঝিয়াছে, সে ধরা পড়িয়াছে। সে তখন পলাইবার পথ খুঁজিতেছে। গোয়েন্দা কহিল, "রাত্রি জাগিয়া পথ হাঁটিয়া আসায়, আমার জলতৃষ্ণা পাইয়াছে। আমি এখন চলিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় আসিব।"

আমি। তুমি আর একটু থাক; আর গোটাদুই প্রশ্ন আমার জিজ্ঞাস্য আছে।

গোয়েন্দা। একবার ছাড়িয়া দিন্, আমি একটু জল খাইয়া শীঘ্র আসিতেছি।

আমি। তা হইবে না। একটু ব'সো। আচ্ছা, বল দেখি, যে স্থানে এক্ষণে বিদ্রোহিগণ আছে, তথায় শীত কেমন?

গোয়েন্দা। ভয়ঙ্কর শীত।

আমি। সমস্ত রাত-ই কি সেনাগণ আগুন পোহাইয়া থাকে?

গোয়েন্দা। হাঁ হুজুর। আগুন ব্যতীত তথায় তিলার্দ্ধ কাল তিষ্ঠিবার যো নাই।

আমি। বিদ্রোহিগণ তথায় নূতন যে কূপটী কাটাইয়াছে, তাহার জল সুস্বাদু না বিস্বাদু?

গোয়েন্দা। (একটু স্থিরভাবে থাকিয়া) অতীব সুস্বাদু।

আমি। এইবার তুমি, একবার স্মরণ করিয়া বল ত,—৫ম দিনে কত বন্দুক গণিয়াছিলে?

গুপ্তচরের মুখে আর কথা নাই। কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া সে কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ বসিয়া রহিল।

আমি হস্তে বেত লইলাম। বলিলাম, "কূপের জল অতীব সুস্বাদু নয়?" বেত উত্তোলন করিলাম। সজোরে গোয়েন্দার পশ্চাদ্ভাগে বেত্রাঘাত করিয়া কহিলাম, "বিদ্রোহিগণ সমস্ত রাত্রি আগুন পোহায়, নয়? এরূপ নিদারুণ মিথ্যা কথা কহিয়া তোমার লাভ কি? তুমি আদৌ সে স্থলে যাও নাই, অথচ ঘোর মিথ্যা কথা কহিয়া তুমি বলিতেছ, তুমি স্বয়ং তথায় গিয়াছিলে। বাপূ! সেখানে কূপ নাই। ঝর্-ণার পবিত্র জলই বিদ্রোহীদের একমাত্র পানীয়। তাঁবুতে আগুন লাগার পর হইতে তথায় কেহ রাত্রি ৯টার পর আর আগুন জ্বালিতে পায় না। অথচ তুমি বলিতেছ, বিদ্রোহী-সেনানিবাসে সমস্ত রাত্রিই আগুন জ্বলে। এই বেতই তোমার উপযুক্ত ঔষধ।"—এই বলিয়া সেই গোয়েন্দার পৃষ্ঠদেশে গণনা করিয়া দ্বাদশ বার বেত্রাঘাত করিলাম। সেই মিথ্যাবাদী গুপ্তচর প্রথমত বিপরীত রবে চীৎকার আরম্ভ করিল; অবশেষে নিস্তেজ হইয়া ধরাশায়ী হইল। সেই যৌবনারম্ভ কালের আমার হাতের দশ বেত বড় কম কথা নহে। আমি নিকটস্থ অনুচরকে কহিলাম, "এ ব্যক্তিকে হাজত-ঘরে লইয়া যাও এবং শুশ্রূষা কর।"

কোন কোন পাঠক হয় ত আমাকে নিষ্ঠুর মনে করিতেছেন। প্রকৃতই অল্পদোষে আমা

প্রকৃতি তখন বড়ই কঠোর হইয়াছিল। তখন তরবারি-বন্দুক-বল্লম লইয়া সদাই কাজ, মুখে সদাই মার্-ধর্-কাট্ বুলি, ব্যাঘ্র-হরিণ-পক্ষী শীকারই তখন ধর্ম্ম, ঘোর যুদ্ধে শত্রুমুণ্ড ছেদনই তখন একমাত্র ব্রত ছিল; সুতরাং প্রকৃতি কঠোর হইবে না কেন? আহার ছিল মাংস, মাংসাশী-ইংরেজের সহিত ছিল বসবাস, বীরপুরুষ কঠিনদেহ ক্ষত্রিয়গণের সহিত ছিল সদা রহস্যালাপ,—প্রকৃতি কঠিন হইবে না কেন? নিকটে কাহারও মাতা নাই, ভার্য্যা নাই, কন্যা নাই,—প্রকৃতি কঠোর হইবে না কেন? প্রসন্নপুণ্য-সলিলা ভাগীরথী নাই, স্বভাবের শ্যামল-সুন্দর শস্যক্ষেত্র নাই, মল্লিকা-মালতী-যূথিকা নাই, তমাল তরু নাই, নিশীথে বংশিধ্বনি নাই,—এ পাথরময় আরণ্য-প্রদেশে এতকাল বাস করিয়া প্রকৃতি কঠোর হইবে না কেন?

বেতের চোটে অন্যের পিঠ ফাটিয়া রক্ত পড়িতে দেখিলে, আমার তাদৃশ কষ্ট বোধ হইত না। অন্যের হাত-পা-মুখ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হউক,—আমার ভ্রূক্ষেপ নাই। মানুষ সাক্ষাতে হস্তী-পদদলিত হইলেও, আমার চাঞ্চল্য নাই। বেদান্ত-ভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

নিয়ম হইল, বিশেষ পরীক্ষা এবং বিশেষ নিদর্শন ব্যতীত, গুপ্তচরের কথা গৃহীত হইবে না। যে স্থলে বিদ্রোহিগণ ছাউনি করিয়াছিল, তথায় একজাতীয় নূতন বৃক্ষ ছিল। সেরূপ বৃক্ষ এবং সেরূপ পাতা, এ অঞ্চলে আদৌ ছিল না। যে গুপ্তচর সেই বৃক্ষের পাতাসহ ক্ষুদ্র একটু ডাল না আনিতে পারিত, তাহার কথা অবিশ্বাস্য বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইত। এইরূপ ধরাধরি, কড়াকড়ি, করাতে জুয়াচোর গোয়েন্দার দল কিছু কমিল।

রবিবার। অপরাহ্ন। শীকার-সন্ধানে বহির্গত হই নাই। চেয়ারে বসিয়া আছি এবং ডাক্তার নন্দকুমারকে জ্বালাতন করিতেছি। একজন আর্‌দলি আসিয়া কহিল,—"অল্প বয়স্ক এক সুন্দরী স্ত্রী, ছাউনিতে আসিয়া সেতার বাজাইয়া সকলকে মোহিত করিতেছেন। সুন্দরী কাহারও সহিত কথা কন না। তাঁহার সহিত একটী বৃদ্ধ পুরুষ আছে; সে গান গায়, ডুগি বাজায় এবং লোকের সহিত কথাবার্ত্তা কয়। হুজুরের যদি অনুমতি হয়, তবে সেতার ওয়ালীকে এইখানে লইয়া আসি।"

আমি। আচ্ছা,—লইয়া আইস।

দূত প্রস্থান করিলে, আমি ভাবিতে লাগিলাম, এ আবার কি এক রকম নূতন ঘটনা ঘটিল। আমরা আসিয়া অবধি এ পর্য্যন্ত কোনও নারীইত হলুদোয়ানিতে আইসে নাই। রমণীর শুভাগমন, শুভ ফল-সূচক, সন্দেহ নাই। অথবা ইহা কোন মায়াবিনীর মায়া। জানি না, কোন্ ছলে কোন্ কামিনী কাহাকে ভুলাইতে আসিয়াছে?

দেখিতে দেখিতে সেতারবাদিনী আসিল। রমণী সুন্দরী, আয়তলোচনা। বয়ক্রম বুঝি যৌবনের সীমা অতিক্রম করিয়াছে! করুক্। তাহাতেই কিন্তু সৌন্দর্য্যকে, সেই রূপরাশিকে, অধিকতর প্রগাঢ়, মধুর এবং উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কামিনীর প্রকৃতি গম্ভীর, ধীর, স্থির। পুরুষের পানে দৃষ্টি নাই। তাহার নয়নযুগল কেবল সেতারের দিকে নিহিত।

আমি কম্বলাসন পাতিয়া দিয়া, শশিমুখীকে বসিতে বলিলাম। শশিমুখী সেতার হস্তে সম্মুখে উপবিষ্ট; তদ্‌পশ্চাতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিক ঘেঁসিয়া, সেই বৃদ্ধ ডুগী লইয়া বসিল। আমি সেতার-বাদিনীকে কহিলাম, "আপনার

নিবাস কোথায়? এবং শিক্ষাই বা কোথায়?" তিনি কথা কহিলেন না; কেবল নিম্নে সেতার-পানে চাহিয়া রহিলেন। বৃদ্ধ কিন্তু আমার কথার উত্তর দিল, কহিল,—"ইনি কথা কহেন না; গুরুর আজ্ঞা সেরূপ নহে। ইহাঁকে সেতার বাজাইতে অনুমতি করুন, বোধ হয় সেতারে আপনাকে পরিতুষ্ট করিতে সক্ষম হইবেন। যে রাগ, যে সুর, যে গান, আপনি আলাপ করিতে বলিবেন, ইনি তাহাঁই হৃষ্টচিত্তে করিবেন।"

আমি। আমার কোন ফরমাইস নাই। যাহা উহাঁর ইচ্ছা, তাহাই আলাপ করুন।

রমণী অমনি বামকরে সেতার ধরিয়া, দক্ষিণ পাণির তর্জ্জনীর সাহায্যে, সেতারে ঝঙ্কার দিলেন। কি অপূর্ব্ব মধুর রব! প্রথম একবার 'সা-রে-গম' সাধিয়া লইলেন। হাতের কায়দা দেখিয়া ভাবিলাম, এ রমণী বড় সামান্যা নয়। তৎপরে তিনি অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া মেঘরাগের আলাপ করিলেন। যাঁহারা সঙ্গীত কি, রাগ কি, সেতার কি বুঝেন,—তাঁহাদের মন মোহিত হইল। অন্যন এক হাজার শ্রোতৃবৃন্দ বা দর্শক-বৃন্দ রমণীকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সকলে সবাস্ সবাস্ ধ্বনি করিতে লাগিল। কেহ কহিল, রমণী মানবী নহে; দেবী। কেহ কেহ মনে মনে প্রশ্ন করিতে লাগিল;—এ রমণীর গুরু কে? কোন্ ওস্তাদ ইহাঁকে এ অলৌকিক রসের অবতারণা করিতে শিখাইয়াছে? সেই ওস্তাদের কি একবার দেখা পাই না?

মেঘরাগ আলাপের পর, রমণী কিছুক্ষণ বিশ্রাম লইলেন। তারপর আবার সেতার ধরিলেন। কিন্তু সেতার বাজাইবার পূর্ব্বে, রমণী দক্ষিণ হস্ত সঞ্চালনপূর্ব্বক ইঙ্গিতে কহিলেন, এইবার সমগ্র দর্শককে এস্থান হইতে সরাইয়া দাও। আমার আদেশ অনুসারে লোকসমূহ অনিচ্ছা সত্ত্বে একে একে, দলে দলে, ধীরে ধীরে, নিতান্ত ভগ্নমনে, তৎক্ষণাৎ সরিয়া পড়িল। রহিলাম, আমি, ডাক্তার নন্দকুমার, এবং দশ বারজন উচ্চপদস্থ হিন্দুস্থানী সৈনিক কর্ম্মচারী।

এবার খাম্বাজ রাগিনীতে সেতারে আলাপ হইতে লাগিল। গৎ বাজাইয়া, শশিমুখী শেষে সেতারে খাম্বাজের গান ধরিলেন। কি মধুর! কি মধুর! চলুক্, চলুক্! যেন আজ আর শেষ হয় না! চলুক্, চলুক্! যেন আজ আর ফুরায় না। দিন ফুরাইয়া যাউক, রাত্রি ফুরাইয়া যাউক,—কিন্তু এ গান যেন ফুরায় না! সংসার চাই না, পৃথিবী চাই না, স্বর্গ চাই না,—কিন্তু এ গান যেন ফুরায় না!

সেতারে গান চলিতেছে, মনুষ্যকণ্ঠে গান যেন গীত হইতেছে, সেতার যেন কথা কহিতেছে;—অথচ গানটী কি আমরা বুঝিতেছিনা। গানটী কি জানিবার জন্য আমাদের লালসা বলবতী হইল। যখন আর থাকিতে পারিলাম না, তখন যোড়হাতে কহিলাম,—সত্যসত্যই যোড়-হাতে কাতর কণ্ঠে কহিলাম, "হে সুন্দরি! হে গায়িকে! হে যৌনবতি! তুমি সেতারের সঙ্গে সঙ্গে আপন কলকণ্ঠে ঐ গানটী গাহিয়া, আমাদিগকে রক্ষা কর।"

চক্ষু চাহিয়া দেখি, সম্মুখে হণ্টার এবং বারওয়েল,—সাহেবদ্বয় উপস্থিত। তাঁহারা গোল-যোগ দেখিয়া প্রকৃত ব্যাপার জানিবার জন্য এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আমি সম্ভ্রমে তাঁহাদের বসিবার জন্য উপযুক্ত আসন আনাইয়া দিলাম; এবং সংক্ষেপে রমণীর বৃত্তান্ত ইংরেজী ভাষায় কহিলাম।

সাহেবদ্বয় উপবিষ্ট হইলে, রমণী মধুর সুরে আবার সেই গান সেতারে বাজাইতে লাগিলেন। আমি পুনরায় অনুনয় বিনয় করিয়া, রমণীকে ঐ গান সেতারের সহিত তদীয় কণ্ঠে গাহিতে অনুরোধ করিলাম।

রমণী আকাশপানে চাহিয়া দেবগণকে প্রণাম করিলেন। শেষে তিনি সেই বৃদ্ধ ব্যক্তির মুখপানে চাহিলেন। বৃদ্ধ কহিল, "আচ্ছা, গাও; সময় ঠিকই হইয়াছে।"

রমণী তখন সেতারের সহিত স্বীয় কণ্ঠে গান আরম্ভ করিলেন। সেতারের সুমধুর স্বরের সহিত, কামিনীর সেই কোকিল-বিনিন্দিত কলকণ্ঠস্বর মিশাইয়া গেল। সেতার বাজিতেছে, কি কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইতেছে, তখন আর কিছুই বুঝা গেল না। কেবল এক অনির্ব্বচনীয় সুধারস শ্রোতৃবৃন্দ পান করিতে লাগিলেন।

সে গান হিন্দী ভাষায় বিরচিত। প্রথম ছত্র ব্যতীত সে গানের অন্য কোন অঙ্গ আমার মনে নাই। আমার স্মারক-লিপির যে অংশে এই গান লিখিত ছিল, সে অংশের কতক একেবারে কীটদষ্ট, কতক জল পাইয়া পচিয়া গিয়াছে; কিছুই ভাল পড়িবার যো নাই। তবে গানের ভাব আমার মনে আছে। ভাব লইয়া বাঙ্গালা ভাষায় সে গানের কতক অনুবাদ করিয়া দিলাম:

খাম্বাজ—একতালা।

শুন হে রাজন্, অমিয় বচন,
হয়েছে হে আজ্ দিল্লীর পতন।
বাদসা বেগমে, ইংরেজ চরণে
লুঠিয়ে প'ড়েছে, লয়েছে শরণ।
উঠ উঠ উঠ, উঠ ত্বরা করি,
দুঃখময় তৃণশয্যা পরিহরি,
রণসাজে ধাও, জয়গান গাও,
স্মরণ করিয়ে শ্রীমধুসূদন।
(ওহে) ভয় নাই আর, ভয় নাই আর,
নয়ন মেলিয়া দেখ একবার,
প্রভাত হইল, আঁধার ঘুচিল, কমল ফুটিল,
ঐ রবি-কিরণ॥

আপার গানটি সমুদায় একত্র দেখিলেন। কিন্তু রমণী যখন গান গাহিতে আরম্ভ করেন, তখন প্রথম চারিছত্র ব্যতীত অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল গান আর অধিক অগ্রসর হয় নাই। রমণীকে শ্রোতৃবৃন্দ কেহই সে গান সহজে সম্পূর্ণরূপে গাহিতে দেন নাই।

আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলে, হিমালয় উড়িয়া চলিলে, সম্মুখে হঠাৎ শত শত বিষম বজ্রপাত এককালে হইতে থাকিলে, মানুষ যত না চমকিত, ত্রস্ত, কম্পিত-কলেবর হয়, প্রথম দুই ছত্র গান শুনিয়া আমরা তাহারও অধিক হইলাম। অদ্য "দিল্লীর পতন কি?"—তবে কি ইংরেজের জয় হইয়াছে, পুনরায় কি ইংরেজ দ্বারা দিল্লী নগরী অধিকৃত হইয়াছে? এ শুভ সংবাদ, এতদিন আমরা জানিতাম না। কিন্তু এই গায়িকা কেমন করিয়া জানিল? দিল্লীর পতন!! তাও কি কখন সম্ভব হয়? আমরা স্বপ্ন দেখিতেছি। দেহও গুরু গুরু কাঁপিতে লাগিল। শুভ সংবাদকে সত্য বিবেচনা করিয়া এক একবার উচ্ছ্বাসে উল্লাসে, আনন্দে চোখে জল আসিবার উপক্রম হইল। কিন্তু যখন শুনিলাম, "বাদসা বেগমে, ইংরেজ চরণে, লুঠিয়ে পড়েছে, লয়েছে শরণ"—তখন বাস্তবিকই আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলাম না। বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিয়া সেই গায়িকাকে কহিলাম, "হে সুন্দরি! বল, তুমি কে? তোমার কথা সত্য কিনা? তোমাকে এ গান কে শিখাইল? বল,—বল,—দিল্লীর পতন!—এ সংবাদ সত্য কি না?"

ধওকলসিংহ-প্রমুখ কয়েক জন উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্ম্মচারী ঠিক আমার ন্যায় বলিতে লাগিলেন, "কথা সত্য কি না?—কথা সত্য কি না?"

হণ্টার সাহেব ইংরেজীতে জিজ্ঞাসিলেন, "বাবু! ব্যাপার কি? সত্য সত্যই কি দিল্লীর পতন হইয়াছে? অথবা এ রমণী আমাদিগকে ভুলাইবার জন্য শত্রুদল-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছে?"—

আমি। (ইংরেজীতে) কিছুই ত বুঝিতেছি না! ভিতরে অবশ্যই গভীর রহস্য আছে। কিন্তু রমণীর মোহিনী মূর্ত্তি দেখিয়া এবং সরস সরল স্বর শুনিয়া, আমার ত এমন মনে হয় না যে, এ রমণী মায়াবিনী, নিশাচরী!

হন্টার। সুন্দর মূর্ত্তিটুকু এবং রসালো কথাটুকু,—এই দু'টীতে একত্র হইয়াই ত মানুষকে মাটী করে। ভুবন-ভুলানীর ভাব সহজে কে বুঝিতে পারে? বহুরূপীকে, বহুরূপী বলিয়া সহজে যদি চিনিতে পারিবেন, তবে আর "সাজার" সার্থকতা এবং বাহাদুরী কি হইল?

এত অনুনয় বিনয় এবং আগ্রহ-প্রদর্শন স্বত্বেও রমণী কথা কহিলেন না। তবে এবার তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া গান আরম্ভ করিলেন,—

উঠ উঠ উঠ, উঠ ত্বরা করি,
দুঃখময় তৃণশয্যা পরিহরি,
রণ-সাজে ধাও, জয়গান গাও,
স্মরণ করিয়া শ্রীমধুসূদন!

আবার যুক্তকরে রমণীকে সাধিলাম। আবার ছল্‌ছলনেত্রে রমণীকে কহিলাম, "রক্ষা করুন, রক্ষা করুন;—কথা কহুন!"

কঠিনা কামিনী কাহারও কথা শুনিলেন না,—একটী কথাও কহিলেন না। কেবল দক্ষিণ হস্ত সঞ্চালন পূর্ব্বক আমাদিগকে ধৈর্য্য ধরিতে (ইঙ্গিতে) বলিলেন।

আমরা নীরব, নিস্পন্দ। রমণী পুনরায় সেতারের সহিত গান আরম্ভ করিলেন,—

(ওহে) ভয় নাই আর,
ভয় নাই আর,
নয়ন মেলিয়া দেখ একবার!—
প্রভাত হইল, আঁধার ঘুচিল,
কমল ফুটিল,—ঐ রবি-কিরণ!
(হয়েছে হে আজু দিল্লীর পতন!)

আমার অঙ্গ দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। মাথা ঘুরিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। অন্যান্য শ্রোতাগণও মন্ত্রমুগ্ধবৎ ধীর, স্থির। কথা কন,—এমন শক্তি বুঝি আর কাহারও নাই। গান শেষ হইলে, হন্টার সাহেব হিন্দী ভাষায় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—আপনার গানে আমরা বড়ই পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আপনি সত্য করিয়া বলুন, "দিল্লীর পতন যথার্থ ঘটিয়াছে কি না? ইংরেজের জয় হইয়াছে কি না? বাদসাহ-বেগম বন্দী হইয়াছে কি না? আপনি এ সংবাদ কোথা হইতে পাইলেন? এ গান কাহার তৈয়ারি?—এ গান কাহার নিকট আপনি গাহিতে শিখিলেন?"

রমণী সেতার রাখিয়া আমার দিকে চাহিয়া যোড়হাতে উত্তর করিলেন, "বাবু-সাহেব! আমাকে কি আপনি চিনিতে পারিতেছেন না?"

আমি চমকিয়া উঠিলাম। বিস্ময় শতগুণে বৃদ্ধি হইল। ঈষৎ চিন্তা করিয়া কহিলাম, "তুমি কি মিশ্র বৈজনাথের লোক!—তুমি স্ত্রী নহ, পুরুষ!!!"

তখন সেই রমণী দাঁড়াইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ স্ত্রীবেশ ফেলিয়া দিল। ভিতরে পুরুষবেশ আঁটা ছিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। সেই পুরুষ দাঁড়াইয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিল, "হুজুর! সত্য সত্যই ইংরেজের জয় হইয়াছে! দিল্লীর পতন হইয়াছে।" আমরাও সেই সঙ্গে ধ্বনি করিয়া উঠিলাম, "জয়, ইংরেজের জয়! জয় ইংরেজের জয়!" শত শত সেনা-কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল, "জয় ইংরেজের জয়! জয় জয়—দিল্লীর পতন।" নিয়ম রহিল না, শৃঙ্খলা রহিল না, প্রকরণ রহিল না, পদ্ধতি রহিল না,—লঘু-গুরু ভেদ রহিল না,—সকলে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে করিতে কহিতে লাগিল,—

জয় ইংরেজের জয়,
জয় ইংরেজের জয়!

ষষ্ঠচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আনন্দ-উল্লাসের উৎসব-ভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইল। আমি গুপ্তচরকে জিজ্ঞাসিলাম, "মিশ্র বৈদ্যনাথের কোন পত্র আছে কি?"

গুপ্তচর। না। আপনি আমাকে চেনেন বলিয়াই তিনি কোন পত্র দিলেন না। প্রভু-মহাশয় এই বলিয়া দিয়াছেন যে, বাবু-সাহেব জিজ্ঞাসিলে, কহিও,—পত্র দিবার আবশ্যকতা নাই। যুক্তিযুক্তও নহে। যদি কোন গতিকে পত্র ধরা পড়ে, তাহা হইলে পত্র-প্রেরক এবং পত্র-বাহক উভয়েরই প্রাণদণ্ড হইবে।"

আমি। তুমি স্ত্রীবেশ ধরিয়া আসিলে কেন?

গুপ্তচর। আপনি বোধ হয় জানেন, "বিশেষ-পাস" ব্যতীত, বেরিলি সহর হইতে কাহারও বাহির হইবার যো নাই। সহরের চারিদিকেই ঘাটির পাহারা আছে। শুনিলাম, পূর্ব্বদিকের ঘাটির যিনি অধ্যক্ষ, তিনি বড়ই সেতার-প্রিয়। নারীবেশ ধারণ করিলে, সহজেই অধ্যক্ষের মন মোহিত করিতে সক্ষম হইব, ভাবিয়া আমি নারীবেশ ধারণ করিয়াছিলাম। একদিন, দুইদিন, তিনদিন,—ক্রমান্বয়ে চারিদিন গিয়া তাঁহার নিকট সেতার বাজাইতাম। দেখিলাম, তাঁহার মন পূর্ণমাত্রায় মোহিত হইয়া উঠিয়াছে। আমি প্রস্তাব করিলাম, একবার রামপুর যাইবার জন্য মন বড় ব্যাকুল হইয়াছে। পিতা মাতা ভ্রাতার অনেক দিন কোন সংবাদ পাই নাই। আপনি কৃপা করিয়া, রামপুর-গমনের যদি একখানি পাস বা অনুমতিপত্র দেন, তাহা হইলে কৃতার্থ হই। অধ্যক্ষ কহিল, ইহা কোন্ বিচিত্র কথা? পাস ত দিবই; ইহা ব্যতীত, দুইজন সওয়ার আমাদের সীমানা পর্য্যন্ত আপনার পাল্কীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবে। আমি কহিলাম, তাহাই হউক। এইরূপ কৌশলে আমি বেরিলি হইতে এই শুভ সংবাদ লইয়া এই বৃদ্ধ ভৃত্যের সমভিব্যাহারে পঞ্চম দিনে পলাইয়া আসিয়াছি।

আমি। তুমি কি সেই অবধি এ পর্য্যন্ত স্ত্রীবেশই ধরিয়া আছ নাকি?

গুপ্তচর। না। নবাব খাঁবাহাদুরের সীমা পার করিয়া দিয়া, অশ্বারোহীদ্বয় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আমিও ভাড়া চুকাইয়া দিয়া পাল্কী-বেহারাগণকে বিদায় দিলাম। তখন স্ত্রীবেশ ছাড়িয়া পুরুষবেশ ধরিলাম,—দীর্ঘ দাড়ি গেরুয়া বসন, জটা, কমণ্ডলু লইয়া সন্ন্যাসী সাজিলাম। বৃদ্ধ ভৃত্যের নিকট এই ক্ষুদ্র ডুগী এবং সেতার থাকিত। বাল্যকাল হইতেই গানে আমার বিশেষ অনুরাগ ছিল। আমি পথে এক প্রকাণ্ড বন-বৃক্ষের তলায় বসিয়া এই গানটী বাঁধিয়াছিলাম। এই গানটী আপনা আপনি কতবার গাইয়াছি, কতবার কাঁদিয়াছি। নির্জ্জন স্থান পাইলেই সেতারে এই গানের আলাপ করিতাম। হলদোয়ানির প্রথম ঘাটি যখন এক ক্রোশ দূরে আছে অনুমান হইল, তখন যোগীবেশ ছাড়িয়া আবার নারীবেশ ধরিলাম।

আমি। নারীবেশ হঠাৎ ধারণ করিবার উদ্দেশ্য কি?

গুপ্তচর। নারীবেশে গান খুলিবে ভাল,—গানের জমাট হইবে ভাল,—এই জন্যই নারীবেশ ধরিয়াছিলাম।

আমি। ইংরেজের জয়, দিল্লীর পতন এবং বাদ্সা-বেগমের বন্দী-হওয়া,—এ সকল সংবাদ কিরূপে কোথা হইতে পাইলে?

গুপ্তচর। সর্ব্বপ্রথমে প্রভু-মহাশয় দিল্লীর নিকটস্থ তাঁহার কোন আত্মীয়ের নিকট হইতে পত্র দ্বারা এ শুভসংবাদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু সেই পত্রখানি হেঁয়ালীর ভাবে লিখিত, সহজে অর্থ বোধ

হইবার যো ছিল না। তাহার দুইদিন পরে, ইংরেজের বিজয় সংবাদ লইয়া, একজন গুপ্তচর, খাস দিল্লী সহর হইতে আগমন করে। যিনি চরপ্রেরক, তিনি একজন ধনাঢ্য জমীদার; এবং আমার প্রভুর বিশেষ বন্ধু। ঐ চর মুখে আমরা দিল্লীর যুদ্ধ-বৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইয়াছি।

আমি। আর কোন সূত্রে দিল্লীর পতনের সংবাদ পাইয়াছ কি?

গুপ্তচর। এই পতন সংবাদ একণে বেরিলী সহর-ময় রাষ্ট্র। মেয়ে-ছেলে-বুড়ো সকলেই এ সংবাদ লইয়া গোপনে আন্দোলন করিয়া থাকে। কিন্তু মুখ ফুটিয়া কাহারও বলিবার যো নাই।

আমি। নবাব-খাঁ-বাহাদুর এ সংবাদ শুনেন নাই কি?

গুপ্তচর। শুনিয়া ছিলেন বৈকি? এসংবাদ যাহাতে প্রচার না হয়, প্রজাগণ যাহাতে ভগ্নোৎসাহ না হয়, তাহার জন্য তিনি বিধিমত চেষ্টা করিতেছেন।

আমি। তিনি কিরূপে এ সংবাদ শুনিলেন? এবং একথা ঢাকিবার জন্যই বা কি উপায়ই অবলম্বন করিয়াছেন?

গুপ্তচর। যে দিন দিল্লীর পতন হয়, তারপর দিন প্রাতে উঠিয়াই কাণাঘুষা শুনিতে আরম্ভ করিলাম, ইংরেজের জয় হইয়াছে। এমনও আজগুবি সংবাদ প্রচার হইতে লাগিল, ইংরেজের বড়লাট, স্বয়ং বিবাহ করিবেন বলিয়া বেগমকে কলিকাতায় লইয়া গিয়াছেন। দশবার ঘণ্টা মধ্যে কিরূপে যে, এ সংবাদ দিল্লী হইতে বেরিলি আসিল, তাহাই এখন ভাবিতেছি। এই প্রথম সংবাদ প্রথম কে আনিল, কে প্রথম প্রকাশ করিল, তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। ক্রমশ নবাব-বাহাদুরের কাণেও একথা উঠিল। কিন্তু সহজে তিনি এ সংবাদ বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বিশ্বাস ন করুন, সহরবাসিগণ মধ্যে প্রায় সকলেরই এক-ধারণা জন্মিল, যে সত্যসত্যই ইংরেজের জয় হইয়াছে। ক্রমশ আমরা দিল্লী হইতে পত্র পাইলাম, সংবাদ সত্য। এবং দিল্লী হইতে একজন গুপ্তচর আসিয়াও এ কথার অনুমোদন করিল। এইরূপে বেরিলি সহরবাসী আরও পাঁচসাতজনের নিকট দিল্লী হইতে সংবাদ আসিয়া পৌঁছিল যে, দিল্লীর পতন হইয়াছে; দশহাজার মুসলমানসেনা যুদ্ধে নিহত হইয়াছে; প্রায় বিশ হাজার মুসলমানকে ইংরেজ কর্ত্তৃক ফাঁসীকাঠে ঝুলান হইয়াছে; ইংরেজের জয় হইয়াছে।

আমি। সহরবাসী অন্যান্য লোকে যখন সঠিক সংবাদ পাইল, তখন কেবল নবাব খাঁ-বাহাদুর পাইলেন না কেন?

গুপ্তচর। সঠিক সংবাদ তিনি কেন পাইলেন না, কেমন করিয়া বলিব? এ দুঃখ-সংবাদ তাঁহাকে দিতে কেহ সাহস করে নাই। সে যাহা হউক, যখন পথে-ঘাটে ঘরে-মাঠে কেবল ঐ কথারই জল্পনা হইতে লাগিল, যখন বেরিলি সহরে এক ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল, নবাবপক্ষীয় সৈনিক-কর্ম্মচারিগণ যখন কথঞ্চিৎ ভগ্নোৎসাহ হইয়া উঠিল,—তখন নবাব প্রকাশ্য দরবারে অতি গম্ভীরভাবে, ঈষৎ ক্রোধের সহিত এইরূপ ঘোষণা করিলেন,—"কে বলিল, দিল্লীর পতন হইয়াছে? এ সমস্তই মিথ্যা কথা? কুলোকে এ কু-কথা রটাইয়াছে,—ইহার মূলে কিছু মাত্র সত্য নাই। আমি আমার প্রজাবৃন্দকে সত্য করিয়া বলিতেছি, পূজনীয় দিল্লীর বাদসাহ সুস্থ স্বচ্ছন্দ শরীরে আছেন; তিনি একবার নহে, সাতবার ইংরেজ সেনাকে পরাভূত করিয়াছেন। যেমন সিংহের নিকট মেষশাবক, সেইরূপ দিল্লীর সম্রাটের নিকট ইংরেজ-সেনা আজ অবস্থিত। তোমরা ভয় করিও না উৎসাহ-হীন হইও না। বাদসাহ

যে, জীবিত আছেন এবং তিনি যে, সম্যক্‌রূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। সম্প্রতি তিনি আমাকে মণিমুক্তা-হীরক-খচিত এক বহুমূল্যের পোষাক পুরস্কারের স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। দিল্লীর বাদসাহ-প্রেরিত দূতগণ সেই পরিচ্ছদ এবং খেলাৎ লইয়া আওলা নামক গণ্ডগ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কল্যই আমি দ্রুতগামী উঠের-সওয়ার পাঠাইয়া সেই পরিচ্ছদ এবং খেলাত আনাইতেছি। অতএব দিল্লীর পতন-সংবাদ মিথ্যা।" নবাবের মুখ-নিঃসৃত এই কথা শুনিয়া সকলে ঘরে ফিরিয়া আসিল। দুই দিন পরে নবাব নাগরা বাজাইয়া নগরে ঘোষণা দিলেন, "খেলাত এবং পরিচ্ছদ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দীপচাঁদ শেঠের বৃহৎ বাগানে খেলাত ও পরিচ্ছদ রক্ষিত হইতেছে। তথায় অদ্য নবাব স্বয়ং যাইয়া খেলাত গ্রহণ করিবেন। হিন্দু-মুসলমান প্রজা যে যেখানে আছে, দীপচাঁদের বাগানে সকলে শিঘ্র হাজির হইও।" প্রভাতে মহাসমারোহে হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করত নবাব খাঁ-বাহাদুর দীপচাঁদের বাগান অভিমুখে চলিলেন। বহু লোকের সমাবেশ হইল। আমরাও সঙ্গে ছিলাম। খাঁ-বাহাদুর সুবর্ণ-হীরক-মুক্তা-মণ্ডিত পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন। সর্ব্বলোককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এই পোষাক দিল্লীর সম্রাটের প্রদত্ত। নবাবের সম্মানে ২১টা তোপধ্বনি হইল। দেওয়ান শোভারামের সম্মানে ১১টা তোপ হইল। লোক সকল নবাবকে, যাহার যেমন সাধ্য নজর দিতে আরম্ভ করিল। মোহর, টাকা, আধুলি মুষল ধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। চারিদিকে যেন আনন্দের বাজার বসিয়া গেল। কিন্তু দুঃখ এই, খাঁ-বাহাদুরের এ সুখ, এ আনন্দ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। যে সময় নবাব সহচরবৃন্দ পরিবেষ্টিত হইয়া, পূর্ণমাত্রায় আনন্দ-উপভোগ করিতেছিলেন,—সেই সময়, একজন ভীম-কলেবর অশ্বারোহী, ভীমবেগে, দীপচাঁদের বাগানে, সভামণ্ডপে উপস্থিত হইল। সেই অশ্বারোহী, নবাবকে এক নির্জ্জন গৃহে ডাকিয়া লইয়া গেল। সকলে চমকিত এবং ভীত হইল। এই অশ্বারোহীর নাম আলিইয়ার খাঁ। এই ব্যক্তি অশ্বারোহী দলের একজন অধ্যক্ষ। নবাব, দিল্লীপতনের প্রকৃত সংবাদ জানিবার জন্য গোপনে ইঁহাকে দিল্লী পাঠাইয়াছিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইল, তখন নবাব আর নির্জ্জন গৃহ হইতে ফিরিয়া সভাস্থলে উপনীত হইলেন না। দেওয়ান শোভারাম তখন নবাবকে দেখিতে সেই নির্জ্জন গৃহে গেলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, নবাব পীড়িত হইয়াছেন,—নবাব এখন আর বাহির হইবেন না,—অদ্য আপনারা সকলে ঘরে যাউন। এই কথা বলিবামাত্র সভা ভঙ্গ হইল। লোক সকল সন্দিগ্ধচিত্তে ভগ্নমনে প্রস্থান করিল।

আমি। আলি ইয়ার খাঁ কি সংবাদ আনিয়াছিল?

গুপ্তচর। শেষে সকলি প্রকাশ হইয়া পড়িল। আলি ইয়ার খাঁ, যখন নবাবকে বলে যে, দিল্লীর পতন হইয়াছে, ইংরেজের হস্তে বাদসাহ বন্দী হইয়াছে, তখন নবাব অমনি থর থর কাঁপিয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছা গেলেন।

আমি। আচ্ছা, তবে বহু মূল্যের পোষাকটী নবাবকে কে পাঠাইয়াছিল?

গুপ্তচর। পোষাকই জাল। নবাব নিজেই উহা তৈয়ার করিয়া নিজেই পরিয়াছিলেন। কেবল লোক ভুলাইবার জন্য, তিনি তাহা দিল্লীর বাদসার প্রদত্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, দিল্লীর পতন হয় নাই। সেই ধারণাবশেই তিনি দিল্লীর বাদসাহের নাম দিয়া সেই পোষাক প্রস্তুত করেন।

আমি। তার পর কি হইল?

গুপ্তচর। নবাব সেই দিন হইতে রাজকার্য্য বড় একটা দেখেন না। রাজ্যের সমস্ত কার্য্যই শোভারাম, লইকউল্লা খাঁ, এবং নিয়াজ মহম্মদ এই তিন জনের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইতেছে।

আমি। ইঁহারা কেমন কাজকর্ম্ম করিতেছেন?

গুপ্তচর। নবাব অপেক্ষা অনেক ভাল। ইঁহারাও কিন্তু "দিল্লীর পতন" এ কথা সত্য নহে,—সর্ব্বদাই এই সংবাদ প্রজাপুঞ্জের মধ্যে প্রচার করিতেছেন। কোথাও কিছুই নাই, হঠাৎ সেদিন বার জন অশ্বারোহী নবাব গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিল, আমরা দিল্লী হইতে আসিতেছি। দিল্লীর বাদসাহ ভাল আছেন। ইংরেজ সৈন্য বহুবার পরাজিত হইয়াছে। ইংরেজের জয়ের আর কোন আশা নাই। দিল্লীর বাদসাহের মোহরাঙ্কিত এই পত্র লউন।" বলা বাহুল্য, এ সমস্তই শোভারামের কৌশল। তিনিই এই অশ্বারোহীদলকে এইরূপ ভাবে সাজিয়া আসিতে বলিয়াছিলেন।

এইরূপ অনেক কথাবার্ত্তার পর, আমি গুপ্তচরকে কহিলাম, তুমি বিশ্রাম কর, কিছু আহারাদি কর।

চর কহিল, "বিশ্রামের সময় নাই,—আহারেরও সময় নাই। বড় গুরুতর সংবাদ আছে। শীঘ্র প্রস্তুত হউন। আমি যে কেবল দিল্লীর পতনের সংবাদ দিতে আসিয়াছি, তাহা নহে,—ইহা অপেক্ষা অধিক বিষম সংবাদ দিবার জন্য আমি এখানে প্রেরিত হইয়াছি।"

আমি উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসিলাম, "কি সংবাদ?—কি গুরুতর সংবাদ?"

চর। নির্জ্জনে কহিব। কর্ণেল ক্রসম্যান সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার সম্মুখে আপনাকে এ সংবাদ কহিব। অন্যের নিকট বা অন্য রূপ প্রকারে এ সংবাদ প্রকাশ করিতে নিষেধ আছে।

রমণী-হৃদয়।

বিচিত্রতাময় এই বিশাল অবনী
শোভা নিকেতন।
মোহিনী প্রকৃতি যথা হৃদয়-রঞ্জিনী
খেলে অনুক্ষণ।
কত শোভা শারদীয় বিমল গগনে
তারকা-ভাতিত।
কত শোভা রজনীর প্রশান্ত বদনে
শুধাংশু-রঞ্জিত।
কত শোভা কামরূপী পয়োধর গণে
—সদা নবীনতা।
কত শোভা আলোক ও ছায়ার মিলনে
—সদা বিচিত্রতা।
কত শোভা ব্যোম ভেদী ভূধরের ভালে
তুষার-মণ্ডিত।
কত শোভা সাগরেতে উদয়াস্ত কালে
উপমা-রহিত।
কত শোভা কল্লোলিনী চঞ্চল গমনে
সাগর-মিলনে;
প্রশান্ত-সলিল-বক্ষ-বিম্বিত গগনে
নানা চিত্র সনে।
কত শোভা তরু লতা কুসুমের কায়
চিত্ত-বিমোহিনী।
কত শোভা বিহঙ্গের পতঙ্গের গায়
আনন্দ-দায়িনী।
কত শোভা কাদম্বিনী হৃদয়ে বিকাশে
নৈশ সৌদামিনী
কত শোভা যাদুকর বসন্ত-পরশে
প্রকাশে ধরণী।
এ সব ভৌতিক শোভা! তুলনা কি হয়
সে রূপের সনে?
যেরূপে বিকাশে সদা রমণী-হৃদয়
ঐন্দ্রিক কিরণে?

নানা রত্ন মাঝে শ্রেষ্ঠ মণি দীপ্তিময়
প্রকৃতি ভবনে;
স্বরগীয় প্রভাময়ী রমণী-হৃদয়
অতুল ভুবনে।

জীবন্ত কবিতাময়ী ভুবন-মোহিনী
সুষমা জননী,
মহাশক্তি! মানবীয় কল্পনাবাহিনী
ত্রিদিব-দায়িনী।

যে হৃদয়ে মাতৃস্নেহ দাম্পত্য-প্রণয়
—ঐশিক শকতি—
বিভাতিত জীবসৃষ্টি পালন রক্ষায়
—বিচিত্র সঙ্গতি!

দয়ার আধার উৎস মধুর কোমল
সহানুভূতিত।
মানবের একমাত্র বিরামের স্থল
সংসার-পীড়িত।

রোগের শয্যায় যবে, অবস্থা-সমরে
বিষম ব্যথিত
মানব,—কাহার প্রেম্ যাতনা নিবারে
আত্ম-বিসরিত?

রমণী-হৃদয় বিনা কোথায় মানব?
কঠোর অসার!
কোথায় উদ্যম তার কোথায় বিভব?
অরণ্য-সংসার!

কোথা তার মান বল—চরিত্র বিকাশ?
দুর্ব্বল হৃদয়!
রমণী শকতি—মানবের মনোচ্ছ্বাস,
উন্নতি সহায়।

মানবীয় জীবনের ধ্রুবতারা প্রায়
সংসার-সাগরে,
যে লক্ষ্যে জীবন তরি প্রবাহিয়া যায়
ভাগ্য-উর্ম্মি পরে।

অটল অজেয় শক্তি! প্রভাব যাহার
বিধাতার বরে,
অলক্ষে শাসিছে সদা জগত সংসার
মঙ্গলের তরে।

রক্তপাতী মহারণ আয়ুধ গর্জ্জন
কৃপাণ আঘাত,
অথবা হৃদয় ভেদী অবস্থা পীড়ন,
দুর্ভাগ্য সম্পাত,—

অণুমাত্র বিচলিত নারে যেই চিত
দুর্দ্দম অটল,
পলকে তাহায় করে মধুরে শাসিত
নারী চক্ষুজল।

সমুন্নত, বিকসিত মানবের মন
মধুরে শোভিত।
রমণী হৃদয় ভাতি পরশে যখন
বিশুদ্ধ পবীত।

শ্রীবিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র।

দূরে থাক্।

নিকটে থাকার চেয়ে দূরে থাকা খুব ভাল।
দেখিব দেখিব আশা থাকে মনে চিরকাল।
বিরলে একেলা বসি
ভাবিব সে মুখ খানি,
শুনিব শ্রবণে, তার
অমিয়া সেবিত বাণী;
একাকী হেরিব তারে, একাকী রহিব ভোর।
কল্পনা আনিয়া দিবে তাহারে সম্মুখে মোর।

কেহনা আসিবে আর রব যবে দুজনেতে।
কেহনা মারিবে উঁকি আড়ি পেতে গোপনেতে।
লাজময়ী চারুশীলা
সহিবারে পারে না, তা,
সদা লাজ, সদা ভয়,
লুকায় সে প্রফুল্লতা;
সরমে গুটায়ে যাবে, যদি কেহ মারে উঁকি।
রহিব বিরলে বসি দুজনায় মুখোমুখি।

আরেক হেরিতে তারে কত আশা মনে জাগে।
মধুর মলয় বহে, ফুটে ফুল অনুরাগে।
পূর্ণকলা শশী তোষে
কুমুদীরে সুধাদানে,
গায় ঝিঁঝিঁ প্রেমগান
বিভোলে মধুর তানে;
এতগুলি যে নিধির সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী;
একি হয় একি সয়, রহিবে সে লাজমুখী?

সাধাসাধি করিলেও ঘোমটা সে খুলিবে না।
চাবেনাক মুখ তুলি, কথাও ত সে কবে না॥
বিরক্ত করিলে বড়
চুপে চুপে এই কবে,—
"চুপ কর, চুপ কর
ওরা সব টের পাবে।"
এতে কিগো মিটে আশা, মুখখানি না তুলিলে,
দোঁহে দোঁহাকার ভাবে আত্মহারা না হইলে?

দূরে থা'ক্, দূরে থা'ক্ সেই ভাল সেই বেশ।
মানসে হেরিয়া তারে ঘুচাইব যত ক্লেশ।
বিভোল পাগল প্রায়—
আত্মহারা হয়ে রব,
কল্পনায় এঁকে তারে
তারি ভাবে মগ্ন হব;
দুই প্রাণে এক প্রাণ অনন্ত মহামিলন।
সেই আমি আমিই সে, এই জ্ঞানে নিমগন।

কাজ কি আমার তবে নিকটে রাখিয়ে তারে,
দূরে থেকে পাই যদি প্রাণ ভ'রে দেখিবারে।—
পরাণের গাঁথা ধন
প্রাণ ছাড়ি কোথা রবে?
কাছেতে রহিলে সদা
আশা মোর মিটে যাবে;
কে বলে নয়কো ভাল?—বিরহে অতুল সুখ।
থা'ক্ থা'ক্ দূরে থা'ক্ তাহে কোন নাই দুঃখ॥

বিজয়া।

(স্থান—প্রয়াগ ও নাইনি মধ্যস্থ
যমুনা-সেতু।)

(১)
নির্জ্জনে প্রফুল্লমনে প্রশান্ত প্রবাহ বহি
সুশীতল সন্ধ্যার ছায়ায়,
মন্দ সমীরণ-প্রীতি-হিল্লোল-কম্পিতা—
হে যমুনে! চ'লেছ কোথায়?
এদিকে তমাল তাল, অঙ্কে মধু সুরসাল
নব মুকুলিত চ্যুত নিকুঞ্জ মধুর
পশ্চাতে কাঁদিছে পড়ি—না চাহ নিঠুর।

(২)
চ'লেছ আপন ধ্যানে দূর দিগন্তের কোলে
ভেদি ওই ধূসর আকাশ,
মিলাতে কি প্রাণ সুর-সখী মন্দাকিনী সনে?
ধরাবাসে মিটে গেছে আশ?
এ প্রাণে তরঙ্গ নাই যমুনে, ছোট কি তাই
অথবা আমার ধন হৃদয়ে পাইয়া
ছুটিয়াছ, ভিক্ষা পাছে করি কাঁদাইয়া।

(৩)
ঊষার কনক রেখা কুসুম কাননে ভাল,
স্থান তার নহে লোকালয়,
স্বর্গের মিলন-স্বপ্ন বড় মধুময়, চক্ষে
আসে ভাসে হাসে—স্থায়ী নয়।
জেনে শুনে তবু তার ছলে ভুলেছিনু তার
তাই বজ্রাঘাতে আজ দেহ জ্বলে যায়;
যমুনে! আমার নিধি লুকালে কোথায়?

(৪)
বড় সে দুরন্ত ছেলে, বড়ই অবোধ, কভু
'স্থির' কারে বলে নাহি জানে,
হাসি তার প্রাণ—হাসে কাঁদিতে কাঁদিতে ভুলে-
রূপ পেলে কোল নাহি মানে।
ঝাঁপায়ে পড়েছে পায়—রূপে ভুলে বুঝি হায়
তোমার বুকেতে বাছা গেল ঝাঁপাইয়া;
অলক্ষ্যে বা ডেকেছিলে কোল বাড়াইয়া।

(৫)

অথবা মিলন-সন্ধি ছিল জন্মান্তরে, আজ
দর্শনে তা' প'ড়ে গেল মনে—
না বুঝিতে পথভ্রম, না ছাড়ি বসন, বাছা
ছুটে গেল সে সত্য-পালনে।
বড় সে দুরন্ত মোর, যমুনে! অবোধ মোর
নিতান্ত সোহাগী, দেখো একা অযতনে
যাতনার জল তার না পড়ে নয়নে।

(৬)

এক রাগে ফুরাইল জীবন-সঙ্গীত মোর
পূরবী কাতর প্রাণ-হীন—
এক ছায়া ছেয়ে গেল সারা লীলা-কবিতায়
নিরাশার গোধূলি মলিন।
এক নিরানন্দময় আনন্দে করিনু ক্ষয়
জীবন—নয়ন জলে 'বিজয়া' উৎসব—
মর্ম্মদাহ শঙ্খ-ঘণ্টা নিত্য করে রব।

(৭)

ক'রেছি বিজয়া সাঙ্গ কালের প্রবাহ-কূলে
আশা-সুখ দিয়া সমুদয়
ভাসায়েছি স্বর্ণময়ী শান্তির কিরণ, দেবি
বিজয়া নূতন মোর নয়।
শঙ্কায় লুকায়ে ধীরে আসিনু তোমার তীরে,
বুঝিলে অদৃষ্ট আছে সঙ্গে,—কোথা যাও—
বিজয়া অঞ্চলে বাঁধি,—যমুনে! দাঁড়াও।

(৮)

এস আলিঙ্গন করি— দেহ স্থান বক্ষস্থলে—
এ চিতাগ্নি কর সুশীতল—
দেখি কোন কক্ষে তব খেলিছে মাণিক মোর,
রত্ন-কণা কোথা সে চঞ্চল।
নিতান্ত না দাও স্থান কর এ অভয় দান,—
শ্রেষ্ঠধন দে গেলাম—তীর্থতে আমার—
না পাই মানব-জন্ম জন্মে জন্মে আর।

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

কহত সজনি!

কহ ত সজনি, কি লাগি যমুনা
নাচিয়া নাচিয়া ধাও ত ওই,
সুনীল আকাশে হাস ত চাঁদিমা
কি লাগি কহ ত পরাণ-সই!

কি লাগি ফুকারে রসালে কোকিল
কি লাগি গুঞ্জরে ভ্রমরা কুল,
কি লাগি সমীর নাচিয়া নাচিয়া
চুমিছে সোহাগে কানন-ফুল!

সকলি নীরব ছিল ত সজনি,
ছিল ত সকলে অবশ-পারা,
কা'র সমাগমে জাগে কুতূহলে
কে ছড়ালে আসি সুধার ধারা?

আসল কি সখি, ব্রজে যদুপতি
আসল কি পুন নিঠুর কানু,
পুন কি কপট কাননে পশিয়া
বাজাইবে তার মোহন বেণু?

না না প্রাণ সখি কি লাগি হেথায়
আসিবে কহত নাগর পুন,
কি সুখ ব্রজে? নাহিক যথায়
কুবুজা সুন্দরী তুষিতে মন!

নিবার শ্যামেরে আসে না হেথায়
কি হেতু আসিবে কাহার তরে?
কবি কহে, ধনি, না কহ ও-বাণী
ফেলো না রতন বিরাগ-ভরে।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

জন্মভূমি।

৪র্থ ভাগ। } বৈশাখ। ১৩০১। { ৫ম সংখ্যা।

৺কাশীরাম দাস।

ভারতের ভাবী ভরসা ও অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব-সূচনা স্বরূপ যত কিছু ঘটনা এ পর্য্যন্ত আমার জ্ঞানগোচরে ঘটিয়াছে; সে সমস্তের মধ্যে, আমার বোধ হয়, গত ১৮৯৩ ইংরেজী সালের ভারতীয় কংগ্রেসে উপস্থিত ও সভাপতিত্ব গ্রহণ করিবার জন্য শ্রীমান্ দাদা ভাই নওরোজী যখন উপস্থিত হইয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহার সম্মানার্থে বোম্বাই হইতে লাহোর পর্য্যন্ত যে অভ্যর্থনাদৃশ্য অভিনীত হয়; তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশা ও উৎসাহপ্রদ এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিত্ত-তৃপ্তিকর। হইতে পারে নওরোজী মহাশয় সে অভ্যর্থনার সম্যক্ বা একেবারেই যোগ্য নহেন, হইতে পারে প্রতিষ্ঠাপাত্র নকল পদার্থ; কিন্তু তাহা হইলেও আশার বিষয় যথেষ্ট। যেখানে নকলের খেলা আরম্ভ হইয়াছে, সেখানে আসলের আবির্ভাবকাল যে অতি নিকট, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ধূলার ঘরকন্না লইয়া খেলিতে খেলিতেই আসল ঘরকন্নার দেখা পাওয়া যায়। এ সংসারে অনেক উঠাপড়া করিলে তবে জ্ঞানলাভ হয়। মানুষ অনন্ত প্রয়োজনজালে বেষ্টিত। সেই প্রয়োজনমোহে মোহিত হওয়ায়, মানুষ দিব্য-দৃষ্টিতে অন্ধ। এজন্য নাম ও নকল লইয়া অনেক খেলিতে খেলিতে, তবে গিয়া আসলের গায়ে হাত পড়ে। কোন বিষয়ের জন্য অতি ব্যস্ত হইও না; অথবা কেহ অতিব্যস্ত হইয়া একেবারে আসলকে ধরিতে পারিতেছে না বলিয়া তাহাকে গালাগালি পাড়িও না, বা তাহার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করিও না। যে প্রকৃতির বক্ষে তোমার স্থিতি, যাহার অনুকরণে তোমার কার্য্য, যাহার কার্য্য-সহায়তায় তোমার কার্য্য; দেখ তাকাইয়া, তাহাতে ব্যস্ততার লেশমাত্র নাই; ধীর স্থির নির্ব্বাক্ চেষ্টায় সকল কার্য্য আপনা হইতে অতর্কিতভাবে হইয়া যাইতেছে। যৌগিকাকর্ষণে গোটা বাঁধেও কার্য্য হয়; শান্তভাব সেই যৌগিকাকর্ষণের মূল, গরমে তাহা উড়িয়া যায়। অতএব তোমরাও ধীর স্থির নির্ব্বাক্ চেষ্টা করিতে শিখ; সহানুভূতিপূর্ণ হও ও বচনব্যয় ছাড়িয়া দেও; তোমাদেরও অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

যে জাতি যখন নিদ্রিত, সুতরাং অধঃপাতগত, তাহার প্রথম ও প্রধান লক্ষণ,—পুরাতন ও পৈতৃক বিষয়ের উপর অনাস্থা ও বিদ্বেষভাব। দ্বিতীয় লক্ষণ,—সমাজ বা জাতি মধ্যে গুণের প্রতিষ্ঠা থাকে না; সকলেই জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠত্ব কেহ স্বীকার করিতে চাহে না।

তদ্বিপরীতে কোন জাতি যখন দীর্ঘ অধঃপাত-নিদ্রা হইতে জাগরিত হইতে থাকে, তখন তাহার প্রথম লক্ষণ,—পুরাতন ও পৈতৃক বিষয়ের উপর ভক্তি; দ্বিতীয় চিহ্ন,—গুণ দেখিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করা। যখন গুণের প্রতিষ্ঠা করিতে শিখে, তখনই চক্ষু হইতে যে ঘুমের ঘোর কাটিয়াছে, ইহা প্রকৃতপক্ষে বলিতে পারা যায়; এবং তখনই কেবল জ্যেষ্ঠত্ব ক্ষয় পাইয়া সমাজ মধ্যে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠত্ব সম্বন্ধ পুনঃস্থাপিত হইতে আরম্ভ হয়। জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব হইতে নেতা ও নীত সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং যেখানে নেতার উদয় হইয়াছে ও নেতা স্বীয় আনুগত্য সাধক নীতকে পাইয়াছে, সেখানে আর অভীষ্টসিদ্ধি-পক্ষে অভাব কিসের? তাই বলিতেছিলাম যে, দাদা ভাই নওরোজীর প্রতিষ্ঠা ও অভ্যর্থনা ব্যাপার বড়ই আশা-ও উৎসাহপ্রদ, বড়ই চিত্ত-তৃপ্তিকর! যেহেতু উহা দ্বারাই স্পষ্টরূপে জানিতে পারিলাম যে, সত্য সত্যই আজি ভারত সন্তান বহুদীর্ঘ ঘুমের পর জাগরিত হইতে চলিয়াছে। হইতে পারে এখনও একটু একটু ঘোর আছে; অথবা হইতে পারে কেন? এখনও না হয় যথেষ্ট ঘোর আছে, তাই আসল নকল ঠিক চিনিয়া লইতে পারে না; কিন্তু তাহা হইলেই বা আনন্দের কমি কি?—ঘুম ভাঙ্গিলে আর ঘোর কাটিতে কতক্ষণ যায়?

কিন্তু গুণের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া, কেবল প্রাচীনের গুণে মোহিত হইলে ও তাহা লইয়া বসিয়া কাঁদিলে ও হা হুতাশ করিলে কোন ফল হয় না। উহা আবার নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বলক্ষণ। প্রাচীন কাল ও প্রাচীন বিষয় চিরকালই সমান রমণীয় এবং সে রমণীয়তা উপস্থিত কার্য্য-জগতে সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি কোন কালে ও কোন যুগেই মিলে না। উপস্থিত কার্য্য-জগৎ, সকল যুগেই সমান কলির রাজত্ব। অতএব মিছা মোহে মোহিত হইয়া আত্মধ্বংস উচিত নয়; মৃতের মোহে মৃতবৎ হইতে যাওয়া অপেক্ষা, জীব-জগতে প্রবেশ পূর্ব্বক জীবন্ত হওয়াতেই এ সংসারে জীবনের সার্থকতা; তবে সে সঙ্গে ইহাও ভুলা উচিত নয় যে, বিগত কার্য্য জগতই উপস্থিত কার্য্য-জগতের ভিত্তিস্বরূপ। উপস্থিত কার্য্য জগতে যে গুণ, তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই তবে জাতিমধ্যে প্রকৃত জীবন্ত ভাবের উদ্রেক হয়; কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্মরণীয় যে, বিগত গুণ ও গুণী কেহ অপ্রতিষ্ঠিত পড়িয়া থাকিলে, কে তোমার উপস্থিত গুণপ্রতিষ্ঠায় প্রত্যয় স্থাপনে সক্ষম হইবে? আর তোমারই বা গুণগ্রাহিতা শক্তির পূর্ণতা আসিবে তাহাতে কিরূপে? অপূর্ণতায় উদ্দিষ্ট কার্য্যের সিদ্ধি-সম্ভাবনা কোথায়? ইহা নিশ্চয় জানিও, এ সংসারে কোন কালেই আধা-ডিক্রি আধা-ডিস্‌মিসে কখনও কোন কার্য্যসিদ্ধি হয় না।

অদ্যকার প্রস্তাবের আলোচ্য, বিগত কালের একজন মহাগুণী মহাপুরুষের বিষয়। অতি দূর বিগত কালের নহে,—ইনি যে কালের লোক, তাহার সহ আমাদের অতি নিকট ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; এজন্য ইহার গুণানুভব ও তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে, আমাদের পক্ষে নিন্দা ও ভর্ৎসনার বিষয় যথেষ্ট। আমরা ইহার গুণ দ্বারা নিত্য উপকৃত হইতেছি; অথচ জ্ঞানতঃ তাহা অনুভব করি না, স্মরণ করি না, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে জানি না, গুণের প্রতিষ্ঠা করিতে পারি না; ইহাপেক্ষা লজ্জা ও অপযশের কথা আর কি হইতে পারে? এ কালের বাঙ্গালী জাতি শৌর্য্য, বীর্য্য, ঔদার্য্য ও মহত্ত্বাদি সকল গুণে হীন হইলেও, নৈতিকপথে যে আজিও পশুবৎ হইতে পায় নাই; অথবা অন্যান্য সকল দেশের ইতর শ্রেণীর তুলনায় বাঙ্গালার ইতর-শ্রেণী যে আজিও সৎ ও নৈতিক জীবনে অনেক উন্নত, অনেক মনুষ্যত্বপূর্ণ, অনেক শ্রেষ্ঠ; যে কেবল প্রধানতঃ কাশীরাম দাসের

প্রসাদাৎ। কাশীরামকৃত মহাভারত শ্রবণ ও তৎকর্ত্তৃক কথিত নীতির পুনঃপুনঃ আলোচনাই তাহার প্রধান কারণ। জাতীয়-চরিত্রের উপর কাশীরাম দাসের প্রভুত্ব যত, এরূপ আর কোন বাঙ্গালী-কবির ভাগ্যে ঘটে নাই।

কালমাহাত্ম্যে এখন অনেক কমিয়া আসিয়াছে সত্য, কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও, বাঙ্গালায় প্রায় এমন গ্রাম ছিল না এবং গ্রামে এমন পাড়া ছিল না, যেখানে বৈকাল হইলেই মহাভারত-পাঠ আরম্ভ না হইত এবং যেখানে ইতর-ভদ্র-নির্ব্বিশেষে পাড়ার নর-নারী সকলে সমবেত হইয়া একমনে ও ভক্তি-বিগলিতচিত্তে তাহা শ্রবণ না করিত। শ্রবণান্তে শ্রোতৃগণের মধ্যে পঠিত অংশ হইতে নীতি তত্ত্বাদির আলোচনা চলিত এবং সেই আলোচনা হইতে তাহাদের চরিত্র বিশোধিত এবং হৃদয়স্থ ভক্তি পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিত। বলা বাহুল্য যে, সেই পাঠ ও আলোচনার ফলেই কথিত বাঙ্গালি-চরিত্রের শ্রেষ্ঠতা, নৈতিকতা ও মনুষ্যত্বপূর্ণ ভাব। এখন যে এমন নীতিশূন্য, মনুষ্যত্বশূন্য, পাষণ্ডতার দিন; তথাপি এখনও কাশীরাম দাসের মহাভারত অধীত ও আলোচিত হইয়া থাকে বড় কম নহে। আর কোন বাঙ্গালা পুস্তক বোধ হয় এখনও এত অধিক পরিমাণে বিক্রীত হইতে পারে নাই। শুনিয়াছি না কি, বটতলা হইতে এখনও প্রতিবর্ষে লক্ষাধিক সংখ্যক কাশীরাম দাসের মহাভারত বিক্রয় হইয়া থাকে।

মহাভারতের যে আখ্যান জ্ঞান ব্যতীত হিন্দুর হিন্দুত্ব সম্পূর্ণ হয় না; যে সকল পৌরাণিক তত্ত্ব পরিজ্ঞাত না হইলে, হিন্দুর হিন্দুয়ানী অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়; কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, অর্থাৎ কালীসিংহ ও বর্দ্ধমান-রাজের ভারত প্রকাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, কি ইতর কি ভদ্র, কি পণ্ডিত কি মূর্খ, কি অধ্যাপক কি কিতাবতী বিদ্বান্ সকলেরই নিকট সেই সকল জ্ঞান ও তত্ত্বপরিজ্ঞানের একমাত্র উপায় ও উৎস ছিল কাশীরাম-দাসকৃত মহাভারত। নতুবা সংস্কৃত মহাভারত বলিয়া যে একটা পদার্থ আছে, তাহা অধিকাংশ অধ্যাপকই কেবল জনশ্রুতিতে অবগত ছিলেন এবং সাধারণ ক্রিয়াকর্ম্মে যতটুকুর প্রয়োজন, তদতিরিক্ত সংস্কৃত মহাভারতের অংশ প্রায় কোন অধ্যাপকেরই স্বর ঠাঙ্গাইয়া বাহির করিতে পারা যাইত না। এই একমাত্র কথা দ্বারাই সকলে এখন অনুমান করিতে পারিবে যে, কি অসাধারণ শ্রমে কি অমূল্য রত্নই না উদ্ধার করিয়া, কাশীরাম স্বজাতি ও স্বদেশকে চিরকৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন! কিন্তু এই সঙ্গে এটাও জিজ্ঞাস্য,—হে বঙ্গসন্তানগণ! আর তোমরা সেই মহাপুরুষ, সেই অমূল্য রত্নের দাতাকে কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য কি করিয়াছ? ভাবিয়া দেখ, অনেক কথা ইহাতে ভাবিবার আছে। সংসারে যত প্রকার কুকীর্ত্তি ও কু-কাজ আছে, অকৃতজ্ঞতার তুল্য অযশস্কর ও লজ্জাকর আর দ্বিতীয় নাই। উপকৃতের কৃতজ্ঞতা দ্বারা উপকারকের লাভ লোক্‌সান সম্বন্ধে বস্তুতঃ বড় একটা আসে যায় না; কিন্তু যে কৃতজ্ঞতা দেখাইতে পারে, তাহার নিজেরই তাহাতে বরং লাভ ও প্রতিষ্ঠার ভাগ অনেক।

অনেকের এখনও একরূপ ভ্রম আছে যে, কাশীরাম বুঝি, মহাভারতের সংক্ষিপ্ত অনুবাদক; বস্তুতঃ তাহা নহে। কাশীরামের মহাভারত অনুবাদ নহে এবং তজ্জন্য উহাকে বরং মৌলিক গ্রন্থবিশেষ বলিলে অসঙ্গত হয় না। কাশীরাম দাস নিজে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন না; অথবা পাশ্চাত্যধরণে এখনকার ন্যায় অসাধারণ পাণ্ডিত্যও তখন প্রচলিত হয় নাই,—যে পাণ্ডিত্যে কোন ভাষা না পড়িয়াও বহু-

ভাষাজ্ঞতার পরিচয় নির্ব্বিঘ্নে দিতে পারা যায়, কোন কেতাব না পড়িয়াও সকল কেতাবের প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে পারা যায় এবং কিছু না জানিয়াও সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারা যায়। এখনকার দিনে বড় সুবিধায় ও সৌভাগ্যপ্রথায় মৌখিক বিদ্যালাপ অসভ্যতা, সুতরাং যদৃচ্ছা পাণ্ডিত্য-খ্যাতির কোনই প্রতিবন্ধকতা নাই; কিন্তু তখনকার দিনে কে কতটা জানে না জানে, দুই দিনও তাহা ছাপাইয়া রাখিতে পারিত না। অতএব এই অবস্থায় ও এমন দিনে, কাশীরামের সাধ্য কি ছিল যে, তিনি স্থূল সূক্ষ্ম, সংক্ষেপ বিস্তার, তাহার যে কোন আকারে মহাভারত অনুবাদ করিতে সমর্থ হন। তাঁহার ছিল মোটের উপর পুঁজি-পাটা,—কিতাবতী লেখাপড়া মাত্র সম্বল। এজন্য তিনি অভিরাম মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক ব্রাহ্মণের মুখে মহাভারতের মোটামুটি গল্পটা শুনিয়া লইয়া, তাহারই অবলম্বনে নিজে মহাভারত রচনা করেন,—

"হরিহরপুরবাসী সর্ব্বগুণধাম।
পুরুষোত্তম মুখটীনন্দন অভিরাম॥
কাশীরাম দাস কহে তাঁর আশীর্ব্বাদে।
সদা চিত্ত রহে যেন দ্বিজরাজপদে॥"

মহাভারত।

"শ্রুত মাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥"

মহাভারত।

অতএব উপাখ্যান-ভাগমাত্র মহাভারতের; নতুবা উহাতে কবিত্ব, চরিত্র-চিত্রণ, রস, সৌন্দর্য্য, তত্ত্ব ও নীতি প্রভৃতি যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই কাশীরামের নিজস্ব সম্পত্তি। এমন কি, মূল মহাভারতের উপাখ্যান ভাগ তিনি এতই মোটামুটি শুনিয়া লইয়াছিলেন যে, কবিত্ব, সৌন্দর্য্য বা তত্ত্ব ও নীতি অংশে মূল মহাভারতের সঙ্গে মিল থাকা ত দূরের কথা; অন্তর্নিবিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যান-ভাগের সঙ্গে পর্য্যন্ত অনেক স্থলেই মূলের সহ কিছুমাত্র মিলন দেখিতে পাওয়া যায় না। কাশীরামের মহাভারতে যে সকল ক্ষুদ্র উপাখ্যান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার কতক অংশ মূল মহাভারতের বটে; কিন্তু অপরগুলি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, কাশীরাম নানাস্থানে নানা পুরাণ হইতে কথকের মুখে যে সকল শুনিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার মহাভারতে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন। সে কালে কথকের ধূমটা বড়ই বেশী বেশী ছিল। সে যাহা হউক, এখন এ কথা আর অধিক করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া বাহুল্য যে, কাশীরামের মহাভারত শ্রবণ যে পরিমাণে মোটামুটী বলিয়া প্রমাণিত হইবে, কাশীরামের নিজ কৃতিত্ব ও কবিত্বও ততই অধিক পরিমাণে উদ্ভাসিত হইতে থাকিবে। ফলতঃ মূল মহাভারতের সঙ্গে কাশীরামের সংস্রব অতি অল্পই এবং সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, কাশীরামের মহাভারতকে প্রকৃতপক্ষে মৌলিক গ্রন্থ বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।

মহাভারতের অন্য বিষয়, অন্য কথা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, একটী বিষয়ের উল্লেখ দ্বারা এখানে দেখাইব যে, কাশীরাম প্রকৃতই কিরূপ স্বভাবসিদ্ধ শক্তিশালী মানুষ, কিরূপ যথার্থতঃই স্বরস্বতীর বরপুত্র ছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কাশীরামের শিক্ষিত বিদ্যার সীমা কিতাবতী লেখাপড়া পর্য্যন্ত। কিন্তু কিতাবতী লেখাপড়া কাহাকে বলে, তাহা সকলে জানেন কিনা বলিতে পারি না। সেকালে লেখাপড়া ছিল দুই প্রকারের; এক কিতাবতী, অপর পণ্ডিতী। কিতাবতী শিক্ষা হইত পাঠশালে আর পণ্ডিতী শিক্ষা হইত টোলে। পাঠশালার প্রথম শিক্ষা, তালপাতে লেখা; তাহা হইতে উন্নতি হইলে, কলাপাতে লেখা; কলাপাত হইতে উন্নতি কাগজে। কাগজে নানাবিধ পাঠা-

পাঠ বিশিষ্ট পত্র ও দলিলাদির ধারা শিক্ষাসহ, লেখায় হাত পাকিলে এবং অন্যদিকে শুভঙ্করী অঙ্ক সমস্ত কষা সমাপ্ত হইলেই, বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইল। তাহার পর যে যে-পথে যাইবে, অর্থাৎ জমিদারি সেরেস্তা বা মহাজনের সেরেস্তায় যে কাজ করিবে, সে তৎ-তৎ সেরেস্তায় কিছুকাল শিক্ষানবিশী করিয়া, তাহার পর সর্ব্বতোভাবে লায়েক হইয়া যাইত। অন্যদিকে পণ্ডিতী ধরণের বিদ্যার্থী যে, সে পাঠশালে কলাপাত পর্য্যন্ত লিখিয়া; কখনও বা পাঠশালে সেরূপ নাও লিখিয়া; টোলে একবারেই ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিত এবং তাহার পর ক্রমে ক্রমে টোলের যথারীতিতে সংস্কৃত বিদ্যায় শিক্ষিত হইত। কিন্তু এ-দিকে ত হইলেন শ্রাদ্ধসভা উজ্জ্বলকারী মহাপণ্ডিত, ও-দিকে কিন্তু বাঙ্গালায় দুই পংক্তি লিখিতে হইলে বা কোন একটা জিনিসের দর কষিতে হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া যাইত; আর সে সকলের প্রতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঘৃণা ও বিদ্বেষই বা ছিল কত!

এই ত ছিল তখনকার কিতাবতীশিক্ষা। বলিয়াছি যে, কাশীরামের মানুষের নিকট বিদ্যা শিক্ষার সীমা এই কিতাবতী পর্য্যন্ত। ইহা ব্যতীত, এখনকার ন্যায় তখন পাঁচ রকম দেখিয়া শুনিয়া যে কিছু শিখিবেন, সে সুযোগও ছিল না। তখন এখনকার ন্যায় "সাধুভাষাও" প্রচলিত ছিল না, অথবা এখনকার ন্যায় নানাবিধ বাঙ্গালা কেতাবও তখন হয় নাই;—কি কৃষ্ণবন্দের পাগ্‌লা বাঙ্গলা, কি বিদ্যাসাগরের নাকে-কাঁদুনে মুমূর্ষু বাঙ্গালা, কি অক্ষয়কুমার দত্তের ফুলো-মাস-লাগা বাঙ্গালা, কি আধুনিক উপন্যাস-লেখকদিগের শয্যাবিলাসী বাঙ্গালা, কি আধুনিক সমালোচক ও সাহিত্যসিংহদিগের বুজরুক বাঙ্গালা, এ সকল কিছুরই তখন উৎপত্তি হয় নাই। সুতরাং কাশীরাম দাস যে পাঁচ রকম দেখিয়া শুনিয়াও দুই পাঁচটা সাধুভাষা শিখিবেন, সে সুযোগও ছিল না। অথবা আজিকার দিনে কেবল এক বিলাসিনীদের প্রণয়পত্রী মাত্র পাঠেই দেখ না কেন, কত তরবেতর ও রংবেরঙের সাধুভাষা শিখিতে পারা যায়। কিন্তু হায় দুর্ভাগ্য কাশীরাম! তাঁহার সময়ে মাথা খুঁড়িয়া মরিলে, সে সুযোগটাও মিলিত না। কপালক্রমে প্রেম-বিলাসিনীরা তখন ছিলেন, গোবরঘাঁটুনী ও উনন বিলাসিনী! সকল দিকেই ঘোর দুর্য্যোগ। তবেই দেখ, একে ত কাশীরাম ছিলেন বাহাল চারি পোয়া গুরুমহাশয়, তাহাতে আবার এই সকল সুবিধা-সুযোগ-হীন; অথচ কিন্তু কাশীদাসের রচনা দেখিলে কি বোধ হয়? শব্দশাস্ত্রে কাশীরামের এরূপ অসাধারণ অধিকার যে, অভিধান-মুখস্থকারী অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যও তাহার কাছে লজ্জা পায়; রচনার কৌশল ও গাঢ়তা এরূপ যে, বর্ত্তমান কালের তাবৎ "সাধুভাষা" উন্নতি ও তরবেতর ইংরেজী অনুকরণের বৈচিত্র্য সহ কোন লেখকই, কাশীরামের সঙ্গে তুলিত হইতে পারে না; অথবা তাহাদিগকেই আজিও কাশীরাম হইতে সাধুভাষা শিখিতে হয়। এতৎসম্বন্ধে আমার এমনও বিশ্বাস যে, আধুনিক প্রায় কোন লেখকের নাম কাশীরামের সহ এক সঙ্গে উল্লেখ করিবারই অযোগ্য এবং সেরূপ উল্লেখে কাশীরামের প্রভূতরূপে অপমান করা হয়। তাহার পর, কাশীরামের রচনায় গাম্ভীর্য্যের ভাগ এতই বেশী যে, সে গাম্ভীর্য্যের ছায়াপাত হেতু, এমন কি, কাশীরাম যেখানে আদিরস বা অপর কোন রসের অবতারণা করিয়াছেন, সেখানে তাহাকেও তত্তৎ রস বলিয়া গ্রহণ করিতে যেন শঙ্কিত হইতে হয়। লোক হাসাইব বা লোক কাঁদাইব, লোকে সুখ্যাতি করিবে কি অখ্যাতি করিবে, লোকে আমাকে বাহবা দিবে, আমি চিরজীবী

হইব ও কবি খ্যাতি পাইব, এ সকলের প্রতি কাশীরামের সিকি পয়সারও ভ্রূক্ষেপ ছিল না;—কোন সত্ত্ববান্ সারত্বপূর্ণ ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষেরই তাহা থাকা উচিত নহে। কাশীরামের একমাত্র চেষ্টা যে, যে মহদ্ব্যাপারে তিনি লিপ্ত হইয়াছেন, তাহা কিরূপে যথাকর্ত্তব্য-জ্ঞানে সমাধা করিবেন। বিষয়ের মহদ্ভাব তাহার মনে ও চক্ষুঃসমক্ষে সর্ব্বদাই উদ্ভাসিত হইতেছে; প্রাণ মন ভক্তিভরে বিনত এবং হরিগুণানুকীর্ত্তন তাঁহার উদ্দেশ্য, যে হরিগুণানুকীর্ত্তন সম্বন্ধে,—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥"

সুতরাং কেননা কাশীদাসের চিত্তছায়ায় ও লেখনীমুখে সমস্ত বিষয়, এমন কি সামান্য রস ও কথাটী পর্য্যন্তও, মহত্ত্ব ও গাম্ভীর্য্যের ছায়ায় বিভাসিত না হইবে। স্বভাবসিদ্ধ লেখক ও ভাবুক যে, তাহার হস্তে বিষয় সকল, স্ব স্ব ভাব পরিত্যাগ করে না, অথচ এই প্রকারেই উন্নত ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাই বলিতেছিলাম যে, জাতিতে গুরুমহাশয় হইয়াও, গুরুত্ব যাহাতে এরূপ, তাহাকে প্রকৃত সভাবসিদ্ধ শক্তিশালী পুরুষ ও সরস্বতীর বরপুত্র ভিন্ন আর কি বলিতে পারা যায়? ফলতঃ কিতাবতী কাশীরাম যাহা লিখিয়া গিয়াছেন; ব্যাকরণ মতি ও বড়বিদ্যায় শিক্ষিত পণ্ডিত তাহার সমকক্ষতা করা দূরে থাকুক, তাহা সম্যক্ শীঘ বোধায়ত্তনে আনিতে ও নির্দ্দোষ অনুলিপিটাও করিয়া উঠিতে পারেন না!

তরল রসাদি উদ্দীপন করিতে গিয়া, গাঁজাখোর বা গুলিখোরের বাক্যানুকরণ করিতে যাওয়া—ছুটলে ও নকল লেখক বা নকল কবির কার্য্য, আসল লেখক বা কবি তাহার কিছুই করে না; অথবা কোথায় কি রসের অবতারণা করিতেছি, তাহার খোজ পর্য্যন্তও তাহারা রাখে না। স্বভাবসিদ্ধ লেখক বা কবি যাহারা, তাহারা যথাস্বভাব যেখানে যাহা হইতে পারে ও হইবে, তাহাই করিয়া যায় এবং তাহাতে রস সকলও সুতরাং আপনা হইতেই অবতারিত ও উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। আর নকল লেখক যাহারা, তাহারাই কেবল রস খুজিয়া বেড়ায় ও স্থান অস্থানে নানা কৃত্রিম উপায়ে তাহা প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা পায়। কথা আছে, স্বাস্থ্যবান্ যে, সে স্বাস্থ্য জন্য বিষয়ের খোজখবর বড় একটা রাখে না; কিন্তু সে খোজখবর বেশী রাখে রুগ্ন যে, সেইই।

উপরে গ্রন্থের গুণাগুণ সম্বন্ধে দুই চারি কথা যাহা বলিলাম, তদ্দ্বারা এরূপ কেহ যেন বিবেচনা না করে যে, আমি কাশীরামের মহাভারত-সমালোচন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। তাহা নহে। সমালোচন করা আমার উদ্দেশ্য নহে এবং কাশীরামের মহাভারত এত বড়ই উচ্চ ও অপরিসীম সারবান্ গ্রন্থ যে, আমি নিজেকে তাহার সমালোচনে আদৌ উপযুক্ত বলিয়াই বিবেচনা করি না। অতএব আমার উদ্দেশ্য সমালোচনা নহে, আমার উদ্দেশ্য সাধারণে কেবল কিঞ্চিৎ কাশীরামের মহাভারতের পরিচয় দেওয়া। অথবা এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, যে গ্রন্থ ইতর ভদ্র সকলেই পড়িতেছে, সকলেই যাহার মাধুর্য্যে মোহিত হইয়াছে, যাহার উপাখ্যান ভাগ সকলেরই নিত্য স্মরণীয় হইয়াছে, গাম্ভীর্য্য ও গুণে যাহাকে লোকে পবিত্র হরিকথার উৎস স্বরূপ বলিয়া মানিতেছে, যদ্বোধিত নীতি দ্বারা লোকে আত্মসংস্কার করিতেছে এবং অধুনাতন "প্রসিদ্ধ কবি" "সুপ্রসিদ্ধ কবি" "মহাকবিগণের" কাব্য নাটকাদি পর্য্যন্ত রচনায় অবলম্বনীয় আখ্যায়িকা দানে যাহা মহারত্নাগার

স্বরূপ হইয়াছে; তাহার আবার পরিচয় দিয়া দেওয়ারই বা প্রয়োজন কি?

কিন্তু হায়! প্রয়োজন আছে; এ হতভাগ্য দুরদৃষ্টপূর্ণ দেশে অপ্রয়োজন স্থলেও প্রয়োজনের আবশ্যকতা দৃষ্ট হয়। তাই বলি, একটু ভাবিয়া দেখিলে এত গুণ সত্ত্বেও যেন কাশীরামের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া দেওয়ার আবশ্যকতা বলিয়া বোধ হয়। এ সংসারে এমন মহামূল্য দ্রব্য অবশ্যই অনেক দেখিয়া থাকিবে যে, বালকে যাহার মূল্য কিছুমাত্র বুঝে না, অথচ দ্রব্যটীর স্বাভাবিক আকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া তাহার যথেষ্ট আদর ও যত্ন করিয়া থাকে। এ বঙ্গভূমে কাশীরামেরও সেই দশা;—কাশীরামের যথার্থ মূল্য অনেকেই অতি কম বুঝে, অথচ গ্রন্থের স্বভাবজ গুণে আকৃষ্ট হইয়া লোকে তাহার সমাদর করিয়া থাকে যথেষ্ট। কিন্তু বালকের আদর ও মানুষের আদরের মূলীভূত কারণে অনেক তফাত এবং উভয় ভেদে মূলীভূত কারণ কি, তাহা বুঝাইতে যাওয়া বাহুল্যমাত্র। এ বঙ্গভূমে কাশীরামের আদর সেই বালকজনোচিত। বস্তুতই মহাভারতের আদর ও মূল্যাবধারণ এরূপ বালকজনোচিত না হইলে মহাভারতের একদিকে বিক্রয় স্থলে এতটা কাট্‌তি এবং আরদিকে মহাভারতের গ্রন্থগত এতটা দুর্দ্দশা ঘটিতে পাইবে কেন?

এখন গ্রন্থগত দুর্দ্দশার কথা আর মাথামুণ্ড বেশী করিয়া বলিব কি? মহাভারত ত পড়ে অনেকেই; কিন্তু এ কথার খোজ বোধ হয় অতি অল্প লোকেই রাখিয়া থাকে যে, বাজারে কাশী রাম দাসের মহাভারত বলিয়া যে মহাভারত বিক্রয় হয়, তাহাতে আসল কাশীরামের রচনাভাগ অতি অল্পই। দুর্দ্দশার প্রথম কথা;—বটতলার ছাপার গুণে কোথাও কেতাবের দুই পাত, কোথাও দশপাত, কোথাও বা অন্তর্নিহিত উপাখ্যান বিশেষ সমস্তই, প্রায় সর্ব্বদাই ত বাদ পড়িয়া থাকে এবং বটতলার ছাপাখানা ভেদে পুনঃ বাদের ভাগ এত বিভিন্ন ও বিবিধ যে, কোন দুই ছাপাখানায় কেতাবের সহ একমিল দেখিতে পাওয়া যায় না। বাদছাদের ব্যাপার ত গেল এরূপ, অথচ ইহাতে মহৎ আশ্চর্য্য কথা এই যে, ইহা কখনও কোন পাঠক অনুভব করে না, কাহারও চিত্ত তাহাতে আকর্ষিত হয় না এবং মনেও কখনও কাহার খট্‌কা উঠে না যে, ভিতরে ভিতরে কাণ্ডখানা হইয়া যাইতেছে কি? মহাভারত পড়িতে হয়, না মহাভারত পড়া! কিন্তু কি পড়িতেছি, কি হইতেছে, ঠিক পড়িতেছি, কি কিছু গোলযোগ ঘটিয়াছে, অথবা তলে তলে ব্যাপারখানা হইয়া যাইতেছে কি, তাহার খোজ খবর কে রাখে?—বাঙ্গালি বিদ্যাবুদ্ধির অবধানতা, বিষয় ও বিষয়ের সারগ্রাহিতা এবং তীক্ষ্মদৃষ্টি চালনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর কি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত হইতে পারে!—অথবা এরূপ না হইলে, জাতীয় দুর্দ্দশাই বা এতটা ঘটিতে পাইবে কেন? অথবা বটতলারই বা জগৎ-ব্যাপী এমন অদ্ভুত নাম ও খ্যাতি রটিবে কেন?

কাশীরামের ন্যায় মহাপুরুষ, যে কোন কালে ও যে কোন দেশে জন্মিতেন, সেই দেশেরই অত্যুচ্চ রকমে মুখোজ্জ্বল করিতে এবং সেখানেই অত্যুচ্চ মহাকবি বলিয়া গণিত হইতে পারিতেন। অধুনাতনকালে যথার্থ গুণগ্রাহিতা, যথার্থ বিদ্যাবুদ্ধির আদর যাহা কিছু আছে, তাহা কেবল ইউরোপ ও আমেরিক ভূমেই দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের এই দীন দরিদ্র বাঙ্গালি কাশীরাম ইউরোপ বা আমেরিক ভূমে জন্মিলে, তাঁহার গুণের যথার্থ সম্মান হইত; আজি তাঁহার স্মরণার্থে কতই না কীর্ত্তি কারখানা চারিদিকে বিস্তারিত হইতে থাকিত, কত ব্যয়েই না তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইত; এবং তাঁহার গ্রন্থেরও খাঁটিমূল রক্ষার্থে

ত মতে কত দিক্ হইতেই না বিদ্বৎমণ্ডলী তিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন; আবার কতদিক্ ইতে গ্রন্থের কতরকমই না সংস্করণ বাহির ইতে থাকিত, যেখানে সামান্য একজন খ্যাতি-শিষ্ট লেখক বা কবির লেখার আসলত্ব রক্ষার ন্যও বিপুল যত্ন ও ব্যয় বিধানিত হইয়া থাকে; যেখানে কাশীরামের ন্যায় মহাকবিকৃত গ্রন্থের াসলত্ব ও অক্ষুণ্নতা রক্ষার জন্য যে কি যত্ন, ত চেষ্টা, কত আগ্রহের স্রোত প্রবাহিত হইত, বং সাধারণপ্রদত্ত উৎসাহও যে তাহাতে ত উত্তেজিত ও মুক্তহস্ত হইত, তাহা সহজেই নুমান করিতে পারা যায়। আর আমাদের দেশে?—কেবল বটতলার ছাপাখানা সকলের ীর্ত্তি মাত্র উল্লেখ করা হইয়াছে; অবশিষ্ট থা বলিতে এখনও অনেক বাকী।

তাহার পর গ্রন্থের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে দ্বিতীয় থা।—বটতলার বাদ ছাদ বাদে, যাহা কিছু হাভারত বলিয়া এখন ছাপা ও বিক্রয় হয়, াহাই কি কাশীরামের লেখনী-প্রসূত আসল নিষ?—তাহা নহে। কাশীরামের নিজ রচনা ইতে তাহা অনেক তফাত, অনেক অন্তর। ্যনাধিক ৪০ বৎসর অতীত হইল, বটতলার াশ্রয়ে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নামে একজন ণ্ডিত-মূর্খের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহার ্দ্ধিতে, সম্ভবতঃ বটতলার উৎসাহ-প্রসূত াহার বুদ্ধিতে এইরূপ উদয় হইয়াছিল যে, কাশীরামের রচনাটা বড়ই গ্রাম্যশব্দে দুষ্ট, ড়ই অশুদ্ধ, পদ্যের তেমন মিল ভাল নাই, াবের অনেক স্থানে অসংলগ্নতা ইত্যাদি। ্তেরাং সে সকল সংশোধন করিয়া দেওয়া িচিত। মহাভারত বলিয়া কথাটা তার বট-লার বিদ্যা-বুদ্ধির সুযশখ্যাতি, সুতরাং মহা-ারত অশুদ্ধ ও খুঁতযুক্ত থাকিবে!—বাঙ্গালী বদ্যাবুদ্ধির ঘোর কলঙ্ক! কলঙ্কের উপর বলিয়া লঙ্ক,—বটতলার আরও গুরুতর কলঙ্ক! তাই তিনি বটতলা ও বাঙ্গালি বিদ্যাবুদ্ধির ঘোর কলঙ্ক দূর করিবার জন্য, আগাগোড়া মহাভারত সংশোধন করিতে বসেন এবং সংশোধনান্তে যাহা খাড়া করিয়া তুলেন, তাহাই অধুনাতন কালে মহাভারত নামে প্রচারিত এবং তাহাও পুনঃ সস্তা বিক্রয়ের খাতিরে বা যে জন্য হউক, বটতলার বাদ ছাদে পড়িয়া হাত-পা ভাঙ্গা খঞ্জ কুব্জ ন্যুব্জাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে।

কেবল মহাভারত নহে, কৃত্তিবাসের রামা-য়ণও, জয়গোপালী ফন্দিতে পড়িয়া সংশো-ধনে কাশীরাম অপেক্ষা আরও অধিক দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়াছে। বরং কাশীরামের মহাভারতে তবু দুই একটা কাশীরামের নিজ লেখনী-প্রসূত শব্দ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কৃত্তি-বাসে তাহাও নাই। এখন বটতলায় যাহা কৃত্তি-বাসী রামায়ণ বলিয়া বিক্রয় হয়, মূল কৃত্তিবাসী হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালার আদি কবির পক্ষে অতি সুন্দর সম্মান রক্ষা, আশ্চর্য্য কীর্ত্তিঘোষণা এবং অতি অপূর্ব্ব পরিণাম বলিতে হইবে! যাহা হউক এখানে আমাদের কাশীরাম দাস লইয়া কথা, সুতরাং তাঁহারই বিষয় অনুসরণ করা যাউক।

এখন জিজ্ঞাস্য, বাস্তবিকই কাশীরাম দাসের রচনায় কি সেই সেই দোষ সকল ছিল এবং জয়গোপালী সংশোধন দ্বারা বাস্তবিকই কি তাহার উন্নতি সাধিত হইয়াছে;—অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও তাহার উন্নতি সাধিত হইয়াছে? পাঠকেরা শুনিয়া আশ্চর্য্য ও স্তম্ভিত হইবেন যে, মূল ও জয়গোপালী সংশোধন, এ দুয়ের তুলনা করিতে গেলে, ঠিক উহার বিপরীত কথা বলিতে হয়। তিল পরিমাণেও উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, বরং প্রভূত বা অপরিসীম পরি-মাণেই অবনতি ঘটনা হইয়াছে। জয়গোপাল

যে যে স্থানে অসংলগ্ন বা অপ্রযুক্ত বোধে পরিবর্জ্জিত বা বিলুপ্ত করিয়াছে; ঠিক তাহাই ছিল সংলগ্ন, সুন্দর ও প্রযুক্ত; আর জয়গোপাল যাহা করিয়াছে, তাহা হইয়াছে তাহার বিপরীত। এখনকার ন্যায় শেষপাদ মিলনের বাঁধাবাঁধির প্রতি সে কালের লোকের তাদৃশ দৃষ্টি ছিল না এবং কাশীরামও তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখেন নাই; নতুবা গ্রাম্য শব্দ বলিয়া জয়গোপাল যেখানে যেখানে সাধুভাষা দ্বারা সংশোধন করিতে গিয়াছে, সেই খানেই তাহা দাঁড়াইয়াছে প্রকৃতপক্ষে জয়গোপালের মাথা আর মুণ্ড। প্রত্যেক একক পদেও জয়গোপাল কিরূপ ভাবের অবনতি ঘটাইয়াছে, তাহার একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দ্বারা এখানে দেখাইব। কাশীরামে আছে;—

"নদনদীগণ যথা গ্রাসিত সাগরে।
সকল পুরাণকথা ভারত ভিতরে॥"

কিন্তু জয়গোপালী সংশোধনে,—

"নদনদীগণে যথা প্রবেশে সাগরে।
সকল পুরাণকথা ভারত ভিতরে॥"

এখন দেখ, কাশীরামের "গ্রাসিত" শব্দ দ্বারা উপমার কি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সঙ্গতত্ব এবং ভাবের কি মর্ম্মস্পর্শী ও মর্ম্মবিকাশকরূপে পরিস্ফুটত্ব; আর সেই স্থানে জয়গোপালের "প্রবেশের" দ্বারা ভাব ও উপমা উভয়ই কতটা অবনতি প্রাপ্ত ও আল্‌গা হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপ এবং ইহাপেক্ষাও দুর্দ্দশা পদবিশেষ গুলির সম্বন্ধে সর্ব্বত্র। আর পৃষ্ঠা, পরিচ্ছেদ ও অধ্যায়াদি সম্বন্ধে ত কথাই নাই এবং সে কথাও ক্রমে বলা যাইতেছে। ফলতঃ কাশীরামের নিজ-ব্যবহৃত শব্দ যে সকল, তাহারা গ্রাম্য হউক আর যাই হউক, তাহারাই বস্তুতঃ পক্ষে অকাট্য, সঙ্গত এবং এরূপ সঙ্গত যে, তাহার পদবিশেষের মধ্য হইতে একটা শব্দ উঠাইয়া বা বসাইয়া লইলেই, আর সে পদের সে রস, মাধুর্য্য ও লালিত্য কিছুই তেমন থাকে না। ইহা নিশ্চয় জানিবে, যে গদ্যই হউক আর পদ্যই হউক, লেখা যখন যথার্থ কোন প্রতিভাশালী লেখক বা কবির হয়; তখন অন্য কাহারও তাহাতে শব্দ উঠাইবার বা বসাইবার অধিকার থাকে না; কারণ সেরূপ স্থলে, গ্রন্থকার ও তাহার ভাবসমূহকে খুন না করিয়া এবং লেখায় রস মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য সকল লোপ না করিয়া, কখনই শব্দ উঠাইতে বা বসাইতে পারা যায় না। খাঁটি লেখকের খাঁটি লেখায়, লেখকের প্রকৃতি ও প্রতিভা প্রতি অক্ষরে উদ্ভাসিত হইতে থাকে। এখন প্রাকৃতিক নিয়মে একজনের প্রকৃতি ও প্রতিভা আর একজনে পাইতে পারে না; সুতরাং একজনের লেখাও আর একজন দ্বারা সংশোধিত হইতে পারে না। এদিকে ত নিয়ম এই, আর তাহার উপর কাশীরাম?—একদিকে কাশীরাম অসীম প্রতিভাশালী মহাকবি ও মহাপুরুষ; আর অন্য দিকে সংশোধক জয়গোপাল?—পেটটালা ভিক্ষুক পণ্ডিত-মূর্খ; কাশীরাম দাসের প্রতিভা ও শক্তির আভাস মাত্র অনুভব করিবারও শক্তি পর্য্যন্ত যাহার নাই। সুতরাং এরূপ মূর্খ জয়গোপাল দ্বারা সেই মহাকবি কাশীরাম সংশোধিত হইলে, সে যে কি অপূর্ব্ব বিকৃতিসম্পন্ন অস্পৃশ্য পদার্থ হইয়া দাঁড়ায়, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়; বর্ণনা দ্বারা আর তাহা বুঝাইবার বড় একটা প্রয়োজন হয় না। এক্ষণে মোটের উপর এই পর্য্যন্ত বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, আসল কাশীরাম দাসের মহাভারত, জয়গোপালী সংশোধিত মহাভারত হইতে শতগুণ নহে, সহস্রগুণও নহে, লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট।

জয়গোপালের সংশোধন হইতে কাশীরামের মহাভারত যে অতি অল্প-স্বল্পেই নিস্তার পাইয়াছে, তাহা মনে করিও না। কোথাও দুই

পংক্তি, কোথাও দশ পংক্তি, কোথাও পৃষ্ঠাকে পৃষ্ঠা, কোথাও দুই দশ পৃষ্ঠা এবং কোন কোন স্থানে পুস্তকের বিষয়কে বিষয় পর্য্যন্ত সম্পূর্ণতঃ পরিত্যক্ত হইয়া গিয়াছে; আর পরিবর্ত্তনের কথা অধিক কি বলিব ?—এমন কোন একপদ বিশেষ প্রায় নাই, যাহার ভিতর কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন লক্ষিত না হইবে। বড়ই ইচ্ছা যে, কিছু কিছু তাহার নমুনা উঠাইয়া পাঠকবর্গকে দেখাইয়া দিই; কিন্তু দেখাইতে যাওয়ায় প্রথম সমস্যা এই যে, সর্ব্বাঙ্গে যাহার ক্ষত, তাহার ঔষধ দিব কোন্ খানে? সর্ব্বত্রই যাহার ছন্নছাড়া করা, তাহার উঠাইব কোন্ এক স্থানবিশেষ হইতে? ফলতঃ সে পক্ষে সমস্ত পুস্তকই তাহার নমুনা বলিয়া পাঠককে বরাত দিলে চলে। আবার বলি, সকলই যাহার অঙ্গহীন, এখন তাহার কোন্ অঙ্গ উদ্ধৃত করিয়া কাহাকে দেখাই বল দেখি? তথাপি দেখাইতে হইবে। তাই বলিতেছিলাম, বড়ই বিষম সমস্যা। ভাল, তাহাই হউক, কিঞ্চিৎ দেখান যাউক।

পাঠকবর্গ, গ্রন্থের আরম্ভেই দেখ, কাশীরামকে কতটা অঙ্গহীন করা হইয়াছে। আসল কাশীরাম দাসের গ্রন্থারম্ভ এরূপে, গণেশ ও ব্যাস বন্দনা দিয়া,—

বিঘ্নবিনাশন, গৌরীর নন্দন,
বন্দো দেবগণরাজে।
ব্রত যজ্ঞ হোমে, সবার প্রথমে,
ধাতা যারে আগে পূজে॥
খর্ব্ব স্থূল অঙ্গ, বদন মাতঙ্গ,
সুন্দর লম্বিতোদর।
চন্দনে চর্চ্চিত, সৌরভে মোহিত,
ব্যাকুল গুঞ্জরে ভ্রমর।
সিন্দূরশোভিত, বৈরির শোণিত,
পরিধান দ্বীপছালা।
ভুজ করিকর, করকহে শর,
পাশাঙ্কুশ জপমালা॥
আসন ইন্দুর, ভূষণ সিন্দুর,
অতি সুললিত নাসা।
প্রচণ্ড মণ্ডল, মুকুট কুণ্ডল,
তিলক তিমির নাশা॥
নানা পরিচ্ছদ, কঙ্কণ অঙ্গদ,
নূপুর কিঙ্কিণী বাজে।
অতি জিতেন্দ্রিয়, যোগিষাগধ্যেয়,
যোগীন্দ্র যোগীর মাঝে॥
যাহার চরণ, করিয়া পূজন,
রচিল বিবিধ গাথা।
বাল্মীকি বশিষ্ঠ, ব্যাস কবিশ্রেষ্ঠ,
ক্ষিতিতলে হলো খ্যাতা॥
জয় বিঘ্নেশ্বর, মোর বিঘ্ন হর,
হরিরসামৃতপানে।
তব পদাম্বুজ, কৃষ্ণদাসানুজ,
কাশীদাস ধ্যায় ধ্যানে॥

বন্দো মহামুনি ব্যাস মুনির তিলক।
শুক সুত, পরাশর যাহার জনক॥
বেদশাস্ত্রপরিনিষ্ঠ সুবুদ্ধি সুধীর।
নীল পদ্ম আভা জিনী কোমল শরীর॥
কনকপিঙ্গলবর্ণ জটাভার শির।
প্রশান্তমূরতি পরিধান ব্যাঘ্রচীরে॥
নয়নকমল দীপ্ত যুগল মিহির।
আজানুলম্বিত কর নাভি সুগভীর॥
ভাগবত ভারতাদি যতেক পুরাণ।
যাহার কমলমুখে হইল নির্ম্মাণ॥
লীলায় বিবিধ বেদ কৈল চারি খান।
ঋক্ সাম যজুঃ আর অথর্ব্ব বিধান॥
কৈবর্ত্ত জননী যার দ্বীপ মধ্যে জন্ম।
বাল্যকাল হৈতে যার আচরণ ব্রহ্ম॥
নমস্তে কবীন্দ্রচন্দ্রচরণপঙ্কজে।
পরম আনন্দে সদা কাশীদাস ভজে॥
বেদ রামায়ণে আর পুরাণ ভারতে।
ইত্যাদি যতেক শাস্ত্র আছয়ে জগতে॥

সর্ব্বশাস্ত্র বিচারি দেখহ পুনঃ পুনঃ।
আদি অন্ত মধ্যে সব হরিগুণ গান॥
সর্ব্বশাস্ত্রবীজ হরিনাম দ্বি অক্ষর।
আদি অন্তে নাহি তাহা বেদে অগোচর॥

বলা বাহুল্য যে, ইহার ভিতর অন্য কাহার কৃত শুদ্ধাশুদ্ধ নাই; কাশীরাম হইতে যথাদৃষ্ট তথা লিখিত।

এখন গুণজ্ঞ পাঠক একবার এই স্থানটুকুর রচনার ছটা ও প্রগাঢ়তা এবং গাম্ভীর্য্য কতটা তাহা অনুভব করিবেন। কিন্তু তথাপি, কি গ্লানি, কি দোষ উহার দেখিয়া জয়গোপাল ঠাকুর আরম্ভ হইতে "সর্ব্বশাস্ত্রবীজ হরিনাম দ্বি অক্ষর" পদের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমুদয় অংশকে কেতাবে স্থান পাইবার অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাহার সংশোধিত মহাভারত হইতে উঠাইয়া দিয়াছে। সুতরাং এখন যত ছাপা মহাভারত প্রচলিত আছে, সে সমস্তই "সর্ব্বশাস্ত্রবীজ হরি" এই পদ হইতে গ্রন্থ আরম্ভ।

মাঝে মাঝে কখনও বটতলার ছাপা কোন কোন মহাভারতে এরূপ লেখা ধ্বনিত দেখিতে পাই যে, 'মুল আসল মহাভারত হইতে অবিকল মুদ্রিত' অর্থাৎ উহা বলার উদ্দেশ্য এই যে, আর সব ছাপার মহাভারত হইতে এই মহাভারত ঠিক। কিন্তু বলা বাহুল্য যে সে কেবল খরিদ-দার আকর্ষণের ছলনা মাত্র, নতুবা ফলের অঙ্কে একই; অথবা কখনও বা জয়গোপালী সংশোধনের উপরেও বটতলা কর্ত্তৃক আবার পুনঃ সংশোধন। সুতরাং সে ঠিক মহাভারত গুলি যে আরও কি অপূর্ব্ব পদার্থ, তাহা আর বলিয়া বুঝাইবার অপেক্ষা রাখে না;—"একা রামে রক্ষা নাই, দোসর লক্ষণ!"

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নূতন বৃক্ষ।

কপি, গোল-আলু, তামাক প্রভৃতি নানারূপ নূতন বস্তু অল্পদিন হইল, এদেশে আনীত হইয়াছে। অন্যান্য নূতন বস্তুও ভারতে আনিবার নিমিত্ত আজ পর্য্যন্ত চেষ্টা হইতেছে। এরূপ চেষ্টা সাহেবেরাই অধিক করিতেছেন, এ দেশবাসীরা বড় নয়।

আজ কয় বৎসর হইল। এ দেশে একটী নূতন গাছ আসিয়াছে। ইহার নাম ইউকালিপটস্ (Eucalyptus), এ গাছের আদি বাস অষ্ট্রেলিয়া দেশে। তক্তা করিবার নিমিত্ত বৃক্ষটী বিশেষ উপযোগী, ইহার গা হইতে এক প্রকার আটা বা গঁদ নির্গত হয়, তাহাও মনুষ্যের নানা কার্য্যে লাগে, আর ইহার পত্র হইতে যে তৈল বাহির হয়, অনেক পীড়ায় তাহা একটী মহৌষধ।

ইউকালিপটস্ পত্রের বর্ণ নীল, সেই জন্য আমি ইহাকে এই প্রবন্ধে "নীলবৃক্ষ" বলিয়া ডাকিব। বৃক্ষদিগের যে বংশে বেলের জন্ম, নীল বৃক্ষও সেই বংশসম্ভূত। উদ্ভিদ্ শাস্ত্রে এই বংশকে মারটাসি (Myrtaceæ) বলে। নীল বৃক্ষ প্রায় ১৫০ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আছে। এই বৃক্ষের পাতা কখন ঝরিয়া যায় না, বার মাস নবীন নীলবর্ণে বৃক্ষটী আচ্ছাদিত থাকে। বৃক্ষটী খুব বড়, ২০০ শত হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। শিশু বৃক্ষের পাতা বড়। বৃক্ষের যত বয়স হইয়া আসে, পাতাও তত ছোট হয়। নীলবৃক্ষের ফুল অনেকটা গোলাপ জামের ফুলের মত দেখিতে। ইহার পাতা ও ফুল কিরূপ, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত পর পৃষ্ঠায় এক চিত্র দিলাম।

নীল বৃক্ষের প্রধান গুণ এই যে, ইহা নিজদেশে অতি শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। চারি

নীলবৃক্ষের পত্রপুষ্প।



পাঁচ বৎসরের মধ্যে গাছটী বিলক্ষণ বড় হয়। ষোল বৎসরে এই গাছ ৬০ হাত উচ্চ হয়। এই সময়ে গাছ এত মোটা হয় যে, মানুষে জাকড়াইয়া পায় না। পঞ্চাশ বৎসরে এই গাছ প্রায় ১৫০ হাত উচ্চ হয়। এই সময় গুঁড়ির বেড় ৪০ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ষাট সত্তর হাত পর্য্যন্ত গাছটী অতি সরল ভাবে উঠে, ইহার ভিতর একটীও ডাল হয় না। এরূপ সরল গাছ হইতে কি প্রকার ভাল তক্তা হইতে পারে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। ইহার কড়ি তক্তা প্রভৃতি অতি দীর্ঘকালস্থায়ী। ইহার আর একটী গুণ এই যে, কাঠের মত ইহাতে পোকা কি ঘুণ ধরে না। এই বৃক্ষের কাঠ পোড়াইলে যে ছাই হয়, তাহাতে অনেক পটাশ (Potash) বা ক্ষার থাকে। ১০০ সের ছাইয়ে প্রায় ২১ সের ক্ষার থাকে। যে স্থানে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব আছে, সে স্থানে নীল বৃক্ষ পুতিলে শুনিয়াছি যে, দূষিত বায়ু সংশোধন করে।

নীল বৃক্ষের পত্র চোয়াইলে যে তৈল বাহির হয়, নানা পীড়ায় সেই তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে বিশেষরূপ যে উপকার হয়, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই তৈল এক প্রকার কর্পূরের ন্যায়। আরক বা

টিংচাররূপেও ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অজীর্ণ, পক্বাশয়ের ও যন্ত্রের পুরাতন সর্দ্দি, মূত্রবৎ কৃমিবাত প্রভৃতি নানারোগে এই ঔষধ ব্যবহার হয়। প্রস্রাবের পীড়ায়ও ইহা ব্যবহৃত হয়। ইহার পবন-নিবারণ শক্তিও বিলক্ষণ আছে। ম্যালেরিয়া জ্বরেরও ইহা একটী ভাল ঔষধ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যেখানে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব আছে, সে স্থানে নীল বৃক্ষ রোপণ করিলে বায়ু পরিশোধিত হয়। সে নিমিত্ত কেহ কেহ ইহার নাম দিয়াছেন "জ্বর-নাশক বৃক্ষ"। প্রকৃতই যে ইহার ম্যালেরিয়ার বিষ নাশ করিবার শক্তি আছে, তাহা ডাক্তার বেণ্টলি অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া স্থির করিয়াছেন। সে নিমিত্ত ইটালি ও আলজিরিয়া দেশে যেখানে অনেক স্থানে ম্যালেরিয়ার জ্বরের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব, সে স্থানে লোকে আজ কাল অনেক নীল বৃক্ষ রোপণ করিতেছে; তাহাতে ফলও ভাল হইয়াছে। যে স্থানে বার মাস লোকে কম্পজ্বরে কাঁপিত, যে স্থানে লোকের প্লীহা যকৃৎ বাড়িয়া পেট মৃদঙ্গের আকার ধারণ করিত, যে স্থানে শিশুদিগের প্রাণ রক্ষা হওয়া দুঃসাধ্য হইয়াছিল, আজ এই নীল বৃক্ষের গুণে সে সব স্থানে সুস্থকায় সবল বীরপুরুষেরা সদর্পে পৃথিবীকে পদদলিত করিতেছে!

নীল বৃক্ষের এমন কি গুণ আছে, যাহাতে মানবজাতির এরূপ উপকার হইতে পারে? তাহা ঠিক বলিতে পারি না। কেহ কেহ বলেন যে, ইহা হইতে এক প্রকার বাষ্প নিঃসৃত হয়, তদ্দ্বারা ম্যালেরিয়ার বিষ ধ্বংসভূত হয়। অনেক বৃক্ষ হইতে বাষ্প নির্গত হয়, তাহাতে মনুষ্য-শরীরের উপকার কি অপকার হইয়া থাকে। বোধ হয়, নিম্ব ও তেঁতুল বৃক্ষের গুণাগুণের কথা সকলেই অবগত আছেন। লোকে কথায় বলে,—

"তাল তেঁতুল কুল, ভিটা করে নির্ম্মূল।"

নিমের হাওয়া ভাল, তেঁতুলের হাওয়া ভাল নয়, এই কথাটী বহুকাল হইতে এ দেশে প্রচলিত আছে। এই কথাটী বিশেষ-রূপে প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এ দেশে একটী গল্পও প্রচলিত আছে। একজন প্রবীণ বিচক্ষণ বৈদ্যের পুত্র বিদেশে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন। পুত্র বিদেশে অবস্থিতি করিয়া কিরূপ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত পিতা তাঁহার নিকট একটী লোক পাঠাইয়া দিলেন। "পথে প্রতিদিন তেতুল কাঠের জালে রাঁধিবে, তেতুল দিয়া ভাত খাইবে, তেতুল তলায় রাত্রিতে শুইবে, সকল বিষয়ে তেতুল ব্যবহার করিবে"; লোকটীকে এইরূপ উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন। বৈদ্যের উপদেশ অনুসারে শয়ন ভোজন করিতে করিতে লোকটী পথ চলিতে লাগিল। বহুদিন পরে বৈদ্যের পুত্রের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। বৈদ্যের পুত্র পিতা-প্রেরিত লোকটীকে অনেক সমাদর করিলেন। লোকটী বৈদ্যের পুত্রকে আপনার শরীর দেখাইয়া বলিল যে—"দেখুন মহাশয়, সম্প্রতি আমার গায়ে এ সব কি বাহির হই-য়াছে। বোধ হয় আমার শোণিত দূষিত হইয়াছে।" পথের সমুদয় বিবরণ পাইয়া বৈদ্যপুত্র জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত পিতা লোকটীকে এই-রূপ উপদেশ দিয়াছিলেন। তেতুল ভোজনে, তেতুলের বায়ুসেবনে লোকটীর শোণিত প্রকৃতই দূষিত হইয়াছে। প্রত্যাগমন কালে বৈদ্য-পুত্র লোকটীকে পথে নিম্বভক্ষণ, নিম্ববায়ু-সেবন করিতে উপদেশ দিলেন। সেই উপদেশ পালন করিয়াই লোকটী পথ চলিতে লাগিল। অল্পদিনে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। বৃদ্ধ বৈদ্যের নিকট আসিয়াই সমুদয় পরিচয়

দিল। বৈদ্য বুঝিলেন যে, চিকিৎসা-শাস্ত্রে তাঁহার পুত্রের জ্ঞান হইয়াছে বটে।

যেরূপ নিম বৃক্ষের গুণ আছে, নীল বৃক্ষেরও সেইরূপ কোনও গুণ থাকিতে পারে। যাহা হউক, ইটালির আলজিরিয়া প্রভৃতি দেশে এই বৃক্ষ রোপণ হওয়ায় লোকের বিশেষ উপকার হইয়াছে।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

লীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রায়পুরের বারুণীর মেলা বড় প্রসিদ্ধ। এই মেলা উপলক্ষে প্রতি বৎসর অনেক দূর-দুরান্তর হইতে বহু লোকের সমাগম হয়। দোকানী পসারি যে কত আসে, তাহার সংখ্যা হয় না। যদিও স্নান উপলক্ষে মাত্র মেলা, তথাপি স্নানের সাত-আট দিন পূর্ব্ব হইতেই জনতা আরম্ভ হয় এবং স্নানের তিন চারি দিন পর পর্য্যন্ত মেলা থাকে। রায়পুরের গৃহস্থদের আত্মীয় কুটুম্ব যে যেখানে থাকে, এই উপলক্ষে রায়পুরে আসিয়া উপস্থিত হয়। এ ছাড়া অতিথি অভ্যাগত প্রভৃতিতেও রায়পুরের ঘরে ঘরে লোক ধরে না।

আমরা যে বৎসরের কথা বলিতেছি, সে বৎসরে বারুণীতে একটী যোগ ছিল বলিয়া জনতা কিছু বেশী হইয়াছিল। অন্যান্য বৎসরে স্নানের দিনে যত লোক না হয়, এবার মেলার তিন-চারি দিন আগেই তাহার অধিক লোক হইয়াছিল। যাত্রীদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য ছিল না, সুতরাং তাহাদের মধ্যে রোগ দেখা দিয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া জনস্রোত কমে নাই। যাত্রীরা আসিয়াই তেলে ভাজা বেগুনি, ফুলরি, পাঁপড়-ভাজা, মুড়ি ও কড়াই-ভাজার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, আর রৌদ্রে ঘুরিয়া এঁদো পচা পুকুরের জল আঁজলা ভরিয়া পান করিতেছিলেন; সুতরাং রোগের কোন দোষ ছিল না। তা হইলে কি হয়; মেলা দেখা রোগটা অন্য বৎসরের অপেক্ষা অধিক সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছিল। ঘরের বৌ, স্বামীর উপর অভিমান করিতেছিলেন, তিনি কেন শাশুড়ীর সঙ্গে তাহাকে মেলায় যাইতে দিলেন না। ম্যালেরিয়ার প্রিয় শিষ্য, ছোট একটী শিশু তাহার মার সঙ্গে মেলা দেখিতে যাইবার জন্য আব্দার করিতেছিল; মা কিন্তু ননদের কাছে ছেলেটী রাখিয়া মেলা দেখিতে প্রস্থান করিতে উদ্‌যোগ করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে পুলিশ ঘাটি বসিয়াছিল, যাত্রীরা মেলা হইতে এক ক্রোশ দূরে মলমূত্র ত্যাগ করিলেও তাহাদের কাছে অপরাধী হইতেছিলেন; তবে দু-চারি আনা পয়সা দিয়া মেলার মধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করিলেও স্বতন্ত্র কথা।

রাজগ্রামের হেমন্তকুমারের মাতা তাঁহার জ্যেষ্ঠা পৌত্রী লীলাকে লইয়া মেলা দেখিতে গিয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতে বলা-কওয়া ছিল বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদের কুটুম্ব রায়পুরের গোবিন্দ ঘোষের বাড়ী আশ্রয় পাইয়াছিলেন।

গত বৎসর লীলার অমূল্যকুমারের সঙ্গে বিবাহ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু লীলা এ অবধি বাপের বাড়ীই ছিলেন। লীলা তাহার ঠাকুরমার বড় আদরের। আর দুই দিন পরে লীলা শ্বশুর বাড়ী গেলে তাহাকে আর দেখিতে পাইব না ভাবিয়া, লীলা আজ-কাল যে আব্দার করিত, ঠাকুর-মা প্রায় তাহা শুনিতেন; আজও সেই আব্দার অনুসারে লীলাকে তাহার ঠাকুর-মা মেলা দেখিতে আনিয়াছিলেন।

সেদিন হেমন্তকুমারের মাতা মেলা দেখিয়া রৌদ্রে ঘুরিয়া রাশীকৃত খেলেনা—হাঁড়ী, পুতুল, ধুচুনী, চুবড়ী কিনিয়া ক্লান্ত হইয়া, সবে মাত্র

গোবিন্দ ঘোষের বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন, এমন সময় রামনগরের তালুকদার নীলরতন রায় আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দ ঘোষ দূর সম্পর্কে নীলরতনের জ্ঞাতি কুটুম্ব। অন্য কোন বিষয়ে সম্পর্ক না থাকিলেও, নীলরতন মেলার সময় আসিয়া দুইচারি দিন গোবিন্দ ঘোষের বাড়ী কাটাইয়া যাইতেন ও গোবিন্দ ঘোষকে আপ্যায়িত করিতে ত্রুটি করিতেন না।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও নীলরতন আসিলে, তাঁহার সমাদরের ধূম পড়িয়া গেল। গোবিন্দ ঘোষ আসিয়া তাড়াতাড়ি "কেমন আছেন" "বাড়ীর সব কেমন আছে" "কখন বাহির হইয়াছেন" "পথে আসিতে কোন কষ্ট হয় নাই ত" ইত্যাদি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন। নীলরতনও সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর দিতে ত্রুটি করিলেন না, তবে মাঝে মাঝে লীলার দিকে চাহিয়া একটু অন্যমনস্ক হইয়া উত্তর দিয়াছিলেন। তা গোবিন্দ ঘোষ অতটা যেন দেখিয়াও দেখিলেন না। এই খানে বলিয়া রাখা ভাল, গোবিন্দ ঘোষ নিতান্ত নির্দ্ধন ছিলেন না। তবে নীলরতন রায়ের সঙ্গে তুলনায় তাঁহার অবস্থা অবশ্য অনেক হীন ছিল। তা নীলরতনের ধন আছে বলিয়াই হউক বা তাঁহার ক্ষমতা আছে বলিয়াই হউক, গোবিন্দ ঘোষ নীলরতনকে যেন একটু ভয়প্রযুক্ত বিশেষ অভ্যর্থনা করিতেন।

নীলরতন বয়সে বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার ষোল আনা সক ছিল। পরণে কালাপেড়ে ধুতি, গলায় কোঁচান চাদর, হাতে রূপা বাঁধান ছড়ি, পায়ে বার্ণিস্ জুতা। বয়সকে ফাঁকি দিবার জন্য চুলে কলপ লাগাইয়াছিলেন; তবে কথা কহিবার সময় দাঁতের মাঝে মাঝে দু একটা ফাঁক দেখা যাইত। তখনু "কৃত্রিম দন্তে অভাবনীয় কাণ্ড হয় নাই"—আর মদন সেকরা দাঁত বাঁধাইবার সময় একটা শক্ত দাঁত খারাপ করিয়া দিয়াছিল বলিয়া নীলরতন বাবু দাঁতের দিকে আর বড় একটা নজর দেন নাই। অনেক ঝামা ও সাবান খরচ করিয়া নীলরতন তাঁহার কৃষ্ণ কান্তি ফরসা করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহার কাল রংএর উপর চাকচিক্য ছিল। যাহাই হউক, নীলরতন আপনাকে এখনও যুবা মনে করিতেন। আর বয়সে তাঁহার যাহাই করুক না কেন, আমরা কিন্তু বলিতে বাধ্য যে, তাঁহার বিলক্ষণ শক্তি সামর্থ্য ছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নীলরতনের পুরা সক ছিল। যেখানে যাত্রা বারোয়ারি, খেমটা গান কবি কি, মেলা হইত, সেই খানেই নীলরতনের দেখা পাওয়া যাইত। বিশেষ যেখানে স্ত্রীলোকের বেশী সমাগম, সেইখানে নীলরতন ঝড়ের আগে এঁটো-পাতের ন্যায় দেখা দিতেন। এ বিষয়ে তাঁহার স্থান-অস্থান, মান-মর্য্যাদা কিছুই জ্ঞান ছিল না। সামান্য লোকেদের নিকট যাইতেন বলিয়া, যদি এই সব বিষয়ে কেহ কিছু বলিত, তবে ইদানীং তিনি উত্তর দিতেন, "আর কটা দিনই বা আছি; সময় ত হ'য়ে এল, দেখিয়া লইতে দোষ কি?" তবে অন্য লোকের দেখা আর তাঁহার দেখায় কিছু ইতর-বিশেষ ছিল। তাঁহার দেখিবার সময়, তাঁহার চক্ষের উপর আর কাহারও চক্ষু পতিত হইলে, সেই ব্যক্তি অনেক সময় মনে মনে নীলরতনকে যমের বাড়ী পাঠাইবার জন্য আশীর্ব্বাদ করিতেন। তবে দু একটা লোক যে নিতান্ত ফিরিয়া চাহিত না, তা একেবারে বলিতে পারি না।

নীলরতনের অনেক কু মন্ত্রী ছিল। তাহাদের সাহায্যে তিনি অনেকের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার লাঠিয়াল সড়কী পাইকগণ একবার হুকুম পাইলে, লুঠ তরাজ করিতে, ঘর পোড়াইতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিত না। তার ফৌজদারী মামলা হইলে, সাক্ষী

তৈয়ার করিতে, জাল সাজাইতে, মকদ্দমায় তদ্বির করিতে নীলরতন সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার প্রমাণের নড়-চড় ছিল না। হাকিম কি ভাবিয়া তাঁহার সাক্ষীদের অবিশ্বাস করিবেন খুঁজিয়া পাইতেন না; পুলিস, নীলরতন ও তাঁহার অনুচরগণকে আসামী করিতে হয় করিতেন। নীলরতনের ভয়ে চারিদিকের লোক সশঙ্কিত থাকিত। গোবিন্দ ঘোষ যে ভয়ে তাঁহার সমাদর করিবেন, তাহার আর বিচিত্র কি?

দু'এক কথার পর, নীলরতন লীলাকে লক্ষ্য করিয়া গোবিন্দ ঘোষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটী কে?"

লীলা তখন তাহার আকুঞ্চিত কেশদাম দোলাইয়া, তাহার বৈশাখ-চম্পক কান্তি লইয়া রৌদ্রভ্রমণজনিত আরক্তিম গণ্ডস্থলের অধিকতর আরক্তিম প্রভা বিস্তার করিয়া, চঞ্চল চক্ষের চাহনি চাহিয়া, নীলরতনকে মুগ্ধ করিয়া ঠাকুর-মার সঙ্গে গোবিন্দ ঘোষের বাড়ীর অন্দরে চলিয়া যাইতেছিলেন। মুগ্ধ করিয়াই ত! লীলাকে দেখিয়া শত্রু ফিরে চায়! নীলরতন ত চাহিবেনই! নীলরতন অনেক দেখিয়াছেন, এমন রূপের সমন্বয় ত দেখেন নাই! মরি মরি! বিধাতা না জানি কি উপকরণ লইয়া এই রূপ-প্রতিমা সৃষ্টি করিয়াছেন! প্রস্ফুটিত গোলাপে এমন শোভা নাই, ভাস্কর-গঠিত দেব-প্রতিমায় এমন সৌন্দর্য্য নাই, অবিচল সৌদামিনীতেও বুঝি এমন আভা নাই!

লীলা ত চলিয়া যাইতেছিলেন,—নীলরতনের রূঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা শুনিয়া মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন; সেই সময় তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছিল। লীলা তাহার চম্পককলিসদৃশ অঙ্গুলি দিয়া কেশগুলি সরাইয়া দিলেন। পূর্ণ চন্দ্রের পূর্ণজ্যোতি নীলরতনের মুখে আসিয়া পড়িল। নীলরতনের মাথা ঘুরিয়া গেল।

মিন্সে একদৃষ্টে কি দেখিতেছে দেখিয়া, ঠাকুর-মা বলিলেন, "চল মা, চল।"

এই অবসরে গোবিন্দ ঘোষ লীলার কি পরিচয় দিবেন ভাবিয়া লইতেছিলেন। সত্য পরিচয় দিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। তবে মিথ্যা বলিলে কি জানি, যদি নীলরতন পরে সত্য কথা কোন রকমে টের পান, তাহা হইলে আপনাকে বিপদে পড়িতে হইবে, এই ভাবিয়া মিথ্যা বলিতেও সাহস কুলাইতে ছিল না। আর নীলরতন যে রকমের লোক, এখনি পিছনে লোক লাগাইয়া সব ঠিকানা জানিতে পারিবেন। কাজেই সাত-পাঁচ ভাবিয়া নীলরতন সত্য পরিচয় দিবেন ঠিক করিলেন।

তখন গোবিন্দ ঘোষ বলিলেন, "এঁরা আমার দূর-সম্পর্কীয় কুটুম্ব: মেলা দেখিতে আসিয়াছেন।"

নীলরতন হাস্য করিয়া বলিলেন, "আরে ভায়া, তা ত বোঝা গেছে, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, এটি কার মেয়ে?"

নীলরতনের হাস্য ঠাকুর-মার মনে কেমন লাগিল।

গোবিন্দ ঘোষ বলিলেন, "ইনি রাজগ্রামের হেমন্তকুমারের মেয়ে।"

নীলরতন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেয়েটী দেখ্‌ছি বিবাহিতা। উহাঁর কোথায় বিবাহ হইয়াছে? সঙ্গের স্ত্রীলোকটীই বা কে? উনি কি একেলা মেলা দেখিতে আসিয়াছেন?"

গোবিন্দ ঘোষ সব জানিতেন; কিন্তু জানিয়াও উত্তর দিলেন না। বলিলেন, "আমি সব ঠিক জানি না।" এই সময় ঠাকুর-মা লীলার হস্ত ধরিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। নীলরতন গোবিন্দ ঘোষের দিকে একবার কটমট করিয়া তাকাইলেন। গোবিন্দ ঘোষ সসম্ভ্রমে "আসুন, মুখ হাত ধুইবেন, আসুন—" বলিয়া হাত ধরিয়া নীলরতনকে ঘরে লইয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৈকাল বেলায় লীলার ঠাকুর-মা গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রীকে তাঁহার ক্রীত জিনিসগুলি দেখাইতেছিলেন আর বেশী ভারি বলিয়া আর তিনটী আহ্লাদে-পুঁতুল আর এক বোঝা রংকরা হাঁড়ি আনিতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ করিতেছিলেন। সেই সকল হাঁড়ির বিচিত্র রংএর ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এমন সময় গোবিন্দ ঘোষ আসিয়া ইঙ্গিতে তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিলেন। তাঁহার স্ত্রী উঠিয়া যাইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লীলার ঠাকুর-মা কি আবার আজ মেলা দেখিতে যাইবেন?"

গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রী বলিলেন, "ওমা, সেকি গো! এইমাত্র উনি পুতুল ও হাঁড়ি আনিতে পান নাই বলিয়া দুঃখ করিতেছিলেন; বোধ হয় আবার এখনি গিয়া সেই সব কিনিয়া আনিবেন।"

গোবিন্দ ঘোষ বলিলেন, "না, আর মেলায় যাইয়া কাজ নাই।"

গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রী "তা ব'লব এখন" বলিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। গোবিন্দ ঘোষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী কথাটা তত গুরুতর বলিয়া মনে করেন নাই, তাই আবার ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি কথাটায় তত কাণ দাও নাই, কিন্তু তত উপহাসের কথা নহে। যদি নিতান্ত লীলার ঠাকুর-মা আবার মেলা দেখিতে যান, তবে লীলাকে যেন সঙ্গে লইয়া যান না। লীলা সুন্দরী মেয়ে; এরূপ গোলযোগের স্থানে রূপের শত্রু অনেক।"

গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রী তখন কথাটা তলাইয়া বুঝিলেন। বলিলেন "বুঝিয়াছি, তা আগে হইতে সাবধান করিয়া দেওয়া ভাল। কুটুম্বের মেয়ে, দুদিনের তরে আসিয়াছে বইত নয়, শেষে কি একটা গোলযোগ বাধাইয়া বসিবে?"

তখন গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রী লীলার ঠাকুর-মাকে বলিলেন, "উনি বলিতেছিলেন, লীলাকে আর মেলা দেখিতে লইয়া যাইও না, লীলার সোমত্ত বয়স, কি জানি কার মনে কি আছে?"

ঠাকুরমা চমকিয়া উঠিলেন, লীলা ত সেদিন-কার মেয়ে, এর মধ্যে 'সোমত্ত' হইয়া উঠিল! ঠাকুরমার কাছে তাঁহার আদরের লীলা তেমনি-টিই আছে, তা আমরা কি করিব? লোকে কিন্তু ইহার মধ্যেই লীলার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছে কিন্তু তা হইলেই বা কি? লীলা যে কতগুলি হাঁড়ি, কতগুলি খেলেনা, কতগুলি পুতুল বাছিয়া রাখিয়া আসিয়াছে;—লীলা না যাইলে ত সে-গুলি ঠাকুরমা ঠিক বাছিয়া উঠিতে পারিবেন না! এমন অবস্থায় ঠাকুরমা লীলাকে না লইয়া যান কেমন করিয়া? ঠাকুরমা বিব্রতে পড়িলেন।

এমনি সময় লীলা আসিয়া ঠাকুরমাকে টানাটানি আরম্ভ করিল, "চল না ঠাকুরমা! রৌদ্র পড়িয়াছে, আমার সব পুতুল কিনিয়া আনি।"

ঠাকুরমা দেখিলেন, লীলা এখনও তেমনি বালিকার মত চঞ্চল, তাঁহাকে টানাটানি করিতে করিতে তাহার অযত্ন-বিবর্দ্ধিত কেশদাম যেমন মুখের উপর পড়িতেছে, অমনি হাত ছাড়াইয়া কেশগুলি সরাইয়া আবার টানাটানি আরম্ভ করিতেছে। তাহার অলোক-সামান্য রূপের গৌরব এখনও সে বুঝে নাই। লীলা যে মাধুরী ছড়াইয়া চলিয়া যায়, এখনও সে মাধুরী তাহার অন্তঃস্থল স্পর্শ করে নাই। লীলার ঠাকুরমা লীলার সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখের পানে তাকাইয়া মনে মনে বলিলেন, "ষাট ষাট, এর মধ্যে আমার দুধের-বাছা সোমত্ত হইল কবে?"

তা যাহা হউক, পরেই লীলাকে ধরিয়া কাছে বসাইয়া সযত্নে তাহার চিবুক ধরিয়া ঠাকুরমা বলিলেন, "না দিদিমণি! তোমার

আর যাইয়া কাজ নাই, আমি তোমার পুতুল কিনিয়া আনিব।”

লীলা বলিল, “সেঁকি, আঁমি নিজে যাঁইয়া পুঁতুল কিঁনিয়া আঁনিব, আঁমি বাঁছিয়া রাঁখিয়া আঁসিয়াছি।” এই সময় লীলার সুরটা একটু নাকি-নাকি হইয়াছিল। আমরা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, ঠাকুরমার আদরের লীলা ঠাকুরমার কথায় প্রতিবাদ করিতে গেলেই তাহার সুরটা একটু নাকি হইয়া আসিত। আর প্রায় তাহার সেই ডাগর-ডাগর চোক দুইটায় এক ফোঁটা জল দেখা দিত। ঠাকুরমা অনেক সময় “পানসে চোক” বলিয়া জল মুছাইয়া দিতেন, তবে তাহার কথার প্রতিবাদের সঙ্গে চন্দ্রবিন্দুটার কি সম্পর্ক আছে, তাহা আমাদের ভাঙ্গিয়া বলেন নাই।

বলিতে বলিতে আবার আগেকার মতন লীলার চক্ষে জল দেখা দিল। ঠাকুরমা গলিয়া গেলেন, লীলাকে কেমন করিয়া মেলায় লইয়া যাইবেন ভাবিতেছিলেন, এমন সময় গোবিন্দ ঘোষের চাকর নফর আসিয়া উপস্থিত হইল।

নফর দেখিল, লীলা ঠাকুরমার সঙ্গে মেলায় যাইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত করিতেছে আর ঠাকুরমা একা যাওয়া হইবে না বলিয়া তাহাকে নিরস্ত করিতেছেন। তখন নফর আগু হইয়া বলিল, “ঠাকুরমা আপনাদের ভাবনা কি? যদি আপনার নাত্নীর যাইতে এত ইচ্ছা হয়, আমি না হয় আপনাদের সঙ্গে যাইব, আমার কাজ প্রায় হইয়া আসিল; এই কয়েক কলসী জল আনিলেই হয়।”

ঠাকুরমা তাঁহার অকূল সমুদ্রে কিনারা পাইলেন। লীলার মুখে হাসি দেখা দিল। গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বিধাতার হস্তে লীলার ভাগ্যসূত্র ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, আবার যোড়া লাগিল।

সেদিন কিন্তু নফরের কাজ অন্য অন্য দিনের মত শীঘ্র সারা হইল না। ঠাকুরমা জিজ্ঞাসা করিলে নফর বলিল, “বাড়ীতে অনেক লোক আসিয়াছেন, কাজ বাড়িয়াছে; তবে হ'ল ব'লে।” নফর এক কলসী জল লইয়া হন হন করিয়া নীলরতনের ঘরের দিকে গেল।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বেই নফর আসিয়া বলিল, “চল দিদিমণি, মেলা দেখিয়া আসি।”

লীলা আগে হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল। ঠাকুরমাকে ধরিয়া লইয়া চলিল। ঠাকুরমার মনটা যাইবার সময় কেমন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। দরজায় বাহির হইতেই চৌকাটে তাঁহার পায়ে হোঁচট লাগিল। তা লীলা তাঁহাকে থামিতে দিল না।

পোড়া মনোহারী-দোকানদারগণ কি চমৎকার দোকান সাজাইয়া রাখিয়াছে, দেখিলে চক্ষু সরাইতে ইচ্ছা করে না। ঐ পুতুলটা, ঐ চিরুণীখানি, ঐ আর্সিখানি, ঐ পুতির মালা, ঐ খেলাঘরের আলমারী, খেলার আলনা—আর কত জিনিস,—লীলা কোন্‌টা লইবে? ঠাকুরমা বলিলেন, “যে দোকানে জিনিস পছন্দ করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি, সেইখানে চল। আহা, সে দোকানদার মিন্সে বড় ভালমানুষ।” লীলা কিন্তু দোকান হইতে চক্ষু সরায় না, অগত্যা ঠাকুরমা লীলাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। লীলাও অগত্যা চলিল, তবে বড় আস্তে আস্তে।

ঠাকুরমা অনেক দূর চলিলেন, কিন্তু সে দোকান ত খুঁজিয়া পাইলেন না। ভাবিলেন, বুঝি পথ ভুলিয়াছেন। তখন নফরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে দোকান কোথা?” নফর বলিল, “কোন্ দোকান?” ঠাকুরমা অপ্রস্তুত হইলেন, তাইত নফর ত সকালে সঙ্গে আসে নাই। এ দিকে ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল।

তখন ঠাকুরমা আর এক দোকান হইতে

জিনিস লইবেন ঠিক করিলেন। কোন্ দোকানে যাইবেন, লীলাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। এমন সময়ে একদল বড় কীর্ত্তনওয়ালা খোল করতাল বাজাইয়া গাহিতে গাহিতে এক দোকানে উপস্থিত হইল। তাহার সঙ্গে কি জনতার স্রোত! ওকি গো, লোককে যে ঠেলিয়া লইয়া যায়! ঠাকুরমা লীলার হাত ধরিয়া হাঁ করিয়া কীর্ত্তন শুনিতেছিলেন, এমন সময় পিছন হইতে এক ধাক্কা আসিল। ঠাকুরমা লীলার হস্ত ছাড়াইয়া সজোরে এক দোকানদারের সাজানো জিনিসের উপর পড়িয়া গেলেন। সে ঠাকুরমাকে গালাগালি আরম্ভ করিল। ঠাকুরমা সাম্লাইয়া উঠিতে ছিলেন, এমন সময় আবার এক ধাক্কা। তার পর আবার এক ধাক্কা। ঠাকুরমা আবার দুই বার দোকানদারের সাজানো জিনিসের উপর পড়িলেন। মিন্সের জিনিস গুলো তচ্ নচ হইয়া গেল। দোকানদারও ঠাকুরমাকে কেবল মাত্র মারিতে বাকী রাখিল। তা হউক, ঠাকুরমা এই সব অপমান সহ্য করিয়া ধূলা ঝাড়িয়া উঠিয়া লীলাকে ডাকিলেন, কিন্তু লীলাকে সামনে দেখিতে পাইলেন না। ঠাকুরমা কত ডাকিলেন। সেই গোলযোগে তাঁহার কথা কে শোনে? বিশেষ, সেই সময় সুবিধা বুঝিয়া এক জুয়াচোর সেই দোকানদারের ছড়ানো কতকগুলি জিনিস সরাইতেছিল, দোকানদার তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। "চোর চোর" বলিয়া একটা রব উঠিল। সেই রবে ঠাকুরমার কথা কেহ শুনিতে পাইল না। ঠাকুরমা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তার পর ঠাকুরমা কতবার নফরকে ও কতবার লীলাকে ডাকিলেন; কিন্তু কেহই তাঁহার কথার উত্তর দিল না।

ঠাকুরমার ক্রন্দন শুনিয়া দু এক জন লোক সেখানে দাঁড়াইল। ব্যাপার শুনিয়া এক জন বলিল, "আহা, লীলা বেশ নামটী, তা লীলা তোমার কে হয় গা?" এক জন বলিল, "তা বেশ হইয়াছে, যেমন কর্ম্ম তেম্নি ফল; ছোট ছোট ছেলে-পুলে লইয়া এই সব মেলায় আসে?" এক জন বলিল, "দে মাগী, পুলিসে খপর দে।" শেষে একজন দয়া করিয়া লীলার ঠাকুরমাকে গোবিন্দ ঘোষের বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে চাহিলেন। ঠাকুরমা তাহার সঙ্গে চক্ষু মুছিতে মুছিতে গোবিন্দ ঘোষের বাড়ী পৌঁছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বেলা অপরাহ্ণপ্রায়। সূর্য্যদেবের ঘোড়াগুলি আস্তাবলমুখো হইয়া সবেগে ছুটিয়াছে। সূর্য্যদেব রাস কষিয়া রাখিতে পারিতেছেন না বলিয়া চটিয়া লাল হইয়াছেন। রৌদ্রগুলা মাটী হইতে লাফাইয়া একেবারে গাছে, গাছ হইতে পাহাড়ে লাফাইয়া পড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। সন্ধ্যার আব্ছায়া পূর্ব্বদিক্ হইতে উঁকি মারিতেছে। পাখীগুলা কলরব করিয়া রৌদ্রকে থামিতে বলিতেছে। এমন সময় রামনগরের গোপাল মুকুয্যে তাঁহার বাহিরের ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। গোপাল মুকুয্যের ভ্রূ কুঞ্চিত। চক্ষু যেন সম্মুখের জিনিস ছাড়িয়া আর কিছু দেখিতেছে। হস্ত মাঝে মাঝে মুষ্টিবদ্ধ হইতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে হুঁকায় সজোরে টান পড়িতেছে। দেখিলেই বোধ হয়, মুকুয্যে মশাই কোন গুরুতর বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন। সেই সময় পাঁচু সেখ হুগলি হইতে সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছিল। গোপাল মুকুয্যেকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি গো দাদাঠাকুর! প্রণাম। সব ভাল ত?"

গোপাল পাঁচুকে দেখিয়া বলিলেন, "কি রে, পাঁচু নাকি? সাক্ষী দিয়ে এলি? ব'স্ ব'স্, আজকের খপর বল্?"

পাঁচু তখন সসম্ভ্রমে গোপালের হুঁকার কলিকাটি তুলিয়া লইয়া মুখ ফিরাইয়া গোটা কতক টান দিল, পরে সাক্ষী দিতে গিয়া সে নূতন কাপড় চাঁদর পাইয়াছিল, পাছে সেই কাপড়ে ধূলা লাগে বলিয়া সযত্নে ধূলা ঝাড়িয়া গোপালের সম্মুখে বসিল। গোপাল সোৎসুক-চিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তখন পাঁচু আপনিই আরম্ভ করিল।

"আর দাদাঠাকুর, খপর কি! খপর সব ভাল। যেখানে খোদ নীলরতন রায় মকদ্দমার যোগাড়ে, আর সাক্ষী পাঁচু শেখ, সেখানে সর্ব্বদাই জয় জয়কার।" নিজের সাক্ষী দিবার গৌরব করিবার সময় পাঁচু একবার বুকে হাত দিয়া বুক ফুলাইয়াছিল।

গোপাল তখন একটু বিরক্তির সহিত বলিল, "আরে, তা ত জানাই আছে, তবুও খপরটা কি, বল্ না?"

পাঁচু একটু হাসিয়া বলিল, "হাঁ, খপর—আংটি চুরির অপরাধে গোবিন্দ ঘোষের হাজত, আর অমূল্যকুমার মিথ্যা সংবাদ দিয়াছে বলিয়া কেন ফৌজদারি সোপর্দ্দ হইবে না বলিয়া তাহার উপর নুটিস হইয়াছে।"

কথাটা বলিয়াই পাঁচু একটু জাঁকাইয়া বসিল। বলিল, "হইবে না কেন, স্বয়ং পাঁচু শেখ যে সাক্ষী! আর এই রকম মকদ্দমা বছরে দু চারটা হ'লে হয়;—পাঁচুকে আর চাষ করিয়া খাইতে হইবে না।"

কথাটা শুনিয়াই কিন্তু গোপাল মুকুয্যের মুখটা কেমন বিবর্ণ হইয়া গেল। সেই গোবিন্দ ঘোষ, সেই নিরীহ ভদ্র লোক, যিনি কখন লোকের সাতেও নাই পাঁচেও নাই,—তিনি আজ নিরপরাধে হাজতে হয়ত অনাহারেই প্রাণত্যাগ করিবেন! হা ধর্ম্ম! এখনও তুমি জগতে আছ!

পাঁচু কিন্তু অতটা লক্ষ্য না করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল, "যুক্তিটা কিন্তু হইয়াছিল ভাল। ভাগ্যে বাবু নফরাকে হাত করিয়াছিলেন; তা না হইলে গোবিন্দ ঘোষ যে রকম চালাক ও তাঁর দিকে যে রকম লোক দেখিতেছি, এতদিনে কোথাকার জল কোথায় গিয়া দাঁড়াইত, কে জানে?"

গোপাল মুকুয্যে কুচক্রীদের পরামর্শ কতক কতক অবগত ছিলেন এবং গোপনে গোবিন্দ ঘোষ ও অমূল্যকুমারকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তবে নিজে আদালতে হাজির হন নাই; কেবল নীলরতনের ভয়ে। তা হউক, তিনি পাঁচু শেখের মুখে আবার সঠিক বৃত্তান্ত জানিবার জন্য পাঁচুকে বলিলেন, "তাই ত, আমি তো নফরার সঙ্গে কি হইয়াছিল জানি না, বাবু কেমন করিয়া তাকে হাত করিলেন?"

পাঁচু বলিল, "বলিতে গেলে সব কথা খুলিয়া বলিতে হয়, তা আপনাকে বলিতেই বা দোষ কি?" পাঁচু সাক্ষী দিয়া একটু ফুলিয়া উঠিয়াছিল। পাঁচু বলিতে লাগিল, "মেলায় আমি বাবুর সঙ্গে গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া যেমন মেয়েটীকে দেখা, অমনি আমার উপর হুকুম হইল, ওকে চুরি করিতে হইবে। গোবিন্দ ঘোষটা কিন্তু চালাক। গোড়া হইতে বাধা দিয়াছিল। তা হইলে কি হয়? ব্যাপার দেখিয়া বাবু টাকা দিয়া নফ্‌রাকে হাত করিলেন। আঃ! সে অনেক টাকা। (পাঁচু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।) তা যাই হোক, নফর কৌশলে মেয়েটাকে ও তাহার ঠাকুরমাকে পথ ভুলাইয়া রাত্রে মেলার মধ্যে যেখানে খুব গোলযোগ, সেইখানে লইয়া গেল। পরে পিছন হইতে আমি ধাক্কা দিয়া বুড়ীটাকে মেয়েটার কাছ হইতে সরাইয়া দিলাম। তার পর একটা লাঠিয়াল আর দুই জন চাকর সঙ্গে মেয়েটাকে পাঠান হইল। এদিকে বুড়ী মাগী বাড়ীতে

কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিলে, বাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। তখন অনেক লোক সন্ধানে বাহির হইল, আর আমাদের বাবুরই বা উৎসাহ দেখে কে? তিনি নিজে কত সন্ধান করিলেন। কত সলা পরামর্শ দিলেন। কত তামাক পোড়াইলেন, তা আর কি বলিব গোবিন্দ ঘোষটা কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই বাবুকে সন্দেহ করিয়াছিল। আর তেমনিই হেমন্ত-কুমারকে লিখিয়া দিল। পরে বাবু আপনার সাফাই করিবার জন্য ঘটনার তিন দিন পর পর্য্যন্ত গোবিন্দ ঘোষের বাড়ী রহিলেন। আর ইতিমধ্যে নফরকে দিয়া তাঁহার হীরের আংটিটী গোবিন্দের স্ত্রীর গহনার বাক্সে রাখাইয়া দিলেন। এদিকে হেমন্তকুমার অমূল্যকে চিঠি লিখিল। সে ছোঁড়া নাকি কলিকাতায় ইংরাজি পড়ে, একেবারে তাড়াতাড়ি আসিবার সময় কাহাকে কিছু না বলিয়া বাবুর নামে পুলিসে স্ত্রী-চুরির দাবি দিয়া আসিল। দারোগা আসিয়া বাবুর বৈঠকখানায় অনেক তামাক পোড়াইয়া গেল, আর কি-একটা পরামর্শ করিয়া চলিয়া গেল। তার পর—তার পর এই মকদ্দমা।"

গোপাল মুকুয্যে বলিলেন, "বুঝিলাম না, গোবিন্দ ঘোষকে নাকাল করিবার জন্য এত চেষ্টা কেন?"

পাঁচু বলিল, "বাবা, ওকে না জব্দ করিলে রক্ষা আছে? লোকটা বড় চালাক! আর একটু হইলে আমাদের ধরিয়া ফেলিয়াছিল আর কি! বিশেষ গ্রামশুদ্ধ লোক উহার পক্ষ। ও, নিজে খালাস থাকিয়া মকদ্দমার তদ্বির করিলে এতদিনে না জানি কি হইয়া যাইত। এখন মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল!—নিজে বাঁচি-বেন, না অপরকে বাঁচাইবেন!"

এই সব কথা বলিতে বলিতে পাঁচু আর এক ছিলিম তামাক সাজিতেছিল। তামাক সাজা হইলে মুখ ফিরিয়া গোটাকতক টান দিয়া কল্কেটী মুকুয্যের হুঁকায় বসাইয়া দিয়া পাঁচু আবার বসিয়া বলিতে লাগিল, "তা হউক দাদা ঠাকুর! এত করিয়াও কিন্তু বাবু কিছু করিতে পারেন নাই, শিকার ফস্কা-ইয়াছে!"

গোপাল বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি?" পাঁচু সরিয়া আসিয়া গোপালের কানের কাছে মুখ আনিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "ঘরের কথা বলিতে নাই, তা হউক, আপনার না জানা কি আছে? ছুঁড়িটা মা-ঠাকুরাণীর হাতে পড়িয়াছে, তিনি তাকে অভয় দিয়া আপ-নার কাছে রাখিয়াছেন! কর্ত্তার সেখানে টুঁ-শব্দ করিবার যো নাই।"

মুকুয্যে মহাশয়ের বুক হইতে যেন একটা ভার নামিয়া গেল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি-লেন। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা কেমন করিয়া হইল?"

পাঁচু বলিল, "লইয়া যাইবার সময় বাড়ীর কাছে কেমন করিয়া ছুঁড়িটার মুখের কাপড় খুলিয়া পড়িয়াছিল, তাই সে বাড়ীর সাম্‌নে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। সেই চীৎকার গিন্নী শুনিতে পাইয়া মেয়েটীকে বাড়ীতে আনেন। তার পর—কর্ত্তার গুণাগুণ ত তাঁহার আর অবিদিত নাই,—সেই অবধি তিনি মেয়েটাকে আপনার কাছে রাখিয়াছেন।"

এই সময়ে বাড়ীর ভিতর হইতে একটা লোক মুকুয্যে মশাইকে ডাকিতে আসিল। বাড়ীর ভিতর হইতে ডাক পড়িয়াছে শুনিয়া মুকুয্যে মশাই যাইতে উদ্যত হইলেন, পাঁচুও উঠিল; যাইবার সময় সে তাহার পাওনা নূতন কাপড়খানার পাড় তুলিয়া গুছাইয়া পরিল ও কোঁচান নূতন চাদর খানি ঝাড়িয়া গলায় ফেলিয়া দিল; পথে যাইতে যাইতে দু চারি বার ফিরিয়া দেখিতেছিল, তাহাকে পিছন হইতে কেমন দেখায়।

ভাল কথা, আমরা আগে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, গোপাল মুকুয্যে অমূল্যকুমারের পিতার সহাধ্যায়ী, আর তিনিই অমূল্যকুমারকে উত্তম পাত্র দেখিয়া লীলার সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনারায়ণচন্দ্র সেন।

গুজরাট।

গুজরাট প্রাচীনকালে "গুর্জ্জর" নামে খ্যাত ছিল। যতদূর বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে বলা যাইতে পারে, যদুবংশ এখানকার প্রথম রাজগোষ্ঠী। অনেকে অনুমান করেন, "বিক্রমাদিত্যের সমকালেই যদুবংশের অভ্যুদয়। এ প্রস্তাবে আমরা সে বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। যদুপ্রবীর শ্রীকৃষ্ণের রাজধানীর নাম দ্বারকা বা দ্বারাবতী। প্রাচীনকালে দ্বারকার খ্যাতি, দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। যে ৭ সাতটী পুণ্যদায়িনী পুরী, পুরাণে কীর্ত্তিত, দ্বারকা বা দ্বারাবতী তাহার একতম। যথা,—

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী হবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ॥"

এই কারণে মহাভারতে "দ্বারকা" উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং সেই সূত্রে রাজধানীর নাম-মহিমায় গুর্জ্জরও পুরাণাদিতে বর্ণিত।

কনিষ্ক, গুজরাট অধিকৃত করিয়াছিলেন। তিনি শকজাতীয় ও কাশ্মীরাধিপ ছিলেন। ৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি কাশ্মীরে রাজ্য করিতেন। হুষ্ক, জুষ্ক ও কনিষ্ক এই তিনজনে সমবেত হইয়া কাশ্মীরে আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কাশ্মীরীয় রাজার নাম দামোদর। ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে দ্বিতীয়-দামোদর-সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া থাকেন। কনিষ্কের পরবর্ত্তী অধিরাজ অভিমন্যু। ইতিবৃত্তে তাঁহাকে প্রথমঅভিমন্যু বলিয়া পরিচিত করে। এই প্রথমঅভিমন্যু বা দ্বিতীয়দামোদর কখনই গুজরাটের ত্রিসীমায় পদার্পণ করিতে সমর্থ হন নাই। *

সূর্য্যবংশধর সেন উপাধিধারীরা, তৎপরে এই দেশ জয় করিয়াছিলেন। "বল্লভী" নগর তাঁহাদের রাজধানী ছিল। এই বংশোদ্ভূত কনকসেন ও তাঁহার সন্ততিবর্গ এখানে রাজ্য বিস্তার করেন।

কনিষ্কের রাজত্বাবসানের অনেক দিন পরে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে এখানে কনকসেন অধিপতি হইয়াছিলেন। বহুকাল ইহা তাঁহাদের অধিকারে ছিল। তাঁহারা সৌরাষ্ট্রেও (সুরাটেও) রাজা হইয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। আনুমানিক ২৫০ দুইশত পঞ্চাশ বৎসর সুরাট তাঁহাদিগের হস্তে থাকে। গুজরাটের অধিকার-ভ্রষ্ট হইয়া তাঁহারা মিবার প্রদেশে গিয়া রাজত্ব চালাইতে লাগিলেন। চীন পর্য্যাটক হায়ন সাঙ, তাঁহাদের রাজধানী সন্দর্শন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ৭৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের গুজরাটে রাজত্ব-বিলোপ ঘটে।

চৌরাবংশীয় রাজপুতদের অধিকারে পত্তনে ৭৫০ খৃষ্টাব্দের পর ইহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পত্তনের অপর নাম আনহলওয়ারা। চৌরাবংশের শেষ ভূপতি ৯৩১ খৃষ্টাব্দে অপুত্রক পরলোক গমন করিলে, তাঁহার জামাতা গুজরাট রাজ্যে অভিষিক্ত হন। তিনি চালুক্য-বংশ-সম্ভূত। মতান্তরে তাঁহাকে সোলাঙ্কি-বংশীয় বলিয়া পরিচিত করে। এই পর্য্যন্ত হিন্দুরাজত্বের কথা।

গুজরাট কোন্ সময়ে যবনের হস্তে স্বাধীনতারত্ন বিসর্জ্জন করে, তদ্বিষয়ে বিস্তর মতভেদ।

* রাজতরঙ্গিণী দেখ।

মামুদ ১০২৪ খৃষ্টাব্দে * গুজরাটস্থিত সোমনাথ দেবের মন্দির আক্রমণ করিয়া শূন্যগর্ভ সোমনাথের অভ্যন্তর হইতে প্রচুর ধনরত্ন অপহরণ করেন।

ফেরিস্তারমতে সোমনাথ শূন্যগর্ভ ছিলেন। † ১০২৪ বা ১০২৬ খৃষ্টাব্দে মুসলমানের প্রথম আক্রমণ।

তৎপরে মহম্মদঘোরী ১১৭৮ খৃষ্টাব্দে গুজরাট অবরোধ করেন। ইহাঁকে মুসলমানদের দ্বিতীয়বার গুজরাট আক্রমণ বলিতে হইবে। এই আক্রমণে মহম্মদঘোরী অকৃতকার্য্য হন। ঘোরীর দ্বিতীয়বার ভারত-আক্রমণে এই ব্যাপার সংঘটিত হয়। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর ফিরোজটোগলকের রাজত্ব সময়ে ইহা মুসলমানের কতকটা অধীন হয়। ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে গুজরাট রীতিমত যবন-শাসনাধীন হইয়াছিল। সেই অধিকারকারীর নাম আলাউদ্দিন। তিনি তত্রত্য রাণী কমলাদেবীকে হরণ করিয়া আনেন। কমলাদেবীর কন্যার নাম দেবলদেবী। তিনি কমলাদেবীর হিন্দুস্বামীর ঔরসজাতা ও কমলাদেবীর গর্ভসম্ভূতা দুহিতা। তিনি মুসলমান-পরিবারে আসিয়া কমলাদেবীর পুত্রবধূ হইলেন। আলাউদ্দিনের জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজির খাঁর সঙ্গে দেবলদেবীর বিবাহ হয়। দ, প্রথমে এই কন্যাকে (দেবল দেবীকে) লইয়া পলায়ন করেন। পরিশেষে রাণীর অনুরোধে ঐরূপ অবৈধ কার্য্য ঘটে। এইবার আমরা ধারাবাহিক ইতিহাস দিতেছি।

(১) জাফর খাঁ বা প্রথম মজফর শা—১৩১৬ খৃষ্টাব্দে মজফর খাঁ কর্তৃক এইরাজ্য মুসলমান রাজ্যরূপে স্থাপিত হয়। তিনি দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক গুজরাটের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি আনলহয়ারায় স্বাধীন রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। তখন ৭৯৯ হিজিরী অব্দ অর্থাৎ ১৪২১ খৃষ্টাব্দ। স্বাধিনত্ব-প্রাপ্তির পর তাঁহার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রথম মজফর শা হয়।

প্রথম তাতার ও দ্বিতীয় তাতার খাঁ।—তাঁহার তাতার খাঁ নামক যে পুত্র ছিল, তিনি রাজা হইতে পান নাই। তৎপুত্রও দ্বিতীয় তাতার খাঁ নামে পরিচিত। তিনিও রাজপদে সমাসীন হন নাই; অতএব দৃষ্ট হইতেছে, জাফর খাঁর পুত্র ও পৌত্র কেহই রাজ্যে দীক্ষিত হন নাই। তাঁহার প্রপৌত্র রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

(২) প্রথম আহম্মদ—প্রথম আহম্মদ (নোসিরুদ্দীন) ১৪৩৬ হইতে ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩২ বত্রিশ বৎসর রাজত্ব সম্ভোগ করেন। তিনি স্বনামে এক নগর প্রতিষ্ঠা করেন, নগরের নাম আহম্মদাবাদ হইয়াছিল। তাঁহার সময় গুজরাটের অধিকার বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার নামাঙ্কিত ১৪৫২, ১৪৫৩, ১৪৫৪, ১৪৫৮, ১৪৫৯, ১৪৬০, ১৪৬৪, ১৪৬৫, ১৪৬৭ ও ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। আহম্মদের দুই পুত্র। মহম্মদ ও দায়ুদ।

(৩) মহম্মদ প্রথম—প্রথম মহম্মদের অপর নাম গিয়াসুদ্দীন করিমশা। ১৪৬৮—১৪৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৯ নয় বর্ষ তাঁহার রাজ্যকাল। তিনি অতিমাত্র বিলাস-পরায়ণ হইয়া উঠেন। ভারতবর্ষীয় কৌতুকাগারে রক্ষিত এই রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রায় কোনরূপ অব্দ পাওয়া যায় না। টমাস সাহেব, ১৪৭১, ১৪৭২ ও ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত তন্নামীয় মুদ্রার উল্লেখ করিয়াছিলেন। তৎপরে আর তিনটী মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। তাহাতে ক্রমান্বয়ে ১৪৭৪, ১৪৭৫ ও ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দের নির্দেশ রহিয়াছে। শেষোক্ত অব্দের মুদ্রায় ক্ষোদিত অংশ ও

* অন্যমতে ১০২৬ খৃষ্টাব্দে ঐ আক্রমণকাণ্ড ঘটিয়া ছিল।

† মতান্তরে সোমনাথ শূন্যগর্ভ ছিলেন না।

টমাস সাহেবের নির্দ্দেশিত অংশ—অভিন্ন দেখা যায়।

(৪) কুতবুদ্দীন আহম্মদ শা ও (৫) দায়ুদ—তাঁহার আত্মজ কুতবুদ্দীন আহম্মদ শা তাঁহার সিংহাসনাধিকারী হইয়া ১৪৭৭—১৪৮৫ হিজিরা পর্য্যন্ত ৮ আট বৎসর কাল রাজত্ব চালাইয়াছিলেন। তদনন্তর তাঁহার খুল্লতাত দায়ুদ নামমাত্র রাজাসনে আরোহণ করেন। সাত দিন মাত্র তিনি সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া সখ মিটাইয়াছিলেন। এইবার যিনি রাজা হইলেন, তিনি উক্ত বংশের সহিত সংস্পৃষ্ট নন।

(৬) প্রথম মামুদ বা মামুদ বিগরাই—প্রথম মামুদ বিগরাই ষষ্ঠ নৃপতি। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ১৪৮৫—১৫৩৯ খৃষ্টাব্দ তাঁহার রাজত্বকাল। উহা ৫৪ বৎসর ব্যাপক হইয়াছিল। চম্পানী ও জুনাগড় তাঁহার করতলস্থ হইয়াছিল। তিনি নিজের নামানুসারে মামুদাবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি নিজতনয় মজফরকে উত্তরাধিকারী রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। কৌতুকাগারের তালিকায় এই প্রসিদ্ধ সুলতানের সর্ব্বপ্রকার রৌপ্য মুদ্রা দুর্লভ। টমাস, ১৫১৩, ১৫২৫ ও ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের অঙ্কিত মুদ্রার কথা বলিয়াছেন। ঐ তিনের কোনটীতেই টাকশালের নাম নাই। কৌতুকাগারের গুজরাটসংক্রান্ত তালিকায় কোন মুদ্রাতেই টাকশালের চিহ্ন নাই। একটী কেবল সন্দেহযুক্ত মুদ্রা রহিয়াছে। এখন ১৪৮৬, ১৪৮৯ বা ৯০, ১৪৯২ ও ১৫৩১ খৃষ্টাব্দের মুদ্রা প্রাপ্তব্য। অহম্মদাবাদের ১৫২২, ১৫২৫ ও ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের মুদ্রা নয়নগোচর হইয়াছে। স্থলে স্থলে অব্দ অক্ষরে লিখিত।

(৭) দ্বিতীয় মজফর ও (৮) সেকেন্দার—ইতিহাসে তিনি দ্বিতীয়-মজফর-সংজ্ঞায় প্রসিদ্ধ। কেননা, গুজরাটের মুসলমান-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জাফর খাঁ প্রথম মজফর বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকেন। ১৫৩৯—১৫৫৪ খৃষ্টাব্দ, পঞ্চদশ বৎসর তিনি রাজ্য-অধিকারী থাকেন। ভারতীয় কৌতুকাগারের তালিকায় দ্বিতীয় মজফরের দুই সুবর্ণমুদ্রার প্রসঙ্গ রহিয়াছে। টমাস সাহেব ইহার যে তাম্র-মুদ্রা গুলির নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে, ১৫৪৪, ১৫৪৫, ১৫৪৬ ও ১৫৫০ খৃষ্টাব্দের তাম্র-মুদ্রা তাঁহার নামে ক্ষোদিত। তৎপরে ১৫৫১ খৃষ্টাব্দের তাঁহার নামীয় আর এক তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। অপর দুই তাম্রমুদ্রায় তদীয় নাম-প্রসঙ্গ বর্জ্জিত। সেই দুই মুদ্রায় "আহমদনগর" এবং "১৫৩৯" ও "১৫৪৪ খৃষ্টাব্দ" অঙ্কিত রহিয়াছে। অব্দ-দ্বয়, তাঁহার রাজ্যকালের অন্তর্গত। কেননা উপরেই বর্ণিত হইয়াছে, তিনি ১৫৩৯ হইতে ১৫৫৪ খৃষ্টীয় বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রদের নাম—সেকেন্দার, দ্বিতীয় মামুদ, বাহাদুর ও আদিল লতিফ খাঁ। কন্যার নাম অজ্ঞাত। কন্যাটী পুত্রত্রয়ের অনুজা এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ আদিলের কেবল অগ্রজাতা। জ্যেষ্ঠ সেকেন্দর, ৪৯ উনপঞ্চাশ দিবস রাজা হইবার পর হত হন।

(৯) দ্বিতীয় মামুদ ও (১০) বাহাদুর—সেকেন্দর অপুত্রক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার শূন্য সিংহাসনে তদীয় দ্বিতীয় সহোদর মামুদ অধিরূঢ় হইলেন। এই মামুদের প্রকৃত আখ্যা নাশির খাঁ। নাশির খাঁ বালক। এক বৎসর মাত্র তাঁহাকে সিংহাসনে থাকিতে হইয়াছিল। রাজা হইলে তাঁহার সংজ্ঞা হইল—মামুদ। তিনি নবম রাজা। ষষ্ঠ রাজা প্রথম মামুদ, অতএব ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে দ্বিতীয় মামুদ নামেই পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নামাঙ্কিত এক মুদ্রা, এক নূতন ধরণের অদ্ভুত বস্তু। তাঁহার অনুজ বাহাদুরের এইবার রাজা হইবার পর্য্যায়। কারণ তিনি নৃপতি দ্বিতীয়

মজফরের তৃতীয় তনয়। ১৫৫৪—১৫৬৫ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ একাদশ বৎসর তাঁহার রাজ্যকাল। তাঁহার নামে ১৫৬০ ও ১৫৬১ খৃষ্টাব্দের মুদ্রা, ঐতিহাসিকদের হস্তগত হইয়াছে।

(১১) আসিরি—অতঃপর দৌহিত্র-বংশ। দৌহিত্রকুলে এই রাজত্বস্রোত পতিত হয়। খাঁন্দেশের খাঁ উপাধিধারী এক ব্যক্তির সহিত এই রাজকুমারী পরিণয়পাশে আবদ্ধ হন। তাঁহার সন্তান ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। তাঁহার আদি নাম আসিরি। অধিরাজ হইবার পর সে নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া মিরাশ মহম্মদ ফারকুই হইয়াছিল। সম্রাট্‌, নবাব, সুলতান বা রাজা হইলে মুসলমান সম্রাট্‌দের নামের আড়ম্বর চলিতে থাকে। অধিক কি ছোট বড় জমীদাররাও পূর্ব্ব নাম পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্জ্জিত করিয়া সাড়ম্বর নব নাম গ্রহণ প্রকৃতিসিদ্ধ। ইনি একাদশ ভূপতি।

(১২) তৃতীয় মামুদ বিনলতিফ—আবার গুজরাট মূল রাজবংশের বাহুলতার আশ্রয় পাইল। ভগবান্‌ বুঝি কেবল কোন পরীক্ষার উদ্দেশেই এই ছলনা করিয়াছিলেন। আদিল লতিফ খাঁ স্বয়ং ভূপাল হইতে না পান, তাঁহার পুত্র মহম্মদ পুনরায় গুজরাটের যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া তাঁহার শুভাশুভ নির্ণয়ের কর্ত্তা হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার প্রতি তাঁহার প্রীতি পূর্ণমাত্রায় উঠিতে পারিয়াছিল। অপত্যস্নেহের অভাবনীয় প্রভাব! তাহাতে একথা সহজে অনুমেয়। যেরূপ হিসাবে গণনা করা হইয়াছে, তাহাতে এই রাজাকে তৃতীয় মামুদ বলিতে হইতেছে। ঐ নামধারী আর দুই জন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। ১৫৬৬—১৫৮৩ খৃষ্টাব্দ সতর বৎসর মাত্র তিনি রাজোপাধি লইয়া রাজ্য করিতেছিলেন। ভারতবর্ষীয় কৌতুকাগারে * তাঁহার কোন মুদ্রাই উল্লিখিত নাই। তবে টমাস সাহেব, ১৫৬৮, ১৫৬৯ ও ১৫৭১ খৃষ্টাব্দীয় মুদ্রার কথা উত্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে ১৫৬৭, ১৫৬৯ ও ১৫৮২ খৃষ্টাব্দের মুদ্রাও দৃষ্ট হইতেছে।

তৃতীয় মামুদ বর্হান নামে এক ক্রীত দাসের হাতে নিহত হন। মহম্মদাবাদে তাঁহার বধকার্য্য সমাহিত হইয়াছিল। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে ৯৮১ হিজিরায় ১২ই রবিয়ল আউলে * তাঁহার জীবনবায়ু বহির্গত হইয়াছিল।

বর্হান কেবল উক্ত ক্ষিতিপতির প্রাণবধে সন্তুষ্ট হয় নাই। তাঁহার হত্যাকার্য্য অতি লোমহর্ষণ। আর একজন গণ্য মান্য ব্যক্তির জীবনহানি করিয়া তাঁহার অসির শোণিতপিপাসা শান্ত হয়! পাপ কার্যের বৃদ্ধি চিরকাল অপ্রতিহত থাকে কি? ইতিমাদ নামে এক ওমরা বর্হানের সহচর ও অনুচরদিগকে আয়ত্ত করিয়া তাহার বিনাশ করেন। ইতিমাদ প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে যবনধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তিনি অতি বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। যবন রাজগণের অন্তঃপুর, কিরূপ গুপ্ত ও পবিত্র, তাহা জানিতে কাহার বাকি আছে? সে শুদ্ধান্তেও তাঁহার গতি অপ্রতিহত। কেবল গতি কেন, নারীরা তাঁহার রক্ষাধীনে থাকিতেন। ত্রিশ বৎসর তিনি রাজা ছিলেন। অন্যেরা নাম মাত্র রাজা হইয়াছেন। তিনি যাহাকে রাজ্যপদ অর্পণ করিতেন, সেইই রাজা হইতে পাইত। সে যাহা হউক, আহম্মদসাই তার পরে রাজপাটে অভিষিক্ত হন।

আইন-ই আকবরীর মতে রাজিউল মুলুকই রাজা হইয়াছিলেন। ইহা ভ্রমাত্মক, কেন না যে সময়ের কথা হইতেছে, তাহার ১১৫ বৎসর

* Indian Museum (ইণ্ডিয়ান্‌ মিউজিয়ম্‌)। শব্দের প্রকৃত অনুবাদ ভারতবর্ষীয় কৌতুকাগার। চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ দেখ।

* "মিরাট সেকেন্দরী" পুস্তকের মতে ১৩ই রবিয়ল আউলে।

পূর্ব্বে রাজি উলমুলুক জীবিত ছিলেন। রাজি উলমুলুকের পিতা আহম্মদ ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে পরলোকগামী হন। তখন তাঁহার পুত্র অতি শিশু। এ বিষয়ে মিরাটি সেকেন্দরের বর্ণনাই সঙ্গত। সম্ভবপর সে বর্ণনা এই—তিনি বাস্তবিক যে বন্দোবস্ত করেন, তাহাতে দ্বিমত আছে। "আইনই-আকবরী মতে আহম্মদাবদের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান আহম্মদের পুত্র রাজি উলমুলুককে সিংহাসনে আরোহিত করেন। কিন্তু এই ঘটনার ১১৫ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ ১৪৬৮ খৃঃ প্রথম সুলতান আহম্মদের মৃত্যু হয়, এ দিকে রাজিও বালক ছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং রাজির রাজ্যপ্রাপ্তি কিয়ৎ পরিমাণে অসম্ভব হইতেছে।" মিরাটি সিকান্দরির গ্রন্থকার সিকন্দারি মহম্মদ ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার বর্ণিত বৃত্তান্তটাই সম্ভবতঃ সত্য। তিনি বলেন, তৃতীয় মামুদের মৃত্যুর পর রাজ্যের প্রধান নায়কেরা সমবেত হইয়া ইতিমাদ খাঁর নিকটে উপনীত হন। ইতিমাদ খাঁ সুলতানের পারিবারিক সংবাদ বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তাঁহারা শুনিতে চাহিলেন, সুলতানের কোন পুত্র বা উত্তরাধিকারী আছে কি না? অথবা তাঁহার কোন পত্নীর কোন সন্তান ভুমিষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা আছে কি না? যদি সুলতানের কোন পত্নীর সন্তানের সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে যত দিন সন্তান ভূমিষ্ঠ না হয়, তত দিন তাঁহারা রাজ্যের অন্য কোনরূপ বন্দোবস্ত করেন না। উত্তরে ইতিমাদ খাঁ বলিলেন, সুলতানের কোন পুত্রও নাই, আর তাঁহার কোন পত্নীর সন্তানের সম্ভাবনাও নাই। সুতরাং সুলতানের উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে নিরাশ হইয়া, তাঁহারা উক্ত খাঁকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, সুলতানের এমন কোন নিকটবর্ত্তী আত্মীয় কি নাই, যাঁহাকে তাঁহারা রাজপদে বরণ করিতে পারেন? ইতিমাদ খাঁ তাঁহাদের ঐ জিজ্ঞাসার উত্তরে বিজ্ঞাপন করিলেন আহম্মদাবাদে আহম্মদ খাঁ নামক সুলতানের এক আত্মীয় আছেন। ইচ্ছা হইলে তাঁহাকে তাঁহারা সুলতানের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিতে পারেন। তার পর তাঁহারা বালক আহম্মদ খাঁকে আনিবার জন্য আমীর রাজি উলমুলুককে আহম্মদাবাদে প্রেরণ করেন।

(১৩) দ্বিতীয় আহম্মদ শা—রাজি উলমুলুক আহম্মদাবাদে উপস্থিত হইয়াই দেখিতে পাইলেন, বালক আহম্মদ খাঁ নিজের পালিত পারাবতের আহারার্থ নিকটস্থ কোন শস্যবিক্রেতার দোকান হইতে শস্য ক্রয় করিয়া লইয়া গৃহে প্রবেশ করিতেছেন। আমীর বালককে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি আহম্মদ খাঁকে শকটে উঠাইয়া লইয়া মামুদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বালকের ধাত্রীরা চীৎকার করিয়া উঠিল এবং বলিল "সে কি? উহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ?" প্রত্যুত্তরে আমীর বলিলেন, "উহাকে যে স্থানে লইয়া যাইতেছি, সেখানে কাল প্রাতে রাজ্যের যাবতীয় লোক উপস্থিত হইবে, কিন্তু সেখানে উহার একজন মাত্রও বন্ধু নাই।"

উত্তরকালে আমীরের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। আহম্মদ খাঁ অতি অল্পদিনের জন্য রাজত্ব করেন। হিজরা ৯৬১ অব্দে ১৫ই রবিয়ল আউল তারিখে (১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে) আহম্মদ খাঁ দ্বিতীয় আহম্মদ নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কিন্তু ইতিমাদ খাঁই রাজ্যসংক্রান্ত সমুদয় রাজকর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। আহম্মদ খাঁর রাজত্বে মুদ্রার উপর "মামুদপুত্র কুতবুদ্দীন" এই নাম অঙ্কিত করা হইয়াছিল। পাঁচ বৎসর পরে, আহম্মদ একজন প্রধান কর্ম্মচারীকে সঙ্গে লইয়া রাজধানী হইতে পলায়ন করেন; কিন্তু কিছুদিন

পরে আবার ফিরিয়া আসেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, তিনি নামে মাত্র সুলতান, কিন্তু ইতিমাদ খাঁ রাজ্যের প্রকৃত অধিপতি। সুতরাং তিনি এই প্রবল মন্ত্রীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। মন্ত্রীও তাঁহার নিজের পথ কণ্টকহীন করিতে ত্রুটি করিলেন না। অবশেষে মন্ত্রী রাজা হইল। অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া সুলতানকে ইহ সংসার হইতে বিদায় লইতে হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, ইতিমাদ খাঁ সুলতানকে হত্যা করেন। এই ঘটনা ৯৬৮ হিজরাতে (১৫৬০ খৃষ্টাব্দে) ৫ই সাবানে ঘটিয়াছিল। সুতরাং তিনি নামে মাত্র ৭ সাত বৎসর রাজত্ব চালাইতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার নাম-ক্ষোদিত একটী তাম্র-মুদ্রা কৌতুকাগারে প্রাপ্তব্য। টমাসের মতে ১৫৮৩ ও ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মুদ্রা প্রচলিত ছিল। রৌপ্য-মুদ্রা তিনটীর মধ্যে ১৫৮৫ ও ১৫৯০ খৃষ্টাব্দের দুইটীর উৎকীর্ণ অঙ্ক পড়িতে পারা গিয়াছে। আর একটীর শেষের অঙ্ক পঠিত হইয়াছে। যথা,—" * * ২ " এই "২" সংখ্যা হিজরা অব্দ-বিজ্ঞাপক।

(১৪) নাথু বা তৃতীয় মজফর শা—আহম্মদ খাঁর মৃত্যুর পর, ইতিমাদ খাঁ, নাথু নামক একটী শিশুকে সিংহাসন প্রদান করেন। কিন্তু উক্ত শিশুর সহিত প্রকৃত সুলতানবংশের কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইতিমাদ উক্ত নাথুকে মামুদের পুত্র বলিয়া প্রচার করেন। রাজ্যস্থ সকলেই এ কথা বিশ্বাস করিতেন। নাথু তৃতীয় মুজাফর নাম গ্রহণান্তর ৯৬৯ হিজিরা অব্দে (১৫৯১ খৃষ্টাব্দে) সুলতান-পদে অভিষিক্ত হন। ৯৮০ হিজিরা সালে অর্থাৎ ১৬০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজত্বাবসান ঘটে। তাঁহার নামাঙ্কিত ১৫৯১, ১৫৯৩, ১৫৯৯ ও ১৬১৩ খৃষ্টাব্দের মুদ্রার বিষয়, ভারতবর্ষীয় কৌতুকাগারে, টমাস সাহেবের পুস্তকে ও ওলিভার সাহেবের কোন প্রবন্ধ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়। *

দেখিতে পাওয়া গেল, ইতিমাদ খাঁ রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। সুলতানকে তাঁহার হস্তে ক্রীড়ার পুত্তলী ভিন্ন আর কি-ই বা বলা যাইতে পারে? তাঁহার বিনা অভিপ্রায়ে রাজ্য-সংক্রান্ত কোন কার্য্য হইতে পারিত না। কোন আমীর, তাঁহার এ প্রবল ক্ষমতায় অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁহার নেতৃত্ব অস্বীকারও করিতেন বটে, কিন্তু দেখিতে গেলে, ইতিমাদ খাঁই কার্য্যতঃ স্বাধীন ছিলেন এবং রাজ্যের সামান্য প্রজা হইতে সুলতান পর্য্যন্ত তাঁহার অধীন ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মিরাটী আহম্মদী গ্রন্থে গুজরাট-রাজ্যের আয় এবং সৈন্যবিভাগ সম্বন্ধে একটী তালিকা আছে। ৯৭৯ হিজরার তালিকায় দেখা যায়, সুলতানের অংশে ১০০০০ দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং ৩৩ ক্রোড় তঙ্কা; ইতিমাদের অংশে ৯০০০ অশ্বারোহী এবং ৩০ ক্রোড় তঙ্কা। অবশিষ্ট ৩০০০০ হাজার অশ্বারোহী ও ৯০ তঙ্কা আর ছয় জন আমীরে ভাগ করিয়া লইতেন। ইহা হইতে ইতিমাদের ক্ষমতা স্পষ্ট বোধগম্য হয়। এমন কি রাজ্যের উপস্বত্বও তিনি সুলতানের সহিত তুল্যাংশে উপভোগ করিতেন। কিন্তু এরূপ বিভাগ সত্ত্বেও কেহই সন্তুষ্ট ছিলেন না। পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে ৯৮০ হিজরাতে (১৬০২ খৃষ্টাব্দে) গুজরাট জয় করিবার জন্য ইতিমাদ খাঁ গোপনে আকবরের নিকট সংবাদ দেন। ঐ বৎসরের ১৪ই রজব তারিখে আকবর গুজরাট অধিকার করেন।

* ৯৩০ হিজিরার অর্থাৎ ১৫৫২ খৃষ্টাব্দের এক মুদ্রার কথা ওলিভার সাহেব লিখিয়াছেন, তাহা অবিশ্বাস্য। উহা তাঁহার রাজত্ব-প্রাপ্তির বহু পূর্ব্বের কথা।

ইতিমাদ এবং গুজরাটের অন্যান্য আমীর আকবরকে গুজরাটের অধিপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। আকবর ইতিমাদের ক্ষমতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে (Tuyul) তুয়ুল স্বরূপ, বরদা চম্পানীর ও সুরাট প্রদান করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি অবমানিত হইয়া কারারুদ্ধ হন। পুনরায় ৯৮২ হিজরাতে কারামুক্ত হইয়া ইতিমাদ খাঁ রাজকীয় ধনরত্নাদির রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রাপ্ত হন। দুই বৎসর পর তিনি মক্কাযাত্রা করেন এবং প্রত্যাবর্ত্তনের সময় জায়গীর স্বরূপ পাটান প্রাপ্ত হন। ৯৯০ হিজরাতে (১৬০২ খৃষ্টাব্দে) ইতিমাদ খাঁ শিহাবুদ্দীনের পরিবর্ত্তে গুজরাটের শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত হন। কিন্তু সিহাবুদ্দীনের সৈন্যেরা বিদ্রোহী হয়। ইতিমাদের অনুপস্থিতে তাহাদের সাহায্যে ৯৯১ হিজরাতে (১৬১৩ খৃঃ) মুজাফর আহম্মদাবাদ অধিকার করিয়া পুনরায় সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে, ইতিমাদ পাঠানে যান এবং সেখানে ৯৯৫ হিজরাতে মানবলীলা সংবরণ করেন এই তো গেল মন্ত্রীর দশা।

(১৪) তৃতীয় মুজাফর শা—সম্রাট্ আকবরের গুজরাট অধিকার এবং সুলতান মুজাফরের পুনরায় গুজরাটের সিংহাসনে অধিরোহণ, এই দুই ঘটনার মধ্যবর্ত্তী কালে সুলতান কি অবস্থায় এবং কোথায় ছিলেন, তাহাও বলা আবশ্যক হইতেছে।

৯৮০ হিজরাতে (১৬০২ খৃষ্টাব্দে) মুজাফর, স্বেচ্ছাক্রমে আকবরকে রাজ্য ছাড়িয়া দেন। তৃতীয় মজফর শা ৯৬৯—৯৮০ হিজিরা (১৫৯১ —১৬০২ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত শাসনদণ্ড পরিচালন করিলে, গুর্জ্জর-রাজলক্ষ্মী, মোগল-নিকেতনে প্রবেশ-লাভার্থে কি ব্যাকুল হইয়াছিলেন! মোগল কুল-তিলক আকবর শাহ, এই সময় গুজরাট-পতি হইলেন। আকবরের উপদেশানুসারে মুজাফর, আগ্রায় যাত্রা করেন এবং সেখানে কারাবরুদ্ধ হন। প্রায় ৯ নয় বৎসরের পর, সুলতান আগ্রার দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া গুজরাটে উপস্থিত হন। তৎপরে কিরূপে ৯৯১ হিজরাতে (১৬১৩ খৃষ্টাব্দে) আকবরের সেনাপতি কুতবুদ্দীন খাঁকে পরাজয় করিয়া গুজরাটের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সময়ে স্বল্পদিনের জন্য আর একবার রাজ্যভোগ-লালসা চরিতার্থ করিয়া লইলেন। তদবধি এখানকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজার রাজত্বের অবসান ঘটিল।

মুজাফরের গুজরাট-অধিকারের কথা শুনিয়া, আকবর তাঁহার বিরুদ্ধে বৈরাম খাঁর পুত্র মিরজা খাঁ খান্নানকে প্রেরণ করেন। উপর্য্যুপরি দুইটী যুদ্ধেই পরাজিত হইয়া মুজাফর কাটেওয়ার প্রদেশে জুনাগড়ে পলায়ন করেন মিরজা খাঁনি আজাম নামে আকবরের আর একজন সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করেন এবং ৯৯৯ হিজরাতে (১৬২১ খৃষ্টাব্দে) মুজাফর কচ্ছদেশে তাঁহাকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া মিরজা খাঁ খান্নানের নিকট আনীত হন। সেনাপতির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া মুজাফর অল্প সময়ের জন্য কোন নির্জ্জন স্থানে যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। খাঁ খান্নান সম্মত হওয়ায় তিনি এক নির্জ্জন স্থানে একখানি খুরের সাহায্যে আত্মহত্যা করেন। সুলতান মুজাফরের মৃত্যুর পরেই গুজরাট দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। মুজাফর দ্বিতীয় বার সিংহাসন অধিকার করিয়া যে অল্পদিন রাজত্ব করেন, সেই অল্পদিনের মধ্যেই তিনি রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া নিজ নামাঙ্কিত মুদ্রার প্রচলন করেন।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

কালিদাস।

কল্পনা! জাগিয়া কিবা দেখিনু স্বপন!
নক্ষত্রখচিত, নীল, লক্ষ্মী পূর্ণিমার
অনন্ত আকাশতলে, চির সুকুমার,
অনন্ত মাধুরীময় ত্রিদিব ভুবন!
ফুটিয়া ঝরে না সেথা কুসুমরতন,
কোকিল কুহরি গাহে নিত্য নব গান,
তটিনী উছলি ধায় তুলিয়া সুতান,
শোভে চির বসন্তের মঞ্জু কুঞ্জবন!
সুরভিত বহে বায়ু মধুরে স্বনিয়া!
পদ্মযোনি যেন—ফুল্ল কমল আসনে,
এ শোভা ভুবন মাঝে, পুরুষ বসিয়া
গড়িছে সুন্দর বিশ্ব—প্রতিভা নয়নে
মহান্‌ মহিমা সিন্ধু উথলে বয়নে—
সৌন্দর্য্যের পরমাণু চুনিয়া চুনিয়া।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

"টু জেন্‌টেল্‌মেন্‌ অব্‌ ভেরোনা"

ভেরোনা সহরে দুই সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বাস করিতেন। একজনের নাম—ভ্যালেন্‌টাইন, আর একজনের নাম—প্রোতিয়াস্‌। বহুকালাবধি তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে বিশিষ্টরূপ বন্ধুত্ব ছিল। উভয়ে একত্র পাঠাভ্যাস করিতেন, এক সঙ্গে থাকিতেন এবং নানারূপ গালগল্প করিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেন। ইতিমধ্যে প্রোতিয়াস্‌ এক যুবতীর প্রেমে আসক্ত হন। যুবতীর নাম—জুলিয়া। জুলিয়াকে দর্শন করিতে প্রোতিয়াস্‌ মধ্যে মধ্যে গমন করিতেন। ভ্যালেন্‌টাইন্‌ ইহা ভাল বাসিতেন না; কাজেই বন্ধুদ্বয়ের মধ্যে ক্রমেই মনোভঙ্গের সূত্রপাত হইতে লাগিল। প্রোতিয়াস্‌, নব-অনুরাগবশে নায়িকার রূপগুণ বর্ণনা করিতেন, তাঁহার ভালবাসার ব্যাখ্যা করিতেন;—ভ্যালেন্‌টাইন্‌ তাহাতে সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরে থাক্‌,—তাহা লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতেন, হাস্যপরিহাস করিয়া কথাটা উড়াইয়া দিতেন। কহিতেন, "ভায়া হে! অত 'ভালবাসাটা' কিছু নয়। এতে পদে পদে বিপদ। কেন ভাই সাধ করিয়া এমন সুখের স্বাধীনতাকে জলাঞ্জলি দিই? আমার ত মনে মনে প্রতিজ্ঞা এই, আমি কখন ও-পথের পথিক হইব না। সত্য কথা বলিতে কি ভাই, তোমার ঐ প্রেম-চিন্তা, হা-হুতাশ, আর দীর্ঘশ্বাস, আমার বড় সুখ-দায়ক বোধ হয়। কারণ, আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন।"

(২)

একদিন প্রাতে ভ্যালেন্‌টাইন্‌ আসিয়া প্রোতিয়াস্‌কে কহিলেন, "ভাই, কিছুদিনের জন্য তোমার সহিত বিচ্ছেদ ঘটিতেছে। আমি মিলান নগরে যাইব সঙ্কল্প করিয়াছি।"

প্রোতিয়াস্‌ বন্ধুর প্রস্তাবে দুঃখিত হইলেন। নানারূপ তর্ক-বিতর্ক করিয়া ভ্যালেন্‌টাইন্‌কে মিলানযাত্রায় প্রতিনিবৃত্ত করিতে যত্ন পাইলেন। কিন্তু ভ্যালেন্‌টাইন্‌ তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। কহিলেন, "ভাই, আমার গন্তব্য-পথে বাধা দিও না। আমি ইচ্ছা করি না যে, অলসের ন্যায় ঘরে বসিয়া থাকিয়া, যৌবনের উদ্যমশীলতা নষ্ট করি। যদি না তুমি জুলিয়ার প্রেমে আবদ্ধ হইতে, তাহা হইলে আমার সমভিব্যাহারী হইতে পারিতে এবং দেশ-পর্য্যটনে জগতের বিবিধ বৈচিত্র্য অবলোকন করিতেও সমর্থ হইবে।

কিন্তু এখন তুমি রমণী-প্রেমে বিহ্বল; অতএব প্রেম লইয়া থাকাই বিহিত। ভরসা করি, এই প্রেম তোমার সর্ব্বাঙ্গীন কুশলদায়ক হইবে।"

অতঃপর নানা কথায় বন্ধুদ্বয়ের প্রীতি সম্ভাষণ হইল। বিদায়কালে প্রোতিয়াস্ কহিলেন, "প্রিয় ভ্যালেন্‌টাইন্, বিদায়! কিন্তু এই একটী অনুরোধ ভাই, দেশ-পর্য্যটন কালে যখনই তুমি কোন অপূর্ব্ব বস্তু দেখিবে, তখনই এই অকৃতী বন্ধুকে একবার স্মরণ করিয়া, সেই সুখের অংশী করিও।"

(৩)

বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ভ্যালেন্‌টাইন্ যথাসময়ে মিলান যাত্রা করিলেন, প্রোতিয়াস্‌ও বন্ধু বিয়োগ-কাতরতার উপশমনার্থ তখনই প্রিয়তমা জুলিয়াকে এক প্রেম-লিপি লিখিতে বসিলেন। লেখা শেষ হইলে, লুসেটা নাম্নী জনৈক পরিচারিকা দ্বারা তাহা জুলিয়ার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। লুসেটা, জুলিয়ারই খাস্ চাকরাণী।

প্রোতিয়াস্ জুলিয়াকে যেরূপ ভালবাসিতেন, প্রেমময়ী জুলিয়াও প্রোতিয়াস্‌কে সেই চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু এই বুদ্ধিমতী রমণী মনে মনে ইহা বেশ বুঝিতেন যে, যতই কেন মুল্যবান্ বস্তু হউক না, সহজে, হেলা ফেলায় লাভ করিলে, তাহার মাহাত্ম্য থাকে না। কাজেই এই চতুরা, চিত্তবিমোহিনী ভাবিনী, বাহিরে ঠিক ভিন্ন-ভাব দেখাইতেন; আর প্রেমময়ী প্রিয়তমার সেই ভিন্ন-ভাব দেখিয়া, প্রেমবিলাসী প্রোতিয়াসের প্রাণ মন আন্‌চান্ করিত।

পরিচারিকা লুসেটা, যথাসময়ে কর্ত্রী-ঠাকুরাণীকে, কর্ত্তাটীর সেই প্রেম-লিপি প্রদান করিল। জুলিয়া তাহা আদৌ গ্রহণই করিলেন না,—অধিকন্তু বিরক্তিসহকারে পরিচারিকাকে ভর্ৎসনা করিয়া সেই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে আদেশ করিলেন।—"এ তোর্ কি ধৃষ্টতা! তুই কোন্ সাহসে, কা'র কথায়, প্রোতিয়াসের পত্র বহন করিয়া আনিলি?"

মুখের কথা এই, কিন্তু মনের কথা অন্যরূপ। ধমক খাইয়া পরিচারিকাটী দুই-চারি-পা যাইতে-না-যাইতে কর্ত্রীঠাকুরাণী কি ভাবিয়া তাহাকে তলব করিলেন;—দাসীও হুজুরে হাজির হইল।

"এখন কটা বেজেছে রে?"

চাকরাণীটী নিতান্ত বোকা-হাবা নয় যে, ঠাকুরণের আসল মতলবটা কি, বুঝিতে না পারে। সে বুঝিল, চিঠিখানায় কি লেখা আছে, তাই জানিবার জন্য ঠাকুরণ অধীর হ'য়েছেন;—"কটা বেজেছে" জিজ্ঞাসা করা—ও একটা অছিলা মাত্র।

চাকরাণীটী অবশ্য মনে মনে একটু হাসিল—"কটা বেজেছে" সে কথার আর কোন উত্তর না দিয়া, ঠাকুরণের আঁতের-ব্যথা-মোচনার্থ প্রোতিয়াসের সেই চিঠিখানা পুনরায় তাঁহার হস্তে প্রদান করিল।

আর যায় কোথায়? এঁ! চাকরাণীটে কিনা মনের ফাঁক বুঝিতে পারিল!—আর বুঝিতে পারিয়া সেই ফাঁকের-ঘর পূরণ করিতে সাহসী হইল! অর্থাৎ কি না, এই মাত্র না তিনি প্রোতিয়াসের সেই পত্রখানা স্পর্শও না করিয়া, 'দূর-ছ্যা' করিয়া চাকরাণীকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন;—পরমুহূর্ত্তেই সেই চাকরাণীটে কিনা, আবার আসিয়া, তাঁহার মতলব বুঝিয়া, আপনা হইতে সেই পত্র দেয়! এ ত বড় বেয়াদবি!

জুলিয়া-সুন্দরী রাগে গর-গর হইয়া, তখনই সেই পত্রখানি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ঘরের

মেজেয় ফেলিয়া দিলেন এবং পরিচারিকা লুসেটাকে তখনই তথা হইতে দূর হইয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

প্রস্থানকালে লুসেটা ভয়ে ভয়ে সেই ছিন্নলিপিখণ্ডগুলি কুড়াইতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু জুলিয়ার আন্তরিক অভিপ্রায় অন্যরূপ,—কৃত্রিম কোপসহকারে পরিচারিকাকে কহিলেন, থাক্, ওগুলো তোকে আর কুড়াইতে হইবে না; তুই এখনই এখান হইতে দূর হ! তুই ও চিঠীর টুক্‌রো গুলো স্পর্শ করিলেও আমার রাগ হয়!"

(৪)

লুসেটা প্রস্থান করিলে পর, জুলিয়া সেই ছিন্ন-লিপিখণ্ডগুলি কুড়াইয়া লইলেন। অতঃপর টুকুরাগুলি যেটীর পর যেটী, একত্রিত করিয়া পাঠ করিতে চেষ্টা পাইলেন। অতঃপর কোনও রকমে একটুকু জুড়িয়া-তাড়িয়া জুলিয়া প্রথমেই পড়িলেন, "প্রণয়াহত প্রোতিয়াস্!" এইরূপে ছিন্ন-লিপি যত জোড়া দেন, ততই একটু-আধ্‌টু মাত্র কথা বুঝিতে পারেন;—সে সকলগুলির মর্ম্মই পরম প্রীতিকর,—প্রণয়িজনোচিত!

প্রেমময়ী জুলিয়ার আর ক্ষোভের সীমা রহিল না। তাঁহার বুঝিবার দোষেই ত পরম-প্রণয়িজনের প্রেম-লিপির এই পরিণাম! প্রেমিকা বিলাপস্বরে আপনা-আপনি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, "হায়! আমি কি নির্ব্বোধ! বৃথা অভিমানে, হৃদয়বল্লভের লিপি-সুধাপানে বঞ্চিত হইলাম! লিপিখণ্ড, তোমাদিগকে আমি যেরূপে আঘাতিত করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, তোমাদিগকে সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিব এবং স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে তোমাদিগকে চুম্বন করিব!"

অবোধ বালিকার ন্যায় নানারূপ বিলাপ করিয়া গুণবতী জুলিয়া বারংবার আত্মধিক্কার করিতে লাগিলেন। কারণ তিনি যতবার সেই ছিন্ন পত্রখানি এক করিয়া পড়িতে চেষ্টা করেন, ততবারই বিফল হন। বুঝিলেন, তাঁহারই বুদ্ধির দোষে, প্রাণেশ্বরের প্রণয়-কাহিনীগুলি নির্দ্দয়রূপে আঘাতিত হইয়াছে। এই দারুণ ক্ষোভের প্রতিকারার্থ তিনি তখনই প্রোতিয়াসকে গভীর স্নেহপূর্ণ এক প্রেমপত্র লিখিলেন! বলা বাহুল্য, ভালবাসার নিদর্শনস্বরূপ, প্রোতিয়াসকে এমন মর্ম্মস্পর্শী প্রেম-পত্র আর কখন লেখেন নাই।

(৫)

প্রাণাধিকা প্রণয়িনীর নিকট হইতে প্রীতিপ্রদ প্রেম-লিপি পাইয়া, প্রোতিয়াস্ যার-পর-নাই আহ্লাদিত হইলেন। চিঠিখানি তিনি যতবার পাঠ করেন, ততই পড়িতে ইচ্ছা হয়। তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "কি মধুর প্রেম! কি মিষ্ট কথা! কেমন সুন্দর জীবন!"

প্রোতিয়াস্ মনের আবেগে বারংবার এইরূপ বলিতেছেন, পার্শ্বস্থ প্রকোষ্ঠ হইতে তাঁহার বর্ষীয়ান্ পিতা জিজ্ঞাসিলেন, "প্রোতিয়াস! ও কি ও? কা'র পত্র তুমি পড়িতেছ?"

প্রোতিয়াসের চমক ভাঙ্গিল। বুদ্ধি খাটাইয়া ধাঁ করিয়া পিতার কথায় উত্তর দিলেন, "পিতঃ, এ পত্র আমার প্রিয় বন্ধু ভ্যালেন্‌টাইনের। তিনি মিলান হইতে এই পত্র আমাকে লিখিয়াছেন।"

"বটে! পত্রখানি দাও দেখি আমাকে একবার।—প'ড়ে দেখি, ব্যাপারখানা কি!"

প্রোতিয়াস্ থতমত খাইয়া উত্তর করিলেন, "না, এমন কিছু জরুরি খবর নাই,—তবে

ভ্যালেন্‌টাইন আমাকে লিখিয়াছেন, তিনি মিলান্‌-রাজের বড়ই প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। মিলান-রাজ তাঁহাকে যার-পর-নাই স্নেহ ও অনুগ্রহ করেন। ভ্যালেন্‌টাইনের একান্ত ইচ্ছা, তাঁহার সেই সুখের অংশী আমি হই।"

"ভাল, তোমার ইচ্ছা কি? তুমি কি তোমার বন্ধুর সাধ পূর্ণ করিতে চাহ?"

"আমি একান্তই আপনার অধীন; আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন কাজ করিতে পারি না।"

পিতা পুত্রে এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল।

এখন ঘটিল এই যে, প্রোতিয়াসের পিতা তাঁহার জনৈক বন্ধুকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলেন, তাঁহার পরামর্শ জানিতে চাহিলেন। উত্তরে বন্ধু বলিলেন, "আপনি অযথা আপনার পুত্রকে ঘরে বসাইয়া রাখিয়া তাহার ভাবী উন্নতি-পথে বাধা দিতেছেন। কারণ, যৌবন-কালেই মানুষের যা-কিছু উদ্যমশীলতা ও উচ্চাভিলাষ থাকে। এ সময়ে, সকলেই আপনাপন পুত্রকে তাহাদের উন্নতির পথ খুঁজিয়া লইতে বিদেশে পাঠাইয়া থাকেন। ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য কেহ সৈনিকের কার্য্যে, কেহ সুদূরবর্ত্তী দ্বীপ আবিষ্কার করিতে, কেহ বিদেশী ভাষা শিক্ষার অভিপ্রায়ে দেশদেশান্তরে গমন করে। এই দেখুন, ভ্যালেন্‌টাইন মিলান-যাত্রা করিয়া, মিলান-রাজের কিরূপ প্রিয়পাত্র হইয়াছেন। আপনার পুত্রও এই সকল বিষয়ের যে-কোন কার্য্যে উপযুক্ত। এ সময়ে যদি তাকে বিদেশ-গমনে বাধা দিয়া ঘরে রাখিয়া দেন, তবে পরিণত-বয়সে তাহার সম্যক্‌ ক্ষতির সম্ভাবনা।"

প্রোতিয়াসের পিতা, বন্ধুর প্রস্তাব যুক্তি-সঙ্গত বোধ করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "ভ্যালেণ্টাইনও প্রোতিয়াস্‌কে তাহার সুখের ভাগী করিতে অভিলাষী।" বৃদ্ধ, প্রোতিয়াস্‌কে মিলান পাঠাইতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি পুত্রকে কখন কোনও বিষয়ে স্বাধীনতা দেন নাই। যাহা আদেশ করিতেন, দ্বিরুক্তি না করিয়া পুত্রও অম্লানবদনে তাহা সমাধা করিতেন। অতএব বৃদ্ধ কহিলেন, "প্রোতিয়াস্‌, তোমার বন্ধু ভ্যালেণ্টাইনের যেরূপ ইচ্ছা, আমারও সেই মত অভিপ্রায়।"

হঠাৎ পিতার এরূপ আদেশে প্রোতিয়াস্‌ বিস্ময়াপন্ন হইলেন। পুত্রকে তদবস্থায় দেখিয়া বৃদ্ধ কহিলেন, "প্রোতিয়াস, বিস্মিত হইও না। তোমাকে কিছুদিনের জন্য মিলান যাত্রা করিতে হইবে। তুমি জান, আমার যে কথা, সেই কাজ। অতএব কোন ওজর আপত্তি না করিয়া, আগামী কল্য তথায় যাইতে প্রস্তুত হও।"

প্রোতিয়াস্‌ পিতার স্বভাব জানিতেন। জানিতেন যে, পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিবার তাঁহার সামর্থ্য নাই। বুঝিলেন যে, আপনার বুদ্ধির দোষেই, প্রাণাধিকা জুলিয়ার প্রেমলিপি গোপন করিতে গিয়া এই অনর্থ উপস্থিত হইল। তিনিই প্রণয়িনীর সহিত বিচ্ছেদের মূলীভূত কারণ। ক্ষোভের আর সীমা রহিল না।

---

(৬)

যথাকালে জুলিয়া এ সংবাদ অবগত হইলেন। তিনি বুঝিলেন যে, প্রিয়তমের সহিত দীর্ঘকাল বিচ্ছেদ ঘটিতেছে। প্রোতিয়াস্‌ও ক্ষুণ্নমনে প্রেয়সী সন্নিধানে বিদায় লইতে উপস্থিত হইলেন। উভয়েরই ক্ষোভের আর সীমা রহিল না। পরস্পর নানারূপ বিলাপ ও হা-হুতাশ করিতে লাগিলেন। জুলিয়া এক্ষণে আর আত্মগোপন করিতে সমর্থ হইলেন না। মুক্ত-অন্তরে, প্রাণের কথা—মনের ব্যথা মনোমোহনের নিকট ব্যক্ত করিলেন। প্রোতিয়াসের প্রতি তাঁহার ভালবাসার গাঢ়তা আর বিন্দুমাত্র

প্রোতিয়াস্ ও জুলিয়া।



অপ্রকাশিত রহিল না। প্রণয়িযুগল স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ পরস্পরের অঙ্গুরীয় বিনিময় করিলেন। পরস্পর প্রতিজ্ঞা করিলেন, চিরদিন সে প্রেম-অঙ্গুরী সযত্নে অঙ্গুলিতে ধারণ করিবেন। অতঃপর প্রোতিয়াস্ ক্ষুণ্নমনে—সজলনয়নে প্রিয়তমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া মিলান যাত্রা করিলেন।

---

(৭)

প্রোতিয়াস্, অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া পিতৃ-সন্নিধানে যাহা বলিয়াছিলেন, বস্তুতঃ তাহা ঠিক। সত্য সত্যই তাঁহার প্রিয় বন্ধু ভ্যালেন্‌টাইন্ মিলানরাজের একান্ত স্নেহভাজন ও প্রিয়-পাত্র হইয়াছেন। অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় এই যে, প্রোতিয়াস্ যাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, ভ্যালেণ্টাইন্ সেই পথের পথিক হইয়াছেন। ভ্যালেণ্টাইন্ আর সে আগেকার ভ্যালেণ্টাইন্ নাই,—তাঁহার স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি ইতিপূর্ব্বে যে রমণী-প্রেমের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন, বিধির বিধানে এখন সেই প্রেম-তুফানে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন!—এ বিষয়ে প্রোতিয়াসে ও তাঁহাতে এখন আর কোন প্রভেদই নাই।

যে অনিবার্য্য-শক্তিবলে ভ্যালেণ্টাইনের এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সেই শক্তি আর কেহ নহে,—স্বয়ং মিলান-রাজ-দুহিতা সিল্‌ভিয়া। রাজকুমারী সিল্‌ভিয়া-সুন্দরী, ভ্যালেন্‌টাইন্‌কে ভালবাসেন। কিন্তু প্রণয়ি যুগলের এই ভালবাসা মিলান-রাজের অগোচর। কারণ, মিলানরাজ যদিও আশ্রিত ভ্যালেন্‌টাইন্‌কে

স্নেহ-অনুগ্রহ করিতেন এবং প্রতিদিন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজ-প্রাসাদে আনিতেন, তথাপি তিনি একরূপ স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, থারিও নামক এক যুবকের সহিত আপন তনয়ার বিবাহ দিবেন। কিন্তু সিল্‌ভিয়া সুন্দরী, থারিওকে পছন্দ করিতেন না। কারণ, এই তরুণ যুবকের এমন কোন গুণ ছিল না, যাহা ভ্যালেণ্টাইনের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। অন্ততঃ রাজকুমারীর এইরূপ বিশ্বাস।

---

(৮)

সিল্‌ভিয়া সুন্দরীর প্রণয়-প্রার্থী দুইজন,—ভ্যালেন্‌টাইন্ ও থারিও। উভয়ে এক প্রণয়-পা[illegible] প[illegible]। একদিন এই দুই প্রণয়ী, এ[illegible] [illegible]কুমারী সিল্‌ভিয়ার সন্নিধানে গমন করিলেন। ভ্যালেন্‌টাইনেরই জয়,—থারিও-বেচারী আর আমল পাইতেছে না। প্রণয়িনীকে উদ্দেশ করিয়া থারিও যে কথাটী কন, ভ্যালেন্‌টাইন্ অমনি তাহা বিদ্রূপ-উপহাসে উড়াইয়া দিয়া আপন আধিপত্য স্থাপন করেন। কারণ, রাজকুমারীর কৃপা-দৃষ্টি যে তাঁরই উপর।

একদিন এইরূপ আমোদ-প্রমোদ চলিতেছে, এমন সময় স্বয়ং মিলান-রাজ সেই প্রমোদ-কক্ষে প্রবেশ করিয়া ভ্যালেন্‌টাইন্‌কে তদীয় বন্ধু প্রোতিয়াসের শুভ-আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। ভ্যালেণ্টাইন্ এ সুসংবাদে মহা আহ্লাদিত হইয়া আপন মনে কহিলেন, "যদি প্রিয়বন্ধুকে আমি এখানে দেখিতে পাই, তাহা হইলে বস্তুতঃই যার-পর-নাই সুখী হই।"

অতঃপর রাজ-সমক্ষে তিনি প্রোতিয়াসের গুণ-ব্যাখ্যা করিয়া কহিলেন, "রাজন্! বন্ধুর গুণের কথা আমি আর এক মুখে কি বলিব,—বরং আমি অনেক সময় বৃথা নষ্ট করিয়াছি, কিন্তু বন্ধু-আমার যথার্থ মনুষ্যোচিত এবং ভদ্রজনোচিত, সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া বিশিষ্টরূপ গুণ-গরিমায় অলঙ্কৃত হইয়াছেন।

এ কথায় মিলানরাজ সন্তুষ্ট হইলেন। অতঃপর তিনি আপন কন্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মা সিল্‌ভিয়া! শুনিলে, ভ্যালেন্‌টাইনের বন্ধু প্রোতিয়াস্ কিরূপ গুণবান্ ও সজ্জন। তিনি এখানে আসিয়াছেন, তাঁহাকে বিশিষ্টরূপ আদর-অভ্যর্থনা করিও। প্রিয় থারিও, তুমিও সে সময় তোমার শিষ্টাচার দেখাইও। ভ্যালেন্‌টাইনকে আর এ সম্বন্ধে আমার কোন আদেশ নাই।"

মিলান-রাজ প্রস্থান করিলেন। প্রোতিয়াস্ মহা-সমাদরে তথায় আনীত হইলেন। কিছুক্ষণের জন্য প্রণয়িগণের প্রেমালাপে বাধা পড়িল। ভ্যালেন্‌টাইন হাসিমুখে প্রোতিয়াসের হাত ধরিয়া, সিল্‌ভিয়াকে কহিলেন, "সুন্দরি! আমি যখন আপনার একান্ত আশ্রিত, আমার বন্ধুও তখন আপনার আশ্রিত। এ অধীনকে যেরূপ কৃপাচক্ষে দেখেন, অধীনের বন্ধুকেও সেইরূপ কৃপা-চক্ষে দেখিবেন।"

নানারূপ সদালাপ ও আমোদ-আহ্লাদে সকলেই প্রোতিয়াসকে আদর-অভ্যর্থনা করিলেন।

(৯)

দুই বন্ধুর সাক্ষাৎ-সন্দর্শনের পর আর আর সকলে প্রস্থান করিলেন। তখন ভ্যালেন্‌টাইন নির্জ্জনে পাইয়া প্রোতিয়াসকে প্রীতিভরে কহিলেন, "ভাই হে, এখন সংবাদ কি বল? তোমার প্রণয়িনী আছেন কেমন? আর তোমাদের ভালবাসাই বা এক্ষণে কিরূপ?"

প্রোতিয়াস্ ঈষৎ হাস্যে উত্তর করিলেন, "কেন ভাই, ভালবাসার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ? ইহাতে ত তোমার আনন্দোদয় হয় না, বরং বিরক্তি হয়।—তবে কেন সে কথা তুলিয়া তোমার মন খারাপ করি!"

ভ্যালেন্‌টাইন্‌ কিছু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "আর ভাই, আমাকে লজ্জা দিও না। আমার জীবনের গতি এখন অন্য দিকে ফিরিয়াছে। আমি প্রেমের প্রতি দোষারোপ করিয়া এক্ষণে সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতেছি। পূর্ব্বে যাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতাম, সময় বুঝিয়া এখন সে আমার প্রতি বিলক্ষণ প্রতিহিংসা লইতেছে। বন্ধু হে, বলিতে কি, প্রেমের প্রভাবে আমার আহার-নিদ্রা উঠিয়াছে। ভাই, আমি এখন বেশ বুঝিয়াছি, প্রেমের নিকট একদিন সকলকেই হারি মানিতে হয়। কিন্তু এ কথাও বলিতে পারি, প্রেমের তুল্য পরম প্রীতিকর বস্তুও পৃথিবীতে আর নাই। প্রেম-কথায়ও এখন আমি সুখানুভব করি এবং ইহার আলোচনায়ও এখন আমি শান্তি পাই।"

বন্ধুর এরূপ চিত্ত-পরিবর্ত্তন দেখিয়া প্রোতিয়াস্‌ যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু এইবার অমৃতে গরল প্রবেশ করিল। ইঁহাদের সে অকৃত্রিম প্রণয় আর অধিক দিন স্থায়ী রহিল না। কারণ প্রোতিয়াস্‌ যখন শুনিলেন যে, ভ্যালেন্‌টাইন্‌, মিলান-রাজকুমারীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী, তখন তাঁহার মনে ভিন্ন ভাবের উদয় হইল। সিল্‌ভিয়াকে প্রণয়িনীরূপে লাভ করিতে তাঁহার লালসা জন্মিল। সুতরাং ইতিপূর্ব্বে যে ব্যক্তি বন্ধু ছিল, স্বার্থ-সাধনার্থ সে শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। পরম লাবণ্যময়ী, সৌন্দর্য্যপ্রতিমা সিল্‌ভিয়াকে দেখিয়া প্রোতিয়াস্‌ একেবারে অধীর হইলেন। অপিচ, জুলিয়ার প্রেম-চিন্তা তাঁহার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। এক্ষণে সিল্‌ভিয়ার সহিত ভ্যালেন্‌টাইনের কিরূপে মনোমালিন্য ঘটে, কিসে সিল্‌ভিয়া ভ্যালেন্‌টাইন্‌কে ঘৃণার চক্ষে দেখেন, বিধিমতে সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সংলোকে কোন-একটা দোষাবহ-কার্য্যে লিপ্ত হইলে মনে নানারূপ দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হইয়া থাকে; প্রোতিয়াসের প্রথম প্রথম তাহাই হইল; কিন্তু প্রেম নাকি বড় বিষম রিপু, তাই তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার সামর্থ্য প্রোতিয়াসের হইল না। তিনি অনায়াসে জুলিয়ার প্রেম বিস্মৃত হইলেন। হিতাহিতজ্ঞান তাঁহার অন্তর হইতে এককালে অন্তর্হিত হইল। অধিকন্তু কি উপায়ে ভ্যালেন্‌টাইনের সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

(১০)

ভ্যালেন্‌টাইন্‌ সয়তানের সয়তানী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অকৃত্রিম বন্ধুজ্ঞানে, অকপটে, প্রণয়ের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত প্রোতিয়াস্‌কে বলিলেন। অধিকন্তু কহিলেন, "ভাই, আমাদের প্রণয়-ব্যাপার মিলান-রাজ আদৌ অবগত নহেন। সিল্‌ভিয়া তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যা;—তাঁহাকে যে আমার হস্তে সম্প্রদান করিবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। তাই মিলান-রাজের সম্পূর্ণ অগোচরে এতদিন আমরা প্রেমালাপ করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে সরলা সিল্‌ভিয়ার আন্তরিক ইচ্ছা, এরূপ গুপ্তভাবে না থাকিয়া, আমার সহিত পিতৃগৃহ ত্যাগ করেন। স্থিরও হইয়াছে তাই। আজ রাত্রিকালে, সংগোপনে আমরা মাণ্টুয়া নগরে প্রস্থান করিব। তাহার উপায়ও করিয়া রাখিয়াছি। তুমি আমার আন্তরিক বন্ধু; তোমাকে আমি প্রাণের সহিত বিশ্বাস করি। তোমাকে কোন কথা গোপন করিব না।"

এই বলিয়া রজ্জুনির্ম্মিত একটী সোপান তাঁহাকে দেখাইলেন। অতঃপর কহিলেন, "এই সোপানের সাহায্যে, নিশীথে, রাজকুমারী সিল্‌ভিয়া রাজপ্রাসাদের গুপ্তদ্বার দিয়া অবতরণ করিবেন। অতঃপর তাঁহাকে যথাস্থানে লইয়া যাইব।"

পাপিষ্ঠ বন্ধু প্রোতিয়াস্ আদ্যোপান্ত শুনিল, মুখে কৃত্রিম সহানুভূতি দেখাইয়া, অন্তরে বিষম বৈরিতা-সাধনের সঙ্কল্প করিল। ভ্যালেন্‌টাইন্ ঘুণাক্ষরেও প্রোতিয়াসের পাপ-অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন না। পাপিষ্ঠ প্রোতিয়াস এ বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক মিলান-রাজকে জ্ঞাপন করিতে সঙ্কল্প করিল।

পাপিষ্ঠের যে চিন্তা, সেই কাজ। যথাসময়ে সে, মিলানরাজ-সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং নানারূপ 'ভূমিকা' ফাঁদিয়া কৌশলপূর্ব্বক এরূপ বাক্‌ভঙ্গী দেখাইতে লাগিল যে, তাহা কেবল সয়তানেরই আয়ত্ত। প্রোতিয়াস্ কহিলেন, "মহারাজ! আজ আপনাকে যে বিষয় জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছি, বন্ধুতার অনুরোধে তাহা প্রকাশ করা অধর্ম্ম। কিন্তু এদিকে আপনি এ অধীনকে যেরূপ স্নেহ-অনুগ্রহ করেন, তাহাতে যদি আমি আদ্যোপান্ত জানিয়া-শুনিয়াও পূর্ব্ব হইতে আপনাকে সাবধান করিয়া না দিই, তাহা হইলে আমাতে ঘোর মহাপাতক স্পর্শিবে। আমি যার-পর-নাই অকৃতজ্ঞ ও মনুষ্য-সমাজে হেয় হইব। অতএব কেবল কৃতঘ্ন পাপ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য এবং আপনার উপকারার্থ আমাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে হইতেছে। নচেৎ আমার ইহাতে বিন্দুমাত্র স্বার্থ বা লাভ নাই।"

ইত্যাকার দীর্ঘ বক্তৃতা আওড়াইয়া সয়তান, ভ্যালেণ্টাইনের সর্ব্বনাশ সাধন করিল। রাজকুমারীর সহিত ভ্যালেণ্টাইনের অবৈধ প্রণয়ের আদ্যোপান্ত কাহিনী—যাহা সে বিশ্বস্ত সুহৃৎভাবে বন্ধুর নিকট শুনিয়াছিল,—মিলান-রাজের নিকট প্রকাশ করিল। অধিকন্তু ইহাও প্রকাশ করিল যে, ভ্যালেন্‌টাইন্ সেই রজ্জুনির্ম্মিত সোপান আপন পরিচ্ছদের মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়াছে।"

(১১)

কথা শুনিয়া মিলান্-রাজ একেবারে অবাক্ হইলেন। ভ্যালেন্‌টাইন্‌কে নিতান্ত বিশ্বাস-ঘাতক ও প্রোতিয়াস্‌কে অতি সজ্জন বিবেচনা করিলেন। বিবেচনা করিলেন, প্রোতিয়াস্ অতি সচ্চরিত্র;—অন্যায় কর্ম্মে বন্ধুর উপরোধও রক্ষা করে না। তিনি প্রোতিয়াস্‌কে যথেষ্ট সাধুবাদ প্রদান করিলেন। অধিকন্তু প্রতিশ্রুত হইলেন, ভ্যালেন্‌টাইনের এই গুপ্ত দুরভি-সন্ধির বিষয় কৌশলে উদ্‌ঘাটিত করিবেন,—প্রোতিয়াসের নামে বিন্দুবিসর্গ কলঙ্ক আরোপ বা তাহার নামও উল্লেখ করিবেন না। বলা বাহুল্য, পাপিষ্ঠ প্রোতিয়াস্ এইক্ষণ হইতে মিলান-রাজের অধিকতর প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাস-ভাজন হইল।

এদিকে মিলানরাজ সন্ধ্যাগমে ভ্যালেন্‌টাইনের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যথাকালে ভ্যালেন্‌টাইনও ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ মধ্যে কি-একটা বস্তু লুক্কায়িত আছে, বুঝা গেল। মিলান-রাজের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ঐ লুক্কায়িত বস্তু আর কিছু নহে,—রজ্জু-নির্ম্মিত সোপান।

ভ্যালেন্‌টাইন্‌কে তদবস্থায় দেখিয়া মিলান-রাজ জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে ভ্যালেণ্টাইন! অত তাড়াতাড়ী যাইতেছ কোথায়?"

ভ্যালেন্‌টাইন্ থতমত খাইয়া উপস্থিত বুদ্ধি-মত উত্তর করিলেন, "আজ্ঞে না, এমন কিছু নয়,—ওখানে আমার একজন লোক দাঁড়াইয়া আছে; তাহার নিকট আমার আত্মীয় স্বজন-গণকে কয়েকখানা চিঠী দিব, তাই যাইতেছি।"

এ মিথ্যা-কথা অধিকক্ষণ ছাপা রহিল না,—ইহার ফলও বড় ভাল হইল না। প্রোতিয়াস্ও একদিন আপন পিতার নিকট এইরূপ মিথ্যা কহিয়া সমুচিত শিক্ষা পাইয়াছিল।

মিলান-রাজ উত্তর করিলেন, "চিঠীগুলি কি বড় দরকারী ?"

আমৃতা আমৃতা করিয়া ভ্যালেণ্টাইন উত্তর করিল, "না," এমন কিছু নয়,—তবে মহা-রাজের আশ্রয়ে আমি পরম সুখে আছি, এই শুভসংবাদ আমার পিতার গোচরার্থ পাঠাইতেছি।"

মিলান-রাজ সুযোগ পাইলেন। কহিলেন, "তবে থাক্,—এখন তুমি আমার নিকট কিছু-ক্ষণ বসিতে পার। তোমাকে আমার কিছু দরকার আছে।"

এইবার সিয়ানে-সিয়ানে কোলাকুলী হইল, চতুরে-চতুরে চাল চলিতে লাগিল। মিলান-রাজ মনের মতলব সম্পূর্ণরূপে গোপন করিয়া কৌশলপূর্ব্বক এক "আষাঢ়ে গল্প" ফাঁদিলেন। সে গল্পে ভ্যালেণ্টাইনের সকল গলদ প্রকাশ হইয়া পড়িল। ক্রমেই সে সকল কথার আলোচনা করা যাইতেছে।

---

(১২)

মিলান-রাজ কহিলেন, "দেখ, আমি বড় বিরক্ত ও জ্বালাতন হইয়াছি। তোমার অবি-দিত নাই যে, আমার একমাত্র কন্যা সিল্‌ভিয়ার সহিত শ্রীমান্ থারিওর শুভ-পরিণয় কার্য্য সমাধা করিব, এই আমার সঙ্কল্প। কিন্তু গুণধরী কন্যাটি-আমার দিন দিন এমন অবাধ্য হইয়া উঠিতেছে যে, কিছুতেই আমার বশে থাকিতে চাহে না। আমাকে সম্মান বা ভয়ও করে না। তার যা মনে আসে, তাই করে। এই জন্য আমারও দিন দিন তার প্রতি স্নেহ-মমতার হ্রাস হইতেছে। মনে বড় আশা ছিল, আমার এই শেষ-দশায় সিল্‌ভিয়া সন্তা-নের কাজ করিবে; সকল রকমে আমার বাধ্য হইয়া চলিবে। কিন্তু আমার সে বড়-আশায় ছাই পড়িয়াছে। তাই সঙ্কল্প করিয়াছি যে, পুনরায় দার-পরিগ্রহ করিব। কন্যার প্রতি আমি আর লক্ষ্য রাখিব না। যে তাহার প্রণয়-প্রার্থী হইবে, সেই তাহাকে লইবে। আমার এই অতুল সম্পত্তি ও বিষয়-বিভব যখন সে গ্রাহ্যই করে না, তখন আমিও তাহাকে কিছু দিব না।—তাহার রূপই তাহার একমাত্র সম্বল হইবে।"

ভ্যালেন্‌টাইন্ নীরবে সকল কথা শুনিলেন। কোন তাৎপর্য্যই গ্রহণ করিতে পারিলেন না। বিস্মিতের ন্যায় উত্তর করিলেন, "তা আমাকে কি করিতে আদেশ করেন ?"

মিলানরাজ কহিলেন, "বলিতেছি। দেখ, আমি যে কুমারীর পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষ করিয়াছি, সেই কুমারী পরমা সুন্দরী ও অতি-শয় লজ্জাশীলা। তাই বোধ হয়, আমার এ বুড়াবয়সের নীরস কথাবার্ত্তা তাহার ভাল লাগে না। আর এ কথাও ঠিক যে, যুবা-বয়সে যেরূপ রঙ্গরসে ও প্রেমালাপে পটু ছিলাম, এখন আর তাহার কিছুই নাই। এখন তোমাকে আমার এই প্রেম-সাগরের কাণ্ডারী হইতে হইবে। তুমি আমাকে শিখাইয়া দাও, কিরূপে আমি সেই অনুপমা স্ত্রীরত্ন লাভ করিতে সমর্থ হই।"

ভ্যালেন্‌টাইন রাজার এ চতুরালী ভেদ করিতে পারিলেন না। সরল মনে নায়িকা-বশীকরণ মন্ত্র রাজাকে দিলেন। কহিলেন, "সর্ব্বদা সেই সুন্দরী সন্নিধানে গতিবিধি করুন; প্রণয়িনী প্রমদাকে ভাল ভাল সৌখীন দ্রব্য উপহার দিন;—এমন করিতে করিতেই কার্য্য-সিদ্ধি হইবে।"

মিলানরাজ একটী ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "ওহে, বলিতেছ বটে, কিন্তু ইতি-পূর্ব্বে আমি একটী প্রণয়-উপহার পাঠাইয়া-ছিলাম; সুন্দরী তাহা গ্রহণ করেন নাই।

আর এদিকে সেই মনোমোহিনীর পিতা এরূপ কড়াকড়ি নিয়মে কন্যাকে চোকে চোকে রাখেন যে, দিবাভাগে সুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই।"

"তা, নিশাযোগে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করুন না কেন?"

মিলানরাজ দেখিলেন, মাছে টোপ গিলিয়াছে, আর যায় কোথায়? ধাঁ করিয়া অমনি উত্তর করিলেন, "সে দুঃখের কথা আর বলিব কি, রাত্রিকালে সে প্রমদার দ্বার রুদ্ধ থাকে!"

দুর্ভাগ্যবশতঃ এইবার ভ্যালেন্‌টাইন্ আপনা হইতে ধরা পড়িলেন। কহিলেন, "তা আপনি এক কাজ করিতে পারেন,—আমি আপনাকে একটি রজ্জু-নির্ম্মিত সোপান সংগ্রহ করিয়া দিব, আপনি তৎসাহায্যে, অনায়াসে নিশাযোগে সেই সুন্দরীর শয়নকক্ষে উপনীত হইতে পারিবেন।"

অতঃপর আবার কহিলেন, "আর যদি সেই রজ্জুনির্ম্মিত সোপান গোপনে রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, আমি উপস্থিত যেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছি, এইরূপ পোষাক পরিয়া তন্মধ্যে অনায়াসে সেই সিঁড়ী লুকাইয়া রাখিতে পারেন। কেহই কোনরূপে জানিতে বা সন্দেহ করিতেও পারিবে না।"

"হাঁ, বটে! তবে দেখি, তোমার পোষাকটা একবার আমাকে দাও দেখি! গায়ে দিয়ে দেখি, মানাইয়া লইতে পারিব কিনা।"

এতক্ষণে রাজার মনস্কাম সিদ্ধ হইল। চতুরালীর জয় হইল।

বহুক্ষণ ধরিয়া, বহু ফিকির-ফন্দি খাটাইয়া মিলানরাজ যে আষাঢ়ে গল্প জমাইয়া আসিতেছিলেন, এতক্ষণে সে গল্পের উপসংহার হইল। ভ্যালেণ্টাইনের বস্ত্রমধ্যে প্রোতিয়াস্-কথিত সেই রজ্জুনির্ম্মিত সিঁড়ীটি দেখাই তাঁহার উদ্দেশ্য,—এতক্ষণে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।

রাজা ভ্যালেন্‌টাইনের অঙ্গ হইতে সেই পরিচ্ছদটী সম্পূর্ণরূপ উন্মুক্ত করিতে না-করিতে রজ্জুনির্ম্মিত সেই সিঁড়ী, অধিকন্তু সিল্‌ভিয়ার নামাঙ্কিত একখানি পত্রও দেখিতে পাইলেন। * তৎক্ষণাৎ পত্রখানি খুলিয়া পড়িলেন। সিল্‌ভিয়া যে উপায়ে ভ্যালেন্‌টাইনের সহিত পলাইয়া যাইবে, সেই পত্রে তদ্‌বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক লিখিত ছিল। এইবার মিলানরাজ নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ক্রোধে কম্পিত-কলেবর হইয়া গর্জ্জিয়া কহিলেন, "ওরে কৃতঘ্ন পিশাচ! তোকে আমি আপন আশ্রয়ে রাখিয়া যেরূপ স্নেহ-অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছি, এতদিনে তুই তার উপযুক্ত কাজ করিলি! আমার কুলে কালী দিয়া দশের নিকট আমার মাথা হেঁট করাইয়া, তুই কিনা আমার একমাত্র কন্যাকে ভুলাইয়া লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিস্? ভাগ্যে তোর দুষ্টবুদ্ধি ধরা পড়িল!—নচেৎ, তুই ত তাহাকে লইয়া পলাইয়াছিলি! যাই হোক, তুই এখনই, এই মুহূর্ত্তে এখান হইতে দূর হ'। তোর ও পাপমুখ আর আমি দেখিতে চাহি না।"

অতঃপর মিলানরাজ তৎক্ষণাৎ অনুচরগণকে ডাকাইয়া হতভাগ্য ভ্যালেন্‌টাইন্‌কে স্বরাজ্য হইতে চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত করিতে আদেশ দিলেন।

দুর্ভাগ্য ভ্যালেন্‌টাইন্, মুখস্-পরা বন্ধু প্রোতিয়াসের ষড়যন্ত্রে সেই নিশীথে, অসহায়ে, অতি ক্ষুণ্ণ মনে মিলান হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। যাইবার কালে, প্রাণাধিকা প্রমদা সিল্‌ভিয়া সুন্দরীকেও জন্মের মত একবার দেখিতে পাইলেন না!

---

* স্থানাভাবে এখানকার চিত্রটি পরপৃষ্ঠায় প্রকটিত হইল।

মিলানরাজ ও ভ্যালেন্‌টাইন।



(১৩)

বিশ্বাসঘাতক, মিত্রদোহী প্রোতিয়াস্ যৎকালে মিলান-নগরে ভ্যালেন্‌টাইনের সর্ব্বনাশ সাধন করিল, সে সময় তাহার পূর্ব্ব-প্রণয়িনী জুলিয়া ভেরোনা-নগরে বিরহ-ব্যাকুলা হন। সুন্দরী অনুক্ষণ নায়কের প্রেম-চিন্তায় বিভোর হইয়া পাগলিনীপ্রায় হইয়া উঠিলেন। শেষে আর কোনমতে ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া, ভেরোনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণবল্লভের অনুসন্ধানের জন্য, মিলান্‌নগরে যাত্রা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। পথে বিপদ্ হইতে উদ্ধারের জন্য পরিচারিকা লুসেটাকে সঙ্গে লইলেন এবং উভয়ে পুরুষের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ছদ্মবেশে গন্তব্য স্থানে পঁহুছিলেন। তাঁহাদের পঁহুছিবার কিছু পূর্ব্বে, হতভাগ্য ভ্যালেন্‌টাইন্; প্রোতিয়াসের বিশ্বাসঘাতকতায় মিলান হইতে নির্ব্বাসিত হন।

মিলান নগরে উত্তীর্ণ হইয়া জুলিয়া ও তৎকিঙ্করী এক গৃহস্থের বাটীতে অতিথি হন। গৃহস্থও পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। প্রণয়ি-চিন্তায় জুলিয়া অস্থির;—একটু মাত্র বিশ্রাম করিয়া, তিনি সেই গৃহস্বামীর সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। একে একে নানা কথাই পাড়িলেন। কথায় কথায় যদি কোনরকমে প্রোতিয়াসের কোন খবর পান।

গৃহস্বামী জুলিয়াকে তরুণবয়স্ক ও সুপুরুষ দেখিয়া তাঁহাকে সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভব মনে করিলেন। তিনি নিজেও বড় সদাশয় লোক;—

জুলিয়ার সহিত খুব মিলিয়া-মিশিয়াই কথা কহিতে লাগিলেন। ছদ্মবেশী যুবককে একান্ত বিষণ্ণ দেখিয়া তাহার চিত্তরঞ্জনার্থ কহিলেন, "দেখ, আজ রাত্রে এখানে এক জায়গায় গান-বাজনা হইবে,—কোন প্রণয়ী তাঁহার প্রণয়িনীর মনোরঞ্জনার্থ গমন করিবেন, আমরাও তথায় যাইব; কেমন?"

জুলিয়ার এরূপ বিষাদিত হইবার কারণ এই,—তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "হয় ত বা বাটী হইতে এমন অবস্থায় আসিয়া প্রাণবল্লভের নিকট অপরাধিনী হইলাম। তাঁহার মন যদিও খুব উদার এবং প্রকৃতিও অতি সৎ, তথাপি কি জানি, যদি তিনি আমার এরূপ ব্যবহারে রুষ্ট হন ও আমাকে হেয় জ্ঞান করেন?"

গৃহস্বামীর এ প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইলেন, আহ্লাদিতও হইলেন। ভাবিলেন, "চাই কি, পথিমধ্যে প্রাণেশ্বরের সাক্ষাৎকারও ঘটিতে পারে।"

(১৪৹)

যথাসময়ে তাঁহারা সেই সংগীত-সভায় গমন করিলেন। এখানে আসিয়া কিন্তু জুলিয়ার বিষণ্ণভাব আরও বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। জুলিয়া দেখিলেন, প্রণয়িনীর মান-সাধনায় যে ব্যক্তি বিবিধ উপায়ে প্রেমসংগীত-রসালাপে নিমগ্ন, তিনি আর কেহ নন, স্বয়ং প্রোতিয়াস্;—জুলিয়ারই হৃদয়-সর্ব্বস্ব।

ফল বিপরীত হইল। কোথায় চিত্ত-বিনোদন জন্য জুলিয়া এখানে আসিলেন, না, মন আরও খারাপ হইয়া গেল। অধিকন্ত জুলিয়া আরও শুনিলেন, রাজকুমারী সিল্‌ভিয়া গবাক্ষদ্বারে বসিয়া অতি কটুবাক্যে প্রোতিয়াস্‌কে ভর্ৎসনা করিতেছেন। সে সব কথা শুনিয়া কোমলপ্রাণা জুলিয়ার বুকে বড় ব্যথা লাগিল। রাজকুমারী প্রোতিয়াসকে বলিতে-ছেন,—"তোর্ মত অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতক আমি আর দ্বিতীয় দেখি নাই। তুই না ইতি-পূর্ব্বে একজন অবলাকে মজাইয়াছিস্! আহা, সে অভাগিনীকে আশা দিয়া, এখন তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছিস্! আবার তোর্ অন্য রমণীর সাধ! তোর্ লজ্জা নাই;—ভাবিয়া দেখ্ দেখি, তুই তোর্ প্রিয়বন্ধু ভ্যালেন্‌টাইনের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিস্!"

ক্রোধে ও ঘৃণায় রাজকুমারী তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তিনি কি বলিয়া এই পাপিষ্ঠের সহিত প্রেমালাপ করিবেন? তাহারই কৃতঘ্নতায় ত ভ্যালেন্‌টাইন আজ নির্ব্বাসিত। সিল্‌ভিয়া কি এমন নরাধমকে ভাল বাসিতে পারেন? জুলিয়া সব দেখিলেন, সব শুনিলেন। প্রণয়ে নিরাশ হইয়াও একেবারে প্রোতিয়াসের আশা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তখনও তাঁহার অন্তরে প্রেমের-ছবি জাগিতে লাগিল।

এই সময়ে প্রোতিয়াস্ একজন পরিচারককে বিদায় দিয়াছিলেন। জুলিয়া এ সংবাদ পাইলেন। মনে মনে কি ভাবিয়া সেই গৃহস্বামীর সাহায্যে প্রোতিয়াসের পরিচারকের পদ পাইবার বাসনা জানাইলেন। প্রোতিয়াস্ ছদ্মবেশী জুলিয়াকে চিনিতে পারিলেন না;—গৃহস্বামীর অনুরোধে, জুলিয়াকে 'ছোক্‌রা চাকর' নিযুক্ত করিলেন; জুলিয়াও বিধিমতে মনিবের মন যোগাইতে লাগিল। প্রোতিয়াস্ তাহার হস্তে প্রেমময়ী সিল্‌ভিয়াকে একখানি প্রেম-পত্র দিলেন। অধিকন্ত, ভেরোনা হইতে বিদায়-কালীন জুলিয়া তাঁহাকে যে স্মৃতি-অঙ্গুরী দিয়াছিলেন, সেই সাধের অঙ্গুরিটীও পত্রের সহিত পাঠাইয়া দিলেন।

---

(১৫)

ছদ্মবেশী জুলিয়া সিবাষ্টিয়ান্ নাম ধারণ করিল। সিবাষ্টিয়ান্ প্রভুর প্রণয়-উপহার

লইয়া রাজকুমারী সিল্‌ভিয়া-সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, সিল্‌ভিয়া তাহা আদৌ গ্রহণ করিলেন না, ঘৃণাভরে ফিরাইয়া দিলেন। এ দৃশ্যে জুলিয়া অবশ্য সন্তুষ্টই হইল। অধিকন্তু সিল্‌ভিয়ার সহিত একযোগে প্রোতিয়াসের নানারূপ নিন্দা করিতে লাগিল। তারপর কথায় কথায় প্রকারান্তরে আপনার কথা পাড়িল। বলিল, প্রোতিয়াসের প্রথম প্রণয়িনী জুলিয়াকে সে চিনে। সে সরলা কুলবালাকে প্রোতিয়াস্ যেরূপে প্রেম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে, প্রেমময়ী জুলিয়াও তাঁহাকে যেরূপ প্রাণান্তপণে ভালবাসেন, একে একে সে সমস্ত কথা বলিল। এখন সে অভাগিনী প্রোতিয়াসের ব্যবহারে কি দশায় দিনযাপন করিতেছে, সে কথাও বলিল। তারপর জুলিয়ার রূপগুণের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কহিল, "যদিও তিনি এখন ছদ্মবেশে বেড়াইতেছেন, তথাপি তাঁহার রূপের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। সেই রমণীকে ঠিক আমারই মত দেখিতে। আমার ন্যায় তাঁহার বর্ণ, আমার ন্যায় তাঁহার মুখ, চোক, কেশ ও সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ; বয়সও তাঁহার আমার সমান।" সিল্‌ভিয়া বুঝিলেন, জুলিয়া অনুপমা সুন্দরী। কারণ, প্রোতিয়াসের যে ছোক্‌রা-চাকর তাঁহার পরিচয় দিতেছে, তাহাকে দেখিতে অতি সুন্দর। স্নেহময়ী রাজবালা, জুলিয়ার দুঃখে গলিয়া গেলেন। ভাবিলেন, এমন অনুপমা স্ত্রী-রত্নকেও প্রোতিয়াস্ কষ্ট দিতেছে! অতঃপর স্নেহমাখাস্বরে ছদ্মবেশিনীকে কহিলেন, "দেখ, কি লজ্জা! প্রোতিয়াস্ কতবার আমাকে বলিয়াছে যে, তাহার পূর্ব্ব প্রণয়িনী জুলিয়া তাহাকে একটী প্রেম-অঙ্গুরী দিয়াছে। এখন কোন্ মুখে, কি বলিয়া, সতীর সেই পবিত্র স্মৃতি আমাকে উপহার পাঠাইয়াছে! যাই হৌক, আমি ঐ অঙ্গুরী স্পর্শও করিব না। বালক! তুমিও আমার স্নেহের পাত্র। কারণ তোমার হৃদয়ে দয়া আছে।—তুমিও সেই দুঃখিনী রমণীর দুঃখে সহানুভূতি করিতেছ! জুলিয়াকে যে তুমি এত ভালবাস, তাহার পুরস্কার স্বরূপ তোমাকে কিছু টাকা দিতেছি, গ্রহণ কর।"

প্রণয়াস্পদ, যে রমণী-প্রেমের ভিখারী, সেই রমণীর এমন সদয় ব্যবহার দেখিয়া জুলিয়া যার-পর-নাই আনন্দিত হইলেন। তাঁহার নিরাশ-হৃদয়ে আবার আশার সঞ্চার হইল।

(১৬)

এদিকে ভ্যালেন্‌টাইন্ মিলান হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত ও হীন বিবেচনা করিলেন। পিতৃগৃহে ফিরিতে তাঁহার আর ইচ্ছা হইল না। কোন্ মুখে দেশে ফিরিয়া সকলের সহিত বাক্যালাপ করিবেন? বিষাদিত মনে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি মিলানের সন্নিকটস্থ এক নির্জ্জন অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় অকস্মাৎ এক দল দস্যু তাঁহাকে আক্রমণ করিল এবং তাঁহার নিকট ধন-রত্ন কি আছে চাহিল।

ভ্যালেন্‌টাইন্ আপনার উপস্থিত দুরবস্থা তাহাদিগকে জ্ঞাপন করিলেন। অধিকন্তু কহিলেন, "এক পরিধান বস্ত্র ছাড়া আমার নিকট আর কিছু নাই।"

দস্যুদল দেখিল, লোকটী সত্য সত্যই দুর্দ্দশাপন্ন। ভ্যালেন্‌টাইন্‌কে দেখিয়া ও তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাহাদের অন্তরে দয়ার উদয় হইল। বুঝিল, লোকটী নিশ্চয়ই সম্ভ্রান্তবংশীয় কোন ভদ্রলোক। তাহারা ভ্যালেন্‌টাইনকে প্রস্তাব করিল, যদি তিনি তাহাদের দলভুক্ত হইয়া অধিনায়কের পদ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার উপস্থিত বিপদ দূর হয়; দস্যুদলও অবনতমস্তকে তাঁহার আদেশ পালন

করেন। অন্যথায়, তাহারা তাঁহাকে প্রাণে মারিবে।

নির্ভীক ভ্যালেন্‌টাইন্ এ কথায় উত্তর করিলেন, "আমি আমার নিজের জন্য কিছু ভাবি না;—তবে আমি তোমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি, যদি তোমরা প্রতিজ্ঞা কর, অবলা ও নিঃসহায় পথিকের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিতে পারিবে না।"

দস্যুদল তাহাতে সম্মত হইল। সদাশয় ভ্যালেন্‌টাইন্ দস্যুদলে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের অধিনায়ক হইলেন এবং আপন উচ্চ লক্ষ্যে স্থিরদৃষ্টি রাখিলেন।

এখানে আর এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। প্রেমময়ী সিল্‌ভিয়াকে তিনি এই অরণ্যে দেখিতে পাইলেন। ক্রমেই সে সকল কথার আলোচনা করা যাইতেছে।

---

(১৭)

এদিকে রাজকুমারী সিল্‌ভিয়া, প্রতিনিয়ত জনককর্ত্তৃক থারিওকে পরিণয় করিতে অনুরুদ্ধ হইতে লাগিলেন। অনেক চেষ্টায়ও তিনি পিতার এ সঙ্কল্প হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। শেষে অনন্যোপায় হইয়া, ভ্যালেন্‌টাইন-সন্নিধানে মাণ্টুয়া নগরে যাইতে মনঃস্থ করিলেন। কিন্তু সুন্দরীর ভুল ধারণা ছিল। ভ্যালেন্‌টাইন্ ত এখন মাণ্টুয়ায় নাই, তিনি যে এখন দস্যুদলের অধিপতি হইয়া অরণ্যবাসী! যাই হউক, রাজকুমারী প্রাণবল্লভের উদ্দেশে একদিন গোপনে বাটী হইতে বাহির হইলেন। পথে কোন বিপদ ঘটে, এই আশঙ্কায় এগ্‌লামোর নামক জনৈক সদাশয় বৃদ্ধকে সঙ্গে লইলেন। উভয়ে নির্ব্বিঘ্নে রাজপথ অতিক্রম করিয়া ক্রমে আরণ্য-পথে উপনীত হইলেন। সেই অরণ্যেই ভ্যালেন্‌টাইন্ সদলবলে বাস করিতেন। উভয়ে সেই বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র একজন দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। বেগতিক দেখিয়া, রক্ষক এগ্‌লামোর সিল্‌ভিয়াকে ফেলিয়া, পলাইয়া আত্মপ্রাণ রক্ষা করিল।

দস্যুহস্তে পতিতা দেখিয়া ও আপনাকে সম্পূর্ণরূপে নিঃসহায়া জানিয়া, সিল্‌ভিয়া যার-পর-নাই ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইলেন। দস্যু তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া কহিল, "সুন্দরি! তোমার কোন ভয় নাই; তুমি আমার সঙ্গে আইস। আমাদের দলপতি বড় সজ্জন ও দয়াশীল। বিশেষ অসহায়া অবলার প্রতি তাঁহার বড় দয়া।"

কিন্তু এ কথায় সিল্‌ভিয়া আশ্বস্তা হইতে পারিলেন না। সকাতরে, ভয়-ব্যাকুলকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হা প্রাণাধিক ভ্যালেন্‌টাইন্! এ বিপদে তুমি কোথায়? এ সময় একবার আসিয়া দেখিয়া যাও, তোমার জন্য অভাগিনী সিল্‌ভিয়ার আজ কি দশা!"

---

(১৮)

এই সময় আর এক আকস্মিক ঘটনা ঘটিল। দস্যু, সিল্‌ভিয়াকে প্রভু-সন্নিধানে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় প্রোতিয়াস্ কোথা হইতে সহসা তথায় উপস্থিত হইল এবং অবিলম্বে প্রভূত বলবিক্রমে দস্যুহস্ত হইতে সিল্‌ভিয়াকে উদ্ধার করিল।

প্রোতিয়াস্ যেদিন শুনিল, রাজকুমারী গৃহত্যাগিনী হইয়াছেন, সেইদিনই ছদ্মবেশিনী জুলিয়াকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। বনপথে সিল্‌ভিয়ার পদ-চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া তিনি চলিতে লাগিলেন। হঠাৎ স্ত্রীলোকের কাতর-কণ্ঠস্বর শুনিয়া তিনি এই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। প্রোতিয়াসের প্রতি সিল্‌ভিয়ার আন্তরিক ঘৃণা থাকিলেও এ সময় সিল্‌ভিয়া তাহা ভুলিয়া গেলেন।—উপকারককে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতে

যাইতেছেন, এমন সময় প্রেমোন্মাদ প্রোতিয়াস্ আবেগভরে কহিলেন, "সুন্দরি! তবে আর কি! এইবার অধীনের মনঃসাধ পূর্ণ কর!"

এইবার জুলিয়ার অন্তরে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অভাগিনী ভাবিল, "দয়াবতী রাজকুমারী হয় ত উপস্থিত উপকারে, কৃতজ্ঞ-চিত্তে, বাধ্য হইয়া, প্রোতিয়াসের বাসনা পূর্ণ করিবেন।"

কিন্তু জুলিয়ার এ ধারণা অমূলক। রাজকুমারী প্রোতিয়াসের উপকারে বাধ্য বটে, কিন্তু তাহার প্রস্তাব শুনিয়া তিনি মনে মনে বিরক্তই হইতেছিলেন। এই সময়ে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল যে, ভ্যালেন্‌টাইন তথায় আবির্ভূত হইয়াছেন! বলা বাহুল্য, যে দস্যু প্রথমে সিল্‌ভিয়াকে প্রথম দেখিতে পায়, সেই গিয়া ভ্যালেন্‌টাইনকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করে।

(১৯)

যৎকালে প্রোতিয়াস্, সিল্‌ভিয়ার প্রণয়-যাচ্ঞা করিতেছিল, ঠিক সেই সময় ভ্যালেন্‌টাইন্ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। এবার প্রোতিয়াসের আর লজ্জার অবধি রহিল না। আপনার কৃত ভ্যালেন্‌টাইনের প্রতি সেই পশুতুল্য ব্যবহার সকল মনে পড়িতে লাগিল। ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে, লজ্জায়, ঘৃণায় সে মরিয়া যাইতে লাগিল। সদুঃখে কাতরবচনে ভ্যালেন্‌টাইনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ভ্যালেন্‌টাইন্ অতি উদার-প্রকৃতি ও মহৎ-হৃদয়। তিনি যে শুধু পিশাচ-বন্ধুকে ক্ষমা করিলেন, এমত নহে,—মুক্তকণ্ঠে কহিলেন, "প্রোতিয়াস্, তোমাকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিতেছি এবং অকপটে বলিতেছি, প্রেমময়ী সিল্‌ভিয়াকে তোমার হস্তে দিলাম!"

জুলিয়ার আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। এত রকমে শত্রুতা-সাধনসত্ত্বেও ভ্যালেন্‌টাইনের হৃদয়ের মহত্ত্ব অবিচলিত দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন। কিন্তু প্রোতিয়াস বন্ধুর এ অপার্থিব আত্মত্যাগে, হয় ত সিল্‌ভিয়াকে প্রণয়িনীরূপে গ্রহণ করিবেন, এই ভাবিয়া জুলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সকলে তাঁহার শুশ্রূষায় তৎপর হইল। এই ঘটনায় সিল্‌ভিয়া অনেকটা আশ্বস্তা হইলেন। তিনি ভাবিতে ছিলেন, "প্রোতিয়াসের প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে সে সব করিতে পারে। যদি সে প্রিয়তম ভ্যালেনটাইনের প্রস্তাবে সম্মত হয়, তবে ত আমি মরিলাম।"

জুলিয়া চেতন প্রাপ্ত হইলেন। সিল্‌ভিয়াকে কহিলেন, "দেখুন, আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম; আমার প্রভু আপনাকে একটী অঙ্গুরী উপহার দিয়াছিলেন।"

প্রোতিয়াস্‌ও এবার অতিশয় বিস্মিত হইল। মনে মনে কহিল, "আমি বহু পূর্ব্বে জুলিয়াকে যে অঙ্গুরী উপহার দিয়াছিলাম, এ যে সেই অঙ্গুরী দেখিতেছি। সিল্‌ভিয়াকে-ত আমি এ অঙ্গুরী দিই নাই!"

প্রকাশ্যে পরিচারককে কহিলেন, "তুমি এ অঙ্গুরী কোথায় পাইলে? ইহা যে জুলিয়ার অঙ্গুরী!"

ছদ্মবেশিনীও মনের হাসি মুখে চাপিয়া উত্তর করিলেন, "জুলিয়া নিজে এখানে আসিয়া আমাকে এই অঙ্গুরীয় দিয়া গিয়াছেন!"

এইবার কি ভাবিয়া প্রোতিয়াস্ নির্ণিমেষ-নয়নে, অবাক্ হইয়া জুলিয়াকে দেখিতে লাগিলেন। নিশ্চয় বুঝিলেন, পরিচারক সিবাষ্টাইনই প্রেমময়ী জুলিয়া। তিনি যার-পর-নাই লজ্জিত হইলেন। সকাতরে ও সলজ্জ অন্তরে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া জুলিয়াকে কহিলেন, "প্রেমময়ি! আমি তোমারই। এ অধীনকে নিজগুণে মার্জ্জনা কর।"

"প্রাণেশ্বর! প্রাণেশ্বর!" বলিতে বলিতে জুলিয়ার বাক্‌রোধ হইল। তাঁহার চক্ষে আনন্দাশ্রু পড়িতে লাগিল। তিনি নির্ব্বিকার চিত্তে স্বামীর হস্ত গ্রহণ করিলেন। এবার প্রোতিয়াস্ কহিলেন, "বন্ধু ভ্যালেন্‌টাইন্, এইবার আমার অনুরোধে তুমি সিল্‌ভিয়া-সুন্দরীকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর। এই অনুপমা স্ত্রীরত্ন তোমারই যোগ্য।"

ভ্যালেন্‌টাইনও প্রোতিয়াসের কথা রক্ষা করিলেন। তখন দুই বন্ধুতে প্রীতিভরে মনোমত পত্নী লাভ করিয়া সুখ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

(২০

এমন সময় আর এক বিভ্রাট ঘটিল,—স্বয়ং মিলানরাজ ও থারিও লোকজন সমভিব্যাহারে সিল্‌ভিয়াকে খুঁজিতে খুঁজিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। ভ্যালেন্‌টাইনের পার্শ্বে সিল্‌ভিয়াকে দেখিয়া থারিও আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন, মুক্তকণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন, "সিল্‌ভিয়া আমার সহধর্ম্মিণী।"

এ পরুষবাক্যে ভ্যালেন্‌টাইন্‌ও বিলক্ষণরূপ উত্তেজিত হইয়া উত্তর করিলেন, "থারিও, যদি প্রাণের মমতা থাকে, পুনরায় ও পাপ-কথা মুখে আনিও না। যদি ভাল চাও, এখনই এখান হইতে প্রস্থান কর। সিল্‌ভিয়া আমার সহধর্ম্মিণী,—এই আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন, আমি জীবিত থাকিতে, কা'র সাধ্য ইহাঁর কেশ স্পর্শ করে?'

ভ্যালেন্‌টাইনের তেজময়ী বাক্যে ভীরু থারিও থতমত খাইল। আমৃতা আমৃতা করিয়া কহিল, "হাঁ, যে আমাকে চায় না, সে চপলা রমণীর জন্য বিবাদ করা মূর্খের কার্য্য!"

উন্নতহৃদয় তেজস্বী মিলান-রাজ থারিওর এই অপৌরুষেয় ব্যবহার দেখিয়া ঘৃণাভরে কহিলেন, "আঃ ভীরু! আঃ অধম! তুই এই সামান্য কার্য্যে পশ্চাৎপদ হইলি! ধিক্ তোকে!"

অতঃপর ভ্যালেন্‌টাইনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "প্রিয় ভ্যালেন্‌টাইন্! তোমার সাহসিকতায় আমি চমৎকৃত হইয়াছি। এইরূপ বীরপুরুষই রাজকন্যার প্রণয়ের যোগ্য। আমি এখন সর্ব্বান্তঃকরণে বলিতেছি, তুমিই সিল্‌ভিয়াকে গ্রহণ কর। কারণ এখন বুঝিলাম, তুমিই সর্ব্বাংশে আমার কন্যার স্বামীর উপযুক্ত!"

ভ্যালেন্‌টাইন্ নতজানু হইয়া মিলান-রাজের হস্তচুম্বন করিলেন এবং সকৃতজ্ঞ-চিত্তে তাঁহার স্নেহাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর তিনি অরণ্যস্থ সেই সমস্ত দস্যুগণের অপরাধ মার্জ্জনা করিতে মিলান রাজকে অনুরোধ করিলেন। কহিলেন, "মহারাজ, ইহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিতে আজ্ঞা হয়। কেবল সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ইহারা আমারই মত নির্ব্বাসিত হইয়াছে। ইহাদিগকে মার্জ্জনা করিলে, পুনরায় লোকসমাজে মিশিয়া ইহাদের রীতি-প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে।"

মিলানরাজ, ভ্যালেন্‌টাইন্‌কে কৃপাচক্ষে দেখিয়াছেন। অধিকন্তু তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্য ও সাহসের ভূয়সী প্রশংসা শুনিয়াছেন। সেই ভ্যালেন্‌টাইন্ যখন দস্যুগণকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিতেছেন, তখন মিলানরাজও সাহ্লাদে, সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদিগকে মার্জ্জনা করিলেন। দস্যুদলও রাজপ্রসাদ লাভ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইল। চারিদিক যেন সুখে নৃত্য করিতে লাগিল। কেবল প্রোতিয়াস্ লজ্জায় ও আত্মগ্লানি-অনুতাপে মরমে মরিয়া গেলেন। কারণ মিলান-রাজ সেই দশের মাঝে তাহার কৃত্রিম-প্রণয় ও

বন্ধুর প্রতি ঘোর বিশ্বাসঘাতকতার আদ্যোপান্ত কাহিনী প্রকটিত করিলেন।

প্রোতিয়াসুও নৃপতির নিকট মার্জ্জনা চাহিলেন। মিলান-রাজ ভাবিলেন, এই আত্মগ্লানিতেই তাহার যথেষ্ট দণ্ড হইয়াছে। অনন্তর নব দম্পতি-চতুষ্টয়কে সঙ্গে লইয়া মহানুভব মিলান-রাজ স্বরাজ্যে উপনীত হইলেন এবং অবিলম্বে মহাসমারোহে ও অতুল আনন্দোৎসবে তাঁহাদের শুভ-পরিণয়-ক্রিয়া সমাধা করিলেন।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

বিহার।

"বিহারো ভ্রমণে স্কন্ধে লীলায়াং সুগতলয়ে।"
মেদিনী।

মগধ এবং অঙ্গদেশের কিয়দংশ এখন বিহার নামে অভিহিত। বিহার শব্দে বুদ্ধ-মন্দির,—বৌদ্ধগণের উপাসনাস্থান। মগধদেশ বুদ্ধদেবের জন্মভূমি, মগধদেশ বৌদ্ধধর্ম্মের আদি মাতা এবং ভারতবর্ষের মধ্যে মগধরাজ্য বৌদ্ধধর্ম্মের চরম উৎকর্ষস্থান। এইজন্য মগধ ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ, বৌদ্ধ-অধিকার কালে বিহার অর্থাৎ বুদ্ধমন্দির এই নামে উৎপ্রেক্ষিত হয়। তদবধি বিহার নাম প্রচলিত।

বিহার নামের এই এক কারণ হইতে পারে। নির্ণীত অপর কারণটী এই—পাটলিপুত্র বা পুষ্পপুর গঙ্গাগর্ভে প্রবিষ্ট হইলে, পঞ্চানী-নদী-পরিবেষ্টিত একটী নগর অতীব সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। বৌদ্ধ-অধিকার কালেই পাটলিপুত্রের পতন এবং দ্বিতীয় রাজধানীর অভ্যুদয় হয়। বৌদ্ধরাজের ইচ্ছানুসারে এই দ্বিতীয় নগর বা নূতন রাজধানীর নাম হইল বিহার। এই সব প্রদেশ মুসলমান-রাজগণের হস্তে পতিত হইবার সময়ে এবং পরেও অনেক দিন বিহার নগরই রাজধানী ছিল।

প্রধান নগরের নামানুসারে দেশের নামকরণ বা বিভাগ হইয়া থাকে; ইহা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। এখন যেমন দেখা যায়, হুগলী, বর্দ্ধমান, ঢাকা ইত্যাদি। এক একটী বড় বড় সহরের নামে বিভাগ বা প্রদেশের সংজ্ঞা হইয়াছে। সেইরূপ মগধাদি প্রদেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান নগরী বিহারের নামে, সমগ্র দেশ বিহার-আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। মুসলমানের সময়ে 'সুবে বিহার' সুপ্রসিদ্ধ ছিল।

মগধদেশ প্রভৃতি জনপদের বিহার নাম হইবার ইহাই সমীচীন কারণ বলিয়া আমার বিশ্বাস। বিহারের অপভ্রংশ নাম বেহার।

আমরা এই প্রবন্ধে সেই বিহার নগরের কথা—স্বয়ং দেখিয়া ও তথায় অনুসন্ধানাদি করিয়া যাহা জানিয়াছি, তাহা পাঠকগণকে বিদিত করিতেছি;—

পাটনা ষ্টেশনের পূর্ব্ব চতুর্থ ষ্টেশন বক্তিয়ারপুর। হাবড়া হইতে বক্তিয়ারপুরের ভাড়া ৪৲ টাকা। বক্তিয়ারপুর যে পাটনার পূর্ব্বে এ, কথা আমি রেলওয়ে-তালিকা অনুসারে কীর্ত্তন করিলাম। পাটনা বাঁকিপুর হইতে ট্রেণে বক্তিয়ারপুর ষ্টেশনে যখন আসিলাম, তখন বেলা কিঞ্চদধিক সাড়ে ছয়টা। চৈত্র মাস। সূর্য্যের কিরণ চতুর্দ্দিকে পরিক্ষিপ্ত। কিরণাবলীর আরক্ত আভা অপসারিত হইয়াছে। দ্রুত-সুবর্ণ-সুষমা নভোমণ্ডল, পৃথিবী দিগ্দিগন্ত ও রশ্মিমালাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছে। গলিত-রজতের অপ্রগাঢ় অস্পষ্ট ছায়া, তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে।

পৃথিবী হাস্যময়ী। কিন্তু "একি!" মহাবিস্ময়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তর্ক বিতর্ক, বিচার নির্ণয়, সংশয়সিদ্ধান্ত নিমিষের মধ্যে সবই হইয়া গেল।

চতুর্দ্দিকে রৌদ্র, কিন্তু পূর্ব্বগগনে চাহিয়া দেখি, সূর্য্য নাই। তৎক্ষণাৎ মনে বিস্ময়ের উদয় হইতে হইতেই সূর্য্যানুসন্ধান-পরায়ণ চপল চক্ষু দক্ষিণ গগনে নিপতিত হইয়াই প্রতিনিবৃত্ত হইল। তথায় স্থির থাকিতে সমর্থ হইল না। প্রভাকরের সর্ব্বাতিশায়ি-প্রভাময় মহামণ্ডল, এই দিকেই অবস্থিত ছিল। তখন মনে মনে বিবিধ বিচার বিতর্ক ও সংশয়ের আবির্ভাব হইল। ভাবিলাম, দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে; কিন্তু কাহার,—আমার না সূর্য্যের?

ইতিপূর্ব্বে নৈহাটী ষ্টেশনে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের ভাড়ানিরূপণ-তালিকায় দেখিয়াছিলাম, নৈহাটীর পূর্ব্ব হুগলি, চন্দন নগর—হাওড়া।—তথ্যানুসন্ধায়ী সত্যবাদী ইংরেজজাতীয় রেলওয়ে কোম্পানি বলিতেছেন, হুগলি হইতে হাওড়া পর্য্যন্ত স্থান নৈহাটীর পূর্ব্ব! আমার তখন বড়ই গোলযোগ বোধ হয়, দক্ষিণবাহিনী ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে নৈহাটী ও পশ্চিম পারে হুগলি এবং নৈহাটীর ১২ ক্রোশ দক্ষিণ হাওড়া বা কলিকাতা, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ ও সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। হৃদয়ে সেই সংস্কারই সুদৃঢ়, কিন্তু রাজার জাতি তাহার বিরুদ্ধ কথা বলিতেছেন, কাজেই মনে বড় ধাঁধা লাগিয়াছিল।

তারপর কোন রকমে ধাঁধা কাটিল বটে, আমার সংস্কারেরই জয় হইল বটে; কিন্তু আজ আবার সূর্য্যদেবকে দক্ষিণে উদিত দেখিয়া সেই পুরাণ মনের ধন্ধ জাগিয়া উঠিল; রেলওয়ে কোম্পানি পশ্চিমকে পূর্ব্ব বলিয়াছেন, দক্ষিণকেও পূর্ব্ব বলিয়াছেন, আজ দেখিতেছি, সূর্য্যও প্রকারান্তরে দক্ষিণকে পূর্ব্ব বলিতেছেন বা বলাইতেছেন; যে দিকে প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা-বা রাজজাতি, সেই দিকেই দুর্ব্বল দেবতা। আমার কাছে কোম্পানির মান বজায় করিতে সূর্য্য দেবও দেখিতেছি শশব্যস্ত। অথবা সূর্য্য দেব কোম্পানির কথাতেই আপনার সংস্কার ত্যাগ করিয়াছেন,—তিনি চিরদিনের ভ্রম বুঝিয়া সাবেক পূর্ব্বদিক্ ত্যাগ করিয়া কোম্পানিসম্মত পূর্ব্ব—সে-কেলে দক্ষিণ দিকে উদিত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন; আমি মূঢ়, আমার সংস্কার পূর্ব্ব হইতে ত্যাগ করিতে পারিলে আজ আর এ বিভ্রাট আমাকে ভুগিতে হইত না। যাহা হউক, এখনও আমার সংশয় রহিল; 'দিগ্‌ভ্রম, আমার না সূর্য্যের?' শেষে অনেক বিচার বিতর্ক করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, সূর্য্যেরই জয়, আমার পরাজয়'।

আমার দক্ষিণকে আমি পূর্ব্ব করিয়া লইলাম। আমার পশ্চিমকে দক্ষিণ করিয়া লইলাম।

বক্তিয়ারপুর হইতে বিহার ৯ ক্রোশ দক্ষিণ।

মেলকাট নামক এক প্রকার অশ্বযান প্রত্যহ ৮।১০ খানি বক্তিয়ারপুর হইতে বিহার পর্য্যন্ত গতায়াত করে। ভাড়া প্রত্যেক ব্যক্তির ১৲ টাকা করিয়া। এক এক গাড়ীতে ছয় জন যাইতে পারে। সকালে বেলা ৮ টা পর্য্যন্ত ও বৈকালে ৪।৫ টার সময় বক্তিয়ারপুর হইতে মেলকাট ছাড়িবার নিয়ম। বেলা ১১টা হইতে ৩.৭টার সময় পর্য্যন্ত বিহার হইতে মেলকাট ছাড়িবার নিয়ম। পথে চার যায়গায় অশ্বপরিবর্ত্তন হয়।

ব্যক্তিয়ারপুর হইতে মেলকাটে বিহার পৌঁছিতে ৩ ঘণ্টা লাগে।

বেলা ৮ টার সময়ে মেলকাটে আরোহণ করিয়া ১১টার সময় আমরা বিহারে উপনীত হই।

মোহানা প্রভৃতি ৩।৪টী সেতুবদ্ধ শুষ্ক, অর্দ্ধশুষ্ক ক্ষুদ্রনদী ও খাল অতিক্রম করিলাম, পথি-পার্শ্বস্থ ঊর্ণাজাল-সমাবৃত মনসা ফণিমনসা প্রভৃতি ক্ষুদ্র কণ্টক-গুচ্ছ ও দূরবিস্তৃত তৃণহীন প্রান্তর দর্শন করিতে করিতে সেই নির্জ্জন রাজমার্গ নিঃশব্দে অতিবাহিত করিতে লাগিলাম

বেলা ১০।৷০ টার সময় মরীচিকামগ্ন মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে বিভূষিত বিহারের পশ্চিম পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র শৈল অস্পষ্টনীল মেঘমালার ন্যায়, ধূমাভ্যন্তরস্থ শ্রেণীবদ্ধ তাল-হিন্তাল-গুবাক-দেবদারু প্রভৃতি তরুরাজির ন্যায় আমার নয়নগোচর হইল। বিহার যে এই শৈলের সমীপবর্ত্তী, তাহা আপনা হইতেই কেমন বুঝিতে পারিলাম। তখন মুণ্ডিত মুণ্ড গৈরিক-বসনধারী শতসহস্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর শান্ত-দৃপ্ত জ্ঞানোজ্জ্বল মূর্ত্তি—আমার মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিল। বৌদ্ধ ভাবাপন্ন হিন্দু সন্ততিগণের তাৎকালিক ভাব ও অবস্থা মনে করিয়া এবং বর্ত্তমানের প্রাণহীন সারশূন্য শ্রীভ্রষ্ট বিহারী হিন্দুজাতির কথা ভাবিয়া দুঃখ-নৈরাশ্যময় হর্ষ-বিষাদময় নবীন অবস্থা অনুভব করিতে লাগিলাম। মনে হইল,—

"নাশাংসে বিজয়ায় সঞ্জয়!"

বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবে জগৎ শান্তিময় হইয়াছিল কিনা জানি না, ভারতবর্ষের কোনরূপ উপকার হইয়াছিল কিনা জানি না; তবে ইহা মনে হইল, যখন দেখিলাম, বৌদ্ধধর্ম্মের পতাকা চতুর্দ্দিকে প্রোথিত হইয়াছে, হিন্দুগণ আত্মধর্ম্ম-রক্ষার জন্য তাহাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান; কখন হিন্দুগণের অবসাদ ও আত্মগ্লানি, হাহাকার ও আর্ত্তনাদে দিগন্ত পরিপূর্ণ; কখন বা বৌদ্ধগণের প্রতিহিংসা-গর্ভ—নিস্তেজ কাতরোক্তিতে ভারতের অর্দ্ধাধিক ভূমি ম্রিয়মাণ। আমি যেন চক্ষের উপর সে-ই দৃশ্য দেখিতেছি। তখনই বিজয়ের আশা, ভারতের উন্নতির আশা পরিত্যাগ করিলাম।

যখন দেখিলাম, ভ্রাতৃবিরোধে ভারতের সর্ব্বনাশ সাধন হইল, আ-মনু-ক্ষুণ্ণধর্ম্মপদ্ধতি সঙ্কীর্ণ ও পরিত্যক্ত হইতে লাগিল, নূতন ধর্ম্ম নূতন তেজে দৃপ্তভাবে প্রবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বধর্ম্মের ভিত্তিভেদে সামর্থ্য প্রকাশ করিতে লাগিল, তখনই বুঝিলাম, এ লক্ষণ ভাল নহে। ইহার ফল একদিন ভুগিতেই হইবে। অধুনাতন এই অবনতি, এই অধঃপতন, সেই বৌদ্ধধর্ম্মাবির্ভাবের কি সুদূরবর্ত্তী ফল নহে? অবনতির কথা ভাবিতে ভাবিতে অবনত হইয়া পড়িলাম, অশ্বযান একটী শুষ্ক নদীগর্ভে অবতরণ করিল। নদীস্রোত বিশুষ্ক দেখিয়া আমার পূর্ব্বচিন্তাস্রোতও বিশুষ্ক হইল।

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এই শুষ্ক নদীই বিহারের দক্ষিণ সীমা।

তার পর বাসা লইলাম, স্নান, পূজা, আহার করিলাম, এই সব বিষয়ের বিশেষ সংবাদ দিবার প্রয়োজন নাই। প্রথম দিন ও তৃতীয় দিনে বিহারের যাহা যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলিব; দ্বিতীয় দিন অন্যস্থানে ছিলাম, সে কথাও অদ্যকার বিজ্ঞাপ্য নহে।

বিহার নগর উত্তরদক্ষিণে প্রায় দেড় ক্রোশ। পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় এক ক্রোশ। পঞ্চানী নদীর * বিশুষ্ক বালুকাময় গর্ভ বিহারের চতুষ্পার্শ্বে সুষুপ্ত; তবে বর্ষাসমাগমে কিয়দ্দিবসের জন্য দুর্গোৎসবে বাঙ্গালীর আনন্দের ন্যায় নদীর জীবন-সঞ্চার হয়। বলা বাহুল্য, তখন বিহার নগরীও অপূর্ব্ব শোভায় শোভাময়ী হইয়া থাকে। আমার চক্ষে সেই চিত্রদর্শন ঘটে নাই। বিহারের সমৃদ্ধি যখন বহুনগরের বরণীয় ছিল, বিহারের গৌরব যখন মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের ন্যায় সমুজ্জ্বল ছিল, তখন পঞ্চানীর পঞ্চীকৃত বেণীচতুষ্টয়ে পানীয়ের প্রচুর সমাবেশ ছিল, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়, বিহারের তাৎকালিক শোভা বড়ই অপূর্ব্ব ছিল।

বিহারের পুরশ্রী বিলুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিহারপালিনী স্রোতস্বিনী পঞ্চানীও যেন

* পঞ্চানী শব্দ পঞ্চবেণীর অপভ্রংশ বোধ হয়।

মনোদুঃখে কৃশা, বিবর্ণা, মলিনা এবং বিশুষ্কা হইয়া সিকতাময় শ্মশানে শয়ন করিয়াছেন।

বিহারের পূর্ব্বভাগে পঞ্চানী নদী মুরলা ও গোঠুয়া নদীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। এই নদীদ্বয়ের অবস্থাও পূর্ব্ববৎ শোচনীয়। বিহারের পশ্চিম প্রান্তে অনতি-উচ্চ একটী ক্ষুদ্র শৈল। আমার বোধ হয়, ইহার উচ্চতা ৩০ হস্তের বড় অধিক হইবে না। দৈর্ঘ্য এক ক্রোশের কিঞ্চিৎ অধিক হইবে। প্রস্থে অর্দ্ধক্রোশের কম। এই পর্ব্বতের পশ্চিম ও উত্তর ভাগে পঞ্চানী নদীর বিশুষ্ক বেণী দ্বারা বেষ্টিত-দক্ষিণ-ভাগ। বিহারের সমতল পশ্চিমাংশ।

আমাদিগের শাস্ত্রে ছয় প্রকার দুর্গের উল্লেখ আছে। তদনুসারে বিহারের চতুর্দ্দিকে জল-দুর্গ এবং পশ্চিমে এই অভেদ্য পর্ব্বত-প্রাচীর। বলা বাহুল্য, পঞ্চানী নদীকেই জল-দুর্গ নামে উল্লেখ করিলাম।

"জাঙ্গলং শস্যসম্পন্নং আর্য্যপ্রায়মনাবিলম্।
রম্যমানতসামন্তং স্বাজীব্যং দেশমাবসেৎ॥
ধন্বদুর্গং মহীদুর্গমব্দুর্গং বার্ক্ষমেব বা।
নৃদুর্গং গিরিদুর্গং বা সমাশ্রিত্য বসেৎ পুরম্॥"

মনুসংহিতা সপ্তম অধ্যায়।

যে দেশে অধিক জল। ভূমি নাই, তৃণ অধিক উৎপন্ন হইয়া শস্যের হানি করে না, বায়ু এবং রৌদ্র প্রচুর, তাদৃশ বহুশস্যসম্পন্ন প্রদেশ, জাঙ্গল নামে অভিহিত। যে দেশে বিহার নগর প্রতিষ্ঠিত, সেই বর্ত্তমান বিহার-জনপদ জাঙ্গল, রমণীয়, অনাবিল অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর, স্বাজীব্য অর্থাৎ কৃষি-বাণিজ্যাদির সুবিধাযুক্ত এবং তথায় ভদ্রলোকের বাসও বহুতর; সুতরাং এই দেশ অনেক সময়ে বহুতর রাজার যে আশ্রয়-যোগ্য, ইহা শাস্ত্রসম্মত। চতুর্দ্দিকে বিংশতি ক্রোশ করিয়া জলশূন্য ভূমি—মরুদুর্গ; পাষাণ কিংবা ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত সচরাচর যেরূপ দুর্গ এখন দেখা যায়, তাহার নাম মহীদুর্গ; চতুর্দ্দিকে দুস্তর জলরাশি, জলদুর্গ নামে অভিহিত; চতুর্দ্দিকে চার ক্রোশ ব্যাপিয়া অবস্থিত নিবিড় বনস্পতি এবং কণ্টকাকীর্ণ গুল্ম-লতাদি, বৃক্ষদুর্গ; চতুর্দ্দিকে অবস্থিত বিশাল চতুরঙ্গবাহিনী, নৃদুর্গ; অতিদুরারোহ বাসোপযোগী পর্ব্বতপৃষ্ঠের নাম, গিরিদুর্গ। ইহার মধ্যে কোন এক প্রকার দুর্গ অবলম্বন করিয়া নগর স্থাপন করা রাজার কর্ত্তব্য।

বিহার নগর প্রকৃতির স্বহস্তনির্ম্মিত অথবা প্রকৃতি ও প্রাকৃতের পরস্পর সাহায্যে প্রস্তুত জলদুর্গে আবৃত, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। অর্থাৎ পঞ্চানী নদী প্রকৃতিলীলায় নিয়োজিত হইয়া স্বকীয় প্রশস্ত বেণী বিহারের চতুষ্পার্শ্বে আলুলায়িত করিয়া রাখিয়াছিলেন অথবা কোন মহারাজ সখাত পরিখার সহিত পঞ্চানী নদীকে সম্মিলিত করিয়া দুর্দ্ধর্ষ জলদুর্গ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা এখন নিতান্ত দুঃসাধ্য এবং কোন্ প্রসিদ্ধ নরপতি এই নগর স্থাপন করেন, তাহা আমি জানিতে পারি নাই। মন্ত্রণার মনস্ক মুখ্যস্থান শত্রু-সৈন্যের গতিবিধি-দর্শনোপযোগী পর্ব্বত—বিশাল-জলদুর্গের বিলীয়মান ছায়া এবং নগরাভ্যন্তরের ভাবভঙ্গী দর্শনে স্পষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে, এ নগর বহু প্রাচীন। বিহার নাম হইবার পূর্ব্বেও নামান্তরে নগরের অস্তিত্ব ছিল।

এই বিহার নগরের মধ্যে একটী মহীদুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই দুর্গের চতুষ্পার্শ্ব-ব্যাপিনী যে বিশাল পরিখা ছিল, তাহা এখন বিহার-নগর-মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত ক্ষেত্র, পূর্ব্বাংশে কোন কোন স্থলে পরিখার চিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, পরিখা-সমেত এই ভগ্নদুর্গ বর্ত্তমান বিহার নগরে প্রায় তৃতীয়াংশের একাংশ। এই দুর্গস্তূপের উপরে এখন মুন্সফী কাছারী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই দুর্গস্থান বিহারের অপর সমতল ভূমি অপেক্ষা উচ্চ।

এই দুর্গ যাঁহার জমিদারির অন্তর্গত, তিনি দুর্গের প্রস্তর বিক্রয় করিয়া বেশ লাভবান হইতেছেন। এ স্থানে অনেক গুলি বৃহৎ বৃহৎ গর্ত্ত দেখিলাম, ভূগর্ভ হইতে প্রস্তর উত্তোলন করাতে এই সব গর্ত্তের জন্ম। কোন কোন, স্থানে প্রস্তরময় দৃঢ় প্রাচীরের কান্তিহীন কঙ্কাল, কঠোর কালের কুঠারতাড়না দর্শকের মনোমধ্যে জাগাইয়া দিতেছে। শোনা যায়, এ স্থানে পূর্ব্বে অনেকে অনেক মুদ্রা রত্নাদি প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই ভগ্ন দুর্গের প্রতিষ্ঠাতা কে, তাহা জানিবার উপায় নাই। আমার বোধ হয়, পালবংশীয় কোন বৌদ্ধ রাজা হইবেন এবং এ দুর্গ বৌদ্ধধর্ম্মের সুদৃঢ় রক্ষাগার ছিল। এ দুর্গভূমির মধ্যে কূপ খনন করাইতে গেলেই অদ্যাপি দুইচারিটী বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া যায়।

বিহারের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু যোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আশ্রয়ে আমি ছিলাম। যোগীন্দ্র বাবু বলিলেন, ঐরূপ মৃত্তিকা-গর্ভস্থ বুদ্ধমূর্ত্তি এক বৎসরের মধ্যে তিনি চারি পাঁচটী সংগ্রহ করিয়াছেন। এইরূপে বহুকাল হইতে বহুলোকেই ভূগর্ভস্থ বুদ্ধমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন। কত শত বলিব, কি কত সহস্র বলিব, কি কত লক্ষ কি কোটী বলিব, কি আরও অধিক বলিব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না; তবে এই বলিতে পারি, অসংখ্য অগণনীয় বুদ্ধমূর্ত্তি এই দুর্গের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আমার বোধ হয়, বৌদ্ধধর্ম্মের ভগ্নাবস্থায় যেখানের যত বুদ্ধমন্দির অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর হস্তগত হইয়াছে, বৌদ্ধগণ তাহার অধিকাংশ মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া লইয়া ঐ ধর্ম্মদুর্গের অভ্যন্তরে আশ্রয়-গ্রহণ করিয়াছিল। নগর প্রাচীন বটে, কিন্তু প্রাচীন হিন্দুদেবালয় এ নগরে একটীও নাই, হিন্দুকীর্ত্তির চিহ্নও প্রায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না। তবে, হিন্দুকীর্ত্তি-চিহ্নের মধ্যে কেবল মণিরাম সাধুর আখড়াই উল্লেখযোগ্য। এই সাধুর কথা পরে বলিতেছি।

মুসলমানগণের অর্দ্ধভগ্ন প্রাচীন সমাধিস্থান ও মসজিদ্ এ স্থানে বর্ত্তমান আছে। ১৫০।২০০ শত বৎসরের মধ্যবর্ত্তী কতিপয় দেবালয়ও আছে; কিন্তু কি হিন্দুর দেব-মন্দির কি মুসলমানের সমাধিস্থান বা মসজিদ্, সর্ব্বত্রই বুদ্ধাঙ্কিত কি বৌদ্ধ-পূজিত তৈলচিক্কণ-পাষাণপট্ট-বিরাজিত। কোন কোন দেবমন্দিরে বুদ্ধমূর্ত্তি ভৈরবরূপে অর্চ্চিত হইয়াও থাকেন। বিহারে হিন্দুপ্রাধান্য বহুকাল বিলুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে বিহার নগর মুসলমানপ্রধান। মুসলমানের পূর্ব্বে, বিহার বৌদ্ধগণের অধিকারে ছিল, বিহারের প্রাচীন মুসলমানেরা এখনও বলিয়া থাকে, মগদিগকে পরাজয় করিয়া মুসলমানগণ বিহারনগর অধিকার করেন। এ সম্বন্ধে আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহা এ স্থলে প্রকাশ করিতেছি। "সম্ভবতঃ কুতুব-উদ্দিনের সেনাপতি বখ্তিয়ার খিলিজি বিবিধ চেষ্টা করিয়াও বিহার নগরের মগদিগকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য তিনি আপনার ধর্ম্মনিয়মানুসারে দৈব কার্য্য করেন। দেবতার প্রত্যাদেশ হয়, 'তোমার সৈন্যসামন্তের মধ্যে একজন পীর আছেন, তাঁহার ৪০ জন শিষ্য আছে, তাহারা সকলেই দৈব-ক্ষমতাপন্ন; তাহারা মনে করিলে বৌদ্ধরক্ষিত বিহার জয় করিতে সমর্থ হইবে।'

"বক্তিয়ার পরিশেষে দেবতার অনুগ্রহে জানিতে পারিলেন, তাঁহার সৈন্যদল মধ্যে সৈয়দ এব্রাহিম পীর এবং তাঁহার অধীনস্থ ৪০ জন ব্যক্তি পীরের সদৃশ। বহু অনুনয় বিনয় করিয়া ইঁহাকে আপনার প্রার্থনা অবগত করেন, তখন সৈয়দ এব্রাহিম বিহার-জয়ে স্বীকৃত হইয়া ৪০ জন মাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে বিহারের

নিকটবর্ত্তী হন। " বিহারের পশ্চিম পারবর্ত্তী বর্ত্তমান মম্বরা গ্রামে সৈয়দ এব্রাহিম অবস্থিতি করিলেন। এদিকে উন্নতকায় মহাবল পরাক্রান্ত বৌদ্ধগণ (পারসী ভাষায় বৌদ্ধদিগেরই নাম মগ)—মগবীরগণ মুষ্টিমেয় মুসলমান-সৈন্যকে একেবারে নিষ্পেষিত করিবার অভিপ্রায়ে পর-পারে উত্তীর্ণ হইবার জন্য পঞ্চানী নদীতে নৌসেতু-রচনায় প্রবৃত্ত হইল। তাহার উদ্যম গতি, অদম্য অধ্যবসায় এবং অপরিমিত উৎসাহ ব্যাহত করিতে চারি সহস্র মুসলমান-সৈন্যও সক্ষম নহে। ৪০।৪১ জন ত দূরের কথা। সুতরাং কৌশলী বারচক্ষু বৌদ্ধগণ, এবার দুর্গের বহি-র্ভাগে যাইতে কিছুমাত্র ভীত হইল না। বলা বাহুল্য, পুররক্ষার জন্য শত শত বৌদ্ধবীর নিযুক্ত রহিল।

এদিকে সৈয়দ এব্রাহিমের সৈন্যেরাও নিশ্চিন্ত রহিল; বৌদ্ধগণের নৌসেতু-নির্ম্মাণেও কোন ব্যাঘাত জন্মাইল না। বৌদ্ধগণ, নদী পার হয়-হয় হইয়াছে, এমন সময়ে সৈয়দ এব্রা-হিম তাহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'আমরা ক্ষণ কালের জন্য ঈশ্বর-উপাসনা করিয়া লই; আপনারা ততক্ষণ আমাদিগকে আক্রমণ করি-বেন না।' বৌদ্ধগণ তাহাতে সম্মত হইলেন। ঈশ্বরানুগৃহীত সৈয়দ এব্রাহিম ঈশ্বরের নাম করিয়া আপনাদিগের বাহুতে অসীম দৈববল, আপনাদিগের হৃদয়ে প্রদীপ্ত দৈবতেজ আনয়ন করিয়া শত্রুগণের সম্মুখীন হইলেন। তখনও তাহাদিগের নৌসেতু নির্ম্মাণ সম্পূর্ণরূপে হয় নাই। সৈয়দ এব্রাহিম আপনার দেবক্ষমতায় তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। তাহা-রাও মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গের ন্যায় সৈয়দ এব্রাহিমের প্রতীকারে সমর্থ হইল না। সৈয়দ এব্রাহিম সানুচরে জলের উপর দিয়া নদী পার হইলেন। নদীমধ্যস্থ, নদীপার্শ্বস্থ, পুরমধ্যস্থ এবং দুর্গমধ্যস্থ শত সহস্র বৌদ্ধ সৈন্য বিনাশ করিয়া দুর্গের উপরে অর্দ্ধচন্দ্র-লাঞ্ছিত বিজয় পতাকা প্রোথিত করিলেন। দৈবপ্রভাবে তাঁহাদিগের একজনও বিনষ্ট হয় নাই।"

এ গল্পে তোমার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় কর, না হয় না কর; সে সম্বন্ধে আমার অনুরোধ উপরোধ কিছুমাত্র নাই; তবে ইহা বুঝিতেছি এবং বুঝাইতে যত্ন করিতেছি যে, ধৃষ্টদ্যুম্নের হস্তে দ্রোণাচার্য্যের মৃত্যুর ন্যায় ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের মৃত্যু মুসলমানের হস্তেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

এই পীর সৈয়দ এব্রাহিমের সমাধিমন্দির বিহারের পশ্চিম প্রান্তবর্ত্তী পূর্ব্বোল্লিখিত শৈলের উর্দ্ধভাগে প্রতিষ্ঠিত আছে। বিহারের মুসলমানেরা বলিয়া থাকে, সৈয়দ এব্রাহিম প্রায় ২০০ শত বৎসর জীবিত ছিলেন। ৫৫০ বৎসর হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

পীর সৈয়দ এব্রাহিমের সমাধিমন্দির আছে বলিয়া ঐ পর্ব্বতের বর্ত্তমান নাম হইয়াছে পীর-পাহাড়। সমাধিমন্দির এক্ষণে সংস্কারহীন, ভগ্নোন্মুখ, চামচিকার আশ্রয়ে নিতান্ত দুর্গন্ধ-যুক্ত। মন্দিরে প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে আরবী অক্ষরে কি লেখা আছে। বলা বাহুল্য, আমি পড়িতে পারিলাম না। মন্দিরের অভ্য-ন্তরে সৈয়দ এব্রাহিমের মৃতদেহ যেখানে প্রোথিত আছে, তদুপরি ইষ্টক-নির্ম্মিত ৩।৪ হাত দীর্ঘ ও ২।৩ হাত উচ্চ এবং দেড় হস্ত প্রস্থ একটী ভিত্তি আছে। এই কবর-ভিত্তির সম-সূত্রপাতে চারি পাঁচ হাত উর্দ্ধ পর্য্যন্ত ছাদের উপর হইতে একটী লৌহশৃঙ্খল লম্বিত আছে, শৃঙ্খলের নিম্নপ্রান্তে একটী কুক্কুটাণ্ড স্থাপিত; বিহারী মুসলমানদিগের বিশ্বাস, ঐ শৃঙ্খল আপনা হইতে কখনও কমে, কখনও বাড়ে। শৃঙ্খল অতিরিক্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শৃঙ্খলাগ্রস্থিত কুক্কুটাণ্ড উক্ত কবর-ভিত্তি স্পর্শ করিলে মহা-প্রলয় উপস্থিত হইবে।

এই সমাধি-মন্দিরের কিয়দ্দূর উত্তরে আর একটী জীর্ণতম সমাধিমন্দির আছে। কথিত আছে, পূর্ব্বে ঐ স্থানে এক শিবলিঙ্গ বিরাজিত ছিলেন। এই সমাধি-মন্দিরের দ্বারদেশে প্রোথিত ভগ্ন প্রস্তর-ফলকে আরবী অক্ষরে কি লিখিত আছে। তাহারও উত্তরিভাগে ইষ্টক-পাষাণময় বর্ত্তুলাকৃতি একটী উচ্চ ভিত্তি আছে; শুনিতে পাওয়া যায়, ইংরেজেরা এই স্থান হইতে দূরবীক্ষণ দ্বারা অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখিয়া থাকেন। যখন পীর-পাহাড়ের প্রসঙ্গ উঠিয়াছে, তখন এই স্থানেই পীর-পাহাড় সম্বন্ধে সমস্ত কথা শেষ করা যাউক।

পীর-পাহাড় ক্ষুদ্র শৈল হইলেও দেখিতে অতি মনোহর। রাস্তায় দেওয়ার প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করিতে অনেক প্রস্তর-ভেদক এই পর্ব্বতে নিযুক্ত আছে। তাহাদের প্রস্তর-কর্ত্তনের গুণেই হউক বা স্বভাবতই হউক, এই পর্ব্বতের অধিকাংশ প্রস্তরই বন্ধুরতা-শূন্য। এক একটী বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর লম্বমান রহিয়াছে, তাহার পার্শ্বে ফাঁক, আবার ঐরূপ প্রস্তর; সারি সারি, এইরূপ প্রস্তরশ্রেণীর সমাবেশে একটু দূর হইতে গিরির বিশেষ শোভা অনুভূত হয়। এই সব প্রস্তরকেই মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে দূর হইতে আমার বৃক্ষশ্রেণী বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল; সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পীর-পাহাড়ের উপত্যকা ও নিতম্ব ভূমিতে অনেক কৃষিজীবী মুসলমান ও নীচজাতীয় হিন্দুর বাস আছে। আর ইহার পূর্ব্বোত্তর কোণে লোচন-লোভনীয় শ্যামলপত্র বৃক্ষশ্রেণীর ঘনবিরল-সন্নিবেশ কিছুদূর হইতে দেখিতে পাইলাম।

শুনিলাম, বর্ষাকালে এই পর্ব্বত স্বর্গ-সৌন্দর্য্যে শোভিত হয়। বর্ষাপ্লাবিত পঞ্চানী নদী এবং বিহারের প্রান্তবর্ত্তী ক্ষেত্রসমূহ জলে একাকার হইয়া, পর্ব্বতকে বেষ্টন করিয়া থাকে। তখন নিকটবর্ত্তী ধনী পুরুষেরা সলিল-শোভা-দর্শন ও গিরিবিহার-মানসে নৌকাযোগে বা হস্তিযানে নানাবিধ দ্রব্য-সম্ভার লইয়া সপরিজনে এই পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া থাকেন। এই পর্ব্বত তখন তাঁহাদিগের শুক্ল পটমণ্ডপে আবৃত হইয়া কৈলাস-শৃঙ্গের ন্যায় অথবা মানস-সরোবর-মধ্যস্থ হংসপুঞ্জের ন্যায় শোভাময় হইয়া থাকে।

গায়িকা ও নর্ত্তকীদিগের মধুর কণ্ঠ ও ভূষণ-ধ্বনি, বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের লীলাময়ী স্বর! স্থষ্টি বুঝি এই পাষাণ-হৃদয়কেও দ্রবীভূত করিয়া দেয়!! তখন সর্ব্বজন-বাঞ্ছিত এই মহীধর জলের সাগরে নহে, সুখের সাগরে ভাসিতে থাকে।

বর্ত্তমান কালের বিহার নগর দেখিলে প্রাচীন কালের বিহার নগরের সমৃদ্ধি যেমন অনুভব করা অসাধ্য, সেইরূপ অন্য সময়ে এই পর্ব্বত দেখিলে, বর্ষার সে শোভাও হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব।

এই পাহাড়ে উঠিয়া আমার মনে হইয়াছিল এবং এখনও হৃদয়ে জাগিয়া আছে, সেটী পর্ব্বত নহে—প্রাচীন কোন রাজার রাজপুরী। কাল-বশে বিপর্য্যস্ত হইয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ভগ্ন-চূর্ণ হইয়া এখনকার এই ভাবে অবস্থিত হইয়াছে। আমি দেখিলাম, এখনও যেন একটী তোরণের ভগ্নাবশিষ্ট পর্ব্বতের সোপান-মার্গ-রূপে প্রতিভাত রহিয়াছে। আমি ভূতত্ত্ববেত্তা হইলে পরীক্ষা করিয়া দেখিতাম, আমার এই মনোভাব সত্যতত্ত্বের অনুগামী কি না।

এখন বিহারে দেখিবার জিনিষ এই কয়েকটী আছে; যথা;

১। ভগ্নদুর্গ।

২। পীর-পাহাড়।

৩। হজুরৎ সৌয়দ কাদের কুম্পাইশ সাহেবের সমাধি-মন্দির।

৪। মণিরাম সাধুর আখড়া।

৫। মগদুল সফর উদ্দিন সাহেবের সমাধি স্থান।

৬। প্রাচীন প্রতিষ্ঠিত শিব।

৭। একটী পুষ্করিণী।

৮। শুষ্ক পঞ্চানী নদী।

৯। বিহারের পশ্চিম পারস্থিত মহামায়া-মন্দির।

১০। অন্যান্য আধুনিক দেবালয়।

এতদ্ভিন্ন বাজার বন্দর, ফোজদারী দেওয়ানি কাছারী, স্কুল, মিউনিসিপালের বেলি-সরাই নামক মনোহর সুদীর্ঘ দ্বিতল অট্টালিকা ইত্যাদি। প্রথম, দ্বিতীয় ও অষ্টম যে যে স্থান উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ আমরা ইতি-পূর্ব্বে যথাসম্ভব প্রদর্শন করিয়াছি। অবশিষ্ট বিষয়ের উল্লেখ এক্ষণে করিতেছি।

৩।—এই সমাধি-মন্দিরের ভিতরে একটী মস্জিদ আছে, অনেকগুলি মুসলমান এই-খানে আহার পাইয়া থাকে, ব্যয়-নির্ব্বাহোপ-যোগী কিঞ্চিৎ বিষয়ও আছে। এই স্থান ও কার্য্যের অধ্যক্ষ একজন ভদ্রবংশীয় মুসলমান। ইনি বেশ সদালাপী, সভ্য ও উদারস্বভাব। আমি বৌদ্ধমূর্ত্তি এবং বৌদ্ধমন্দিরের ভগ্ন প্রস্তর দর্শন করিবার জন্য এই স্থানে গিয়াছিলাম। আমার পথি-প্রদর্শক এবং সন্ধানদাতা ছিল একজন বৃদ্ধ মুসলমান।

এই সমাধিমন্দিরের বহিঃসোপান হইতে মসজিদের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত যত কৃষ্ণপ্রস্তর গ্রথিত আছে, তৎসমস্তই বুদ্ধচিহ্নিত কিংবা বৌদ্ধলাঞ্ছিত। বাহিরের প্রথম সোপানে অর্দ্ধপ্রোথিত প্রস্তরফলকে এক ভগ্ন ক্ষুদ্র বুদ্ধ-মূর্ত্তি; তাহার নিকটে সংস্কৃত অক্ষরে প্রস্তরে উৎকীর্ণ রহিয়াছে "দত্তত্থাগত"। আমি সে সোপানে পদার্পণ করিতে পারিলাম না, একটু বক্রভাবে গিয়া তাহার উপরিস্থ সোপানে উঠিলাম; কিন্তু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া এই নিয়ম রক্ষা করা বড়ই কঠিন হইল। সেখানে কোন প্রস্তরে বুদ্ধের শয়ান ক্ষুদ্র মূর্ত্তি; কোন-খানে বা বুদ্ধাসন; কোন খানে বা অন্যবিধ বুদ্ধ-চিহ্ন। তদ্ভিন্ন বুদ্ধাঙ্কিত বহু প্রস্তরই বিপর্য্যস্ত ভাবে গ্রথিত আছে, অর্থাৎ বুদ্ধমূর্ত্তি উপরে থাকিলে স্থানের বন্ধুরতা হয়, এই জন্য গাঁথনির অভ্যন্তরে মূর্ত্তি ও উপরে প্রস্তরপৃষ্ঠ। এই ভাবে অনেক স্থান নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

একস্থানে দেখিলাম, একটী বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি, উৎপৃষ্ঠভাবে ভূতলে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছেন।

এই সমাধিমন্দিরটী পূর্ব্বোক্ত ভগ্নদুর্গের উপরেই স্থাপিত।

৪।—৩০০।৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে মণিরাম নামে একজন সাধু ছিলেন। তিনি হনুমৎ সিদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিহার নগরের দক্ষি-ণাংশে তাঁহার আশ্রম ছিল, সেই স্থানই এখন মণিরাম সাধুর আখড়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বিহারী-হিন্দুগণ অদ্যাপি সেই স্থানের মৃত্তিকাকে বিক্রম-বর্দ্ধক বিবেচনা করিয়া পরম সমাদরে গ্রহণ করে এবং এই স্থানে মহা-বীর হনুমান এবং সাধু মণিরামকে প্রণাম করিয়া থাকে, মহাবীরের পূজাও যথাপদ্ধতি সম্পন্ন হয়।

৫। প্রথমেই একটী কথা বলা হয় নাই; বিহার নগরের দক্ষিণস্থিত পঞ্চানী নদীর দক্ষিণ পার কিয়দংশ পর্য্যন্ত এক্ষণে বিহার নামে অভিহিত এবং এই দিকের পঞ্চানী নদীতে বালুকা-নিমগ্নার্দ্ধ একটী অনতি পুরাতন ইষ্টকা-লয় সেতু দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বোধ হয়, নদীপরিবেষ্টিত বিহার, নগর নামে অভিহিত হইত এবং নদীর বহিঃস্থিত ভূমি বিহার-পল্লী নামে অভিহিত হইত। নদীর শুষ্কতা, বিহার নগরের পতন এবং রাজ-পরিবর্ত্তন ইত্যাদি নানা কারণে স্থান প্রভৃতির সংজ্ঞায় বৈলক্ষণ্য ঘটিবার সম্ভাবনা।

সে যাহা হউক, বর্ত্তমান সময়ে বিহার বলিলে পঞ্চানীর দক্ষিণ পার কিয়দংশও বুঝায়; এইটুকুই আমার বিশেষ বক্তব্য।

মগদুম সাহেবের সমাধিস্থান নদীর বাহিরে, বিহার-পল্লীর মধ্যে। বিহার-জনপদে মগদুম সাহেবের নাম অতি প্রসিদ্ধ। হিন্দু মুসলমানে তাঁহাকে সিদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে। বিহার-জনপদের ২।৩ স্থলে মগদুম সাহেবের গাদি আছে। গয়ার নিকটবর্ত্তী ষ্টেসন মগদুমপুর ইঁহার এক সিদ্ধিক্ষেত্র।

বিহার-পল্লীর মগদুম-সমাধিস্থানে মহরম পর্ব্বোপলক্ষে প্রতি বৎসর মেলা হইয়া থাকে। নানা স্থানের মুসলমান সেই সময়ে এই স্থানে সমবেত হয়। মগদুম সাহেবের সমাধি-মন্দিরে জুতা পরিয়া প্রবেশ করা নিষেধ। কয়েক বৎসর হইল, ছোট লাট সাহেব এই সমাধি-মন্দির দেখিতে যান; কিন্তু মুসলমানেরা, জুতা পায়ে দিয়া তাঁহার তথায় প্রবেশ করিবার পক্ষে আপত্তি করে। ছোট লাট সাহেব জুতা খুলিতেও ইচ্ছা করিলেন না, মগদুম সাহেবের সমাধিস্থানও তাঁহার দর্শন করা ঘটিল না। এই ঘটনাতেও মুসলমানদিগের উজ্জ্বল জাতীয় ভাব উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত। হিন্দুর মতে যাহা অপবিত্র, প্রয়োজন হইলেই সেই অপবিত্র পরিচ্ছদে হিন্দু-দেবালয়ে গমন, হিন্দু-দেবদেয়-সামগ্রীস্পর্শ, হিন্দুর অর্চ্চনায়-ব্যাঘাত, এক কথায় হরিদ্বারের মেলাভঙ্গ-ব্যাপার গ্রহণোপলক্ষে কাশী হইতে বিদেশাগত সাধু সন্ন্যাসিগণের দূরীকরণ ব্যাপার অনায়াসে অক্ষোভে রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাহাতে হিন্দু কি করে?—হিন্দু একটী প্রতপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, একবার উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করে, আর নীরবে—অতি নীরবে একবিন্দু অশ্রুমাত্র পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

এই মগদুম সফর-উদ্দিন সাহেব এবং পূর্ব্বোক্ত মণিরাম সাধু সমসাময়িক ব্যক্তি। কথিত আছে, হিন্দু মুসলমানের চিরপদ্ধতি অনুসারে এই সিদ্ধ পুরুষদ্বয়ের অনুচরবর্গেরও পরস্পর বৈরিতা ছিল। মগদুমের অনুচরেরা মণিরাম ও তাঁহার অনুচরদিগের স্বধর্ম্মানুমোদিত অপকার সাধনে ক্রটী করিত না। মণিরামের অনুচরেরাও যথাশক্তি প্রতিশোধ লইতে ছাড়িত না। প্রথমে এই বিবাদ সিদ্ধ পুরুষ-দ্বয়ের চিত্তাকর্ষণ করে নাই, তারপর উভয়ের মনোযোগে বিবাদ মিটিয়া গেল। মনোযোগ হইবার ঘটনাটী এই—শঙ্খধ্বনি হিন্দু-দেবপূজায় বিশেষ উপযোগী, মুসলমানের ধর্ম্মে শঙ্খধ্বনি বড়ই গর্হিত। মণিরাম ও মগদুমের আশ্রয়, ক্ষুদ্র নদীর এ-পারে এবং ও-পারে। মণিরাম শঙ্খধ্বনি করিলেই, মগদুমের আশ্রয়ে পঁহুছিত; মগদুমের তাহাতে দৃক্‌পাত না থাকিলেও তাঁহার অনুচরেরা বড়ই বিরক্ত হইত। একদা মগদুমের অনুচরেরা সুযোগক্রমে মণিরামের শঙ্খটী অপহরণ করিয়া, একটী কূপজলে নিক্ষেপ করিল।

সন্ধ্যার সময় উপস্থিত, মণিরামের দেবতার আরতি হয়-হয়, কিন্তু তাঁহার আজ আর শঙ্খ নাই; অনুচরেরা শঙ্খবাদ্যের জন্য ভাবিত হইবে মাত্র; এমত সময়ে বিহারের যাবতীয় কূপগর্ত্ত হইতে শত সহস্র শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। মণিরাম ও তাঁহার অনুচরেরা পূর্ণোৎসবে মহাবীরের আরতিক্রিয়া সমাপন করিলেন। বিহারবাসী সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল; ব্যাপার কি কেহই বুঝিল না। মগদুমের অনুচরেরা মগদুমের নিকট গিয়া সভয়ে শঙ্খহরণ বৃত্তান্ত জানাইল এবং একটী কূপে যে মণিরামের শঙ্খ ফেলিয়াছিল, তাহাও বলিল। মগদুম মণিরামের ক্ষমতা বুঝিলেন, তৎপরদিনে মণিরামের সঙ্গে দেখা করিতে এবং মণিরামকে আপনার ক্ষমতা বুঝাইতে ব্যাঘ্রারোহণে যাত্রা করিলেন। এদিকে

সিদ্ধ মণিরাম মনে মনে মগদুনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া যে রোয়াকে বসিয়া দন্তধাবন করিতেছিলেন, তাহাকেই বলিলেন, "চল্ বেটা চল্" রোয়াকও অমনি প্রাণীর ন্যায় প্রভুর আদেশমত চলিতে লাগিল। ব্যাঘ্রবাহন মগদুন এবং রোয়াকবাহন মণিরাম, পথিমধ্যে পরস্পর সম্মুখীন হইলেন। তখন মগদুন বিনয় প্রদর্শন করিলেন, মণিরামও অপ্যায়িত করিলেন এবং স্থির হইল, মগদুনের অনুচরেরা এ পারে কোন উপদ্রব করিবে না এবং মণিরামের অনুচরেরাও ও-পারে উপদ্রব করিবে না। কেহ কেহ বলেন, এই বৈরিতা যে কেবল অনুচরদিগের ছিল, তাহা নহে; মগদুন মণিরামেরও ছিল। যাহা হউক, এইদিন হইতেই সকল বৈরিতারই অবসান হইল।

৬।—বিহারে যত হিন্দু দেবতা আছেন, তন্মধ্যে এই শিব পুরাতন। একশত বৎসরের অধিক কাল ইঁহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ভগ্ন-দুর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণে কিয়দ্দূর যাইলে এই শিবমন্দির দেখা যায়। পূর্ব্বে এই শিবের সেবার এবং এই স্থানে সাধুসংকারের একটু বন্দোবস্ত ছিল বলিয়া জানা যায়। কিন্তু এক্ষণে এই শিবের প্রত্যহ পূজা হয় কিনা সন্দেহ।

বিহারে অনেক হিন্দু আছে, স্বস্ব উদরপোষণ সকলেই করিয়া থাকে; কিন্তু এই দেবাধিদেবের পূজাবিধান করিতে অর্থাৎ একটু জল, একটা বিল্বপত্র আর বড়জোর দুই চারিটা আতপ-তণ্ডুলে যাঁহার পূজা হয়, সেই আশুতোষের পূজা-ব্যবস্থায় সকলই উদাসীন। শুধু বিহারে কেন, অনেক হিন্দু গ্রামে এইরূপ দুর্দ্দশা দেখা যায়। অধিক কি, শিবনিবাসে (জেলা নদীয়া ই, বি, রেলওয়ে কৃষ্ণগঞ্জ ষ্টেসনের এক ক্রোশ পশ্চিম) স্বনাম-খ্যাত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত এক বৃহৎ শিবলিঙ্গ আছেন। তাঁহার নাম রাজরাজেশ্বর; তাদৃশ বৃহৎ সুগঠিত এবং সুচিক্কণ শিবলিঙ্গ ভারতবর্ষে আর কোথায়ও আছেন কিনা জানি না। এক তাঁহার গৌরী-পট্ট খানিই ৭ হাত হইবেক। রাজ-রাজেশ্বর শিবলিঙ্গ, তেমনি তাঁহার উপযুক্ত মন্দির। কিন্তু এখন তাঁহার সেবাদির ত্রুটী দেখিলে, ভক্তমাত্রেই অশ্রু সংবরণ করিতে পারে না। মন্দিরের চারিদিকে বন, ভিতরে বিকট দুর্গন্ধ, মন্দিরটী শত সহস্র কি লক্ষ লক্ষ চামচিকার বাসভূমি হইয়াছে; চামচিকার বিষ্ঠায় রাজ-রাজেশ্বরের পষাণমূর্ত্তি সমাচ্ছন্ন। মন্দিরের ভিতরে গিয়া ভদ্রলোকে ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারে না; পূজাও তথৈবচ।

৭।—উক্ত শিবমন্দিরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটী প্রস্তর-বদ্ধ পুষ্করিণী আছে। এখন বিহার নগরে ঘরে বসিয়া তোলা জলে স্নান করিতে হয়, কষ্টোত্তোলিত কূপজলই প্রধান পানীয়; এমন স্থানের পুষ্করিণী তাহা ভালই হউক, মন্দই হউক, দেখিবার জিনিষ; তাহার কোন সন্দেহ নাই। একজন জমিদার এই পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছেন।

৯।—বিহারের পশ্চিম পরপারে মঘরা গ্রাম, এই গ্রামে মহামায়ার মন্দির আছে। মহামায়া অতি প্রাচীন দেবতা, এই মহামায়া আর কেহই নহেন, ইনি বুদ্ধ-জননী মায়াদেবী। এক্ষণে হিন্দুরাও ইঁহার পূজা করিয়া থাকেন। পারসীভাষায় বুদ্ধদিগের নাম মঘ। এই স্থানে মঘদিগের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া, এই স্থানের মঘরা নাম মুসলমানগণের প্রদত্ত। বাঙ্গালাতেও যে কয়েকটী গ্রামের নাম মগরা আছে, তাহার মূলও এইরূপ; অর্থাৎ বৌদ্ধ-সম্পর্কান্বিত, ইহা আমার বিশ্বাস।

১০।—একটী রাম-মন্দির, তিন চারিটী শিবালয়, দুই তিনটী মহাবীর স্থান, দুই তিনটী জৈন মন্দির, একটী সাধুর আখড়া, একটী গির্জ্জা এবং কতকগুলি মসজিদ আছে।

রাম-মন্দিরে বেশ জাঁকজমক আছে, রাম-নবমীতে বেশ ধুমধাম হয় এবং মধ্যে মধ্যে এইখানে সাধুভোজনও হইয়া থাকে। অন্যান্য হিন্দুমন্দিরেও পূজাদির ব্যবস্থা আছে, সন্ধ্যা-কালে কাংস্য-ঘণ্টার শব্দ, সকল হিন্দু-দেবালয় হইতে হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন শিবালয়টী এ তালিকার বহির্ভূত।

আমি দুই দিনের মধ্যে—ঘণ্টা হিসাব করিলে ১০ ঘণ্টার মধ্যে এই সব স্থান চকিতের ন্যায় দেখিয়া এবং বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়া ও কতিপয় বিবরণ সংগ্রহ করিয়া, বিরাম এবং বিশ্রাম লাভ করিলাম। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি কি না, কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা জানাইলে বাধিত হইব। আসিবার সময়ে বিহারের গৌরবময় অতীত কাল এবং অকিঞ্চিৎকর বর্ত্তমান কাল যতই মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল, ততই কেমন একপ্রকার ব্যাকুলতা, অশান্তি এবং অস্থিরতা অনুভব করিতে লাগিলাম।

পূর্ব্ব-কথামত যোগেন্দ্র বাবুর বাসার নিকটে মেলকাট আসিল, বেলা সাড়ে তিনটার সময় বক্তিয়ারপুরে আসিবার জন্য আমি তাহাতে আরোহণ করিলাম, মেলকাট ছাড়িয়া দিল। মেলকাটবাহী তেজস্বী অশ্বযুগল সবেগে পদক্ষেপ করিতে লাগিল, আমি তাহাদিগের খুরধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে যেন শুনিতে পাইলাম—

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মন স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥"

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

আমার জীবন-চরিত।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

কর্ণেল ক্রস্‌ম্যান সেদিন হল্‌দোয়ানীতে ছিলেন না। নেপালের রাজা আমাদের সাহায্যার্থ এক দল গোরখা-সৈন্য নাইনিতালে পাঠাইয়াছিলেন, তাহার পরিদর্শনার্থই তিনি নাইনিতালে গিয়াছিলেন। আমি, গুপ্তচর, লেফটেনাণ্ট বারওয়েল এবং আটজন রক্ষক-সওয়ার—আমরা এই এগার জন তখন অশ্বারোহণে নাইনিতাল-যাত্রা করিলাম। নাইনিতালে পৌছিয়া দেখি, সাহেবগণ এক বৃহৎ প্রকোষ্ঠে, রুদ্ধদ্বারে, গোপনে কি পরামর্শ করিতেছেন। মানবমাত্রেরই তথায় প্রবেশ-নিষেধ। সশস্ত্র-প্রহরিগণ দ্বারদেশে পাহারা দিতেছে। আমাদের আগমনবার্ত্তা, সাহেব-গণকে জানাইবার জন্য, তাহাদিগকে বলিলাম। তাহারা কহিল, "কেমন করিয়া সংবাদ দিব? কারণ, কোন ব্যক্তিরই ভিতরে যাইবার অধিকার নাই।"

শীতকালের রাত্রে, নাইনিতালে, রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত আমরা দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলাম। সভা ভাঙ্গিলে, সাহেবগণ বাহিরে আসিলেন। যত বড় বড় উচ্চপদস্থ সাহেব নাইনিতালে ছিলেন, সকলেই সেদিন সেই ঘরে একত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আমাদিগকে এরূপভাবে দেখিয়াই চমকিত হইলেন। ক্রস্‌ম্যান ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "সংবাদ কি?" আমি প্রকৃত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলাম। তখন ক্রস্‌ম্যান আমাদিগকে লইয়া পুনরায় সেই মন্ত্রণা-গৃহে গেলেন। গুপ্তচরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বল, তুমি কি সংবাদ আনিয়াছ?—যাহা জান, ঠিক তাহাই বলিও, একচুল এ-দিক ও-দিক করিও না।"

চর যোড়হাতে কহিল,—"প্রথম সংবাদ দিল্লীর পতন। দ্বিতীয় সংবাদ, নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁ ষোল হাজার সৈন্য একত্র করিয়া, হল্‌দোয়ানি এবং নাইনিতাল আক্রমণার্থ কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। দেওয়ান শোভারামের পরামর্শে এই সকল কাজ হইতেছে। আর বড় অধিক বিলম্ব নাই। সম্ভবতঃ দুই দিন মধ্যে অসংখ্য মুসলমান-সৈন্য দ্বারা হলদোয়ানি পরিবেষ্টিত হইবে। হলদোয়ানির ১৪ মাইল দূরে ফজলহক্‌ প্রায় সাত হাজার সৈন্য লইয়া সাগুা নামক স্থানে ছাউনি করিয়া আছে। আর একজন মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষ—তাহার নাম কালে খাঁ—প্রায় দশ সহস্র সৈন্য লইয়া বহেড়ি নামক স্থানে আড্ডা করিয়াছেন। বহেড়ি, হলদোয়ানি হইতে ষোল মাইল দূরস্থ। অতি গোপনে এরূপ সেনা-সমাবেশের কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল, এক দল সৈন্য সম্মুখ এবং অন্য দল সৈন্য পশ্চাৎ হইতে আসিয়া হলদোয়ানি আক্রমণ করিবে। কিন্তু শত্রুদল, এক্ষণে সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া, এক নূতন কল্পনা করিয়াছে। কালে খাঁর সৈন্য গতকল্য চারপুরা নামক স্থানে আসিয়া ছাউনি করিয়াছে। ঐ স্থানে, শীঘ্রই তিনি ফজলহকের সৈন্যের সহিত মিলিত হইবেন। উভয় সৈন্য একত্র হইলে কালে খাঁ প্রায় ষোল হাজার সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া হঠাৎ হলদোয়ানি আক্রমণ করিবেন। হুজুর ইহাই আমার সংবাদ!"

কর্ণেল ক্রস্‌ম্যান কহিলেন, "তোমার সংবাদ সত্য। গতকল্য আমরাও এই ভাবে সংবাদ পাইয়াছি।"

ক্রস্‌ম্যান তখন এক ভীতিব্যঞ্জক বংশীধ্বনি করিলেন। আবার, নাইনিতালের প্রধান প্রধান সাহেবগণ, রাত্রি ১০টার সময় সেই মন্ত্রণা-গৃহে উপনীত হইলেন। আবার রুদ্ধদ্বারে পরামর্শ হইল। রাত্রি ১১টার সময় আবার সভাভঙ্গ হইল। আমরা কর্ণেল ক্রস্‌ম্যানের সহিত সেই রাত্রেই নাইনিতাল হইতে হলদোয়ানি প্রত্যাগত হই। অদ্যকার তারিখ ৯ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ।

পরদিন ১০ই ফেব্রুয়ারি, বেলা দশটার সময় নাইনিতাল হইতে প্রধান প্রধান সাহেবগণ হলদোয়ানিতে আসিলেন। তখন সর্ব্বশুদ্ধ ৮০ জন ইংরেজ একদল হইয়া হঠাৎ উপনীত হইলেন। বেলা দ্বিপ্রহরে আবার একশত ইংরেজ হলদোয়ানিতে আগমন করিলেন। নাইনিতাল সাহেব শূন্য হইল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ক্রস্‌ম্যান সাহেবের বৃহৎ তাম্বুর ভিতর সাহেবগণ কি একটা পরামর্শ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তাঁহারা অনেকক্ষণ পরামর্শ করিয়া আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আমি উপস্থিত হইলাম। কর্ণেল ম্যাক্‌সল্যাণ্ড সাহেব আমাকে বলিলেন, "অদ্য রাত্রে আমরা এখান হইতে যাত্রা করিয়া বিদ্রোহী-সেনাদিগকে আক্রমণ করিব; তুমি চুপে চুপে রেশালদারগণকে এই সংবাদ জানাও এবং সেনা-নিবাসে যাইয়া যে সকল সৈন্যকে উপযুক্ত বিবেচনা করিবে, তাহাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে বল।" আমি এই আদেশ পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ লাইনে আসিলাম এবং অশ্বারোহী সেনাগণকে যোদ্ধবেশে সাজিয়া শ্রেণীবদ্ধ হইতে বলিলাম। এই কথা শুনিয়া ছয় শত সওয়ার শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। আমি তাহাদের মধ্য হইতে তিন শত কর্ম্মক্ষম, অমিত-বলশালী অশ্বারোহীকে মনোনীত করিয়া লইলাম। তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্র এবং ঘোড়া যুদ্ধের উপযোগী ছিল তাহাদের ঘোড়াগুলিকে পৃথক্‌ স্থানে বাঁধিতে বলিয়া কর্ণেল সাহেবের আদেশ শুনাইয়া বলিলাম, "তোমরা যুদ্ধের জন্য সশস্ত্রে প্রস্তুত থাক।

হুকুম পাইবামাত্র ঘোড়ায় জিন আঁটিয়া যাইতে হইবে।” এই সকল বন্দোবস্ত করিয়া, সাহেবকে আসিয়া সংবাদ দিলাম। সাহেব বলিলেন, যখন আবার প্রয়োজন হইবে, তখন আমাকে সংবাদ দিবেন।

এই কথা শুনিয়া আমি বাসায় আসিলাম। কিন্তু তখন আমার অন্য চিন্তা ছিল না, যুদ্ধের চিন্তাতেই আমার মন নিমজ্জিত হইয়াছিল। এ সময়ে কোন্ কাজ করা উচিত, কি করিলে মঙ্গল হইবে, কি কাজই বা বাকি থাকিল, তাহাই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। হঠাৎ একটী কথা মনে উদয় হইল। তৎক্ষণাৎ লাইনে গেলাম; এবং সেখানে যে সকল শাণ-কারক ছিল, তাহাদিগকে ডাকাইয়া অস্ত্র শস্ত্র শাণ দিতে বলিলাম। বারুদাগার হইতে ৪০,০০০ চল্লিস হাজার টোটা বাহির করিয়া, প্রত্যেক সিপাহীকে ৩০টা করিয়া দিলাম, অবশিষ্ট কার্ট্রিজ দুইটা বাক্সে বদ্ধ করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য রাখিলাম। যে সকল খালাসী ভিস্তি আমাদের সঙ্গে যাইবে, তাহাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে বলিলাম। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আহত লোক আনিবার জন্য হাঁসপাতালে একখানি মাত্র ডুলি এবং ছয়জন কাহার ছিল; কিন্তু তাহাতে কাজ চলিবে না ভাবিয়া নাইনিতাল হইতে আরও ডুলি এবং ডাণ্ডী আনাইলাম। ডাক্তার বাবু নন্দকুমার মিত্রকে বলিলাম, যে সকল ঔষধ এব অস্ত্রের প্রয়োজন হইবে, তাহা যেন স্থির করিয়া রাখিয়া দেন। যে সকল বাঁকি বাক্স পেটরা **Medicine instruments** লইয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগকে গোছাইয়া স্থির করিয়া রাখিতে বলিলাম। এই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে রাত্রি প্রায় ৮টা বাজিয়া গেল। সমস্ত দিন অনবরত পরিশ্রম করিয়া অতিশয় ক্লান্তি বোধ হইল, বিশ্রামলাভার্থ বাসায় আসিলাম বাসায় আসিয়া বসিতে না-বসিতে একজন আরদালি আসিয়া সংবাদ দিল, কর্ণেল সাহেব আপনাকে ডাকিতেছেন। আমার শ্রান্তিদূর করা আর হইল না। তৎক্ষণাৎ সাহেব-সমীপে উপস্থিত হইলাম। সাহেব বলিলেন, যুদ্ধের জন্য সমুদয় প্রস্তুত আছে কিনা?” আমি অতি বিনয়-নম্রভাবে বলিলাম যে, সকলই প্রস্তুত আছে এবং যেরূপ বন্দোবস্ত করা গিয়াছিল, একে একে তাহাও বলিলাম। কর্ণেল সাহেব তাহা শুনিয়া অপরিসীম আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন, “অভিযানের আর অধিক বিলম্ব নাই; রাত্রি ১০টার সময় সকলকে যাত্রা করিতে হইবে।” অধিকন্তু তিনিও যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হইতে চলিলেন। তিনি আরও বলিলেন, “নেপালের জঙ্গ বাহাদুর আমাদের সাহায্যের জন্য যে একদল গোরখা পল্টন পাঠাইয়াছেন, তাহারা গত কল্য নাইনিতালে আসিয়াছে, তাহাদের অর্দ্ধেক এবং সরকারি যে গোরখা সৈন্য আছে, তাহারও অর্দ্ধেক লইতে হইবে। নাইনিতালে কি সিবিল, কি সামরিক-বিভাগের সাহেব, এমন কি সাহেব-কেরাণীরাও যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সকলের সংখ্যা দুই শতের ন্যূন হইবে না। কাশীপুরের জঙ্গলের দিকে আমাদের যে প্রায় দেড় শত সরকারি হাতী আছে, তাহা পাঠাইয়া দিবার জন্য কাপ্তান ব (Baugh) সাহেবকে লেখা হইয়াছে। হস্তীদল অতি ত্বরায় আসিতেছে। পদাতিক সৈন্যেরা এই সকল হস্তী-আরোহণে যাইবে। এক্ষণে তুমি যাও, আর যদি কোন আয়োজনের বাকি থাকে, তাহা হইলে সে কাজ শীঘ্র যাইয়া সম্পন্ন কর। সওয়ারদিগকে অতি সাবধানে নিঃশব্দে প্রস্তুত হইতে বলিবে, বিউগুল (বাঁশী) বাজাইতে নিষেধ করিবে। আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র যাও।”

ইহা শুনিবা মাত্র আমি দ্রুতপদে আবার

লাইনে আসিলাম এবং যাহা করণীয় ছিল, তাহা সম্পন্ন করিতে লাগিলাম। আরদালির কাজের জন্য বাছিয়া বাছিয়া ৩০ জন সওয়ারকে সঙ্গে লইলাম। যে সকল সৈন্যেরা অভিযানের জন্য প্রস্তুত ছিল, পরিদর্শনের জন্য তাহাদিগকে প্যারেড-ভূমিতে লইয়া গিয়া সাহেবদিগকে সংবাদ দিলাম, সাহেবেরা আসিয়া সকল দেখিতে লাগিলেন। এমন সময়ে নাইনিতাল হইতে সৈন্য সামন্ত ও ঘোড়া সকল আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের তিনটী (**Mountain trainguns**) পর্ব্বতের ব্যবহারোপযোগী কামান ছিল। এক একটী কামান লইয়া যাইবার জন্য দুই দুইটী হাতী নিয়োজিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে হিন্দুস্থানী সিপাহীরাই গোলন্দাজের কার্য্য করিত, কিন্তু বিদ্রোহের সময় তাহাদের উপর সন্দেহ হওয়াতে, সকলকে বিদূরিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই বিশ্বাস-হন্তারা বিতাড়িত হইয়া বিদ্রোহীদলের গোলন্দাজের কার্য্যে নিযুক্ত হয়। যাহা হউক, গোরখা পণ্টনেরা ইহাদের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং কর্ণেল ম্যাক্‌স-ল্যাণ্ড সাহেবের শিক্ষার অধীনে থাকিয়া এই গোরখারাই অতি অল্পকালমধ্যে গোলন্দাজের কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল।

রাত্রি ৯॥ ঘটিকার সময় অভিযানের জন্য সকলই প্রস্তুত, কেবল হুকুম পাইবার অপেক্ষায় আমরা রহিয়াছি। শীতকাল হইলেও আজ রাত্রি তত হিমানীমণ্ডিত নহে। রজনী জ্যোৎস্নাময়ী, আকাশ অতি পরিষ্কার, চন্দ্রমা অতি সুনির্ম্মল। শশধরের সমুজ্জ্বল কিরণে পৃথিবী যেন রজতময়ী হইয়া উঠিয়াছে। যোদ্ধৃবৃন্দ সকলেই সসজ্জ, তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্র চন্দ্রকর প্রতিবিম্বিত হইয়া বিদ্যুতের ন্যায় চকমক্ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কাহার দক্ষিণ করে বর্ষা, বাম হস্তে বল্লা, পর্য্যাণে বন্দুক, পৃষ্ঠদেশে তোষদান। এদিকে অমিততেজা অশ্ব, যুদ্ধবাসনায় বড় অধীর হইয়া উঠিয়াছে; সম্মুখের পাদ দ্বারা সরোষে মৃত্তিকা খনন করিতেছে। গ্রীবা বক্র করিয়া একবার এ-দিক্ একবার ও-দিক্ দেখিতেছে। খলীন-চর্ব্বণে মুখ ফেনাযুক্ত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে হ্রেষারবে প্রান্তর কম্পিত করিয়া তুলিতেছে। ঘোটকারূঢ় যোদ্ধারা অতি কষ্টে আপন আপন অশ্বের বেগ সংযত করিয়া রাখিয়াছে। হস্তীরাও আজ রণমদে উন্মত্ত। তাহাদের সুবিস্তৃত পৃষ্ঠে সুন্দর আস্তরণ, শস্ত্রপাণি রণোন্মুখ যোদ্ধৃগণ তাহাতে সমারূঢ়। এই সকল সেনাকে পৃষ্ঠে করিয়া মনের আনন্দে হেলিতেছে দুলিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে শুণ্ড আস্ফালন করিতেছে। যাহা হউক, এখন সকলেই বীরমদে উন্মত্ত, মৃত্যুভয় সকলের হৃদয় হইতে একেবারে অপসারিত হইয়াছে; সকলের চক্ষু হইতে যেন অগ্নিকণা বহির্গত হইতেছে। তাহারা কেবল অধিনায়কের আদেশের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে।

সেই সময় একজন চর শত্রু-শিবির হইতে আসিয়াছিল এবং আমাদের সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত ছিল। আমি হঠাৎ তাহাকে জিজ্ঞাসিলাম, "বিদ্রোহীদের অশ্বারোহী সেনার সামরিক পরিচ্ছদ কিরূপ?" সে বলিল, "বৃটিশ-সেনার পরিচ্ছদের সহিত শত্রু-সেনার পোষাকে কোন প্রভেদ নাই। আমাদের সেনার ন্যায় তাহাদেরও নীল বর্ণের কোট, লাল উষ্ণীষ এবং লাল কোমরবন্ধ।" এই কথা শুনিবামাত্র আমি সাহেবদের নিকট গিয়া বলিলাম, আমাদের সৈন্যের সামরিক-পরিচ্ছদের সঙ্গে বিপক্ষ-সেনার পোষাকের কোন পার্থক্য নাই; সকলই এক প্রকার। এমন স্থলে রাত্রে ভ্রমবশতঃ আত্ম-পর বিবেচনা না করিয়া হয় ত আপনাদের মধ্যে কাটাকাটি হইতে পারে; সুতরাং ইহার কোন সদুপায় করা উচিত। ইহার প্রত্যুত্তরে কর্ণেল সাহেব বলিলেন,—"**Now it is too late,**

can't be helped." আমি বলিলাম, যদিও আর সময় নাই বটে, কিন্তু যদি তিনি আদেশ করেন, তাহা হইলে এখনও ইহার প্রতীকারের উপায় আছে। সাহেব বলিলেন, "যদি এখনও ইহার প্রতীকারের পথ থাকে, তাহা হইলে এখনই তাহা কর, আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিলে চলিবে না।" আমি আর বিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে বাজারে গেলাম এবং এক দোকান হইতে দুই থান ধোয়া মারকিন ক্রয় করিয়া আনিলাম। উক্ত থান হইতে ছয়-ইঞ্চি চৌড়া চার ফুট লম্বা এইরূপ অনেকগুলি টুকরা করিলাম। সেই দুই খণ্ড বস্ত্র, সওয়ারদের দুই বাহুর উপর বাজুর ন্যায় বাঁধিতে বলিলাম। তাহারা তৎক্ষণাৎ বাঁধিয়া ফেলিল। আমি তখন সেই সওয়ারদের মধ্যে একজনকে সঙ্গে লইয়া সাহেব-সমীপে উপস্থিত হইলাম। সাহেব আমার প্রতি সকরুণ কটাক্ষ করিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "That will do very well Babu, now every body can recognise our own men from distance." অর্থাৎ বেশ হইয়াছে, এখন দূর হইতে অনায়াসে আমাদের সৈন্যকে চিনিতে পারা যাইবে।

যুদ্ধযাত্রা জন্য আমাদের সকল প্রস্তুত, আর বিলম্ব নাই। কিন্তু হল্‌দোয়ানী ত অরক্ষিত ভাবে রাখা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, নানাস্থানে শত্রুসৈন্য শিবির সংস্থাপন করিয়া আছে, পাছে তাহারা অন্য কোনও পথে আসিয়া বিভ্রাট ঘটায়! এই নিমিত্ত আমরা হল্‌দোয়ানী-রক্ষার্থ ২০০ দুই শত গোরখা সৈন্যও আর একটী কামান রাখিলাম; অবশিষ্ট সওয়ারগণও রহিল। শত্রুসেনা পূর্ব্বাহ্নে আসিয়া কোথায় আমাদের আক্রমণ করিবে স্থির করিয়াছিল, তাহা না হইয়া আমরাই তাহাদের বিনাশ-সাধনের জন্য অগ্রবর্ত্তী হইলাম। রাত্রি যাই ১০টা বাজিল, অমনি আমাদের যুদ্ধযাত্রা করিবার আদেশ হইল এবং সেই সঙ্গে এ আজ্ঞাও প্রচারিত হইল যে, যাইবার সময় কেহ কোন কথা কহিতে পারিবে না। যতদূর সম্ভব, আমরা অতি সাবধানে এবং নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিলাম।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

এ সময়ে আমিও অশ্বারূঢ় হইয়া যোদ্ধবেশে সাহেবদের সঙ্গে মিলিত হইয়া যাইতেছিলাম। পর্ব্বাগ্রে আট জন সওয়ার এবং দুই জন দফাদার। তাহার পর জেনারেল টুরূপ, কর্ণেল ক্রেশম্যান, কর্ণেল ম্যাক্‌সলেন এবং আমি। তার পর, সমস্ত অশ্বারোহীদল। তার পর কামানশ্রেণী। অবশেষে হস্তীপৃষ্ঠে পদাতি-সেনা। এই ভাবে প্রথমে আমরা যাত্রা করিয়াছিলাম। আমি যখন রেশালার কর্ম্ম করিতাম, তখন আমার বেশভূষা সকলই হিন্দুস্থানীদের ন্যায় ছিল, এখনও সেই বেশ, সেই সবই। আমার পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া হঠাৎ বাঙ্গালী বলিয়া চিনিতে পারিবার যো ছিল না; সুতরাং আমি সহজে হিন্দুস্থানী সওয়ার হইয়া সৈন্য মধ্যে মিশিয়া যাইতে পারিয়াছিলাম। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমার মনে অন্য কোন চিন্তাই স্থান পাইতেছিল না। কেবল যুদ্ধই ধ্যান এবং যুদ্ধই জ্ঞান হইয়াছিল। সমরসাজে সাজিয়া যুদ্ধে যাইতেছি, হয়ত শত্রুহস্তে নিহত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে, হয়ত অঙ্গচ্ছেদ হইয়া চিরদিনের জন্য বিকলাঙ্গ হইয়া থাকিব, এ সকল কথা তখন মনে একবারও উদয় হয় নাই। তখন কেবল যুদ্ধের উৎসাহে মন একেবারে উৎসাহিত হইয়াছিল। কিসে শত্রুসেনার ধ্বংস-সাধন করিব, তাহাই মনে মনে কল্পনা করিতেছিলাম। তখন আরও এই প্রকার বহুবিধ চিন্তা হৃদয়মধ্যে তরঙ্গায়িত হইতেছিল।

আমরা যখন ৯ মাইল আসিয়াছি, তখন রাত্রি ১টা বাজিল। শ্রান্তিদূর করিবার জন্য আমরা অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল এক স্থানে বিশ্রাম করিয়া আবার চলিতে লাগিলাম। সেই নিশীথ সময়ে অন্ধকারময় নির্জ্জন পথ দিয়া আমাদের সৈন্য চলিতে লাগিল। রাত্রি চারিটা বাজিল, আমরা একটী স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে দেখি, শত্রুদের পিকেট বা কতকগুলি প্রহরী, ঘাঁটি আগুলিয়া আছে। আমাদের অশ্বের পদশব্দে তাহাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ হ্যায়"। কাপ্তান ক্রসম্যান তখন সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া যাইতেছিলেন, তিনি উত্তর করিলেন, "হাম্‌লোক মৌলভী ফজলহক্ সাহেবকা আদ্‌মি হ্যায়, নবাব সাহেবসে মিলনে যাতেহেঁ।" এই কথা শুনিয়া তাহারা নিরুত্তর হইল। আমারা দুই শত পদ অগ্রবর্ত্তী হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া তাহাদিগকে একেবারে ঘিরিয়া ফেলিলাম। সেখানে যে সকল লোক প্রহরী রূপে ছিল, তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৩০ জন হইবে। এই সকল লোককে আমরা তরবারির আঘাতে এবং বর্শাফলকে একেবারে মৃত্যু-শয্যায় শায়িত করিলাম। তাহাদের মধ্যে কেহ প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিয়াছিল কিনা, তাহা অন্ধকারে ভাল জানা গেল না। এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে আমাদের তিনজন সওয়ার কিছু আহত হইয়াছিল মাত্র। আমরা এখানে এই শত্রু-দলকে শমনসদনে পাঠাইয়া আবার গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিলাম।

এখান হইতে চারপুরা প্রায় ৩ মাইল হইবে। কিছুক্ষণ পরে রজনী প্রভাত হইল। বাল-সূর্য্যের লোহিতোজ্জ্বল কিরণে পূর্ব্বদিক্ বিভাসিত হইয়া উঠিল। আমরা একটী নিম্নস্থানে গিয়া ছাউনি করিলাম। এখান হইতে শত্রু-শিবির প্রায় এক মাইল হইবে। কিন্তু তাহাদের ধবলাকৃতি শিবির তাহাদের সৈন্য-সামন্ত অনায়াসে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। যে নিম্ন-ভূমিতে আমরা শিবির স্থাপন করিলাম, তাহা আমাদের বিশেষ সুবিধাকর ; ইচ্ছা করিলে আমরা অনায়াসে অলক্ষিতভাবে শত্রু-সেনাদের গতিবিধি দেখিতে পাই, কিন্তু তাহাদের নিকট আমরা অদৃশ্যভাবেই রহিলাম। এ বিগ্রহে কর্ণেল ম্যাকস্‌ল্যাণ্ডই অধিনায়ক ছিলেন, তিনিই ইহার সকল বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

হস্তিপৃষ্ঠে যে সকল সেনা আসিয়াছিল, তাহারা অবতরণ করিলে, হাতীগুলি মাহুতেরা জঙ্গলমধ্যে লইয়া গেল। পার্ব্বত্য স্থানে ব্যবহারোপযোগী যে দুইটী কামান আনিয়াছিলাম, তাহা কামানাধারে রাখিয়া উহা যথোপযুক্ত স্থানে বসান হইল এবং সকল সৈন্যকে একত্র করা গেল। তদনন্তর কি করা কর্ত্তব্য, তাহা নির্দ্ধারণের জন্য সাহেবদিগের সমিতি বসিল। এখানে অনেক তর্ক বিতর্ক হইতে লাগিল। ম্যাকস্‌ল্যাণ্ড সাহেব প্রস্তাব করিলেন, "আমরা যে এখানে আসিয়াছি, এ সংবাদ বিদ্রোহীগণকে জ্ঞাপন করা উচিত।" কেহ বলিলেন, "একেবারে আমরা সসৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করি।" কেহ বলিলেন, "আমরা অতি অল্পমাত্র সেনা লইয়া আসিয়াছি, যদি আমরা একেবারে বিপক্ষ দলের উপর চড়াও হই, তাহা হইলে আমাদের একজন সৈনিকের উপর তাহাদের ২৫জন লোক পড়িলে নিশ্চয় আমাদিগকে পরাজিত হইতে হইবে। এমন স্থলে প্রথমত আমাদের দূর হইতে তাহাদের সঙ্গে কামানের লড়াই করা শ্রেয়ঃ।"

এই পরামর্শ স্থির করিয়া আমাদের পক্ষ হইতে একটী কামানের ফাঁকা আওয়াজ করা হইল। এই শব্দ হইবামাত্র শত্রুপক্ষ হইতে একেবারে ১০ টা তোপধ্বনি হইয়া উঠিল। শত্রুদের গোলা ভীমবেগে আমাদের দিকে ছুটিতে লাগিল। কামানের মুহুর্মুহুঃ গভীর-নিনাদে পার্ব্বত্যস্থান একেবারে বিকম্পিত হইয়া

উঠিল। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, আমরা নিম্নভূমিতে আড্ডা করিয়াছিলাম। বিপক্ষদলের গোলা প্রথমতঃ আমাদের মস্তকের হস্ত উর্দ্ধ দিয়া যাইতেছিল; কিন্তু ক্রমে গোলা আরও নীচে আসিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া আমরা ভূপৃষ্ঠে লম্বমান হইয়া শুইয়া পড়িতে আদেশ পাইলাম। এই ভাবে আমাদের কিয়ৎকাল অবস্থান করিতে হইল। এ দিকে শক্ররা অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল অবিশ্রান্ত গোলাবৃষ্টি করিয়া আপনাদের বারুদাগার অকারণে নিঃশেষিত করিয়া ফেলিল। তাহাদের গোলা-বৃষ্টি মন্দীভূত হইয়া আসিলে, আমরা আবার পূর্ব্ববৎ দণ্ডায়মান হইয়া স্ব স্ব স্থান অধিকার করিলাম। উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া যুদ্ধ-বিশারদ তীক্ষ্ণবুদ্ধি কর্ণেল ম্যাকস্ল্যাণ্ড দূরবীক্ষণ দ্বারা শক্রদের অধিকৃত স্থান বিশিষ্টরূপে পর্য্যবেক্ষণ করত আমাদের দুইটী কামান যথোপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া গোলা চালাইতে আদেশ দিলেন। আমাদের প্রথম দুইটী গোলায় বিপক্ষদের ৩ টী কামান বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। আবার দুইটী গোলায় সেইরূপ কয়েকটী তোপ উণ্টাইয়া পড়িল। এইরূপে কর্ণেল ম্যাক্‌সল্যাণ্ড সাহেবের বিচিত্র শিক্ষা-কৌশলে এবং তাঁহার অব্যর্থ সন্ধানে বিদ্রোহীদের সকল তোপই বিনষ্ট হইয়া গেল। কামান নষ্ট করিয়া এবার আমাদের গোলা, বজ্রবেগে ঘোররবে শক্রসৈন্যমধ্যে পড়িতে লাগিল। কামানের ধূমে চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বিপক্ষ গোলন্দাদিগের আর তথায় তিষ্ঠান ভার হইল। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল। তথাপি নিস্তার নাই, আবার উপর্য্যুপরি গোলার উপর গোলা, তাহাদের সৈন্যমধ্যে পড়িতে লাগিল। এবার শক্রসেনা অস্থির হইয়া প্রাণভয়ে পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এক্ষণে গোলাচালান আর উচিত নহে বিবেচনা করিয়া আমাদের কামান ছোড়া বন্ধ হইল। শক্রসৈন্য আমাদের দিকে আসিতে লাগিল, আমরা শক্রসৈন্যের দিকে আসিতে লাগিলাম। এইবার বন্দুকের যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

আমাদের সঙ্গে অশ্বারোহী সৈন্য প্রায় ১৬০ জন এবং পদাতিক এক সহস্র ছিল। কিন্তু এরূপ সুকৌশলে তাহা শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছিল যে, দূর হইতে এমন অনুমান হইত, আমাদের সঙ্গে ৩ দল অশ্বারোহী এবং ১২ দল পদাতিক সৈন্য রহিয়াছে। আমরা দুইটী কামান লইয়া দ্রুতগতিতে ভীম-রবে দুর্দ্দমনীয় পরাক্রমে শক্রসেনা তরঙ্গমধ্যে গিয়া পড়িলাম। এখানে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। আমাদের সৈন্যেরা প্রথমতঃ বর্ষার বারিধারার ন্যায় কিয়ৎক্ষণ শক্রদের উপর অবিচ্ছেদে গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহারা আমাদের ভীষণ আক্রমণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিতে লাগিল। আমরা তাহাদের অনুসরণ করিলাম। প্রত্যেক একশত জন বিদ্রোহী পশ্চাতে আমরা কেবল দশবার জন ধাবিত হইতেছিলাম; কিন্তু তাহারা প্রাণ ভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতেছিল, পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিবার অবকাশ পায় নাই। যাহা হউক, যে স্থানে যাহাকে পাইলাম, তাহাকে হয় অসির আঘাতে, না হয় বর্শার ফলকে কিংবা বেয়নেটের খোঁচায় ভূতলশায়ী করিতে লাগিলাম। এরূপে আমরা পলায়নোদ্যত বিপক্ষদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রায় দুই-তিন মাইল গিয়া শেষে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিলাম। এ সময়ে সমরক্ষেত্রের ভীষণ ভাব দেখিয়া শরীর রোমাঞ্চিত হইল। সে স্থান শক্রশোণিতে একেবারে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে স্তূপাকৃতি মৃতদেহ, ছিন্নশির, ছিন্ন গ্রীব, ছিন্নদেহ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কোন স্থানে বা কতকগুলি অর্দ্ধমৃত অবস্থায় রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে গুলিতে কাহার বা জানু, কাহার বা হাত, কাহার বা অন্যান্য অবয়ব ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কেহ উত্থানশক্তি-রহিত হইয়া গভীর আর্ত্তনাদ করিতেছে। কেহ বা আসন্নকালে আত্মীয় স্বজনকে স্মরণ করিয়া যাতনায় আরও অধীর হইতেছে। মুমূর্ষুদের ঈদৃশ হৃদয়ভেদী কাতরোক্তিতে কিয়ৎকালের জন্য মন বড় বিচলিত হইল। কিন্তু রণক্ষেত্রে এ ভাব দীর্ঘকালস্থায়ী হইল না। যাহা হউক, চারিদিক্ পর্য্যবেক্ষণ

করিয়া দেখিলাম, প্রায় বারশত শত্রুসেনা যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া রহিয়াছে।

আমি যখন এই সকল দেখিতেছিলাম, তখন কর্ণেল সাহেব আসিয়া বলিলেন, "যুদ্ধে আমাদের যে সকল সেনা আহত হইয়াছে, তাহাদিগকে ডুলি করিয়া হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে কি না এবং এ সময়ে ডাক্তার নন্দকুমার মিত্রই বা কি করিতেছেন, তাহা একবার দেখা প্রয়োজন হইয়াছে।" আমরা এখানে উপস্থিত হইলে একটী বড় গাছের তলায় তৎসময়োপযোগী হাঁসপাতাল করিয়াছিলাম। সাহেবের এই কথা শুনিয়া, আমি দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া যথাস্থানে উপস্থিত হইলাম। সেখানে গিয়া দেখি, আমাদের ষোল জন আহত সিপাহী তথায় রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কাহার বা তরবারির, কাহার বা গুলির আঘাতে হস্তপদ জখম হইয়াছে; কেহই মরে নাই। ডাক্তার নন্দকুমার বাবু বলিলেন যে, যদিও সব ভাল বটে, কিন্তু তাঁহার বিষম আশঙ্কা হইতেছে, পাছে পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে শত্রুরা আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। নন্দকুমার বাবু যে একাকী ছিলেন, এমত নহে, তাঁহার জন্য ১২ জন অস্ত্রধারীরক্ষক অনবরত পাহারা দিতে ছিল; তথাপি তাঁহার এরূপ ভয় দেখিয়া মনে মনে হাসিলাম। পরে, তাঁহাকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিয়া পুনরায় আমি সমরক্ষেত্রাভিমুখে চলিলাম। পথিপার্শ্বে কত শব পড়িয়া রহিয়াছে, আমি তাহার মধ্য দিয়া যাইতেছি, এমন সময়ে পশ্চাতে একটী শব্দ শুনিতে পাইলাম। সে সময়ে সাধারণতঃ বিশেষ সতর্কিতভাবে ছিলাম, শব্দ শুনিবামাত্র পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি, একজন ভয়োরূ মুসলমান-সিপাহী বসিয়া বসিয়া, সেকেলে একটী সুদীর্ঘ হিন্দুস্থানী বন্দুক হস্তে করিয়া, দ্বিতীয় হস্তে পলিতাগ্রহণ করত আমার প্রতি লক্ষ্য করিতেছে। ইহা দেখিবামাত্র তাহাকে বন্দুকে পলিতা সংযোজিত করিবার অবসর না দিয়া, নিষ্কোষিত-অসিহস্তে নক্ষত্রবেগে অশ্বসঞ্চালনপূর্ব্বক, একেবারে তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। আমার এরূপ ক্ষিপ্রকারিতায় লোকটা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল এবং আর কোন উপায় না পাইয়া, তাহার দীর্ঘ বন্দুকের অগ্রভাগ দ্বারা আমার ঘোড়াকে খোঁচা মারিতে আসিল। আমার ঘোটক অত্যন্ত তেজঃশালী ছিল; সে আপনাকে বিপদাপন্ন দেখিয়া, একেবারে ১০ হাত দূরে লাফাইয়া পড়িল। ইত্যবসরে উক্ত সিপাহী পুনরায় বন্দুকে রঞ্জক দিয়া আমাকে গুলি করিবার জন্য পলিতা মাটিতে ঘসিয়া পুনরায় বন্দুকে সংলগ্ন করিবার প্রয়াস পাইল। আমিও আর বিলম্ব না করিয়া, তাহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া তরবারি উত্তোলন করিলাম, সেও পূর্ব্বের ন্যায় আমার অশ্বকে খোঁচা মারিতে উদ্যত হইল। সুশিক্ষিত ঘোটক একলম্ফে শত্রুর আক্রমণের সীমা অতিক্রম করিয়া স্থানান্তরে পড়িল। এইরূপে সেও আবার বন্দুকে রঞ্জক দিয়া পলিতা মাটিতে ঘষিয়া আমাকে মারিবার চেষ্টা বিধিমতে করিতেছে, আমিও তাহার মুণ্ডপাতের চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তাহার কৃতকার্য্য না হইবার পক্ষে একটী বিশেষ অন্তরায় ছিল যে, তাহার বন্দুকটী দেশী, রঞ্জকে বারুদ দিয়া পলিতা দিতে হইত। বারুদে পলিতা-সংযুক্ত করিবার পূর্ব্বেই আমি তাহার সমীপবর্ত্তী হইতাম, সে আত্মরক্ষার্থ বন্দুক দ্বারা আঘাত করিতে আসিত, আর রঞ্জকের বারুদ পড়িয়া যাইত। পুনরায় বারুদ দিতে বিলম্ব হইত বলিয়া, আমাকে গুলি করিতে পারে নাই। যাহা হউক, আমি তখন নিশ্চয় বুঝিয়াছি, এ দুর্ব্বৃত্ত আমার প্রাণ-বিনাশ না করিয়া ছাড়িবে না, আমিও তাহাকে কিন্তু অব্যাহতি দিতেছি না। আমারও বিশেষ অসুবিধা এই, আমি অশ্বপৃষ্ঠে রহিয়াছি; সে ভূতলে বসিয়া আছে। তাহার বন্দুক আমার তরওয়াল হইতে বড়, লম্বা;—এজন্য তাহাকে আঘাত করিবার সুবিধা হইতেছে না। আমরা কিয়ৎকাল এইরূপ পরস্পর পরস্পরকে বিনাশের চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে দেখি, লেপ্টেন্যান্ট বারওয়েল সাহেব তীরবেগে অশ্ব ছুটাইয়া আমাদের দিকে আসিতেছে। তিনি দূর

হইতে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"Banerjee! where is your revolver, have you forgotten it?" অর্থাৎ তোমার পিস্তল কোথায়? তাহার বিষয় কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ?" এই কথা শুনিবামাত্র আমার চেতনা হইল। আমার জিনের সম্মুখে চামড়ায় বাঁধা দুই পার্শ্বে যে দুইটী পিস্তল ছিল, এ কথা আমার তখন আদৌ স্মরণ ছিল না। পিস্তলের নাম হইবামাত্র আমার তখন তাহা মনে পড়িল। আমি তৎক্ষণাৎ তরবারি দাঁতে ধরিয়া পিস্তলটী ক্ষিপ্রহস্তে যথাস্থান হইতে বাহির করিয়া, শত্রুর মস্তক লক্ষ্য করত একেবারে উপর্য্যুপরি দুইটী আওয়াজ করিলাম। একটী গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল, দ্বিতীয় গুলি তাহার বক্ষঃস্থলে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতের বন্দুক মাটীতে পড়িয়া গেল এবং সেও "লা এলা ইল্লিল্লা মহম্মদ রসুল উল্লা" বলিয়া পঞ্চত্ব পাইল। এই সময়ে বারওয়েল সাহেব আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। আমরা উভয়ে সেই হত সৈনিক-পুরুষকে দেখিতে গেলাম। দেখি যে, যুদ্ধের সময় গুলি লাগিয়া তাহার দক্ষিণ জানুর হাড় ভাঙ্গিয়া উত্থানশক্তি রহিত হইয়াছিল। আমাকে একাকী দেখিয়া আত্মজীবনের প্রতিশোধ লইবার জন্য তাঁহার জিঘাংসাবৃত্তি বড়ই প্রবল হইয়াছিল, কিন্তু শেষে আমারই হস্তে তাহাকে মানবলীলা সংবরণ করিতে হইল। আমরা এখানে অপেক্ষা না করিয়া একেবারে রণস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ক্রমে আমার সঙ্গে চারিজন এবং লেপ্টেনেণ্ট বারওয়েল সাহেবের সঙ্গে ৫ জন সওয়ার আসিয়া জুটিল। কর্ণেল ট্রুপ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, "যুদ্ধস্থানে যদি আমাদের কোন লোক আহত হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে শীঘ্র তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাও।"

এই আদেশ পাইবামাত্র আমি তথনই সেই চারিজন সওয়ার সঙ্গে করিয়া যুদ্ধস্থানের চতুর্দ্দিক্ দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এইরূপে প্রায় এক মাইল দূর গিয়াছি, এমন সময়ে বিদ্রোহীদের ৫ জন অশ্বারোহী-সেনা জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আমাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। প্রথমে আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই,—পরে অশ্বের পদধ্বনি শুনিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি, শত্রুরা আমাদের অনুসরণ করিয়াছে। আমরাও অতুলসাহসে দ্রুতবেগে বিপক্ষদের সম্মুখীন হইলাম। দুর্ভাগ্যক্রমে অন্য একজন বিদ্রোহী-সেনা কোথা হইতে অতি দ্রুতবেগে হঠাৎ একেবারে আমার সম্মুখে আসিয়া আমার মস্তক লক্ষ্য করত তরবারির আঘাত করিল। সে প্রহার আমি কোন প্রকারেই নিবারণ করিতে পারিলাম না। শত্রুর অসি আমার উষ্ণীষে এবং কপালে লাগিল। আমি তখন তাহা ভ্রূক্ষেপও করিলাম না। আহত হইয়া আমার হস্তে যেন দ্বিগুণ বলসঞ্চার হইল; আক্রমণকারী আঘাত করিবার সময় আমার দিকে কিছু ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। আমি এই অবসরে আমার হস্তস্থিত তীক্ষ্ণধার তরবারি দৃঢ়তর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া আঘাতকারীর কণ্ঠে দারুণ প্রহার করিলাম। আমার তরবারি তাহার কণ্ঠ প্রায় ৮ ইঞ্চি ভেদ করিয়া ফেলিল। সে আর অশ্বের বেগ সংযত করিতে পারিল না, তাহাতে ঢলিয়া পড়িল, হস্তস্থিত তরবারি, ঝঙ্কন-শব্দে ভূতলে পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে সেও ধরাশায়ী হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এ সকল বিষয় লিখিতে যত বিলম্ব হইল, তাহার সিকি বা সিকির-সিকি সময়ের মধ্যে এ সকল কাজ সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহাকে ভূমিশায়ী করিয়া সঙ্গীদের দিকে চাহিয়া দেখি, তাহারা শত্রু-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া যুদ্ধ করিতেছে। আমি পিস্তল লইয়া শত্রুদের উপর গুলি চালাইলাম, একজন জখম হইয়া পড়িয়া গেল। অপর তিনজন প্রস্থান করিল; কিন্তু আমাদের চারিজন সওয়ার তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হইল, আমি আর গেলাম না, কারণ আমার কপালে যে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহাতে উষ্ণীষ ও দক্ষিণ ভ্রূর উপর চারি অঙ্গুলি চর্ম্ম কাটিয়া চক্ষের উপর ঝুলিতেছিল; রক্তস্রোতে গাত্রবস্ত্র প্লাবিত করিতেছিল। আমি উক্ত চর্ম্ম যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া উষ্ণীষের কাপড় দ্বারা তাহা অতি দৃঢ়রূপে বন্ধন করতঃ আবার

ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম। অনতিবিলম্বে আমার সঙ্গে তিনজন সওয়ার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বিদ্রোহীরা পলাইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহাদের একজন সঙ্গী গুরুতররূপে আহত হইয়াছে, এমন কি, সে অশ্ব পৃষ্ঠে বসিতে অক্ষম।" আমি ডুলি আনিয়া উক্ত আহত ব্যক্তিকে শীঘ্র হাসপাতালে লইয়া যাইতে বলিলাম। একজন সওয়ার ডুলির সঙ্গে গেল। আমি দুইজন সওয়ারকে সমভিব্যাহার করত কর্ণেল ট্রুপ সাহেব যেখানে ছিলেন, সেই দিকে অশ্ব চালাইলাম। যাইবার সময় দেখি, রণস্থলের একদিকে লেপ্টেনেণ্ট বারওয়েল এবং তাঁহার ৫ জন সমভিব্যাহারী অশ্বারোহীকে, বিপক্ষদের ৭ জন সওয়ার আসিয়া আক্রমণ করিয়াছে এবং উভয়পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়া গিয়াছে। আমরা সেই দিকে অশ্ব ধাবিত করিলাম এবং তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইলে উপযুক্ত অবসর পাইয়া পিস্তল ছুড়িলাম। গুলি একজনের ঘোড়ার মস্তকে লাগিয়া আরোহীশুদ্ধ ঘোড়াটী মাটীতে বসিয়া পড়িল। এই সময়ে আমার সঙ্গের একজন সওয়ার দ্রুতগতিতে তথায় গিয়া শত্রুপৃষ্ঠে দারুণ বর্ষা দ্বারা আঘাত করিল, সে আহত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। বারওয়েল সাহেবের সাহায্যার্থ আমাদিগকে আসিতে দেখিয়া বিদ্রোহী সেনা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল, কিন্তু যাইবার সময় তাহার মধ্যে একজন আমাকে গুলি করিল। গুলি আমার পায়ের সন্ধিস্থলে প্রবেশ করিয়া হাঁটুর অস্থি ভাঙ্গিয়া ফেলিল, কিন্তু তথাপি আমি অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলাম না। সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলাম। সেখানে শত্রুদের যে সকল কামান ছিল, তাহা দড়ী দিয়া বাঁধিয়া হাতী দ্বারা টানাইয়া আনিলাম। আমাদের সৈন্যেরা বিপক্ষদের যাহা কিছু পাইল, সকলই লুট-পাট করিতে লাগিল। এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে বেশ দুইটা বাজিল। এই সময়ে পার্শ্বস্থ জঙ্গলমধ্যে দামামাধ্বনি হইল। ইহা শুনিয়া আমরা অনুমান করিলাম, বিদ্রোহীরা হয় ত আবার সাজিয়া আসিতেছে। অমনি কর্ণেল ম্যাকসলাণ্ড যে দিক্ হইতে দামামার শব্দ আসিতেছিল, সেইদিকে তোপের মুখ ফিরাইয়া উপর্য্যুপরি ৭।৮ টা গোলা চালাইলেন। সেই অগ্নিময় লৌহপিণ্ড গভীর গর্জ্জনে বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করত বনস্থলী বিকম্পিত করিয়া তুলিল। শত্রুরা প্রাণভয়ে কোথায় যে পলাইয়া গেল, তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

যুদ্ধাবসানে দেখা গেল, আমাদের সৈন্যের দুইজন ইংরেজ আফিসার যোদ্ধা হত এবং নয় জন ইংরেজ আহত হইয়াছেন। অশ্বারোহীদের মধ্যে সাত জন হত, বাইশ জন আহত এবং পদাতিকদের মধ্যে বার জন হত ও উনিশজন আহত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শত্রু-সেনাদের মধ্যে প্রায় বার শত লোক রণস্থলে প্রাণসমর্পণ করিয়াছে। আর কতজন যে আহত হইয়াছে, তাহা গণনার অতীত। হতাবশিষ্ট ভয়ত্রস্ত বিদ্রোহীগণ প্রাণ লইয়া একেবারে আঠার উনিশ মাইল দূর বেরিলীতে প্রস্থান করিয়াছিল।

জয়-ডঙ্কা বাজাইয়া আমরা হল্‌দোয়ানিতে প্রত্যাগত হইলাম। সৈন্যগণের বিজয় উল্লাসে পথ, প্রান্তর, কানন একেবারে নিনাদিত হইতে লাগিল। কয়েকজন গুরখা-ভাট বিজয়গীত গাহিতে আরম্ভ করিল। রাত্রি ৯টার সময় হল্‌দোয়ানিতে আসিয়া পৌঁছিলাম।

সিপাহী-বিদ্রোহের অবসানে, আমরা পুনরায় বেরিলী সহরে আসিলাম। যেদিন বেরিলী প্রথম প্রবেশ করি, সেই দিন দেখিলাম, সহর শূন্যময়। পথে একটীও লোক নাই। দোকান বন্ধ। বড় বড় অট্টালিকা জনমানববিহীন। আমরা যখন বাজারের ভিতর দিয়া যাইতে লাগিলাম, তখন আমাদের ঘোড়ার পদশব্দে চারিদিক ভয়ঙ্কর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

আবার বেরিলীতে ইংরেজ-রাজত্ব বসিল। মনে অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। কিন্তু আর না। অদ্য এইখানেই আমার জীবন-চরিত শেষ করিলাম। জন্মভূমিতে অবশিষ্ট জীবনী আর প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত নহে।

জন্মভূমি।

৪র্থ ভাগ। } জ্যৈষ্ঠ। ১৩০১ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

স্বাধীন ভারত।

(ইতিহাস)

"কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে
ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃপরনির্ব্বৃতয়ে
কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে॥"

মম্মটভট্ট।

কাব্য-কামিনী, কর্ণকুহরে মৃদুমধুর কূজন করিয়া, মৃণাল-কোমল বাহুলতা কণ্ঠে অর্পণ করিয়া এবং সদ্যঃপরিতৃপ্তিকর, অতুলনীয় প্রেমপীযূষ-ধারায় হৃদয়ক্ষেত্র অভিষিক্ত ও পুলকপূর্ণ করিয়া আমাদের প্রাণে প্রাণে মাধুরীময়ী প্রেয়সীরূপে যে কেবল বিরাজ করেন, তাহা নহে; তিনি সময় বিশেষে অতি সন্তর্পণে পরম যত্নে আমাদিগকে কোলে লইয়া গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে নানাপ্রকার উপদেশ, বিবিধ গল্প এবং সেকেলে কাহিনী ধীরে ধীরে শুনাইয়া জরতী পিতামহীর সমুচ্চ আসনও অধিকার করিয়া থাকেন।

বলিব কি, কাব্য-কামিনীর কোন্ কলেবর তুমি ভাল বাস? নবীন ভাবুক! আমায় উপহাস করিতেছ? তা কর। তবু কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করিতে কুণ্ঠিত হইব না। ভাল করিয়া বুঝিয়া বল, সকল সময় স্মরণ করিয়া বল, "পিতামহী কি একেবারে তোমার কেহই নহেন?"

না হউন, আমি পিতামহীকেও বড় ভালবাসি, ভক্তি করি, অন্ততঃ আমার জন্যই আমি কাব্য-সীমন্তিনীর গরীয়সী পিতামহী-মূর্ত্তি একবার প্রকটন করিতেছি; হে প্রেয়সী-মূর্ত্তি-মোহিত নবীন ভাবুক! তুমি নয়ন নিমীলিত কর।

প্রকৃত কথা হইতেছে এই,—বাণভট্ট সংস্কৃতকাব্যে একজন মহাকবি। তিনি অন্ততঃ ১২০০ বার শত বৎসর পূর্ব্বের লোক। ইহা সকলেরই স্বীকৃত। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষের বা আর্য্যাবর্ত্তের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা তৎপ্রণীত কাদম্বরী ও হর্ষচরিত হইতে প্রতিপাদন করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কাব্যের মনোমোহন রসভাব-মাধুর্য্য অলঙ্কার-সৌন্দর্য্য প্রদর্শন এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য নিম্নে কতিপয় বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

১ম—ধর্ম্ম।

ভারতবর্ষে তখন দুইটী ধর্ম্ম সমুজ্জ্বল, এক সনাতন হিন্দুধর্ম্ম এবং নূতন বৌদ্ধধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় বৌদ্ধধর্ম্মেরও নানা শাখা প্রশাখা

সমুত্থিত হইয়াছিল। জৈনধর্ম্মও বৌদ্ধধর্ম্মের একটী শাখা। যাগ যজ্ঞের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান, শিব, দুর্গা, সূর্য্য, বিষ্ণু, কার্ত্তিকেয় এবং গণেশের পূজা, প্রতিমায় দেবতা পূজা এবং রাজা রাজপুত্রাদিরও পূজা-অর্চ্চনা-সন্ধ্যাবন্দনায় অনুরাগ প্রচুর ছিল। বৌদ্ধ ও হিন্দুর পরস্পর মনোমালিন্য ছিল না, বরং সদ্ভাবই ছিল। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক রচনার সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মে যে সব দোষ আশ্রয় করিয়াছিল, বাণভট্টের সময়ে তাহা দূরে—অতিদূরে ছিল। বৌদ্ধদিগকে পরোপকারী দয়ালু এবং হিংসাবিরত বলিয়া, সমাজ সম্মান করিতেন। শব-সাধন, মহামাংস-বিক্রয় প্রভৃতি তান্ত্রিক কার্য্যেরও তখন সুপ্রচলন ছিল। নানাবিধ তুক-তাক ঔষধ প্রদান, তন্ত্র মন্ত্র, ঝাড়ান কাড়ান, বৌদ্ধগণের মধ্যেও প্রবিষ্ট হইয়াছিল। প্রাতঃকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, কার্ত্তিকেয়, সূর্য্য ও বৈশ্বদেবের ন্যায়, বৌদ্ধ-উপাস্য জিন, আর্য্য অবলোকিতেশ্বর এবং অর্হৎ ইহাঁদিগেরও স্তবস্তুতি পাঠ করা হইত। হিন্দুর ঘরে এ সব স্তবপাঠ নিষিদ্ধ ছিল না। বৌদ্ধগৃহেও হিন্দু দেবতার প্রতি সম্মানাদি প্রদর্শন করা হইত।

গুরুভক্তি, দেবপূজা এবং ঋষিগণ-পরিচর্য্যায় অশেষ কল্যাণ লাভ হয়, এ বিশ্বাস তখনও ছিল। অপুত্রক ব্যক্তি, পুত্র-লাভের জন্য নানাবিধ ব্রত করিত। দেবগৃহে 'ধন্না' দেওয়া বা 'হত্যা' দেওয়া সর্ব্বরত্নগর্ভ পবিত্র জলে যথাবিধি গাভীর উদরতলে স্নান করা, রত্নযুক্ত স্বর্ণময় তিলপাত্র ব্রাহ্মণদিগকে দান করা, মণ্ডল-বিশেষের মধ্যে থাকিয়া দিগ্‌দেবতাগণের উদ্দেশে বলি প্রদান পূর্ব্বক কৃষ্ণপক্ষ-চতুর্দ্দশী-রাত্রিতে চতুষ্পথে স্নান করা, দেবতাগণের নিকট 'মানসিক' করা অর্থাৎ 'সিন্নি মানা', প্রসিদ্ধ নাগহ্রদে অবগাহন করা, অশ্বত্থ প্রভৃতি মহাবনস্পতিদিগকে পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ করা, কাকগণের জন্য দধিভক্ত প্রদান করা, মাদুলিতে করিয়া কবচ ধারণ করা এবং ওষধিসূত্র পরিধান করা,—এ সমস্তই বিশেষ বিশেষ কামনা-সিদ্ধির জন্য অনুষ্ঠিত হইত। ভূর্জ্জপত্রেই কবচ লেখা হইত, তবে, এখন যেমন অলক্তক দ্বারা লেখা হয়, তখন 'গোরোচনা' দ্বারা লেখা হইত, ইহা জানা যায়। অলক্তক দ্বারা লেখা হইত কি না জানা যায় না। তবে শাস্ত্রে কোন কোন স্থানে লেখা আছে, গোরোচনা ...ক্তক এবং কুঙ্কুম; ইহার মধ্যে যে-টী হয়, তদ্দ্বারাই লিখিতে পারা যায়।

তখন বাক্‌সিদ্ধ নগ্নক্ষপণক-(জৈনবিশেষ)-গণের অস্তিত্ব ছিল, হিন্দুর গৃহেও তাঁহারা সম্মানিত ছিলেন, কোন কামনা-পূরণের উদ্দেশে তাঁহাদিগকে আহারাদি দ্বারা পরিতুষ্ট ও সৎকৃত করিয়া তাঁহাদের আদেশ শুনিতে লোকের আগ্রহ ছিল।

পীড়াদি বিপত্তি উপস্থিত হইলে, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন তখনও হইত। হোম, বেদপাঠ, শৈবসূক্তপাঠ ও দুগ্ধ দ্বারা শিবস্নপন ইত্যাদি শাস্ত্রীয় স্বস্ত্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন স্থলে বৌদ্ধ স্তুতিপাঠও হইত।

সূতিকা-গৃহ-রক্ষার জন্য এবং প্রসূতি ও প্রসূতের বিপত্তি-বারণার্থ নারায়ণের সহস্র নাম পাঠ, বেদপাঠ, ষোড়শমাতৃগণপূজা ইত্যাদি কার্য্য বিভবানুসারে সম্পাদিত হইত। আর ষষ্ঠ দিবসের রাত্রিতে ষষ্ঠীপূজা (সূতিকা ষষ্ঠী পূজা) এবং সেই দিন রাত্রিজাগরণ করা হইত। আর রাত্রিকালে চন্দ্রোদয় হইলে, চন্দ্রদেবের উদ্দেশে কামিনীগণ অর্ঘ্য প্রদান করিতেন।

কিরাত প্রভৃতি ইতর জাতি শাক্ত ছিল। ব্রাহ্মণাদি জাতির মধ্যে শৈব সৌর অনেকে ছিলেন। ললাটদেশে ভস্ম ত্রিপুণ্ড্র অনেকেরই শোভা পাইত। মর্ম্ম হইল এই যে, তখন ধর্ম্ম

নূতনতর ছিল না; এখনকার মতই ছিল, তবে বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা যাগযজ্ঞ ত অধিক ছিলই, তদ্ভিন্ন অপরাপর অনুষ্ঠানও অধিক ছিল। মুনি ঋষির দর্শন তখনও পাওয়া যাইত। বৌদ্ধ জৈনাদি ধর্ম্মের ঘোরতর প্রাবল্যেও আমাদের ধর্ম্মের যে অনিষ্ট করিতে পারে নাই, ইংরেজের আমলে তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্ত,—বিশেষতঃ বিহারের নিকটবর্ত্তী পশ্চিমাদি প্রদেশের তাৎকালিক অবস্থাই প্রদর্শিত হইল। বৌদ্ধ-জৈন প্রাদুর্ভাবও এই সব দেশে অধিক ছিল। তৎকালে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব ও উজ্জ্বলতা দাক্ষিণাত্যে আরও অধিক ছিল, কেননা ধর্ম্মান্তরের পরাক্রম সে সব স্থানে বড় ছিল না।

২য়—বিদ্যা।

দ্বিজজাতি উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে বেদাদি শিক্ষা করিতেন। ছত্রিশ বৎসর বা চব্বিশ বৎসর বা দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য করার নিয়ম বোধহয় হ্রস্ব হইয়াছিল; বাণভট্টের ন্যায় সদ্বংশীয় বালকেরও চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত হইয়াছিল। তবে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম না থাকিলেও, সমাবর্ত্তন হইলেও, অধ্যয়ন করার নিয়ম ছিল।

ব্যাকরণ, কাব্য, মীমাংসা দর্শন, তর্কশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড ব্রাহ্মণের প্রধানতঃ শিক্ষণীয় ছিল। সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইতে হইলে, ঐ সকল বিদ্যা ত চাহি-ই; তদ্ভিন্ন রাজনীতি, ব্যায়াম-শাস্ত্র, নৃত্যগীতবাদ্য, চিত্রকর্ম্ম, গ্রহগণিত, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, ইন্দ্রজালবিদ্যা, মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ, ইতিহাস, ছন্দঃ, বাস্তুবিদ্যা, সর্ব্ববিধ ভাষা ও অক্ষর, সর্ব্ববিধ শিল্প, সন্তরণ, লম্ফ, বৃক্ষারোহণ পর্য্যন্ত সকল বিষয় শিক্ষা করা হইত।

ধনীর ঘরের মেয়েরাও সকল 'কলা' অর্থাৎ নৃত্যগীতাদি এবং বিবিধ শিল্পকার্য্য শিক্ষা পাইতেন; বলা বাহুল্য, ভাষা ও লিপি-শিক্ষাও এই সঙ্গে হইত।

রাজা মহারাজেরা সর্ব্ব বিষয়ে এক একজন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া একটী বিদ্যালয় করিয়া দিতেন; আপনাদের ঘরের ছেলেরা দুই একজন সহচর-সমভিব্যাহারে এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়নে নিযুক্ত হইত। ৫।৬ বৎসর বয়সে অধ্যয়ন আরম্ভ হইত; আর অধ্যয়ন শেষ হইলে, শিক্ষকেরা অনুমতি করিলে, বিদ্যালয় হইতে বাহির হইতে পারিত। কিন্তু যাবৎ বিদ্যাভ্যাস না হয়, তাবৎ শিক্ষকেরা বাহির হইতে অনুমতি দিতেন না। এই নিয়মে ৮।১০।১২ বা ততোধিক বৎসর বিদ্যালয়ে বন্দীর মত থাকিতে হইত। বিদ্যালয় হইত, একটী প্রকাণ্ড স্থান। চতুষ্পার্শ্ব পরিখা বেষ্টিত উচ্চ প্রাচীরে আবৃত, মধ্যে উদ্যান, সরোবর, অশ্বারোহণে ভ্রমণোপযোগী ভূভাগ এবং বৃহৎ প্রাসাদ। নানাবিধ পুস্তক, চিত্র-কর্ম্মোপযোগী যন্ত্রাদি এবং অন্যান্য শিল্পের সমগ্র উপকরণ এই প্রাসাদে এক একটী প্রকোষ্ঠে থাকিত। প্রাসাদগৃহ দ্বিতল, ত্রিতল হইত, নিম্নতলে ব্যায়াম-চর্চ্চা-স্থান সাধারণতঃ থাকিত। লৌহ-মুদ্গর লইয়া ব্যায়াম করার নিয়ম ছিল। সাধারণতঃ, ব্রাহ্মণের ছেলেরা টোলেই পড়িতেন। বিদেশী ছাত্রেরা সম্ভবতঃ আহারও পাইতেন। এইরূপ পরান্ন ভোজন করিয়াই বিদেশে বাণভট্ট অধিক বিদ্যাভ্যাস করেন। তবে এই আহার অধ্যাপকে দিতেন বা অপরে দিতেন, তাহা বলা যায় না।

দ্বিজাতিগণের সাধারণ শিক্ষাস্থান ছিল, টোল। টোলে পড়িতে বেতনাদি লাগিত না। সভার বিচার, বিচারে কলহ এখনকার ন্যায় তখনও ছিল। বলা বাহুল্য, টোল নামটী

নূতন। খনিজ্ঞান, রত্নপরীক্ষা, শকুনজ্ঞান অর্থাৎ কাকের এই প্রকার শব্দ ভাল, ঐ প্রকারশব্দ মন্দ; মৃগের ডাক ভাল কি মন্দ এবং কোন প্রকার শব্দ কোন্ প্রকার ফলের সূচনা করে, তাহা জানা; অশ্বশিক্ষা, রথবিদ্যা, হস্তিশিক্ষা, মৃত্তিকার প্রতিমাদি গঠন, ছুতারের কর্ম্ম, হস্তি-দন্তাদির কারুকার্য্য, ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ খনন করা, বিষনাশিনী বিদ্যা এবং দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি নানা বিষয় শিক্ষণীয় ছিল। কথা, আখ্যায়িকা ও নাটক গ্রন্থ তখনও বেশ প্রচলিত ছিল। কিন্তু সে সব প্রাচীন গ্রন্থ এক্ষণে অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে।

অনেক ব্রাহ্মণই সংসারী; সংসারী পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা, স্বগৃহে ছাত্রগণকে বিদ্যাদান করিতেন, সে নিয়ম অদ্যাপি অনেক স্থলে প্রতিপালিত হইতেছে।

৩য়—সমাজ।

হিন্দুসমাজ তৎকালে কিঞ্চিৎ শিথিল হইলেও সাধারণতঃ বৃত্তি-সাঙ্কার্য্য ঘটে নাই। ব্রাহ্মণের যাজন, অধ্যাপনা, ভূমিবৃত্তিভোগ; ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ ও প্রজাপালনাদি; বৈশ্যের কৃষি বাণিজ্যাদি; শূদ্রের সেবা ও শিল্পকর্ম্মাদি এবং সঙ্কর জাতির কারুকার্য্য প্রভৃতিই নির্দ্দিষ্ট জীবিকা ছিল। তবে, সাধু জৈন বা বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীরাও অনেক বিষয়ে সদ্‌ব্রাহ্মণের সমকক্ষ ছিলেন। কোন কোন্ বিষয়ে কোন কোন স্থলে, সদ্‌ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অধিক সম্মানও তাঁহাদের হইয়াছিল। কিন্তু সন্ন্যাসী না হইলে, সাধারণ বৌদ্ধধর্ম্মীরা জাতি-জীবিকা পরিত্যাগ করিত না। স্ত্রীলোকের স্বাতন্ত্র্য ছিল না। তবে, সংসারে গৃহিণীর—রাজার সংসার হইতে দরিদ্রের সংসার পর্য্যন্ত সর্ব্বসংসারেই সেই-সেই গৃহিণীর কর্তৃত্ব ছিল। সকল দিকই তাঁহাকে দেখিতে হইত। প্রভাকর-বর্দ্ধন-মহিষী যশোবতীর বর্ণনা দ্বারা তাহা বেশ বুঝা যায় *। অবরোধপ্রথা ছিল। তবে, আত্মীয়-স্বজনে অন্তঃপুরেও যাইতে পারিত। রাজাদের অন্তঃপুরে বৃদ্ধ ভৃত্য কঞ্চুকী ও বর্ষবর (ক্লীব) রক্ষক থাকিত। দেবতাদি-দর্শনার্থ স্ত্রীলোকেও সুরক্ষিত হইয়া পথে বহির্গত হইতেন। তবে অবগুণ্ঠন দ্বারা বদনমণ্ডল আবৃত থাকিত।

তৎকালে সমাজে বিলাস সম্ভোগ সম্পূর্ণ রূপে লব্ধপ্রসর হইয়াছিল। নৃত্য, গীত, বাদ্য দ্যূতক্রীড়ার প্রাচুর্য্য হইয়াছিল। বারবিলাসিনীরাও অসঙ্কুচিতভাবে নানা উৎসবে যোগ দিত। অনেক উৎসবে তাহাদিগেরই আবার প্রাধান্য হইয়াছিল, মদ্যের আদরও বিলাসি-সম্প্রদায়ে বিলক্ষণ ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণজাতি প্রায়ই এ সব কার্য্যে মিশ্রিত হইতেন না। ব্রাহ্মণজাতি প্রায়ই বিলাসি-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হন নাই।

বাণভট্ট নিজে অল্পবয়সে কিঞ্চিৎ বিলাসী হইয়াছিলেন, নৃত্য, গীত, বাদ্য ও দ্যূতক্রীড়ায় সম্ভবতঃ তাঁহার অভিনিবেশ ছিল, তাহাতেই তিনি সজ্জন-সমাজে উপহসিত এবং সুপণ্ডিত হইলেও মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের নিকট "মহানয়ং ভুজঙ্গঃ" বলিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। তবু তিনি ইন্দ্রিয়দোষে বা পানদোষে দূষিত হন নাই। তখন যে ব্রাহ্মণেরা প্রায়ই আত্মসংযমী সদাচারী ও বিলাসবিমুখ ছিলেন, তাহা বাণভট্টের ঘটনা দ্বারাই বিশেষরূপে অনুমেয়। সমাজে—তখন অনুলোম-বর্ণবিবাহ অপ্রচলিত

---

* দেবী তু যশোবতী, বিবাহোৎসবপর্য্যাকুলহৃদয়া হৃদয়েন ভর্ত্তরি, কুতূহলেন জামাতরি, স্নেহেন দুহিতরি, উপচারেণ নিমন্ত্রিতস্ত্রীষু, আদেশেন পরিজনে, শরীরেণ সঞ্চরণে, চক্ষুষা কৃতাকৃতপ্রত্যবেক্ষণেষু একাপি বহুধা বিভক্তেবাভবৎ। হর্ষচরিত।

হয় নাই। বহুবিবাহও সম্পূর্ণ ছিল। বাণভট্ট নিজে বলিয়াছেন, তাঁহার পারশব ভ্রাতা ছিল। ব্রাহ্মণের ঔরসে তদীয় শূদ্রজাতীয়া পত্নীর গর্ভে যে সন্তান হয়, তাহাদেরই পারশব সংজ্ঞা হইয়া থাকে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,

"—শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপি বা।"
"————বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ।"
যাজ্ঞবল্ক্য আচারাধ্যায় ৯১।৯২।

কিঞ্চিৎ পরনিন্দকতা এবং পাপসঞ্চার সমাজে তখনও হইয়াছিল। এইজন্য কলিকাল কলিকাল বলিয়া বাণভট্ট দু এক স্থলে আক্ষেপের আভাস দিয়াছেন। তবে বর্ত্তমান সমাজ হইতে সে সমাজ সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট ছিল। স্বাধীন দেশ, স্বজাতি রাজা, সদনুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণ, সমাজের প্রতি রাজা দৃষ্টিসম্পন্ন, কাজেই সামাজিক অবস্থা তখন উন্নত ছিল।

৪র্থ—আচার-ব্যবহার।

তাম্বুল-ব্যবহার তখন খুব ছিল। কিঞ্চিৎ সঙ্গতি থাকিলেই এক জন তাম্বুলদায়ক পরিচারক থাকিত। বিশেষ সম্পত্তি থাকিলে এক জন তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী অর্থাৎ তাম্বূলপাত্রগ্রাহিণী সেবিকা থাকিত। সে অনেক স্থলেই প্রভুর সঙ্গে থাকিত। যুদ্ধ-শিবিরে, রাজসভায়, রাজমার্গে অনেক স্থলেই তাম্বূলকরঙ্কবাহিনীকে দেখা যাইত। সর্ব্বদা সান্নিধ্য বশতঃ তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী প্রভুর অনেক রহস্য বিষয়ও জানিতে পারিত। স্ত্রীলোকেরও তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী থাকিত। কোন ভদ্রলোক উপস্থিত হইলে গৃহস্বামী স্বহস্তে তাম্বূল দিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেন।

ধনিগৃহে রমণীরাও মাথায় ছাতা দিতেন। কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেরই ছত্র ধারণ করিত স্ত্রীলোক। বলা বাহুল্য, দরিদ্রের আর ছত্রধারিণী ছিল না।

অনেক দিনের পর সাক্ষাৎ হইলে, গুরুজনকে অভিবাদন ও প্রণাম, স্নেহের পাত্রদিগকে আশীর্ব্বাদ ও বয়স্যাদির সহিত সম্ভাষণ করার রীতি এখনকার ন্যায় তখনও ছিল। আত্মীয় বয়ঃকনিষ্ঠদিগের মস্তক-চুম্বন, মস্তকাঘ্রাণ করিবার প্রথা ছিল। স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে বিশেষ প্রীতিস্থলে আলিঙ্গন দ্বারা সম্ভাষণ করা হইত।

গুরুজনের প্রসাদ লাভ করিলে, অথবা গুরুজন-সমক্ষে আপনাকে কেহ প্রণাম করিলে, গুরুজনকে প্রণাম করার প্রথা ছিল।

বাড়ীর বুড়া ঠাকুরাণীর গল্প গিলিতে গিলিতে শিশুগণের নিদ্রাবেশ তখনও হইত।

শস্যক্ষেত্রে বা লাউমাচা-শশামাচার এখন যেমন খড়ের মুরদ গড়িয়া দেওয়া হয়, তখনও তাহা হইত।

রাজা রাজড়ার কন্যার বিবাহ একটু বয়সে হইত। বিবাহের লগ্ন রাত্রিতেই দেখিয়াছি।

বিবাহাদি মঙ্গলকার্য্যে বিধবা স্ত্রীলোক থাকিতেন না। সধবারাই সে সবকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। আলিপানা দেওয়া প্রভৃতি কত রকম মঙ্গলকার্য্য 'গিন্নিবান্নি'রাই করিতেন। বরের অভ্যর্থনা, কন্যাকর্ত্তা নিজেই করিতেন। বিবাহের জন্য বেদী প্রস্তুত হইত, কুশণ্ডিকা এই বেদীর উপরেই নির্ব্বাহিত হইত। বিভবানুসারে বেদী সুসজ্জিত এবং সুশোভিত হইত। পঞ্চমুখ চিত্রবিচিত্র পূর্ণকুম্ভের উপরি পল্লব আর হস্তে ফল লইয়া দণ্ডায়মানা মৃণ্ময়-নারীমূর্ত্তি বেদীর চতুষ্পার্শ্বে রাখিবার নিয়ম ছিল। বর (প্রথমে) কৌতুকাগারে যাইতেন। তখনও স্ত্রী-আচারের প্রথা ছিল।

এই কৌতুকাগারই হইল, স্ত্রী-আচারের স্থান। লজ্জানম্রমুখী আসন্নপাণি-গ্রহণা কুমারী এই কৌতুকাগারেই থাকিতেন, বর তথায় আসিয়া স্ত্রী-আচারের হস্ত হইতে অব্যাহতি

পাইয়া বধূ-সমভিব্যাহারে বেদীতে আরোহণ করিতেন; তথায় বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইত। এ রীতি প্রায় এক প্রকারই আছে। বিবাহের পর, জামাতা শ্বশুরালয়ে দশ দিন পর্য্যন্ত থাকিতেন। তার পরে নববধূ-সমভিব্যাহারে দেশে যাইতেন।

বিবাহের সময়ে কন্যাকর্ত্তার বাড়ীতে প্রচুর বাদ্যধ্বনি ও মহোৎসব হইত। বরের আসিবার সময়ে আলো করা হইত, কিন্তু বরপক্ষে বাদ্য করা হইত কি না বলা যায় না। বর আসিতেন, যানে, আমরা কিন্তু হস্তিযানের কথাই পাইয়াছি। উপনয়নাদি সংস্কার যথাকালে করিবার নিয়ম ছিল। প্রবাসে যাত্রা করিবার সময় অক্ষমালা-গ্রহণ, যাত্রিক মন্ত্রপাঠ, শিবের দুগ্ধ স্নাপনাদি সহকৃত পূজা, হোম, ব্রাহ্মণকে ধনদান, শিখায় সিদ্ধার্থ (শ্বেতসর্ষপ) গ্রহণ, কর্ণে গোরোচনা-চিত্রিত, দূর্ব্বাঙ্কুর ধারণ এবং নমস্তবর্গের নিকট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্য করিতে হইত। দৈবজ্ঞেরা যাত্রিক দিনক্ষণ দেখিতেন। সময়ে সময়ে অনেক স্ত্রীলোক অশ্বারোহণ করিতেন। ভদ্রলোকের সম্মুখে জৃম্ভণ করিতে হইলে, হস্ত দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করা হইত। নীচ জাতিরা কুক্কুট পোষণ করিত। চাণ্ডাল অতীব ঘৃণ্য জাতি ছিল।

পুস্তক তখনও সূত্র দ্বারা বেষ্টিত থাকিত। সূত্রবেষ্টন খুলিয়া সম্মুখ-স্থাপিত শরশলাকা যন্ত্রে, পুস্তক রাখিয়া পাঠ করা হইত। এই যন্ত্র কিঞ্চিদুচ্চ এবং পুস্তক আটকাইয়া রাখিবার উপযোগী। এক্ষণে আমরা সেরূপ যন্ত্র দেখিতে পাই না। তবে দেশান্তরে আছে কি না জানিনা।

সাধারণ পুস্তক লিখিত হইত কাল কালি দ্বারা (হর্ষ)। কেবল তন্ত্রমন্ত্রের পুস্তক অলক্তক দ্বারা লিখিত হইত। (কাদম্বরী)।

৫ম—রাজা।

রাজা দেবাংশ, এ বিশ্বাস সকলেরই ছিল। মন্ত্রী রাজার প্রধান সহায় ছিলেন। প্রবল রাজা হইতে হইলে, দিগ্বিজয় করিতে হইত। দিগ্বিজয় করিবার প্রারম্ভে রাজাদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিতে হইত। দূত গিয়া বলিত, আপনারা হয় যুদ্ধ করুন, না হয় অধীনতা স্বীকার করুন। দিগ্বিজিগীষু রাজাদের প্রাতঃকালে গমন সময়ে সে দিন যত ক্রোশ যাইতে হইবে, ততবার পটহ শব্দ করা হইত, প্রত্যহ এইরূপ নিয়ম ছিল। রন্ধনোপযোগী সকল সামগ্রী সঙ্গেই থাকিত। বিশেষ সতর্কতা ও সাবধানতা রাজার একান্ত অবলম্বনীয় ছিল। উত্তম রাজারা প্রজাপুঞ্জকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন। অধীনস্থ রাজারা স্বয়ং বা প্রতিনিধি দ্বারা সর্ব্ব সময়েই মহারাজের দরবারে উপস্থিত থাকিতেন। মন্ত্রী থাকিতেন অনেক, তন্মধ্যে প্রধান মন্ত্রী থাকিতেন একজন। কুলক্রমাগত অনেকগুলি বিশ্বস্ত বীরপুরুষ রাজার শরীর-রক্ষক থাকিত। কি ব্রাহ্মণ, কি সন্ন্যাসী, কি অপরজাতি, সকলেই রাজ-দর্শন পাইতে পারিত। তবে অনায়াসেই যে তাহা ঘটিত, তা নয়। রাজসভায় প্রতীহারী থাকিত স্ত্রীলোক। প্রতীহারী বা এই জাতীয় অপর ভৃত্য, ভূতলে করতল এবং জানুদ্বয় স্থাপন পূর্ব্বক, রাজাকে কোন কথা বলিত।

ক্ষত্রিয় রাজাকে ব্রাহ্মণ দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া জয় শব্দপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতেন। অপর প্রজারা রাজার নিকট আসিয়া পঞ্চাঙ্গে * প্রণাম করিত। প্রসাদভাজন ভৃত্য প্রণাম করিলে, তাহার পৃষ্ঠে হস্তপ্রদান রাজারা করিতেন। ভৃত্য পুনরপি

* দুই হস্ত, সঙ্কুচিত পদদ্বয় এবং মস্তক ভূতলে রাখিয়া—এখন যেমন প্রণাম করা হয় তদনুসারে।

নমস্কার করিত। রাজাদিগের পাদপীঠে মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম, অধিক বিনয়ের চিহ্ন। তদ্ভিন্ন সাধারণতঃ ঘাড় নাড়িয়া বা দৃষ্টিপাত করিয়া অথবা কিঞ্চিৎ কথা কহিয়া কিংবা ঈষৎ হাস্য করিয়া পরের প্রণামাদি গ্রহণ করার প্রথা রাজাদিগের ছিল। আপনার অনুলেপনাবশিষ্ট চন্দনপ্রদান, নিজ কটিস্পৃষ্ট বস্ত্র-প্রদানাদি করা রাজাদিগের অতিশয় প্রসাদ-চিহ্ন ছিল।

রাজাদিগের একটী সাধারণ রাজসভা থাকিত; আর একটী অভ্যন্তর সভা থাকিত। প্রাতঃকালে প্রায় সাধারণ সভায় রাজারা বসিতেন, অপরাহ্নে প্রায় অভ্যন্তর সভায় থাকিতেন। সভায় রাজা রাজসিংহাসনে বসিতেন, অপরে স্ব স্ব উপযুক্ত কাষ্ঠাসন বেত্রাসনাদিতে উপবিষ্ট থাকিতেন। মন্ত্রি-সমূহ, অধীন রাজগণ, পণ্ডিত, রক্ষকপুরুষ, চামরগ্রাহিণী কতিপয় বারাঙ্গনা এবং অনুমতি-ক্রমে সমাগত আগন্তুকে সাধারণ সভাগৃহ পূর্ণ থাকিত। রাজার বিভবানুসারে সাধারণসভা-গৃহ, সিংহাসন ও গৃহসজ্জা সুন্দর হইতে সুন্দরতর হইত।

অভ্যন্তর সভায় অল্প সভ্য থাকিতেন। বিশেষ বিশ্বস্ত ব্যক্তি ভিন্ন এখানে অপরের যাইবার অধিকার ছিল না।

সুধাধবলিত সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদ বহু-ভূমিক এবং বহুকক্ষাশোভিত ছিল। বাহির হইতে অভ্যন্তর পর্য্যন্ত বর্ণনা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব বটে, কিন্তু সার্ব্বভৌম-সভ্য বাণভট্টের রাজপ্রাসাদ বর্ণনা পাঠ করিলে সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়।

রাজভবন একটী বৃহৎ নগরবিশেষ। সম্মুখে শ্বেত-পরিচ্ছেদ-পরিধান বহু পুরুষ দ্বার-রক্ষায় নিযুক্ত। কোন কক্ষায় অশ্বশালা, কোন কক্ষায় হস্তিশালা, কোন বিভাগে অত্যুচ্চ বেত্রাসনোপবিষ্ট বিচারকগণ বিচার-কার্য্যে নিযুক্ত; লেখকগণ, রাজশাসন পত্র-লিখনে ব্যাপৃত। কোন বিভাগে সুবিস্তৃত রাজসভা; কোন বিভাগে ক্রীড়াপর্ব্বত, কোন বিভাগে নাট্য-শালা, চিত্রশালা, কোন স্থলে সেনানিবাস, কোথাও বা ভৃত্যনিবাস, কোন স্থানে বা পশু-শালা এবং প্রশস্ততম সুন্দর শুদ্ধান্ত ও বৃহৎ বৃহৎ অভ্রংলিহ প্রাসাদমালা। ক্রীড়া-দীর্ঘিকা প্রমদবন প্রভৃতিও রাজভবনের অন্তর্গত।

রাজারা অনেক বিবাহ করিতেন, কিন্তু মহিষী বা দেবী সংজ্ঞা এক জনের ভাগ্যে ঘটিত। ছত্র ও চামর এই দেবী সংজ্ঞার চিহ্ন। অন্তঃপুরেও স্ত্রীজন-পরিচালিত নাট্য-শালা ছিল। প্রচুর পরিচারিকা, সৈরিন্ধ্রী এবং পুরন্ধ্রী অন্তঃপুরে থাকিতেন। নিতান্ত আত্মীয় এবং বিশ্বস্ত পুরুষ ভিন্ন অপরের অন্তঃপুর-প্রবেশে অধিকার ছিল না, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রাজসভা-ভঙ্গের সময় শঙ্খধ্বনি হইত। আবার রাজার স্নানের সময়ে নানা-বিধ বাদ্য ও শঙ্খধ্বনি হইত। সভাভঙ্গের পর রাজা ব্যায়াম করিতেন; তার পর পরি-চারিকা বারবিলাসিনীরা আমলকচূর্ণ মস্তকে মর্দ্দন করিলে সুগন্ধ জলপূর্ণ দ্রোণী অর্থাৎ টব বা চৌবাচ্ছায় নামিতেন, তথায় সিক্ত ও নির্ম্মল-দেহ হইয়া স্নানপীঠে আরোহণ করিলে, সুস্নিগ্ধ সুশীতল সুগন্ধ জল বারবিলাসিনীরা রাজার মস্তকে ঢালিয়া স্নানকার্য্য সমাপন করিত। তার পর, বস্ত্রান্তরগ্রহণ ও উষ্ণীষবন্ধন; উষ্ণীষ-বন্ধনের পর সন্ধ্যা, হোম, পূজা করিয়া রাজা, ধূপবর্ত্তি পান করিতেন। এই ধূপবর্ত্তি কি, তাহা জানি না। কেহ ভাবেন, চুরুট; কেহ বলেন, মুখ-সুগন্ধ-সম্পাদক বর্ত্তিবিশেষ। অনন্তর আচমনান্তে তাম্বুল গ্রহণ করিয়া যথা-সময়ে আহার সমাপন পূর্ব্বক অভ্যন্তর সভায় গমন করিতেন। সেই সময়ে আবশ্যক মত

মন্ত্রী ও রাজাদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইত। খড়্গবাহিনী, পাদসংবাহন করিত, রাজা মিত্রগণের সহিত প্রয়োজনীয় কথা কহিতেন। এইরূপে ক্ষণকাল বিশ্রাম লাভ হইত।

৬ষ্ঠ—বেশভূষা।

ক্ষৌম বস্ত্র, কার্পাস বস্ত্র, কৌষেয় বস্ত্র, নেত্র বস্ত্র, অংশুক এবং দুকুল এই ষড়্বিধ উত্তম বস্ত্র পাওয়া যাইত। চীন বস্ত্রও দেশে আমদানী হইত। এই রকম বর্ণনা আছে, কাপড়ের খোল সর্পনির্ম্মোকবৎ ঘন এবং সূক্ষ্ম হইত। তবে প্রথম ত্রিবিধ বস্ত্র মোটাও হইত। চণ্ডাতক নামে এক প্রকার পরিধেয় বস্ত্র ছিল, তাহা ঊরুদেশের অর্দ্ধভাগের অধিক নামিত না। শবর কিরাত চাণ্ডাল জাতিরা প্রায়শই তখন কৌষেয় বস্ত্র অর্থাৎ তসর কাপড় করিত। রাজারাও অতি শুক্লবর্ণ সর্পনির্ম্মোকবৎ ঘন সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতেন। উত্তরীয় বস্ত্রও ঐরূপ হইত। যে উত্তম বস্ত্রের প্রান্তভাগে গোরোচনা-চিত্রিত হংসযুগলের প্রতিমূর্ত্তি থাকিত, তাহা তখন বড় আদরণীয় ছিল। রাজারা সভাতেও উত্তরীয় এবং পরিধেয় বস্ত্রে সজ্জিত থাকিতেন। জামাজোড়া কিছুই থাকিত না। মুক্তাহার, কেয়ূর অর্থাৎ অনন্ত, কুণ্ডল প্রভৃতি অলঙ্কারে রাজদেহ অলঙ্কৃত হইত। বক্ষঃস্থল চন্দন-চর্চ্চিত, কুঙ্কুম-তিলকে ললাট এবং সুচারু পুষ্পমাল্যে মস্তক সুশোভিত থাকিত। স্ত্রীলোকেরও পরিধেয় এবং উত্তরীয় দ্বিবিধ বস্ত্র ছিল। নূপুর, কঙ্কণ, হার, তে-নলী কণ্ঠাভরণ, একাবলী, মুক্তামালা, কেয়ূর, মেখলা, * সীমন্তের চূড়ামণি, এবং কুণ্ডল, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ এবং রত্নময় বহুমূল্য অলঙ্কার স্ত্রীলোকের ছিল। দন্তপত্র অর্থাৎ হস্তি-দন্তনির্ম্মিত পত্রাকৃতি অলঙ্কার, তাহাও স্ত্রীলোকে ধারণ করিতেন। তমালপল্লব, যবাঙ্কুর, অশোকপল্লব প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ অবয়বও রমণীর কর্ণপালী পরিশোভিত করিত। চরণ-তলে অলক্তকরাগ, রমণীরা তখনও দিতেন। মেখলা পুরুষেও পরিধান করিত। বালকের কণ্ঠদেশে প্রবাল পরান হইত। আর সুবর্ণ-বদ্ধ ব্যাঘ্রনখ বালকের গ্রীবাভূষণ ছিল। নূপুরা-দিও বালকে পরিত। এখন যাহার নাম ঘুনসী, সেই কটিসূত্র, সেকালে নানারকমের ছিল। রাজোপায়নযোগ্য বহুমূল্য কটিসূত্রের কথাও আমরা হর্ষচরিতে পাইয়া থাকি। লৌহময় দৃঢ় বর্ম্ম, বিবিধ কঞ্চুক (জামা-বিশেষ) আপ্র-পদীন কঞ্চুক (পাদ পর্য্যন্ত লম্বমান জামা) তখনকার পরিচ্ছদ ছিল। রক্ষিপুরুষ, কঞ্চুকী, প্রতীহারী, দ্বারপাল, চামরগ্রাহিণী, ছত্র ধারিণী ইহারা সকলেই স্ব স্ব কার্য্যপালনের সময় কঞ্চুক বা লৌহবর্ম্ম যোগ্যতা এবং আবশ্যক অনুসারে ধারণ করিত। অনেক স্ত্রীলোকেই সময়-বিশেষে কঞ্চুক ধারণ করিতেন। দরিদ্র নীচ জাতীয়েরা, চিত্র বিচিত্র গালার বালা পরিত। তীর্থমৃত্তিকা এবং গোরচনার তিলক ললাটে ধারণ করা, সভ্যবেশের অনুষঙ্গী ছিল। জুতা পায়ে দেওয়া তখন খুব ছিল। মহাশ্বেতার ন্যায় ব্রহ্মচারিণীরও নারিকেলত্বক্ নির্ম্মিত উপানৎ ছিল। তৈল এবং আমলকচূর্ণ দ্বারা কেশ সুচিক্কণ করা হইত।

মুখাবরণের প্রস্তাবে 'জালিকা' শব্দের উল্লেখ আছে; জালিকা শব্দে সূক্ষ্মবস্ত্র নির্ম্মিত মুখের জালও হইতে পারে। তাহা হইলে তখন বিলাসি-স্ত্রীলোকেরা জালিকার দ্বারাও মুখাবরণ করিত।

* মেখলা—কটিভূষণ, চন্দ্রহারজাতীয়। কিন্তু ইহাতেও ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা দেওয়া হইত। মেখলা তিন ছালী বা পাঁচ ছালী হইত। মধ্যে মণি থাকিত।

৭ম—জনপদ—নগর, গ্রাম।

জনপদ বিস্তৃত ভূখণ্ড অর্থাৎ প্রশস্ত ক্ষেত্রসমূহ, শস্যরক্ষাস্থান, বনভূমি, গ্রাম, নগর জলাশয় এই সমগ্রই জনপদের অন্তর্গত। জনপদের চতুঃসীমান্তেই পর্ব্বতাকার শস্যরাশি সজ্জিত থাকিত। বলা বাহুল্য, জনপদে নানা জাতিরই বাস। পূর্ব্বকালের সু-জনপদে ব্রাহ্মণাদি জাতির বাস অসঙ্কীর্ণ ভাবে ছিল। যেস্থলে ব্রাহ্মণের বাস, সেস্থলে অপর জাতির বাস করা প্রথাবিরুদ্ধ ছিল। ক্ষত্রিয়াদি জাতি সম্বন্ধেও এইরূপ রীতি জানিবে।

বনের মধ্যেও কূপাদি জলাশয় খনন করিয়া দেওয়া হইত। পথিকেরা এই সব কূপে তৃণরজ্জু এবং পত্রপুট-যোগে পানীয় উত্তোলন করিতেন।

নানাবিধ যজ্ঞ, প্রস্তরময় দেবমন্দির নির্ম্মাণ, অতিথি-সৎকার এবং বিবিধ প্রকার দানধর্ম্ম, জনপদের, নগরের এবং সৎগ্রামের প্রাণস্বরূপ ছিল।

সুধাধবলিত অভ্রংলিহ প্রাসাদপঙ্ক্তি নগরের শোভা; তখনও তাই ছিল। প্রাসাদের উপরিভাগে, সুবর্ণকলস-স্থাপিত নানাবিধ পতাকা উড্ডীন হইত। ছাদের গঠন সমতলই ছিল। সোপানযোগে এই অট্টালিকার ছাদের উপর আরোহণ করা যাইত। গৃহের দ্বার এইরূপই ছিল। বাতায়ন, কপাটযুক্ত ও জালমণ্ডিত থাকিত। তবে, বাতায়ন বা জানালার 'গরাদে' ছিল কি না বলা যায় না। প্রয়োজন হইলে বাতায়ন-পথে বাহিরে মুখ বাড়ান যাইত।

সমৃদ্ধি-বর্ণনস্থলে 'মণিময় বাতায়ন' বলিয়াও উল্লেখ আছে। কুট্টিম (মেজে) প্রস্তরের হইত, বিশেষ ধনীর গৃহে মণিময় কুট্টিম ছিল। সভা, সত্র (অন্নসত্র), পানীয়শালা (ধর্ম্মার্থ-প্রতিষ্ঠিত জলপান-স্থান) এবং প্রাগ্বংশমণ্ডপ অর্থাৎ যজ্ঞশালা তখন নানাস্থানেই ছিল।

ব্রাহ্মণদিগের গৃহ বেদাধ্যয়ন-শব্দে পরিপূর্ণ, অঙ্গনের এক পার্শ্বে জলসেক-সুকুমার সোমলতার ক্ষুদ্র ক্ষেত্র; একপার্শ্বে কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্মোপরি শ্যামাক তণ্ডুল শুষ্ক হইতেছে; বালিকারা স্থানে স্থানে নীবারবলি দিয়া বেড়াইতেছে, কোন স্থানে শিষ্যেরা পবিত্রভাবে, কুশ পলাশ-সমিধের বোঝা আনিয়া রাখিয়াছে। রাশীকৃত ঘুঁটে, স্তূপাকৃতি উড়ুম্বর-শাখা, হোমধেনু, কৃষ্ণসার মৃগ, ছাগ-শাবক এবং অধ্যয়নতৎপর শুকশারিকা স্থানে স্থানে অবস্থিত। তখন ব্রাহ্মণ-গৃহ এই জাতীয়ই ছিল।

বনগ্রাম—অরণ্যচর-নীচজাতিরই বাসভূমি। প্রান্তভাগে ক্ষেত্রসমূহ, ক্ষেত্রমধ্যে শ্বাপদতাড়নার্থ এক একটী উচ্চ মঞ্চ, কোন স্থলে বা ব্যাঘ্রবধ যন্ত্র (বাঘ মারা কল) প্রতিষ্ঠিত; বাগুরা বীতংস লইয়া ব্যাধগণ ইতস্ততঃ ধাবমান, কুটীর-সমূহ কটতৃণের ঘন সন্নিবেশে নির্ম্মিত, ছিদ্র একবারেই নাই। বাঁশের বেড়া। তরুসমূহ সমাবেশে নির্ম্মিত এক একটী ক্ষুদ্র চামুণ্ডামণ্ডপ; এমন ক্ষুদ্র গ্রামেও ধর্ম্মার্থ প্রতিষ্ঠিত সুশীতল পানীয়শালা বিদ্যমান ছিল।

এই ভারতবর্ষে তখন, অনেকগুলি স্বাধীন খণ্ডরাজ্য ছিল। মালবরাজ্য, গৌড়রাজ্য, মহারাষ্ট্ররাজ্য, প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজ্য এবং শ্রীকণ্ঠ রাজ্য ইত্যাদি। প্রাগ্‌জ্যোতিষ (আসাম) প্রদেশে তখনও ভগদত্তের বংশধর ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ভাস্করবর্ম্মা রাজত্ব করিতেছিলেন। সকল দেশেই প্রায় ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তৎপরে শ্রীহর্ষবর্দ্ধন, অনেকগুলি রাজ্য বশীভূত করিয়া আপনি চক্রবর্ত্তী রাজা হন। চীন, পারসীক, তুরস্ক, শকরাজ্য এবং হূণরাজ্যের সঙ্গে বিরোধ তখন বা তাহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই ছিল। কিন্তু বলিয়া আর একটী বৈদেশিক

জনপদের উল্লেখ আছে; কিন্তু এই কিষ্ক্‌ দেশ কোন্‌টী, তাহা বলিতে পারিলাম না।

"আশ্চর্য্য-দর্শন-কুতূহলীব চণ্ডীপতিঃ, দণ্ডোপনতযবননির্ম্মিতেন নভস্তলযায়িনা যন্ত্রযানেন অনীয়ত ক্বাপি।"

হর্ষচরিতের এই অংশ টুকু পড়িলে, বোধ হয়, যেন চণ্ডীনগরীর অধিপতি একবার গ্রীকদিগকে পরাজিত করেন। যন্ত্রযুক্ত ব্যোমযান-নির্ম্মাতা যবন সম্ভবতঃ গ্রীকেরাই হইতে পারে। কিষ্ক্‌ শব্দে এই গ্রীস্‌ দেশও হইতে পারে।

পদ্মাবতী, শ্রাবস্তী, মৃত্তিকাবতী, মথুরা, অশ্মক, চণ্ডী, মগধ, মেকল, বিদেহ, কলিঙ্গ, করূষ, চকোর, চম্পা, চামুণ্ডী, কাশী, অযোধ্যা, বৈরন্তী সুঙ্গ, সৌবীর, কান্যকুব্জ, গৌড়, উজ্জয়িনী, অবন্তী শ্রীকণ্ঠ, স্থাণ্বীশ্বর (থানেশ্বর), মণিতার ইত্যাদি নগর নগরী ও জনপদের প্রীতিকূট, মল্লকূট এই দুইটী গ্রামের এবং যষ্টিগৃহ-নামক বনগ্রামের উল্লেখ বাণভট্ট করিয়াছেন। গঙ্গা, যমুনা, নর্ম্মদা, সরস্বতী, শোণ, অজিরবতী, বেত্রবতী এবং শিপ্রা প্রভৃতি কয়েকটী নদীর নাম আছে। পারি ত কখন এ সব স্থানের বিশেষ বিবরণ দিব। তখন হর্ষবর্দ্ধনের রাজধানী ছিল, বর্ত্তমান থানেশ্বর।

৮ম—দ্রব্যসামগ্রী।

কৃষ্ণাগুরুতৈল এবং অন্যবিধ গন্ধতৈল, (ইহা দ্বারা বিলাস-গৃহের দীপ প্রজ্বালিতও হইত) গন্ধজল (গোলাপ জল কি না বলা যায় না), পটবাস, কুঙ্কুম, গোরোচনা, উশীর, চন্দন, মৃগনাভি, কর্পূর, মৃণাল, কমলিনীপত্র, করঙ্ক মণিযষ্টি অর্থাৎ মণিময় পিলসুজ, পিচকারী, ধারাগৃহ (যে গৃহের চারি দিকে জলের ফোয়ারা), মণিদর্পণ, মণিময় পানপাত্র, চিত্রপট, বীণা, বেণু, মুরজ, মৃদঙ্গ, ইত্যাদি।

নারিকেল-সমুদ্গকও তখন বিলাসের পরম্পরা উপকরণ ছিল। নারিকেল-সমুদ্গক অর্থে নারিকেলের কৌটা, ইহা দেখিতে অতি সুন্দর। সুন্দর কি না যদিও স্পষ্ট তাহা উল্লেখ নাই, তথাপি বলিতে পারি, নারিকেল-সমুদ্গক বড়ই সুন্দর। কেননা, কাদম্বরী, ত্রিভুবন-রমণীয় শেষ নামক যে হার চন্দ্রপীড়কে প্রণয়োপহার প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার আধার ছিল, নারিকেল-সমুদ্গক। এমত অসাধারণ পাত্রে বিন্যস্ত অসাধারণ সামগ্রী একটা সামান্য কৌটায় যে থাকিবার উপযুক্ত নহে, ইহা বলাই বাহুল্য। বাণভট্ট বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের সম্রাট্‌-পুত্র চন্দ্রাপীড় সেই হার দেখিয়া অতীব চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সে হার কি যে-সে পাত্রে থাকিতে পারে?

সেই মহাকারুকার্য্যময়, লোচন-লোভনীয় নারিকেল-সমুদ্গক এক্ষণে কোথাও পাওয়া যায় কিনা জানি না। এতদ্ভিন্ন খর্জ্জুর-পুট সমুদ্গকেরও বর্ণনা আছে। তাহা বিলাস দ্রব্য নহে, সাধারণের ব্যবহার্য্য।

নারিকেল-সমুদ্গক নারিকেলের 'মালা'য় প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু খর্জ্জুর-পুট-সমুদ্গক, কিরূপে হইত, বলা যায় না; বোধ হয়, খর্জ্জুরত্বক্‌ দ্বারাই তাহা নির্ম্মিত হইত। সুতরাং এদিকে আবার সন্দেহ উপস্থিত হয়, নারিকেল-সমুদ্গকও কি ঐরূপ নারিকেলত্বক্‌ নির্ম্মিত? সে কথার নিশ্চয় উত্তর দিতে পারি না।

কারুকার্য্যময়, শঙ্খ ও শুক্তির বিবিধ পানপাত্র আসাম প্রদেশে পাওয়া যাইত।

'অনবরতগলন্নাড়িকাকলিতকালকলে' ইত্যাদি কাদম্বরী (১৩৩ পৃঃ) লিখিত পড়িলে বোধ হয় যেন তখনও এক প্রকার ঘড়ি ছিল।

২য়—পুরাণ-ইতিহাস।

"ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং ষষ্ঠঞ্চ সপ্তমং নয়েৎ।"

ইতিহাস এবং পুরাণ দুইটী জিনিষ; এখন ইতিহাসের অস্তিত্ব ধরিতে গেলে একবারেই বিলুপ্ত; কিন্তু বাণভট্টের সময়ে ইতিহাসের প্রচলন ছিল। বিদ্বান্ হইতে হইলেই ইতিহাস পড়িতে হইত।

চন্দ্রাপীড়ের বিদ্যাশিক্ষা স্থলে এবং অপরাপর স্থলেও ইতিহাস-পাঠের উল্লেখ আছে। পুরাণের কথাও আছে।

নারদীয় পুরাণ এবং বায়ু পুরাণের নাম স্পষ্টই লিখিত আছে। আর ভুবনকোষ-বর্ণনা যে পুরাণ মধ্যে আছে, সে কথাও বাণভট্ট বলিয়াছেন। জরাসন্ধের প্রসঙ্গ, স্থূলশিরা ঋষির শাপে রম্ভার অশ্বরূপ প্রাপ্তি, উষানিরুদ্ধ-প্রসঙ্গ, রামকথা, আগস্ত্যকৃত সমুদ্রপান-প্রসঙ্গ, নহুষকথা, বরাহ অবতারে পৃথিবী উত্তোলন, বাণাসুর ও নরকাসুরের প্রসঙ্গ, বলভদ্রের যমুনাকর্ষণকথা, দক্ষযজ্ঞধ্বংস, পাণ্ডুমৃত্যু, অভিমন্যুমৃত্যু, চন্দ্রের গুরুপত্নী-হরণ, পুরূরবার বিপ্রস্বলোভ, যযাতির ব্রাহ্মণী-বিবাহ, সুদ্যুম্নরাজার স্ত্রীত্ব, নৃগরাজের কৃকলাসত্ব-প্রাপ্তি, সৌদাসের পৃথিবীপালনে অক্ষমতা, নলের কলি-আবেশ, এসব প্রসঙ্গ বাণভট্ট উল্লেখ করিয়াছেন। সোমকরাজ, জন্তুরাজকে বধ করেন, পুরুকুৎসের নর্ম্মদা বিহার, কুবলয়াশ্বের মদালসাপরিণয়, সংবরণ রাজার সূর্য্য-কন্যা-বিবাহ, পৃথুকৃত পৃথিবী দোহন, আর যুধিষ্ঠির যে দ্রোণভয়ে ভীত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সত্যপথ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, (অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ) তাহারও উল্লেখ হর্ষচরিতে আছে। তবে "মান্ধাতার সপুত্র-পৌত্রে রসাতল-গমন," এই যে একটী কথা হর্ষচরিতে লিখিত আছে, তাহার মূল আমরা প্রচলিত পুরাণে পাই না তবে "রসাতল-গমন"-শব্দের অর্থান্তর করিলে অর্থাৎ সাবমান মৃত্যু এইরূপ অর্থ করিলে মূল পাওয়া যায়। কাদম্বরীতে আর একটী কথা আছে—"পৃথিবী প্রলয়কালে বরাহদন্তাঘাত-ভয়ে ভীত হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করেন" * এ কথাও আমরা পুরাণে প্রাপ্ত হই না। শ্রীকৃষ্ণ, বাল্যলীলায় যে কালিয় নাগকে দমন করেন, বৃষাসুরকে বধ করেন, আর তিনিই যে পুণ্ডরীকাক্ষ নারায়ণ, সে কথা হর্ষচরিতে আছে। দিলীপের পুত্র রঘু, এ কথা রামায়ণে বা পুরাণে দেখি নাই; কিন্তু কালিদাস লিখিয়াছেন, বাণভট্টও লিখিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে, এক দিলীপের পৌত্র রঘু। অন্য পুরাণে আরও তফাৎ। চতুর্দ্দশ গন্ধর্ব্বকুল, ভগীরথের গঙ্গানয়ন, এ সব কথাও আছে। আরও অনেক পৌরাণিক বৃত্তান্ত আছে। তাহাতে বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ বা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ, রামায়ণ এবং মহাভারতের অনেক প্রসঙ্গ বাণভট্টের গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইতিহাসের বিষয় যাহা পূর্ব্বে সূচনা করিয়াছি, তাহার প্রমাণ উল্লেখ করিতেছি; * নাগকুল-সম্ভূত পদ্মাবতী-নারীপতি নাগসেন রাজার গূঢ়মন্ত্রণা সময়ে, তথায় এক শারিকা পক্ষী ছিল, সারিকা পক্ষীই সেই গুপ্তমন্ত্রণা প্রকাশ করে, তাহাতেই সেই রাজার জীবনান্ত হয়।

শুকপক্ষী গূঢ়মন্ত্রণা শ্রবণ করাতেই, শ্রাবস্তীপতি শ্রুতবর্ম্মা রাজ্যভ্রষ্ট হন।

মৃত্তিকাবতী নগরাধীশ্বর রাজা স্বর্ণচূড় স্বপ্ন-সময়ে মন্ত্রণারহস্য প্রকাশ করাতেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হন।

যবনেশ্বর, সুহৃৎপ্রেরিত গুপ্তলিপি মনে

* গিরিশ বিদ্যারত্ন-মুদ্রিত কাদম্বরী পূর্ব্বভাগ ২২৪ পৃঃ।

* নাগকুলজন্মনঃ সারিকাশ্রাবিতমন্ত্রস্য—ইত্যাদি। হর্ষ চঃ ৬।

স্নানে পড়িতেছিলেন, নিকটে চামরগ্রাহিণী ছিল; রাজার মুকুটরত্নে প্রতিবিম্বিত সেই পত্রাক্ষরাবলী চামরধারিণী পাঠ করে। যবনেশ্বরের পক্ষে তাহাই কালস্বরূপ হইয়াছিল।

মথুরাধিপতি বৃহদ্রথ, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে নিধি খনন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে, বিদূরথের সৈন্য আসিয়া, খড়্গাঘাতে সেই নিঃস্পৃহায় রাজাকে বিনষ্ট করে।

অগ্নিমিত্র-নন্দন সুমিত্র, বড়ই নৃত্য গীত ভাল বাসিতেন, নটদিগকে বিশ্বাসও করিতেন, মিত্রদেব, নটসাজে আসিয়া নৃত্যগীতাদি প্রদর্শন করিতে করিতে, রাজা সুমিত্রের মস্তক ছেদন করেন।

শত্রুপক্ষীয় লোক, অলাবুবীণার অভ্যন্তর-গর্ত্তে তরবারি লইয়া, বাদ্যবিদ্যার ছাত্ররূপে উপস্থিত হইয়া বাদ্যপ্রিয় অশ্মকাধিপতি শরভের মস্তক ছেদন করেন।

সেনাপতি পুষ্পমিত্র, মৌর্য্যবংশীয় রাজা বৃহদ্রথকে, সৈন্য-প্রদর্শনচ্ছলে, আত্মবশীভূত সৈন্যমণ্ডলী প্রদর্শন করিয়া নিহত করে।

চণ্ডীনগরীর অধিপতি, অদ্ভুত কাণ্ড দর্শনে বিশেষ কুতূহলী ছিলেন, একদা তিনি আত্ম-নির্জ্জিত যবনগণের উপঢৌকন স্বরূপ ব্যোমচারী যন্ত্রযানে আরোহণ করিবামাত্র কোথায় নীত হইলেন, তাহার কিছু ঠিকানা হয় নাই।

শিশুনারবংশীয় কাককর্ণ রাজা, নগর-সমীপেই ছিন্নকণ্ঠ হইয়া পতিত ছিলেন।

অমাত্য বসুদেব, বসুভূতি দাসী-কন্যাকে দেবী-সজ্জায় সজ্জিত করিয়া তদ্দ্বারা স্ত্রী-সঙ্গলুব্ধ শুঙ্গ রাজাকে নিপাতিত করেন।

পাতাল-গমনোৎসুক এক মগধরাজকে মেকলাধিরাজের মন্ত্রীরা কৌশলক্রমে, পর্ব্বত-সুড়ঙ্গপথে, নিজ রাজ্যে লইয়া উপস্থিত করেন।

প্রদ্যোতপুত্র মহামাংস-বিক্রয়-বাতুল কুমার কুমারসেনকে, বেতাল তালজঙ্ঘ বিনাশ করে।

শত্রুপ্রযুক্ত রাসায়নিক লোক, বহু লোকের বহু রোগ উপশম করিয়া বৈদ্যভাবে বিশ্বস্ত হয়; অবশেষে বিদেহ-রাজনন্দন গণপতির রাজযক্ষ্মা-রোগ উৎপাদন করিয়া দেয়।

স্ত্রী-বিশ্বাসী কলিঙ্গাধিপতি ভদ্রসেনের ভ্রাতা বীরসেন, রাজমহিষী-গৃহে ভিত্তি-অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকিয়া পরিশেষে ভ্রাতার প্রাণসংহার করেন।

মাতার শয্যাতলে লুক্কায়িত থাকিয়া অন্যতম পুত্র করূষাধিপতি দধ্রকে নিহত করে, পিতৃ-হত্যার কারণ,—অন্য পুত্রকে রাজ্যদান করিতে পিতার উদ্যত হওয়া।

শূদ্রক রাজার দূত আভিচারিক বেশে আসিয়া চকোরপতি চন্দ্রকেতুকে আপনার অপসারণ ক্ষমতার কথা অবগত করে, তিনি শূদ্রক রাজার অপসারণ কার্য্যে তাহাকে নিযুক্ত করেন, পরমবিশ্বস্ত সেই আভিচারিক কৌশলে মাত্র রাজা ও মন্ত্রীকে নিকটে আনিয়া উভয়েরই প্রাণ বিনাশ করে।

চম্পাধিপতির সৈন্যবৃন্দ, নড্বলনলবনে নিলীন থাকিয়া মৃগয়াসক্ত চামুণ্ডাপতি পুষ্করের প্রাণবধ করেন। মৌখরি—মুখর-বংশসম্ভূত বন্দিগণের গীতিপ্রমুগ্ধ অজ্ঞ ক্ষত্রবর্ম্মাকে, শত্রু-প্রেরিত জয়শব্দতৎপর সন্ধ ক্ষত্রিয়গণ বিনষ্ট করে।

কামিনীবেশধারী চন্দ্রগুপ্ত পরদার-কামুক-শক রাজকে নিহত করেন।

মহিষী সুপ্রভা পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য মহাসেন নামক কাশিরাজকে বিষপ্রয়োগে বিনাশ করেন। বরাহমিহিরও লিখিয়াছেন :

"শস্ত্রেণ বেণী-বিনিগূহিতেন,
বিদূরথং স্বা মহিষী জঘান।
বিষপ্রদিগ্ধেন চ নূপুরেণ
দেবী বিরক্তা কিল কাশিরাজম্॥"

অপহৃত কাম্মিনী রত্নবতী, নিজমনোভাব গোপন করিয়া ক্ষুরধারা-শাণিত দর্পণের পার্শ্ব-দ্বারা অযোধ্যাপতি জারূথের প্রাণ বিনাশ করিয়াছিল।

দেবরাম্নুরক্তা দেবকী সুহ্মাধিপতি দেবসেনকে, বিষচূর্ণগর্ভ কর্ণোৎপলসাহায্যে নিহত করেন। মহিষী বল্লভা, সপত্নীদ্বেষে বৈরন্তী নগরীপতি রন্তিদেবকে, আভিচারিকচূর্ণবর্ষী নূপুরসাহায্যে বধ করেন।

রাজ্ঞী বিন্দুমতী, কেশপাশ-লুক্কায়িত শস্ত্র দ্বারা বৃষ্ণিবংশীয় বিদূরথকে নিহত করেন।

হংসবতী, সৌবীরপতি বীরসেনকে রসলিপ্ত মেখলারত্নের সাহায্যে বিনষ্ট করেন।

মহিষী পৌরবী, বিষ মিশ্রিত বারুণীগণ্ডুষ পান করাইয়া পৌরবেশ্বর সোমকের প্রাণনাশ করেন। এ সব ইতিহাসের অধিকাংশই এক্ষণে বিলুপ্ত। দুই একটী কথা মাত্রে পর্য্যবসিত। হর্ষচরিত মাত্রই এক্ষণে এই ইতিহাস বিবরণের দুর্ব্বল মূল। ইতিহাস আমাদের বিলুপ্ত হইয়াছে, কেন বিলুপ্ত হইল? তাহা জানি না। বুঝি—সৌভাগ্য-লিপির সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাস-লিপিও মুছিয়া গিয়াছে।—পঞ্চতন্ত্রে দেখিতে পাই, ব্যাকরণ-কর্ত্তা, পাণিনি সিংহের করাল কবলে নিপতিত হন, মীমাংসাদর্শন-প্রণেতা জৈমিনি বন্যহস্তীর পদতলে প্রাণত্যাগ করেন, ছন্দঃশাস্ত্রকর্ত্তা পিঙ্গল মকরগ্রাসে বিনষ্ট হন। এ সব কথাও লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

যাহা হউক, বাণভট্টের সময়ে, দেশের যে রকম অবস্থা ছিল; তাহা কাদম্বরী ঠাকুরাণী ও হর্ষচরিত ঠাকুরের নিকট যথাসম্ভব শ্রবণ করিয়া পাঠকগণকে জানাইলাম, ঠাকুর-ঠাকুরাণীকেই পিতামহী বলিয়া—আমি প্রণাম করিতেছি। ঠাকুরকে পিতামহী বলায় অপরাধ আপনারা গ্রহণ করিবেন না, কেন না, ঠাকুর নপুংসক লিঙ্গ।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

লীলা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অনেক দিনের পর নীলরতন রায় অন্দরে আসিয়াছেন। তাঁহার অন্দরে আসা প্রায় ঘটিয়া উঠিত না, আর যদি কখন আসিতেন, তা ভার্য্যা হৈমবতীর অনেক ডাকা-ডাকি, সাধাসাধি, মাথা-কোটাকুটির পর। এবারেও তাই হইয়াছে। হৈমবতী অনেক করিয়া ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, তাই আজ নীলরতন অন্দরে। তা অন্তবারে যাইবার সময় নীলরতনের মুখ এতটা ভার-ভার থাকিত না। নীলরতন বুঝিয়াছিলেন, হৈমবতী সেই মেয়েটার একটা হেস্তনেস্ত করিবার জন্য ডাকিতেছেন।

নীলরতন অন্দরে আসিলেই দেখিতে পাইতেন যে, হৈমবতী তাহার জন্য এক থাল খাবার সাজাইয়া পার্শ্বে বসিয়া আছেন। তার পর এটা খাও, সেটা খাও, আর তার পর কান্নার ঘেন্-ঘেনানি,—তা অত কথা তাঁহার ভাল লাগিত না। নীলরতন বিরক্ত হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেন। যেখানে মেয়েমানুষের মুখে ইয়ারকির ফোয়ারা ছোটে না, যেখানে বাঁধা হুঁকায় বাঁধা তবলায় আসর জমকায় না, যেখানে মানুষের পশুবৃত্তি-নিচয়ের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি পায় না, সেখানে নীলরতন রাত্রে! ছি! ছি! হৈমবতী, তুমি ত এ সব করিতে পারিবে না, তবে নীলরতনের আশা কেন? আর পাঠক মহাশয়! আপনি বলিতেছেন, নীলরতনের বয়স হইয়াছে, তাহার এ বয়সে এরূপ স্বভাবের চিত্র ভাল লাগে না। না লাগিবারই কথা, কিন্তু আমরা কি করিব? নীলরতনকে যেমন দেখিয়াছি, তেমনি আপনাদের সম্মুখে হাজির করিয়াছি। নীলরতন যৌবন বয়স হইতেই উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবে ছিলেন,

তাঁহার অনেক ধন ও অপরিমিত ক্ষমতা ছিল, কিন্তু বুঝাইবার লোক ছিল না, তাই তাঁহার ধনের অপব্যয় হইত, ক্ষমতার অপব্যয় হইত, আর তাই আজ বয়স হইলেও তাঁহার উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশমিত হয় নাই। তবে বলিয়া রাখা ভাল নীলরতনের স্বভাবের তাঁহার সমবয়স্ক অনেক লোক ছিল। আজকাল নীলরতনের আমোদ-প্রমোদ অধিকাংশ সময় তাহাদেরই সঙ্গে চলিত। তবে চাকর বাকর ঘরের দুটা কথা জানিত, তাহা স্বতন্ত্র কথা। আর বয়স হইলেও নীলরতনের শক্তি সামর্থ্য কমে নাই, বরং কৃষ্ণকান্তির উপর একটু চাকৃচিক্য হইয়াছিল।

কি বলিতেছিলাম।—নীলরতনের মুখখানি আজ বর্ষণোন্মুখ মেঘের মত। অন্দরে আসিবার পথেই কি করিয়া হৈমবতীর কথাটা উড়াইয়া দিবেন, ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিলেন। অন্দরে ঢুকিয়াই আবার সেই এক থাল খাবার; বরং অন্য দিনের চেয়ে আজ আয়োজন বেশী, তেমনি সাজানো, তবে তফাতের মধ্যে হৈমবতী পাশে নাই। দেখিয়াই নীলরতনের মনে কেমন-একটা খট্‌কা বাধিয়া গেল। নীলরতন এত করিয়া হৈমবতীকে জ্বালাইয়াছেন। সমস্ত মাসের মধ্যে এক দিনও তাঁহাকে দেখা দেন নাই, এক দিনের তরে তাঁহাকে আদর করেন নাই, ভাল বাসেন নাই, কিন্তু তবু তাঁহার উপর হৈমবতীর অবিরল ভক্তি, প্রগাঢ় শ্রদ্ধা দেখিয়াছেন, আজ কি সেই হৈমবতী তাঁহাকে ডাকিয়া দেখা দিতেছেন না? তা হইলেও হয়; নীলরতন একবার তাহাকে দেখা দিয়াই পলাইবেন,—কতগুলা ঘেনঘেনানি আর তাঁহাকে শুনিতে হয় না। কিন্তু কথাটা কেমন মনে লাগিল না। সাত পাঁচ ভাবিয়া নীলরতন ডাকিলেন, "হৈমবতী"।

ক্ষীণ মৃদুস্বরে উত্তর হইল, "কে, তুমি আসিয়াছ? এসো, ব'সো।" সেই স্বরের সঙ্গে কি একটা কাতরতা, কি একটা কোমলতা জড়ান ছিল। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হত্যাকারীর জীবন-ভিক্ষায় সে কাতরতা নাই। বৈশাখী সান্ধ্য-সমীরণে কুসুম-সুবাস মিশাইলে সে কোমলতা মিলে না।

নীলরতন সেই স্বর শুনিয়া চমকিলেন, পরে যাহা দেখিলেন, তাহাতে যেন তাঁহার সংজ্ঞা দেহ ছাড়িয়া গেল। সেই প্রশস্ত কক্ষের এক কোণে ক্ষুদ্র বিছানায় হৈমবতী শয়ানা। দেহ এত ক্ষীণ যে, বিছানায় কেহ শুইয়া আছে বলিয়া জানা যায় না, হৈমবতী আর সে হৈমবতী নাই।

মুহূর্ত্তেকে নীলরতনের মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

নীলরতন হৈমবতীর বিছানায় গিয়া বসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "হৈমবতী, একি?"

হৈমবতী উত্তর দিলেন "বলিতেছি, আগে জল খাও।"

আবার সেই জল খাইবার জন্য পীড়াপীড়ি। নীলরতন জল খাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, হৈমবতী বলিলেন, "চল, আমি পাশে গিয়া বসিতেছি।" হৈমবতী অনেক কষ্টে উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু তাহাতেই যেন তাঁহার শ্বাসরোধ হইয়া আসিল। নীলরতন আস্তে আস্তে তাঁহাকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিলেন। কতক্ষণ পরে হৈমবতী প্রকৃতিস্থ হইলে নীলরতন আবার ডাকিলেন, "হৈমবতী!"

হৈমবতী বলিলেন, "জল খাও।"

অগত্যা নীলরতন জল খাবারের পার্শ্বে গিয়া বসিলেন ও নাম মাত্র জল খাইলেন। অল্প পরেই উঠিয়া আসিয়া আবার বিছানার পাশে বসিলে, হৈমবতী বলিলেন, "মনে বড় দুঃখ রহিল, আজ তোমাকে যত্ন করিয়া খাওয়াইতে পারিলাম না।"

কথা শুনিয়া নীলরতন মুখ ফিরাইলেন, তাঁহার চোক দুটার কেমন জল আসিয়া পড়িতেছিল।

তখন নীলরতন জিজ্ঞাসা করিলেন, "হৈমবতী! এ সংবাদ দাও নাই কেন?"

হৈমবতী বলিলেন, "কি সংবাদ? কিসের সংবাদ? কাহাকে দিব? যে দিন হইতে তুমি আমায় পায়ে ঠেলিয়াছ, সেও ত আজ বিশ বৎসরের কথা,—সেই দিন হইতেই মৃত্যু-কামনা করিতেছি, শীঘ্রই বুঝি অনেক দিনের আশা সফল হয়।" হৈমবতী থামিলেন, আবার একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "যাহার বাঁচিয়া সুখ, সে চিকিৎসা করাক।"

নীলরতন কথা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইতেছিলেন। হৈমবতী বুঝিতে পারিলেন। তখনই বলিলেন, "রাগ করিও না, পীড়া হঠাৎ হইয়াছে, বলিবার সময় পাই নাই"। হৈমবতী মিথ্যা কথা বলিলেন। তিনি অনেক দিন হইতে অন্তরে অন্তরে পীড়া পোষণ করিতেছিলেন, তার পর এ পীড়া ইচ্ছা করিয়া করিয়াছেন।

নীলরতন বলিলেন, "যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে, এখন চিকিৎসা করাইতে হইবে।"

হৈমবতী বলিলেন, "চিকিৎসা করাইলেও যে বাঁচিব, সে আশা বৃথা।"

এখন নীলরতন হৈমবতীর মুখে মৃত্যুর ছায়া দেখিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে হৈমবতীর গায়ে হাত দিয়া ডাকিলেন, "হৈমবতী!"

হৈমবতী নীলরতনের দিকে পাশ ফিরিয়া শুইলেন, তাঁহার চক্ষু নীলরতনের চক্ষুর উপর স্থাপিত হইলে জলে পুরিয়া আসিল। নীলরতন অনেক দিন এমন করিয়া হৈমবতীর গায়ে হাত দেন নাই। হৈমবতী মনে মনে বলিলেন, "আর দু-দিন আগে অমন করিয়া ডাক নাই কেন? তাহা হইলে বুঝি রোগের প্রতিকার হইত।"

নীলরতন কিন্তু সেই শীর্ণ বিবর্ণ আধিক্লিষ্ট অথচ প্রশান্ত মুখ আর সেই জল-ভরা চক্ষুদুটীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

তখন হৈমবতী বলিলেন, "অমন করিয়া চাহিয়া আছ কেন? ভয় নাই।"

সেই সময়, নীলরতন হৈমবতীর উপর যত অত্যাচার করিয়াছিলেন, আর হৈমবতী কেমন করিয়া সে সব অত্যাচার সহিয়াও নীলরতনের মঙ্গল কামনা করিতেন, কেমন করিয়া তাঁহাকে সুপথে আনিতে চেষ্টা করিতেন, সেই সব কথা নীলরতনের মনে পড়িতেছিল। একবার অসুখ হইলে হৈমবতী কেমন করিয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সেবা করিয়া ছিলেন, নিজে অশক্ত হইয়া শেষে পীড়ায় পড়িয়াছিলেন, তাহার পর পাছে নীলরতন জানিতে পারিলে আর শুশ্রূষা করিতে না দেন, তাই সে কথা লুকাইয়াও শুশ্রূষা করিয়াছিলেন;—আর একবার পিতৃগৃহে নীলরতনের নিন্দা শুনিয়া কেমন করিয়া তাহাদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন, আর কতবার তাঁহার পায়ে কাঁটাটী ফুটিলে নিজের গলা কাটিয়া সে কাঁটা তুলিতে গিয়াছিলেন,—সেই সব কথাও নীলরতনের মনে আসিতে লাগিল; তাহার চক্ষে এক ফোঁটা জল দেখা দিল, স্বরটা জড়াইয়া আসিল।

নীলরতন চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "না,—ভয় নাই হৈমবতী! আজ বুঝিতেছি, আমার পাপের চারি পোয়া পূর্ণ হইয়াছে ভরা-ডুবি হইতে আর বাকী নাই। নহিলে তোমার এমন রোগ হইবে কেন?"

হৈমবতী বলিলেন, "না, অমন কথা বলিতে নাই। ভগবান্ তোমায় সুমতি দিবেন। তবে আজ যে জন্য ডাকাইয়াছি, তাহা তোমায় করিতে হইবে। লীলাকে ফিরাইয়া দাও।"

কথা শুনিয়া নীলরতন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

তারপর হৈমবতী বলিলেন, "কেমন করিয়া ফিরাইয়া দিতে হইবে বুঝিতে পারিতেছ না? এখনও সময় আছে, লীলাকে আমার সঙ্গে পাল্কি করিয়া পাঠাইয়া দাও, আমি গিয়া হেমন্তকুমারের পায়ে ধরিয়া মিটাইয়া আসিব। আমার এ অবস্থা দেখিলে তাহারা আমার কথায় অমত বা অবিশ্বাস করিবে না।"

নীলরতন ঘাড় হেঁট করিলেন। হৈমবতী যে তাঁহার শক্রর বাড়ী যায়, তাহা নীলরতনের ইচ্ছা নয়। পরে বলিলেন, "তোমার এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তোমাকে পাঠাইতে পারি না। দু'দিন যাক্, একটু সারিয়া ওঠ, তাহার পর বিবেচনা করা যাইবে।"

হৈমবতী বুঝিলেন, "নীলরতন তাঁহার প্রস্তাবে রাজি নহেন, তখন বলিলেন। শোন, এত দিন কোন্ কালে আমি লীলাকে তাহার বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিতাম, তা কেবল তোমার অনভিমতে কেহ আমার কথা শোনে না বলিয়াই এতদিন পাঠাইতে পারি নাই। আর আমার বিশ্বাস, লীলাকে রাখিলে আমায় বাঁচাইতে পারিবে না। তাহার প্রতি-উষ্ণশ্বাসে তোমার সর্ব্বনাশ হইতেছে। তারপর যতদূর শুনিয়াছি, লীলার শ্বশুরের ধনুক ভাঙ্গা পণ,—তোমাকে ছাড়িবে না।"

হৈমবতী অনেক কষ্টে কথা কহিতেছিলেন, এতক্ষণ কথা কহিয়া নিস্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। বিশেষ এখনও নীলরতন তাঁহার কথা শুনিলেন না, এ দুঃখ তাঁহার বুকে বড় বাজিল।

নীরতন ডাকিলেন, "হৈমবতী।"

কেহ তাঁহাকে সাড়া দিল না। নীলরতন দেখিলেন, হৈমবতী অচেতন।

নীলরতন অনেক যত্নে হৈমবতীর চৈতন্য সম্পাদন করাইলেন। কতক্ষণ পরে হৈমবতী নীলরতনের হাত দুখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বড়ই কাতর-স্বরে বলিলেন, "শোন, আমার একটা কথা রাখ। লীলার উপর অত্যাচার করিলে ভগবান্ তাহার প্রতিফল দিবেন। এখনও জগতে ধর্ম্ম আছে। একবার ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া অঙ্গীকার কর, লীলাকে ফিরিয়া দিবে? আমি সুখে মরিতে পারিব।" হৈমবতীর স্বর বন্ধ হইয়া আসিল, তাঁহার হাত নীলরতনের হাত ছাড়িয়া পায়ে পড়িল।

পূর্ব্ব হইতেই নীলরতনের হৃদয় গলিয়াছিল। তিনি হৈমবতীর উপর অত্যাচার করিয়াও যে স্নেহ ভক্তি শ্রদ্ধা প্রতিদিন পাইয়াছিলেন, তাহা মনে করিয়া আপনা আপনিই কুণ্ঠিত হইতেছিলেন। তারপর হৈমবতীর বর্ত্তমান্ অবস্থা দেখিয়া নীলরতন আর 'না' বলিতে পারিলেন না। বলিলেন, "ভাল, তোমারই কথা মত কার্য্য করিব।" নীলরতন বলিলেন, বটে, কিন্তু কি করিয়া লীলাকে প্রত্যর্পণ করিবেন, ভাবিয়া ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

তখন হৈমবতী দুটী হাত জুড়িয়া উর্দ্ধদিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভগবান্ তোমায় সুমতি দিন, আমার কাজ হইয়াছে, আমি সুখে মরিতে পারিব।"

অল্প পরেই হৈমবতী আবার অজ্ঞান হইলেন। এবার নীলরতন ডাকিয়া উত্তর পাইলেন না। এবার হৈমবতীর শীঘ্র সংজ্ঞা না হওয়ায়, নীলরতনের আর সাহসে কুলাইল না। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বাড়ীর লোক-জন ডাকিলেন, মুহূর্ত্তেকে একটা-ডাকাডাকি-হাঁকাহাঁকি পড়িয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এই ঘটনার পর নীলরতন কয়দিন অন্দরে ঘন ঘন যাতায়াত করিয়াছিলেন। ডাক্তার কবিরাজের আনাগোনাতে আত্মীয় কুটুম্বগণের ফুসফুসানিতে চাকর বাকরদের কাণাকাণিতে

নীলরতনের অন্দর দিন কতক সরগরম হইয়া উঠিয়াছিল। সকলেরই মুখে এক কথা—"কেমন আছে?" "কেমন দেখচ?" যিনি দুইমিনিট হইল রোগীর কক্ষ ছাড়িয়া আসিয়াছেন, তিনি দুই মিনিট পরেই রোগীর কক্ষ হইতে আর একজন লোককে আসিতে দেখিলে বিশেষ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, "এখন কেমন আছে?" ডাক্তার কবিরাজ নাড়ী টিপিয়া একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেই, কি একটু জীব কাটিলেই একবারে "হায় হায়" শব্দ পড়িয়া যাইতেছিল, যেন হৈমবতী আর নাই। এদিকে আবার অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যগণ স্বস্ত্যয়নে বসিয়া গিয়াছিলেন।

আত্মীয় কুটম্বদের মধ্যে যাহারা শুধু "চোকের দেখা" দেখিতে ও "হায় হায়" করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা রোগীর ঘরে যাওয়াটা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই। তাঁহারা দরজার ফাঁক হইতে উঁকি মারিয়া "কেমন, এখন লোক চিন্‌তে পারছে ত"? ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া সরিয়া আসিতেছিলেন। ইহাদের মধ্যে কয়জন পাশের একটী ঘরে আড্ডা করিয়া "কেমন করিয়া আরাম করিতে হয়" "এ সময় মিছরির পানা খাইতে দেওয়া উচিত কি না" "ক্ষীরোদ ডাক্তারকে মারিয়া তাড়াইয়া দিয়া তাহার জায়গায় শশী ডাক্তারকে আনা যুক্তিসঙ্গত কি না"—ইত্যাদি বিষয়ে গুরুতর তর্ক বিতর্ক করিতেছিলেন। হরিশের মেয়ের ব্যামর সময় কেমন করিয়া শশী ডাক্তার মরাজীব বাঁচাইয়াছিল, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া শশী ডাক্তারের একটী আত্মীয় শশীর পশারেরও জোগাড় করিতেছিলেন। হৈমবতীর দুইটী দূরবর্ত্তী আত্মীয়, যাহারা কিছু করিয়া মাসহারা পাইত ও যাহারা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া মাসহারা বজায় রাখিবার জন্য এক পেট "ডাকছাড়া কান্না" সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, তাহারাও এখন কাঁদিবার সময় হয় নাই দেখিয়া এই দলের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল। অবশ্য ইহাদের মধ্যে ঘন ঘন "কেমন আছে" জিজ্ঞাসা করা যায় নাই, তবে সে জিজ্ঞাসা হইতেছিল, যাহারা রোগীর ঘর হইতে আসিতেছিল তাহাদিগকে। নিজে উঠিয়া গিয়া দেখিয়া আসা বা সেবা-শুশ্রূষা করা ইহারা বাড়ার ভাগ মনে করিয়াছিল।

এই সব আগন্তুকের দল যে ঘর জুড়িয়া বসিয়াছিল, বাড়ীর নীরদা চাকরাণী সেই ঘর দিয়া কি-একটা কাজে যাইতেছিল। নীরদা বাড়ীর ঝি, গৃহিণীর কাছে থাকে, ঘরের কথা জানে; সুতরাং আজ তার নিকট দু-একটা বড় ঘরের কথা না শুনিয়া যাওয়া সঙ্গত নয় মনে করিয়া আগন্তুকদের মধ্যে তাহাকে একজন ডাকিয়া বলিল, "নীরদা কোথা যাচ্চিস্?" নীরদা ঠিক জবাব না দিয়া বলিল,—"বাবা, আর পারিনে, ফরমাস্ খাটিতে খাটিতে পায়ের সুতা ছিঁড়িয়া গেল, শরীরটা যেন আর বয়না।"

১নং আগন্তুক। তা তো দেখিতেই পাচ্চি। আহা, তোর যে কাজ! তা হউক, আপনার শরীরের দিকেও নজর রাখিতে হবে। এমন কি তাড়াতাড়ির কাজ! না হয় দুদণ্ড পরে হবে এখন। খানিক ব'স্।

নীরদা। বসি বা কেমন ক'রে? মার কি রকম,—আমি না হইলে যেন চলিবে না এতত আর সব ঝি রহিয়াছে, কিন্তু আমি না করিলে তাঁহার কোন কাজ পছন্দ হয় না।

নীরদার কাজ গৃহিণীর বড় পছন্দ-সই ও সেই-জন্য সে গৃহিণীর প্রিয়পাত্র, ইহা জানাইয়া নীরদা আপনার একটু পসার করিয়া লইল।

১নং আগন্তুক একটু মন রাখিয়া বলিল,—"এই ত এতবড় বাড়ী, এক একটা মহল নয়ত—যেন এক এক খানি গাঁ; সব ঘরগুলো ঝাঁট দেওয়াই পাঁচটা চাকরের কাজ, তা একজনের উপর সব বরাত দিলে কি চলে?"

২।৩ নং আগন্তুক "তা বই কি, তা বই কি" বলিয়া উঠিল। নীরদা আগন্তুকদের মধ্যে বসিল।

তখনই ১নং আগন্তুক জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁ নীরদা! এবার নাকি গিন্নী এ ব্যায়রামটা নিজে করিয়াছেন?"

নীরদা। ওমা সেকি, গো? ব্যায়রাম কি নিজে করা যায়?

নীরদা আকাশ হইতে পড়িল।

১নং আগন্তুক সামলাইয়া লইল,—"বলি তা নয় তা নয়, তবে এবার নাকি ব্যাম হ'লেও গিন্নী অনেক দিন কর্ত্তাকে জানান নাই।"

নীরদা। কে জানে বাবু! বড় ঘরের বড় কথা! ও সব কথা দেখিতে শুনিতে নাই, আমরা চোক থাকৃতেও কাণা, কাণ থাকতেও কালা।

নীরদা যে ভিতরের কথা জানে, তাহা আভাস দিল।

১নং আগন্তুক একটু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তা বটেই ত, বড় মানুষদের কি আর হাত পা আছে, তোমরাই ত সব; আর তোমরা সব বলিয়া দিলে ওঁদের কি আর মান-সম্ভ্রম থাকে।"

নীরদা ১নং আগন্তুকের কাছে একটু সরিয়া গলার আওয়াজটা একটু ছোট করিয়া বলিল, "না বল্লেও বাঁচিনি, আর বলিই বা কেমন ক'রে? তবে তোমরা নাকি গিন্নীর নেহাত আপনার লোক, কিছু দায়-অদায় পড়ুলে দেখ্তে তোমরা বই আর কেউ নাই,—তাই তোমাদের কাছে বল্তে দোষ নেই।"

আগন্তুকের দল একটু সরিয়া আসিয়া নীরদাকে ঘেরিয়া বসিল।

নীরদা। দেখ, আমাদের কর্ত্তার এই যত অনাছিষ্টি কারখানা। সেদিন কার বউ ধ'রে এনেছেন। আর সেই বউটী আমাদের গিন্নীর হাতে প'ড়েছে। আহা, মেয়েত নয়, যেন রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী! এমন মেয়ে ত দেখি নাই। তা গিন্নীর জেদ, তাকে ফিরিয়ে দেবেন; তাই কর্ত্তাকে কদিন থেকে অন্দরে আস্তে বল্‌ছিলেন, তা কর্ত্তাটী কিন্তু তেমন নয়, গিন্নির কথাটা কাণে তোলেন নাই, তাই মনের দুঃখে গিন্নি ৩ দিন জলস্পর্শ করেন নাই; তারপর ৪ দিনের দিন সেই মেয়েটীই আবার গিন্নীকে জল খাওয়ায়। তা অত সহিবে কেন? ও শরীরে কি অত সয়? সেই উপবাস হইতেই জ্বর হয়। পরে ৫।৬ দিন কাহাকেও কিছু বলেন নাই, কর্ত্তাও খবর পান নাই; সেই জ্বরের উপরই সব করিয়াছেন, তার পর যা হইয়াছে, দেখিতেছ।"

নীরদা চুপ করিল, কিন্তু আগন্তুক-দলের মধ্যে বউটীর কথা শুনিয়া মুখ-চাওয়া-চাওয়ি চোক-টিপা-টিপি কানা-কাণি পড়িয়া গেল। "কাদের বউ গা? কত বয়স গা? দেখিতে কেমন গা?" ইত্যাকার নানা রকম কথা কাণে-কাণে চলিতে লাগিল। শেষে ১ নং আগন্তুক সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ নীরদা! সে বউ কোথা? আমরা কি একবার দেখ্তে পাই নি?"

নীরদা। বাবা, সে কোথা, আমি কি জানি? আর জানলেও বা আমি কি বল্তে পারি?

নীরদা ইঙ্গিতে জানাইল, তার সব জানা আছে, এমন সময় ঘরের ভিতর হইতে নীরদাকে ডাকায় "যাই গো, আবার কি ফরমাস্ আছে" বলিয়া নীরদা প্রস্থান করিল। আগন্তুকগণ অনুসন্ধিৎসার অগাধ জলে পড়িয়া খাবি খাইতে লাগিল।

তখন আগন্তুকদের মধ্যে লীলা সম্বন্ধে নানা রকম তর্ক-বিতর্ক চলিতে লাগিল। কেহ বলেন, "বউটার রঙ কাঁচা সোণার মত;" কেহ বলেন, "মুখ খানা গোলাল-গোলাল, হাত পা যেন মোমের বাতি;" কেহ বলেন, বড় মানুষের বউ,

গায়ে ৩০০০৲টাকার গহনা আছে। তখনতাহাদের মধ্যে একজন জোর করিয়া বলিল, "তোরা সব জানিস্, আমি আজ নিজের চোকে দেখিয়াছি, আমি আসায় সে আমাকে দেখিয়া কপাট দিয়াছিল। নীরদা সেখানে ছিল। আমার চোখকে কিন্তু ফাঁকি দিবার যো নাই, আমি এক দেখাতেই তাকে চিনিয়াছি"।

তখন আর একজন বলিল, "তবেই তুমি ঠিক দেখিয়াছ! আমিত তোমার সঙ্গে আসিতেছিলাম। তোমাকে দেখে যে কপাট দিয়াছিল বলিতেছ, সে ওদের রাঁধুনির ভাইঝী, সবে আসিয়াছে; আর তোমাকে দেখে সে ত কপাট দেয় নাই। হাবা চাকর-আসিতেছিল, দেখিয়া কপাট দেয়।"

নানারকম তর্ক বিতর্ক চলিতেছে, এমন সময় আবার নীরদা কার্য্যব্যপদেশে সেখানে আসিয়া বসিয়া গেল—"আঃ ভগবান্ রক্ষে করেছেন; আর ভয় নাই, ক্ষীরোদ ডাক্তার বলেছে যে, জর মগ্ন হ'বার সময়, যে সময়টা নাড়ী ছেড়ে যাবার কথা ছিল, সে সময়টা কেটে গেছে; তবে শুধরে উঠতে দু চার দিন দেরি লাগ্‌বে।"

আগন্তুক মধ্যে দু চার জন একটু দুঃখিত হইল। যে, দু মাগী ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া মাসহারাটা বজায় রাখিবার চেষ্টায় আসিয়াছিল, তাহারা আর কিছুদিন মাসহারা ভোগ করিবে বলিয়া আনন্দিত হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে কথার স্রোত বদলাইয়া গেল; ক্ষীরোদ ডাক্তারের হাতযশ নাড়ীজ্ঞান প্রভৃতির প্রশংসা হইতে লাগিল। ক্রমে আগন্তুকের দল সু-খবর পাইয়া যে যেখান হইতে আসিয়াছিল, তিনি সেখানে প্রস্থান করিল।

নীরদা মিথ্যা বলে নাই, রোগীণীর উত্তর উত্তর সুলক্ষণ দেখা দিতে লাগিল ও তিনি ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইতে লাগিলেন।

আমরা ডাক্তার নই, সুতরাং রোগ চিনিতে পারি না; যে রকম দেখিয়াছিলাম, তাহাতে বড় ভয় হইয়াছিল; ভাবিয়াছিলাম, এ যাত্রা হৈমবতী আর রক্ষা পাইবে না। আর পাঠকবর্গেরাও মনে করিয়াছিলেন যে, হৈমবতী বুঝি তাহাদের দেখা দিয়াই পলাইবেন। কিন্তু কি করি? বিধাতার ইচ্ছা, ক্ষীরোদ ডাক্তারের হাত-যশ আর নীলরতনের কপাল; হৈমবতী এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হৈমবতী ত বাঁচিয়া গেলেন। নীলরতন কিন্তু তাহার জ্বালায় মর-মর হইতে লাগিল। যেমন দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, হৈমবতী প্রতিনিয়ত নীলরতনকে লীলাকে ফিরাইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত করিতে লাগিলেন। সেই একঘেয়ে "ফিরাইয়া দাও" "ফিরাইয়া দাও" শুনিতে শুনিতে নীলরতন জ্বালাতন হইয়াছিলেন। একবার একবার মনে করিতেন, তিনি আর অন্দর মহলে যাইবেন না, তবে আবার হৈমবতী তাহার এই অসুস্থ শরীরে না জানি কি করিয়া বসে, এই ভয়ে নীলরতনকে অন্দরে যাইতে হইত। হৈমবতী বলিতেন, "লীলাকে পাঠাইয়া দাও।" নীলরতন উত্তর দিতেন, "দাঁড়াও ঠিক করি, না হয় দু-দিন পরেই পাঠাইলাম, শীঘ্রই মকদ্দমা মিটিয়া যাইবে। আর পাঠাইলে যদি না লয়?" হৈমবতী বলিতেন, "তবে আজ আমি রাখিয়া আসি"। নীলরতন বলিতেন, "আমি না বুঝিয়া দেরি করি নাই, মকদ্দমার যেরূপ গতিক দেখিতেছি, তুমি আজ জোর করিয়া রাখিয়া আসিলে কাল আমায় জেলে যাইতে হইবে।" হৈমবতী নীলরতনের মুখের দিকে চাহিয়া নিরস্ত হইতেন, কিন্তু তখনই আবার অন্য কোন উপায়ে পাঠাইতে বলিতেন।

শেষে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ঠিক হইত, যেমন করিয়াই হউক না কেন, লীলা কাল যাইবে। এমনি কাল কাল করিয়া অনেক দিন গিয়াছিল। নীলরতন যে, একেবারে আপনার অঙ্গীকার বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তাহা নহে; তবে তাঁহার অঙ্গীকার-পালনের কোন উপায় খুঁজিয়া পান নাই। আর হৈমবতীর আরোগ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অঙ্গীকার-পালন করাটার বিষয় একটু শৈথিল্য করিতেছিলেন।

এদিকে আমাদের যে সব গৃহলক্ষ্মী অসুখের সময় হৈমবতীকে দেখিতে গিয়াছিলেন, বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া লীলা সম্বন্ধে যাহার যাহা মনে হইল, রটাইয়া দিলেন। তবে তাহাদের সকলের মধ্যে একটা কথার ঐক্য ছিল। তাহারা সকলেই বলিয়াছিল যে, তাহারা লীলাকে দেখিয়া আসিয়াছে। দু-দিনের মধ্যে লীলা সম্বন্ধে জনরব শতমুখে ছুটিয়াছিল। হাটে, মাঠে, বাজারে যেখানে নিষ্কর্ম্মার দল জড় হইত, তাহাদের মধ্যে লীলা ছাড়া অন্য কথা হইত না। এমন কি, নীলরতনের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় কেহ কেহ একটু উঁকি মারিয়া যাইত। আশা, যদি সেই সময় ছাদের আলিসার মধ্য দিয়া লীলার মুখখানি দেখিতে পায়। তা যাহাই হউক, লীলা-সম্পর্কীয় জনরবে নীলরতনের দুর্ভাগ্য বশতঃ একটু সত্য ছিল। লীলা বাস্তবিক নীলরতনের ঘরে ছিলেন।

এদিকে গ্রামের মধ্যে ধীরে ধীরে নীলরতনের বিরুদ্ধে একটী দল সৃষ্টি হইতেছিল। নীলরতন অনেক সময় অনেক অত্যাচার করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহ কখন তাঁহার কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করে নাই। তাঁহার ঐশ্বর্য্য ছিল, ক্ষমতা ছিল, প্রভুত্ব ছিল, তাই সাহস করিয়া কেহ তাহাকে এক কথাও বলিতে পারে নাই। এ পর্য্যন্ত তাঁহার কার্য্যসম্বন্ধে কাণাঘুষা মাত্র চলিয়াছিল। কিন্তু সেই কাণাঘুষা ক্রমে ক্রমে এবারে স্পষ্ট বিরোধিতায় দাঁড়াইল। বিরোধি দলের যে সব লোক আগে তাঁহাকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হইত, আজ কাল তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া সরিয়া দাঁড়াইত না। নীলরতন যে বুঝিতে পারিতেন না, তাহা নহে, তবে যেন ইচ্ছা করিয়া দেখিয়াও দেখিতেন না। বলা বাহুল্য, আমাদের পূর্ব্বপরিচিত গোপাল মুখুয্যে এই দলের নেতা ছিলেন।

অনেক ভাবিয়া—চিন্তিয়া নীলকমল ঠিক করিয়াছিলেন, এবার মকদ্দমা না মিটাইতে পারিলে সুরাহা হইবে না। তখন অনেক বাছিয়া বাছিয়া একজন সুচতুর লোককে মতলব বুঝিবার জন্য লীলার শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মোকর্দ্দমা মিটাইবার আশা বৃথা; লীলার শ্বশুর বলেন, এখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে লীলাকে লইয়া যে তাঁহারা আর ঘর করিতে পারিবেন এমন আশা করেন না, সুতরাং তাঁহারা এখন আর লীলাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য তত ব্যস্ত নহেন। তবে যাহারা এমন অত্যাচার করিয়াছে তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য লীলার শ্বশুরদের সমধিক যত্ন; ইহাতে তাঁহারা সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছেন।" কথা শুনিয়া নীলরতন লোকটীকে "কোন কাজের লোক নও" ইত্যাকার অনেক ভৎসনা করিয়াছিলেন। সে কিন্তু, কথা শুনিতে শুনিতে নীলরতন বাবুর মুখ শুকাইতে দেখিয়াছিল।

তখন নীলরতন আর এক চা'ল চালিলেন। সেই লোকটীকে আবার হেমন্তকুমারের বাড়ী পাঠাইলেন। হেমন্তকুমারের তাদৃশ বিষয় ছিল না, বিশেষ মকদ্দমার সূত্রপাতেই লীলার শ্বশুর হেমন্তকুমারকে মকদ্দমা সম্বন্ধে কোন কাজ তাঁহার অনভিমতে করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সুতরাং লোকটীর কথা শুনিয়া হেমন্তকুমার

লীলার শ্বশুরের মত জানিতে গেলেন। পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, লীলার শ্বশুর এখন মকদ্দমা আদালত হইতে না মিটিলে লীলাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যস্ত নহেন; সুতরাং আমি নিজে তাঁহার অনভিমতে কোন কাজ করিতে পারি না। তাঁহার অনভিমতে কার্য্য করিলে হয়ত আমার লীলা চিরদুঃখিনী হইবে। লোক ফিরিয়া আসিল নীলরতন দেখিলেন, এ চা'লও ব্যর্থ হইয়াছে।

তখন হৈমবতী আবার ডাকিয়া পাঠাইলে নীলরতন যেমন যেমন করিয়াছিলেন, সব বলিলেন। শুনিয়া হৈমবতী বলিলেন, "এখনও আর এক উপায় আছে, আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব।"

নীলরতন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উপায়?"

হৈমবতী বলিলেন, "যে রূপে ভুবন ভোলে, সে রূপে কি আর এক জন ভুলিবে না?"

নীলরতন বলিলেন, "ভুলিবে না কেন? কিন্তু সে আর এক জন কে?" হৈমবতী বলিলেন, "অমূল্যকুমার।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

লীলা নীলরতনের অন্দরে রহিয়া গেলেন। পাঠক মহাশয় ভাবিয়াছিলেন, আমরাও প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, ওখানে বুঝি লীলাকে দেখিয়া আর চিনিতে পারিবেন না, বুঝি ভাবিয়া ভাবিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া লীলা আধখানা হইয়া যাইবে! বুঝি তাহার গণ্ডস্থলের হাড় বাহির হইয়া পড়িবে! চক্ষু কোটরে প্রবেশ করিবে! তাহার কাঁচাসোণার রঙ কালি হইয়া যাইবে! বুঝি এই কয় দিনেই তাহার বালিকা-স্বভাব ঘুচিয়া যাইবে! বুঝি এক কথায় লীলা আর সে লীলা থাকিবে না!

আমরা কিন্তু সব সময় যা মনে করি, তা ঘটে না; এখানেও তাই হইয়াছে। বারুণীর মেলায় যে লীলাকে দেখিয়াছিলাম, আজ হৈমবতীর কাছেও সেই লীলাকে দেখিতেছি। আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত বৈষম্য বিশেষ লক্ষ্য না করিলে বোঝা যায় না। লীলা যে তাহার পিতৃগৃহের কথা, তাহার ঠাকুরমার ভালবাসা ভুলিয়া গিয়াছে, তাহা নহে; তবে হৈমবতীর স্নেহ ভালবাসা অনেক পরিমাণে তাহার শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিয়াছে। যেদিন—সে বিপদসঙ্কুল দিনের কথা মনে করিলে এখনও লীলার কান্না আসে,—যে দিন অপরিচিত-লোক-পরিবেষ্টিত হইয়া লীলা বারুণীর মেলা হইতে অপরিচিত স্থানে আসে, সে দিন হৈমবতীর প্রথম সান্ত্বনা-বাক্যে লীলার ক্ষুদ্র হৃদয় গলিয়া গিয়াছিল, তার পর হৈমবতী আশার মন্ত্র লীলার কাণে দিয়াছিলেন। শেষে হৈমবতী তাহাকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন, লীলা কিছুই ভোলে নাই; তবে তাহার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল।

লীলা হৈমবতীর ঘরে একটা কাকাতুয়ার সঙ্গে ঝগড়া করিতেছিল, যতবার তাহার গায়ে হাত দিতে যাইতেছিল—ততবার কাকাতুয়া মাথার ঝুঁটি ফুলাইয়া, চক্ষু রাঙ্গা করিয়া, গায়ের পালক উঠাইয়া, লীলাকে কামড়াইতে আসিতেছিল; শেষে লীলা অনন্যোপায় হইয়া কাকাতুয়াকে খাবার দিয়া, গায় হাত দিতে যাইতেছিল, কাকাতুয়া কিন্তু খাবার লইবার পর আর গায়ে হাত দিতে দিতেছিল না। কাকাতুয়া যখন খাইতেছিল, লীলা তখন পিছন দিক্ হইতে তাহার লেজ ধরিয়া টানিতেছিল। কাকাতুয়া কামড়াইতে আসিলে, লীলা সরিয়া গিয়া হাসিতেছিল ও কাকাতুয়াকে অক্ষম বলিয়া উপহাস করিতেছিল। কাকাতুয়া লীলার কথা অত বুঝিতে পারিতেছিল কি না জানি না,

কিন্তু সেও নিজের ভাষায় লীলাকে গালি দিতেছিল।

পিছন হইতে হৈমবতী লীলার কাকাতুয়ার সঙ্গে ঝগড়া দেখিতেছিলেন, একবার আর একটু হইলে কাকাতুয়া লীলাকে কামড়াইয়া দিয়াছিল, তখন হৈমবতী ডাকিলেন, "লীলা!"

লীলা হৈমবতীর কাছে দৌড়িয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগা, আমি কবে যাব ব'ল না?"

হৈমবতী বলিলেন, "বলিতেছি, কিন্তু ও কাকাতুয়ার সঙ্গে কি হইতেছিল? এ যে কামড়াইলে একেবারে মাংস তুলিয়া লইত?"

লীলা উত্তর দিলেন, "তা বৈকি? তুমি গায়ে হাত দিলেও কিছু বলে না, আমি গেলে কামড়াইতে আসে কেন? তা আমি একবার দেখাইব।" তখনই আবার লীলা বলিল, "হ্যাঁগা, কৈ কবে যাব বলিলে না?"

হৈমবতী দেখিলেন যে, লীলাকে যাবার সম্বন্ধে একটা জবাব না দিলে সে ছাড়িবে না। তখন হৈমবতী বলিলেন, "যাবে বৈ কি, কিন্তু যতদিন তোমার আর আমার অদৃষ্টের ভোগ না ফুরায়, ততদিন এখানে থাকিতে হইবে।"

হরি হরি! লীলার আবার অদৃষ্টের ভোগ! অমন সুন্দর মুখ যাহার, তাহার আবার অদৃষ্টে দুঃখ! যেদিন লীলাকে প্রথম বারুণীর মেলায় দেখিয়াছিলাম, তখন মনে ভাবিয়াছিলাম, না জানি, এই বালিকার ভবিষ্যৎ কতই সুখময় হইবে। বিধাতা তাঁহার এমন সুন্দর সৃষ্টিকে কি কাঁদাইতে পাঠাইয়াছেন! লীলার পিতা মাতাও লীলার শৈশবে বলাবলি করিতেন, আমাদের লীলার জন্য কখন ভাবিতে হইবে না। এ রূপ-লাবণ্য বৃথায় আসে নাই। লীলার অদৃষ্টে কখন দুঃখভোগ করিতে হইবে না। লীলার নিশ্চয় সৎপাত্রে বিবাহ হইবে। ফলে হইয়াছিলও তাহাই। লীলা বিবাহের বয়সে পা দিতে-না-দিতেই তাহার জন্য ঘটক ছুটাছুটি করিয়াছিল। হেমন্তকুমার নিঃস্ব হইলেও লীলার জন্য রাশি রাশি পাত্র জুটিয়াছিল। হেমন্তকুমার তাহাদেরই মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া সৎপাত্র দেখিয়া অমূল্যকুমারের হস্তে লীলাকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। বিবাহের পরও এক বৎসর বড়ই আমোদ আহ্লাদে গিয়াছিল, তারপর এই লীলার অদৃষ্টে বারুণীর মেলা আর পাঠকের আমার উপর রাগ!

রাগ বৈ কি; রাগের কাজ করিলে রাগের পাত্র হইতে হয় না ত কি? কোথায় আমি অমন সুন্দরী মেয়েকে সোফার উপর এলোচুলে আধ-বসাইয়া আধ-শোয়াইয়া কার্পেট তুলিতে তুলিতে পাঠকের সাম্‌নে হাজির করিব, কোথায় তাহার সাম্‌নে একখানা নভেল, আর একটা গোলাপ ফুলের তোড়া, একটা পিয়ানো না হয় একটা হারমনিয়ম পড়িয়া থাকিবে, কোথায় মিহিসুরের আওয়াজে লীলার চাকর বাকরকে ডাকিবে; না আজ কোথায় অপরিচিত স্থানে, অপরিচিত লোকের মধ্যে লীলার দিন কাটিতেছে!—ভাল, তাহা না হয় হইল, লীলার অন্তত ঘন ঘন মূর্চ্ছাটাও হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু কৈ, পাঠকবর্গকে তাহাও ত দেখাইতে পারিতেছি না! অবশ্য আমি একটা ইহার কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য। কৈফিয়ৎ আর নিজে কি দিব? পাঠকবর্গ! বিধাতার নিকট হইতে লইবেন; তাঁহার সৃষ্টির ভিতর যে এত অনাসৃষ্টি আছে, তা আমি জানিতাম না। আর জানিলে, এত করিয়া লীলার কোথায় কি হইয়াছিল, খুঁজিয়া বেড়াইতাম না, আর পাঠক মহাশয়ের ও বিরক্তিভাজন হইতাম না।

কি বলিতেছিলাম।—লীলা হৈমবতীর কথায় মুখ তুলিয়া হৈমবতীর মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার ডাগর-ডাগর চোক দুটী একটু বিস্ফারিত

করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জানি আমার অদৃষ্টের ভোগ না ফুরাইলে আমার যাওয়া হইবে না, কিন্তু আমার যাওয়ার সঙ্গে তোমার অদৃষ্টের সম্বন্ধ কিসের?"

লীলা বাস্তবিকই বুঝিতে পারে নাই, তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিবার সময় তাহার মুখে কি এক অপূর্ব্ব সরলতা, কি এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাব শোভা পাইতেছিল। তখন হৈমবতী সযত্নে লীলাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার মুখখানি দুই হাত দিয়া ধরিয়া বলিলেন, "বুঝিতে পার নাই! লীলা, বুঝিবে কেমন করিয়া? স্বামী কি পদার্থ, এখনও জানিতে পার নাই; আর তাই স্বামীর অদৃষ্টের সঙ্গে স্ত্রীর অদৃষ্ট কি অবিচ্ছিন্নভাবে সম্বন্ধ, তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। যতদূর শুনিয়াছি, যতদূর জানিয়াছি, তোমাকে আনিয়াছেন বলিয়া বা আমার স্বামীর ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে! সেই সঙ্গে আমারও ভাগ্য বিপর্য্যয় অনিবার্য্য।"

লীলার জন্য হৈমবতীর ভাগ্যবিপর্য্যয়! যে হৈমবতী লীলাকে তেমন বিপদ হইতে বাঁচাইয়াছেন, তাঁহার জন্য যে হৈমবতী প্রাণত্যাগ করিতে বসিয়াছিলেন, যে হৈমবতী আজও লীলাকে বুকে করিয়া রাখিয়াছেন, লীলার জন্য তাঁহাকে দুঃখভোগ করিতে হইবে? লীলা ত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। লীলা কাঁদে কাঁদুক, তাহার জন্য অপরে কাঁদিবে কেন? আর লীলা মরিলে যদি সকলে সুখী হয়, তবে লীলা না হয় মরিল। তখন সেই ক্ষুদ্র কৃতজ্ঞ হৃদয় আপনার মৃত্যু কামনা করিল। লীলার ডাগর-ডাগর চোক দুটী জলে পুরিয়া আসিল, হৈমবতীর দুটী হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া লীলা বলিল; "লীলা মরিলে যদি সকলের অদৃষ্টের ভোগ ফুরায়, তবে লীলা মরুক না কেন!"

কি জানি, কেমন করিয়া হৈমবতী লীলার সেই জলভরা চোক দুইটী দেখিতে পাইয়াছিলেন, আর তেমনি করিয়া, ঠাকুরমার-মত করিয়া মুছাইয়া দিয়াছিলেন। লীলার চোক দুটো বড় অবাধ্য। মানা না শুনিয়া বড় কান্নাকাটি আরম্ভ করিয়াছিল। তা করুক, লীলার কথা শুনিয়া হৈমবতীরও চক্ষে জল দেখা দিয়াছিল।

হৈমবতী লীলার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "না লীলা, লীলাকে মরিতে হইবে না, অমূল্যকুমার বাঁচিয়া থাক্, এ রত্ন তাহার পায় ফেলিয়া দিলে সে কখন অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না; দেখি অমূল্যকুমারকে বলিয়া সব মিটাইতে পারি কি না?"

অমূল্যকুমারের নাম শুনিয়া লীলা লজ্জায় মুখ নামাইলেন। তখন সেই লজ্জাবনত মুখখানি কি সুন্দর দেখাইতেছিল! আর সেই লজ্জায়-অর্দ্ধমুদ্রিত সেই ভাসা-ভাসা চোক দুটি,—থাক, অত শত কথায় আমাদের কাজ নাই।

তখন হৈমবতী বলিলেন, "অমূল্যকুমার আসিলে তাহার কাছে যাইতে পারিবে ত? যে যে কথা বলিয়া দিব, বলিতে পারিবে ত?"

অমূল্যকুমারের সহিত বিবাহ হওয়া অবধি রাজ্য শুদ্ধ লোক "অমূল্যকুমার অমূল্যকুমার" করিয়া লীলাকে খেপাইয়া মারিয়াছে, বিশেষ ঠাকুর মা। আজ এখানে পরের বাটীতেও সেই অমূল্যকুমার! লীলা হৈমবতীর কথার জবাব না দিয়া তাহার হাত ছাড়াইয়া পলাইতে চেষ্টা করিল, হৈমবতী টানিয়া রাখিলে লীলা তাঁহার কাপড় ছিঁড়িয়া হাতে আঁচড়াইয়া পলাইল।

হৈমবতী কিন্তু অমূল্যকুমারকে লইয়া কি-একটা মতলব আঁটিতেছিলেন, তা লীলা যখন তাঁহার কথায় কাণ দিল না, আমরাও তাঁর মতলবটা শুনিতে পাইলাম না। (ক্রমশঃ)

শ্রীনারায়ণচন্দ্র সেন।

ভূদেব-বিয়োগ।

পার্থিব প্রপঞ্চে থাকি, পুণ্য পুণ্য-ফলে
ভূদেব সে নর-দেব,—গি'য়েছে রে চ'লে!
দৈন্যের কারুণ্য-কণ্ঠে যেচে অন্ন যেই
জুড়াল উদর-জ্বালা,—আত্ম-বলে সেই
জগতের দিগ্বিজয়ী দান-অবতার;
কর্ম্মের বৈচিত্র্য-তত্ত্বে করিল প্রচার
পবিত্র গীতার সার; শিখা'ল নীরবে
কর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম নিকর্ম্মা মানবে।
কর্ম্ম-সূত্রে কর্ম্ম করি,—কর্ম্মে দেখাইয়া
জীবনের উচ্চ লক্ষ্য—গি'য়েছে চলিয়া।
গি'য়েছে অমরাধামে,—রেখে গেছে তা'র
পদাঙ্ক অঙ্কিত করি;—পথ দেখাবার
অনন্ত সে পথ-মাঝে,—যে পথে প্রয়াণ
ক'রেছে আপনি সেই, পুরুষ-প্রধান।

শ্রীবিহারিলাল সরকার।

জন্মপত্রিকা-প্রস্তুত-প্রণালী।

জন্মপত্রিকায় সাধারণতঃ এই কয়েকটী বিষয় লিখিত থাকে:—

১। জাতচক্র।
২। পতাকীচক্র।
৩। ষড়ুবর্গ।
৪। জন্মরাশি—বর্ণ।
৫। জন্মনক্ষত্র—দশা—গণ।
৬। বিবিধ—যথা,—সন, মাস, তারিখ, বার, তিথি ইত্যাদি।
৭। সংক্ষিপ্ত দৈনিক পঞ্জিকা।

আমরা যথাক্রমে এই কয়েকটী বিষয় গ্রহণ করিতেছি।

১। জাতচক্র।

জাতচক্র অঙ্কিত করিতে, জাতকের লগ্ন-নিরূপণ ও জন্মকালে গ্রহগণ কোন্ কোন্ রাশিতে কোন্ কোন্ নক্ষত্রে অবস্থান করিতেছে, তাহা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক।

লগ্ননিরূপণ। নভোমণ্ডলের পূর্ব্বদিকের সর্ব্বনিম্নে অর্থাৎ যেখানে উহা পৃথিবীর সহিত যুক্ত বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়, সেইখানে যে রাশি উদিত থাকে, তাহাকে লগ্ন কহে। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন—এই দ্বাদশটী রাশি। ইহার কোন একটী প্রভাতে পূর্ব্বদিকের পূর্ব্বোক্ত স্থানে উদিত হইয়া ক্রমে পরবর্ত্তী রাশিকে তথায় স্থান দান করত পশ্চিমে গমন করিয়া থাকে। এই সকল রাশির দৈর্ঘ্য আছে। ঐ দৈর্ঘ্যের ৩০ ভাগের এক ভাগকে অংশ কহা যায়।* সুতরাং রাশি মাত্রই ৩০ অংশে বিভক্ত। পূর্ব্বদিকের পূর্ব্বোক্ত স্থানে যে সময়ে যে রাশির অংশ উদিত থাকে, সেই রাশিকেই সেই সময়ের লগ্ন কহা যায়। উক্ত রাশিগুলি সর্ব্বদাই পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে অস্ত যাইতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও রাশির সকল অংশ এক মুহূর্ত্তেই পূর্ব্বদিকের সর্ব্বনিম্ন-স্থান, যাহাকে চক্রবাল বলে, তাহা অতিক্রম করিতে পারে না; তজ্জন্য কিছু সময় আবশ্যক। ঐ সময়কে লগ্নমান কহে। যথা মেষের ১ম অংশ পূর্ব্বদিকে চক্রবালে প্রথম উদিত হইল; ক্রমে তথায় ২য়, ৩য়, ৪র্থ এইরূপ অংশ উদিত হইয়া সর্ব্বশেষে ৩০শ অংশ উদিত হইল। পরে তাহাও স্থানত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল এবং বৃষ রাশির ১ম অংশ সবে মাত্র উদিত হইল। এখন মেষের লগ্ন-মান অর্থে—মেষের প্রথম অংশ সর্ব্বপ্রথমে উদিত হওয়া অবধি বৃষের প্রথম অংশ সর্ব্বপ্রথম উদিত হওয়া পর্য্যন্ত, যে সময় অতিবাহিত হইল, তাহাই বুঝিতে হইবে।

* প্রথম শিক্ষার্থীগণকে অংশের সেইরূপ সংজ্ঞা বলায় কোনরূপ দোষ মনে করিলাম না। প্রথমে বিবৃতি একবারে স্থূলভাবে বুঝিতে পারিলে, পরে ইহার সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝাইতে কষ্ট হয় না।

পাঠকবর্গের প্রথমে এই লগ্নমান জানা আবশ্যক। সকল রাশির লগ্নমান একরূপ নহে। এই লগ্নমান বিশুদ্ধরূপে বাহির করিতে অনেক প্রক্রিয়া আবশ্যক। কিন্তু আমরা এখন তাহা কিছুমাত্র না বলিয়া অতি সহজে পঞ্জিকা-মাত্র অবলম্বনে যাহাতে পাঠকবর্গ জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিতে পারেন, তাহাই বলিব।

লগ্নমান সকল পঞ্জিকাতেই লিখিত থাকে। পাঠকবর্গ গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা হইতে ইহা দেখিয়া লইবেন। যে বৎসরে জাতকের জন্ম হইয়াছে বা হইবে, সেই বৎসরের "গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায়" যে অয়নাংশশোধিত লগ্নমান দেওয়া আছে, তাহাই সেই সনের লগ্নমান স্বরূপ গ্রহণ করিয়া জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিবেন। যথা ১২৯৯ সালের গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় ১৬ই জ্যৈষ্ঠে কলিকাতার লগ্নমান এইরূপে লিখিত আছে ;—

মেষ ৪।৭।০ ; বৃষ ৪।৪৯।৪০ ; মিথুন ৫।২৮।৪০ ; কর্কট ৫।৪০।৪০ ; সিংহ ৫।৩৩।০ ; কন্যা ৫।২৯।০ ; তুলা ৫।৩৭।০ ; বিছা ৫।৪০।২০ ; ধনু ৫।১৭।২০ ; মকর ৪।৩৩।২০ ; কুম্ভ ৩।৫৭।০ ; মীন ৩।৪৭।০। ১২৯৯ সালের কোন জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করিতে হইলে, ইহাই কলিকাতার লগ্নমান স্থির করিয়া ধরিলেই হইল।

লগ্ননিরূপণে সর্ব্বপ্রথম জাতকের জন্ম সময় নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। এখন এই সময় নিরূপণ জন্য ঘটিকা যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু উহা প্রকৃত পক্ষে জন্মপত্রিকার জ্ঞাতব্য সময় সঠিক নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম। তাহার কারণ অনেক—আমরা সে সকল বিষয় বিস্তৃতরূপে বলিতে চাহি না। এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি যে, সূক্ষ্ম গণনার সময় নির্দ্ধারণ করিতে সৌরমান ও এই ঘটিকা যন্ত্রের প্রদর্শিত সময়ের দৈনিক বিভিন্নতা ধরিয়া লইতে হয়। আমরা আপাততঃ পাঠকবর্গকে তাহা কিছুই না বলিয়া ঘটিকাযন্ত্রের সময়ই গ্রহণ করিতে বলিব। দিবায় জন্ম হইলে প্রভাত হইতে জন্ম-সময় পর্য্যন্ত কত দণ্ডাদি ও রাত্রিতে জন্ম হইলে সূর্য্যাস্ত হইতে জন্মসময় কত দণ্ডাদি, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে হইবে। যাঁহারা কিছু-মাত্র গণিত জানেন, তাঁহাদের পক্ষে এই পর্য্যন্ত লিখিলেই যথেষ্ট হয় ; কিন্তু আমরা সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকবর্গের জন্য এই প্রবন্ধ লিখিতেছি, সুতরাং এ সম্বন্ধে একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া অন্যায় মনে করি না। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ মাপ করিবেন।

মনে করুন, ১২৯৯ সনের ১০ই শ্রাবণ বেলা ১১॥০ সময় কোন বালকের জন্ম হইল। এখন এই বালকের প্রভাত হইতে জন্মকাল পর্য্যন্ত দণ্ডাদি নির্দ্ধারণ করিতে সর্ব্বপ্রথম দেখিতে হইবে, সেই দিন প্রভাতে কত ঘটিকাদির সময় সূর্য্যোদয় হইয়াছিল। ঐ সনের গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় দেখা যায়—"ইং ঘণ্টা ৫।২৯।০ গতে উদয়" এইরূপ লিখিত আছে। এতদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, উক্ত তারিখে ৫ ঘটিকা, ২৯ মিনিট গতে প্রভাত হইয়াছে। ১১॥০ টা অর্থাৎ ১১ ঘঃ ৩০ মিনিট হইতে উক্ত অঙ্ক বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট ৬ ঘণ্টা ১ মিনিট রহিল। ৬ ঘণ্টা= ১৫দণ্ড। ১মিনিট=২॥পল। সুতরাং সে সময়ে বেলা ১৫দণ্ড ২পল ৩০বিপল হইল। কারণ

১ঘণ্টা=২॥ দণ্ড অর্থাৎ ২দণ্ড ৩০পল।

১মিনিট=২॥ পল অর্থাৎ ২পল ৩০বিপল।

১ সেকেণ্ড=২॥ বিপল অর্থাৎ ২বিপল ৩০ অনুপল।

এবং ১ দণ্ড = ২৪ মিনিট ; ১ পল = ২৪ সেকেণ্ড ; ১বিপল—২৪আড়া।

যদি ঐ তারিখ অপরাহ্ণ বেলা ১টার সময় কিংবা অপরাহ্ণ ৫।২৯ মিনিট পর্য্যন্ত যে কোন সময় বালক জন্মগ্রহণ করিত, তবে উক্ত অঙ্কের সহিত যোগ করিয়া পরে উদয়কাল বিয়োগ করিতে হইত। রাত্রিতে জন্ম হইলেও ঐরূপেই প্রক্রিয়া করিতে হইবে। প্রভেদ এই যে,

সেখানে উদয়কাল না ধরিয়া অস্তকাল ধরিতে হইবে।

জন্মদণ্ডাদি এইরূপে স্থির হইলে, লগ্ন-নিরূপণার্থ আর একটী কার্য্য আবশ্যক। যে দিনের লগ্ন স্থির করিতে হইবে, সেই দিনের প্রভাতের চক্রবালে সর্ব্বপ্রথম কোন্ লগ্ন উদিত হইয়াছিল এবং ঐ লগ্ন সেই স্থান সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে কত কাল অবশিষ্ট ছিল। দিবার লগ্ননিরূপণার্থ তাহা স্থির করা আবশ্যক এবং রাত্রির লগ্ন নির্ণয় করিতে হইলে কোন্ লগ্ন সেই দিন সূর্য্যাস্ত সময়ে পশ্চিমে অবস্থান করিতেছিল এবং তাহার সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইতে কত সময় অবশিষ্ট ছিল, তাহাই জানিতে হইবে। ইহাও প্রথম শিক্ষার জন্য আমরা পাঠকবর্গকে পঞ্জিকা দৃষ্টে অবধারণ করিয়া লইতে বলিব।

পূর্ব্বোক্ত ১২৯৯ সনের গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় ১০ই শ্রাবণ তারিখে লিখিত আছে,—

"কর্কট ১।৪৬।০ গতে উদয়"

ইহার অর্থ এই,—সেই তারিখ প্রভাতে কর্কটের লগ্নমানের ১দণ্ড ৪৬পল ৯বিপল অতীত হইলে সূর্য্যোদয় হইয়াছে।

পূর্ব্বে পাইয়াছি কর্কটের (কলিকাতার) লগ্নমান দণ্ড ৫।৪০।৪০; সুতরাং কর্কটের চক্রবাল হইতে তিরোহিত হইলে, দণ্ড ৩।৫৪।৪০ বিপল কম অবশিষ্ট ছিল। (৫।৪০।৪০—১।৪৬।০ = ৩।৫৪।৪০)।

এতদ্দ্বারা এই বুঝিলাম যে, যদি কোন বালক কলিকাতায় উক্ত দিবস বেলা দণ্ড ৩।৫৪।৪০ বিপল মধ্যে জন্মগ্রহণ করিত, তবে তাহার লগ্ন কর্কট হইত। কিন্তু আমাদের কথিত বালকের জন্ম তাহার অনেক পরে, সুতরাং সেই সময়ের লগ্ন স্থির করিতে পরবর্ত্তী রাশির লগ্নমান যোগ করিতে হইবে। কর্কট দৃশ্য হইলে, লগ্নে সিংহরাশি উপস্থিত হইলেন। তিনিও তথায় ৫।৩৩।০ বিপল মাত্র থাকিয়া পরবর্ত্তী কন্যাকে স্থান দিয়া তিরোহিত হইলেন। তাহাতে পাইলাম বেলা ৩।৫৪।৪০ বিপল পর্য্যন্ত কর্কট লগ্ন, পরে সেই সময় হইতে বেলা ৯।২৭।৪০ বিপল (৩।৫৪।৪০ + ৫।৩৩।০ = ৯।২৭।৪০) পর্য্যন্ত সিংহলগ্ন। পরে কন্যা—তাহার মান ৫।২৯।০ বিপল সুতরাং ৯।২৭।৪০ বিপল হইতে বেলা (৯।২৭।৪০ + ৫।২৯।০ = ১৪।৫৬।৪০) ১৪ দণ্ড ৫৬ পল ৪০ বিপল পর্য্যন্ত কন্যালগ্ন। আমাদের জাতকের জন্ম ইহারও পরে। সুতরাং ইহারও পরের লগ্ন দেখিতে হইবে। কন্যার পরে তুলা—তাহার মান ৫।৩৭।০ সুতরাং বেলা ১৪ দণ্ড ৫৬পল ৪০ বিপল পরে (১৪।৫৬।৪০ + ৫।৩৭।০ = ২০।৩৩।৪০) ২০ দণ্ড ৩৩পল ৪০বিপল পর্য্যন্ত মধ্যে কোন বালক জন্মগ্রহণ করিলে তাহার তুলালগ্নে জন্ম হইল। কথিত বালক বেলা ১৫ দণ্ড ২ পল ৩০ বিপল সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অতএব তাহার জন্ম-লগ্ন তুলা। এইরূপে জাতকের লগ্ননির্দ্ধারণ করিতে হয়।

লগ্ননিরূপণ-কার্য্য স্থূলভাবে এই খানেই শেষ হয়, কিন্তু পরবর্ত্তী কার্য্যের সুবিধার জন্য, এ সম্বন্ধে আরও ২।১টী কথা বলিতে হইবে।

দেখা গেল যে, তুলা লগ্নের আরম্ভ বেলা ১৪।৫৬।৪০ বিপল পরে হইল—জাতকের জন্ম হইল বেলা ১৫।২।৩০ বিপল সময়ে; সুতরাং তুলা ১৫।২।৩০—১৪।৫৬।৪০ = ০।৫।৫০ বিপল অতীত হইয়া গেলে জাতক জন্মিল। ঐ ০।৫।৫০ বিপল পরিমিত কালে জাতকের জন্মলগ্ন **ভুক্তকাল** কহে। অবশিষ্ট অর্থাৎ ৫।৩৭।০ (তুলার লগ্নমান)—০।৫।৫০ = ৫।৩১।১০ বিপল উক্ত লগ্নভোগ্য দণ্ডাদি কহে।

এইরূপে সময় দ্বারা লগ্নের সূক্ষ্ম গণনা হইল। কিন্তু অংশ দ্বারাও ইহার সূক্ষ্ম গণনা

আবশ্যক। যেরূপ ১দণ্ড=৬০পল; ১পল=৬০বিপল; ১বিপল=৬০অনুপল; সেইরূপ ১রাশি=৩০অংশ; ১অংশ=৩০কলা; ১কলা=৩০বিকলা—ইত্যাদি।

যাঁহারা গণিত শাস্ত্রে পারদর্শী, তাঁহারা অনায়াসেই লগ্নের ভুক্ত ও ভোগ্য অংশাদি বাহির করিতে পারিবেন। তাঁহারা নিম্নলিখিত ত্রৈরাশিক দ্বারা সহজেই উহা স্থির করিতে পারিবেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রতি লগ্ন ৩০অংশে বিভক্ত। যথা—

লগ্নমান (দণ্ডাদি): লগ্নভুক্ত (দণ্ডাদি):: ৩০অংশ: ক (অংশ) পূর্ব্বোক্ত শিশুর স্থলে—

৫।৩৭।০ (তুলার লগ্নমান দণ্ডাদি): ০।৫।৫০ (তুলার ভুক্ত দণ্ডাদি): ৩০অংশ কা: ক=৫ অংশ ৫১কলা ৩৭বিকলা।

কিন্তু যাঁহারা ত্রৈরাশিক জানেন না, তাঁহাদের জন্য আর একটু বিশদ করিয়া দিতে হইবে।

তাঁহারা ইহা জানিয়া রাখিবেন—যে লগ্নের মানকে ও তাহার ভুক্তিমানকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিপলে আনিতে হইবে। পরে ভুক্তি মানকে বিপলসংখ্যক অঙ্ককে ৩০দিয়া গুণ করিয়া লগ্নমানের বিপল অর্থাৎ তৎসংখ্যক অঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলে যে ফল হইবে, তাহাই অংশ এবং অবশিষ্টকে ৬০ দ্বারা পূরণ করিয়া পুনরায় পূর্ব্বোক্ত ভাজক দ্বারা ভাগ করিলে যে ফল হইবে, তাহাই কলা এবং অবশিষ্টকে পুনরায় ৬০ দ্বারা গুণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভাজক দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল বিকলা হইবে। এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট হইবে।

পূর্ব্বোক্ত অঙ্ক এইরূপে সাধিত হইল।

লগ্নমানের বিপল=২০২২০; লগ্নভুক্তির বিপল=৩৯৫০। ৩৯৫০×৩০=১১৮৫০০। ১১৮৫০০÷২০২২০=৫ অবশিষ্ট ১৭৪০০। ঐ ১৭৪০০÷৬০=১০৪৪০০০ এবং ১০৪৪০০০÷২০২২০=৫১ অবশিষ্ট ১১৭৮০। ঐ ১২৭৮০×৬০=৭৬৬৮০০। ৭৬৬৮০০—২০২২০—৩৭ অবশিষ্ট গ্রহণ করা গেল না।

তুলার ঐ ৫ অংশ ৫১ কলা ৩৭ বিকলাকে লগ্নস্ফুট কহে। জ্যোতিষ মতে উহা এইরূপ লিখিত হয়।

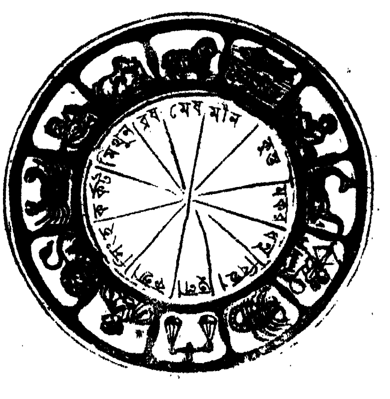
লগ্নস্ফুট রাশ্যাদি—৬।৫।৫১।৩৭ অর্থাৎ ৬ রাশি ৫ অংশ ৫১ কলা ৩৭ বিকলা। ৬ রাশি অর্থ এখানে ৬ রাশি অতীত হইয়া ৭ম রাশি। এইরূপ ০ রাশি=মেষ। ১=বৃষ, ২=মিথুন, ৩=কর্কট, ১১=মীন এইরূপ।

যাঁহার ইহা বুঝিতে কষ্ট হইবে, তিনি ঐ লগ্নস্ফুট নিম্নলিখিত রূপ লিখিলেও পারিবেন।

লগ্নস্ফুট—তুলা অংশাদি ৫।৫১।৩৭। এইরূপে লগ্ননিরূপণ করিয়া পরে জাতচক্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে এই লগ্ন ও গ্রহ সংস্থান করিতে হইবে।

গ্রহ সন্নিবেশ ও লগ্ন সংস্থান।

হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে রাশিদিগের সংস্থান নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে।

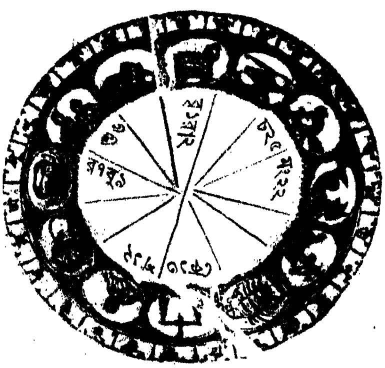


এক্ষণে এই রাশিচক্রের কোন্ রাশিতে কোন্ গ্রহ, কোন্ নক্ষত্র আছেন ও লগ্ন কোথায় আছেন, স্থির করিয়া স্থাপন করিলেই জাতচক্র অঙ্কিত হইল।

গ্রহ ৯টী। ৭টী সপ্তবারের অধিপতি, যথা—রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি অপর দুটী রাহু ও কেতু। এই ৯টী গ্রহের অন্যান্য বিভিন্ন নামও আছে। যথা রবিকে তদর্থব্যঞ্জক, দিবাকর, তপন, সূর্য্য, ভানু প্রভৃতি দ্বারাই অভিহিত করা হইয়া থাকে। অন্যান্য গ্রহগণেরও এইরূপ পর্য্যায় আছে। প্রস্তাব-বাহুল্য-ভয়ে এ স্থানে তাহা লিখিত হইল না।

এই গ্রহগণ মেষাদি দ্বাদশ রাশির কোন্ রাশিতে জন্ম-সময়ে অবস্থান করেন, তাহা পাঠকবর্গ পঞ্জিকা দৃষ্টে এইরূপে স্থির করিবেন। যে বৎসরের যে মাসের গ্রহসংস্থান জানিতে হইবে, সেই মাসের সংক্রান্তি দিবসে অর্থাৎ মাসারম্ভ দিনে যে চক্র অঙ্কিত আছে, তাহা দেখিয়া লইতে হইবে।

১২৯৯ সালের 'গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় শ্রাবণ-সংক্রান্তি দিবসে নিম্নচিত্রিত চক্র অঙ্কিত আছে।



ইহার অর্থ—সংক্রান্তি সময়ে বৃহস্পতি ১ অর্থাৎ অশ্বিনীনক্ষত্রে—মেষ রাশিতে;—রাহু ভরণীনক্ষত্রে ঐ রাশিতে, শুক্র ৬ অর্থাৎ আর্দ্রানক্ষত্রে মিথুন রাশিতে; রবি ৭ অর্থাৎ পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে কর্কট রাশিতে আছেন। ইত্যাদি। এইখানে নক্ষত্রের কথা বলিয়া লইতে হয়।

জ্যোতিষ মতে নক্ষত্র ২৭ টী। যথা—১ অশ্বিনী, ২ ভরণী, ৩ কৃত্তিকা, ৪ রোহিণী, ৫ মৃগশিরা, ৬ আর্দ্রা, ৭ পুনর্ব্বসু, ৮ পুষ্যা, ৯ অশ্লেষা, ১০ মঘা, ১১ পূর্ব্বফল্গুনী, ১২ উত্তর-ফল্গুনী, ১৩ হস্তা, ১৪ চিত্রা, ১৫ স্বাতি, ১৬ বিশাখা, ১৭ অনুরাধা, ১৮ জ্যেষ্ঠা, ১৯ মূলা, ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া, ২১ উত্তরাষাঢ়া, ২২ শ্রবণা, ২৩ ধনিষ্ঠা, ২৪ শতভিষা, ২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ, ২৬ উত্তরভাদ্রপদ ২৭ রেবতী।

পাঠকবর্গ এই নক্ষত্রগুলি ও তাহাদের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা মনে রাখিতে পারিলে ভাল হয়। নতুবা পঞ্জিকা দৃষ্টে ইহা স্থির করিবেন। প্রতি পঞ্জিকাতেই ইহা লিখিত থাকে।

সংক্রান্তি সময়ে কাহার জন্ম হইলে, ঠিক এইরূপ জাতচক্র অঙ্কিত করিয়া যে রাশিতে লগ্ন স্থির হইল, সেই রাশিতে "লং" সংক্ষেপে ইহা লিখিয়া লইলেই জাতচক্র সম্পূর্ণ হইল।

কিন্তু সংক্রান্তি ভিন্ন অন্য সময়ে জন্ম হইলে ঐ চক্রে চলিবে না—কারণ গ্রহগণ সচল, সর্ব্বদাই স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে। সুতরাং ঐ পরিবর্ত্তনও জানা আবশ্যক।

তাহাও পঞ্জিকাতেই লিখিত আছে। সংক্রান্তি-চক্রের নীচেই ঐ পরিবর্ত্তন লিখিত থাকে। যথা, ১২৯৯ সনের গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির পরেই লিখিত আছে,—

"শ্রাবণ মাসের মঙ্গলাদি গ্রহের রাশ্যাদি সঞ্চার সময়" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চক্র যে সময় অঙ্কিত হইয়াছে, সেই সময়ের পর হইতে ভ্রমাসের সংক্রান্তি সময় পর্য্যন্ত (রবি ও চন্দ্র ভিন্ন) মঙ্গলাদি গ্রহগণের যে যে কালে যে যে নক্ষত্র ও রাশি পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহাই উক্ত বিষয়ে লিখিত আছে। রবি ও চন্দ্রের পরিবর্ত্তন অতি শীঘ্রই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং

সমগ্র মাসের পরিবর্ত্তন লিখিলে অনেক লিখিতে হয় বলিয়া তাহা ঐ স্থানে লিখিত হয় না। তাহা স্থির করিবার পন্থা পরে বলা যাইবে।

আমাদের পূর্ব্বোক্ত পঞ্জিকায় এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

"৫ই শ্রাবণ ২৫।১০ পলে বুধ সিংহ রাশিতে।
১৩ই শুক্র বক্রগতি ত্যাগ করিবেন।
২২শে বুধ বক্রী হইবেন
২৫শে বুধ পশ্চিমে পাদাস্ত হইবেন।
২৮শে ৩৮।২৮ পলে বৃহস্পতি বক্রী হইবেন।"

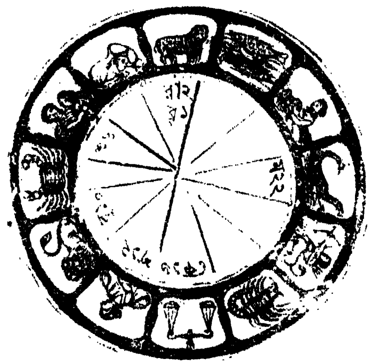
উক্ত বিবরণের ১পংক্তির মর্ম্ম এই যে, বুধ ৫ই শ্রাবণ ২৫।১০ পলে সিংহ রাশিতে গমন করিবেন। এখানে একটী বিষয় পঞ্জিকাকার ভুলিয়াছেন। আমরা সংক্রান্তি-চক্রে দেখিয়াছি, ইহার পূর্ব্বে বুধ ৯নক্ষত্রে ছিলেন। এক্ষণে পঞ্জিকায় নক্ষত্রের কোন পরিবর্ত্তন লিখিত হইল না। বাস্তবিক কিন্তু এ স্থলে নক্ষত্রের পরিবর্ত্তনও অনিবার্য্য। পাঠক বর্গকে তাহা বুঝাইতেছি।

কোন্ কোন্ নক্ষত্রে কোন কোন্ রাশি হইয়া থাকে, তাহা নির্দ্দিষ্ট আছে।

যথা—১ (অশ্বিনী), ২ (ভরণী), ৩ কৃত্তিকার প্রথম ১ পাদে=মেষরাশি। ৩ (কৃত্তিকার) বাকী—ত্রিপাদ, রোহিণী মৃগশিরার প্রথমার্দ্ধ বৃষরাশি। মৃগশিরার বাকী শেষার্দ্ধ, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসুর প্রথম ত্রিপাদ=মিথুনরাশি। পুনর্ব্বসুর শেষপাদ, পুষ্যা, অশ্লেষা=কর্কট। মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনীর প্রথমপাদ=সিংহ। এইরূপ সকল নক্ষত্রকে সমান ধরিয়া সওয়া দুই নক্ষত্রে পূর্ব্বোক্তরূপে এক এক রাশি হয়। দেখা যাইতেছে, বুধ ৫ই শ্রাবণ ২৫।১০ পলে সিংহ রাশিতে গিয়াছেন। অতএব নিশ্চয়ই বুধ মঘা নক্ষত্রে গিয়াছেন। মঘার সংখ্যা ১০- -ঃ পঞ্জিকায় এইটী না লেখা ভ্রম মাত্র।

কথিত বিবরণের ২য়, ৩য়, ৪র্থ পংক্তি গ্রহের গতিবিষয়ক। তাহা পাঠকবর্গ এখন না জানিলেও ক্ষতি নাই।

এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি, ১২৯৯ সালের ১০ই শ্রাবণ বেলা ১১।৩০মিঃ সময় রবি ও চন্দ্র ভিন্ন অন্য গ্রহসংস্থান যথা ;—



মঙ্গলাদি গ্রহের সঞ্চার গণনার দৃষ্টান্ত আর একটী দেওয়া যাইতেছে। উক্ত সনের গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় ভাদ্র মাসের সঞ্চারগণনা দেখুন। উহাতে শুক্রের নক্ষত্রে ও রাশিপরিবর্ত্তন সম্বন্ধে ৩টী বিবরণ আছে। ১লা ভাদ্র ৫৯।৩ পলে শুক্র ৭ পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে। ২য়—১৫ই ২৬।৫২ পলে শুক্র কর্কটরাশিতে।

৩য় ১৯০। ১৯শে পলে শুক্র ৮ পুষ্যা নক্ষত্রে।

এখন জাতকের লগ্নের অব্যবহিত পূর্ব্বের পরিবর্ত্তনই গ্রহণীয়। যাহার ১লা ৫৯।৩ পল পরে ১৫ই ২৬।৫২ পল মধ্যে জন্ম, তাহার জাতচক্রে শুক্র ৭ নক্ষত্রে থাকিবে; যাহার জন্ম ১৫ই ২৬।৫২ পল গতে ১৯এ ১৯।২ পল মধ্যে, তাহার জাতচক্রে শুক্র কর্কট রাশিতে ৭ নক্ষত্রে থাকিবে; আর যাহার জন্ম ১৯শে ১৯।২ পল পরে ঐ মাস মধ্যে, তাহার জাতচক্রে শুক্র কর্কটরাশিতে ৮ পুষ্যানক্ষত্রে থাকিবে। কারণ জাতকের জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বের রাশি-

পরিবর্ত্তন ১৫ই বিবরণ দ্বারা সূচিত হইয়াছে। এইরূপ অন্যান্য গ্রহেরও সঞ্চার বুঝিতে হইবে।

এখন রবি ও চন্দ্রের স্থাপনা হইলেই পূর্ব্বোক্ত শিশুর গ্রহ স্থাপন কার্য্য শেষ হয়। উক্ত পঞ্জিকায় ১০ই শ্রাবণ তারিখে বামদিকে দেখা যায়, লিখিত আছে র ৮॥০, এতদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে রবি ৮ নক্ষত্রে আছে।

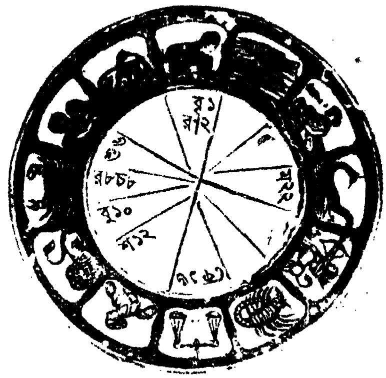
এই নক্ষত্র দ্বারাও রবির রাশি কতকটা স্থির করা যায়। কিন্তু তাহা আমরা এখন বলিব না। রবির রাশি স্থির করিবার অতি সহজ সঙ্কেত আছে। রবি বৈশাখে মেষ রাশিতে। জ্যৈষ্ঠে বৃষে, আষাঢ়ে মিথুনে এইরূপ ক্রমান্বয় ১২ মাসে ১২ রাশিতে অবস্থান করেন।

ঃ০ শ্রাবণ মাসে রবি কর্কট রাশিতে। নক্ষত্র পূর্ব্বেই পাইয়াছি ঃ০ ১০ই শ্রাবণ রবি কর্কট রাশিতে ৮ নক্ষত্রে।

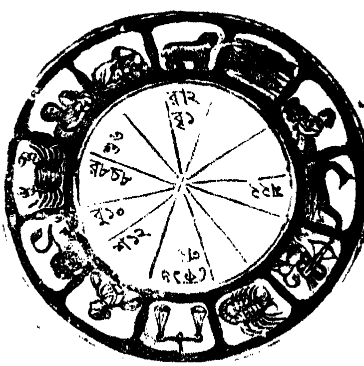
এখন বাকি রহিলেন চন্দ্র। চন্দ্রের কথাও উক্ত পঞ্জিকায় লিখিত আছে। লিখিত আছে, "কর্কটের চন্দ্র"। * এতদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে, চন্দ্র উক্ত তারিখ কর্কট-রাশিতে ছিলেন। এখন চন্দ্রের নক্ষত্র বাহির করিতে পারিলেই, কর্ম্ম শেষ হইল। জাতকের জন্মনক্ষত্রও যাহা, চন্দ্রের নক্ষত্রও তাহা। দেখা যায়, উক্ত দিনে উক্ত সময় পঞ্জিকায় পুষ্যা নক্ষত্র লিখিত আছে। ঃ০ চন্দ্র সেই সময় কর্কট রাশিতে পুষ্যা নক্ষত্রে অবস্থান করিতেছিলেন। পুষ্যা নক্ষত্রের ৮ ঃ০ চন্দ্র যেই সময় কর্কট রাশিতে ৮ নক্ষত্রে ছিলেন।

* যেখানে "কর্কটের চন্দ্র ৩৫।৩০ গতে সিংহের চন্দ্র" এইরূপ কথিত থাকে, সেখানে বুঝিতে হইবে, সেই দিন প্রাতে হইতে দং ৩৫।৩০ পল পর্য্যন্ত চন্দ্র কর্কটে ছিলেন পরে সিংহে গিয়াছেন। উক্ত ৩ দণ্ড ৩০ পল পর যে শিশুর জন্ম হইল, তাহার চন্দ্র সিংহে লিখিতে হইবে।

এখন গ্রহ সংস্থান এইরূপ হইল,—



এখন লগ্ন বসাইলেই জাতচক্র শেষ হইল। পূর্ব্বোক্ত শিশুর লগ্ন তুলা ; ঃ০ জাতচক্র এইরূপ হইল।



ক্রমশঃ।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়।

অভিমান।

সযতনে অভিমান রাখে তোরে প্রাণ।
তাই তার পদে পদে এত অপমান।
বিদ্যাবল মান ধনে, কেহ নহে তোমা সনে,
ললিত ভাষায় তুমি না হরিলে জ্ঞান,
অভিমান, কে তোমার রাখিত হে মান।

যদি না করিত কেহ তোমারে প্রত্যয়।
দুখাগার এ সংসার কাহার কি হয় ?

বার বার করি ছল, ঢাল হৃদে হলাহল,
পাছে কেহ বড় হয় এই সদা ভয়,
হিংসা তাই অধিকারী মানব-হৃদয়।

তুমি না করিলে ছল ক্রোধের কি বল,
নরঘাতী ক্রোধ তব কথায় প্রবল,
আমারে না গণে মানে, দারুণ বেদনা হানে,
কুটিল কথায় তব কে রহে সরল,
বুঝেও না বুঝে জ্বলে চিতায় অনল।

কোথায় কি আছে হেন কঠিন বন্ধন,
মন্মথের ফুলবাণ তুমি শরাসন,
তোমার কুটিল ভাষে, বদ্ধ হয় মোহপাশে,
ভ ব কার নহি আমি আদরের ধন,
আমার না হবে কেবা রমণীরতন।

তুমি বল তাই হেন মনে মনে ভাবি,
কে হেন রমণী নহে মম অভিলাষী।
নাহি চাই নাহি চাব, চাহিলে তখনি পাব,
ভাল বাসে সে আমারে নাহি ভাল বাসি,
অভিমান হাসে আমি গলে পরি ফাঁসী॥

সিংহাসনযোগ্য পাত্র কে আছে এমন
মুকুট না পরি শিরে বিধি বিড়ম্বন।
মম সম যোগ্য কেবা, ভ্রমে নাহি করে সেবা,
নরকুল হায় হায় নির্ব্বোধ কেমন
কেন না পরায় মোরে মুকুট-ভূষণ॥

মনোহরা বেশ কভু লোভ কি পরিত
চতুর ভাবিয়া পর-ধন কি হরিত।
শ্রেষ্ঠ আমি সবা হ'তে, বুঝা'য়েছ বিধিমতে,
বিশ্বাসঘাতন কভু কেহ কি করিত
কুম্ভপানে কেবা হ'তো নিদ্রা-বিরহিত।

আমি দিই তাই থায় সন্তান আমার,
দম্ভভরে কর্ণে না কহিলে বার বার।
গুণী কত দম্ভ করে, কেন রব যোড় করে,
কেন বা পরিব গলে দাসত্বের ভার।
কর্ত্তা আমি যদি না আসিত অহঙ্কার।

অভিমান! কত বেশে ভুলাও আমায়
বুঝিলে কেবল তুব চরণে লোটায়।
প্রেমের করিয়ে ভাণ, কর কত অপমান,
অস্ত দন্ত হীন রাখ মার্জ্জার শয্যায়,
সকলি গিয়েছে সার ভেবে ধর তায়॥

অভিমান! অতি প্রিয় দাস তব মদ,
কৌপীন ধরিয়ে পায় ঠেলেছ সম্পদ।
অন্ত কেহ নাহি পারে, মনে কর বারে বারে,
ঈশ্বর বিলুব্ধ-চিত্তে ঘটাও বিপদ
সংসারে নাহিক হেন বিপদের হ্রদ।

মাৎসর্য্যে ক'রেছ কত ঐশ্বর্য্য প্রদান,
সাথে সাথে আছ ভাবে নাহি অভিমান।
বল ওই দম্ভ ক'রে, ঘৃণা কর দম্ভভরে
দম্ভ নাহি বলি করি আপন সম্মান,
ভুলাও মজাও তুমি শ্রেষ্ঠ মতিমান।

রাখিতে পারি হে যদি গুরুপদে মতি,
বুঝিব হে অভিমান! তোমার শকতি।
ইচ্ছামত ধন পাব, নারী পাব যারে চাব,
অতি হীন হ'য়ে হব ধরণীর পতি,
অতি হীন হ'য়ে পাব অতি উচ্চগতি॥

শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ।

"উইন্‌টার্‌স্‌ টেল্‌।"

(১)

সিসিলিদ্বীপে লিয়ন্তিস নামে এক রাজা এবং হারমিয়নি নামে এক রাণী ছিলেন। হারমিয়নি রূপে-গুণে অনুপমা। দম্পতি-যুগলের মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় ছিল। মনোমোহিনী গুণবতী ভার্য্যালাভে সিসিলিরাজের কোন সুখ অপূর্ণ ছিল না। তবে মধ্যে মধ্যে তিনি তাঁহার বাল্য-সহচর ও সহপাঠী সুহৃৎ বোহি-মিয়ারাজ পলিক্‌সেনিসকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেন। কৈশোর অবস্থা হইতে লিয়ন্তিস ও পলিক্‌সেনিস এক সঙ্গে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। কিন্তু উভয়ের পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায়, যথাসময়ে উভয়েই পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তদবধি বহুকাল উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই;—কেবলমাত্র উপহার, প্রণয়-পত্র ও দূত-প্রেরণে উভয়ের আত্মীয়তা রক্ষিত হইত।

অনেকবার বন্ধুর সাদর অভ্যর্থনায় বাধ্য হইয়া, একদিন বোহিমিয়া-রাজ সিসিলি-রাজ্যে উপনীত হইলেন এবং লিয়ন্তিসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

বন্ধুকে আপন বাটীতে সমাগত দেখিয়া, সিসিলি-রাজের আর আনন্দের অবধি রহিল

না। প্রাণাধিকা হারমিয়নির সহিত তিনি বন্ধুর আলাপ-পরিচয় করিয়া দিলেন। সহধর্ম্মিণীকে কহিয়া দিলেন, তিনি যেন বিশেষরূপে বোহিমিয়া-রাজকে আদর-আপ্যায়িত করেন। অতঃপর দুই বন্ধুতে মিলিয়া, অতীতের অনেক কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। সুকুমার-শিশুকালের সেই সরল প্রীতিপ্রদ কথার আলোচনায় উভয়েই সুখী হইলেন। গুণবতী হারমিয়নি যদিও ইতিপূর্ব্বে অনেকবার স্বামীর মুখে সে সকল কথা শুনিয়াছিলেন, তথাপি উপস্থিত কথোপকথনে তাঁহার সুখের সীমা রহিল না।

দুই বন্ধুতে কিছুদিন এইরূপ খুব মনের সুখে কাল কাটাইলেন। অতঃপর বোহিমিয়া-রাজ স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিবার প্রস্তাব করিলে, সিসিলি-রাজ দুঃখিত হইলেন এবং আরও কিছুদিন বন্ধুকে অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেন। পলিক্সেনিস বন্ধুর সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। কিন্তু যখন গুণবতী হারমিয়নি মধুরভাষে, সবিনয় আগ্রহসহকারে অনুরোধ করিলেন, বোহিমিয়া-রাজ তখন আর সে অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না,—আরও কিছুদিন বন্ধুর আলয়ে থাকিতে সঙ্কল্প করিলেন।

(২)

কিন্তু ভবিতব্য অন্যরূপ! কিসে যে কি হয়, তাহা নির্দ্দেশ করা বড় কঠিন। দুরদৃষ্টবশে সরলা হারমিয়নি আপন গ্রহ আপনি ডাকিয়া আনিলেন। দেবতার মন্দিরে পিশাচ আশ্রয় লইল।

লিয়ন্তিস যদিও বন্ধুকে সচ্চরিত্র, সুশীল এবং হারমিয়নিকে পতিব্রতা সাধ্বী বলিয়া জানিতেন, তথাপি উপস্থিত ব্যাপারে অকস্মাৎ তাঁহার অন্তরে উৎকট সন্দেহ ও বিকট হিংসার উদয় হইল।—"কি, আমি এত অনুরোধ করিলাম, এত আগ্রহ দেখাইলাম, আমাকে উপেক্ষা করিয়া, আমার স্ত্রীর কথা রক্ষা করা হইল! অবশ্যই ইহার ভিতর কোন রহস্য আছে!"

উৎকট সন্দেহের সহিত বিকট হিংসার মিলন! নরকের আগুন জ্বলিয়া উঠিল! সিসিলিরাজ হিতাহিত জ্ঞান হারাইলেন। একবারও ভাবিলেন না যে, সরলা হারমিয়নি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ এবং বোহিমিয়া-রাজও সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। পতিব্রতা যে, কেবল স্বামীর চিত্ত-বিনোদনের জন্যই পলিক্সেনিসকে আরও কিছুদিন থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, আর পলিক্সেনিসও যে, সরলভাবে সে অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন, সিসিলি-রাজ লিয়ন্তিস ভ্রমেও একথা একবার ভাবিলেন না। মূর্ত্তিমান্ শনি যার ব্রহ্মরন্ধ্রে আশ্রয় গ্রহণ করে, সে ত আদৌ সুপথ দেখিতে পাইবে না। প্রতিহিংসায় পিশাচবৎ নির্ম্মম ও কঠোর হইয়া লিয়ন্তিস কেমিলো নামক জনৈক বিশ্বস্ত ও সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারীকে মনের দারুণ অবস্থা জানাইলেন এবং বিষ-প্রয়োগ-দ্বারা বোহিমিয়া-রাজ পলিক্সেনিসের প্রাণ-সংহার করিতে আদেশ করিলেন।

(৩)

কেমিলো অতি সজ্জন প্রকৃতির লোক ছিলেন। বিলক্ষণরূপেই বুঝিতে পারিলেন, ঘটনাটী সম্পূর্ণ অমূলক। প্রভুর আদেশপালন অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া, তিনি অদূরদর্শীর ন্যায় বোহিমিয়া-রাজকে বিষপ্রয়োগ করিলেন না,—অধিকন্তু গোপনে সিসিলি-রাজের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাকে তথা হইতে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে পরামর্শ দিলেন এবং নিজেও সিসিলি-রাজ্য ত্যাগ

করিয়া, তাঁহার সমভিব্যাহারী হইবেন, বলিলেন।

পলিক্‌সেনিস্‌ বাল্যবন্ধু লিয়ন্তিসের সঙ্কল্প শুনিয়া অতিমাত্র ভীত, চকিত, স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন; কিন্তু একটু খানি ভাবিবারও অবসর পাইলেন না;— কেমিলোর সাহায্যে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রাণভয়ে প্রস্থান করিলেন এবং যথাসময়ে নির্ব্বিঘ্নে আপন রাজধানীতে উপনীত হইলেন। কেমিলো এখানে আসিয়া, বোহিমিয়া-রাজের পরম সুহৃৎ ও প্রধান প্রিয়জনস্বরূপে সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

---

(৪)

পলিক্‌সেনিস্‌ প্রাণভয়ে পলায়ন করিলে, লিয়ন্তিসের ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পাইল। স্ত্রীর ব্যভিচারাশঙ্কা তাঁহার মনে আরও বদ্ধমূল হইল। তিনি ক্রোধে কম্পিতকলেবর হইয়া, তখনই হারমিয়নির উদ্দেশে গমন করিলেন। সরলা রাণী তখন আপন পুত্র মেমিলাসের সহিত উপবিষ্ট ছিলেন। প্রাণোপম পুত্র তখন জননীর সহিত সোহাগপূর্ণ গল্পগাছা করিতে ছিল। অকস্মাৎ রুদ্রমূর্ত্তিতে সিসলি-রাজ সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং পুত্রকে তথা হইতে অপসারিত করিয়া দিয়া, অতি নিষ্ঠুর-ভাবে মহিষীকে কারারুদ্ধ করিলেন।

রাজকুমার মেমিলাস্‌ যদিও বয়সে বালক, তথাপি সে মাতৃস্নেহ বুঝিত। সেই স্নেহময়ী জননী, জনককর্ত্তৃক যৎপরোনাস্তি অপমানিতা ও লাঞ্ছিতা হইয়া, অতি নিষ্ঠুরভাবে কারারুদ্ধ হইলেন দেখিয়া, তাহার বুকে দারুণ আঘাত লাগিল। তদবধি সে অনাহারে ও অনিদ্রায় অতি শীর্ণ হইয়া পড়িল। সকলে ভাবিল যে, মাতৃশোকে বালকের প্রাণবিয়োগও হইতে পারে।

সিসিলি-রাজ, মহিষীর ব্যভিচারাশঙ্কায় অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইয়া, ক্লিওমিনিস্‌ ও ডাইয়ন নামক দুই জন বিশিষ্ট সিসিলিবাসীকে দেল্‌ফস্‌ নগরে এপেলোদেবের মন্দিরে পাঠাইয়া দিলেন। উদ্দেশ্য, উক্ত দেবতার প্রত্যাদেশে জানিতে পারিবেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণী হারমিয়নি সতী কি কলঙ্কিনী?

(৫)

এদিকে অভাগিনী হারমিয়নি কারারুদ্ধ হইবার অল্প দিন পরেই এক লোচনানন্দদায়িনী সুরূপা কন্যারত্ন প্রসব করিলেন। এ দারুণ দুর্দ্দিনে, শিশু-কন্যার সে সরল মুখারবিন্দ দেখিয়া, দুঃখিনী জননী অনেকটা সান্ত্বনা পাইলেন। অনেক দুঃখে তাঁহার চক্ষে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। তিনি সেই শিশু-কন্যাকে স্নেহমাখা-স্বরে কহিতে লাগিলেন, "ওরে দুঃখিনীর সন্তান! তুইও যেরূপ নিরীহ, আমিও সেইরূপ নির্দ্দোষ। কিন্তু হায়, কপাল-গুণে আজ আমার এই দশা।"

দুঃখিনী হারমিয়নির এক প্রিয়সখী ছিলেন;—নাম পালিনা। পালিনা, এন্‌টিগোনাস্‌ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারীর সহধর্ম্মিণী। এই স্নেহময়ী রমণী রাজমহিষীর সকল দুঃখ-কষ্টের কথা শুনিয়াছিলেন এবং সে জন্য নিজেও যার-পর-নাই মনঃকষ্টে কাল কাটাইতে ছিলেন। কিন্তু যাই শুনিলেন, কারাগারে মহিষী এক কন্যারত্ন প্রসব করিয়াছেন, অমনি তাঁহার মনে কি-এক আশার সঞ্চার হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখনই প্রিয়-সখীর উদ্দেশে কারা-কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তথায় এমিলিয়া নাম্নী মহিষীর পরিচারিকাকে দেখিয়া, বিনীতভাবে কহিলেন, "এমিলি, তোমার কাছে আমার প্রার্থনা এই,

তুমি গিয়া মহারাণীকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি তাঁহার শিশু কন্যাটীকে বিশ্বাস করিয়া, আমাকে দিতে পারেন কি না? ঠিক বলিতে পারি না,—যদি আমি কন্যাটিকে লইয়া মহারাজের নিকট যাইতে পারি, তাহা হইলে হয় ত অপত্যস্নেহে তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইতে পারে, আর তাহা হইলে দুঃখিনী হারমিয়নিরও সকল দুঃখের অবসান হইতে পারিবে।"

এমিলিয়া একথা শুনিয়া, পুলকভরে কহিল, "ঠাকুরাণি! ইহা অতি উত্তম সঙ্কল্প। আমি এখনই গিয়া মহারাণীকে আপনার এই সাধু সংকল্প জ্ঞাপন করি। আহা, মহারাণীও আজ দুঃখ করিয়া বলিতেছিলেন যে, তাঁহার এমন এক জন আত্মীয়-স্বজন নাই, যে সাহস করিয়া, তাঁহার বক্ষের নিধিটি লইয়া, রাজসমক্ষে উপস্থিত হইতে পারে।"

পালিনা কহিলেন, "তা ভাল কথা। আমার প্রিয় সখীকে আরও বলিও, কেবলই যে, আমি তাঁর কন্যারত্নটিকে লইয়া, রাজাকে উপহার দিব, তাহা নহে,—অকপটে, মুক্তকণ্ঠে তাঁর অমূলক অপবাদ অপনোদন করিতেও যত্ন পাইব।"

এমিলি। "ঈশ্বর আপনার এই নিঃস্বার্থ উপকারের পুরস্কার দিবেন। রাজমহিষীর প্রতি যে আপনার এত স্নেহ ও ভালবাসা আছে, তাহা আমি জানিতাম না।"

এমিলিয়া তৎক্ষণাৎ রাণীকে এই শুভ-সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। দুঃখিনী রাণীও সহর্ষে, সর্ব্বান্তঃকরণে প্রিয়সখী পালিনার হস্তে প্রাণাধিকা কন্যাকে সমর্পণ করিলেন। হায়! এতটুকু অনুগ্রহও কেহ তাঁহাকে করে নাই, করিতে সাহস পায় নাই।

(৬)

করুণহৃদয়া পালিনা রাজকন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া, সিলিলি-রাজ-সকাশে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তাঁহার স্বামী এন্‌টিগোনাস্ পত্নীর এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। রাজা লিয়ন্তিস্ যে, ইহাতে ক্রোধান্বিত হইবেন, ইহাও বলিলেন। কিন্তু পরোপকারিণী রমণী, স্বামীর কথা শুনিলেন না। তিনি নির্ভীকচিত্তে রাজ-সভায় উপনীত হইয়া, সেই শিশু-কন্যাকে রাজার চরণপ্রান্তে রাখিয়া দিলেন। অতঃপর রমণী-স্বভাব-সুলভ পরদুঃখে কাতর হইয়া, সরল হৃদয়ে, মুক্তকণ্ঠে অভাগিনী হারমিয়নির নিষ্কলঙ্ক চরিত্র প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "মহারাজ, আপনি বৃথা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মহারাণী হারমিয়নিকে আমি বিশেষরূপ জানি, তিনি নিষ্পাপ ও সতী সাধ্বী। তাঁহার নামে কলঙ্কের আরোপ করিয়া, আপনি ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইতেছেন। এই দেখুন, এই সদ্যোজাত কন্যার অবয়ব অবিকল আপনারই ন্যায়। অতএব আপনি বৃথা সন্দেহ পরিহার করুন। কৃপা-চক্ষে সরলা সহধর্ম্মিণী ও তদ্গর্ভজাত সন্তানকে দেখুন। তাহাদের প্রতি সদয় হউন।"

কিন্তু ভাগ্য প্রতিকূল;—পালিনার এ সবিনয় অনুযোগের ফল বিপরীত হইল। রাজা লিয়ন্তিস্ আরও ক্রোধান্বিত হইলেন, পালিনার স্বামী এন্‌টিগোনাস্‌কে অনুমতি করিলেন, "এই মুহূর্ত্তে তোমার এই প্রগল্‌ভা রমণীকে এখান হইতে দূর করিয়া দাও।"

পরদুঃখকাতরা পালিনা তখনও একেবারে নিরাশ হইলেন না। হারমিয়নির শিশু কন্যাটিকে রাজার চরণ-তলে রাখিয়া চলিয়া

গেলেন। ভাবিলেন, ক্ষণপরে সকলে প্রস্থান করিলে, রাজার মনে দয়ার সঞ্চার হইতে পারে। তখন চাই কি, তিনি নির্দ্দোষ শিশুটীকে কৃপাচক্ষে দেখিতে পারেন। কিন্তু হায়, নিষ্ঠুর ভবিতব্য! পালিনা বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহার সেই অতি-বড় আশার উপর অলক্ষ্যে, অদৃষ্ট, নিষ্ঠুর হাসি হাসিয়াছিল!

---

(৭)

সিসিলি-রাজ, মহিষীর প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার অন্তর হইতে দয়া-মায়া একেবারে লোপ পাইয়াছিল। পালিনা প্রস্থান করিলে পর, তিনি এন্‌টিগোনাস্‌কে আদেশ করিলেন, "এই হতভাগা মেয়েটাকে সমুদ্রপারে, কোন বন মধ্যে নির্ব্বাসন করিয়া আইস। পাপিষ্ঠা পত্নীর এই কন্যাও আমার চক্ষুঃশূল হইয়াছে।"

রাজার যে কথা, সেই কাজ। বিশেষ এন্‌টিগোনাস্ কেমিলোর ন্যায় সদ্বিবেচক ও সহৃদয় ছিল না। রাজাজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র সেই নিষ্ঠুর, অর্ণবযানে আরোহণ করিয়া রাজ-কন্যাকে সমুদ্র-পারস্থিত বিজন বনে নির্ব্বাসন করিতে চলিল।

লিয়ন্তিসের মনে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। পত্নীর ব্যভিচারাশঙ্কা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে তিনি ক্লিয়মিনিস্ ও ডাইয়ন্ নামক যে দুই জন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে এপেলো দেবের মন্দিরে রাণীর সতীত্ব বিষয়ে পরীক্ষা লইতে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করিতেও তাঁহার ধৈর্য্য রহিল না। তিনি রীতিমত এক সভা আহ্বান করিলেন। সে সভায় অনেক বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং রাজ-কর্ম্মচারী আহূত হইলেন। দুষ্টগ্রহ-পরিচালিতা, সূতিকাগৃহ-বাসিনী, অভাগিনী রাণী সে সভায় আনীতা হইলেন। ক্ষোভে, দুঃখে, অপমানে, ঘৃণায় ও লজ্জায় তাঁহার বক্ষঃস্থল শতধা বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। সাশ্রুপূর্ণ লোচনে, কম্পিত-কলেবরে মহা অপরাধীর ন্যায় রাজ্ঞী সে সভায় দাঁড়াইলেন। চারিদিকে পাত্র, মিত্র ও অমাত্য। রাণী হারমিয়নি সতী কি কলঙ্কিনী, তাহার বিচার হইবে!

---

(৮)

এমন সময় এপেলোদেবের মন্দির হইতে রাজ-প্রেরিত সেই দুইজন ভদ্র লোক সেই সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পুলকিত-অন্তরে সেই মন্দির-স্বামীর সিলমোহরযুক্ত একখানি পত্র সিসিল-রাজের হস্তে প্রদান করিলেন।

সিসিলি-রাজ মন্ত্রীর হস্তে সেই প্রত্যাদেশ-লিপি দিয়া, তাহার সিলমোহর খুলিয়া সর্ব্ব-সমক্ষে পাঠ করিতে অনুমতি করিলেন। মন্ত্রীও রাজাজ্ঞা পালন করিলেন। প্রত্যাদেশ-লিপিতে সংক্ষেপে এই কথাগুলি লিখিত ছিল ;—

"হারমিয়নি সাধ্বী ; পলিক্‌সেনিস্ নিষ্পাপ ; কেমিলো ধার্ম্মিক প্রজা ; লিয়ন্তিস্ হিংস্রক পিশাচ ; হারা-নিধির উদ্ধার না হইলে রাজা নির্ব্বংশ হইবে।"

কিন্তু দুর্ভাগ্য রাজা! দারুণ প্রতিহিংসায় তাঁহার মন কলুষিত। তিনি মনে করিলেন, রাণীর আত্মীয়েরা কৌশল করিয়া এই পত্র পাঠাইয়াছে,—আর প্রকৃত প্রত্যাদেশ-লিপি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

সিসিলি-রাজের বিচার-সভা।



দুর্ভাগ্য লিয়ন্তিস্ সমাগত সভ্যমণ্ডলীকে এই কথা জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, "আপনারা পাপিষ্ঠা রাণীর প্রতি যথাবিহিত দণ্ডাজ্ঞা করুন।"

সবটা কথা মুখ হইতে বাহির হইতে-না-হইতে একজন পরিচারক ঊর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া নিবেদন করিল, "মহারাজ! সর্ব্বনাশ হইয়াছে! সর্ব্বসমক্ষে, প্রকাশ্য-সভায়, জননীর সতীত্বের পরীক্ষার কথা শুনিয়া, দারুণ দুঃখ ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া রাজকুমার মেমিলাস অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন!"

---

(১)

এই নিদারুণ সংবাদ শুনিবামাত্র অভাগিনী হারমিয়নি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। হতভাগ্য লিয়ন্তিসের কঠিন অন্তর এবার গলিল। পুত্রের নিধনবার্ত্তা তাঁহার হৃদয়ে বিষাক্ত শল্যের ন্যায় বিষম বাজিল। অভাগিনী পত্নীর প্রতিও করুণার উদয় হইল। তিনি পালিনা প্রভৃতি সমাগত রমণীকে আদেশ করিলেন, "রাজ্ঞীকে এখান হইতে লইয়া গিয়া শুশ্রূষা কর।"

পালিনাও তাহাই করিলেন। কিন্তু অবিলম্বে প্রত্যাগমন করিয়া রাজাকে কহিলেন, "হায়, কি দুর্দ্দৈব! সেই ক্ষণ মূর্চ্ছাই মহারাণীর শেষ মূর্চ্ছা!—তিনি অনন্তকালের জন্য ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন!"

এইবার লিয়ন্তিসের মর্ম্মান্তিক অনুশোচনা উপস্থিত হইল। এতক্ষণে তাঁহার বিবেক-বুদ্ধির উদয় হইল। সরলা, স্নেহময়ী পত্নীর প্রতি তাঁহার পৈশাচিক নিষ্ঠুরাচরণের কথা মনে

পড়িল। সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের প্রতি আর তাঁহার বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না। ভাবিলেন, "আমিই এই সব অনর্থের মূল। আমারই অপরিণামদর্শিতায় আজ এই সর্ব্বনাশ ঘটিল! পাপ ঈর্ষাবশে আমিই স্ত্রী পুত্রের বিনাশের কারণ হইলাম।—আমারই বুদ্ধিদোষে শিশু কন্যাটীও আজ নির্ব্বাসিতা। ওঃ! এ দুঃখের কি আর শেষ আছে? বুঝিলাম, এপেলোদেবের প্রত্যাদেশ প্রকৃত। কলুষিত অন্তর বলিয়াই আমি সেই অমৃতময়ী-লিপির আস্বাদ পাই নাই। হারানিধি পুনঃপ্রাপ্ত না হইলে সত্য সত্যই ত আমি নির্ব্বংশ হইব! হায়! কেন বুঝিলাম না,—কেন মজিলাম?"

(১০)

ক্ষোভ, দুঃখ, শোক, আত্মগ্লানি ও দারুণ অনুতাপে লিয়ন্টিস্ পুড়িতে লাগিলেন। তাঁহার বুকের ভিতর আগুন জ্বলিতে লাগিল। রাজ্য-পাট ত্যাগ করিয়া সেই নির্ব্বাসিত কন্যাটির উদ্ধার-সাধন করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। আবার পরক্ষণেই ভাবিলেন যে, এনুটিগোনাস কোন্ পথ দিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছে, তাহা ত তিনি অবগত নন; আর কেহও ত তাহা জানে না।

সিসিলি-রাজের চারিদিক অন্ধকার। সর্ব্ব-প্রকারে নিরুপায় হওয়ায়, শোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়া তিনি অতি কষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে এনটিগোনাস্ রাজপুত্রীকে লইয়া যে তরীতে আরোহণ করিয়া সমুদ্র-যাত্রা করে, দৈব দুর্ব্বিপাকবশতঃ প্রবল ঝটিকায়, সে তরী বোহিমিয়া-রাজ পলিক্সেনিসের রাজ্য-উপকূলে উপনীত হইল। নিষ্ঠুর এনটিগোনাস পোত হইতে অবতরণ করিয়া সেই তটস্থ অরণ্যে, অভাগিনী হারমিয়নির সেই বুকভরা-ধন—শিশু কন্যাটিকে নিক্ষেপ করিল।

কিন্তু পাপের ফল হাতে হাতে ফলিল। বিধাতার অমোঘ অভিশাপ ব্যর্থ হইবার নহে। পাপিষ্ঠ এনটিগোনাস্ নিষ্ঠুর রাজাদেশ পালন করিয়া যেমন তরীতে পুনরারোহণ করিতে আসিবে, অমনি এক ভীষণ-দর্শন, মহাবল বন্য-ভল্লুক সহসা তাহাকে আক্রমণ করিল এবং অবিলম্বে প্রখর নখরাঘাতে তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া প্রাণসংহার করিল!

সদ্যোজাত শিশু-কন্যা হইলেও মহারাজ্ঞী হারমিয়নি কন্যার অঙ্গে বিবিধ রত্নালঙ্কার ও মহার্ঘ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দিয়াছিলেন। স্বয়ং সিসিলি-রাজ—তাঁহার প্রাণাধিক পতিরত্ন, কন্যা দর্শন করিবেন, করিয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, এই আশ্বাসেই অভাগিনীর এই অনুষ্ঠান, কন্যাকে সুসজ্জিতাবস্থায় রাজ-সমক্ষে প্রেরণ। কিন্তু নিয়তিবশে, সেই বেশেই রাজ-কন্যার নির্ব্বাসন হইল! এনটিগোনাস্ যখন রাজকন্যাকে বনবাস দিতে লইয়া যায়, তখন তাহার সেই মহামূল্য পরিচ্ছদের উপর পিনসংযুক্ত একখণ্ড কাগজে, ক্ষুদ্র অক্ষরে "পারদিতা" এই নাম লিখিয়া দিয়াছিল; অধিকন্তু তাহার উচ্চবংশে জন্ম ও দারুণ দুর্ভাগ্যের কথাও সঙ্কেতে উল্লেখ করিয়াছিল।

---

(১১)

নিরুপায়ের উপায়—বিধাতা। অভাগিনী হারমিয়নির প্রাণ-পুত্তলি—পারদিতাটি যে, অসহায়ে মরিবে, ইহা বিধাতার ইচ্ছা নহে। নিষ্ঠুর এনটিগোনাস্ পারদিতাকে বিজন বনে বিসর্জ্জন করিলে পর, এক মেষপালক ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইল। দেখিল, বন আলো করিয়া একটি দুগ্ধ-পোষ্য শিশু অসহায়ে পড়িয়া আছে। দেখিয়া তাহার দয়া হইল। সযত্নে কন্যাটিকে ক্রোড়ে লইয়া গৃহে গেল। আপন গৃহিণীকে সেই

অনুপমা কন্যা-রত্নটী সমর্পণ করিল। মেষপালক-গৃহিণী কন্যার অপরূপ রূপ-লাবণ্য ও রত্না-লঙ্কারাদি দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইল এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে সেই কন্যাটিকে লালন-পালন করিতে লাগিল।

মেষপালকের অবস্থা অবশ্য ভাল ছিল না। কিন্তু কুড়ান-মেয়েটীর গায়ে যে সমস্ত বহুমূল্য রত্নালঙ্কার আছে, তাহার উপস্বত্ব হইতে হঠাৎ রাতারাতি 'বড়মানুষ' হইয়া পড়িলে পাঁচ জনে পাঁচ কথা কহিতে পারে, এই আশঙ্কায় সে, পূর্ব্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করিল এবং দেশের অন্য খণ্ডে গিয়া বাস করিল। অতঃপর অধিক মেষ ক্রয় করিয়া ব্যবসায় জমাইয়া বসিল এবং অল্পদিনের মধ্যে একজন ধনবান্ মেষপালক হইল বলা বাহুল্য, বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞানোদয় হইলেও পারদিতা কিছু-তেই আত্মপরিচয় পাইল না,—মেষপালকের কন্যা বলিয়াই আপনাকে জানিল।

কিছুকাল অতীত হইল। পারদিতা বড় হইল। বালিকার দেহে রূপ আর ধরে না, দেখিলে আরও দেখিতে ইচ্ছা হয়।

স্বভাবের কি আশ্চর্য্য মহিমা! পারদিতা যদিও মেষপালকের পালিতা কন্যা ও সেই মেষ-পালকের নিকট হইতে তাহার যা-কিছু শিক্ষা ও সদুপদেশ লাভ, তথাপি উচ্চ বংশমর্য্যাদা ও বাপ-মায়ের গুণ হইতে বালিকা বঞ্চিত হয় নাই। ফলতঃ, রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিলে যে সকল মহদ্‌গুণ লাভ হয়, পারদিতায় সে সমস্ত গুণের অভাব ছিল না।

(১২)

বোহিমিয়া-রাজ পলিকৃসেনিসের একমাত্র পুত্র ছিল,—নাম ফ্লোরিজেল্। ফ্লোরিজেল এক দিন মৃগয়া করিতে করিতে হঠাৎ ঐ মেষ-পালকের বাটীর সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং অলোকসামান্যা, ত্রৈলোক্যসুন্দরী পার-দিতাকে দর্শন করিলেন। পারদিতাও যুব-রাজকে দেখিতে পাইল। উভয়ের চারি চক্ষের মিলন হইল। সে চক্ষের পলক আর পড়ে না। উভয়েই উভয়ের রূপে আকৃষ্ট। রাজপুত্র, আত্মহারা হইলেন,—এই অনুপমা স্ত্রীরত্ন লাভ করাই তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান হইল।

যুবরাজ গৃহে আসিলেন। কিন্তু ঘরে আর মন বসে না। যেরূপে—যেমন করিয়াই হউক, এই রূপবতী রমণীকে লাভ করিতে হইবে। এই ভাবিয়া সামান্য রাখালবেশে "দোরিক্লিস্" নাম ধারণ করিয়া ফ্লোরিজেল উক্ত মেষপালকের বাটীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। যুবক-যুবতী অনতিবিলম্বে পরস্পরের প্রণয়ে আবদ্ধ হইলেন।

বোহিমিয়া-রাজ, পুত্রকে সর্ব্বদাই গৃহে অনুপস্থিত থাকিতে দেখিয়া কিছু সংশয়িত-চিত্ত ও কৌতূহলী হইলেন। যুবরাজ সর্ব্বদাই একাকী কোথায় গতায়াত করে, তাহা জানিবার জন্য তিনি গোপনে চর নিযুক্ত করিয়া দিলেন। অল্প অনুসন্ধানেই রহস্য প্রকটিত হইল,—চরেরা রাজাকে জ্ঞাপন করিল, যুবরাজ ফ্লোরিজেল এক মেষপালক-তনয়ার প্রেমে পড়িয়াছেন।

(১৩)

ঘটনার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিবার জন্য বোহিমিয়া-রাজ এক দিন সেই প্রাণরক্ষক প্রিয় কেমিলোকে সঙ্গে লইয়া উক্ত মেষপালকের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। উভয়েরই ছদ্মবেশ।

সে দিন তথায় 'মেষমুণ্ডন' নামক এক মহোৎসব। বহুলোকের সমাগম হইয়াছে। মেষপালকের বাটীর সম্মুখে বিবিধ পণ্যদ্রব্য সুসজ্জিত; চারিদিক সুশোভিত; সকলেই হাসিমুখে, মনের সুখে ইতস্তত পরিভ্রমণ

করিতেছে। বিস্তর নিমন্ত্রিত লোকের সমাগম হইয়াছে। এমন আনন্দ-আসরে স্বয়ং বোহিমিয়া-রাজ ও কেমিলো অনাহূত হইয়া উপস্থিত। গৃহস্বামী—সেই বৃদ্ধ মেষপালক, দুই জন বিদেশী ভদ্রলোক দেখিয়া আদর-অভ্যর্থনা করিল ও এই মহোৎসবে যোগদান করিতে অনুরোধ করিল।

মেষ মুণ্ডন পর্ব্বে চারিদিক উৎফুল্ল। সকলেই হাসিয়া-খুসিয়া বেড়াইতেছে; কেবল পারদিতা ও ফ্লোরিজেল্‌ নিভৃতে এক কোণে বসিয়া কথোপকথনে নিযুক্ত।

ছদ্মবেশী পলিক্‌সেনিস ও কেমিলো ক্রমে ক্রমে সেই দিক ঘেঁসিয়া বসিলেন ও যুবক-যুবতীর নব-অনুরাগের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, উভয়ে এরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিলেন যে, যুবরাজ কোন মতেই পিতাকে বা কেমিলোকে চিনিতে পারিলেন না।

পারদিতার মধুর কথাবার্ত্তা শুনিয়া বোহিমিয়া-রাজ বিস্মিত হইলেন। বিস্মিত হইয়া তিনি জনান্তিকে কেমিলোকে কহিলেন, "দেখ, আমি জীবনে, নীচকুলে এমন অপরূপ সুন্দরী দেখি নাই। বিশেষ, ইহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমি আরও মোহিত হইয়াছি। ইহার হাব-ভাব ও বিনীত ব্যবহার দেখিলে মনে হয় না যে, বালিকা হীনবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।"

কেমিলোও অধিকতর চমৎকৃত হইয়াছিলেন। চমৎকৃত হইয়া তিনিও রাজবাক্যের পোষকতা করিয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমারও তাহাই বোধ হইতেছে। রূপে-গুণে এই রমণী রাজরাণীর যোগ্য।"

বোহিমিয়া-রাজ মেষপালককে জনান্তিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বন্ধু হে, তোমার কন্যার সহিত যে তরুণ যুবকটিকে কথোপকথন করিতে দেখিতেছি, ইঁহার নাম কি?"

মেষপালক উত্তর করিল, "ইঁহার নাম দোরিক্লিস্‌। ইনি আমার তনয়ার প্রণয়-প্রার্থী। আমার তনয়াও ইঁহার প্রতি অনুরক্তা। ফলতঃ, ইঁহাদের পরস্পরের প্রেম-চুম্বন দেখিয়া বুঝিবার যো নাই যে, কে কাহাকে বেশী ভালবাসে। আর এ কথাও ঠিক যে, দোরিক্লিস্‌ যদি আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করে, তবে সে, যা কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই, এত ধন-রত্ন পাইবে।"

তা' কথা বটে।—দোরিক্লিস্‌ যদি যথার্থ কৃষক-পুত্র রাখাল হয়, তাহা হইলে মেষপালকের খরচ সত্ত্বে, এখনও পারদিতার যে কয়খানি রত্নালঙ্কার আছে, তা' একটা রাখালের পক্ষে স্বপ্নাধিক বটে!

এবার পলিক্‌সেনিস্‌ সম্পূর্ণরূপে গলার স্বর পরিবর্ত্তন করিয়া আপন পুত্রকে কহিলেন, "কেমন হে যুবক, আজ এমন সমারোহ ব্যাপার,—এমন দিনে তুমি প্রণয়িনী প্রমদাকে লইয়া যে চুপ-চাপ আছ? ওহে, আমাদেরও এক সময় বয়স ছিল, কত রঙ্গরসে দিন কাটিত,—প্রণয়িনীকে কত কি সৌখিন জিনিস-পত্র উপহার দিতাম;—আর আজ এই উৎসবের দিনে এত-শত জিনিস-পত্রের দোকান দেখিতেছি,—তুমি একটি দ্রব্যও প্রণয়িনীকে উপহার দিলে না?"

রাজপুত্র পিতাকে চিনিতে না পারিয়া, সাধারণ ভদ্রলোক-বোধে কহিলেন, "মহাশয়! আমার এ মনোমোহিনী, সামান্য বিলাস-দ্রব্যের প্রার্থী নন। ইনি যে অমূল্য ধনের অভিলাষী, তাহা অহর্নিশ আমার হৃদয়ে জাগিয়া আছে।"

অতঃপর পারদিতাকে সম্বোধন করিয়া জনান্তিকে কহিলেন, "প্রাণাধিকে, এই বৃদ্ধ দেখিতেছি, সময়ে একজন রসিক পুরুষ ছিলেন। প্রেমের মর্ম্ম ইনি অবশ্যই জানেন। অতএব ইনি সাক্ষী হউন, আমি মুক্তকণ্ঠে আমার মনের ভাব ব্যক্ত করি।"

ফ্লোরিজেল্ ও পার্দিতা।



এই বলিয়া ফ্লোরিজেল সেই ছদ্মবেশীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয়! আপনি সাক্ষী রহিলেন, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া বলিতেছি, এই সুন্দরীর পাণি-গ্রহণ করিব, ইনি আমার ধর্ম্মপত্নী হইবেন। আপনি আমার অঙ্গীকার-বাক্যের সাক্ষী

আর যায় কোথায়? আগুন গর্জ্জিয়া উঠিল। পুত্রের এ-হেন নীচ প্রবৃত্তির কথা শুনিবামাত্র বোহিমিয়া-রাজ ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিলেন এবং রোষপরবশ হইয়া কম্পিত কলেবরে কহিলেন, "কুলাঙ্গার! হাঁ, আমি যেন তোর্ এই অবৈধ-প্রণয়-বন্ধন-চ্ছেদের সাক্ষী হই! হা! ধিক্ তোকে! তুই আমার কুলে কালি দিতে বসিয়াছিস্!"

এই বলিয়া পুত্রকে যার-পর-নাই তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করিলেন। পারদিতাও রাজরোষ হইতে অব্যাহতি পাইল না। বোহিমিয়া-রাজ সেই সরলা বালিকাকেও যৎপরোনাস্তি অপমান ও ভর্ৎসনা করিলেন। অধিকন্তু কহিলেন, "সাবধান, যদি পুনরায় যুবরাজের প্রণয়প্রার্থী হও বা তাহাকে আপন আবাসে আসিতে দাও, তাহা হইলে তোমার সহিত তোমার বৃদ্ধ পিতারও প্রাণ যাইবে!"

পলিক্সেনিস্ তথায় আর ক্ষণকাল তিষ্ঠি-লেন না,—কেমিলোকে বলিয়া গেলেন, "হতভাগ্য পুত্রকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে আমার হও; আমি চলিলাম।"

বোহিমিয়া-রাজ স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

(১৪)

দারুণ অপমানে ও অভিমানে রাজতনয়া পারদিতার অন্তর স্ফীত হইয়া উঠিল। সিংহ-শিশু সিংহের স্বভাবই প্রাপ্ত হয়। কোপভরে, গভীরস্বরে নৃপনন্দিনী কহিলেন, "কি বলিব, যদি রাজ-রোষে সবংশে আমাদের বিনাশ-সাধন হয়, আমি তাহাতেও অণুমাত্র ভীত বা বিচলিত নহি। অনেক কষ্টে আমি আত্ম-সংবরণ করিয়াছি। একবার নয়,—দুইবার আমি বোহিমিয়া-রাজের পরুষবাক্যের প্রত্যুত্তর করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। আমি বলিতে যাইতেছিলাম, "মহারাজ, দিনকর সর্ব্বত্রই সমানরূপে স্বর্ণকর বিতরিত করিয়া থাকেন। আপনার প্রাসাদোপরি যে সূর্য্যালোক প্রতি-বিম্বিত হয়, দরিদ্রের পর্ণকুটীরেও সেই আলোক পতিত হইয়া থাকে। কিন্তু হায়! আমার অন্তরের কথা অন্তরেই লীন হইল।''

তার পর মনোবেগ সংবরণে অসমর্থা হইয়া গভীর দুঃখের সহিত রাজপুত্রকে কহিলেন, "এতদিনে আমার সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল! আমার রাজ-রাণী হইবার আশা ঘুচিয়াছে! যুবরাজ, আমাকে বিদায় দাও! ভাগ্যবান্, যাও —নিজ-স্থানে যাও! নীচ মেষপালকের বংশে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি,—সুতরাং সেই মেষ-দুগ্ধ দোহন করিব ও কাঁদিয়া-কাঁদিয়া এ জীবন শেষ করিব!"

অতঃপর কেমিলো, রাজপুত্রকে অনেক বুঝাইলেন। পারদিতাকে চিরদিনের মত পরি-ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দেখিলেন, ফ্লোরিজেল অচল, অটল। তিনি কিছুতেই পারদিতার প্রণয়-পাশ ছেদন করিতে চাহেন না। বরং এজন্য তিনি পিতৃবন্ধু কেমিলোর নিকট অনেক সবিনয় অনুযোগও করিলেন।

এবার সহৃদয় কেমিলোর হৃদয় গলিল। বিশেষ, তাঁহার অন্তরে যুগপৎ বিস্ময় ও কৌতু-হল জাগিতে লাগিল,—নীচ মেষপালকের গৃহে এ তেজস্বিনী রমণী কিরূপে জন্মগ্রহণ করিল? ইহার হৃদয়ের মহত্ত্ব ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখিয়া বোধ হয় না যে, এ নারী সামান্যা। বিশেষ দেখিতেছি, প্রণয়ি-যুগলের প্রেম-বন্ধন বদ্ধমূল হইয়াছে। যুবরাজ ফ্লোরিজেল দেখিতেছি, কিছুতেই এ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিবে না।"

এই ভাবিয়া সহৃদয় কেমিলো মনে মনে কি-এক স্থির-সিদ্ধান্ত করিলেন এবং আভাষে প্রণয়ি-যুগলকে একটু আশ্বাসও দিলেন।

---

(১৫)

ইতিপূর্ব্বে কেমিলো সংবাদ পাইয়াছিলেন, সিসিলি-রাজ লিয়ন্তিস্ এখন আত্মদোষ বুঝিতে পারিয়া বিশিষ্টরূপ অনুতপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার প্রকৃতিতে এখন আর সেই কাঠিন্য ও বৈর-নির্য্যাতন-স্পৃহা একেবারেই নাই। কেমিলো যদিও বোহিমিয়া-রাজ-আলয়ে পরম সমাদরে অবস্থান করিতেছেন, তথাপি জননী-জন্মভূমি দেখিতে ও পূর্ব্বপ্রভু সিসিলিরাজের স্নেহ-অনুগ্রহ লাভ করিতে তিনি অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন। অতঃপর ভাবিলেন, এই অবসরে সকল দিক রক্ষা হয়। এই ভাবিয়া তিনি ফ্লোরি-জেল্‌কে কহিলেন, "যুবরাজ, যদি আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হন, তাহা হইলে আর আপ-নাকে এ মনোকষ্ট ভোগ করিতে হয় না। চলুন, আমরা সকলে মিলিয়া এই অবসরে সিসিলি-রাজ্যে গমন করি। সিসিলিরাজের শরণাপন্ন হইলে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না। তিনিও পরম সমাদরে আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। আর চাই কি, আপনার পিতাও, সিসিলি রাজের অনুরোধে আপনার প্রতি প্রসন্ন হইতে পারেন ও এই বিবাহে মত দিতে পারেন।"

তাহাই স্থির হইল। পারদিতাকে সঙ্গে লইয়া ফ্লোরিজেল্ কেমিলোর সহিত সিসিলি-রাজ্যে যাইতে সম্মত হইলেন। বৃদ্ধ মেষ-পালকও সেই সঙ্গে যাইবে, স্থির হইল। অতঃপর যথাসময়ে তাঁহারা অর্ণবপোতে সিসিলি-রাজ্যে পলায়ন করিলেন। মেষপালক তাহার অন্যান্য দ্রব্যের সহিত পারদিতার সেই বাল্যপরিচ্ছদটী ও অবশিষ্ট অলঙ্কারগুলি সঙ্গে লইল।

---

(১৬)

সিসিলি-রাজ লিয়ন্তিস্ অদৃষ্ট দোষে, দুর্ম্মতিবশে অকালে কন্যা ও পুত্র-কলত্র হারাইয়া শোকসাগরে নিমগ্ন ছিলেন। তদুপরি অযথা মিত্রদ্রোহে মর্ম্মান্তিক কষ্টে কালযাপন করিতে-ছিলেন। এক্ষণে সেই বন্ধু-পুত্র ও প্রিয় অমাত্য কেমিলো তাঁহার রাজ্যে আসিয়াছেন দেখিয়া, পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। পারদিতাকে, ফ্লোরিজেল্ আপন সহধর্ম্মিণী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজা, নির্নিমেষ নয়নে সেই রমণীকে দেখিতে লাগি-লেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। স্বাভাবিক বাৎসল্য-স্নেহে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল। অভাগিনী হারমিয়নিকে মনে পড়িল। সেই মুখ, সেই চোক, সেই অঙ্গ সৌষ্ঠব—একে একে স্মৃতি-পথে উদিত হইতে লাগিল। পারদিতার সহিত হারমিয়নির আকৃতি-গঠন অবিকল এক বোধ হইল। দুর্ভাগ্য রাজা বিষাদভরে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "হায়, আমি নিজের সর্ব্ব-নাশ নিজে করিয়াছি! আমি দুর্ম্মতিবশে যদি সেই সোনার-পুত্তলিটিকে বিসর্জ্জন না করিতাম, তাহা হইলে আমার সেই কন্যাও আজ এত বড়টি হইত। কিন্তু হায়, ভাগ্য প্রতিকূল। আজ কোথায় বা আমার সেই কন্যা, আর কোথায় বা আমার সেই স্নেহময়ী, সরলা সহধর্ম্মিণী!"

অতঃপর বোহিমিয়া-রাজপুত্রকে সম্বোধন করিয়া আবার কহিলেন, "বৎস, গ্রহবশে আমি তোমার পিতার-ন্যায় মহানুভব ব্যক্তির বন্ধু-স্নেহে বঞ্চিত হইয়াছি। তাঁহাকে দেখিতে আমার বড়ই সাধ হয়। ভগবান কি আমার এ সাধ পূর্ণ করিবেন?"

বৃদ্ধ মেষপালক আনুপূর্ব্বিক সকল কথা শুনিল ও পারদিতাকে দেখিয়া সিসিলি-রাজের যে অপত্যস্নেহ জাগিয়া উঠিল, তাহার কারণ কেবল সে-ই বুঝিল। বুঝিল যে, পারদিতা আর কেহ নয়,—সিসিলি-রাজেরই কন্যা। কারণ,বালিকার নির্ব্বাসনের পর অবশিষ্ট ঘটনা কেবল সে-ই জানিত।

---

(১৭)

যথা সময়ে সে, রাজপুত্র ফ্লোরিজেল্, পার-দিতা, কেমিলো ও এন্‌টিগোনাস্-পত্নী পলি-নাকে পারদিতার জীবন-কাহিনী বিস্তারিত-রূপে কহিল। যেরূপে, যেমন অবস্থায় তাহাকে অরণ্যে দেখিতে পায়, এন্‌টিগোনাস্ যেরূপে বন্য-ভল্লুক-হস্তে নিহত হয়, একে একে খুটিয়া-খুটিয়া সকল কথা বলিল। অতঃপর পারদিতার শৈশবকালীন সেই পরিচ্ছদ ও অবশিষ্ট অল-ঙ্কারগুলি দেখাইল। পালিনা দেখিলেন ও বুঝিলেন, হাঁ মহারাণী হারমিয়নি এইরূপ বেশেই তাঁর সেই শিশু-কন্যাটীকে রাজসভায় পাঠাইয়া ছিলেন। অতঃপর সেই পরিচ্ছদ-সংলগ্ন কাগজ খণ্ডে স্বামীর হস্তাক্ষর দেখিলেন। সকলেরই মনে যুগপৎ বিস্ময় ও হর্ষ বিকাশ হইতে লাগিল। সকলেরই ধ্রুব বিশ্বাস হইল, পারদিতা সিসিলি-রাজ লিয়ন্তিসের কন্যা!

পালিনার মনের অবস্থা এখন বড়ই বিচিত্র। একদিকে তাঁহার অতুল আনন্দ, অপরদিকে

গভীর দুঃখ। অভাগিনী হারমিয়নির প্রাণ-পুত্তলি—হারানিধিটি আজ বিধাতা মিলাইয়া দিলেন, দেবতার প্রত্যাদেশ সফল হইল,—রাজবংশ রক্ষা হইল;—কিন্তু হায়, অপরদিকে তাঁহার বুকের একখানি হাড় খসিল! শোকাবেগে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল!—তাঁহার জীবন-সর্ব্বস্ব স্বামী আর ইহ-জগতে নাই! দুর্ভাগা এন্‌টিগোনাস্‌ তাহার পাপের ফল হাতে-হাতে পাইয়াছে; ভয়াবহ ভল্লুক-হস্তে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে;—এ দারুণ দুঃসংবাদে তিনি অভিভূতা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার একবার ইচ্ছা হইতে লাগিল, মন খুলিয়া হাসি, আর বার ইচ্ছা হইল, ডাক ছাড়িয়া কাঁদি। পালিনার হৃদয়ে মূর্ত্তিমন্ত হাসি-কান্নার অভিনয় চলিতে লাগিল।

(১৮)

কিন্তু শেষে হাস্যাভিনয়েরই জয় হইল। অভাগিনী হারমিয়নির সেই হারানিধিটী পাইয়া গুণবতী পালিনা স্বামি-শোক ভুলিলেন। যথাসময়ে লিয়ণ্টিস্‌ এ আনন্দ-সংবাদ পাইলেন। রাজার তৎকালীন সে আনন্দ দেখে কে? কন্যার যে বয়স্থা, সে জ্ঞান আর তখন তাঁহার নাই,—তিনি পারদিতাকে সস্নেহে বক্ষে ধারণ করিলেন ও বাৎসল্য-স্নেহে ঘন ঘন তাহার মুখ-চুম্বন করিতে লাগিলেন। বাষ্প-রুদ্ধকণ্ঠে, গদ্গদস্বরে বারংবার এই কথা কহিতে লাগিলেন, "হায়, আজ যদি তোমার জননী জীবিত থাকিত! অহো, অভাগিনী হারমিয়নি!"

সিসিলি-রাজ হারানিধি পাইয়া যেমন হর্ষে আত্মহারা হইলেন, প্রাণাধিকা হারমিয়নির শোকও তেমনই মধ্যে মধ্যে বুকে আঘাত করিতে লাগিল।

পালিনা এই অবসরে রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ, মহারাণীকে আমি কিরূপ স্নেহ-চক্ষে দেখিতাম, আপনি জানেন। আমি বহুযত্নে ও বহু অর্থব্যয়ে ইটালীদেশীয় এক চিত্রকরের দ্বারা আমার সেই প্রভু-পত্নী—প্রিয়সখীর একটি অপরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছি। সে দেবী-প্রতিমা আমার গৃহেই সংস্থাপিত আছে। যদি মহারাজ ইচ্ছা করেন, দয়া করিয়া এ অধীনীর কুটীরে পদার্পণ করিবেন;—দেবীরূপা হারমিয়নির মনোহর প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া নয়ন-মন সার্থক করিবেন! সে মূর্ত্তি এমন সুন্দর ও স্বাভাবিক যে, দেখিলে মনে করিতে পারিবেন না, জড় মূর্ত্তি দেখিতেছেন, কি বাস্তব হারমিয়নিকে দেখিতেছেন!"

রাজা, পালিনার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পারদিতা, জন্মাবধি মাতৃমুখ অবলোকন করে নাই, সুতরাং সেও নিরতিশয় আগ্রহের সহিত জননীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে চাহিল।

যথাসময়ে পালিনা গৃহে আসিলেন। স্বয়ং সিসিলি-রাজ তাঁহার গৃহে আসিবেন, কাজেই পূর্ব্ব হইতে যতদূর সম্ভব, রাজ-অভ্যর্থনার আয়োজনাদি স্থির করিয়া রাখিলেন।

(১৯)

সিসিলি-রাজ কন্যা-সমভিব্যাহারে মহিষীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিবার জন্য পালিনার আলয়ে উপস্থিত হইলেন। কেমিলো, ফ্লোরিজেল প্রভৃতিও সঙ্গে গেলেন। মূর্ত্তি বস্ত্রাবৃত ছিল। পালিনা অল্পে অল্পে সে বস্ত্র অপসারিত করিতে লাগিলেন। মূর্ত্তি প্রকটিত হইল। লিয়ণ্টিস্‌ বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে, নির্নিমেষ-নয়নে, অবাক্‌ হইয়া সে মূর্ত্তিপানে চাহিয়া রহিলেন।

পালিনা কহিলেন, "মহারাজ, দেখুন, রাজ্ঞীর প্রতিমূর্ত্তি ঠিক হইয়াছে কি না? ভাস্করের নিপুণতাকে ধন্যবাদ দেওয়া যায় কিনা?"

সতী হারমিয়নি।



রাজার মুখে কিছুক্ষণ কোন বাক্য স্ফুরণ হইল না। পালিনা পুনরায় এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "হাঁ, ভাস্কর অতি সুদক্ষ ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে প্রতিমূর্ত্তিটিতে রাজ্ঞীর মুখের সে স্বাভাবিক কমনীয়তা নাই—বয়সের যেন কিছু আধিক্য হইয়াছে।"

পালিনা উত্তর বলিলেন, "তা মহারাজ, ইহা ত সেই চিত্রকরের বিশিষ্ট দক্ষতার পরিচায়ক। কারণ, রাজ্ঞী জীবিত থাকিলে এত দিনে এই বয়সে উপনীত হইতেন।"

রাজা সদুঃখে কহিলেন, "হায়, যে দিন আমি নবানুরাগে রাণীকে পশ্চাৎ দিক হইতে ধরিতে গিয়াছিলাম, তিনি তখন ঠিক এই ভাবেই দাঁড়াইয়াছিলেন।"

একটু ইতস্তত করিয়া পালিনা কহিলেন, "মহারাজ, তবে অনুমতি করুন, প্রতিমূর্ত্তি ঢাকিয়া ফেলি।"

রাজা সাগ্রহে কহিলেন, "না, না পালিনে! থাক্, থাক্,—ঢাকিয়া কাজ নাই। আরও কিছুক্ষণ আমি দেখি। আঃ! যত দেখি, তত আমার দর্শন-পিপাসা বাড়িয়া উঠিতেছে।"

পারদিতাও পিতৃ-বাক্যের পোষকতা করিল।

পালিনা কহিলেন, "না মহারাজ, অধিকক্ষণ দেখাটা কিছু নয়। অধিকক্ষণ দেখিয়া এই প্রতিমূর্ত্তিটিকে আপনার সজীব বলিয়া বোধ হইতে পারে। প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে আপনাকে ক্রমেই মোহে আকৃষ্ট হইতে দেখিতেছি। অনুমতি করুন, আমি মূর্ত্তি আবরিত করি।"

এবার রাজা সাগ্রহে কহিলেন, "না

পালিনে, আমি আরও দেখি। এ মূর্ত্তিটীকে আমার সজীব বলিয়া বোধ হইতেছে। এ অলীক ধারণা যেন চিরদিন আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে। কিন্তু, ও কি ও! মূর্ত্তিটী শ্বাস-প্রশ্বাস লইতেছে না? বলিহারি, চিত্রকর! না, না—আমার যেন স্পষ্টই বোধ হইতেছে, মূর্ত্তিটী সকরুণ-নেত্রে আমার পানে চাহিতেছেন। তোমরা কেহ আমাকে পাগল ভাবিও না,—আমি এই প্রতিমূর্ত্তির মুখচুম্বন করিব!"

রাজা আসন হইতে উঠিতে উদ্যত হইলে, পালিনা ত্রস্তভাবে কহিয়া উঠিলেন, "সেকি মহারাজ, প্রতিমূর্ত্তিটির মুখে এখনও কাঁচা রং আছে, আপনি উহাতে মুখ দিলে মুখে ঐ রং লাগিবে। মহারাজ, বলেন ত, আমি সঙ্কেতে মূর্ত্তিটিকে এই মঞ্চ হইতে অবতরণ করাইয়া আপনার কর-স্পর্শ করাইতে পারি।"

লিয়ন্তিসের আর বিস্ময়ের সীমা নাই। একি স্বপ্ন, প্রহেলিকা, না ইন্দ্রজাল! চিত্রকর কি এত ক্ষমতা ধরিতে পারে?

পালিনা, রাজার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "মহারাজ, আমি এই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারিতেছি বলিয়া আমাকে দুষ্টা বা কুচরিত্রা ভাবিবেন না।—কোনরূপ ইন্দ্রজাল বা ডাকিনী-মন্ত্রে আমি এরূপ করিতে সমর্থ হইতেছি, অবশ্য এমন ভাব মনে আনিবেন না।"

এই বলিয়া সেই চতুরা রমণী পূর্ব্ব শিক্ষামত বাদ্যকরগণকে বাদ্য করিতে ইঙ্গিত করিলেন। তাহারাও মনোমোহকর মৃদু-মধুর বাদ্য বাজাইতে লাগিল। লিয়ন্তিস্ চিত্রার্পিতের ন্যায়, মহিষী হারমিয়নির সেই পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি পানে চাহিয়া রহিলেন। সে চক্ষের পলক আর পড়ে না। সরলা পারডিতাও নতজানু হইয়া ভক্তিভরে, নির্নিমেষ নয়নে মাতৃমূর্ত্তি পানে চাহিয়া রহিল। দর্শকমণ্ডলী সকলেই অবাক্! সকলেই বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে প্রতিমূর্ত্তি পানে চাহিয়া আছে। এমন সময় সেই মঞ্চ হইতে অতি মৃদু-মন্থর গতিতে প্রতিমূর্ত্তিটি ভূমে অবতরণ করিল। পালিনা, পারদিতাকে মূর্ত্তি-পার্শ্বে লইয়া গেলেন। হরি হরি! মূর্ত্তি, সেই স্নেহময়ী কন্যাটীর মুখ-চুম্বন করিল! অতঃপর ছল-ছল নেত্রে বিনীতভাবে রাজ-হস্ত স্পর্শ করিল ও করুণকণ্ঠে স্বামীর কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসিল।

"প্রাণাধিকে! সতি! আমার জীবন-সর্ব্বস্ব!—"

বলিয়া সিসিলিরাজ মহিষীকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। সভার মাঝে আনন্দের-স্রোত প্রবাহিত হইল।

---

(২০)

বলা বাহুল্য, মহারাণী হারমিয়নি জীবিতাই ছিলেন। যখন সিসিলি-রাজ লিয়ন্তিস দুর্জ্জয় ক্রোধের বশবর্ত্তী, হিতাহিত জ্ঞান শূন্য;—শিশু-কন্যাকে বনে বিসর্জ্জন করিলেন, অসতী জ্ঞানে মহিষীকে যার-পর-নাই নির্য্যাতন করিলেন;—তখন বুদ্ধিমতী পালিনা ভাবিলেন, যেরূপ গতিক দেখিতেছি, তাহাতে রাজার ক্রোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-ই পাইবে। এ অবস্থায় মহিষীর জীবন-সংশয়। অতএব, মহিষীর কল্পিত-মৃত্যু-রটনা করাই এক্ষেত্রে প্রশস্ত।"

তাই, যখন সেই সভার মধ্যে পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে অভাগিনী হারমিয়নি মূর্চ্ছিতা হইলেন, পালিনা সেই অবসরে রাজাকে বিরলে লইয়া গিয়া সিসিলি-রাজকে সংবাদ দিলেন যে, মহিষী এই মূর্চ্ছাতেই গতাসু হইয়াছেন। পাঠকের অবশ্যই সে কথা স্মরণ আছে।

তদবধি ঐ গুণবতী রমণী সযত্নে, সংগোপনে আপন আলয়ে রাণীকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। উপস্থিত অচিন্তনীয় উপায়ে দুহিতা লাভ হইল দেখিয়া ও রাজার কৃতপাপের যথোচিত অনুশোচনা হইয়াছে ভাবিয়া, তিনি হারমিয়নিকে স্বামি-সম্মিলনে সুখী করিলেন।

রাজা লিয়ন্তিস্ পালিনার আচরণে যে কি অবধি আনন্দ লাভ করিলেন, তাহা কেবল তিনিই বুঝিলেন। বলা বাহুল্য, সেই বৃদ্ধ মেষপালকও রাজার অল্প স্নেহ ও কৃতজ্ঞতার-ভাজন হয় নাই। অচিন্তনীয় রূপে জায়া ও নন্দিনী লাভ করিয়া লিয়ন্তিস্ অপার সুখসাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

এই সময়ে আর এক শুভ ঘটনা সংঘটিত হইল। বোহিমিয়া-রাজ পলিক্সেনিস, সপুত্র কেমিলোকে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে না দেখিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিলেন, নিশ্চয়ই ইঁহারা সিসিলি-রাজ্যে সমাগত হইয়াছেন। কারণ তিনি জানিতেন, কেমিলো ইদানীং প্রায়ই স্বদেশ দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন এবং যথাসময়ে সিসিলিতে আসিয়া উপনীত হইলেন।

লিয়ন্তিসের আর সুখের অবধি রহিল না। একে একে তাঁহার সকল মনঃকষ্ট দূর হইল। আজ তিনি স্ত্রী, কন্যা, বন্ধু ও প্রাচীন প্রিয় অমাত্য কেমিলোকে পাইয়া নিরতিশয় সুখে মগ্ন হইলেন। সিসিলি-রাজ মুক্ত অন্তরে বোহিমিয়া-রাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। উভয়েই উভয়কে সন্তুষ্ট করিলেন;—কাহারও আর কোনরূপ মনোমালিন্য রহিল না। চারিদিকে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

পলিক্সেনিস, সাহ্লাদে, সর্ব্বান্তঃকরণে পার্দ্দিতার সহিত ফ্লোরিজেলের বিবাহ দিতে সম্মত হইলেন। কারণ, পার্দ্দিতা ত এখন আর হীনবংশীয়া মেষপালক-দুহিতা নয়! বালিকাকে এক দিন অযথা তিরস্কারে মর্ম্মাহত করিয়াছিলেন ভাবিয়া বোহিমিয়া-রাজ ব্যথিত হইলেন। এখন শতগুণ স্নেহমাখা কথায়, সে তিরস্কার ঢাকিয়া ফেলিলেন। অতঃপর, মহা সমারোহে ফ্লোরিজেল ও পারিদ্দিতার শুভ পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। সতী সাধ্বী হারমিয়নি, স্বামী, কন্যা ও জামাতা লইয়া মনের সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

আহ্বান।

দুখী বলে,—"বিধি নাই, নাহিক বিধাতা,
চক্র সম অন্ধ ধরা চলে।"
সুখী বলে,—"কোথা দুখ, অদৃষ্ট কোথায়!
জগত মানব-পদ তলে।"

জ্ঞানী বলে,—"কার্য্য আছে, কারণ দুর্জ্ঞেয়,
আজীবন প্রতীক্ষা কেবল।"
ভক্ত বলে,—"এ জগত বিরিঞ্চি-বাসর,
ভোগে রাগে তরল উজ্জ্বল!"

ঋষি ভাবে,—ধ্রুব তুমি, বরেণ্য, ভূমান্।"
কবি ভাবে,—"পূর্ণশোভাময়।"
গৃহী আমি, জীব-যুদ্ধে ডাকি সকাতরে—
"দয়াময়! হও গো সদয়।"

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

সমাজ-পুষ্টি।

হিন্দুসমাজ বিশেষতঃ বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ এক্ষণে বড়ই কাতর। তেজ নাই, উৎসাহ নাই, পাপে নিবৃত্তি নাই, ধর্ম্মে প্রবৃত্তিও নাই। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এক প্রকার হিতাহিত বিবেচনা-শূন্য হইয়া, সমাজ কালস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছেন। অতি অল্প দিনের মধ্যেই সমাজের এই শোচনীয় অবস্থা সংঘটিত হইয়াছে, তাই বলিয়া এখনও আশা পরিত্যাগ করা যায় নাই; অল্পদিনের কাতরতা, উপযুক্ত ঔষধ পাইলে, দূর হইতে পারে। এইজন্যই সামাজিক মাত্রেরই ভাবা উচিত, সমাজের পুষ্টি হইবে কিরূপে? কাতরতা দূর হইবে কি উপায়ে? কি করিয়া আবার তেজ, উৎসাহ, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি, পাপ-নিবৃত্তি সমাজের অন্তরে আধিপত্য করিতে পারিবে? অবশ্য উপায় বলা বিশেষ কঠিন নহে। ধার্ম্মিক মাত্রেই বলিতে পারেন, "ধর্ম্মই সমাজের মূল ভিত্তি, সকলে সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে, পাপ-সংশ্রব পরিত্যাগ করিলে, সমাজ আবার পূর্ব্ববৎ তেজঃসম্পন্ন হইবে।" বস্তুগত্যা, ধর্ম্মাবলম্বন যে প্রকৃষ্ট উপায়, তদ্বিষয়েও কোন সংশয় নাই। কিন্তু এ উপায়টী সুবচ হইলেও, একালে এতদবলম্বন সুকর নহে। সুকর যে নহে, তাহা সকলেই বুঝিতেছেন।

(যদিও ধর্ম্মসম্বন্ধে বাহ্য আন্দোলন এক্ষণে খুব চলিয়াছে; স্কুলের বালক হইতে পেন্‌সন-প্রাপ্ত ডিপুটী পর্য্যন্ত বহুতর লোকেই এখন ধর্ম্মের আন্দোলনে যোগদান করে, ধর্ম্ম কি বুঝিতে যায়; স্বজাতি ধর্ম্মের প্রতি ভালবাসা মুখস্থ করে; কিন্তু প্রকৃত মনের টান, ধর্ম্মের দিকে আন্তরিক প্রবৃত্তি, ধর্ম্মান্দোলন ফলে অতি অল্প লোকেরই হইয়াছে। কাটাছাটা বাদসাদ-দেওয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বরং লোকে অনুরক্ত হইতে পারে, কিন্তু ঠিক পুরাতন সাবেক ধর্ম্মে লোকের অনুরাগ হওয়া সহজ নহে।

তাহা হইলেও আন্দোলন পরিত্যাজ্য নহে, কিছু না-কিছু উপকার ইহাতে আছেই।

আর এক সম্প্রদায় বলেন, "সত্য অবলম্বন করাই সমাজের উচিত। ধর্ম্মসম্বন্ধে বিবাদ-বিসংবাদ, কাল্পনিকতা এবং আড়ম্বর-পূর্ণতা যথেষ্ট। ফলে শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম অবলম্বন করা নানা রকমেই অসম্ভব; অতএব সত্য অবলম্বনই প্রকৃষ্ট উপায়। কাপট্য, শঠতা পরিত্যাগ করিলে, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার রাক্ষসী মূর্ত্তিকে সমাজ হইতে অপসারিত করিতে পারিলে, সমাজের অবশ্যই উন্নতি হইবে। বকধার্ম্মিকতা, বৈড়ালব্রতিকতা সমাজের ঘোরতর অনিষ্টের মূল; সেই জিনিসটীকে সমূলে নির্ম্মূল করিলে অবশ্যই সমাজের উন্নতি হইবে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। তাঁহারা বলেন, ভিতরে এক, বাহিরে আর এক, এমন লোক এ সমাজে যথেষ্ট। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ত প্রায়ই ঐরূপ। একজন ঘোর পাপী সমাজ-গ্রাহ্য হইতেছে, আবার আর একজন তাদৃশ পাপী সমাজে পরিগৃহীত হইতেছে না। স্বদেশে সর্ব্ববিধ অকার্য্য করিয়াও ভণ্ডামীর প্রভাবে বা মিথ্যা কথার গুণে একেবারে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির; সমাজ সব জানিয়াও চক্ষু নিমীলিত করিয়া তাহাকে সাদরে বক্ষে করিতেছেন; আর বিলাত প্রত্যাগত সত্যবাদী সৎ পুরুষকে দূরে রাখিবার জন্য সমাজ বদ্ধ-পরিকর। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা তৈলবটের টাকার উপরেই লোকের ধর্ম্মাধর্ম্মের, জাতিকুল রক্ষার ভিত্তি স্থাপন করিয়া বসিয়া আছেন। সমাজে এই সব এবং আরও সব কপট ব্যবহারের, মিথ্যা আড়ম্বরের সমাবেশ হইয়াছে। তাহা ছাড়িয়া সত্য অবলম্বন কর। যেরূপে পাপীকে লইয়া

সমাজ সাগরে ব্যবহার করিতেছেন, সহায় থাকুক আর নাই থাকুক, সম্পত্তি থাকুক, আর নাই থাকুক, সেইরূপ সকল পাপীকেই গ্রহণ করুন। সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ এবং যথেচ্ছাচারে বিলাত-গামী ব্রাহ্মণের পাপ-তারতম্য বিশেষ নাই; সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ যদি সমাজে চলে, তবে বিলাত প্রত্যাগতকে পায়ে ঠেলিবে কেন? কিন্তু বর্ত্তমান সমাজে এ ঔচিত্য বিচার নাই। সকল পাপিসংস্রব পরিত্যাগ করিয়া তেজ নাই, কিন্তু সময়বিশেষে কাপট্য আছে। কতিপয় অপবিত্র লোককে বাদ রাখিয়া স্বীয় পবিত্রতা-খ্যাপন বিশুদ্ধিব্যপদেশ সমাজের বিলক্ষণ হইয়াছে। এই দোষগুলি পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পাপ যখন ঢুকিয়াছে, তখন আপনাকে নিষ্পাপ বলিয়া খ্যাপন করা সমাজের কর্ত্তব্য নহে। সত্যপথ অবলম্বন করাই উচিত। অকর্ম্মণ্য পাপীকে লইয়া সমাজ আত্মাকে সতত কলুষিত করিতেছেন, এখন না হয় কর্ম্মণ্য পাপীকে লইয়া আপনার তেজ প্রদর্শন করুন, কর্ত্তব্য পালন করুন।”

পাপী বলিয়া স্পষ্ট তাঁহারা উল্লেখ না করিলেও মনোভাব ইহাই বটে। মর্ম্মকথা আমি পুনরায় বলিতেছি,—“সমাজ যখন সুরা-পায়ী ব্রাহ্মণকে, অগম্যাগামী, অভক্ষ্যভোজী প্রভৃতি বিবিধ পাপীকে চালাইয়াছেন, তখন কপট-বিশুদ্ধতার ভান করিয়া ‘বিলাতী’দিগকে পরিত্যাগ করা অনুচিত। সত্যের উপর নির্ভর করিয়া নির্ভয়ে ‘বিলাতী’দিগকেও গ্রহণ করুন। ‘বিলাতী’রা কর্ম্মিষ্ঠ, বিবিধ পার্থিব ক্ষমতাসম্পন্ন, ইহাদিগকে সমাজে লইলে লাভ আছে, ইহা-দিগকে সমাজে লইলে, সমাজ-পুষ্টি, ত্যাগ করিলে সমাজেরই ক্ষতি। ইত্যাদি।”

শেষোক্ত মতের আলোচনা করা এই প্রব-ন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

তাহা হইলেও বিশেষ প্রয়োজনীয় বোধে প্রথমে সমাজ-স্থিতির ফল সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছি।

সমাজ কেন?—সমাজেরই যখন প্রয়োজন নাই, তখন সমাজ-পুষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা করা আর বন্ধ্যা-পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ করা কি ঠিক এক কথা নহে?—ইহার উত্তর;—

“ধর্ম্মভয়, রাজভয়, এবং সমাজভয়, মনুষ্যকে নানাবিধ অকার্য্য হইতে দূরে রাখে। মনু-ষ্যের সুশীলতা, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব—এই ত্রিবিধ ভয়ের ফল। তন্মধ্যে প্রথম ভীতিদ্বয়, সর্ব্ব-বিধ সুশৃঙ্খলার, প্রধান হেতু নহে। কেবল, ধর্ম্মভীতি ত সাধারণ মানুষের পক্ষে বড়ই অকি-ঞ্চিৎকর। রাজভীতির ক্ষমতা থাকিলেও বর্ত্তমান সময়ে তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার অনেক উপায় আছে। বিশেষতঃ, রাজভীতি অকার্য্য নিবর্ত্তনে সম্পূর্ণ সমর্থ হইলেও সৎপ্রবৃত্তির হেতু যে একবারেই নহে, একথা কে অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু সমাজ-ভীতি অকার্য্যেরও নিবর্ত্তক, সৎকার্য্যেরও প্রবর্ত্তক। অকার্য্য করিলে, সমাজ নিন্দা করিবে, বল প্রয়োগ করিবে, সৎকার্য্য না করিলেও সমাজ হেয় জ্ঞান করিবে, একথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনুষ্য হৃদয়ে জাগরূক হয়। ধনী কৃপণ হইলে, প্রতিবেশী নিরন্ন বালকের মুখের দিকে না চাহিলে, রাজ দণ্ড নাই; কিন্তু সমাজদণ্ড আছে। সমাজের নিকট ধিক্কার-দণ্ড সতত ভোগ করিতে হয়, এ দণ্ড ভোগে অভিলাষ অনেকেরই হয় না। সমাজের নিকট সাধু হইতে সকলেরই ইচ্ছা হয়। সমাজ না থাকিলে, সমাজ ভীতিও থাকিত না, সমাজের নিকট সাধু হইতে ইচ্ছাও হইত না।

আমি যাহাকে সমাজ-ভয় বলিয়া মোটা-মুটী উল্লেখ করিয়াছি, তাহার প্রকৃত অর্থ হইল, ‘লোকৈষণা।’ লোকৈষণা অর্থে, সমাজ যাহাতে ভাল বলে, তদ্বিষয়ে ইচ্ছা; গৃহত্যাগী

সন্ন্যাসীরও লোকৈষণা পরিত্যাগ সুকঠিন। যা হউক, এই অশেষ ক্ষমতাবতী লোকৈষণা সংসারোপযোগী বহুতর সুফল প্রসব করে। অতএব সংসারী হইলেই সমাজ আবশ্যক। সমাজ হইতেই সংসারের সারতা, সমাজ হইতেই সংসারের বিশুদ্ধি।

দ্বিতীয় কথা; বাক্যযুক্ত জ্ঞানসম্পন্ন জীব মনুষ্য, সহস্র সহস্র—এক স্থানে বাস করিলেই একপ্রকার সমাজ হইয়া যাইবেই। সেরূপ সমাজ হওয়া স্বভাবেরই কার্য্য। সে সমাজ অপরের প্রস্তুত করিতে হয় না, স্বতঃই হইয়া উঠে। অতি নীচ জঘন্য মনুষ্য হইতে সর্ব্বোচ্চ জাতি পর্য্যন্ত সকলেরই সমাজ আছে। তবে নীচ জাতির নীচ সমাজ, উচ্চ জাতির উচ্চ সমাজ, প্রভেদ যা এইখানে। দস্যু-সমাজ, দস্যুতা, পরপীড়ন, পরধনহরণ প্রভৃতি অকার্য্যের প্রশ্রয় এবং প্ররোচনা দান করে। ব্যাধসমাজ প্রাণিহত্যার পোষক, আবার উচ্চ সমাজ, সর্ব্বত্র দয়া, দাক্ষিণ্য এবং সাধুতার মহা প্রস্রবণ।

দস্যুসমাজে যদি একজন পরপীড়ন-পরাঙ্মুখ পুরুষ থাকে, কিংবা ব্যাধসমাজে জীব-হত্যায়-বিতৃষ্ণ ব্যক্তি থাকে, তবে তাহারা স্ব স্ব সমাজে লাঞ্ছিত এবং ঘৃণিত হয়। পক্ষান্তরে উচ্চ সমাজে, দস্যুভাবাপন্ন বা ব্যাধ-ভাবাপন্ন অথবা ঐ প্রকার কুকার্য্যশালী পুরুষ বিশেষ নিন্দিত হয়। সামাজিক ব্যক্তিগণের প্রকৃতি অনুসারে সমাজের উচ্চতা নীচতা স্থিরীকৃত হয়। যে সমাজে যত নির্দ্দোষ এবং উচ্চ-আদর্শে-গঠিত ব্যক্তির সমাবেশ, সে সমাজ ততই উচ্চ। তাহার অভাব হইলেই নীচ। পবিত্র হওয়া ভাল ও শ্রেষ্ঠ-জীবন লাভ করা ভাল; এ ধারণা যে সমাজে যত অধিক, সে সমাজকে ততই উচ্চ বলিতে হয়। তাহার অভাব হইলেই নীচ বলা গিয়া থাকে। সুতরাং মানুষের সমাজ স্বাভাবিক; তবে, সমাজের শ্রেষ্ঠতা, ব্যক্তিগণের ধর্ম্মজ্ঞানাদি সাপেক্ষ।

বীতস্পৃহ এবং অত্যাচারী এই দ্বিবিধ ব্যক্তি-ভিন্ন সমাজ না মানে কে? উক্ত দ্বিবিধ লোকের কথা, আমরা ছাড়িয়া দিতেছি।

এখন দেখা যাইতেছে, সমাজধ্বংসও মানুষে করিতে পারে না, (অবশ্য যুদ্ধে মারিয়া সমাজধ্বংসের কথা আমরা বলিতেছি না) তবে ভাল সমাজকে মন্দ করিতে পারে, মন্দ-সমাজকেও ভাল করিতে পারে। কিন্তু সমাজধ্বংস হয় না।

এই আমরা, সমাজের ফল এবং প্রসঙ্গক্রমে সমাজ-উৎপত্তি ও সমাজধ্বংসের বিষয় বলিলাম। অতঃপর প্রকৃতমনুসরামঃ;—

সমাজে লোকসংখ্যা বেশী হইলেই সমাজ-পুষ্টি হয় না; যেমন সমাজ, তদুপযুক্ত লোক অধিক হইলেই সমাজ-পুষ্টি। অভাবে সমাজ-ক্ষয় অর্থাৎ সমাজের ভাবান্তর।

এক্ষণে দেখ, হিন্দুসমাজ অন্যান্য সমাজের ন্যায় কেবল ইহলোক লইয়া ব্যস্ত নহে, কিন্তু ইহলোক ও পরলোকে যাহাতে শুভ হয়, হিন্দুসমাজ তদ্বিষয়ে ব্যগ্র। সুতরাং অপর কোন শ্রেষ্ঠ (নব্যমতে) সমাজের আদর্শে এ সমাজ গঠন করিলে চলিবে না। বিশেষতঃ, পরলোকে দৃষ্টি নাই বলিয়া এক হিন্দুসমাজ ব্যতীত সকল সমাজেই কোন অংশে উৎকর্ষ থাকিলেও বিশৃঙ্খলা নানাবিভাগে। হিন্দু-সমাজের সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা সর্ব্ববিষয়ে। এ সমাজে জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, শাস্ত্রজ্ঞ, বিশ্বাসী, ক্ষমাগুণ-সম্পন্ন, চৌর্য্যাদি-দোষরহিত এবং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির প্রাচুর্য্য আবশ্যক। সেই সব লোকই এই সমাজের উপযুক্ত। এই প্রকার লোকের অল্পতা বশতই ক্রমে আমাদের সমাজের অধঃপাত হইতেছে। এই প্রকার লোকের প্রাচুর্য্য হইলে, সমাজ-পুষ্টি

হইবে। বিলাতী বাবুদিগকে লইলে, আমাদের সমাজ-পুষ্টির আশা কোথায়? বরং ঘোরতর অবনতির সম্ভাবনা। আমরা যেমন লোকের প্রাচুর্য্য সমাজে চাহি, পাপস্রোত যতই সমাজে ঢুকিবে, তেমন লোকের আবির্ভাবের আশা ততই কমিয়া যাইবে। পাপস্রোত নিবৃত্তির পথ অন্বেষণ করাই এখনকার সমাজের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। একটু আধটু করিয়া পাপ দমন, পাপপ্রবৃত্তির দমন করিবার চেষ্টা করাও অন্ততঃ সকলের উচিত। তাহা হইলে, ক্রমে পাপ-বেগ হ্রাস হইতে পারে।

এই উদ্দেশ্যেই আমরা কখন কিছু বলিয়া থাকি। সমাজ পূর্ব্বে ২।৪ জন পাপীকে অনুগৃহীত করিয়া তাহাদিগকে আপনার অন্তর্গত করিয়া এখন একেবারে মজিতে বসিয়াছেন। জানি না, কতকালে ইহার প্রতিকার হইবে। এখন পাপি-সংশ্রব না কমিলে, আর রক্ষা নাই। দুই একজন লোভী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের আত্মদ্রোহিতায়, কালাপ্রসাদ দত্ত প্রভৃতি কয়েকটী লোক, সমাজে প্রচলিত হওয়ায় আজ বাঙ্গালী-সাহেবও সমাজে চলিত হইতে চাহিতেছেন। কাল বকাউল্লাও চাহিবেন।

পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য এখন সমাজকে অন্তরে থথ-মত খাইতে হইতেছে নিশ্চিতই। আবার সেই অপরাধে প্রবৃত্ত হওয়া কি সমাজের উচিত? স্বীকার করি, সমাজে বিলাতী বাবুদের ন্যায় হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পাপী বা ততোহধিক পাপীও আছে; কিন্তু তাই বলিয়াই যে, তাহাদিগকে লইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। যে ব্রাহ্মণ সুরাপায়ী, সে ত মহাপাপী; মহাপাপী বলিয়া চৌর্য্য প্রভৃতি অল্পপাপ তাহার করা কর্ত্তব্য অথবা কেন সে না করিবে?—এ যুক্তি কেহ দিতে চাহেন কি? অথবা যে ব্যক্তি একটী ব্রহ্মহত্যা করিয়াছে এবং আর একটী ব্রহ্মহত্যা করিতে উদ্যত, তাহাকে আরও শত শত ব্রহ্মহত্যা করিতে বাধ্য করা কি ন্যায়-সঙ্গত, না প্রমাণানুমোদিত? বরং সে-ই পাপীদের পাপনিবৃত্তি পাপ-প্রবৃত্তির অল্পতা যাহাতে হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করাই কর্ত্তব্য। মনে কর, সমাজ একটী ব্যক্তি, সে এখন বিলক্ষণ পাপগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাকে আরও পাপভারে ভারী করিতে কোন সমাজিকেরই প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। লোভে হউক, মোহে হউক, অজ্ঞানে হউক, সমাজ কতকগুলি পাপানুষ্ঠান করিয়াছে, তাই বলিয়া তাহাকে আরও পাপ করাইতে হইবে! আমরা এ যুক্তির সারবত্তা বুঝিলাম না। বড়ই দুঃখের বিষয়, একজন প্রধান রাজনীতি-বেত্তা বুদ্ধিমদগ্রগণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই যুক্তিটী আমাকে বুঝাইতে আসিয়াছিলেন। আমার অনুরোধ, তাঁহারা আমার কথাটা ভাল করিয়া বিবেচনা করুন। সকলেরই উচিত, আমাদের সমাজ কিসে আবার অত্যুত্তম হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা। সমাজ, পবিত্রতা অভিমানে নহে, মিথ্যা বিশুদ্ধি ব্যপদেশেও নহে, কিন্তু পাপের মাত্রা বাড়াইতে অনিচ্ছুক হইয়াই বিলাতী দিগকে লইতে অনিচ্ছুক। বিশেষতঃ, যে সব বিলাতী বা তথাবিধ পাপী প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে মিশিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা ত সমাজের অনুগত, সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা—আপনারা অব্যবহার্য্যই থাকুন, যখন স্মার্ত্ত, শূলপাণি প্রায়শ্চিত্ত করিলেও অব্যবহার্য্য হইবে এই কথা বলিয়াছেন, তখন তাঁহারা যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া অব্যবহার্য্যভাবেই সমাজে থাকুন, তাঁহাদের সবর্ণাগর্ভজ পুত্রেরা ঐরূপ পাপ না করিলে, যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া * সমাজে ব্যবহার্য্য হইতে পারিবে। নতুবা কৃত-প্রায়শ্চিত্ত বা

* ঐরূপ পিতার ঔরসজাত বলিয়া পুত্রকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত জ্ঞানকৃত মহাপাতকী বা তত্তুল্য পাতকী সমাজে কদাচ ব্যবহার্য্য হইতে পারে না। সমাজ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া, এতাদৃশ পাপীকেই, পরিত্যাগ করুন; না হয়, যতদূর পারেন করুন। ইহা কাপট্য নহে, অসভ্য-ব্যবহার নহে; ন্যায্য কথা। আর যাঁহারা পাপী, তাঁহাদিগকে বলি, তাঁহারাও আমাদেরই সমাজের, আমাদেরই আত্মীয়;—আত্মীয়ের মঙ্গল, দশের মঙ্গল, দেশের মঙ্গল ও সমাজের মঙ্গল সম্পাদন করা কি তাঁহাদেরও উচিত নহে? স্বার্থত্যাগ না থাকিলে কোন সমাজেরই উন্নতি হয় না; নিজের ব্যবহার্য্যতারূপ স্বার্থ-ত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করুন, ধর্ম্ম-কথায় মন দিন, পুত্রাদির সুশিক্ষার ব্যবস্থা করুন, তদীয় পুত্রাদি দ্বারা সমাজ-পুষ্টি হইবে।

আমাদের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকেও বলি, কেন আপনাদের পায়ে আপনারা কুঠারাঘাত করিতেছেন? সামান্য অর্থলোভ পরিত্যাগ, কি সমাজের উপকারের জন্য, পুত্র পৌত্রাদির উপকারের জন্য আমরা করিতে পারি না? সমাজের জন্য কত লোক, কত স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়াছে, আর ২।১০ টা তুচ্ছ টাকার মমতা ত্যাগ করিতে পারিব না? আর এই লোভ ত্যাগে আমাদেরও বিশেষ উপকার আছে। আজ ১০ টাকার লোভে এই সব অকার্য্য করিতেছি, তাহাতে দশদিন পরেই ১০০ এক শত টাকা ক্ষতি হইতেছে। সমাজে আর রাধাকান্ত দেব, যাদবরাম চৌধুরী, গোলোক রায় জন্মগ্রহণ করেন না? যাহাদের দ্বারা আমরা প্রতিপালিত হইয়াছি, তেমন লোক, আমাদের প্রতি সেরূপ ভক্তিমান লোক জন্মগ্রহণ করে না কেন?—আমাদেরই দোষে। আমরা অর্থলোভে অব্যবস্থা-কুব্যবস্থা দিয়া পাপের স্রোত বাড়াইয়াছি এবং নিবৃত্তি করিবার চেষ্টা করি নাই। তাহার ফলে, সমাজ পাপী হইয়াছে; পাপী সমাজ হইতে তাদৃশ পুণ্যশীল মহাত্মাদিগের প্রাদুর্ভাব অসম্ভব। ২।১ জন সাধুশীল এখনও যে আছেন, তাহা পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যফল মাত্র, আর কিছুই নহে। নিমন্ত্রণ-পত্র দিন দিন কমিতেছে, তাহার কারণও আমরা। আমরাই সমাজে পাপ চালাইয়া, সুপ্রবৃত্তির পথ রুদ্ধ করিয়া দিতেছি। অতএব এই পরিণাম-বিরস সর্ব্বশেষ কার্য্যে, আমাদের সমূলবিনাশী কার্য্যে আমাদের প্রবৃত্ত হওয়া কি উচিত? কখনই নহে। কৃতাঞ্জলিপুটে বলি, হে সামাজিকগণ! হে পুণ্যশীল, পাপী মহা-পাপী—সর্ব্ববিধ হিন্দুগণ! হিন্দুসমাজের উপকার কামনায়, ঐহিক, পারত্রিক, মঙ্গলকামনায় আপনার আপনার কিছু কিছু স্বার্থ পরিত্যাগ করুন! হিন্দুসমাজ রক্ষা করুন! একটু একটু স্বার্থ পরিত্যাগ করিলে দেখিবেন, হিন্দু-সমাজ অচিরেই নবভাব ধারণ করিবে, পরিপুষ্ট হইবে, নিষ্পাপ হইবে, সুপবিত্র হইবে, উৎসাহ, তেজ, ধর্ম্ম, কর্ম্মণ্যতা সকল গুণই সমাজে পুনরাবির্ভূত হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

নানা সাহেব।

প্রথম অধ্যায়।

জীবনী।

ভারতীয় ইতিহাসের সমুজ্জ্বল অধ্যায়ে নানা সাহেবের জীবনী সন্নিবিষ্ট হইবার নহে। তাঁহার ক্রিয়াকলাপে ইতিহাস কখন দৃপ্ত হইতে পারে না। সত্যের অনুরোধে আমরা অবশ্য স্বীকার করিতে বাধ্য যে, নানা সৎ-প্রকৃতির লোক ছিলেন না; কিন্তু আমরা ইহাও বলিব যে, বিদেশীয় লেখকগণ তাঁহার চরিত্র যেরূপ আদর্শ-নৃশংসতায় গঠিতে চাহেন, তাহা

সত্যের নিতান্ত বিরোধী। অধিক কি কোন কোন বিদেশীয় ব্যক্তি, ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, নানা সাহেব বিদ্রোহের পুর্ব্বে দয়ালু, ভদ্র ও আলাপপ্রিয় ছিলেন। যে ব্যক্তি ইংরেজের উপর এইরূপ সদাচার ও ভদ্র ব্যবহার নিমিত্ত বিখ্যাত, কেন তিনি, পরিশেষে ইংরেজের দারুণ শত্রু হইয়া পড়িলেন, তাহার বিচার করা আবশ্যক। অধিকন্তু কানপুর হত্যাকাণ্ডের পর, ইংরেজের ভারতীয়গণের উপর যে বিষদৃষ্টি হইয়াছে, সত্য ঘটনা বলিলে যদি কিছুমাত্র তাহা দূর হয়, সেজন্য আমরা নানাসাহেবের জীবনী প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম।

বলাই বাহুল্য, ভারতে আমরা আর দ্বিতীয় নানা সাহেব চাহি না। যে ব্যক্তি ভারতে ইংরেজ-রাজ্যের মূল উৎপাটনের চেষ্টা করে, সে পাগল, মূর্খ,—সে ভারতের ঘোর শত্রু। আমরা রাজভক্ত;—আমরা ভারতে ইংরেজ রাজত্বের স্থায়িত্ব কামনা করি,—কাজেই নানা সাহেবের ন্যায় লোক আমাদের চক্ষুশূল।

ম্যাথারন্ পর্ব্বতের নিম্নভাগে ভেন্ নামক এক ক্ষুদ্র নির্জ্জন গ্রামের এক কুটীরে মধুরায় নারায়ণ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পত্নী গঙ্গাবাই বাস করিতেন। ১৮২৪ খৃঃ অব্দে এই দম্পতির একটি পুত্র সন্তান হইল। যখন সন্তানের বয়ঃক্রম প্রায় সার্দ্ধ দুই বৎসর, তখন ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণী পুত্র সমভিব্যাহারে বিথুরে একবার আগমন করেন। বিথুরে তখন মহারাষ্ট্র শাসকের শেষ বংশধর, বাজীরাও, ইংরেজের বৃত্তিভোগী হইয়া বন্দীস্বরূপ অবস্থান করিতেছিলেন। বাজীরাও নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি বিথুরে নবাগত মধুরায়, তাঁহার সগোত্র কুলজাত জ্ঞাত হইয়া, তাঁহার পুত্রকে দত্তক স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, তাহার নাম নানাসাহেব রাখিলেন। এইরূপ দুরবস্থায় জন্ম গ্রহণ করিয়া, বিধাতার নির্ব্বন্ধে নানাসাহেব, গৌরবান্বিত মহারাষ্ট্র শাসকগৃহে পুত্র স্বরূপ গৃহীত হইলেন। *

নানাসাহেব যদি এই সমুচ্চ সম্মানাই শাসককুলে পতিত না হইতেন, হয়ত তাহা হইলে, বৃটিস ইণ্ডিয়া ইতিহাসের কয়েক অধ্যায় কিছু পরিবর্ত্তিত হইত; কিন্তু এই মহোচ্চ নৃপতি বংশের প্রতিনিধিস্বরূপ গৃহীত হইয়া, যে যে কারণে, তিনি ইংরেজের উপর বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়েন, তাহা জানিতে হইলে, পাঠকগণকে একবার প্রবল পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্র জাতির ইতিহাসের শোচনীয় শেষভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে।

ইতিহাস-পাঠকেরা অবগত আছেন যে, মহারাষ্ট্র পেসোয়ারা এককালে প্রায় সমগ্র ভারতের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন; এমন কি, ইংরেজও বশ্যতা-সূচক করপ্রদানে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপান্বিত মহারাষ্ট্র শাসকগণকে সন্তুষ্ট করিতেন; কিন্তু সৌভাগ্যের অবস্থা চিরকাল এক ভাবে থাকে না। কালস্বরূপ পাণিপথ-যুদ্ধে ভীষণ হত্যাকাণ্ডের পর, মহারাষ্ট্রদিগের ক্ষমতা হ্রাস পাইতে লাগিল। পরিশেষে পেসোয়া পরিবারের শেষ বংশধর বাজি রাও, সামন্ত অধীন নরপতিগণের প্ররোচনায় ও তাহাদের বিশ্বাস-ঘাতকতায় ১৮১৮ খৃঃ অব্দে ক্ষমতাপন্ন ইংরেজের সহিত সমরে স্বীয় রাজ্য হারাইলেন। ইংরেজ পোসোয়ার বাৎসরিক ৩৪,০০০০০ চৌত্রিশ লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্য লইয়া বাজি রাওকে তাঁহার ও তাঁহার পরিবারমণ্ডলীর ভরণপোষণ নিমিত্ত বাৎসরিক ৮ লক্ষ টাকা মাত্র দিয়া বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই যে, ইহা অতিরিক্ত হইয়াছে। †

* বল্ সাহেব কৃত সিপাহি-বিদ্রোহ প্রথম খণ্ড ৩০১-২ পৃষ্ঠা।

* এচিসন সাহেবের সংশোধিত সংস্করণের সন্ধি-পুস্তক ৫ম খণ্ড, ৭৩ পৃঃ।

সে যাহা হউক, ইংরেজ-সেনানী মেজর ম্যালকমের অভিমত ও ইচ্ছানুসারে বাজি রাওয়ের বাসস্থান কানপুর হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ অন্তর্হিত বিথুর নামক স্থানে নির্দ্দিষ্ট হইল। তথায় বাজি রাওয়ের আধিপত্য ও ক্ষমতা স্বাধীন রহিল। স্থানান্তরিত হইবার পর পেসোয়ার অনুচর-সংখ্যা সাত শত অশ্বারোহী ও দুই শত পদাতিতে সীমা বদ্ধ হইল।

রাজ-সিংহাসন হইতে বিদূরীত হইয়া, বিথুরে সামান্য বৃত্তিভোগী বন্দীস্বরূপ অবস্থান কালে, বাজি রাও বিচলিত বা কাতর হইলেন না; প্রত্যুত হৃদয়ের দৃঢ়তায় ও মানসিক-বলে, অবস্থানুযায়ী কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। যে ইংরেজ তাঁহার অদৃষ্টে এই ঘোরতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিয়াছেন, তাঁহাদের উপর বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক; বরং তাঁহাদের মঙ্গলে যত্নশীল হইয়া স্বীয় প্রশস্ত হৃদয়ের মহানুভবতা ব্যক্ত করিলেন। ইংরেজের ঘোর দুর্দ্দিনে বাজি রাও তাঁহাদের পরম মিত্র-স্বরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। দুরন্ত আফগান-গণের সহিত সমরে যখন ইংরেজের ধনাগারে অর্থাভাবে অর্থের অত্যন্ত অনাটন হয়, তখন বাজি রাও ইংরেজকে পঞ্চ লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিয়া তাঁহাদের প্রভূত সাহায্য করেন। পুনরায় যখন শিখসৈন্যের সহিত পঞ্চনদের ঘোরতর সমরে ইংরেজের ভারতীয় রাজ্য বিপন্ন অবস্থায় পতিত হয় এবং যখন ইহা প্রকৃতপক্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, মহারাষ্ট্রগণ শিখগণের সহিত মিলিত হইবে, তখন এই মহারাষ্ট্রনেতার প্রভাবে ভারতে ইংরাজরাজ্য রক্ষা পাইয়াছিল *

বার্দ্ধক্যবশতঃ তাঁহার শরীর ভগ্ন ও জরাগ্রস্ত হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন পুত্র-সন্তান হইল না, এরূপ ঘটনায় সুবিখ্যাত পেসোয়া বংশ তাঁহার মৃত্যুর পর বিলুপ্ত হইবে, এইরূপ অশেষ কারণে ব্যাকুলিত হইয়া বাজি-রাও তাঁহারই স্ব-গোত্র হইতে কতকগুলি শিশু-সন্তানকে দত্তক স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নানা সাহেব শ্রেষ্ঠ। এতদ্ব্যতীত তিনি নানা সাহেবের অগ্রজ, অনুজ এবং তাঁহাদের জননীকে স্বীয় প্রাসাদে অবস্থান করিতে দিয়াছিলেন। বাজি রাও পুত্রসন্তান হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার দুইটি পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। তাঁহার প্রিয় ভার্য্যা-দ্বয়, ময়না বাই এবং সই বাইয়ের গর্ভে যোগবাই এবং কুসুমবাই নাম্নী দুইটি রূপবতী ও গুণবতী কন্যা জন্ম গ্রহণ করে।

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে যাহাতে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট নানা সাহেবের, পেশোয়ার পদবী ও বৃত্তিতে, অধিকার সত্ত্ব স্বীকার করেন, তাহার জন্য তিনি এক আবেদন করেন। বাজিরাও ভাবিয়াছিলেন যে, যে জাতির মঙ্গল-বর্দ্ধন হেতু তিনি এত করিয়াছেন, সে জাতি কখন তাঁহার এই আবেদন অগ্রাহ্য করিবেন না। কিন্তু ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট যদিও বাজিরাওয়ের এই আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন, তথাপি তাঁহারা বাজিরাওকে একবারে নিরাশ করিলেন না। তাঁহারা মহারাষ্ট্র নৃপতিকে এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবারের নিমিত্ত কিছু করা হইবে। তাঁহার পরিবারের ভরণ পোষণ নিমিত্ত ইংরেজ বাধ্য হইয়াছেন, এই আশ্বাসে ও সন্ধিসর্ত্তে আশ্বস্ত হইয়া, বাজি-রাও ১৮৫১ খৃঃ অঃ জানুয়ারি মাসের ২৮এ তারিখে মানবলীলা সম্বরণ করেন এবং উইল দ্বারা নানা সাহেবকে তাঁহার বিষয়সম্পত্তি ও প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা এবং মহারাষ্ট্র জাতির একমাত্র অধীশ্বরত্ব প্রদান করেন।

* কে সাহেব কৃত সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১০০ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নানা সাহেবের আবেদন।

নানা সাহেব যখন পেসোয়ার সঞ্চিত ধন ও তাঁহার পদবীর অধিকারী হন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম সপ্তবিংশতি বর্ষমাত্র। তিনি সে সময়ে অতি নিরীহ জাঁকজমকবিহীন, সংস্বভাববিশিষ্ট ছিলেন, এবং সতত বৃটিস কমিসনরের উপদেশ ও পরামর্শ সাগ্রহে গ্রহণ করেন।*

পেসোয়ার বিপুল পরিবারের ভরণপোষণ স্বীয় আয় হইতে সঙ্কুলান করা দুঃসাধ্য দেখিয়া, নানা সাহেব সন্ধিপত্র অনুযায়ী ইংরেজের পেসোয়া পরিবারের ভরণপোষণ করিতে স্বীকার ও তাঁহার জনককে মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে যে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল, তৎসমুদায় উল্লেখ করিয়া বিনীত ও নম্রভাবে ইংরেজ-কর্ত্তৃপক্ষের সমীপে আবেদন করেন। বিথুরের কমিসনর সাহেব এই আবেদনের ন্যায় ও যুক্তি সমর্থন করেন। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ হইতে এই আবেদন অগ্রাহ্য হইল। ভারত গবর্ণমেণ্টের শীর্ষস্থানে তখন যে শাসক আসীন ছিলেন, তিনি দেশীয় নরপতিগণের অধিকার সত্ত্ব বজায় রাখা দূরে থাকুক, তাঁহাদের রাজ্য আত্মসাৎ করিবার সুবিধা পাইলে, কখনই পরাঙ্মুখ হইতেন না। তথাকার বড়লাট লর্ড ডেলহাউসি কেবল নানা সাহেবের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; বিথুরের কমিসনর সাহেব নানাসাহেবের আবেদন সমর্থন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলেন যে, এ বিষয়ে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ অনাহূত ও অন্যায় হইয়াছে। এই আদেশের কঠোর ভাব অন্য কোন সদয় আচরণে তিরোহিত হয় নাই, পরন্তু বিথুরের যে জাইগীরের স্বাধীন আধিপত্য পেসোয়ার পরিবার-মণ্ডলীকে ব্রিটিস বিচারাধীনের বহির্ভূত করিয়াছিল, সেই জাইগীর এক্ষণে বাজেয়াপ্ত হওয়ায় তাঁহারা বৃটিস বিচারাধীন হইলেন। বৃটিস বিচারালয়ে বলপূর্ব্বক আনীত হওয়া দেশীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের পক্ষে অত্যন্ত অবমাননাজনক। ইহা হইতে অব্যাহতি পাইতে অনেকে আত্মহত্যা করিয়াছে। পেসোয়ার পরিবারও এই অবমাননা হইতে নিস্তার পায় নাই। এতদ্ব্যতীত বাজিরাওর মৃত্যুর সময় তাহাকে যে বৃত্তি দেওয়া হইত, তন্মধ্যে ৬২০০০৲ টাকা তাঁহাকে দেওয়া হয় নাই। ইংরেজ এ বিষয়ে তাঁহার নিকট ঋণী ছিলেন। কিন্তু ইহারও কিছু নিষ্পত্তি হয় নাই।

পেসোয়ার পরিবারমণ্ডলী এইরূপে শোচনীয় ও ক্লেশকর অবস্থা লর্ড ডেলহাউসির হৃদয় বিচলিত করে নাই। দেশীয় নৃপতি ও তাঁহাদের পরিবারমণ্ডলী মর্ম্মান্তিক যাতনায় ডেলহাউস আদৌ দৃকপাত করিতেন না। যদিও সন্ধিসর্ত্তানুসারে বাজিরাওয়ের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ নিমিত্ত ইংরেজ স্বীকারাবদ্ধ ছিলেন; তথাপি লর্ড ডেলহাউসের ধারণা ছিল যে, বাজিরাও ও তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ নিমিত্ত যে বৃত্তি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা শুদ্ধ বাজিরাওয়ের নিমিত্ত ও তাঁহার পরিবারবর্গের নিমিত্ত নহে। তিনি বলিয়াছিলেন, পেসোয়ার পরিবারবর্গ বৃটিস গবর্ণমেণ্টের নিকট কিছুই প্রত্যাশা করিতে পারেন না, তজ্জন্য তিনি এই বৃত্তির কিছু অংশ তাহাদিগকে দিতে প্রস্তুত নহেন। আর বাজিরাও যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা উক্ত পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। সমগ্র মহারাষ্ট্র জাতির শাসকের ৩৫ লক্ষ টাকা আয়ের সমৃদ্ধি পরিবর্ত্তে ৮ লক্ষ মাত্র দান, লর্ড ডেলহাউসি

* কে সাহেব কৃত সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস, ১ম, খণ্ড ১০১ পৃষ্ঠা।

* বল সাহেব কৃত সিপাহিবিদ্রোহের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৩০২-৩ পৃষ্ঠা।

যথেষ্ট বিবেচনা করিয়াছিলেন ; সুতরাং তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল না।

এইরূপ অনুদার ও অন্যায় নীতি কাহার না বিস্ময়োৎপাদন করিবে? একজন অপক্ষপাতী ইতিহাসকার লিখিয়াছেন, "তৎকালীন ভারতের রাজ-শাসননীতিজ্ঞগণ লর্ড হেষ্টিংস্, আডাম এলফিনিষ্টোন, বিশেষতঃ পেশোয়ারের সন্ধিসর্ত্তে স্বাক্ষরকারী মালকম সাহেব যদি কোনরূপে জানিতে পারিতেন যে, তাঁহাদের পরবর্ত্তী কোন শাসক বলিবেন যে, পেশোয়ার পরিবার ইংরেজের নিকট কিছুরই প্রত্যাশা করিতে পারে না, তাহা হইলে তাঁহারা দুঃখিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। কিন্তু সে যাহা হউক, লর্ড ডেলহাউসি এরূপ বিচার করিবার শাসক ছিলেন না। যদিও বিলাতের ডিরেক্টরগণ ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, বাজি রাওর মৃত্যুর পর তাঁহার পরিবারমণ্ডলীর নিমিত্ত তাঁহারা কিছু সংস্থান করিবেন ; কিন্তু লর্ড ডেলহাউসি ডিরেক্টরগণের অজ্ঞাতসারেই স্বকীয় কঠোর আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। *.

নানা সাহেব যখন দেখিলেন যে, লর্ড ডেলহাউসির নিকট পেশোয়ার পরিবারবর্গের নিমিত্ত কিছু প্রত্যাশা করা অসম্ভব, তখন তিনি নিরুপায় হইয়া বিলাতে ডাইরেক্টরদিগের নিকট এই মর্ম্মের এক আবেদন প্রেরণ করেন—"সন্ধিসর্ত্তানুসারে ৩৪ লক্ষ টাকা আয়ের সমৃদ্ধ রাজ্য গ্রহণে যে ৮ লক্ষ টাকা মাত্র বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা কেবল বাজিরাওরই জীবদ্দশায় উপভোগ্য হইবে, এমন হইতে পারে না। আর সন্ধিপত্রে বাজিরাওর পরিবারবর্গকে ভরণপোষণ করিবার কথা যখন উল্লিখিত আছে, তখন বাজিরাও যাহা সংস্থান করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার পরিবারবর্গের যথেষ্ট হইবে। ভাবিয়া, তাহার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের কোন বন্দোবস্ত না করা কর্ত্তব্য নহে। বাজিরাওকে যাহা দেওয়া হইত, তাহা তিনি সঞ্চিত করিয়াছেন. কিনা এবং সঞ্চয়ে পরিবারের ভরণ-পোষণ হইতে পারে কিনা, এরূপ প্রশ্ন উল্লিখিত করা ন্যায়সঙ্গত নহে। আর ইংরাজের মঙ্গল নিমিত্ত বাজি রাও যে সমুদায় প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার জন্যও তাঁহার পরিবারের দুরবস্থায় ইংরাজ রাজের দয়া প্রকাশ করা, মহানুভাবতা ও উদার প্রকৃতির পরিচয়।" নানা সাহেবের এই যুক্তিপূর্ণ আবেদনে বিলাতের রাজসভার সভ্যগণের হৃদয়ে দয়া জাগরূক হয় নাই।*

নানা সাহেবের আবেদন অগ্রাহ্য হইল। কিন্তু এই বার্ত্তা ভারতবর্ষে পৌঁছিবার পূর্ব্বে নানা সাহেব তাঁহার এক প্রিয় অনুচর আজিম উল্লা খাঁকে বিলাতে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে প্রেরণ করেন।

আজিম উল্লা এক অতি সুশ্রী ও সুপুরুষ মুসলমান। ইংরাজি ও ফরাশি ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। এতদ্ব্যতীত তিনি জর্ম্মণ ভাষাও কিছু কিছু জানিতেন। আজিম উল্লা বিলাসিতা ও সম্পদের ক্রোড়ে লালিত হন নাই। দারিদ্র্যে তাঁহার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সময় বালক আজিম উল্লার দুরবস্থা ও দুঃখের আর ইয়ত্তা ছিল না। সেই শোচনীয় সময়ে বালক আজিম উল্লা ও তাঁহার বিধবা জননী অনাহারে মৃতপ্রায় হইয়া পথিমধ্যে পতিত ছিল। সৌভাগ্যক্রমে তাহারা কোনরূপে সে অবস্থা হইতে উদ্ধার পায়। অতঃপর আজিম উল্লাকে খৃষ্টান করিবার

* মার্টিন্ সাহেব কৃত ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার। ২য় খণ্ড ২৪৮ পৃষ্ঠা।

* কে সাহেবেরকৃত সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১০৪—১০৮ পৃষ্ঠা।

প্রস্তাব হইয়াছিল। তখন তাঁহার জননী এ বিষয়ে বিশেষ আপত্তি করেন। কানপুরের পাটন সাহেবের তত্ত্বাবধারণে চালিত এক অবৈতনিক বিদ্যালয়ে আজিম উল্লা লেখা-পড়া করিয়াছিলেন। মাসিক তিন টাকা বৃত্তি পাইয়া ১০ বৎসর অধ্যয়ন পরে আজিম উল্লা উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকপদে নিযুক্ত হন। এইরূপ কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পর আজিম উল্লা নানা সাহেবের অনুগ্রহে তাঁহার সভার শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ইউরোপীয় ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি ও বিচক্ষণতা দেখিয়া নানা সাহেব তাঁহাকে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে বিলাতে প্রেরণ করেন।

বিলাতে আজিম উল্লা তাঁহার প্রভুর নিমিত্ত কিছুই করিতে পারেন নাই বটে; কিন্তু তিনি তাঁহার ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করিতে ত্রুটি করেন নাই। নিজ রূপলাবণ্যের বলে এই যুবক অল্পকাল মধ্যেই ইংলণ্ডের সুন্দরী রমণি-সমাজের সাতিশয় প্রিয় হইয়া উঠেন। এমন কি, কোন কোন উচ্চপদবীভূষিতা রমণীগণের স্নেহ ও ভালবাসায় তিনি আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই সুন্দর মুসলমানকে যে সমুদয় গুপ্ত প্রণয়সূচক পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা ইংরেজেরা কানপুর পুনরাধিকারের সময় পাইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, ইংলণ্ডের রমণি-সমাজের আদর ও ভালবাসায় আজিম উল্লা তাঁহার প্রভুর মুদ্রা নষ্ট করিয়া ভারতে প্রত্যাগত হন। পথিমধ্যে রসল্ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎকালে নির্লজ্জ আজিম উল্লা ইংলণ্ডের সুন্দরীমহলে তাঁহার আধিপত্যের বিষয় গৌরব করিয়া বলিয়াছিলেন, "ইংরাজ রমণীরা, পতঙ্গের ন্যায় বর্ত্তিকা-লোকে দগ্ধ হয়।" *

নানা সাহেবে যখন আজিম উল্লার নিকট শুনিলেন যে, তাঁহার আবেদনপত্র অগ্রাহ্য হইয়াছে, তখন তিনি ইংরাজের উপর সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। নানা সাহেব যে ইংরাজ কর্ত্তৃক "উত্তম ও ন্যায়রূপে ব্যবহৃত হন নাই," ইহা সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বল সাহেব লিপিবদ্ধ করিয়া পুনরায় লিখিয়াছেন,—ইংরেজের উপর নানা সাহেবের ক্রুদ্ধ হইবার বিশেষ কারণ ছিল, কানপুরের ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড না ঘটিলে নানা সাহেবের অবস্থা ইংলণ্ডবাসিগণের হৃদয়ে সহানুভূতি জাগরূক করিতে সক্ষম হইত। * সে যাহা হউক, নানা সাহেব তাঁহার বিদ্বেষভাব যথাসাধ্য গোপন রাখিয়া মৌখিক আলাপে ও ভদ্রতায়, যে সমুদয় ইংরেজ-পুরুষ ও রমণী তাঁহার প্রাসাদে অতিথি হইতেন, তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিতেন। এদিকে গোপনে ভিন্ন ভিন্ন নরপতিগণের নিকট ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্থিত হইবার নিমিত্ত তিনি চর প্রেরণ করিতে থাকেন। এই কার্য্য এত গোপনে ও কৌশলে সংসাধিত হয় যে, ইহার কিছুমাত্র প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু ভারতীয় নৃপতিগণ নানা সাহেবের অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। নানা সাহেব অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার প্রতি অবিচারের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত সুযোগ-অনুসন্ধিৎসু হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সুযোগ লর্ড ডেল্‌হাউসির পররাজ্য গ্রহণের ভয়ঙ্কর নীতি উৎপাদন করিল। নাবালকের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করিয়া পঞ্জাব বাজেয়াপ্ত, এতদ্ব্যতীত অন্যায় ও বলপূর্ব্বক ইংরাজমিত্রতায় অবিচলিত ঝান্সি, নাগপুর সেতারা, অযোধ্যা প্রভৃতি বৃটিস-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করায় যে সাধারণ ভীতি ও বিদ্বেষ ভারতীয় নরপতিগণের হৃদয়ে উৎপাদন করে, নানা সাহেবের তাহাতে বিলক্ষণ সুযোগ হইয়াছিল। কিন্তু কানপুর বিদ্রোহ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব কালাবধিও নানা সাহেব ঘুণাক্ষরে ইংরেজ

* রাসেল সাহেবের ডায়েরী ১ম খণ্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা।

* সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ৩০২ পৃষ্ঠা।

গবর্ণমেণ্টকে জানিতে দেন নাই যে, তিনি তাঁহাদের উপর বিরক্ত; প্রত্যুত পূর্ব্বমত শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপে তাঁহাদের নিকট এক অতি ভদ্র ও সভ্য ব্যক্তি বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

এই চতুর ব্যক্তি ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের এপ্রিল মাসে, নানা সাহেব তাঁহার প্রিয় অনুচর আজিমউল্লা খাঁকে সমভিব্যাহারে সহসা লক্ষ্ণৌ-নগরীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া সহসা তিনি বলিয়া যান। তাঁহার এই আচরণ অযোধ্যায় কমিসনর স্যার হেনরি লরেন্স সন্দেহজনক বোধে কাণপুরের কর্ত্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করেন; কিন্তু তাঁহারা নানা সাহেব যে তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, সহজে তাহা বিশ্বাস করিতে পান নাই।

অযোধ্যা রাজ্যাপ্ত সময়ে নানা সাহেবের ৫০,০০,০০০ টাকার কোম্পানির কাগজ ছিল; কিন্তু তিনি তৎসমুদায় বিক্রয় করিতে লাগিলেন। কাণপুর আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে, ৩,০০,০০০ টাকা ব্যতীত তিনি প্রায় সমুদায়ই বিক্রয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাও ইংরাজের বিস্ময়োৎপাদন করে নাই। (ক্রমশঃ)

পত্র

ভাই, আমার বিষণ্ণ-মুখ দেখিয়া, সেদিন তুমি ব্যথিত-প্রাণ হইয়াছিলে! জ্যোৎস্নাবিধৌত গঙ্গা-সৈকতে বসিয়া, শোভাময়ী প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছিলে;—নির্ম্মল সুনীল আকাশে বসিয়া, নির্নিমেষ-নয়নে চন্দ্র গঙ্গার পানে তাকাইয়া আছে, স্বচ্ছসলিলা গঙ্গাও চন্দ্রের পানে চাহিয়া আছে,—তুমি তাহাই দেখিতেছিলে! দেখিতেছিলে,—অতি দূরে আকাশে ও গঙ্গায় এক হইয়া গিয়াছে, যেন দুইটী ভিন্ন-হৃদয় এক হইয়া, এক মহা-হৃদয় হইয়াছে! যেন তাহারই মাঝখানে তুমি বসিয়া আছ,—জাগ্রত-জগতের কোন কথাটী তোমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না! তুমি ধ্যানমগ্ন; তুমি বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে, উপরে চাহিয়া কি দেখিতেছিলে, জানি না। এক খণ্ড কাল-মেঘ আসিয়া, মুহূর্ত্তের জন্য চন্দ্রকে ঢাকিল; মুহূর্ত্তের জন্য জ্যোৎস্না নিবিয়া গেল; মুহূর্ত্তের জন্য গঙ্গার জল কাল হইল! ক্ষুদ্র একটী নিশ্বাস ফেলিয়া তুমি আমারই পানে চাহিলে। কি দেখিলে? আমার তেমন ম্লান-মুখ, তুমি বল, আর কখন দেখ নাই। তোমাকে তখন কিছুই বলিতে পারি নাই। জন-মানবের দূরে বসিয়া, কোলাহলের নেপথ্য-প্রদেশে আসিয়া, নিভৃতে, প্রফুল্লচিত্তে, প্রকৃতির শোভা দেখিতেছিলে;—তখন কেমন করিয়া, ভাই! তোমাকে দুঃখের কাহিনী শুনাই? সুখ-দুঃখপূর্ণ আমাদের এ ক্ষুদ্র জীবনে, দুঃখের অংশই অধিক। যদি মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মাঝে শান্তি পাই, কে তাহাতে বাধা দিতে চাহিবে?

তাহার পর আজ কতদিন হইল! ভাই! তুমি কবি, তুমি হৃদয়বান্! আজ তুমি আমার দূরে আছ বলিয়া, তোমার করুণ-হৃদয় আমার অপরিচিত হয় নাই! তুমি জগতের দুঃখে কাতর হইয়া, পরোপকার-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছ; দীন-দরিদ্রের পিতা-মাতা স্বরূপ হইয়াছ;—আমি জানি না, কেমন করিয়া, আমার প্রাণের আনন্দ প্রকাশ করি! পরের মঙ্গল-মন্দিরে আপনাকে বলি দেওয়াই মনুষ্যত্ব;—ভাগ্যবান্ তুমি, তাই এ মহাপথের পথিক হইতে পারিয়াছ! কিন্তু দেখিও ভাই, কাল বড় কুটীল!—সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া যেন হাল-দাঁড় ছাড়িয়া বসিও না।

আজ তবে সেই কথা বলি?

(১)

মথুরাপুরে এক ঘর বড় গরীব লোক আছে। সামান্য আয়ে, অতি কষ্টে, ভদ্র-পরিবারের দিনপাত হয়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়,—বাড়ীর কর্ত্তার নাম রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়;—বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতি সচ্চরিত্র, সাধু ও বিনীত-স্বভাবের লোক। সংসারে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী ও তিনটী পুত্র-কন্যা আয় তেমন কিছু ছিল না,—দুই তিনখানি ক্ষুদ্র বাগান,—তাহার ফল-মূল বিক্রয় করিয়া যৎকিঞ্চিৎ হয়;—আর দুই চারি কাঠা ব্রহ্মোত্তর জমি,—তাহার আয়ও অতি সামান্য। এই অতি সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করিয়া, এই দুঃখী-পরিবার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

পুত্র-কন্যার মধ্যে, প্রথম পুত্রের বয়স ষোড়শ, কন্যার

বয়স দ্বাদশ, আর কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স ছয় বৎসর মাত্র অর্থের অভাবে ছেলে দুটী স্কুলে যাইতে পায় নাই, আইবুড়-মেয়েটি অনেক দিন মাথায় একটু তেল পায় নাই। জন্মেও কখন একটু ভাল জিনিস তাহারা দেখে নাই। চাঁদপানা ছেলে মেয়েগুলি বড় সুবোধ, বড় শান্ত। কাঙ্গাল গরীবের ঘরের ছেলে মেয়েগুলি এমন না হইলে, যন্ত্রণার আর অবধি থাকে না।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সুপণ্ডিত সরল-হৃদয় ও ধর্ম্মপ্রাণ। তাঁহার স্ত্রীও সকল রকমে স্বামীর আশানুযায়ী হইয়াছিলেন। দুঃখ ও বিপদের মাঝে ধৈর্য্যশীলা, শোকে অবিচলিত চিত্তা, একান্ত পতি-পরায়ণা, সম্পূর্ণ-রূপে ঈশ্বরে নির্ভরকারিণী,—সকলে বলিত, শান্তদেবী যথার্থ দেবী! অবসর পাইলে, প্রতিবেশী বালক বালিকার নিকট হইতে পুস্তক চাহিয়া আনিয়া, স্বামী-স্ত্রীতে ছেলে-মেয়েগুলিকে কিছু কিছু পড়াইতেন। সকল দিন রাত্রে, গৃহে প্রদীপ জ্বলিত না। কতদিন উঠানে ছিন্ন মাদুর বিছাইয়া, চন্দ্রালোকে বসিয়া, বালক-বালিকাগুলি পাঠাভ্যাস করিত!

মেয়েটীর নাম ছিল—সুকুমারী। কাঙ্গালের ঘরে জন্মিয়াছিল বলিয়া, বালিকার রূপের অভাব ছিল না। উজ্জ্বল শ্যামরূপ, সুবিস্তৃত প্রশান্ত আঁখি-যুগল, সুকুমার মুখাবয়ব, সুন্দর শ্রী। চরণ-চুম্বিত কেশরাশি—অগ্রভাগে ঈষৎ কুঞ্চিত, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। সমস্ত অবয়বটীতে অতি সুন্দর পবিত্রতা ছিল। যে দেখিত, সেই তাহাকে ভাল-বাসিত। বলিকার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু ছিল আরও সুন্দর! তাহার ভিতর শুধু স্নেহ, শুধু ভালবাসা! বালিকা সেই ক্ষুদ্র বুকটুকুর ভিতর সকলকে রাখিতে প্রয়াস পাইত। হায়! কে জানিত, একদিন এই বিশাল পৃথিবীর বুকেও তাহার একটু স্থান মিলিবে না!

কোন খান হইতে যদি একটু ভাল জিনিস আসিত, সুকুমারী ভাই দুটীকে নিজের অংশ হইতে আরও একটু করিয়া দিত। রাত্রে শুইয়া থাকিত,—তাহাদের গৃহের চালখানি জীর্ণ; বৃষ্টি হইলে, কোন কোন দিন গৃহে জল পড়িত; খুব শীতল বাতাস আসিয়া সকলকে কাঁপাইত; বালিকা আপনার ক্ষুদ্র বস্ত্রখানির অঞ্চল দ্বারা ছোট ভাইটিকে ঢাকিয়া, বুকের ভিতর টানিয়া রাখিত। মাঝে মাঝে উঠিয়া, পিতামাতার গায়ে হাত দিয়া দেখিত,—তাঁহাদের গাত্রে কোন বস্ত্র আছে কি না। মা জিজ্ঞাসিলেন,—"সুকু, কি দেখিতেছ, মা?"

বালিকা উত্তর করিল,—"মা, তোমার গায়ে শীত লাগ্‌ছে, কোন কাপড় আছে কি না, দেখ্‌ছি!"

বালিকা নিজের জন্ত ভাবিত না।

ছোট ভাইটী কি 'বায়না' করিয়া একদিন কাঁদিতেছিল; মায়ের সান্ত্বনা তাহার ভাল লাগিল না। দিদি আসিয়া, তাহার মুখে চুম, খাইয়া বলিল,—"ছি; ভাই, কাঁদে কি! আমরা যে গরীব মানুষ;—আমাদের কি 'বায়না' করিতে আছে?

বালিকার বয়স তখন সাত বৎসর।

সোণারচাঁদ ছেলেমেয়েগুলিকে লইয়া, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সংসার এই ভাবে চলিতে লাগিল।

এই অবস্থার ভিতরও একটা সুখ ছিল;—তাহা চিত্তের প্রফুল্লতা। যতদিন এই সুখটুকু থাকে, অনন্ত দুঃখও মানুষকে বিচলিত করিতে পারে না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এ সুখটুকুও গেল। তাঁহার সংসার নিতান্ত দুঃখের-সংসার হইল। সাশ্রু-নয়নে, ভগবানকে স্মরণ করিয়া, ব্রাহ্মণ মনে মনে কহিলেন,—"কাঙ্গালের ঠাকুর! কাঙ্গালের জাতি ও ধর্ম্ম রক্ষা কর!"

---

(২)

এ অশান্তির কারণ কন্যাদায়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বড় ছেলেটী কলিকাতায় এন্‌ট্রান্স পড়িত। কোন দয়ার্দ্রচিত্ত ভদ্র-মহোদয়, তাহার যাবতীয় খরচ দিতেন। ছেলেটীর লেখা-পড়ায় খুব মনোযোগও ছিল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভাবিতেন, এই পুত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, তাহার বিবাহ দিয়া, কন্যার বিবাহ দিবেন। কিন্তু হায়, বড়-সাধে বাদ পড়িল! পরীক্ষার পরই তাঁহার সে পুত্রের মৃত্যু হইল! সকল আশা-ভরসাই নির্ম্মূল হইল! ব্রাহ্মণ দেখিলেন,—তাঁহার দুঃখ অন্তহীন, সীমাহীন!

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চিররুগ্ন। মধ্যে একরূপ সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল যে, বাঁচিবার কোন আশা ছিল না। এখন কেবল বাঁচিয়াই আছেন,—কোন কাজ কর্ম্ম করিবার আর সামর্থ্য নাই। যখন ভাল ছিলেন, তাঁহার অবস্থা এত হীন ছিল না। তারপর উপযুক্ত পুত্র বিয়োগ! যাহার মুখ চাহিয়া, এত কষ্ট অবাধে সহ্য করিতেছিলেন, এত দুঃখ ও অসহায় অবস্থার মাঝে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল দেখিতেছিলেন,—সে ত চলিয়া গেল! বুক ভাঙ্গিয়া গেল; ব্রাহ্মণ চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন! ধর্ম্মপ্রাণা সাধ্বী শান্তদেবীর বুকের একখানি হাড় খসিল। কিন্তু তিনি শোকে অধীর হইলেন না,—ভগবানকে স্মরণ করিয়া, ভাঙ্গা-বুক আবার জোড়া দিলেন।

খন একেবলমাত্র ছেলে-মেয়েটীকে লইয়া, কোনও

মতে দিন কাটিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মেয়েটি বড় হইল, দ্বাদশবর্ষও উত্তীর্ণা হয়। অনূঢ়া রাখা আর ভাল দেখায় না, শীঘ্র বিবাহ না দিলে আর চলে না। কাজেই বড় ভাবনা আসিল, ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ভিখারীর কুটীরে যে শান্তিটুকু ছিল তাহাও অন্তর্হিত হইল।

দরিদ্রের কন্যা, কে বিবাহ করিবে? বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিঃস্ব, সহায়-সম্পত্তি হীন। তিনি নিষ্ঠাবান্, সহৃদয়, পর-দুঃখ-কাতর,—কেবল অবস্থাই হীন ছিল। চরিত্রগুণে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। কন্যা-দায়ে কিন্তু কেহ কোন প্রকারে তাঁহাকে সাহায্য করিল না। রাশিখানেক অর্থ না দিলে ত আর পাত্র মিলে না! ব্রাহ্মণ মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। অন্তরে, কাতরস্বরে ভগবানকে ডাকিলেন,—"দয়াময়! তুমি ভিন্ন দীন-দুঃখীকে আর কে দয়া করিবে? বিপন্নের প্রতি মুখ তুলিয়া চাও, নারায়ণ!"

---

(৩)

এই সময়ে আর একটা বড় গোলযোগ ঘটিল। ভাই, আজ সে কথা মনে করিতেও বুক ফাটিয়া যায়! এই যে নিভৃতে, নিস্তব্ধ-নিশীতে, প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া এই দুঃখের কাহিনী তোমাকে লিখিতেছি, এ সময় সেই মলিন মুখখানি মনে পড়িতেছে! সেই প্রশান্ত-নয়নের করুণদৃষ্টি, ঠিক তেমনি করিয়া যেন আমার পানে চাহিয়া আছে! হায়! তখন কেন দেখিলাম না? কেন বুঝিলাম না?

মথুরাপুরে আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত দেখা করিতে যাই। আমার ভগিনীর সহিত সুকুমারীর বড় ভাব, বড় ভালবাসা। দু'জনারই বাড়ী খুব কাছা-কাছি। সুকুমারী প্রতিদিন অন্ততঃ একবার করিয়া, আমার ভগিনীর সহিত দেখা করিতে আসিত। পরস্পরের সুখ-দুঃখের কথা হইত। আমার ভগিনী সুকুমারী অপেক্ষা, দুই বৎসরের বড়; কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া-যায় নাই। একবার মথুরাপুরে যাই;—সেখানে এই দরিদ্র-পরিবারের দুঃখ-কাহিনী শুনিয়াছিলাম।

একদিন আমার ভগিনীর সহিত বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছি. সুকুমারী আসিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইল। সেই প্রথম দেখা! আমার ভগিনী তাহাকে ডাকিয়া, আপনার পার্শ্বে বসাইল। বালিকা মুখখানি নত করিয়া বসিয়া রহিল। আমি কিছু কথাবার্ত্তা কহিয়া বাহিরে চলিয়া গেলাম।

বালিকা-হৃদয়ের রহস্য কখন বুঝি নাই। স্নেহভরা সে ক্ষুদ্র হৃদয় টুকু সরলতার আধার। নির্ম্মল মুখখানি দেখিলে স্বর্গের কথা মনে পড়ে। অতি-বড় পাষাণ-হৃদয়ও সে মুখখানি দেখিয়া, অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে।

ক্রমে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ হইল। তাঁহার কন্যার একটি পাত্রের জন্য, বিশেষ অনুরোধ করিয়া, তিনি আমাকে বলিলেন। সুকুমারীর মাও আমার ভগিনীকে ডাকিয়া কহিলেন, "বউ-মা, তোমার ভাইকে বলিয়া, আমার মেয়ের একটি ভাল বর করিয়া দাও।"

দুর্ভাগ্য-পরিবারকে দেখিয়া আমার বড় দয়া হইল। মনে করিলাম, যেমন করিয়া পারি, একটি সৎপাত্রের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া, এই বালিকার পিতামাতার আশীর্ব্বাদভাজন হইব।

মথুরাপুর হইতে চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় আমার ভগিনীর চক্ষু জলে ছলছল করিতেছিল। পার্শ্বে সুকুমারী দাঁড়াইয়াছিল; দেখিলাম, তাহার চক্ষুও অশ্রুপূর্ণ! তাহার সঙ্গিনীর চক্ষে জল দেখিয়া কি, তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল?—না, সে-ই তার পিতা-মাতার যত অসুখের কারণ বুঝিয়া, মনে মনে আত্ম-ধিক্কার করিল? হায়, কেন বুঝিলাম না?—কেন ভাবিলাম না?

---

(৪)

আসিবার সময়, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ছোট ছেলে-টিকে সঙ্গে আনিয়াছিলাম। তাহার যাহাতে লেখা-পড়া হয়, এমন বন্দোবস্ত করিয়াও দিলাম। সুকুমারীর জন্য পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, পাত্র মিলিল না। বিনা অর্থে, কিম্বা যৎসামান্য অর্থ লইয়া কেহই বিবাহ করিতে চাহিল না। বন্ধু-বান্ধবকে ধরিলাম; আমার অবস্থানুযায়ী নিজে কিছু অর্থ দিব বলিয়াও কত চেষ্টা করিলাম; কিন্তু ভাই, কি দুর্ভাগ্য, পাত্র একেবারেই মিলিল না! হায়, হতভাগ্য স্বদেশ! অর্থ-পিপাসাই এত প্রবল হইল! দয়ামায়াহীন পিশাচ, আমাদের অপেক্ষা, কোন্ গুণে নিকৃষ্ট?

আমি অবিবাহিত, সত্য। কিন্তু আমি যে বিবাহ করিব; এরূপ কথা কখন আমার মনে উদয় হয় নাই। অনেক চেষ্টা করিয়াও বর মিলিল না। নিতান্ত কুক্রিয়াসক্ত, হতভাগ্য দু' একটা পাত্র মিলিয়াছিল; কিন্তু কোন্ প্রাণে, জানিয়া-শুনিয়া, সরল ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ করি!

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে একথা জানাইলাম।

কার্য্যানুরোধে, আমাকে দেশান্তরে যাইতে হইল। ভাবিলাম সেখানেও যদি একটা পাত্র পাই। হায়, নিষ্ঠুর ভবিতব্য!

এইরূপ গণ্ডগোলে, আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল। সুকুমারী ত্রয়োদশ বর্ষও উত্তীর্ণ হইল। পিতা মাতার আহার-নিদ্রা উঠিল। দিন-রাত ঐ ভাবনা,—কিরূপে মেয়ে পার হয়! ব্রাহ্মণ গরীব লোক; জাতিচ্যুতি হইতে আগে তাহারই হইবে।

সুকুমারী ভাবিল, সে-ই তার পিতামাতার যত অসুখের কারণ। আহা, তার দাদাটি বাঁচিয়া থাকিয়া, সে যদি মরিত, সকলদিকে ভাল হইত! একমাত্র অর্থের অভাবে, কন্যা পাত্রস্থ হইতেছে না,—করুণ-হৃদয় পিতা আজ চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে, সেই প্রাণাধিকা তনয়ার মৃত্যু কামনা করিতেছেন!!

গিরিগুহাবাসী অসভ্য সাওতাল! এস ভাই, এস! আজ তোমায়-আমায় আলিঙ্গন করি! শিক্ষা ও সভ্যতার অভাবে তুমি অসভ্য; আর সেই শিক্ষা ও সভ্যতা লাভ করিয়া,—দেখ দেখ! আমরা কিরূপ পিশাচ, বর্ব্বর ও নরঘাতী চণ্ডাল!!

---

(৫)

অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন কোথাও কিছু হইল না,—আমার মা আমাকে বিবাহ করিতে অনুমতি দিলেন। আমি প্রথমতঃ মাতৃ-আজ্ঞাও লঙ্ঘন করিব ভাবিয়াছিলাম; শেষে দাদাও আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, বুঝাইলেন, একটু ভর্ৎসনাও করিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, শেষে আমি বিবাহ করিতে সম্মত হইলাম।

এই ঘটনার অনতিবিলম্বে, আমার কনিষ্ঠা ভগিনীও আমাকে এক অনুরোধ-পত্র লিখিল। তাহার মর্ম্ম এই:—"দাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমিই সুকুমারীকে বিবাহ কর। কুলে শীলে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের পাল্‌টি ঘর। আহা, পয়সার অভাবে ব্রাহ্মণ, সেই সোণার প্রতিমাকে, আজ এক বৃদ্ধের হস্তে সঁপিয়া দিতেছে! দাদা, বিপন্নকে দয়া করিলে, ভগবানও আমাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবেন। তুমি আমার চেয়ে কত অধিক বুঝ; তোমাকে আর আমি বেশী কি লিখিব?"

হায়, নিষ্ঠুর ভবিতব্য! পত্র আমার হস্তগত হইল,—অনেক বিলম্বে।

আমার এরূপ উপেক্ষা ভাব দেখিয়া, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, অগত্যা নিরুপায়ে, হতাশ হইয়া, এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের হস্তে, কন্যা সম্প্রদান করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন। পাত্রের বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত কুক্রিয়াসক্ত, মদ্যপায়ী ও ব্যাধিগ্রস্ত! দুইবার তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল, এইবার তিনবার! জননী জঠরে বালিকা মরিল না কেন?

যেমনি পাত্র ঠিক হইল, অমনি বিবাহ হইয়া গেল। ফুল্ল-কুসুম উত্তোদকে নিক্ষিপ্ত হইল!!

---

(৬)

মথুরাপুরে আমাকে, আর একবার যাইতে হইয়াছিল,—সুকুমারীর বিবাহের এক বৎসর পরে। এই এক বৎসরের মধ্যে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আর বড়-একটা খোজ খবর লই নাই।

আমি মথুরাপুরে গেলাম। পথে, হঠাৎ সুকুমারীর কথা মনে পড়িল। তাহার বিবাহের পর, তাহার কথা, আর বড়-একটা মনে উদয় হয় নাই। কিন্তু হঠাৎ বুকের ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল; প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। অতি কষ্টে, আত্মসংবরণ করিয়া, অন্তরে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিতে লাগিলাম। মনে মনে কহিলাম,—"ভগবান্! বৃদ্ধ-পাত্রে পরিণীতা হইলেও, সুকুমারীকে যেন সুখী দেখিতে পাই! সুকুমারী সুশীলা; তাহার পবিত্রতায়, অসচ্চরিত্র তাহার স্বামীর হৃদয়ও, চাই কি, উন্নত হইতে পারে!" কিন্তু হায়, আমি জানিতাম না যে, আমার এ কাতর-প্রার্থনার উপর, অলক্ষ্যে অদৃষ্ট, নিষ্ঠুর হাসি হাসিয়া ছিল!

ভগিনীর সহিত দেখা করিতে গিয়া দেখিলাম, আমার ভগিনীর পার্শ্বে একখানি বিষাদ-প্রতিমা বসিয়া আছে! শরীর শিহরিল, প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল! হরি হরি হরি!!! এই কি সে সুকুমারী?

আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, ভগিনী অশ্রু মুছিয়া বলিল,—"দাদা, কপাল পুড়িয়াছে!—বিবাহের তিন দিন পরে অভাগীর সিঁথীর সিঁদূর মুছিয়াছে!"

আমি অতি কষ্টে সুকুমারীর পানে চাহিলাম। দেখিলাম, সরলা বালিকা, বৈধব্য-মুকুটে মস্তক ঢাকিয়া ভূমি-পানে চাহিয়া আছে!

চক্ষে অশ্রু ঝরিল না,—কিন্তু প্রাণের ভিতর সে দৃশ্য, দুঃখ-কান্নার অতীত হইয়া, চির-জাগরূক রহিয়া গেল।

ভাই, এই আমার সেই দুঃখ-কাহিনী!

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

মনের কথা।

লিখিব কি?—লিখিলেই গোল। লিখিলেই রাগ। রাগে "মানহানির মোকদ্দমা।"

সত্য কথা কহিবার যো নাই। মন্দকে মন্দ, চোরকে চোর, অসতীকে অসতী বলিতে পাইবে না। কৃষ্ণাঙ্গীকে যদি কালো বলি, তাহা হইলেও,—লাইবেল্। কেন না, জনগণ-সমক্ষে তাঁহাকে হেয়া এবং নিম্নপদস্থা করা হইল। শ্রীমতী কৃষ্ণাঙ্গী যদি অবিবাহিতা হন, তাহা হইলে তিনি বলিবেন, তাঁহার কৃষ্ণকান্তির কথা প্রকাশ করায়, তাঁহার বিবাহে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে। অতএব, দাও,—ক্ষতিপূরণ। কৃষ্ণাঙ্গী যদি বিবাহিত হন, তাহা হইলে বলিবেন, "এঁ। আমাকে কালো বলিয়া রাষ্ট্র করিলে? তবে ত আমার স্বামী আমাকে আর না ভাল বাসিতে পারেন? আমার ছেলেমেয়ের বিবাহও ত সহজে না হইতে পারে? অতএব, দাও—ক্ষতিপূরণ।" শ্বেতকায় ব্যক্তিকে যদি সাদা বলি, তাহা হইলে, হয় ত তিনি বলিবেন, "কি বলিলে? আমি সাদা!! তবে কি আমার ধবল হইয়াছে?" অতএব, দাও উকীলের চিঠি। যদি বলি চম্পক-কলি-সদৃশ সুবর্ণ বর্ণ। তবে কি আমার পাণ্ডুরোগ হইয়াছে? যদি বলি, নীলবর্ণ। নীলবর্ণ ত কাহারও দেখিতে পাই না। নীল-বাঁদরের কথা শুনিয়াছি। তবে কি আমাকে নীল-বাঁদর বলিয়া উটংকণ করা হইল?

যদি বলি, তোমার রূপ বড় কুৎসিৎ, তাহা হইলে ত সঙ্গে সঙ্গে ফৌজদারী-সোপরর্দ্দ। ক্ষমাপ্রার্থনা কালে, যদি বলি, তুমি অতি সুন্দর-সুপুরুষ। তাহা হইলেও তুমি বলিবে, আমাকে ঠাট্টা করিতেছ নাকি? এরূপ বিদ্রূপ-নিবন্ধন তোমার নামে ড্যামেজের নালিস্ করিতে পারি।

যাই কোথা! দাঁড়াই কোথা!

আজ কাল কথায় কথায় "মানহানি" হইতেছে। মনিব, চাকরকে যদি বলে, তুমি অকর্ম্মণ্য;—চাকর অমনি মনিবের নামে ডিফ্যামেশনের চার্জ্জ আনিতেছে! অধিক কি, স্ত্রী, স্বামীর নামে মানহানির মোকদ্দমার উপক্রম করিতেছে। ২৯৷৷৵০ সোণার ভরি। স্ত্রী গহণা চাহিলেন। স্বামী বলিলেন, "প্রেয়সি! কয়েক দিন থামো, পরে গহণা গড়াইয়া দিব।" প্রেয়সী উত্তর দিলেন, "নির্দ্দিষ্ট গহণাগুলি লইয়া নিমন্ত্রণ খাইতে গেলে, স্ত্রী-সমাজে অবমানিত এবং অপদস্থ হইতে হইবে। অতএব, গহণা যদি এখন না দাও, তবে হে স্বামিন্! হে প্রাণধন! তোমার নামে মানহানির মোকদ্দমা করিতে বাধ্য হইব।"

এ কলিকালে, ইংরেজ-রাজত্বে, আজ খুড়ো-ভাইপোয় মানহানি, শালা-ভগ্নিপোতে মানহানি, বাপ-বেটায় মানহানি!!

কথা কহিলেও মানহানি, চুপ করিয়া থাকিলেও মানহানি। যদি চুপ করিয়া থাকি, তাহা হইলেও বলিবে, মনে মনে গালি দিতেছে;—

মুখে নাই রা।
পর্ব্বতে মারে ঘা॥

অতএব লোকালয় ত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসী সাজিয়া, সকলে বনে গমন কর।

***

গমন করিবার আরও এক বিশেষ কারণ জন্মিয়াছে। সংসারে, লোকালয়ে, ঘর করিয়া থাকিতে হইলেই, এবার কৃত্তিবাসের জন্য কিঞ্চিৎ চাঁদা দিতে হইবে। আমি বলি, কৃত্তিবাসকে চাঁদা দেওয়া অপেক্ষা, কৌপীন

আঁটিয়া বিজন অরণ্য-যাত্রা সহস্রগুণে শ্রেয়। শুনিতে পাই, কাশীর বানরগুলা মনুষ্যের ন্যায় সর্ব্বকার্য্যই করে, কেবল টেক্স দিবার ভয়ে কথা কয় না। শুনিতে পাই, অনেক বুদ্ধিমান মনুষ্য, ডিক্রীদারকে ফাঁকি দিবার জন্য, গৈরিক বসন পরিধান, এবং অঙ্গে ভস্ম বিলেপন করিয়া থাকে। নজিরের অভাব নাই। অতএব কৃত্তিবাসের চাঁদা কেহ চাহিলেই পরণের কাপড় ফেলিয়া বনে পালাও। অথবা, আদালত খোলা,—ইন্‌সলভেন্ট লও। তোমার পক্ষ সমর্থন জন্য হাইকোর্টে বড় বড় বারিষ্টার নিযুক্ত কর। কিন্তু, সাবধান,—কৃত্তিবাসের চাঁদা কেহ দিও না। বিষবৃক্ষকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা উচিত। আজ যদি কৃত্তিবাসের চাঁদা দাও, কাল বলিবে কাশীদাশের চাঁদা দাও, পরশ্ব বলিবে কবিকঙ্কণের চাঁদা দাও। তারপর ভারতচন্দ্র আছেন, ঘনরাম আছেন, রূপরাম আছেন, ক্ষেমানন্দ কেতক দাস আছেন;—পিপীলিকা-শ্রেণীবৎ এইরূপ অসংখ্য মহাকবির শ্রেণী আছে। অতএব ভাই সকল! ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ কর। ফাঁদে পা দিও না। একবার কৃত্তিবাসরূপ-চাঁদার ফাঁদে তোমাকে প্রবেশ করাইতে পারিলে, তোমার আর ইহকাল পরকাল থাকিবে না। যা কিছু রোজগার কর, তাহা এইরূপ কৃত্তিবাসদিগরকে দিয়া যাও, আর কি! কিন্তু বঙ্গবাসী নাছোড়বন্দ। বঙ্গবাসী বলেন, তিনি কৃত্তিবাসের চাঁদা বাঙ্গালীর নিকট হইতে আদায় করিবেনই। এরূপ স্থলে বঙ্গবাসীর নামে একটী মানহানির মোকদ্দমার উদ্যোগ করিলে হয় না? লাইবেল নানারূপ হয়। প্রথমতঃ, বঙ্গবাসী বলিয়াছেন, কৃত্তিবাসের ভিটায় কিছুই নাই,—বাড়ী-ঘরদ্বার নাই,—কৃত্তিবাসের বাগান নাই, কৃত্তিবাসের পুকুর নাই। অর্থাৎ প্রকারান্তরে কৃত্তিবাসকে লক্ষ্মী-ছাড়া বলা হইয়াছে। কৃত্তিবাসের কোন বংশধরকে দিয়া, এইরূপ ভাবে নালিস করান চলে,—কৃত্তিবাসকে লক্ষ্মীছাড়া, অতিদরিদ্র বলায় জনগণসমাজে আমার সম্মান নষ্ট হইয়াছে। অতএব, কর বঙ্গবাসীর নামে শমন-জারি। দ্বিতীয় উপায় এই;—বঙ্গবাসী চাঁদা চাহিতেছেন,—দশজনে চাঁদা দিল, আমি দিলাম না, বা দিতে পারিলাম না। ইহাতে কি আমার সম্মান নষ্ট হইল না? অন্যের নাম অর্থাৎ যাঁহারা চাঁদা দিয়াছেন, তাহাদের নাম কাগজে উঠিল, আমার নাম উঠিল না, ইহাতে কি লোকে বুঝিতে পারিল না যে, আমি অক্ষম বা অসমর্থ? আমি দরিদ্র বা হীন? লোকের যদি ঐ রূপ সংস্কার জন্মিয়া যায়, তাহা হইলে আমার পুত্র কন্যার বিবাহ হইবে কেন? অতএব সর্ব্বাগ্রে বঙ্গবাসীকে জব্দ করা উচিত। বঙ্গবাসী হইতেছেন, পাপময় মহাক্রম। বঙ্গবাসীকে যদি একান্তই জব্দ করিতে না পারি, তবে পূর্ব্বের যুক্তি অনুসারে বন গমনই কর্ত্তব্য।

ফল কথা,—

> কবি কৃত্তিবাসে কেহ দিওনা রে চাঁদা।
> একবার দিলে রবে নাগপাশে বাঁধা॥
> দিতে দিতে ক্রমে হবে দেহ তব ক্ষয়।
> দানশক্তি বেড়ে গেলে মুস্কিল নিশ্চয়॥
> দান ক'রে পাতালে বলির হ'ল বাস।
> দান ক'রে কর্ণের কবচ হ'ল নাশ॥
> দান ক'রে দধিচির ঘাড় ভাঙ্গে যমে।
> দিও না রে চাঁদা, পড়ি' বঙ্গবাসী দমে॥

***

শুনিতে পাই, এসময় অনেক বড়লোকের মৃত্যু হইতেছে।* এমনও কথা রাষ্ট্র হই-

* "শুনিতে পাই" কেন বলিতেছি?—কারণ, কাহারও মৃত্যুত স্বচক্ষে দেখি নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রত্যক্ষ প্রমাণই প্রমাণ বলিয়া গণ্য।

৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায়।



তেছে, কালে প্রায় সকল বড়লোকেরই মৃত্যু হইবে। আমারও কিঞ্চিৎ মৃত্যু-ভয় হইয়াছে। অতএব আমি বড়লোক কি না? ভয় হইলেই বড়লোক?—না, বড়লোক হইলেই ভয়?

বড়লোক কিসে হয়?—

কেহ কেহ বলেন, চৌমাথার মোড়ের উপর যাঁহার প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনিই বড়লোক। মনে করুন, আমার পাথর কিনিবার পয়সা নাই। আমি যদি একখানি উঁচু টুল লইয়া গিয়া স্বয়ং সেই টুলের উপর চব্বিশ ঘণ্টা চৌমাথায় দাঁড়াইয়া থাকি, তাহা হইলে আমি বড়লোক হইব কি না? আমি

কিন্তু ছাতা মাথায় দিয়া দাঁড়াইব। পক্ষিগণ আমার মস্তকে পুরীষ পরিত্যাগ করিবে, প্রখর-রৌদ্রে আমার ব্রহ্মরন্ধ্র ফাটিবে, বিষম বর্ষায় ভিজিয়া আমার দেহ কাদা হইয়া যাইবে,—তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না। আমার একটী ছাতা চাই। আরও একটী কথা আছে। বেলা দেড়টার সময়,—যখন পথে কিছু কম লোক চলিবে, তখন একবার প'নের মিনিট কাল ছুটী করিয়া একটু জলখাবার খাইয়া লইব। আর, রাত্রি দেড়টার পর—পথে যখন জনমানব বড়-কেহ থাকিবে না, তখন টুলখানি মাথায় করিয়া ঘরে আসিব। আহারাদির পর, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, খুব ভোরে—যখন ময়লার গাড়ীগুলি চলে, সেই সময় উঠিয়া আবার টুলখানির উপর চৌমাথায় ছাতা মাথায় দিয়া দাঁড়াইব থাকিব। এরূপ করিলে, বড়লোক হয় কি না? আমারত কেহ নাই,—পয়সাও নাই, বন্ধুবান্ধবও নাই,—কাজেই আমাকেই—নিজে নিজেই সকল কাজ করিতে হইবে। বলিতে পারেন, যদি আমার কখনও জ্বর হয়, টেম্পারেচার ১০৭ ডিগ্রী হয়, তখন আমি কেমন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিব? বলা বাহুল্য, ঘুষঘুষি সামান্য জ্বরে আমি না হয় লাঠি ধরিয়া নিজেই দাঁড়াইয়া থাকিব। বেশী জ্বর হয়, একজন একটীন্ দিব। লাটসাহেবের একটীন্ চলে,—লর্ড-মেয়োর দেহ ত্যাগে একজন একটীন্ লাট হয়, আর আমার এই সামান্য কার্য্যে একটীন্ দিলে চলিবে না কি?

***

"বয়সেতে বৃদ্ধ নয়, বৃদ্ধ হয় জ্ঞানে।"

ভূদেব বাবু অতীব বালক ছিলেন। নতুবা তিনি এক লাখ ষাট হাজার টাকা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের রক্ষার জন্য দান করিবেন কেন? লেডি ডফরীণের ফণ্ড থাকিতে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে দান!! নাইনিতালে সানিটেরিয়ম নাই,—তদুদ্দেশ্যে অন্তত পঞ্চাস হাজার টাকা ত চাঁদা দিতে পারিতেন। বিলাতের ফাউণ্ডিলিং হাঁসপাতালের জন্য তাঁহার অন্তত পঁচিশ হাজার টাকা দেওয়া উচিত ছিল। কাহাকেও কিছুই না দিন্, অন্তত আমাকে কিছু টাকা নগদ দিলে ত তাঁহার কোন ক্ষতি ছিল না। আরে ছি! সকলকে বঞ্চিত করিয়া শেষে কিনা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদলকে দান!! তাহাদের মধ্যে অনেকে এরূপ অসভ্য যে, তাহারা পায়ে জুতা দিতে জানে না, পিরান গায়ে দিতে পারে না;—মাথায় টেড়ি নাই, বুক-পকেটে চেনঘড়ি নাই, হাতে বিলাতী ছড়ি নাই। বালক ভূদেব বেনা-বনে মুক্তা ছড়াইলেন কেন? অপাত্রে দান,—মহাপাপ! ভূদেবের উইলটা নাকচ হইবার কি কোন উপায় নাই? বন্ধুগণ! একবার ভাবো! হায়! সুন্দরীরমণীকুল! তোমাদের সুরুচিবর্দ্ধিনী সুশিক্ষার নিমিত্ত ভূদেব বাবুর বৃহৎ ভাণ্ডার উন্মুক্ত না হইল কেন? হা! দগ্ধোস্মি! হা হতোস্মি! হা! ললিতলবঙ্গলতাললনাকুল! যদি তোমরা কুলকুলনাদিনী ভাগীরথীর সহিত কুল কুল করিয়া ভাসিয়া যাও,—তথাচ তোমাদের প্রতি কেহ চাহিয়া দেখিবে না।

ভূদেব বড়ই দুষ্কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন! বহুকাল হইল, এমন দুষ্কর্ম্ম ভারতে কেহ কখন করে নাই। অতএব ভূদেবের মূর্ত্তি দেখিয়া লোক চিনিয়া রাখ। যাহার ওরূপ মূর্ত্তি দেখিবে, তাহাকেই সমাজচ্যুত—একঘ'রে করিবে। পুলিস দ্বারা হুলিয়া করাইলে হয় না?

জন্মভূমি।

৪র্থ ভাগ। } আষাঢ়। ১৩০১। { ৭ম সংখ্যা।

লীলা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হৈমবতী ছাড়িবার পাত্র নহেন। একদিন অমূল্যকুমার মকদ্দমা সম্বন্ধে কি একটা পরামর্শ করিতে গোপাল মুকুয্যের বাড়ী আসিয়াছিলেন, ফিরিয়া যাইবার সময় নীরদা কোথা হইতে সম্মুখে আসিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "দাদা বাবু!"

অমূল্যকুমার সবিস্ময়ে দেখিলেন, সম্মুখে একটী স্ত্রীলোক তাঁহাকে 'দাদা বাবু' বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। অমূল্যকুমার বলিলেন, "কে তুমি? আমি ত তোমার চিনি না; তুমি লোক ভুল করিয়াছ বোধ হয়।"

নীরদা। আমি লোক ভুল করি নাই। কেমন করিয়া চিনিলাম, পরে বলিব। সম্প্রতি লীলার নিকট হইতে আসিতেছি; লীলা আপনাকে ডাকিতেছেন।

অমূল্যকুমার ভাবিলেন, আবার একটা কি বিপদ! লীলার নাম করিয়া আবার একটা কে তাঁহাকে নূতন ফ্যাসাদে ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। তখন বিশেষরূপে নীরদাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, শঠতা বা প্রবঞ্চনার লেশ মাত্র তাহাতে দেখিতে পাইলেন না।

ভাব বুঝিয়া নীরদা বলিল; "কি দেখিতেছেন?—বিশ্বাস করিতে পারেন না?"

অমূল্য। এখন যেরূপ সময়, বিশ্বাস করিতে পারি না।

নীরদা। আপনাকে বিশ্বাস করিতে বলি নাই। আমি চলিলাম। লীলাকে বলিব, অমূল্যকুমার আসিলেন না।

নীরদা ফিরিল।

অমূল্যকুমারের শরীরে কি একটা তড়িৎ প্রবাহ ছুটিতেছিল। লীলা অমূল্যকুমারের জাগ্রৎ অবস্থায় আরাধনার ধন, নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নের মোহিনী প্রতিমা; লীলা অমূল্যকুমারের মর্ত্ত্যের স্বর্গ, স্বর্গের অস্পৃষ্ট কুসুম,—অমূল্যকুমার লীলাকে ছুঁইতে সাহস করেন না, পাছে নিশ্বাসে শুকাইয়া যায়। সেই লীলা ডাকিতেছে, আর অমূল্যকুমার যাইবেন না?

নীরদা ফিরিয়াছিল বটে, কিন্তু বড় চলিতে পারিতেছিল না। পথের ঘাসগুলা উঁচু উঁচু হইয়া তাহার পায়ে বিঁধিতেছিল। কি জানি কিন্তু আসিবার সময় ত এমন করিয়া বিঁধে নাই।

অমূল্যকুমার অল্প আয়াসেই নীরদাকে ধরিলেন; নীরদা বলিল, "আবার কি?"

অমূল্য। সত্য সত্যই কি লীলা ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন? লীলা কোথায়?

নীরদা। তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, যখন আমি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি, তখন কোন বিপদের আশঙ্কা নাই।

অমূল্য। তা জানি, কিন্তু যখন তোমাকেই চিনি না, তখন লীলা কোথায় আছে, জানিয়া যাইতে দোষ কি?

নীরদা দেখিল বড় বিপদ, যদি সত্য কথা বলি, তবে ত অমূল্যকুমার কোন মতেই যাইবেন না। এখন নীলরতনের সঙ্গে অমূল্যকুমারের যেরূপ ঘোরতর শত্রুতা, অমূল্যকুমার নিতান্ত মূর্খ না হইলে আর নীলরতনের বাড়ী পা বাড়াইবেন না। তখন নীরদা কৌশল করিয়া বলিল, "যেখানে লীলা আছেন, বলিতে নিষেধ আছে। আপনার ইচ্ছা ও বিশ্বাস যদি হয়, ত আমার সঙ্গে আসুন।"

অমূল্যকুমার নিতান্ত ইতস্তত করিতেছিলেন, নীরদাও এতক্ষণ অমূল্যকুমারকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল; শেষে নিতান্ত বেগতিক দেখিয়া নীরদা বলিল, "হাঁ, বলিতে ভুলিয়াছিলাম, লীলা আপনাকে কি একখানি চিঠি দিয়াছেন।" নীরদা আঁচলের খোঁট হইতে খুলিয়া কি একটা কাগজ অমূল্যকে দিল। অমূল্যকুমার তাড়াতাড়ি খুলিয়া দেখেন, সেই লীলার হাতের অক্ষর, সেই হিজি-বিজি কালি-ফেলা, পড়া যায় না। চিঠি, সেই এক ছত্র লিখিতে পাঁচ ছত্র কাটা, আর সেই একটা ছত্রে পাঁচটা ভুল, সেই আঙ্গুল দিয়া মোছা কালির দাগ, আর সেই কাগজের এ-কোণ হইতে ও-কোণ পর্য্যন্ত ছুটোছুটী করা ছত্র। তখন অমূল্যকুমার বলিলেন, তুমি যে লীলার নিকট হইতে আসিতেছ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন তুমি যেই হও না কেন, আমি তোমার সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত আছি। অমূল্যকুমার অনেক কষ্টে পড়িলেন, লীলা তাঁহাকে পত্রবাহকের সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

নীরদা অমূল্যকুমারকে লইয়া একেবারে নীলরতনের কামরে—যেখানে লীলা বসিয়াছিল, সেই খানে হাজির করিল। অমূল্য নীলরতনের দরজায় পা দিতে একবার ইতস্তত করিয়াছিলেন, কিন্তু নীরদা পুনঃপুনঃ লীলা লাভের লোভ দেখাইয়া প্রায় তাঁহাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল।

লীলা অমূল্যকুমারকে দেখিয়া ছুটিয়া পলাইল। তখন নীরদা কত টানা-টানি, কত সাধা-সাধি করিয়া লীলাকে অমূল্যকুমারের কাছে রাখিয়া গেল।

অমূল্যকুমারের চোকের সাম্‌নে কি একটা স্বপ্নের মতন ভাসিয়া যাইতেছিল। আজ আবার কত দিনের পর সেই অতুল রূপের অধিষ্ঠাত্রী লীলা তাঁহার সম্মুখে। অমূল্যকুমার দেখিতেছিলেন, লীলার সেই জলন্ত অথচ স্নিগ্ধতরল রূপ-রশ্মি তেমনিই আছে, সেই লজ্জাবনত মুখখানি, সেই অযত্ন-বিন্যস্ত চরণ-চুম্বিত ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশরাশি, সেই আলতা-মাখান ঠোঁট দুখানি, সেই অর্দ্ধমুদ্রিত ভূমি-ন্যস্ত আকর্ণ-বিশ্রান্ত চোক দুটী, সেই অবগুণ্ঠনের অন্তরালে বিদ্যুদ্দাম-বিলোল কটাক্ষ, সেই কনককান্তি, সেই পুনঃপুনঃ দেখিয়াও 'নয়ন-না-তিরপিত ভেল' রূপের সম্ভার, সব তেমনি-ই আছে। সেই রূপের অনন্ত লহরী-লীলা, সেই বায়ু-বিতাড়িত অলকদামের খেলা, আর সেই কনক-চম্পক-কলিনিভ অঙ্গুলি-সঞ্চালন, সেই প্রশান্ত ললাটের স্বেদ-বিন্দু—অমূল্যকুমার মন্ত্রমুগ্ধ অনিমিষ নয়নে দেখিতেছিলেন। সে দেখার আর বিরাম নাই,

সে চক্ষের পলক নাই, সে দেখিবার আশার তৃপ্তি নাই। অমূল্যকুমারের শরীরে মন ছিল না, মনে জ্ঞান ছিল না, জ্ঞানে সংজ্ঞা ছিল না। কে বর্ণন করিবে, তাঁহার সেই তন্ময় ভাব? কোথায় তুমি রূপের উপাসক? শিখাইয়া দাও, কেমন করিয়া বর্ণন করিতে হয়—রূপের নীরব নিস্তব্ধ তন্ময় উপাসনা! আর তুমি পূর্ণ-সৌন্দর্য্যাধার ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়া—রূপ! জগতের আনন্দ-রশ্মি! বলিয়া দাও, কি প্রভায় অমূল্যকুমারের নয়নে প্রতিভাত হইয়াছ?

অমূল্যকুমার নির্নিমিষ নয়নে লীলাকে দেখিতেছিলেন। আর লীলা—আমাদের ঠাকুরমার আদরের লীলা, কি অমূল্যকুমারের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছিল? লীলা ঠাকুরমার কাছে শুনিয়াছিল, স্বামীকে ভক্তি করিতে হয়, তাই সে অমূল্যকুমারকে প্রণাম করিত। স্বামীকে ভালবাসিতে হয়, তাই সে মনে করিত, অমূল্যকুমারকে ভালবাসে, কিন্তু কেমন করিয়া ভাল বাসিতে হয়, এখনও সে তাহা জানে না।

কতকক্ষণ দুজনে নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল, অমূল্যকুমারের মনে যাহাই হউক, লীলার কিন্তু অত ভাল লাগিতেছিল না; সে হৈমবতীর কি একটা শিখান কথা বলিতে আসিয়াছিল, সেইটা বলিয়া পলাইতে পারিলেই তাহার অব্যাহতি হয়;—তাই সে সেই কথাটা বলি বলি করিতেছিল; তা লজ্জায় তাহার মুখে কথাটা বড় ফুটিল না, আধখানা পেটের ভিতরেই রহিয়া গেল। আর সেই ফোটে-কোটে-কোটে-না অস্ফুট হৃদয়ের ভাষা!—অমূল্যকুমারের চমক ভাঙ্গিল। বিবাহ হওয়া অবধি এ পর্য্যন্ত লীলা তাঁহাকে ডাকিয়া কথা কয় নাই, আজ সেই লীলা তাঁহাকে ডাকিয়া কথা বলিতেছে, অমূল্যকুমার অধীর হইলেন, লীলা আবার একবার তাঁহাকে কি একটা কথা 'হ-ব-ব-র-ল' করিয়া জড়াইয়া বলিল; এবারও অমূল্যকুমার বুঝিতে পারিলেন না; তখন তিনি বড়ই সোহাগে, সাদরে সযত্নে লীলার হাত দুখানি ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "লীলা! কেন লীলা আমায় ডাকাইয়াছ?" লীলাকে স্পর্শ করিয়া অমূল্যকুমার নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া লীলাময় হইয়াছিলেন,—আর লীলা কোথায় সোহাগে গলিয়া যাইবে—না ছিছি! অমূল্যকুমারের হাত হইতে তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়াছিল।

তখন অনেক কষ্টকল্পনা করিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া, লীলা বলিলেন, "হাত ছাড়িয়া দাও। আর মকদ্দমায় যাহাই হউক না কেন, নীলরতনকে বাঁচাইতে হইবে।"

হরি হরি! এ কি কথা! এই কথা বলিবার জন্য লীলা অমূল্যকুমারকে ডাকাইয়াছিলেন! আর এই কথা শুনিবার জন্য অমূল্যকুমারের এত আগ্রহ, নীলরতনকে পাঁশ পাড়িয়া কাটিলে যে অমূল্যকুমারের রাগ যায় না, তাহাকেই বাঁচাইবার জন্য লীলার অনুরোধ! যে নরপিশাচ লীলাকে চিরদুঃখিনী করিতে বসিয়াছে, আর তাহারও অধিক—যে রাক্ষস, লীলার সর্ব্বস্ব ধন অপহরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারই ঘরে বসিয়া আজ লীলা তাহাকে বাঁচাইতে বলিতেছে! অমূল্যকুমারের চক্ষের সম্মুখ দিয়া নীলরতনের ঘরের দেওয়াল ঘুরিতে লাগিল। অমূল্যকুমার হাত দিয়া ঘরের মেজে ধরিলেন।

কতক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া অমূল্যকুমার আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "লীলা!—বল লীলা! আজ কেন তোমার এ অনুরোধ? একবার বুঝাইয়া দাও,—অমূল্যকুমার তোমার অনুরোধ উপেক্ষা করিবে না।"

লীলা অনেকক্ষণ হৈমবতীর নিকট হইতে আসিয়াছেন, এতক্ষণ না জানি, তাহারা কি মনে করিতেছে, আর তাহা ছাড়া সে ত হৈমবতীর শিখান কথা বলিয়াছে—আর তাহার

থাকিবার দরকার কি?—লীলা যাইবার জন্য উঠিতেছিল, তখন অমূল্যকুমার আবার ধরিয়া বসাইলেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর লীলা আবার বলিলেন, "যাহা বলিয়াছি, তাহার অধিক আর কিছু জানি না, নীলরতনের যেন অনিষ্ট না হয়।" এই কথা বলিয়া, লীলা হাত ছাড়াইয়া পলাইলেন। অমূল্যকুমার আবার ঘরের মেজে ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন।

লীলা ছুটিয়া গিয়া যেখানে হৈমবতী ও নীরদা ছিল, সেইখানে উপস্থিত হইল। উভয়েই আগ্রহ-সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন লীলা, ঠিক ত বলিতে পারিয়াছিলে?"

লীলা বলিল, বুঝি "অত কথা সব বলিতে পারি নাই, তবে নীলরতনকে বাঁচাইতে বলিয়াছি।"

হৈমবতী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "আর কি বলিয়াছ?"

লীলা উত্তর দিলেন, "কৈ, আর ত কিছু বলিতে বল নাই?"

হৈমবতী বলিলেন, "তবেই সব বলিয়াছ, আমার মাথা খাইয়া আসিয়াছ?"

নীরদার সেই সময় বুঝি লীলাকে একটা অন্তর-টিপুনি দিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তা না দিয়া সে বলিয়া উঠিল, "সেকি?"

তা তোমরা যাই বল, আমাদের লীলা কি করিবে? সে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের কৃতজ্ঞতায় আপনার প্রাণকে উৎসর্গ করিয়া স্বামীর প্রাণে দাগা দিয়া নীলরতনকে বাঁচাইতে বলিয়া আসিয়াছে। তাহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল, হৈমবতীর যত কিছু অনুরোধ, নীলরতনকে বাঁচাইবার জন্য; যেন কোন মতে নীলরতনের পায়ে কাঁটাটীও না ফোটে, কেবল এই কথাই তাহার মাথায় ঘুরিতেছিল, আর এই কথাই সে অমূল্যকুমারকে বলিয়া আসিয়াছে। আর তাহাকে লইয়া যাওয়ার কথা? সেও কি একটা কথার মধ্যে? লীলার বিশ্বাস ছিল, সুবিধা পাইলেই অমূল্যকুমার, না হয় তাহার পিতা, তাহাকে লইয়া যাইবে। তাহার জন্য কি আবার উপরোধ করিতে হয়! আর হইলেও না হয় হেমন্তকুমারকে সে এ কথাটা বলিতে পারিত। তা লজ্জার মাথা খাইয়া স্বামীকে কেমন করিয়া লইয়া যাইতে বলিবে? সে কথা লীলার মুখে ফুটিল না। লীলা আমাদের সব কথা গুছাইয়া বলিতে পারে নাই। সে হৈমবতীর কাছে কত ঋণী, আর সেই জন্য—হৈমবতীর জন্য—কেন নীলরতনকে বাঁচান দরকার, সে সব কথা লীলার মুখে ফোটে নাই; কিন্তু তাই বলিয়া কি লীলার দোষ? কেমন করিয়া স্বামীর কাছে সোহাগ করিয়া নিজের কার্য্য উদ্ধার করিতে হয়, লীলা তাহা জানে না; কেমন করিয়া গলা ধরিয়া স্বামীর কাণে মন্ত্র দিয়া একান্নের সোণার সংসার নষ্ট করিতে হয়, লীলা তাহা শিখে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া সে অকৃতজ্ঞ নহে। পৃথিবীর কুটিলতা লীলার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই; কিন্তু তাই বলিয়া তাহার হৃদয়ে স্বর্গীয় ভাবের অভাব ছিল না; কিন্তু তবুও কি তোমরা লীলার দোষ দিবে?

তা হোক, হৈমবতীর কথায়, নীরদার মুখের ভাব দেখিয়া লীলা ভাবিতেছিল, বুঝি সে হৈমবতীর কার্য্য করিয়া আসিতে পারে নাই। অভিমানে লীলার "পান্‌সে চোক" কি একটা কাণ্ড বাধাইবার উপক্রম করিতেছিল। তখন লীলা সেই ডবডবে চোক লইয়া মুখ ফিরাইয়া নিজের কক্ষে পলাইল। সেখানে গিয়া বালিশে মুখ লুকাইয়া লীলা কত কাঁদিয়াছিল, তাহা সেই অন্তর্যামী ভগবান্ ভিন্ন আর কে দেখিবে? লীলা কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

এদিকে যেখানে অমূল্যকুমার একলা বসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার সংসারের ধ্রুবতারাকে

অস্তমিত হইতে দেখিতেছিলেন, সেখানে নীরদা গিয়া উপস্থিত হইল। অমূল্যকুমার চিত্রার্পিতের ন্যায়, নীরব, নিস্পন্দ, নিশ্চল। প্রথমে নীরদাকে দেখিতে পান নাই। তখন নীরদা ডাকিল, "দাদা বাবু?"

অমূল্যকুমার চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আবার কেন? এতদিন বুঝিতে পারি নাই, আজ বুঝিতে পারিতেছি; অন্ধকারেই বিদ্যুতের জন্ম। তাহার ক্ষণিক স্থায়িত্ব অন্ধকারকে দীপ্তিমান্ করিবার জন্য, উদ্‌ভ্রান্ত পথিককে বিপথে লইয়া যাইবার জন্য; তার পর অন্ধকারেই লয়। আজ এ যে সম্মুখে পশ্চাতে, দক্ষিণে বামে, ঊর্দ্ধে অধে গাঢ় তিমির,—ভেদ করিয়া কোথায় যাইব? না, জীয়ন্তে এ যন্ত্রণা অসহ্য! আজ কেন লীলাকে দেখাইলে? না, তোমার দোষ নাই। চল, আজ সপ্তমীর পূর্ব্বে, উদ্বোধনের পূর্ব্বে, দেবীপ্রতিমা বিজয়ার জলে বিসর্জ্জন করি!" লীলা কেন তাহার স্বামীর পরম শত্রুর শুভানুধ্যায়িনী, অমূল্যকুমার তাহা বুঝিতে পারিতেছিলেন না; তাই নানারূপ সন্দেহ তাঁহার মনে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত করিতেছিল।

নীরদা বুঝি অমূল্যকুমারের অত কথা বুঝিতে পারিল না, তাই বলিয়া উঠিল, "তা হবে তখন; এখন লীলাকে কবে লইয়া যাইবেন, ঠিক করিলেন?"

অমূল্যকুমার অন্যমনে উত্তর দিলেন, "কবে লইয়া যাইব, বলিতে পারি না; তবে যখন সময় হইবে, লীলা আপনিই যাইবে।" অমূল্যকুমারের মন উদাস হইয়া আসিতেছিল। লীলার নামে তাঁহার প্রাণে বুঝি আর তেমন আকুল-তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হয় না।

নীরদা আবার বলিল, "সে সময় ত হইয়াছে, মনে করিলে এখনই লইয়া যাইতে পারেন।"

অমূল্যকুমার মুখ তুলিলেন। বলিলেন, "আর দুই দণ্ড আগে ওই কথাটী শুনিবার বুঝি সর্ব্বস্ব দিতে পারিতাম। লীলা সংসারে আমার জীবনের বন্ধন-গ্রন্থি। আজ সেই গ্রন্থি. শিথিল;—বুঝি আর লীলাকে লইয়া যাইব না।"

নীরদা বলিল, "আচ্ছা, দেখিতে পাইব, অমন অনেকে বলিয়া থাকে।" নীরদা ভাবিতেছিল, একবার এই সময় লীলার সেই মুখখানি অমূল্যকুমারকে দেখাইতে পারি!

তা হোক, নীরদা না হয় দুদিন পরে লীলার মুখখানি অমূল্যকুমারকে দেখাইবে, আর আমাদের লীলাও ত চিরকাল এমন বোকা থাকিবে না। তখন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নীরদা আবার বলিল, "তবে এখন?"

অমূল্যকুমার বলিলেন, "যে পথে আসিয়াছি, সেই পথে।" অমূল্যকুমার উঠিলেন, নীরদা পথ দেখাইয়া দিল, শূন্যমনে অমূল্যকুমার নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

হৈমবতী ঠিক বলিয়াছিলেন, অদৃষ্টের ভোগ না ফুরাইলে কষ্ট ফুরায় না।

নবম পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দ ঘোষ হাজতে পচিতেছিলেন। সেই নিরীহ ভদ্রলোকের দুর্দ্দশায় সমগ্র রায়পুরের লোক দুঃখিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। নানা কারণে রায়পুরের প্রজারা গোবিন্দ ঘোষের বাধ্য ছিল। তাহাদের মধ্যে কাহারও দায় অদায় পড়িলে, সে ছুটিয়া গোবিন্দ ঘোষের নিকট উপস্থিত হইত। গোবিন্দ ঘোষও সাধ্যমত শরণাগতের বিপদ-মোচনে ক্রটি করিতেন না। কাহারও সম্পত্তি নীলাম হইয়া যাইতেছে, সে আসিয়া গোবিন্দ ঘোষের নিকট টাকা ধার লইয়া তাহা রক্ষা করিত। কাহারও গৃহদাহ হইয়াছে, সে গোবিন্দ ঘোষের নিকট হইতে বিনামূল্যে চাল ছাইবার খড় পাইত। কাহারও

বীজ-ধান নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আর বীজের ধান নাই, সে গোবিন্দ ঘোষকে ধরিলে তাহার প্রার্থনা বিফল হইত না। কাহারও প্রতিবাসীর সঙ্গে মনান্তর হইয়াছে, সে গোবিন্দ ঘোষকে জানাইলে তিনি উভয় পক্ষকে ডাকিয়া সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিতেন। তাহা ছাড়া গোবিন্দ ঘোষের অন্দরে কৃষকপত্নীদের অবারিতদ্বার ছিল। একটী ছেলে কোলে করিয়া আর একটীর হাত ধরিয়া কৃষকপত্নীদের রাতদিন গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রীর নিকট যাওয়া আসা করিতে দেখা যাইত। গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রী ছাড়া তাহাদের দুঃখ জানাইবার আর কেহ ছিল না; বাড়ীর পার্শ্বের গৃহস্থেরা, চা'লটা, তেলটুকু, নুনটুকুও দরকার মত লইয়া যাইত। তাহা ছাড়া, রৌদ্রের সময় আসিলে একটু মিষ্টি ও এক ঘটী শীতল জল খাইয়া ঠাণ্ডা হইয়া যাইত। গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রী আবার এক নিয়ম করিয়াছিলেন।—গ্রামের মধ্যে কোন বিবাহ হইলে নবদম্পতীকে আনিয়া এক জোড়া নূতন কাপড় না পরাইয়া ছাড়িতেন না; নবদম্পতীরও মনে হইত, বিবাহের পর গোবিন্দ ঘোষের বাড়ী না গেলে বুঝি তাহাদের বিবাহ মঞ্জুর হইবে না। গোবিন্দ ঘোষ যদিও নিতান্ত নির্দ্ধন ছিলেন না, তথাপি নানা কারণে কখন কখন তাঁহার অতিরিক্ত খরচ হইয়া যাইত। কখন কথা উঠিলে বলিতেন, "আর টাকা লইয়া কি করিব? আমরা ত নিঃসন্তান, কাহারও জন্য ভাবিতে হয় না; তবে এ জন্মে টাকার সদ্ব্যয় করা আর জন্মের জন্য ভগবান্‌কে টাকা ধার দেওয়া বৈত নয়! তা না হয় ধারই দিলাম।" আজ সেই গোবিন্দ ঘোষের হাজত হওয়াতে রায়পুরের সরলপ্রাণ কৃষকমাত্রেই ব্যথিত।

নফর যে এ মকদ্দমায় সংশ্লিষ্ট, তাহা দুই দিনের মধ্যে রায়পুরের প্রজাদের আর জানিতে বাকি রহিল না। প্রথমে নফরকে ভাঙ্গাইতে তাহারা অনেকে অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়াছিল, অনেক লোভ দেখাইয়াছিল; কিন্তু নফর যখন কোন মতেই টলিল না, তখন তাহার উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল। নফর গ্রামের বাজারে গেলে জিনিস-পত্র খরিদ করিতে পাইত না। তাহার ধোপা নাপিত বন্ধ হইয়াছিল, রাত্রে অলক্ষ্যে তাহার চালে ঢিলটা-আসটা আসিয়া পড়িত; বড়ই বেগতিক দেখিয়া নফর গ্রাম ছাড়িয়া নীলরতনের অধিকারে আসিয়া বাস করিয়াছিল, কিন্তু সেখানেও তাহার নির্য্যাতনের শেষ হয় নাই। রায়পুরের লোকেরা গোপনে মুকুয্যের কাছে আনাগোনা আরম্ভ করিয়াছিল, নফরের সঙ্গে দেখা হইলে সময় ও সুবিধা পাইলে তাহারা গায়ে পড়িয়া ঝগড়া করিতে ছাড়িত না; কিছু না পারিলেও অন্ততঃ পিতৃ-পিতামহের জন্য সুশ্রাব্য ভাষায় উত্তম খাদ্যের বন্দোবস্ত করিয়া আসিত। অবশ্য এ সব কথার নালীশ যে নীলরতন রায়ের কাছে হয় নাই, তাহা নহে; তবে ইদানীং তিনি দেখিয়াও দেখিতেন না,—তাঁহার বিপক্ষদলেরা শনৈঃ শনৈঃ প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল।

এদিকে গোবিন্দ ঘোষ হাজতে পানাহার বন্ধ করিয়াছিলেন। প্রথম দুই দিন ত অনশনেই ছিলেন, তাহার পর কেবল দারোগার নির্ব্বন্ধে এক মুষ্টি আহার করিতেন। ব্যাপার শুনিয়া দারোগার বড় দয়া হয়; তাই তিনি লুকাইয়া ব্রাহ্মণের পাক-করা অন্ন আনিয়া দিতেন। তাহারই এক মুষ্টি আহার করিয়া গোবিন্দ ঘোষের দিনপাত হইত। আর সমস্তদিন তিনি ভগবানের নাম করিয়া কাটাইতেন। এই কয় দিনেই গোবিন্দ ঘোষের অস্থিচর্ম্ম সার হইয়াছিল, তাঁহাকে দেখিলে চেনা যাইত না।

অমূল্যকুমারের মোকদ্দমা উপলক্ষে মুকুয্যে মশাইকে এ মকদ্দমারও তদ্বির করিতে হইয়া-

ছিল। এ পর্য্যন্ত তিনি বড় একটা কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। দু একটা ভাড়া-করা পেশাদার ঘুষখোর বক্সলে সাক্ষী ভাঙ্গাইয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কি হইবে? আসল সাক্ষীরা এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে বড় আমল দেয় নাই। নফরের পিছনে গুপ্ত অনুসন্ধানের জন্য লোক লাগাইয়াছিলেন; তাহাতে এই পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছেন যে, মকদ্দমার সূত্রপাত হইতে সে তিনকড়ি সেকরার কাছে যাওয়া-আসা করে। তিনকড়ি প্রসিদ্ধ চোরাই মালের গ্রাহক, কয়েকবার শ্রীঘরেও বাস করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাহার স্বভাব সংশোধন হয় নাই। সেই তিনকড়ির সঙ্গে পরামর্শ অবশ্যই বড় সন্দেহের কথা। ইহার একটা কারণ মুকুয্যে মশাই ঠাওরাইয়াছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ঠিক না জানিতে পারায় কাহাকেও কিছু বলেন নাই। আজ সনাতনকে সেই সম্বন্ধে কি একটা বিষয় জানিতে পাঠাইয়া মুকুয্যে মশাই বড়ই উৎসুক-চিত্তে তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে-ছেন। সনাতন বড়ই বিশ্বাসী ও চতুর। একবার তাহার স্ত্রীর ওলাউঠা হইলে গোবিন্দ ঘোষ, ভিন্ন-গ্রাম হইতে ডাক্তার আনাইয়া অনেক খরচ করিয়া তাহার স্ত্রীকে বাঁচাইয়া-ছিলেন, সেই অবধি সে গোবিন্দ ঘোষের কেনা-গোলাম হইয়াছিল। মকদ্দমা হওয়া অবধি সে নিজের শরীর ঢালিয়া পরিশ্রম করিতেছিল। সনাতনের দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল যে, সে গোবিন্দ ঘোষকে এই মিথ্যা মকদ্দমা হইতে খালাস করিয়া আনিতে পারিবে। সেই বিশ্বাসের জন্যই হউক, কি নিজের কৃতজ্ঞতার জন্যই হউক, সনাতন একদিনের তরে মুকুয্যে মশাইয়ের হুকুম পালন করিতে দ্বিধা করে নাই। আর সেই জন্যই আজও সনাতনকে মুকুয্যে মশাই তথ্য-সংগ্রহ করিতে পাঠাইয়াছিলেন।

এদিকে হুকা হাতে মুকুয্যে মশাই তাঁহার বাহিরের ঘরের দাওয়ায় পাইচালি করিতে-ছিলেন। ক্রমে যতই দেরি হইতে লাগিল, ততই তাঁহার পাদ-চারণের বেগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কেবল ফিরিবার সময় এক একবার মুখ তুলিয়া যেখান হইতে রাস্তাটি সোজা নজর হয়, সেই-খান হইতে একদৃষ্টে রাস্তার শেষভাগ পর্য্যন্ত দেখিতেছিলেন। আঃ! এখনও সনাতন ফিরিল না! মুকুয্যে মশাই সবেগে তামাক পোড়াইতেছিলেন, আর মনে মনে কতই তোলাপাড়া করিতেছিলেন। আচ্ছা, তিনি যাহা আন্দাজ করিয়াছেন, তাহাই যদি ঠিক হয়, তবে ত একেবারেই গোবিন্দ ঘোষ আর সঙ্গে সঙ্গে অমূল্যকুমার খালাস! তার পর লোকটাকে টানিয়া জেলে পুরিবেন, আর সঙ্গে সঙ্গে নীলরতনের শ্রাদ্ধও বেশ গড়াইবে। আর যদি তাঁহার আন্দাজ মিথ্যা হয়, তবে গোবিন্দ ঘোষকে রক্ষা করে কাহার সাধ্য? মুকুয্যে মশাই শিহরিয়া উঠিলেন, তাঁহার তামাক টানা বন্ধ হইল, মুখ হইতে হুঁকা নামিয়া হাতে ঝুলিয়া পড়িল।

তবু সেই ঝুলান-হুঁকা-হাতে মুকুয্যে-মশাইয়ের পাইচালির বেগ কমিল না, এখন আবার তিনি কি বিজ-বিজ করিয়া বকিতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময় দূর হইতে সন্ধ্যার আব্‌ছায়ায় ঢাকা হইয়া, সনাতনের সজীব কৃষ্ণোজ্জ্বল কান্তি দেখা দিল। মুকুয্যে মশাই বড়ই অধীর হইয়াছিলেন, পা উঁচু করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিলেন, তাই ত সনাতনই ত আসি-তেছে। মুকুয্যে মশাইয়ের পাইচালি বন্ধ হইল। আবার হুঁকা উঠিল, আবার কলিকা হইতে নলিচার মধ্য দিয়া হুঁকার জলে অব-গাহন করিয়া, সুবাসিত তামাকের ধূম তাঁহার বুদ্ধির গোড়ায় আসিতে লাগিল।

সনাতন পৌঁছিতে-না-পৌঁছিতে তাহাকে

প্রণাম করিতে অবসর না দিয়াই, মুকুয্যে মশাই সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন।

সনাতনের আর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করা হইল না, হাত দুটা কপালে ঠেকাইয়া বলিল,—"প্রণাম! খপর ভাল, আপনি যাহা আঁচ করিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক। যেদিন লীলাকে চুরি করা হয়, তাহারই পরদিন হইতে নফর ও তিনকড়ির কথাবার্ত্তা চলিতেছে। আর লীলা চুরি হইবার ৮ দিন পরে, পুলিশ খানাতল্লাস করিয়া গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রীর গহনার বাক্স হইতে আংটী পায়।"

"সাবাস" বলিয়া মুকুয্যে মশাই এক-দমে কলিকার বাকী তামাকটুকু পোড়াইয়া ছাই করিয়া সনাতনের মুখের সামনে ধূম ছাড়িয়া দিলেন। সনাতন একবার কলিকাটী তুলিয়া লইয়া তামাক টানিবার মতলব করিতেছিল, তা মুকুয্যের ব্যাপার দেখিয়া, তাহার মনের আশা মনেই রহিয়া গেল। তা হউক, মুকুয্যে মশাইয়ের ভাব দেখিয়া, সনাতন যে নিশ্চয়ই কোন সু-খবর আনিয়াছে বুঝিতে পারিল। তখন সে মুকুয্যের কাছে একটু আগু হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল ঠাকুর! আমি এখনও ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, ব্যাপারখানা কি, বুঝাইয়া দিন।"

মুকুয্যে মশাই বলিলেন, "আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। তোর মাকে যাইয়া বল্‌গে যা, আগামী দিনে গোবিন্দ ঘোষকে খালাস করিয়া আনিব। যদি না পারি, তবে এই গোপাল মুকুয্যে বামণ নয়।"

সনাতন কয় দিনেই মুকুয্যেকে বুঝিতে পারিয়াছিল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী সুচতুর মুকুয্যে যে মিথ্যা কথা বলে নাই, তাহা সনাতনের দৃঢ়-বিশ্বাস হইয়াছিল। তখন গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রীকে আগে সে সু-খবর দিতে সনাতনের বড়ই ইচ্ছা হইল। তাড়াতাড়ি কেমন করিয়া গোবিন্দ ঘোষকে খালাস করা হইবে, জিজ্ঞাসা করিতে সনাতন ভুলিয়া গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সে অনেক দূর হইতে আসিয়াছে, তাহার মুখে হাতে একটু জল দেওয়া উচিত ছিল, তাহাও সনাতনের মনে পড়িল না।

"ঠাকুর মশাই প্রণাম গো! তবে আসি—" বলিয়া সনাতন সবেগে গোবিন্দ ঘোষের বাড়ীর দিকে চলিল। মনের আবেগে, মুকুয্যের যে সনাতনকে বসিতে বলা উচিত ছিল, তাহা মনে হইল না।

গোপাল মুকুয্যে এতক্ষণে ঠিক বুঝিতে পারিলেন যে, নফর যে শুধু লোভে পড়িয়া নীলরতনের হীরার আংটী গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রীর গহনার বাক্সে রাখিয়াছে তাহা নহে। সে, অতি লোভে পড়িয়া আংটী বাক্সে রাখিবার পূর্ব্বে তিনকড়ির যোগ-সাজিতে আর এক চাল চালিয়াছে। তিনকড়ি চোরের উপর বাটপাড়ি করিয়াছে। নফরকে কিছু বখরা দেয় নাই। মুকুয্যের কেবলমাত্র সন্দেহ ছিল যে, হয়ত অনেক দিন হইতে নফরের সঙ্গে তিনকড়ির কার-কারবার চলিয়া আসিতেছে; তা যখন তিনি টের পাইলেন যে, আংটী চুরির আগে তিনকড়ির সঙ্গে নফরের আর সম্বন্ধ ছিল না, তখন এই আংটীর যে কোনরূপ রূপান্তর তিনকড়ি করিয়াছে, তাহা সুচতুর গোপালের বুদ্ধির অগোচর রহিল না।

দশম পরিচ্ছেদ।

হুগলীর কাছারি লোকে লোকারণ্য। ভিড় ঠেলিয়া প্রবেশ করা যায় না। আজ গোবিন্দ ঘোষের মকদ্দমার দিন, সমগ্র রায়পুরের প্রজারা উপস্থিত হইয়াছে। তা ছাড়া হেমন্তকুমার অমূল্যকুমার ও নীলরতনের গ্রাম হইতেও কম লোক আমদানি হয় নাই। বড়ই জেদের মকদ্দমা;—উভয় পক্ষই বড় বড় উকীল-

মোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুন্দরী স্ত্রীলোক মকদ্দমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে শুনিয়া অনেক ছুট্‌কো উকীল অমনি তামাসা দেখিতে আসিয়াছিলেন। সোমবার আদালত গিস-গিস করিতেছিল। আরদালিদের ভিড় ঠেলিয়া রাখা দুঃসাধ্য হইয়াছিল। দর্শকেরা এ-দরজা হইতে তাড়া খাইয়া ও-দরজা দিয়া ঢুকিতেছিলেন। অনেককে গলাধাক্কা খাইতে খাইতে প্রাণান্ত হইতে হইয়াছিল; কিন্তু তবুও ফাঁক পাইলে মাথা গলাইতে ছাড়িতেছিল না। সনাতন অনেক কষ্টে এক কোণে মুখ লুকাইয়া বসিয়াছিল, চাপরাসি-সাহেব দেখিতে পাইলে সে চারি আনা পয়সা দিয়া নিস্তার পায়।

সনাতন হাঁ করিয়া উকীল-মোক্তারের কাণ্ড-কারখানা দেখিতেছিল। যেখানে মক্কেলরূপ মধুর কলসী, সেখানে উকীল-মাছিগণ ঝাঁকে ঝাঁকে ভেন্ ভেন্ করিয়া উড়িয়া বসিতে যাইতেছিল। কাছায় বাঁধা টাকা—মক্কেলগণ কেবল পুরাতন নামজাদা উকীলদেরই আমল দিতেছিল, আর কচিৎ যে দুই একজন নূতন উকীল আমল পাইতেছিল, তাহাদের লম্ফ ঝম্ফ দেখে কে? বরং তাহাদেরও পার আছে, যাহারা আদৌ আমল পাইতেছিল না, তাহারা আবার আরও ব্যস্ত। ছিয়াত্তুরে মন্বন্তরের ছেঁড়া পুরাণ নথীর এক প্রস্থ নকল বগলে করিয়া তাদের দৌড়া-দৌড়ি কত! এই কাছারিতে, এখনই বাহিরের পানের দোকানে, তারপর তামাকে এক টান দিয়াই হাকিমের চাপরাসীর কাণে কাণে কথা, আবার আদালতে;—যেন মক্কেলের কাজে আর বেচারীদের হাঁফ ছাড়িবারও ফুরসুতটুকু নাই আদালতের সকলেই ব্যতিব্যস্ত। এমন দৌড়া-দৌড়ি, হুড়াহুড়ি, টানাটানি, কাণাকাণি সনাতন আর কখনও দেখে নাই।

ক্রমে যথাসময়ে হাকিম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আগে আগে বাক্স-ঘাড়ে আর্দ্দালি, পিছনে ছড়ি-হাতে চূড়া-ধড়া-আঁটা হাকিম;—যেন যশোদার নন্দদুলাল পাচনি-হাতে গোষ্ঠে যাইতেছেন। উপস্থিত লোকেরা সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল, হাকিম আসনে বসিলেন; উকীল-মোক্তারেরা উঠিয়া ঘাড় নোয়াইল, হাকিমও প্রত্যভিবাদন করিলেন। আরদালি-দের "চুপ চুপ" শব্দে আদালতের গোল থামিল।

তারপর কাণে-কলম-গোঁজা পেস্কার মহাশয় নথীর তাড়া লইয়া মৎফরক্কা পেস্ করিতে আসিলেন। যাহাদের নিকট হইতে দু-পয়সা পাইয়াছিলেন, অল্প আয়াসেই তাহাদের কাজ হাসিল হইয়া গেল। আর যাহারা দু'পয়সা দিতে একটু "কিন্তু" করিয়াছিল, তাহাদের নথী সংক্রান্ত কাগজ-পত্র 'সিজিল' হয় নাই বলিয়া ফেলিয়া রাখিলেন। বেচারীরা আবার হুগলী আসিতে না হয় বলিয়া চোকে চোকে পেস্কার মহাশয়ের সঙ্গে কথা কহিয়া কাজ নিকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু আজিকার এত গোলে পেস্কার মহাশয় আর বড় তাহাদের দিকে নেক-নজর দিলেন না। একটী নব্য উকীল তাহার মক্কেলকে পেস্কারকে কিছু দিতে মানা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ফলে তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার মক্কেলের নথী আগামী তারিখে পেস্ হইবার হুকুম হইয়া গেল। পেস্কার মহাশয় একটী লিখিত কৈফিয়ৎ দর্শাইয়া কহিলেন, "উহাঁর নথীর কাগজ যে রেজিষ্টারিতে আছে, সে রেজিষ্টারি উই-এ কাটিয়াছে, জীর্ণো-দ্ধার করিতে তিন মাস সময় লাগিবে" সেরেস্তার কথা নব্য উকীল কি জানিবেন,—অগত্যা তাঁহার 'বসিবার আসন ফিরিয়া লইতে' বাধ্য হইলেন এবং তাঁহার মক্কেলের কাজ এক দিনের জায়গায় তিন মাস দেরি পড়িয়া গেল।

তারপর দরখাস্ত লওয়া হইল। ক্রমে

মকদ্দমা ডাক শুরু হইল। অনেক উকীল-মোক্তার দেখিয়া হাকিম আগেই গোবিন্দ ঘোষের মকদ্দমা পেস করিতে বলিলেন। একজন কনষ্টেবল গোবিন্দ ঘোষকে হাজত হইতে আনিয়া কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া দিল।

গোবিন্দ ঘোষ মুখ তুলিয়া চাহেন নাই। তথাপি তাঁহার নিজের অদৃষ্ট ভাবিয়া তাঁহার চক্ষে জলধারা বহিতেছিল। আজ কুচক্রীর কুচক্রে বিনা অপরাধে চোর অপবাদে গোবিন্দ ঘোষ হাকিমের সম্মুখে! 'হা ভগবন্! এর চেয়ে যে গোবিন্দের মৃত্যু ছিল ভাল।' নিরীহ গোবিন্দকে দেখিয়া অশ্রুধারায় অনেকের হৃদয় গলিয়াছিল, তাঁহার সেই প্রবঞ্চনা-শূন্য সরল সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া কাহারও তাঁহাকে চোর বলিয়া বিশ্বাস হইল না। হাকিমের নিজের অভিজ্ঞতা তাঁহাকে বলিয়া দিতেছিল যে, 'গোবিন্দ কখন চুরি করে নাই'; কিন্তু তিনি কি করিবেন? যখন বমাল শুদ্ধ গ্রেপ্তার হইয়া আসিয়াছে, তখন তিনিই বা কিরূপে ছাড়িয়া দেন। তা হোক আদালত শুদ্ধ লোকের সহানুভূতি কিন্তু গোবিন্দ ঘোষের উপর পড়িয়াছিল।

আজ ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীর জেরা হইবার দিন। প্রথম সাক্ষী নীলরতনকে জেরার সময় আংটিটী দেখাইয়া ঠিক সেই আংটিটী তাঁহার চুরি গিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি বলিলেন, হাঁ এই আংটিটীই চুরি গিয়াছে।" তবে আংটিটীর হীরা খানি তাঁহার কেমন কেমন ঠেকিয়াছিল, তাই তিনি একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। তা হউক, শেষে তিনি সেই আংটিটীই চোরাই মাল বলিলেন।

প্রথম সাক্ষীতেই নফরের মুখ শুকাইয়া আসিল।

পরের সাক্ষী পাঁচু সেখ—"অনেকগুলা স্মরণ নাই" শিখিয়া আসিয়াছিল। আসামীর উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"পাঁচু! তুমি কতবার সাক্ষ্য দিয়াছ?"

উ। স্মরণ নাই।

আবার জিজ্ঞাসা হইল, "কতবার জরিমানা দিয়াছ?"

উ। স্মরণ নাই।

এইবার একটু তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া আসামীর উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতবার জেলে গিয়াছ?"

অমনি বাদীর উকীল আগু হইয়া বলিলেন, "হুজুর! আমার সাক্ষী যা জানে, তাই বলিবে। যদি তাহার স্মরণ না থাকে, উকীল মহাশয় না হয় স্মরণ করাইয়া দিন; কিন্তু তাই বলিয়া আমার সাক্ষীকে ধমকাইবার তাঁহার কি অধিকার আছে?"

প্রশ্রয় পাইয়া পাঁচু বলিল, "আমি ত বলিতেছি, আমার স্মরণ নাই; তবে উনি যদি আমার সঙ্গে গিয়া থাকেন, না হয়, স্মরণ করাইয়া দিন।"

আদালত-শুদ্ধ হাসি পড়িয়া গেল। হাকিম পাঁচুকে একটু ধমকাইলেন। তা হোক, আদালতে বিপক্ষের উকীলকে যে অপ্রতিভ করিতে পারিয়াছে এই ভাবিয়া পাঁচু ফুলিয়া উঠিতেছিল। আর বাড়ী গিয়া তাহার জবর সাক্ষী দিবার কথা কেমন করিয়া বুক ফুলাইয়া গুছাইয়া বলিবে, তাহাই ভাবিতেছিল।

তার পর কয়েকটা "বক্কলে সাক্ষী" পাঁচুর মত "স্মরণ নাই" বলিয়া নিস্তার পাইল। পরে সাক্ষী নফরের জেরা আরম্ভ হইল। নীলরতনের হাতে ঠিক সেই আংটিটী দেখাও পরে সেইটী আসামীর স্ত্রীর গহনার বাক্সে পাওয়া যাওয়া সম্বন্ধে বলিতে সাক্ষীর বড় একটা গোল হয় নাই। বাক্সের অধিকারী যে আসামী এবং তাহারই কাছে যে বাক্সের চাবিকাটী থাকে,

সে কথাও সাক্ষী ঠিক বলিয়াছিল। তবে তিনকড়ির সঙ্গে তাহার পরামর্শের কথা জিজ্ঞাসার সময় সাক্ষী বড়ই গোল করিতে লাগিল। সে আমৃতা আমৃতা করিয়া প্রথমে বলিল যে, তিনকড়িকে চেনে না, পরে বলিল, হাঁ চেনে বটে, তবে ঠিক চেনে না। একবার বলিল, সে তিনকড়ির বাড়ী যায় নাই, আবার বলিল, হাঁ, কেবল একদিন মাত্র গিয়াছে। তাহার কথায় হাকিমের মনে একটা খট্‌কা রহিয়া গেল।

তার পর যে সেকরা নীলরতনের আংটী গড়িয়াছিল, তাহার জবানবন্দী হইল। তাহাকে আংটী দেখান হইলে সে চোকে চশমা আঁটিয়া একবার ডান হাতে একবার বাম হাতে করিয়া আন্দাজে আংটিটী ওজন করিয়া একবার আলোর দিকে মুখ ফিরিয়া আংটির হীরাটী দেখিয়া একবার নিচুদিকে মুখ করিয়া আংটিটী দেখিয়া ছাপ্পান্নরকম মুখভঙ্গী এবং ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া শেষে বলিল, "হুজুর, আংটিটী আমার তৈয়ারি বটে, তবে কে যেন হীরাখানি বদলাইয়াছে।" তখন আবেগে পিছন হইতে নফর বলিয়া উঠিল, "না—কেহ বদলায় নাই, হীরা যেমন ছিল, তেমনই আছে।" নফরের দিকে সকলের নজর পড়িল, নফর কাঁপিতেছিল হাকিম তাহাকে সম্মুখে রাখিতে বলিলেন তার পর সাক্ষী সেকরা আঙ্গুল দিয়া হীরার বাঁধন একটু খুঁটিয়া নাড়িলে হীরাখানি পড়িয়া গেল। তখন সে বলিল, "হুজুর! হীরাখানি নিশ্চয়ই কেহ বদলাইয়াছে। আমি যে হীরাখানি বসাইয়াছিলাম, কাহার সাধ্য, আঙ্গুল দিয়া খুঁটিয়া তাহাকে বাহির করে? আর এ যে দেখিতেছি, আসল হীরাখানি খুলিয়া লইয়া কে নকল হীরা বসাইয়া দিয়াছে! তবে তাড়াতাড়িতে বসাইবার সময় পায় নাই বলিয়া যেমন-তেমন করিয়া আঁটিয়া দিয়াছে।"

আদালত-শুদ্ধ লোক কাণাকাণি করিতেছিল, "এ কাজ নফরা ছাড়া আর কাহারও নহে।"

তখন গতিক দেখিয়া ফরিয়াদীর উকীল দাঁড়াইয়া বলিল, "হুজুর! আপনাদের সন্দেহ অমূলক। আমার মক্কেল যখন বলিতেছেন যে, এই আংটি তাঁহার চুরি গিয়াছিল, তখন আপনাদের সন্দেহের কোন কারণ নাই; তবে যখন অনেক সাক্ষীই বলিতেছে যে, আংটির রূপান্তর হইয়াছে, তাহাতেই বা কি? আসামী যেরূপ চতুর দেখিতেছি, তাহাতে সে দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য নিজেই আংটির হীরা বদল করিয়া রাখিয়াছিল। আর আংটির ফ্রেম যে বাদীর, তাহা ত প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আসামীর কোন মতে অব্যাহতি হইতে পারে না। অনেকে দেখিতেছি, আমার সাক্ষী নফরকে সন্দেহ করিতেছে; কিন্তু এ সন্দেহও অমূলক। সাক্ষী পাড়াগেঁয়ে লোক, কখন আদালতে আসে নাই; এখানে আসিলে সহজেই লোকের বুদ্ধিভ্রম হয়, তা জেরায় যে তাহার মত সরল সাক্ষীর বুদ্ধিলোপ হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?"

তার পর উকীল বাবু আদালতকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার বাগ্মিতার স্রোত ছুটাইয়া দিলেন। সে স্রোত, সে হাত নাড়া, সে মুখনাড়া দেখে কে? উকীলবাবু বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার! আসামী বড়ই চতুর। সে ভীষণ প্রবঞ্চক, দস্যু, চোর, ডাকাত, তাহাকে পুলি-পোলাও না পাঠাইলে সমাজের আর নিস্তার নাই; সুতরাং ধর্ম্মেরও রক্ষা নাই। যে এমন বহুমূল্য আংটি দিন দুপুরে চুরি করিতে পারে, সে অনায়াসেই লোকের গলায় ছুরি দিতেও পারে। সুতরাং এমন খুনী আসামীর পুলিপোলাওই প্রকৃতস্থান। আর আসামী দিন দুপ্রহরেই চুরি করিয়াছিল, তা নহিলে

আংটি তাহার বাক্সে কেমন করিয়া গেল!” ইত্যাদি ইত্যাদি।

হাকিম এই বক্তৃতা শুনিয়া মনে মনে কি ভাবিতেছিলেন, জানি না; কিন্তু সনাতনের গা কস্ কস্ করিতেছিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, একবার উঠিয়া, উকীল বাবুর মুখ লইয়া কাছারির নূতন বালি ধরানো দেয়ালে ঘসিয়া দেয়।

বক্তৃতার স্রোত কমিলে হাকিম দেখিলেন যে, যদিই স্বীকার করা যায় যে, আংটির রূপান্তর হইয়াছে, তথাপি তাহা যে, নফর কর্ত্তৃক হইয়াছে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। আর অন্য কেহ যে আসামীর বাক্সে এ আংটিটী রাখিয়াছিল, তাহারই বা প্রমাণ কি? হাকিম কি করিবেন, ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। কেবল বসিয়া বসিয়া তাঁহার কলমের মাথা চিবাইতেছিলেন।

এমন সময় কাছারির সম্মুখ হইতে বড় একটা গোল উঠিল। হাকিম শুদ্ধ সকলেরই নজর সেই দিকে পড়িল। তাহারা দেখিল, তিনকড়িকে বাঁধিয়া দারোগা টানিয়া লইয়া আসিতেছে। পিছনে পিছনে মুকুয্যে মশাই গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া আসিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে দারোগা তিনকড়িকে লইয়া আদালতের সম্মুখে হাজির করিল। পরে পা দুখানি গোটো করিয়া দাঁড়াইয়া উল্টাহাতে হাকিমকে সেলাম করিয়া বলিল, “হুজুর! তিনকড়ি সেকরাকে আপনার অজানা নাই। অনেকবার সে জেল খাটিয়াছে, সম্প্রতি আবার নফরের সঙ্গে সে নীলরতনের আংটির বহুমূল্য হীরা চুরি করিয়াছিল। গোপাল মুকুয্যের সংবাদ-ক্রমে আমি তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছি, আর তাহার বাড়ী খানা তল্লাসে এই হীরাখানি বাহির হইয়াছে।” বলিয়া হীরাখানি আদালতের সম্মুখে ধরিল।

সেই মুহূর্ত্তে হীরাখানি দেখিতে আদালত শুদ্ধ লোক মুখ বাড়াইল। গোবিন্দ ঘোষ খালাস পাইবে বলিয়া রায়পুরের লোকেরা একটা অস্ফুট আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। বাদীর উকীল পূর্ব্ব হইতে ঘামিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এখন রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতে লাগিলেন। সনাতন মনের আবেগে “হরিবোল” বলিয়া উঠিল; তাহাকে থামাইতে আর পঞ্চাশ জন চুপ-চুপ করিয়া উঠিল। এক মুহূর্ত্তে আদালতে একটা হৈ হৈ পড়িয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

গোলমাল একটু থামিলে পর হাকিম নফরকে সম্মুখে ডাকাইয়া সব জিজ্ঞাসা করিলেন, নফর অধোবদনে আনুপুর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন করিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করিল। কেমন করিয়া সে লোভে পড়িয়া লীলা ও তাহার ঠাকুরমাকে পথ ভুলাইয়া লইয়া গিয়া লীলা-চুরির সাহায্য করিয়াছিল, কেমন করিয়া তার পর নীলরতনের কথায় তাঁহার আংটিটী লইয়া গোবিন্দ ঘোষের বাক্সে রাখিতে স্বীকৃত হইয়াছিল, তার পর কেমন করিয়া অতিলোভে পড়িয়া তিনকড়ির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আংটির হীরাটী খুলিয়া লইয়া নকল হীরা বসাইয়াছিল, কেমন করিয়া সুযোগ পাইয়া গোবিন্দের বাক্সে আংটি রাখিয়াছিল, কোন কথাই গোপন রাখিল না। সঙ্গে সঙ্গে কেমন করিয়া তিনকড়ি হীরা খানি লইয়া নফরকে ফাঁকি দিয়াছিল, সে কথাটীও বলিয়া ফেলিল। তার পর হাকিম তিনকড়িকে জিজ্ঞাসা করিলে সেও নিজের অপরাধ স্বীকার করিল। অবিলম্বে গোবিন্দ ঘোষ খালাস পাইলেন; আর নফর ও তিনকড়িকে তাঁহার জায়গায় দাঁড় করাইতে হুকুম হইল।

একটা কালান্তক যমদূতের মত পশ্চিমে কনষ্টেবল নফরকে হিচ্‌ড়িয়া টানিয়া কাঠগড়ায় লইয়া যাইতেছিল, এমন সময় নফর হঠাৎ তাহার হাত ছাড়াইয়া দৌড়িয়া গিয়া যেখানে গোবিন্দ ঘোষ দাঁড়াইয়াছিল, সেখানে উপস্থিত হইল। পরে ধূলায় শুইয়া পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া দুই হাতে গোবিন্দের পা-দুখানি ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "প্রভু, পিতা, আজ আদালত সাক্ষী; লোভে পড়িয়া যে পাপ করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই! বুঝি নরকেও এ পাপীর স্থান হইবে না, যেদিন হইতে আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছি, সেই দিন হইতেই যে কি তুষানলে পুড়িতেছি, কি বলিব! আর সহ্য হয় না, এখনই আমায় জেলে পুরুন; কিন্তু আমার স্ত্রী-পুত্র——"

নফর আর বলিতে পারিল না, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল, সে দৃশ্যে, সে পাপীর সে অনুতাপে আদালত শুদ্ধ লোক স্তম্ভিত হইল, পশ্চিমে কনষ্টেবলেরও নফরকে উঠাইতে হাত উঠিতেছিল না।

এদিকে সহৃদয় গোবিন্দ ঘোষের বুক—দুটী চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেছিল। তখন সেই রোরুদ্যমান গোবিন্দ ঘোষ দুই হাতে নফরকে ধরিয়া তুলিয়া বলিতে লাগিলেন, "আয় নফর! আয়, তোকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করি। না বুঝিয়া যে কাজ করিয়াছিস্, তাহার জন্য আর দুঃখ করিতে হইবে না। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না। আমার অদৃষ্টের ভোগ ছিল, কাটিয়া গিয়াছে! আয়, চল্, দুজনে গৃহে যাই। আবার যেমন ছিলাম, তেমনি করিয়া সময় কাটিবে।" গোবিন্দ ঘোষ নফরকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

"আহা এমন লোকেরও এমন হয় গা!" বলিয়া আদালত শুদ্ধ লোক চোক মুছিতেছিল। হাকিমও রুমালে চক্ষু মুছিতেছিলেন। বাদীর উকীলেরও মনটা কেমন-কেমন হইয়া আসিতেছিল।

সনাতন এতক্ষণ কোণে বসিয়া বসিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল, আর তাহার সহ্য হইল না। দু'পাশের লোকগুলিকে দু'হাতে ঠেলিয়া দিয়া দৌড়িয়া আসিয়া গোবিন্দ ঘোষের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল, "আর কাজ নাই ঘোষজা মশাই! ও হতভাগাকে ছাড়িয়া দিন, ওর মুখ দেখিলেও পাপ আছে। চলুন, ঘরে চলুন। মা অনশনে আছেন, আপনি না গেলে মুখে জলদিবেন না।" সনাতন গোবিন্দ ঘোষকে টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু গোবিন্দ ঘোষ নফরকে ছাড়িলেন না। সনাতনও গোবিন্দকে ছাড়াইয়া লইতে ব্যস্ত।

সনাতনকে আর টানিতে হইল না, সেই পশ্চিমে কনষ্টেবল কোন মতে চক্ষু মুছিয়া বলিয়া উঠিল, "আরে তুঁ কোন্ হায়! হামারা মুদানা ছোড় দেও।" সনাতন থতমত খাইয়া গেল, গোবিন্দ ঘোষ নফরের হাত ছাড়িয়া দিলেন, হাকিম গোলযোগ দেখিয়া সেদিনের মত মকদ্দমা মুলতুবি রাখিলেন। তিনকড়ি ও নফরের হাজতের হুকুম হইল, গোবিন্দ ঘোষের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে নফরের মূর্ত্তি কাছারির ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

তার পর ক্রমে আবার আদালতের কার্য্য আরম্ভ হইলে, অমূল্যকুমারের মকদ্দমা ডাক হইল, তাহাতে আর কারণ দর্শাইতে হইল না; অমনিই মকদ্দমা খারিজ হইয়া গেল। তখনই নীলরতনের খোঁজ পড়িল, গোলযোগের সূত্রপাতেই নীলরতন অদৃশ্য হইয়াছিলেন। অনেক সন্ধান করিয়াও তাঁহার দেখা পাওয়া গেল না। ক্রমশঃ।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র সেন।

অনুতাপ।

বিবিধ বিধানে করি আশা আরাধন,
তবু তার ভ্রম তব গেল না কি মন ?
এ কেমন ঘটাইলে দায় ;—
সুখ-শান্তি বলি দিয়া বিষয় আবেশে,
ফিরিলে ভুবনময় ভিখারীর বেশে,
অবশেষে কি হবে উপায় ?
কামনার দাস হয়ে ছিছি অনুক্ষণ,
কভু বা কামিনী কভু কাঞ্চন কারণ,
এ জীবন বিলাইলে কত ;—
অলীক আলোক আশে ক্ষণিকের তরে,
আপনার গৃহে অগ্নি দিলে নিজ করে,
কি করিলে অবোধের মত ?
আপন অভাব ভাল স্বজিয়া আপনি,
পালিলে যতনে হৃদে তায় কাল-ফণি।
নাহি গণি বিষের সঞ্চার ;
রতনের লোভে হায় উন্মত্ত অন্তরে
না বুঝিয়া নিজ-বল ডুবিলে সাগরে ;—
কেবা করে প্রতীকার তার ?
বর্দ্ধিত প্রবৃত্তি-শিখা কে করে নির্ব্বাণ,
পালিলে আহুতি সদা দিয়া তার প্রাণ
পরিত্রাণ পাইবে কোথায় ?
সহায় সম্বল ছিল যা কিছু তোমার,
পদে পদে ভ্রান্ত তুমি—রাখিলে কি তার ;
অনিবার অনিত্য আশায় !

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত।

জন্মপত্রিকা-প্রস্তুত-প্রণালী।

২। পতাকীচক্র।

পতাকীরিষ্টি গণনা করিতে হইলে জাতকের জন্মদণ্ডাধিপতি ও জন্মযামার্দ্ধাধিপতি জানিতে হয়। আমরা প্রথমে তাহা কিরূপে স্থির করিতে হয়, তাহাই বলিয়া লইব।

যামার্দ্ধাধিপতি। দিবামানকে ৮ ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগকে দিবা-যামার্দ্ধ বলে, ঐরূপ রাত্রিমানকে ৮ ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগকে রাত্রি-যামার্দ্ধ বলে। সর্ব্বপ্রথমে এই মান স্থির করিতে হইবে।

জাতক, দিবার কোন্ যামার্দ্ধে অর্থাৎ কোন্ অষ্টমভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা স্থির করিয়া, তাহার অধিপতি গ্রহ কে, তাহা নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টে স্থির করিতে হইবে। পরে সেই অধিপতি গ্রহের যামার্দ্ধে জন্ম এইরূপ লিখিতে হইবে। এই যামার্দ্ধাধিপতি যেমন দিবায় একরূপ, রাত্রিতে অন্যরূপ, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বারেও ভিন্ন ভিন্নরূপ হইয়া থাকে। তালিকাদৃষ্টে তাহা প্রতীয়মান হইবে।

দিবার যামার্দ্ধাধিপতি।

বার	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম
রবিবার	র	শু	বু	চ	শ	বৃ	ম	র
সোমবার	চ	শ	বৃ	ম	র	শু	বু	চ
মঙ্গলবার	ম	র	শু	বু	চ	শ	বৃ	ম
বুধবার	বু	চ	শ	বৃ	ম	র	শু	বু
বৃহস্পতিবার	বৃ	ম	র	শু	বু	চ	শ	বৃ
শুক্রবার	শু	বু	চ	শ	বৃ	ম	র	শু
শনিবার	শ	বৃ	ম	র	শু	বু	চ	শ

রাত্রির যামার্দ্ধাধিপতি।

বার	১ম	২য়	৩য়	৪র্থ	৫ম	৬ষ্ঠ	৭ম	৮ম
রবি	র	বৃ	চ	শু	ম	শ	বু	র
সোম	চ	শু	ম	শ	বু	র	বৃ	চ
মঙ্গল	ম	শ	বু	র	বৃ	চ	শু	ম
বুধ	বু	র	বৃ	চ	শু	ম	শ	বু
বৃহস্পতি	বৃ	চ	শু	ম	শ	বু	র	বৃ
শুক্র	শু	ম	শ	বু	র	বৃ	চ	শু
শনি	শ	বু	র	বৃ	চ	শু	ম	শ

দণ্ডাধিপতি। যামার্দ্ধের (দিবার কিংবা রাত্রির যাহার হউক) চারিভাগের একভাগকে দণ্ড কহে। দণ্ডমানও নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। জাতক যামার্দ্ধের কোন্ দণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা স্থির করিয়া পরে তাহার অধিপতি নিম্নতালিকা দৃষ্টে গ্রহণ করিতে হইবে। যামার্দ্ধের ন্যায় দণ্ডও দিবা রাত্রি ও বারভেদে

বিভিন্ন প্রকার। তাহার তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

দিবার দণ্ডাধিপতি।

বার	১ম দণ্ডের	২য় দণ্ডের	৩য় দণ্ডের	৪র্থ দণ্ডের
রবি	র	রা	বু	চ
সোম	চ	র	রা	বু
মঙ্গল	ম	র	রা	বু
বুধ	বু	চ	র	রা
বৃহস্পতি	বৃ	চ	র	রা
শুক্র	শু	ম	র	রা
শনি	শ	ম	র	রা

"রা" অর্থ রাহু।

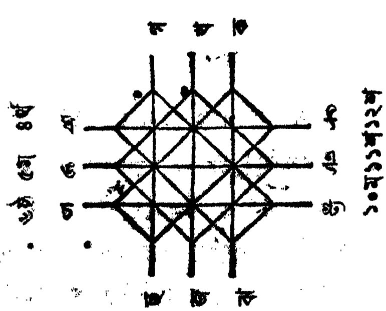
রাত্রির দণ্ডাধিপতি।

বার	১ম দণ্ডের	২য় দণ্ডের	৩য় দণ্ডের	৪র্থ দণ্ডের
রবি	র	শু	বু	চ
সোম	চ	শ	বৃ	ম
মঙ্গল	ম	র	শু	বু
বুধ	বু	চ	শ	বৃ
বৃহস্পতি	বৃ	ম	র	শু
শুক্র	শু	বু	চ	শ
শনি	শ	বৃ	ম	র

এইরূপে যামার্দ্ধ ও দণ্ড স্থির করিয়া তাহাদের অধিপতি গ্রহের নাম লিখিতে হইবে।

পতাকী রেখা এইরূপ।

৩য় ২য় ১ম



৭ম ৮ম ৯ম

অঙ্কন-প্রণালী প্রথমে পূর্ব্বানুরূপ "১—৯," "২—৮," "৩—৭" রেখা অঙ্কিত করিবে। পরে "৪—১২," "৫—১১," "৬—১০", রেখা তাহাদের উপর লম্বভাবে টানিবে।

ঐ সকল রেখায় ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ বিন্দু গ্রহণ কর (ঐ সকল নামকরণ কেবলমাত্র পাঠকবর্গকে বুঝাইতে, নতুবা চক্রে তাহা থাকিবে না)।

পরে গঘ, খঙ, কচ, চছ, ঙজ, ছঝ, ঝঞ, জট ও ছঠ বিন্দু যোগ কর। তাহা হইলেই কার্য্য হইল। রেখাগুলি সমান্তরাল ভাবে টানিলে সুন্দর দেখায়। যদি বৃত্তমধ্যে ঐরূপ অঙ্কিত কর—তাহা হইলে বোধ হয়, আরও একটু সুন্দর দেখায়।

এইরূপে অঙ্কিত করিয়া উহাতে নিম্নলিখিত রূপ অঙ্ক বসাইতে হইবে। যথা,—১মের পার্শ্বে ১৭, ২য়ের ১৭, ৩য়ের ৩৯, ৪র্থের ৫, ৫মের ৮, ৬ষ্ঠের ২, ৭মের ২০, ৮মের ৬, ৯মের ১০, ১০মের ১৪, ১১শের ৩, ১২শের পার্শ্বে ৪ এই অঙ্ক বসাইতে হয়। কোন কোন মতে ১ম ২য় ও ৩য় রেখার পার্শ্বে কিছুই স্থাপিত করিতে হয় না।

এইরূপে অঙ্কস্থাপনা করিয়া উহাতে গ্রহ-সংস্থান ও লগ্নসংস্থান করিতে হয়। ১ম রেখাকে মেষরাশি, ২য় রেখাকে বৃষরাশি এই-রূপ রাশিজ্ঞানে উহাতে গ্রহসংস্থান করিতে হইবে। তাহা হইলেই পতাকী অঙ্কিত হইল।

এখন উদাহরণ দ্বারা ইহা দেখাইয়া দিতেছি। পূর্ব্বোক্ত শিশুর জন্ম দিবায়। সেই দিবসের দিনমান ৩৩।৬ পল। ৩৩।৬÷৮=৪ দণ্ড ৮ পল ১৫ বিপল হইল যামার্দ্ধমান। শিশুর জন্ম হইল ১৫দণ্ড ২ পল ৩০ বিপল কালে।

৪। ৮। ১৫ ১ম যামার্দ্ধমান।

৪। ৮। ১৫ ২য় যামার্দ্ধমান।

৪। ৮। ১৫ ৩য় যামার্দ্ধমান।

১২। ২৪। ৪৫=৩য় যামার্দ্ধ যে পর্য্যন্ত দিন।

৪। ৮। ১৫ "

১৬। ৩৩। ০=৪র্থ যামার্দ্ধ যে পর্য্যন্ত দিন।

৪র্থ যামার্দ্ধে জাতকের জন্ম হইয়াছে।

৪।৮।১৫ বিপল ৪=১।২।৩।৪৫ অনুপল=দণ্ডমান।

৩য় যামার্দ্ধের শেষ— ১২। ২৪। ৪৫
১। ২। ৩। ৪৫

৪র্থ যামার্দ্ধের ১ম দণ্ড ১৩। ২৬। ৪৮। ৪৫
১। ২। ৩। ৪৫

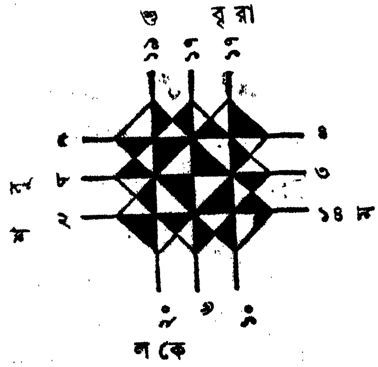
৪র্থ যামার্দ্ধের ২য় দণ্ড ১৪। ২৮। ৫২। ৩০
১। ২। ৩। ৪৫

৪র্থ যামার্দ্ধের ৩য় দণ্ড ১৫। ৩০। ৫৬। ১৫

পূর্ব্বোক্ত শিশু ৪র্থ যামার্দ্ধের ৩য় দণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ঐ দিন রবিবার।

চন্দ্রের যামার্দ্ধে বুধের দণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

উহার পতাকা এইরূপে লিখিত হইবে।



অর্থাৎ বৃ ও রাকে মেষরাশিতে, শুক্রকে মিথুনে, ম ও চকে কর্কটে, বুধকে সিংহে, শনিকে কন্যায়, লগ্ন ও কেতুকে তুলায়, যকে মকরে স্থাপিত করা হইল।

৩। ষড়্‌বর্গ।

ষড়্‌বর্গ অর্থ রাশির ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেকাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ। জন্মপত্রিকায় যে রাশিতে লগ্ন থাকিবেন, তাহার ষড়্‌বর্গ স্থির করিয়া তাহাদের অধিপতির নাম লিখিতে হইবে। আমরা তাহা যথাক্রমে নিম্নে লিখিতেছি।

ক্ষেত্র। লগ্ন যে রাশিতে আছেন, তাহা স্থির করিয়া, তাহার অধিপতি গ্রহ স্থির করিতে হইবে। ঐ রাশিকে সেই অধিপতি গ্রহের ক্ষেত্র বলে। (অন্যান্য গ্রহগণও যে যে রাশিতে থাকেন, তাহারও ষড়্‌বর্গ সূক্ষ্মগণনার আবশ্যক, কিন্তু আমরা এ স্থলে তাহার উল্লেখ করিলাম না)। ক্ষেত্র এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যথা,—

মেষ—মঙ্গলের ক্ষেত্র। বৃষ—শুক্রের ক্ষেত্র।
মিথুন—বুধের ক্ষেত্র। কর্কট—চন্দ্রের ক্ষেত্র।
সিংহ—রবির ক্ষেত্র। কন্যা—বুধের ক্ষেত্র।
তুলা—শুক্রের ক্ষেত্র। বৃশ্চিক—মঙ্গলের ক্ষেত্র।
ধনু—বৃহস্পতির ক্ষেত্র। মকর—শনির ক্ষেত্র।
কুম্ভ—শনির ক্ষেত্র। মীন—বৃহস্পতির ক্ষেত্র।

পূর্ব্বোক্ত বালক তুলারাশিতে জন্মিয়াছে, অতএব সে শুক্রের ক্ষেত্রে জন্মিয়াছে। এইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে জন্মিলেও তদধিপতি গ্রহের ক্ষেত্রে জন্মিয়াছে লিখিতে হইবে।

হোরা। রাশিকে ২ ভাগ করিলে তাহার প্রথম ভাগকে ১ম হোরা ও ২য় ভাগকে ২য় হোরা বলে। সুতরাং রাশির ১ হইতে ১৫ অংশ পর্য্যন্ত ১ম হোরা ও তাহার পর হইতে ত্রিংশ পর্য্যন্ত ২য় হোরা। বিভিন্ন রাশির এই হোরা নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে।

রাশিগণের নাম	১ম হোরা অর্থাৎ ১৫ অংশ পর্য্যন্তের অধিপতির নাম।	২য়হোরা অর্থাৎ ১৫অংশের পর ৩০অংশ পর্য্যন্ত অধিপতির নাম
মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু, কুম্ভ,	রবি	চন্দ্র
বৃষ, কর্কট, কন্যা, বিছা, মকর, মীন,	চন্দ্র	রবি

পূর্ব্বে যে লগ্নস্ফুট-প্রক্রিয়া লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা লগ্নস্ফুট করিয়া রাশির কোন্ অংশে বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা আমরা জানিতে পারি। পরে এই তালিকা দৃষ্টে হোরাধিপতি নির্দ্দেশ করিতে পারি।

যথা পূর্ব্বোক্ত শিশুর জন্মলগ্ন তুলা—তাহার স্ফুট ৫।৫১।৩৭ কলা। সুতরাং সে তুলার ১৫ অংশ মধ্যে জাত হওয়া নিবন্ধন রবির হোরায় জন্মিয়াছে। এইরূপ অন্য লগ্নে জন্মগ্রহণ করিলেও এই তালিকা দৃষ্টে সে কাহার অর্থাৎ কোন্ গ্রহের হোরায় জন্মিয়াছে, তাহা জানিতে পারা যায়। সে হোরার যে অধিপতি, তাহাকে সেই গ্রহের হোরা বলা হইয়া থাকে। যথা—রবির হোরা, চন্দ্রের হোরা।

দ্রেক্কাণ। রাশিদিগের তিন ভাগের এক ভাগের নাম দ্রেক্কাণ। সকল রাশিই ৩০ অংশে বিভক্ত। সুতরাং রাশির ১ অংশের আরম্ভ হইতে ১০ অংশের শেষ পর্য্যন্ত ১ম দ্রেক্কাণ; ১১ অংশের আরম্ভ হইতে, ২০ অংশের শেষ পর্য্যন্ত ২য় দ্রেক্কাণ ও ২১ অংশের আরম্ভ হইতে ৩০ অংশের শেষ পর্য্যন্ত ৩য় দ্রেক্কাণ। হোরার ন্যায় ইহারও অধিপতি নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহার ন্যায় যে দ্রেক্কাণের যে অধিপতি সেই দ্রেক্কাণকে সেই অধিপতির দ্রেক্কাণ বলা হইয়া থাকে।

বিভিন্ন রাশির বিভিন্ন দ্রেক্কাণের অধিপতি এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে।

রাশির নাম	১ম দ্রেক্কাণ অর্থাৎ ১অংশের আরম্ভ হইতে ১০অংশের শেষপর্য্যন্তের অধিপতি গ্রহের নাম	২য় দ্রেক্কাণ অর্থাৎ ১১অংশের আরম্ভ হইতে ২০অংশের শেষপর্য্যন্তের অধিপতি গ্রহের নাম	৩য় দ্রেক্কাণ অর্থাৎ ২১অংশের আরম্ভ হইতে ৩০অংশের শেষপর্য্যন্তের অধিপতি গ্রহের নাম।
মেষ	মঙ্গল	রবি	বৃহস্পতি
বৃষ	শুক্র	বুধ	শনি
মিথুন	বুধ	শুক্র	শনি
কর্কট	চন্দ্র	মঙ্গল	বৃহস্পতি
সিংহ	রবি	বৃহস্পতি	মঙ্গল
কন্যা	বুধ	শনি	শুক্র
তুলা	শুক্র	শনি	বুধ
বিছা	মঙ্গল	বৃহস্পতি	চন্দ্র
ধনু	বৃহস্পতি	মঙ্গল	রবি
মকর	শনি	শুক্র	বুধ
কুম্ভ	শনি	বুধ	শুক্র
মীন	বৃহস্পতি	চন্দ্র	মঙ্গল

পূর্ব্বোক্ত বালক তুলার ৫।৫১।৩৭ বিকলায় জাত হওয়াতে সে ১ম অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সে শুক্রের দ্রেক্কাণে জন্মিয়াছে। এইরূপ অন্যত্রও করিতে হইবে।

নবাংশ। যেরূপ রাশির তিন ভাগের এক ভাগকে দ্রেক্কাণ বলে, সেইরূপ তাহার নয় ভাগের এক ভাগকে নবাংশ বলে। তাহার অধিপতির তালিকা এইরূপ।

রাশির নাম	১ম নবাংশ অর্থাৎ রাশির ৩য় অংশ ২০ কলা পর্য্যন্তের অধিপতি গ্রহের নাম	২য় নবাংশ অর্থাৎ ৬ষ্ঠ অংশ ৪০কলা পর্য্যন্তের অধিপতি গ্রহের নাম	* ৩য় নবাংশ ১০।০	৪র্থ নবাংশ ১৩।২০	৫ম নবাংশ ১৬।৪০	৬ষ্ঠ নবাংশ ২০।০	৭ম নবাংশ ২৩।২০	৮ম নবাংশ ২৬।৪০	৯ম নবাংশ ৩০।০
মেষ, সিংহ, ধনু	মঙ্গল	শু	বু	চ	র	বু	শু	ম	বৃ
মকর, বৃষ, কন্যা	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চ	র	বু
তুলা, কুম্ভ, মিথুন	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু
কর্কট, বিছা, ধনু	চ	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ

পূর্ব্বোক্ত বালক তুলার ৫।৫১।৩৭ বিকলায় জন্মগ্রহণ করাতে ২য় নবাংশে ∴ মঙ্গলের নবাংশে জন্মিয়াছে।

দ্বাদশাংশ। রাশির বার ভাগের এক ভাগকে দ্বাদশাংশ বলে। পূর্ব্বোক্ত দ্রেক্কাণাদির ন্যায় ইহারও অধিপতিতালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

† রাশির নাম।	১ম ২।৩০	২য় ৫।০	৩য় ৭।৩০	৪র্থ ১০।০	৫ম ১২।৩০	৬ষ্ঠ ১৫।০	৭ম ১৭।৩০	৮ম ২০।০	৯ম ২২।৩০	১০ম ২৫।০	১১শ ২৭।৩০	১২শ ৩০।০
মেষ	ম	শু	বু	চ	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ
বৃষ	শু	বু	চ	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম
মিথুন	বু	চ	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু
কর্কট	চ	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু
সিংহ	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চ
কন্যা	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চ	র
তুলা	শু	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চ	র	বু
বিছা	ম	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বৃ	চ	র	বু	শু
ধনু	বৃ	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চ	র	বু	শু	ম
মকর	শ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চ	র	বু	শু	ম	বৃ
কুম্ভ	শ	বৃ	ম	শু	বু	চ	র	বু	শু	ম	বৃ	শ
মীন	বৃ	ম	শু	বু	চ	র	বু	শু	ম	বৃ	শ	শ

উদাহরণ—পূর্ব্বোক্ত শিশু তুলার ৫।৫১।৩৭ বিকলায় জাত হওয়াতে বৃহস্পতির দ্বাদশাংশে জন্মিয়াছে।

---

* স্থানের অভাব হওয়াতে ইহা সংক্ষেপে লিখিত হইল। ইহার অর্থ পূর্ব্বের ন্যায় এই স্তম্ভে ২য় নবাংশের পরে ১০ম অংশ পর্য্যন্ত গ্রহের অধিপতির নাম লিখিত হইল। অন্যত্রও এইরূপ। গ্রহগণের নামেরও আদ্যক্ষর মাত্র দেওয়া হইল। যথা—র-রবি, চ-চন্দ্র ইত্যাদি।

† ১ম এই স্তম্ভে ১ম দ্বাদশাংশ অর্থাৎ ২য় অংশ ত্রিংশ কলাপর্য্যন্তের অধিপতি গ্রহের নাম লিখিত হইল।
২য় এই স্তম্ভে ২য় দ্বাদশাংশ অর্থাৎ ২য় অংশ ত্রিংশ কলার শেষ হইতে পঞ্চম অংশ পর্য্যন্তের অধিপতি গ্রহের নাম লিখিত হইয়াছে।
এইরূপ অন্যান্য স্তম্ভেরও অর্থ বুঝিতে হইবে।

ত্রিংশাংশ। রাশির ৩০ ভাগের ১ ভাগকে ত্রিংশাংশ কহে। ত্রিংশাংশের অধিপতি গ্রহের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

রাশি	১ম হইতে ৫ম ত্রিংশাংশ অর্থাৎ ৫ম অংশ পর্য্যন্ত	৬ষ্ঠ হইতে ১০ম ত্রিংশাংশ অর্থাৎ পরের	১১শ হইতে ১৮শ ত্রিংশাংশ	১৯শ হইতে ২৫শ ত্রিংশাংশ	২৬শ হইতে ৩০শ ত্রিংশাংশ
মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু, কুম্ভ	মঙ্গল	শনি	বৃহস্পতি	বুধ	শুক্র
আর	১ম—৫ম	৬ষ্ঠ—১২শ	১৩শ—২০শ	২১শ—২৫শ	২৬শ—৩০শ
বৃষ, কর্কট, কন্যা, বিছা, মকর ও মীনের	শু	বু	বৃ	শ	ম

পূর্ব্বোক্ত তালিকাগুলি বুঝিতে পারিলেই ইহাও পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন।

পূর্ব্বোক্ত শিশুর তুলার ৫।৫১।৩৭ বিকলায় জন্ম হওয়াতে শনির ত্রিংশাংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। অতএব উক্ত শিশু শুক্রের ক্ষেত্রে, রবির হোরায়, শুক্রের দ্রেক্কাণে, মঙ্গলের নবাংশে, বৃহস্পতির দ্বাদশাংশে, শনির ত্রিংশাংশে জন্মিয়াছে। ষড়বর্গ এইরূপে লিখিতে হয়।

এইরূপে ষড়বর্গ স্থির করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে লিখিত হইবে ইহার আর একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

যাহার লগ্নস্ফুটরাশ্যাদি ৭।১৫।২৭।৩ অর্থাৎ বিছার ১৫।২৭।৩ বিকলা; সে শুক্রের ক্ষেত্রে, রবির হোরায় (কারণ ১৫ অংশ অতিক্রম করিয়াছে), বৃহস্পতির দ্রেক্কাণে, মঙ্গলের নবাংশে, শুক্রের দ্বাদশাংশে ও বৃহস্পতির ত্রিংশাংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

৪। জন্মরাশি ও বর্ণ।

জন্মরাশি। জন্মকালে চন্দ্র যে রাশিতে থাকে, তাহাকে জন্মরাশি বলে। যথা—পূর্ব্বোক্ত শিশুর জন্মরাশি কর্কট।

বর্ণ। যাহার জন্মরাশি মীন, কর্কট বা বৃশ্চিক, তাহাকে বিপ্রবর্ণ; যাহার জন্মরাশি মেষ, সিংহ বা ধনু, তাহাকে ক্ষত্রিয়বর্ণ; যাহার জন্মরাশি বৃষ, কন্যা বা মকর, তাহাকে বৈশ্যবর্ণ ও যাহার জন্মরাশি মিথুন, তুলা বা কুম্ভ, তাহাকে শূদ্রবর্ণ বলে।০ঃ পূর্ব্বোক্ত শিশুর বিপ্রবর্ণ বটে।

৫ম। দশা—গণ

দশা। দশা বহুবিধ, তন্মধ্যে নাক্ষত্রিকী দশাই পাঠকবর্গ এখন অভ্যাস করুন। তাহাই সাধারণতঃ জন্মপত্রিকায় লিখিত থাকে।

এই দশাও দ্বিবিধ। অষ্টোত্তরীয় ও বিংশোত্তরীয়। অষ্টোত্তরীয় দশায় রব্যাদি সমস্ত গ্রহের ও রাহুর দশা গণিত হইয়া থাকে, তাহার সমষ্টি ১০৮। বিংশোত্তরীয় দশায় উহা ব্যতীত কেতুর দশাও গণিত হইয়া থাকে, তাহার সমষ্টি ১২০। নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টে দশা নিরূপণ করিবেন।

অষ্টোত্তরীয় দশার তালিকা।

যাহার নিম্নলিখিত নক্ষত্রে জন্ম	তাহার নিম্ন লিখিত দশা	সেই দশার ভোগকাল
* ৩, ৪, ৫	রবির	৬ বৎসর
৬, ৭, ৮, ৯	চন্দ্রের	১৫ "
১০, ১১, ১২	মঙ্গলের	৮ "
১৩, ১৪, ১৫, ১৬	বুধের	১৭ "
১৭, ১৮, ১৯	শনির	১০ "
২০, ২১, ০, ২২	বৃহস্পতির	১৯ "
২৩, ২৪, ২৫	রাহুর	১২ "
২৬, ২৭, ১, ২	শুক্রের	২১ "
		১০৮

যেরূপ পর পর দশার কথা লিখিত হইল, সেইরূপই পর পর দশা হইবে। যথা—রবির পরে চন্দ্রের, বৃহস্পতির পর রাহুর, শুক্রের পরে রবির এইরূপ।

বিংশোত্তরীয় দশা।

(ইহাতেও যেরূপ পর পর দশা লিখিত আছে; সেইরূপ দশার ভোগ হয়। যথা—রবির পর চন্দ্র, রাহুর পর বৃহস্পতি, শুক্রের পরে রবি ইত্যাদি।)

* ৩। ১২। ২১। রবির দশা, ভোগকাল ৬বৎসর
৪। ১৩। ২২। চন্দ্রের দশা, ভোগকাল ১০বৎসর
৫। ১৪। ২৩। মঙ্গলের দশা, ভোগকাল ৭বৎসর
৬। ১৫। ২৪। রাহুর দশা ভোগকাল ১৮ বৎসর
৭। ১৬। ২৫। বৃহস্পতিরদশা, ভোগ ১৬ বৎসর
৮। ১৭। ২৬। শনির দশা, ভোগকাল ১৯ বৎসর
৯। ১৮। ২৭। বুধের দশা, ভোগকাল ১৭বৎসর
১০। ১৯। ১। কেতুর দশা, ভোগকাল ৭ বৎসর
১১। ২০। ২। শুক্রের দশা, ভোগ ২০ বৎসর

এই দশার আবার ভুক্ত ও ভোগ্য বাহির করিতে হইবে। বিংশোত্তরীয় দশার ভুক্ত ও ভোগ্য কাল বাহির করা সহজ। নক্ষত্রের মান·অনুসারে তাহা হইয়া থাকে।

যে সময়ে জাতক জন্মগ্রহণ করিল, সেই সময়ের যে নক্ষত্র, তাহার মান বাহির করিতে হইবে। সেই নক্ষত্র কোন কোন স্থলে জন্মদিনের পূর্ব্বদিন আরম্ভ হইয়া জন্মদিন শেষ হইয়াছে, কোন কোন স্থলে জন্মদিন আরম্ভ হইয়া তাহার পরদিন শেষ হইয়াছে। ২।১ স্থলে জন্মদিন, তাহার পূর্ব্ব ও পরদিন এই ৩দিন অথবা জন্মদিন ও তৎপূর্ব্ব বা পরের দুইদিন এই ৩দিনও নক্ষত্রের স্থায়িত্ব থাকিতে পারে। সর্ব্বপ্রথমে এই নক্ষত্রের স্থায়িত্ব বাহির করা আবশ্যক। কদাচিৎ জন্মদিনেই নক্ষত্রের আরম্ভ ও শেষ হইতে পারে।

জন্মদিন ও তৎপূর্ব্বদিন এই দুই দিনে যদি জন্মনক্ষত্রের স্থায়িত্ব থাকে, তবে জন্মদিন সেই জন্মনক্ষত্রের যে মান লিখিত আছে, সেই মানের সহিত পূর্ব্বদিনের মান যোগ করিতে হইবে। যথা—কোন শিশুর জন্মনক্ষত্র

* নাম লেখা হইল না। অঙ্ক দ্বারা নাম পাঠকবর্গ ঠিক করিয়া লইবেন।

* অর্থাৎ উল্লিখিত সংখ্যক নক্ষত্রে জন্ম হইলে তাহার পার্শ্বস্থিত দশায় জন্ম বুঝিতে হইবে।

হস্তা; সে ১৩০০ সনের ২৪শে আশ্বিন বেলা ২০ দণ্ডের সময় জন্মিয়াছে।

হস্তার মান সেই দিনের = ৪৬ দণ্ড ১ পল।

তাহার পূর্ব্বদিন উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র ছিল দং ৪৪।২৫ পল। সুতরাং ৬০—৪৪।২৫ পল = ১৫।৩৫ পল। সেই দিন হস্তানক্ষত্র ছিল।

∴ ৪৬দ ১ পল + ১৫দ ৩৫পল = ৬১দ ১৬পল হইল শিশুর জন্ম নক্ষত্রের মান।

মনে করুন, ঐ তারিখ ৪৮দণ্ড সময়ে শিশুর জন্ম হইল। তাহা হইলে জন্মনক্ষত্র হইল চিত্রা কারণ হস্তা কেবলমাত্র ৪৬।১পল ছিল। সেই দিনের অবশিষ্ট সময় অর্থাৎ ৬০—৪৬।১ = দ ১৩।৫৯ পল চিত্রা নক্ষত্র রহিল। ঐ চিত্রা তাহার পরদিবস ২৫শে আশ্বিন ৪৮।৫১ পল থাকিতে দেখা যায়। ∴ জন্মনক্ষত্রের মান= ১৩।৫৯ পল + ৪৮ দণ্ড ৫১ পল = দণ্ড ৬২।৫০ পল হইল।

২৭শে আশ্বিন ৫৮ দণ্ডের সময় কোন বালক জন্মগ্রহণ করিলে তাহার জন্মনক্ষত্র হইল অনুরাধা। কারণ সেই দিন ৫৭ দণ্ড ৫০ পল পর্য্যন্ত বিশাখা ছিল। সেই জন্মনক্ষত্র অনুরাধা জন্মদিন অর্থাৎ ২৭শে ছিল ৬০—৫৭।৫০ = ২ দণ্ড ৩০ পল। তাহার পরদিন ২৮শে ছিল ৬০।০ দণ্ড এবং ২৯শেও ছিল ৩।৪৭ পল ∴ জন্মনক্ষত্রের মান ২।১০ × ৬০।০ + ৩।৪৭ = ৬৫ দণ্ড ৫৭ পল।

এইরূপ ২৯শে প্রভাতে সেই বালকের জন্ম হইলে—জন্মদিন ও তৎপূর্ব্ব দিনের নক্ষত্রমান যোগ করিয়া নক্ষত্রমান স্থির করিতে হইবে।

২৮শে জন্ম হইলে জন্মনক্ষত্র জন্মদিন ও তাহার পূর্ব্ব ও পরদিন এই ৩ দিন রহিল।

আমাদের কথিত বালকের জন্মনক্ষত্র পুষ্যা। ১০ই শ্রাবণ উহা ছিল ৩৪ দঃ ১৪ পঃ ১২ বিঃ। পূর্ব্বদিন ছিল ৬০—৩৪।১৪।৩৫ = ২৫।৪৫।২৫ বিপল। ∴ উহার মান=৩৪ দঃ ১৪ পঃ ১২ বিঃ + ২৫ দঃ ৪৫ পঃ ১৫ বিঃ = ৫৯ দঃ ৫৯ পঃ ৩৭ বিঃ।

জন্ম-নক্ষত্রমান স্থির হইলে লগ্নের ন্যায় ইহারও ভুক্ত ও ভোগ্য বাহির করিতে হইবে। অর্থাৎ লগ্নের পূর্ব্বে সেই নক্ষত্রের মান কতটা চলিয়া গিয়াছে ও পরে কতটা আছে, তাহা স্থির করিতে হইবে।

যথা—পূর্ব্বোক্ত শিশুর জন্মদিনে জন্ম-নক্ষত্র ১৫ দঃ ২ পঃ ৩০ বিঃ গত হইলে তাহার জন্ম হয়। ∴ ৩৪।১৪।১২—১৫।২।৩০ = ১৯। ১২।১৮ বিপল, সেই নক্ষত্রের ভোগ্য মান। ∴ ৫৯।৫৯।৩৭—১৯।১২।১৮ = ৪০।৪৭।১৯ বিপল সেই নক্ষত্রের ভুক্তমান।

এইরূপে জন্ম-নক্ষত্রের ভুক্ত ও ভোগ্য স্থির হইলে—বিংশোত্তরীয় দশার ভুক্ত ভোগ্য বাহির করিতে নিম্নলিখিত ত্রৈরাশিক স্থাপন করিতে হইবে।

সমগ্র নক্ষত্র মান ঃ নক্ষত্রের ভোগ্য মান ∷ সেই নক্ষত্রে জন্মিলে যে রাশি হয়, তাহার ভোগ কাল ঃ ক।

এই ক = দশার ভোগ্য কাল।

দশার ভোগ্য কাল অর্থ সেই দশা আর যত কাল থাকিবে তাহা। যথা—পূর্ব্বোক্ত শিশুর বিংশোত্তরীয় দশার ভোগ্য কাল বাহির করিতে নিম্নলিখিত রাশি বসাইতে হইবে। ৫৯।৫৯।৩৭ ঃ ১৯।১২।১৮ ঃ ঃ ১৯ বৎসর ঃ ক বৎসর।

যাঁহারা ত্রৈরাশিক জানেন না, তাঁহারা এইরূপ করিবেন। নক্ষত্রমান ও নক্ষত্রের ভোগ্যমান পৃথক্‌ভাবে বিপলে পরিণত করিয়া রাখিবেন। পরে যে নক্ষত্রে জন্মিলে যে দশায় জন্মিবে নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই দশার নির্দ্দিষ্ট ভোগকাল বৎসরকে ১২ গুণিত করিয়া সেই সংখ্যা দ্বারা নক্ষত্রের ভোগ্য বিপল সংখ্যক অঙ্ককে গুণ করিবেন। গুণফল নক্ষত্রের পূর্ণমান বিপলসংখ্যক অঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলে

যে ভাগফল হইবে, তাহা মাস হইবে। অবশিষ্টকে ৩০ দ্বারা গুণ করিয়া পুনরায় উক্ত ভাজক দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল দিন হইবে। অবশিষ্টকে ৬০ দ্বারা গুণ করিয়া উক্ত ভাজক দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল দণ্ড হইবে। এইরূপ পল বিপলাদিও আনয়ন করা যায়।

যথা ;—৫৯ দঃ ৫৯ পঃ ৩১ বিপলকে বিপল করিলে হইল ২১৫৯৭১। ১৯ দণ্ড ১২ পল ১৮ বিপল = ৬৯১৩৮ বিপল। ১৯ বৎসর = ২২৮ মাস।

৬৯১৩৮ × ২২৮ = ১৫৭৬৩৪৬৪

১৫৭৬৩৪৬৪ ÷ ২১৫৯৭১ = ৭২ ফল অবশিষ্ট ২১৩১২০। ২১৩১২০ × ৩০ = ৬৩৯৩৬০০। ৬৩৯৩৬০০ ÷ ২১৫৯৭১ = ২৯ ফল অবশিষ্ট ১৩০২৬৭। ১৩০২৬৭ × ৬০ = ৭৮১৬০২০। ৭৮১৬০২০ ÷ ২১৫৯৭১ = ৩৬ ফল অবশিষ্ট ৩৯৮৪৮।

∴ ভোগ্য কাল = ৭২ মাস ২৯ দিন ৩৬ দণ্ড = ৬ বৎসর ২৯ দিন ৩৬ দণ্ড।

অষ্টোত্তরীয় দশার ভোগ্য কাল নির্ণয় করিতে অন্য প্রকার নিয়ম আবশ্যক।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, ক্রমান্বয়ে হয় ৩ নক্ষত্র নহিলে ৪ নক্ষত্র লইয়া এক এক দশা নির্দ্দিষ্ট আছে। অষ্টোত্তরীয় দশার ভোগ্যাদি বাহির করিতে, দশাকালকে ৩ নক্ষত্রের দশা স্থলে ৩ দ্বারা ৪ নক্ষত্রের দশা স্থলে ৪ দ্বারা ভাগ করিতে হইবে। ঐরূপ ভাগ করিলে নিম্নলিখিত ফল পাওয়া যায়।

রবির দশা	স্থলে	২ বৎসর।
চন্দ্রের „	„	৩ বৎসর ৯ মাস।
মঙ্গলের „	„	২ বৎসর ৮ মাস।
বুধের „	„	৪ বৎসর ৩ মাস।
বৃহস্পতির „	„	৪ বৎসর ৯ মাস।
শুক্রের „	„	৫ বৎসর ৩ মাস।
শনির দশা	স্থলে	৩ বৎসর ৪ মাস।
রাহুর „	„	৪ বৎসর।

যাহার রবির দশায় জন্ম, তাহার ত্রৈরাশিক এইরূপ বসাইতে হইবে।

জন্মনক্ষত্রমান : নক্ষত্র ভোগ্যমান :: ২বৎসর : ক বৎসর। চন্দ্রের দশায়, ২বৎসর স্থলে,৩বৎসর ৯মাস, মঙ্গলের দশায় ২বৎসর ৮মাস, বুধের দশায় ৪বৎসর ৩মাস এইরূপ বসাইলেই হইবে।

এইরূপে ফল বাহির করিয়া—জন্মনক্ষত্রের পর যে যে নক্ষত্রে জন্মনক্ষত্রের নির্দ্দিষ্ট দশা হয়, দশার পূর্ব্বতালিকার নির্দ্দিষ্টকাল সেই কয়বার তাহাতে যোগ দিলেই, অষ্টোত্তরীয় দশার ভোগ্যকাল বাহির হইবে। যথা—রোহিণী-নক্ষত্রে জন্ম হইলে পূর্ব্ববর্ণিতরূপে ফল বাহির করিয়া তাহাতে রবির দশা ২বৎসর একবার যোগ করিলে; যদি ১৩ নক্ষত্রে জন্ম হয়, তবে পূর্ব্বরূপে ফল বাহির করিয়া তাহার পরে বুধের নির্দ্দিষ্ট ৪বৎসর ৩মাস তাহাতে ৩বার ১৪ নক্ষত্রে জন্ম হইলে এই ৪বৎসর ৩মাস ২বার এইরূপ যোগ করিলেই অষ্টোত্তরীয় দশার ভোগ্যকাল বাহির হইবে।

যথা—পূর্ব্বোক্ত শিশুর জন্মনক্ষত্র ৮, সুতরাং তাহার চন্দ্রের দশায় জন্ম। চন্দ্রের দশার নির্দ্দিষ্ট অঙ্ক ৩ বৎসর ৯ মাস। ∴ ত্রৈরাশিক এইরূপ হইবে।

৫৯।৫৯।৩১ : ১৯।১২।১৮ :: ৩ বৎসর ৯ মাস : ক বৎসর ?

যাঁহারা ত্রৈরাশিক জানেন না, তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় দশার নির্দ্দিষ্ট অঙ্ককে মাসে ও নক্ষত্রের মান ও ভোগ্যকালকে বিপলে আনয়ন করিয়া নক্ষত্রের ভোগ্যকালকে সেই মাসসংখ্যক অঙ্ক দ্বারা পূরণ করিয়া নক্ষত্রের মান বিপল সংখ্যক অঙ্ক দ্বারা হরণ করিলে যে ফল হইবে, সেই ফল মাস হইবে। অবশিষ্টকে ৩০ দ্বারা গুণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভাজক দ্বারা ভাগ করিলে

ফল দিন। ও অবশিষ্টকে ৬০ দ্বারা গুণ করিয়া পরে উক্ত ভাজক দ্বারা ভাগ করিলে ফল দণ্ড হইবে। যথা—পূর্ব্বোক্ত শিশুর দশার নির্দ্দিষ্ট কাল=৪৫ মাস। ৫৯।৫৯।৩৭=২১৫৯৭৭ বিপল। ১৯।১২।১৮ বিপল=৬৯১৩৮ বিপল × ৪৫= ৩১১১২১০।

৩১১১২১ ÷ ২১৫৯৭৭=১৪ ফল, অবশিষ্ট ৮৭৫৩২। ৮৭৫৩২ × ৩০ ÷ ২১৫৯৭৭=১২ ফল, অবশিষ্ট ৩৪২৩৬। ৩৪২৩৬ × ৬০ ÷ ২১৫৯৭৭= ৯ ফল অবশিষ্ট ১১০৩৬৭। ∴ অভীপ্সিত ফল=১৪মাস ১২ দিন ৯দণ্ড=১বৎসর ২ মাস ১২ দিন ৯ দণ্ড। পরে দেখা যাইতেছে. যে ৮ নক্ষত্রের পরে আর একটী মাত্র নক্ষত্রে চন্দ্রের দশা হয়। উক্ত ১ বৎসর ২ মাস ১২ দিন ৯ দণ্ডের সহিত একবার মাত্র ৩ বৎসর ৯ মাস যোগ করিলেই অষ্টোত্তরীয় দশার ভোগ্য কাল হইল। ∴ পূর্ব্বোক্ত শিশুর অষ্টোত্তরীয় দশার ভোগ্য কাল = ৪ বৎসর ১১ মাস ১২ দিন ৯ দণ্ড। অর্থাৎ এই বয়সের পরে তাহার মঙ্গলের দশা হইবে। এই দশা ৮ বৎসর থাকিবে। পরে বুধের দশা, এইরূপ চলিতে থাকিবে।

গণ। জন্মনক্ষত্র দ্বারা গণ স্থির হয়। যথা

১। ৫। ৭। ৮। ১৩। ১৫। ১৭। ২২। ২৭

এই কয়েক সংখ্যক নক্ষত্রে দেবগণ হয়।

২। ৪। ৬। ১১। ১২। ২০। ২১। ২৫। ২৬

এই কয়েক সংখ্যক নক্ষত্রে জন্মিলে নরগণ হয়।

৩। ৯। ১০। ১৪। ১৬। ১৮। ১৯। ২৩। ২৪

এই কয়েক নক্ষত্রে জন্মিলে রাক্ষসগণ হয়।

পূর্ব্বোক্ত শিশু ৮ নক্ষত্রে জাত হওয়ায় দেবগণ বটে।

৬। বিবিধ।

পঞ্জিকা হইতে জন্ম সন, মাস, তারিখ, বার, পক্ষ, তিথি ইত্যাদি লিখিত হইবে। এ সম্বন্ধে অধিক লেখা নিষ্প্রয়োজন।

ক্রমশঃ।

শ্রী গরিজাপ্রসন্ন রায়।

যুগল-কবিতা।

উপেক্ষা।

অনন্ত সাগর-তীরে—ক্ষুদ্র রেণু-কণামত
প'ড়ে আছি নিরাশ্রয়, কত কাল হ'ল গত।
কত ঝড়, কত বৃষ্টি, তরঙ্গ-আঘাত কত
বুকের উপর দিয়া চ'লে গেল এ যাবত।
কিছুতেই টলাইতে, ভাঙ্গিতে নারিল তায়,
সামান্য সে উপেক্ষায় শেষে ভেঙে দিল হায়!
সামান্য বায়ুর ভারে এবে প্রাণ টলমল
একটুকু উপেক্ষার হায় কি ভীষণ বল!

বাঁশরী বাজিল!

বাঁশরী বাজিল পুনঃ অই
আকুল করিয়া প্রাণ মন।
দেখে আসি—কোন্ দূর-পুরে
বাজে সে, বাজায় কোন্ জন।
বাঁশরী সে ডাকিছে আমায়
অসীম সে মিলনের তরে।
সংসারের স্নেহ-মমতায়
আর কি বাঁধিতে পারে মোরে?
অসীম অতৃপ্ত প্রেম-আশা
বিরহ-বেদনা বুকে পুরি,
বাঁশরীর স্বর লক্ষ্য করি
ছুটিতেছি কত কাল ধরি!
কত পাছে বিশ্ব আছে পড়ি;—
যত যাই, দূরে বাজে সেই।
জানিনা গো কত দিনে শেষ
জীবনের পথ-যাত্রা এই!

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মিছারামের পত্র। *

আজ্ঞাকারী প্রতিপার্ল্য শ্রীমিছারাম

দেবশর্ম্মণং।

প্রণামা শতসহস্র সবিনয় পুব্বক নিবেদনঞ্চাগে। মহাশয়ের আশিব্বাদে এজনার অহিক পারত্রিক নিস্তার পরং। বহুদিবসাবধি মহাশয়দিগ্যের কুশল-সোমাচার অপ্রাপ্তে ভাবিতাছি। ডাকজোগে সারোয়ার তাবৎ বাত্রা পত্রস্থ করিয়া পরমার্প্যায়িত করিবেন।

এখ্যনকার কালে আবালবৃর্দ্ধবনিতা সকলেই বহুত বহুত সাধুভাষা জ্ঞ্যাত আছেন ও কথাবাত্রা কহেন ও লেখেন। তাহাতে আপনকারা পণ্ডিত মনিষ্য। আমাদ্দিগ্যের সাবেক কিতাবতি লেখাপড়ার দ্বারা মহাশয়দিগ্যের নিকট পত্রাপত্র লেখা উপহাস্যাস্পদমাত্র, আর সাবকাশও কম। তবে ৺ স্বেচ্ছায় বঙ্কিম বাবুর নাটকাদি ও বঙ্গবাসী পৃভিতি উপাঙ্খ্যাস অস্মদের আলাচোনা আছে। সে যে হোক্ দেশের কথা ও মম্ম কথার নিমির্ত্ত্য মনজুগী হইয়া পত্রখানি অবিস্ত ২ দৃষ্ট করিবেন।

অত্র গ্রামের অবস্থা লিপিবাহাল্য। শকলি বিদিতাছেন। কয়েক দিবস দেবতার অত্রযোগ হইয়া রাস্তাঘাট আরো অচল হইয়াছে। স্বভাবিকই তো একরূপ অচল। এখ্যনে দেশের প্রধান লোকেরাই কত্তা হইয়া রাস্তাঘাট করিতেছেন। তাহার নাম আত্মশাশন। কিন্তু আত্মশাশন কি অথশোশন, কি সাথসাধন তাহা বলিতে পারি না, কেননা তাঁহারা মার্ন্য গর্ণ্য ক্ষমতাপন্ন মহাশয় লোক। চাউল আদি অমিল, যেন দুর্ভ্যক্ষ উপস্থিত। গ্রহগুলি জরাজীর্ন, বৃষ্টি হইলে তাহা আর বাহিরে পড়ে না। গ্রহের মালিকদের চক্ষে জল পড়ে ততোধিক। সে তাঁহাদের কুগ্রহ। কিন্তু তাঁহারা বলেন সে টেক্সের জ্বালায়। পঞ্চমহাপাতকীতে পঞ্চায়ত হইয়াছে। তাঁহারা গরিব দুঃখীর দুঃখে অটল, অধিকন্তু তাহাদ্দের উপর প্রতাপই বা কত। অক্লাশে দিনগুজরান হয়, গ্রামে এমন সম্পত্ত্য কাহার আছে বলুন দেখি। এই সময়ে আবার অক্রুর পরামানিক্য এক মোকর্দ্দামা উপস্থিত করিয়া আমাকে সাক্ষ্য মার্ন্য করিয়াছে। তাহার পঞ্চ মুদ্রা কর্জ্জ দেওয়া আমার সাক্ষ্যাতে হইয়াছিল, এই আমার অপরাধ। ইহাতে আমার ক্রোধ নাই। কেননা, গবর্ম্মেণ্টের শাশনে ছাগে ব্যাঘ্যে সমতুল্য অধিকার হইয়াছে। নেবুরফুলী নবণ রাখার জন্ত বাজারের তৈলক্ষ মুদীকে শাশন করিতে গিয়া আমি কিতক বিপদাপর্ন্ন হইয়াছিলাম, মহাশয়ের শরণ আছে। ইহাতে অক্রুর পরামানিক্য আমাকে সাক্ষ্য মানিবে, আশ্চয্য কি। যদ্যপিস্যাৎ ইহা বলিয়া মনকে প্রবোধ দি, কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না। আমি ফুলের মুখুটী, বিষ্টুঠাকুরের সন্তান, শূর্দ্রের বাটীতে কস্মিনকালে পদার্প্পন নাই, ব্যাটা অন্তজ আমাকে সাক্ষ্য

---

* সম্পাদক মহাশয়!

নিম্নলিখিত পত্রখানি আমাকেই আমার কোন আত্মীয় বিষয়ী-লোক লিখিয়াছিলেন। নানা কারণে পত্রখানির উত্তর যথাসময়ে দেওয়া হয় নাই। উহা আমার চিঠির ফাইলে উদ্বন্ধনদশায় লম্বিত থাকিয়া অপমৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল দেখিয়া, আমি দুঃখিতচিত্তে উহার সদ্গতি-বিধানার্থ আপনাদিগের নিকট পাঠাইলাম। জন্মভূমিতে উহার নবকলেবর দেখিলে সুখী হইব। তাহাতে এই পত্রের লেখকেরও ইষ্টসিদ্ধি হইবে। কেননা, তাঁহার প্রার্থিত ব্যবস্থায় সাধারণের মনোযোগ আবশুক। পরন্ত পত্রখানি যেমন অবিকল লিখিয়া পাঠাইলাম, ঐরূপ অবিকল মুদ্রিত করিবেন। দেখিবেন, যেন আপনাদিগের দোষে কোন স্থানে অশুদ্ধিস্পর্শ না হয়। ইতি।

শ্রীশারদাপ্রসাদ শর্ম্মণঃ।

মানে, ব্যাটার জন্য কাঠগড়ায় উঠিয়া আমায় চৌদ্দপুরুষের তর্পণ করিতে হইবে! যখন মনে করি, চখ খের জলে বধ্যস্থল ভাসিয়া যায়। আবাহাম্মান কালের সমস্কার কি দুদিনের গবর্ণ্মেন্টের শাখনে ভোলা যায়? আর সেই সোমায়ে রাগ হয়, ধ ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির উকিল মশায়দের জন্য। তাঁহাদের দৌরাত্ম্যে সর্ত্য কথা টিঁকিবার যো নাই; জেরায় জেরায় তাঁহারা সর্ত্যকথা মির্থ্যা প্রমাণ করিয়া দিয়া হাকিমানের বিচারের সুবিধা করিয়া দেন! যাহোক্, আমার কোন আপত্ত্য• গ্রাহ্যযোগ্য হইবে না, সাক্ষ্য দিতেই হইবে। পরমাণিক্যের পোর পঞ্চমুদ্রা আদায় করিতে ইতিমধ্যে পঞ্চদশমুদ্রা ব্যায় হইয়াছে। তত্রাচ জেদ। যাউক, তাহাতে আর শঙ্কা নাই। যেরূপ কালকল্প পড়িয়াছে, সদা সব্বক্ষণ সাবধানপুব্বক থাকিলেও নিস্তার নাই, তাহা জানি। ভার্ব্য-ভাবনা করিয়া কি করিব।

তদ্‌পরে, গ্রামে একটী মাইনর ইস্কুল স্থাপিত হওয়ায় যদিচ শৈশব বালকদিগ্যের বিদ্যাশিক্ষ্যার সুবিধা হইয়াছে, কিন্তু তাহা বিদ্যা কি অবিদ্যা, অস্মদের দুরাদিষ্ট ক্রমে তাহা বোধগর্ম্য হয় না। বালকদিগ্যের সৌজন্যতা মাত্র নাই, মান্যনীয় লোকদিগ্যে মান্য করে না, পিতা মাতাকেও সম্মান করে না, সাধারণ লোকদিগ্যে তুচ্ছতাচ্ছল্য করে ও অপ্রীয় কথা কহে। উচ্ছিষ্টজ্ঞ্যান নাই, দাঁড়াইয়া পেচ্ছাব ত্যাগ করে, উপনয়নের পর জগ্যপবীত গলাতেই ঝুলেন বা কোমরে নামেন, হাতে আর উঠেন না। দেবতাভক্তি তো তথৈবচ। এবার শ্রীশ্রী৺দুর্গ্যাপূজার সমায়ে উক্ত প্রতিমা নিরক্ষণ করিয়া একটী বালক তর্ক করিয়াছিল, পুত্তলিকার চর্ক্ষু আছে, দেখিতে পায় না, কর্ণ আছে শুনিতে পায় না, ইহা আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যেসাগরের বহিতে পড়িয়াছি, আরো পড়িয়াছি যে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ নিরাকার চৈতন্যরূপ। প্রতিমা কখনো ঈশ্বর হইতে পারে না, উহার পূজা অর্চ্চা করা মরা-গরুর ঘাস কর্ত্তন মাত্র। তাহাতে আমি কহিলাম, হাঁরে বাপু, ইশ্বর যদি সর্ব্বশক্তিবান্ হয়েন, তবে আকার গ্রহণের শক্তিটুকু তাঁর নাই কেন? আর পুত্তলিকা কাণ থাকিতে সুনিতে পায় না, বা মুখ থাকিতে কথা কহিতে পারে না, তাহা যৎকালীন আমরাও প্রত্যক্ষ করিতেছি, তখন আমাদের সর্গীয় পুব্বপুরুষ মহাত্মারা এমনি মহামুখ্খু ছিলেন যে ঐ পুঁতুলকেই সব্বশক্তিবান্ ইশ্বর জানিতেন ও পূজা করিতেন! তাহা নয়, বাপু সকল, তাহা নয়, আমরা বেদবিধিমতে উহাতে যে ক্রিয়ার অনুষ্ঠ্যান করি, তাহারি বলে উহাতে ইশ্বরের অধিষ্ঠান হয়। তৎকালীন প্রতিমায় তাঁহার পূজা হয়। তদ্‌পরে বিসর্জ্জন হইলেই যে মাটী, সেই-মাটী। ইহাই শাস্ত্রে বলে, সেই মনি-রিশির মতেই পুর্ব্বপুরুষেরা তাহা করিয়া গিয়াছেন, আমরাও তাহাই করিতেছি। তোমরা তাহা না মানিয়া সব মাটী ভাবিতেছ ও মাটী করিতেছ কেন? আরো তাহারা বলে যে ইশ্বর জৎকালীন সকলের ছিষ্টিকর্ত্তা, তখন তাঁহার নিকট কাহারো উচ্চ নীচু সম্ভবে না, তবে আমরা গাভী পৃভিতিকে যে পুজ্য ও সুকরাদিগেকে যে ত্যাজ্য মনে করি, ইহা আমাদের অন্যায় ও ভ্রমমাত্র। আমি তো শুনিয়াই অবাক্! আমি কহিলাম হাঁহে বাপু-শকল, ভগমান্ সব্বজীবের ছিষ্টিকর্ত্তা বলিয়া সংসারে যদি সকলকে সমতুল্য সম্মান করিতে হয়, তবে তোমার গর্ভধারিণীকে আর মেথ-রাণীকে সমান সর্ম্মান করনা কেন? সে সোমায়ে কুসমস্কারের কায্য কর কেন? আর একটী প্রশংসিত ছেলে এবার মাইনর পরিক্ষ্যায় উত্তির্ন্ন হইয়াছে, তাহার মুখে শুনিলাম, অধ্যয়-

কুমার দত্ত নামে একজন চারুপাঠ নামে একখানি বহিতে লিখিয়াছেন যে আমাদের সিঁতিশাস্ত্র সব ভুল ও অসার ও মনগড়া এবং ষড়দরশনও তাই, আর অধ্যাপক পণ্ডিতেরা মহামুখ্খু, আসল বিদ্যে তাঁদের একবিন্দুও নাই। তাঁহারা ঐ অসার বিষয় লইয়া তর্কবিতর্ক করেন বলিয়া কত উপহাস করিয়াছেন।

আমি কহিলাম বাপু, তোমাদের বিদ্যে যতেষ্ট হয়েচে, সে দত্ত-কুলঙ্গারের বহি তোমরা পড় কেন? তাহাতে সে রাগত হইয়া ইংরাজীতে আমায় কতগুগুলি কথা বলিলেক। আর একটী বালক ততোধিক সৌজন্যতা প্রকাশিয়া কহিলেক, ওঁগো বুঁড়ো বঁক্কেশ্বর, চুঁপ করিয়া থাক, আর বিঁদ্যা প্রকাশে কাজ নাই। ভূগোল, ইতিহাস, পদার্থ-বিদ্যা কোন শাস্ত্রে কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, আমাদের সঙ্গে কথা কহিতে সাহস কেন? আর্য্যজাতি বলিতে ইয়ুরোপীয় কোন্ কোন্ জাতিকে বুঝায়, জান কি? ভারতীয় ব্রাহ্মণ-জাতির আদিম অধিবাস কোথায় জান কি? কোন্ সময়ে তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা লাঙ্গল কাঁধে করিয়া গরু চরাইতে চরাইতে ভারতে উপস্থিত হন, জান কি? গারো, ভীল, কোল প্রভৃতি অসভ্য বর্ব্বর পাহাড়ীয়ারা কোন্ সময়ে তাঁহাদের যুদ্ধে পরাভূত হইয়া শূদ্রনামে খ্যাত হইল জান কি? জাতিভেদ প্রথা কতদিন হইতে চলিয়া ভারতের সর্ব্বনাশ করিল জান কি? শিক্ষিত বালক এইরূপ বক্তিতা করিয়া ক্ষ্যান্ত হইলে আমি কোন উত্তর করিলাম না, যে হেতুক কথায় ইহার উত্তর হয় না, আর ক্ষ্যামতাও নাই। আমার পৌত্তুরটী তাহাদের দলে বসিয়াছিল, তাহাকে তদ্দণ্ডে উঠাইয়া আনিলাম ও সেই দিনই ইস্কুল হইতে তাহার নাম কাটিয়া দিলাম। এখ্যন আমার জিজ্ঞেসা এই যে যাহারা এই সকল বহি লিখে, তাহারা হিন্দু, না যবন, না খ্রীষ্টিয়ান্? এবং যাঁহাদের অর্থ্যক্ষতায় এই সকল বহি চলিতেছে, তাঁহারা কোন্ জাতি? সেই কুলাঙ্গারেরা যদি হিন্দু হয়, তবে জগতে অহিন্দু কে? পূর্ব্বপুরুষের মান-মর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিতে যাহারা শিক্ষ্যা দেয়, পূর্ব্বপুরুষের শাস্ত্র, যুক্তি, আচার-ব্যাবহার-সংস্কার উপহাস করিতে যাহারা শিক্ষ্যা দেয়, তাহারা যদি শিক্ষিত, তবে মুখ্খু কে? আর মহাশয়েরা যদিস্যাৎ বালকদিগ্যে এই বিদ্যে শেখাতে ইস্কুলে পাঠান, তবে মহাশয়দিগ্যের চাইতে জ্ঞান-পাপী আর কাহারা?

মহাশয় আমার উপর অসন্তোষ হবেন না, মহাশয় আমাকে ভূয়ষী স্নেঁহ করেন বলিয়া মনের আবেগে এতধূর অব্যাবহায্যনীয় কথা লিখিয়া ফেলিলাম। মহাশয় মহিমাসাগর, নিজগুণে ক্ষ্যামা করিবেন। আর এতধূর দুঃখের কথাও কি পত্রস্থ না করিয়া থাকা যায়? সেওয়ায় বালিকাবিদ্যালয়ও একটী আরাম্ভ হইয়াছে। আপাতক স্যানেদের চণ্ডীমণ্ডপে উহা বসিতেছে। এখ্যন আপুনি কি বলিতে চান? এজে কুড়ির উপর বিষফোড়া উপস্থিত হইল! আপনকারা এ ফোড়ার উপর অস্ত্র করিবেন; না সর্ব্বাঙ্গ পচাইয়া ফেলিবেন? অস্মদ কিন্তু ইতোমধ্যেই তিষ্টিতে অপারগ। এই যে জেলেদের ও চাঁড়ালদের পাশকরা ছেলে দুইটা বলে যে বুড়োবক্কেশ্বরগুলো নিপাত না হইলে কুসমস্কারের অন্ধকার ঘুচিবেক না ও সর্ভ্যতার সূয্য উদয় হইবেক না, তা আমাদের আপনা হইতেই অগ্রেই গঙ্গাতীর আশ্রয় করা কত্তব্ব হইয়াছে। মহাশয় কি ব্যাবস্থা দেন?

মহাশয়ও যে সহজে ইহার ব্যবস্থা নিরাকরণ করিতে ক্ষমবান্ হইবেন, ইহা বোধগর্ম্য হয় না। দেখুন, সহর কলিকাতার রাস্তার নাম

ও লম্বর পর্য্যন্ত ইংরাজিতে লেখা। বাঙ্গালা দেশ এমনি ইংরাজের মুল্লুক হইয়াছে ও বাঙ্গালীরাও এমনি উল্লুক হইয়াছে! এখ্যনে এককালীন ছেলেদের একটু ইংরাজী না শেখাইলে তাহারাও উর্দ্ধুরকাল শাঁপশাঁপান্ত করিতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মরখ্যা সকলের আগে। পুত্র মেলেচ্ছ হইলে তাহাতো তাহার মৃত্যুতুল্য। তার অপিক্ষ্যায় মুকুখু হইয়া বাঁচিয়া থাকা তো ভাল। শিক্ষ্যা না পাইলেও সহবৎ পাইবে। এমতাবস্থায় আপুনি কি বিবচোনা করেন? আমিহ ৺ কাশীধাম যাত্রাই মনঃস্থ করিয়াছিলাম। কিন্তু সেধামেও শুনিলাম, ভূতের দৌরাত্ম্য নাকি আত্যন্তিক বৃদ্ধি হইয়াছে।

উপস্থিত অত্র বাটীর আর ২ মঙ্গল। আগত পত্রে শ্রীমান্ শ্রীমতীদিগ্যের সহ মহাশয়ের যাবদীয় কুশলাখ্যানে সন্তোষ করিতে আজ্ঞ্যা হয়। অলমতিবিস্তারেণ। মিতি সন তেরশত্ত সাল, তারিখ পহেলা অঘ্রান।

কবির প্রতি।

(১)

কোথা কবি,—কোথা তুমি,—কোন্ স্বর্গপুরে?
কোন্ দিব্য লোকে দেব!—আছ কত দূরে?
ধ্রুব ব্রহ্মা শিব কিংবা বিষ্ণু ইন্দ্র লোকে;
অথবা তদুচ্চ লোকে—বিরাজ পুলকে?
যেথানে থাকনা কেন,
বারেক এ মর্ত্তে যেন,
স্বরগের শুভ-দৃষ্টি,—হয় সঞ্চালন।
বারেক উজ্জ্বলি দেব গগন-প্রাঙ্গণ,
দাঁড়াইয়া দে'ও দেখা,—ভাগ্যহীন জনে,
বারেক স্বরগ-বার্ত্তা,—শুনাও শ্রবণে।

(২)

মর্ত্তের নরক-কীট,—পাপী দুরাচার,
পশিতে স্বরগ-দ্বারে,—নাহি অধিকার।
নহি ভাগ্যবান্ কবি,—প্রাণ অবসানে
পাইব স্বরগে স্থান,—প্রফুল্ল পরাণে।
পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্যফলে,
পুণ্যময় কাব্য-বলে,
গে'য়েছ স্বরগে স্থান,—হে মহামতিন্,
মর্ত্তে কিন্তু কীর্ত্তিমান্,—তুমি চিরদিন।
মর্ত্তের মানব বটে,—কিন্তু সাধ যায়
শুনিতে স্বর্গের গীত,—স্বর্গীয় বীণায়।

(৩)

গে'য়েছ মর্ত্তের গান মর্ত্ত্য কলেবরে,
আছেত সে গান গাঁথা,—অমৃত-অক্ষরে।
পুণ্যহীন মর্ত্ত্য জীব,—শুনিবে সে গান,
যত দিন মর্ত্ত্য দেহে রহিবে পরাণ।
কত জন্ম ঘুরে ঘুরে,
পুনঃপুনঃ মর্ত্তাপুরে,
আসিবে ধরিয়ে দেব!—মানব-আকার;
শুনিবে সে নিত্য মর্ত্ত্য সঙ্গীত তোমার।
রেখে'ছ সঞ্চয়ি যাহে, মর্ত্তের সম্বল
সুখ দুঃখ শান্তি শোক,—হাসি অশ্রু জল।

(৪)

শুনাও স্বর্গের গান,—হে স্বর্গীয় কবি!
দেখাও বারেক দেব,—স্বর্গীয় সে ছবি।
কিবা স্বর্গ কোথা স্বর্গ,—কিবা সুখ তায়?
কিবা কান্তি কিবা শান্তি,—বিরাজে তথায়?
বল কত কোটি বলে,
কত কোটি বিশ্ব চলে?
কত ব্রহ্মা কত বিষ্ণু কত ইন্দ্র শিব?
কত দীপ্তি-পুঞ্জময় স্বরগের জীব?
কত কোটি ভানু তাতে, কত চন্দ্র তায়?
কত কোটি তারা ফুটে,—কত মেঘ-গায়?

(৫)

কিবা বায়ু বহে তথা,—কিবা ফুল ফুটে?
কিবা তথা স্রোতস্বতী,—কত স্রোত ছুটে?
কত ভোগ-রাগ-রঙ্গে,—তরঙ্গে খেলায়?
কেমন বিপিন রম্য,—কত ঋতু তায়?
কিবা সে লতিকাকুঞ্জে,
পুঞ্জে পুঞ্জে অলি গুঞ্জে,
কিবা সে সরসী-মালা,—কিবা শতদল?
কত বা সুন্দর স্বচ্ছ,—সরসীর জল?
কতই কৌতুকময়,—মীন ভাসে তায়?
কেমন সে লয় রাগে,—বিহঙ্গম গায়?

(৬)

শুনেছি স্বরগে আছে,—নন্দন কানন ;
দেখাও বারেক তাহা,—আঁকিয়া এখন।
কিবা ! তার পারিজাত,—পুষ্প-আভরণ,
কিবা ! তার কলি-কুল,—বাসই বা কেমন ?
কিবা মন্দাকিনী বহে,
কোথা সুধাভাণ্ড রহে,
কিবা সে কৌস্তুভ মণি,—কি তা'র বরণ,
কত কোটি বিশ্বোজ্জ্বল,—বিমল কিরণ ?
কিবা ঐরাবত হস্তী,—উচ্চৈঃশ্রবা হয় ?
দেখাও আরো বা যদি,—কোথা কিছু রয়।

(৭)

তুমি দেব মহাকবি,—ভাবানন্দময়,
স্বর্গে মর্ত্তে দেব তব,—আত্মার নিলয়।
শিখে'ছি মর্ত্তের তথ্য,—তোমার কৃপায়,
জেনে'ছি এ মর্ত্ত-ভূমে,—কোথা কিবা রয়।
এবে দেব কৃপা ক'রে,
বারেক শুনাও মোরে,
স্বরগের শুভ বার্ত্তা,—বারেক আঁকিয়া,
দেখাও স্বরগ-ছবি !—দেখিয়া শুনিয়া,
বুঝিলে-মরমে দেব ;—স্বর্গ-মর্ত্ত-ভেদ,
ঘুচিলে ঘুচিতে পারে,—কলুষের ক্লেদ।

শ্রীবিহারিলাল সরকার।

মিড্‌সামার্ নাইট্‌স্ ড্রিম্”।

(১)

এথেন্স নামে এক নগর আছে। এখানকার রাজনিয়ম এই যে, পিতাই কন্যার বিবাহের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবেন ;—পাত্র-নির্ব্বাচন বা পাত্র-মনোনয়ন বিষয়ে কন্যার কোনরূপ স্বাধীনতা থাকিবে না। কিন্তু যে কন্যা, পিতার মনোনীত পাত্রে আত্মসমর্পণ করিতে অসম্মত হইবে, পিতা বিচারপ্রার্থী হইলে, রাজবিধি অনুসারে সেই হতভাগিনীর প্রাণদণ্ড ঘটিবে ! রাজবিধি এত কঠোর হইলেও আশঙ্কার বিশেষ কারণ ছিল না। কারণ, পিতা কখন এত কঠোর হইতে পারেন না যে, ইচ্ছা করিয়া তনয়ার মৃত্যুকামনা করেন। তবে, অনেক পিতা মুখে আইনের ভয় দেখাইয়া, কন্যাকে স্বেচ্ছাচারিতা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতেন।

এক সময়ে কিন্তু সত্য সত্যই এরূপ এক ভয়াবহ ঘটনা সংঘটিত হয়। ইজিয়স্ নামক এক এথেন্সবাসী একদা সত্য সত্যই আপন কন্যা হার্ম্মিয়ার বিরুদ্ধে, এইরূপ এক অভিযোগ আনয়ন করেন। বৃদ্ধের অভিযোগ এই, তিনি তাঁহার কন্যার জন্য যে পাত্র মনোনীত করিয়াছেন, কন্যা তাহাকে বিবাহ করিতে চাহে না। পাত্রের নাম ডিমিট্রিয়াস্। তিনিও একজন সম্ভ্রান্ত এথেন্সবাসী। হার্ম্মিয়া গোপনে অন্য এক ব্যক্তির প্রণয়াসক্ত ছিলেন। সে অন্য এক ব্যক্তি ও এথেন্সবাসী ; নাম—লাইসাণ্ডার। কন্যার অসম্মতি দেখিয়া ইজিয়স্, এথেন্সরাজ থিসিয়াসের নিকট বিচারপ্রার্থী হইলেন। হার্ম্মিয়া আপন অপরাধ ক্ষালন জন্য অনেক চেষ্টা পাইলেন। বলিলেন, তাঁহার পিতা তাঁহার জন্য যাঁহাকে মনোনীত করিয়াছেন, সেই ডিমিট্রিয়স্ অন্য একজনের প্রণয়-পাত্র। সে অন্য, আর কেহই নহে, হার্ম্মিয়ার বাল্য-সহচরী হেলেনা। হার্ম্মিয়া বলিলেন, “ডিমিট্রিয়াস হেলেনাকে যেরূপ ভালবাসিতেন, তাহাতে হেলেনা তাঁহার একান্ত অনুরাগিনী হইয়া পড়িয়াছেন। এ অবস্থায় আমার সঙ্গিনীর হৃদয়ে দারুণ কষ্ট দিয়া আমি কিরূপে পিতার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি ?”

কন্যার এ যুক্তি কিন্তু পিতার হৃদয়ে স্থান পাইল না। ইজিয়স্ বিচার-ফলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এথেন্সরাজ থিসিয়স্ কিন্তু এরূপ নিষ্ঠুর-প্রকৃতি ছিলেন না। তিনি অতি কোমল-প্রকৃতি হইলেও দেশের চিরপ্রথা রহিত করিবার ক্ষমতাও তাঁহার ছিল না। চারিদিনের জন্য তিনি হার্ম্মিয়াকে ভাবিবার সময় দিলেন।

আজ্ঞা করিলেন, "এই চারিদিনের পরও যদি দেখি, তোমার পিতার সহিত তুমি একমত হইতে না পারিয়াছ, তবে তোমাকে জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইবে!"

(২)

হার্মিয়া ব্যথিত হৃদয়ে লাইসাণ্ডারের সহিত দেখা করিলেন। লাইসাণ্ডার সকল কথাই শুনিলেন। প্রেমিক প্রেমিকা তখন পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রবল প্রেম ও ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া অধিকতর ব্যথিত হইলেন।

কন্যার প্রতি পিতার এইরূপ ব্যবহার কেবলমাত্র এথেন্সনগরীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। এথেন্সের বাহিরে এই নিষ্ঠুর রাজ-নিয়ম ছিল না। স্বীয় প্রণয়িনী হার্মিয়াকে এই নিষ্ঠুর দেশের, নিষ্ঠুর নিয়মের হস্ত হইতে কিরূপে রক্ষা করিবেন, লাইসাণ্ডার তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে বুঝিলেন, এ দেশ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু কোথায় যাইবেন? তাঁহার মনে পড়িল, এথেন্স হইতে কিছু দূরে, তাঁহার এক পিতৃব্য-পত্নী আছেন। হার্মিয়াকে সেখানে লইয়া যাইতে পারিলে, তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "প্রিয়তমে! আমি এক উপায় ঠিক করিয়াছি। আজি-ই রাত্রে তুমি তোমার পিতৃ-গৃহ ত্যাগ করিয়া এস। চল, তোমায় আমায় এখান হইতে চলিয়া যাই। যেখানে আমার পিতৃব্য-পত্নী আছেন, তোমাকে সেইখানে রাখিব এবং সেই স্থানেই নির্ব্বিঘ্নে তোমার আমার বিবাহ সম্পন্ন হইবে।"

হার্মিয়া সকল কথা শুনিলেন, শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। এবং পিতৃগৃহ ত্যাগ করাই উচিত বিবেচনা করিলেন। হার্মিয়ার সম্মতি পাইয়া লাইসাণ্ডার বলিলেন, "তবে তুমি প্রস্তুত হও। এই নগরের বাহিরে, সেই যে কানন,—যেখানে তোমার বাল্য-সহচরী হেলেনাকে লইয়া তুমি আমি মধুময় বসন্তকালে ভ্রমণ করিতাম;—সেই কাননে আমি আজ তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিব।"

ফুল্ল-হৃদয়ে হার্ম্মিয়া গৃহে ফিরিলেন, গৃহ-ত্যাগ করিবার কথা আর কাহারও কাছে প্রকাশ করিলেন না,—কেবলমাত্র বাল্যসহচরী হেলেনার নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

ভালবাসার মোহে অনেক সুন্দরী অনেক সময় অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন। হেলেনাও সময় গুণে সেইরূপ একটা অন্যায় কাজ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

আমরা বলিয়াছি, হেলেনা, ডিমিট্রিয়াসের প্রতি অনুরাগিণী। ডিমিট্রিয়াসের কিন্তু হার্ম্মিয়ার সহিত বিবাহ-প্রসঙ্গ হইতেছিল এবং ডিমিট্রিয়াস্ হার্ম্মিয়ারই কিছু পক্ষপাতী। সুতরাং হেলেনা নায়কের অনাদৃতা। অনাদৃতা হইলেও প্রেম-আশা কিন্তু একেবারে ছাড়ে নাই।—আজ ডিমিট্রিয়াসের নিকট হার্ম্মিয়ার মনোভাব প্রকাশ করিল। তাহাতে হেলেনার যে বিশেষ কোন উপকার হইবে, এমন আশাও ছিল না।—তবে একটা কথা এই, হার্ম্মিয়ার পলায়নবৃত্তান্ত জানিতে পারিলে, ডিমিট্রিয়াস্ কোন্ না তাহার অনুসন্ধানে বাহির হইবেন? এবং তাহা হইলে হেলেনাও সেই সঙ্গে ডিমিট্রিয়াসের সঙ্গে থাকিয়া নানা প্রকার কথোপকথনে কিছুক্ষণ ভ্রমণ করিবে। কেবল মাত্র এই আশাটুকুর জন্য, হেলেনা শৈশব-সঙ্গিনী, সরল-হৃদয়া হার্ম্মিয়ার বিশ্বাস ভঙ্গ করিল।

(৩)

লাইসাণ্ডার ও হার্মিয়া যে কাননে আসিয়া পরস্পরে দেখা করিবেন কথা ছিল, পরীগণ আসিয়া সেই কাননে সর্ব্বদা পরিভ্রমণ করিত। অবারণ্—পরীর রাজা, টিটানিয়া—রাণী। রাজা ও রাণী অনুচর সকলকে লইয়া নিশীথ সময়ে আনন্দ-উল্লাসে সেই কানন পরিপূর্ণ করিতেন।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে পরীর রাজা ও রাণীর পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। শুভ্র জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে, বৃক্ষবল্লরী-সমাকীর্ণ কানন-পথে কেহ কাহারও সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতেন না। যদি কখন দেখা হইত, পরস্পরের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইত। কলহটা এতদূর দাঁড়াইত যে, অনুচরেরা ভয়ে যে যেখানে পাইত, লুকাইয়া পড়িত।

রাজা-রাণীর এই কলহের একটা কারণ ঘটিয়াছিল। টিটানিয়া একটী মাতৃহীন বালককে প্রতিপালন করিতেছিলেন। বালকের মাতা টিটানিয়ার প্রিয়সখী ছিলেন। মাতার মৃত্যু হইলে টিটানিয়া কাননে বালকটীকে লইয়া আপন পুত্র ভাবে রক্ষা করিতেছিলেন। রাজার ইচ্ছা, বালকটীকে আপন ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করেন। রাণী তাহাতে সম্মত হন নাই। ইহাই বিবাদের কারণ।

যে রজনীতে লাইসাণ্ডার ও হার্মিয়া সেই কাননে উপস্থিত হইবেন, সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে টিটানিয়া সখীগণ সমভিব্যাহারে বন-বিহার করিতেছিলেন। ঘটনাক্রমে পরীরাজ অবারণ্ও সেই খানে উপস্থিত হইলেন। রাজা রাণীর পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। তখন উভয়ের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ চলিতে লাগিল।

রাজা। গর্ব্বিতে! বড় অশুভক্ষণে আজ এই কৌমুদী-নিশীথে তোমার সহিত দেখা হইল।

রাণী। বাঃ, একে! এ যে দেখিতেছি, কলহপ্রিয় অবারণ্! চল সখীগণ, আমরা এখান হইতে চলিয়া যাই। আমি শপথ করিয়াছি, উহার সহিত একত্র থাকিব না।

রাজা। টিটেনিয়া, অপেক্ষা কর, চলিয়া যাইও না। আমি কি তোমার স্বামী নহি? আমার প্রতি এরূপ আচরণ কেন? বালকটীকে আমায় দাও, এ মনোবিবাদ মিটিয়া যাক্।

রাণী। মহারাজ! ক্ষান্ত হও! তোমার সমস্ত পরীরাজ্য বিনিময়েও এ বালকটীকে পাইবে না।

এই বলিয়া ক্রোধভরে রাণী চলিয়া গেলেন।

রাজা। তবে যাও গর্ব্বিতে!—কিন্তু দেখিও, কল্যই প্রত্যূষে এই অবমাননার প্রতিফল পাইবে।

(৪)

পক্ নামে রাজার এক প্রধান অনুচর ছিল। সে বড় কৌতুকপ্রিয় ও ধূর্ত্ত। সেই কানন-সন্নিহিত গ্রামগুলিতে পকের অনেক উপদ্রব ছিল। শঠ-রাজ যখন দেখিত, কোন গোপ-বধূ দুগ্ধ মন্থন করিয়া নবনী প্রস্তুত করিতেছে, অমনি ইচ্ছা হইত সেই মন্থনদণ্ডের উপরে উঠিয়া নৃত্য করে। পকের যে ইচ্ছা সেই কাজ! গোপবধূর হস্ত-সঞ্চালিত মন্থন-দণ্ড যেমন চারিদিকে ঘুরিত ফিরিত, সেই সঙ্গে সঙ্গে পকও অঙ্গভঙ্গিসহকারে নৃত্য করিত। তখন সহস্র চেষ্টা করিয়াও গোপবধূ একটুকুও নবনী প্রস্তুত করিতে পারিত না। যখন কতকগুলি গ্রামবাসী একত্রিত হইয়া আনন্দে সুরাপান করিতে থাকে, পক্ হয়ত তখন একটা সিদ্ধ-কাঁকড়ার আকার ধারণ করিয়া তাহাদের পানপাত্রের মধ্যে পড়িয়া থাকিত। যখন কোন্ বৃদ্ধা জলপান করিতে

যাইত, পক্‌ অমনি সেখানে উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই বৃদ্ধার অধরোষ্ঠ এমনই ভাবে কাঁপাইয়া দিত যে, সমস্ত জল বৃদ্ধার চিবুক গড়াইয়া পড়িয়া যাইত। বৃদ্ধা আবার যখন প্রতিবাসিনীগণকে ডাকিয়া একটা টুলের উপর বসিয়া সেই দুঃখের কথা বলিত, পক্‌ তখন অলক্ষিতভাবে সেই টুলখানি সরাইয়া লইত ;—বৃদ্ধা পড়িয়া যাইত ;—সমবেত প্রতিবাসিনীগণ অমনি হো হো হাসিয়া উঠিত। পকের ক্রীড়া ও কৌতুক এইরূপ নানা প্রকার।

পরীরাজের আদেশে পক্‌ আসিয়া সেই কাননে উপস্থিত হইল। তখন পক্‌কে নিকটে পাইয়া রাজা আজ্ঞা করিলেন, "দেখ পক্‌! তুমি শুনিয়াছ, এমন কতকগুলি ফুল আছে,—প্রেমিকা রমণীগণ যাহাকে সোহাগ-কুসুম বলিয়া থাকে,—আজি আমাকে গোটাকত সেই সোহাগ-কুসুম আনিয়া দাও। সেই রঙ্গিলা ফুলের রস নিদ্রিতের চক্ষে লেপন করিলে সেই জন নিদ্রাভঙ্গে যাহাকে সর্ব্বপ্রথম দেখিবে, তাহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িবে। আজি আমার টিটানিয়া সুন্দরী যখন নিদ্রিত হইবে, আমি সেই কুসুম-রস তাহার চক্ষে লেপিয়া দিব। ধনী চক্ষু মেলিয়া যখন চাহিবেন, সিংহ হোক, ভল্লুক হোক, বানর হোক,—যাহাকে প্রথম দেখিবেন, তাহার প্রেমে পড়িতেই হইবে। অবশ্য অন্য পুষ্পরসে এ মোহ আবার আমি দূর করিয়া দিতে পারিব। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না রাণীর তেজ কমে, যে পর্য্যন্ত না রাণী সেই বালকটীকে আমায় দেয়, সে পর্য্যন্ত তাহার মোহ দূর করিব না।"

কৌতুকপ্রিয় পক্‌ মনের মত কাজ পাইল,—হৃষ্টান্তঃকরণে সে প্রভুর আদেশ পালন করিতে ছুটিল!

---

(৫)

পক্‌ পুষ্প অন্বেষণে বাহির হইল ; অবারণ তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে তিনি দেখিলেন, ডিমিট্রিয়াস্‌ ও হেলেনা সেই কাননে প্রবেশ করিল। তখন এই যুবক যুবতীর মধ্যে বচসা চলিতেছে। ডিমিট্রিয়াস্‌ বলিতেছেন, "হেলেনা, কেন তুমি আমার সঙ্গে আসিলে? তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ কর। আমি তোমাকে চাহি না, তথাপি কেন তুমি আমার মায়া ছাড়িতে পার না?"

হেলেনা সে কথা শুনিল না। সে পূর্ব্ব-প্রণয় স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল। সরল শৈশবের সেই ভালবাসা, পরস্পরের প্রতি হৃদয়ের বিশ্বাস, ভবিষ্যতে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইবার প্রতিজ্ঞা—একে একে কত কথাই তুলিল। কিন্তু ডিমিট্রিয়াস্‌কে কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিল না। সেই বিজন অরণ্যে প্রেমপাগলিনী হেলেনাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া, ডিমিট্রিয়াস্‌ প্রস্থান করিলেন। হেলেনাও যথাসাধ্য তাঁহার অনুসরণ করিল।

পরীরাজ অবারণের হৃদয় হেলেনার দুঃখে কাতর হইল। সরল-হৃদয় প্রেমিক প্রেমিকার প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্নেহ ছিল। পাঠকের স্মরণ আছে, ইতিপূর্ব্বে লাইসাণ্ডার বলিয়াছেন যে, হেলেনাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহারা অনেক বার জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীতে এই কাননে ভ্রমণ করিতে আসিতেন। হয়ত অবারণ সেই সময়ে হেলনা ও ডিমিট্রিয়াসের প্রণয়ানুরাগ দেখিয়া থাকিবেন।

যখন পক্‌ প্রেম-কুসুম লইয়া ফিরিয়া আসিল, অবারণ বলিলেন, "দেখ পক্‌, তোমাকে একটী কার্য্য করিতে হইবে। আজ এথেন্সবাসী এক যুবক ও যুবতী এই কানন

মধ্যে আসিয়াছে। যুবতী, প্রণয়োন্মাদিনী; যুবক কিন্তু তাহার প্রতি ফিরিয়াও চাহে না। যখন তুমি সেই যুবককে নিদ্রিত দেখিবে, তাহার চক্ষে এ পুষ্পরস মাখাইয়া দিও। কিন্তু এ কার্য্য এমন সময়ে করিবে, যেন ঐ যুবক নিদ্রা-ভঙ্গে তাহারই পার্শ্বে সেই অনাদৃতা যুবতীকে দেখিতে পায়। সেই যুবককে চিনিতে তোমার কষ্ট হইবে না;—এথেন্সবাসীর পরিচ্ছদেই তাহাকে চিনিতে পারিবে।

চতুরতার সহিত পক্ এ কার্য্য সমাধা করিতে পারিবে, অঙ্গীকার করিল।

---

(৬)

পরীরাজ অবারণ্ তখন রাণী টিটানিয়ার উদ্দেশে চলিলেন। রাণী তখন আপন কুঞ্জে শয়নের উদ্যোগ করিতেছিলেন। নদী-সৈকতে বেলা, চামেলি, গোলাপ, গন্ধরাজ প্রভৃতি কুসুম গন্ধে আমোদিত, শ্যামশোভায়-সমাকীর্ণ-বৃক্ষ-বল্লরী-সমাচ্ছাদিত কুঞ্জকুটীরে পরীরাণীর শয়ন স্থান। অবারণ্, সেইখানেই তাঁহাকে দেখিলেন। তিনি শুনিলেন, রাণীর নিদ্রাকালে, কোন্ সহচরী কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, রাণী একে একে তাহা বলিয়া দিতেছেন। রাণী কাহাকে বলিতেছেন, "কুসুম-কোরক হইতে কীটগুলি বাছিয়া ফেল।" কাহাকে বলিতেছেন, "আমার নিদ্রাকালে কর্কশ-কণ্ঠ পেচক কাছে আসিতে দিও না।" এইরূপ সকলকে এক একটা কাজের ভার দিয়া শেষে বলিলেন, "সখীগণ! তোমরা একটা গান কর, আমি নিদ্রা যাই।"

তখন সখীগণ মিলিয়া সমস্বরে এক মনোমোহকর, সুরসাল, সুখ-শান্তিময় গান ধরিল;—

বেহাগ—আড়াঠেকা।

দূর হ রে অমঙ্গল, পাপ তাপ ভয়,
পরীর ঈশ্বরী যাবে নিদ্রা এ সময়।
হাস হে চন্দ্রমা বিমল কিরণে,
ঢাল সুধারাশি এ কুঞ্জ-কাননে,
গাও রে পাপিয়া সুমধুর তানে
ফুল্ল-ফুল-বাস আন হে পবন;—
পেচক মশক, সজারু সর্পক,
দূর হ রে যত বালাই কণ্টক,
ডাইন-ডাকিনী-ইন্দ্রজাল-মন্ত্র
এস না—প'শ না নিকুঞ্জ-আলয়॥

সখীদের গানে রাণী নিদ্রিতা হইলে সখীগণও স্ব স্ব কার্য্যে প্রস্থান করিল।

অবারণও এই অবসরে টিটানিয়ার শয্যা-পার্শ্বে আসিলেন। নিদ্রিতা রাণীর চক্ষে সেই পুষ্পরস মাখাইয়া দিলেন। বলিয়া গেলেন,—

"নিদ্রা অবসানে উঠে, দেখিবে যাহারে,
সেই হ'বে প্রাণেশ্বর,—নিও বুকে তারে।" *

---

(৭)

এখন হার্মিয়ার কথা কিছু বলি। পিতার মনোনীত পাত্রে আত্মসমর্পণ করিতে অসম্মত হইয়া হার্মিয়া স্বীয় প্রণয়ী লাইসাণ্ডারের পরামর্শ মত পিতৃ-গৃহ হইতে পলায়ন করেন। লাইসাণ্ডারের পিতৃব্যপত্নী-ভবনে আসিবার পথে এই কানন মধ্যে হার্মিয়া দেখিলেন, পূর্ব্বসঙ্কেতমত লাইসাণ্ডার তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন।

পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে আনন্দের সহিত তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানাভিমুখে চলিলেন। কিন্তু অধিক পথ যাইতে-না-যাইতে হার্মিয়া পথ-শ্রান্তিতে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। যে রমণী আপনার বিশ্বাস ও প্রেম সকল প্রকারে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই-রূপে স্বীয় মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহার

* এই স্থানের ছবিখানি পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

অবারণ্ ও টিটানিয়া।



যাহাতে কোন প্রকারে কষ্ট না হয়, লাইসাণ্ডার সে বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। প্রণয়িনীকে পথশ্রান্ত দেখিয়া নিকটে একটী তৃণ-শষ্প-সমাচ্ছন্ন স্থান পাইয়া সেইখানে বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন এবং প্রাতেঃ উঠিয়া পুনর্ব্বার চলিতে থাকিবেন, এইরূপ স্থির করিলেন। *

সেই তৃণশষ্পসমাচ্ছন্ন ভূমিতলে পথশ্রান্তা হার্ম্মিয়া শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূতা হইলেন। লাইসাণ্ডারও কিয়দ্দূরে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন।

(৮)

প্রভুর আদেশ পালন করিবার জন্য পক্ প্রস্তুত হইল। সেই তৃণশষ্পসমাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ডের উপর যুবক যুবতীকে দেখিয়া, পক্ মনে করিল, প্রণয়ে অনাদৃতা সেই যুবতী এই এবং তাহার নিষ্ঠুর প্রণয়ী যুবকও এই। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ ভুল বুঝিয়াছিল। নিদ্রিত যুবক যুবতী আর কেহই নহে, লাইসাণ্ডার ও হার্ম্মিয়া;—ডিমিট্রিয়াস্ বা হেলেনা নহে। পক্ তাহা না বুঝিয়া, তাহার প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া, সেই নিদ্রিত যুবক লাইসাণ্ডারের চক্ষে সেই পুষ্পরস ঢালিয়া দিল!

দৈবক্রমে ঘটনা অন্যরূপ হইল। পুষ্পরসের গুণ এই, নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত হইয়া প্রথমে যাহাকে দেখিবে, তাহার প্রতিই অনুরক্ত হইবে। লাইসাণ্ডার জাগ্রত হইয়া দৈবক্রমে প্রথমেই হেলেনাকে দেখিতে পাইলেন। সেই পুষ্পরসের কি আশ্চর্য্য গুণ!—লাইসাণ্ডার তদ্গতপ্রাণা হার্ম্মিয়াকে ভুলিয়া, হেলেনার অনুরাগী হইলেন।

ইতিপূর্ব্বে আমরা বলিয়া আসিয়াছি, হেলেনাকে একাকিনী অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া ডিমিট্রিয়াস্ প্রস্থান করিলেন; হেলেনাও যথাসাধ্য তাঁহার অনুসরণ করিলেন। অনুসরণ

* এ স্থানের ছবিখানি পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

লাইসাণ্ডার ও হার্ম্মিয়া।



করিলেন বটে, কিন্তু চেষ্টা ফলবতী হইল না। হেলেনা ডিমিট্রিয়াস্ হইতে অনেকদূর পিছাইয়া পড়িলেন। ডিমিট্রিয়াস্ ততক্ষণে তাঁহার অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন।

এইরূপে পরিত্যক্তা, অসহায়া হেলেনা, একাকিনী সেই বনমধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে—যেখানে লাইসাণ্ডার ও হার্ম্মিয়া নিদ্রিত ছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। লাইসাণ্ডারকে সেই স্থানে তেমনই ভাবে নিদ্রিত থাকিতে দেখিয়া হেলেনা কিছু বিস্মিত হইলেন; মনে মনে ভাবিলেন, 'দেখিতেছি, লাইসাণ্ডার ভূমিতলে পড়িয়া আছেন;—নিদ্রিত না মৃত?' এই ভাবিয়া লাইসাণ্ডারকে স্পর্শ করিলেন। ধীরে ধীরে ডাকিলেন, "যদি তুমি বাঁচিয়া থাক, তবে জাগ্রত হও।"

লাইসাণ্ডারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। জাগ্রত হইবামাত্র প্রথমেই তিনি হেলেনাকে দেখিলেন;—পুষ্পরসের প্রভাবে তাঁহারই প্রতি অনুরক্ত হইলেন। তখন লাইসাণ্ডার নবপ্রেমিকের মত হেলেনার রূপ ও সৌন্দর্য্য লইয়া নানারূপে সুন্দরীকে আপন মনোভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সে উন্মত্ততায় প্রাণাধিকা হার্ম্মিয়া ভাসিয়া গেল। হেলেনাই এক্ষণে তাঁহার হৃদয়-রাজ্য সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিল।

ব্যাপারখানা কিন্তু হেলেনার বড় ভাল লাগিল না। সে বুঝিল অন্যরূপ। তাহার অবিদিত ছিল না যে, লাইসাণ্ডার হার্ম্মিয়ার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী এবং তাহার সহিত বিবাহেও প্রতিশ্রুত। অথচ লাইসাণ্ডারের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া ও সহসা তাঁহার হৃদয়ের এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া, হেলেনা কিছু বিস্মিত হইল, কিছু রুষ্টও হইল। তাহার মনে হইল, লাইসাণ্ডার তাহাকে উপহাস করিতেছে।

হেলেনা দুঃখ-অভিমানভরে বলিতে লাগিল, "হায়, জানিতাম না, সকলের উপহাসের পাত্রী হইয়াই এ. অভাগী জন্মগ্রহণ করিয়াছে! ডিমিট্রিয়াস্‌কে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসি; তাহার বিনিময়—প্রত্যাখ্যান বৈ আর কিছু পাইলাম না! একটু ভাল কথা, কি একটু সদয় দৃষ্টি, কিছুই পাইলাম না। সেই দুঃখেই মর্ম্মাহত হইয়া আছি! তাহার উপর তোমার এই কঠোর উপহাস!—ছিঃ! আমি জানিতাম না যে, তুমি এত অভদ্র, নীচ ও অসৎ।"

এই বলিয়া ক্রোধভরে হেলেনা সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। লাইসাণ্ডারও মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন;—অসহায়া, নিদ্রিতা হার্ম্মিয়ার পানে একবার চাহিলেনও না!

---

(৯)

হার্ম্মিয়া নিদ্রাভঙ্গে দেখিলেন, সেই বিজন বনে তিনি একাকিনী;—পার্শ্বে লাইসাণ্ডার নাই! লাইসাণ্ডার কোথায় চলিয়া গেলেন, তাঁহার কি হইল, ভাবিতে ভাবিতে হার্ম্মিয়া কাননের চারিদিক অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

এদিকে ডিমিট্রিয়াস্‌ হেলেনাকে পরিত্যাগ করিয়া অনেক দূর চলিয়া গেলেন। কিন্তু যে জন্য তাঁহার এই কাননে আসা, তাহার কিছুই হইল না।—হার্ম্মিয়া বা লাইসাণ্ডারের কোন সন্ধান তিনি পাইলেন না। কানন মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, বিশ্রামার্থ একস্থানে উপবেশন করিলেন, ক্ষণপরে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

পরীরাজ অবারণ্‌ ডিমিট্রিয়াস্‌কে সেই নিদ্রিত অবস্থায় দেখিলেন।

অবারণ্‌ বিবিধ প্রশ্নে বুঝিয়াছিলেন, পক্‌ তাঁহার আদেশ পালনে বিপরীত ফল ঘটাইয়াছে। ভুলক্রমে সে অন্যব্যক্তির চক্ষে সেই পুষ্পরস ঢালিয়া দিয়াছে। কাজেই অবারণ্‌ নিজ-হস্তে সেই পুষ্পরস নিদ্রিত ডিমিট্রিয়সের চক্ষে ঢালিয়া দিলেন। ডিমিট্রিয়স্‌ জাগ্রত হইয়াই সম্মুখে দেখিলেন, হেলেনা। পুষ্পরস প্রভাবে ডিমিট্রিয়াস্‌ তৎক্ষণাৎ হেলেনার প্রতি অনুরক্ত হইলেন এবং নানাপ্রকার চাটু-বাক্যে সুন্দরীর গুণ-গান আরম্ভ করিয়া দিলেন!

এদিকে পরিত্যক্তা হার্ম্মিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে লাইসাণ্ডারকে পাইলেন। ঘটনাক্রমে সকলেই একস্থানে মিলিত হইলেন। রহস্যটাও জমিয়া গেল।

অনাদৃতা হেলেনারই স্বীয় প্রণয়-পাত্রকে খুঁজিবার কথা। কিন্তু পকের ভ্রম ক্রমে, হার্ম্মিয়ার উপর এখন সেই ভার পড়িল।

সেই রঙ্গস্থল তখন বড় সুন্দর ভাব ধারণ করিল। হার্ম্মিয়াই এক্ষণে অনাদৃতা, আর হেলেনা দুইজন নায়কের আরাধ্যা!

হেলেনা, এই অভিনব রহস্যের কোন মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারিল না। প্রত্যুত, সে বিস্ময়বিস্ফারিত-নেত্রে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, ডিমিট্রিয়স্‌ ও লাইসাণ্ডার দুইজনে মিলিয়াই আজ তাহাকে উপহাস করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে!

হার্ম্মিয়ার বিস্ময়ও হেলেনার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে! যে লাইসাণ্ডার ও ডিমিট্রিয়াস্‌ দুই জনেই তাঁহাকে আন্তরিক ভাল বাসিতেন, আজ তাঁহারা দুই জনেই এককালে হেলেনার উপর অনুরক্ত হইলেন! ইহার মর্ম্ম তিনি কিছুই বুঝিতে না পারিলেও পরিহাস বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হইল না।

দুই যুবতীতে তখন কলহ বাধিল। শৈশব-কাল হইতেই দু'জনাই দু'জনার বড় প্রিয় ছিল। জীবনের মাঝখানটাতে পরস্পরের আজ মনোমালিন্য ঘটিল। হেলেনা বলিল,

"হার্ম্মিয়া, তুমি কি কঠোর-হৃদয়া! আমার প্রতি লাইসাণ্ডারের এমনই-তর ব্যবহার তুমিই শিখাইয়া দিয়াছ। আর তোমার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ডিমিট্রিয়াস্—এখন আমি যাঁহার দুটী চক্ষের বিষ হইয়াছি,—যিনি আমার ছায়া মাড়াইতেও ঘৃণা বোধ করেন;—সেই ডিমিট্রিয়াস্‌ও যে আজ আমায় এমন মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতেছেন, ইহাও তোমার কাজ! আমাকে এমনই করিয়া উপহাস করা কি তোমার উচিত? শৈশবে, পাঠাভ্যাস কালে, সেই সৌহার্দ্দ আজ কি ভুলিয়া গেলে? মনে করিয়া দেখ দেখি, কতবার তোমায় আমায় একত্র একই আসনে বসিয়া, একই গীত গাহিতে গাহিতে, একই কার্পেটে দুই জনে একই ফুল বুনিয়াছি! একই বৃন্তে দুইটী ফলের ন্যায় অভিন্ন-হৃদয়ে দুইজনে বর্দ্ধিত হইয়াছি!—আজি এই ব্যবহার!—পুরুষের সহিত যোগ দিয়া, শৈশব সঙ্গিনীকে এমনই-তর অপমান করা বন্ধুত্বের উচ্চ আদর্শ?—না, কুমারীর উচিত ধর্ম্ম?"

হার্ম্মিয়া। তোমার ক্রোধ দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইতেছি। তুমি আমার অনাদরের পাত্রী নহ। বরং আজি বোধ হইতেছে, আমি-ই তোমার অনাদৃতা।

হেলেনা। তোমার অন্তরে ও বাহিরে এক দেখিতেছি না। মুখে দেখিতেছি, যেন কিছুই জান না;—কিন্তু আমি পিছন ফিরিলেই অঙ্গ ভঙ্গী ও ইসারা প্রভৃতি দ্বারা বিদ্রূপ কর। বুঝিলাম, তোমার হৃদয়ে স্নেহ, দয়া, মায়া কিছুই নাই। থাকিলে, আমায় লইয়া এমনতর করিতে না।"

যুবতীদ্বয়ের মধ্যে যখন এইরূপ বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছিল, তখন ডিমিট্রিয়াস্ ও লাইসাণ্ডার কোথায়?—দুই জনে একই রমণীর প্রতি অনুরক্ত হইয়া, কাননের অন্যতম প্রদেশে গমন করিয়া, যুদ্ধে পরস্পরকে পরাভব করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহারা নিকটে নাই দেখিয়া যুবতীদ্বয়ও তাঁহাদের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

---

(১০)

পক্-সমভিব্যাহারে পরীরাজ অবারণ্ অলক্ষ্যে থাকিয়া এই সমস্ত ব্যাপার সম্যক্ অবগত হইলেন। অবারণ বলিলেন, "পক্, এ সমস্ত তোমারই অসাবধানতার ফল?—না ইচ্ছা করিয়াই তুমি এরূপ করিয়াছ?"

পক্। রাজন্! আমায় বিশ্বাস করুন,—ভুল ক্রমেই এরূপ ঘটিয়াছে। আপনি কেবলমাত্র বলিয়া দিয়াছিলেন, এথেন্স-বাসীর পরিচ্ছদে আমি সেই যুবককে চিনিতে পারিব! অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমার কোন দোষ নাই। কিন্তু যাই হোক, যাহা ঘটিয়াছে, ইহা একটী মন্দ কৌতুক নয়!

অবারণ্। কিন্তু ইহাও ত শুনিলে ডিমিট্রিয়াস্ ও লাইসাণ্ডার পরস্পরে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। যাই হোক, আমি তোমায় অনুমতি করিতেছি, তুমি এখনই এই রাত্রিতে এই অরণ্যানী ঘোর কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন কর এবং চারিদিকে অন্ধকার ঢালিয়া দাও,—যেন পরস্পরে পথ-হারা হয়! কেহ কাহাকে দেখিতে না পায়! আর তুমি ঐ দুই যুবকের স্বর অনুকরণ করিয়া—যেন একজন অন্যের প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছে,—এইরূপ ভ্রম জন্মাইয়া দিয়া, দুই জনকে বিপরীত পথে লইয়া যাও। যখন দেখিবে, পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া তাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তখন,—আমি আ একটী পুষ্প দিতেছি,—ইহার রস লইয়া লাইসাণ্ডারের চক্ষে ঢালিয়া দিও; তাহ হইলে হেলেনার জন্য এই নূতন মত্ততা তাহার আর থাকিবে না। আবার পূর্ব্বে

সেই স্বাভাবিক-প্রেম ফিরিয়া আসিবে, আবার হার্মিয়াকে তেমনই করিয়া আপনার ভাবিবে এবং তাহা হইলে সেই দুই যুবতী পরস্পরের মনোনীত পাত্র লাভে পরস্পরে সুখী হইবে, উভয়ের মনোমালিন্যও দূর হইবে। তখন সকলে বুঝিবে, যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহার কিছুই সত্য নহে;—মনে হইবে, আজিকার নিশীথের একটা স্বপ্ন দেখিয়াছে মাত্র। যাও পক্‌, যাহা বলিলাম, তাহা কর। আমি এখন দেখি গিয়া, আমার টিটানিয়া সুন্দরী কি করিতেছেন!

(১১)

টিটানিয়া তখনও নিদ্রিত ছিলেন। অবারণ্‌ দেখিলেন, একজন পথভ্রান্ত, বোকা-হাবা, রাণীর লতাকুঞ্জের অনতিদূরে শয়ন করিয়া আছে। পরীরাজ সেই জীবটির মস্তকে একটা গর্দ্দভের মুখস পরাইয়া দিলেন। মুখসটী এমনই খাপ্‌ খাইল যে, তাহা স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ভাবিলেন, "এই জীবটীকেই মদ-গর্ব্বিতা টিটানিয়ার সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে। জাগ্রত হইয়া ইহার প্রতি চাহিবামাত্র, গর্ব্বিতা-রাণী ইহার অনুরাগিনী হইবে।"

গর্দ্দভের মুখসটি, ধীরে ধীরে পরাইলেও সেই নির্ব্বোধের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গে সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। বুঝিতে পারিল না যে, তাহার আবার এক নূতন শোভা হইয়াছে! তখন সে, রাণী যেখানে নিদ্রিত ছিলেন, সেই লতামণ্ডপ-অভিমুখে চলিতে লাগিল।

টিটানিয়া চক্ষু মেলিবামাত্র সেই অপূর্ব্ব জীবটির প্রতি চাহিলেন। পুষ্পরসের গুণও ধরিল। টিটানিয়া সেই কিম্ভূত-কিমাকার বোকা-হাবাটাকে অতুল সৌন্দর্য্যময় বোধ করিলেন। বিস্ময় সহকারে বলিলেন, "আহা, কি সুন্দর! বুঝি ইনি স্বর্গের কোন দেবতা হইবেন!"

অতঃপর প্রকাশ্যে বলিলেন, তোমাকে যেরূপ রূপবান্‌ দেখিতেছি, তুমি কি তেমনই বুদ্ধিমান্‌?"

মূর্খ চাষা উত্তর করিল, বিশেষ বুদ্ধি আছে কি না, তাহা জানি না। তবে এই বনটা পার হইতে পারিলে বুদ্ধি যথেষ্ট আছে বুঝিব।"

প্রণয়-মুগ্ধা রাণী বলিলেন, "প্রাণাধিক! বনের বাহিরে যাইবার বাসনা পরিত্যাগ কর। আমাকে সামান্য পরী ভাবিও না। আমি তোমাকে ভালবাসিয়াছি। আমার সঙ্গে চল, তোমার সেবার জন্য আমি অনেক পরী নিযুক্ত করিয়া দিব।"

তখন তিনি, চারিজন পরীকে ডাকিয়া তাঁহার নবীন-নাগরের সেবায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন, "তোমরা এই মধুর মূর্ত্তি, ভদ্র মহোদয়ের সেবায় নিযুক্ত থাক। কেহ ইহাঁর সম্মুখে আনন্দ-উল্লাস কর; কেহ সুস্বাদু ফল আনিয়া দাও; কেহ মধুচক্র হইতে মধু ভাঙ্গিয়া আন।"

অতঃপর সোহাগভরে নব-প্রণয়ীকে কহিলেন, "এস এস, বঁধু এস। আমার নিকটে ব'স। আমি তোমার এই রোমরাজিপূর্ণ মনোরম গণ্ডস্থল লইয়া ক্রীড়া করি এবং তোমার এই সুন্দর লম্ব কর্ণ দুটীতে বার বার চুম্বন করিতে থাকি!"

সেই হাবা-বোকা চাষাটা, প্রণয়-বিমুগ্ধা রাণীর সহিত প্রেমালাপ করা অপেক্ষা কিঙ্করীগণের উপর প্রভুত্ব করা সুখকর ও আনন্দজনক বোধ করিয়াছিল। সুতরাং সে কাহাকে ডাকিয়া বলিল, "আমার মাথা আঁচড়াইয়া দাও।" কাহাকে বলিল, "মাছিগুলি তাড়াইয়া দাও।" কাহাকে বলিল, "মধু আহরণ করিয়া

গর্দ্দভ মুখসাবৃত নির্ব্বোধ।



আন। কিন্তু দেখিও, সাবধান!—মধুচক্র ভাঙ্গিয়া মধুস্রোতে যেন তুমি ভাসিয়া যাইও না!"

তারপর আপন মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, "আমার মুখে দেখিতেছি, বিস্তর লোম হইয়াছে। নাপিতের বাড়ী যাইয়া এই সকল পরিষ্কার করিতে হইবে।"

অতঃপর রাণী বলিলেন "প্রিয়তম, প্রাণাধিক! কি খাইবে বল? যদি সুরসাল কোন সুস্বাদু ফল ভক্ষণে অভিলাষ থাকে, তবে আমার কিঙ্করীরা এক্ষণে তাহা আনিয়া উপস্থিত করিবে।"

গর্দ্দভের মুখস পরিয়া, হতভাগ্য, গর্দ্দভের আহারের প্রবৃত্তিও পাইয়াছিল। সে বলিল, "ও সকলে আমার রুচি নাই; যদি পার, তবে কিছু শুকনো মটর আনিয়া দাও। কিন্তু এখন আমার বড় ঘুম আসিতেছে,—তোমার দাসদাসীদিগকে বারণ করিয়া দাও, যেন কেহ আমার বিরক্ত না করে।"

রাণী বলিলেন, "তবে এস, তুমি আমার এই বাহুতে মস্তক রাখিয়া সুখে নিদ্রা যাও। তোমায় আমি কত ভালবাসি, প্রাণাধিক!"

---

(১২)

পরীরাজ অবারণ্ যখন দেখিলেন, রাণীর বাহুলতার মধ্যে সেই জীবটি নিদ্রা যাইতেছে, তখন তিনি রাণীর সম্মুখীন হইলেন এবং রাণীর এই অভিনব প্রণয়াসক্তি দেখিয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

রাণী আর কি বলিবেন,—লুকাইবার চেষ্টাও বৃথা। কেন না, সেই হতভাগা হাবাটা তখনও পর্য্যন্ত রাণীর ভুজপাশে আবদ্ধ হইয়া নিদ্রিত রহিয়াছে! তাহার মস্তকও কুসুম-মালায় পরিশোভিত রহিয়াছে।

অবারণ্, রাণীকে বিস্তর তিরস্কার করিলেন। অতঃপর অবসর বুঝিয়া, মাতৃহীন সেই বালকটীকে পাইবার জন্ত জেদ্ দেখাইলেন।

রাজা স্বয়ং, রাণীকে অন্তের প্রতি আসক্তা দেখিলেন;—লজ্জায় ও ক্ষোভে রাণী তখন আর অস্বীকার করিতে পারিলেন না,—পরীরাজকে বালকটী দিবেন, অঙ্গীকার করিলেন।

এইরূপে অবারণের বহুদিনের বাসনা চরিতার্থ হইল;—বালকটিকে তিনি ভৃত্যরূপে পাইলেন। পুষ্পরসের প্রভাবে রাণীকে এইরূপ দুর্দ্দশার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া রাজা এখন অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। রাণীকে প্রকৃতিস্থ করিবার জন্য, তখন তিনি অন্য পুষ্পের রস রাণীর চক্ষে ঢালিয়া দিলেন। রাণীর আবার পূর্ব্বদৃষ্টি ফিরিয়া আসিল। তিনি তখন সেই গর্দ্দভ-মূর্ত্তি জীবটির প্রতি চাহিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইলেন। সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এই পিশাচমূর্ত্তি হতভাগাটার প্রতি কিরূপে আমি অনুরক্ত হইয়াছিলাম!"

পরীরাজ অবারণ তখন সেই নীরেট মূর্খের মুখ হইতে সেই গর্দ্দভের মুখসটী খুলিয়া লইলেন। হতভাগ্য তখনও নিদ্রা যাইতে লাগিল। কৃত্রিম মুখস উন্মোচিত হইল বটে, কিন্তু তাহার সেই স্বাভাবিক গর্দ্দভ-মস্তিষ্ক তেমনই রহিয়া গেল।

রাজা ও রাণীর এইরূপে পুনর্ম্মিলন সংঘটন হইলে পরীরাজ সেই কানন মধ্যে সেই প্রণয়োন্মত্ত যুবক যুবতীদিগের কথা আনুপূর্ব্বিক রাণীকে জ্ঞাপন করিলেন। ঘটনা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা যথাস্থানে বলিয়া আসিয়াছি; এক্ষণে পরিণাম কি দাঁড়াইল, দেখিবার জন্য রাজা ও রাণী সেইদিকে গেলেন। চলুন পাঠক, আমরাও যাই,—ব্যাপার-খানা কি, দেখি!

---

(১৩)

অবারণ ও টিটানিয়া দেখিলেন যে, সেই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রেমিকদ্বয় নবদূর্ব্বাদলশয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহাদের অনতিদূরে তাঁহাদের স্ব স্ব প্রণয়িনীদ্বয়ও ঘুমাইতেছেন। পক্ তাহার পূর্ব্বভ্রম দূর করিতে এবার সাধ্যমত যত্ন করিয়াছিল এবং কৌশলে সকলকে একত্র করিতেও পারিয়াছিল। অধিকন্তু প্রভু পরীরাজের আদেশমত অন্য পুষ্পের রস, লাইসাণ্ডারের চক্ষে ঢালিয়া দিয়া, তাঁহার মোহ দূর করিয়া দিল।

হার্ম্মিয়া সর্ব্বপ্রথমে জাগিয়া উঠিলেন। তিনি লাইসাণ্ডারকে পার্শ্বে দেখিতে পাইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলেন এবং তাঁহার অব্যবস্থ-চিত্তের কথা ভাবিয়া কিছু আশ্চর্য্যও হইলেন।

লাইসাণ্ডারও নিদ্রাভঙ্গে হার্ম্মিয়াকে দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহার মোহ ঘুচিয়াছে; পূর্ব্বদৃষ্টি তিনি ফিরিয়া পাইয়াছেন; পূর্ব্ব জ্ঞানও ফিরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং এক্ষণে হার্ম্মিয়ার প্রতি সেই পূর্ব্বপ্রেম আবার তেমনই ভাবে ফিরিয়া আসিল। তখন উভয়ে নানা প্রকার প্রণয়-আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। দুই জনের কেহই বুঝিতে পারিলেন না যে, গত রাত্রের ঘটনা সকল বাস্তবিক কি না। উভয়েরই মনে হইল, বোধ হয়, উভয়েই সেই নিদাঘ-নিশীথে একই রকমের স্বপ্ন দেখিয়াছেন!

এদিকে ডিমিট্রিয়াস্‌ ও হেলেনাও জাগ্রত হইলেন। সুনিদ্রায় হেলেনার বিক্ষুব্ধ-হৃদয় শান্ত হইয়াছিল। ডিমিট্রিয়াসের প্রণয়ালাপ এক্ষণে তিনি হৃষ্টান্তঃকরণে শুনিতে লাগিলেন। এখন আর সেই প্রণয়ালাপ, তাঁহার বিদ্রূপ বলিয়া বোধ হইল না। অকপট হৃদয়ের অকৃত্রিম ভালবাসা জানাইয়া উভয়েই উভয়কে সুখী করিলেন।

অতঃপর দুই সখীতেও মিল হইল। হার্ম্মিয়া ও হেলেনার অসদ্ভাবের আর কোন কারণ রহিল না। তখন সকলে মিলিয়া সুহৃৎভাবে পরামর্শ করিতে লাগিলেন, কি

করিলে ভাল হয়। পরামর্শে স্থির হইল, ডিমিট্রিয়াস্ এথেন্সে গিয়া, হার্ম্মিয়ার পিতা ইজিয়াস্‌কে বলিবেন যে, তিনি আর হার্ম্মিয়ার প্রার্থী নন। তাহা হইলেই ইজিয়াস্‌ও কন্যাকে ক্ষমা করিবেন এবং লাইসাণ্ডারের সহিত তাঁহার বিবাহ দিবেন।

এই স্থির হইয়া ডিমিট্রিয়াস্ এথেন্স যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় সকলে দেখিতে পাইলেন, ক্রোধমূর্ত্তি ইজিয়াস্, পলায়িতা কন্যার অনুসন্ধানার্থ সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডিমিট্রিয়াস্ তখন একে একে সকল কথা নিবেদন করিলেন এবং হার্ম্মিয়ার প্রতি প্রসন্ন হইয়া লাইসাণ্ডারের সহিত তাঁহার বিবাহ দিতে অনুরোধ করিলেন।

ইজিয়াস্ তাহাতে সম্মত হইলেন। অধিকন্তু কহিলেন, "ভাল, যে চতুর্থ দিনে রাজবিধি অনুসারে অবাধ্য হার্ম্মিয়ার প্রাণদণ্ডের কথা ছিল, সেই দিন আমি সর্ব্ব সমক্ষে লাইসাণ্ডারের করে কন্যা সমর্পণ করিব!"

অতঃপর, ডিমিট্রিয়াসের সহিত হেলেনারও ঐ দিন শুভ-বিবাহ হইবে স্থির হইল। সকল গোলযোগ মিটিয়া গেল। সকলেই হাসি মুখে, মনের সুখে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

পরীরাজ অবারণ্ ও পরীরাণী টিটানিয়া অলক্ষ্যে থাকিয়া এই মিলনদৃশ্য দেখিতেছিলেন এবং সকলের কথা শুনিতেছিলেন। যখন তাঁহারা দেখিলেন, তাঁহাদের প্রিয় অনুচর পকের কৌশলেই নায়ক-নায়িকাগণের পরস্পরের মিলন হইল, তখন আর তাঁহাদের আনন্দের অবধি রহিল না। রাজা ও রাণীতে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, নায়ক-নায়িকাগণের এই আনন্দ-মিলন-উপলক্ষে তাঁহারাও আপন রাজ্যে আনন্দোৎসব করিবেন।

এদিকে যথা দিনে, শুভক্ষণে, লাইসাণ্ডারের সহিত হার্ম্মিয়ার, ও ডিমিট্রিয়সের সহিত হেলেনার শুভ পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। এই উপলক্ষে সে দিন সমস্ত পরীরাজ্যেও আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। আমার কথাটিও এইখানে ফুরাইল।

যাঁহারা এই গল্পটি উদ্ভট বলিয়া আস্থা না করিবেন, তাঁহারা নিদাঘ-নিশীথে এইরূপ একটা স্বপ্ন দেখিয়াছেন মনে করিলেই চলিবে। বেশী গরমে ত ঘুম হয়ই না;—তা এমনতর পরীর-স্বপ্ন দেখা মন্দ কি?

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

সূর্য্য-গ্রহণ।

সম্প্রতি কলিকাতায় একটী দিব্য সূর্য্য-গ্রহণ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় সর্ব্বগ্রাস হয় নাই, তবে গ্রহণটী নিতান্ত মন্দ হয় নাই। গ্রহণ কি? সে কথা ভাল করিয়া বুঝাইবার এখনও সময় আসে নাই। পাঠকদিগের বিজ্ঞান-শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ অধিকার হইলে, সে কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু গ্রহণ বুঝিতে অঙ্ক-শাস্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন। সেই নিমিত্ত ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিব কিনা, বলিতে পারি না।

চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়া পড়িলে চন্দ্র-গ্রহণ হয়। পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝখানে চন্দ্র আসিয়া আমাদের চক্ষু হইতে সূর্য্যকে আড়াল করিলে সূর্য্য-গ্রহণ হইয়া থাকে। পৃথিবী চন্দ্র অপেক্ষা বড়, পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রকে ভালরূপে আচ্ছন্ন করিতে পারে। সে নিমিত্ত চন্দ্র-গ্রহণ হইলে সকল স্থান হইতেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীকে সেরূপ আচ্ছন্ন করিতে পারে না, সুতরাং সূর্য্য-গ্রহণ

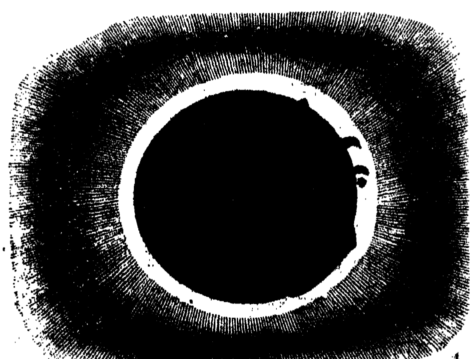
সেই মুহূর্ত্তেই সকল স্থানে হয় না। পৃথিবীর যে স্থান টুকুতে কেবল চন্দ্রের ছায়া পড়ে, সেই স্থানের লোকেই সূর্য্য-গ্রহণ দেখিতে পায়। সূর্য্য; পৃথিবী, চন্দ্র ও গ্রহগণ নভোমণ্ডলে সকলেই অতি দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিতেছে; স্ব স্ব নিয়মিত পথে ভ্রমণ করিয়া পুনরায় পূর্ব্ব স্থানে ফিরিয়া আসিতেছে; তাই কৃষ্ণপক্ষ, শুক্লপক্ষ, মাস, ঋতু, বৎসর হইতেছে। আজ যে স্থানে চন্দ্র আছে, ২২৯ চান্দ্র মাসের পর পুনরায় চন্দ্র সেই স্থানে আসিবে। সুতরাং পূর্ব্ব ২২৯ মাসে যে সমুদয় চন্দ্র-গ্রহণ হইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যৎ ২২৯ মাসেও সেই দিনে সেই ক্ষণে সেইরূপ চন্দ্র-গ্রহণ হইবে। সেই নিমিত্ত চন্দ্র-গ্রহণ গণিয়া বলা কিছু কঠিন কথা নহে।

গ্রহণের কারণ যদিও কেবল একটু ছায়া মাত্র, তথাপি অতি প্রাচীন কাল হইতেই গ্রহণ দেখিয়া লোকের মনে বড়ই আতঙ্ক উপস্থিত হয়। লোকে কত কি ভাবে, কত কি বিপদের আশঙ্কা করে! গ্রহণ বিষয়ে নানা দেশে নানা মত। চীনেরা মনে করে যে, বিপর্য্যয় পক্ষযুক্ত ভয়ানক একটী রাক্ষস অগ্নি উদ্গীরণ করিতে করিতে চন্দ্র কি সূর্য্যকে গিলিয়া ফেলিতে যাইতেছে! পাছে চাঁদটী কি সূর্য্যটীকে একেবারে খাইয়া ফেলে, সেইজন্য ঐ সময়ে কাঁসর ঘণ্টা বাজাইয়া সেই ভয়াবহ রাক্ষসকে দূরীভূত করিতে চেষ্টা করে। প্রাচীন রোমানদিগের মতে চন্দ্র একটী স্ত্রীলোক, নাম লিউনা। রোমানেরা মনে করিত যে, চন্দ্রের প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইলে গ্রহণ হয়। স্বাভাবিক কারণে গ্রহণ হয়, এ কথা কাহারও মুখে আনিবার বো ছিল না, মুখে আনিলে সে মানুষের প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িয়া যাইত। কলম্বস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেন, তখন একবার তাঁহার জাহাজে খাদ্যসামগ্রীর বড় অনটন হইয়াছিল। সে স্থানের লোকে কিছুতেই তাঁহাকে খাদ্যসামগ্রী দিবে না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। সেই সময় কলম্বস গণিয়া দেখিলেন যে, চারি দিন পরে চন্দ্র-গ্রহণ হইবে। তিনি আমেরিকার অসভ্য লোকদিগকে বলিলেন,—"তোমরা যদি শীঘ্র শীঘ্র আমার জাহাজের নিমিত্ত খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিয়া না দাও, তাহা হইলে চারি দিন পরেই চাঁদে গ্রহণ লাগাইয়া দিব।" অসভ্যেরা তাঁহার কথা বিশ্বাস করিল না, খাদ্যসামগ্রীও দিল না। চারি দিন পরে যখন চাঁদে সত্য সত্যই গ্রহণ লাগিল, তখন অসভ্যেরা ভাবিল যে, এ লোকটী মানুষ নয়, দেবতা হইবে; মানুষে ইচ্ছা করিয়া কোন্ কালে আবার চাঁদে গ্রহণ লাগাইয়া দিতে পারে? কলম্বস যা চাহিলেন, অবিলম্বে তাহারা আনিয়া দিল।

সর্ব্বগ্রাস সূর্য্য-গ্রহণ হইলে সত্য সত্যই মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইবার কথা। কোথায় কিছু নাই, সহসা দিনের বেলা পৃথিবীতে অন্ধকার উপস্থিত হইল! ফরাসী দেশের পণ্ডিত আরাগো সাহেব বলেন যে, এইরূপ গ্রহণের সময় জীব-জন্তুও ভয়ে আকুল হয়। তিনি বলেন যে,—"একটী ক্ষুধার্ত্ত কুকুর খাবার খাইতেছিল, যেই অন্ধকার উপস্থিত হইল, আর সে খাদ্য পরিত্যাগ করিয়া ভয়ে সে স্থান হইতে পলাইল। এক ঝাঁক পিপীলিকা আহার আহরণ করিতেছিল, যেই অন্ধকার আসিল, আর যে যেখানে ছিল, সেই স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এক পাল গরু চক্রাকার হইয়া দাঁড়াইল, ও আপনাদিগকে যেন কোনও এক আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত শৃঙ্গ পাতিয়া রহিল। বাবলা-জাতীয় বৃক্ষসমূহ নিদ্রা যাইবার নিমিত্ত আপনাদিগের পত্র মুদ্রিত করিল।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চন্দ্র পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ২৯ দিনে চন্দ্র

একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। এই ঘুরিবার সময় চন্দ্র কখনও পৃথিবীর নিকটে থাকে, কখনও একটু দূরে যায়। যখন পৃথিবীর নিকটে থাকে, তখন সূর্য্য অপেক্ষা চন্দ্রকে একটু বড় দেখায়; যখন দূরে যায়, তখন ছোট দেখায়। যে সময় চন্দ্রকে বড় দেখায়, সেই সময় যদি সর্ব্বগ্রাস-সূর্য্যগ্রহণ হয়, তাহা হইলে সূর্য্যটী একেবারে ঢাকিয়া যায়, পৃথিবী সম্পূর্ণরূপ অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ে; তবে সমুদয় পৃথিবী নয়, যে স্থান হইতে গ্রহণ দেখা যায় কেবল সেই স্থানে। যখন চন্দ্রকে ছোট দেখায়, তখন যদি সর্ব্বগ্রাস-সূর্য্যগ্রহণ হয়, তাহা হইলে সূর্য্যটী সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া যায় না, চারি দিকে একটী আংটীর মত উজ্জ্বল রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ গ্রহণকে আনুলার (Annular) বলে।



যে স্থান হইতে এবার সর্ব্বগ্রাস-সূর্য্যগ্রহণ দেখা গিয়াছিল, সে স্থানে এই আনুলার গ্রহণ হইয়াছিল। আনুলার গ্রহণের সময় সূর্য্যের চারি পাশে সেই যে আংটীর মত উজ্জ্বল রেখাটী রহিয়া যায়, তাহা হইতে বিপর্য্যয় পর্ব্বতপ্রমাণ অগ্নিস্তম্ভ নির্গত হইতে থাকে। এক একটী অগ্নিস্তম্ভ লক্ষ লক্ষ ক্রোশ উচ্চ। ইহা জলন্ত হাইড্রোজেন গ্যাস। যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস মিশিয়া জল প্রস্তুত হয়।

বায়ু।

মাছ যেরূপ জলের ভিতর থাকে, আমরাও সেইরূপ বায়ুর ভিতর ডুবিয়া আছি। মাছ যেরূপ জল না পাইলে বাঁচে না, আমরাও সেইরূপ বায়ু না পাইলে বাঁচি না। নিশ্বাসের সহিত এই বায়ু লইয়া আমরা জীবিত থাকি। বায়ু স্বচ্ছপদার্থ, তাই আমরা ইহাকে চক্ষে দেখিতে পাই না। কাচ স্বচ্ছপদার্থ, সে নিমিত্ত উত্তমরূপে পরিষ্কৃত হইলে দূর হইতে কাচও চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই মক্ষিকা প্রভৃতি কীট-পতঙ্গ কাচের সারসি দিয়া বাহিরে পলাইতে চেষ্টা করে। ঘরের ভিতর বদ্ধ করিয়া তাড়া দিলে পলাইবার চেষ্টায় চড়ুই পক্ষীও জানালার সারসির উপর গিয়া পড়ে। ইহার কারণ এই যে, স্বচ্ছপদার্থ চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। নির্ব্বোধ চড়ুই পাখী মনে করে, এখানে বুঝি কিছুই নাই, এস্থান বুঝি খোলা, তাই সারসি দিয়া পলাইবার চেষ্টা করে। স্বচ্ছ বলিয়া বায়ুও আমরা চক্ষে দেখিতে পাই না। কিন্তু বায়ু আমরা স্পর্শ করিতে পারি। গ্রীষ্মকালের দিনে মৃদুমন্দ দক্ষিণ-বায়ু আসিয়া আমাদের শরীর সুশীতল করে। পাখা দিয়া আশে পাশের বায়ু একত্র করিয়া আমাদের গায়ে লাগাইয়া সুখানুভব করি। তাহার পর, বায়ুর যে কত বল, তাহা সকলেই জানেন। যখন খরতর স্রোতে বায়ু বহিতে থাকে, তখন পৃথিবী কম্পিত হয়, গাছ-পালা ঘর-বাড়ী সব পড়িয়া যায়।

আকাশের উপর যে স্থানে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র আছে, আমাদের এ বায়ু সে স্থান পর্য্যন্ত নাই। পৃথিবী হইতে বোধ হয় পঁচিশ ক্রোশ উপরে এ বায়ু একেবারেই নাই। সামান্য একটী আবরণের ন্যায় এই বায়ু পৃথিবীকে চারিদিকে ঢাকা দিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবীর এই বায়ু-আবরণটী পঁচিশ ক্রোশ পুরু। পৃথিবী খুব

বড়, তাই আবরণটীও পুরু। পৃথিবী যদি একটী জালার মত ছোট হইত, তাহা হইলে, সেই পরিমাণে, এই আবরণটী এক অঙ্গুলির অধিক পুরু হইত না। বায়ুর যখন বল আছে, তখন বায়ুর ভারও আছে। জল যেরূপ ওজন করিতে পারা যায়, বায়ুও সেইরূপ ওজন করিতে পারা যায়। এক বর্গ ইঞ্চ ভূমির উপর প্রায় সাড়ে সাত সের বায়ু আছে। তবেই ভাবিয়া দেখ, আমাদের মাথার উপর কত মণ বায়ু আছে! কিন্তু চারিদিক্ হইতে বায়ু আমাদিগকে চাপিয়া রাখিয়াছে বলিয়া আমরা অনায়াসে সে ভার বহন করিতে সমর্থ হই, কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ করি না, জানিতেও পারি না যে, মাথার উপরে এত বড় বোঝা রহিয়াছে। মাথায় করিয়া এক ঘড়া জল লইয়া আসিতে কত ক্লেশ হয়; কিন্তু জলের ভিতর যখন ডুব দিই, তখন কত শত ঘড়া জল মাথার উপর থাকে! কিন্তু তাহাতে মাথা ভাঙ্গিয়া যায় না, কিছুমাত্র ক্লেশ হয় না। জল শরীরের চারি দিকে চাপিয়া থাকে বলিয়া, সেই নিমিত্ত ক্লেশ বোধ হয় না। বায়ুও সেইরূপ শরীরের চারিদিকে ঘিরিয়া থাকে বলিয়া বায়ুর ভার আমরা অনুভব করিতে পারিনা। এক অঙ্গুলি অর্থাৎ এক ইঞ্চ ভূমির উপর সাড়ে সাত সের বায়ু থাকে এ কথা মনে করিয়া রাখিতে হইবে। এ কথাটী বিশেষ আবশ্যক। এই কথা লইয়া ইহার পর অনেক বাদানুবাদ হইবে। অগ্নির উত্তাপে জল কেন ফুটিয়া উঠে, জল ফুটিয়া বাষ্প কিরূপে হয়, বাষ্প হইয়া কল কিরূপে চলে, যখন এই সকল কথা বিচার করিব, তখন এই বায়ুর ভারটী আমার আবশ্যক হইবে। প্রতি ইঞ্চ ভূমির উপর বায়ুর চাপ ৴৭॥—সের এই কথাটী মনে করিয়া রাখিবে।

মাটির উপর যেখানে আমরা বাস করি, সেই স্থানে বায়ু বিলক্ষণ গাঢ়। সেই স্থানেই বায়ুর চাপ সাড়ে সাত সের। যতই উপরে যাইবে, ততই দেখিতে পাইবে যে, বায়ুর গাঢ়তা ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিতেছে, বায়ু ক্রমে পাতলা হইয়া আসিতেছে, বায়ু লঘু হইতেছে, বায়ুর ভার কমিয়া আসিতেছে। এইরূপে ক্রমে কম হইয়া হইয়া অবশেষে পঁচিশ ক্রোশ উপরে আর আদৌ বায়ু থাকে না। বড় পাহাড়ের মাথায় বায়ু এইজন্য অতিশয় পাতলা। সে স্থানে বায়ু এত পাতলা যে, নিশ্বাস লইয়া কুলায় না। শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হয়। বায়ু অভাবে নাক কাণ দিয়া রক্ত ফুটিয়া বাহির হয়। বেলুনে চড়িয়া আকাশের উপর উঠিলেও সে স্থানে বায়ুর অভাবে লোকের এইরূপ কষ্ট হয়। পৃথিবীতে তিন ক্রোশের অধিক উচ্চ পর্ব্বত নাই, কিন্তু দুই ক্রোশ উঠিলেই অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তাহা অপেক্ষা অধিক উপরে মনুষ্য আর উঠিতে পারে না।

সে কালের পণ্ডিতেরা বায়ুকে একটী মূল পদার্থ বলিয়া পরিগণিত করিতেন। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূতের মধ্যে বায়ুকে একটী ভূত বলিয়া তাঁহারা গণনা করিতেন। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বায়ু একটী পদার্থ নয়। সচরাচর চারিটী পদার্থ ইহাঁর ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কারবনিক অম্ল ও জল। ইহার মধ্যে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন হইল প্রকৃত বায়ু, কারবনিক অম্ল ও জল বায়ুর সহিত যৎসামান্য ভাবে মিশ্রিত থাকে। আজ পাঠকদিগকে আমি "অক্সিজেন" ও "নাইট্রোজেন" এই দুইটী নাম মনে করিয়া রাখিতে অনুরোধ করি। ইহাদিগকে লইয়া পরে যে আমাকে কত কি কথা বলিতে হইবে, তাহার সীমা নাই।

শ্রীত্রৈলোক নাথ মুখোপাধ্যায়।

কালিদাসের গল্প।

ভালবাসার দৌরাত্ম্য বা মাহাত্ম্য সংসারী মাত্রেই কিছু-না-কিছু অবগত আছেন। ভালবাসা মানুষকে প্রণয়ীর দোষদর্শনে অন্ধ করে এবং গুণগ্রহণে সহস্রচক্ষু করিয়া থাকে। ভালবাসা মানুষকে দেবতা করে, আবার অপদার্থও করে। তা যাই করুক, ভাল না বাসিয়া কিন্তু কেহ থাকিতে পারে না।

আমি তোমায় ভাল বাসি; তোমার কথা উঠিলে, আমি তাহা লইয়াই ব্যস্ত থাকি। হয় ত অনেক সময়ে এমন কথা উঠে, যাহা অপরের নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর; আমি কিন্তু তাহা বুঝিতে পারি না; আমি একেবারেই আচ্ছন্ন হই।

মহাকবি কালিদাসকে আপনারা অবশ্যই ভাল বাসেন। আমি সেই কালিদাস সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ কথা বলিব। কথা যেমনই হউক, আপনাদের তাহা ভাল লাগিবেই। ভাল না লাগিলে বুঝিব, কালিদাসে আপনাদের ভালবাসা নাই।

ধারা নগর ভোজরাজের রাজধানী। ধারা এক্ষণে 'ধার' নামে প্রসিদ্ধ। কালিদাস, মহারাজ বিক্রমাদিত্য এবং মহারাজ ভোজ উভয়েরই সভ্য ছিলেন। কালিদাস পর্য্যায়ক্রমে একের লোকান্তরে অপরের আশ্রয় গ্রহণ করেন, কি কখন এ-রাজার নিকট, কখন ও-রাজার নিকট থাকিতেন, বলিতে পারি না।

অথবা যিনিই ভোজ, তিনিই বিক্রমাদিত্য, কি ভোজের কালিদাস ও বিক্রমের কালিদাস এক ব্যক্তি নহেন, এ সব সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম প্রত্নতত্ত্ব এ প্রবন্ধের আলোচ্য নহে।

'ভোজপ্রবন্ধে' লিখিত আছে, মহাকবি কালিদাস-প্রমুখ বহুশত কবি, মহারাজ ভোজের আশ্রয়ে ছিলেন। ধারা নগরীতেও সুপ্রচলিত প্রবাদ আছে, কালিদাস ভোজ রাজার সভ্য।

কালিদাস যে স্থানে সিদ্ধিলাভ করেন এবং শাপগ্রস্ত হন, সেই ভুবনেশ্বরী-ক্ষেত্র ও ভুবনেশ্বরী-মূর্ত্তি, অদ্যাপি ধার নগরীর পশ্চিম প্রান্তে বর্ত্তমান। ধারানগরে কালিদাস সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে একটী প্রবাদ;—

"প্রসিদ্ধ মহারাজ ভোজ সবিশেষ পণ্ডিতপ্রিয় ছিলেন এবং নিজেও একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি পাণ্ডিত্যের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া আদেশ প্রচার করেন, আমার রাজধানীতে কোন মূর্খ বাস করিতে পারিবে না। এই আদেশ-প্রচারের পূর্ব্বে তিনিও সাধারণের পাণ্ডিত্য-লাভের জন্য যে সব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতেই সকলের মূর্খতা দূর হইয়াছিল। ভোজরাজের বিবেচনা ছিল, যে ব্যক্তি অন্ততঃ একটী কবিতাও রচনা করিতে না পারে, সে ই-মূর্খ।

"সপ্তাহের মধ্যে রাজার নিকট রাজধানীর সকলকেই কবিতা রচনা করিয়া নিজ নিজ অ-মূর্খত্বের পরিচয় দিতে হইবে, তবে রাজধানীতে বাস করা চলিবে; নতুবা, রাজধানী পরিত্যাগ করিতে হইবে। আদেশ-লঙ্ঘনে প্রাণদণ্ড। ভোজপ্রবন্ধে লিখিত আছে,—"ন হি ধারানগরে কোঽপি মূর্খঃ প্রতিবসতি স্ম" ধারানগরে একজনও মূর্খ ছিল না। সুতরাং এ কঠোর আদেশেও রাজধানী বিচলিত হইল না; সকলেই নিজ নিজ কবিত্ব প্রদর্শন করিয়া রাজার অসীম আনন্দ উৎপাদন করিতে লাগিল।

রাজধানীর মধ্যে কেবল এক তন্তুবায়, বড়ই বিষন্ন হইয়াছে। সপ্তাহের শেষ দিন,—তখনও তাহার একটী কবিতা রচনা হইয়া উঠে নাই; অর্দ্ধেক মাত্র হইয়াছে। তন্তুবায় পরিবারবর্গ লইয়া কোথায় যাইবে, বাসচ্যুত হইয়া দরিদ্র তন্তুবায় আপাততঃ কাহার আশ্রয়ে

থাকিবে, এই ভাবনা তাহার হৃদয়ে আজ বলবতী। শ্লোক করিবার দিকে কষ্ট করিয়া মন লইয়া যাইতেছে, আর সে-ই সব দারুণ দুর্ভাবনা আসিয়া সব উদ্যম ভঙ্গ করিয়া দিতেছে। গৃহে মন টিকিল না। তন্তুবায় বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছে আর চক্ষুতে অন্ধকার দেখিতেছে। আজিকার তাহার দুঃখ, তাহার চিন্তা, অন্তর্যামী ভিন্ন আর কেহ বুঝিয়াছে কি?—বুঝিয়াছেন।

মহাকবি কালিদাস, আজ কয়েক দিনই রাজধানীর সংবাদ লইতেছেন। যে বিপন্ন হইবে, তাহাকে তিনি উদ্ধার করিবেন, ইহা তাঁহার সঙ্কল্প। তিনি তন্তুবায়ের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া গোপনে স্বকর্ত্তব্য-পালনাভিপ্রায়ে তাহার বাড়ীর সম্মুখবর্ত্তী পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন। কালিদাস তন্তুবায়ের সম্মুখে—পথে; তন্তুবায় কিন্তু ভয়ঙ্কর ভাবনায় প্রমত্ত, সে কিছুই দেখিতে পাইল না।

সর্ব্বজ্ঞ কৃপালু কালিদাস, নিজেই তখন তন্তুবায়কে মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাপু! তুমি কি ভাবিতেছ এবং তোমাকে এতাদৃশ বিষণ্ণই বা দেখিতেছি কেন?"

দেশ-বিদেশের ধনী, মানী, জ্ঞানী, রাজা, মহারাজ, কবি, মহাকবি এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরা যাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে ব্যগ্র; সেই ব্যাস-বাল্মীকি-প্রতিম সর্ব্বজন-সম্মানিত মহাকবি কালিদাস কাছে আসিয়া মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন! তন্তুবায় আপনাকে কৃতার্থ মনে করিল, ক্ষণকালের জন্ত হৃদয়ে সে অপূর্ব্ব সুখ অনুভব করিল এবং তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া কালিদাসের চরণে নিপতিত হইল। কালিদাস, হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিলেন। তন্তুবায় গদ্গদ-কণ্ঠে কালিদাসের অনেক স্তুতি-বিস্তুতি করিল, আর রোদন করিতে লাগিল।

কালিদাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে বল?"

তন্তুবায় রাজার আদেশ ও আপনার কবিতা-রচনার অসম্পূর্ণতার কথা নিবেদন করিয়া, মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিল।

কালিদাস বলিলেন,—"কাঁদ কেন? ভয় নাই। তুমি যে অর্দ্ধ-কবিতা রচনা করিয়াছ, তাহা বল দেখি শুনি।"

তন্তুবায় বলিল,—

"কাব্যং করোমি ন তু চারুতরং করোমি,
কষ্টাৎ করোমি ন চ শীঘ্রতরং করোমি।"

কালিদাস বলিলেন,—"উত্তম হইয়াছে; অবশিষ্ট অর্দ্ধ এই বলিবে;—

"রাজন্য-মৌলিমণি-রঞ্জিত-পাদপীঠ!
হে সাহসাঙ্ক! কবয়ামি বয়ামি যামি॥

তুমি এখনই রাজার নিকট যাও; কোন ভয় নাই। সম্পূর্ণ শ্লোকটী বল গিয়া।"

তন্তুবায়, কালিদাসের আশ্বাস-বাক্যে ও অর্দ্ধ-কবিতা-রচনার সাহায্যে যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইল।

তন্তুবায় তখন, কালিদাসের চরণতলে, বিলুণ্ঠিত হইয়া, রাজ-ভবনাভিমুখে যাত্রা করিল।

এদিকে কালিদাসও অন্ত পথ দিয়া রাজ-সভায় উপস্থিত হইলেন।

ক্রমে, তন্তুবায় রাজ-সভায় উপস্থিত হইয়া রাজা, পণ্ডিতগণ ও সভ্যদিগকে যথাযথ অভিবাদনাদি করিয়া আপনার অমূর্খত্ব-প্রতিপাদনের জন্ত কবিতা বলিতে সবিনয়ে অনুমতি প্রার্থনা করিল। অনন্তর অনুমতিপ্রাপ্ত তন্তুবায় বলিতে লাগিল,—

"কাব্যং করোমি ন তু চারুতরং করোমি,
কষ্টাৎ করোমি ন চ শীঘ্রতরং করোমি।

রাজন্ত-মৌলি-মণি-রঞ্জিত-পাদ-পীঠ!
হে সাহসাঙ্ক! কবয়ামি বয়ামি যামি॥" *

কালিদাস-রচনাভিজ্ঞ মহামতি ভোজরাজ, কালিদাসের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া তন্তুবায়কে বলিলেন,—"তোমার কবিতার প্রথম অর্দ্ধ উত্তম হইয়াছে। শেষ অর্দ্ধ একেবারেই অশ্রাব্য। যাহা হউক, তুমি বস্ত্রবয়ন কার্য্য কর গিয়া। তোমার কোন ভয় নাই।"

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

রাজা ও রাণী

[ইংরাজী সাহিত্যে ওয়াল্‌টার স্যাভেজ্ ল্যাণ্ডারের নাম সুবিখ্যাত। তাঁহার রচনার মাধুর্য্য, ইংরাজী পাঠকের অবিদিত নাই। কোন ঘটনা-বিশেষ লইয়া দুই চারি কথায় তিনি এমন সুন্দর গল্প চিত্রিত করিতে সমর্থ হইতেন যে, তাহাতে তাঁহার নাট্যনৈপুণ্যের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এমনতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প তিনি অনেক লিখিয়াছেন। আমি তাহারই মধ্য হইতে এই গল্পটি আজ বঙ্গীয় পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। গল্পটীর নাম 'লিওফ্রিক এণ্ড গডিভা'। গল্পটীর আমি ঠিক অনুবাদ করি নাই, করিতেও পারি নাই। এবং পারিলেও সে সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে পারিতাম না। ঘটনাটী কভেণ্ট্রি দেশের। ঘটিয়াছিল, ১০৪০ খৃষ্টাব্দে। রাজকবি টেনিসনও 'গডিভা' নাম দিয়া একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন।]

কভেণ্ট্রি দেশে ঘোর অনাবৃষ্টি উপস্থিত। কোথাও একটুকু জল নাই, চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। প্রকৃতি ভীষণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। বৃক্ষবল্লরী পুষ্প-পত্র-হীন, নির্জীব, জীর্ণ, শীর্ণ, মৃতপ্রায়; ধান্যক্ষেত্র শুষ্ক-সাহারায় পরিণত; গো-মহিষাদি জন্তুগণ দারুণ-যন্ত্রণায় অস্থির-চিত্ত;—এক একটী করিয়া প্রতিদিনই কত জন্তু মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে! নর-নারীর প্রতি চাহিয়া দেখ, দুর্ব্বল, অতি রুগ্ন, মৃতপ্রায়! প্রকৃতির ভিতর হইতে প্রাণটুকু যেন চলিয়া গিয়াছে, তাই বৃক্ষবল্লরীতে আর শ্যাম-লতা নাই, জীব জন্তুতে সে প্রীতি-প্রফুল্লতা নাই, সে মাধুর্য্য কোথাও নাই,—আছে কেবল সারাদেশ ব্যাপিয়া দারুণ উত্তাপ! সে উত্তাপে দেশ জ্বলিতেছে!

অনাবৃষ্টি, আবার অন্ন-কষ্ট! কৃষক আশা-নেত্রে আকাশ পানে চাহিয়া চাহিয়া, চক্ষু মুছিয়াছে; লাঙ্গল ও বলদ লইয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে গৃহে ফিরিয়াছে। লাঙ্গলে মাকড়সায় জাল বুনিয়াছে। দারুণ উত্তাপে বলদ মরিয়া গিয়াছে। কৃষকের গৃহ অন্নহীন। গৃহস্থের দুয়ার হইতে অতিথি ফিরিতেছে। পথে পথে ভিখারীর ভিড়। মায়ের কণ্ঠ জড়াইয়া শিশু কাঁদিতেছে; স্নেহময়ীর কোমল বুকে সে স্বর্গ-সুধা কৈ, আর নাই! শুষ্ক-কণ্ঠে শিশু কাঁদি-তেছে, কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের কণ্ঠ জড়াইয়া, মায়ের নয়ন-পুত্তলী, মায়ের বুকের উপর মরিতেছে!

দলে দলে নরনারী একত্র হইল, দেবতার মন্দির, কাতর-প্রার্থনায় পূর্ণ হইল!

বৃষ্টি হইল না। অন্নকষ্টও ঘুচিল না!

লিওফ্রিক সেই দেশের রাজা। রাজা তখন নব-বিবাহিত। রাণীর নাম গডিভা। বিবাহের আনন্দ-উৎসব তখনও সম্পন্ন হয় নাই। দেশের চিরপ্রথা, এই প্রকার উৎসবে প্রজাগণ অর্থ উপহার দিবে। সেই প্রথা অনু-সারে, রাজা, প্রজাগণের উপর নূতন কর ধার্য্য করিলেন।

* ভাবার্থ;—"আমি কবিতা করি বটে, কিন্তু বড় ভাল হয় না, অথচ কষ্ট এবং বিলম্ব হয়। হে প্রণত-রাজগণ-মুকুট-মণি-রঞ্জিত-পাদপীঠ! মহারাজ সাহ-সাঙ্ক! আমি কবিতা রচনা করিব, না বস্ত্রবয়ন করিব? অথবা আমাকে রাজধানী পরিত্যাগ করিতে হইবে?"

ভোজের নামান্তরই ছিল সাহসাঙ্ক; অথবা সাহসাঙ্ক যৌগিক শব্দ।

সেই অনাবৃষ্টিকালে, অন্নপ্রপীড়িত, ক্ষুৎ-পিপাসা-ক্লিষ্ট, শোকতাপে-মর্ম্মাহত, দীনহীন প্রজাগণ রাজার আদেশ শ্রবণ করিল! কটি-দেশে শত-গ্রন্থিময় বস্ত্রখণ্ড অতি মলিন, অতি জীর্ণ। উদরে দারুণ অনল। গৃহহীন, আশ্রয় হীন;—চক্ষের উপর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সোণারচাঁদ ছেলে-মেয়েগুলি মরিতেছে। শৃগাল কুক্কুরে সেই মৃতদেহ লইয়া টানাটানি করিতেছে, তাহার উপর এই রাজাদেশ!

সকলে সে আদেশ পালন করিতে পারিল না। যাহার গৃহে কিছু ছিল, সে দিতে পারিল; যাহার অতি সামান্য ছিল, সেও কিছু দিতে পারিল। যে আপনি মরিতে বসিয়াও দিনান্তে কোলের শিশুটীকে একমুঠা অন্ন দিতেছিল, সে, সেই অন্ন শিশুর মুখ হইতে কাড়িয়া রাজ-দরবারে প্রেরণ করিল! আর যে, কিছুই পারিল না, রাজার আদেশে—কেহ বা নিহত হইল, কেহ বা কারারুদ্ধ হইল!

হাহাকারে দেশ পূর্ণ হইল! দেশের প্রতি চাহিয়া দেখ, মনে হইবে, সহসা যেন কাহারও অভিশাপে দেশের আলোক নিবিয়া গিয়াছে, মৃত্যুর করাল-ছায়া চারিদিক ঘিরিয়াছে!

দলে দলে নরনারী একত্র হইল, দেবতার মন্দির কাতর-প্রার্থনায় পূর্ণ হইল!

বৃষ্টি হইল না! নিষ্ঠুর রাজার বধিরকর্ণে কিছুই স্থান পাইল না!—দেবতার কর্ণেও কি সে কাতর কণ্ঠ পঁহুছিবেনা?

রাণী চারিদিকে চাহিলেন, সমস্ত বুঝিলেন, তাঁহার কোমলপ্রাণে বড় আঘাত লাগিল। রাণীর তখনও কৈশোরকাল অতিবাহিত হয় নাই। কোমল হৃদয়টুকু প্রজার দুঃখে ভাঙ্গিয়া পড়িল। করুণ আঁখি দুটি জলে পূর্ণ হইল। তেমনই জলভরা আঁখিদুটি আকাশ পানে রাখিয়া, নতজানু হইয়া, বদ্ধাঞ্জলিতে কত নিশা, তিনি দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতেন—"দয়াময়! মুখ তুলিয়া চাও!—তোমারই দেশ, তুমিই রক্ষা কর!"

ক্ষুৎপিপাসা ক্লিষ্ট শিশু সন্তান লইয়া, মলিনবসনা, অনাহারে শীর্ণ-কলেবরা, ভিকারিণী আসিয়া রাণীর চরণে পড়িল।—বৃদ্ধ বৃদ্ধা কাঁদিল, যুবক যুবতী কাঁদিল, বালক বালিকা কাঁদিল, কোলের শিশুও বুঝি অস্ফুটস্বরে কাঁদিল,—

"মাগো, রক্ষা কর! আমরা উপবাসে;—ইহার উপর রাজার এই ভীষণ আদেশ!—তোমারই সন্তান আমরা,—জননি! সন্তানের প্রতি মুখ তুলিয়া চাও!"

রাণী কাঁদিলেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া অশ্রু ফুরাইল। দারুণ-দুঃখে তাঁহার বুক ফাটিবার উপক্রম হইল।

দয়াময়ী, স্নেহময়ী, করুণাময়ী রমণী। রমণীর প্রাণ আর কত সহ্য করিতে পারে!

রাজা অশ্বারোহণে বাহির হইলেন, রাণীও অশ্বারোহণে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

পথভ্রমণ করিতে করিতে রাজা রাণীতে কথোপকথন হইতে লাগিল;—

রাণী। প্রিয়তম! দেশের সর্ব্বত্রই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। অনাবৃষ্টিতে দেশ উৎসন্ন গেল। কতদিন আমরা শুনিয়াছি, দেশবাসিগণ দেবতার নিকট কতই প্রার্থনা করিতেছে। কিন্তু হায়! তথাপি বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা নাই। দিন দিন গো-মহিষাদি জীবগণ মৃত্যুমুখে পড়িতেছে। মানুষেরও দুঃখ কষ্টের অবধি নাই। সে দিনও আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, খাদ্যের অভাবে গৃহ-তাড়িত ভয়াবহ কুক্কুরগণ নর-নারী গো প্রভৃতি যাহা পাইতেছে, তাহাই আক্রমণ করিয়া উদর-পূর্ণ করিতেছে। পথে এরূপ আরও ভয়ঙ্কর ব্যাপার। চারিদিকে হাহাকার!

রাজা। প্রিয়তমে! বোধ হয়, তোমার ভয়

হইতেছে,—পথে আমরা কুক্কুর ও ক্ষুধার্ত্ত জন্তুর উদরসাৎ হইব! কিংবা বোধ হয়, তোমার মনে হইতেছে, বাগানে ফুল ফুটে নাই, বেল, মল্লিকা, গোলাপ কোথাও কিছুই নাই,—তবে কে আর তোমাকে আদর-অভ্যর্থনা করিবে?

রাণী। না স্বামিন্! সে জন্য আমার কোন উৎকণ্ঠা নাই। আর ফুলের কথা কি বলিতেছ? কেন, ফুল ত চারিদিকেই ফুটিয়া আছে;— এই ত ফুলের সময়। ফুল নিশ্চয়ই জানে না, আমি তাহাদিগকে কত ভালবাসি। কিন্তু বোধ হয়, তাহারাও আমাকে দেখিয়া সুখী হয়।

রাজা। তবে তোমার অসুখের কারণ কি? আমি এখানে প্রার্থনা করিব বলিয়া আসি নাই। তবে যদি আমি প্রার্থনা করিলে তুমি সুখী হও; যদি আমি দেবতার কাছে প্রার্থনা করিলে দেশের এ অভিশাপ ঘুচিয়া সুবৃষ্টি হয়, দেশ জুড়ায়, তবে আমি এখনই দেব-মন্দিরে যাইয়া সারানিশি প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত আছি।

রাণী। রাজন্! আমিও তাহাই করিতে প্রস্তুত। কিন্তু হায়, ঈশ্বর বিমুখ! কত সাধুর প্রার্থনা বিফল হইয়াছে! প্রিয়তম, তোমার নিকট আমি একটি প্রার্থনা করি, তুমি কি তাহা পূর্ণ করিবে? তুমি কিন্তু মনে করিলেই তাহা হইতে পারে। তোমার সে অনুগ্রহ, ঈশ্বরের কৃপার ন্যায় প্রতীয়মান হইবে!

রাজা। কি প্রার্থনা?

রাণী। এখন সময় নহে,—এ সময় তোমায় বলিতে পারি না যে, এই হতভাগ্য দেশবাসিগণের অপরাধ তুমি ক্ষমা কর!

রাজা। তাহারা অসুখী!—কেবল এই?

রাণী। অসুখী তাহারা নিশ্চয়ই,—যখন তোমার নিকট তাহারা অপরাধী! দেখ, কি মধুর স্নিগ্ধ বাতাস বহিতেছে, কি সৌম্যশান্তিপূর্ণ সন্ধ্যা! প্রকৃতি শান্তিপূর্ণ! হায়, কেবল এই হতভাগ্যগণ অসুখী!

রাজা। তুমি কি এই রাজদ্রোহিগণের স্বপক্ষে আমার নিকট প্রার্থনা করিতে চাও?

রাণী। রাজদ্রোহী? আমি জানিতাম না যে, তাহারা তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে!

রাজা। তাহারা আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছে! আমার প্রাপ্য-কর তাহারা দিতেছে না। আমার প্রয়োজনও তাহাদের অবিদিত নাই। বিশেষতঃ এই অনাবৃষ্টি ও অন্নকষ্টের দিনে, আমার ভাণ্ডারও শূন্যপ্রায়।

রাণী। কিন্তু তাহারাও অন্নাভাবে মরিতেছে!

রাজা। তাহা বলিয়া আমিও অন্নাভাবে মরিব নাকি? না খাইতে পাইয়া প্রজাবৃন্দ মরুক, তাহাতে আমার কি?

রাণী। উঃ, অসহ্য! কেমন করিয়া একথা বলিলে? স্বামিন্, প্রভো, দাও,—তাহাদিগকে জীবন দাও!—সুখ দাও, শান্তি দাও, মুক্তি দাও! এই হতভাগ্যগণের মধ্যে এমনও কেহ আছে, যে আমার শৈশবে আমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া সস্নেহে মুখচুম্বন করিয়াছে!—বিবাহকালে শুভ আশীর্ব্বাদ করিয়াছে! আমি যদি কাঁদিয়াছি, কত আদরে কত যত্নে চক্ষের জল মুছিয়া দিয়াছে! আমি যদি কিছু চাহিয়াছি, কত আগ্রহে, কেহ তাহা তখনই আনিয়া দিয়াছে! আজ আমার মৃত্যু হউক, কেহ কাঁদিবে! হায়, কাঁদিবে কাহার জন্য?—তাহাদের নিষ্ঠুর রাজপত্নীর জন্য!

রাজা। কিন্তু বিবাহের উৎসব অবশ্যই সম্পন্ন করিতে হইবে।

রাণী। অবশ্য!

রাজা। তবে.

রাণী। তবে কি? জনতাপূর্ণ প্রাসাদ, নর-শোণিত-সঞ্চিত-অর্থব্যয়ে নৃত্য করিবে,—ইহাই কি উৎসব? সঙ্গীত, নৃত্য, বিলাস,

আড়ম্বর, ইহাই কি উৎসব?—না প্রিয়তম, ইহা উৎসব নহে। ঐ শুন, ভিখারী প্রজা অনাহারে কাঁদিতেছে! ঐ শুন, অন্নাভাবে মৃত-শিশু বুকে করিয়া পুত্রহারা জননী উচ্চ-কণ্ঠে গগন বিদীর্ণ করিতেছে। একি করুণ দৃশ্য! প্রিয়তম! এস, আমরা এই দরিদ্র, অন্ন-কষ্ট-প্রপীড়িত সন্তানগুলিকে লইয়া তাহাদিগকে পেট পুরিয়া খাইতে দিই; তাহাদের নিরানন্দ মুখ প্রফুল্ল করি! বিধাতার আশীর্ব্বাদ পাইব; চারিদিক্ মাঙ্গল্যে পূর্ণ হইবে; আমরা ধন্য হইব! এস মহারাজ, সেই উৎসব করি!

রাজা। রাণি, তুমি পাগল হইলে না কি?

রাণী। সত্যই আমি পাগল হইয়াছি! আমি কি বলিতেছি, জানি না। আমার মনে হইতেছে, কে যেন আমার বুকের ভিতর হইতে এই কথা বলিতেছে! প্রিয়তম, শুন, চাহিয়া দেখ,—ভূমি পানে মুখ নত করিও না,—আমার মুখের পানে চাহিয়া দেখ!

রাজা। থাম রাণি, ভাবিয়া দেখি।

রাণী। ও কথা বলিও না। ভাবিয়া দেখিবে? ভাবিবে কি? সৎকার্য্য সাধন করিবে, তাহা আবার ভাবিবার প্রতীক্ষা কেন? ঐ শুন, ক্ষুধায় কাতর হইয়া শিশু কাঁদিতেছে! নারী হইয়া আমি আর এ দৃশ্য দেখিতে পারি না! হায়, বিশ্বজননী শিশুর পানে চাহিবেন,—প্রিয়তম, আমাদের পানে তিনি চাহিবেন না!

(অদূরে রাজপুরোহিতের প্রবেশ)।

রাজা। দেখিতেছি, পুরোহিত আসিতে-ছেন। আমরা গৃহ হইতে অর্দ্ধক্রোশ আসিয়াছি। অশ্ব হইতে অবতরণ করিতেছ কেন? রাণী গডিভা! একি, নামিও না, নামিও না!—আমাদের এ প্রথা নহে। এখনই আমার অপমান হইবে,—নামিও না রাণি!

রাণী। না মহারাজ, আমি আর না! যে পর্য্যন্ত না তুমি এই নিষ্ঠুর কর হইতে এই দুঃখী প্রজাবৃন্দকে মুক্তি দাও, সে পর্য্যন্ত—সে পর্য্যন্ত মহারাজ, আমি এই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিব।

রাজা। দেখ দেখি, পুরোহিতের দেহ কেমন হৃষ্ট-পুষ্ট। প্রজাবৃন্দ ক্ষেপিয়াছে,—ইহাও সম্ভবে রাণী? এই লোকটাকে দেখিলে কেমন হৃষ্টপুষ্ট,—আর তাহারা কি না খাইতে পায় না! রাণী, তা নয়;—তাহারা পরিবর্ত্তন চায়! পুরাতন-প্রথা তুলিয়া দিতে চায়! (পুরোহিতের প্রতি)পুরোহিত মহাশয়, আমার বালিকা-পত্নীর এই ব্যবহারে আমি বিশেষ লজ্জিত হইয়াছি।

রাণী। স্বামিন্! বল, তুমি দেশের প্রতি সদয় হইবে?

রাজা। সদয়? আচ্ছা, আমি দেশবাসী-দিগকে ক্ষমা করিব;—যদি তুমি উলঙ্গিনী হইয়া অশ্বারোহণে মধ্যাহ্ন সময়ে সমস্ত রাজ-পথ পর্য্যটন করিতে পার! ইহা আমি শপথ করিয়া বলিতেছি!

রাণী। নিষ্ঠুর, প্রিয়তম, এই কি তোমার সেই হৃদয়?

পুরোহিত। মহারাজ! এরূপ নিষ্ঠুর কথা বলিয়া আপনি মহারাণীর কোমল-প্রাণে বড় ব্যথা দিয়াছেন। দেখুন, মায়ের মুখখানি মলিন হইয়া গিয়াছে, মা-আমার কাঁপিতেছেন। মহারাণি! আশীর্ব্বাদ করি, আপনি সুখী হউন!

রাণী। মহাত্মন্! আমাদের দেশ সুখী না হইলে আমি সুখী হইব না। আপনি আমার স্বামীর নিষ্ঠুর কথা শুনিলেন ত?

পুরোহিত। জননি, আপনি উহা ভুলিয়া যান।

রাণী। আমি ইহাতে কিছু মনে করি নাই।

পুরোহিত। আপনি যথার্থই দেবী!

রাণী। আমার স্বামী যাহা বলিলেন, শপথ করিয়াই কি তাহা বলিয়াছেন?

পুরোহিত। শপথ করিয়াই তাহা বলিয়াছেন!

রাণী। ঈশ্বর, তুমি তাহা শুনিয়াছ! এই হতভাগ্য দেশ রক্ষা কর! প্রিয়তম, তুমি কি দেশের জন্য কিছু করিবে না? আর কি কোন আশা নাই?

রাজা। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা শপথ করিয়াই বলিয়াছি!—আর কিছু করিতে পারি না। তুমি আমার কথা শুনিলে না?—আমি নিষেধ করিলাম,—তথাপি তুমি অশ্ব হইতে অবতরণ করিলে,—ইহা দেশের দুর্ভাগ্য!

রাণী। আমি যে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়াছিলাম, তাহা তোমার কথা অবজ্ঞা করিয়া নহে।—আমিও লজ্জিত হইয়াছিলাম!

রাজা। আমিও তাহা দেখিয়াছি। ও মুখ লজ্জার রক্তিম আভা লুকাইতে পারে না। আমার সৌন্দর্য্য-প্রতিমা তুমি প্রিয়তমে, তোমার পানে চাহিয়া আমি স্বর্গ-শোভা দেখিতে পাই! তুমি আমার কাছে থাকিলে কোন পাপ-চিন্তা আমার কাছে আসিতে পায় না! তোমার পবিত্র চরণস্পর্শে, তোমার প্রতি নিশ্বাস-প্রশ্বাসে পৃথিবী পবিত্র! এস প্রিয়তমে, এ হৃদয় মধ্যে তোমাকে রাখিয়া, ঐ সুধাপূর্ণ ওষ্ঠাধর দু'খানি মধুর চুম্বনে ঢাকিয়া রাখি!

রাণী। আজ নহে মহারাজ!—আজি রাত্রে আমি উপবাস করিয়া থাকিব। সারা-নিশি প্রার্থনা করিতে থাকিব!

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে রাজা ও রাণী গৃহে ফিরিলেন। প্রজার দুঃখে রাণীর হৃদয় আলোড়িত। ব্যথিতপ্রাণে স্বামীকে মনোব্যথা জানাইলেন, স্বামী কিনা শপথ করিয়া বলিলেন, "যদি মধ্যাহ্ন সময়ে উলঙ্গিনী হইয়া অশ্বারোহণে রাজপথ অতিক্রম করিতে পার, তবেই আমি দেশের প্রতি সদয় হইতে পারি।" অবশেষে রাণী তাহাই করিতে মনঃস্থ করিলেন। রমণী দয়াময়ী, স্নেহময়ী, করুণাময়ী!

রাণী মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "বড় দুঃসাহসের কার্য্য করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি! প্রভু, দয়াময়, হৃদয়ে বল দাও, সাহস দাও! তুমি আমার সহায় হও! দুঃখীর ক্রন্দন আর শুনিতে পারি না! প্রজাবৃন্দ, কাল আর তোমরা পথের বাহির হইও না! তোমরা আমার সন্তান! তোমাদের জন্য আমি এই অসম-সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি! আমার এই বয়স, এই সৌন্দর্য্য!—ইহারা কি আমার শত্রু হইবে?—না, ভগবান্ আমার সহায়!—কাল যে, কেহ বাড়ীর বাহির হইবে, সে আশঙ্কা আমার হয় না! কতক্ষণে রজনী প্রভাত হইবে! কতক্ষণে কল্যকার মধ্যাহ্ন সময় উপস্থিত হইবে!"

রমণী দয়াময়ী, স্নেহময়ী, করুণাময়ী!

রজনী প্রভাত হইল! দেশবাসী সকলে প্রতিজ্ঞা করিল, কেহ বাড়ীর বাহির হইবে না। মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত!

সে মধ্যাহ্নের সূর্য্য কিরণে চারিদিক্ প্রভাসিত। কোথাও একটুকু আঁধার নাই, এইটুকু ছায়া নাই, চারিদিকে আলোক। পথে জনপ্রাণী নাই। গৃহী গৃহমধ্যে আবদ্ধ!—চারিদিকে দরজা-জানালা বন্ধ! গৃহহীন নিরাশ্রয়ও আজ পথে নাই,—দেবতার মন্দিরে আত্মগোপন করিয়াছে। জনপ্রাণীর একটুও সাড়া শব্দ নাই। কেহ নিশ্বাস ফেলিতেছে কি না, জানিবারও উপায় নাই। বাতাস যেন বহিতেছে না! চারিদিক্ স্থির ও নিশ্চল। পত্র-পুষ্প-পূর্ণ বৃক্ষবল্লরীও আজ নড়িতেছে না। পথের মাঝে দাঁড়াইয়া চীৎকার কর, কাহারও

সাড়া পাইবে না। মনে হইবে, সারাদেশ যেন মৃত্যুর কোলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পক্ষি-গণও আজ নীরব, নিস্তব্ধ। কি ভাবিয়া তাহারা আপন আপন কুলায়ে অবস্থিত। হায়, কেবল নিলর্জ্জ আলোক চারিদিকে!

পাঠক! চক্ষু মুদিয়া থাক! সে পথের পানে আর চাহিও না! বহিশ্চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে সেই দিব্য চক্ষু দিয়া চাহিয়া দেখ, দয়াময়ী, স্নেহময়ী, করুণা-ময়ী, দেবী-প্রতিমা রমণী আজ আর্ত্তের দুঃখে অভয়ারূপে অবতীর্ণা!

রাণী অশ্বারোহণে বাহির হইলেন। রাণী উলঙ্গিনী নহেন, সতীত্বের আবরণে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়াছে! ঘন নিবিড় কেশরাশি তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ঢাকিয়া ফেলিল। সমস্ত শরীর হইতে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য বাহির হইতে লাগিল! কাহার সাধ্য, সে প্রদীপ্ত সূর্য্যপানে চাহিতে পারে! বাতাস যেন ভয়ে নিশ্চল হইয়া রহিল! চারিদিক্ নিস্তব্ধ! রাণী চলিতে লাগিলেন।

সমস্ত রাজপথ অতিক্রম করিয়া, মহা-মহিমময়ী মহারাণী গডিভা গৃহে ফিরিলেন! ভগবান্ তাঁহার উদ্দেশ্য পূর্ণ করিলেন! যিনি সেই কৌরব-সভায় বিবসনা দ্রুপদ-তনয়াকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি আজ পরদুঃখকাতরা গডিভার সহায় হইলেন! কাহার সাধ্য, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করে? দেবতার আশীর্ব্বাদ তাঁহার মস্তকে পড়িল! স্বর্গ হইতে পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল!

সেই প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন সময়ে করুণাময়ী রাজ-রাজেশ্বরী যখন রাজপথ পবিত্র করিয়া, প্রজার দুঃখ দূর করিতে চলিতেছিলেন, অকৃতজ্ঞ-হৃদয় এক মহাপাপী কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, আপন গৃহের দেওয়ালের ছিদ্র দিয়া সে দৃশ্য দেখিতেছিল! কিন্তু সতী-প্রতিমার কি প্রবল প্রতাপ! হতভাগ্যের সে চক্ষু তৎক্ষণাৎ অন্ধ হইয়া গেল! মহাপাপী চিরদিনের জন্য দুর্নামের ভাগী হইয়া রহিল!*

রাজা প্রতিজ্ঞামত কার্য্য করিলেন। কর উঠাইয়া দিলেন, অনাহারী ক্ষুৎ-পিপাসা-ক্লিষ্ট প্রজাবৃন্দের জন্য আপন ভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন। দেবতার অনুগ্রহে বৃষ্টি হইল! আবার ধন-ধান্যে দেশ পূর্ণ হইল! হাহাকার ঘুচিল! মহোল্লাসে, মহা-মহিমময়ী মহারাণী গডিভার পবিত্র নাম জগৎ জুড়িয়া ঘোষিত হইল!

কভেণ্ট্রিবাসী আজিও পবিত্র-হৃদয়ে, সেই পবিত্র-কাহিনী শ্রবণ করিয়া থাকে!

শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত।

রাজগৃহ।

অদ্য আমি রাজগৃহের কথা লিখিব। কিন্তু সে কথা আমি জানি কিনা এবং কতদূর জানি, তাহা বলিব না।

এখনকার নিয়ম এই, যে বিষয়ে যাহার সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা, সেই বিষয় লইয়াই তাহাকে অধিক বাহাদুরি লইতে হয়। যিনি এ কার্য্য করিতে অক্ষম বা যাঁহার এ কাজ করা হয় নাই, তিনি এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে নেহাত ন-গণ্যের মধ্যে। শত শত

* A certain tailor peeped through his window to see the lady pass. Some say, he was struck blind, others that his eyes were put out by the indignant townsfolk, and some that he was put to death. Be this as it may he has ever since been called. "Peeping Tom of Coventry.

—Dr. Brewer

প্রবন্ধ লিখিলেও, শতাবধি উপন্যাস-নাটক লিখিলেও তিনি একালে লেখক বা কবি নাম পাইতে পারেন না। তবে সুখের বিষয়, এ সময়ে সাহিত্য-গুরু হইতে সাহিত্যের সামান্য লোক পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই এই নিয়মাবলম্বী।

কিন্তু একটী কথা আছে, সে অনভিজ্ঞতা টুকু ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। অর্থাৎ সকল লোকে অনভিজ্ঞতার কথা বিদিত থাকে, থাকুক, তাহাতে ক্ষতি নাই; তুমি কিন্তু নিজে লিখিয়া জানাইতে পারিবে না যে, এ বিষয়ে আমি অনভিজ্ঞ বা অসম্পূর্ণ অভিজ্ঞ।

সত্য কথা না বলিয়া, আপনার প্রকৃত বিদ্যার কথা আপনি চাপিয়া গিয়া প্রবন্ধে কেবল বিদ্যা ফলাইবে, তখন—তুমি মহামূর্খ হইলেও তোমার যশোডিণ্ডিম দিগ্‌দিগন্তে বাজিয়া উঠিবে। সত্য বলিবে ত অধঃপাতে যাইবে। শ্যাম! তুমি মনুর বচন আবৃত্তি করিতে পার না; কিন্তু কাহারও নিকট কোন কথা না ভাঙ্গিয়া, তুমি প্রবন্ধে বা পুস্তকে মনুবচন উদ্ধৃত করিতে আরম্ভ করিলে, তোমার 'পণ্ডিতবর' উপাধি নবীন সাহিত্যিক জগতে মিলিবে। আর তুমি রাম! মনু পড়িয়াছ। কিন্তু সকল শ্লোকগুলি তোমার অভ্যস্ত নাই। তুমি এই স্বকীয় অসম্পূর্ণ অভ্যাসের কথা প্রকাশ করিয়া তারপর যদি মনুবচন উদ্ধৃত কর, তাহা হইলে তোমার আর নিস্তার নাই। তুমি তথায় নানা প্রকারে ভর্ৎসিত হইতে থাকিবে; আবৃত্তি-অক্ষম শ্যামই তোমায় উপহাস করিয়া মস্ত বাহাদুরী লইবে।

অন্ধ! দুনিয়ার রূপের প্রশংসা কর,—ও-লোকটী দেখিতে এমন, এ-লোকটী দেখিতে তেমন, এইরূপ রূপের সমালোচনা কর;—বলা বাহুল্য, সেই প্রশংসা ও সমালোচনা তোমার অন্ধতার অনুরূপই হইবে। এখনকার লোক কিন্তু তাহাই শুনিবে আর তোমায় ধন্যবাদ দিবে; চক্ষুষ্মানের কথায় কর্ণপাতও করিবে না, আপনারাও দেখিবে না। কেমন মজা বল দেখি!

অতএব না বলাই ভাল। সত্য গোপন করাই ভাল। সত্য গোপন করিব বটে; কিন্তু মনের কাছে ত গোপন থাকিবে না! এইজন্য পাঠকগণকে অনুরোধ করিতেছি, আমার যশো-ব্যাঘাত যাহাতে হয়, তাহা যেন তাঁহারা না করেন। আমার যে গুলি মনের কথা, সে গুলি তাঁহাদিগকে চুপি চুপি জানাইব, তাঁহারা যেন কাহারও নিকট প্রকাশ না করেন। মনে যাহাই থাক্, প্রকাশ্যে বলিতেছি, আমি সর্ব্বজ্ঞ।

কোন্‌গুলি আমার মনের কথা, কোন্‌গুলি প্রকাশ করিলে আমার যশোব্যাঘাত হইবে, কোন্‌গুলি আমি চুপি চুপি বলিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি, প্রবন্ধ পড়িলেই পাঠকেরা তাহা বুঝিবেন, তজ্জন্য আমাকে বা তাঁহাদিগকে কষ্ট করিতে হইবে না।

এখনকার নিয়মের ভয়ে, প্রবন্ধটীই জন্মভূমিতে গোপনে লিখিতে ইচ্ছা ছিল; অতি গোপনে প্রকাশ হয়, ইহাই প্রথম সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু অনেক আত্মীয়-স্বজনের কথাতেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলাম না।

আত্মীয়-স্বজনের কথাতে না করা যায় কি; রাজা যুধিষ্ঠির, অত্যন্ত অনিচ্ছা থাকিলেও, পরমাত্মীয় শ্রীকৃষ্ণের কথাতেই মহাবল পরাক্রান্ত দুরাধর্ষ জরাসন্ধের নিকটেও প্রাণপ্রতিম ভ্রাতৃদ্বয় ভীমার্জ্জুনকে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

রাজগৃহ সেই জরাসন্ধেরই রাজধানী।

রাজগৃহ পাটনা জেলার অন্তর্গত। বক্তিয়ারপুর হইতে ষোল ক্রোশ দক্ষিণ। 'বিহার' হইতে সাত ক্রোশ। এই সাত ক্রোশ পাল্কী বা একা-যানে যাইতে হয়। পাল্কীর ভাড়া অধিক,

একার ভাড়া সস্তা। আমাদের দেশে একা নাই বটে, কিন্তু একা দেখিয়াছেন অনেকেই। যিনি দেখেন নাই, তিনি শুনুন। একা ক্ষুদ্র-রথের অপভ্রংশ। একজন আরোহীর উপযুক্ত বলিয়া ইহার সাধারণ নাম 'একা'; তবে দুই জন যাইতে পারে, এমন একাও আছে।

বিহারের মুন্সেফ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র বাবুর ব্রাহ্মণ-ভৃত্য সমভিব্যাহারে আমি রাজগৃহে যাইবার জন্য রাত্রি ২॥০ টার সময়ে বিহারে একায় আরোহণ করিলাম। একা চলিতে লাগিল।

চৈত্র মাস। কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথি। শেষনিশার বসন্ত-শিশির-সিক্ত শুভ্রজ্যোৎস্নায় নগর, সৌধমালা, রাজপথ, পর্ব্বত, তরু-লতা, সৈকত-প্রান্তর সকলই হাস্যময়—সুসূক্ষ্ম-শুভ্র বসনাবৃত অৰ্দ্ধ-অস্ফুট সারল্যপূর্ণ বদনমণ্ডলের নিঃশব্দ সুমধুর হাস্যময়। দুই চারিটী নক্ষত্র অনন্তআকাশ-প্রাঙ্গণে, অযত্ন-উপেক্ষিত ক্ষুদ্র রত্নখণ্ডের ন্যায়, ইতস্ততো-নিপতিত।

আমার একাবাহী পবনগামী (!) অশ্বরাজ, সারথির অশেষ পরিশ্রমে এক ঘণ্টায় এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিল। তা'হলেও আমি কষ্ট বা বিরক্তি অনুভব করিতে পারি নাই।

বিহার-নগর অনেকক্ষণ পরিত্যাগ করিয়াছি। এখন উন্মুক্ত প্রকৃতির গম্ভীর-মধুর লীলা দর্শনে, মন এবং নয়ন উভয়ই ব্যগ্র ছিল। কেবল মধ্যে মধ্যে শীত-বায়ুস্পর্শে সঙ্কুচিত হইয়া একা-প্রকম্পন-শিথিলিত বনাতখানি ভাল করিয়া গায়ে দিয়া লইতেছিলাম।

মাথার উপর শিশির-চন্দ্রিকা-বিধৌত উচ্চ আকাশ-মধ্য। আকাশের চতুষ্পার্শ্ব বিপুল ছত্রাকারে ক্রমে নত হইয়াছে; সুদূর প্রান্তে একেবারে মাটীতে মিশিয়াছে। এই আকাশ-ছত্রের দিকে যতই দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম, ততই প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ-প্রেরিত, হর্ষবৰ্দ্ধনের বারুণছত্রের কথা আমার মনে পড়িতে লাগিল।

চক্ষু বড় ব্যস্ত ছিল, মনকে মনের কাছে একা বসিয়া থাকিতে না দিয়া আপনার কার্য্য-সাহায্যের জন্য টানিয়া লইল। আমি দেখিলাম, আমাদের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে কিয়দ্দূরে ক্রম-নিম্ন গগন-গাত্রে চার পাঁচটী দীর্ঘ আরক্ত জ্যোতির্ম্মালা। বিস্ময়-বিমুগ্ধনেত্রে বার বার দেখিলাম; দেখিয়া ভাবিলাম, ধূমকেতুই উঠিয়াছে, কিন্তু এত ধূমকেতু! এমন আশ্চর্য্য ত কখন দেখি নাই। নিশ্চয়ই এ দেশের বিশেষ অমঙ্গল হইবে।

অনন্তর আমার সঙ্গী ও পরিচারক দেবনারায়ণ পাঁড়েকে সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করাইবামাত্র সে আমার সকল কল্পনা দূর করিয়া দিল।

আমি জানিলাম, অনতিদূরবর্ত্তী পর্ব্বত-শৃঙ্গের শুষ্ক-তৃণ-লতা-দাহী অনলরাশিই আমার কল্পিত ধূমকেতু। হিমকরের হিমানী-চর্চ্চিত কিরণ-রাজি দূরস্থিত কৃষ্ণ-কলেবর অচলবরকে আপনার বিশ্ব-বিসারী গৌর আবরণে নিমজ্জিত করিয়া আকাশের সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছে। কিন্তু তেজস্বী বৈশ্বানরকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই; তিনি আপনার তেজে তেজীয়ান্;—অতিদূর হইতেও তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সকলেরই প্রত্যক্ষ হইবার উপযুক্ত।

প্রকৃতির এই লীলা জড়-জীব সর্ব্বত্রই সমভাবে দেদীপ্যমান।

এখন, সর্ব্বগ্রাহিণী ইংরেজী-সভ্যতার শিশিরজাল-জটিল-জ্যোৎস্নাময়ী মূর্ত্তি;—সেই পার্ব্বত্য বৈশ্বানরোপম তেজস্বী না হইলে, তাহা সকলকেই আত্মচ্ছায়ায় নিমজ্জিত করিবে; তখন অপরের অস্তিত্ব অননুভবনীয় হইবে, অভিব্যক্তি তিরোহিত হইবে। হিন্দু সমাজ!

কি বল;—আপনার অস্তিত্ব ডুবাইবে, না, রাখিবে? যদি রাখিতে ইচ্ছা হয় ত মনে থাকে যেন তেজ চাই। যে তেজ অশান্তি, উপদ্রব বা কলহ-বিগ্রহের মূল নহে, কিন্তু আত্ম-অস্তিত্বের, আত্ম-অভিব্যক্তির একমাত্র হেতু, সেই তেজ চাই।

জ্যোৎস্নার সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে মিলিত হইবে, কিন্তু আত্ম-অস্তিত্ব ডুবাইবে না; এমন যে তেজ তাহা আমার নয়নে সেই রজনী-শেষ-শিশির-কৌমুদী-কবলিত পর্ব্বতের উপর, আর অন্তরে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তরাল-নিপতিত হিন্দুসমাজের প্রাণের উপর প্রতিভাত হইতে লাগিল। একটী উপ-মান, আর একটী উপমেয়; একটী মূর্ত্তি, আর একটী আলেখ্য; একটী নিয়তি, আর একটী আশা। বড়ই সুন্দর, বড়ই মধুর। কিন্তু ভগবন্! আমার অন্তরের এই প্রত্যক্ষ, দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের দিক্‌নির্দ্দেশের মত নয়ত?—তুমি ভিন্ন কে বলিতে পারে?

তবে আমরা ইহা বলিতে পারি ও সকলেই বলিতে পারেন,—সমাজের তেজ চাই, প্রশান্ত মধুর জ্যোতি চাই। নতুবা অভিব্যক্তি হারাইবে, অস্তিত্বেও অবিশ্বাস্য হইবে।

মনের কথা কালী-কলমে লিখিয়া শেষ করা যায় না। কোন্ সূত্র হইতে কোন্ কথা মনে আসে, কোন্ কথা হইতে কিরূপ ভাব উদয় হয়, তাহা লেখা যেমন অসম্ভব, তেমনই অনুচিত। অতএব এখন যত কথা মনে আসিতেছে এবং এই সময়ে না চাপিলে যত কথা মনে আসিবে, আর সেদিন নিস্তব্ধ নির্ম্মল নিশাশেষে বন্ধুহীন—কথোপকথনের উপযুক্ত সঙ্গিহীন—সপ্তক্রোশব্যাপী অপরিচিত পথে যানে বসিয়া যত আমি মনে আন্দোলন করিয়াছিলাম, সে গুলির আংশিক প্রশ্রয় প্রদানও বিড়ম্বনামাত্র। সুতরাং তিনখানি গ্রামের মধ্য দিয়া তদ্দেশীয় দুঃখী লোকদিগের প্রাতঃকালীন কর্ম্ম সম্মুখে যাহা পড়িতেছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে বেলা আট টার সময় রাজগির—অর্থাৎ রাজগৃহের বাজারে উপস্থিত হইলাম।

রাজগৃহের অন্যতম পাণ্ডা শ্রীগোপীচন্দ্র উপাধ্যায় আমায় প্রথম লক্ষ্য করেন, সঙ্গ লয়েন, এবং আমাকে তাঁহারই হইতে হইবে অর্থাৎ তিনিই আমার পাণ্ডা হইবেন এ কথাও বলেন। আমার তাহাতে কোন আপত্তি ছিল না বটে, কিন্তু আমার সঙ্গী দেবনারায়ণ পাঁড়ে আপত্তি করিল। শেষে সে আত্ম-পরিচিত 'পুনীত উপাধ্যায়'কে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইল। ক্রমে একস্থানে গাড়ী থামিল, একটী দোকানে বসিলাম, তিন চারিজন পাণ্ডা আমার নিকট বসিয়া আলাপাদি করিতে লাগিল। গোপীচন্দ্রও সঙ্গ ছাড়েন নাই। পরে পুনীতও আসিলেন। পাণ্ডারা সকলেই ভদ্রলোক বটেন, অত্যাচার উৎপীড়ন কিছুমাত্র নাই।

রাজগৃহ-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে,—জরাসন্ধের পূর্ব্বপুরুষ বসুরাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার সময়ে দ্রাবিড় কর্ণাট মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দক্ষিণ-প্রদেশ হইতে সপ্তসহস্র ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন; সেই সব ব্রাহ্মণেরা পঞ্চদশ গোত্রে বিভক্ত;—বৎস, উপমন্যু, কৌণ্ডিন্য, গর্গ, হারীত, গৌতম, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কৌশিক, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ, বাৎস্য, সাবর্ণি, পরাশর এবং অত্রি,—এই সেই পঞ্চদশ গোত্র সপ্তসহস্র ব্রাহ্মণের বংশ; এক্ষণে দেড়শত মাত্র পরিবারে পর্য্যবসিত হইয়াছে। তবে আজিও গোত্র লোপ হয় নাই। সকলেরই জীবিকা—তীর্থ-পৌরোহিত্য অর্থাৎ পাণ্ডাগিরি। যে পাণ্ডা প্রথমেই সঙ্গ লইবে, সেই যাত্রী সেই পাণ্ডার। লব্ধ দক্ষিণা যথাসম্ভব পাণ্ডা-দলে বিভক্ত হয়।—এই হইল পাণ্ডা-আইন।

আমার পাণ্ডা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিভ্রাট্ উপস্থিত হইল।

অনেক গোলযোগের পর, আমার পাণ্ডা কয়জনই হইলেন অথবা গোপীচন্দ্র এবং পুনীত দুই জন হইলেন, কিংবা এই দুই জনের মধ্যে একজন হইলেন। কেননা, কয়জনেই চৈত্র-মাসের একপ্রহর বেলার পর, পাহাড়ে রৌদ্রে অর্দ্ধ-ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া আমার সঙ্গে তীর্থ-স্নান-স্থলে গমন করিলেন। স্নানের সময়ে ভাগাভাগি করিয়া মন্ত্র পড়াইতে প্রবৃত্ত হইলেন; অথচ গোপীচন্দ্র একটু বিশেষত্ব দেখাইতে লাগিলেন। অপরাহ্নে ঘুরান ফিরান পুনীত হইতেই হইল। এখন, আমার পাণ্ডা কে হইলেন, তাহা পাঠকেরাই বলুন।

সে-ই দোকান হইতে দক্ষিণ-মুখ সোজা পথে প্রায় অর্দ্ধ-ক্রোশ অতিক্রম করিয়া, ক্ষুদ্র সরস্বতী নদী-রেখা পার হইয়া পাহাড়ে উঠিলাম। অতি অল্প উচ্চেই অশ্বত্থ বৃক্ষের নিকট দিয়া সোপান-পথে ব্রহ্মকুণ্ডের নিকটে উপস্থিত হইলাম। কোথায় উপস্থিত হইলাম দেখিবে?—*

ঐ দেখ, ঝ—ঞ—ট চিহ্নিত মন্দিরত্রয় পশ্চিম-পার্শ্বে; জ চিহ্নিত মন্দির পূর্ব্ব-পার্শ্বে; আমরা মধ্যস্থলে সান-বাঁধান মন্দিরচ্ছায়াময় চত্বরে আসিয়া বসিলাম। ক্ষণকাল বিশ্রামের পর যথাসম্ভব এবং যথাভাগ্য তীর্থ-কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া বাসায় ফিরিলাম। পুনীত উপাধ্যায়ের বাড়ীতেই আমাদের বাসা হয়। ফিরিতে বেলা দুই প্রহর হইয়াছিল। আহারাদির পর, পুনীত উপাধ্যায় সমভিব্যাহারে, আমি বেলা ৩ টার সময়ে আবার এই সব স্থান দর্শন করিতে বহির্গত হই। এই সময়েই আমি স্বহস্তে চিত্র প্রস্তুত করিয়া আনি।

রাজগৃহে ১৮ ঘণ্টা ছিলাম,—ছয় ঘণ্টামাত্র এই সব স্থান দেখিয়াছি—তবে সে সব চিত্র দেখাইতে পারিলাম না, এতদ্ভিন্ন অনেক তীর্থের পরিচয়ই দিব,—শাস্ত্রে ও পাণ্ডাদের মুখে, স্বচক্ষে দেখার মত শুনিয়া—যে সব তীর্থের বিষয় সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা পরে বলিব। সম্মুখ ভাগমাত্র আপনাদিগকে দেখাইতেছি। দেখুন, ভাল করিয়া দেখুন, পাহাড়ের ভিতর, পাহাড়ের নিকট, ক, খ প্রভৃতি বর্ণমালা গুলি পড়িয়া দেখুন; আর নিম্নে দেখুন বর্ণমালার টীকা।

ক।—ব্রহ্মকুণ্ড। চতুষ্কোণ ক্ষুদ্র-জলাশয়। কলিকাতায় অনেক বাড়ীর কলতলায় এমনতর চৌবাচ্ছা আছে। কুণ্ড চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রস্তর-ভিত্তি-বদ্ধ। জল উত্তপ্ত এবং বুদ্বুদোদ্গারী। এরূপ উষ্ণজল তথাকার কোন কুণ্ডেই নাই।

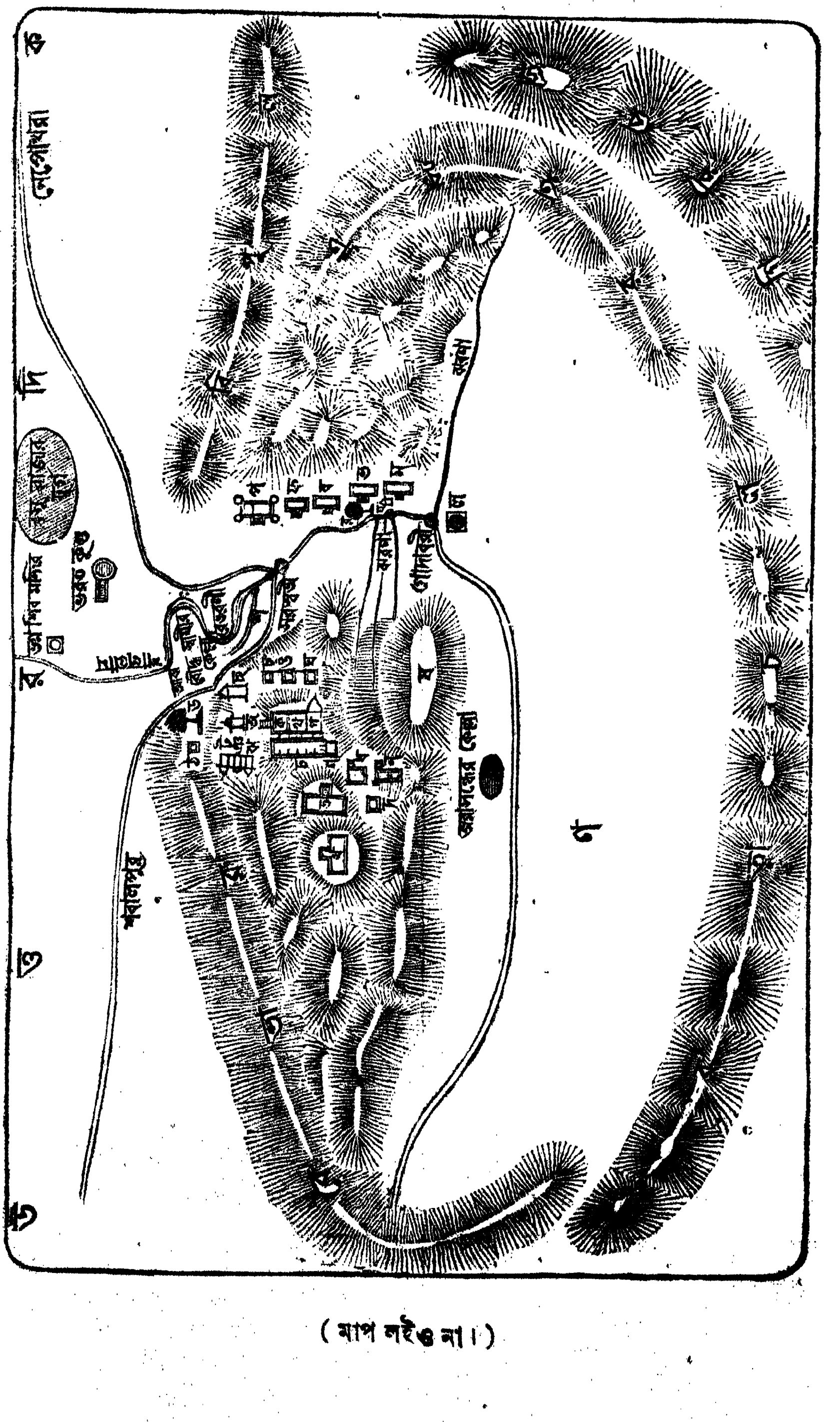
ব্রহ্মকুণ্ডের উচ্চ-উত্তরভাগে আমরা বসিয়াছিলাম। ব্রহ্মকুণ্ডে অবতরণ করিতে সেদিকে এক সোপানপঙক্তি আছে। পশ্চিমেও এক সোপানপঙক্তি আছে। তাহা হইতে সমতল ভুমি ঘুরিয়া আসিলে, ঠিক উত্তর-সোপান-আরম্ভ-স্থলে পৌঁছান যায়। পশ্চিমে উচ্চ-ভিত্তির উপরে খিলান-করা দ্বার। এই দ্বার ব্রহ্মকুণ্ড ও সপ্তধারা কুণ্ডের মধ্যবর্ত্তী ভিত্তির উপর স্থাপিত। দ্বারদেশের উপরেও ভিত্তি আছে। ব্রহ্মকুণ্ডের পশ্চিমভাগ হইতে আর একটী সোপান-পরম্পরা এই দ্বারে পৌঁছিয়াছে। দ্বারের পশ্চিম ও সপ্তধারা কুণ্ডের পূর্ব্বভাগে আর একটী সোপানশ্রেণী আছে, তদ্দ্বারা সপ্তধারা কুণ্ডে অবতরণ করা যায়।

ব্রহ্মকুণ্ডের ভিতর জলের ধারে নৈঋ্‌তকোণে ভিত্তিগাত্রে ঠেসান মগধ-ভাস্কর-ক্ষোদিত প্রস্তরময় বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। (১)

* এই স্থানের চিত্রটী পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(১) ব্রহ্মকুণ্ডস্য মাহাত্ম্যং শৃণু বক্ষ্যামি পার্ব্বতি।
যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥
পুরা কৃতযুগে দেবি চকার সৃষ্টিকৃৎ প্রভুঃ।

রাজগৃহ।



(মাপ লইও না।)

ব্রহ্মকুণ্ডের মধ্যেই নৈঋ্ঁত কোণে হংস-তীর্থ। তথায় স্নানদান করিলে সর্ব্ব পাপক্ষয় হয়। (২) *

খ—ব্রহ্মকুণ্ডের দক্ষিণ-দিকে ও শিব-মন্দিরের সম্মুখে একটী দালান।

গ। শিবমন্দির। অন্যান্য সকল মন্দির অপেক্ষা পরিষ্কৃত। সেবারও বন্দোবস্ত আছে।

ঘ। প্রস্তরময় বরাহ-অবতার মূর্ত্তি। ব্রহ্ম-কুণ্ডের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে;—না হয় ধরিলাম, দক্ষিণেই অবস্থিত। শাস্ত্রে কিন্তু ব্রহ্মকুণ্ডের পশ্চিমে ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠিত বরাহ-অবতার-মূর্ত্তির কথা লিখিত আছে। (৩)

ঙ। সন্ন্যাসীদিগের থাকিবার স্থান।

চ। নহবৎখানা। এই তীর্থে গ্রহণে যে অর্থ যাত্রিগণ কর্ত্তৃক উৎসৃষ্ট হয়, পাণ্ডারা তাহা গ্রহণ করেন না। এই নহবৎখানা তদ্দারা নির্ম্মিত।

ছ। শ্রীরামের পঞ্চচূড় মন্দির।

জ। শিব-মন্দির। যাত্রীরা পাক করিয়া খাইতে পারে এমন স্থানও ইহার সহিত সম্মিলিত।

ঝ। এই মন্দিরে বলরাম হনুমান্-মূর্ত্তি।

ঞ। এই মন্দিরে পার্ব্বতী ও গণেশ-মূর্ত্তি।

ট। এই মন্দিরে শিব ও গণেশ মূর্ত্তি। *

ব্রহ্মকুণ্ড, সপ্তধারাকুণ্ড, ঋষিমন্দির, উক্ত কয়টী দেবমন্দির, নহবৎখানা, সন্ন্যাসি-স্থান—সকল গুলিই এক চত্বরের মধ্যে অর্থাৎ ছাদ, প্রাচীর, পাকা-উঠানি, পরস্পর মিলিত। অনেক পাণ্ডা ও দুই চারি জন ভিক্ষুক, প্রাতঃ-কালে সর্ব্বদাই এই স্থানে থাকে।

ঠ। যক্ষিণী-মন্দির। ব্রহ্ম-কুণ্ডের উত্তর। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া এই যক্ষিণী পূজা করিলে মহাফল। পূর্ব্বে যক্ষিণীর বৃহৎ প্রাসাদ ছিল, এক্ষণে অতি ক্ষুদ্র মন্দির। সেবার পারিপাট্য নাই। বৌদ্ধ-অত্যাচারে যক্ষিণীর মন্দিরাদি বিনষ্ট হইয়া থাকিবে। (৪)

ড। যক্ষিণী-মন্দিরের নিকটে একটী অশ্বত্থ বৃক্ষ; তলায় ভগ্ন বৌদ্ধমূর্ত্তি দুই চারিটী আছে। এই বৃক্ষের অগ্নিকোণেই

তীর্থমেতচ্ছুভং জ্ঞাত্বা যজ্ঞং বহুসুবর্ণকম্ ॥
বাজপেয়ং তথা দেবৈঃ সেন্দ্রৈর্দেবর্ষিভির্ব্বৃতঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ ॥
যজ্ঞকুণ্ডে সমুৎপন্নং যজ্ঞান্তে প্রবরং কিল।
পাতালজাহ্নবীতোয়ং কবোষ্ণং বিমলোদকম্ ॥
এতদ্দৃষ্ট্বা মহাভাগে প্রোবাচ কমলোদ্ভবঃ।
ময়ৈতন্নির্ম্মিতং যস্মাৎস্নান্নাম্নৈব শুভোদকম্ ॥
ব্রহ্মকুণ্ডমিতি খ্যাতং ত্রিষু লোকেষু পার্ব্বতি।
পাতালজাহ্নবীতোয়ং কবোষ্ণং বিমলোদকম্ ॥
ব্রহ্মকুণ্ডমিতি খ্যাতং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
রাজগৃহে বরং তীর্থং তত্র চোষ্ণোদকং শুভম্ ॥
গঙ্গোদ্ভেদোদ্ভবং প্রাহুস্তত্র স্নাত্বা দিবং ব্রজেৎ।
ব্রহ্মকুণ্ডমিতি খ্যাতং যত্র তীর্থোত্তমং প্রিয়ে ॥
সংক্ষেপাৎ কথয়িষ্যামি তস্য তীর্থস্য যৎ ফলম্।
—————————যে চ স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ॥
জলং স্পৃষ্ট্বা দিবং যান্তি শ্রদ্ধাবন্তো জনাঃ কিমু।
সংক্রান্তাবুপরাগেষু বারুণ্যর্দ্ধোদয়াদিষু ॥
তথা পুণ্যাসু তিথিষু কার্ত্তিকাদিযুগাদিষু।
মাঘে পঞ্চদশী কৃষ্ণা নভস্যে চ ত্রয়োদশী ॥
তৃতীয়া মাধবে শুক্লে নবম্যূর্জ্জে যুগাদয়ঃ।
শ্রদ্ধাবান্ মানবো দেবি স্নাত্বা পাতালজাহ্নবীম্।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপেভ্যো বিমুক্তঃ সোঽপি তৎক্ষণাৎ ॥
দত্ত্বা দানানি বিপ্রেভ্যঃ পরাং গতিমবাপ্নুয়াৎ।
নন্দন্তি পিতরস্তস্য বহুবর্ষাণি সুব্রতে ॥ ইত্যাদি।
বায়ু-পুরাণ রাজগৃহ-মাহাত্ম্য।

(২) ব্রহ্মকুণ্ডস্য মধ্যে তু নৈঋ্ঁত্যে হংসতীর্থকঃ।
তত্র স্নাত্বা চ দত্ত্বা চ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ ॥
বয়ু-পুরাণ রাজগৃহ-মাহাত্ম্য।

(৩) পশ্চিমে ব্রহ্মকুণ্ডস্য বারাহঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।
পশ্চিমে ব্রহ্মকুণ্ডস্য যা ধারা বিমলোদকম্।
তত্র স্নানং নরঃ কৃত্বা বাজিমেধফলং লভেৎ।
বায়ু-পুরাণ রাজগৃহ-মাহাত্ম্য।

(৪) উত্তরে ব্রহ্মকুণ্ডস্য যক্ষিণ্যাশ্চৈত্যকং মহৎ।
ব্রহ্মকুণ্ডে নরঃ স্নাত্বা যক্ষিণীং যোঽভিপূজয়েৎ।
যক্ষিণ্যাস্তু প্রসাদেন মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥
বায়ু-পুরাণ রাজগৃহ-মাহাত্ম্য।

* এই তিনটী মন্দিরে যে কয়েকটী দেব-মূর্ত্তির কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার ক্রমভঙ্গ হইলেও হইতে পারে।

সোপান। নিম্নভূমি হইতে এই সোপানরাজি উত্থিত হইয়া কুণ্ডগমনের সম্পূর্ণ সুবিধা করিয়া দিতেছে।

চ। সপ্তধারা-কুণ্ড। উষ্ণজল। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা চৌবাচ্চা। ভিত্তিগাত্র-নির্ম্মিত প্রণালী-যোগে সপ্তধারায় জল পড়িতেছে। পশ্চিমে পাঁচ ধারা ও দক্ষিণে দুই ধারা। সপ্ত-ধারা-কুণ্ডের শাস্ত্রীয় নাম—বিমলোদক-ধারা। দক্ষিণে কুণ্ডাবতরণের সোপান আছে। জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, দুর্ব্বাসা, বসিষ্ঠ এবং পরাশর এই সপ্তর্ষির প্রীতি-উদ্দেশে ব্যাস তপোবলে এই তীর্থ, মার্কণ্ডেয়-কুণ্ড এবং গঙ্গা-যমুনা নির্ম্মাণ করেন। (৫)

ণ। সপ্তর্ষি-মন্দির ; সপ্তর্ষি-মূর্ত্তি। সপ্তর্ষি-মূর্ত্তি আধুনিক। তথায় একটী ভগ্ন বৌদ্ধমূর্ত্তি আছে। নিকটবর্ত্তী কোন পুষ্করিণী খনন করিবার সময়ে এই মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল।

ত। অনন্ত-ঋষি। অনন্তের প্রীতি-উদ্দেশে ব্যাসদেবের নির্ম্মিত। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা কুণ্ড মণ্ডূক-পরিপূর্ণ। নামিবার সোপান পূর্ব্ব-ধারে। (৬)

থ। গঙ্গা-যমুনা। পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা কুণ্ড। নামিবার সোপান উত্তর-ধারে। ভিত্তিপ্রণালী হইতে দুই ধারায় জল পড়িতেছে। রাজগৃহ-মাহাত্ম্যে কিন্তু লিখিত আছে,—গঙ্গা, যমুনা ও নর্ম্মদা একত্র অবস্থিত আছেন। বোধ হয়, কালক্রমে এই কুণ্ডের একটী জল-প্রণালী বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

দ। একটী ক্ষুদ্র মন্দিরের অভ্যন্তরে দত্তাত্রেয়-চরণ—বিষ্ণুপাদ। (৭)

ধ। ব্যাসকুণ্ড। শীতলজল। পশ্চিমের ভিত্তিগাত্রে অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৌ প্রস্তর-ফলক গ্রথিত। (৮)

ন। মার্কণ্ডেয়-কুণ্ড। এক্ষণে শুষ্ক। উত্তর-পার্শ্বে, অন্ধকারময় ক্ষুদ্র মন্দিরে কামাখ্যা-দেবী। (৯)

প। রামকুণ্ড। * গণেশমূর্ত্তি তথায় বর্ত্তমান। জল শীতল। জলচর সর্পের আবাস, অপরিষ্কৃত। পূর্ব্বধারের ভিত্তিতে কি লেখা আছে ; সন্ধ্যার অন্ধকার ও সর্পভয়ে পূর্ব্বধারের ভিত্তিতে যাইতে সম্পূর্ণ সাহস না হওয়াতেই পড়িতে পারিলাম না।

ফ। গণেশকুণ্ড। (১০)

ব। সোমকুণ্ড। বিষ্ণুমূর্ত্তি তন্মধ্যে আছে। (১১)

ভ। সূর্য্যকুণ্ড। বামে বৌদ্ধভগ্নাসন। দক্ষিণে গণেশ, সূর্য্য ও ব্রহ্মার মূর্ত্তি। মধ্যে বৌদ্ধমূর্ত্তি। (১২)

ম। সীতাকুণ্ড। এই সকল কুণ্ডেরই পশ্চিমদিকে সোপান এবং উত্তর-দক্ষিণে এগুলি লম্বা। অবস্থা কাহারও ভাল নহে। (১৩)

য। হাটকেশ্বর † শিব। বটবৃক্ষতলে একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে এই দেবাদিদেবের অধিষ্ঠান। গৌরীপট্ট সমতল-ভূমির সহিত মিলিত ; উপরে খর্ব্ব ও আ-বর্ত্তুলাকৃতি লিঙ্গ। মগধের শিবলিঙ্গ সবই প্রায় এইরূপ।

> জমদগ্নির্ভরদ্বাজো বিশ্বামিত্রোঽথ গৌতমঃ।
> দুর্ব্বাসাশ্চ বসিষ্ঠশ্চ পারাশর্য্যোঽপ্যনন্তকঃ॥
> এতেষু স্নানদানাদিকর্ম্মণা গর্ভসঙ্কটাৎ।
> বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ পরাং গতিমবাপ্নুয়াৎ॥
> বায়ু-পুরাণ রাজগৃহ-মাহাত্ম্য।

(৫—৮) জাহ্নবী যমুনা চৈব নর্ম্মদা সলিলোত্তমা
মার্কণ্ডেয়মুনেস্তীর্থং ব্যাসস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ॥

(৯) মার্কণ্ডেয়দক্ষিণে ভাগে কামাখ্যা সুপ্রতিষ্ঠিতা।
তস্যাঃ পূজনমাত্রেণ সর্ব্বকামানবাপ্নুয়াৎ॥
ততশ্চ দক্ষিণে দূরে বিষ্ণোঃ পাদমনুত্তমম্।
বায়ু-পুরাণ রাজগৃহ-মাহাত্ম্য।

* এই কুণ্ডের উল্লেখ রাজগৃহ-মাহাত্ম্যে নাই।

(১০—১৩) পূর্ব্বভাগে সরস্বত্যাঃ খ্যাতং তীর্থচতুষ্টয়ম্।
গণেশস্যাথ সোমস্য সূর্য্যস্য চ মহাত্মনঃ।
সীতায়াশ্চ মহাতীর্থং পাবনং স্নানকারিণাম্॥
বায়ু-পুরাণ রাজগৃহ-মাহাত্ম্য।

† পাণ্ডারা ইঁহাকে হাটকেশ্বর বলে।

র। বটবৃক্ষ-তলদেশে একটী রোয়াক রোয়াকের নিকট স্তম্ভ। তথায় বৌদ্ধভগ্ন-মূর্ত্তি বহুতর বর্ত্তমান।

ল। জরাদেবীর মন্দির। জরাদেবী এক্ষণে অপহৃতা। ক্ষুদ্র মন্দির একটী টিবির উপর অবস্থিত।

কুণ্ডগুলি অতি প্রাচীন, দেবতাস্থানও অতি প্রাচীন; তবে, বিধর্ম্মীর অত্যাচারে কোন কোন দেবতা তিরোহিত বা নবভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন! ঋষিমূর্ত্তি, মন্দির, সোপানশ্রেণী ও চত্বরাদি হরিরাম হর্ষৌখা,—বিষ্ণুসিংহ,—এবং পাটনা-মেয়ার নিবাসী চেতীসিংহ প্রভৃতি পুণ্যশীল ধনীদিগেরই কীর্ত্তি।

একটী কথা বলা হয় নাই। ব্রহ্মকুণ্ডের ঊর্দ্ধে দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে, পর্ব্বতারোহীদিগের শ্রমাপ-নোদন ও অবস্থিতির জন্য, একটী যাত্রিনিবাস আছে। যাত্রি-নিবাস-সৌধ দেখিতে উত্তম।

এই সৌধ-কীর্ত্তি যাঁহার, তাঁহার নাম, বৈদ্যনাথ সিংহ।

শ। শুষ্ক খাল। এই খাল জলপূর্ণ থাকিলে এই স্থানও একটী ক্ষুদ্র দুর্গের উপযুক্ত।

ষ। সোণভাণ্ডার, বৈভার গিরিগাত্রে ক্ষোদিত গুহাগৃহ। জৈনগ্রন্থে ইহার সবিশেষ উল্লেখ আছে। এই গুহা-গৃহের মধ্যে বা আরও অভ্যন্তরস্থ লুক্কায়িত গৃহে প্রচুর ধনরত্ন আছে, জৈনদিগের ইহা বিশ্বাস। গুহাগৃহের অভ্যন্তরে একটী ক্ষোদিত দ্বারচিহ্ন দেখা যায়। অঙ্কিত দ্বারের পার্শ্বে কি লিখিত আছে, তাহা পড়িতে পারা যায় না। তাহার ভিতরে গুপ্ত ভাণ্ডার কিনা, ইহা জানিবার জন্য বহু চেষ্টা হইয়াছিল। শুনিলাম, ইংরেজরাজও চেষ্টা করিয়াছিলেন, কোন ফল হয় নাই। সোণভাণ্ডার নামটী বোধ হয় স্বর্ণভাণ্ডারেরই অপভ্রংশ। এই গুহা-গৃহের মধ্যে প্রবেশদ্বারের পূর্ব্বধারে ঋষভ-দেবের এক-প্রস্তর-ক্ষোদিত প্রকাণ্ড মূর্ত্তিচতু-ষ্টয়, ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখের ন্যায় পরস্পর সংসক্ত-ভাবে অবস্থিত। দেয়ালে একটী গণেশমূর্ত্তি-অঙ্কনের অস্পষ্ট ছায়া আছে। ইহা দেখিলে ও ভিতরে প্রবেশ করিলে মনে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয়।

উপরে ভরতকুণ্ড, ভরতকুণ্ডের জল শীতল এবং ধারাহীন। এই কুণ্ড গোলাকারে বাঁধান। পশ্চিমে অবতরণ-সোপান।

তাহার পশ্চিমোত্তর কোণে ভগ্ন শিবমন্দির। এ শিবের পূজা ও সেবাদি কার্য্য এক্ষণে রহিত হইয়াছে।

রাজগৃহ-মাহাত্ম্যে লিখিত হইয়াছে,—

"বৈভারো বিপুলশ্চৈব রত্নকূটো গিরিব্রজঃ।
রত্নাচল ইতি খ্যাতাঃ পঞ্চৈতে পাবনা নগাঃ॥
পঞ্চানাং শৈলমুখ্যানাং মধ্যে মালেব রাজতে।
সরস্বতী পুণ্যতোয়া পুণ্যারণ্যাদ্বিনিঃসৃতা॥"

ঐ যে রাজগৃহ-ভূমির শৃঙ্গার-হারাবলী-সদৃশী পঞ্চপর্ব্বত-মধ্যচারিণী নদী; উহার সাধারণ নাম সরস্বতী। স্থানবিশেষে এই সরস্বতীই ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। যথা;—শালগ্রাম, বৈতরণী এবং গোদাবরী। চিত্রটী দেখিয়া লও, ঠিক বুঝিবে। ব্রহ্মকুণ্ডের পূর্ব্বভাগে সরস্বতীর বাঁধা-ঘাট। সাধারণে এই স্থান টুকুকেই সরস্বতী বলে এবং ইহাই তীর্থস্নান-ঘাট বলিয়া প্রসিদ্ধ। চিত্রে আমিও ঐ স্থানে সরস্বতী বলিয়া লিখিয়াছি। শাস্ত্র দেখিয়া আমার কিন্তু বোধ হয়, ঐ স্থানটী পঞ্চ-নদ তীর্থ।*

সরস্বতী যে পর্য্যন্ত পূর্ব্ববাহিনী, সে পর্য্যন্ত তাহার দক্ষিণ-তীরভূমি অনেক দূর সমতল। তার পর, ঠিক সমতল নহে, তবে অত্যন্ত বন্ধুরও নহে। চিত্রে যেখানে "সরস্বতী" নামী

* পূর্ব্বস্মিন্ ব্রহ্মকুণ্ডস্য তীর্থং পঞ্চনদং স্মৃতম্।
যথা পঞ্চনদঃ কাশ্যাং তথাত্রাপি ন সংশয়ঃ॥
বায়ু-পুরাণ রাজগৃহ-মাহাত্ম্য

লিখিত আছে, তথায় সরস্বতী ত্রিবেণী; মধ্যবেণী প্রাকৃত; অপর দুই বেণী কৃত্রিম। পশ্চিম-উত্তরবাহিনী বেণী শবালপুর অভিমুখে ধাবিত, পূর্ব্ব-উত্তরবাহিনী বেণী নেপোখরায় মিলিত হইয়াছে। চিত্রগাত্রে পর্ব্বতের নাম ক্ষোদিত আছে। দেখিয়া লইবে।

রত্নকূট পর্ব্বত হইতে যে ঝরণা নির্গত হইয়াছে, তাহার নাম গোমতী। এই গোমতী-সরস্বতী-সঙ্গম স্থলই গোদাবরী। শালগ্রাম এবং বৈতরণীতে বাঁধা-ঘাট আছে। এই তীর্থের উল্লেখ রাজগৃহ-মাহাত্ম্যে সবিশেষ আছে।

আর যে যে দেবতা বা তীর্থ রাজগৃহে আছেন, তত্তৎসম্বন্ধে উল্লেখ করিতেছি:—

গোদাবরীর কিঞ্চিৎ উত্তরে, বানরীতরণ তীর্থ, বৈভার পর্ব্বতে কেদার তীর্থ, গণেশ-মূর্ত্তি, শেষনাগ, সন্ধ্যাদেবী, সোমেশ্বর শিব এবং মণিনাগ অধিষ্ঠিত। ইহাঁদের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র যে তীর্থ, ইহা বলাই বাহুল্য।

গৌতম-বন, অহল্যাহ্রদ, গৌতমাশ্রম, ব্যাসাশ্রম, ধৌত-পাপকুণ্ড, ত্রিকোটীশ্বর শিব-লিঙ্গ, বহ্নিতীর্থ, বাণগঙ্গা, অশ্বিনীকুমার, চণ্ড-কৌশিকাশ্রম এবং ঋষিশৃঙ্গ পর্ব্বতে সম্ভবতঃ আমাদের উল্লিখিত রত্নকূট পর্ব্বতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ত্রিধারা আছে। এই ত্রিধারা-স্নানে মহাফল।

গিরিব্রজ পর্ব্বতে শিবনদী, বৈকুণ্ঠ-স্থান এবং বিষ্ণু-মূর্ত্তি অবস্থিত। বৈকুণ্ঠের এক ক্রোশ উত্তরে কণ্ঠেশ্বর শিব। রত্নকূটের কিঞ্চিৎ উত্তরে নির্জ্জরেশ্বর শিব বর্ত্তমান।

পূর্ব্বে শিব-নদী, পশ্চিম চণ্ডকৌশিকাশ্রম, উত্তর শালগ্রাম, দক্ষিণ বহ্নিতীর্থ—এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ভূভাগ রাজগৃহ।

শাস্ত্রে লিখিত আছে,—

"কীকটেষু গয়া পুণ্যা নদী পুণ্যা পুনঃপুনা।
চ্যবনস্যাশ্রমং পুণ্যং পুণ্যং রাজগৃহং বনম্॥"

মগধ-দেশের মধ্যে গয়া, পুনঃপুনা নদী, চ্যবনাশ্রম এবং রাজগৃহ এই চারিটী স্থান পবিত্র।

রাজগৃহ যে পরম পবিত্র তীর্থ, ইহা শাস্ত্রে উক্ত আছে।

সরস্বতী-স্নানের ফল,—

"বৈভারো বিপুলশ্চৈব রত্নকূটো গিরিব্রজঃ।
রত্নাচল ইতি খ্যাতাঃ পঞ্চৈতে পাবনা নগাঃ॥
পঞ্চানাং শৈলমুখ্যানাং মধ্যে মালেব রাজতে।
সরস্বতী পুণ্যতোয়া পুণ্যারণ্যাদ্বিনিঃসৃতা॥
মহাদানাচ্চ যৎ পুণ্যং তৎ স্নাত্বৈব সরস্বতীম্।
আজন্ম সঞ্চিতং পাপং জ্ঞানাজ্ঞানকৃতঞ্চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং বিলয়ং যাতি স্নাত্বা চৈব সরস্বতীম্॥"

এই তীর্থের কথা-প্রচার আমাদের দেশে অল্প। কিন্তু মুঙ্গের, পাটনা, গয়া, আরা, মুজঃফরপুর, ছাপরা এবং দ্বারভাঙ্গা এই কয়েকটী জেলায় রাজগৃহের নাম বড়ই অধিক। এসব জেলার লোকে, মলমাসে দলেদলে রাজগৃহ-তীর্থে গমন করে। অন্য পুণ্য তীর্থিতেও কেহ কেহ গিয়া থাকে।

মলমাসে কোন তীর্থ নাই, কিন্তু রাজগৃহ-তীর্থ মলমাসে সুপ্রশস্ত।

"তথা মলিম্লুচে মাসি পঞ্চাশমাক্রমতে বনে।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো ধনধান্যসমন্বিতঃ॥
ভুক্তেহবিপুলান্‌ভোগানৃযথেষ্টান্‌সার্ব্বকালিকান্
অন্তে চ বৈষ্ণবংলোকং প্রাপ্নোতি পুরুষঃশুচিঃ॥"

বসুবংশ-রাজধানী রাজগৃহ—গিরিদুর্গ-বেষ্টিত রাজগৃহ—এখন অরণ্য, জনমানব-বর্জ্জিত। মলমাসে রাজগৃহ অসংখ্য জনতাপূর্ণ, কোলাহলময় রাজধানীবেশ ধারণ করে। আপণ-বিপণি, শিবিকা-গজবাজী এবং প্রহরিগণের সুসমাবেশে প্রতি তৃতীয় বৎসরে একমাস কাল অর্থাৎ সম্পূর্ণ মলমাস, রাজগৃহ পূর্ব্ব গৌরবের, পূর্ব্ব শোভার—প্রাণহীন আংশিক অভিনয় করিয়া থাকে।

রঙ্গমঞ্চে বারবিলাসিনীগণের সীতা-সাবিত্রী অভিনয় দর্শনে যাঁহারা সুখী হন, সম্রাট্-রাজধানী রাজগৃহের মালমাসিক সুষমা দর্শনে তাঁহাদের আনন্দ হইতেই পারে।

ভিন্নপ্রকৃতিক লোকের কথা স্বতন্ত্র। তাহাদের হয় ত উভয় স্থানেই অশ্রুপাত হয়। তাহারা হয় ত এসব দেখিতেই পারে না। মনের ভিতর কেমন একটা গুরুভার আসিয়া পড়ে; অন্তঃকরণের পেষণ-যন্ত্র তাড়িতবেগে ঘুরিতে থাকে। তা কি করা যাইবে, "ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ।"

যখন আমি রাজগৃহে যাই, তখন কোন উৎসবই ছিল না, যাত্রীও ছিল না। জরাসন্ধ মহারাজের নির্ম্মাংস ললাট-কঙ্কাল-সদৃশ দুর্দ্ধর্শ-মূর্ত্তি রাজগৃহে দৃষ্টিপাত করিয়া—প্রকৃতির স্বহস্ত-নির্ম্মিত দৃঢ়প্রকার চতুর্দ্দিগ্বেষ্টনী শৈল-রাজির দিকে চাহিয়া—ক্ষণকাল আমি হৃদয়-হীন কি মহামনা, পাষাণ-কর্কশ কি মহা-প্রেমিক, বিদ্যুদ্দাম-চঞ্চল কি চিত্রপুত্তলিকা,—কেমন এক প্রকার হইয়াছিলাম। ক্ষণপরে বৌদ্ধদর্শনের ক্ষণভঙ্গুরতাবাদ, সর্ব্বশূন্যতাবাদ ও বেদান্তদর্শনের মায়াবাদ আমার বুদ্ধিকে একেবারেই গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল।

যা'ক, সে সব অনেক কথা। অতি প্রয়োজনীয় কথাই সব এবার বলা হইল না;—জৈন-তীর্থ; চিত্রলিখিত পঞ্চ পর্ব্বত, রাজগৃহ-নাম, রণভূমি তিনটী কেল্লার কথা ইত্যাদি নিতান্ত আবশ্যকীয় কথাই বলিতে পারিলাম না, তখন আর নিজের কথা জানাই কি বলিয়া? সুতরাং এবার আমার সকল কথাই বন্ধ করা ভাল।

পাঠক! নদীর দক্ষিণপারস্থিত বড় গ টী মনে রাখিবেন।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

সমালোচনা।

ফুল-শয্যা। (বিয়োগান্ত দৃশ্যকাব্য) শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য, এম, এ. প্রণীত। মূল্য এক টাকা। আধুনিক কাব্যক্ষেত্রে বড়ই বিড়ম্বনা। আগাছা-কুগাছা-কণ্টক-আবর্জ্জনায় সরস সাহিত্য-ক্ষেত্র পরিপূর্ণ,—কাব্যক্ষেত্র ততোধিক জঙ্গলময়। এই সকল 'ভুঁইফোড়' পাপ-জ্রুমের দৌরাত্ম্যে, সুন্দর ফুলের চারা, বড়-একটা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে না। সুকৃতি-বশে, যে কয়টী মহাদ্রুম টিকিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই এখন উন্নত-মস্তকে ক্ষেত্রের শোভা বর্দ্ধিত করিতে-ছেন। ইহাঁদের ফুল-ফলও যেমন মিষ্ট, ছায়াও তেমনি স্নিগ্ধ। কিন্তু ইহাঁদের 'আওতায়' পড়িয়া, আবার কতকগুলি অভিনব বৃক্ষ, সরস থাকিতেও মর-মর প্রায়। ক্ষেত্র-স্বামীও তাহার কোন তত্ত্ব লয় না, লোকেও তাহা দেখিয়া দেখে না। মহাদ্রুমগুলি মাটী গাড়িয়া বসিয়াছেন,—সুতরাং তিনি বা তাঁহারা, নূতন বৃক্ষকে 'আমল' দিতেই চাহেন না,—কি জানি, চারাগাছটা যদি একদিন তাঁহাকেই ডিঙ্গাইয়া উঠে! "গুরু-মারা-বিদ্যে"ও ত অনেকের আছে! এই না এখনকার সাহিত্যের অবস্থা? এমন দিনে সৎগ্রন্থ লেখাও একরূপ বিড়ম্বনা। জীরা-হীরা এখন একই দরে বিকাইতেছে। যিনি চালে-ডালে ও শাকে-অম্বলে অদ্ভুত খিচুড়ী বানাইয়া "কাব্যি" লেখেন, তিনিও একজন কবি; আবার যে ব্যক্তি যথার্থ মনে-প্রাণে অনুশীলন করিয়া, প্রকৃতি-দত্ত প্রতিভা লইয়া কাব্য-প্রণয়ন করেন, তিনিও কবি-পদ-বাচ্য। এখন এই দুই কবির প্রভেদ করে কে? বিধু লিখিলেন বহি, আর সিধু করিলেন, তার সমালোচনা। সিধু বলি-

লেন, "দাদা রে, কি লেখাই লিখিয়াছ! এমন বহি আর হয় নাই, হইবে না!" বিধুও তার পাল্‌টা জবাব গাহিয়া বেড়াইলেন,—"সমালোচক ত সিধু বাবু! এমন সমালোচনা করিতে জানে কয়টা লোক!" কাল এমনই বিষম পড়িয়াছে। এমন দিনে ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার সাধের "ফুল-শয্যা" লইয়া, সাহিত্যের আসরে নামিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী—বিজ্ঞানে এম-এ,—আবার অন্যদিকে, সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত—"বিদ্যাবিনোদ" উপাধিধারী;—তাহার উপর আবার একজন স্বভাব-কবি।—এ কিন্তু দুর্দ্দিনে কি তাঁহার আদর হইবে? সরলপ্রাণ কবি, সরলভাবেই 'উপহারে' লিখিতেছেন;—

"বসিতে পাইলে লোক শু'তে করে আশা,
করুণা-ভিখারী শেষে চায় ভালবাসা।"

কথাটি বড় সত্য। বুঝি, এই সুরে সুর মিলাইয়াই তিনি তাঁহার পবিত্র, স্নিগ্ধ ও শান্তিময় ফুল-শয্যা রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের আদ্যোপান্ত একটি সুন্দর সহৃদয়তা ও করুণ-মাধুর্য্য-রসের সমাবেশ দেখিতে পাই। আখ্যায়িকাটী ইতিহাস-মূলক,—নাটকাকারে প্রবর্ত্তিত। ভ্রাতৃ-প্রেম ও ভগিনীস্নেহ ইহার মেরুদণ্ড। চিতোর-কুল-রবি পৃথ্বীরাজ ও রাণা সঙ্গের আংশিক জীবনকাহিনী হইতে সংমিশ্রিত। প্লটটি যতদূর কাব্যোপযোগী, ততদূর নাটকোপযোগী নহে। ইহার জানু—নির্ব্বাসিত তুদাপতি শূরতান সিংহের দুইটী কন্যা,—তারা ও বীণা। গ্রন্থের প্রথমাংশটী কিছু অস্পষ্ট, আবছায়াপূর্ণ, হেঁয়ালীর মত। একটু ধৈর্য্য ধরিয়া না পড়িলে শেষের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি হইবে না। কিন্তু ঘটনা বড় কম, গল্পের বৈচিত্র্যও ততোধিক কম। উচ্চ অঙ্গের নাটকের এ লক্ষণ হইলেও, উপস্থিত নাট্যকাব্যের ইহা সমীচীন হয় নাই। ইহা সত্ত্বেও কিন্তু, গ্রন্থখানি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। তাহার কারণ, ইহার অনেক স্থানে প্রকৃত কবিত্ব আছে। সে কবিত্ব অতি উচ্চ শ্রেণীর। দু'একটা নমুনা দিই;—

সঙ্গরাজ ও বীণার কথোপকথন ঃ—

"সঙ্গ। *** আজ শুনি, আর কভু সুধা'ব না বীণে!

"বীণা। অসি, ধর্ম্ম, বাণ যার—অস্ত্রশিক্ষা যার, বীণা হ'বে তার।

"সঙ্গ। যদি সে ভিখারী হয়?

"বীণা। বীণা হবে ভিখারিণী।

"সঙ্গ। সে যদি রাজত্ব পায়?

"বীণা। বীণা হ'বে রাণী।

"সঙ্গ। সে যদি দুর্ব্বল, ভীরু, হয় কাপুরুষ?

"বীণা। বীণা ম'রে যাবে!"

এই যে "বীণা ম'রে যাবে!"—এই একটী মাত্র ছত্রে রাজপুত-রমণীর চিত্র কেমন সুন্দর ফুটিয়াছে!

আর একস্থল;—স্বামীকে যুদ্ধে পাঠাইতে রাজপুত-সতীর উত্তেজনা।—পত্রে প্রকাশ, যুদ্ধ-জয় না-হওয়া-অবধি পৃথ্বীরাজ উপবাসী থাকিবেন;—তাই রমণী-রত্ন কমলা, স্বামী অজয়-সিংহকে উত্তেজিত করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে কিন্তু আবার এই রমণী স্বামি-দর্শন-লাভাশায় ব্যাকুলা ছিলেন!— * * *

"অজয়। সেত নয় ক্ষুদ্র রণ, বহু সৈন্য প্রয়োজন, তাই আমি আছি প্রাণেশ্বরি!

"কমলা। সৈন্য কি আমারে চাও? ছি ছি! সে না আছে তব তরে উপবাসী?

"অজয়। সে কি! এ সংবাদ তুমি কোথা পেলে? * * * গুরুদেব কোথা?

"কমলা। রুদ্ধদ্বারে—ভবানী-মন্দিরে।—তাই বলি শীঘ্র যাও। (প্রসাদী ফুল দিয়া(

এই ফুল লও।—প'ড়ে গেল,—প'ড়ে গেল? যায় যাক্,—ক্ষত্রিয়ের সমরে পতন বিয়োগ ত নয়;—সহধর্ম্মিনীর সনে, কুসুম-শয়নে, অনন্তের কোলে সে যে অনন্ত-কালের লীলা! —যাও, শীঘ্র যাও!"

"অজয়। কমলে! কমলে!

"কমলা। ফিরে চাহিব না, ফিরে চাহিতে দিব না,—কথা কহিব না, কথা কহিতে দিব না;—সে যে উপবাসী তব তরে!"

'কমলা' কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তারা-বীণাও যেন স্বপ্ন-কন্যা। এ স্বপ্ন-কন্যা দুটী, প্রকৃতির বিশাল-বুকে, আর কবির মানস-পটেই শোভা পায়। এ তিনটী নারী-চরিত্রই একটু বিশেষত্ব-পূর্ণ। এই বিশেষত্বটুকুই কবির নিজস্ব। ঠিক যেন এক বৃন্তে তিনটী ফুল ফুটিয়া আছে। সিন্দুরা, রাক্ষসী-চরিত্র;—কিন্তু শেষে ঘাত-প্রতিঘাত বেশ আছে। কবির হাত বেশ মিষ্ট, কিন্তু সুস্পষ্ট 'বোলের' অভাব।—বিশেষ পদ্য অপেক্ষা গদ্যে। স্থানে স্থানে ভাষাটাও যেন কিছু এলো-মেলো, ওজন-হীন। পদ্যেও স্থানে স্থানে যতিপাতদোষ ঘটিয়াছে। দৃশ্য-সংযোজনেরও ত্রুটী লক্ষিত হয়। অনেক গুণ আছে বলিয়াই, আমরা খুটিয়া-খুটিয়া এ দোষগুলিরও উল্লেখ করিলাম,—স্থানাভাবে উদ্ধার করিতে পারিলাম না। ভরসা করি, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় দ্বিতীয় সংস্করণে এ দোষগুলির প্রত্যাহার করিবেন। এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, যত্ন ও অধ্যবসায় থাকিলে, এই নব-কবি, কালে আপন বলে, এক-দিন সাহিত্যের অতি উচ্চস্থান অধিকার করি-বেন। "ফুল-শয্যা" কাব্যামোদীর আদরের বস্তু।

নূতন পাঠ। শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু, এম, এ, বি, এল, প্রণীত। কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ৴১০ আনা। বসুজ মহাশয়ের "নূতন পাঠ" চিরদিন-ই নূতন থাকিবে। পুস্তকখানি বালকদিগের শিক্ষার্থ বিরচিত হইয়াছে; কিন্তু ইহা পাঠে অনেক বৃদ্ধেরও জ্ঞানোদয় হইবে। 'ডিপজিটরী' গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়া ভালই করিয়াছেন। বাঙ্গালায় এ শ্রেণীর গ্রন্থের একান্ত অভাব ছিল। অনেকের ধারণা, 'স্কুলের ছেলেদের জন্ম বহি লেখা খুব সহজ;—যে-সে একাজ করিতে পারে।' বড় ভুল কথা। 'যে-সে' এ-কাজে নামিয়াছে বলিয়াই ত স্কুল-পাঠ্য-পুস্তকে এত বিভ্রাট! কত সূক্ষ্ম-দৃষ্টি, গবেষণা ও হিতাহিত জ্ঞান থাকিলে তবে এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া যায়! কারণ, বাল্যে যে ভাব হৃদয়ে প্রতি-বিম্বিত হইয়া থাকে, আজীবন, সেই ভাব রহিয়া যায়। সুতরাং স্কুল-পাঠ-পুস্তক লিখিয়া 'গুরুগিরি' করা যে-সে লোকের কাজ নহে, উচিত নহে। বসুজ-মহাশয় সাহিত্য-সমাজে চিন্তাশীল ও সুপণ্ডিত বলিয়া পরিচিত। "শকু-ন্তলা-তত্ত্বের" প্রতিভা লইয়া যিনি স্কুল-পাঠ্য পুস্তক-রচনার-আসরে নামিয়াছেন, তাঁহার সে রচনার মূল্য যে অনেক বেশী, তাহার আর কথাটি নাই। ফলে, "নূতন পাঠে"ও আমরা তাহার বিশিষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। পুস্তকখানির আগাগোড়া একটি সুন্দর সামঞ্জস্য আছে। ছেলেকে মানুষ করিয়া সংসার-ধর্ম্ম শিখাইতে হইলে, যেটীর পর যেটী একান্ত আবশ্যক, তাহা অতি পরিপাটীরূপে বুঝান' হইয়াছে। বহিখানি পড়িতে পড়িতে যখন যে প্রসঙ্গের অবতারণা আবশ্যক ভাবিয়াছি, পরক্ষণেই দেখিয়াছি, চিন্তাশীল-লেখক অতি নিপুণতার সহিত সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। এ-বড় কম ক্ষমতার কথা নহে। পুস্তকখানিতে নয়টি পাঠ সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই নয়টি পাঠে সাধা-রণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক কথা আছে। সংক্ষিপ্ত প্রাণি-তত্ত্ব, কৃষি-তত্ত্ব, শিল্প-তত্ত্ব—অনেক তত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। এমন-সব কঠিন ও গুরুতর বিষয়ের এত সরল ব্যাখ্যা

আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না বসুজ মহাশয়ের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে গ্রন্থের ভাষাও অতি পরিপাটী।

মনোহর পাঠ। শ্রীযুক্ত হরনাথ বসু প্রণীত। মূল্য ।৵০ আনা। এখানিও এক খানি স্কুল-পাঠ্য-গ্রন্থ। ইহাতে চারিটী অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে নীতি-কথা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহাজন-কথা, তৃতীয় অধ্যায়ে প্রাণি-কথা এবং চতুর্থ অধ্যায়ে কৃষিকথা আলোচিত হইয়াছে। অধ্যায় গুলির ভিতর আবার বিষয়-নির্ব্বাচনের বৈচিত্র্যও আছে। "সরল-মতি বালকদিগের পাঠোপযোগী পুস্তকে জ্ঞান ও ভাবের সংমিশ্রণ আবশ্যক" বোধে, গ্রন্থকার এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা অতি সরল ও সুস্পষ্ট। আলোচ্য বিষয়গুলিও প্রীতিকর। দেশী ও বিদেশী—পাঁচ ফুলে সাজি সাজাইয়া, শ্রীমান্ হরনাথ সাহিত্যের আসরে নামিয়াছেন। এ সাজির শোভা আছে, ফুলে সৌরভও আছে। মনোহর পাঠ, প্রকৃতই মনোহর। ছাপা, কাগজ এবং চিত্রগুলি তদধিক মনোহর।

প্রেমের পরীক্ষা। শ্রীযুক্ত নিত্যকৃষ্ণ বসু, এম-এ প্রণীত। গ্রন্থকার ইহার নাম দিয়াছেন,—মনোড্রামা বা একাত্মক গদ্য-নাট্য। নায়ক, আপন মুখেই মনের কথা ব্যক্ত করিতে-ছেন। গ্রন্থের মর্ম্ম এই, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন উচ্চ উপাধিধারী নব্য-যুবা 'সুখের' অন্বেষণে সংসার ঘুরিলেন, অনেক খেয়াল মাথায় লইয়া বেড়াইলেন,—সুখ মিলিল না!—শেষ ঘরে ফিরিলেন, ঘরে ফিরিয়া মাতৃ-পদ-ধ্যানে প্রকৃ-তিস্থ হইলেন। এখনকার দিনে রোগ অনেক, কিন্তু 'রোজা' বড় কম। বসুজ মহাশয় রোজা-গিরীতে বাহাদুরী দেখাইয়াছেন। আগুনে অনেক 'পোড়' খাইলে তবে সোণার পরীক্ষা হয়। 'প্রেমের পরীক্ষায়'ও সংসার-বিরাগী নব্যযুবাকে অনেক পোড় খাইতে হইয়াছে। গ্রন্থকারের মর্ম্মস্পর্শী করুণ-গীতি—"হায় সুখ, কোথায় তুমি, কেমন তুমি, কিসে তুমি?" রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু-সঙ্কুল এ ছার মাটীর সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়া, সকলকেই একদিন-না-একদিন এই করুণ সুরে কাঁদিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের "কমলাকান্ত" একদিন এই মিষ্ট-কান্নার-সুরে বাঁশরী বাজাইয়াছিলেন; আর চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের "উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম"ও এই সুরে কাঁদিয়া, একদিন বাঙ্গালী নর-নারীকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল;—বসুজ মহাশয়ের "প্রেমের পরীক্ষা"র ভাষাও কতকটা এই দুই গ্রন্থের ছাঁচে ঢালা।—সরল, প্রাঞ্জল ও মর্ম্মস্পর্শী। তবে গ্রন্থের প্রথমাংশটী পড়িয়া আমরা যেরূপ মোহিত হইয়াছি, শেষ অংশটীতে সেরূপ হই নাই। শেষ অংশটী ভাল হয় নাই।

দারোগার দপ্তর। ইহা একখানি মাসিক গল্প-গ্রন্থ। মাসে মাসে, ক্ষুদ্র পুস্তকা-কারে এক একটী গল্প সম্পূর্ণ হয়। এ গল্পের রচয়িতা শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়; প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী;—ঠিকানা কলিকাতা, সিকদার বাগান, বান্ধব-পুস্তকালয়। বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা। এ সংখ্যার গল্পের নাম—"বাঃ গ্রন্থকার"। মুখোপাধ্যায় মহা-শয় নিজে একজন সুদক্ষ পুলিস-কর্ম্মচারী—ডিটেক্‌টিভ;—কাজেই ডিটেক্‌টিভের গল্পও তিনি লিখেন বেশ। চুরী, জুয়াচুরী, জাল, খুন, ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি অনেক ভয়াবহ ঘটনা দারোগার দপ্তরে প্রকা-শিত হয়। তা ছাড়া, সমাজের অনেক গূঢ় কথা, অনেক রঙ্গ-রহস্যও থাকে। সৎ, সাধু এবং সতী-নারীর চরিত্রেও 'দপ্তর' পূর্ণ হয়। 'আদর্শ-চরিত্রের' না হৌক, বাস্তব-ঘটনার ইহা একখানি 'ফটো' বিশেষ। ফলতঃ, লোক-চরিত্র শিক্ষার ইহা একটী প্রকৃষ্ট উপায়। 'বাঃ গ্রন্থকারে'ও একটী অদ্ভুত জীবের চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষা বেশ সরল। গল্প গুছাইয়া বলিতে পারেনও তিনি বেশ। আমরা তাঁহার 'দপ্তরের' দীর্ঘ-জীবন কামনা করি।

জন্মভূমি।

৪র্থ ভাগ। } শ্রাবণ। ১৩০১। { ৮ম সংখ্যা।

লীলা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

লীলা বাপের বাড়ী আসিয়াছেন। হেমন্তকুমার একবার লীলার শ্বশুরকে লীলা কোথায় থাকিবে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিলেন, লীলার শ্বশুর একেবারে লীলাকে লইয়া অতবড় একটা দায় ঘাড়ে করিতে সাহস করেন নাই। মকদ্দমা মিটিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও মকদ্দমার কথা ঘরে ঘরে। কি জানি, ঐ সব কথা লইয়া সমাজে যদি একটা গোলযোগ ঘটিয়া বসে, তাই ভাবিয়া লীলার শ্বশুর এখন লীলাকে আনা, অতটা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই। তাই অত কথা না বলিয়া লীলার শ্বশুর হেমন্তকুমারকে বলিলেন, "অমূল্যকুমার ছেলে-মানুষ, বিশেষ এখন তাহার পাঠ্যাবস্থা; আর তাহার পরীক্ষার সময় উপস্থিত, এখন দিনকতকের জন্য লীলা যেমন আপনার কাছে আছে, তেমনি থাক্; তার পর আপনার মেয়ে, আমার ঘরের বৌ, দুদিন পরে আনিলেই হইল।" হেমন্তকুমার ফিরিয়া আসিলেন।

কাজেই লীলা বাপের বাড়ী রহিলেন, হেমন্তকুমার কিন্তু লীলাকে লইয়া বড় ভীত হইলেন। হেমন্তকুমারের অনেক জ্ঞাতি শত্রু, বিশেষ লীলার বিবাহের পর তাঁহার শত্রুর সংখ্যা বাড়ে বই কমে নাই। হেমন্তকুমারের সঙ্গে তুলনায় অমূল্যকুমারেরা অনেক বড় ঘর। অতবড় ঘরে অমন সুন্দরী মেয়ের বিবাহ হইলে কাহার না চোক টাটায়? বিশেষ আবার অমূল্যকুমার রূপে গুণে সর্ব্বাংশে লীলার উপযুক্ত পাত্র। লোকের এত ভাল কি দেখা যায়! লীলা বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসিলে, 'সে যে অনেক দিন অপরিচিত লোকের বাড়ী ছিল' এই কথা লইয়া হেমন্তকুমারের আত্মীয়-কুটুম্বদের ঘরে ঘরে একটু আন্দোলন চলিতে লাগিল।

কিন্তু তাই বলিয়া ঠাকুর-মা লীলাকে আদর করিতে কম করেন নাই। বরং অনেক দিনের পর আদরের লীলাকে পাইয়া ঠাকুর-মা আদরের একটু মাত্রা বাড়াইয়াছিলেন। ঠাকুর-মার আদরের প্রথম নম্বরে ছিল কান্নাকাটি, তার পর লীলাকে সাজানো, তাহার চুল বাঁধিয়া দেওয়া, তাহাকে গহনা পরানো, তার পর অমূল্যকুমারের নাম করিয়া একটু পরিহাস করা। লীলাও নাকে কাঁদিয়া তাহার "পানসে চোকের" জল ফেলিয়া ঠাকুর-মার হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া তাঁহাকে

আঁচড়াইয়া, তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু সে হাসি-তামাসা ছিল, দুদিন। সে ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি ছিল, বড়ই অল্প সময়ের জন্য। লীলার ভাগ্যের সুখ, মেঘের কোলে বিদ্যুতের মত দেখা দিয়াই লুকাইল। ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে, লীলার অদৃষ্টাকাশে মেঘ-সঞ্চয় হইতেছিল। ধীরে ধীরে লীলার জীবনের প্রাতঃসূর্য্যরশ্মি সেই মেঘের অন্তরালে লুকাইতেছিল। ধীরে ধীরে লীলার জীবনের প্রভাতে সন্ধ্যার অন্ধকার আচ্ছন্ন হইতেছিল, বুঝি প্রভাতের ধীর সমীর আর সে মেঘরাশিকে ছিন্নভিন্ন করিতে পারে না, বুঝি সে ক্ষীণ উষার হাসি আর অমঙ্গল অন্ধকারকে দূর করিতে পারে না!

লীলা হেমন্তকুমারের বাড়ী আসিবার পরেই তাঁহার আত্মীয় কুটুম্বগণের আত্মীয়তাটা কিছু বাড়িয়া গেল। লীলার পিসি-মা, মাসী মা, খুড়ী-মা, জেঠাইমা প্রভৃতি যে যেখানে ছিলেন, তাঁহাদের আনাগোনার আর বিরাম নাই। লীলার পিসী-মার মেয়ে লীলার এক-বয়সী। পিসী-মার বড় সাধ ছিল, তাঁহার মেয়ের ভাল ঘরে বিবাহ হয়। তা এমনি কপাল, লীলা বিবাহের পর ৩০০০ টাকার গহনা পাইল, আর পিসী-মার জামাই বিবাহের পরেই পিসী-মার ঘাড়ে পড়িয়াছে, কাজেই লীলার অদৃষ্ট দেখিয়া পিসী-মার মনটা একটু ভার-ভার হইয়াছিল। লীলার বিবাহের পর হইতে লীলার সুখ দেখিয়া আর মেয়ের কপাল ভাবিয়া পিসী মা আর হেমন্তকুমারের বাড়ী মাথা গলান নাই। কিন্তু তা হইলে কি হয়? এত দিনের পর লীলা ঘরে আসিয়াছে, পিসী-মা কি তাহাকে একবার দেখিতে যাইবেন না? আর না যাইলেই বা লোকে কি বলিবে! কাজেই চক্ষুলজ্জার খাতিরে অন্তত পিসী-মাকে হেমন্তকুমারের বাড়ী আসিতে হইল। এতদিনের পর হঠাৎ পিসী-মার ভাইঝীর উপর প্রবল স্নেহ উথলিয়া উঠিল, সেই স্নেহের স্রোতে ভাসিয়া পিসী-মা হেমন্তকুমারের বাড়ী উপস্থিত হইলেন।

পিসী-মা প্রথমে লীলাকে কত আদর করিলেন, তার পর তাহার কষ্ট হইয়াছিল বলিয়া কত 'হায় হায়' করিলেন; আর সেই কষ্টে নিজে কিছু করিতে পারেন নাই বলিয়া কতবার নিজের মুখে আগুন দিলেন। নীলরতনকে কত গালি পাড়িলেন, আর তার চেয়েও গালি পাড়িলেন, সেই ষণ্ডা মুসলমান লাঠিয়ালদের, যাহারা লীলাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। "পোড়ারমুখোদের কি একটু দয়া মায়া নাই গাঁ! তাহারা কেমন করিয়া লীলার ও-শরীরে হাত দিয়াছিল? তাহারা নাকি তিন দিন লীলাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল?" এইখানে পিসী-মা আর তাঁহার চক্ষের জল সাম্‌লাইতে পারিলেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "লীলাকে নাকি তিন দিন তাহাদের ভাত খাইতে হইয়াছিল?"

পিসী-মার অত ফোঁস-ফোঁসানির মধ্যে লীলা তাঁহার সব কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ, কিন্তু দায়ে পড়িয়া দু একটা "হুঁ" "হাঁ" দিয়াছিলেন। আমাদের পিসী-মা তাহা তেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, লীলা তাঁহার কথা স্বীকার করিতেছে। পিসী-মা ভাবিলেন, মেয়েটা কি বোকা? তা হোক, পিসী-মার কাজ হইয়া গেল, তিনি উঠিয়া গেলেন।

তার পর জেঠাই-মা আসিলেন, তিনি আর একটা নূতন তথ্য জানিতে আসিয়াছিলেন। তিনি কোথা হইতে শুনিয়াছিলেন, হৈমবতী লীলাকে আসিবার সময় একসুট সোণার গহনা দিয়াছেন। লীলার হাতে, তাহার বিবাহের সময়-পাওয়া সোনার বালা দেখিয়া জেঠাই-মা জিজ্ঞাসা করিলেন "হৈমবতীর হাতে অমনি বালা আছে না?" লীলা উত্তর দিলেন "হাঁ"।

জেঠাই-মার আর বুঝিতে বাকী রহিল না, ঐ বালাই হৈমবতী দিয়াছেন। হৈমবতীই বা কোথা হইতে বালা দিবে? তাহার ত আর নিজের ধন নয়। ও বালা নীলরতনেরই দেওয়া হইল। তখন জেঠাই-মার চোক ফুটিল, তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতে লাগিলেন; লীলা নীলরতনের দেওয়া-বালা পরিয়া আছে। জেঠাই-মার মনে হইল, ছুঁড়ীটা কি বেহায়া গা? পরপুরুষের দেওয়া-বালা এখনও হাতে পরিয়া আছে?"

এইরূপে পিসী-মার দল সকলে আসিয়া এক একটা সত্য আবিষ্কার করিয়া যাইতে লাগিলেন। আর তাঁহাদের আবিষ্কৃত অপরূপ সত্যের মহিমা-ধ্বজা অতি শীঘ্র ঘরে ঘরে উড্ডীন হইতে লাগিল। তখন ঝাঁকে ঝাঁকে হেমাঙ্গিনী, সরোজিনী, বিনোদিনী, মৃণালিনী, কামিনী, ভামিনী, নলিনী, বিমলা, কমলা, সরলা, সুশীলা, কুলবালা, বাবুবালা, কিরণবালা, চন্দ্রমুখী, শশিমুখী, পদ্মমুখী, সরোজ, বিরাজ, হ'রের-মা, নটোর-মা, ভুতোর-মা, পদোর-মা, দলে দলে ব্যগ্র হইয়া সেই সত্যের খনি লীলাকে দেখিতে আসিতে লাগিল লীলা একে সুন্দরী, তার পর অত ভাল ঘরে, অমন সুন্দর পাত্রের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে, এত সুখও কি চোখে দেখা যায় গা? তা-পিসী-মার দলই বল, আর প্রতিবাসীর দলই বল, আর সমবয়স্কার দলই বল, আর দাসীর দলই বল,—যাহারা লীলাকে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা হঠাৎ সকলে একমত হইয়া গেল। লীলার সামনে চোকোচোকি করিয়া, লীলাদের বাড়ীতে কাণাকাণি করিয়া, তাহাদের বাড়ীর বাহিরে একটু চেঁচাইয়া কথা কহিয়া, নিজের বাড়ীতে গেল। তারপর এই লইয়া, একটা হৈ-চৈ হইল। বৈকালে জল আনিতে গিয়া নদীর ঘাটে জটলা করিয়া কমিটিতে তাহারা ঠিক করিল,—লীলা মুসলমানের ভাত খাইয়াছে; আরো ঠিক করিল, লীলা কুচরিত্রা। ভেড়ার-দল কর্ত্তারা গিন্নীদের কথায় একটু দ্বিরুক্তিও করিলেন না। দেখিতে দেখিতে হেমন্তকুমার যাহা ভয় করিয়াছিলেন, তাহাই হইল। তিনি 'এক-ঘ'রে' হইলেন।

তখন হেমন্তকুমার একদিন অমূল্যকুমারকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। অমূল্যকুমারের পিতা অমূল্যকুমারকে যাইতে দিলেন না। হেমন্তকুমার দেখিলেন, জন্মের-শোধ লীলার সুখতারা ডুবিল। লীলা গোপনে অমূল্যকুমারকে আসিতে লিখিলেন, পত্রের উত্তর আসিল, "স্বেচ্ছাচারিণী স্বৈরিণীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতে ইচ্ছা করি না।" লীলার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ধীরে ধীরে লীলার পিতা-মাতার, লীলার ঠাকুর-মাঁর মুখে বিষাদের ছায়া পড়িতে লাগিল, আর যেমন দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, অমনি সেই ছায়া ঘনীভূত হইতে লাগিল। ধীরে ধীরে সেই ছায়ার প্রতিচ্ছায়া লীলার রূপের প্রভা মলিন করিতে লাগিল। লীলা যে চঞ্চলতা, হৈমবতীর ঘরে গিয়াও হারায় নাই, আজ বাপ-মার ঘরে বসিয়া অজ্ঞাতসারে লীলার সেই চঞ্চলতা অপহৃত হইতে লাগিল। ঠাকুর-মা আর লীলাকে পরিহাস করেন না, তবে লীলাকে দেখিলে তাঁহার চক্ষে অলক্ষ্যে জল আসিয়া পড়ে। ঠাকুর-মাকে দেখিলেও লীলার চক্ষে জল আসে, তবে সে জল—কথার প্রতিবাদের জন্ত "পানসে চোকের" জল নয়। এখন লীলার চক্ষে জল পড়ে, তাহার হৃদয় ফাটিয়া—তাহার নিজের অদৃষ্ট ভাবিয়া। লীলার অদৃষ্টে, যে কেহ সংসারে তাহার সংসর্গে আসিয়াছে, তাহারই সুখের সঙ্গে সম্পর্ক ফুরাইয়াছে। লীলা ভাবিতেন, তাহার ক্ষুদ্র জীবনের পঙ্কিল-স্রোত একেবারে বহিয়া

যায় না কেন? আর না যায় ত চারিদিকে স্বচ্ছসলিল অমন করিয়া কর্দ্দমময় করে কেন? কি বুঝিবে লীলা, কেমন করিয়া ইহার উত্তর দিব? প্রকৃতির বৈচিত্র্যই এই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

হুঁকা-হাতে মুকুয্যের তামাক খাওয়ার বিরাম নাই। দিনের মধ্যে কতবার তাঁহার হুঁকায় কলিকা উঠে পড়ে, তাহার একটা হিসাব রাখা বড়ই কঠিন। আর জন্মাবধি আজ পর্য্যন্ত তিনি কত ছিলিম তামাক পোড়াইয়াছেন, তাহার হিসাব করিতে বুঝি বড় বড় গণিতজ্ঞেরও মাথা বিগড়াইয়া যায়, বুঝি পরার্দ্ধেও কুলায় না। মুকুয্যে, জীবনের জাগ্রত অবস্থার ব'রে আনা ভাগ তামাক খাইয়া কাটাইয়াছেন। তাঁহার বুদ্ধির গোড়ায় তামাকের ধোঁয়া লাগিয়া বুদ্ধিটা খুব পাকিয়া উঠিয়াছিল; তবে একটু ধোঁয়াটে রঙ হইয়াছিল মাত্র। মুকুয্যের জীবন-অঙ্কে হুঁকা তাহার পৌনঃপুনিক দশমিক। ইহলোক হইতে আরম্ভ করিয়া স্বর্গের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছে। সেখানে যাইয়া "স্বর্গরাজ্যে হুঁকার অস্তিত্ব"-প্রতিজ্ঞা, বিধাতা জ্যামিতি-সূত্র দ্বারা প্রতিপন্ন না করিতে পারিলে মুকুয্যে স্বর্গে যাইতে সম্মত হইবেন কি না, নির্ণয় করা দুরূহ।

আজও হুঁকা-হাতে মুকুয্যে তাঁহার বাহিরের ঘরের দাওয়ায় বসিয়া চক্ষু বুজিয়া তামাক টানিতেছিলেন। আজ তামাকটা বড়ই মিষ্ট লাগিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তেমন করিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিতে হইতেছিল না, বা পাইচারির বেগ হইতেছিল না। এমন সময় হেমন্তকুমার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যথারীতি প্রণাম করিয়া বসিবার পর মুকুয্যে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন হেমন্তকুমার লীলাকে ঘরে লইবার পর যে কারণে 'এক-ঘ'রে' হইয়াছেন, তাহার বিবরণ সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন। শুনিতে শুনিতে মুকুয্যের তামাক-টানার বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তামাকের ধোঁয়ায় জড়াইয়া তাহার বুদ্ধিটা ওলট-পালট করিতে লাগিল। শেষে হেমন্তকুমারের কথা শেষ হইলে, মুকুয্যে জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে এখন?"

হেমন্তকুমার বলিলেন, "এখন উপায় আপনি। আজ আমি আপনার শরণাগত, আপনিই লীলার বিবাহ দিয়াছেন, আজ আপনিই তাহাকে রক্ষা করুন"। কথা বলিতে বলিতে হেমন্তকুমারের চক্ষু ছল-ছল করিতে লাগিল।

মুকুয্যে বলিলেন, "আপনি যান, দিন কতক পরে আসিবেন। দেখি কতদূর করিতে পারি।"

হেমন্তকুমার বিদায় হইলে পর মুকুয্যে আর কয় ছিলিম তামাক পোড়াইয়াছিলেন, তাহার একটা সঠিক হিসাব আমরা রাখিতে পারি নাই। তবে অনেক রাত্রেও ঘরে আসিলেন না দেখিয়া মুকুয্যের গৃহিণী লোক পাঠাইয়া ডাকিয়া আনেন। ঘরে আসিয়া খাইবার সময় নাকি মুকুয্যে ডালের বাটির জায়গায় দুধের বাটী পাতে ঢালিয়াছিলেন। ব্যাপার দেখিয়া মুকুয্যের গৃহিণী জিজ্ঞাসা করেন, "ও কি, পাগল হ'লে নাকি"? মুকুয্যে উত্তর দিলেন "হুঁ"। তাহার পর আর কোন কথা কহেন নাই। মুকুয্যের গৃহিণী তাঁহার প্রকৃতি বেশ জানিতেন; তাই বুঝিলেন, আবার একটা কি পরের ভাবনায় মুকুয্যের মাথা-ব্যথা পড়িয়াছে। তিনি আর মুকুয্যেকে বিরক্ত করিলেন না।

ইহার পর কয়দিন নীরদাকে মুকুয্যের বাড়ী যাওয়া-আসা করিতে দেখা গিয়াছিল। আর আমরা দেখিয়াছি, মুকুয্যে গোপনে নীলরতন রায়েরও বাড়ী গিয়াছিলেন।

তার পর, একদিন হঠাৎ মুকুয্যে অমূল্যকুমারের পিতার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক দিনের পর পাঠ্যাবস্থার বন্ধুকে পাইয়া অমূল্যকুমারের পিতা মুকুয্যের অনেক খাতির, যত্ন, আদর, অভ্যর্থনা ও সংবর্দ্ধনা করিলেন। পরে মুখে হাতে জল দিয়া জল খাইয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে হুঁকা হাতে মুকুয্যে উপবিষ্ট হইলে, অমূল্যকুমারের পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ হঠাৎ কি মনে ক'রে? ব্যাপারখানা কি?"

মুকুয্যে একেবারেই উত্তর দিলেন, "ব্যাপারখানা গুরুতর; হেমন্তকুমারকে সকলে 'এক-ঘ'রে' করিয়াছে।"

অমূল্যকুমারের পিতা বলিলেন, "তা ত জানি। কিন্তু কি করিব? উপায় ত কিছু দেখি না। কয়েক দিন হইতে তোমাকে ডাকাইব মনে করিতেছিলাম, তা ভালই হইয়াছে, আজ সৌভাগ্যবশতঃ তুমি আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ; এখন উপায় কি?"

মুকুয্যে বলিলেন, "তার জন্য আর বড় ভাবিতে হইবে না, আমি সব ঠিক করিয়া আসিয়াছি। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি, রায়পুর হইতে রাজগ্রাম যাইতে যে কয় ঘণ্টা লাগে, সেই কয় ঘণ্টামাত্র লীলা লাঠীয়ালদের কাছে ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহই মুসলমান ছিল না। লীলা তাহাদের ভাত খায় নাই। হৈমবতী লীলাকে কোন গহনাই দেয় নাই।"

অমূল্যকুমারের পিতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ভাই! তুমি যেমন অনুসন্ধান করিয়াছ, আমিও তেমনি অনুসন্ধান করিতে ত্রুটি করি নাই। তুমি যাহা জানিতে পারিয়াছ, আমি তোমার আগেই তাহা জানিতে পারিয়াছি। তবে তোমার আমার জানায় কি আসে যায়। সকলে বুঝিবে কেন?"

মুকুয্যে বলিলেন, "তাহারও উপায় করিয়াছি। হৈমবতী স্বীকার করিয়াছেন যে, যদি আর ফৌজদারি হাঙ্গামা না হয়, তবে যে যে লাঠিয়াল লীলাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহারা সকলের সমক্ষে আপনাদের অপরাধ স্বীকার করিবে। তার পর নীলরতনের বাড়ী লীলা যে অবস্থায় ছিল, হৈমবতী নিজে বলিবেন; আর তিনি যে লীলাকে কোন গহনা দেন নাই, সে কথা তিনি বুঝাইয়া দিবেন। এখন কেবল যাহারা হেমন্তকুমারকে 'এক-ঘ'রে' করিয়াছে, তাহাদের একদিন একত্র করিতে পারিলেই হয়।"

অমূল্যকুমারের পিতা বলিলেন, "এখনও বুঝি সব ঠিক হইল না। ইহাতেও যদি হেমন্তকুমারের জ্ঞাতি-শত্রুরা বিশ্বাস না করে?"

মুকুয্যে বলিলেন, "বিশ্বাস না করার কারণ দেখি না। হৈমবতী বড় ঘরের মেয়ে, বড় লোকের স্ত্রী; তাহার সত্য কথায় অবিশ্বাস করে কাহার সাধ্য? তবে যদি কেহ নিতান্ত অবিশ্বাস করে, তবে তাহার জন্য হৈমবতী আরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে রাজি আছেন।"

"আরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ?" অমূল্যকুমারের পিতা বুঝিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহার অধিক আরও কি প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে পারে?"

মুকুয্যে হাসিয়া উত্তর দিলেন, "ভায়া! সংসারে এতকাল কাটাইলে, এখনও প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বুঝিলে না? এ প্রত্যক্ষ প্রমাণ, হৈমবতীর সিন্ধুকের চাবির ভিতর থাকে। যাহার হাতে পড়ে, সে জগৎটা করতলন্যস্তামলকবৎ দেখিতে পায়। লীলা-চুরির ব্যাপারটা আর দেখিতে পাইবে বিচিত্র কি? হৈমবতী তাঁহার স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ প্রচুর প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যয় করিতে রাজি আছেন।"

অমূল্যকুমারের পিতা হাসিয়া উঠিলেন,

বলিলেন "বটে বটে, তা তিনিই বা একা অত প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে যাইবেন কেন। অমূল্য-কুমার আমার এক ছেলে, আর লীলার মত রূপগুণবতী কন্যা বুঝি সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তা অমূল্যকুমারই যদি অমন বৌকে লইয়া ঘর করিতে না পারিল, তবে আমারই বা সংসারে থাকিয়া লাভ কি? আর তুমিও জান, ভগবানের কৃপায় আমিও কিছু সঞ্চয় করিয়াছি (অমূল্যকুমারের পিতা বৈঠকখানায় কাঠের ফ্রেমে বসান ফায়ার প্রুফ লোহার সিন্দুক দেখাইলেন); তা না হয় বেটার জন্য, বৌএর জন্য, কিছু খরচই করিলাম।"

মুকুয্যে বলিলেন, "তবুও ভাল, এ কথা আগে তোমাকে বলিতে সাহস হয় নাই। কি জানি, তোমরা ছেলের বাপ, ছেলের আর একটা বিবাহ দিতে কতক্ষণ? তা যাহা হউক, যখন তুমিও খরচ করিতে রাজি আছ, তখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ ত প্রত্যক্ষতর হইয়া গেল। আর 'এক-ঘ'রের' কথাটা ছাড়িয়া দিলেই হয়। অ'রে তামাক দে।" অনেকক্ষণ মুকুয্যের তামাক খাওয়া হয় নাই।

মুকুয্যে তামাক খাইয়া উঠিতেছিলেন, অমূল্যকুমারের পিতা হাত ধরিয়া বসাইলেন, "আহে, এমন সন্ধের সময় যাবে কোথা? অনেক দিনের পর দেখা, না খাইয়া যাইতে পারিবে না।" অগত্যা অমূল্যকুমারের পিতার নির্ব্বন্ধে মুকুয্যে সে রাত্রি সেইখানেই কাটাইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ধন্য মুকুয্যের বুদ্ধি! আর ধন্য সমাজের দিব্যজ্ঞান। দিনকতক মুকুয্যের হাঁটাহাঁটিতে, কোথাও রজত-মুদ্রার বিতরণে, কোথাও রজত-মুদ্রার প্রলোভনে, ক্রমে ক্রমে সমাজের বোল ফিরিল, এই দুদিন আগে যাহারা হেমন্ত-কুমারকে 'এক-ঘ'রে' করিবার নেতা ছিলেন, আজ তাঁহারাও ও-কথা উঠিলে বড় একটা কিছু বলেন না। দু এক জন এরি মধ্যে হেমন্ত-কুমারের পক্ষসমর্থন করিতে লাগিলেন। বলেন, "অমন ঢের হইয়া থাকে।" যদিও হেমন্ত-কুমারকে সমাজে লইবার জন্য একটা বিরাট্ আয়োজনের কথা হইয়াছিল, তথাপি এরি মধ্যে হেমন্তকুমারের একঘ'রের কথাটা ধীরে ধীরে ডুবিতে লাগিল। এ কথা হেমন্তকুমার বুঝিতে পারিলেন। অমূল্যকুমারের পিতারও বুঝিতে বাকী রহিল না। সকলেই আশ্বস্ত হইলেন। ঠাকুর মা পর্য্যন্ত চোকের জল মুছিলেন। কিন্তু তবুও এ সব দেখিয়াও দেখিল না, বুঝিয়াও বুঝিল না, কেবল লীলা।

লীলা ধীরে ধীরে আপনার উপর বিশ্বাস হারাইতেছিল। 'এক-ঘ'রে' হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত লীলার অলোক-সামান্য সৌন্দর্য্য ও স্বাভাবিক সরলতা সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিত। শিশু-লীলাকে কোলে করিতে লোকের কতই না যত্ন ছিল! তখন লীলা কেমন লহর তুলিয়া হাসিতে পারিত; আর সেই হাসি দেখিতে আর সঙ্গে সঙ্গে লীলাকে নাচাইতে লোকের কতই না আগ্রহ ছিল! বালিকা লীলার সহচরীগণের লীলাকে না পাইলে খেলা হইত না। তখন লীলা যাহাদের বাড়ী খেলিতে যাইতেন, তাহা-দের বাড়ীর গৃহিণীরা কত যত্ন করিয়া লীলার আ-গুল্ফ-লম্বিত কেশ বিনাইয়া দিত। ভবিষ্যতে স্বামীর ঘর আলো করিবে বলিয়া, কত আশীর্ব্বাদ করিত। লীলার জন্য কে কত তপস্যা করিয়াছে; সেই তপস্যার বলে লীলাকে পাইবে বলিয়া কতই আশস্ত করিত। এইরূপ ঘটনাবলীর সংযোগে লীলা সংসারকে সুখের কাম্য-কানন দেখিতেন, ভবিষ্যতের উপর বিশ্বাস ছিল, বুঝি এমনি দিনই কাটিবে।

নিজের উপরে ততোধিক বিশ্বাস ছিল। লীলা যা মনে করে, তাহাই হয়; যা চায়, তাহাই পায়।

'এক-ঘ'রে' হইবার পরেই পৃথিবীর কাঁটা প্রথম লীলার পায়ে ফুটিল। লীলা দেখিল, জগৎসংসার আর লীলার মনের মত হইয়া চলে না। যেমনটী ছিল, তেমনটি আর রহিল না। লীলা ঠাকুর-মার মুখের দিকে চাহিলেন, সেখানে চ'খের জল; মাসী-মার মুখের দিকে চাহিলেন, সেখানে বিষাদের কালিমা; সহচরী-দের দিকে চাহিলেন, তাহারা মুখ ফিরাইল; আত্মীয় কুটুম্বদের দিকে চাহিলেন, তাহারা ফিরিয়াও দেখিল না, তাই লীলার নিজের উপর বিশ্বাস টলিল; লীলা আত্মহারা হইলেন। তখন সেই গাঢ় অন্ধকারে শান্ত জ্যোতির রেখা, অসীম মরুভূমে শস্যশ্যামল তৃণক্ষেত্র স্বামীর মুখ লীলার হৃদয়ে শনৈঃ শনৈঃ দেখা দিল। লীলা দেখিল, নিজের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে বটে, কিন্তু স্বামীর উপর বিশ্বাস হারায় নাই। জগতে স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি স্বামী; সেই স্বামীর উপর লীলার অটল বিশ্বাস স্থাপিত হইল।

অনেক গোপনে, অনেক দুঃখে, বড় ভয়ে, ভয়ে লীলা অমূল্যকুমারকে পত্র লিখিয়াছিলেন। এ পত্রের কথা আর কেহ জানিত না, লীলা আর কাহাকেও বলা প্রয়োজন মনে করে নাই। তার পর সে পত্রের যে উত্তর আসিয়াছিল, তাহাতে অকৃতাপরাধা লীলা মরমে মরিয়াছিল। এতদিন লীলার ফুটনোন্মুখ হৃদয় আশাবদ্ধ হইয়াছিল, উত্তর পাইবার পর শুকাইতে আরম্ভ করিল, তাই এতটা কাণ্ড হইয়া গেলেও লীলা ফিরিয়া দেখিল না; তাই সকলে চোখের জল মুছিলেও লীলার চোখের জল শুকাইল না।

লীলা তাহার প্রিয়দ্রব্যে বীতস্পৃহ হইতেছিল। পোষা পাখীটীকে তেমন করিয়া আর আদর করে না। খেলেনার বাক্স তেমন করিয়া সাজায় না, গহনার বাক্স তেমন করিয়া নাড়েচাড়ে না। লীলার বড় আল্‌তা পরার সাধ ছিল, পাড়ার কোথাও নাপিতিনী আসিলে লীলা গিয়া তাহার কাছে উপস্থিত হইত; আর পায়ে ও হাতে আল্‌তা না পরিয়া সাজিয়া তাহার মনঃপূত হইত না। নাপিতিনীরও সেই সুন্দর রাঙ্গা-পায়ে আল্‌তা না দিলে আলতা-পরান সার্থক হইত না; আজ ঘরে আসিয়া নাপিতিনী ডাকা-ডাকি করিল, লীলা আল্‌তা পরিতে উঠিল না। মেছোনি মাগী বড় উজ্জ্বল টিপ্‌পোকা আনিয়াছে, লীলা ফিরিয়াও দেখিল না। জল না পাইয়া লীলার সাধের গোলাপ গাছ শুকাইল। আহার না পাইয়া লীলার প্রিয় লাল মাছগুলি মরিল। যত্নের অভাবে লীলার সুন্দর খেলেনায় ছাতা পড়িল।

এ পরিবর্ত্তন সকলেই বুঝিতে পারিল। ঠাকুর-মা মনে করিলেন, 'কেন এমন হয়!' হেমন্তকুমার মনে করিলেন, 'বুঝি ছেলেমানুষ-লীলার মন হইতে এখনও 'এক-ঘ'রে' হওয়ার কথাটা যায় নাই।' পাড়ার লোকেরা তখন মনে করিল, 'বুঝি লীলাকে অপদেবতাতে পাইয়াছে।' তখন তাহারা সকলে মিলিয়া ঠিক করিল, একবার অমূল্যকুমারকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা উচিত। অমূল্যকুমারের পিতাও এখন গোপনে অমূল্যকুমারকে পাঠাইতে বড় একটা অমত করিলেন না। লীলা কিন্তু এ কথা শুনিয়া অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া, অমূল্যকুমারকে আনিতে নিষেধ করিলেন। লীলার কি হইয়াছে, কেহ বুঝিল না। এতদিনেও লীলার চক্ষের জল, মনের আগুন নিবিল না।

এই সময় একদিন নীরদা লীলাকে দেখিতে আসিয়াছিল। অমূল্যকুমার যে পূর্ব্ব হইতে লীলাকে সন্দেহ করিয়াছিল, এ কথা নীরদা জানিত; আর সেই সন্দেহে যে বিষময় ফল

উৎপন্ন হইতে পারে, নীরদা সে ভয় করিয়াছিল। বাড়ী আসিয়া যখন শুনিল যে, সমাজের আগুন নেবো-নেবো হইলেও লীলা অমূল্যকুমারকে আনিতে মানা করিয়াছে, তখনই নীরদা বুঝিল, যে অমূল্যকুমার কি-একটা কাণ্ড ঘটাইয়াছে। হৈমবতীর গৃহে আসিবার সময় নীরদার কি যেন একটু লীলার উপর মায়া হইয়াছিল। লীলাও নীরদাকে কোন কথা বড় একটা গোপন করিত না।

আজ রুদ্ধদ্বারে উপাধানে মুখ লুকাইয়া লীলা যেখানে অশ্রুরাশিতে সিক্ত হইতেছিল, নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে নীরদা সেখানে উপস্থিত হইল। তার পর মাথার শিয়রে দাঁড়াইয়া নীরদা ডাকিল, "বোকা মেয়ে!"

পরিচিত গলার স্বরে লীলা মুখ তুলিল, কিন্তু কোন কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না, কপোল বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।

সযত্নে মুখ মুছাইয়া দিয়া নীরদা বলিল, "কাঁদিতে আছে কি? আর কি, দুদিন পরে স্বামি-সোহাগিনী হইবে, তোমাকে সুখী দেখিয়া আমরা মরিব।"

কাঁদিতে কাঁদিতে লীলা বলিল, "আমি না কাঁদিলে কাঁদিবে কে? তিনি যে দাসীকে পায়ে ঠেলিয়াছেন! দাসীর যে সব ফুরাইয়াছে।"

নীরদা বলিল, "এই যে নেকা-মেয়ের মুখ ফুটিয়াছে, এ মুখ দুদিন আগে ফুটিলে আজ আর কাঁদিতে হইত না। নিজের মাথা নিজে খাইয়াছ! হৈমবতীর ঘরে এমন করিয়া কেন সব অমূল্যকুমারকে বুঝাইয়া বলিতে পার নাই?"

লীলা আবার উপাধানে মুখ লুকাইল।

নীরদা নিজের চোক মুছিয়া বলিল, "এবার যদি দেখা হয়, বুঝাইয়া বলিতে পারিবে ত?"

নীরদা বড়ই কঠিন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে, অমূল্যকুমারকে দেখিলে লীলার সব কেমন গোলমাল হইয়া যায়। অনেক ভাবিয়া লীলা উত্তর দিল "দেখি।"

তখন চক্ষু মুছিতে মুছিতে নীরদা বাহির হইয়া গেল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ণিমা রজনী; জ্যোৎস্নায় জগৎ পরিপ্লাবিত। সে জ্যোৎস্নার তরঙ্গ যেন পৃথিবীকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। আজ ভাগীরথীর স্রোতে, জ্যোৎস্না-অন্তর্নিহিত সরোবরের ক্ষুদ্র বীচিক্ষোভের সঙ্গে পরিক্ষিপ্ত নৈশ-সমীরণের স্তরে স্তরে অন্তর্নিবিষ্ট ফুলের হাসি; জ্যোৎস্না-মাখা পাপিয়ার বা জ্যোৎস্না-বিধৌত কোকিলের পঞ্চম জ্যোৎস্না-তরঙ্গায়িত। সে জ্যোৎস্নায় স্নান করিয়া জড়-প্রকৃতি আজ সজীব, অনেক দিন প্রকৃতি এমন হাসি হাসে নাই। আজ প্রকৃতির এ হাসি এক নিশ্বাসে দেখিয়া শেষ করা যায় না; দেখিতে দেখিতে দিগন্তে মিশাইয়া যায়। এক দেখায় হৃদয় স্পর্শ করে না; যেখানে দেখি, সেই খানেই হৃদয়ের কথা; কোন্ কথা হৃদয় স্পর্শ করিবে? আজ জ্যোৎস্নার স্রোতে পৃথিবীর পাপ বিধৌত, মলিনতা সুদূরীকৃত। সেই স্রোতে বাণচাল হইয়া পাপীর হৃদয়ও আকাশ পানে চাহিতেছে। আজ অপূর্ণ জগতে পূর্ণিমার পূর্ণতা। পৃথিবীতে স্বর্গের ছায়া।

আজ এই পূর্ণিমায় ভাগীরথীর তীরে নির্জ্জনে একাকী অমূল্যকুমার করতলন্যস্ত-কপোলে বসিয়া আছেন। জ্যোৎস্না তাহার সম্মুখে খেলা করিতেছিল, প্রকৃতি তাহার চারিদিকে কবিতা ছড়াইতেছিল। অমূল্যকুমারের হৃদয় এখনও এত নীরস হয় নাই যে, নগ্ন-প্রকৃতির এই জ্যোৎস্নাময় সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হয় না। তাই আজ কবিতাকে লইয়া জ্যোৎস্নার স্রোতে ভাসমান হইয়া, তাঁহার মন অনেক দূরে

গিয়া পড়িয়াছিল। আজ অমূল্যকুমার উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই অতীত-প্রদেশে;—যেখানে বিগত জীবনের ঘটনাবলীর রেখা স্মৃতির স্বচ্ছ-সলিলে প্রতিবিম্বিত হইয়া খেলা করিতেছিল। অমূল্যকুমার মনশ্চক্ষে দেখিতেছিলেন, এমনি জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে তাঁহার বিবাহ, এমনি জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর উৎসবে তাঁহার ফুলশয্যা। অমূল্যকুমার দেখিতেছিলেন, জ্যোৎস্নাসিক্ত হাসি অধরে লইয়া আপাদ-মস্তক পুষ্পাভরণে বিভূষিতা, প্রকৃতির অতুল্যকুসুম লীলা মন্থর-গতিতে তাঁহার নিকট আসিতেছেন, জ্যোৎস্নায় ফুলে মাখামাখি; চারিদিকে ফুলের রাশি। বাছিয়া বাছিয়া সুন্দর গোলাপ তুলিয়া অমূল্যকুমার লীলার গায়ে ফেলিয়া দিলেন। লীলা ফিরিয়া দেখিল, অমূল্যকুমার কি বলিতে যাইতেছিলেন; এমন সময় মাথার উপর দিগন্ত কাঁপাইয়া কোকিল ডাকিল—"কুহু"; বনস্পতির বিশাল শাখায় প্রতিহত হইয়া, প্রতিধ্বনি বলিল, 'কুহু'; কুঞ্জে কুঞ্জে সঞ্চরমান সমীরণ উত্তর দিল, "কুহু"; ভাগীরথীর অপর পার, সে পঞ্চম ফিরাইয়া দিল, বলিল, 'কুহু'। অমূল্য-কুমারের মনে সে 'কুহু' বড়ই গোলমাল আরম্ভ করিল। অমূল্যকুমার আপনা-আপনি অনুচ্চ-স্বরে বলিতে লাগিলেন, "লীলা, লীলা, কোথায় তুমি? এতক্ষণ দেখিতেছিলাম, এ অনন্ত-সৌন্দর্য্যে তোমার সৌন্দর্য্য না মিশাইলে বুঝি সৃষ্টির পূর্ণ বিকাশ হয় না; কিন্তু আজ কে তোমায় দেখাইয়া দিবে?" রূপে-মুগ্ধ আত্ম-বিস্মৃত অমূল্যকুমার যে জন্য লীলার উপর রাগ করিয়াছিলেন, ভুলিয়া গেলেন।

ধীরে ধীরে পশ্চাৎ হইতে উত্তর হইল, "আমি, দেখাইয়া দিব।"

অমূল্যকুমারের চমক ভাঙ্গিল। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, মনুষ্যমূর্ত্তি; জ্যোৎস্নালোকে চিনিলেন, নীরদা।

তখন অমূল্যকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "নীরদা, তুমি এখানে কেন?"

বিনয়ে, নম্রভাবে নীরদা উত্তর দিল, "আপনি এখানে কি জন্য?"

তখনও প্রকৃতি বুঝি, অমূল্যকুমারের সম্মুখে কবিতা ছড়াইতেছিল, তাই অমূল্যকুমার বলি-লেন, "আমি আজ জীবনের পথে দিশাহারা; তাই আজ এখানে দিক্ নির্ণয় করিতে আসি-য়াছি।"

ঠিক তেমনি স্বরে নীরদা উত্তর দিল, "আমিও আপনাকে দিক্ দেখাইতে আসি-য়াছি।"

মর্ম্মপীড়িত স্বরে অমূল্যকুমার বলিলেন, "না নীরদা! সে ক্ষমতা আর তোমার নাই। আর একদিন এমনি করিয়া আমার লীলাকে দেখাইয়া জীবনের দিক্ দেখাইতে আসিয়া-ছিলে। তখন পৃথিবী প্রাতঃসূর্য্যকিরণ-মণ্ডিত ছিল; যেদিকে চাহিতাম, সেই দিকেই সোণা; মাটিতে, গাছেতে সোণা ফলিত; লীলার নামে কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিত; লীলার রূপে চক্ষে স্থির সৌদামিনী দীপ্তিমতী হইত। ভাবিতাম, পৃথিবী লীলার জন্য, আমার জন্য,—পুণ্যভূমি, সুখের ক্রীড়াক্ষেত্র পৃথিবী!—তাই সেদিন তোমার সঙ্গে গিয়াছিলাম। কিন্তু সেই দিন অবধি কে আমার চ'কের চসমা খুলিয়া লই-য়াছে। এখন শুধু দেখিতে পাই, মানুষের ক্ষুদ্রত্ব, শুনিতে পাই, শুধু পাপের গণ্ডগোল। সম্মুখে মূর্ত্তিমান্ অবিশ্বাস, তবুও এখনও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না, লীলা অবিশ্বাসিনী।"

এতক্ষণ নীরদা সব বুঝিতে পারে নাই, তাই চুপ করিয়াছিল। 'লীলা অবিশ্বাসিনী' শুনিয়া পদ-দলিত গর্ব্বিত-ভুজঙ্গের ন্যায় মাথা তুলিয়া বলিল, "লীলা অবিশ্বাসিনী নহে, আপনি তাহার কাছে অপরাধী!"

'যদি তাহা হয়, যদি অমূল্যকুমার এতদিন

না বুঝিতে পারিয়া থাকে, সে ত এতদিন তাহার মনের সন্দেহ কাহাকেও বলে নাই; হয় ত বলিলে এতদিন কেহ-না-কেহ তাহার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিত। আর সে যে সেই সন্দেহের জন্য অনর্থক লীলাকে রূঢ় কথা লিখিয়াছিল, আর সেই জন্য লীলা কত কাঁদিয়াছে! আমি আজ লীলার কাছে কত অপরাধী"—মনে মনে এই কথা বলিতে বলিতে অমূল্যকুমার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন। কতক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাই যদি হয়, তবে বল, কেন সেদিন লীলা নীলরতনের মঙ্গল-কামনা করিয়াছিল?"

তেমনি গর্ব্বিত স্বরে নীরদা বলিল, "লীলা নীলরতনের মঙ্গল-কামনা করে নাই, হৈমবতীর মঙ্গলকামনা করিয়াছিল। লীলা হৈমবতীর কাছে কত ঋণী, আপনি কি বুঝিবেন? হৈমবতী লীলাকে বাঁচাইয়াছেন;—তাহার অধিক—লীলার ধর্ম্মকে বাঁচাইয়াছেন। এ অবস্থায় লীলার ক্ষুদ্র কৃতজ্ঞ-হৃদয় কেন না হৈমবতীর মঙ্গলকামনা করিবে? তার পর হৈমবতী কি? হৈমবতী কি নীলরতন ছাড়া? আপনি স্বার্থপূর্ণ নয়নে এ সব দেখিতে পান নাই। লীলা তাহার কাজ করিয়াছে, আর আপনি বুদ্ধিমান্ পুরুষ, আপনি লীলাকে অবিশ্বাস করিয়া তাহার উপযুক্ত পুরস্কার দিয়াছেন!" যে গর্ব্বিত স্বরে, নীরদা আজ অমূল্যকুমারকে এ সব কথা শুনাইতেছিল, অন্য দিন হইলে হয়ত সে অমূল্যকুমারের নিকট হইতে হাতে হাতে কিছু ফিরিয়া পাইত;—কিন্তু আজ স্থিরভাবে অমূল্যকুমার নীরদার কথা শুনিতে লাগিলেন।

ধীরে ধীরে অমূল্যকুমারের চক্ষের সম্মুখ হইতে কোয়াসা সরিয়া যাইতে লাগিল, আবার সেই কোয়াসা ভেদ করিয়া, তাঁহার চক্ষের সম্মুখে প্রকাশ পাইতে লাগিল,—রূপময়ী মহিমান্বিতা গৌরবান্বিতা লীলা। অমূল্যকুমার দেখিলেন, বুঝিতে পারিলেন, তিনি অপরাধী।

অমূল্যকুমার মনের আবেগে নীরদার হাত ধরিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ মনের বেগ সংবরণ করিয়া বলিলেন, "নীরদা! এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি? লীলা কি ক্ষমা করিবেন?"

নীরদা সময় পাইয়াছে, ছাড়িবে কেন? বলিল "প্রায়শ্চিত্ত? প্রায়শ্চিত্ত আছে বৈ কি। এ প্রায়শ্চিত্তে পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হয়, আর নীরদাকে ২২ কাহন কড়ি দিতে হয়। তা আমায় না হয় ২২ কাহন কড়ি নাই দিলেন, পায়ে ধরাটা অভ্যাস আছে কি? সেটা না হইলে কিন্তু চলিবে না।"

অমূল্যকুমার বলিলেন, "তা হ'বে এখন; এখন লীলাকে দেখাইয়া দিবে বলিয়াছিলে, চল।"

বিনা বাক্যব্যয়ে নীরদা আগে আগে চলিল, অমূল্যকুমার পাছে পাছে চলিলেন।

হেমন্তকুমারের বাড়ী উপস্থিত হইয়া ঠাকুর-মার ঘরের কাছে গিয়া নীরদা আস্তে আস্তে ডাকিল, "ঠাকুর-মা!" ঠাকুর-মা সবেমাত্র দোক্তা-দেওয়া পান চিবাইতে চিবাইতে ঘুমাইয়াছেন, দোক্তার ঝোঁকে স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, লীলার ঘরে মস্ত একটা সিঁধেল চোর ঢুকিয়াছে। চোর চুরি করিবার আগে লীলার জিনিস পত্র সব গুছাইয়া গুছাইয়া তুলিতেছে। বড় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া সাজাইতেছে। তখনি নীরদার ডাকে ঠাকুর-মার ঘুম ভাঙ্গিলে ঠাকুর-মা স্বপ্নের ঘোরে বলিলেন, "লীলা, ও যে চোর।"

নীরদা বলিল, "তা চোর বই কি! নহিলে এত রাত্রে এমন করিয়া আসিবে কেন? এখন দরজা খুলিয়া দিন।"

ঠাকুর-মা পাশ ফিরিয়া আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া শুইলেন, তার পর আবার নীরদার ডাকে নিদ্রাভঙ্গ হইলে দরজা খুলিয়া দিলেন। সম্মুখে

অমূল্যকুমারকে দেখিয়াই আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "এস দাদা এস"। ঠাকুর-মা কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন; তখন নীরদা তাঁহাকে কথা কহিতে অবসর না দিয়াই বলিল, "অমূল্য-কুমারের লীলার কাছে কিছু বিশেষ প্রয়োজন আছে, এখনি চলিয়া যাইতে হইবে; আর কাহাকেও জাগাইবেন না।" অমূল্যকুমারও আর কাহাকেও জাগাইতে নিষেধ করিলেন। অগত্যা ঠাকুর-মা অনেক দিনের পর নাত-জামাইকে পাইয়াও অভ্যর্থনা করিতে পারিলেন না।

তখন নীরদা অমূল্যকুমারকে লইয়া লীলার ঘরে প্রবেশ করিল। অভাগিনী তখনও ঘুমায় নাই; আপনার অবস্থা ভাবিয়া অশ্রুরাশিতে সিক্ত হইতেছিল। হঠাৎ নীরদা ও অমূল্য-কুমারকে আসিতে দেখিয়া উঠিয়া বসিল; বসিয়া মুখে অবগুণ্ঠন টানিয়া দিল।

তখন নীরদা লীলাকে ধরিয়া টানিয়া লইয়া, যেখানে উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে চন্দ্রালোক প্রবেশ করিয়া খেলা করিতেছিল, সেইখানে বসাইল। তার পর অবগুণ্ঠন টানিয়া ফেলিয়া দিয়া সোহাগে চিবুক ধরিয়া তুলিয়া অমূল্যকুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখুন দেখি, এ মুখে অবিশ্বাসের ছায়া পান কিনা? দেখুন দেখি, পৃথিবীর অবিশ্বাস এ মুখ স্পর্শ করিতে পারে কিনা?"

নীরদার অনেক দিনের আশা পুরিল।

তখন সেই শুভ্ররশ্মি-পরিমণ্ডিত অশ্রুসিক্ত শিশির-নিষিক্ত ফুল্লকমলবৎ গৌরবময় মুখে অমূল্যকুমার অবিশ্বাসের ছায়া কিছুমাত্রও দেখিতে পাইলেন না, তাঁহার মন আবার পূর্ব্বের মত রূপসাগরে ডুবিল। অমূল্যকুমার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া লীলার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, বলি-লেন, "লীলা! আমি অপরাধী; বুঝিতে পারি নাই, না বুঝিয়া তোমাকে অবিশ্বাস করিয়াছি।"

লীলার মুখে কথা ফুটিল না, ঘুরিয়া সেই অভিমানপ্রদীপ্ত অননুমেয় সৌন্দর্য্যময় মুখ অমূল্যকুমারের পায়ে পড়িল। সেখানে লুকাইয়া অশ্রুরাশি বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনারায়ণচন্দ্র সেন।

ধর্ম্মের প্রমাণ।

যুক্তিবাদ এখন জগতের সার। আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিরূপ যুক্তি দিয়া গিয়াছেন, এ সময়ে তাহার আলোচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। আমি সেই প্রয়োজন-সাধনে প্রবৃত্ত হইলাম। মনোযোগ করিয়া সুধীর-ভাবে যিনি পাঠ করিতে সমর্থ, এই প্রবন্ধ পাঠের জন্য তাঁহাকে আমি সাদরে আহ্বান করিতেছি।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—

"বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।"

"সমগ্র বেদই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মূল (অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের স্বরূপ ও ইতিকর্ত্তব্যতা সকলই বেদ হইতে জ্ঞাত হইয়া থাকে) এবং বেদজ্ঞ মহর্ষিগণ-প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র ও তাঁহাদের পরম্পর-প্রাপ্ত অনুষ্ঠানও ধর্ম্মের প্রমাণ।"

এই মনু-বাক্যটী ও অন্যান্য সকল ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা মহর্ষিগণেরও বাক্য হইতে আমরা এইটী বুঝিতে পারিতেছি যে, এই হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম জানিতে হইলে, বেদই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। আরও সহজ ভাবে বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে,—হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় প্রামাণিক পদার্থটী জানিতে হইবে—বেদরূপ প্রমাণ দ্বারা। এক্ষণে দেখিতে হইবে, যদি বেদ বাস্তবিক প্রমাণ হয়, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মও সম্পূর্ণ

প্রামাণিক বস্তু বটে। সুতরাং যতক্ষণ না বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইবে, ততক্ষণ হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণিকতা সিদ্ধ হওয়া কোনপ্রকারে সম্ভবপর নহে। সুতরাং এই স্থানে সকলেরই মনে জিজ্ঞাসা হইতে পারে,—কতকগুলি বর্ণসমষ্টিরূপ বেদের একটা প্রামাণ্য কিপ্রকার? এই প্রশ্নের উত্তরটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বোধে আমরা প্রথমতই এই বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

কোন বস্তুর প্রামাণ্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমেই সামান্যতঃ 'প্রমাণ' শব্দে কি বুঝায়, দার্শনিকগণ কোন্ বিষয়টী বুঝাইবার জন্য এই 'প্রমাণ' শব্দটীর ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাই বুঝা আবশ্যক। জগতে অদ্যাবধি যত দার্শনিক নিজ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল মত লইয়া পর্য্যালোচনা করিলে ও নিজের তত্ত্বানুসন্ধায়িনী বুদ্ধি বৃত্তির উপর নির্ভর করিলে, সকলেই এই প্রকার একটী সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকেন যে, জগতে যাহা কিছু বস্তু আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, সেই সকল বস্তুই নিজ নিজ সত্তা স্থাপন করিতে জ্ঞানের সাহায্যকে অবলম্বন করিয়া থাকে। যেমন গভীর অন্ধকারে অনন্ত প্রকারের দ্রব্যনিচয় পড়িয়া থাকিলেও যতক্ষণ একটী আলোক সেখানে প্রকাশ না পাইবে, ততক্ষণ সেই সকল নানাবিধ বস্তু আছে কি না, তাহা স্থির করা অসম্ভব, সেই প্রকার এই অজ্ঞানাচ্ছন্ন জড়-জগতে যতক্ষণ না বিষয়নিচয়, জ্ঞানের সম্বন্ধকে প্রাপ্ত হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহার সত্তা স্থাপন করিবার সামর্থ্য কাহারও হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জ্ঞানসম্বন্ধ ব্যতিরেকে সকল পদার্থই অকিঞ্চিৎকর ও নিজ সত্তা স্থাপনে একান্ত অসমর্থ। ইহা দ্বারা ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, বিষয় প্রকাশ করাই জ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। দার্শনিক জগতে সামান্যতঃ এই জ্ঞান তিন প্রকার বলিয়া কীর্ত্তিত, যথা;—যথার্থ, অযথার্থ ও সংশয়। এই যথার্থ জ্ঞানের আর একটী নামও আমাদের প্রাচ্য দার্শনিকগণের পুস্তকে দেখা যায়; যথা,—প্রমা। এক্ষণে দেখা যাউক যথার্থ জ্ঞান ও প্রমা শব্দে কি বুঝায়।

ন্যায়দর্শনে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"তদ্বতি তৎপ্রকারকং জ্ঞানং প্রমা"

অর্থাৎ যে পদার্থটী যেখানে আছে, সেই খানে সেই পদার্থটী যদি জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞানই প্রমা বলিয়া অভিহিত হইবে। যেমন ভূতলে একটী ঘট বিদ্যমান আছে, সেই সময় তথায় চক্ষুঃ-সংযোগ হওয়ার পর দ্রষ্টার একটী জ্ঞান উৎপন্ন হইল যে, এই স্থানটী ঘট-বিশিষ্ট। এই স্থলে বলিতে হইবে যে, দ্রষ্টার এই জ্ঞানটী 'প্রমা' পদের বাচ্য।

এই প্রকার ভ্রমের লক্ষণও দর্শনশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যথা;—

"তদভাববতি তৎপ্রকারকং জ্ঞানং ভ্রমঃ।"

অর্থাৎ যে পদার্থটী যেখানে নাই, সেই পদার্থটী সেই খানে আছে বলিয়া যে জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাকেই ভ্রম কহা যায়। যেমন বাহিরে প্রচণ্ড সূর্য্য-কিরণে তাপিত-চক্ষুঃ কোন পুরুষ, সহসা গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একটী শুভ্রবর্ণ শঙ্খ দেখিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার জ্ঞান হইল যে, এখানে একটী পীতবর্ণ শঙ্খ রহিয়াছে। এই স্থানে বলিতে হইবে যে, এই পুরুষের জ্ঞানটী ভ্রমপদ-বাচ্য। কারণ, এস্থলে যে শঙ্খটী আছে, তাহা বস্তুতঃ পীতবর্ণ নহে, তাহা শ্বেতবর্ণ; সুতরাং পীতত্ব যে শঙ্খে নাই, সেই শঙ্খেই পীতত্বপদার্থ এই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়াছে।

সংশয়ের লক্ষণও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা,—

"একধর্ম্মিণি বিরুদ্ধকোটিদ্বয়প্রকারকং
জ্ঞানং সংশয়ঃ।"

অর্থাৎ একটী আধারে পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের সম্বন্ধ যে জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাকে সংশয় কহে। যেমন কোন ব্যক্তি অগ্নি-আনয়নে প্রবৃত্ত হইয়া, কোন স্থানে গমন করিতেছে, এমন সময় দূর হইতে ধূমরাশি বিলোকন করিয়া তাহার জ্ঞান হইল,—এখানে বহ্নি আছে কিনা? এই স্থলে সেই পুরুষের এতাদৃশ জ্ঞানকে সংশয় বলিতে পারা যায়। কারণ, কোন একটী স্থানবিশেষে অগ্নি ও তাহার অভাবের সম্বন্ধ তাহার সেই জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে। এই 'প্রমা'ভ্রম ও সংশয়ের দার্শনিক-গণ-সম্মত পরিষ্কৃত লক্ষণ ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইলে, বিশেষ প্রবন্ধ বাড়িয়া যায় এবং তাহা ততটা প্রকৃতের উপযোগী নহে; এইজন্য তাহা এস্থলে পরিত্যক্ত হইল। এক্ষণে প্রকৃত অনুসরণ করা যাক।

জগতে বাহিরের বস্তুর প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, অসাধারণ কারণ বলিয়া যাহাকে উল্লেখ করা যায়, তাহার নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়। এই জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী; যথা,—চক্ষু, কর্ণ, নাসা, রসনা ও ত্বক্। এই পাঁচটী ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকে কোন বাহ্য বস্তুরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। তন্মধ্যে এই পাঁচটীও প্রত্যেকে সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষে কারণ হইতে পারে না। নয়ন রূপই গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু শব্দ গ্রহণ করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। কর্ণ শব্দ-প্রত্যক্ষেরই হেতু হইতে পারে, রূপাদি-প্রত্যক্ষে তাহার ক্ষমতা নাই। এই কয়টী ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকে আর একটী অন্তরিন্দ্রিয় স্বীকার না করিলে বিষয়-প্রত্যক্ষের পরিদৃশ্যমান সুশৃঙ্খলা হইয়া উঠে না। সেই অন্তরিন্দ্রিয়ের নাম—মন। দার্শনিক-গণ মনের সাধন বিষয়ে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাহা দেখান যাইতেছে। তাঁহারা বলেন,—চক্ষুঃ কর্ণ প্রভৃতির স্বীয় বিষয়—রূপ ও শব্দাদি-প্রত্যক্ষে সম্পূর্ণরূপ ক্ষমতা স্বীকার করিলে একটী দুরপনেয় আপত্তিক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হয়। আপত্তিটী এই প্রকার যে, প্রায়ই এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়;—কোন ব্যক্তির সন্নিকটে ভাল ভাল দেখিবার বস্তু আছে, উৎকৃষ্ট বাদ্য ধ্বনিত হইতেছে, প্রস্ফুটিত গোলাপপ্রভৃতি পুষ্পনিচয় স্তূপাকারে সজ্জিত রহিয়াছে, সুন্দর সুকোমল শয্যার উপর তাহার শরীর সন্নিবেশিত রহিয়াছে,—এরূপ অবস্থায় কিন্তু যখন সে ভাল বাদ্য বা গীত শুনিতেছে, সে সময় তাহার চক্ষু সন্নিকৃষ্ট সুন্দর বস্তুতে সন্নিবিষ্ট থাকিলেও সে বস্তুর সৌন্দর্য্য তাহার অনুভবপথে আরূঢ় হইতেছে না; হয় ত যে সময় সেই সুন্দর বস্তুটীর সৌন্দর্য্য তাহার অনুভবপথে আরূঢ়, সেই সময় সুন্দর গীতধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেও অনুভবপথের পথিক হইতেছে না। ইহার কারণ কি? চক্ষু সুন্দর দ্রব্যে সংযুক্ত রহিয়াছে; কর্ণবিবরে কেহই অঙ্গুলি প্রদান করে নাই; নাসাবিবর বদ্ধ হইয়া যায় নাই;—তথাপি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় কেন এক সময়ে নিজ কার্য্য করিতে পারিতেছে না? ইহার উত্তর ইহাই দিতে হইবে যে, রূপাদি-জ্ঞানে চক্ষুঃপ্রভৃতি অসাধারণ কারণ হইলেও তাহারা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন নহে, নিজের কার্য্য করিতে হইলে তাহারা আর একটী বস্তুর সাহায্য গ্রহণ করে; তাহার সাহায্য না পাইলে ঐ সকল ইন্দ্রিয় কোন কার্য্যই করিতে পারে না। দর্শন-শাস্ত্রবেত্তাগণ সেই ইন্দ্রিয়সমষ্টির স্ব স্ব কার্য্যে প্রেরক বস্তুটীর নাম রাখিয়াছেন—মন। পূর্ব্বোক্ত স্থলে মন যখন যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য করিতেছে, সেই ইন্দ্রিয়ই তখন নিজ কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেছে; যাহার প্রতি মন প্রেরণা না করিতেছে, সে নিজ নিয়ত বিষয়ে সন্নিকৃষ্ট হইয়াও কোন কার্য্য করিতে পারিতেছে না। এই কথাই দৃষ্টান্তস্থলে উক্ত হইয়াছে,—

"যথানুমীয়তে চিত্তমুভয়ৈরিন্দ্রিয়েহিতৈঃ।"

শ্রীমদ্ভাগবত, চতুর্থস্কন্ধ, ২৯ অঃ ৬৩ শ্লোক।

অর্থ—যেমন দুই প্রকার ইন্দ্রিয়চেষ্টা দ্বারা চিত্তের অনুমান হইয়া থাকে।

সুতরাং প্রত্যক্ষবাদিগণের ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, বিষয়-জ্ঞানের প্রতি এই পাঁচটী ইন্দ্রিয় ও মন সর্ব্বপ্রকারে কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে। পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত এই প্রত্যক্ষ-কারণ-নির্ব্বাচনে নামগত ও বিভাগগত তারতম্য পরিলক্ষিত হইলেও বস্তুগত কোন পার্থক্যই ইহাতে পরিলক্ষিত হইবে না, ইহা স্থির-সিদ্ধান্ত।

এই সময় একবার দেখিতে হইবে যে, মন নামে একটী অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিচালিত এই ইন্দ্রিয় কয়টী কতদূর সামর্থ্য লইয়া মনুষ্য-জগতে জ্ঞানের রাজ্য বিস্তার করিতেছে। অনেক প্রত্যক্ষ-প্রমাণের গোঁড়া-উপাসকগণ একটু অবজ্ঞার হাসি অধরপ্রান্তে বিকসিত করিয়া আমাদের উপর কটাক্ষ পরিচালন করিতে পারেন এবং বলিতেও পারেন যে, "প্রত্যক্ষের সামর্থ্য নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা মনুষ্যের এখনও হয় নাই; যেদিন প্রত্যক্ষ-প্রমাণের বিষয়-প্রকাশ-শক্তির ইয়ত্তা নির্দ্ধারিত হইবে, সেদিন বিজ্ঞানের উন্নতির পথে একটী সুদৃঢ় ও অপরিসীম প্রাচীরও পরিলক্ষিত হইবে।' কিন্তু এখনও বিজ্ঞানের এই শৈশব কাল মাত্র। এই বিজ্ঞান, যে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ কয়টীর উপর স্বকীয় অটল-সিংহাসন স্থাপন করিয়া অদ্য প্রাণিজগতে পরম উপকার সাধন করিতেছে, সেই প্রত্যক্ষ-প্রমাণ কয়টীর শক্তি অপরিসীম এবং সেই শক্তিসমষ্টির অপরিসীমতাই বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সর্ব্বাতিশায়ী প্রভুতাস্থাপনে একমাত্র দ্বারস্বরূপ; সুতরাং প্রত্যক্ষ-প্রমাণের অপরিসীম শক্তির ইয়ত্তা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা ও জগতের পরমাণু-সমষ্টির সংখ্যা প্রদর্শনে উদ্যোগ এক প্রকারই হইয়া উঠিতেছে।"

বর্ত্তমান বিজ্ঞানের উপাসক-সম্প্রদায়গণের একথাটী শুনিতে এক প্রকার হইলেও ইহার ভিতর বড় একটা সার পাওয়া যাইতেছে না। তাহার কারণ দেখিলেই লোকে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। প্রথমে দেখিতে হইবে যে, আমরা ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানজনন সামর্থ্যের ইয়ত্তা নির্দ্ধারণ করিতে অগ্রসর; ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানজনন-সামর্থ্য সকলেরই অনুভূত আছে; মন সহায়তা করিলে চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় জাগরণাবস্থায় একটা-না-একটা জ্ঞান উৎপাদন করিবেই করিবে;—এপ্রকার জ্ঞানজনন-সামর্থ্য কাহারও অবিদিত নহে এবং ইহার ইয়ত্তাও এক প্রকার নির্দ্ধারিত প্রায়ই রহিয়াছে; ইহা নিরূপণ করিতে চেষ্টা না হওয়াই উচিত।

তবে আমরা কোন সামর্থ্যটীর সীমা অনুসন্ধান করিতে যাইতেছি? না,—ইন্দ্রিয় কোন্ কোন্ বিষয়ের জ্ঞান আমাদের উৎপাদন করিয়া থাকে? অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞানে বিষয়ভাবে কোন্ জাতীয় পদার্থগুলি লব্ধপ্রবেশ হইতে পারে? এই স্থানেই বর্ত্তমান বিজ্ঞানোপাসকগণ আমাদের বাক্যটীকে খণ্ডন করিতেছেন যে, ইন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞানের বিষয় কে হইতে পারে, কে না পারে, ইহা নির্দ্ধারণ হইতে পারে না। আমাদের দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন যে, মনুষ্যেরই এপ্রকার সামর্থ্য আছে, যাহা দ্বারা প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে বিষয়-ভাব-প্রাপ্ত বস্তুনিচয়ের সংখ্যা বা স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইতে পারে। বিষয়টী পরিষ্কার করিয়া বুঝাইলে তোমাদেরও এ ভ্রমটী ঘুচিয়া যাইবে।

ইন্দ্রিয়-জনিত জ্ঞানে বিষয়ভাব-প্রাপ্ত বস্তুর সীমা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, সর্ব্ব প্রথমে ইহাই দেখিতে হইবে যে, একটী ইন্দ্রিয় দ্বারা একটী জ্ঞান উৎপত্তি লাভ করিল; সেই উৎপদ্যমান

জ্ঞানে যে বিষয়টী ভাসিল, তাহার স্বরূপ কি এবং যে বিষয়টী ভাসিতেছে না, তাহারই বা স্বরূপ কি? যে পদার্থটী জ্ঞানে ভাসিয়াছে, তাহার সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ কি এবং যে বিষয়টী ভাসে নাই, তাহাতে এমন কি বৈলক্ষণ্য আছে, যাহার বলে ঐ বিষয়টী জ্ঞানে ভাসিতে পারিতেছে না? এই চারিটী বিষয় বুঝিতে পারিলেই লোকে একটা স্থির করিতে পারে যে, ইন্দ্রিয়-বিশেষ-জনিত জ্ঞান-বিশেষে অমুক অমুক বস্তু এক একটী-বিশেষ কারণ বশতঃ লব্ধ-প্রবেশ হইতেছে বা প্রবেশের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছে। যেমন মনে করিয়া লউন, চক্ষু দ্বারা আমাদের যে জ্ঞান হইতেছে, তাহাতে প্রতিবার একটী বস্তু নিয়মিত ভাবে বিষয়ভাব ধারণ করিতেছে, সে বস্তুটী কি?—রূপ। আবহমান কাল হইতে মানুষ চক্ষুর সাহায্যে এমন কোন জ্ঞান উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে, যাহাতে রূপ বিষয়ভাব লাভ করে নাই?—এইরূপ দেখিতে পাইতেছি, চক্ষুর সাহায্যে যে জ্ঞান আমাদের উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে রস নামক বস্তুটী কোন দিনই বিষয়ভাব প্রাপ্ত হয় নাই। কোন দিন চক্ষুতে দেখিয়া মানুষ কটু, অম্ল, তিক্ত প্রভৃতি রসের আস্বাদন করিতে পাইয়াছে—একথন বলা উন্মত্তপ্রলাপ তাহার সন্দেহ নাই। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, রূপ নামক একটী বস্তুর সহিত চক্ষুর একটী এমনি অলৌকিক সম্বন্ধ আছে, যে সম্বন্ধের প্রভাবে চক্ষু, যখনই জ্ঞান উৎপাদন করিবে, তখনই সেই জ্ঞানে রূপ-বস্তুটী বিষয়ভাব প্রাপ্ত হইবেই হইবে। আবার রূপ ভিন্ন রসাদির সহিত চক্ষুর এমনি একটী বিসদৃশ সম্বন্ধ আছে, যাহার বলে চক্ষু রসকে নিজ কার্য্যস্বরূপ জ্ঞানে কোনপ্রকারেই বিষয়ভাবে লওয়াইতে পারিতেছে না। সুতরাং এই স্থানেই চক্ষুর বিষয়-বিশেষ-প্রকাশ-শক্তি এক-প্রকার নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে। এই প্রকার অন্বয়-ব্যতিরেকে পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের বিষয়-বিশেষ-প্রকাশ-সামর্থ্য ও ইতর-প্রকাশে অপটুতা অল্প আয়াসেই নির্দ্ধারিত হইয়া আসিতেছে। তাহা হইলেই ইহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে —এই পাঁচটী ইন্দ্রিয় রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ প্রভৃতি কতিপয় গুণবিশিষ্ট দ্রব্যকে প্রকাশ করিতে পারে; ইহা ছাড়া অন্য কোন গুণবিশিষ্ট কোন বস্তু যদি জগতে থাকে, তবে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়নিচয় তাহার প্রকাশ করিতে সামর্থ্য-বিশিষ্ট নহে। জগতে এই প্রকার পদার্থ তোমার জ্ঞান-গোচর সহস্রবার হইয়াছে ও হইবে; কিন্তু সে বিষয়টী চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-নিচয় কর্তৃক কোন দিনই প্রকাশিত হইবার নহে।

সেই বস্তুটী কি? প্রথমতই দেখিতে হইবে,—জ্ঞান বলিয়া যে পদার্থটী সর্ব্ববাদীরই অবশ্য-স্বীকার্য্য, তাহাতে রূপ, রস, স্পর্শ, গন্ধ বা শব্দ এমন কোন গুণ নাই, যাহার সাহায্যে তাহা চক্ষুরাদির যোগ্য কোন দিনই হইতে পারে না, অথচ জগতে অদ্যাবধি এমন কোন তার্কিকই জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি এই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়নিচয়ের অগোচর এই জ্ঞান-পদার্থটীর অপলাপ করিতে সাহস পাইয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর একমাত্র নির্ভর করিলে সকলের স্বীকরণীয় বস্তুর সত্তা সাধিত হইয়া উঠিতেছে না। ইহা একপ্রকার সিদ্ধ হইয়া যাইতেছে। এই স্থলে অনেকে এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া থাকেন যে, যেমন সুখ দুঃখ প্রভৃতি আন্তরিক বস্তুনিচয় রূপাদি-গুণশূন্য হইলেও সুখ দুঃখ প্রভৃতির সর্ব্বানুভবসিদ্ধ অনুভবকে মানস-প্রত্যক্ষ শ্রেণীতে অন্তর্ভূত করা গিয়া থাকে, সেইপ্রকার সর্ব্বানুভবসিদ্ধ রূপাদি-গুণরহিত জ্ঞান নামক পদার্থটীকেও মানস-প্রত্যক্ষের বিষয়নিচয় মধ্যে আসন প্রদান

করিয়া প্রত্যক্ষের সর্ব্ববিষয়ানুভাবিনী শক্তির অক্ষুণ্ণতা অনায়াসেই রক্ষা করা যাইবে।

প্রতিবাদীর কথাটী নির্যুক্তিক না হইলেও অখণ্ডনীয় বলিবার কোন কারণ নাই। বরঞ্চ তাহার খণ্ডন হইতে পারে এমন উপায় বহুতর বিদ্যমান আছে। প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, কেবলমাত্র বহিরিন্দ্রিয়-নিচয় দ্বারা যাঁহারা সকল বিষয়ের সত্তা জ্ঞানগোচর করিতে চাহেন, তাঁহাদেরই মত খণ্ডন করিবার জন্য আমরা বহিরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের অবিষয় জ্ঞান-পদার্থটীর উল্লেখ করিয়া বহিরিন্দ্রিয় মাত্রেরই প্রামাণ্যবাদের অসর্ব্বতোমুখতা প্রতিপাদিত করিয়াছি। এস্থলে মানস প্রত্যক্ষ দ্বারা জ্ঞানের সত্তা সাধিত করিলেও বহিরিন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষের অসর্ব্বতোমুখতা কিছুতেই খণ্ডিত হইতেছে না; কারণ, মনকে বহিরিন্দ্রিয় বলা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ মানস-প্রত্যক্ষ ও বহিরিন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষের একান্ত অবিষয় এমন বহুতর বিষয় বিদ্যমান আছে, যাহা প্রত্যক্ষবাদী চার্ব্বাককেও সর্ব্বথা স্বীকার করিতে হইবে। বিবেচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতিভাত হইয়া থাকে যে, জ্ঞান যখন বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে, সে সময় বিষয়ের সহিত অবশ্য কোন না কোন একটী সম্বন্ধ নিশ্চয়ই ঘটিয়াছে। মনে করুন, আমার যখন রূপ-জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, সে সময় রূপই আমার নিকট প্রকাশ পাইতেছে; রস বা গন্ধ প্রকাশ পাইতেছে না। এক্ষণে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, জ্ঞানে রূপই প্রকাশ পাইল; রস ও গন্ধ প্রকাশ পাইল না কেন? ইহার উত্তর তোমাকে ইহাই প্রদান করিতে হইবে,—রূপেরই সহিত জ্ঞানের কোন একটী এমন সম্বন্ধ উৎপন্ন হইয়াছে, যাহার বলেই রূপ প্রকাশ পাইতেছে; রস বা গন্ধের সহিত তাদৃশ সম্বন্ধ ঘটে নাই। যদি ঘটিত, তবে নিশ্চয়ই রস ও গন্ধ প্রকাশ পাইত। তবেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে,—সকল দার্শনিকেরই জ্ঞানের সহিত বিষয়-বস্তুর একটী সম্বন্ধবিশেষ অবশ্যই স্বীকরণীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। এক্ষণে বলিতে পার—সেই সম্বন্ধটী তোমার কোন্ ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে বিষয় হইতেছে? কোন্ সর্ব্ববাদি-সম্মত প্রত্যক্ষ তোমার সেই সম্বন্ধটীকে প্রকাশ করিয়া দিতেছে? কেহই বলিতে পারেন না—যেমন রূপ-বস্তুটী সর্ব্ববাদি-সম্মত চক্ষুরিন্দ্রিয় জন্য জ্ঞানের বিষয়, যেমন সুখ-দুঃখজ্ঞান প্রভৃতি আন্তর-ধর্ম্ম কয়টী সর্ব্ববাদি-সম্মত মানস প্রত্যক্ষের বিষয়, সেই প্রকার বাহ্য-বস্তুর সহিত আন্তর-বস্তু-জ্ঞানের বিশেষ-সম্বন্ধটী কোন্ সর্ব্ববাদি-সম্মত প্রত্যক্ষের বিষয়ভাব ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে বা হইতেছে কিংবা হইবে। তবেই দেখিতে পাওয়া গেল, আমাদের প্রাচ্য দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বিষয়প্রকাশ-সম্বন্ধে যে সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত নহে, অথবা দার্শনিক-জগতে যথেচ্ছাচারও নহে।

এই ত দেখা গেল, প্রত্যক্ষের সকল স্বীকরণীয় বিষয় প্রকাশ করিবার সামর্থ্য আছে,—একথা স্বীকার করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। সুতরাং প্রত্যক্ষের অবিষয় পদার্থগুলি যে জ্ঞানের সাহায্যে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তাহা প্রত্যক্ষ হইতে সম্পূর্ণ প্রকারে বিলক্ষণ-স্বভাবাক্রান্ত, ইহা অবশ্য স্বীকরণীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে।

এক্ষণে আমাদিগকে দেখিতে হইবে, যেমন প্রত্যক্ষ সকল বিষয় প্রকাশ করিতে পারে না বলিয়া প্রত্যক্ষ ভিন্ন জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইতেছে, সেইরূপ যে সকল বস্তু প্রকাশ করিতে প্রত্যক্ষ পূর্ণ-সামর্থ্য-বিশিষ্ট বলিয়া অঙ্গীকৃত, সেই বিষয় সকল প্রকাশ করিতে প্রত্যক্ষ অন্য কোন জ্ঞানের অপেক্ষা

করে কিনা অর্থাৎ অপর কোন জ্ঞানের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য সিদ্ধ কিনা? যদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান, নিজের প্রামাণ্য সিদ্ধ করিতে অন্য কোন জ্ঞানেরও অপেক্ষা করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে যে, প্রত্যক্ষ-বাদিগণ যে প্রত্যক্ষকে প্রমাণ-জগতের উচ্চতম আসনে বসাইয়া এত স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই স্পর্দ্ধাটী তাঁহাদের নিতান্ত অজ্ঞানের পরিণাম, সুতরাং অকাতরে দার্শনিকের নিতান্ত অবজ্ঞার বিষয় তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা, প্রত্যক্ষ-প্রমাণের নিজ প্রামাণ্য-সিদ্ধি বিষয়ে অন্য কোনও জ্ঞানের অপেক্ষা বিশেষরূপে করিতে হইতেছে, ইহা সিদ্ধ করিয়া, প্রত্যক্ষ-প্রমাণের পূর্ণ দৌর্ব্বল্য প্রতিপাদন করিতে অগ্রসর হইতেছি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জ্ঞানের সম্বন্ধ-প্রযুক্ত জড়ের অস্তিত্ব, প্রাণি-জগতে নির্ণীত হইয়া থাকে; এক্ষণে দেখিতে হইবে,—সকল জ্ঞানেই বস্তুর স্বরূপ যথাতথরূপে ভাসিতে পারে না। যে জ্ঞান ভ্রমস্বরূপ নহে, যাহাতে সংশয়াকারতা নাই, সেই জ্ঞানই প্রমাণ এবং প্রমাণ-জ্ঞান ব্যতিরেকে লোকের যথাযথরূপে পদার্থের অস্তিত্ব পূর্ণরূপে নির্ণীত হইতে পারে না। অথচ যতক্ষণ যথাযথরূপে বস্তুর স্বরূপ প্রতিভাসিত না হইবে, ততক্ষণ প্রামাণিক পুরুষের কোন বিষয়েই প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। এই কারণে যে কোন জ্ঞানই হউক না কেন, বিবেচকগণ সর্ব্বপ্রথমেই তাহার প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতে উদ্যত হইয়া থাকেন।

এক্ষণে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানেরও প্রামাণ্য আমাদের একবার পরীক্ষা করিতে হইবে। যদি বুঝিতাম, প্রত্যক্ষ কখনও ভ্রমরূপ হয় না, তাহাতে কোনদিনও সংশয়াকারতা প্রতিভাত হয় নাই, তাহা হইলে প্রত্যক্ষের প্রামাণ্য পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হওয়া একান্ত অনুচিত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত বটে; কিন্তু সে প্রকার ত দেখিতে পাইতেছি না। এই অসীম সামর্থ্যশালী ইন্দ্রিয়নিচয় কতবার এমন জ্ঞান উৎপাদন করিয়াছে, যাহাতে সত্যবস্তু মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে;—শ্বেত কৃষ্ণরূপে উপলব্ধ হইয়াছে, প্রতিনিয়ত অবধারিত বস্তুও সংশয়িত বলিয়া হৃদয়পটে আরূঢ় হইয়াছে। কে বলিবে বল, যে, এহেন প্রত্যক্ষ ও স্বতঃ-প্রমাণ ইহার প্রামাণ্য অপরীক্ষণীয়? এই দেখ না কেন, যে শঙ্খ শ্বেতবর্ণ বলিয়া শতবার অনুভব করিয়াছি, হঠাৎ একদিন, না জানি কোন কারণে, চিরদিনের সেই শ্বেতশঙ্খ কেন পীতবর্ণে আমার নয়নে প্রতিভাত হইল! পূর্ব্বের কৃত প্রত্যক্ষ-জ্ঞান-সমষ্টি আমাকে বলিয়া দিতেছে, শঙ্খ নিশ্চয় শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে; কিন্তু বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ-জ্ঞান আমাকে বুঝাইল যে, শঙ্খ পীতবর্ণ। পূর্ব্বের জ্ঞানও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, বর্ত্তমান জ্ঞানও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ; এই সমশক্তিশালি-জ্ঞান দ্বয়ে যখন বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, সেই সময় উভয়ের প্রামাণ্যই পরীক্ষণীয়। এক্ষণে বল দেখি, এই উভয় জ্ঞানের প্রামাণ্য-পরীক্ষা যে জ্ঞানের সাহায্যে করিতে হইবে, তাহা কি প্রত্যক্ষশ্রেণীতে পরিগণিত হইবে?—নাসিকা, কর্ণ, শ্রোত্র বা ত্বক্‌, তোমার এই জ্ঞানদ্বয়ের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া শঙ্খের শ্বেতত্ব বা পীতত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে পারিবে? কখনই পারিবে না। বিবাদ হইয়াছে শঙ্খের শ্বেতবর্ণ ও পীতবর্ণ লইয়া। নাসা, কর্ণ, শ্রোত্র বা ত্বকের যখন কোনদিনও কোন প্রকার রূপ প্রকাশ করিবার সামর্থ্য এ জগতে উপলব্ধ নহে, তখন কি করিয়া বলিব যে, চক্ষু ছাড়া আর কোন ইন্দ্রিয় রূপবিষয়ে বিরোধ ভঞ্জন করিয়া প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের প্রামাণ্য নির্দ্ধারণ করিয়া

দিবে? সুতরাং এই জাতীয় প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সংশয়িত প্রামাণ্য নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, আমাদের আর এক জাতীয় জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। এই জাতীয় জ্ঞানকে আমাদের প্রাচ্য দার্শনিকগণ অনুমান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এরূপ প্রত্যক্ষ-বিরোধ-স্থলে অনুমান-জ্ঞানের সাহায্যে আমরা 'শঙ্খ পীত' এই প্রকার জ্ঞানের দোষবিশেষ-জন্যত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া, প্রামাণ্য-বিরোধ এবং 'শঙ্খ শ্বেত' এই জাতীয় প্রত্যক্ষের বিজয় উদ্ঘোষণা করিয়া থাকি।

এইবার প্রত্যক্ষবাদিগণের অবশ্যই ইহা স্বীকার করিতে হইবে;—প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে, দার্শনিকের বিশ্বরাজ্যের তত্ত্বোদ্ভেদ করিবার পথে একপদও অগ্রসর হইবার সামর্থ্য নাই; প্রত্যেক প্রত্যক্ষেরই প্রামাণ্য-পরীক্ষার নিমিত্ত সর্ব্ব প্রকারে সকল ব্যক্তিকেই অনুমান-জ্ঞানের সাহায্য অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। তবেই বুঝা গেল, চার্ব্বাকগণ 'প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষ' বলিয়া যে বিষম স্পর্দ্ধার সহিত চীৎকার করিয়া থাকেন, তাহা নিঃসার ও যুক্তিরাজ্যে নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়।

অনেক পাঠক হয় ত আমার উপর একটু বিরক্ত হইয়াছেন, কেহ কেহ বা বিরক্তিসূচক কটাক্ষে জন্মভূমির কোন সমীপবর্ত্তী পাঠককে এ প্রকার বুঝাইতেও প্রবৃত্ত হইয়া থাকিবেন যে, "এ প্রবন্ধটী এক কিম্ভূত-কিমাকার হইয়া উঠিল। উপরে হেডিং দেখিলাম, "ধর্ম্মের প্রমাণ"; আগ্রহে পড়িতে বসিলাম। ভাবিলাম, ইহাতে না জানি বেদের কত রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে;—বেদস্বরূপ ব্রাহ্মণভাগ, মন্ত্রভাগ, ঋষি, ছন্দঃ, অগ্নিষ্টোম, জ্যোতিষ্টোম, বাজপেয় প্রভৃতি দুরূহ বিষয়ের সুলভ তাৎপর্য্য না জানি ইহাতে কতই আছে। ও হরি! ইহা দেখি তাহার কোন কিছু দিয়াই যায় না। কাহাকে বলি—প্রত্যক্ষ, কাহার নাম—অনুমান, প্রত্যক্ষেরই বা কত শক্তি, এই সকল বিষয়েই এ প্রবন্ধ পূর্ণ হইতে চলিল। পড়িলে বোধ হয়, ঠিক যেন ন্যায়ের বিচার করিতে আরম্ভ করা হইয়াছে। ছিঃ! এমন প্রবন্ধও জন্মভূমিতে ছাপা হয়!" ইত্যাদি ইত্যাদি।

পাঠকগণ! স্থির হউন, অত চটিবেন না। যাহা জানিতে চাহেন, তাহা সকলই পাবেন্; কিন্তু একটু বিলম্বে। বেদের মন্ত্রভাগ কাহাকে বলে, ব্রাহ্মণ কাহার নাম, বিধি কয় প্রকার, অর্থবাদ কি, অগ্নিষ্টোমাদিরই বা স্বরূপ কি,—এ সকল বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইবে না। কিন্তু ঐ যে পাশ্চাত্য-সভ্যতা, প্রত্যক্ষ নামক একটী ভীষণ অগ্ন্যুৎপাদক যন্ত্র লইয়া, বেদরূপ সুমহান্ বৃক্ষের শান্তিময় সুশীতল ছায়ায় যুগ-যুগান্তর হইতে আশ্রিত চিরশান্ত ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু-সমাজকে চিরদিনের জন্য ব্যতিব্যস্ত করিবার জন্য সংশয় নামক যে ভীম-অগ্নি প্রজ্বলিত করিতেছে, যাহার প্রভাবে হিন্দুর সন্তান আজ বেদের শান্তিময়ী ছায়াকে বিষ-জ্বালার কারণ বিবেচনা করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রষ্ট হইয়া চারিদিকে অশান্তির ভীম কোলাহলে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতেছে; সেই সংশয়াগ্নিকে অগ্রে প্রমাণ-জলে নির্ব্বাণ করিতে দেও। আস্তিকতার চির-বিদ্বেষী, পারলৌকিক বিশ্বাস-নিচয়ের দারুণ-বৈরী পাপের সহচর, বিষয়হর, অভিন্নহৃদয়, চিরন্তন-মিত্র ঐ প্রত্যক্ষ যন্ত্রটীকে ভাল করিয়া বুঝিয়া না লইলে উহার বেগ সামলাইতে পারিবে কেন? এইজন্যই আমি এতক্ষণ প্রত্যক্ষের স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, এক্ষণে প্রকৃতপথে অগ্রসর হইব। শব্দ-প্রামাণ্যের কথা আজ তুলিব না, পরে কহিব। একমাত্র অনুমান-জ্ঞানের সাহায্যে অদ্য বুঝাইতে চেষ্টা করিব যে, হিন্দু-সমাজের বেদ ছাড়া অন্ত

কোন গতি নাই। নাস্তিকগণ, বেদের প্রামাণ্য খণ্ডন করিবার জন্য বেদের উপর যে অজস্র দোষারোপ করিয়া থাকেন, আস্তিক হিন্দু-দার্শনিকগণ কোন্ কোন্ প্রবল যুক্তি দ্বারা সেই সকল দোষ কি প্রকারে খণ্ডন করিয়া থাকেন, এই সকল বিষয় একটী একটী করিয়া অতি উজ্জ্বল ভাবে পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম করাইতে বিহিত উপায় অবলম্বন করা যাইবে সেইজন্য বলি, পাঠক! ব্যস্ত হইবেন না বিষয়টী অতি মহান্, বিশেষ ধৈর্য্য-সহকারে অপেক্ষা করিতে হইবে।

এক্ষণে অনুমানের স্বরূপ কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক। যদ্যপি আমাদের দর্শনশাস্ত্রে এই অনুমানপ্রকরণ অতি মহৎ, তাহার সম্পূর্ণরূপ পরিচয় দিতে গেলে অনন্ত প্রবন্ধেও কথা শেষ হয় না, তথাপি এখানে সেই সকল বিষয়ের কিছু উল্লেখ করিয়া সামান্যরূপে সাধারণ বোধোপযোগী অনুমানস্বরূপ একটু নির্দ্দেশ করিয়া লইব।

ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, একটী বস্তুকে দেখিয়া সময়ে সময়ে অন্য একটী বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে। ইহার প্রতি কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে; যে বস্তুটী দেখা গিয়াছে, সেই বস্তুটীর অনন্তর-জ্ঞাত বস্তুটীর কোন একটী বিশেষ-সম্বন্ধ অনুভবের পথে আরূঢ় হইয়া, অদৃষ্ট বস্তুটীকেও আমাদের জ্ঞানপথের পথিক করিয়া দেয়। এই প্রকার সম্বন্ধ জগতে অসংখ্য-প্রকার হইলেও কতকগুলি বস্তুর সহিত কতকগুলি বস্তুর একটী নিয়ত সম্বন্ধ আছে,—যেমন ধূমের সহিত বহ্নির। এ নিয়ত সম্বন্ধটীর আকার এই প্রকার যে, বহ্নি না থাকিলে ধূম কখনই থাকিতে পারে না অর্থাৎ ধূম যেখানে আছে, বহ্নি সেখানে অবশ্যই আছে; সুতরাং এইখানে বলা যাইতে পারে, ধূমের সহিত বহ্নির কোন একটী নিয়ত সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে। এই প্রকার নিয়ত-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ধূমকে কোন স্থানে দেখিলে লোকের মনে পরক্ষণেই এমন একটী জ্ঞান হয় যে, ধূম ত বহ্নি না থাকিলে, থাকিতে পারে না। এই প্রকার জ্ঞানের পর লোকের যে বহ্নিমত্তা-জ্ঞান অর্থাৎ 'এখানে বহ্নি আছে' এই জ্ঞান হয়, তাহাকে আমাদের প্রাচ্য দার্শনিকগণ অনুমান বা অনুমিতি কহিয়া থাকেন। তাহা হইলে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, একটী নিয়ত-সম্বন্ধযুক্ত বস্তু দেখিয়া সেই-স্থানে অন্য একটী তাদৃশ-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বস্তুর জ্ঞানকে অনুমান শব্দের দ্বারা বুঝান গিয়া থাকে। এই প্রকার বেদের প্রামাণ্য অনুমান করিতে গেলে বেদের উপর এমন ধর্ম্ম সকল দেখাইতে হইবে যে, বেদের প্রামাণ্য না থাকিলে, সেই সকল ধর্ম্মের স্থিতি ও বেদের উপর নিতান্ত অসম্ভব হইয়া উঠে।

বারান্তরে সেই সব ধর্ম্ম দেখাইয়া দিব।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

সন্ধ্যা।

(বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ)

(১)

অরুণিমা পশ্চিম গগনে!
আঁধার আকাশময়,
দিগন্ত ছাইয়া রয়
তিমির বসনে।
দিগন্ত বিসারী-নীল নীরদের ঘটা,
নিবিড় নিথর; নাহি বিজলির ছটা।

(২)

অরুণিমা অতুল গগনে!
সুস্থির, কোমল, ক্ষীণ,
রাঙা আভা আলোহীন,
তিমির গহনে।

নিরাশায় আশালোক, নিদাঘ-জ্বালায়
শীতছায়া, সুধারাশি মৃগতৃষ্ণিকায়।

(৩)

মোহকর মধুর মিলনে
আলোক আঁধারে মিশে,
অরুণ তামসী মিশে,
জীবন মরণে।
সাগরের নীলনীরে মিশে সুধাকর,
শ্যাম ধরণীর সনে উজ্জ্বল অম্বর।

(৪)

নিভিয়া জ্বলিছে অরুণিমা।
অজানা সুদূর দেশে
নীরবে চলিছে ভেসে
আলোক-প্রতিমা।
যেন ত্রিদিবের ছায়া, মায়ার ছলনা
প্রণয়ের ঊষা যেন সুকবি-কল্পনা।

(৫)

আজি এই সাঁজের গগনে
আলোক-আঁধার-ময়;
একে একে উথলয়
কত ভাব মনে।
আপনা হারায়ে হই চিন্তা-নিগমন,
অরুণিমা ভবিষ্যৎ মানবজীবন!

(৬)

ঘন ঘোর নিবিড় আঁধার,
থরে থরে অগণন
কুটিল করাল ঘন
দিগন্ত-বিসার।
বিদ্যুৎ উন্মেষহীন তমিস্র বিমান,
তমোময় মানবের যুগ বর্ত্তমান!

(৭)

অহো কিবা চিত্র সুভীষণ!
শুধু হেথা অন্ধকার
শুধু হেথা হাহাকার
সজল-নয়ন।
পাপতাপ অভিশাপ বিফল বাসনা
শুধু হেথা জীবনের তীব্র বিড়ম্বনা!

(৮)

হেথা গুণে কে করে যতন!
অনাদর অন্ধকারে
বিস্মৃতির পারাবারে
চির-নিমগন।
প্রতিভা ধূলায় পড়ি আকুল লুটায়,
নির্য্যাতন, নিপীড়ন, দুর্ভিক্ষের দায়!

(৯)

হেথা ধর্ম্মে শুধু প্রতারণা
অরুণ-আভার হাসে
মেঘ-মন্দ্রে কাঁপে ত্রাসে
মানব-কল্পনা।
ভয়, ভক্তি, বিস্ময়ের নিগড়ে বাঁধিয়া,
রাখে তারে উপন্যাস যাজক রচিয়া।

(১০)

হেথা প্রেম অলীক স্বপন।
জীবনের পরিণয়
হৃদয়ের বিনিময়
প্রাণের মিলন।
সাগরে নদীর মত আপনা ভুলিয়া
হেথায় কে মিশে পরে প্রেমে মূরছিয়া!

(১১)

হেথা জ্ঞানে সুধু বিড়ম্বন।
সৈকতের বালুকণা
প্রকৃতির নীতি গণা
অসাধ্য-সাধন!
অজ্ঞেয় সৃষ্টির তত্ত্ব, স্থিতি ও বিরাম
জ্ঞানের এ শোচনীয় শেষ পরিণাম।

(১২)

হেথা লোক স্বার্থপরায়ণ——
অকরুণ পদতলে
প্রবল দলিছে বলে
দীন অভাজন।
দয়া, ধর্ম্ম, স্নেহ, প্রীতি, পরার্থ ভুলিয়া
মগ্ন সবে নিশিদিন আপনা লইয়া।

(১৩)

হেথা কাঁদে কত অনাথিনী!
পতিহারা কাঁদে সতী
পুত্রহারা পুত্রবতী
দিবস-যামিনী।
তনয়ের শোকে পিতা কাঁদে উভরায়
জনক-জননী-হারা শিশু কাঁদে হায়!

(১৪)

তাই হেথা শশ্মান-ভুবন
সমরে কঙ্কালরাশি
বিজেতার অট্টহাসি
আর্ত্তের রোদন।
নিরন্নের কোলাহল যুড়িয়া অবনী
হৃদয়ের চিতানল দিবস রজনী!

(১৫)

অহো কিবা চিত্র বিভীষণ!
শুধু হেথা হাহাকার
শুধু হেথা অন্ধকার
বিকট বিজন!
পাপ, তাপ, নির্যাতন, নৈরাশ্যজ্বালায়
পশুত্বের প্রতিকৃতি মানব ধরায়!

(১৬)

বৃথা ভয়—দূরে অরুণিমা!
অনুপম অতুলন
ভুলায়ে নয়ন মন
মোহিনী প্রতিমা।
ত্রিদিবের প্রতিছায়া শান্ত বিমোহন
পূর্ণ মানবের ওই ভবিষ্য-জীবন!

(১৭)

মোহকর মধুর মদির।
ওই আলো লক্ষ্য করি,
ওই আশা বুকে ধরি,
মুছি নেত্রনীর।
আঁধার এ অমানিশা পোহাবে যখন
ফুটিবে ও হেমউষা উজলি গগন!

(১৮)

পাপস্রোত ছুটিবে না আর;
পৃথিবীর অমরায়
হারাইবে আপনায়
তীব্র খরধার।
তাপ-দগ্ধ হৃদয়ের করুণ রোদন
উঠিবে না; ঝরিবে না সজল নয়ন।

(১৯)

জ্ঞানময় নরের নয়নে
ভাতিবে যে রত্ন জ্ব'লে
প্রকৃতির অন্তস্তলে
আঁধার বিজনে।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মহা সমাধান
জ্ঞানাতীত নহে আর পুরুষ মহান্।

(২০)

নিভিবে সমর-দাবানল;
জাতি জাতি জনে জন
ভুলি বৈর চিরন্তন
দুর্ব্বল প্রবল,
ভাই ভাই মিলি সবে এক মহাপ্রাণ
সাধিবে স্রষ্টার বিশ্বকার্য্য সুমহান্।

(২১)

রহিবেনা প্রণয় বিরহ
অধতম পুরাতনে
অতৃপ্তি আর নূতনে
নিতি অহরহ।
কামের কণিকাহীন হইবে মিলন
হৃদয়ের হৃদয়ের অচ্ছেদ্য বন্ধন।

(২২)

শুভজলা শ্যাম বসুন্ধরা
বিজ্ঞানের সুকৌশলে
মানবের পুণ্যফলে
সার শস্যে ভরা!
মিটিবে ক্ষুধার জ্বালা, ধনী দীন হীন
অনন্ত এ বিশ্বরাজ্যে সমান স্বাধীন!

(২৩)

জরা ব্যাধি অকাল-মরণ
সুখময় বসুধায়
বিজ্ঞানের পূর্ণতায়
হবে অদর্শন।
বিকচ জীবনফুলে ছুটিবে সৌরভ
প্রকৃতির সুসন্তান হইবে মানব।

(২৪)

ঈর্ষা দ্বেষ ভুলি অভিমান
পরদুঃখে অবিরল
ফেলিবে নয়ন জল
মানব-সন্তান।
সমবেদনার বশে হইবে নিয়ত
সাধিতে আপন হিত পরহিতে রত।

(২৫)

পূর্ণ প্রেমে প্রীতির উচ্ছ্বাস
মানবের মোক্ষধর্ম্ম
জগতে নিষ্কাম কর্ম্ম
হবে পরকাশ!
টুটিবে সংশয়গ্রন্থি, দেখিবেক নর
সচ্চিদ্-আনন্দময় বিশ্ব চরাচর।

(২৬)

মোহকর মধুর মদির
ওই আলো লক্ষ্য করি
ওই আশা বুকে ধরি
মুছি নেত্রনীর।
আঁধার এ অমানিশা পোহাবে যখন
ফুটিবে ও হেমউষা উজলি গগন।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

নানাসাহেব।

তৃতীয় অধ্যায়।

(কাণপুর-বিদ্রোহ।)

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে, কাণপুর-শিবিরে ইংরেজের প্রায় ৩০০ গোরা এবং ৩০০০ সিপাহি পৃষ্ঠবল ছিল। এই বাহিনী স্যার-হিউহুই-লরের অধীনে পরিচালিত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের প্রাক্কালে সিপাহি-সৈন্য, দুষ্টমতি ও দুরাচারগণের কল্পিত বিচিত্র কাহিনী শ্রবণে, কিছু বিচলিত হয়। তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল যে, ইংরেজগণ তাহাদের জাতি নাশ করিয়া তাহাদিগকে এককালীন বারুদে উড়াইয়া দিবেন। মূঢ় সিপাহি-সৈন্যের ইংরেজের উপর অসন্তোষ সঞ্চার এইরূপে হয়। সে যাহা হউক, তাহাদের মানসিক ভাব কোন বিদ্রোহ-সূচক কার্য্যে পরিণত হয় নাই; কিন্তু তাহাদের সেনানী হুইলর সাহেব সিপাহিগণের এই চিত্তবিকার দর্শনে, লক্ষ্ণৌনগরীর শাসক হেন্‌রীলরেন্স এবং (আশ্চর্য্যের বিষয়!) নানা-সাহেবেরও নিকট সৈন্য-সাহায্যার্থী হইলেন। এইরূপ যাঁহারা ভারতীয়গণের অদৃষ্ট পরিচালনা করিতেন, দুর্দ্দৈব বশতঃ তাঁহারা এক্ষণে, যে ব্যক্তি তাঁহাদের নিকট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার নিকট সাহায্যার্থী হইতে বাধ্য হইলেন। নানা-সাহেব এই সাহায্য-প্রার্থনায় অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার সময় ও সুযোগ উপস্থিত।

নানা-সাহেব তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য হইবার পর, কপটতা বিলক্ষণ শিক্ষা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বমত মৌখিক শিষ্টাচারে ও আলাপে কাণপুরস্থ ইংরেজ অধিবাসিগণকে আপ্যায়িত করিয়া, হৃদয়ে ইংরেজ জাতির উপর দারুণ ঘৃণা পোষণ করিতে লাগিলেন। যদিও তাঁহার আনন হাস্যময়, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের কোমলতা ইংরেজ-পীড়নে একবারে তিরোহিত হইল। যাহা হউক, তাঁহার হৃদয়ের ভাব ঘুণাক্ষরে ইংরেজ জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সমাজে নানা-সাহেব তখনও ভদ্র ও সৎস্বভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এজন্য বিপদ্‌কালে ইংরেজ নানা-সাহেবের সাহায্য-প্রার্থী হন। তিনিও কাল-বিলম্ব না করিয়া স্বয়ং মে মাসের ২২শে তারিখে ৩০০ অনুচর ও দুইটী তোপ সমভি-ব্যাহারে কাণপুরে উপস্থিত হইলেন। নানা-সাহেবের উপর ইংরেজের এত বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহাদের ধনাগারের রক্ষাভার অসঙ্কুচিত-চিত্তে, তাঁহার করে অর্পিত ও তাঁহার বাসস্থল কাণপুরস্থ ইংরেজ-মহলে নির্দ্দিষ্ট হইল। কাণপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব নানা সাহেবের নিকট আসিয়া তাঁহার আগমনে ইংরেজের প্রভূত উপকার হইল স্বীকার করিলেন।

এদিকে সিপাহিগণ মধ্যে অসন্তোষচিহ্ন দর্শনে, ইংরেজ-সেনানী ভাবিত হইল। যদিও তাহারা বিদ্রোহজ্ঞাপক কার্য্য কিছুই এ পর্য্যন্ত করে নাই, কিন্তু তাহাদের ভাব গতিক ভাল নহে বুঝিয়া তিনি ইংরেজসৈন্য ও অধিবাসিগণের রক্ষার্থ মনোনিবেশ করিলেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এ নিমিত্ত হুইলার সাহেব কাণপুরস্থ সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত অস্ত্রাগার পরিত্যাগ পূর্ব্বক, এক অরক্ষিত ও প্রশস্ত ময়দানে কতকটা ভূমি সামান্য প্রাকারে বেষ্টিত করিতে বলিলেন। এই সামান্য দুর্গ যখন প্রস্তুত হইতেছিল, আজিমুল্লা একাকী জনৈক সামরিক কর্ম্মচারীর সহিত সম্মুখস্থ ময়দানে ভ্রমণকালীন, উহা লক্ষ্য করিয়া সহচরকে বলিয়াছিলেন, আপনারা ইহার নাম কি দিবেন? ইংরেজ বলিলেন, ইহার কি নাম দেওয়া হইবে, আমি জানি না। আজি-

মুল্লা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, ইহাকে "নিরানন্দের" দুর্গ বলা উচিত। ইংরেজ বলিলেন,—"না, ইহা বিজয়ের দুর্গ"। *

ইংরাজের এই বিচিত্র আত্মরক্ষার স্থান নির্ম্মিত হইতেছে, এমন সময়ে অযোধ্যার শাসক মহামতি স্যার হেনরী লরেন্স, স্বীয় বিপদ্ সত্ত্বেও, কাণপুরে হুইলারের বিপদ্ জানিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ ৫৫ টী গোরা ও ২৪০ জন সিপাহী প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, নানাসাহেবকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।" †

হুইলার, লরেন্সের জ্ঞানগর্ভ উপদেশ বুঝিলেন না। নানা-সাহেবের উপর তাঁহার বিশ্বাস অটল রহিল। প্রায় দশলক্ষ টাকার ধনাগার নানা-সাহেবকে রক্ষা করিতে দেওয়া হইয়াছিল। যে নানা-সাহেব ইংরেজের সহিত ভদ্রতা, শিষ্টাচার ও সদালাপে বিখ্যাত, সে ব্যক্তি কিরূপে ইংরেজের অবিশ্বাসী হইবে, হুইলার বুঝিতে পারিলেন না।

এইরূপে মে মাস অতিবাহিত হইল। তখনও সিপাহীরা কোন প্রকার বিদ্রোহসূচক কার্য্যে কৃপাণ কলঙ্কিত করে নাই। এদিকে এলাহাবাদ হইতে এক দল ইউরোপীয় সৈন্যও কাণপুরে ৩রা জুন্ তারিখে পঁহুছিল। হুইলার কালবিলম্ব না করিয়া, এই সৈন্য, লক্ষ্ণৌ-নগরীতে স্যার হেনরিলরেন্স-প্রেরিত সৈন্যের পরিবর্ত্তে প্রেরণ করিলেন। হেনরিলরেন্সের নিকট সৈন্যগ্রহণরূপ ঋণ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত, এলাহাবাদ হইতে প্রেরিত সৈন্য, লক্ষ্ণৌ-নগরীতে পাঠাইয়া তিনি যে দারুণ ভ্রমাত্মক কার্য্য করিলেন, তাহা তাঁহাকে জীবনশোণিতে অপনোদিত করিতে হইয়াছিল। ইংরেজ-সেনানী ভাবিয়াছিলেন যে, কলিকাতা হইতে সাহায্যার্থ সৈন্য কাণপুরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে, তাঁহার নিকট যে সৈন্য রহিল, তাহা আত্মরক্ষার্থ যথেষ্ট হইবে; কিন্তু দুর্দ্দৈব বশতঃ উক্ত সৈন্যের কাণপুরে আগমন, তাঁহাকে দেখিতে হয় নাই।

আত্মরক্ষার শিবির নির্ম্মাণ সমাপন হইলে, ইংরেজ সেনানী, সমুদয় ইউরোপীয় অধিবাসী,—শিশুরমণী সমেত প্রায় ১০০০ প্রাণীকে এই স্থানে প্রেরণ করিলেন; ইহাতে সিপাহীসৈন্যগণের ধারণা হইল যে, ইংরেজ আর দেশীয় সৈন্যগণকে বিশ্বাস করেন না। তাহাদের জাতি ও ধর্ম্মনাশ সম্বন্ধে, যে সমুদয় অমূলক বার্ত্তা এতাবৎকাল তাহাদের সমাজে প্রচারিত হইয়াছিল, এক্ষণে আর তাহারা তৎসমুদয় অগ্রাহ্য করিল না।

এদিকে নানা-সাহেবের বিশ্বস্ততায় ইংরেজের অবিচলিত বিশ্বাস রহিল। এমন কি, শিবির মধ্যে, নানা-সাহেবের আগমন অবারিত ছিল। ইংরেজের শিবিরে কোন্ স্থানে তোপ কিরূপ সন্নিবিষ্ট ও কোন্ স্থান ক্ষীণ ও অরক্ষিত তৎসমুদয় তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির বহির্ভূত হইতে পারে নাই। এইরূপে ইংরেজের অবস্থা সম্যক্রূপ অবগত হইয়া ও সিপাহি-সৈন্যের ভাবগতিক দেখিয়া তিনি অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রতিশোধের সময় নিকটবর্ত্তী।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুন, বৃহস্পতিবার রজনীযোগে, দুই সংখ্যক দেশীয় অশ্বারোহী প্রথমে বিদ্রোহ-ধ্বজা উড্ডীন করিলে, রাত্রি ৩টার সময় এক সংখ্যক দেশীয় পদাতি তাহাদের সহিত যোগদান করিল। এই পদাতি-সৈন্য তখনও তাহাদের সেনানীগণকে সম্পূর্ণরূপ ভুলিতে পারে নাই; তাহারা সেনানীগণকে শিবির মধ্যে যাইতে বিশেষ অনুরোধ করিল, ও পাছে সেই ইংরেজগণের কোন অমঙ্গল ঘটে, সেইজন্য বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে

* ট্রেভিলিয়ন প্রণীত "কাণপুর" পৃষ্ঠা ৮২৩।
† গবিন্স্ প্রণীত অযোধ্যা বিদ্রোহ পৃষ্ঠা ৩২।

শিবির মধ্যে প্রেরণ করিল। * ইহার পর তাহারা নানা-সাহেবের রক্ষিত ধনাগার আক্রমণ করিবামাত্র রক্ষকগণ তাহাদের সহিত মিলিত হইল। বিপুল অর্থ লুণ্ঠন করিয়া দুর্ব্বৃত্তগণ দিল্লী অভিমুখে পদচালনা করিয়াছিল। যখন দুই সংখ্যক অশ্বারোহী ও এক সংখ্যক পদাতি এইরূপ বিদ্রোহ ও লুণ্ঠন কার্য্যে, সৈনিক নামে কলঙ্ক আরোপিত করিতেছিল, তখন কাণপুরে অপর দুই রেজিমেণ্ট দেশীয় সৈন্য, তাহাদের সহচরদিগের সহিত যোগদান না করিয়া, স্বীয় বিভাগে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান ছিল। তাহাদের ইউরোপীয় সেনানীগণ নিশ্চিন্তভাবে তাহাদের সহিত রজনী অতিবাহিত করিলেন। ৫ই তারিখের প্রত্যুষে বিদ্রোহী-শিবিরের কতকগুলি চর অনেক প্রলোভনের পর তাহাদিগকে কিছু বিচলিত করিল। সে সময় যদি তাহাদের সেনানীরা সান্ত্বনা-বাক্যে তাহাদিগকে কর্ত্তব্য-কার্য্য-পরায়ণ হইতে প্রোৎসাহিত করিতেন, সম্ভবতঃ তাহারা বিশ্বস্ত থাকিত; কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে সেনানীগণ তাহাদিগের বিরুদ্ধে কামান সজ্জিত করিলেন। তিনবার গোলাবর্ষণের পর হতভাগ্য সিপাহিরা ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল। কামানের গোলা সকলকে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হয় নাই। তাহাদের দেশীয় সেনানীগণের রাজভক্তি অটল ছিল, প্রায় ১০০ সিপাহী-সেনানী স্বীয় কৃপাণের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিল। এরূপ বিশ্বস্ততা সত্ত্বেও তাহারা ইংরেজের নূতন শিবির মধ্যে স্থান পায় নাই, তাহাদিগের বাসস্থান শিবির-বহির্ভাগে নির্দ্দিষ্ট হইল।

এদিকে বিদ্রোহী সিপাহীরা লুণ্ঠনাদি ব্যাপার সমাপন করিয়া, যে স্থলে বিদ্রোহ-তেজোরাশি কেন্দ্রীভূত হইয়া, ইংরেজের ভারত-রাজ্য বিপন্ন করিতেছিল, যথায় বিদ্রোহের অধিনেতা দুর্ব্বৃত্তগণ দিল্লীশ্বরকে বলপূর্ব্বক ইংরেজ-বিরুদ্ধে অর্দ্ধচন্দ্র-শোভিত হরিত পতাকা উড্ডীন করিতে বাধ্য করিয়াছিল, সেই প্রাচীন রাজধানী হস্তিনাভিমুখে পদচালনা করিয়া দিল। তাহারা নবাবগঞ্জে পৌঁছিয়া জানিতে পারিল যে, নানা-সাহেব নিকটবর্ত্তী স্থানেই অবস্থান করিতেছেন। কাল বিলম্ব না করিয়া বিদ্রোহী-সিপাহিগণের চালকগণ মহারাষ্ট্র-শাসকের সন্নিধানে আসিয়া বলিল, "মহারাজ! আপনি যদি আমাদের পক্ষ অবলম্বন করেন, আপনি রাজ্য লাভ করিবেন, কিন্তু যদি আমাদের শত্রুর সহিত যোগ দান করেন, আমাদের হস্তে আপনার মৃত্যু অবধারিত।" নানা-সাহেব বলিলেন, "ইংরাজের সহিত আমার কি সম্বন্ধ? আমি তোমাদেরই।" বিদ্রোহী-নেতারা এই আশ্বাসে নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়া নানা-সাহেবকে বলিল, "আমাদিগকে দিল্লীশ্বরের নিকট পরিচালনা করিয়া লইয়া যাউন।" নানা-সাহেব তাহাতে সম্মত হইলেন; কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠ পারিষদ আজিমউল্লা এ বিষয় হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন এবং ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিলেন যে, দিল্লীতে যাইলে, তাঁহার কিছুই ক্ষমতা থাকিবে না, বরং কাণপুরে লুপ্ত মহারাষ্ট্র গৌরবের নিমিত্ত প্রয়াস করিলে তাঁহার খ্যাতি ও যশ ঘোষিত হইবে। নানা-সাহেব আজিমুউল্লার প্রলোভন সূচক উপদেশ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার অনুচরগণ সিপাহিগণকে অর্থ ও পদের প্রলোভন দেখাইয়া কাণপুরে প্রত্যাগমন করাইতে কৃতকার্য্য হইল।

---

* চেম্বর্শ কৃত ভারতীয় বিদ্রোহ পৃষ্ঠা ১২৮।

চতুর্থ অধ্যায়।

(কাণপুর-অবরোধ।)

সিপাহিরা কাণপুর পরিত্যাগ করিয়া দিল্লী অভিমুখে গমন করিয়াছে শুনিয়া ইংরেজ-সেনানীর যে আহ্লাদ হইয়াছিল, তাহা অধিক-কাল স্থায়ী হইল না। জুন মাসের ষষ্ঠ দিবসের প্রত্যূষে, যে কু-সমাচার তিনি পাইলেন, তাহাতে ইংরেজ-শিবির বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। যে ব্যক্তির উপর ইংরেজ কাণপুর-বিদ্রোহনিবারণার্থ বহুল আশা করিয়াছিলেন, যাঁহার হস্তে তাঁহাদের ধনাগার নিঃশঙ্কচিত্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই নানা-সাহেব এখন ইংরজে-সেনানীকে জ্ঞাপন করিলেন যে, তিনি অনুচর ও বিদ্রোহী সিপাহী সমভিব্যাহারে ইংরেজ-শিবির শীঘ্রই আক্রমণ করিবেন। ইংরেজগণের এ বিষয়ে বিস্ময়াপন্ন হইবার অবসরও নানা-সাহেব দিলেন না। বেলা সার্দ্ধ-দশ ঘটিকার সময় তাঁহার তোপ গর্জ্জিয়া উঠিল। ক্রমাগত প্রায় বিংশতি দিবস উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। ইংরেজেরা স্বল্প-সংখ্যক হইলেও, তাঁহাদের চিরন্তন বীর্য্যবত্তা ও বিপুল সাহস, শত্রুগণের নিরতিশয় ক্লেশদায়ক ও ভয়প্রদ হইল। এমন কি ইংরেজ রমণীরা স্বীয় বস্ত্রভাগও ছিন্ন করিয়া কামানের ছিটাগুলির আবরণ করিতে দিয়াছিল। সিপাহীদিগের পক্ষে আজিজন্ নাম্নী এক সুন্দরী রমণী অশ্বারোহণে ভীরু সিপাহিগণকে উত্তেজিত করিয়াছিল।

এইরূপ সংগ্রাম অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে নাই। ক্রমশঃ রসদ ও সেনাভাবে ইংরেজের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। যদি ইংরেজ রমণী ও অপরাপর অসামরিক ব্যক্তিগণ ইংরেজ-শিবিরের গলগ্রহ না হইত, তাহা হইলে, এই অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া, ইংরেজ-সেনানী অসংখ্য শত্রুমধ্যে ঝম্পপ্রদান করিয়া, প্রাণ দিতে কাতর হইতেন না; কিন্তু অসহায় শিশু ও রমণীগণের নিমিত্ত, তাঁহারা শত্রু-করে আত্মসমর্পণ ব্যতীত অন্য কোন উপায় দেখিলেন না। এমন সময়ে ২৫শে তারিখের প্রত্যূষে শত্রু শিবির হইতে "অর্দ্ধ-জাতীয়" এক নারী আজিমুল্লার লিখিত এক পত্র ইংরেজ-শিবিরে আনয়ন করিল। ঐ পত্রে এইরূপ লেখা ছিল,—"যে সমুদয় ইংরেজ লর্ড ডেলহাউসির ক্রিয়া-কলাপে লিপ্ত নহেন, তাঁহারা অস্ত্র সমর্পণ করিয়া নিরাপদে এলাহাবাদে যাইতে পারিবেন।" ইংরাজেরাও অনন্যোপায় হইয়া নিম্নলিখিত বন্দোবস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন,—তাঁহাদিগকে কামান, বারুদ ও অর্থাদি নানা-সাহেবের নিকট সমর্পণ করিতে হইবে। বন্দুক সহিত কিছু গুলি লইয়া যাইতে তাঁহারা আদিষ্ট হইবেন। আহত মহিলা ও শিশু সন্তানদিগকে গঙ্গাতীরে আনয়ন করিবার জন্য নানা-সাহেব শকটাদি আয়োজন করিবেন; গঙ্গাতটে, তাঁহাদিগকে এলাহাবাদে পঁহুছিয়া দিতে নৌকা প্রস্তুত থাকিবে। এই অঙ্গীকার রক্ষিত হইবে, এই নিমিত্ত নানাসাহেব বিদ্রোহী সেনানী জোয়ালাপ্রসাদ ও অপর দুইটী সহচরকে ইংরেজ-শিবিরে প্রতিভূস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। জোয়ালার আচরণ ইংরেজসেনানীর প্রীতিকর হইয়াছিল। এ দিকে ইংরেজ-সেনানী তোপ সমুদয় শত্রুকরে অর্পণ করিয়া শিবির হইতে বহির্গত হইলেন। দীর্ঘ-কাল অবরোধের পর এই স্বাধীনতা লাভে আহ্লাদিত হইয়া ইংরেজ-সৈনিক, রমণী ও শিশু সন্তানগণ জাহ্নবী অভিমুখে গমন করিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

(বিশ্বাসঘাতকতা।)

যুদ্ধের এইরূপ অবসানে, বিদ্রোহী-সেনা মধ্যে যাহারা হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, তাহারা এতদিন পরে যুদ্ধের অসীম ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইল বলিয়া অতিমাত্র আহ্লাদিত হইল। অপর পক্ষে মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী বিদ্রোহীরা ইংরেজের এইরূপ মুক্তিলাভে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল। যদিও যুদ্ধে তাহাদের ভীরুতা তাহাদিগকে হিন্দুসৈন্যগণের ঘৃণার্হ করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু নৃশংসতা ও বাক্‌পটুতায় তাহারা নানা-সাহেবের অপদার্থ পারিষদ-সমাজে প্রিয় হইয়া উঠে। ইংরেজেরা মুক্তিলাভ করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিবে, এই আশঙ্কায় তাহারা ইংরেজের এইরূপ মুক্তি লাভে ভীত হইল। মুসলমান সেনানীগণ, যাহাতে ইংরেজেরা আর কাণপুর হইতে ফিরিয়া যাইতে না পারে, সেইজন্য আজিমউল্লা এবং নানা-সাহেবের ভ্রাতা বালা-সাহেবের সহিত এক নীচ ও জঘন্য চক্রান্ত উদ্ভাবন করিল। তাহারা স্থির করিল যে, ইংরেজগণ যেমন জাহ্নবীতীরে গিয়া নৌকায় উঠিবে, অমনি তাহাদিগকে আক্রমণ করা হইবে। সমুদয় পুরুষকে বিনষ্ট করা হইবে; কেবল রমণী ও শিশুগণকে রক্ষা করা হইবে। এই অভূতপূর্ব্ব বিশ্বাসঘাতকতার বিবরণ নানা-সাহেবের নিকট জ্ঞাপন করা হইলে তিনি বলিলেন, যে, ইংরেজগণকে নিরাপদে এলাহাবাদে পৌঁছিয়া দিতে অঙ্গীকারপাশে আবদ্ধ হইয়া, তিনি কখন এরূপ ব্যাপার সমর্থন করিতে পারেন না। ইহাতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত ও লজ্জিত না হইয়া, নারকী চক্রান্তকারিগণের নেতা আজিমউল্লা ও বালা-সাহেব বলিলেন যে, তাঁহার আপত্তি তাঁহারা গ্রাহ্য করেন না; তিনি অঙ্গীকারে আবদ্ধ আছেন সত্য বটে, কিন্তু তাঁহারা কোন রূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ নহেন; সুতরাং তাঁহারা অনায়াসে ইংরেজগণের বিনাশ সাধন করিতে পারেন। এই ঘৃণিত যুক্তির বিরোধী হইবার ক্ষমতা নানা-সাহেবের ছিল না। এইরূপ ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতার অবতারণ করিয়া চক্রান্তকারিগণ তৎসম্পাদনে অগ্রসর হইল।* ভারতীয় ইতিহাসে এরূপ ব্যাপারের অনুষ্ঠান কখন দৃষ্ট হয় নাই।

এদিকে ২৭শে তারিখের প্রত্যূষে, নানা-সাহেবের বন্দোবস্ত মত ইংরেজগণের যাত্রার আয়োজন সমুদয় প্রস্তুত হইলে, তাঁহারা আহ্লাদে ও প্রফুল্লান্তঃকরণে গঙ্গাতীরাভিমুখে চলিলেন। তথায় তাঁহাদিগের নিমিত্ত আহারাদির আয়োজন হইয়াছিল। ভোজনান্তে ইংরেজ পুরুষ ও রমণীগণ নৌকায় উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, তখন বেলা প্রায় নয় ঘটিকা হইবে,—এমন সময় এক শ্রবণবিদারী ভেরীর রব শ্রুত হইল; অমনি চতুর্দ্দিক্‌ প্রকম্পিত করিয়া কামানের গোলা অজস্র ধারায় ইংরেজের উপর পতিত হইতে লাগিল। এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতাসূচক আক্রমণে কাতর হইয়া, ইংরাজ-সেনাগণ প্রাণপণে নৌকা নদীর মধ্যভাগে লইয়া যাইতে প্রয়াস পাইল, কিন্তু মুসলমান অশ্বারোহী-সৈন্যেরা শাণিত তরবারি হস্তে নদীজলে ঝম্পপ্রদান করিয়া ইংরেজ-সেনাগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। কম্পিত-কলেবর ইংরেজ-রমণী ও শিশুগণকে তাহারা বন্দী করিয়া নৌকাসমেত পুনরায় কাণপুরের ঘাটে আনয়ন করিল। পুরুষগণের মধ্যে প্রায় কেহই শত্রু কৃপাণ হইতে নিস্তার পাইল

* সেপার্ড প্রণীত কাণপুর হত্যাকাণ্ড পৃষ্ঠা ১০৭। এই ব্যক্তি তৎকালীন বন্দীভাবে কাণপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, এজন্য এরূপ ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁহার বর্ণিত ঘটনা প্রকৃত ও সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

না। কেবল একখানি তরী সৌভাগ্যক্রমে সেই ভয়ঙ্কর স্থান হইতে পরিত্রাণ পাওয়ায়, চারিজন ইংরেজ-পুরুষের জীবন রক্ষা হয়। ইহাদের নাম টমশন্,* ডেলাফোস্, মরফি এবং সলিভান্।

শ্রীগোপেন্দ্রলাল দে।

জন্মপত্রিকা-প্রস্তুত-প্রণালী।

৭। সংক্ষিপ্ত দৈনিক পঞ্জিকা।

প্রতি পঞ্জিকাতেই প্রতি তারিখের একটী সংক্ষিপ্ত দৈনিক পঞ্জিকা বাম পার্শ্বে লিখিত থাকে। যথা,—পূর্ব্বোক্ত গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় ১০ই শ্রাবণের সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকা এইরূপ লিখিত আছে ;—

দিবা ৩৩।৬
রাত্রি ২৬।৫৪
মুং ২।১২।২৪

১	৮	১৫
১	৩৪	৮
৫৭	১৪	১৬
৩৯	১২	২৫
২১	কিং	১০

ইহার অর্থ এই—সেই দিনের দিবা-মান ৩৩ দণ্ড ৬ পল। রাত্রি-মান ২৬ দণ্ড ৫৪ পল। মুহূর্ত্ত (অর্থাৎ দিবার পনর ভাগের এক ভাগ) মান ২ দণ্ড ১২ পল ২৪ বিপল।

পরের অঙ্কের ১ম স্তম্ভের ১ম অঙ্ক "১" সেই দিনের বারজ্ঞাপক। ১ বার অর্থাৎ রবিবার। এইরূপ ওখানে ৭ থাকিলে শনিবার বুঝাইত।

১ম স্তম্ভের ২য় অঙ্ক "১" সেই তারিখের প্রভাতের তিথিজ্ঞাপক। ১ তিথি অর্থাৎ শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথি। ১৫ থাকিলে পূর্ণিমা বুঝাইত। ১৬ থাকিলে কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ বুঝাইত ২৭ থাকিলে কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী বুঝাইত; ৩০ থাকিলে অমাবস্যা বুঝাইত। ১ম স্তম্ভের ৩য়, ৪র্থ ও পঞ্চম অঙ্ক অর্থাৎ "৫৭", "৩৯" ও "২১" উক্ত তিথির অর্থাৎ এস্থলে শুক্ল-প্রতিপদের যথাক্রমে "দণ্ড", "পল" ও "বিপল" মানব্যঞ্জক। অর্থাৎ উক্ত দিবস শুক্লপক্ষীয় প্রতিপদ ৫৭ দণ্ড ৩৯ পল ২১ বিপল ছিল।

২য় স্তম্ভের ১ম অঙ্ক "৮" সেই তারিখের প্রভাতের নক্ষত্রব্যঞ্জক। অর্থাৎ সেই তারিখে প্রভাতে ৮ নক্ষত্রে চন্দ্র ছিলেন। ২য় স্তম্ভের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম অঙ্ক অর্থাৎ "৩৪", "১৪" "১২" এই তিন অঙ্ক উক্ত নক্ষত্রের যথাক্রমে "দণ্ড" "পল" "বিপল" মানব্যঞ্জক। অর্থাৎ উক্ত তারিখের ৮ নক্ষত্র ৩৪ দণ্ড ১৪ পল ১২ বিপল ছিল।

"কিং" অর্থে কিংস্তুঘ্ন করণ। করণ ১১টী ; যথা,—বব, বালব, কৌলব, তৈতিল, গর, বণিজ, বিষ্টি, শকুনি, চতুষ্পাদ, নাগ ও কিংস্তুঘ্ন।

২য় স্তম্ভে সর্ব্বশেষ পদে করণ বুঝায়।

৩য় স্তম্ভের ১ম অঙ্ক যোগব্যঞ্জক। যোগ ২৭টী। অনাবশ্যক বোধে উহাদের নাম লিখিত হইল না। "১৫" এই অঙ্কে উক্ত ১৫ সংখ্যক যোগ, এই বুঝাইল। ৩য় স্তম্ভের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ অঙ্ক ঐ যোগের ব্যাপক কাল দণ্ড, পল ও বিপল। ৩য় স্তম্ভের শেষের অঙ্ক মাসের তারিখ।

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় এইরূপ সকল সংক্ষিপ্ত দৈনিক পঞ্জিকারই পূর্ব্বোক্তরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

* এই ব্যক্তি পরিশেষে কাণপুর-কাহিনী সম্বন্ধে এক পুস্তক রচনা করেন, উপরোক্ত ঘটনা তাঁহার বর্ণিত ব্যাপারের ভিত্তিতে গঠিত

ঠিকুজীতে যে যে দিন জন্মনক্ষত্র স্পর্শ করে, সেই সেই দিনের সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকা দিতে হইবে। যেদিন বালকের জন্ম, সেই দিনের সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকাকে 'জাতাহ' ও তাহার পূর্ব্বের দিনের দিতে হইলে তাহাকে 'পূর্ব্বাহ,' পরের দিনের দিতে হইলে তাহাকে 'পরাহ' বলিবে।

আমাদের পূর্ব্বোক্ত শিশুর জন্মনক্ষত্র, তাহার পূর্ব্বদিন পাইয়াছিল, সুতরাং উক্ত শিশুর জন্মপত্রিকায় এইরূপ লিখিতে হইবে ;—

জাতাহ।			পূর্ব্বাহ।		
দিবা ৩৩।৬			দিবা ৩৩।৭।৫		
রাত্রি ২৬।৫৪			রাত্রি ২৬।৫২।৫৫		
মুং ২।১২।২৪			মুং ২।১২।২৮।২০		
১	৮	১৫	৭	৭	১৪
১	৩৪	৮	২৯	৩৪	১২
৫৭	১৪	১৬	১	১৪	৩৮
৩৯	১২	২৫	৩৯	৩৫	৪১
২১	কিং	১০	৬	শ	৯
			৫৭	—	—
			২৭	—	—
			২৫	—	—

যদি বালক ৯ই ৩৪ দণ্ড ১৪ পল ৩৫ বিপল পরে জন্মে, তাহা হইলে এখন যাহাকে পূর্ব্বাহ বলিলাম, তখন তাহাকে জাতাহ বলিয়া লিখিতে হইত ; আর জাতাহকে পরাহ বলিতে হইত।

এখন স্থূলভাবে ঠিকুজীতে যেরূপ ভাবে পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলি লিখিত থাকে, তাহা দেখাইয়া প্রস্তাব শেষ করিব।

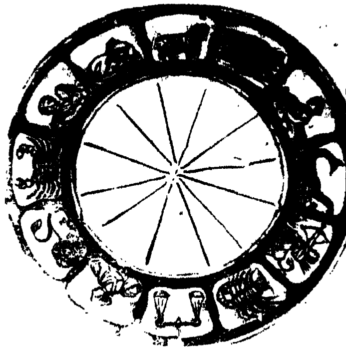
শক মাস* দিন দণ্ডাদি————

সন „ „ „————

ইং সন মাস দিবা ঘণ্টাদি————

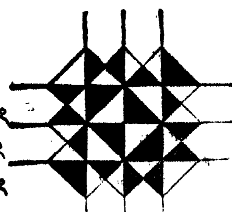
* মাস ও দিন-সংখ্যায় ১ অঙ্ক কম লিখিত হয়। উহা অতীত-কাল-বাচক। যথা ;—বৈশাখ মাসে হইলে ০ মাস, ১৫ই বৈশাখ হইলে ০।১৪ এইরূপ লিখিতে হয়।

জাতচক্র।



রাশিচক্রের পার্শ্বে জাতাহটী লিখিতেই হইবে। আবশ্যক হইলে পূর্ব্বাহ বা পরাহ বা উভয়ই লিখিতে হইবে।

পতাকীচক্র।



বিংশোত্তরীয় জন্মদশা ভোগ্যমান
অষ্টোত্তরীয় জন্মদশা ভোগ্যমান

............সনের.........মাসের.........তারিখে ......বারে......পক্ষের......তিথিতে......ক্ষেত্রে ......হোরায়.........দ্রেক্কাণে......... নবাংশে ......দ্বাদশাংশে......ত্রিংশাংশে...... যামার্দ্ধে ......দণ্ডে......লগ্নে... ..রাশিতে...... নক্ষত্রে ......অষ্টোত্তরীয় দশায়......বিংশোত্তরীয় দশায় ......র......পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। জাতক ......গণ......বর্ণ। ভগবান্ উঁহার মঙ্গল করুন।

পূর্ব্বোক্ত শিশুর অর্থাৎ যাহার জন্ম কলিকাতায় ১২৯১ সালের ১০ই শ্রাবণ বেলা সাড়ে

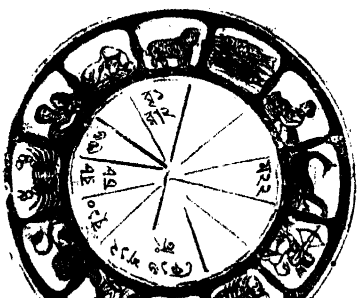
এগারটার সময় কল্পনা করা হইয়াছে, তাহার ঠিকুজীতে এইরূপে উক্ত স্থান পূরণ হইবে।

শক মাস দিন দণ্ডাদি ১৮১৪।৩।৯।১৫।২।৩০ বিপল

সন মাস দিন দণ্ডাদি ১২৯৯।৩।৯।১৫।২।৩০ বিপল

ইং সন মাস দিন ঘণ্টাদি ১৮৯২।৬।২৩।১১।৩০ মিঃ

জাতাহ।			পূর্ব্বাহ।		
দিবা ৩৩।৬			দিবা ৩৩ ৭।৫		
রাত্রি ২৬।৫৪			রাত্রি ২৬।৫২।৫৫		
মুং ২।১২।২৪			মুং ২।১২।২৮।২০		
৯	৮	১৫	৭	৭	১৪
১	৩৪	৮	২৯	৩৪	১২
৫৭	১৪	১৬	১	১৪	৩৮
৩৯	১২	২৫	৩৯	৩৫	৪১
২১	কিং	১০	৬	শং	৯
			*৫৭	—	—
			২৭	—	—
			২৫	—	—



লগ্নমান দং ৫।৩৭।০

লগ্নভুক্ত দং ০।৫।৫০

লগ্নভোগ্য দং ৫।৩১।১০

নক্ষত্রমান দং ৫৯।৫৯।৩৭

নক্ষত্রভুক্ত দং ৪০।৪৭।১৯

দিবামান ৩৩।৬

রাত্রিমান ২৬।৫৪

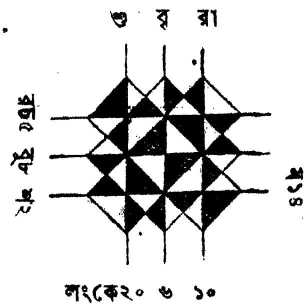
মুং ২।১২ ২৪

দিবাযামার্দ্ধমান ৪।৮।১৫ বিপল

দিবা দণ্ড মান দং ১।২।৩।৪৫

*এই ৩ অঙ্কের অর্থ—সেই তারিখে অন্ত একটী তিথি উক্ত সময় পর্য্যন্ত ছিল।

বিংশোত্তরীয় মতে শনির ভোগ্য—৬ বৎসর ১১ মাস ২৯দিন ৩৬ দণ্ড। অষ্টোত্তরীয় দশামতে চন্দ্রের ভোগ্য—৪ বৎসর ১১মাস ১২দিন ৯দণ্ড।



বাঙ্গালা ‘১২৯৯’ সনের ‘শ্রাবণ’ মাসের ‘১০ই’ তারিখে ‘রবি’বারে ‘শুক্ল’ পক্ষের ‘প্রতিপদ’ তিথিতে ‘শুক্রের’ ক্ষেত্রে ‘রবির’ হোরায়, ‘শুক্রের’ দ্রেক্কাণে ‘মঙ্গলের’ নবাংশে ‘বৃহস্পতির’ দ্বাদশাংশে ‘শনির’ ত্রিংশাংশে ‘চন্দ্রের’ যামার্দ্ধে ‘বুধের’ দণ্ডে ‘তুলা’ লগ্নে ‘কর্কট’ রাশিতে ‘পুষ্যা’নক্ষত্রে ‘চন্দ্রের’ অষ্টোত্তরীয় দশায় ‘শনির’ বিংশোত্তরীয় দশায় ‘শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ রায় মহাশয়ের’ ‘প্রথম’ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। জাতক ‘দেব’গণ ‘বিপ্র’বর্ণ। ভগবান্ ইহার মঙ্গল করুন। *

সাধারণ ঠিকুজীতে ইহা ছাড়া অন্য কিছুই লিখিত থাকে না। তবে ২।১ খানায় গ্রহগণের দশা কাল ও ষণ্নাড়ীও লিখিত থাকে।

আমরা যাহা লিখিয়াছি, বুদ্ধিমান্ পাঠকবর্গ তাহা হইতেই, ইচ্ছা হইলে, স্থূল-দশাকাল লিখিতে পারিবেন। জন্মদশার ভোগ্যকালের সহিত পর পর দশার ভোগ্যকাল যোগ করিয়া গেলেই হইল। যথা, পূর্ব্বোক্ত শিশুর দশা ;—

* ইতিপূর্ব্বে “...সনের...মাসের” ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ‘ ’ এই চিহ্নিত পদগুলি ক্রমে নিবেশিত করিয়া লইতে হইবে।

অষ্টোত্তরীয় মতে

	বৎসর	মাস	দিন	দণ্ড	
চন্দ্রের ভোগ্য	৪	১১	১২	৯	পর্য্যন্ত
মঙ্গলের ,,	৮				
	১২	১১	১২	৯	,,
বুধের ,,	১৭				
	২৯	১১	১২	৯	,,
শনির ,,	১০				
	৩৯	১১	১২	৯	,,
বৃহস্পতির ,,	১৯				
	৫৯	১১	১২	৯	,,
রাহুর ,,	১২				
	৭০	১১	১২	৯	,,

এইরূপ

	বৎসর	মাস	দিন	দণ্ড	
শনির ভোগ্য	৬	০	২৯	৩৬	পর্য্যন্ত
বুধের ,,	১৭				
	২৩	০	২৯	৩৬	,,
কেতুর ,,	৭				
	৩০	০	২৯	৩৬	,,
শুক্রের ,,	২০				
	৫০	০	২৯	৩৬	,,
রবির ,,	৬				
	৫৬	০	২৯	৩৬	,,
চন্দ্রের ,,	১০				
	৬৬	০	২৯	৩৬	,,

ইত্যাদি

কেহ কেহ বা অন্তর্দ্দশাও লিখিয়া থাকেন।

গ্রহের স্থূলদশার মধ্যে এক এক গ্রহের ভোগকালের নাম অন্তর্দ্দশা। গ্রহের দশার প্রথমে সেই গ্রহেরই অন্তর্দ্দশা পড়িবে। পরে যথাক্রমে দশার-ন্যায় অন্তর্দ্দশা পরিবর্ত্তিত হইবে। যথা,—রবির দশায় প্রথমে রবির অন্তর্দ্দশা, পরে চন্দ্রের, পরে মঙ্গলের ;—এইরূপ। উহা এইরূপ লিখিতে হয় রর, রচ, রম, রবু, রশ, রবৃ, ররা, রশু ;—এইরূপ। স্থূলদশার কালকে যাহার অন্তর্দ্দশা, তাঁহার কাল দ্বারা গুণ করিয়া ১০৮ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফলাদি অষ্টোত্তরীয় অন্তর্দ্দশার বর্ষ মাস দিন দণ্ড হইবে।

যথা, শুক্রের দশায় বৃহস্পতির অন্তর্দ্দশার মান কত ?

$$ক = \frac{২১ \times ১৯ \text{ বর্ষাদি}}{১০৮}$$

= ৩ বৎসর ৯ মাস ১০ দিন।

বিংশোত্তরীয় দশায় ১০৮ স্থলে ১২০ গ্রহণ করিতে হইবে। প্রভেদ এই মাত্র।

জন্ম দশাটীর অন্তর্দ্দশা গণনা করিতে আপাততঃ একটু গোল দেখা যায়। পাঠকবর্গ যদি প্রথম অন্তর্দ্দশা হইতে গণনা আরম্ভ না করিয়া শেষ অন্তর্দ্দশা হইতে গণনা করেন, তবে আর গোলমাল থাকে না।

তার পর ষণ্নাড়ী। জন্মনক্ষত্রকে জন্মনাড়ী ও তাহা হইতে গণনায় দশম নক্ষত্রকে কর্ম্ম-নাড়ী, জন্ম হইতে গণিয়া ষোড়শ নক্ষত্রকে সাংঘাতিক নাড়ী, অষ্টাদশ নক্ষত্রকে সমুদয় নাড়ী, ত্রয়োবিংশ নক্ষত্রকে বিনাশ-নাড়ী ও পঞ্চবিংশ নক্ষত্রকে মানসনাড়ী বলে।

যথা,—পূর্ব্বোক্ত শিশুর জন্মনক্ষত্র ৮ হওয়ায় উহার

জন্মনাড়ী	৮	সমুদয়	২৫
কর্ম্মনাড়ী	১৭	বিনাশ	৩
সাঙ্ঘাতিক	২৩	মানস	৫

স্থূলভাবে ঠিকুজী-গণনা-প্রণালী লিখিত হইল। কিন্তু ইহা জ্যোতিষ গণনার উপক্রমণিকা মাত্র। ইহা লিখিয়া পরে সূক্ষ্মভাবে সময় নির্দ্ধারণ, শঙ্কু দ্বারা স্বীয় স্বীয় দেশের লগ্নমান সূক্ষ্মরূপে গণনা—গ্রহস্ফুট ভাবস্ফুট ইত্যাদি শিক্ষা করিলেই সংক্ষেপে একপ্রকার জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনাভাগ শেষ হয়।

পরে জ্যোতিষের ফল গণনা অভ্যাস করিবার পূর্ব্বে—গ্রহগণের প্রকৃতি রূপ ইত্যাদি, তাহাদির নাম ও তাহার কোন্ গৃহে কি আলোচনা করিতে হইবে তাহা, গ্রহগণের দৃষ্টি-স্থান, গ্রহগণের মিত্রামিত্র, গ্রহগণের তুঙ্গ ও নীচস্থান প্রভৃতি গ্রহগণের বলাবল নির্ণয়াত্মক বিষয়গুলি জানিতে হয়। এই সকল জানিয়া পরে ফলাফল-তত্ত্ব শিক্ষা করিতে হয়।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়।

প্রাণ।

একটী একটী ক'রে যায় জীবনের দিন
গতি তার বড়ই মন্থর ;
অশ্রুময়,—শ্রাবণের নীরদ-সম্ভার যথা,—
বরষিয়া চলে নিরন্তর।
দিনেক বিরাম নাই—এত অশ্রু কোথা পাই—
একে একে এই ভাবে কত দিন যাবে—
এত অশ্রু কোথা পাব ?—বিধাতা মিলাবে।

কে যেন নিকুঞ্জবনে বাজাতে বাজাতে বাঁশী,
কি জানি কি পেলে অপরাধ—
নিক্ষেপ করিল দূরে—ভেঙ্গে গেল বাঁশী—সঙ্গে
ভেঙ্গে গেল আশা—সুখ-সাধ।
ডুবে গেল চন্দ্রালোক, বুকে মল্লিকার শোক,
স্বরপূর্ণ কক্ষগুলি হইল বিজন ;—
অদৃষ্ট বিক্ষিপ্ত সেই বংশী এ জীবন।

এই জনমের শেষ—এই ধরিত্রীর শেষ—
নাহি শক্তি—নাহি স্থান—উঠি ;
ধূমাচ্ছন্ন দৃষ্টিপথ—সর্ব্বাঙ্গ বিচূর্ণ—তবু—
তবু—সাধ যায় উঠে ছুটি।
ফুরায়েছে লীলা-নাট—পড়ে যা' কেবল কাঠ—
অভিনয় অস্তগত—আলো নেবা বাকী ;
রৌদ্রে জলে ভিজে পুড়ে যত দিন থাকি।

'আর কি বাজিবে'? কভু অন্তরে নিরাশ স্বরে
ওঠে ধ্বনি—'আর কি বাজিবে'?
ছিন্ন-কান্তা বিধবার নিরর্থ চিন্তার মত
মনে হয় গেছে যা' ফিরিবে?
প্রফুল্ল-মাধবীবনে পূর্ণ-চন্দ্র-প্রলোভনে
আর কি বাজিবে প্রাণে মায়োন্মা গান্ধার?
এ শ্মশানে সুধাবৃষ্টি হইবে কি আর?

আবার সে যমুনারি নীল-জল-রাশি-কূলে
এ বাঁশরী বাজিবে কি আর?
চুম্বনে কি তুলিবে রে রাগিণী-তরঙ্গ প্রাণে
শ্যামময়ী শ্রীরাধা আমার?
অসহ্য সুখের ঘোরে আর কি যাব না ম'রে?
আর সে নিশীথ-শূন্য-বিপ্লাবন তান
কাঁপাবে না স্বপ্নমুগ্ধা প্রেমিকার প্রাণ?

আর বাজিবে না—ছাড়্ চন্দ্রালোকময়ী স্মৃতি
ভুলে যা' সে ফুল-বন-বাস ;
ভুলে যা' মল্লিকাসঙ্গ, সঙ্গীত-জীবন, বাঁশি!
এ জনম-ঋতু-মধুমাস।
এ মরা গঙ্গায় তোর্ ফিরে আসিবে না জোর,
হৃদয়ে প'ড়েছে চড়া—বালুকা বিশাল ;
এ চড়া ডুবিবে? কেন দুরাশা-জঞ্জাল!

বেজে গেছে—যতটুক বাজিবার ছিল তোর—
বেজে গেছে এ জন্মের মত—
সুখের যে পরিমাণ পূরিয়াছে এবারের,
বাকী পড়ে অশ্রুপাত-ব্রত।
এ সবে প্রারম্ভকাল সযত্নে সে ব্রত পাল,
উদ্‌যাপনে জুড়াইবে জাহ্নবীর নীরে ;—
বাজিবার যতটুকু বেজেছে বাঁশি রে।

আর বাজিবে না? তবে কেন আছি? কোন সাধে
করিব এ ব্রতের পালন?
কোন্ সাধে?—সাধে নয়—না পালি নিস্তার নাই
কর্ ব্রত ব্রতের-কারণ।
এই কি—এই কি শেষ? স্বপ্নে সুখ—জ্ঞানে ক্লেশ
বাজিবে না যদি, কেন বংশীজন্ম ছার—
বংশি! সে চতুর বড়—বিশ্ব-বংশীকার!!

শ্রীরামলাল বন্দোপাধ্যায়।

ভেক-শক্তি।

শ্রাবণ মাস—প্রাতঃকাল। কয়দিনের পর আজ সূর্য্যঠাকুরকে বাহির হইতে দেখিয়া আকাশ বড়ই প্রফুল্ল হইল, হাসিমুখে আগু-বাড়াইয়া তাঁহাকে বলিল,—"ভাই সূর্য্য! আজ তিন দিন একেবারে ঘরের বাহির হও নাই। তাই কি শুধু তুমি?—চন্দ্র নয়, তারাও নয়। আমার মনটা বড় খারাপ হ'য়ে গেছেল ; আজ তোমায় দেখে বড় সুখী হলুম।"

সূর্য্য। আমরা ছটফটে লোক, ঘরে চুপটী ক'রে ব'সে থাকার ন্যায় কষ্ট আমাদের আর নাই। কি করি, কুইনাইন খেয়ে ধাত খারাপ ক'রে ফেলেছি, বাদলার হাওয়ায় বাহির হ'বার কি যো আছে! আমার যে দশা—চন্দ্র ও তারাদেরও সেই দশা। এবারকার ম্যালেরিয়ায় সকলকেই কুইনাইন খেতে হ'য়েছে।—আচ্ছা, আকাশ! তুমিও ত ভাই কুইনাইন-খেগো লোক; এই টিপ-টিপিনি বৃষ্টি, পূবে হাওয়া; তুমি এতেও বাহির হ'য়েছিলে?

আকাশ। কি কর্‌ব ভাই! আমার চাকরি ত জান; ঝড় নাই, বৃষ্টি নাই, শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, চৌপর দিন, চৌপর রাত হাজির থাকতে হ'বে; তা মরি আর বাঁচি। পেটের দায় চাকরির খাতির; ধাত খারাপ ব'লে আর কি কর্‌ব? তবে, বিশ-পঁচিশ-হারা খুব পুরু পুরু বড় বড় মেঘের চাদরে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে রেখেছিলুম, বাদ্‌লার হাওয়াটা গায়ে বড় লাগ্‌তে পায় নাই, এই যা ক'রেছি।

সূর্য্য। ঠিক্ ব'লেছ ভাই! চাকুরি ত রাখ্‌তেই হবে; তা প্রাণ থাক্ আর যাক্। আমি ত ক'দিন ঘর থেকে বাহির হই নাই, এই ক'দিনের মধ্যে কি কিছু নূতন খবর আছে?

আকাশ। হাঁ; একটা বড় মজার খবর আছে।

সূর্য্য। কি, কি?

আকাশ। বড় বাদ্‌লা আরম্ভ হ'ল। পথ-ঘাট জল-কাদায় পরিপূর্ণ। শুষ্ক তৃণপত্র প'চে স্থানে স্থানে দুর্গন্ধ বাহির হ'তে লাগ্‌ল। স্বচ্ছ জলাশয়ের জলরাশি ঘোলা হ'য়ে উঠ্‌ল। গৃহকর্ম্ম-পরায়ণা গৃহ-সুন্দরীদের চম্পক-কলিকা-কৃতি কমনীয় চরণাঙ্গুলি-রন্ধ্রে স্বেদজ ক্ষত (পাঁকুই) প্রবেশাধিকার লাভ ক'র্‌লে। মহীলতা (কেঁচো), শতপদ (কেন্নু) এবং মশক দংশক প্রভৃতি ঘৃণা ও বিরক্তিজনক কীট পতঙ্গ ঘরের ভিতরে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ ক'র্‌লে। দুই চারিটা কাক গাছের ডালে ব'সে ব'সে ভিজ্‌তে লাগ্‌ল। ভাল পাখীগুলিকে সন্ধান ক'রেও দেখ্‌তে পেলুম না। বড় বড় ভাল ভাল সেকেলে বাড়ীগুলো হুড়মুড় দুড়-দুড় ক'রে প'ড়ে যেতে লাগ্‌ল। এমন বাদলা ভাই! আমি অনেকদিন দেখি নাই। রাত্রি ঘোর অন্ধকার; অন্ধকারে কোলের মানুষ চেনা যায় না। তুমি ত রাত্রিতে কোন দিনই বাহির হও না; চন্দ্র এবং তারারাও সেদিন বাহির হ'তে পারে নাই। এই সুযোগে দু-দশটা জোনাকি গাছের আশে-পাশে ঘুরে ঘুরে আলোর বাহার নিচ্ছিল। ব্যাঙদের বড় আমোদ;—খানা, ডোবা, পুকুর, রাস্তা-ঘাট, সর্ব্বত্রই তাদের অবাধ আধিপত্য। তাদের লম্ফ, ঝম্ফ, দম্ভ, দর্প, চীৎকার, কোলাহল দেখে কে? যে-ই একটী ব্যাঙ একটু কোঁ করেছে, অমনি শত শত, সহস্র সহস্র ব্যাঙের—তার সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে যে কি চীৎকার, তা আর কি বল্‌ব!

"দর্দ্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্।"

যেখানে দর্দ্দুরের অর্থাৎ ব্যাঙের কোলাহল, সেখানে চুপ ক'রে থাকাই ভাল; এ নীতির অনুসরণ সবাই কচ্ছিল।

ভরতপুরে কোকিলের কুহুরব সতত শুনা যাইত, ভরতপুরের লোকেরাও কুহুরব বড় ভালবাসিত। বর্ষা-বাদলে কোকিলেরা কোথায়, তাহার ঠিকানা নাই। সদা সর্ব্বদা ব্যাঙের ডাক শুনে শুনে আর বাদলার পেচ্-পেচানিতে সাধারণ লোকেও কেমন হতভম্ব হ'য়ে গেছে। কুহুরবের আশা তারা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে।

কয়েক ঘর ব্রাহ্মণের বাড়ী পোষা-কোকিল আছে। তারাও কিন্তু বর্ষায় নীরব। যে

যে রাত্রের কথা তোমাকে বল্‌ছিলাম, সেই রাত্রে—সেই অন্ধকার, বাদলা, বৃষ্টি ও ব্যাঙের চীৎকারের সময়ে তাঁদেরই এক ব্রাহ্মণ, হাতে আলো ল'য়ে পায়খানার দিকে যাচ্ছিলেন, পিঞ্জরের কোকিল চোখের কাছে আলো দেখে দু'একবার 'কুহু কুহু' ক'রে উঠ্‌ল।

পাশের পানা-পুকুরে ব্যাঙের দল, ঘোরতর কোলাহল কচ্ছিল, কোকিলের শব্দ কোন রকমে তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ কর্‌বা মাত্র তারা প্রমাদ মনে কল্লে।

"কোকিলের রব লোকে শুন্‌তে পেলে আমাদের ডাকে বড়ই বিরক্ত হবে, বেশী বিরক্ত কল্লে হয় ত আমাদের মেরে ফেল্‌বার চেষ্টা কর্‌বে" এই সব ভেবে-চিন্তে ব্যাঙের দল বড় ভীত হ'ল। এমন সময় নর্দ্দামার একটা প্রকাণ্ড ব্যাঙ,—তারও এ সব ভাবনা ও ভয় যথেষ্ট হ'য়েছিল,—পুকুরের ব্যাঙেদের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে পরামর্শ স্থির কল্লে, "আমাদের যেন চীৎকার-নিবৃত্তি না হয়, বরং মানুষেরা যাতে কোকিলের রব কখন শুন্‌তে না পায়, এমনতর গোলযোগ আমাদের কর্ত্তে হ'বে।"

সর্ব্বভেক-মণ্ডলীতেই সমাচার পাঠান্ হ'ল। অনেকেই আনন্দে কোলাহল ক'র্ত্তে লাগ্‌ল। বর্ষাবাদল যে চিরস্থায়ী নহে, এটা তারা একবারও ভাব্‌লে না।

আমি কাণ্ড দেখে একা হাস্‌ব কত!

সূর্য্য। কিন্তু বেশ বেশ! ভাই আকাশ! ব্যাঙেরা ত সামান্য জন্তু, কতটুকুই বা ওদের বুদ্ধি! ওদের কাণ্ড দেখে আর হাস্‌বে কি!

ভূতলচারী ব্যাঙের থু-থু উচ্চ বৃক্ষপত্রে অবস্থিত এই ব্যাপারে বিজ্ঞান শক্তির প্রবলতা এবং 'ব্যাঙের ছাতার' শিল্প-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখে বিস্ময়-বিমুগ্ধচিত্তে অনেক মনুষ্য-সন্তানেরা যে ব্যাঙ হ'বার জন্য বিশেষ চেষ্টা কচ্চে, অনেকে ভেকরূপে সজ্জিতও হ'য়েচে, এ বৃত্তান্ত কি তুমি ভুলে গেছ!

হাস্‌তে হয়, সে-ই মানুষের ছেলেদের কাণ্ড দেখে হাস, ব্যাঙ ত বাপের ঠাকুর!

আকাশ। হাঁ, হাঁ। বর্ষাকাল পড়্‌বার পরে, আমিই ত একদিন এ সংবাদ তোমাকে দেই। আমি কি স্মৃতিশক্তিহীন!

সূর্য্য। বিশেষতঃ আমরাই যখন কুইনাইন সেবন ক'রেছি, বাদলাকে বাঘের ন্যায় ভয় কচ্ছি, তখন পরের কথা ল'য়ে আর হাস্‌ব কি? ভাই! চোখের জল যে রাখা যায় না।

আকাশ। তা ঠিক ব'লেছ।

তার পর সব নীরব হইল। আমি অনেকক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিলাম, কিন্তু আর কাহারও কোন কথা শুনিতে পাইলাম না।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

সিম্বেলিন্।

(১)

রোমের সম্রাট আগষ্টস্ সিজারের অধিকার কালে, সিম্বেলিন্ নামে ইংলণ্ডে এক রাজা ছিলেন। ইংলণ্ডের তৎকালীন নাম ছিল,—ব্রিটেন্। রাজা সিম্বেলিনের প্রথমা মহিষী, অপোগণ্ড দুই পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গতাসু হন। কন্যার নাম ছিল—ইমোজেন্। ইমোজেন্ পিত্রালয়েই প্রতিপালিত হইতে লাগিল। কিন্তু রাজপুত্রদ্বয় জননীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে অভাবনীয়রূপে অপহৃত হইল। তখন তাহাদের একটির বয়স তিন বৎসর, অন্যটি আর্ত্ত শিশু। বলা বাহুল্য, রাজা, পুত্রদ্বয়ের অনুসন্ধানার্থ বিস্তর চেষ্টা করিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। —কে, কোন্ উদ্দেশ্যে, কোথায় তাহাদিগকে

লইয়া গেল এবং কি দশা করিল, দুর্ভাগ্য সিম্বেলিন্ তাহার কোন কারণ অবধারণ করিতে পারিলেন না।

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে, রাজা পুনরায় দার পরিগ্রহ করিলেন। দ্বিতীয় পক্ষের এই মহিষীটি অতি খল-স্বভাবা। সুতরাং সে অচিরাৎ তাহার স্বভাবানুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল ;—সপত্নীতনয়া ইমোজেনের সহিত, নিষ্ঠুর বিমাতার ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল।

---

(২)

সিম্বেলিন্-মহিষী, সপত্নী-তনয়া ইমোজেন্‌কে বিরূপ-নয়নে দেখিত বটে, কিন্তু কিছুদিন পরে সেই দুষ্টার মনে আর এক অভিলাষ জন্মিল। সে অভিলাষে, আত্মস্বার্থ সিদ্ধি হইবে বিবেচনায়, এখন হইতে সে, ইমোজেন্‌কে মৌখিক ভালবাসা দেখাইতে লাগিল। রাজা সিম্বেলিনের এই দ্বিতীয়া মহিষী, ইতিপূর্ব্বে আর একবার বিবাহ করিয়াছিল। সেই পূর্ব্ব-স্বামীর ঔরসজাত একটি পুত্রও ছিল। সে পুত্রের নাম ক্লোটেন্। সিম্বেলিন্-মহিষী মনে করিল, ক্লোটেনের সহিত ইমোজেনের বিবাহ দিয়া সপত্নী-কণ্টক দূর করিবে। অর্থাৎ রাজার দুই পুত্র যখন নিরুদ্দেশ, তখন রাজার অবর্ত্তমানে ইমোজেন্‌ই পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী ; এমত অবস্থায় আপন পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দেওয়াইতে পারিলে, সেই পুত্র ক্লোটেন্‌ই, ব্রিটেনের ভাবী রাজা হইতে পারিবে। কিন্তু তাহার সেই বড়-সাধে বাদ পড়িল।—ইমোজেন্, পিতা ও বিমাতার অগোচরে, সর্ব্ব-চক্ষু-অন্তরালে, আর এক ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিলেন।

---

(৩)

রাজকুমারী ইমোজেন্ যাঁহাকে বিবাহ করিলেন, তাঁহার নাম—পস্থিউমাস্। পস্থিউমাস্ শব্দের অর্থ, যে শিশু গর্ভে অবস্থিতি কালীন তাহার জনকের মৃত্যু হয়। পস্থিউমাস্ যৎকালে গর্ভাবস্থায় ছিলেন, তাঁহার পিতা, ব্রিটেন্-রাজ সিম্বেলিনের পক্ষ-সমর্থন করিয়া কোন যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। এবং ঐ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র তদীয় জননীও স্বামি-শোকে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করেন। সিম্বেলিন্, শিশুর পিতার রাজভক্তি স্মরণ করিয়া এবং পিতৃ-মাতৃহীন এই অনাথ বালককে দয়া করিয়া আপন আশ্রয়ে রাখিলেন এবং তিনিই তাহার নাম রাখিলেন,—পস্থিউমাস্।

পস্থিউমাস্ রাজ ভবনে থাকিয়া বিশিষ্টরূপ বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজনন্দিনী ইমোজেন্ ও পস্থিউমাস্ একই শিক্ষকের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতেন এবং অতি শৈশবকাল হইতেই পরস্পর পরস্পরের খেলার দোসর হইয়াছিলেন। তখন হইতেই পরস্পরের মনে অনুরাগ জন্মিতেছিল। কাল সহকারে তাহা বর্দ্ধিত হইয়া পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিল। পস্থিউমাস্ সে সময়ে সেখানকার একজন বিশিষ্ট শিক্ষিত ও ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য হইলেন। যথাসময়ে গোপনে ইমোজেন্ ও পস্থিউমাসের বিবাহ সম্পন্ন হইল।

রাণী, আশায় নিরাশ হইলেন। তিনি অচিরে তাঁহাদের বিবাহ বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন। ইমোজেন্ কখন্ কি করে, কি ভাবে, এই সকল জানিবার জন্য নিয়তই রাণীর চর ঘুরিত। তাহারাই এই বিবাহ-রহস্য রাণীর কর্ণগোচর করে। তখন রাণী, রাজার নিকট তাঁহার কন্যার সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন।

রাজার ক্রোধের অবধি রহিল না।

তাঁহার কন্যা হইয়া উচ্চবংশমর্য্যাদার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, একজন সাধারণ প্রজাকে বিবাহ করিয়াছে;—দুঃখ ও অপমানে তিনি অধীর হইলেন। তখনই তিনি পস্থিউমাস্‌কে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিয়া চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসন-দণ্ড প্রদান করিলেন।

পস্থিউমাস্ রোম নগরে জীবনযাপন করিবেন, এইরূপ স্থির করিলেন। তাঁহার বিদায়কালে রাণী যেন দয়া ও স্নেহবশতই স্বামীর সহিত শেষ-সাক্ষাতের জন্য ইমোজেন্‌কে অনুমতি দিলেন। বিমাতার এই দয়ার মূলে কিছু স্বার্থ ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, পস্থিউমাস্ দেশত্যাগ করিয়া যাইলে, তখন আপন অভীষ্ট সিদ্ধির পথ পরিষ্কার করিতে পারিবেন। তখন ইমোজেন্‌কে এই বলিয়া বাধ্য করিতে পারিবেন যে, রাজার অগোচরে ও অসম্মতিতে যে বিবাহ হইয়াছে, তাহা বিবাহই নয়। সুতরাং ইমোজেন্ পুনর্ব্বার অন্য ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিতে পারে।

বিদায়কালে পস্থিউমাস্ ও ইমোজেন্,—পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল। উভয়েই উভয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। ইমোজেনের আপন-মায়ের একটী অঙ্গুরীয়ক ছিল, তিনি তাহা পস্থিউমাস্‌কে স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ প্রদান করিলেন। পস্থিউমাস্ প্রতিশ্রুত হইলেন, তিনি জীবনে সে অঙ্গুরীয়ক পরিত্যাগ করিবেন না। তারপর তিনিও একগাছি কঙ্কণ লইয়া প্রণয়চিহ্ন-স্বরূপ প্রিয়তমার হস্তে বন্ধন করিয়া দিলেন। তারপর পরস্পরের প্রতি চিরদিনের বিশ্বাস ও ভালবাসা যেন তেমনই বদ্ধমূল থাকে, বারবার এই সত্য করিয়া পরস্পরে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

---

(৪)

স্বামি-নির্ব্বাসনে ব্যথিত-হৃদয়া ইমোজেন্, মনের দুঃখে কাল কাটাইতে লাগিলেন। পস্থিউমাস্‌ও রোমনগরে পঁহুছিলেন।

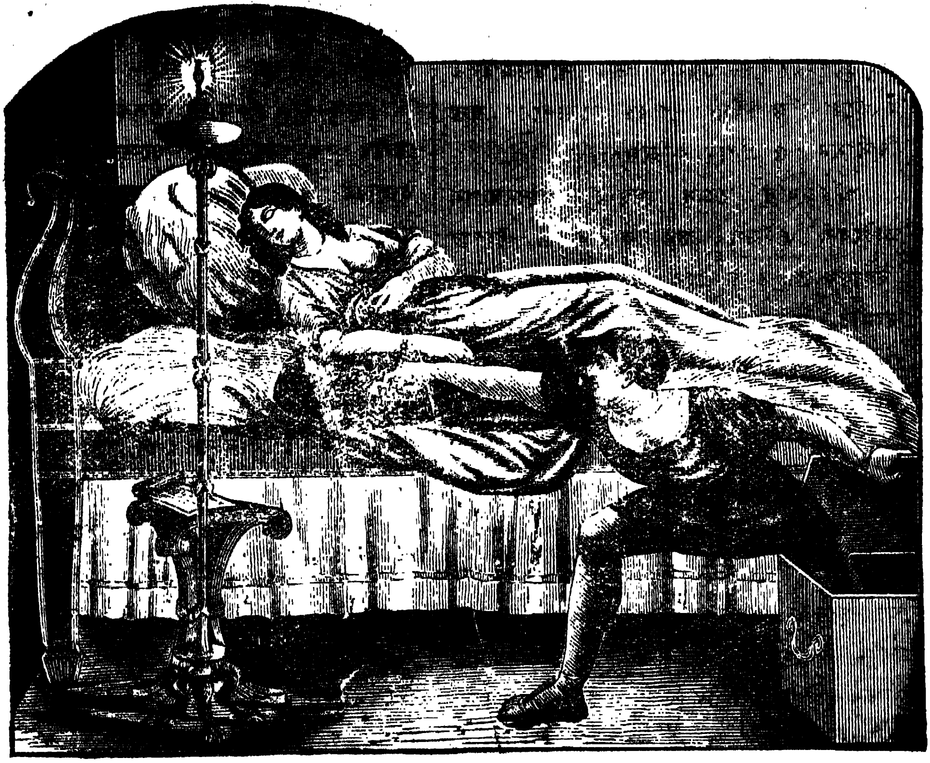
রোমনগরে একস্থানে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় যুবক বাস করিতেছিলেন। পস্থিউমাস্ তাহারই একজন হইলেন। একদিন সেই সকল যুবক আপন আপন দেশের এবং আপন আপন পত্নীর গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। অবশ্য, প্রত্যেকেই আপন পত্নীকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়াছিলেন। পস্থিউমাসের হৃদয়ে তাঁহার প্রিয়তমার মোহিনী-মূর্ত্তি দিবানিশি জাগিতেছিল। তিনি বলিলেন, "আমার পত্নীর তুল্য রূপবতী, গুণবতী, বুদ্ধিমতী ও পতিপরায়ণা এ জগতে আর কাহারও পত্নী নাই।"

সেই সকল যুবকের মধ্যে এক ব্যক্তি পস্থিউমাসের বাক্যে কিছু অসন্তোষ প্রকাশ করিল। তাহার নাম ইয়াকিমো। রোমনগরের কোন মহিলা অপেক্ষা ব্রিটেনের কোন মহিলা যে, প্রশংসনীয়া হইবে, ইহা সম্ভবপর নহে; অন্ততঃ, ইয়াকিমো তাহা ভালবাসে না। বলিল, "পস্থিউমাস্, তুমি যেরূপ বলিতেছ, তাহাতে আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। কিছু মনে করিও না, তোমার স্ত্রীর সতীত্বে আমি ততদূর আস্থা করিতে পারি না।"

উভয়ের মধ্যে অনেক বাদ-প্রতিবাদ হইল। ইয়াকিমো পুনরায় বলিল, "তোমার বিশ্বাস না হয়, যদি আমায় সে সুবিধা দাও, তবে আমি দেখাইতে পারি, তোমার সেই পতিপরায়ণা সাধ্বী-স্ত্রীও আমার প্রতি অনুরাগিণী হইতে পারেন।"

পস্থিউমাস্ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; কিন্তু এইরূপ একটা প্রতিজ্ঞা ধার্য্য হইল যে, যদি ইয়াকিমো তাহার কথামত কার্য্য করিতে

নিদ্রিতা-ইমোজেন্ ও চোর-ইয়াকিমো।



না পারে, তবে দণ্ড-স্বরূপ প্রচুর মুদ্রা পস্থিউমাস্‌কে দিবে। কিন্তু যদি সে কৃতকার্য্য হয়, যদি সে, সেই রমণীর প্রণয়লাভ করিয়া, পস্থিউমাস্ প্রদত্ত সেই অকৃত্রিম প্রণয়-নিদর্শন,—ইমোজেনের করস্থিত সেই কঙ্কণ লইয়া আসিতে পারে, তাহা হইলে ইমোজেন্-প্রদত্ত সেই অঙ্গুরীয়ক পস্থিউমাস্ ইয়াকিমোকে প্রদান করিবেন। ইমোজেনের প্রতি পস্থিউমাসের অচল ও সুদৃঢ় বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের বলেই পত্নীর সতীত্বের পরীক্ষা গ্রহণ করিতে তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না

ইয়াকিমো ব্রিটেনে উপস্থিত হইল এবং পস্থিউমাসের বন্ধু বলিয়া ইমোজেন্‌কে পরিচয় দিল। স্বামীর বন্ধু জানিয়া ইমোজেন্ তাহাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু দুষ্ট-স্বভাব ইয়াকিমো যখন ইমোজেনের প্রতি আপনার প্রণয়ানুরাগ জানাইতে লাগিল, সাধ্বী ইমোজেন্ ঘৃণায় মুখ ফিরাইলেন। ইয়াকিমো যখন বুঝিল, তাহার পাপ-অভিসন্ধি সফল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তখন অগত্যা প্রতারণা দ্বারা অভীষ্ট-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল।

---

(৫)

বিশেষ কোন উপায় ঠিক করিতে না পারিয়া, ইমোজেনের কতকগুলি সহচরীকে ইয়াকিমো হাত করিল। তাহাদিগকে কিছু উৎকোচ প্রদান করিল।

ইয়াকিমোর প্রার্থনা এই যে, ইমোজেনের পরিচারিকারা কোনপ্রকারে তাহাকে রাজকুমারীর শয়ন-গৃহে এক রাত্রি থাকিতে দেয়।

অর্থলোভে তাহারা সেই প্রকার কার্য্য করিতে স্বীকার করিল এবং একদিন একটা পেট্‌রার মধ্যে ইয়াকিমোকে আবদ্ধ করিয়া গোপনে প্রভু-কন্যা ইমোজেনের শয়ন গৃহে রাখিয়া আসিল।

ইমোজেন্‌ যে পর্য্যন্ত না নিদ্রিত হইলেন, ইয়াকিমো সেই পেট্‌রার মধ্যে তদবস্থায় থাকিল। যখন দেখিল, ইমোজেন্‌ নিদ্রিতা, সে পেট্‌রা হইতে বহির্গত হইয়া, বিশেষ মনোযোগের সহিত শয়ন-গৃহের সকল দ্রব্য দেখিতে লাগিল। যাহা দেখিতে লাগিল, তাহাই এক খণ্ড কাগজে লিখিয়া লইল। ইমোজেনের কণ্ঠদেশে একটী আঁচিল ছিল। বিশেষ করিয়া তাহাও দেখিল এবং তাহার পর ধীরে ধীরে ইমোজেনের করস্থিত সেই কঙ্কণ খুলিয়া লইল।

এইরূপে স্বীয় অভীষ্ট সাধন করিয়া সেই পরিচারিকাগণের সাহায্যে দুষ্টবুদ্ধি ইয়াকিমো বাহির হইয়া আসিল এবং আনন্দের সহিত রোমনগরে যাত্রা করিল।

---

(৬)

পশ্থিউমাসের সহিত যখন ইয়াকিমোর সাক্ষাৎ হইল, পরস্পরে এইরূপ কথা-বার্ত্তা চলিতে লাগিল ;—

ইয়াকিমো। দেখ পশ্থিউমাস্‌, যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা ঠিক কিনা? এই দেখ, তোমার পত্নীর হস্তস্থিত তোমারই সেই প্রণয়-নিদর্শন—সেই কঙ্কণ আমি পাইয়াছি। এবং কেবল ইহাই নহে, তিনি তাঁহার শয়ন গৃহে এক রাত্রি আমাকে অতিবাহিত করিতেও দিয়াছিলেন। যদি প্রমাণ চাও, তবে শোন। দেখিয়াছি, ইমোজেনের শয়নগৃহ বিচিত্র কারুকার্য্যে শোভিত। একখানি অপূর্ব্ব চিত্রপটও দেখিলাম ;—যখন অভিমানিনী ক্লিওপেট্রা এ্যান্‌টনিওর সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন, চিত্রে তাহাই অঙ্কিত।—সেই চিত্রখানি দেখিলাম, সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর এবং তাহাতে যথেষ্ট শিল্প-নৈপুণ্য প্রকাশ পাইতেছে।

পশ্থিউমাস্‌। যাহা বলিলে, তাহা সত্য। কিন্তু তুমি যে সেই ঘরে গিয়াছিলে, ইহার প্রমাণ কি? অন্যের নিকট ইহা শুনিতে পার?

ইয়াকিমো। তবে আর একটা বলি। দেখিয়াছি, সেই শয়ন-গৃহের দক্ষিণে অগ্নি-নির্গমের জন্য একটা 'চিম্‌নি' আছে। সেই চিম্‌নির উপর দেবী ডিয়ানার একটী সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ পাইতেছে। তেমন সুন্দর মূর্ত্তি আর কোথাও দেখি নাই।

পশ্থিউমাস্‌। ইহাও সত্য। কিন্তু ইহাও তুমি লোক-মুখে শুনিয়া থাকিবে। কেন না, এ কথা সকলেই জানে।

ইয়াকিমো। আচ্ছা, তবে আর একটা বলি। সেই গৃহের ছাদ অতি সুন্দর। দেখিলাম, দুইটী লৌহ-দণ্ডে দুইটী অর্দ্ধ-নিমীলিত-নেত্র কামদেবের প্রতিমূর্ত্তি ;—পায়ের উপর পা দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

তারপর অপহৃত সেই অলঙ্কার বাহির করিয়া বলিল, "পশ্থিউমাস্‌, বেশী কথায় কাজ নাই, এই অলঙ্কারটী চিনিতে পার? ইমোজেন্‌ ইহা আমাকে দিয়াছেন। আমি যেন এখনও তাঁহার সেই হাসি-হাসি মুখখানি দেখিতেছি। তাঁহার ব্যবহারে আমি বিশেষ সুখী হইয়াছি। যখন এই অলঙ্কার তিনি আমাকে দেন, তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, ইহা তিনি অতি মূল্যবান্‌ বিবেচনা করিতেন। হাঁ, ভাল কথা,—আমি তাঁহার গ্রীবাদেশে একটী আঁচিলও দেখিয়াছি।"

পশ্থিউমাস্‌ দুষ্টের প্রতারণা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সকলই সত্য বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। তখন ক্ষোভে, দুঃখে, ক্রোধে,

অভিমানে, ইমোজেনের উদ্দেশে অনেক তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কষ্টের আর পরিসীমা রহিল না। পূর্ব্ব অঙ্গীকার-মত এখন তিনি ইমোজেন্-প্রদত্ত সেই অঙ্গুরীয়ক ইয়াকিমোকে প্রদান করিলেন।

পস্থিউমাস বিক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ-হৃদয়ে পিসানিওকে এক পত্র লিখিলেন। পিসানিও একজন ব্রিটেন্-বাসী, পস্থিউমাসের একজন বিশিষ্ট-বন্ধু এবং ইমোজেনের এক প্রকার অনুচর-বিশেষ। পস্থিউমাস্ তাঁহাকে লিখিলেন, "ইমোজেন্ অসতী; তাহার প্রতি আমার আর কিছুমাত্র বিশ্বাস বা স্নেহ-মমতা নাই। তুমি তাহাকে মিলফোর্ড বন্দরে আনিয়া মারিয়া ফেলিও;—আমি সে কৌশল করিয়াও দিতেছি।"

এদিকে ইমোজেন্‌কেও তিনি এক পত্র লিখিলেন। প্রকৃত ব্যাপার কিছু জানিতে না দিয়া স্নেহের ভাণ দেখাইয়া লিখিলেন, "প্রিয়তমে! আমি তোমাকে দেখিবার জন্য নিতান্তই ব্যাকুল হইয়াছি। ব্রিটেনে যাইবার আমার আর অধিকার নাই। সেখানে যাইলেই আমার প্রাণদণ্ড হইবে। অতএব তুমি একবার আসিয়া দেখা করিও। আমার বিশ্বস্ত বন্ধু পিসানিও, তোমাকে লইয়া মিল্‌ফোর্ড বন্দরে আসিবেন; সেখানে আমাদের সকল কথা হইবে।"

সরল-হৃদয়া, পতি-পরায়ণা ইমোজেন্ তাহাই বিশ্বাস করিলেন। পত্রপাঠ পিসানিও-সমভিব্যাহারে স্বামীর উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

---

(৭)

লক্ষ্যস্থানে পঁহুছিবার কিছু পূর্ব্বে ইমোজেনের নিকট তাঁহার স্বামীর নিষ্ঠুর আদেশ পিসানিও জ্ঞাপন করিলেন। পিসানিও পস্থিউমাসের অকৃত্রিম সুহৃদ্ বটে, কিন্তু এরূপ নিষ্ঠুর আদেশ পালন করিতে তিনি সক্ষম হইলেন না। তাই সকল কথা ব্যক্ত করিলেন্। অধিকন্তু পস্থিউমাসের পত্রখানি দিলেন।

ইমোজেন্ স্বামি সন্দর্শনের নিমিত্ত বড় আশা করিয়াই আসিয়াছিলেন। কিন্তু এখন বুঝিলেন, সেই স্বামী তাঁহার বিনাশ সাধনের জন্য এইরূপ প্রতারণা করিয়াছেন। সতীর সে দুঃখ-কষ্ট বর্ণনাতীত।

পিসানিও অনেক সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। বলিলেন, "ভদ্রে, কিছুদিন ধৈর্য্য ধরিয়া থাকুন, এদিন থাকিবে না। একদিন নিশ্চয়ই আপনার স্বামী আপনার ভ্রম বুঝিবেন এবং তাঁহার এই আচরণের নিমিত্ত অনুতপ্ত হইবেন। এখন চলুন, আপনার পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাই।"

ইমোজেন্ পিতৃগৃহে ফিরিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন পিসানিও পরামর্শ দিলেন, "তবে আপনি এক কাজ করুন। পুরুষের পরিচ্ছদ পরিয়া দেশ পর্য্যটন করিয়া বেড়ান। পুরুষ-পরিচ্ছদে আপনি নিরাপদ থাকিতে পারিবেন।"

ইমোজেন্ তাহাতে সম্মত হইলেন। ভাবিলেন, "এইরূপ ছদ্মবেশে রোম নগরে স্বামি-সকাশে যাইব। যদিও তিনি এতদূর নিষ্ঠুর হইয়াছেন, যদিও তিনি আমাকে ভুলিতে পারিয়াছেন, আমি তাঁহাকে ভুলিতে পারি নাই, পারিবও না।"

পিসানিও পরিচ্ছদ আনিয়া দিয়া ইমোজেন্‌কে তদবস্থায় ফেলিয়া রাজ-ভবনে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন এবং বিদায়কালে একটী ক্ষুদ্র পাত্রস্থিত এক প্রকার ঔষধ ইমোজেনের হস্তে দিয়া কহিলেন, "আমি এই ঔষধ রাণীর নিকট পাইয়াছিলাম। শুনিয়াছি, ইহাতে সকল রকম রোগের প্রতিকার হয়।"

পিসানিও, ইমোজেন্ ও পস্থিউমাস্‌কে ভাল বাসিতেন। রাণীর তাহাতে অত্যন্ত ঘৃণা ও

পিসানিও ও নির্ব্বাসিতা-ইমোজেন্।



অশ্রদ্ধা। সেই ঘৃণার বশবর্ত্তী হইয়াই রাণী এই ঔষধ পিসানিওকে দিয়াছিলেন। রাণী জানিতেন, ইহা এক প্রকার বিষ। তিনি ইহা এক বৈদ্যের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, 'বিষের প্রভাব কি প্রকার, তাহা আমি একটা পশুকে দিয়া পরীক্ষা করিব।' সে বৈদ্য, রাণীর প্রকৃতি অবগত ছিলেন। তাই তিনি প্রকৃত হলাহল না দিয়া এমন-এক প্রকার ঔষধ দিয়াছিলেন যে, তাহাতে সেবনকারীর জীবনের কোন অনিষ্ট না করিয়া, সেবন মাত্র তাহাকে কিছুক্ষণের জন্ত মৃতবৎ অচৈতন্ত করিয়া রাখিবে। পিসানিও এ সকল কিছুই জানিতেন না। রাণী যেরূপ বলিয়া ছিলেন, তাহাই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। তিনি ইমোজেন্‌কে বলিলেন, "পথশ্রমে যখন বড় কাতর হইবেন, এই ঔষধ সেবন করিবেন; ইহাতে শ্রান্তি দূর হইবে।"

তার পর ইমোজেন্‌কে আশীর্ব্বাদাদি করিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

---

(৮)

ঘটনাচক্র অন্যদিকে ফিরিল। ইমোজেন্ সেই পুরুষ-পরিচ্ছদে ঘুরিতে ঘুরিতে এক নির্জ্জন প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে তাঁহার দুই সহোদর বাস করিতেছিলেন। এই বালক-দ্বয় অতি শৈশবেই অপহৃত হইয়াছিল; সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। ব্রিটেন্-রাজ সিম্বেলিনের সভায় বেলেরিয়াস্ নামক একজন উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি রাজদ্রোহী বলিয়া, মিথ্যা অভিযোগে রাজার দুর্জ্জয় ক্রোধের ভাজন হন এবং রাজা তাঁহাকে নির্ব্বাসন-দণ্ড প্রদান করেন। বেলেরিয়াস্ প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইয়া রাজার শিশু-তনয় দুইটিকে অপহরণ করিয়া, এই নির্জ্জন

বনপ্রদেশে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং তথায় এক গহ্বর খনন করিয়া পুত্র-নির্ব্বিশেষে রাজ-কুমার-দ্বয়কে প্রতিপালন করিতেছিলেন। তাহাদের প্রতি বস্তুতঃ কোন নিষ্ঠুর-ব্যবহার করেন নাই; অধিকন্তু বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন এবং আপন প্রাণাপেক্ষা তাহাদিগকে ভালবাসিতেন।

রাজকুমার দুটি সাহসী ও তেজস্বী হইয়া উঠিল। জন্তু-শিকার ও ক্রীড়া-কৌতুকে তাহারা সুদক্ষ ও পরিশ্রমী হইল। এবং তাহাদের পিতাকে (বেলেরিয়াস্‌কেই তাহারা পিতা বলিয়া জানিত) বার বার উত্তেজনা করিত যে, কোন প্রকার যুদ্ধে তাহাদিগকে প্রেরণ করিলে, তাহারা সৌভাগ্য সঞ্চয় করিতে যত্নবান্‌ হইবে।

সেই নির্জ্জন অরণ্য প্রদেশে ইমোজেন্‌ উপস্থিত হইলেন। রোমে যাত্রা করিবার মানসে মিলফোর্ড বন্দরে যাইতে যাইতে এই অরণ্য মধ্যে তিনি পথ হারাইয়া ফেলেন। তথায় কোন প্রকার খাদ্যাদি না পাইয়া একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়েন। পুরুষের পরিচ্ছদ মাত্র তাঁহার পরিধান ছিল; কিন্তু নারীজনোচিত সেই কোমল হৃদয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণার সে যন্ত্রণা সহ্য হইবে কেন? তিনি সেই নির্জ্জন বন-প্রদেশে সেই গহ্বর দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মনে ভাবিলেন, "ইহার মধ্যে কেহ-না-কেহ আছে। ভিক্ষা করিয়াও তাঁহার নিকট হইতে কিছু পাইব।" কিন্তু তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কেহই নাই। গহ্বর জনশূন্য; কিন্তু মনুষ্যের আস্বাদ-উপযোগী অনেক খাদ্য-সামগ্রী ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। ক্ষুধায় তিনি এক প্রকার মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতে না পারিয়া, সেই খাদ্য-সামগ্রী আহার করিতে বসিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, "মনুষ্য-জীবন কি কষ্টকর! আমি কতই শ্রান্ত! ক্রমাগত দুই রাত্রি ভূমিতল আমার শয্যা হইয়াছে। স্বামীর সহিত দেখা করিব, সেই আশায় এখনও হৃদয়ে বল আছে, নতুবা বুঝি প্রাণ হারাইতাম। সেই পর্ব্বত-শিখর হইতে যখন পিসানিও মিলফোর্ড-বন্দরের পথ দেখাইলেন, তখন কত নিকটই বোধ হইয়াছিল।"

তারপর স্মরণ হইল, তাঁহার স্বামী তাঁহার প্রাণবধের আদেশ করিয়াছিলেন। তখন বলিলেন, "হায় প্রিয়তম, কি নিষ্ঠুর তোমার হৃদয়!"

---

(৯)

যৎকালে সেই গহ্বরমধ্যে ইমোজেন্‌ আপনা-আপনি এইরূপ আক্ষেপ করিতে-ছিলেন, সেই সময় তাঁহার দুই সহোদর বেলেরিয়াসের সহিত শিকার হইতে ফিরিয়া আসিলেন। বেলেরিয়াস্‌ তাঁহাদিগের নাম রাখিয়াছিলেন, পলিডোর এবং কডল্‌। কিন্তু তাঁহাদিগের প্রকৃত নাম ছিল—গাইডেরিয়াস্‌ ও আর্ব্বিরাগাস্‌। বেলারিয়াস্‌ প্রথমে সেই গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তন্মধ্যে ইমোজেন্‌কে দেখিতে পাইয়া সবিস্ময়ে কুমার-দ্বয়কে বলিলেন, "ভিতরে আসিও না; বাহিরে কিঞ্চিৎকাল বিলম্ব কর। দেখিতেছি, ভিতরে কে-একজন আসিয়াছে এবং দেখিতেছি, আমাদেরই খাদ্য খাইতেছে। নহিলে বুঝিতাম, নিশ্চয়ই এ কোন পরী হইবে!"

কুমারদ্বয় উত্তর করিল, "আপনি কি বলিতেছেন! ইহা কি সত্য?"

বেলারিয়াস্‌। ঈশ্বরের শপথ, সত্য। দেখিতেছি, নিশ্চয়ই কোন দেবতা। কিন্তু যদি মানুষ হয়, তবে পৃথিবীর মধ্যে এ রূপের তুলনা নাই।"

বস্তুতই সে সময় সেই পুরুষের পরিচ্ছদে,

স্বভাব সুন্দরী ইমোজেন্‌কে এত সুন্দর দেখিতে হইয়াছিল! ইমোজেন্ যখন শুনিতে পাইলেন, গহ্বরের ভিতর মনুষ্যের শব্দ হইতেছে, তখন কিছু ভীত হইয়া বলিলেন, "আপনারা যেই হউন, আমার প্রতি কোন অনিষ্ট করিবেন না। আমি এই গহ্বরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম, এই খাদ্যগুলি হয় আপনাদিগের নিকট চাহিয়া লইব, নয় উচিত মূল্যে কিনিয়া লইব। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া ক্ষুধার-জ্বালায় এই সকল খাইয়া ফেলিয়াছি। আমি কিছুই অপহরণ করি নাই। যদি এই গহ্বরের চারিদিকে স্বর্ণ-রৌপ্যাদি পড়িয়া থাকিত, তাহাও লইতাম না। যে খাদ্য ভক্ষণ করিয়াছি, তাহার মূল্য গ্রহণ করুন। যদি আপনাদিগকে দেখা না পাইতাম, মূল্য এইখানে রাখিয়া যাইতাম, এবং যাইবার সময় আপনাদিগের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া যাইতাম।"

তাঁহারা মূল্য লইলেন না। ভীতা ইমোজেন্ করুণ-কণ্ঠে বলিলেন, "তবে বোধ করি, আপনারা আমার উপর রাগ করিয়াছেন। যদি আপনারা বিনা অপরাধে আমাকে বধ করেন, তবে বুঝিব, আমার বাড়া দুঃখী পৃথিবীতে আর নাই!"

বেলেরিয়াস্। তুমি কোথায় যাইবে? তোমার নাম কি?

ইমোজেন্ প্রকৃত নাম গোপন করিয়া বলিলেন, "আমার নাম ফাইডিলি। আমার একজন আত্মীয় ইটালী যাইতেছেন। তিনি মিলফোর্ড বন্দরে জাহাজে আরোহণ করিবেন। আমি তাঁহার নিকট যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে ক্ষুধায় কাতর হইয়া এই খানে আসিয়াছি এবং আপনাদের নিকট এই অপরাধ করিয়াছি।"

বেলেরিয়াস্। যুবক! তোমার কোন ভয় নাই। আমাদিগকে হীন-প্রকৃতি বা নীচাত্মা ভাবিও না। কিংবা এই সামান্য স্থানে থাকি বলিয়া আমাদিগকে লঘুচেতা বলিয়া বিবেচনা করিও না। সৌভাগ্যক্রমে, তুমি এখানে আসিয়াছ; তোমার প্রতি যত্নের কোন ত্রুটী হইবে না। তুমি এই খানেই থাক।

পরে বালকদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পলিডোর, কডল্! তোমরা ইঁহার যথাবিধি অভ্যর্থনা কর।"

(১০)

বলা বাহুল্য, ভ্রাতৃদ্বয় আপন ভগিনীকে চিনিতে পারিল না; ভগিনীও তাহাদিগকে চিনিল না। কেহ কাহাকে চিনিতে না পারিলেও, সেই অতি অল্প সময়ে পরস্পরের মধ্যে একটা স্নেহের ভাব প্রকাশিত হইল।

বালকদ্বয় বলিল, "তুমি আমাদেরই কাছে থাক, আমরা তোমাকে আপন ভায়ের-মত দেখিব এবং সেইরূপ স্নেহ করিব।"

সেই স্নেহপূর্ণ কথায়, ইমোজেনের হৃদয় শান্ত হইল। তখন সকলে মিলিয়া সাহ্লাদে, সেই গহ্বর মধ্যে শিকারের মাংস লইয়া রন্ধনের উদ্যোগ করিলেন। ইমোজেন্ রন্ধনের ভার গ্রহণ করিলেন এবং এমন সুস্বাদু করিয়া পাক করিলেন, যাহা আহার করিয়া সকলের বিশেষ তৃপ্তিদায়ক হইল। আজ কাল ধনিগৃহে স্ত্রীলোকের রন্ধন-কার্য্য এক প্রকার নীচ কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত; কিন্তু সে সময় এরূপ ছিল না। যখন কুমারদ্বয় রন্ধনের প্রশংসা করিতেছিল, আর্ত্তের পার্শ্বে স্নেহময়ীর শুশ্রূষার ন্যায় ইমোজেন্ তাহাদিগের পার্শ্বে বসিয়া খাদ্যের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। অনন্তর ইমোজেনের সঙ্গীত শুনিয়া পলিডোর তাহার ছোট ভাইটীকে বলিল, "কডল, এই যুবকের কি সুমিষ্ট কণ্ঠ! কি মধুর গীত!

যেন কোন দেবতা স্বর্গীয় সুরে সুধাবর্ষণ করিতেছেন।"

তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "ফাইডিলির সকলই সুন্দর! তাহার হাসিটুকুও কেমন মধুর! কিন্তু তাহাতে যেন কেমন-একটু বিষাদের ছায়া মিশিয়াছে। নির্ম্মল অথচ বিষাদপূর্ণ মুখখানি দেখিলে বোধ হয়, যেন দুঃখ ও সহিষ্ণুতা একই স্থানে পাশাপাশি বিরাজ করিতেছে!"

কেহ জানিত না যে, তাহাদের পরস্পরের এই স্নেহের মূলে ভাই-বোনের যে নৈসর্গিক স্নেহ, তাহাই বিদ্যমান রহিয়াছে। যাই হৌক, ইমোজেনের সদ্‌গুণে তাহারা অত্যন্ত প্রীত হইল। ইমোজেনেরও তাহাদের প্রতি এমনই স্নেহ হইল যে, তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "যদি পষ্থিউমাস্‌কে না জানিতাম এবং তাঁহাকে হৃদয়ে স্থান দান না করিতাম, তবে এমনই স্থানে, এই গহ্বর মধ্যে বালকদুটিকে আপন সহোদরের ন্যায় ভাল বাসিয়া জীবন কাটাইতাম।"

এইরূপে ইমোজেন্ মিলফোর্ড বন্দরে যাইবার জন্য যে পর্য্যন্ত না সক্ষম হয়েন, সে পর্য্যন্ত বালকদ্বয়ের সহিত একত্র থাকিতে সম্মত হইলেন।

মৃগয়া-হইতে-আনীত সেই মাংস যখন ফুরাইয়া আসিল, তাহারা আবার শিকারে বাহির হইল। ফাইডিলি, শারীরিক অসুস্থতার জন্য তাহাদের সঙ্গে যাইতে পারিলেন না। অসুস্থতার বস্তুতঃ কারণও ছিল। স্বামীর সেই নিষ্ঠুর ব্যবহার, তজ্জনিত মনে দারুণ কষ্ট, সেই পথশ্রান্তি—সে সকল, কোমল-হৃদয়া রাজ-নন্দিনীর যথেষ্ট কষ্টের কারণ হইয়াছিল।

রাজকুমারদ্বয় ও তাহাদিগের প্রতিপালক, শিকারে চলিয়া গেলেন। পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা ফাইডিলির রূপ, গুণ ও সদ্ব্যবহারের প্রশংসা করিতে করিতে চলিলেন। ইমোজেন্ একাকিনী সেই গহ্বরে রহিলেন।

---

(১১)

ইমোজেন্ একাকিনী সেই গহ্বর মধ্যে আপন অবস্থা ভাবিতে লাগিলেন। তখন পিসানিও-প্রদত্ত সেই ঔষধের কথা মনে হইল। তিনি শ্রান্তি দূর করণার্থ তাহা পান করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ গভীর নিদ্রায় অভিভূতা হইয়া পড়িলেন। সেই অবস্থায় তাঁহাকে মৃতের ন্যায় বোধ হইয়াছিল।

বেলারিয়াস্ যখন কুমারদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া শিকার হইতে ফিরিলেন, পলিডোর সর্ব্বাগ্রে সেই গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ফাইডিলির কোন সাড়া-শব্দ না পাইয়া ভাবিলেন, বুঝি বা ফাইডিলি নিদ্রিত হইয়াছে; পাছে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে আপন পাদুকা দু'খানি খুলিয়া রাখিয়া, অতি ধীরে গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বস্তুতই ফাইডিলির প্রতি ভ্রাতৃদ্বয়ের এতই স্নেহ হইয়াছিল। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে ফাইডিলির আকার-ইঙ্গিতে তাহারা বুঝিল যে, ফাইডিলি আর জীবিত নাই। তখন পলিডোর উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। ফাইডিলি যেন যথার্থই তাহার ভাই;—শৈশব হইতে তাহারা যেন একত্র বর্দ্ধিত হইয়াছে!

বেলেরিয়াস্ সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; অবশেষে ফাইডিলির দেহ বাহিরে আনিয়া যথাবিধি সৎকারের আয়োজন্ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর কুমারদ্বয় সেই দেহ, ছায়াপূর্ণ একস্থানে লইয়া আসিলেন। তখন সযত্নে, শ্যামল তৃণের উপর তাহা রাখিয়া, তাহার পার্শ্বে বসিয়া করুণ-কণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন। পলিডোর, ফাইডিলির দেহোপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে

লাগিলেন। এবং বলিলেন, "ফাইডিলি, যে পর্য্যন্ত এই মধুর গ্রীষ্মকাল থাকিবে এবং আমরাও এখানে থাকিব, সে পর্য্যন্ত আমি প্রতিদিন তোমার এই দেহে পুষ্পবর্ষণ করিব।"

এই বলিয়া দুই ভায়ে নানাবিধ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ফাইডিলির দেহ পুষ্পাবৃত করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় ক্ষুন্নমনে প্রস্থান করিলেন।

---

(১২)

সেই প্রকার মৃতভাবে ইমোজেন্‌কে অধিক ক্ষণ থাকিতে হয় নাই। সেই ঔষধ আপনার গুণ দেখাইয়া, এখন স্বাভাবিক ভাব প্রাপ্ত হইল। ইমোজেন্‌ও ক্রমশঃ জাগিয়া উঠিলেন। জাগিয়া উঠিয়া দেখেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে ফুল। সকলই তাঁহার স্বপ্ন বোধ হইল। ভাবিলেন, "আমার মনে পড়িতেছে, আমি এক গুহা মধ্যে ছিলাম। সেখানে আর যাহারা ছিল, আজ তাহারাই বা কৈ? আর আমিই বা এখানে এমন অবস্থায় কেন?"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে উঠিলেন; কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। গহ্বরের দিকে ফিরিয়া যাইবেন,—সে পথও খুঁজিয়া পাইলেন না। তখন সকলই তাঁহার স্বপ্ন বোধ হইল। মনে করিলেন, "তবে যাই,—যেখানে যাইবার জন্য বাহির হইয়াছি, সেই মিলফোর্ড বন্দরে যাইবার জন্য আবার চেষ্টা করি। দেখি, যদি পথ পাই।"

বস্তুতঃ, স্বামি-সন্দর্শনের আশা তখনও তাঁহার হৃদয়ে বলবতী।

---

(১৩)

এদিকে ইমোজেনের অজ্ঞাতসারে অদৃষ্ট-চক্র আর একদিকে ঘুরিতেছিল। রোম ও ব্রিটেন্ তখন পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া এক মহা সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছে। রোমের সৈন্যগণ ব্রিটেন্ আক্রমণের জন্য সমুপস্থিত। যে কাননে ইমোজেন্ ইতস্ততঃ ঘুরিতেছিলেন, ঘটনাক্রমে সেই খানে রোম সৈন্যগণ সেনানিবেশ সংস্থাপন করিল। নির্ব্বাসিত পস্থিউমাস্‌ও সেই রোমি-সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে সেইখানে উপস্থিত ছিলেন।

পস্থিউমাস্ রোম-সৈন্যদের মধ্যে থাকিলেও স্বদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন নাই; বরং স্বদেশের পক্ষে থাকিয়াই শত্রু বিনাশ করিবেন, এই সঙ্কল্প করিয়াই তিনি আসিয়াছিলেন।

ইমোজেন্‌কে কি তখন তাঁহার মনে ছিল? ছিল বৈ কি! কিন্তু সে স্মৃতি তেমন হৃদয়-আনন্দদায়িনী ছিল না। তখনও তাঁহার বিশ্বাস, ইমোজেন্ অবিশ্বাসিনী, চরিত্রহীনা। কিন্তু তবুও সেই ভালবাসার মোহ এড়াইতে পারেন নাই। ইমোজেন্‌কে মারিবার জন্য পিসানিওকে আজ্ঞা দিয়াছিলেন এবং পিসানিও প্রত্যুত্তরে মিথ্যা করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার কথামত কার্য্য হইয়াছে—তাঁহারই আজ্ঞায় ইমোজেনের মৃত্যু হইয়াছে!—ইমোজেন্ দুশ্চরিত্রা হৌক, অবিশ্বাসিনী হৌক, কিন্তু তথাপি তাঁহার মৃত্যু, পস্থিউমাসের কষ্টের কারণ হইল। সে কষ্ট এতদূর জ্বালাময় হইয়া উঠিল যে, পস্থিউমাস্ মনে করিলেন, "রোমিওগণের বিরুদ্ধে স্বদেশের জন্য যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইব। যদি তাহাতেও মৃত্যু না হয়, তবে নির্ব্বাসন আজ্ঞা-লঙ্ঘন করিয়া পুনর্ব্বার স্বদেশে আসিয়াছি, সেই অপরাধে ব্রিটেন-রাজ সিম্বেলিনের হস্তে নিশ্চয়ই নিহত হইব।"

মৃত্যুর জন্য পস্থিউমাস্ এতদূর স্থির-নিশ্চয়! সে জ্বালাময়ী যন্ত্রণা পস্থিউমাসকে এতদূর কাতর করিয়া তুলিয়াছিল। ইমোজেন্‌কে অবিশ্বাসিনী বলিয়া জানিলেও পস্থিউমাসের

হৃদয়ে তৎপ্রতি এতটা স্নেহ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।

(১৪)

ইমোজেন্ মিলফোর্ড বন্দরে আসিবার জন্য সেই অরণ্য মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে রোম-সৈন্যের হস্তে পড়িলেন। তাঁহার সে মধুর-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সৈন্যগণ তাঁহাকে সামান্য বলিয়া ভাবিতে পারিল না। তাহারা দয়া করিয়া সেই ছদ্মবেশী ইমোজেন্‌কে, রোম-সেনাপতি লুসিয়াসের বালক-ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিয়া দিল। বলা বাহুল্য, ইমোজেনের তখনও সেই পুরুষ-পরিচ্ছদ।

এদিকে সিম্বেলিনের সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। যখন তাহারা সেই অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল, গুহাবাসী সেই অপহৃত রাজ-কুমারদ্বয়—পলিডোর এবং কডল—রাজসেনার সহিত যোগদান করিলেন। বৃদ্ধ বেলরিয়াস্‌ও তাঁহাদের সঙ্গে যাইলেন। কুমারদ্বয় তখনও জানেন না যে, তাঁহাদিগের নিজের পিতার জন্য, নিজ-রাজ্যের জন্য এই যুদ্ধে ব্রতী হইয়াছেন!

বেলেরিয়াস্ কুমারদ্বয়কে অপহরণ করিয়া পরিশেষে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিজে বীর; বীরের ন্যায় সন্তান দুইটীকে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছিলেন। রাজাকে মর্ম্মান্তিক মনঃকষ্ট দিয়া, আজি অনুতপ্ত-হৃদয়ে সেই পূর্ব্ব প্রভুর জন্য যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

তাহার পর সমরানল প্রজ্বলিত হইল। উভয় দলে ঘোরতর সংগ্রাম বাধিল। বৃদ্ধ বেলেরিয়াস্, পস্থিউমাস্ ও কুমার-দ্বয় অমিত বলবিক্রমে যথেষ্ট সাহসিকতার পরিচয় দিয়া ব্রিটেনের ভাগ্যলক্ষ্মী অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। বস্তুতঃ, তাঁহারা উপস্থিত না থাকিলে, রাজার জীবন রক্ষা হইত না, ব্রিটেনের পরিণামও অত্যন্ত শোচনীয় হইত।

(১৫)

এইরূপে যুদ্ধ শেষ হইলে পস্থিউমাস দেখিলেন, মৃত্যু ত তাঁহার হইল না।—অনুতাপ ও মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় তাঁহাকে এতই অস্থির করিয়া তুলিল যে, মৃত্যু ভিন্ন তাঁহার আর শান্তি নাই। মরিবার জন্য তিনি ত প্রস্তুত; কিন্তু মৃত্যু ত হইতেছে না! তখন অবশেষে, রাজার কোন কর্ম্মচারীর নিকট আত্মপ্রকাশ করিলেন ও আপনাকে ধরা দিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইবে।

ইমোজেন্ ও তাঁহার প্রভু, সেই রোম-সেনাপতি লুসিয়াস্ বন্দী হইয়া ব্রিটেনরাজ-সমীপে আনীত হইলেন। বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী, রোমবাসী ইয়াকিমো-ও সেই সঙ্গে বন্দী হইয়া আনীত হইয়াছিল।

রাজ-দরবারে যখন সকল বন্দী একত্রিত হইল, পস্থিউমাস্‌কেও সেখানে আনা হইল। পস্থিউমাস্ তখন ভাবিতেছেন, রাজা কতক্ষণে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিবেন। বেলে-রিয়াস্ ও সেই কুমারদ্বয় যুদ্ধে যে প্রকার সাহস ও বিক্রমের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদের যথোচিত পুরস্কারের জন্য, তাঁহারাও সে সময় সেখানে আনীত হইলেন।

এইরূপে সেই বন্দীগণ ও অন্যান্য ব্যক্তি-গণের মধ্যে, বড় একটা মধুর মিলন ঘটিয়া গেল। কারণ, একদিকে অনুতপ্ত, মৃত্যুর জন্য সদাই-প্রস্তুত পস্থিউমাস্ রাজাজ্ঞা শুনিবার জন্য দণ্ডায়মান; অন্যদিকে ইমোজেন্ তাঁহার প্রভু রোম-সেনাপতির সহিত দণ্ডায়মান। একদিকে সেই বিশ্বাসঘাতক ইয়াকিমো, অন্য-দিকে হিতার্থী ও সহৃদয় সুহৃদ্ সেই

পিসানিও। আবার অপর দিকে সেই অপহৃত কুমারদ্বয় ও বেলেরিয়াস্। সকলে একত্র বটে; কিন্তু মনের ভাব সকলের সমান নহে। কাহারও হৃদয়ে আশা, কাহারও হৃদয়ে মৃত্যু-আকাঙ্ক্ষা, কাহারও হৃদয়ে আনন্দ, কাহারও হৃদয়ে বিষাদ;—আনন্দ ও নিরানন্দের সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য!

(১৬)

প্রথমে রোম-সেনাপতি উঠিলেন। সর্ব্ব-প্রথমে তাঁহারই কথা আরম্ভ হইল। ইমোজেন্ অবশ্য পস্থিউমাস্কে চিনিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু পস্থিউমাস্ পুরুষবেশধারিণী ইমোজেন্কে চিনিতে পারেন নাই। ইমোজেন্ সেই পাপিষ্ঠ ইয়াকিমোকেও চিনিতে পারিলেন। ইয়াকিমোর হস্তে আপনার সেই প্রিয়-অঙ্গুরী—যে অঙ্গুরী বিদায় কালে তিনি তাঁহার প্রিয়তম পস্থি-উমাসকে প্রণয়-চিহ্ন স্বরূপ উপহার দিয়া-ছিলেন,—তাহাও চিনিতে পারিলেন। কিন্তু বুঝিতে পারিলেন না যে, ইয়াকিমো সেই অঙ্গুরী কিরূপে কোথায় পাইল? এবং ইহাও বুঝিতে পারিলেন না যে, সেই পাপিষ্ঠই তাঁহার সকল বিপদের মূল। ইমোজেন্ রাজ-সম্মুখে বিচারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পিতা, কন্যাকে চিনিলেন না।

পিসানিও অবশ্য ইমোজেন্কে চিনিয়া-ছিলেন। কারণ, তিনিই সেই পুরুষ-পরিচ্ছদে ইমোজেন্কে সাজাইয়াছিলেন। ইমোজেন্কে দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন। ভাবিলেন, যখন বাঁচিয়া আছেন, তখন যেরূপেই হউক, ঘটনাচক্র একদিকে ফিরিবে।

বৃদ্ধ বেলেরিয়াস্ ইমোজেন্কে নির্দ্দেশ করিয়া চুপি চুপি কডলকে বলিলেন, "বালকটীকে চিনিতে পারিয়াছ? আমরা ইহাকে মৃত স্থির করিয়া পুষ্পাবৃত দেহে ঢাকিয়া রাখিয়াছিলাম। মনে পড়ে?"

কতক বিস্ময়ে, কতক আনন্দে কডল উত্তর করিল, "চিনিতে পারিতেছি, সেই ফাইডিলি-ই বটে।" পলিডোরও অধিকতর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "নিশ্চয়ই এ ফাইডিলি!" বেলেরিয়াস্ পুনরায় কিন্তু তাহাদিগকে বলি-লেন, "তাহাও কি হয়? যদি সেই-ই হইবে, তবে নিশ্চয়ই আমাদের সহিত কথা কহিত।" কিন্তু কুমারদ্বয় এ কথায় শান্ত না হইয়া বাদানু-বাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বেলেরি-য়াস্ একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ভাল, চুপ কর। এখন ও-সব কথার সময় নয়।"

পস্থিউমাস্ ভাবিতেছেন, "কতক্ষণে মৃত্যুর আজ্ঞা শুনিতে পাইব"

তিনি জানিতে দিলেন না যে, তিনিও রাজার পক্ষে থাকিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া-ছেন।—কি জানি, এ কথা জানিতে পারিলে যদি রাজা দয়া-পরবশ হইয়া তাঁহার প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞা রহিত করেন!

রোম-সেনাপতি বলিতে লাগিলেন, "আমি রোমবাসী; রোমবাসীর হৃদয়ে যে তেজ, যে সাহস, আমাতে তাহা আছে। রোমবাসী মৃত্যুকে ভয় করে না। আমারও মৃত্যু-ভয় নাই। শুনিতেছি, অর্থ বিনিময়ে আপনি বন্দীগণকে মুক্তি দিবেন না। তবে আপনার যাহা ইচ্ছা, তাই হোক। কিন্তু আমার কেবল একটী মাত্র কথা বলিবার আছে। তাহারই জন্য আপনাকে অনুরোধ করি।"

তখন ইমোজেন্কে সম্মুখে রাখিয়া পুনরায় বলিলেন, "ব্রিটেন্-রাজ! এই বালক আমার ভৃত্য, কিন্তু এ ব্রিটেনবাসী। রোম-প্রভুর দাসত্বে নিযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া ইহার কোন অপরাধ নাই। এই ব্রিটেন্‌বাসী কাহারও কোন অনিষ্ট করে নাই; কেবল রোমবাসীর দাসত্ব করি-

আছে। এমন কর্ত্তব্য-পরায়ণ, এমন বুদ্ধিমান্, এমন সরলহৃদয়, এমন ব্যথার ব্যথী ভৃত্য, বুঝি কখনও কোন প্রভু পায় নাই। ইহারই জীবনের জন্য আপনাকে অনুরোধ করি।”

সিম্বেলিন্ ইমোজেনের প্রতি চাহিলেন ছদ্মবেশিনী কন্যাকে চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে, অজানিত ভাবে, স্বাভাবিক স্নেহের ভাব উচ্ছলিয়া উঠিল বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, “এ বালককে নিশ্চয়ই কোথায় দেখিয়াছি। এ মুখ, আমার পরিচিত বোধ হইতেছে। বালক, তুমি কে, জানি না। যেই হও, কেন জানি না, আমার ইচ্ছা হইতেছে, তুমি জীবিত থাক। আমি তোমার প্রাণদণ্ড করিব না। আর তুমি কি প্রার্থনা কর, তাহা বল। যদি তোমার প্রভু, এই রোম-সেনাপতিরও জীবন প্রার্থনা কর, আমি তাহাও পূরণ করিতে সম্মত আছি।”

ইমোজেন্ অবনত-মস্তকে রাজাকে অভিবাদন করিল। সকলেই শুনিবার জন্য উৎসুক রহিল, বালক কি প্রার্থনা করে।

লুসিয়াস্। বালক, আমার বোধ হইতেছে, তুমি আমারই জীবন প্রার্থনা করিবে। কিন্তু আমি তাহা বলি না। তোমার আর কিছু প্রার্থনা করিবার থাকে, রাজসমীপে তাহাই প্রকাশ কর।

ইমোজেন্। হাঁ প্রভু, তাহাই করিতেছি। আপনার জীবন হইতেও উচ্চতর কার্য্য আমার আছে। আমি এখন আপনার জীবন ভিক্ষা করিতে পারি না।

রোম-সেনাপতি ও উপস্থিত দর্শকবর্গ এ কথায় বিস্মিত হইলেন। বালক কি তবে এতই অকৃতজ্ঞ?

ইমোজেন্ তখন বিশ্বাসঘাতক ইয়াকিমোর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, “রাজন্, আমি জানিতে চাই, এই ব্যক্তি ইহার হস্তস্থিত এই অঙ্গুরীয়ক কিরূপে, কোথায় পাইল? আপনার সাক্ষাতে এ ব্যক্তি সকল কথা অকপটে স্বীকার করুক।”

রাজা, এ প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। তিনি ইয়াকিমোকে বিশিষ্টরূপ ভয় দেখাইয়া গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, “যুবক, মুক্তকণ্ঠে সকল কথা স্বীকার কর; নচেৎ তোমার প্রাণদণ্ড করিব।”

ইয়াকিমো তখন আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করিল। তারপর পস্থিউমাস্ ও ইমোজেনের সহিত আপন বিশ্বাসঘাতকতা ও চাতুর্য্যের কথা, সমস্তই খুলিয়া বলিল। পস্থিউমাস্ তখন বুঝিতে পারিলেন, ইমোজেন্ তাঁহার প্রতি অবিশ্বাসিনী নহেন; কিম্বা ইমোজেন্ তাঁহার স্নেহের প্রতিকূলাচরণও করেন নাই;—তিনি সতীত্বের আদর্শ;—নিষ্ঠুর অদৃষ্ট ও পস্থিউমাসের অদূরদর্শিতাই তাঁহার অনিষ্টের মূল। পস্থিউমাসের ক্ষোভের আর সীমা রহিল না।

---

(১৭)

তখন অনুতপ্ত হৃদয়ের উপর আবার এক প্রাণঘাতী জ্বালা,—শত বৃশ্চিকে যেন তাঁহাকে দংশিতে লাগিল। যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পস্থিউমাস্ রাজার নিকট আপনার সকল কথা ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, “মহারাজ, আপনার দুহিতা, আমার জীবনসর্ব্বস্ব প্রিয়তমা ইমোজেন্‌কে আমিই হত্যা করিয়াছি। আমি তাঁহার প্রতি সন্দিহান হইয়া পিসানিওকে লিখিয়া পাঠাই, তুমি যেন অচিরে ইমোজেনের প্রাণ বধ কর। প্রিয়বন্ধু পিসানিও সে আদেশ পালন করিয়াছেন। হায় ইমোজেন্! প্রাণাধিকে, সতি, এসময় তুমি কোথায়?”

ইমোজেন্ আর আত্মভাব গোপন করিতে পারিলেন না। স্বামীর সে অবস্থা দেখিয়া তখন তিনি আত্মপ্রকাশ করিলেন। স্বামী-স্ত্রীর স্নে

রাজা সিম্বেলিনের বিচার-সভা।



অনির্ব্বচনীয় আনন্দের কথা বর্ণনাতীত। সভায় আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল।

সিম্বেলিন্ তখন আপন কন্যা-রত্ন পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ও পস্থিউমাস্‌কে আপন জামাতা বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন।

বৃদ্ধ বেলেরিয়াস্‌ও তখন অবসর বুঝিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন এবং কুমারদ্বয়কে রাজার সেই হারানিধি বলিয়া জানাইয়া দিলেন। একে একে সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া তিনি রাজার অনুগ্রহপ্রার্থী হইলেন। সভার মাঝে আবার আনন্দের স্রোত বহিল।

সিম্বেলিন্, বেলেরিয়াস্‌কে ক্ষমা করিলেন। শাস্তি-প্রদান সে সময় কাহার মনে থাকে? সে আনন্দ ও মিলনের শুভক্ষণে সকলই সুখে পর্য্যবসিত হইল।

এইবার ইমোজেন্, রোম-সেনাপতির জীবন-ভিক্ষা করিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইলেন। তখন লুসিয়াসের সাহায্যে, রোম ও ব্রিটেনে অনেক কালের জন্য এক সন্ধি স্থাপন হইল। সে সন্ধিতে দেশ জুড়াইল।

তারপর সিম্বেলিন-রাজমহিষী আপন উদ্দেশ্য-সাধনে বিফল-মনোরথ হইয়া কি প্রকার মনঃকষ্ট পাইয়াছিলেন, তাঁহার নির্ব্বোধ-পুত্র সেই ক্লোটেন্ সামান্য একটা বিবাদে নিহত হওয়ায়, তিনি যে কিরূপ মর্ম্মপীড়া পাইয়াছিলেন, দুঃখে ও শোকে অভিভূতা হইয়া শেষে কিরূপে তাঁহার মৃত্যু হইল, সে সকল বর্ণনা অত্যন্ত কষ্টকর।—এ শুভ-মিলন-দিনে সে সকল দুঃখের কথা তুলিয়া এ চিত্র বিষাদে পরিণত করিব না।

ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পুরস্কারের যোগ্য যাহারা, তাহারা ব্রিটেন্‌রাজের নিকট

হইতে যথোচিত পুরস্কার পাইল। এমন কি, সেই ক্রুর-হৃদয়, বিশ্বাসঘাতক ইয়াকিমোও বিনা শাস্তিতে মুক্তি পাইল। রাজা সিম্বেলিন পুত্র, কন্যা ও জামাতা লইয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

৺কাশীরাম দাস।

কাশীরাম সম্বন্ধে জন্মভূমির গত বৈশাখের সংখ্যায় যাহা লিখিয়াছি, তাহার পরবর্ত্তী অংশ লিখিবার পূর্ব্বে, গুটিকয়েক কথা বলিবার আছে।

গুটি-কয়েক কথার মধ্যে প্রথম কথা, আমার নামে লাইবেল মোকদ্দমা হইবে।

কাশীরাম-বিষয়ক প্রবন্ধের প্রথম অংশে, যাহা জন্মভূমিতে প্রকাশিত হইয়াছে, বাঙ্গালার আদি কবি কৃত্তিবাস ও প্রতিভাশালী কবি কাশীরাম দাস, এই দুয়ের অঙ্গভঙ্গকারী সাহিত্য-বোমবেটে মৃত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের প্রতি "পণ্ডিতমূর্খ" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করা হয়। অপরাধ এই। শুনিতেছি নাকি, তজ্জন্য মৃত জয়গোপালের বংশধরগণ আমার নামে "লাইবেল কেস" আনিবার কল্পনা করিতেছেন। অবশ্যই, এ সংবাদে নূতনত্ব কিছুই নাই। যে দেশে প্রতিবেশী প্রতিবেশীতে, ভাই ভাইয়ে, পিতা পুত্রে, মাতা কন্যায়, স্বামী স্ত্রীতে পর্য্যন্ত বাদী বিবাদী সাজিয়া আদালতে উপস্থিত হইয়া থাকে; যেখানে উৎসন্নোন্মুখ এই জাতির পক্ষে উৎসন্ন যাওয়ার প্রশস্ত পন্থাস্বরূপ মামলাবাজীই দ্বিতীয় স্বভাবরূপে পরিণত হইয়াছে; সেখানে আর ওরূপ সংবাদে নূতনত্ব কি থাকিতে পারে? কিন্তু সে যাহা হউক, যেরূপ গতিক দেখিতেছি, তাহাতে আর কিছুদিন বাদে বা লোক সকল, আগে পেনাল-কোডের ধারা এবং ষ্ট্যাম্প ও উকীলের দরদস্তুরাদি শিখিয়া, তবে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইতে আরম্ভ করে!—অথবা যদিই করে, এ বিড়ম্বিত দেশে তাহাতেই বা নূতনত্ব কোথায়?

যাহা হউক, আমি এ লাইবেল মোকদ্দমার সূচনায় সন্তুষ্ট ভিন্ন অসন্তুষ্ট নহি; কারণ আমি উহাতে যতটা আক্কেল পাই বা না পাই, জয়গোপালের প্রেতাত্মার আক্কেল ও উপকার হইবে উহাতে প্রভূত। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম সম্বন্ধে পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য, জয়গোপালের প্রেতাত্মা যে লোকান্তরে অশান্তিভোগ করিতেছে অনেক, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার বিষয় অতি অল্পই। এখন আমি এই এক ক্ষুদ্র প্রবন্ধ দ্বারা জয়গোপালী কীর্ত্তি যতটা প্রচারে সক্ষম না হইব, একা এক লাইবেল কেসের দ্বারা প্রচারিত হইবে তাহা শতগুণে। প্রচার হইলেই সুতরাং চেষ্টার উদ্রেক হইবে, চেষ্টার উদ্রেক হইলেই কৃত্তিবাস ও কাশীদাসও পুনর্জ্জীবিত হইতে পারিবেন সহজে। সুতরাং জয়গোপালের প্রেতাত্মাও যে তাহাতে তাহার পাপের কারণক্ষয়ে শান্তিলাভ করিতে পারিবে অনেক, তাহাও কি আর বলিয়া বুঝাইতে হয়? অতএব এ লাইবেলকে আমি অনাদরের পরিবর্ত্তে বরং সাদরে ও সুখের সহিতই আহ্বান করিতে প্রস্তুত।

দ্বিতীয় কথা। এ প্রবন্ধ সাহিত্যসম্পাদক প্রভৃতি কাহারও কাহারও কাছে ভাল লাগিতেছে না, যেহেতু ইহাতে কথা কম, আড়ম্বর বেশী ও হৃদয়গ্রাহিতা নাই।

না থাকিবারই কথা। ভাষাও শয্যাবিলাসী নহে, বিষয়ও নাগর-নাগরীর প্রেম-কাহিনী নহে; সখের তরকারীর মিশালে ইহা সামান্য নিমঝোল বিশেষ, সুতরাং ভাল লাগিবে কি

প্রকারে? তবে কথা কি, ভাল না লাগিলেও। নীমঝোল উপকারী ও সুপথ্য এবং অনেক সময়ে অবস্থা-বিশেষে লোককে জোর করিয়াও গিলাইয়া দিতে হয়। এমন পিত্তনাশক প্রবন্ধেরও নিন্দা! কিন্তু পিত্ত কাহারও কিছু আছে কি?—তা থাকিলে আর এ প্রবন্ধ লিখিবার প্রয়োজন হইবে কেন! সে যাহা হউক, এ প্রবন্ধ যাঁহার ভাল না লাগিবে, তিনি ইহা না পড়িলেই উপকৃত বোধ করিব।

পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, মহাভারতের আরম্ভে মূল কাশী দাসীতে গণেশবন্দনা, ব্যাসবন্দনা প্রভৃতি যে সকল অংশ আছে, তাহা বটতলার মহাভারত হইতে একেবারেই উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐরূপ কত স্থানে কত যে উঠান হইয়াছে ও কতস্থানে কত যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। কিন্তু সে সকল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবই বা কত এবং জন্মভূমিতেই বা সে বৃহৎ-ব্যাপারের জন্য স্থানে কুলাইবে কিরূপে? বটতলার কেতাব হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে সকল অংশ, তাহার নমুনার স্বরূপ এই একটা কথামাত্র এখানে উল্লেখ করি যে, স্বর্গারোহণ পর্ব্বে, ছাপার মহাভারতে, প্রথমেই হস্তিনা হইতে মহাপ্রস্থান-পথে প্রস্থান ও স্বর্গপথে মেঘনাদ পর্ব্বতে আরোহণ, এই উপাখ্যান অংশ দিয়া পর্ব্ব আরম্ভ করা হইয়াছে। বটতলার যত রকম মহাভারত আছে, সে সকল গুলিতেই দেখিলাম যে, ঐ একই প্রকার ও সকলেতেই স্বর্গারোহণ পর্ব্ব ঐ উপাখ্যানাংশ হইতে আরব্ধ।

কিন্তু আসল কাশী দাসীতে স্বর্গারোহণ পর্ব্বের আরম্ভ অন্যতর। উহার প্রথমেই দ্বাপর শেষ হওয়ায় কলির অধিকার আসিতেছে জানিয়া বলিকর্ত্তৃক কলির বন্ধন-মোচন। পরে কলি-অধিকার। এখানে কলি-অধিকারের পূর্ব্ব ও পরের অবস্থা কিরূপ, তাহা দেখাইবার জন্য, এক ব্রাহ্মণ ও তাহার চাকর-ঘটিত একটী সুন্দর উপাখ্যানও দেওয়া হইয়াছে। ঐ উপাখ্যানে, কলিমোচনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে, এক ব্রাহ্মণের চাকর ব্রাহ্মণের জমি চষিতে চষিতে লাঙ্গলের মুখে উত্থিত কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এখন ঐ পড়িয়া-পাওয়া অর্থ কাহার প্রাপ্য, ইহা লইয়া সমস্যা। তৃতীয় ব্যক্তির অভাবে ব্রাহ্মণ ও চাকর তাহারা নিজেই তাহা মীমাংসা করিতে বসিল। কিন্তু মীমাংসায় ঘোর বিতণ্ডা উত্থিত;—চাকর বলে, "ঠাকুর, উহা তোমার প্রাপ্য, যেহেতু তোমার জমিতে উহা পাওয়া গিয়াছে এবং যেহেতু অমি যে পাইয়াছি, আমিও তোমার চাকর"; এ কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিতেছে, "সে কি কথা বাপু, হইল যেন আমার জমি, কিন্তু পাইয়াছ ত তুমি ও তোমার অদৃষ্ট-জোরে, অতএব ও অর্থ আমার নহে, তোমার প্রাপ্য।" এইরূপে চাকর বলিতেছে, "ঠাকুর, ও অর্থ তোমার", তাহাতে ঠাকুর বলিতেছেন, "না বাপু, ও অর্থ আমার নয়, তোমার।" ঘোর বিতণ্ডা, অর্থ কে লইবে, কে পাইবে, কিছুই মীমাংসা হইতেছে না। এমন সুসময়ে ও শুভক্ষণে বলি পাতালপুরে হঠাৎ কলিকে মোচন করিয়া দিলেন।

কলিও নাচিতে নাচিতে সেই মুহূর্ত্তে যেমন পৃথিবীতে সমাগত; অমনি চাকর ও মুনিবের বিবাদ-মীমাংসার সুর ফিরিয়া অন্যরূপ দাঁড়াইল। তখন বামন চাকরের প্রতি লাঠি উঠাইয়া বলিতে লাগিল, "অরে নষ্ট! ও অর্থ আমার"; চাকরও অমনি বামনের প্রতি লাঠি উঠাইয়া বলিতে লাগিল, "চুপ বিটুলে, ও অর্থ তোর নয়—আমার।" ক্রমে লাঠালাঠি ও খুনোখুনি বাধিয়া গেল। এইরূপে কলি সমাগত ও তাহার আচরণ দেখিয়া ও অন্যান্য কারণেও, যুধিষ্ঠির তখন স্থির করিলেন যে, আর এ কলির

অধিকৃত পাপ পৃথিবীতে থাকা উচিত নহে; এমন পৃথিবী পরিত্যাগ করা উচিত এবং তদনুসারে দ্রৌপদী সহ পঞ্চভ্রাতা মহাপ্রস্থান-পথে প্রস্থান করিলেন। অতএব গোড়া হইতে এই পর্য্যন্ত ছাপার মহাভারতে একেবারেই নাই এবং এই পর্য্যন্ত ছাপার অন্যূন, ছাপা মহাভারতের ন্যায় পৃষ্ঠার ১৪।১৫ পৃষ্ঠা হইবে। সুতরাং উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধ মধ্যে দেখান কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না।

উহু সম্বন্ধে আরও একটা উদাহরণ প্রদান করিব। ভীষ্মপর্ব্বের আরম্ভ হইতে ভীষ্মের *প্রথম দিনের যুদ্ধ পর্য্যন্ত যে অংশ ছাপার মহাভারতে আছে, আসল কাশী দাসের সঙ্গে তাহার কিছুমাত্র মিল নাই। পুনশ্চ, সেই অংশ, ছাপার মহাভারতস্থ অংশ আয়তনে দ্বিগুণেরও অধিক হইবে। ইহাও ছাপার ৯।১০ পৃষ্ঠা হইবে, সুতরাং এখানেও, এ সঙ্কীর্ণ আয়তনের মধ্যে সে সকল উদ্ধৃত করিয়া দেখান সহজ নহে। যাহা হউক, তথাপি কুড়ি লাইন আন্দাজ ছাপার মহাভারতের সঙ্গে পার্শ্বাপার্শ্বি ভাবে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, তফাৎ কি সর্ব্বাবয়বে ও সম্পূর্ণরূপে!

ভীষ্মপর্ব্বের আরম্ভ ;—

(বটতলার মহাভারত হইতে)

জিজ্ঞাসে জনমেজয় কহ তপোধন।
উলুকের মুখে বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ॥
কোন্ কর্ম্ম করিলেক দুর্য্যোধন বীর।
কিবা কর্ম্ম করিলেন রাজা যুধিষ্ঠির॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন মহাশয়।
দূতমুখে বার্ত্তা শুনি ধর্ম্মের তনয়॥
কৃষ্ণেরে কহেন হলো সমর-সময়।
বিহিত ইহার যাহা কর মহাশয়॥
শ্রীহরি বলেন রাজা করি নিবেদন।
যাত্রা কর মহাশয় দিন শুভক্ষণ॥
তখনি দিলেন আজ্ঞা রাজা যুধিষ্ঠির।
চল্লিশ সহস্র রাজা সাজে মহাবীর॥
পাঁচকোটী রথী সাজে ত্রিশকোটী হাতি।
ষষ্টিকোটী আসোয়ার অসংখ্য পদাতি॥
সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা পাণ্ডবের দলে।
সবে বিষ্ণুপরায়ণ মহাবল বলে॥
সিংহনাদ শঙ্খধ্বনি বিবিধ বাজন।
নানা অস্ত্রে বীরগণ করিল সাজন॥
শ্রীহরি করিয়া আগে পাণ্ডুর তনয়।
কুরুক্ষেত্রে চলে সবে করি জয় জয়॥
ইত্যাদি।

(প্রাচীন হাতের লেখা পুঁথি হইতে)

তবে জন্মেজয় রাজা করিয়া বিনয়।
জিজ্ঞাসিল মুনিবরে কহ মহাশয়॥
কিরূপে ভারতযুদ্ধ হৈল আরম্ভণ।
কোন্ কোন্ বীর আইল যুদ্ধের কারণ॥
কি মন্ত্রণা কৈল তবে পিতামহগণ।
কি কর্ম্ম করিল তবে রাজা দুর্য্যোধন॥
বিশেষিয়া সে সকল কহ মহামুনি।
তব মুখে শুনিতে আশ্চর্য্য হেন মানি॥
ভীষ্ম মহাবীর যেই অজিত সংসারে।
কিরূপেতে পার্থবীর জিনিল তাঁহারে॥
তবে জন্মেজয় নৃপে বলে মুনিবর।
উলুক কহিল আসি সকল উত্তর॥
কৌরব পাণ্ডবগণে দলের সহিত।
পৃথিবীর রাজা যত আইল ত্বরিত॥
বিন্দ অনুবিন্দ আইল শল্য মহাশল্য।
কৌরব পাণ্ডবগণে কত মহীপাল॥
শূরসেন নৃপতি আইল জয়দ্রথ।
সাতকোটী অশ্ব সঙ্গে নয়কোটী রথ॥
চিত্ররথ রাজা আইল বহুসৈন্য সাথে।
মদ্রসেন রাজা আইল মদ্রদেশ হতে॥
ইত্যাদি।

দেখিলে এখন সকলে,—জয়গোপালী কাণ্ড। উপরে এক স্থানে বলিয়াছি যে, জয়-গোপাল ছিল সাহিত্য-বোমবেটে; কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, কেবল তাই নয়; অধিকন্তু "সাহিত্য-পিকপকেট" বা "সাহিত্য-ছুঁচো" বলিলেও সঙ্গত হয়। যেরূপ নমুনা উপরে দেখাইলাম, ঐরূপ নমুনা বরাবরই এবং সে সকলের পুনঃসংখ্যা এত যে, সে সকল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে হইলে, প্রায় মহাভারতের ন্যায় বৃহৎ আর এক খানি দ্বিতীয় কেতাবের সৃষ্টি হয়। যাহা হউক, উপরে যে বিবরণ দেওয়া গেল এবং সেই সঙ্গে যতটুকু উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইল, তাহা দ্বারাই মূল কাশী দাস হইতে উঠাইয়া দেওয়া বা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত করা অংশ কি প্রকারের, তাহা সকলে অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন এবং সেই সঙ্গে ইহাও স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইবেন যে, বটতলা ও জয়গোপালের হাতে কাশীরামের কি বিষম খুন-খারাপি ও দুর্দ্দশাই ঘটিয়াছে! পুনশ্চ, সেই সঙ্গে ইহাও অবধারণ করিতে পারিবেন যে, বটতলার বর্ত্তমান ছাপা মহাভারত কাশীরামের নামে নামাঙ্কিত হইবার পক্ষে কতটা পরিমাণে যোগ্য অথবা অযোগ্য।

গ্রন্থের আসল অংশবিশেষকে একেবারেই উড়াইয়া দেওয়া, পুনঃ তাহার স্থানবিশেষকে একেবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলা সম্বন্ধে, আর অধিক উদ্ধৃত করিয়া দেখান বা তাহার উপর আর অধিক বাক্যব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই। অতঃপর গ্রন্থের মধ্যে যে সকল স্থানে কবির লেখনীপ্রসূত আসল মূলভাগ এখনও পরিত্যক্ত হয় নাই; সেখানেও অতঃপর প্রতিশ্লোক এবং প্রতিশ্লোকের প্রতিপদ পর্য্যন্তে, বটতলা ও তদাশ্রিত জয়গোপালী সংশোধনে কাশীরামে কিরূপ রূপান্তর ও সেই রূপান্তরে কিরূপ হীনতা ঘটনা হইয়াছে, তাহারও একটু নমুনা দিয়া দেখান উচিত।

আদিপর্ব্বে নারায়ণ মোহিনীরূপ ধারণ করিলে, তাঁহার রূপবর্ণনা অংশে দেখ;—

ছাপার মহাভারত।	প্রাচীন পুঁথি।
ভুজসম, ভুজঙ্গম, মৃণাল জিনিয়া।	ভুজসম, ভুজঙ্গম, কি করিবে তুল।
সুরাসুর, মূর্চ্ছাতুর, যাহারে হেরিয়া॥	সুরাসুরে, শোভা হরে,* করের অঙ্গুল॥
পদ্মবর, জিনি কর, চম্পক অঙ্গুলি।	কোকনদ, মুখপদ, দুষ্টধ্বংসী কর।
নখবৃন্দ, জিনি ইন্দু, প্রভাগুণশালী॥	হিমকর, তেজোহর, কুণ্ডল মকর॥
কোটি কাম, জিনি ধাম, বদনপঙ্কজ।	কোটীকাম, সুধাধাম, বদনপঙ্কজে।
মনোহর, ওষ্ঠাধর, গরুড় অগ্রজ॥	মনোহর, ওষ্ঠাধর, গরুড় অগ্রজে॥
নাসিকায়, লজ্জা পায়, শুকচঞ্চুখানি।	নাসাতুল, তিলফুল, শুকচঞ্চু জিনি।
নেত্রদ্বয়, শোভা হয়, নীলপদ্ম জিনি॥	পদ্মচক্ষু, যুগ্মপক্ষ, নাটক নটিনী॥
পুষ্পচাপ, হরে দাপ, ভ্রূদ্বয়ভঙ্গিমা।	পুষ্পচাপ, হরে দাপ, ভ্রূলতাভঙ্গিমা।
গালে প্রাতঃ, দিননাথ, দিতে নারে সীমা॥	ভালতেজে, দিনরাজে, দিতে নারে সীমা॥
পীত বাস, করে হাস, স্থিরসৌদামিনী।	পীত বাস, করে হাস, স্থির সৌদামিনী।
দন্তপাঁতি, করে দ্যুতি, মুক্তার গাঁথুনি॥	দন্তপাঁতি, দিবাভাতি, উজোর যামিনী॥
দীর্ঘকেশে, পৃষ্ঠদেশে, বেণীলম্বমান।	দীর্ঘকেশে, পৃষ্ঠদেশে, বেণী নিরমাণ।
আচম্বিত, উপনীত, সভা বিদ্যমান॥	আচম্বিত, উপনীত, সভাবিদ্যমান॥

* কোন পুঁথিতে "সুরাসুরে, মূর্চ্ছা করে"।

পাঠক একবার দেখিবেন মিলাইয়া, আসল কাশী দাসে কিরূপ ছিল এবং সংশোধনের পরে তাহা কিরূপ দাঁড়াইল এবং সে দুইয়ের মধ্যে ভাল বা কোন্‌টা; মন্দ বা কোন্‌টা। 'সংশোধন দ্বারা নিশ্চয় উন্নতি করিতে পারিব', ইহা অবধারিত থাকিলেও, তথাপি একজনের লেখার উপর আর একজনের তালি দিবার অধিকার নাই। কিন্তু হায়! এখানে সে সমস্ত বিবেচনাশূন্য "লেঙুটার নাই বাটপাড়ের ভয়"-ব্যাপারের ঘটা দেখ একবার কতটা।

পুনশ্চ,—

বটতলা।

এত শুনি পরাশর ক্রোধে শান্ত হৈল।
রাক্ষসে মারিব বলি অঙ্গীকার কৈল ॥
রাক্ষস বলিয়া না থুইব পৃথিবীতে।
পরাশর মুনি এতে দৃঢ় কৈল চিত্তে ॥
বশিষ্ঠের শক্তিতে না হইল বারণ।
রাক্ষসবধের যজ্ঞ কৈল আরম্ভণ ॥
পরাশরযজ্ঞকথা অদ্ভুত কথন।
যে যজ্ঞে হইল সব রাক্ষস নিধন ॥
রাক্ষসের দুষ্টাচার জানিয়া সকল।
পরাশর মুনি হৈল জলন্ত অনল ॥

প্রাচীন পুঁথি।

এত শুনি পরাশর ক্রোধে শান্ত হৈল।
রাক্ষসে মারিব বলি অঙ্গীকার কৈল ॥
রাক্ষস মোহর পিতা করিল ভক্ষণ।
পিতৃবৈরী নিশাচর করিব নিধন ॥
রাক্ষস বলিয়া না থুইব পৃথিবীতে।
এত পরাশর মুনি দৃঢ় কৈল চিত্তে ॥
বশিষ্ঠের শক্তিতে নহিল নিবারণ।
রক্ষযজ্ঞ আরম্ভিল শক্তির নন্দন ॥
পরাশরযজ্ঞকথা অদ্ভুত কথন।
সেই যজ্ঞে হৈল সব রাক্ষস নিধন।
ত্রিঅনল পৃথিবীতে বলে বেদবাণী ॥
পরাশর মুনি হৈল চতুর্থ আগুনি ॥

পাঠক! যেন মনে না করেন যে, আমি বাছিয়া বাছিয়া বিশেষ স্থান সকল উঠাইতেছি, তাহা নহে। যেখানে ও যদৃচ্ছা নজর পড়িতেছে, সেই থান হইতেই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পুনশ্চ,—

বটতলা।

পূর্ণ সুধাকর, হইতে প্রবর,
কে বলে কমলমুখ।
গজমতি ভূষা, তিলফুল নাসা,
দেখি মুনি মনসুখ ॥
প্রবাল শ্রীধর, বিরাজে অধর,
পূর্ব্বীয় অরুণ ভালে।
মধ্যে কাদম্বিনী, ঘন সৌদামিনী,
সিন্দুর চাঁচর বালে ॥
মাঝা দেখি ক্ষীণ, প্রবেশে বিপিন,
করিহর হরি লাজে।
করে কোকনদ, পাইল বিপদ,
নখরেতে দ্বিজরাজে ॥
কনককঙ্কণ, করে ঝন ঝন,
চরণে নূপুর হংস।
জঘন সুন্দর, বিহারকন্দর,
স্বর্ণকাঞ্চী অবতংস ॥

প্রাচীন পুঁথি।

পূর্ণশরদিন্দু, হীন যেন বিন্দু,
বিকচ কমল মুখ।
গজমতি ভূষা, তিলফুল নাসা,
দেখি মুনিমনসুখ ॥
সুপর্ণসোদর, নিন্দিয়া অধর,
পূরব অরুণ ভালে।
মধ্যে কাদম্বিনী, স্থির সৌদামিনী,
সিন্দুর চিকুরজালে ॥
মাঝা দেখি ক্ষীণ, প্রবেশে বিপিন,
করি হর হরি লাজে।
করে কোকনদ, পাইল বিষাদ,
দ্বিজরাজ নখতেজে ॥
কনককঙ্কণ, দ্বিভুজ রঞ্জন,
নূপুর হংসশবদা।
জঘন সুন্দর, বিহার কন্দর,
মার-বারণের সদা ॥

উপরের অংশগুলি সমস্তই আদিপর্ব্ব হইতে উদ্ধৃত। এক্ষণে অপর এক পর্ব্ব হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেখা যাউক। সভা-পর্ব্বে,—

বটতলা।	প্রাচীন পুঁথি।
কান্দে যজ্ঞসেনী, তিতিল অবনী, নয়নের নীর-ধারে।	চতুর্দ্দিকে শত, কৌরব উন্মত্ত, নানা উপহাস করে।
চতুর্দ্দিকে যত, কৌরব উন্মত্ত, নানা উপহাস করে॥	হয় অমঙ্গল, নানা অকুশল, শিবা ঘোর নাদ করে॥
হেনই সময়, অন্ধের আলয়, নানা অমঙ্গল দেখি।	হেনই সময়, অন্ধের আলয়, নানা পশুগণ দেখি।
মহা ঘোর ধ্বনি, বায়স শকুনি, ডাকয়ে পেচক পাখি॥	করে ঘোর ধ্বনি, বায়স শকুনি, ডাকিছে পেচক পাখি॥
গৃহে অগ্নি হয়, শুনি শিবাচয়, প্রবেশ করিয়া ডাকে।	অগ্নিহোত্র গৃহে, শুনী প্রবেশয়ে, আকুল হইয়া ডাকে।
ভাঙ্গে রথধ্বজ, পড়ি মরে গজ, হাহাকার রব লোকে॥	ভাঙ্গে রথধ্বজ, পড়ি মরে গজ, হাহাকার করে লোকে॥

পুনশ্চ :—

মনে হয় দুঃখ, পুর্ণচন্দ্র মুখ, কি হেতু মলিন দেখি!	একি বিপরীত, পুর্ণিমার সিত, কি হেতু মলিন দেখি!
অম্লান অম্বর, দিল যে কিন্নর, বাকল তাহা উপেক্ষি॥ ইত্যাদি, ইত্যাদি।	অম্লান অম্বর, যে দিল কিন্নর, বাকল তাহা উপেক্ষি॥ ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অথবা আর কতই তুলিয়া দেখাইব। সমস্ত গ্রন্থ ধরিয়াই এই কাণ্ড, এই ব্যাপার। এক্ষণে মোটের উপরে দেখা যাইতেছে যে, আসল কাশীরামী মহাভারত এই কয় প্রকারে খাস্ত ও বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে।—

প্রথমতঃ। আসল কাশী দাসীতে যাহা আছে, তাহার বহুস্থান বটতলার ছাপার কেতাবে একেবারেই নাই; উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

২। আসল কাশিদাসীর বহুস্থান বটতলার ছাপার কেতাবে একেবারেই পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, এমন কি উভয়ের মধ্যে তিলমাত্রও সাদৃশ্য দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা নাই।

৩। উপরে যে দুই দফার উল্লেখ করিলাম, তাহা একধা বহু বহু পৃষ্ঠা সম্বন্ধে বর্ত্তে। তদ্ভিন্ন মাঝে মাঝে দুই পঙ্ক্তি বা চারি পঙ্ক্তির অভাব, পরিবর্ত্তন বা নূতন সংযোজন, এ সকল বটতলার ছাপার কেতাবে যে কত, তাহার আর সীমা ও সংখ্যা নাই।

৪। তাহার পর সমস্ত গ্রন্থের মধ্যেই এমন কোন এক পঙ্ক্তি অতি বিরল, যাহাতে কিছু-না-কিছু রূপান্তর ঘটনা হইয়াছে।

অধুনা কাশীরামের নামে যে মহাভারত বটতলা প্রভৃতি স্থানে মুদ্রিত, প্রকাশিত ও বিক্রীত হইতেছে; আসল কাশীদাসী মহাভারত হইতে তাহা যে কতটা বিকৃত, রূপান্তরিত

ও নানা প্রকারে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে, তাহার পরিচয় উপরে দেওয়া গেল। কিন্তু এক্ষণে আমি যে কি প্রমাণের উপর বল বাঁধিয়া সেই সকল পরিচয় দিতে সাহসী ও সমর্থ হই, তাহার বিবরণ পাঠকদিগকে কিঞ্চিৎ অবগত করান কর্ত্তব্য।

পাঠকেরা আমার লেখার ধরণেই বুঝিয়াছেন, সুতরাং তাহার আর অধিক প্রকাশ্য পরিচয় দেওয়া বাহুল্যমাত্র যে; আমি কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস এই দুইজন বাঙ্গালা কবির একজন পরম ভক্ত। আমি কৃত্তিবাসের ভক্ত প্রধানতঃ এই জন্য যে, কৃত্তিবাস বাঙ্গালা ভাষার আদি লেখক ও আদি কবি;—কৃত্তিবাসের পূর্ব্বের বাঙ্গালা লেখক, বা কৃত্তিবাসের ভাষার অপেক্ষা পুরাতন বাঙ্গালা ভাষার পরিচয় আর কোথাও পাওয়া যায় না। চণ্ডীদাস প্রভৃতি কৃত্তিবাসের অনেক পরের লোক। কৃত্তিবাসের প্রাদুর্ভাবকাল প্রায় ৫৮০ বৎসর পূর্ব্বে। তাহার পর কাশীরামের ভক্ত আমি এই জন্য যে, কাশীরামের তুল্য অসাধারণ প্রতিভাশালী কবি সর্ব্বদা জন্মায় না এবং যখন যে দেশে জন্মায়, তখন ও তদুত্তর অপরিমিত কালের জন্য সে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া থাকে।

উক্ত কবি দুই জনের উপর এই ভক্তি বশতঃ, তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসমূহের নানা প্রকার বিকৃতি ঘটনা দৃষ্ট করিয়া বড়ই ব্যথিত হই এবং সেই দুইতেই আমার এই সঙ্কল্প হয় যে, যে কোন প্রকারে হউক ইহাদের মূল উদ্ধার করিয়া সাহিত্য-জগতে অর্পণ করি। সুতরাং এতদর্থে বহু প্রাচীন হাতের লেখা পুঁথি সকল, যাহা এখনও পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু আর কিছুদিন বাদে পাওয়া যাইবে না, তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হই। "যাহা এখনও পাওয়া যাইতেছে, আর কিছুদিন বাদে তাহা আর পাওয়া যাইবে না," এ কথা বলিতেছি যে কেন, তাহার একটা মাত্র উদাহরণ প্রদান করিলেই পাঠকবর্গ সে কথার অর্থ বুঝিতে পারিবেন।

মহাভারতের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, বহু এদিক ওদিকের পর নানা সন্ধানের মধ্যে একটা সন্ধান এই পাওয়া যায় যে, কাটোয়া সবডিবিজনের অন্তর্গত মৌগ্রামের এক কলুবাড়ীতে কতকগুলি মহাভারত আছে। ছিলও সত্য, কিন্তু আমার লোক গিয়া দেখিল যে, পুঁথির পাতাগুলি এলো-মেলো, জড়-সড়, ছেঁড়া-ছুটো প্রভৃতি অবস্থাগ্রস্ত এবং তদতিরিক্ত বেস্ করিয়া তাল-পাকান ও উত্তম করিয়া গুণচটে বস্তাবন্দিপূর্ব্বক ঘানি-ঘরের আড়ার উপর উঠান আছে। এখানে মন্দের ভাল একটা এই দেখা গেল যে, বস্তার ভিতরে যাহাই ঘটুক, তাহাতে আসে যায় না; কিন্তু বস্তাটীর প্রতি কলুপুত্রের বিশেষ দৃষ্টি, অর্থাৎ সেটী কোন প্রকারে গৃহচ্যুত না হয়। এ যত্নের কারণ কি, তাহা জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে, মহাভারত ঘরে থাকিলে ঘরে আগুন লাগে না! কিন্তু এখানেও পাঠকদের একটা অবশ্য জ্ঞাতব্য ও শিক্ষিতব্য কথা আছে যে,—আগুন নিবারণ করিতে ছাপার পুঁথি তেমন মজবুত নহে, যেহেতু ছাপা জন্য তাহা ভ্রষ্ট ও দুষ্ট; সে শক্তি কেবল পুরাতন হাতের লেখা পুঁথিরই আছে এবং সেই জন্যই বস্তাটীর প্রতি কলুপুত্রের যত্ন এবং সেই জন্যই আমার সংগৃহীত পুঁথির এবারকার মত পরমায়ু রক্ষা! অতঃপর বলা বাহুল্য যে, আমাদিগকে অনেক বুঝাইয়া ও অনেক ভুলাইয়া তবে সে বস্তাটীকে হাত করিতে হইয়াছিল। এখন পাঠক বুঝিতেই পরিতেছেন যে, এ বস্তা আর কত কালই কলুপুত্রের গৃহদাহ নিবারণ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইত! আর অতি অল্পকালের মধ্যেই যে বস্তাটী জীর্ণ

ও তন্নিহিত পত্রগুলি যে একেবারে গলিত ও নষ্ট হইয়া যাইত, তাহা আর বেশী করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক রাখে না। অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত রামায়ণ মহাভারতাদি সম্বন্ধেও এতদ্রূপ কোন-না-কোন ঘটনা সকলের উল্লেখ করিতে পারা যায়। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, আমার সংগৃহীত পুঁথিগুলি অপেক্ষাকৃত হীনতর লোকের কুসংস্কারবশে রক্ষিত হওয়াতেই পরে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। নতুবা ভদ্রলোকের ঘরে যে সকল প্রাচীন পুঁথি ছিল, তাহা বহুদিন পূর্ব্বেই অনাবশ্যক বোধে বদল দিয়া সাদা কাগজ কেনা হইয়াছে!

রামায়ণের পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছি কত ও কিরূপ, তাহা আর এখানে বলিবার কোন আবশ্যক রাখে না। মহাভারত লইয়া এখানে কথা, সুতরাং এখানে তাহারই পরিচয় কিঞ্চিৎ প্রদান করি।

৭ খানি প্রাচীন মহাভারত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার মধ্যে চারিখানিতে অষ্টাদশ পর্ব্ব সম্পূর্ণ আছে, আর বাকী তিনখানিতে কোন পর্ব্ব আছে, কোন পর্ব্ব নাই। কোন্ পুঁথি কোথা হইতে পাওয়া গিয়াছে ও কে কতদিনের পুরাতন, তাহার পরিচয় দেওয়ার স্থান এখানে নহে; তবে যদি কখন সংশোধিত খাঁটি মূল উদ্ধার করিয়া তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে পারা যায়, তবে তাহারই ভূমিকাতে সে সকল বিবরণ দেওয়া যাইবে। আপাততঃ এই পর্য্যন্ত বলিতেছি যে, অধিকাংশ পুঁথি একশত বৎসরের অধিক পুরাতন; উহার একটা সমগ্র পুঁথি এত পুরাতন যে, তাহা ১১৪২ সালের অর্থাৎ ১৫৯ বৎসর পূর্ব্বের। সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক যে পুঁথি, তাহাও ৮০ বৎসরের এঁদিকের নহে।

এই সূত্রে আরও একটা কথা বলিয়া রাখি যে, কাশীরামের জন্মস্থানের নিকটবর্ত্তী শ্রীবাটী প্রভৃতি স্থান হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায়। ঐ প্রাচীন পুঁথির মধ্যে কাশীরাম দাসের ভণিতাযুক্ত আরও দুই খানি নূতন পুঁথি পাইয়াছি, যাহাদের অস্তিত্ব এ পর্য্যন্ত দেশমধ্যে কেহই অবগত ছিলেন না এবং সে দুই পুঁথি তত উৎকৃষ্ট রচনা না হওয়াতেই বোধ হয় এ পর্য্যন্ত তাহারা কাশীরামের বাসভূমির নিকটবর্ত্তী শ্রীবাটী প্রভৃতি হইতে অধিক দূরস্থানে প্রকাশিত ও প্রচলিত হইতে পারে নাই। ঐ দুই পুঁথির একখানির নাম 'নলোপাখ্যান' ও অপর খানির নাম 'জলপর্ব্ব'। এ দুই খানিও যেন কথকের মুখে শুনিয়া লেখার মত বোধ হয়। পুঁথি দুই খানি পড়িয়া আমার এরূপ অনুমান হইল যে, কাশীরাম দাসের ইহারা প্রথম-কালের লেখা। এ দুই পুঁথি লিখিবার পর যখন লিখন-বিষয়ে কাশীরামের নিজ-শক্তিতে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, তখনই যেন তাঁহার বৃহৎ গ্রন্থ মহাভারত আরম্ভ করিয়াছিলেন। এ দুই পুঁথি আপাততঃ যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিয়াছি; পরে যে উহাদের লইয়া কি করিব, তাহা এখনও নিরূপণ করিতে পারি নাই। মহাভারত অপেক্ষা ঐ দুই পুঁথির লেখা অনেক পরিমাণে কাঁচা।

অতঃপর বক্তব্য এই যে, যে সকল প্রাচীন মহাভারতের পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছি বলিয়া উল্লেখ করিলাম, তাহাদেরই পাঁচখানি একত্র মিলাইয়া যে মূলভাগ পাইলাম, তাহাই উপরে ছাপার পুঁথির সহ তুলনা করিয়া দেখাইলাম। ইহা দ্বারাই এখন পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, আমার উদ্ধৃত অংশ প্রামাণিক কতদূর।

অতঃপর গ্রন্থ-সম্বন্ধে আর অধিক কিছু না বলিয়া, কাশীরামের বাসস্থান ও জীবনী-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজগৃহ।

রাজ-গৃহ সম্বন্ধে বলিবার কথা অনেক আছে; দেখি, কতদূর পারি।

তালিকা-প্রারম্ভেই একটী বংশ দিতেছি,—কেন, তাহা পরে জানিবেন।

শ্রীশ্রী৺নারায়ণ	রন্তিনার
ব্রহ্মা	তংসু
অত্রি	ঐনিল
চন্দ্র	দুষ্মন্ত
বুধ	ভরত
পুরূরবা	বিতথ
আয়ু	ভবন্মন্যু
নহুষ	বৃহৎক্ষত্র
যযাতি	সুহোত্র
পুরু	হস্তী
জনমেজয়	অজমীঢ়
প্রচিন্বান্	ঋক্ষ
প্রবীর	সংবরণ
মনস্যু	কুরু
উভয়দ	সুধনু, জহ্নু
সুদ্যুম্ন	সুহোত্র
বহুগব	চ্যবন
সম্পাতি	কৃতক
অহংপাতি	* উপরিচর বসু
রৌদ্রাশ্ব	বৃহদ্রথ
ঋতেয়ু	জরাসন্ধ
রন্তিনার	

এই সদ্বংশ-সম্ভূত উপরিচর-বসু-নির্ম্মাপিত দুর্গের চিহ্নাবশেষই চিত্রে 'বসু-রাজার কেল্লা' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

মহারাজ উপরিচর-বসু হইতেই মগধের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত। রাজগৃহ, উপরিচর-বসু হইতেই সৌভাগ্যশালী।

উপরি-প্রদর্শিত বংশ-তালিকা বিষ্ণুপুরাণের উল্লিখিত। মহাভারতের আদি-পর্ব্বে ক্রমিক দুই অধ্যায়ে দ্বিবিধ বংশ-তালিকা লিখিত হইয়াছে। যথা,—

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

পুরু		দুষ্মন্ত
প্রবীর	রৌদ্রাশ্ব	ভরত
অনশ্বভানু		ভূমন্যু
ঋচেয়ু		সুহোত্র
মতিনার		অজমীঢ়
তংসু		ঋক্ষ
ঈলিন		সংবরণ
দুষ্মন্ত		কুরু *

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

পুরু	অবাচীন
জনমেজয়	অরিহ
প্রচিন্বান্	মহাভৌম
সংযাতি	অযুতনার
অহংযাতি	অক্রোধন
সার্ব্বভৌম	দেবাতিথি
জয়ৎসেন	অরিহ
অবাচীন	ঋক্ষ

* কুরুর পরে উপরিচর-বসু পর্য্যন্ত কয়েক পুরুষের পরিচয় মহাভারতে পাই নাই। তজ্জন্য এই বংশ-তালিকাতে কুরু পর্য্যন্তই লিখিয়াছি।

ঋক্ষ
|
মতিনার
|
তংসু
|
ঈলিন
|
দুষ্মন্ত
|
ভরত

ভূমন্যু

ভূমন্যু
|
সুহোত্র
|
হস্তী
|
বিকুণ্ঠন
|
অজমীঢ়
|
সংবরণ

কুরু

চতুর্নবতিতম অধ্যায়ের বংশ-তালিকা সংক্ষিপ্ত, এই কথা উল্লেখ করিয়া জনমেজয়, বৈশম্পায়নকে পুনরায় বিস্তৃতভাবে বংশ-কীর্ত্তন করিতে বলেন, তদনুসারে পঞ্চনবতিতম অধ্যায়ের বংশ বর্ণনা। সুতরাং ইহা বিশেষ সম্ভাবনা করা যায় যে, পৌরাণিক বংশ তালিকায় বংশের প্রধান প্রধান পুরুষেরই উল্লেখ থাকে। মহাভারতের প্রথম-উক্ত বংশ-তালিকায় প্রধান পুরুষ-পরম্পরারই নাম আছে। পর অধ্যায়ে তদপেক্ষা বিস্তৃত-বিবরণ অর্থাৎ অধিক-সংখ্যক প্রধান প্রধান পুরুষের উল্লেখ আছে। তবে ইহাঁদের তুল্য প্রধান প্রধান পুরুষ আরও এ বংশে ছিলেন। গ্রন্থকার-ভেদে এ সম্বন্ধে মতভেদও থাকিবার কথা। কোন গ্রন্থকার এক জনকে প্রধান এবং আর এক জনকে তদপেক্ষা ঈষৎ ন্যূন মনে করিয়াছেন; অপর গ্রন্থকার ঠিক ইহার বিপরীত ভাবিয়াছেন। যে স্থলে অতি অল্পমাত্রই তারতম্য, সে স্থলে মনুষ্যের রুচিভেদ, বিবেচনা-ভেদ এবং দেশ-কাল-ভেদে এইরূপ বৈপরীত্য-জ্ঞান সর্ব্বসমাজে, সকল সময়েই প্রচলিত। আর লিপি-প্রমাদ-বশে কিঞ্চিৎ নাম ব্যত্যয় ঘটিয়াছে, যথা;— ঋতেয়ু (বিষ্ণুপুরাণ) ঋচেয়ু (মহাভারত)। এক জনের দুই তিন প্রকার নামও হইত। যথা;— ঋচেয়ুর আর এক নাম—অনাধৃষ্টি (মহাভারত)। 'সার্ব্বভৌম' নামটীও আমার বোধ হয় ঋচেয়ুর। মহাভারতে পূর্ব্ব অধ্যায়ে ঋচেয়ু 'ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয় রাজা' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। পর অধ্যায়ে 'ঋচেয়ু' নামই নাই। তবে 'সার্ব্বভৌম' আছে। যিনি ভূমণ্ডলে অদ্বিতীয় রাজা, তাঁহার সার্ব্বভৌম নাম হওয়া অসঙ্গত নহে। বিষ্ণুপুরাণের যিনি রন্তিনার, মহাভারতে তিনিই মতিনার। ঐনিল এবং ঈলিনও এক ব্যক্তি।

ভূমন্যু এবং বিতথ একই ব্যক্তি। বিতথ নামটী যৌগিক।—ইত্যাদি। এইরূপ মীমাংসা করিয়া লইতে হইবে।

মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতির অনেক বচনে দায়-ভাগাদি-প্রকরণে পুত্র শব্দে পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র পর্য্যন্ত বুঝিতে হয়। তদ্রূপ ঐ সব পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক বচনেও পুত্র শব্দে বংশধর বুঝিতে হইবে। একটী দৃষ্টান্ত;— 'পৌষ্টী নাম্নী মহিষীর গর্ভে পুরুর তিন পুত্র উৎপন্ন হন, তাঁহাদিগের নাম—প্রবীর, রৌদ্রাশ্ব এবং ঈশ্বর।" এই অংশের ভাবার্থ,—"পুরু এবং তৎপত্নী পৌষ্টীর বংশে প্রবীর রৌদ্রাশ্ব প্রভৃতির জন্ম।" এরূপ অর্থ না করিলে মহাভারতের দুটী অধ্যায়ে পরস্পর বিরোধ হয়। অন্য গ্রন্থের সঙ্গেও বিরোধ হয়। আর কল্পভেদ অবলম্বন করিয়া মীমাংসা করিলেও সর্ব্বসামঞ্জস্য হয় কিনা সন্দেহ। অতএব জরাসন্ধের কাল-নির্ণয় হইলেও উপরি-চর-বসুর কাল-নির্ণয় হওয়া কঠিন। অর্থাৎ উপরিচর-বসু, জরাসন্ধের পিতামহ কি বহু পূর্ব্বপুরুষ, তাহা স্থির করা কঠিন।

দুইটী উপাখ্যান দ্বারা * পূর্ব্ব আশঙ্কা অপনোদিত হইলেও যোগযুক্ত পূর্ব্বতন পুণ্যশীল রাজগণের আয়ুষ্কাল নির্ণয় করাও সহজ নহে।

* একটী উপাখ্যানে বৃহদ্রথের ঔরসে জরাসন্ধের জন্ম, (মহাভারত সভাপর্ব্ব ষোড়শ অধ্যায় হইতে—) আর একটী উপাখ্যানে উপরিচর-বসুর ঔরসে বৃহদ্রথের জন্ম (মহাভারত আদিপর্ব্ব ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়) বর্ণিত আছে।

তবে বসুরাজা চারি হাজার বৎসরের যে পরবর্ত্তী নহেন, ইহা সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য।

গ্রীসের গৌরব যখন ভবিষ্যৎ-গর্ভে লুক্কায়িত, রোমের রমণীয়তা যখন লোকের স্বপ্নেরও অগোচর, সেই সময়ে—সেই বহু সহস্র বৎসরের পূর্ব্ব সময়ে রাজগৃহের সমৃদ্ধি-সৌভাগ্য দেখা দিয়াছিল। রাজগৃহের প্রতি যে উপরিচর-বসুর প্রথম দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল, তাহার এক প্রমাণ—পরম্পরা-প্রসিদ্ধ বসুরাজার দুর্গ; আর এক প্রমাণ রাজগৃহ-মাহাত্ম্য। রাজগৃহ-মাহাত্ম্য বায়ুপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত। কিন্তু এসিয়াটিক সোসাইটীর মুদ্রিত বায়ু-পুরাণে রাজগৃহ-মাহাত্ম্য নাই। না থাকিলেও রাজগৃহ-মাহাত্ম্যকে নিতান্ত অপ্রমাণিক বলা যায় না। অনেক কাল অনেক প্রদেশের লোক এই গ্রন্থসম্মত রাজগৃহ তীর্থ-কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আসিতেছে। মূল-পুস্তকের, বিশেষতঃ কতিপয় পুরাণ ও সংহিতার যে বিশেষ পরিবর্ত্তন ও পরিকর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহা সকলই জানিতে পারেন। রাজগৃহ-মাহাত্ম্যে আছে,—"উপরিচর-বসু রাজগৃহ-বনে যজ্ঞ করিয়াছিলেন।"

উপরিচর-বসু চেদি দেশের রাজা ছিলেন। নানাকারণে মুগ্ধ হইয়া তিনি শেষে হয় ত রাজগৃহে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন; তথায় যজ্ঞ করা এবং দুর্গস্থাপনা করা তাহারই পরিচায়ক।

সেই দুর্গের ভগ্নাবশেষ আজিও আছে. প্রাকৃতিক গিরিদুর্গের বহির্ভাগে এই দুর্গচিহ্ন—ঢিবি ঢাবা, আবর্ত্তুলাকৃতি দুর্গের সীমা-রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। চিত্র মনে কর, তাহাতে এই দুর্গের উল্লেখ আছে।

আমার কিন্তু সিদ্ধান্ত অন্যরূপ;—উপরিচর-বসু রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন নাই; তবে রাজাদের দুর্গ স্থানে স্থানে থাকে, তদনুসারে রাজগৃহেও বসুরাজা একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

বায়ু-পুরাণে গয়ামাহাত্ম্য প্রকরণে লিখিত আছে,—

"কীকটেষু গয়া পুণ্যা নদী পুণ্যা পুনঃপুনা।
চ্যবনস্যাশ্রমং পুণ্যং পুণ্যং রাজগৃহং বনম্॥"

মগধের মধ্যে চারিটী পবিত্র তীর্থ। তন্মধ্যে রাজগৃহ অন্যতম।

পবিত্র তীর্থে যজ্ঞ করা চিরপ্রচলিত নিয়ম। বসুরাজাও স্বাধিকারস্থ পবিত্রতীর্থ রাজগৃহে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তারপর তাঁহার অন্যতম পুত্র বৃহদ্রথ, মগধরাজ্য ভাগে পাইয়া রাজগৃহে রাজধানী স্থাপনা করেন।

মহাভারত আদিপর্ব্বে যাহা লিখিত আছে, তাহার মর্ম্ম এই,—"উপরিচর-বসু উগ্রতপস্যায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার কঠোর তপস্যা দেখিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ সভয়ে তাঁহার নিকটে আসিয়া তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন,—'রাজন্! লোকের ধর্ম্ম রক্ষা করুন, রাজধর্ম্ম পালন করুন।' ইন্দ্র বলিলেন, 'রাজন্! তুমি মর্ত্ত্য আর আমি ত্রিদিববাসী; তথাপি তুমি আমার সখা হইলে। চেদিদেশ সর্ব্ব প্রকারে শ্রেষ্ঠ; ধর্ম্মবাহুল্য, উর্ব্বরতা, রমণীয়তা, এবং নানাবিধ গুণ চেদিদেশে আছে। তুমি চেদিদেশে বাস করিয়া রাজ্য পালন কর।' ইন্দ্রের উপদেশে উপরিচর চেদিদেশে বাস করেন। ক্রমেই তাঁহার সমুন্নতি হইল। উপরিচর-বসুর পাঁচ পুত্র। পুত্রদিগকে তিনি ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে অভিষিক্ত করেন, অন্যতম পুত্র বৃহদ্রথকে মগধ রাজ্য দেন।" চেদিদেশ আর মগধদেশ এক নহে। ভারতের সভাপর্ব্ব প্রভৃতি নানাস্থানে সে কথা ব্যক্ত আছে। ইন্দ্রের উপদেশে যে দেশে বাস, তথা হইতে স্থানান্তরিত হওয়া সম্ভবপর নহে। কেমন কিনা

বসুরাজার দুর্গ বহির্ভাগে ছিল। পঞ্চপর্ব্বত-বেষ্টিত গিরিদুর্গ-রক্ষিত স্থান বসুনন্দন বৃহদ্রথের রাজধানী হয়।

এই রাজগৃহে মগধ-রাজ্যের রাজধানী বহুকাল ছিল। অনেকে বলেন,—অশোক, নূতন রাজধানী করেন। তাঁহার রাজধানী হয়—পাটলি-পুত্র। তাহা কিন্তু ঠিক নহে; কেন-না, মেগাস্থিনিস্ চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পাটলি পুত্রের বর্ণনাও অনেক করিয়াছেন।* চন্দ্রগুপ্ত—অশোকের পিতামহ। তবে একটী কথা আছে;—রাজগৃহের প্রকৃতি-রক্ষিত রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, পাটলি-পুত্রে রাজধানী স্থাপন করাও বিশেষ প্রবলরাজারই কর্ম্ম। জরাসন্ধের পরে মগধরাজ্যে শূদ্ররাজ † মহাপদ্ম অর্থাৎ প্রথম নন্দই অতি প্রবল রাজা বলিয়া পুরাণে পরিচিত। সম্ভবতঃ তিনিই রাজধানী পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

এ অনুমান সত্য হইলে, রাজগৃহ অন্যন প্রায় দুই সহস্র বৎসর রাজধানী ছিল। মধ্যে মধ্যে ভারতরাজ্য-লক্ষ্মীও এই স্থানে সরস্বতীর ক্ষুদ্র-তরঙ্গ-চুম্বিত শীত-সমীরণে ঘর্ম্ম অপনোদন করিয়াছেন, শীতকালে উষ্ণ-প্রস্রবণে অবগাহন করিয়াছেন।

বহুকাল রাজধানী ছিল বলিয়াই হউক, অথবা অসাধারণ রাজা জরাসন্ধের রাজধানী ছিল বলিয়াই হউক, এই স্থানটী রাজগৃহ নামে প্রসিদ্ধ হয়।

আমাদের এই 'রাজগৃহ' মহাভারতে 'গিরিব্রজ' নামে অভিহিত।

এইরূপ পঞ্চ পর্ব্বতেরও নামান্তর মহাভারতে দেখা যায়। যথা;—

"বাসুদেব বলিলেন, 'হে পার্থ! ঐ দেখ, মগধরাজ্যের মহানগর কেমন শোভা পাইতেছে! উত্তম উত্তম অট্টালিকায় সুশোভিত ঐ মহানগরী সুজলা, নিরুপদ্রবা এবং গবাদি-পূর্ণা। বৈহার, বরাহ, বৃষভ, ঋষিগিরি এবং চৈত্যক এই পঞ্চ মহাশৈল যেন একযোগ হইয়া গিরিব্রজ নগরকে রক্ষা করিতেছে। পুষ্পিত-শাখাগ্র সুগন্ধ-পূর্ণ মনোহর লোধ্র-বনরাজি ঐ শৈল-সমূহকে যেন লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছে। ঐ দেখ, গৌতমাশ্রমের সমীপে লোধ্র ও অশ্বত্থ-বনরাজি * সুপ্রকাশিত।"

মহাভারত সভাপর্ব্ব (২১শ অধ্যায়)।

বৈহার এবং বৈভার এই দুইটী নামের পার্থিক্য নাই বলিলেই হয়। এ দুটী নাম একই পর্ব্বতের।

তার পর সুপ্রচলিত প্রদক্ষিণ-ক্রমে নাম-নির্দ্দেশ করিলে, বুঝা যায়,—বরাহ এবং বিপুল; বৃষভ এবং রত্নকূট; ঋষিগিরি এবং গিরিব্রজ; আর চৈত্যক এবং রত্নাচল পর্য্যায় শব্দ। কিন্তু কোন্ পর্ব্বতের নাম বৈভার, কোন্ পর্ব্বতের নাম বিপুল, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বলা সুকঠিন। আমি চিত্রে যে নাম নির্দ্দেশ করিয়াছি ও প্রবন্ধে ব্যবহার করিয়াছি; তাহা পাণ্ডাদিগের উপদেশ মত।

সেই গিরিব্রজ নগরের এখন আর কিছুই নাই। যে গিরিব্রজ নগরের অধিস্বামী মহারাজ বৃহদ্রথ, তিন অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি সমর-দৃপ্ত, শ্রীমান্, অতুল বিক্রম-সম্পন্ন, যজ্ঞচিহ্নে নিয়ত ভূষিতগাত্র এবং ইন্দ্রতুল্য ছিলেন, এখন সেই গিরিব্রজ শ্মশান,—বুঝি শ্মশান অপেক্ষাও ভীষণ!

---

* গ্রীক ও হিন্দু।

† 'মুদ্রারাক্ষস' নাটকে কিন্তু ক্ষত্রিয়-রাজ বলিয়া কথিত।

* এই সব বনরাজিই বায়ু-পুরাণে "রাজগৃহং বনম্" লিখিবার মূল। কেহ কেহ বলেন, রাজগৃহ অতি প্রাচীন নাম।

সেই ভীষণ গিরিব্রজে আমি আর আমার পাণ্ডা পুনীত বেলা তিনটার সময়ে ঘুরিতে লাগিলাম। মাথায় পাহা'ড়ে প্রখর রৌদ্র, পাষাণ-কান্তার উত্তপ্ত।

আমার কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নাই। পুনীত বলিয়াছে, 'জরাসন্ধের দুর্গস্তূপ-চিহ্ন এবং রণভূমি দেখাইব।' যখন সেই রণভূমির কথা মনে করিতে লাগিলাম, তখনই আমার হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল। জানি না, কোন্ আবেশে তখন আমি বিহ্বল হইয়াছিলাম। সেই জরাসন্ধ, সেই ভীম, সেই অর্জ্জুন আর সেই সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীবাসুদেব যেন এখনও রণভূমিতে বর্ত্তমান, আমি তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য ছুটিয়াছি। আমার গতিবেগ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। পুনীত অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল,—"ঐ রণভূমি।" আমার চিত্রে যেখানে বড় 'ণ'টী আছে, সেই স্থান। আর দেখাইল,—"উত্তর পারে ঐ জরাসন্ধের দুর্গাবশেষ।" আমার চিত্রে সেই স্থানই জরাসন্ধের কেল্লা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আমি দেখিলাম, গুল্ম-গুল্ম-পরিবৃত সেই মহা রণভূমি; অশ্রুপূর্ণ-নয়নে রোমাঞ্চিত-শরীরে দেখিলাম। দেখিয়া ভাবিলাম, এই কি সেই মহাবল-পরাক্রান্ত অদ্বিতীয় যোদ্ধা পরম-শৈব রৌদ্রকর্ম্মা জরাসন্ধের প্রিয়-রণভূমি? এই কি তাঁহার নৃপতি-কুল ভীষণ মহাদুর্গ? ধন্য কাল! ধন্য তোমার মহাশক্তি! পাঠক! মহাভারতের সভাপর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ রাজসূয়-যজ্ঞের মন্ত্রণাকালে জরাসন্ধ-সম্বন্ধে যে যে কথা যুধিষ্ঠিরের নিকট বলিয়াছিলেন, তাহাতে একবার মনোযোগ কর;—

"শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—'মহারাজ! যুধিষ্ঠির! আপনি সকল গুণেতেই শ্রেষ্ঠ, অতএব সর্ব্বপ্রকারেই আপনার রাজসূয় যজ্ঞ করিবার অধিকার আছে। যদিও আপনি সকলই অবগত আছেন, তথাপি আপনাকে আমি কিছু বলিতে বাসনা করি। জামদগ্ন্য পরশুরাম যে ক্ষত্রিয়কুল নিঃশেষিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে লোকে যাহারা ক্ষত্রিয় নামে প্রচলিত আছেন, ইহাঁরা সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। হে ধরানাথ! নিদেশভাজন ঐ সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ যেরূপ কৌলিক নিয়ম করিয়াছেন, তাহা আপনার অজ্ঞাত নাই। প্রসিদ্ধ রাজপরম্পরা এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্য অস্বতন্ত্র ক্ষত্রিয়গণ আপনাদিগকে ঐল ও ইক্ষ্বাকুবংশের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেন। হে ভরতনন্দন! ঐল ও ইক্ষ্বাকুদিগের একশত কুল। যযাতির ও ভোজদিগের বংশ মহাগুণ-সম্পন্ন ও অতিশয় বিস্তীর্ণ; অধুনা তাহা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে। সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ উক্ত রাজগণ সম্বন্ধীয় সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর উপাসনা করেন, কিন্তু হে রাজন্! সম্প্রতি জরাসন্ধ ঐ সকল নরেন্দ্র-বংশীয়দের সৌভাগ্য অভিভব-পূর্ব্বক মহীপতিরূপে অভিষিক্ত হইয়া তেজোদ্বারা সকলকে আক্রমণ করত সর্ব্বোপরি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং অবনীর মধ্য-ভাগস্থিত মথুরাদি প্রদেশ স্বায়ত্ত করত আমাদিগের পরস্পরের ভেদ করিয়া দিতে মনস্থ করিয়াছে। মহারাজ! যে রাজা সকলের প্রভু, যিনি সমগ্র মহীমণ্ডলে একাধিপত্য করেন, তিনিই যুক্তিমত সাম্রাজ্যলাভের অধিকারী হন। হে ভূপতে! প্রতাপশালী শিশুপাল সর্ব্বপ্রকারে জরাসন্ধকে আশ্রয় করিয়া তাহার সেনাপতিত্ব পদ লাভ করিয়াছে। মহাবল পরাক্রান্ত মায়াযোধী করূষাধিপতি বক্র, জরাসন্ধের নিকট শিষ্যবৎ উপস্থিত থাকে। অপর মহাবীর্য্য-সম্পন্ন মহাপ্রাণ হংস ও ডিম্ভক উভয়েই ঐ মহাবলিষ্ঠ জরাসন্ধের অনুগত হইয়াছে। দন্তবক্র, করূষ, করভ ও মেঘবাহন, ইহারাও তাহার আশ্রয় লইয়াছে। মহারাজ! লোকে

যাহা অদ্ভুতমণি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, যিনি সেই দিব্যমণি মস্তকে ধারণ করেন; যে নরাধি মুরু ও নরকে শাসন করেন এবং পশ্চিমদেশে বরুণতুল্য আধিপত্য প্রচার করিয়া থাকেন; আপনার পিতার সখা সেই অপরিমিত বলশালী যবনাধিপতি বৃদ্ধ ভূপতি ভগদত্ত বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা জরাসন্ধ সমীপে প্রণত রহিয়াছেন; কিন্তু মনে মনে আপনার প্রতিও পিতার ন্যায় ভক্তিমান্ হইয়া স্নেহবদ্ধ আছেন। হে পুরুষপ্রবর! যিনি পশ্চিম ও দক্ষিণ দিগন্তের রাজা, সেই কুন্তিবংশবর্দ্ধনকারী, শৌর্য্যশালী শত্রুবিমর্দ্দন, আপনার মাতুল, একমাত্র পুরুজিৎ কেবল স্নেহ বশতঃ আপনার পক্ষ আছেন। হে পুরুষপ্রবর! যে দুর্ম্মতি চেদিদেশে সুবিখ্যাত; এই লোকমধ্যে যে আপনাকে পুরুষোত্তম বলিয়া স্বীকার করে এবং মোহ বশতঃ শঙ্খচক্রাদি মদীয় চিহ্ন সমস্ত সতত ধারণ করিয়া থাকে; অপিচ লোকমধ্যে যে বাসুদেব নামে বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ হইয়াছে; বঙ্গ পুণ্ড্র ও কিরাতরাজ্যের অধিপতি সেই বলশালী পৌণ্ড্রক রাজাও জরাসন্ধের আশ্রিত হইয়াছে। পূর্ব্বে আমি তাহাকে নিহত করি নাই বলিয়াই সে মগধরাজের আশ্রয় লইয়াছে। মহারাজ! যিনি পৃথিবীর চতুর্থাংশভোজী এবং ইন্দ্রের সখা; যিনি বিদ্যাবলে পাণ্ড্য ও ক্রথকৈশিকদিগকে জয় করিয়াছিলেন; যাঁহার ভ্রাতা আকৃতি, পরশুরাম তুল্য শূর ছিলেন; সেই শত্রুহন্তা বলসম্পন্ন ভোজরাজ ভীষ্মকও জরাসন্ধের অনুগত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার কুটুম্ব, সুতরাং অনুরক্ত ও আজ্ঞাবহ থাকিয়া সর্ব্বদা তাঁহার প্রিয় কর্ম্ম করি, তথাপি তিনি আমাদিগের প্রতি অনুরক্ত না হইয়া অপ্রিয় কর্ম্মেই প্রবৃত্ত থাকেন। হে রাজন্! তিনি আপনার বল ও কুলমর্য্যাদা না জানিয়া জরাসন্ধের প্রদীপ্ত যশোরাশি দৃষ্টে তাহার আশ্রিত হইয়াছেন। হে প্রভো! উত্তরদিকস্থ দিগের অষ্টাদশকুল, আর শূরসেন, ভদ্রকার, বোধ, শাল্ব, পটচ্চর, সুস্থল, মুকুট, কুন্তি, কুলিন্দ এবং অনুচর ও সহোদরদিগের সহিত শাল্বায়ন রাজগণ ঐ জরাসন্ধের ভয়েই পশ্চিমদিকে পলায়ন করিয়াছেন; দক্ষিণ পঞ্চাল ও পূর্ব্বকোশলস্থ রাজারা কুন্তিদেশে আশ্রয় লইয়াছেন, মৎস্য ও সন্নস্তপাদদেশীয় রাজন্যগণ ভয়পীড়িত হইয়া উত্তরদিক্ পরিহারপূর্ব্বক দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করিয়াছেন; এবং সমস্ত পাঞ্চালগণ জরাসন্ধ ভয়ে অভিভূত হইয়া স্বরাজ্য পরিত্যাগানন্তর সর্ব্বদিকে পলায়ন-পরায়ণ হইয়াছেন। * * * *

"হে ভরতসত্তম! আপনি নিত্যকাল সাম্রাজ্য ভোগের উপযুক্ত; অতএব ক্ষত্রিয়গণমধ্যে আপনাকে সম্রাটরূপে বিখ্যাত করুন। কিন্তু আমার বোধ হয়, মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে আপনি রাজসূয় মহাযজ্ঞ কদাচ সম্পন্ন করিতে পারিবেন না, কেন না সিংহ যেমন মহা হস্তিগণকে আক্রমণ করিয়া গিরিরাজ-কন্দরে বদ্ধ রাখে, তদ্রূপ ঐ জরাসন্ধ রাজগণকে পরাজয় করিয়া গিরিদুর্গে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। হে অরিন্দম! রাজগণ দ্বারা যজ্ঞ করিবার বাসনায় ঐ জরাসন্ধ উগ্রতর তপস্যা সহকারে উমাপতি মহাদেবের আরাধনা করিয়া যাবতীয় ভূপালকে পরাজিত করিয়াছে এবং তদ্দ্বারা উক্ত প্রতিজ্ঞা হইতেও উত্তীর্ণ হইয়াছে। সে ভূপালবর্গকে সৈন্য-সামন্তের সহিত পুনঃপুনঃ পরাজয় করিয়া স্বপুরে আনয়নপূর্ব্বক মহান্ জনসংবাদ করিয়া তুলিয়াছে। মহারাজ! তৎকালে আমরাও উহার ভয়ে মথুরা পরিত্যাগ করিয়া দ্বারবতী পুরীতে পলায়ন করিয়াছিলাম।"

(২২৩ পৃঃ সভাপর্ব্ব) *

* বঙ্গবাসীর প্রকাশিত মহাভারত।

সেই জরাসন্ধের এই দুর্গাবশেষ! সেই জরাসন্ধ এই রণভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ-অর্জ্জুনের সমক্ষে ভীমহস্তে নিহত হন। যতই ভাবি, ততই যেন আত্ম-বিস্মৃত হইতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে রণভূমির মৃত্তিকা অঙ্গে মাখিতে লাগিলাম। সেই শ্রীবাসুদেব-চরণ-চুম্বিত বীরভূমির পবিত্র মৃত্তিকা যতই মাখি, ততই অসীম আনন্দ হয়। সে মৃত্তিকা দেখিতেও অপূর্ব্ব; বালি নাই, কাঁকর নাই, একটু জল পড়িলেই অতি মোলায়েম, যেন মোম! এই মৃত্তিকা বৃন্দাবনে প্রেরিত হয়। বৃন্দাবনের গোপীচন্দন এই রণভূমি-মৃত্তিকা হইতেই প্রস্তুত। সেই মৃত্তিকা আমি খানিকটা লইয়া আসিয়াছিলাম, বিহারের মুন্সেফ যোগীন্দ্র বাবুও নিমীলিত-নয়নে সে মৃত্তিকা মাখিলেন।

তারপর শূন্য-হৃদয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চিত্র-প্রদর্শিত 'বৌদ্ধ-স্বামীর কেল্লা' ভূতলগত দুর্গস্তূপ-চিহ্ন দেখিলাম। সে স্থানটীকে লোকে 'আবা' বলে।

আমি দেখিলাম, দুই চারিজন লোক সেই স্থান খনন করিতেছে। উত্তোলিত স্বল্পভগ্ন কতিপয় বৌদ্ধ-মূর্ত্তি নিকটে পতিত রহিয়াছে দেখিলাম। খনকেরা বলিল,—"এরূপ মূর্ত্তি, ইহার ভিতর হইতে অনেক পাওয়া গিয়াছে; টাকা-কড়িও অনেকে অনেক পাইয়াছে।"

এই চিহ্নাবশিষ্ট দুর্গ কোন্ বৌদ্ধরাজার, তাহা আমি ঠিক করিতে পারি নাই। দুই একজন পাণ্ডা বলিল, "অশোকের।"

ইন্দোর রাজধানীতে দুর্গ নাই। রাজধানী-প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর মলহর রাওকে এক মন্ত্রী পরামর্শ দেন, "রাজধানীতে একটী দুর্গ করুন।" মলহর রাও উত্তর করিলেন, "দুর্গ মানুষকে রক্ষা করে,—না, মানুষ দুর্গকে রক্ষা করে?"

কথাটা বড়ই ঠিক। এই প্রকৃতির দুর্ভেদ্য দুর্গ-রক্ষিত গিরিব্রজ বা রাজগৃহের অবস্থা দেখিয়া কথাটা বড়ই ঠিক বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

আসিবার সময় আর একবার রাজগৃহের দিকে চাহিলাম। ভাবিলাম, হায়! একদিন শ্রীরামতনয় কুশের নিকট, পরিত্যক্ত পূর্ব্ব-রাজধানী অযোধ্যা-দেবীকে রোদন করিতে দেখিয়াছি, এখন আমরা রাজগৃহ-দেবীকে দেখিয়া রোদন করিতেছি! অযোধ্যাদেবী আপনার সুন্দরী-চরণালক্তকরঞ্জিত সৌধ-প্রকোষ্ঠে মৃগরুধির-রঞ্জিত ব্যাঘ্রপদপঙ্‌ক্তি দেখিয়া বিলাপ করিয়াছেন; আর আমরা রাজগৃহ-দেবতার সুচারু সৌধ-প্রকোষ্ঠের পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র-গুল্মাকীর্ণ বন্ধুর অবন্ধুর নিশ্চিহ্ন ভূতলে শ্বাপদ-পদচিহ্ন দেখিয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়াছি। অযোধ্যা-দেবী, নিজ দীর্ঘিকা-সলিলে, প্রমদা-করতল-স্খলনের পরিবর্ত্তে বন্য মহিষের শৃঙ্গতাড়ন শব্দ শ্রবণ করিয়া খেদ করিয়াছেন, আর আমরা রাজগৃহ-দেবতার দীর্ঘিকা-সমূহ, মরুভূমির স্বভাব-নিম্ন স্থলের ন্যায় খাতচিহ্নমাত্রে পর্য্যবসিত দেখিয়া কাতর হইয়াছি।

অযোধ্যা-দেবীর মুখে শুনিতে পাইয়াছি,—

'তদর্হসীমাং বসতিং বিসৃজ্য
মামভ্যুপেতুং কুলরাজধানীম্।'

অর্থাৎ হে রাজন্! এই বাসস্থলী পরিত্যাগ করিয়া এই পূর্ব্ববংশীয়গণের রাজধানীর প্রতি অনুগ্রহ করা আপনার উচিত।

আর রাজগৃহ-দেবতার মুখে কোন কথা শুনিতে পাই নাই। তাঁহার সেই বিষাদ-কালিমময় মাংসহীন নিঃশব্দ-ভীষণ বদনমণ্ডলে নৈরাশ্যের বিকট-ছায়া দেখিয়া শিহরিয়াছি। সেই সুধাকর-কৌমুদী-কান্তি বহুমণিভূষণ-ভূষিতা স্মিতমুখী নয়নানন্দ-বিধায়িনী রাজগৃহ-দেবতা আজ দীনা, হীনা, মলিনা, বিবর্ণা।

হে মহাকাল! হে তীক্ষ্ণহুতাশবক্ত্র!—

"লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমস্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো!"

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন

মিনতি।

শারদে! চরণে মিনতি,
দরিদ্রের বাসে আর এসনাক সতি!
যেথা লক্ষ্মী সেথা যাও, সেথা লক্ষ্মী সেথা রও;
দেব-নিষেবিত দেশে কর মা! বসতি।
শ্বেতকমলের গায় রেগে দুটী রাঙ্গা পায়
থেকে থেকে কেন মা! বীণায় মার তান?
কুন্দেন্দু-তুষার আভা দেখায়ে অঙ্গের শোভা
কেন মা! আকুল কর দরিদ্রের প্রাণ?
যেথা জরামৃত্যু নাই, সেথা মা! পাইয়ে ঠাঁই
কি লোভে এস মা! এই মরণের ঘরে?
যৌবনেই জরা যেথা, জীবনে মরণে গাঁথা
কেন মা সেথায় আনা দু'দিনের-তরে?
তুলিয়া তরঙ্গ প্রাণে, হৃদয়ের মাঝখানে
দিয়া দেবি! বসুমতী-ভার,
সহস্রধা ভাঙা হৃদে পাতি রাঙা-কোকনদে
কি আমোদে জীবন্তে জীবন হর তার?
সতিনীর তরে দেবি! ভ্রম দেশে দেশে।
একবার করি দয়া অলক্ষ্মীর প্রতি মায়া
ছাড়ি দিয়া যাও দেখি সতিনীর বাসে।
দেখিবে, আদর পাবে, অভিমান ভুলে যাবে,
লক্ষ্মী-মেয়ে বড় যত্নে দিবে তোমা স্থান।
সে ত মা! কথা না জানে, কথা কয় প্রাণে প্রাণে;
তাহার ঝঙ্কার যে মা! ললিতের তান।
দেখিবে, আদর পাবে, অভিমান ভুলে যাবে,
সতিনী-সন্তান নিত্য পূজিবে চরণ।
ঢেকে দিবে পীতবাসে, আদরের অভিলাষে
সোণায় মুড়িয়া দিবে ও হীরা-বরণ।
সে আদরে ভর ক'রে রহ গিয়া তার ঘরে
দয়া ক'রে অধম সন্তানে কর পর।
দুইদিন হাসি খেলি, তাই বলি মোরে ভুলি'
পদ্মে পদ্মে ছেয়ে ফেল কমলার ঘর।
যেথা লক্ষ্মী সেথা যাও, যেথা লক্ষ্মী সেথা রও;
দরিদ্রের প্রতি মাগো! এত যদি দয়া,
মানব-কল্লোলে তারে ফেল' না মা! এ সংসারে,
সংসারে একক তারে কর মহামায়া!

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

সমালোচনা।

সমগ্র ভারত ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি প্রণীত। এখানি "টেক্‌ষ্টবুক-কমিটির নির্ব্বাচিত ইতিহাসগুলির সার-সংগ্রহ।" সংগ্রহ অতি উত্তম হইয়াছে। বিদ্যানিধি মহাশয়ের দৃষ্টি দূরগামী। ইতিহাসে তাঁহার বিশিষ্ট অধিকার আছে। ভাষার বিশুদ্ধি-রক্ষায় তিনি সচেষ্ট ও সদাই-সাবধান। এ সংগ্রহটী, ইতিহাস-শিক্ষার্থী ছাত্রদিগের অনেক উপকারে আসিবে। প্রশ্নোত্তরগুলি সরল ও বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং লেখকের শ্রমও সার্থক হইয়াছে।

সিন্ধুবালা। (গার্হস্থ্য উপন্যাস) শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দে প্রণীত; মূল্য ।৵০ আনা। লেখক নূতন ব্রতী বলিয়া বোধ হয়। হউক, তিনি উৎসাহ পাইবার যোগ্য। সূক্ষ্ম বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আছে। তবে এখানি ঠিক 'উপন্যাস' নয়,—একটী সাদা-মাটা গল্প বটে। নাটকের উপাদান ইহাতে অতি কম, আখ্যায়িকার অংশই অধিক। উপযুক্ত লিপি-কুশলতা ও চরিত্র-অঙ্কনের ক্ষমতা জন্মিলে, কালে, লেখক একজন ভাল উপন্যাসকার হইতে পারিবেন, আশা করা যায়। গ্রন্থের কাগজ ও ছাপা বড় অপরিষ্কার।

ব্রহ্মচারী। (প্রাণধন হরিচন্দন প্রণীত।) এখানি এক ক্ষুদ্র কাব্য। ইহার ভাষা ললিত, কবিত্ব প্রশংসার যোগ্য। ইহার গল্পাংশও হৃদয়গ্রাহী। গল্পটী, কবি বড় কৌশলে চিত্রিত করিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে অনেক স্থানে হৃদয়ের আবেগ চাপিয়া রাখা যায় না। অনেক স্থলের বর্ণনাও অতি মনোহর। স্থানাভাবে তাহা উদ্ধৃত হইল না। আমরা কাব্যামোদী পাঠককে 'ব্রহ্মচারী' পড়িতে অনুরোধ করি।

নিকুঞ্জ-লীলা। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। এখানি একখানি রাধা-কৃষ্ণ-প্রেমলীলা-বিষয়ক খণ্ডকাব্য। লেখক অনেক স্থলে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের পদানুসরণ করিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন;—উৎকৃষ্ট পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। ভাবে, বৈষ্ণব কবিগণ কাব্য জগতে অতুলনীয়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সেই মনোহর মধুর সুরে সুর মিলাইয়া বীণায় ঝঙ্কার দিয়াছেন। ঝঙ্কার আরও মধুর হইত, যদি ছন্দে ও পদ-লালিত্যে তিনি সেই অমরকবিগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন। বলা বাহুল্য, "নিকুঞ্জ-লীলা"র ভাষা বিষয়োপযোগী হয় নাই।

স্বর্ণমণি পারিতোষিক-প্রবন্ধ। অর্থাৎ "মাতৃভক্তি এবং মাতৃ-উপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি" ও "ভাতের ফেন গালা অকর্ত্তব্য; তজ্জন্য এদেশবাসিগণ হীনবল ও নির্দ্ধন হইতেছে"—এই দুইটী প্রবন্ধ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়া উক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মিত্র মুস্তৌফী ও শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মিত্র মুস্তৌফী স্বর্গীয়া জননীর স্মরণার্থ এই "স্বর্ণমণি পারিতোষিক"-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। প্রথম প্রবন্ধটীর পুরস্কার-প্রাপ্ত-লেখক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি গোস্বামী ও দ্বিতীয়টীর লেখক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সাহা। প্রবন্ধ দুটীতে ভাবিবার বিষয় অনেক আছে। সাহিত্যের উন্নতি-কল্পে এরূপ পুরস্কার প্রথা প্রশংসনীয়।

হিন্দু-সুহৃদ্। ধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্র। বাগবাজার হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ৸০ আনা মাত্র। 'হিন্দু-সুহৃদ্' পাঠ করিয়া বড়ই তৃপ্তি-লাভ করিলাম। ইহাতে ধর্ম্মের অনেক গূঢ় কথার, ভগবদ্ভক্তি-বিষয়ক অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা হইতেছে। এরূপ পত্রের দীর্ঘজীবন একান্ত প্রার্থনীয়। বিষয়-বিবেচনায় মূল্যও খুব সুলভ বলিতে হইবে।

পুরোহিত। মাসিক-পত্র ও সমালোচন। শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি সম্পাদিত। পুরোহিত নূতন মাসিক-পত্র। কিন্তু নূতন হইলেও ইহার প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত। ধর্ম্ম, সাহিত্য, ইতিহাস, জীবনী, উপন্যাস, কবিতা—সকল বিষয়ই ইহাতে অল্প-বিস্তর আলোচিত হয়। সম্পাদক মহাশয় নিজে একজন কৃতী লেখক। নব্য লেখকগণকেও 'হাতে করিয়া মানুষ' করিবার ইচ্ছা তাঁহাতে দেখিতে পাই। এ ইচ্ছা সাধু ও বিশিষ্ট-সাহিত্য-সেবিগণের অনুকরণীয়। অনেক কাগজে দেখিতে পাই, সেই "থোড়-বড়ি-খাড়া ও খাড়া-বড়ি-থোড়,"—সেই ক'টী বাঁধা-লেখক, ক'টী বাঁধা-বিষয়ে লেখনী-চালনা করিতেছেন। কাগজগুলির নাম ভিন্ন ভিন্ন বটে, কিন্তু বিষয় ও লেখায় কোন বৈচিত্র্য নাই। নূতন লেখক তৈয়ার করিতে যেন ইহাঁদের মাথার দিব্য আছে। সম্পাদকের কাজ কি কেবল কতকগুলি নামজাদা, উপাধিধারী লেখকের লেখা প্রকাশ করা? তাহা হইলে তাঁহাতে ও প্রকাশকে প্রভেদ কি? দেখিয়া সুখী হইলাম, বিদ্যানিধি মহাশয় এ পথ অবলম্বন করেন নাই। তিনি নূতন ও পুরাতন লেখকের চিন্তা ও ভাব একত্রিত করিয়া সাহিত্যের পৌরোহিত্যে ব্রতী হইয়াছেন।

সৎসঙ্গ ও জ্যোতিঃ। এ দু'খানিও নূতন মাসিক পত্র। আকার ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু বিষয়গুলি মনোজ্ঞ। 'সৎসঙ্গ' প্রধানতঃ ধর্ম্ম ও সামাজিক কথায় পূর্ণ; 'জ্যোতিঃ'-সাহিত্য ও সমালোচনার অঙ্গ। ভাষার দিকে এ দুয়েরই একটু খর-দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

জন্মভূমি।

৪র্থ ভাগ। } ভাদ্র। ১৩০১। { ৯ম সংখ্যা।

দুই বন্ধু।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ঠিক দামোদরের উপর মহেশপুর নামে একটী ক্ষুদ্র-গ্রাম। গ্রামখানির অধিকাংশই কৃষকের বাস। গ্রামবাসীরা বড় সুখী—প্রায় কাহারও কোন অভাব নাই; যে যেমন লোক, জীবিকা-নির্ব্বাহের তার তেমনি উপায় আছে। কৃষকদের মধ্যে প্রত্যেকেরই প্রায় ১৫।১৬ বিঘা করিয়া জমি আছে; দেবতা প্রচুর বৃষ্টি না করিলেও কৃষকেরা দামোদরের জলে অবাধে চাষ-আবাদ করে,—মহেশপুরের উর্ব্বরা ভূমিতে যথেষ্ট ধান্য জন্মে। তা ছাড়া গ্রামবাসীরা দামোদরে বিনামূল্যে মাছ ধরিয়া খায়; তাহারা দামোদরের স্রোতোজলে স্নান করিয়া তাহার সুমিষ্ট স্বাস্থ্যকর বারি পান করিয়া সম্পূর্ণরূপে নীরোগ ও বলিষ্ঠ।

হরকালী ঘোষ মহেশপুরের একজন সম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি গ্রামের কৃষকগণের সহিত তেজারতি কারবার করিয়া থাকেন; গ্রামে তাঁহার ১০০ বিঘা লাখেরাজ। তাঁহার বাটীতে নিত্য শালগ্রাম পূজা হয়; গুরু-পুরোহিত অতিথি তাঁহার গৃহে দেবতার ন্যায় পূজা পাইয়া থাকেন। হরকালী একজন স্বনামখ্যাত পুরুষ,—তাঁহার এসব বিষয়-সম্পত্তি পৈতৃক নহে।

হরকালীর পুত্র-কন্যা কিছুই নাই; বাটীতে ছেলের মধ্যে কেবল তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অরুণ। অরুণ, হরকালীর কনিষ্ঠ-সহোদরের পুত্র। অরুণ জন্মিবার তিন চারি বৎসর পরেই তাহার পিতামাতা স্বর্গারোহণ করেন; সেই অবধি অরুণ জ্যাঠা-মহাশয়ের ও জ্যাঠাই-মার যত্নে লালিত-পালিত। তাঁহারা ভাবিতেন,—অরুণই তাঁহাদের পুত্র—অরুণ হইতেই এ বংশ রক্ষা হইবে, অরুণের জন্যই পিতৃপুরুষের পিণ্ড লোপ পাইবে না; অরুণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এসব বিষয়-আশয় তাহারই হইবে। এইরূপে অরুণ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; এক-দিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাকে কোন কষ্ট পাইতে হইল না। সুখের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অরুণের বাল্য-জীবন কাটিতে লাগিল। কে জানে, ভবিষ্যতে সে সুখের স্রোতে বিষের বাতাস বহিয়া দুঃখের তরঙ্গ উঠিবে কিনা?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মহেশপুরে একটী উচ্চ পাঠশালা ছিল; অরুণ সেইখানে লেখাপড়া শিখিতে লাগিল। লেখাপড়ায় অরুণের আন্তরিক যত্ন। অরুণের বড় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি; অতি অল্প কালের মধ্যেই সে, পাঠ অভ্যাস করিতে লাগিল। তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া গুরু মহাশয় একদিন হরকালীকে বলিলেন,—"ভগবান্ আপনার অরুণকে দীর্ঘ জীবী করুন, কালে ও একটা মানুষ হবে।" অরুণ যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি শিষ্ট ও শান্ত;—জ্যাঠা-মহাশয় ও জ্যাঠাই-মার একান্ত বাধ্য; গুরু মহাশয়ের প্রতি বড় ভক্তিমান্; সহপাঠী ও সমবয়স্ক বালকগণের সহিত তার বড় ভাব। অরুণ সেই অল্প বয়সেই বড় মিষ্টভাষী, সদালাপী এবং সত্যবাদী।

অরুণ ১১ বৎসরে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। গুরু-মহাশয় আবার তাহার জ্যাঠা মহাশয়কে বলিলেন,—"মহাশয়! ছেলে-টীকে ঘরে বসিয়ে রাখবেন না; মহিষরেখায় ভাল ইস্কুল আছে, সেখানে পাঠিয়ে দিন।" তিনি সেই কথা ঘরে আসিয়া নিজের স্ত্রীকে বলিলেন; শুনিয়াই অরুণের জ্যাঠাই-মা কাঁদিয়া আকুল,—"আমি কোথায় ছেলেকে পাঠাব! আমার দুধের ছেলে, সেখানে কে ওর যত্ন করবে? বাছা আমার একদণ্ড খেতে না পেলে, মুখ শুকিয়ে যায়; আমার প্রাণ থাকতে আমি বাছাকে ছেড়ে দিব না। লেখাপড়া শিখে কাজ নাই; আমাদের যা আছে, ওর খুব চলবে। আর দু'বছর পরে আমি বাছার বে দিয়ে ঘরে বউ এনে দুদিন সাধ-আহ্লাদ করি;—আমাদের আর কদিন?" হরকালী সেদিন গতিক ভাল নয় দেখিয়া আর কোন কথা কহিলেন না।

আর একদিন অবসরক্রমে তিনি তাঁহার [স্ত্রী]কে বলিলেন,—"দেখ, কথাটা তামাসা নয়, তুমি স্বীকার পাও,—অরুণকে পাঠিয়ে দাও।"

অরুণের জ্যাঠাই-মা বড়ই কাতর হইয়া [ব]লিলেন, "দেখ, ঐ নিষ্ঠুর কথাটী ছাড়। [আ]মার বুকে কেন আর ছুরি মার? বাপ্‌রে! [আ]মি বাছাকে পাঠাতে পার্‌ব না।"

হর। কেন পারবে না?

স্ত্রী। কোথা পাঠাব? বাছা আমার [এ]খনও ঘরের বার হয় নি।

হর। ব্যাটা ছেলে,—ভয় কি? পাঁচ [জা]য়গা যাবে-আসবে, তবে তো ভরসা হবে! [আ]র, অন্য কারও কাছে নয়, আপনার মাসীর [কা]ছে থাকবে। এতে আর তুমি অমত কর[ছ কে]ন?"

স্ত্রী। আমি মেয়ে-মানুষ, লেখাপড়ার ধার [ধা]রি না! তোমাকে অধিক আর কি বল্‌ব, [তো]মার দুটী পায়ে ধ'রে বলি, ছেলেকে-আমার [কো]থাও পাঠিও না। ও ঘরে ব'সে গুরু-[ব]ন্ধুবের সেবা করুক।

"তবে তোমার যা ইচ্ছে, তাই কর, আমি [কি]ছু জানি না" এই বলিয়া কৃত্রিম রাগিয়া [হ]রকালী বাহিরে যাইবার উপক্রম করিলেন। [স্ব]ামীকে রাগ করিতে দেখিয়া অরুণের জ্যাঠাই-[মা] কহিলেন,—"দ্যাখ, তুমি রাগ ক'র না; তুমিই [ভে]বে দেখ দেখি, অরুণকে পাঠিয়ে কি নিয়ে [ঘ]রে থাকব?" হরকালীরও চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল; তিনি কহিলেন,—"আমিও কি সুস্থির হ'তে পারব? কিন্তু কি করি? একটু স্নেহের জন্যে অরুণের কি পরকাল মাটি করব? অরুণ মানুষ হ'লে আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল হবে। সেখানে অরুণের কোন কষ্ট হবে না, আমি সব বন্দোবস্ত ক'রে দিব। আর মনে কর, সকালে লোক পাঠা'লে অরুণ বিকালে বাড়ী আস্‌তে পারবে।" অরুণের জ্যাঠাই-মা অগত্যা স্বীকৃতা হইলেন।

কুলাচার্য্যকে ডাকাইয়া হরকালী একটী ভাল দিন দেখাইলেন। যাবার দিনে জ্যাঠাই-মা অরুণকে স্বহস্তে খাওয়াইলেন; কোলে করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কত-কি বলিয়া দিলেন, কতবার মুখচুম্বন করিলেন, কতবার আশীর্ব্বাদ করিলেন। অরুণ কাঁদিতে কাঁদিতে জ্যাঠাই-মার কোল হইতে নামিয়া তাঁহাকে ও জ্যাঠা-মহাশয়কে প্রণাম করিয়া একজন চাকরের সহিত মহিষরেখা যাত্রা করিল। যতক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, জ্যাঠাই-মা তাহাকে দেখিলেন, অরুণও জ্যাঠাই-মার পানে চাহিয়া রহিল। যখন আর দেখিতে পাওয়া গেল না জ্যাঠাই-মা তখন ঘরে আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অরুণ-বিহনে আজ তাঁর গৃহ অন্ধকার!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অরুণ আসিয়া মহিষরেখার ইস্কুলে ভর্ত্তি হইল। মহিষরেখায় তাহার মাসীর বাড়ী। তাহার মেসো-মহাশয়ের অবস্থা অতিশয় মন্দ;—একে যৎসামান্য আয়, তার উপর আবার ছেলে-পুলে লইয়া খাইতে অনেকগুলি,—বেচারার কষ্টের একশেষ। সুতরাং অরুণকে পাঠাইয়া তাঁহার জ্যাঠা-মহাশয় সংসারটীর অনেক ব্যয়ভার নিজেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অরুণের বিদ্যা-বুদ্ধি ও নানা সদ্‌গুণে শিক্ষক ও ছাত্রগণ বড় মুগ্ধ হইলেন। সকলেই তাহাকে বড়ই ভালবাসিতে লাগিল। ক্লাসের সকল ছেলের সঙ্গেই তাহার খুব ভাব, কিন্তু মিহির নামে একটী ছেলের সহিতই খুব বেশী সখ্য হইল। মিহিরদের বাড়ী তাহার মেসো মহাশয়ের বাড়ীর পাশে; দুই জনে একসঙ্গে বসিয়া পড়া করিত, একসঙ্গে ইস্কুলে আসিত, একসঙ্গে বাটী যাইত; অনেক সময়ে একসঙ্গে খাইত, একসঙ্গে শুইত। মিহিরদের বাড়ীতেই পড়া-শুনা হইত; মিহির প্রায়ই তাহাকে নিজ বাড়ীতে খাওয়াইত মিহিরের মাও অরুণকে ছেলের মত দেখিতেন।

দেখিতে দেখিতে পূজার ছুটী নিকটবর্ত্তী হইল; অরুণ মিহিরকে তাহাদের বাড়ীতে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিল। সে মিহিরকে বলিল—"আমাদের বাড়ী যেতে হবে; তোমাকে আমার জ্যাঠাই-মা কত ভাল বাসবেন!" মিহির বড় আহ্লাদিত হইয়া এ-কথা মাকে জানাইল; তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইলেন।

ইস্কুল বন্ধ হইবার পরদিনেই অরুণ ও মিহির মহেশপুর যাত্রা করিল।

অরুণের জ্যাঠাই-মার ত আনন্দের সীমা নাই! তিনি যেন হাত-বাড়াইয়া আকাশের চাঁদ পাইলেন। এক চাঁদেই তাঁর ঘর আলো, আজ আবার দুই চাঁদের এক সঙ্গে উদয়! তিনি যে আহ্লাদে কি করিবেন, খুঁজিয়া পান না। মিহিরের কথা তিনি পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। অরুণ প্রতি পত্রে জ্যাঠাই-মাকে মিহিরের কথা লিখিত জ্যাঠাইমা স্নেহভরে দুজনের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন,—"আজ আমার ঘরে চাঁদের হাট।"

জ্যাঠাই-মা প্রত্যহ স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া দুটী ছেলেকে কত যত্ন করিয়া খাওয়াইতেন। মিহির তাঁহার যত্নে মা-বাপকে ভুলিয়া গেল।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। সুখের দিন বুঝি আরও শীঘ্র যায়! সুখের পূর্ণিমা-নিশা বুঝি ভোগ না-হইতে হইতেই পোহাইয়া যায়! দেখিতে দেখিতে ছুটী ফুরাইয়া আসিল। আবার অরুণ ও মিহিরকে মহিষরেখা যাইতে হইবে। জ্যাঠাই-মার স্নেহের পাশ কাটিয়া আবার দুটী ছেলে তাঁহার কোল-ছাড়া হইবে! আবার কতদিন বাদে যে তিনি তাদের চাঁদ

মুখ দেখিবেন, তাহার ঠিক নাই। এ কয়দিন ছেলে দুটীকে লইয়া জ্যাঠাই-মা কতই ব্যস্ত! পাড়া-প্রতিবাসীর সঙ্গে একটা কথা কহিবারও বুঝি অবসর নাই! ছেলে দুটী যাইলে তিনি শূন্যগৃহে শূন্যমনে বসিয়া কতই কাঁদিবেন! যে কয়দিন ছেলে দুটী আসিয়াছে, জ্যাঠাই মা রোজ কত-কি খাওয়াইতেছেন, তবু তিনি ভাবেন,—ছেলেদিগকে পেট-ভোরে খাওয়াতে পারলেম না। ছুটীর সব দিন গেল; ছেলেরা কাল যাবে, মাঝে কেবল তাহারা রাতটুকু আছে। জ্যাঠাই-মা সেরাত্রি আর ঘুমাইলেন না। ছেলেদের কাছে বসিয়া কত কথা কহিলেন, তাহাদিগকে কত-কি বলিয়া দিলেন, কত আশীর্ব্বাদ করিলেন,—চিরকাল যেন তাহাদের সদ্ভাব থাকে, কখনও যেন তাহাদের অমিল না হয়, মধুসূদনকে এ কথা কায়মনে কতবার জানাইলেন!

প্রভাতে উঠিয়াই অরুণ ও মিহির মহিষরেখা যাত্রা করিল। জ্যাঠাইমা পথ পানে চাহিয়া চাহিয়া কত কাঁদিলেন!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

উমাকান্ত রায় মহিষরেখার একজন পুরাতন অধিবাসী। তিনি ধনবান্ না হইলেও গ্রামের সকলে তাঁহাকে বড় মানিয়া-গণিয়া থাকে; আজকাল পয়সা-ওয়ালাকেই সকলে ভয় করে; কিন্তু বৃদ্ধ উমাকান্তকে, কি গুণে জানি না, সকলেই বড় ভয় ও ভক্তি করিত। শুনিয়াছি, তিনি বড় সরল-প্রকৃতি ও পরোপকারী লোক ছিলেন।

সংসারে আপনার বলিতে উমাকান্তের একটীমাত্র কন্যা,—কন্যাটীর নাম কিরণময়ী; কিরণ যখন ছয়মাসের, তখন সে মাতৃহীনা হয়। বাপ, মেয়েটীকে বড়ই ভাল বাসিতেন; তিনি বলিতেন,—"কিরণ আমার আঁধারের আলো, নিরাশার আশা, হৃদয়ের শান্তি; কিরণ আমার স্নেহের লতিকা, প্রীতির কুসুম, মমতার ছবি।" কিরণ দেখিতে বড় সুন্দর;—রংটী ঠিক বৈশাখী চাঁপার ন্যায়, চক্ষু দুটী যেন ফুটন্ত কাল অপরাজিতা, ঠোঁট দুখানি বড় মধুর—মৃদু হাসিটুকু সদাই তাহাতে লাগিয়া আছে। কিরণের মাথায় রাশীকৃত চুল—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; তাহা এলো করিয়া পৃষ্ঠে ছড়াইয়া দিলে, কিরণকে প্রতিমার মত দেখাইত।

সৎপাত্রে কন্যা দিতে কার না ইচ্ছা? বৃদ্ধ উমাকান্ত সদাই কিরণের কথা ভাবিতেন; দূরদেশে তিনি কিরণকে পাঠাইতে চান না; তাঁহার ইচ্ছা, নিকটে কোন সৎপাত্র দেখিয়া কিরণের বিবাহ দেন। কিরণ এখন সাত বছরের; উমাকান্ত ভাবিতে লাগিলেন,—"আমার কপালে কি গৌরী-দানের ফল নাই?"

মিহির ছেলেটী উমাকান্তের পছন্দ-সই;—বাপের দুপয়সা সঙ্গতি আছে; ছেলেটী লেখাপড়া শিখিতেছে, বড় সুশীল ও সুবোধ, আর তিনি শুনিয়াছিলেন, মিহিরের মা বড় স্নেহময়ী;—তাই তিনি ভাবিয়াছিলেন, এসংসারে তাঁর কিরণ সুখে থাকিবে।

একদিন বাটীতে কি কার্য্য উপলক্ষে উমাকান্ত গ্রামস্থ স্বজাতিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন; তাহাতে মিহির আসিয়াছিল, অরুণও তাহার মেসো-মহাশয়ের সহিত আসিয়াছিল। অরুণ ও মিহির একসঙ্গে বসিল, উমাকান্ত অরুণের বিষয় শুনিয়াছিলেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখেন নাই; এক্ষণে অরুণের সব পরিচয় পাইলেন। বৃদ্ধ তখন মনে মনে ভাবিলেন,—"এরা একগাছে দুটী ফুল, এক-আকাশে দুটী চাঁদ! এদের কোন্‌টীকে রেখে কোন্‌টীকে লওয়া যায়? আহা, বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি! দুটীতে রূপেও যেমন, গুণেও

তেমন! দুটীতে কি চমৎকার ভাব! মার পেটের ভাইয়ে ভাইয়ে এত ভাব হয় না। এদের বুঝি শাপভ্রষ্ট জন্ম! এরা বুঝি মনুষ্য-রূপে দেবতা! আজ আমার গৃহ পবিত্র হইল।” বৃদ্ধের হৃদয়ে ভাবের লহরী বহিতে লাগিল, চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হইল।

ছেলে দুটীকে দেখিয়া বৃদ্ধ উমাকান্ত এমনি হইয়াছিলেন, যেন তিনি কত মুস্কিলে পড়িয়াছেন! কাহাকে কন্যা দিবেন? তাঁহার চক্ষে দুটীই সমান। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া বৃদ্ধ ঠিক করিলেন, মিহিরের সঙ্গেই বিবাহ দিব। একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে মিহিরদের বাড়ীতে গেলেন। মিহিরের পিতা, রায় মহাশয়কে বড়ই খাতির-যত্ন করিলেন; বৃদ্ধ মিহিরের সহিত কিরণের বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। মিহিরের বাপ, বড় পয়সাখোর লোক; তিনি একটু ভারি মেজাজে কহিলেন,—“রায় মহাশয়! মিহির আগে “পাশ” দিক, তার পর কথা।”

আপাততঃ কথা স্থগিত রহিল; বৃদ্ধ মনে মনে কত সুখের ছবি আঁকিতেছেন; কাল কিন্তু অলক্ষ্যে বসিয়া ঘটনার সূত্র অন্যদিকে ফিরাইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ইস্কুলের সকলেই জানিত, অরুণ ও মিহিরে বড় ভাব,—দুটীতে এক প্রাণ। পাড়া-প্রতিবাসীরা বলিত, এদের একজনের গলায় জল ঢালিলে দুইজনের গলায় পড়ে। ধরিতে গেলে, অরুণ মিহিরদের বাড়ীতেই থাকিত, দুইজনে একসঙ্গে পড়িত একসঙ্গে খাইত, এক সঙ্গে ঘুমাইত;—একটী আর একটীকে ছাড়িয়া ক্ষণকাল থাকিত না। মিহিরের মা বড় স্নেহময়ী, তিনি কখনও অরুণকে পরের ছেলে ভাবিতেন না; বরং মিহিরকে পিছু রাখিয়া অরুণকে আগে দেখিতেন। অরুণ বাটী যাইয়া এ সব কথা জ্যাঠাই-মাকে বলিত। জ্যাঠাই-মা বলিতেন,—“সে পূর্ব্বজন্মে কত পুণ্য করিয়াছিল, তাই তোমরা দুইজনে তার ঘর আলো ক'রেছ।”

ইস্কুল হইতে আসিয়া দুইজনে নদীর ধারে বেড়াইতে যাইত। ঠিক আদালতের পাশ দিয়া দামোদর প্রবাহিত; দেখিতে সেখানটী বড় সুন্দর। সেখানে একটী কাঠের ছোট সেতু আছে, দুইজনে সেই সেতুর উপরে বসিয়া স্থির-ভাবে সান্ধ্য-জল-কল্লোল শুনিত। আদালতের সম্মুখে সাহেবদের বড় বাংলা; বাংলার পাশে খুব বড় ফুলবাগান,—বাগানের মাঝে বড় পুষ্করিণী,—পুষ্করিণীর বাঁধা-ঘাট। বাংলার সাহেব ইস্কুলের ছেলেদিগকে সেই বাগানে বেড়াইতে দিতেন। অরুণ ও মিহির প্রায় এই বাগানে বেড়াইতে আসিত। দুইজনে বাগানের একটী নিভৃত স্থানে বসিত। চারিদিকে ফুল ফুটিত, গন্ধ ছুটিত, চাঁদ উঠিত; দুটীতে আপনার মনে আপনাদের কথা লইয়া ব্যস্ত থাকিত। কথাই বা এমন কি? তাহাদের ক্ষুদ্র-জীবনের ক্ষুদ্র-কথা! সে কথায় কবিত্ব নাই, কল্পনার কুহেলিকাও নাই। তুমি-আমি হয় ত সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিই, কিন্তু তাহারা ইহাতেই বিমল আনন্দ ভোগ করিত। তোমার-আমার হৃদয় যতই নীরস হউক, তুমি-আমি যতই গুরু-গম্ভীর বিষয় ভালবাসি না কেন, তথাপি যাইতে যাইতে এক মিনিট দাঁড়াইয়া যদি তাহাদের কথা শুনি, যদি তাহাদের সেই সরলতা পূর্ণ মিষ্ট কথা গুলিতে কাণ দেই, আমাদের অন্তঃকরণ নিশ্চয় গলিয়া যাইবে,—তাহাদের নিকট হইতে আর যাইতে ইচ্ছা হইবে না।

একদিন রবিবারে বাংলার সাহেবেরা শিকার করিতে গিয়াছিলেন; ঠিক দুপুরবেলা অরুণ ও মিহির সেই বাগানে বেড়াইতে

আসিল। বাগানের পুষ্করিণীতে সাহেবদের 'বাচ' খেলিবার 'পিনেস্' নৌকা ছিল। ছেলেমানুষ, তাই দেখিয়া তাহাদের 'পিনেসে' চড়িতে ইচ্ছা হইল। যেমন ইচ্ছা, অমনি কাজ! দুইজনে 'পিনেসে' চড়িয়া বসিল, কিন্তু কেহই চালাইতে জানে না; 'পিনেস' হঠাৎ একদিকে হেলিয়া যাওয়ায় অরুণ জলে পড়িয়া গেল। মিহির দেখিল, চারিদিকে কেহ কোথাও নাই। মিহির সাঁতার জানিত, তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। অরুণ সাঁতার জানিত না, ক্রমে জলমগ্ন হইতে লাগিল। মিহির সজোরে তাহাকে এক হাতে ধরিল, অপর হাতে তেমনি জোরে 'পিনেস' খানি ধরিয়া রহিল। মিহিরের এই বুদ্ধিতে দুইজনেই জলে ভাসিতে লাগিল,—কেহ ডুবিল না। তারপর পায়ে করিয়া জল ঠেলিয়া, ভাসিতে ভাসিতে মিহির অরুণকে লইয়া তীরে আসিয়া উঠিল।

তীরে উঠিয়া অরুণ কি বলিয়া যে মিহিরকে কৃতজ্ঞতা জানাইবে, খুঁজিয়া পায় না। মিহির কহিল,—"ওসব কথা রাখ ভাই, কাহাকেও আজিকার কথা ব'ল না;—ক্লাসে কি বাড়ীতে, কাকেও নয়। তা'হলে আর আমরা বেড়া'তে আস্‌তে পাব না। এমন ক'রে আর আমরা কখনও নৌকাতে উঠ বো না।" দুইজনে রৌদ্রে কাপড় শুকাইয়া ঘরে গেল।

অরুণ ও মিহির ব্যতীত এ জলে-ডোবার কথা ভবিষ্যতে আর একজন জানিয়াছিল। সে, কিরণ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে বৎসর কাটিয়া গেল; অরুণ ও মিহির আঠার বছরে পড়িল। এক মাস পরেই দুইজনে প্রশংসার সহিত "এন্‌ট্রান্স পাশ" হইল। সময় বুঝিয়া উমাকান্ত রায় আবার বিবাহের কথা তুলিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মিহিরের বাপ বড় পয়সাখোর;—শুধু পয়সাখোর হইলেও বাঁচা যাইত; তিনি বড় কলহপ্রিয়, বড় অহঙ্কারী, বৃথা-অভিমানী। সর্ব্বদা মালী-মোকদ্দমা ভাল বাসেন, গ্রামে অনর্থক দলাদলি বাঁধাইয়া থাকেন। উমাকান্তের কথা শুনিয়া মিহিরের পিতা কহিলেন,—"রায় মহাশয়, যদি নগদ হাজার টাকা দিতে পারেন, আপনার কন্যাকে পুত্রবধূ করিব।" কর্ত্তায় কর্ত্তায় এইরূপ দেনা পাওনার কথা চলিতে লাগিল; মিহির বা অরুণ এসব কথার বাষ্পও জানিলেন না।

এদিকে মিহিরের মা একদিন মেয়েটীকে বাড়ীতে আনাইলেন; তখন মিহির ও অরুণ ঘরে বসিয়া পড়িতেছিলেন। মা কোলে করিয়া কিরণকে ঘরের ভিতর আনিলেন; মিহির জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়েটী কে মা?"

মা। জান না মিহির! এটী রায় মশাইয়ের মেয়ে।

মি। হাঁ মা! সেবারে খেতে যেয়ে দেখেছি বটে।

মা। হাঁ। কেমন মেয়েটী বল দেখি?

মি। দিব্য মেয়েটী।

মা, কিরণের মুখখানি ধরিয়া তুলিলেন, মিহির দুই তিন বার ধরিয়া কিরণের মুখখানি দেখিলেন; কিরণ কিন্তু মাটীর পানে চাহিয়া। অরুণ সেদিক পানে না চাহিয়া একখানি বই পড়িতেছিল। মিহিরের মা অরুণকে কহিলেন, "তুমিও কিরণকে দেখ না বাবা?"

অরুণ, কিরণের মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন সহসা কিরণের দৃষ্টিও অরুণের উপর পড়িল,—চারি চক্ষু মিলিত হইল; এ মিলন কেবল তাহারা দুই জনেই দেখিল। মিহির বা তাহার মা এ মিলন দেখিতে পাইলেন না।

মা জিজ্ঞাসিলেন,—"অরুণ! কিরণ কেমন মেয়েটী বল দেখি?"

একেতো অরুণ বেশী কথা কহিত না। এখন আবার তার উপর লজ্জা-লজ্জা করিতে লাগিল। অরুণ আস্তে আস্তে বলিল,—"বেশ মেয়েটী।" এই বলিয়া আবার বইখানি পড়িতে বসিল। মা, কিরণকে লইয়া ঘর হইতে চলিয়া গেলেন।

মিহির অরুণকে জিজ্ঞাসিল,—"কি বই পড়ছ?"

"কিছুই না" বলিয়া অরুণ বই-পড়া বন্ধ করিল; তার পর মিহিরের পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া কিরণের কথা তুলিয়া কহিল,—"ওসব দেখিতে আমার বড় লজ্জা করে ভাই।"

দুইজনে গৃহ হইতে বাহির হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

একদিন বৈকালে মিহিরের পিতা মিহিরকে কোথায় পাঠাইয়াছিলেন; অরুণ তাহাদের বাড়ীতে আসিবামাত্র মিহিরের মা বলিলেন,—"মিহির সন্ধ্যার আগেই আস্‌বে, তোমাকে একা বেরুতে সে অনেক ক'রে বারণ ক'রে গেছে, ঘরে ব'স বাবা!" অরুণ ঘরে বসিলেন।

সেদিন বৈকালে উমাকান্ত রায়ের বাড়ীর দাসী কিরণকে লইয়া মিহিরদের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছিল। কিরণ এধার ওধার বেড়াইতে বেড়াইতে যে ঘরে অরুণ আছেন, সেইখানে যাইয়া হাজির হইল; আবার কিরণের চোখে অরুণের চক্ষু পড়িল; অরুণের মুখমণ্ডলে লজ্জার ছায়া অঙ্কিত হইল, কিরণের সুন্দর মুখখানিও লাল হইয়া উঠিল। আহা! কিরণের সে সুন্দর বালিকা-মূর্ত্তি কি নয়ন-মনোহর! অরুণ ভাবিলেন,—"দেবতারা বুঝি স্বর্গের একটী পারিজাত-কুসুম ধরায় নিক্ষেপ করিয়াছেন! কি অতুল রূপরাশি!" নির্ম্মল আকাশ হইতে, সপ্তমীর চন্দ্র যেমন ধীরে ধীরে গভীর বনভাগ-পার্শ্বে অদৃশ্য হইয়া যায়, কিরণও সেইরূপ ধীরে ধীরে সেখান হইতে সরিয়া আসিল, কিন্তু অরুণের হৃদয় হইতে সে রূপের জ্যোতিঃ আর অন্তর্হিত হইল না।

এ ব্যাপার আর কেহ দেখিল না। কিরণ ধীরে ধীরে আসিয়া দাসীর পাশে বসিল। মিহিরের মা, দাসীর সহিত মিহির ও অরুণের বিবাহের কথা কহিতে লাগিলেন; সেই সময়ে অরুণ বাহিরে আসিলেন। অরুণকে যাইতে দেখিয়া মা কহিলেন,—"কোথা যাও বাবা?" "এখনি আস্‌ছি" বলিয়া অরুণ দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

অরুণ যাইয়া বাংলার বাঁধা ঘাটে বসিলেন। তখন সূর্য্যঠাকুর পাটে বসিয়াছেন। পুষ্করিণীর স্বচ্ছনীরে ধীর-সমীরে ছোট ছোট ঢেউগুলি ভাসিয়া যাইতেছে, তাহাতে তপনের রক্ত বর্ণ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে,—যেন জলের ভিতর আগুন লাগিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সূর্য্য অস্ত গেলেন, চারিদিকে অন্ধকারের ছায়া পতিত হইতে লাগিল। অরুণ ঘাট হইতে উঠিয়া একা বেড়াইতে লাগিলেন। যেদিকে ছেলে বেশী, অরুণ সেদিকে আদৌ গেলেন না; তবু ভুবনের সঙ্গে দেখা হইল। সে জিজ্ঞাসিল, —"আজ মিহির কোথা ভাই?" অরুণ তাহার মুখের পানে একবার চাহিয়া একটু ভাবিয়া কহিলেন,—"সে ঘরে আছে।" শুনিয়া শ্যাম কহিল,—"দুজনে আজ ছাড়াছাড়ি কেন?" অরুণ একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিলেন,—"না, ভাই। আমার ভুল হ'য়েছে, সে এখনি আস্‌বে।" নগেন জিজ্ঞাসিল,—"অরুণ! আজ তোমার মনটা এত চঞ্চল কেন?" অরুণ কহিলেন, "কৈ, না!" সকলে চলিয়া গেল; অরুণ আসিয়া এক অশোক-তরু-তলে বসিলেন। সেখানটী পাথর দিয়া বাঁধানো।

ক্রমে চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিল। অরুণ ভাবিলেন,—"কাল রবিবার আছে, এখানে একটু বসি।" অরুণ বসিয়া বসিয়া সেখানে শুইয়া প'ড়লেন। শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"সে যে স্বর্গের সুধা! সে কত সুন্দর! তার অতুল রূপরাশি! তার সে সুন্দর চোখের তুলনা নাই।" অরুণের দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। ভাবিতে ভাবিতে অরুণ যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, আবেশে চক্ষু বন্ধ হইয়া আসিল। একে সন্ধ্যা-কাল, শীতল সমীরণে ও অসংখ্য ফুলের সৌরভে অরুণ ঘুমাইয়া পড়িলেন। ধীরে ধীরে চাঁদ উঠিল, অরুণের সুন্দর মুখখানি সে কিরণে হাসিয়া উঠিল। সমস্ত বাগানটী নীরব, কেহ কোথাও নাই, সকলেই চলিয়া গিয়াছে, কেবল অরুণ সেই গাছতলায় একা ঘুম-ঘোরে অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

এমন কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলেন, তাহা তিনি জানেন না। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন; হঠাৎ ঘুমের ঘোরে বলিয়া উঠিলেন,—"না, জ্যাঠাই-মা! তুমি কাছে ব'স; তোমার কোলে মাথা দিয়ে শুই।" ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। একি আশ্চর্য্য! শিয়রে কে? কাহার কোলে মাথা দিয়া অরুণ এতক্ষণ ঘুমাচ্ছিলেন? এ যে মিহির! অরুণ উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"মিহির! তুমি কোথা থেকে? আমি কি তোমারই কোলে মাথা দিয়া ঘুমাচ্ছিলাম?" মিহির কহিলেন,—"হাঁ ভাই।"

অরুণ জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি কতক্ষণ এসেছ?"

মিহির কহিলেন,—"অনেকক্ষণ।"

দুইজনে ঘরের দিকে চলিলেন। অরুণকে মিহির জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলে?"

অরুণ কহিলেন,—"স্বপ্নে দেখ্‌লাম আমি যেন একটা মাঠে শুইয়া আছি, কাছে আমার কেবল জ্যাঠাই-মা আছেন; কে একটী স্ত্রীলোক যেন জ্যাঠাই-মাকে ডাকিয়া লইয়া চলিল। আমি যেন কাঁদিয়া জ্যাঠাই-মাকে ডাকিতে লাগিলাম, কিন্তু জ্যাঠাই-মা আমার কথা শুনিলেন না।"

দুইজনেই ভাবিতে ভাবিতে গৃহে গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অরুণের মনের শান্তি নষ্ট হইয়াছে। তাঁহার আহারে অরুচি, ভ্রমণে বিতৃষ্ণা, পাঠে অমনোযোগ, কথায় ভুল, স্মৃতিতে ভ্রংশ—এইসব ঘটিয়াছে। দুইতিন বার ডাকিলে তিনি উত্তর দেন; কখনও বিরক্ত হন। সম্মুখে কেহ আসিলে একেবারে তাহাকে ঠাওরাইতে পারেন না। তাঁহার সে 'ভাসন্ত' চোখ দু'টী বসিয়া গিয়াছে, চোখের কোণে কাল দাগ দেখা দিয়াছে।

অমৃতের সরোবরে বিষের বাতাস বহিয়াছে! মনোহর উদ্যানে দাবাগ্নি জ্বলিয়াছে! সুখের নন্দন-কানন দুঃখের মরুভূমি হইয়াছে! স্বর্গের পারিজাত মর্ত্ত্যের উত্তাপে শুকাইয়াছে! স্নিগ্ধ চন্দ্রিকা আজ মেঘে ঢাকিয়াছে! অফুটন্ত কুসুম আজ অসময়ে ঝরিয়াছে! অকালে আজ নদীতে 'বান' ডাকিয়াছে! অসময়ে আজ নির্ম্মল গঙ্গা উদ্বেলিত হইয়াছে!

মিহির এসব লক্ষ্য করিলেন, কাহাকেও কিছু বলিলেন না; আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন এমন হইল? কেন এ অশান্তি? কেন এ অতৃপ্তি? কিসের এ পরিবর্ত্তন? সুস্থ দেহ অসুস্থ হইল কেন? তেমন সরল মনে গরলের বাতি জ্বলিল কেন?" মিহির অরুণকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না; তিনি লুকাইয়া অরুণের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় অরুণ একা আসিয়া দামোদরের সেতুর উপরে বসিয়া ছিলেন। সন্ধ্যাকালে নীরবে নক্ষত্রগুলি ফুটিতেছিল; দামোদরের নির্ম্মল জল তাহার প্রতিবিম্ব বুকে রাখিয়া ধীরে ধীরে বহিতেছিল; শীতল সমীরণ ফুল-বাস লইয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছিল। এমন সময়ে মিহির নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে আসিয়া পিছন হইতে অরুণের চোখদুটী চাপিয়া ধরিলেন। অরুণ চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"কে তুমি?" মিহির সম্মুখে আসিয়া কহিলেন,—"আমাকে চিনিতে পার?"

অরুণ। কেন ভাই! আজ এ কথা জিজ্ঞাসিলে?

মিহির। কেন ভাই! তুমি এমন হইলে?

অরুণ। আমি কি হইলাম?

মিহির। নিজেই বুঝিয়া দেখ।

অরুণ নীরবে রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে মিহির জিজ্ঞাসিলেন,—"চুপ ক'রে রইলে যে?" অরুণ কহিলেন,—"আমি কি বলিব?"

মিহির। যাহা সত্য; যাহা তোমার মনের কথা।

অরুণ। আমার মনের কথা? আমার মনের কথা তুমি কি বা না জান? আমার মনের কথা, আমি যা না জানি, তুমি তা জান;—তুমিই আমার মনের কথা বল না ভাই! তোমা বই আর আমার কে আছে? তুমি আমার সহায়, সম্পত্তি, সম্বল, ভরসা। তুমি আমার নিরাশার আশা,—তুমি আমার আশ্রয়, আমি তোমার অধীন। তুমি সদ্যুক্তি দাও। আমি কি করিব, বলিয়া দাও; কোন্ পথে যাইব, দেখাইয়া দাও। আমি আমার মনের কথা জানি না, বলিব না, বলিতে পারিব না; আমি পাগল, আমি দরিদ্র, আমি পথের ভিখারী; আমার বড় আশা, দুরাশা! মিহির! ভাই! সে দুরাশা——"অরুণ আর বলিতে পারিলেন না; তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল। অরুণ কাঁদিতে কাঁদিতে মিহিরের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন। "কর কি, কর কি" বলিয়া মিহির অরুণকে তুলিলেন; স্বীয় বস্ত্রে অরুণের অশ্রু মুছাইয়া দিয়া, দুইজনে সেইখানে উপবেশন করিলেন।

সে নীরব দামোদর তীরে নির্ম্মল সৈকতের উপর অরুণ মিহিরের কোলে মাথা রাখিয়া শুইলেন। দুইজনেই নীরব গম্ভীর। ধীরে ধীরে আকাশে চাঁদ উঠিল, ধীরে ধীরে তাহার কিরণজাল দামোদরের নির্ম্মল সলিলে প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল; মলয়-মারুত ধীরে ধীরে আসিয়া দুইজনকে সেবা করিতে লাগিল। মিহির নীরবে বসিয়া অরুণের বিষয় কত কি ভাবিতে লাগিলেন,—"আহা! অরুণের এমন কোমল প্রাণে কেন আঘাত লাগিল? এমন ফুটন্ত-গোলাপ কেন ছিন্ন হইল? হায়! কোন্ পাপে, কার অভিশাপে অরুণ এ দুশ্চিন্তার বিষ-দংশন সহিতেছে? কেন তাহার হৃদয় অগ্নি-শিখায় জ্বলিয়া-পুড়িয়া যাইতেছে? আহা! এ অগ্নি কি নিবে না? এ বিষের দংশন কি নিবৃত্তি হয় না? কি করিলে অরুণ শান্তি পায়? কিসে তাহার হৃদয় শীতল হয়?—কে আমাকে বলিয়া দিবে? কাহাকে জিজ্ঞাসিব? জগদীশ্বর! দয়াময়! দয়া করিয়া অরুণের হৃদয় শীতল কর।" মিহিরের অন্তর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। মিহির আত্ম-সংবরণ করিতে পারিলেন না; তাঁহার চক্ষু দিয়া দর-বিগলিত ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হইল। একেবারে ঝর ঝর করিয়া সে অশ্রু অরুণের বুকের উপর গড়াইয়া পড়িল। অরুণ আপন অবস্থা বুঝিলেন, উঠিয়া বসিলেন; ধীরে ধীরে মিহিরের গলা জড়াইয়া কহিলেন,—"মিহির! কাঁদিও না ভাই! আমিই তোমাকে কাঁদাইয়াছি। অস্থির হইও না, ভাবিও না; আমার মর্ম্মকথা

তোমাকে বলিব। না বলিলে তোমার কাছে অবিশ্বাসী হইব, ধর্ম্মে পতিত হইব। কিন্তু আজ নয়। ভাই! তুমি যার বন্ধু, তার কিসের অভাব? তুমি যার সহায়, তার কিসের ভয়?”

অরুণের চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হইল। অশ্রুতে অশ্রু মিশিয়া গেল! নিস্তব্ধ চন্দ্র-কিরণ-বিধৌত যামিনীতে আজ দুই সখার প্রেমাশ্রু দামোদরের নির্ম্মল সলিলে মিশিয়া চলিল।

অরুণের জন্য মিহির বড়ই ভাবিত হইলেন। সে রাত্রে তাঁর ঘুম হইল না; প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া অন্যমনস্ক-ভাবে একখানি বই খুলিলেন, পুস্তকখানির ভিতর হইতে একটী হাতে-লেখা কাগজ বাহির হইল। কাগজখানিতে অরুণের হস্তাক্ষর। তাহাতে লেখা আছে,—“অতি সুন্দর, অতি নির্ম্মল তাহার মুখখানি! সে মুখের তুলনা নাই। অতুল সে রূপরাশি! তার সে সুন্দর চক্ষু, সে সুন্দর ওষ্ঠ, কি দিয়া বুঝাইব? জগতে তার তুলনা নাই।” উহা পাঠ করিয়া মিহির বুঝিলেন; কাগজখানি যথাস্থানে রাখিয়া বইখানি বন্ধ করিলেন।

বেলাটুকু কাটিয়া গেল। সন্ধ্যাবেলা দুইজনে নদীর ধারে বেড়াইতে গেলেন; আবার দুইজনে সেই নির্ম্মল বালুকাচরে বসিলেন। চারিদিক নীরব, নিস্তব্ধ, গম্ভীর। মিহির অরুণকে জিজ্ঞাসিলেন,—“ভাই! আমাকে সত্য করিয়া বল, কে সে?”

অরুণ জিজ্ঞাসিলেন,—“কার কথা বল্‌ছ?”

মিহির। তোমারই কথা। আমাকে সত্য করিয়া বল, কে তোমার হৃদয়ের সামগ্রী?

অরুণ মিহিরের মুখের পানে স্থিরভাবে চাহিয়া রহিলেন। মিহির বলিলেন,—“কি দেখ্‌ছ?” অরুণ কহিলেন,—“তুমি কি মনের কথা জান্‌তে পার?”

মিহির। তুমি আমাকে বল্‌বে না?

অরুণ। না।

মিহির। কেন?

অরুণ। আমার ভ্রম সংশোধন ক’রেছি। আমি না বুঝে কালকূট উদরস্থ ক’রেছিলাম; এখন জান্‌তে পেরেছি,—আমার পক্ষে তা কালকূটই বটে। আমি দরিদ্র—পথের কাঙ্গাল, আমার মাথায় মহামূল্য মণি আমারই মৃত্যুর কারণ! আমি তোমার অযোগ্য বন্ধু! তুমি স্বর্গের দেবতা, আমি নরকের কীট! তুমি পবিত্র, আমি হেয়! তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর। কেন তুমি আমাকে ভাল বাসিয়া কষ্ট পাও? কেন তুমি আমার জন্য চিন্তার দংশনে যন্ত্রণা পাও? আমি স্থির করিয়াছি, মরিব; মরিয়া সকল জ্বালা ভুলিব।

মিহির। মরিবে কেন?

অরুণ। মরিব কেন? বাঁচিয়া কি সুখ? বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা! বাঁচিয়া থাকিয়া, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মরা অপেক্ষা, একেবারে মরাই ভাল! দরিদ্রের আশা তো সফল হইবে না; কাঙ্গালের ভাগ্যে তো মহানিধি মিলিবে না।

সেই নির্জ্জন, গম্ভীর নদীতটে অরুণ, মিহিরকে নিজের মনোভাব বলিলেন। মিহির আর কোন কথা আজ বলিলেন না; তিনি নিস্তব্ধভাবে বসিয়া অরুণের সকল কথা শুনিলেন।

দুইজনে যখন বাড়ী ফিরিয়া যাইলেন, শুনিলেন, মিহিরের সহিত কিরণের বিবাহ হইবে। ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা কেহই এ বিবাহ-কথার নাম-গন্ধও জানিতেন না।

দুইজনে শয়ন করিলেন; কাহারও নিদ্রা আসিল না, অথচ কেহ কোন কথা কহিলেন না। অরুণ জানিলেন, মিহির গাঢ় নিদ্রামগ্ন; মিহির জানিলেন, অরুণ গাঢ় নিদ্রামগ্ন। অরুণ মিহিরকে নিদ্রিত ভাবিয়া শয্যা হইতে উঠিলেন

এবং প্রদীপের কাছে যাইয়া একখানি কি পত্র লিখিলেন। আবার আসিয়া শুইলেন, ভাবিতে ভাবিতে এবার গাঢ় নিদ্রামগ্ন হইলেন।

মিহির কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া বিছানা হইতে উঠিয়া পুস্তকের ভিতর হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া পড়িলেন। পত্রখানিতে লেখা আছে,—

"জ্যাঠাই-মা! কিরণের সঙ্গে মিহিরের বিবাহ হইবে,—সব ঠিকঠাক হইয়া গিয়াছে। ভালই হইল; কিরণ চিরকাল সুখে থাকিবে! মিহির আমাকে কত ভাল বাসে! মিহির আমার আশ্রয়। আমার অন্তঃকরণ বড় অপরিস্কার, মিহিরের অন্তঃকরণ স্বর্গভূমি। মিহিরকে মুখ দেখাইতে এখন আমার লজ্জা হয়। জ্যাঠাই-মা, আপনাকে দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। আপনি একটী লোক পাঠাইবেন, আমি বাড়ী যাইব। অনেক দিন আপনি আমাকে বাড়ী যাইতে লেখেন নাই। জ্যাঠাই-মা! আপনি কি আর আমাকে ভাল বাসেন না?"

মিহির বুঝিলেন, পত্রখানি লিখিতে লিখিতে অরুণের হাত কাঁপিয়াছে, তিনি কাঁদিয়াছেন;—অক্ষরগুলি অশ্রুজলে মাঝে মাঝে মুছিয়া গিয়াছে।

এই কয়ছত্র পড়িয়া মিহির সব বুঝিলেন। নীরব গৃহমধ্যে তিনি স্থির হইয়া বসিলেন। সম্মুখের দীপশিখা উজ্জ্বল করিয়া দিলেন, তাঁহার সুন্দর মুখখানি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। মুখের সে নীরব গাম্ভীর্য্য গম্ভীরতর হইল, অথচ তাহাতে মৃদু-হাস্যরেখা প্রকটিত হইল। তিনি ধীরে ধীরে আপনা-আপনি কহিলেন,—"জগতে এমন কি মহামূল্য নিধি আছে, যাহার বিনিময়ে আমি অরুণকে ত্যাগ করিতে পারি!" (ক্রমশঃ)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ পাইন।

পাগলিনী।

(১)

"মা, মা, মা!"

"মা'র মাথা খা।"

"হা—হা—হা। ঐঁ—ঐঁ—ঐঁ।"

বৃদ্ধা পাগলিনী হাসিতেছে ও কাঁদিতেছে, হাসির সঙ্গে কাঁদিতেছে, কান্নার সঙ্গে হাসিতেছে।

পাগলিনীর ছিন্ন জীর্ণ বস্ত্র। শরীর জীর্ণ, শীর্ণ, বিবর্ণ, ক্ষত-বিক্ষত। মস্তকে, কক্ষে ও পৃষ্ঠে জীর্ণবস্ত্র-বদ্ধ বৃহৎ বৃহৎ মোট।

পশ্চাতে ছেলে, বুড়া ও যুবা পালে পালে। কেহ করতালি দিতেছে, কেহ সোপহাসে 'মা' বলিয়া নিকটে আসিতেছে ও মোট ধরিয়া টানিতেছে, কেহ বা 'মা' বলিতেছে ও প্রহার করিতেছে, কেহ দূর দূর করিয়া তাড়াইতেছে। এ সব কাজে সকলেরই কিন্তু ভারি আমোদ।

দূরে দু'চারি জন, সজল-নয়নে পাগলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে দণ্ডায়মান।

"কত কথা হয়রে মনে,
খেলা করি উলু-বনে।

উঁহুঁ,—

খেলা করি পদ্মবনে;
ভেঙ্গে গেল পদ্মফুল,
খেলা হ'ল নির্ম্মূল।"

হা—হা—হা! কেমন গান! আবার গা'ব। গাই, আর একটা গাই;—

"লাঙ্গল ঘাড়ে কোপ্‌নি পরা,
পুঁতে রাখ্‌লে বেদের চারা।
ডাল-পালা তার শত শত,
ফল-ফুল তার হ'লো কত!"

না?—আমি পাগল? আমার বোচকায় হাত দিবি ত মার খাবি। তবু হাত, তবু

টানাটানি! মাণিক কেড়ে নেওয়া! থু-থুঃ। মর্ বেটারা, আমায় মাল্লি; মার্; হা—হা—হা। আমি কাঁদ্‌ব না, হাস্‌ব। না,—কাঁদ্‌ব।

"তাল পত্তর্ খাঁড়া,
পক্ষিরাজ ঘোঁড়া।
কুড়ুনির বেটার উড়ুনি গায়,
পোঁটা-চুন্নির বেটা চন্নবিলেস।"

আমার কি সুর! কি মিঠে আওয়াজ! আমার গান তোমরা শোন নাই; শুন্‌বে?—

"পাতার বেড়া, পাতার কুঁড়ে
সুখে নিদ্রা যাই।
বড় বাড়ী বাড়াবাড়ি
যেতে ভয় পাই।
ভাঙ্গ্‌ল বেড়া, ভাঙ্গ্‌ল কুঁড়ে,
বেড়াই আমি উড়ে উড়ে;
সঙ্গে কেবল বেঁচকা-বিঁড়ে,
হ'য়েছি বালাই।
ঝুর্ ঝুর্ ঝুর্ ব'চ্চে বাতাস
নেচে নেচে ধাই।"

আমাকে কি তোমরা চেন? বল দেখি, কে আমি? পাগলী; না?—"ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ!"

---

(২)

"আহা কি রূপ! এ বয়সে এই পাগল অবস্থাতেও এমন রূপ! কি কথা!—যেন মধু-মাখা! আহা! বড় ঘরের মেয়ে, বড় ঘরের বৌ. কত লোককে প্রতিপালন করেছেন, কত লোকের কত উপকার করেছেন, আহা! এমন মানুষেরও এমন হয়!

"ছেলে-পুলে নাতি-পুতিরও অভাব নাই, তবু এমন দুর্দ্দশা! কলিকালের ছেলে-পুলে! কলিকালের উপকৃত-আশ্রিত! তারা চেয়েও দেখে না, দেখ্‌লেও উপহাস করে, মর্ম্মপীড়া দেয়।

"তবে, পাগল কিনা, এ, কিছুই গায় মাখে না। এ'র আপনার লোকেরা পরের খোসা-মোদ কচ্চে, পরের সেবা-শুশ্রূষা কচ্চে, তাও ভাল, তবু এ, যাতে ভাল হয়—যা'তে আপনা-দের পরের খোসামোদ কর্ত্তে না হয়,—তা কর্‌বে না, সেদিকে মনও দিবে না।

"কি বল্‌ব, এরা আমার কেহ নয়; আমার কেহ হ'লে এই বদ্ লোকগুলোকে বেশ ক'রে শিখিয়ে দিতুম।"

এক অসামান্যা বিদেশীয়া রমণী পাগলিনীর দুঃখে দুঃখিত হইয়া এইরূপ অনেক ভাবিতে লাগিলেন।

"আমি বই বহুমূল্য রতনের ভার,
পোঁটলা পুঁটলি সব রতন-ভাণ্ডার;
কহিনূর দর্পচুর তেড়োট্টি-তালপাতে।
মণিহার মানে হার বর্ণের শোভাতে।
নাচি ধেই ধেই
তা নেই তা নেই,
কুড়ানো পাতা
জড়ানো কাঁথা।
"আয়রে রে ছেলের পাল মাচ ধ'র্ত্তে যাই,
মাচের কাঁটা পায় ফুটেছে দোলায় চড়ে যাই।"

পাগলিনী নাচিতে নাচিতে, গাইতে গাইতে চলিয়া গেল।

রমণী দূর হইতে পাগলিনীর কথা শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"এ কি যথার্থই পাগল? আহা! ছেলে-পুলের উপর স্নেহ-বাৎসল্য, মায়া-মমতা দেখে তা ত মনে হয় না। কু-সন্তান কু-সেবকের উপরেও মনের টান কত!

"আহা! এ'র সকল কথা গুলিতেই গম্ভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, একি প্রকৃতই পাগল?"

(৩)

সেই দয়াবতী রমণী আপনার পুত্রদিগকে বলিলেন,—"অমুক দেশে এক নূতন-রকমের পাগ্‌লী আছে, তোমরা—যার যেমন ক্ষমতা—তার সেবা কর্‌বে, তাকে যত্ন কর্‌বে, আমার ন্যায় বা আমা অপেক্ষাও অধিক শ্রদ্ধা-ভক্তি তার উপর রাখ্‌বে।"

অনেক আজ্ঞাকারী পুত্র খুঁজিয়া খুঁজিয়া পাগলিনীর দেখা পাইল এবং জননীর আদেশ মত তাঁহার সেবা-শুশ্রূষাদি করিতে লাগিল।

ক্রমে তাহারা দেখিল,—পাগলিনী প্রকৃত পাগলিনী নহে, প্রধান রমণী। তখন অনেকে তাঁহাকে মণিময় প্রসাদে মহার্হ-রত্নময় সিংহাসনে বসাইয়া জয় গান করিতে লাগিল। দু'দশ জন কিন্তু বিদ্বেষীও হইল।

যে দেশে পাগলিনীর এত আদর হইল, সে দেশে মানুষের এক চক্ষু ও এক হস্ত। ভক্তগণ,—পাগলিনীর সম্মান বৃদ্ধি করিবার অথবা আত্ম পক্ষ সমর্থনের উদ্দেশে সর্ব্ব-সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে লাগিল, এই দেবীরও এক হাত এবং এক চোখ;—অপর হাতের মত যা দেখা যায়, সেটী কৃত্রিম পরিচ্ছদ-বিশেষ; অপর চোখের মত যা দেখা যায়, তাও একখানা মাংসে বসান পরকলা মাত্র,—চোখ নহে।"

যাহারা বিদ্বেষী ছিল, তারা এই দুই হস্ত ও দুই চক্ষু লইয়া তাঁহার প্রতি উপহাস আরম্ভ করিল।

শ্রীমতী পাগলিনী দেবীর ভাবভঙ্গী সেই একরূপই। সিংহাসনে বসিয়াও তিনি ছিন্ন-বস্ত্র এবং মোটগুলি পরিত্যাগ করেন নাই। বিদ্বেষীরা ইহা লইয়াও বিদ্রূপ করিতে লাগিল। যা-, হউক, পাগলিনী এখন ভিখারিণী ও রাজ্যেশ্বরীরূপে,—বিদুষী ও উন্মত্তারূপে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন।

---

(৪)

"বাজ্‌রে পিয়ানো, বাজ্‌ পাখোয়াজ,
বাজ্‌ হার্‌মোনিয়ম্‌, ক্লার্ণেট বাজ্‌;
হৌক্‌ মধুময় ধরণী-মণ্ডল,
আরও মধু, মধু, মধুরে মাতাও।
নাচ, নাচ, নাচ,—গাও, গাও, গাও,
ও হো হো রূপসী, পরাণ উধাও,
মরি মরি মরি সুধায় মধুরে,
আরও সুধা, সুধা, সুধারে সুধাও।
চুম পমেটমে ইলেক্ট্রো-জোছনা,
ল্যাবাণ্ডার অডি-কলোনে মেলনা,
স্প্রীং-টানা-পাখা হাওয়ার হিল্লোলে,
আজি মজি, মজি, মজারে মজাও।
বাঃ, বাঃ।"

পাগলিনীর সন্তান-সন্ততিগণ প্রচুর আমোদে উন্মত্ত।

এখন পাগলিনীর কথা কেহ মনেও করে না।

যে দেশে পাগলিনীর আদর, সে দেশের প্রতি কিন্তু ইহাদের অচলা-ভক্তি। ইহারাও সেই-দেশীয়গণের দেখা-দেখি একচক্ষু এবং একহস্ত-সম্পন্ন হইয়াছে। এক চক্ষু ও এক হস্ত নষ্ট করিয়াছে;—কাহারও একেবারে সমূলে নষ্ট, কাহারও বা কার্য্যতঃ নষ্ট। সকলেরই এক হস্ত এবং এক চক্ষুতেই কার্য্য-কারিণী শক্তি পর্য্যবসিত হইয়াছে। তবে ফলে দাঁড়াইয়াছ এই যে, যাহাদের স্বাভাবিক এক চক্ষু, এক হস্ত, তাহাদের সেই একেই সমগ্র শক্তি; আর যাহারা ইচ্ছা করিয়া এক চক্ষু ও এক হস্ত হারাইয়াছে, তাহাদের শক্তি হ্রাসই হইয়াছে।

পাগলিনী-তনয়েরা সেই, শ্রদ্ধাস্পদ দেশে পাগলিনীর আদর শুনিয়া মাতৃ-ভক্তিতে বিমুগ্ধ হইলেন। তখন পাগলিনীর প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা অকস্মাৎ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বিশেষ, যখন শুনিলেন, পাগলিনীরও এক চক্ষু ও

এক হস্ত, তখন ত আর তাঁহাদের আনন্দের সীমা-পরিসীমা রহিল না।

---

(৫)

ভবিষ্যৎ।

ওদিকে ক্রমে ক্রমে পাগলিনীর মহিমা প্রকটিত হইল।

পাগলিনীর সুন্দর রূপে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার আকর্ণ বিস্তৃত দুই নেত্র ও মৃণাল-কোমল বাহুদ্বয় দেখিয়া সে-দেশের লোকও আপনাদের বিরূপতা অনুভবে সমর্থ হইল। বিদ্বেষীর বিদ্বেষ দূর হইল। ভক্তের কৌশল বাক্য অনাবশ্যক হইল। কিসে দুই চক্ষু ও দুই হস্ত হয়, তাহার চেষ্টা সে দেশে পূর্ণমাত্রায় হইতে লাগিল। তখন, ইচ্ছা করিয়া যাহারা চক্ষু ও হস্ত নষ্ট করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বিশেষ হাহাকার পড়িয়া গেল; অনুতাপানল জ্বলিয়া উঠিল।

তখন—

ছাড়িলেন পাগলিনী পাগলের সাজ,
হেরে তাঁরে শান্তি পায় মানব-সমাজ।
শ্বেত-পদ্মাসনা শ্বেত-কুসুম-শোভনা,
শ্বেতাম্বর-ধরা শ্বেত-গন্ধ-বিলেপনা।
শ্বেত-বীণা শ্বেত-অক্ষ-সূত্র করতলে,
শ্বেত-কায় শ্বেত-বর্ণ ভূষণ উজলে।
বিতরেণ বরাভয় অভয়দায়িনী,
উঠিল গগনভেদী জয় জয় ধ্বনি।

শ্রীউটুঙ্কন।

জন্মভূমি।

সমীরণ পূরায়ে ওঙ্কারে
"মধুবাতা ঋতায়তে" স্বরে,
মধু ঢালি' মহাসিন্ধু জলে,
মধু ঢালি' ওষধি সকলে,
চন্দ্র সূর্য্যকরে ধরণী অম্বরে
মধু ঢালি', ধূলার কণায়,
"জাগো মা জনমভূমি!" ডাকিয়াছে যায়,
কোথা ভাই! সে অমর স্থান?
"জাগো মা! জাগো মা! ব'লে বেদমন্ত্র মহারোলে
স্বাহা-স্বধা-পূর্ণাহুতি করে'ছে প্রদান।
আকাশ ভরিয়ে দিল সুধার সাগর।
ভেদি' অনন্তের কূল ফুটিল তারকা-ফুল;
পঞ্চমুখে বেদগান মত্ত মহেশ্বর।
সে নাম-করণ কালে মহাঋষি দলে দলে
ডুব দিল ধ্যান-মহাসিন্ধু-জলে;
জননী পড়িল ধরা; সংসার পাগল পারা,
সপ্তমে ধরিল তান সপ্তর্ষিমণ্ডলে।

পুরুষ-প্রকৃতি দোঁহে ধরি করে-করে
সদ্যঃশিশু জ্যোতির আধার,
আলোকিত করিবারে সমগ্র-সংসারে
ধ'রে দিল মায়েরে আমার।
"জাগো জাগো রে সন্তান!
জগতে পশিল প্রাণ,
স্তিমিত-লোচন ধ্যানে কার ভরে আর?
দেখ দেখরে সন্তান!
জননী করিনু দান,
কাছে রেখ', সুখে রেখ', আদি চেতনার।"

কোথা হ'তে এলে কোন স্বরগের ফুল;—
কি মদে মাতিল ধরাতল!
তোমা-হারা স্বর্গ মর্ত্ত্যে আজি হুলস্থূল
জন্মভূমি! আত্মার সম্বল!
স্বরগে টুটিল মান,
বিশ্বেশ্বরী বিশ্বপ্রাণ
ঢেলে দিলা জননীর হৃদয়-কমলে;
শ্রীকান্তে কাঁপিল হিয়া,
কমণ্ডলু উথলিয়া
ছুটিল সুধার ধারা—চাঁদ গেল গ'লে।

মন্দার-প্রসূন-গন্ধ শিশু-কলেবরে
চারিধারে ছুটিল যেমনি,
সে গন্ধে প্রমত্ত যত নিশাচরে
হুহুঙ্কারে ঘেরিল মেদিনী।
গেল গেল উঠে রব,
নরজন সে ভৈরব
শুনি' নর দেব ভাবে "কি হবে উপায়"—
বুক ভেঙে অস্থিদানে
কে রাখিল মার প্রাণে?
হে দেবেন্দ্র! মহাবজ্র কে দিল তোমায়?

জননীর সৃজন কারণ
পূর্ণব্রহ্ম তুমি সনাতন!
সর্ব্বস্ব তোমায় দানে
সাধ না ত মেটে প্রাণে—
জন্মভূমি যবে হে করিলে আক্রমণ,
যজ্ঞকুণ্ডে আত্মহারা
মেঘনাদ মাতোয়ারা
দিল প্রাণ-ধন বিসর্জ্জন।
জীবন্তে তোমারে দিতে
সাহস না হ'ল চিতে
জন্মভূমি, হে ঈশ্বর; কেমন সে ধন!

বনে বনে ঘুরি' মহা সাম্রাজ্য-ঈশ্বর
গলবস্ত্রে কৌরবের দ্বারে,
জন্মভূমি-হারা বড় কাতর অন্তর
সূচীমান স্থান ভিক্ষা তরে।
মাথায় পড়িল বাজ,
সর্ব্বত্যাগী—ঋষিরাজ
শুনিল যখন কাণে পাবে না জননী,
গেল আত্ম-পাশরিয়া;
রণরঙ্গে মাতাইয়'
ক্ষণেকে ডুবাল অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী।
আর তুমি ক্ষত্রিয় প্রধান—
যার নামে পাগল প্রহ্লাদ!
স্বর্ণ-সৌধ ছেড়ে দেব! কোথা তব স্থান,
কে ঘটালে হেন পরমাদ?
গৌরবের উচ্চস্থান
তোমারে করিবে দান
সাদরে ত ব'লেছিল দিল্লীর ঈশ্বর,
তবে কেন বারমাস
তরুর কোটরে বাস,
কেন শীতজলে নিরন্তর?
কাঁদে শিশু ভূমে লুটি'
তৃণজ কর্কশ রুটী
মেয়ের মুখের অন্ন হরিল মার্জ্জার—
দেখিলে ত হাস্যমুখে,
বল দেখি কোন্ সুখে
সে সময় ছিল মগ্ন অন্তর তোমার?
পদে পদে প্রতিহিংসা—হস্তি-পদতলে
সমর-অনল-মুখে,
দারিদ্র্য দারুণ দুঃখে,
ছাড়ে নাই মায়ে, ধ'রেছিলে তুলে।
স্তরে স্তরে স্বর্ণভরা,
বীরগর্ভা বসুন্ধরা—
সুশ্যামলা জননী আমার;
কমল প্রহার গায়
কখন সহেনি মায়,
বৃথা অন্বেষণে তবে কার!
সমীরণে উঠে ধ্বনি, ছাইল ভারতভূমি—
গভীর হতাশা ধ্বজা শব্দ পতপত।
হিমালয় গৃহ ছাড়ি
চলিল কুমারী-বাড়ী
শোক-গীতি,—'কোথা তুমি সোণার ভারত'!!

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

খাসিয়া-পাহাড় ও খাসিয়া-জাতি

সূচনা। ১২৯৬ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাস—সে আজ ছয় বৎসরের কথা—যখন আসাম-সীমায় প্রথম পদার্পণ করি,—যখন প্রবাস হইতে প্রবাসান্তরের যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়ি,—যখন পুরাতন ছাড়িয়া নূতনের নবীনত্বে 'দিশেহারা' হই,—সেই একদিন, আর এই একদিন! এখন আর সে ভাব নাই, এখন নূতন আবার পুরাতন হইয়াছে—নব-সংসর্গে অতীতের পূর্ব্বস্মৃতি ক্রমে ক্রমে ভুলিতে শিখিয়াছি,—এখন নবীনের নূতনত্বে গা ঢালিয়া আবার 'মাথামাখি' করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি। ভবিষ্যতের দৃশ্য এতই ভয়াবহ,—জীবনের ভবিষ্যৎ অধ্যায় আসামের সংসর্গে কিরূপ ঘটনা ঘটাইবে, ভাবিয়া অস্থির হইয়াছিলাম; বর্ত্তমানের মোহে পড়িয়া, আপাত-মনোরম স্বচ্ছন্দতায় স্নিগ্ধ হইয়া, সে অস্থিরতা এখন তিরোহিত হইয়াছে,—এখন আবার এ অধ্যায়ের অন্তরালে কিরূপ পরিণাম প্রচ্ছন্ন আছে, এই চিন্তাই মধ্যে মধ্যে অন্তরাকাশে অমাস্ককার ঢালিয়া দেয়—উদাস-প্রাণে ক্ষণিক মর্ম্মভেদী ভীতি সঞ্চার করে।

মানুষ ভ্রান্ত,—বর্তমানের কুহকে পড়িয়া ভবিষ্যতের ভাবনা বড় ভাবিতে পারে না;

ভাবিলেও বোধ করি, সংসার চলে না। বরং উপস্থিত অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া সংসারে চলিতে পারিলেই এই পাপ-তাপময় কষ্টের হৃদয়েও কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করা যায়। ভবিষ্যতের গর্ভে ভাগ্যে যাহাই থাকুক, আমরা এখন বর্ত্তমান লইয়াই ব্যতিব্যস্ত—বর্ত্তমান বিষয়ের আলোচনাতেই তাই উপস্থিত বদ্ধপরিকর। প্রবাসের প্রথম পত্রে * প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম,—"আসামের অন্যান্য কথা বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল; তার পর "দুই চারিটী কথা" † না বলিয়াছিলাম, এমন নহে;—মধ্যে আসামের সামাজিক আনন্দোৎসব "বিহুর ‡ চিত্রও বঙ্গীয় পাঠকের সমক্ষে ধরিয়াছিলাম, এবং বঙ্গ-সুন্দরীগণের মনোরঞ্জনার্থ "মালঞ্চের" পসরায় ** "অসমা-সুন্দরী"গণের সুন্দর 'ছাঁচ' তুলিতেও সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু এ সকলই শুনা কথার উপর নির্ভর করিয়া,—আসামের সকল দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ বড় কখন ঘটে নাই। এবার একটু চাক্ষুষ বৃত্তান্ত বলিব।

বিধাতার বিচিত্র লীলা—অনন্ত পুরুষের অপার করুণা! দারুণ দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও সুখশান্তির অস্ফুট ছায়া প্রচ্ছন্ন থাকে, ভ্রান্ত-জীব মনুষ্য তাহারই আশ্রয়ে জীবনধারণ করে। বহুকাল একস্থানে অবস্থিতি করার পর আসাম-প্রবাসের অজানা অবস্থা-বিপর্য্যয়ের চিন্তা আমার মনকে প্রথমতঃ বড়ই আন্দোলিত করিয়াছিল; পরন্তু "কালাজ্বরে"র প্রবল প্রকোপে আসামের অধিকাংশ স্থল শ্মশানে পরিণত,—সেই শ্মশানের ভীষণ ভাব অন্তরে সহজেই ভীতিসঞ্চার করে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে, দুর্গতিহারিণী দয়াময়ীর অপার দয়াগুণে আমাকে সে শ্মশানের দৃশ্য দেখিতে হয় নাই। প্রথমাবধিই আসামের মনোজ্ঞ ভূমি, প্রীতি-শান্তির বিনোদ-ক্ষেত্র, খাসিয়া-শৈলের শিখর-দেশে স্থান পাইয়াছি; সেই সুখে অন্যবিধ দুশ্চিন্তা ভুলিতে পারিয়াছি, আজি সেই সুখের আবেগেই শান্তি-ক্ষেত্র খাসিয়া-শৈল সম্বন্ধে দুই চারি কথা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

ভৌগোলিক।—খাসিয়া শৈলের কথা বলিতে গেলেই সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তী পর্ব্বতের কথা বলিতে হয়। বস্তুতঃ এই দুইটী পর্ব্বত যেন যমজ সহোদরের ন্যায় পরস্পর স্নেহালিঙ্গনে মিশামিশি করিয়া রহিয়াছে; ইংরেজের রাজনৈতিক কার্য্য-বিভাগেও এ দুইটী সমসূত্রে জড়িত—একই জেলা বলিয়া পরিগণিত। এই সম্মিলিত শৈলযুগলের উত্তরে কামরূপ ও নবগ্রাম (Nowgong) জেলা —কলিকাতা হইতে আগমন কালে এই কামরূপ অতিক্রম করিয়া খাসিয়া-পর্ব্বতে অধিরোহণ করিতে হয়। বঙ্গ-পুর-মহিলা-মহলে, অধিক কি—ভৌগোলিক তত্ত্বানভিজ্ঞ পুরুষের দলেও, কামরূপের পর আর দেশ আছে বলিয়া ধারণাই নাই। এখন পর্য্যন্ত স্বদেশে বন্ধুর পার্শ্বে খাসিয়া-শৈলে প্রবাসের কথা উত্থাপন করিলে, উহার ভৌগোলিক অবস্থা ভাল করিয়া বুঝাইতেই মস্তক ঘুরিয়া যায়,—"আসাম-গোয়ালপাড়া কামরূপ-কামাখ্যা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, ভেড়া না বনিয়া মনুষ্য-দেহেই দেশে ফিরিতে পারিয়াছি" একথা সহজে কেহ বিশ্বাস করিতেই চাহেন না। ইংরেজের অনুকম্পায় কিন্তু আজ-কাল কোন স্থানে যাইতেই কষ্ট নাই, আর বাঙ্গালীর ন্যায় অন্নসংস্থান-বিহীন জাতিও ভারতে দ্বিতীয় নাই, তাই এই প্রাচ্য সীমান্তপ্রদেশও অধুনা বাঙ্গালীর "ভাত-ঘর" হইয়া দাঁড়াইয়াছে।—এই পর্ব্বতদ্বয়ের পূর্ব্বে উত্তর-কাছাড় ও

* নব্যভারত।—৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।
† নববিভাকর সাধারণী।—২রা জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫।
‡ মালঞ্চ।—১ম বর্ষ, ৫ম খণ্ড।
** ঐ।— ঐ ১২শ খণ্ড।

নাগ-পর্ব্বত এবং কপিলী নদী; দক্ষিণে শ্রীহট্ট; এবং পশ্চিমে গারো-পাহাড়। খাসিয়া-পাহাড়ের প্রাকৃতিক শোভা—এই সীমান্ত-ব্যবচ্ছেদেই সুন্দরভাবে প্রতীয়মান!—উত্তরে-দক্ষিণে সমতল প্রদেশ, আর সেই প্রদেশের বক্ষ ভেদ করিয়া একদিকে বিশাল নদ ব্রহ্মপুত্র বীরদর্পে বহিয়া যাইতেছে ও অপরদিকে সুশীলা 'সরমা' নদী সরম-সোহাগে যেন গড়াইয়া পড়িতেছে; পূর্ব্বে-পশ্চিমে অগণ্য পর্ব্বতশ্রেণী অনন্তের পথে অগ্রসর হইতেছে।

প্রাকৃতিক।—'পাহাড়ে' দেশ অগণ্য পাহাড়ে পরিপূর্ণ;—"যেদিকে ফিরাই আঁখি, কেবল পাহাড় দেখি"—পাহাড় ভিন্ন আর কথা নাই। এ, ভূগোলের সূত্রগত বা মানচিত্রে শ্বেত-কৃষ্ণে জড়িত পাহাড় নহে,—নগ্ন চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত শত শত পর্ব্বত প্রকৃতির শোভা বিস্তার করিতেছে, উচ্চে—অতি উচ্চে—মস্তক উত্তোলন করিয়া সর্ব্বোচ্চ বিশ্বপতির বিশ্ব-রাজ্যের উচ্চতার পরিচয় দিতেছে, আর দলে দলে মিলিত হইয়া ঐক্য-বলের দর্প ঘোষণা করিতেছে। পর্ব্বত-দুহিতা নদীও অগণ্য; গঙ্গা-যমুনা, গোদাবরী-সরস্বতীর ন্যায় দিগন্ত-প্রসারিণী কলনাদিনী নদী নহে,—পর্ব্বত-নিঃসৃত জলপ্রবাহে সম্মিলিতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী রজতসূত্রের ন্যায় ক্ষীণ-দেহে পর্ব্বতের বক্ষ ভেদ করিয়া নিম্নপথে ঝুর ঝুর রবে বহিয়া যাইতেছে, কেহ বা যৌবন-জোয়ারের জোর-প্রবাহে বহিয়া গিয়া অদূরে চিরযৌবন ব্রহ্মপুত্রের প্রশান্ত প্রেমপ্রবাহে আত্মোৎসর্গ করিতেছে। পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্যে ২০।২২টী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য; ইহাদিগের উচ্চতা ৪০০০ হইতে ৬৫০০ ফিটের মধ্যে। খাসিয়া-শৈলের রাজধানী 'শিলঙ্' সহ-রের সন্নিকটস্থ পর্ব্বতশৃঙ্গই সর্ব্বোচ্চ, ইংরেজের হিসাবে উহা সমুদ্রতলের ৬৪৪৯ * ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত। প্রবাদ শুনিয়াছিলাম,—এই সর্ব্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গে অধিরোহণ করিয়া সুদূর ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন-লালসায় বহু প্রয়াসে আমরা এক দিবস ঐ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলাম; দুর্ভাগ্যক্রমে, ব্রহ্মপুত্র আমাদিগের নয়নগোচর হইল না, অদূরে শিলঙ্ সহর এবং শ্বেতবটিকা-বৎ তন্মধ্যস্থ গৃহাবলী ও পিপীলিকাপুঞ্জ সদৃশ মনুষ্যের গমনাগমন দেখিয়াই পথ-পর্য্যটন-ক্লেশ পরিশোধ করিয়া আসিলাম। অত্রত্য অধিবাসী খাসিয়ারা কিন্তু "সহ্-পেট-বাইনেঙ্" নামক পর্ব্বতকে সর্ব্বোচ্চ বলিয়া জানে; ঐ সুদীর্ঘ খাসিয়া-শব্দের অর্থ—আকাশের নাভি-দেশ, আর 'কূপমণ্ডুক' খাসিয়ার ধারণা—উহাই সসাগরা পৃথ্বীর কেন্দ্রস্থল। প্রভূত উহা উল্লেখযোগ্য পর্ব্বতগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন,—উহার উচ্চতা ৪০০০ ফিট্ মাত্র। নদী-গুলির মধ্যে কপিলী ও বড় পাণিই প্রসিদ্ধ; ইহারা উভয়েই ব্রহ্মপুত্রের সহিত সম্মিলিতা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, কপিলী, বড়পাণি প্রভৃতি নাম বাঙ্গালী বা অপর বিদেশী কর্ত্তৃক প্রদত্ত; খাসিয়ার অভিধানে উহার অন্য নাম আছে। খাসিয়ার "উম্" শব্দ, সাধারণতঃ সলিলার্থে ব্যবহৃত হয়; নদী, তড়াগ বা অন্য জলাশয় মাত্রই খাসিয়ার নিকট "উম্"-পদ-বাচ্য। "বড়পাণি"র খাসিয়া নাম—উম্-ইয়াম্। এইরূপ উম্-ক্রু, উম্-সাও, উম্-খেন প্রভৃতি কত উমই আছে, এখন সে সমস্তের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

পর্ব্বতশৃঙ্গের অধিকাংশই শুণ্ডাকৃতি এবং সুন্দর লতা-বিতানে সমাচ্ছাদিত। শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ মস্তকোত্তোলন করিয়া রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে সমতল উচ্চভূমি শৃঙ্গগুলির পরস্পর উচ্চ-নীচত্বের বৈলক্ষণ্য বিকাশ করিতেছে। এই সকল উচ্চভূমির অনেকস্থল বালুকাময় এবং

* ভূতত্ত্ববিৎ-পণ্ডিত ডাক্তার ওল্ডহাম সাহেবের মতে ইহার উচ্চতা ৬১২৪ ফিট।

তাহারই গাত্র বিধৌত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরিম্মালা প্রবাহিতা। অন্যান্য প্রদেশের পর্ব্বত-মালার ন্যায় এখানকার পাহাড়ের উপরিভাগ প্রস্তরময় নহে; নবীন নধর কিশলয়ে সদাই অতি সুশোভিত,—যেন সুবিশাল করি-পৃষ্ঠ তৃণাস্তরণে আচ্ছাদিত; আর মধ্যে মধ্যে সুল-লিত লতাকুঞ্জে মনোজ্ঞ ভাব সঞ্চারিত। এই সকল লতাকুঞ্জ সুরভি বনজ কুসুমে, সুখকর দারুচিনি বৃক্ষে, এবং বিকচ বনবল্লরীতে পরিপূর্ণ; দেখিলে, বাস্তবিক, শান্তিরসাস্পদ তাপসাশ্রম বলিয়া বোধ হয় এবং কি-এক অব্যক্ত দেবভাবে মনঃপ্রাণ মাতোয়ারা হইয়া উঠে। এই চিরন্তন দেবভাবে ইহারা পূর্ব্বাপর কাঠুরিয়ার কঠিন কুঠার হইতে আত্ম-সংরক্ষণে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু অধুনা কারুকর্ম্মা ইংরেজের সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা হইতে নিস্তার পায় নাই। ইংরেজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সুদূরব্যাপিনী,—গৃহসজ্জার সম্পূর্ণ উপযোগী এই বনের কুসুম তাঁহার দৃষ্টি-সীমা অতিক্রম করে নাই; তিনি অতি যত্নে, অনেক অর্থব্যয়ে, কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তরে ঘুরিয়া এই কুসুমলতা গুলি আহরণ করেন এবং তদ্দ্বারা প্রয়োজনমত স্বগৃহের সুষমা বৃদ্ধি করিয়া উদ্বৃত্তাংশ ভিন্ন-দেশের বাণিজ্য-স্রোতে ভাসাইয়া দেন। ইংরেজের উদ্ভিদ্—তত্ত্বে এই সমস্ত লতাই orchids, rhododendrons ইত্যাদি নামে অভিহিত।

উচ্চ পাহাড়ের উপরিভাগে আর এক সুন্দর বৃক্ষ জন্মে—তাহার নাম সরল। অগণ্য পর্ব্বতে সরল বৃক্ষও অগণন। শিলঙ্ ও তৎসন্নিহিত পর্ব্বতশ্রেণীর উপর সরল ভিন্ন অপর কোন বৃক্ষ নাই বলিলেই হয়; পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, যদিকে দৃষ্টি ফিরাইবেন, সেই দিকেই গগনস্পর্শী সরল-বৃক্ষশ্রেণী আপনার নয়নগোচর হইবে। সরল সরলতার অতি সুন্দর নিদর্শন;—শাখা-প্রশাখার জটিলতা নাই, পত্র-পুষ্পের আড়ম্বর নাই, ফল-ভরে অবনতি নাই, কেবল সরলভাবে উর্দ্ধে উঠিতেছে—যেন সর্ব্বলোক-বিধাতার চরণ-স্পর্শ করিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া অনন্ত পথে উধাও হইতেছে। সরলের এই ভাব দেখিয়া সহজেই সাধুর মনের উচ্ছ্বাস প্রবল হয়, তিনি আবেগে কাতর-কণ্ঠে সরলকে সুধাইয়া বসেন—

"বল রে তরু, কা'র উদ্দেশে,
গগন ভেদ ক'রে যা'স উর্দ্ধদেশে,
হ'লি সংসারে এসে কা'র প্রেমে অচল রে?"

অন্যত্র উচ্চ পর্ব্বতের অভিজ্ঞতা আমাদিগের অল্প,—এইরূপ সরল-বৃক্ষ অন্য পর্ব্বতে আছে কিনা, বলিতে পারি না; কিন্তু হিমালয়ের সমুচ্চ গিরিশৃঙ্গেও যে ইহার অধিষ্ঠান ছিল, অক্ষয় কবি কালিদাসের অমৃতময়ী রচনায় তাহার আভাস পাওয়া যায়। কবি হিমালয়-বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"কপোলকণ্ডূঃ করিভির্বিনেতুং
বিঘট্টিতানাং সরলদ্রুমাণাম্।
যত্র স্রুতক্ষীরতয়া প্রসূতঃ
সানূনি গন্ধঃ সুরভীকরোতি॥"

এখনকার সরলবৃক্ষ হইতে করি-কপোল-কণ্ডূয়ন-সঞ্চালিত ক্ষীরধার, কৈ, দেখিতে পাই না; তবে খাসিয়া-কুঠার-কর্ত্তিত সরল-মজ্জা হইতে তৈলময় নির্য্যাস ক্ষরণ হইতে দেখিয়াছি এবং এইরূপ নির্য্যাস-সংযুক্ত কাষ্ঠে অগ্নি-হোত্রাদি-ক্রিয়ায় মনোহর সৌরভ সম্ভোগ করিয়াছি। সরলের সারে সাগ্নিকের ক্রিয়া-কাণ্ড বাস্তবিক অতি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয় এবং এইজন্যই, বোধ হয়, ইহার অন্যতর নাম ধূপকাষ্ঠ। ইহার প্রধান গুণ—অগ্নিস্পর্শেই জ্বলিয়া উঠে; একারণ পাচকের পাকচুল্লীতে ইহা বিশেষ প্রয়োজন সাধন করে এবং অন্ধ-কারে নিঃস্ব পথিকের হস্তে আলোক-দানের

কার্য্য করে। সরলের এইরূপ সারভাগ দেশলাইয়ের কাষ্ঠের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইতে পারে; কলিকাতার নব-প্রতিষ্ঠিত দেশলাইয়ের কারখানায় ইহার পরীক্ষা করা সমীচীন বোধ হয়। খাসিয়া পাহাড়ে সরল-বৃক্ষ কল্পতরু-বিশেষ;—জ্বালানী-কাষ্ঠ-হইতে দ্বার-চৌকাট, চেয়ার টেবিল, সাজ-সরঞ্জাম সমস্তই ইহা দ্বারা সাধিত হয়। সরল-বৃক্ষের প্রাচুর্য্য স্বাস্থ্যোন্নতি-বিধায়ক বলিয়াও দেশীয় মহলে প্রবাদ আছে; ইংরেজ, বোধ করি, এ কথায় বিশ্বাস না করিয়াই সহরের অনেক বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিতেছেন। ঐ কারণেই হউক বা লোকাধিক্য বশতই হউক, ইদানীং অস্বাস্থ্যের লক্ষণও কিছু প্রবল দেখা যাইতেছে।

খাসিয়া-শৈলের স্বভাব-সৌন্দর্য্যের নানা উপকরণ বিদ্যমান; গিরিগুহা এবং উষ্ণপ্রস্রবণ তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। গুহার মধ্যে চেরাপুঞ্জি এবং রূপনাথের গুহারই প্রসিদ্ধি অধিক। কিংবদন্তী আছে,—রূপনাথের গুহাভ্যন্তর দিয়া চীন রাজ্য পর্য্যন্ত যাওয়া যায় এবং পুরাকালে একদা চীন-সম্রাট্ নাকি অগণ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে এই গুহার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। অনেক গুহার মধ্যে নাকি আবার প্রস্তর-খোদিত হিন্দুর-দেবমূর্ত্তি আছে। চীন-রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত না হউক, এইরূপ গিরি-কন্দর যে অনেক স্থলেই বিলক্ষণ গভীর ও দেবমূর্ত্তির আধার—ইহা অমূলক বোধ হয় না এবং এই সকল গুহাভ্যন্তরে যে আজ পর্য্যন্ত কত সংসার-বিরাগী সাধু-পুরুষ সচ্চিদানন্দের সাধনায় নিরত আছেন, কে তাহা সাহসপূর্ব্বক অস্বীকার করিতে পারে? কাছাড়-সীমান্তর্গত পূর্ব্বোল্লিখিত কপিলী-নদীর তীরবর্ত্তী সুমীর নামক স্থানে একটী উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। মুঙ্গেরের নিকটবর্ত্তী সীতাকুণ্ডের ন্যায় ইহার পবিত্রতা সম্বন্ধীয় কোনরূপ প্রসিদ্ধি না থাকিলেও, বাহ্য-লক্ষণে ইহা সীতাকুণ্ডাপেক্ষা বিশেষ হীন বোধ হয় না।

জলপ্রপাত এখানকার প্রাকৃতিক শোভার অন্যতম উপকরণ। এখানে-সেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রপাত বিস্তর আছে, সে সকলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে চেরাপুঞ্জির নিকটস্থ Mausmai Falls এবং শিলঙ্ সহরের অনতি-দূরস্থ Beadon's Fall দেখিবার সামগ্রী বটে। নগরাজ হিমালয়ের অত্যুচ্চ শিখরদেশে তুষার-স্রোত দেখিতে মহা মহিমান্বিত; আর যখন সেই তুহিন-ক্ষেত্রে সুবর্ণ বর্ণ অরুণ-কিরণ প্রতিফলিত হয়, তখন শোভার ইয়ত্তা থাকে না, সে শোভা সন্দর্শনে মানুষ ক্ষণেকের জন্য মুগ্ধ হইয়া ঐশী মহিমায় তন্ময় হইয়া পড়ে। উদয়-অস্তের আরক্তিম ছবি অনন্ত আকাশে বিকশিত, আর সুবিমল রশ্মিতেজে তুষার-স্রোত অসংখ্য বর্ণে সুরঞ্জিত—দেখিয়া মানুষ পঞ্চভৌতিক নশ্বর জগতের কথা ক্ষণেকের জন্য ভুলিয়া যায়,—যেন জ্যোতির্ম্ময় স্বর্গদ্বারে অনন্ত পুরুষের অস্ফুট ছবি দেখিতে পাইয়া উল্লাসে নৃত্য করিতে থাকে, অথবা ভাবের ভরে মন্ত্রমুগ্ধবৎ বিচেতন হইয়া পড়ে। এখানকার জলপ্রপাত গুলি সেরূপ অনির্ব্বচনীয় ভাবোদ্দীপক না হইলেও তাহাদিগের মহান্ দৃশ্য বিশ্বকর্ম্মার কৃতিত্বের অপরূপ নিদর্শন, সন্দেহ নাই; পাপ-তাপে অনুতপ্ত মনুষ্য-সমাগম পরিহার করিবার জন্যই যেন তাহারা বিরলে—বনের মাঝে আশ্রয় লইয়াছে, আর অতি উচ্চ শিখরভূমি হইতে অজস্রধারে বারিধারা অতি নিম্নে অবিরাম গতিতে নিপতিত হইয়া যেন মর্ত্ত্যভূমে বিশ্বনিয়ন্তার অপার করুণাবর্ষণের পরিচয় দিতেছে। কিবা অপরূপ স্থান!—চতুর্দ্দিকে গগনভেদী পাহাড়—পাহাড়ে বিশাল বৃক্ষশ্রেণী—নিবিড় জঙ্গল-

রাশি—নীরব ভীষণতা!—দারুণ নিস্তব্ধতা!—কেবল মধ্যে মধ্যে বনজ-বিহঙ্গের কাকলী, বায়ুর স্বন্ স্বন্ শব্দ, আর জলপ্রপাতের অবিরাম ঝম্ ঝম্ রব সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে—প্রায়ই বৃষ্টি, বৃষ্টির সঙ্গে "কড়-কড়-কড়ে" কুলিশের নাদ দিগন্ত ফাটাইয়া ভীষণতা বৃদ্ধি করিতেছে, আবার সেই শব্দের বিরামেই অধিকতর নিস্তব্ধতা উপস্থিত হইতেছে। প্রকৃতির এই কি-জানি-কেমন ভাব কেবল বুঝিবার সামগ্রী—বুঝাইবার নহে।

উত্তর-আমেরিকার 'নায়েগ্রা' জলপ্রপাত জলপ্রাচুর্য্যে (volume of water) জগতে অদ্বিতীয়, কিন্তু উহার উচ্চতা (ভৌগোলিক রুকম্যান সাহেবের মতে) ১৬২ ফীট মাত্র। অন্যপক্ষে, ইতালীর Cerasoli Falls উচ্চতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু নায়েগ্রার কথা দূরে থাকুক, ভারতের অনেক জলপ্রপাতের তুলনাতেও, জলাংশে উহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। খাসিয়া-পর্ব্বতের Mausmai Falls ঐরূপ জলাংশে তুচ্ছ হইলেও, উচ্চতায় পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বলা যাইতে পারে।* ডাক্তার ওলডহাম সাহেবের মতে উহার উচ্চতা ১৮০০ ফীট;—পতনাবস্থায় প্রস্তর-স্তূপে বেগ-রুদ্ধ হইয়া জলপ্রপাতটী দুই স্তরে বিভক্ত হইয়াছে,—সর্ব্বোচ্চ সীমা হইতে মধ্যভাগ ৮০০ ফীট এবং তথা হইতে পুনঃ প্রপাতের নিম্নতল পর্য্যন্ত ১০০০ ফীট। Beadon's Falls উচ্চতায়, আনুমানিক, ৬০০ ফীট হইবে। ভারতের নানা স্থানে নানা প্রপাত আছে, সকল গুলির জলের পরিমাণ নির্ণয় করা দুরূহ; নিম্নে উচ্চতানুসারে, বিদেশীয় বিখ্যাত প্রপাতগুলির তুলনায় কয়েকটীর নামোল্লেখ করা গেল;—

দেশ।	স্থান।	জলপ্রপাত।	উচ্চতা।
ইতালী	আল্পস পর্ব্বতশ্রেণী	সিরাশোলী	২৪০০ ফীট।
ঐ	ঐ	ইভান্সন্	১২০০ ,, ।
	স্লাভয়	আর্ভা	১১০০ ,, ।
উত্তর-আমেরিকা	ইরাই এবং অণ্টেরিও হ্রদের মধ্যে	নায়েগ্রা	১৬২ ,, ।
ভারতবর্ষ	কানারা, পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালা	সরাবতী বা গৈরসাপা	৮৮৮ ,, ।
ঐ	মহাবলেশ্বর পর্ব্বত	মেন্না	৬০০ ,, ।
ঐ	মহীশূরে	কাবেরী	৩০০ ,, ।
ঐ	বুন্দেল খণ্ড	তমসা (Tons)	২০০ ,, ।
ঐ	খাসিয়া পর্ব্বতে	মৌসমাই	১৮০০ ,, ।
ঐ	ঐ	বীডন্স	৬০০ ,, ।

ভারতের মৌসমাই যেরূপ উচ্চতায় জগতে দ্বিতীয় আসন পাইবার যোগ্য, জলপ্রাচুর্য্যে সরাবতী তদ্রূপ;—নায়েগ্রার নিম্নে একমাত্র উহাকেই গণনা করা যাইতে পারে।*

ভূতত্ত্বে।—খাসিয়া-পাহাড়ের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপ স্তর দেখিতে পাওয়া যায়;—কোথাও মৃত্তিকা, কোথাও বালুকা, কোথাও কঠিন প্রস্তরময়। মৃত্তিকার অধি-

* ওলডহাম সাহেব কৃত খাসিয়া পাহাড়ের ভূ-তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ।

* উপরি-লিখিত তালিকা ও তৎসংক্রান্ত বিবরণ ভ্রম-প্রমাদশূন্য নহে। খাসিয়া-শৈলে বসিয়া, পুস্তকাভাব সত্ত্বেও যাহা সংগ্রহ করা গেল, তাহাই এ স্থানে উল্লেখ করা হইল। সহৃদয় পাঠকবর্গ প্রমাণ-সহ ভ্রম দেখাইয়া দিলে পরম অনুগ্রহ বোধ করিব।



জল-প্রপাত।

কাংশই লালবর্ণ ও লৌহঘটিত। পাহাড়ের অনেক স্থলেই লৌহের আকর আছে; তন্মধ্যে খাইরিম্, মৌপ্লিম ও চেরাপুঞ্জির আকরই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। পূর্ব্বে এই সমস্ত আকর হইতে অনেক লৌহ প্রস্তুত হইত; কলিকাতা যাদুঘরের অধ্যক্ষ (Curator, Asiatic Museum) শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম ভাগ 'জন্মভূমি'র চতুর্থ সংখ্যায় ইহার প্রস্তুতকরণ-প্রণালী বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। "বিলাতী লৌহের আমদানিতে খাসিয়া-পর্ব্বতে লৌহ প্রস্তুত করা প্রায় একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে।" *

কয়লা এবং চুণ † এ পাহাড়ে অতি উৎকৃষ্ট এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কলিকাতা এবং তৎসন্নিহিত স্থান-সমূহে ছাতকের চুণ বলিয়া যাহা পরিচিত, তৎসমস্তই এই খাসিয়া-পাহাড়ে জন্মে; পর্ব্বত-সীমান্তে শ্রীহট্টের অধীন ছাতক নামক স্থান হইতে এই চুণের চালান যায় বলিয়াই বঙ্গে উহা ছাতকের চুণ নামে প্রসিদ্ধ। চেরাপুঞ্জির নিকটস্থ থড়িয়া নামক স্থানে চুণের আকর অধিক এবং ঐ থড়িয়া হইতে রেলযোগে—৮ মাইল মাত্র—কোম্পানিগঞ্জ পর্য্যন্ত যাইয়া তথা হইতে নৌকা-যোগে ছাতক যায় ও ছাতক হইতে, প্রয়োজন মত, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। এক চুণের চালানের জন্যই ঐ ক্ষুদ্র রেলপথটুকুর সূক্ষ্মরেখা আসাম-সীমায় দেখিতে পাওয়া যায়, নচেৎ এত দিনে উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইত। কয়লার খনিও চেরাপুঞ্জি এবং জয়ন্তী পর্ব্বতের দক্ষিণ সীমান্তর্ব্বর্ত্তী লাকাডঙ্ নামক স্থানে অধিক। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন, চেরাপুঞ্জিতে ৩,৭২,৯১,৪০০ এবং লাকাডঙে ৩,১৬,৮৪,০৮০ মণ কয়লা আছে। ‡ গুণাংশে উৎকৃষ্ট হইলেও, কিন্তু এ কয়লা স্থানান্তরে বড় ব্যবহৃত হয় না। আসামের মধ্যে লক্ষ্মীপুর জেলার অন্তর্গত ডিব্রুগড়ের নিকটবর্ত্তী মাকুমের কয়লাই কলিকাতায় গিয়া থাকে। কয়লা-কোম্পানির স্বকৃত রেলপথে এবং ব্রহ্মপুত্র-বক্ষে কলিকাতার বিখ্যাত সরিদ্বিহারী পোতাধ্যক্ষ ম্যাক্নীল কোম্পানির জলপোতে গমনাগমনের সুবিধা থাকায় মাকুমের কয়লা সহজেই কলিকাতায় নীত হয়, কিন্তু খাসিয়া পাহাড়ের কয়লা স্থানান্তরে পাঠাইবার সেরূপ সুগম পথ না থাকায় উহা খাসিয়া-পাহাড় বাসীর ব্যবহারেই পর্য্যবসিত হয়, ক্বচিৎ পাহাড়-সংলগ্ন শ্রীহট্টের বাজারেও বিক্রীত হইয়া থাকে।

এ পাহাড়ে প্রস্তরও নানাবিধ;—কোথাও আগ্নেয় স্ফটিকময়, কোথাও কেবল শ্লেটে পরিপূর্ণ, কোন ভাগ দৃঢ়, কোন অংশ ভঙ্গপ্রবণ। এখানকার অট্টালিকাদি, সমস্তই প্রস্তরে গঠিত, শ্লেটও যথেষ্ট পরিমাণে গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফলতঃ পর্ব্বতের সর্ব্বত্র প্রয়োজনীয় পদার্থে পরিপূর্ণ; অধুনা পাশ্চাত্য-

* আসামের শাসন-বিবরণী, ১৮৯২-৯৩, দ্বিতীয় সংখ্যা, (এ) ১ম পরিচ্ছেদ, ৫৯এর প্যারা।

† এস্থলে যেখানে চুণের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, সেই স্থানেই (Lime-Stone) চূর্ণ প্রস্তরের কথা বুঝিতে হইবে। এই প্রস্তর হইতে কিরূপ প্রক্রিয়ায় ব্যবহারোপযোগী চুণ প্রস্তুত হয় এবং খাসিয়া পাহাড়ে কোন্ কোন্ খনিজ পদার্থ কিরূপ পরিমাণে ও কোন্ উপায়ে পাওয়া যায়, তৎসমুদায়ের বিস্তৃত-বিবরণ-অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ Memoirs of the Geological Survey of India, Vol. I, Part II., নামক গ্রন্থে দেখিবেন। উপর-আসামে "আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে" কোম্পানির যে কাজ চলিতেছে, তাহাতেও এই খাসিয়া-পাহাড়ের চুণ ব্যবহৃত হইতেছে।

* ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অর্ণবপোতে ব্যবহারের পক্ষে ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কয়লা ভারতবর্ষের অন্যত্র কোথাও পাওয়া যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ ভূতত্ত্ব-বিষয়ক বিবরণীর ২২ এবং ২৩ তলকে দ্রষ্টব্য।

রুচিজাত বিলাসিতা চরিতার্থ করা ভিন্ন পর্ব্বত-বাসীর পক্ষে পাহাড়ের নিম্নে পদার্পণ করিবার কোন প্রয়োজন ঘটে না।

ঐতিহাসিক।—"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"—এ কথার যৌক্তিকতা ইংরেজের কার্য্যে যেরূপ প্রতীয়মান, অন্যত্র কদাচ তাহা দৃষ্ট হয়; ইংরেজ বাণিজ্য-ব্যপদেশে সূচ্যগ্র ভূমির স্বত্ব লাভ করিয়া কাল-সহকারে সসাগরা পৃথিবীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া দাঁড়ান। সমগ্র ভারতাধিকারের মূলেও যে সূত্র, এই ক্ষুদ্র নগণ্য খাসিয়া-পাহাড় অধিকারের মূলেও তাহাই;—বাণিজ্যসূত্রেই ইংরেজ এখানে প্রথম পদার্পণ করেন। পূর্ব্বকথিত খাসিয়া-চূণের ব্যবসায় বহুকাল হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; খাসিয়ার এই অবাধ-বাণিজ্য সুচতুর ইংরেজের চিত্ত আকর্ষণ করিল। তাঁহারা ঐ বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিবার উদ্দেশে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে অল্পে অল্পে পাহাড়ে প্রবেশ করিলেন এবং পাহাড়ের উপর দিয়া শ্রীহট্ট হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত পথ প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে, নঙ্ক্লাওয়ের খাসিয়া-রাজার অনুমতি-ক্রমে তাঁহারই রাজ্যে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। ভারতের যেখানে ইংরেজ, সেই স্থানেই তাঁহার অনুচর বাঙ্গালী ন্যূনাধিক বর্ত্তমান; এই খাসিয়া-পাহাড়েও সেই প্রথমাবস্থায় ইংরেজ বাঙ্গালীশূন্য ছিলেন না। বাঙ্গালী অকৃতজ্ঞ জাতি কিনা! বাঙ্গালী হইয়া, আমাদিগের বলা শোভা পায় না;—কিন্তু ইংরেজের কার্য্যে যে কোন ক্রটী লক্ষিত হয়, সহৃদয় ইংরেজ তাহা বাঙ্গালীর শিরে আরোপ করিতে পশ্চাৎপদ হন না। নঙ্ক্লাওয়ে অবস্থানকালে, অত্যল্প কালের মধ্যেই ইংরাজ ও খাসিয়াতে মনোবিবাদ জন্মে ও ক্রমে তাহা প্রকাশ্য বৈরিতায়, এবং পরিণামে যুদ্ধবিগ্রহে পর্য্যন্ত পরিণত হয়। ইংরেজের ইতিহাসে ব্যক্ত—বাঙ্গালীর অবৈধাচরণই এই দুর্দ্দৈবের অন্যতম হেতু। হেতু যাহাই হউক, ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রেল তারিখে খাসিয়ারা প্রকাশ্যে অস্ত্রধারণ করে এবং দুইজন সাহেব ও কতিপয় সিপাহী তাহাদিগের হস্তে প্রাণ-বিসর্জ্জন করেন। অগত্যা সরকার বাহাদুর আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, রীতিমত যুদ্ধায়োজন হইল এবং খাসিয়াগণকে সম্যক্-রূপে শাসিত ও নিয়মিত করিতে প্রায় পাঁচ বৎসর কাল কাটিয়া গেল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল লিষ্টার পোলিটিক্যাল এজেন্ট রূপে প্রথমে উল্লিখিত নঙ্ক্লাওয়ে অধিষ্ঠিত হন,—ইংরেজের বিজয়নিশান তদবধি খাসিয়া-শৈলে উড্ডীয়মান। সিভিল ও মিলিটারীর কর্ত্তৃত্বভার প্রথমতঃ, একাধারেই ন্যস্ত ছিল, পরে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বোল্লিখিত চেরাপুঞ্জি সহরে ইংরেজ রাজ্যের রাজধানী স্থাপিত ও ঐ সিভিল মিলিটারীর বিচ্ছেদ সংসাধিত হয় এবং মিঃ হাডসন্ নামক জনৈক সাহেব বাহাদুর ডেপুটি কমিশনার রূপে সিভিলের কর্ত্তৃত্বপদে নিয়োজিত হন। শাসন ও বিচার-ভার তখনও একসূত্রে গ্রথিত ছিল,—এখনও আছে; ফলতঃ, তদবধি প্রায় একই নিয়মে খাসিয়া-শৈলের শাসনযন্ত্র পরিচালিত হইতেছে।

খাসিয়া ও জয়ন্তী পর্ব্বত বর্ত্তমান ইংরেজ রাজত্বে একসূত্রে জড়িত হইলেও, পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন রাজার অধীন ছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন কারণ ও কৌশলে, এতদুভয় পর্ব্বতের অসভ্য রাজারা ব্রিটিশরাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। জয়ন্তী পর্ব্বত, প্রথমতঃ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের অধিকৃত হয়, কিন্তু ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে উহা সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত ও উহার অধিবাসিবর্গের অত্যাচার প্রশমিত হয় নাই। কিংবদন্তী আছে,—জয়ন্তীরাজ ইন্দ্রসিংহ তান্ত্রিকমতে শক্তিপূজক ছিলেন এবং তাঁহার

উপাস্যদেবী-সন্নিধানে নরবলি দিতেন; ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্ববংশীয় কয়েকজন লোক ব্রিটিশ-রাজ্যের তিন জন প্রজাকে কৌশলে অপহরণ করিয়া করাল-বদনা কালী-মন্দিরে ঐরূপ বলি দিয়াছিলেন। স্বয়ং ইন্দ্রসিংহ এই লোমহর্ষণ কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে ইংরেজ-কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন এবং ইংরেজ-রাজের নিকট বার্ষিক ছয় সহস্র মুদ্রা বৃত্তি ভোগ করিয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ শ্রীহট্টে নির্ব্বিবাদে অতিবাহিত করেন। জয়ন্তী-পর্ব্বতে ইংরেজাধিপত্য এই সূত্রেই সূচিত। রাজ্যলাভের সঙ্গে রাজস্ব বৃদ্ধি করা, বোধ করি, রাজধর্ম্মের অন্যতম নীতি; সেই নীতি বা পদ্ধতি অনুসারে ইংরাজ-রাজ নব-বিজিত জয়ন্তীরাজ্যের রাজস্ব-বিস্তারে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। জয়ন্তীর অসভ্য প্রজা এতকাল কলাটা, মূলাটা, ছাগলটা, মহিষটা দিয়া তাহাদিগের অসভ্য রাজার মনস্তুষ্টি সাধন ও রাজস্ব পরিশোধ করিয়া আসিতেছিল, অধুনা সুসভ্য ইংরেজ প্রবর্ত্তিত আর্থিক কর-প্রদানে তাহারা আপনাদিগকে নিতান্ত নিপীড়িত বোধ করিল এবং তাহাদিগের আপন রাজার প্রতি ইংরেজের নির্ম্মম ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া বিদেশী রাজাকে আদৌ করদান করিতে অস্বীকৃত হইল। এইরূপ অসভ্য-সমাজে সহসা নূতন কর স্থাপন ও নূতন রাজস্বধারা প্রবর্ত্তন করিয়া ইংরেজ অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন; অন্য দিকে, স্বাস্থ্য-রক্ষানুরোধে জয়ন্তীর বর্ত্তমান রাজধানী জোবাই গ্রামে তত্রত্য অধিবাসিবর্গের চিরন্তন শবদাহ প্রথাও তাঁহারা প্রতিরোধ করিয়াছিলেন। এইরূপ নানা কারণে অসভ্য সিণ্টেঙের * মন উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তাহারা প্রকাশ্যে প্রবল-প্রতাপ ইংরেজের প্রতি বৈরিতা সাধন করিতে প্রস্তুত হইল। সিণ্টেঙের উপদ্রব-প্রশমনার্থ ইংরেজ তাহাদিগকে নিরস্ত্র করা সিদ্ধান্ত করিলেন; কিন্তু তাহাতে সম্যক্ সফলকাম হওয়া দূরে থাকুক, বরং অধিকতর কুফলই ফলিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে একদা একস্থানে সিণ্টেঙের ধর্ম্মোৎসব চলিতেছিল; সশস্ত্র নৃত্য করা এই উৎসবের প্রধান পদ্ধতি,—এ ক্ষেত্রেও তাহারা সে পদ্ধতি ভঙ্গ করে নাই, বরং অধিকতর উল্লাসে নৃত্য করিতেছিল। তাহাদিগকে নিরস্ত্র করার আদেশ ইতিপূর্ব্বেই পুলিসের উপর প্রবল ছিল; পুলিসের পক্ষে সেই আদেশ প্রতিপালন করিবার এই এক সুযোগ মিলিল,—স্বয়ং দারোগা সাহেব সেই নর্ত্তকগণকে নিরস্ত্র করিতে অগ্রসর হইলেন। এতদিন যে বহ্নি ভস্মস্তূপে প্রচ্ছন্ন ছিল, এই সামান্য ফুৎকারে আজ তাহা জ্বলিয়া উঠিল—অসভ্য জয়ন্তীবাসী উন্মত্ত হইল; জোবাইয়ের পুলিস-থানা জ্বালাইয়া দিল,—ইংরেজের সিপাহী-সৈন্য অবরোধ করিল,—স্বীয় স্বাধীনতা সমুদ্ধারের জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট হইল। এই বিদ্রোহ-শান্তির জন্য ইংরেজকে যথারীতি যুদ্ধায়োজন করিতে এবং অসভ্যগণকে সুশাসিত করিবার জন্য বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, অসাধারণ সমরকুশল ইংরেজের নিকট অসভ্য সিণ্টেঙ কতদিন মস্তকোত্তোলন করিয়া থাকিতে পারে?—বিদ্রোহী দলপতিগণ একে একে বন্দী হইতে লাগিল এবং ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই জয়ন্তীর বর্ব্বরভূমে ইংরেজের শান্তিরাজ্য অক্ষয়-ভাবে সংস্থাপিত হইল। তদবধি খাসিয়া ও জয়ন্তী-পর্ব্বতের সমগ্র প্রজা ইংরেজ্-শাসনে শান্ত ও অবনত-ভাব ধারণ করিয়াছে। চেরা-পুঞ্জি পূর্ব্বে ইংরেজাধিকৃত খাসিয়া-পর্ব্বতের রাজধানী ছিল; পরে, অতিরিক্ত বর্ষার

* জয়ন্তী-পর্ব্বতের অধিবাসিগণ সিণ্টেঙ্ নামে অভিহিত।

প্রকোপে * সরকারী কার্য্যের অসুবিধা ঘটায়, ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে উহা বর্ত্তমান শিলঙে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে, আসাম বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটী পৃথক্ প্রদেশরূপে গঠিত হইলে, শিলঙেই সমগ্র আসামের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ পর্য্যন্ত শিলঙেই লাট-মন্দির শোভা পাইতেছে এবং সমগ্র আসামের শাসনকার্য্য পরিচালিত হইতেছে।

শাসন-প্রণালী।—খাসিয়া-জয়ন্তী-সম্মিলিত সমগ্র ভূভাগ তিনটী প্রধান অংশে বিভক্ত;—ইংরেজাধিকৃত খাসিয়া-পাহাড়, খাসিয়া অধিকৃত খাসিয়া-পাহাড় এবং জয়ন্তী-পাহাড়। ইহার প্রত্যেক অংশ আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণায় বিভক্ত;—খাসিয়া-অধিকৃত ভূখণ্ড ও জয়ন্তী-পাহাড়—প্রত্যেকের মধ্যে ২৫টী এবং ইংরেজাধিকৃত খাসিয়া-পাহাড়ে ২৪টী পরগণা। জয়ন্তীর সমগ্রভাগ সম্যক্‌রূপে ইংরেজরাজের অধীন; খাসিয়া-পাহাড়ের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র সরকারবাহাদুরের স্বীয় শাসনভুক্ত, অবশিষ্ট সমস্ত স্থান ইংরেজরাজের সহিত সন্ধি-সূত্রে সম্মিলিত খাসিয়া-জমিদারগণের অধীন। প্রভুত্ব ও অধিকার-ভেদে এই সমস্ত জমিদারগণ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত; তন্মধ্যে সিএম্, ওহাদাদার সর্দ্দার এবং লিঙ্‌দোগণের নামই উল্লেখযোগ্য। খাসি-অধিকৃত উল্লিখিত ২৫টী পরগণার মধ্যে ১৫টী সিএম্, একটী ওহাদাদার, পাঁচটী সর্দ্দার এবং চারিটী লিঙ্‌দোগণের অধীনস্থ। মর্য্যাদা-বিষয়ে সিএম্‌গণই সকলের শীর্ষস্থানীয়; বঙ্গভাষাভিজ্ঞ খাসিয়ারা ইহাদিগকে রাজা বলিয়া থাকে, খাসিয়ার অভিধানে 'সিএম্' কথার মৌলিক অর্থ—জীবন বা আত্মা। এই সমস্ত খাসিয়া-রাজারা ইংরেজ-সরকারকে কোনরূপ রাজস্ব দান করে না; কিন্তু তাহাদিগের অধিকারভুক্ত স্থানসমূহের মধ্যে খনিজ, বনজ বা অন্যবিধ ফসলের অর্দ্ধেক উপস্বত্ব সরকারে সরবরাহ করিয়া থাকে। প্রজাসাধারণের নির্ব্বাচনানুসারে এবং ইংরেজরাজের অভিমতিক্রমে, সিএম্ বংশ হইতেই ঐরূপ খাসিয়া-শাসনাধিনায়ক নিয়োজিত হইয়া থাকে; স্বাধীন খাসিয়া ভূমির সর্ব্বত্র ঐ সমস্ত অধিনায়কগণ শাসনকার্য্য পরিচালন করে, কিন্তু নরহত্যা বা তদ্রূপ গুরুতর অপরাধের বিচার ব্রিটিশ-ধর্ম্মাধিকরণে নিষ্পন্ন হয়। এইরূপ অপরাধ উপলক্ষে সিএম্-বিশেষের অনবধানতা বা অত্যাচার লক্ষিত হইলে ইংরেজ রাজকর্ত্তৃক তাহাকে স্থানচ্যুত ও ক্ষমতাভ্রষ্ট এবং পূর্ব্বোল্লিখিত প্রথানুসারে নূতন সিএম্ অভিষিক্ত করা হয়। ইংরেজাধিকৃত খাসিয়াভূমে সরকার বাহাদুরের-সাধারণ শাসননীতি পূর্ণমাত্রায় চলে না; আইনের মূলসূত্র অবলম্বন করিয়া অনেক নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। খাসিয়া-পাহাড়ে প্রবাসকালে, খাস পর্ব্বতীয় ভিন্ন, অপর সাধারণকেও অনেকাংশে ঐ সমস্ত ধারার অধীন থাকিতে হয়। জয়ন্তী পাহাড় একটী মহকুমারূপে পরিগণিত; শিলঙের ডেপুটী কমিশনার সাহেবের অধীনে তথাকার প্রধান স্থান জোবাইগ্রামে একজন নিম্নপদস্থ সাহেব শাসনকর্ত্তা আছেন, তাঁহারই দ্বারা সমস্ত মহকুমার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

* শুনা যায়, সমগ্র এসিয়া-ভূমির মধ্যে চেরাপুঞ্জিতে জলবর্ষণের মাত্রা অধিক। সমগ্র এসিয়া হউক আর না হউক, আসাম-প্রদেশের মধ্যে যে উহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, সরকারী বিজ্ঞপ্তীতেই তাহা প্রকাশ পাইয়াছে;—ব্রহ্মপুত্র-অধিত্যকাস্থিত সমস্ত জেলার যত জলপাত, এক চেরাপুঞ্জিতে প্রায় তত দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বস্রষ্টার অদ্ভুত সৃজনকৌশল,—শিলঙ্ এবং চেরাপুঞ্জির মধ্যে ১৩ ক্রোশ মাত্র ব্যবধান, অথচ উভয়ের প্রাকৃতিক অবস্থা অনেকাংশে পৃথক্। এক জলবর্ষণ অধ্যায়ে দেখা যায়, চেরাপুঞ্জিতে সংবৎসরে ৪৭৩ ইঞ্চি জলপাত, পক্ষান্তরে শিলঙে ঐ সময়ের মধ্যে জলপাত ৮৫ ইঞ্চি মাত্র।

নানাকথা।—অসভ্য খাসিয়ার রাজ্যে ইংরেজের পাদস্পর্শে সভ্যতার উপকরণ গঠনোপযোগী মূল ভিত্তির কথা বলা গেল। এখন উহার পথ ঘাট, ফল-ফসল, জীব-জন্তু প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ বিষয় সম্বন্ধে দুই-চারি কথা বলা যাউক, পরে খাসিয়া জাতির কথা উত্থাপন করা যাইবে। ইংরেজ-রাজ-প্রসাদাৎ পাহাড়ের সর্ব্বত্র সুপ্রশস্ত ও সুচিক্কণ পথ সকল প্রস্তুত হইয়াছে; পূর্ব্বকথিত ঐতিহাসিক তত্ত্বঘটিত শ্রীহট্ট হইতে কামরূপের পথই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও সংস্কৃত,—গগনভেদী পর্ব্বতের বক্ষ ভেদ করিয়া আরক্তিম রথবর্ত্মের ক্ষীণরেখা দেখিতে বড়ই নয়নারাম। বর্ষার প্রকোপেও পার্ব্বতীয় পথের কোথাও কর্দ্দমের চিহ্ন নাই; বরং বর্ষণান্তে প্রস্তরময় পথের সমধিক শোভা বর্দ্ধিত হয়—বৃষ্টির বেগে আবর্জ্জনা-সমূহ দূরীভূত হইয়া পথ অধিকতর পরিমার্জ্জিত হয়। ফসলের মধ্যে আলু, কুমড়া, শশা, আনারস ও সফ্লাঙ্গু; স্থানে স্থানে চাউল ও রবিশস্যও কিয়ৎ পরিমাণে জন্মে, কিন্তু তাহা অসভ্য খাসিয়ার অথবা বাক্স্ফূর্ত্তি-বিহীন গোজাতির উপভোগ্য,—ভদ্রসমাজের পরিপাকও হয় না, মুখেও উঠে না। আলু এখানকার প্রধান সামগ্রী, পূর্ব্বে সুলভও বিলক্ষণ ছিল, এখন রপ্তানির দৌরাত্ম্যে দুর্ম্মূল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে; ব্যবসা-জীবন আগরওয়ালা মহাপ্রভুগণের কৃপায় আসামের সর্ব্বত্র এবং কলিকাতা পর্য্যন্ত উহার চালান যাইতেছে। আনারসের বন হয় ও প্রচুর পরিমাণে জন্মে; খাসিয়া উহার স্বাদ জানিত না, এখনও বড় কেহ জানে কিনা সন্দেহস্থল;—সংপ্রতি সাহেব ও বাঙ্গালীবর্গের সংযোগে গতিবিধি হওয়ায় চতুর খাসিয়া উহার মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছে এবং বাজারের পসরা সাজাইতেছে। 'সফ্লাঙ্গু' কেশুর-জাতীয় মূলবিশেষ—উদ্ভিদতত্ত্ববিদেরা নাম দিয়াছেন **Flemingia Vestita** উহা খাসিয়ার অতি রুচিকর খাদ্য; হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাটে অসভ্য খাসিয়া উহা অবিরাম চর্ব্বণ করিতেছে, বিরামকালে 'গুয়া-পান' উহার স্থান অধিকার করিতেছে। খাসিয়া পাহাড়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল কমলালেবু। শ্যামল কমলা-কুঞ্জে বৃক্ষে বৃক্ষে শাখায়-শাখায়, অগণন সুবর্ণ-বর্ণ কমলা শোভা পাইতেছে।—দেখিতে বড়ই নয়নানন্দবর্দ্ধক। কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান-সমূহে যে কমলা বিক্রীত হয়, সে সমস্তই এই খাসিয়া পাহাড়ের ফল। বাল্যকালে বাঙ্গালার গ্রাম্য-সঙ্গীতে শুনিয়াছিলাম—

"ওহে কমলালেবু প্রাণ!
সিলেটেতে জন্ম তব, বেলেঘাটায় স্থান।"

কমলা-বিলাসী সুরসিক সঙ্গীতকারের কৃপায় আমাদিগের ধারণা ছিল—এখনও, বোধ করি, অনেক বাঙ্গালীর এ ধারণা বিদূরিত হয় নাই—যে শ্রীহট্টেই কমলালেবুর উৎপত্তি। বাস্তবিক তাহা নহে। সঙ্গীতকারেরও বিশেষ অপরাধ নাই;—পূর্ব্বে 'ছাতকের চুণ' সম্বন্ধে যে কথা বলা গিয়াছে, 'শ্রীহট্টের কমলা' সম্বন্ধেও সেই কথাই প্রযোজ্য। শ্রীহট্ট-সীমান্তেই খাসিয়া-পাহাড়ের যত উৎকৃষ্ট পদার্থের উৎপত্তি-স্থান। কমলারও উৎপত্তি ঐ স্থানে। শ্রীহট্টের প্রধান নদী সুরমা-যোগে উহা কলিকাতায় নীত হওয়ায় সাধারণের ধারণা—শ্রীহট্টেই উহার জন্ম। বৈশাখের বিষম রৌদ্রে সুমিষ্ট কমলার রসাস্বাদ করিতে পারা, খাসিয়া-পাহাড়-প্রবাসী বঙ্গবাসীর প্রবাস-ক্লেশের মধ্যেও এক বিলাস-সুখের উপকরণ! কমলার গুণে আর এক উপাদেয় দ্রব্য জন্মে—মধু। কমলা-মধু অতি পরিষ্কার ও সুমিষ্ট এবং কবিরাজী মতে পরম উপকারী;—এই উপকার স্মরণ রাখিয়া বিদেশী বাঙ্গালী 'স্বদেশ' গমন কালে কিঞ্চিৎ মধু সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইতে অন্যথা করেন না। এতদ্ভিন্ন পান-সুপারি, তুলা,

ইক্ষু প্রভৃতি দ্রব্যও এ পাহাড়ে পাওয়া যায়; তেজপত্র, লঙ্কা, মরিচ, দারুচিনি প্রভৃতি মসলাও জন্মে। তাম্বুল-চর্ব্বণে ইতর-ভদ্র আসামবাসী মাত্রেরই বড় রুচি; সে কারণ আসামের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে পান পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের ন্যায় এ প্রদেশে পানের চাষ হয় না; অধিকাংশ স্থলেই নিবিড় সুপারি-কুঞ্জেই পান জন্মে;—উচ্চশির সুপারি-বৃক্ষের অঙ্গ-বেষ্টন করিয়া পর্ণলতা উর্দ্ধমুখী হইয়া কবিকল্পিত "সহকার সনে মাধবী-লতা"র তুলনাকে তুচ্ছ করিতেছে। সহকার-মাধবীর সম্বন্ধ অপেক্ষা পান-সুপারির সম্বন্ধ অধিকতর অবিচ্ছিন্ন, সন্দেহ নাই—হিন্দু দম্পতীর অটুট সম্বন্ধের ন্যায় অবস্থান্তর কালেও তাহাদিগের একত্র বাস। পান-সুপারির এই অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ সংস্থাপনে বঙ্গবাসী অপেক্ষা আসামবাসীই অধিকতর ভাবুকতার পরিচয় দিয়াছেন। এই সংযোগের উপর পর্ণপত্রে চূর্ণ-লেপনের ন্যায় কাক-বিষ্ঠা দর্শনেই তাম্বুল-মোহান্ধ পথিক মনের আবেগে বলিয়া-ছিলেন,—

"একই গাছে পান-সুপারি, একই গাছে চূণ—
মরি! দেশের কিবা গুণ!"

অসভ্য খাসিয়া সভ্যতর আসামী অপেক্ষা পানে অধিকতর রত; জাগ্রৎ-অবস্থায় তাহার মুখে পানচর্ব্বণের বিরাম নাই, ভ্রমণকালে চর্ব্বিত পানের সংখ্যা দ্বারা ইহারা পথের দূরত্ব নির্ণয় করে।

আসামের সমতল ভূমে প্রায় সর্ব্বত্রই চা-বাগিচা; কিন্তু পাহাড়ে উহা বড় জন্মে না। সমগ্র খাসিয়া পাহাড়ে একখানি মাত্র বাগিচা আছে, তাহাতে বার্ষিক ৫০ মণ আন্দাজ চা জন্মে। খাসিয়া-পাহাড়বাসী বাঙ্গালীকে কলিকাতাবাসীর প্রায় সমান মূল্যে চা ক্রয় করিয়া খাইতে হয়। এণ্ডি, মুগা প্রভৃতি আসাম-জাত রেশমও এখানে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। খাসিয়া-পর্ব্বতে জঙ্গলের ভাগ নিতান্ত অল্প; রবার ভিন্ন অপর মূল্যবান্ বৃক্ষও এখানে অতি অল্প জন্মে। বনের ভাগ অল্প হইলেও, বন্য জন্তুর বড় অভাব নাই; ব্যাঘ্র, ভল্লুক, হস্তী, গণ্ডার, শূকর, মহিষ, শৃগাল, হরিণ—সকলই আছে, কেবল সর্পভয় নাই। বিষাক্ত সর্পের ভাগ অতি অল্পই দেখা যায়, শীতের প্রকোপে তাহারা, বোধ হয় গহ্বর হইতে মস্তকোত্তোলন করিতে পারে না। সুন্দরবনের ন্যায় মনুষ্য-খাদক ব্যাঘ্রের বিষয়ও এখানে বড় শুনা যায় না; মনুষ্যরক্তের রসাস্বাদন তাহাদিগের ভাগ্যে অল্পই ঘটিয়াছে। খাসিয়া-জমিদারগণ-অধিকৃত ভূখণ্ডে অনেক 'হাতীর মহল' আছে, হস্তি-শিকার দ্বারা এই সকল মহলে অর্থাগমও হইয়া থাকে; এই অর্থের অর্দ্ধেক ইংরেজ-সরকারে এবংঅপরার্দ্ধ খাসিয়া-রাজ-দরবারে যাওয়াই সাধারণ নিয়ম।

খাসিয়া পাহাড়ের জলবায়ু প্রায় সর্ব্বত্রই সুন্দর। বর্ষা ও শীত ঋতু ভিন্ন অপর ঋতুর উপলব্ধি বড় হয় না। সাহেবদিগের পক্ষে এ স্থান সর্ব্বাংশে বড়ই প্রীতিপ্রদ, কিন্তু ক্ষুদ্র-প্রাণ বঙ্গবাসীর পক্ষে শীতের মাত্রা বড় বিষম বোধ হয়। ষড়্‌ঋতুর সমাবেশ বঙ্গদেশে যেরূপ প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত হয়, ভারতের অন্যত্র কোথাও সেরূপ দেখা যায় না। শীতসহিষ্ণু সাহেবের নিকট শিলঙের শীত-বর্ষা যেরূপ রুচিকর, বাঙ্গালীর নিকট বার মাস সে ভাব বড় ভাল লাগে না। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠে বৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত একটু বসন্তের লক্ষণ বোধ হয়; বাঙ্গালীর নিকট এই অবস্থাটুকু বড়ই মনোরম। নৈদাঘ তপনের প্রতপ্ত-কিরণ-সম্পাতে বঙ্গবাসী এখন বিষম জর্জ্জরিত, কিন্তু তাঁহার প্রবাসী বন্ধু খাসিয়া-শৈলের সুস্নিগ্ধ মারুত-হিল্লোলে পরম পুলকিত, দাসত্ব ও প্রবাস-জনিত অসহ্য কষ্টের

খাসিয়া-জাতি।



মধ্যেও ক্ষণিক সুখসম্ভোগে গৌরবান্বিত। সিমলা, দার্জ্জিলিঙ্ প্রভৃতি পাহাড় অপেক্ষা এখানকার শীতের কঠোরতা অল্প, পক্ষান্তরে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর জ্যোতিঃ-প্রভা সমধিক প্রতিভাত; প্রবাসী বাঙ্গালীর বিরহ-বিপদ ইহাতে অনেকটা তিরোহিত হয়। বঙ্গদেশসুলভ ব্যাধির ভাগও এখানে নিতান্ত অল্প,—ম্যালেরিয়ার মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা আদৌ নাই; দুঃখলব্ধান্ন সুস্থ শরীরে ভোজন করিতে পাওয়াও বিদেশীয় পক্ষে সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

লোক জন।—বিগত ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের গণনায় দেখা গিয়াছে, সমগ্র খাসিয়া জয়ন্তী-পাহাড়ে ১৯৭,৯৮৪ জন লোকের বাস; তন্মধ্যে ৭৪,৫২১ জন মাত্র জয়ন্তীর অধিবাসী, বক্রী সমস্তই খাস খাসিয়া-পাহাড়ের এবং শেষোক্তের মধ্যে ৬,৭২০ জনের বাস রাজধানী শিলঙ্ সহরে। বলা বাহুল্য, এই সংখ্যার কিয়দংশ ঔপনিবেশকগণ কর্ত্তৃক গঠিত। খাসিয়াগণ সহজে স্বীয় বাসভূমি পাহাড় হইতে নিম্নদেশে অবতরণ করিতে ভাল বাসে না; তবে, সভ্যতা-বৃদ্ধির সঙ্গে, আজ-কাল পাহাড়-সংলগ্ন শ্রীহট্ট, কাছাড়, কামরূপ ও অপরাপর স্থানে দুই দশ জন কার্য্য সূত্রে যাইতে শিখিয়াছে। লোক-সংখ্যার হিসাব অবধারণে বুঝা যায়, এইরূপে শ্রীহট্টে ৩,৬৭৩, কাছাড়ে ৩১৩, কামরূপে ১৯৫ এবং অন্যান্য স্থানে ৫২০ জন খাসিয়ার বাস হইয়াছে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবলোকনে ইহাদিগকে মঙ্গোলীয় জাতির শাখা বলিয়া অনুমান হয়,—

বক্র আঁখি, নত নাসা, উচ্চ গণ্ড, ক্ষুদ্র মস্তক, স্থূল ওষ্ঠ ;—পার্ব্বত্যজাতি মাত্রই প্রায় এইরূপ। আকৃতি খর্ব্ব, কিন্তু বলিষ্ঠ ও সাহস-ব্যঞ্জক ; গুল্‌ফের উপরিভাগ দৃঢ়, মাংসল ও পেশীযুক্ত। পুরুষেরা প্রায়ই শ্মশ্রুবিহীন, কিন্তু গুম্ফযুক্ত। ইহাদিগের, বিশেষতঃ রমণীগণের, প্রকৃতি সদাই প্রফুল্ল ; শারীরিক পরিশ্রম এবং সাহস-পরাক্রম প্রদর্শন করিতে ইহারা কোন অংশে হীনবল নহে ; পুরুষেরা কিন্তু বড়ই দ্যূতক্রীড়াসক্ত।

খাসিয়ারা, সাধারণতঃ দিবসে দুইবার আহার করে। শুষ্ক মৎস্য তাহাদিগের অতি উপাদেয় খাদ্য ; অধিকন্তু, কুক্কুর-মাংস ভিন্ন অপর কোন জন্তুর মাংসই তাহাদিগের অখাদ্য নহে। অসভ্য খাসিয়ার ধারণা,—মনুষ্য-সৃষ্টির অব্যবহিত পরেই তাহাদিগকে প্রেতাত্মার হস্ত হইতে পরিত্রাণের নিমিত্ত ঈশ্বর কুক্কুর জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন! এইজন্যই সৃষ্ট জীবের মধ্যে কুক্কুরকুলের প্রতি তাহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি, কুক্কুর-মাংসও সে কারণে তাহার অভক্ষ্য। সভ্যজাতির পক্ষে যাহা শ্রেষ্ঠ আহার্য্য, খাসিয়ার পক্ষে প্রায়ই তাহা পরিত্যাজ্য ;—দুগ্ধই ইহার মধ্যে প্রধান উপকরণ, খাসিয়া দুগ্ধকে বিষ্ঠাবৎ ঘৃণ্য পদার্থ বোধ করে। খাসিয়াগণ অতিশয় পানাসক্ত, কিন্তু আফিম, গঞ্জিকা প্রভৃতি অপর কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে না। তাম্বুল-রাগ-রঞ্জনে খাসিয়া-রমণীর অধরশোভার পরিচয় 'অসমা সুন্দরী' প্রবন্ধেই ব্যক্ত করিয়াছি, ইহার সঙ্গে তাম্রকূট-সেবনের ব্যবস্থাও বড় হীন নহে। তাম্বুলরাগে দশনপংক্তির বিকৃত দশা সমুৎপাদন করা খাসিয়ার অঙ্গশোভার লক্ষণ ; একারণ তাহারা ঘৃণা করিয়া বলে,—"কুক্কুর ও বাঙ্গালীর দন্ত অতি ধবল!"

আজ-কাল সুসভ্য খাসিয়া-পুরুষগণ বাঙ্গালীর ন্যায় ধুতি-চাদর ব্যবহার করিয়া থাকেন ; পার্থক্যের মধ্যে বাঙ্গালী উষ্ণীষবিহীন, খাসিয়ার মস্তকে উষ্ণীষ বা আধুনিক আপিসার-উপভোগ্য শিরস্ত্রাণ ব্যবহৃত হয়। অসভ্য খাসিয়ার একমাত্র পরিচ্ছদ—আজানু-লম্বিত 'আস্তীন'-শূন্য 'আলখাল্লা,' তাহার তলদেশে ঝালর ঝলঝলায়মান ; মস্তকে পশু-চর্ম্ম-বিনির্ম্মিত অপরূপ টুপি। এইরূপ সাজে সুসজ্জিত খাসিয়া মূর্ত্তি দেখিতে অতি সুন্দর, যেন ধড়া-চূড়া-পরিহিত ব্রজের গোপাল নন্দদুলাল! রঙ্গ-বিরঙ্গ 'ডোরা'-বিশিষ্ট বস্ত্রখণ্ডে খাসিয়া-রমণীর কটিদেশ সুবেষ্টিত এবং উভয় স্কন্ধের উপরি-ভাগে গ্রন্থি-সম্বদ্ধ পৃথক্ বস্ত্রে দেহের উর্দ্ধ-ভাগ আবৃত ; বিশিষ্টাগণের মধ্যে ইংরেজি 'জ্যাকেট' প্রবর্ত্তিত,—অবস্থার অনুপাতে বস্ত্রের ব্যবস্থাও সমধিক সৌষ্ঠব-সম্পন্ন। উৎসবোপলক্ষে খাসিয়ানীগণ স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কার পরিধান করিয়া থাকে,—প্রবালমালা তাহাদিগের প্রিয়তম ভূষণ।

খাসিয়াদিগের জাতিভেদ নাই, কিন্তু সম্প্রদায়-ভেদ আছে। বিগত লোক-সংখ্যা-অবধারণ উপলক্ষে আসামপ্রদেশের সেন্‌সাস্-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহানুভব শ্রীযুক্ত ই,এ, গেট, আই, সি, এস, বাহাদুর, বিশেষ পর্য্যালোচনা-পূর্ব্বক এই সম্প্রদায় গুলিকে প্রধানতঃ, চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন ;—

১। এক শ্রেণী আপনাদিগকে কোন জীব বা উদ্ভিদের বংশজাত বিবেচনা করে। ইহাদিগের মধ্যে কেহ অলাবু, কেহ সরল-বৃক্ষ, কেহ কর্কট, কেহ বানর, কেহ বা বরাহ-বংশ-সম্ভূত।

২। ব্রিটিশাধিকারের পূর্ব্বে খাসিয়াগণ পর্ব্বতসীমান্তে, শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে, দৌরাত্ম্য করিয়া তত্রত্য ইতর-জাতীয়া রমণীগণকে হরণ করিয়া আনিত। এই সকল রমণীর গর্ভে খাসিয়ার ঔরসে যে সন্তান জন্মিয়াছিল, তাহাদিগের বংশধরেরা 'খর শিলট' (শ্রীহট্টবাসী),

'খর আকর' (সুসভ্য বাঙ্গালী) প্রভৃতি নামে অভিহিত। আদিম খাসিয়াগণ হইতে ইহাদিগের আকৃতিগত পার্থক্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। খাসিয়াদিগের মধ্যে এইরূপ বংশ-সম্ভূত লোক বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। পূর্ব্ব-পুরুষের আকৃতি বা প্রকৃতি অনুসারে অনেক বংশ পরিচিত; যথা,—বলিটু (শ্বেত), ডুকুলি (স্বার্থপর) ইত্যাদি।

৪। কাহারও বংশ ব্যবসায়গত, যেমন কামার, বণিক্ প্রভৃতি।* সভ্যতর খাসিয়া-রমণীগণের মধ্যে সতীত্ব-জ্ঞান অল্পই লক্ষিত হয়। কুমারী অবস্থায় ইহারা অনেকেই পর-পুরুষাসক্তা থাকে এবং খাসিয়া-পুরুষের অল্পতা নিবন্ধন, কেহ বা আজীবন স্বৈরিণীতাচরণ-পূর্ব্বক দিনপাত করে। সৌভাগ্যের বিষয়, বিবাহিতাবস্থায় কেহ স্বামীর বিশ্বাসঘাতিনী হয় না। বাল্য-বিবাহ ইহাদিগের মধ্যে বিরল,—যৌবনের জোয়ারে আত্ম-বিহ্বল না হইলে প্রায়ই বিবাহ-সংস্কার ঘটে না। এ বিবাহ-পদ্ধতিও বিচিত্র,—পিতা বা অপর অভিভাবক সংঘটিত সামান্য চুক্তি মাত্র; কোনরূপ আদান-প্রদান নাই, কোন উৎসব-আড়ম্বর নাই, আর ধর্ম্মের সঙ্গে ত আদৌ কোন সম্বন্ধই নাই। সভ্যতার উন্মেষে এবং সভ্যতর জাতির সংঘর্ষে, বরযাত্রা এবং আহার-বিহারের ব্যাপার আজ-কাল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সহযোগে কন্যার ভবনে উপনীত হন এবং পরদিবস প্রাতে পরিণীতা প্রণয়িনী সমভি-ব্যাহারে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পত্নী ও তাঁহার কুটুম্বদিগকে যথাসাধ্য ভোজ্যে পরিতুষ্ট করেন। পতি-গৃহে দুই এক দিন অবস্থানের পর নব-দম্পতী কন্যার ভবনে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সুখ-স্বচ্ছন্দে সহবাস করেন। নিঃস্ব-সংসারে কন্যা মাতৃ-গৃহেই থাকে, বরও আপন গৃহে থাকে—কেবল স্বেচ্ছামত শ্বশ্রূ-ভবনে পত্নীর নিকট যাতায়াত করে; এইরূপে সন্তানাদি জন্মিলে, স্বামী পৃথক্ বাটী নির্ম্মাণ করিয়া পুত্র-কলত্র লইয়া তথায় বাস করে। স্বীয় বংশ-সম্ভূতা কোন রমণীর পাণিগ্রহণ করিবার প্রথা নাই; পিতামহী, পিতৃস্বসা বা পিতার অপর কোন নিকট আত্মীয়াকে বিবাহ করাও অবৈধ; তদ্ভিন্ন সর্ব্বত্রই বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধন করা চলিতে পারে। উদ্বাহ বন্ধন যেমন শ্লথ, উহা ভঞ্জনের প্রথা ততোধিক সহজ হওয়াই সম্ভব; "সামান্য সাংসারিক বচসায় বা আহারাদির বন্দোবস্তের ত্রুটী ঘটিলেই দাম্পত্য প্রণয় অন্তর্হিত হয় এবং দুইদশ জনকে জানাইয়া পাঁচ কড়া কড়ি বা পাঁচটী পয়সা পরস্পর বিনিময় করিলেই বিবাহ-বন্ধন চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়! ইহার পর পতি-পত্নী আপন ইচ্ছামত পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু "ভাঙা-প্রেমে যোড়া লাগে না!"—একবার বিবাহ বন্ধন ভঙ্গ হইলে আর তাহাদিগের মধ্যে পরিণয় সম্ভবে না। এ বিবাহে ঘোর স্বেচ্ছা-চারিতা—মূলেও যে সূত্র, অন্তিমেও তাহাই; রূপজ মোহে অভিভূত হইয়া দুই দশ দিন একত্রে সহবাস, আর সে মোহ কাটিলেই পরস্পর বিচ্ছেদ, আবার অন্য পুরুষ বা রমণীর প্রতি আসক্তি। সাম্যের ইহা এক সুন্দর নিদর্শন এবং সাম্যবাদী সভ্য সমাজের সুশিক্ষার অতি উৎকৃষ্ট উপকরণ। যে সমাজে এইরূপ সধবা-বিবাহই চলে, বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ থাকা সেখানে বিচিত্র নহে; খাসিয়ার মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত, কিন্তু বহুবিবাহ নিষিদ্ধ। বহু-বিবাহ পূর্ব্বে চলিত, কিন্তু সভ্যতার সূত্রপাতে তাহা প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে, তবে পুরুষাপেক্ষা রমণীর সংখ্যা অধিক হওয়ায় সম্ভ্রান্ত খাসিয়াকে

* আসামের লোক-সংখ্যার বিবরণী, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ইতর-শ্রেণীস্থ খাসিয়ার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিতে হইতেছে।

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—জীবনের তিনটী প্রধান ঘটনা। খাসিয়ার বিবাহ-পদ্ধতির পরিচয় আমরা প্রথমেই দিলাম; এখন জন্ম-মৃত্যু-ঘটিত অনুষ্ঠানের দুই এক কথা বলাও নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সূতিকা-গৃহে অবস্থান-কালে প্রসূতি অশুচি বলিয়া বিবেচিত হয় না; সকল অবস্থাতেই যে শৌবাশৌচ-জ্ঞান-বিরহিত, প্রসবান্তে অশুচিভাব তাহার অন্তরে উদিত হইতেই পারে না। হিন্দুর শাস্ত্রে বিধান আছে,—

"অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।"

জানি না, খাসিয়ার হৃদয়-কন্দরে পুণ্ডরী-কাক্ষের পবিত্র স্মৃতি অনুক্ষণ সজাগ কিনা, তবে তাহার বিবেচনায় সে, সকল অবস্থাতেই যে শুচি, তাহা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি! খাসিয়া-শিশুর নামকরণ-প্রথা কিছু অপরূপ বটে। আচার্য্য সুরাপূর্ণ একটী কমণ্ডলু, কিঞ্চিৎ তণ্ডুল-চূর্ণ ও তিন্তিড়ী এবং একটী ধনু ও তিনটী তীর লইয়া যজমান-গৃহে শুভাগমন করেন; শিশুর মাতামহী বা অপর আত্মীয়া কর্তৃক তখন তিনটী নাম নির্ব্বাচিত হয় এবং আচার্য্য মহাশয় চাউল-চূর্ণ ও তেঁতুলটুকু একখানী কদলী-পত্রে রাখিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তদুপরি তিন বিন্দু সুরা নিক্ষেপ করেন। এই তিন বিন্দু সুরা তিনটী নামের প্রতিরূপ; কমণ্ডলু হইতে যে বিন্দুর পতনকালে অধিক সময় পর্য্যবসিত হয়, সেই বিন্দুস্থানীয় নামেই শিশু অভিহিত হইয়া থাকে। আচার্য্য তখন শিশুকে তীর-ধনু প্রদর্শন এবং বিক্রমশালী যোদ্ধা হইবে বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। সাম্য-ভক্ত সভ্য-মহলে আজ-কাল যে প্রথাই প্রবর্ত্তিত হউক, স্ত্রী পুরুষের কর্তব্য-ভেদ সকল দেশে, সকল সময়ে, সকল অবস্থাতেই ছিল; এই অসভ্য খাসিয়া-সমাজেও সে পার্থক্য শিশুর নামকরণোৎসবেই প্রতীয়মান। আদিম খাসিয়াদিগের মধ্যে ধনুর্ব্বাণ লইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মৃগয়াদি করা পুরুষের এবং ঝুড়ি-কুঠার লইয়া গৃহ-কার্য্যে মনোযোগী হওয়া রমণীর কর্ত্তব্য; এই নিমিত্ত নামকরণান্তে, পুত্রকে উল্লিখিতরূপ ধনুর্ব্বাণ এবং কন্যাকে তৎপরিবর্ত্তে কুঠার ও ভারবহনোপযোগী পেটী প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সভ্য খাসিয়াদিগের মধ্যে রায়, সিংহ প্রভৃতি পদবী এবং হরিচরণ, চন্দ্র-মোহন অথবা Sewis, Solomon প্রভৃতি নাম প্রবর্ত্তিত হইতেছে; অসভ্য খাসিয়ার নাম অনেক স্থলে অর্থশূন্য—পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি দৃষ্ট পদার্থ যাহা নগ্ন চক্ষে উপনীত হয়, খাসিয়াগণ অনেক সময়ে তাহাই পুত্র-কন্যার নাম রাখিয়া থাকে। লিঙ্গ-বোধার্থ 'উ' ও 'কা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে;—শ্রীমান্ উ আর শ্রীমতী কা। ক্লীব-লিঙ্গেও 'কা' প্রচলিত; যথা,—'কা দুধ,' 'কা ডিঙ্' ইত্যাদি।

হিন্দুর ন্যায় খাসিয়াদিগের মধ্যে শব-দাহ-প্রথা প্রচলিত। কিন্তু এই ঔর্দ্ধদেহিক উৎসবেও কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। মাতৃ-বংশীয়দিগের দ্বারাই খাসিয়ার সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে—পিতার ধার তাহারা বড় ধারে না! মাতৃবংশীয় কুটুম্বগণ কর্তৃক শব শ্মশানে নীত ও তাহার অগ্নিসংস্কার সাধিত হয়। এই সংস্কারের অগ্রে আত্মীয়বর্গ পূর্ব্ব-পশ্চিম উত্তর দিকে দুইটী তীর নিক্ষেপ এবং প্রেতাত্মার উদ্দেশে একটী কুক্কুট-বলি উৎসর্গ করে; খাসিয়ার বিশ্বাস,—আত্মার লোকান্তর গমনকালে ঐ কুক্কুট পথ-প্রদর্শক হইবে এবং তীরদ্বয় পথের শত্রু নিপাত করিয়া আত্মার মঙ্গল সাধন করিবে। দাহান্তে ভস্মাবশিষ্ট অস্থি-

কঙ্কালাদি একটী মৃণ্ময় পাত্রে সংগ্রহপূর্ব্বক যথাকালে বংশপরম্পরাগত সমাধিক্ষেত্রে তাহা প্রোথিত করিয়া স্মৃতি-স্তম্ভ স্বরূপ তদুপরি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড স্থাপন করে। পুরুষের জন্য এই প্রস্তর ঊর্দ্ধশির করিয়া এবং স্ত্রীলোকের জন্য ভূমির সহিত সমান্তরালভাবে স্থাপন করাই বিধি। খাসিয়ার এই সমাধি-কাণ্ড হিন্দু-সমাজের শ্রাদ্ধোৎসব স্থানীয়; এই সূত্রে ইহা-দিগের মধ্যে বহুদিনব্যাপী নৃত্যভোজাদি চলিয়া থাকে। ইহারা আত্মার দেহান্তর-প্রাপ্তি বিশ্বাস করে, কিন্তু মানবাত্মার ক্রমোন্নতি না ঘটিয়া ক্রমাবনতি ঘটাই তাহাদিগের ধারণা; তাহারা বলিয়া থাকে,—"মানুষ মরিয়া কূর্ম্ম, কর্কট, বানর, ভেক প্রভৃতি জীবরূপে পরিণত হইবে।"

খাসিয়া-মহলে স্ত্রীজাতিই বংশের চূড়া। মাতৃ-গৃহে অবস্থান কালে, বিবাহিতই হউক আর অবিবাহিতই হউক, খাসিয়া-পুরুষের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি তাহার মাতৃবংশেই পর্য্যবসিত হয়। হিন্দুর দায়ভাগ-তত্ত্ব অনেক পণ্ডিতেই অবগত আছেন; খাসিয়ার দায়াদ-নিরূপণে তাঁহাদিগের কোন গোলযোগ না ঘটে, এই অভিপ্রায়ে তাহার উত্তরাধিকারীর ক্রমসূত্র এই স্থলে সংযোজিত হইল;—একের অভাবে পরবর্ত্তী আত্মীয় বিষয়াধিকারী হইবে;—মা, মাতামহী, ভগিনী (মাতার কন্যা), ভাগিনেয় (মাতার দৌহিত্র), ভ্রাতা (মাতার পুত্র), মাতুলানী বা মাতৃস্বসা, তৎপুত্রাদি, প্রমাতামহীর ভগিনী ও সন্তানাদি। সহোদরের সন্তানেরা ভিন্ন-বংশীয় বলিয়া পরিগণিত, তাহারা কোন ক্রমেই বিষয়াধিকারী হইতে পারে না। মাতুলালয় পরিত্যাগ করিয়া শ্বশুর-ভবনে বাসকালে মৃত্যু ঘটিলে স্ত্রী এবং স্ত্রীর মৃত্যুতে তাহার সন্ততি, বিষয়াধিকারী হইয়া থাকে; কেবল পুরুষের আপন বসনভূষণ তাহার ভ্রাতৃ-ভগিনীর প্রাপ্য হয়। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, পিতৃবংশের সহিত সন্তানের কোন সম্বন্ধ নাই, মাতুলবংশ দ্বারাই সে পরিচিত; এমন কি, পূর্ব্বকথিত খাসিয়া-রাজার রাজ্যও, মাতার সম্বন্ধে, তদীয় সহোদর বা ভাগিনেয় অধিকার করিয়া থাকে, তাহার আপন পুত্র-কন্যা তাহা-দিগের জননীর বিষয় ও বংশ-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়। রমণীর একাধিক পুরুষগ্রহণই এই প্রথার মূল হেতু বোধ হয়;—বর্ত্তমান বাটা-বিভ্রাটের ক্ষতি-পূরণের টাকা লইবার জন্য অনেক সাহেব-নামধেয় সভ্য পুরুষকে এই কারণে আপন পিতৃবংশ-পরম্পরা অবধারণে ব্যতিব্যস্ত হইতে দেখিয়াছি।

অসভ্য পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে খাসিয়া-সমাজেই সভ্যতার উন্মেষ কিছু অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। খৃষ্টীয় পাদরি-পুঙ্গবেরাই এই সভ্যতা-সঞ্চারের বিশিষ্ট হেতু। ধর্ম্মতত্ত্বের নিগূঢ় রসাস্বাদনের সঙ্গে খাসিয়াগণ খৃষ্টান-গুরুর নিকট ইংরেজ-সমাজগত অনেক প্রণালী শিক্ষা করিয়াছে। বাণিজ্য-ব্যবসায়ে, গৃহাদি-নির্ম্মাণে স্থপতি-বিদ্যায় ইহারা অসাধারণ উন্নতি করিয়াছে এবং খাসিয়া খৃষ্টানগণ গৃহ-সজ্জায় পারিপাট্য-বর্দ্ধনে বিলক্ষণ পটু হইয়াছে। খৃষ্টান-গুরুর কৃপায় খাসিয়াগণ অনেকে লেখা-পড়াও শিখিয়াছেন, কেহ কেহ কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই একটী পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইতেছেন, আর কেরাণীগিরির কলম পরি-চালনে অনেকেই দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। ইহাদিগের স্বকীয় কোন লিখিত ভাষা বা পুস্তকাদি ছিল না,—অধুনা এই খৃষ্ট-গুরুর প্রসাদে ইংরেজি অক্ষরে ইহাদিগের লিখন-প্রণালীও গঠিত হইয়াছে। খাসিয়াদিগের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা সুন্দর ভাবে চলিতেছে. এমন কি, সমগ্র আসাম-প্রদেশের মধ্যে খাসিয়া-পাহাড়ই স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে শীর্ষস্থানীয় বলিয়া

পরিচিত। ইংরেজি সুরে বাইবেল হইতে খাসিয়া-ভাষায় অনুবাদিত ভগবৎ-স্তোত্র-সঙ্গীত খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দিরে খাসিয়া রমণীগণ কর্ত্তৃক অতি সুললিত তানে গীত হইয়া থাকে। ফলতঃ ইংরেজি সমাজের অনেক চিত্রই খাসিয়া-ভবনে দেখা যায়, ইংরেজ ও সেজন্য খাসিয়াগণকে অন্তরের সহিত ভাল বাসেন। তবে মূল ধর্ম্ম বিষয়ে ইহারা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে বলা যায় না; প্রয়োজন মতে ইহারা এক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে; স্বৈরিণীতাচরণও সমাজ-বিরুদ্ধ নহে, ধর্ম্মান্তর গ্রহণেও সমাজগত পাতিত্য জন্মে না। আজ খৃষ্টান, কাল মুসলমান, পরশ্ব মূলধর্ম্মী প্রেতোপাসক!—সাম্যতন্ত্রী ব্রাহ্মভ্রাতাগণ ইহাদিগকেই আবার আজ-কাল ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া 'বাহবা' লইতেছেন। স্বর্গীয় মহাত্মা রামমোহন রায়ের উপনিষদোক্ত ব্রহ্মবাদের যে এই বিষম পরিণতি হইবে,—সদাচার-ভ্রষ্ট খাসিয়া "ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" হৃদ্গত করিয়া জগতে একেশ্বরবাদের মহিমা ঘোষণ করিবে,—স্বর্গীয় মহাত্মা জীবদ্দশায় ইহা, বোধ করি, কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই! রামমোহন বা কেশবচন্দ্র আজ মর-জগতে বিদ্যমান থাকিলে তাঁহাদিগের প্রচারিত এই অভিনব ধর্ম্মের এতাদৃশ অভ্যুত্থান তাঁহারা দর্শনে পুলকিত বা বিষণ্ন হইতেন, একবার চিন্তার বিষয় বটে;—আমরা কেবল "অপরং বা ভবিষ্যতি" ভাবিয়া নীরবে দুই বিন্দু অশ্রুপাত করি। শেলার নিকটবর্ত্তী কয়েক ঘর খাসিয়া বৈষ্ণব বলিয়াও পরিচয় দিয়া থাকে; শ্রীহট্টবাসী কোন চৈতন্য-শিষ্য কর্ত্তৃক ইহাদিগের হৃদয়ে বিষ্ণুভক্তি উপচিত হইয়া থাকিবে।

প্রয়োজন-বিশেষে বা সভ্য-জাতির সংস্রবে খাসিয়াগণের মধ্যে আজ-কাল খৃষ্ট, ব্রাহ্ম, মুসলমান বা হিন্দুধর্ম্মের ছায়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে দেখা দিলেও, অধিকাংশ খাসিয়াই এখন পর্য্যন্ত উপদেবতার উপাসক। আধিভৌতিক বা আধিদৈবিক কোনরূপ দুঃখ সমুপস্থিত হইলেই উহারা আপন-আপন ধারণামত উপদেবতা-বিশেষের প্রকোপকে উহার হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করে এবং তাহা প্রশমনার্থ তত্তদ্দেবতার উদ্দেশে কুক্কুট বা তাহার ডিম্ব উৎসর্গ করে। প্রেত-পূজার পর্ব্বোপলক্ষে স্থানে স্থানে নৃত্যভোজাদি উৎসব হইয়া থাকে, তন্মধ্যে নঙ্ক্রেম্-রাজ-ভবনস্থ উৎসবই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য; এই উপলক্ষে শিলঙের সম্ভ্রান্ত সাহেবগণও রাজ-ভবনে নিমন্ত্রিত হইয়া থাকেন। খাসিয়া-রমণীর নৃত্য দেখিবার সামগ্রী বটে; সে নৃত্যে চলনের চটুলতা নাই, কটাক্ষের ভ্রূভঙ্গী নাই, নিতম্বের আস্ফোট নাই,—সে নৃত্য, ধীর, স্থির, গম্ভীর—চরণ চলি-চলি চলে না, দেহলতা দুলি-দুলি দোলে না, মুখ-কমল ফুটি-ফুটি ফোটে না।—সে নৃত্য দেখিবার সামগ্রী,—বুঝাইবার নহে। নর্ত্তনপ্রিয় পাঠকের পরিতৃপ্তির নিমিত্ত সে নৃত্যের সামান্য নমুনা তুলিয়া দিলাম; ইহাতে সকলে সেই অপরূপত্বের, অধিকন্তু খাসিয়া স্ত্রী পুরুষের আকৃতির, কতক পরিমাণে আভাস পাইবেন। দেহান্তর-প্রাপ্তি সম্বন্ধে খাসিয়ার বিশ্বাসের পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি; পরলোকের ঈষদন্ধকার-আব-ছায়াও তাহার অন্তরাকাশে সময়ে সময়ে উদিত হয়; তবে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল—কোথায় তাহার পরিণতি, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না। জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণের দৃষ্টিতেও যাহা আজ পর্য্যন্ত ঘোর অন্ধকার, অসভ্য খাসিয়ার মনস্তত্ত্বে আর তাহা কতদূর জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতে পারে? খাসিয়া স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অবাধ বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রচলিত থাকিলেও, পত্যন্তর গ্রহণ স্ত্রীজাতির পক্ষে অবৈধ নীতি বলিয়া তাহাদিগের বিশ্বাস; ইহজীবনে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর সম্বন্ধ অটুট থাকিলে পরলোকেও

তাহারা অবিচ্ছিন্ন প্রেমে বদ্ধ থাকিতে পারিবে, ইহাই তাহাদিগের সমাজ-ধর্ম্মের অন্যতম নীতি। হিন্দুর সহিত খাসিয়ার ধর্ম্ম-নীতির এই টুকু সামঞ্জস্য দেখিয়া কল্পনাকুশল পণ্ডিতগণ হিন্দু-কেও খাসিয়ার সদৃশ বর্ব্বর ভাবিবেন কিনা, বলিতে পারি না!

খাসিয়ার সকল কথাই সংক্ষেপে বলা হইল। তাহার ভাষার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ভাষা-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা প্রত্যেক ভাষারই মূলসূত্র উদ্ভাবন করিয়া থাকেন;—পার্ব্বত্য জাতির ভাষা-মূলে তাঁহারা কতদূর প্রবেশ করিতে পারেন, খাসিয়ার এই ভাষা প্রসঙ্গে তাহা বিবেচ্য। খাসিয়ার চলিত-কথার মৌলিক উপাদান আমরা ত কিছুই অনুমান করিতে পারি না। তবে, শিশুর বাক্যস্ফুরণের 'মা-বাপ' এই দুই মধুময় শব্দের যে প্রথম উদ্গম হয়, খাসিয়ার বুলিতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। 'মা'-'পা' এই দুই অস্ফুট উচ্চারণ সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে শুনা গিয়া থাকে,—খাসিয়ার নিকট মা 'মি' রূপে অবতারিত 'পা' মৌলিক ভাবেই বিদ্যমান, কেবল লিঙ্গ ভেদার্থ শব্দদ্বয়ের পূর্ব্বে 'কাক্' ও 'উক্' সংযুক্ত হইয়া, যথাক্রমে 'কাক্মি' ও 'উক্পা,' দাঁড়াইয়াছে। আর এক কথা;—প্রচলন অভাবে, খাসিয়ার অভিধানে পূর্ব্বে অনেক কথা ছিল না, এখন বঙ্গদেশীয় বন্ধুদিগের সম্মিলনে সেই সকল কথা বাঙ্গালা-উচ্চারণে ব্যবহৃত হইতেছে, কেবল ক্লীবলিঙ্গ বোধক 'কা' তাহা-দিগের পূর্ব্বে যুক্ত হইয়া থাকে; যথা,—কা দুধ, কা চিনি, কা-ঘি, ইত্যাদি। তঙ্কা টঙ্কা-রূপে, খবর খুবররূপে মৌলিক অবস্থারই পরিচয় দিতেছে; ধ্বনি অনুসারে বিড়ালের নাম কা-মিউ হইয়াছে। এইরূপ দুই-দশ কথা ভিন্ন খাসিয়ায় শব্দশক্তি-নিরূপণ করা দুরূহ; নিম্নে পাঠকের অবগতির নিমিত্ত কয়েকটী কথা সংযোজিত করিলাম;—

আমি	মঙা।
তুমি	ফি।
এখানে	হাঙনে।
সেখানে	সেতাই।
কোথায়	শেন্ন।
আইস	আলে।
যাও	লাইনো।
রাখ	বু।
বস	শঙ।
সূর্য্য বা দিন	কা সিঙি।
রাত্রি	কা মিট।
চন্দ্র	কাব নায়।
শিশু	খুন্।
কাষ্ঠ বা অগ্নি	কা ডিঙ।
জলাশয় বা জল	উম্।
বৃষ	উ-মাশিডাপ্।
গাভী	কা-মাশি।
কুক্কুর	উ-ক্লউ।
ব্যাঘ্র	উ-খ্লাউ।
ছাগ	ব্লাঙ।
সর্প	উব সেন।
তামাক	ডি-ডুমা।
হুক্কা	তাঙ-ডুমা।
মৃত্যু	লাত-আপ্।
ঈশ্বর	উ-ব্লেই।

খাসিয়ার খ্যাতি, বোধ করি, ভারতের কোন জাতিরই বিদিত নহে। এরূপ জাতির বাসভূমি ও বিস্তৃত কাহিনী বর্ণন করিয়া আমরা কাহারও বিস্ময়-নয়নে পড়িব কিনা, জানি না। তবে, সভ্য-জাতির সংসর্গে অসভ্য-জাতির কিরূপ ক্রমোন্নতি সম্ভবে, খাসিয়ার আখ্যায়িকায় তাহা অনেকটা বুঝা যাইতে পারে, আর সেই উদ্দেশ্যেই আমাদিগের এই প্রবন্ধের অবতারণা।

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

জীর্ণ তরু।

(১)

চারিদিকে নীরবতা, শূন্য নিরালয় ;
অঙ্গে ফুটে তীক্ষ্ণ রবিকর ;
একা শুধু জীর্ণ-তরু রয়েছি দাঁড়ায়ে
মৃত্যুহীন মৃত-কলেবর।
পত্র-পুষ্প-ফলহীন শুষ্ক শাখাচয়—
প্রকটিত প্রাণের কঙ্কাল ;—
হৃদয়ের অতিঘোর বিজন শ্মশানে
রাশীকৃত স্মৃতি-ভস্মজাল।

(২)

সমুখেতে ম্রিয়মাণ নিদাঘ-তটিনী,
মুখে তার সরে না বচন ;
দুই ধারে রৌদ্রতপ্ত বহ্নি-বালুরাশি
দীর্ঘশ্বাসে উড়ায় পবন।
প্রকাণ্ড, প্রচণ্ড মাঠ, তৃণমাত্রহীন ;
কোন দিকে চলে না নজর ;—
মাঝে-মাঝে জাগে শুধু মেঘ-মরীচিকা
স্পন্দহীন নয়নের'পর।

(৩)

শিরোপরি সাদা মেঘ দ্রুত উড়ে যায় ;
ছায়া তার পড়ে না হেথায় !
দূর হ'তে চেয়ে-চেয়ে চরন্ত পশুরা
দূর হ'তে চমকি পলায় !
সারাদিনে একটীও চলে না পথিক,
রাখালেরা আসে নাক আর ;—
একা শুধু জীর্ণতরু রয়েছি দাঁড়ায়ে
রুদ্রমূর্ত্তি মরুভূ মাঝার।

(৪)

সন্ধ্যাবেলা কোথা হ'তে আসি' সমীরণ
ক্ষণমাত্র করে হায়-হায় !
কদাচিৎ পথহারা একেলা বিহগী
নীরে এসে বেগে চ'লে যায়।
কদাচিৎ কোথা যেন পাই শুনিবারে
স্বপ্নসম ভেসে আসে গান ;—
কভু বা শৃগাল-দলে তীব্র কোলাহল,
কুক্কুরের বিকট ব্যাদান !

(৫)

নিশীথে ডাকিয়া যায় গুপ্তচর পাখী—
লুপ্তকায় পেচকের পাল ;
অলক্ষ্যে আঁধারে বসি' পিশাচ-বাদুড়
করে রব কর্কশ-করাল

তা'রাও আসে না পাশে ; শূন্য হ'তে চাহি'
ধায় দ্রুত কম্পিত-কাতর ;—
আশঙ্কায় মুখচ্যুত খ'সে পড়ে ফল
জীর্ণ-শীর্ণ মস্তকের'পর !

(৬)

শ্মশানের মত এই প্রান্তর-প্রদেশে
পূর্ণিমার পড়িলে কিরণ,
প্রলয়-সলিলে যেন ছেয়ে যায় দিক,
ভীষণেরে দেখায় ভীষণ !
থেকে-থেকে দিগঙ্গনা চমকে তরাসে,
শূন্য ভেদি' বাজে হা-হুতাশ,
লুকায় আকাশ-কোলে তারকা-বধূরা,
কেঁদে উঠে মুমূর্ষু বাতাস !

(৭)

অশ্রুমাঝে সুখস্মৃতি উঠিছে জাগিয়া,—
স্বপ্নময় শৈশব-কাহিনী ;—
কি উল্লাসে পাখী সব বসিত শাখায়,
কি আনন্দে পোহা'ত যামিনী !
মেলিয়া সুদীর্ঘ বাহু সুদূর পথিকে
করিতাম স্নেহ-নিমন্ত্রণ ;—
নীরবে অতিথি-সেবা ছায়া-ফল-ফুলে,
তপোবনে ঋষির মতন।

(৮)

রাখাল-যুবক, হায়, কত-না আসিত ;
দলে-দলে বেড়া'ত খেলিয়া,
শ্রান্ত হ'লে ছায়াতলে শ্যামশয্যা'পরে
সারি-সারি থাকিত শুইয়া।
গ্রাম হ'তে কত সখা করি গলাগলি
সেদিধারে আসিত সমীর ;
এক সুরে তুলি' গান গোধূলি-আকাশে
চ'লে সবে যেত ধীর-ধীর।

(৯)

তুষার-শীতল প্রাণে আর কভু, হায় !
হ'বে কি সে বসন্ত-বিকাশ ?—
আর কি এ জীর্ণবুকে উঠিবে ফুটিয়া
কচি ফুল-বালিকার হাস ?
কে জানে কিসের লাগি র'য়েছি বাঁচিয়া
নিশিদিন গাঁথিয়া স্বপন ?
গেল ঊষা, গেল পাখী, গেল গীত-গান,
কেন নাহি গেল এ জীবন ?

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

কৃত্তিবাস।

বঙ্গবাসীতে কৃত্তিবাসের কাল সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, শ্রাবণের 'সাধনায়' শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। প্রতিবাদটী লাল মোহন শর্ম্মার সম্বন্ধ-নির্ণয়ের কতকাংশের চর্ব্বিত-চর্ব্বণ মাত্র। লেখকের নিজের স্বাধীন যুক্তি একটীও নাই। যাঁহারা উক্ত 'সম্বন্ধ-নির্ণয়' পুস্তক কিংবা ১২৮২ সালের ভাদ্রের বঙ্গদর্শনে "দেবীবর ঘটক ও যোগেশ্বর পণ্ডিত" শীর্ষক প্রবন্ধটী দেখেন নাই, তাঁহাদেরই নিকট অঘোর বাবুর কিছু কৃতিত্ব প্রচারিত হইবে।

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধগুলির পরে অঘোর বাবু পুনশ্চ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন,—রামায়ণ ১৪৮০ শকে রচিত (১)। ইহাই প্রমাণ করা যদি তাঁহার উচ্চ উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তবে তাঁহার সমস্ত পরিশ্রম এক কথাতেই পণ্ড হইবে; জেলা হুগলী বদনগঞ্জ-নিবাসী পণ্ডিত হারাধন দত্ত-ভক্তিনিধি মহাশয় ১৪২৩ শকের হস্ত-লিখিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ (২) হস্তে লইয়া উপবিষ্ট আছেন, ঐ পুঁথি দেখিবামাত্রই প্রতিবাদ-লেখককে মস্তক অবনত করিতে হইবে।

সমুদ্রে-পতিত ব্যক্তি যেরূপ তৃণগুচ্ছ আশ্রয় করিয়া উদ্ধার কামনা করে, ঐতিহাসিক ভ্রমে. গলদ্‌ঘর্ম্ম পণ্ডিত মহাশয়গণও সেইরূপ "সপ্তদ্বীপের সার নবদ্বীপ" ও "গ্রামের প্রধান ফুলিয়া" এই দুইটী বাক্য ধারণ করিয়া ঘোরতর প্রত্নতত্ত্ব-সমুদ্র পার হইতে বাসনা করিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত পদটী দ্বারা কবির চৈতন্য স্মরণ ও দ্বিতীয়টী দ্বারা কবির দেবীবর স্মরণ প্রমাণ করাইয়া তাঁহারা সুস্থির হইতে পারিয়াছিলেন। (৩) ১৪২৩ শকের হস্ত-লিখিত পুস্তক আছে, এই কথা প্রচারের পর সেই সব প্রাচীন যুক্তির শব ভূ-প্রোথিত করিতে হইবে।

কেবল ইহাই নহে, সেই অমূল্য পুস্তকে কৃত্তিবাসের একটী অমূল্য আত্ম বিবরণ আছে। ভক্তিনিধি মহাশয় 'সাহিত্য' পত্রিকায় তাহা পাঠাইয়াছেন, আমি তাহার সারটুকু বলিব মাত্র। "পূর্ব্বে বঙ্গভাগে (পূর্ব্ববঙ্গে) বেদানুজ নামে রাজা ছিলেন, তাঁহার পাত্র ছিলেন—নৃসিংহ ওঝা। একদা বঙ্গদেশে (পূর্ব্ববঙ্গে)

---

(১) এই শক-মীমাংসায় যিনি উপস্থিত হইয়াছেন, প্রবন্ধভাগের পরিচয়ে জানা যাইতেছে, তিনি একজন চট্টোপাধ্যায়। একজন চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে এরূপ কালনির্ণয়ে উপস্থিত হওয়া ততটা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া ধরি না, যতটা আশ্চর্য্যের বিষয় ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণের বংশ-পরিচয় না জানা। উক্ত বংশ-পরিচয় জানিলে, বঙ্গবাসীতে নির্ণীত কৃত্তিবাসের কাল সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিবার প্রয়োজন হইত না। ২ আর ২ এ ৫ বলাও যেমন সম্ভব, উক্ত বংশাবলীর পরিচয় জানিলে কৃত্তিবাসের কাল নির্ণয়ে ১৪৮০ শকে উপস্থিত হওয়াও তেমনি সম্ভব।—জ, স,

(২) কৃত্তিবাসের মূলভাগ সংশোধনের যে প্রস্তাব ও আয়োজন হইতেছে, আশা করা যায়, ভক্তিনিধি মহাশয় স্বীয় উদারতা-গুণে, যথাসময়ে, তাঁহার এই বহুমূল্য প্রাচীন পুঁথির সাহায্যদানে মুক্তহস্ত হইবেন। তাহাতে যশ ও পুণ্য উভয়ই আছে।—জ, স,

(৩) সপ্তদ্বীপের মধ্যে সার নবদ্বীপ এইজন্য যে, উহা বল্লালের পূর্ব্ব হইতেই সেন-রাজগণের অন্যতর-রাজধানী ও জাতীয় বিদ্যার আকরভূমি। প্রাচীন নবদ্বীপ গঙ্গাগর্ভগত হইলেও, বল্লালসেন কর্ত্তৃক খানিত দীঘীর একটা পাড় এখনও বর্ত্তমান এবং এখনও তাহাকে লোকে "বল্লাল দীঘী" নামে ডাকিয়া থাকে। উহারই নিকটে চৈতন্যের জন্মস্থান নবদ্বীপের মায়াপুর মহল্লা ছিল। গ্রামের প্রধান ফুলিয়া এইজন্য যে, একে গঙ্গাতীর, তাহাতে তৎকালে ফুলিয়ার তুল্য ব্রাহ্মণ-ভূমি প্রায় ছিল না। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও ফুলিয়া বহুসংখ্যক ও বড় বড় কুলীন ব্রাহ্মণের স্থান ছিল।—জ, স,

উৎপাত আরম্ভ হওয়াতে নৃসিংহ ওঝাঁ গঙ্গাতীরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন এবং বসতি স্থানের নাম দেন 'ফুলিয়া' (৪)। নৃসিংহের পুত্রের নাম গর্ভেশ্বর। গর্ভেশ্বরের তিন পুত্র ;—মুরারি, সূর্য্য ও গোবিন্দ। মুরারি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। মুরারির পুত্র বনমালী দুই বিবাহ করেন ; এক স্ত্রীর গর্ভে ৬ পুত্র ও অপরার গর্ভে এক মাত্র কন্যা উৎপন্ন হয়। এই পুত্রদিগের মধ্যে কৃত্তিবাস অন্যতম (৫)। তাঁহার মাতার নাম 'মালিনী'। মাঘমাসে শ্রীপঞ্চমীর দিন রবিবারে কৃত্তিবাস ভূমিষ্ঠ হন। এগার বৎসর গত হইয়া, যখন বার বৎসরে প্রবেশ করিলেন, তখন কৃত্তিবাস একদা শুক্রবার দিবস প্রাতঃকালে, অধ্যয়নার্থ 'বড়গঙ্গা' (পদ্মানদী) পার যাত্রা করিলেন। কয়েক বৎসর শিক্ষা করিয়া 'পণ্ডিত' উপাধি লাভ করিয়া কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে গৌড় গমন করেন। গৌড়েশ্বর তাঁহার পাণ্ডিত্য দর্শনে আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে ভাষা-রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ করেন।" এই গৌড়েশ্বর হিন্দু রাজা ; কবি যে সব সভাসদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারাও হিন্দু, যথা ;—জগদানন্দ (পাত্র) সুনন্দ (ব্রাহ্মণ), কেদার খাঁ, নারায়ণ, গন্ধর্ব্ব রায়, মুকুন্দ (রাজ-পণ্ডিত)। আমাদের বোধ হয়, এই গৌড়াধিপতি—রাজা কংসনারায়ণ (লোকে যাহাকে রাজা গণেশ বলিয়া জানে)। ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব (৬)।

(৪) ধ্রুবানন্দ মিশ্র-কৃত মহাবংশ বা কুলদীপিকা অনুসারেও নৃসিংহই প্রথম ফুলিয়াতে আসিয়া বাস করেন। বল্লাল-কৃত কুলীন উৎসাহ, তাঁহার পুত্র আয়িত্ত, আয়িত্তের পুত্র উদ্ধব, উদ্ধবের পুত্র শিব, শিবের তিন পুত্র,—১ রাম, ২ নৃসিংহ, ৩ দ্যাকর। উহার মধ্যে রাম বাস করেন ছোট ফুলিয়ায়, নৃসিংহ বাস করেন ফুলিয়ায় ও দ্যাকর বাস করেন কাচনায়। নৃসিংহ ফুলিয়া গ্রামের নামকরণ করেন নাই, ফুলিয়া তাহার বহুপূর্ব্ব হইতে ছিল।—জ, স,

(৫) এই বংশাবলী কুলগ্রন্থানুসারেও ঠিক।—জ, স,

(৬) আমাদের নিকট যে সকল হাতের লেখা প্রাচীন রামায়ণের পুঁথি আছে, তাহাতে কৃত্তিবাসের এ আত্ম-পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে যখন ভক্তিনিধি মহাশয়ের নিকট রক্ষিত ১৪২৩ শকের লেখা পুঁথিতে উহা আছে এবং ঐতিহাসিক কাল ও ব্যক্তিবর্গের পরিচয়ে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে না, তখন উহা প্রামাণিক হইলেও হইতে পারে। এক্ষণে দেখা যাউক ;—

বঙ্গবাসীতে নির্ণয় করা হইয়াছে যে, কৃত্তিবাস সম্ভবতঃ ৫৫০ হইতে ৫৮০ বৎসর পূর্ব্বের লোক। খৃষ্টীয় শকে আনয়ন করিলে, উহা ১৩১৪ – ১৩৪৪ খৃঃ অব্দ হয়, এখানে বলা উচিত যে, চৈতন্যের জন্মকাল ৪০৯ বৎসর ইহা ঠিক সময়, তাহার পূর্ব্বে কৃত্তিবাসের যে সময়, তাহা কেবল পুরুষ-পড়্তা করিয়া ধরা হইয়াছে ; সুতরাং সে সময়ে যে অনেক এদিক-ওদিক হইতে পারে, তাহা বলাই বাহুল্য। যখন একই সময়ে ৩।৪ পুরুষের বর্ত্তমানতা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় এবং অকালমৃত্যু প্রভৃতিও যখন বিরল নহে ; তখন পুরুষ পড়্তা করিয়া যে গণনা, তাহা কখনই ঠিক হইতে পারে না। ওরূপ কাল নির্ণয়, কেবল অভাব পক্ষেই গ্রহণ করা যায়। কিন্তু যদি কোন সত্য-ঘটনা সম্বন্ধীয় কালের সন্ধান পাওয়া যায়, তবে তাহাই সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য, তাহা বলাই অধিক। তবে ইহাও বলি যে, এই শেষোক্ত সত্য-ঘটনা সম্বন্ধীয় সময় যে, পুরুষ-পড়্তা করা সময় হইতে একেবারে আকাশ-পাতাল তফাৎ হইয়া যায়, তাহাও কখন যায় না। ভাল, এখন প্রবন্ধোক্ত ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত মিলাইয়া দেখা যাউক।—

প্রবন্ধভাগে আছে যে, কৃত্তিবাস কৃতবিদ্য হওয়ার পর গৌড়েশ্বর রাজা কংসনারায়ণের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে গমন করেন। এখন মুসলমানী ইতিহাস রিয়জে আসুলাতীন অনুসারে ৭৮৭ হিজিরা, খৃঃ ১৩৮৫ সালে ভাতুরিয়া নামক স্থানের জমিদার রাজা "কানিস্" দ্বিতীয় সমসুউদ্দিনকে পরাজয় পূর্ব্বক গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৭৯৪ হিজিরা, খৃঃ ১৩৯২ সালে পরলোক গমন করেন। ইহার পুত্র চৈতমল্ল পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন বটে, কিন্তু কিছুদিন পরেই জালাল-উদ্দিন নাম ও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই রাজা "কানিস্" ইংরেজ ঐতিহাসিকের হাতে পড়িয়া "গানিস" বা "গণেশ" হইয়াছে। আমাদের "কানিস"কে কংস বা "কংসনারায়ণ" বলিতে কোনই আপত্তি নাই ; বরং উহাই সঙ্গত।

এখন এই কংসের নিকট কৃত্তিবাস অনুগ্রহ লাভার্থে উপস্থিত হইয়া থাকিলে, ১৩৮৫ হইতে ১৩৯২ খৃঃ মধ্যে

নৃসিংহ ওঝাঁ বেদানুজ নামক রাজার পাত্র ছিলেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানদিগের অত্যাচারের উল্লেখ আছে। বঙ্গের ইতিহাসে দনুজ(৭) নামক সুবর্ণগ্রামের রাজার সময় (১২৭৭ খৃঃ হইতে ১২৮২ খৃঃ কি এইরূপ কোন সময়) টোগরল খাঁর অত্যাচার বর্ণিত আছে। আমাদের বিশ্বাস এই "দনুজ রাজাই" কৃত্তিবাসের উল্লিখিত "বেদানুজ রাজা" মুসলমান ঐতিহাসিকগণ দ্বারা নামের এরূপ ক্ষুদ্র বিকৃতি আশ্চর্য্যজনক নহে। সুতরাং ১২৭৭ খৃঃ নৃসিংহ ওঝাঁর পলায়ন-কাল ধরিলে তাঁহার জন্মকাল (১২৭৭—৩৩)

কোন এক সময়ে উপস্থিত হইয়া থাকিবেন। ২।৪ বৎসরের তফাৎ-বাদে যায় আসে না, অতএব সে উপস্থিত হওয়া ১৩৮৫ সালই ধরিয়া লইলাম। তাহা হইলে হইল যে ৫০১ বৎসর পূর্ব্বে। "পুরুষ-পড়্‌তা" সময় হইতে বড়ই বেশী তফাত হইয়া পড়িতেছে না কি? তবে চৈতন্যের পূর্ব্বধৃত ৫ পুরুষে প্রত্যেক পুরুষ ২০ বৎসর করিয়া ধরিলে আর অসঙ্গতি হয় না। তাহা হওয়াও কিছু বিচিত্র নহে, যেহেতু শ্রীহর্ষ বংশে সকলেই যে ধরাবাঁধা ৩৩ কি তদ্রূপ কোন সংখ্যায় পুরুষ পূরণ করিয়াছিলেন এমনও নহে।

কিন্তু এই গৌড়েশ্বর যে কংসনারায়ণ তাহার, প্রমাণ কি? উহা কি ১৪৩২ শকের প্রাচীন পুস্তকে উল্লিখিত আছে, না প্রবন্ধ-লেখকের আন্দাজ? তখনকার কালে মুসলমান নবাবেরাও হিন্দুপণ্ডিত ও হিন্দুবিদ্যার যথেষ্ট সম্মান করিতেন ও তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিতেন, এবং তাঁহাদের মন্ত্রী কর্ম্মচারী প্রভৃতিও হিন্দুই বেশীর ভাগ থাকিত। ঐরূপ রাজা "কানিস"ও মুসলমানদের এতটা সম্মান করিতেন যে, তিনি মরিলে হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ বাধে। বিবাদের বিষয়,—রাজা কানিসের হিন্দু-সংকার হইবে, না, তাঁহার কবর দেওয়া যাইবে? অতএব কৃত্তিবাস কংসের পরিবর্ত্তে কোন মুসলমান নবাবের কাছে যে যান নাই, তাহার প্রমাণ কি? সে যাহা হউক, আপাততঃ আর অধিক বলিবার স্থান নাই; বাকী মীমাংসা পাঠকেরা করিয়া লইবেন। আমাদের মোটের উপর বক্তব্য এই যে, রাজা কানিসের সাময়িক হইলেও, কৃত্তিবাস বাঙ্গালার আদি-লেখক ও আদি-কবি পদে অক্ষুণ্ণ থাকিতেছেন।—জ, স,

৭। ইনি রিয়জে আসুলাতীন অনুসারে "দানুজ," ঐতিহাসিক ইংরেজ ষ্টুয়ার্ট অনুসারে "ধিনুজ," আইন আকবরী অনুসারে "নৌজা," তারিখি-ই-বরণ অনুসারে "দনুজরায়," এবং মহাবংশ ও বারেন্দ্রকুলগ্রন্থ-লেখক হরিমিশ্র অনুসারে "দনৌজামাধব";—

"যোগিবন্দ্যোঽভবৎ তুল্যো দেবলস্য তনূদ্ভবঃ।
দনৌজামাধবেনাম্নো রাজা পূর্ব্বং পুরস্কৃতঃ॥"
মহাবংশ

"প্রাদুরভবদ্ ধর্ম্মাত্মা সেনবংশাদনন্তরম্।
দনৌজামাধবঃ সর্ব্বভূপৈঃ সেব্যপদাম্বুজঃ॥"
হরিমিশ্র

অনেক কুলগ্রন্থেও দনুজ রায় বলিয়া উক্ত। ইনি মুসলমান-সেনাপতি বখতিয়ার খিলিজীর পাঁচনবাড়ীর ঘায়ে পলায়ন-পথে বাঙ্গালী জাতির জেনারল জঙ্গী-লাট লক্ষ্মণ সেনের পৌত্র ও কেশব সেনের প্রপৌত্র;—বল্লালপুত্র লক্ষ্মণের নহে। ইনি সুবর্ণ-গ্রামে স্বাধীন-ভাবে রাজত্ব করেন ও রাজধানী ছিল পৈনাম গ্রামে। ইনি ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ, উভয়েরই কৌলীন্যে আদান-প্রদান সম্বন্ধে অনেক নিয়ম স্থাপন করেন ও সর্ব্বদা পণ্ডিত-মণ্ডলীতে পরিবেষ্টিত থাকিতেন। ইনি দিল্লীশ্বর বালীন বা বল্‌বনকে ১২৮০ খৃঃ অব্দে বঙ্গেশ্বরের বিপক্ষে অনেকটা সাহায্য করেন। এখন এই ১২৮০ খৃঃ সালে যদি ধরা যায় যে, নৃসিংহ বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা হইলে তখন হইতে রাজা কানিসের সময় পর্য্যন্ত ১০৫ বৎসর; এদিকে নৃসিংহ হইতে কৃত্তিবাস পর্য্যন্ত, নৃসিংহকে ছাড়িয়া দিলে ৪ পুরুষ। ১০৫ বৎসরে ৪ পুরুষের সমাবেশ কিছু অসম্ভব নহে; অথচ সেই সঙ্গে ইহাও ধর্ত্তব্য যে, সে সমাবেশ অনেক কম সময়ের মধ্যেও হইতে পারে এবং তাহাতে, কৃত্তিবাস কংসের পূর্ব্বতন কোন নবাব-বিশেষের অনুগ্রহপ্রার্থী ধরিলে, তাঁহার সে সময় ও নৃসিংহের এই সময়, এ উভয়ই তুলনায় কোন বিরোধ ঘটনা হয় না।

পুনশ্চ প্রবন্ধ-লেখকের অনুকূলে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, "পুরুষ-পড়্‌তা" কাল ও ঐতিহাসিক সম্বন্ধীয় কাল চেষ্টা করিলে, উভয়কে একরূপ মিলাইতে না পারা যায় এমন নহে; তখন প্রবন্ধোক্ত কৃত্তিবাসের জীবনী অংশকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা দেখা যায় না,—যদি তাহা কোন প্রামাণিক প্রাচীন পুঁথি হইতে উদ্ধৃত করা হইয়া থাকে। প্রবন্ধলেখক সেই পুঁথির উল্লেখ ও তাহা হইতে মূল অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলে, তাহাতে বিশেষ ফল হইত ও সাহিত্য-জগতেরও তাহাতে কতকটা উপকার করা হইত। আশা করি, প্রবন্ধান্তরে তিনি সে সংকার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন না।—জ, স,

১২৪৪ খৃঃ অব্দ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। নৃসিংহ হইতে কৃত্তিবাস পাঁচ পুরুষ, সুতরাং ৩৩ বৎসর করিয়া পুরুষ গণনা করিলে ১৪০৯ খৃঃ অব্দে কৃত্তিবাসকে তেত্রিশ বর্ষ বয়স্ক পাওয়া যায়। যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে যখন গৌড়েশ্বরের নিকট গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স ২০ বর্ষের বেশী হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না; সুতরাং কৃত্তিবাসের গৌড়-গমনকাল ১৩৯৬ খৃঃ পাওয়া যাইতেছে। রাজা কংসনারায়ণ ১৩৮৫—১৩৯২ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতেছিলেন, চারি বৎসরের প্রভেদ বেশী নহে, বিশেষ, পুরুষ ৩৩ বৎসর হিসাবে গণনা করা একটু অতিরিক্ত হইয়াছে। কংসনারায়ণের সময় কৃত্তিবাস বর্ত্তমান থাকিলে সে আজ কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ ৫০০ শত বৎসরের কথা।

অঘোর বাবুর একটী যুক্তি, মালাধর বসু কান্যকুব্জের দশরথ বসু হইতে অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ, কিন্তু কৃত্তিবাস শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন দ্বাবিংশ পুরুষ। দ্বাবিংশ নহে, অষ্টাদশ; যথা,—১ শ্রীহর্ষ, ২ ধান্দু, ৩ শ্রীনিবাস, ৪ জলাশয়, ৫ বাণেশ্বর, ৬ গুড়িং, ৭ কাক, ৮ মাধবাচার্য্য, ৯ কোলাহল, ১০ উৎসাহ, ১১ আয়িত, ১২ উদ্ধব, ১৩ শিব, ১৪ নৃসিংহ, ১৫ গর্ব্বেশ্বর, ১৬ মুরারিওঝা, ১৭ বনমালী, ১৮ কৃত্তিবাস (৮)। আর আমাদের বোধ হয় না—দশরথ বসু হইতে মালাধর বসু ত্রয়োদশ পুরুষ। বংশাবলিতে অবশ্যই কোন ভ্রম আছে; তাহার কারণ এই,—

'কায়স্থ-কৌস্তভ' গ্রন্থ অনুসারে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আনয়নের সময় ৮৯২ খৃঃ অব্দ, এদিকে মালাধর বসু ১৪৮০ খৃঃ অব্দে শ্রীকৃষ্ণবিজয় সমাপ্ত করেন; সুতরাং দশরথ হইতে মালাধর পর্য্যন্ত ৫৮৮ বৎসর পাওয়া যায়। (৯)

(৮) মহাবংশ অনুসারে "৭ কাক" নাই। তদনুসারে শ্রীহর্ষ হইতে কৃত্তিবাস ১৭ পুরুষ। কিন্তু বর্দ্ধমান জেলায় দাঁইহাটের নিকট ঘটকদিগের কুলগ্রন্থে, শ্রীহর্ষ হইতে কৃত্তিবাস পর্য্যন্ত বংশ-বিবরণ এরূপ দেওয়া আছে;—১ শ্রীহর্ষ। ২ শ্রীগর্ভ। ৩ শ্রীনিবাস। ৪ আরব। ৫ ত্রিবিক্রম। ৬ কাক। ৭ ধান্দু। ৮ জলাশয়। ৯ বিশেশ্বর। ১০ প্রাণেশ্বর। ১১ গুঁই। ১২ মাধব। —বাকী প্রবন্ধের সঙ্গে ঠিক আছে, তাহাতে কৃত্তিবাস পর্য্যন্ত ২২ পুরুষ।

পুনশ্চ কুলপঞ্জিকা অনুসারে—১ শ্রীহর্ষ। ২ শ্রীগর্ভ। ৩ শ্রীনিবাস। ৪ মেধাতিথি। ৫ আরব। ৬ ত্রিবিক্রম। ৭ কাক। ৮ ধাঁধুমুখ। ৯ জলাশয়। ১০ বাণেশ্বর। ১১ প্রাণেশ্বর। ১২ গুঁই। ১৩ মাধব। ১৪ উৎসাহ। ১৫ আয়িত। ১৬ উদ্ধব। ১৭ শিব। ১৮ নৃসিংহ। ১৯ গর্ব্বেশ্বর। ২০ মুরারি ওঝা। ২১ বনমালী। ২২ কৃত্তিবাস। এইটীই বেশী প্রামাণিক। এ মতে, কোলাহল উৎসাহের ভ্রাতা।—জ, স,

(৯) বাঙ্গালার স্বাধীনরাজ হোসেন সাহা, যাঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন—সনাতন গোস্বামী ও প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন—তদীয় কনিষ্ঠ রূপ, উভয়েই চৈতন্যের পরমভক্ত; এবং চৈতন্যও ঐ হোসেন সাহের সময়ে প্রথম বৃন্দাবন-যাত্রায় কামকেলী গ্রামে রূপ ও সনাতনের ভক্তি উপহার লইয়া নীলাচলে ফিরিয়া আইসেন। সেই হোসেন সাহের রাজস্ব-মন্ত্রী ছিলেন গোপীনাথ বসু এবং উপাধি ছিল তাঁহার পুরন্দর খাঁ। কৃষ্ণবিজয় প্রণেতা মালাধর বসু—উপাধি গুণরাজ খাঁ উক্ত গোপীনাথ বসুর সমসাময়িক। মালাধর বসু, কৃষ্ণ বসু হইতে ১১শ পুরুষ; যথা;—১ কৃষ্ণ। ২ ভব। ৩ হংস। ৪ মুক্তি। ৫ দামোদর। ৬ অনন্ত। ৭ গুণাকর। ৮ শ্রীপতি। ৯ যজ্ঞেশ্বর। ১০ ভগীরথ। ১১ মালাধর—গুণরাজখাঁ। উক্ত গোড়ার কৃষ্ণ বসুই বল্লালী-কৌলীন্য প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণ বসুর পূর্ব্বের বংশাবলী আপাততঃ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। কিন্তু তাহা হইলেও আর একটা দেখা যাইতেছে যে, ঐ সময়ে সাণ্ডিল্য-গোত্রীয় বন্দ্যোপাধ্যায়েরা ১০ম ও ১১শ পুরুষে এবং ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মুখোপাধ্যায়রা ১৪শ ও ১৫শ পুরুষে কৌলীন্য প্রাপ্ত হন। এ হিসাবে তদুভয়ের মাঝামাঝি ১২ পুরুষ কৃষ্ণ বসুর পূর্ব্বে গত হইয়াছে ধরিলে আদি দশরথ বসু হইতে মালাধর পর্য্যন্ত অন্ততঃ ২৩ পুরুষ গত বলিয়া ধরিতে হয়।

এই পর্য্যন্ত লেখা হইলে জানা গেল, আদি বসু হইতে ১৪শ পুরুষে কৃষ্ণ বসু কৌলীন্য প্রাপ্ত হন। সুতরাং আদি বসু হইতে মালাধর ২৪ পুরুষ।

কোন বংশ দীর্ঘজীবী, কোন বংশ ক্ষীণজীবী হয়; তজ্জন্য বিভিন্ন বংশ তুলনায় ২।৪ পুরুষের তফাৎ-বাদ ধর্ত্তব্য নহে।—জ, স,

৩৩ বৎসর করিয়া পুরুষ গণনা করিলেও তের পুরুষে মাত্র ৪২৯ বৎসর পাওয়া যায়, ১৫০ বৎসরের বেশী প্রভেদ থাকে। আদিশূরের ব্রাহ্মণ আনয়নের সময় সম্পর্কে অনেক বিরুদ্ধ মত আছে, কিন্তু আবুল ফজেল বল্লালসেনের সিংহাসন-প্রাপ্তির সময় দিয়াছেন ১০৬৬ খৃঃ অব্দ। রাজা রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি সকলেই এই মত পরিগ্রহ করিয়াছেন। এখন বল্লালসেন, শ্রীহর্ষবংশোদ্ভূত 'উৎসাহ'কে কুলীন উপাধি প্রদান করেন, এই 'উৎসাহ' শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন দশম পুরুষ। দশরথ বসুর অধস্তন দশম পুরুষ এই সময়ে ধরিলে ১০৬৬ খৃঃ অব্দের পরে মালাধর বসু পর্য্যন্ত মোটে তিনটী পুরুষ পাওয়া যায়। এই তিন পুরুষে এক শত বৎসর ধরিলেও মালাধর বসুর ১১৬৬ খৃষ্টাব্দে জীবিত থাকার কথা, কিন্তু তাহা না হইয়া, মালাধর ১৪৮০ খৃঃ অব্দে পুস্তক লিখিতেছেন,—কতদূর অন্যায়। আর বল্লালসেন হইতে কংসনারায়ণ পর্য্যন্ত ৩০০ বৎসরের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ এবং 'উৎসাহ' হইতে কৃত্তিবাস ৯ পুরুষ। পূর্ব্বোক্ত-রূপে তিন পুরুষে এক শত বর্ষ গণনা করিলে ৩০০ বৎসর পাওয়া যায়, সুতরাং কৃত্তিবাস যে ৫০০ বৎসরের কিছু ঊর্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা বলা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। এস্থলে মোটা-মুটি একটা সময় দেওয়া গেল, সূক্ষ্মভাবে এই সব বিষয় ধরিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ, একবার ইতিহাস একবার কুলপঞ্জী ইত্যাদির উল্লিখিত সময় সামঞ্জস্য করা অতি কঠোর কার্য্য; কোন একদিকে একটু ভুল থাকিলেই সমস্ত গণিত শাস্ত্রের চেষ্টা বৃথা হইয়া পড়ে। ইতিহাসই বলুন আর কুলপঞ্জীই বলুন, কোনটীই নির্ভুল নহে।

দেবীবরের অনেক পূর্ব্বে যে কৃত্তিবাস জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অঘোর বাবুর নিজেরই প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন,—"মুরারি যোগেশ্বরের-সমান পর্য্যায়ের হইলেও সমান-বয়সের ছিলেন না,—তাঁহার বৃদ্ধ প্রপৌত্র গঙ্গানন্দ প্রভৃতি মেল-বন্ধনের সময় উপস্থিত ছিলেন।" কৃত্তিবাস এই গঙ্গানন্দের পিতামহের সমবয়স্ক ছিলেন। যেখানে প্রশ্ন কঠিন ও লালমোহন শর্ম্মা, কিম্বা রামগতি শর্ম্মার পুস্তকে যাহা প্রকটিত হয় নাই, সেই সব স্থলে অঘোর বাবু প্রশ্নটী দেখিয়াও চুপ করিয়া গিয়াছেন! বঙ্গবাসী হইতে তিনি এই অংশটী উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"চৈতন্যদেবের সমবয়স্ক ও সমপাঠী ছিলেন—স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য। এই রঘুনন্দনের পিতামহের জ্যেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ মিশ্র দেবীবর কর্ত্তৃক মেল বন্ধনকালীন উপস্থিত থাকিয়া মহাবংশ নামে কুলীনদিগের বংশাবলী রচনা করেন।" কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন কথাই অঘোর বাবু বলেন নাই; বোধ হয়, বলিবার কিছু নাই।

এক সময়ে নবদ্বীপ হিন্দু-রাজাদিগের রাজ-ধানী ছিল, সুতরাং কৃত্তিবাস যদি নবদ্বীপকে "সপ্তদ্বীপের সার দ্বীপ" বলিয়া থাকেন, তবে তাহাতে অন্য কথা ভাবিবার কারণ কি? আর ফুলিয়া তাঁহার বৃদ্ধপ্রপিতামহ-অধিষ্ঠিত স্থান, তিনি যে গর্ব্বের সহিত ইহাকে "স্থানের প্রধান ফুলিয়া" বলিবেন, তাহাতে বাধা কি? এই-জন্য মন-গড়া কথার উৎপত্তি (১০) করা ঐতি-হাসিকের উচিত কার্য্য নহে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

(১০) ইংরেজীতে একটা কথা আছে,—"Man will run to and fro and knowledge will gather" ঠিক কথা। সুতরাং কৃত্তিবাস সম্বন্ধে অনুকূল-প্রতিকূল যত প্রবন্ধ বাহির হয়, ততই আহ্লাদের কথা। যেহেতু তাহা হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কৃত্তিবাস সম্বন্ধে যাহা আসল সত্য, তাহা নিরূপিত হইতে পারিবে। সেই অভিপ্রায়েও এই প্রবন্ধ জন্মভূমিতে প্রকাশিত করা হইল।—জ, স,

কর্ম্ম ও অদৃষ্ট।

(কারণবাদ)

মনুষ্য-জীবনে একটী কার্য্যের সহিত আর একটী কার্য্যের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, যতই কেন তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করা যাউক না, কিছুতেই সে সম্বন্ধ বিনষ্ট হইবার নহে। একটী ঘটনা আর একটী ঘটনার সহিত এরূপ ভাবে মিলিত হইয়া বহমান জগতের কার্য্য-সমূহ নিষ্পন্ন করিতেছে যে, মনুষ্যগণ যতই তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া প্রত্যেকের কার্য্যকুশলতা অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করেন, ততই তাঁহাদিগকে সেই অবিচ্ছেদ্য ঘটনাবলির জটিলতা সম্বন্ধে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইচ্ছা ব্যতিরেকে কার্য্য হয় না, কারণ ব্যতিরেকে ইচ্ছাও হয় না এবং সে কারণাবলিও বাহ্য অবস্থা ও ঘটনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে,—যতই এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্বানুসন্ধান করিতে চেষ্টা পাওয়া যায়, ততই যেন অন্ধকার আসিয়া আমাদিগের জ্ঞানপথ ও কারণ-দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ও প্রতিহত করিবার চেষ্টা করে এবং এক এক সময় এরূপ ঘটনাস্রোত আসিয়া পড়ে যে, অতি অমানুষিকী চেষ্টাও তাহাকে ফিরাইতে সক্ষম হয় না। তখন বিজ্ঞানই বল, আর ভূত-ভবিষ্যৎ-কারণগ্রাহিণী সুতীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টিই বল, কেহই সে অবোধ্য ভবিতব্যতা-স্রোত নিবারণে সমর্থ নহে। এই অগম্য অবিনশ্বর সম্বন্ধই এই ক্ষুদ্র মর-জগতের শৃঙ্খল এবং ইহাই লইয়া এত বিরোধ।

আমরা বিজ্ঞানের বিরোধী হইতে চাহি না; কিন্তু অবশ্যই স্বীকার করিব যে, এই সর্ব্বব্যাপী সম্বন্ধ মনুষ্যবুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য এবং ইহা এত জটিল যে, ইহার বিশ্লেষণ বর্ত্তমান বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অনায়ত্ত। কাষ্ঠে অগ্নি প্রদান করিলে কাষ্ঠ দগ্ধ হইবে;—আমরা বলিব, কাষ্ঠের দাহ্য-শক্তি আছে বলিয়া। বর্ত্তমান বিজ্ঞান বলিবেন, কাষ্ঠে অঙ্গারের ভাগ অধিক বলিয়া এবং অঙ্গার জবক্ষারজনক অর্থাৎ অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হয় বলিয়া। জলে শর্করা প্রদান করিলে শর্করা মিশ্রিত হইয়া যায়;—আমরা বলিব, শর্করার দ্রব হইবার গুণ আছে বলিয়া; বিজ্ঞান বলিবেন, জলের সহিত শর্করার সংহতি বা (affinity) আছে বলিয়া। বিজ্ঞান কেবল এইরূপ কারণ নির্দ্দেশই করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বিজ্ঞানের শক্তি স্বল্পদূর-ব্যাপিনী; একটী কারণ হইতে আর একটী কারণ পর্য্যন্ত যাইতে-না-যাইতেই নিঃশেষ হইয়া যায় এবং কার্য্য-পরম্পরার সহিত কার্য্য-পরম্পরার সম্বন্ধ-বিশ্লেষণ করা দূরে থাকুক, ক্রমেই জটিলতা ও অন্ধকার আসিয়া উপস্থিত হয়। জড়-জগতের একটী দৃষ্টান্ত দেখা যাউক। চূর্ণ ও হরিদ্রা এই দুইটী দ্রব্য লও, দেখিবে,—এই উভয়ের কেহই রক্তবর্ণ নহে। ইহাদিগের উভয়কে মিশ্রিত কর, দেখিতে পাইবে,—রক্তবর্ণের উৎপত্তি হইবে! এই রক্তবর্ণের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? বিজ্ঞান বলিবেন, রাসায়নিক শক্তির গুণে; কিন্তু মাত্র এ ব্যাখ্যায় আমরা সন্তুষ্ট নহি। বিজ্ঞান বলিবেন, চূর্ণ ও হরিদ্রা এই দুই দ্রব্যের মধ্যে পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা বা সংহতি আছে, সুতরাং উভয়ের মিশ্রণে রাসায়নিক ক্রিয়ার গুণে এক নূতন দ্রব্যের সৃষ্টি হইতেছে। বিজ্ঞান এইরূপ যুক্তিময় ব্যাখ্যায় বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন; একটী কারণ আর একটী কারণের উপর চাপাইয়া সন্তুষ্ট হইবেন; কিন্তু আদিকারণ নির্ণয়ে অগ্রসর হইবেন না। এইরূপ কারণ-নির্দ্দেশের উপর এমন কি, এই বাহ্য জগতেরও সমস্ত গুহ্য-রহস্য আরোপ করিয়া বুঝাইতে পারিবেন না। সে চেষ্টায় কেবল বুদ্ধির বাল-সুলভতা ও

গভীরত্ব-শূন্যতা প্রকাশ পায় মাত্র। কারণ, যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি, চূর্ণ ও হরিদ্রার এরূপ ধর্ম্ম হইল কেন? বিজ্ঞান অমনি পশ্চাৎপদ হইবেন। সুতরাং "চূর্ণ ও হরিদ্রার ধর্ম্ম" বলিলে এবং 'রাসায়নিক শক্তির প্রভাবে' বলিলে জগতের এই অগম্য শক্তি যেরূপ বিশদ হইবে, আর "চূর্ণ ও হরিদ্রা মিশ্রিত হইলে রক্তবর্ণ ধারণ করে" বলিলেও সেইরূপ বিশদ হইবে। প্রকৃত কারণ-নির্দ্দেশ কিছুই হইবে না। বিজ্ঞান এই জড়-জগতের প্রত্যেক ঘটনায় ও প্রত্যেক বিষয়ে এইরূপই যুক্তি প্রদান করেন।

এই ত গেল স্থূল বা জড়-জগতের কথা। অধিকন্তু এই জগতেই বিজ্ঞানের আধিপত্য সম্যক্। চেতন-জগতের প্রত্যেক বিষয়েই বিজ্ঞান সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এইরূপ দুই একটী অযৌক্তিক কারণ প্রদর্শন ব্যতীত বিজ্ঞানের আর কোন ক্ষমতাই নাই। ক্রমে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

বিজ্ঞানাবলম্বীকে প্রত্যেক কার্য্যেরই এক একটী কারণ এবং সেই সেই কারণকে আবার কার্য্যস্বরূপ ধরিয়া তাহার আবার কারণ—এইরূপ কারণের কারণ, আবার তাহার কারণ দেখাইতে হইবে। আমি একটি কার্য্য করিলাম; কারণদর্শী বলিবেন,—"ইচ্ছাই তোমার সেই কার্য্যের কারণ।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ইচ্ছা আবার কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? ইচ্ছা কি বিনাকারণে উৎপন্ন হইতে পারে?" তিনি বলিলেন,—"তোমার ইচ্ছা (will) আসিল বাসনা" (desire) হইতে। "বাসনা আবার কোথা হইতে উৎপন্ন হইল?" —এই প্রশ্নে তিনি বলিলেন,—"তোমার বাসনা আবার কোন অন্তর্নিগূঢ় মানসিক ভাব (Internal volition) * হইতে।" কারণদর্শী এইরূপ কারণ-পরম্পরা দ্বারা কার্য্যের জটিলতা বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা পান। কিন্তু তাঁহাকে যদি আবার জিজ্ঞাসা করা যায়,—"এই অন্তর্নিগূঢ় ভাব কোথা হইতে আসিল?" তিনি হয় ত বলিবেন যে, "এই অন্তর্নিগূঢ় ভাব তোমার সন্নিহিত পদার্থনিচয় ও ঘটনাবলীর সহযোগে তোমার প্রকৃতি বা চরিত্র হইতে।" যদি আবার জিজ্ঞাসা করা যায়,—"এ প্রকৃতি বা চরিত্রের কারণ কি?" তিনি উত্তর করিবেন,—'কতক বৈজিক তত্ত্বানুসারে পিতৃপুরুষ হইতে, কতক গঠন-প্রণালী অনুসারে অবস্থা ও শিক্ষা হইতে এই প্রকৃতি বা চরিত্র উৎপন্ন হয়। কারণ-দর্শী বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এইরূপ কারণ দর্শাইয়া ক্ষান্ত হইবেন। কিন্তু এই কারণ নির্দ্দেশ প্রমাদপূর্ণ, ও তাহা সাধারণ নহে। এইরূপ যুক্তি প্রপঞ্চে আমরা সম্পূর্ণ প্রীত হইতে পারি না; কারণ, ইহা সকল স্থলে যুক্তিসিদ্ধ ও ফলপ্রদ হয় না। কারণ, যদি ইচ্ছাই আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন না হইল,—যদি চতুর্দ্দিকস্থ পদার্থনিচয় ও ঘটনাবলীর উপর এবং বৈজিকতত্ত্বানুসারে পিতৃপুরুষের চরিত্র ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করিল,—তাহা হইলে ইচ্ছা আর কোন কালে স্বাধীন হইতে পারিল না এবং আমাদের জীবনের কার্য্য সমুদয়ও আমাদের আয়ত্তাধীন রহিল না, আর তাহা হইলে স্বাধীন ইচ্ছা (Free will) এই কথাটী বিজ্ঞান হইতে একেবারে তুলিয়া দিতে হইল। কিন্তু কারণ-দর্শিগণ তাহা পারেন না,—ইচ্ছার স্বাধীনতা অস্বীকার করিতে পারেন না। এরূপ অনেক স্থল আছে, যে স্থলে কারণ-দর্শীদিগকে ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার না করিলে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়।

* ইংরেজ বিজ্ঞানবিদ্‌গণ volition, desire ও will এই তিনটি বিভিন্নপ্রকার ইচ্ছা লইয়া অনেক তর্ক-বিতর্ক করেন; কিন্তু তাহার ফল যে বিশেষ কি, তাহা বিশদরূপে বুঝিতে পারা যায় না।

এক্ষণে দেখা গেল যে, এইরূপ কূটতর্ক বা কারণ-নির্দ্দেশ অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে না। কারণবাদী যতই চেষ্টা করুন, তাঁহাকে পরাজিত হইতেই হইবে। আর দুই একটী কথা বলিয়া তাহা আরও বিশদরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যাবলী নির্দ্দেশ করিতে গিয়া কারণবাদীকে অনেক 'স্বতঃসিদ্ধ' ধরিয়া লইতে হয় এবং কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ বুঝাইতে গিয়া তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হয় যে, "কার্য্য ও কারণ সমগুণাবলম্বী" অর্থাৎ কার্য্যের গুণাবলী কারণের গুণাবলীর অনুযায়ী। এই স্বতঃসিদ্ধটী প্রত্যেক কারণ-বাদীই স্বীকার করেন এবং নিউটন্-সাহেব আবিষ্কৃত স্বতঃসিদ্ধগুলির মত প্রয়োজনীয় ও সাধারণ বলিয়া বিবেচনা করেন। প্রকৃত পক্ষে যদি এই জগতের প্রত্যেক ঘটনা এই নিয়মের বাধ্য হইত, তাহা হইলে বোধ হয় কারণ-বাদিগণ অনেকটা কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন এবং প্রায় সকল ঘটনাই এই কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধে বুঝাইয়া দিয়া আপনাদিগের মত অখণ্ড-নীয় ও সুগম করিয়া স্থাপন করিতে পারিতেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, স্বতঃসিদ্ধটী এ বিশ্বরাজ্যের অসংখ্য ঘটনাবলী নিষ্পন্ন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যে স্থলে এই স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধ হইতে পারে না। অনেক স্থলে কার্য্যের গুণ, কারণের গুণ হইতে বিভিন্ন হইয়া পড়ে। জড়-জগতের পূর্ব্ব দৃষ্টান্তটীই দেখ না কেন। যখন দেখিতেছি, চূণ ও হরিদ্রা মিশ্রিত হইয়া নূতন পদার্থ হইয়া পড়িতেছে, তখন দেখিতেছি, উৎপন্ন-পদার্থ উৎপাদক পদার্থদ্বয় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী। এ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী পদার্থের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? চূর্ণ ও হরিদ্রা কেহই রক্তবর্ণ নহে, কিন্তু উৎপন্ন পদার্থ রক্তবর্ণ এবং এমন কি, উৎপন্ন-পদার্থের সত্তাও কারণের সত্তা হইতে বিভিন্ন হইতেছে। কিন্তু যদি পূর্ব্ব স্বতঃসিদ্ধটী—"কার্য্যের গুণাবলী কারণের গুণাবলী অনুযায়ী"—সর্ব্বত্র সত্য হয়, তাহা হইলে উৎপন্ন পদার্থ উৎপাদক পদার্থ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইতে পারে না; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কারণবাদীর কোন যুক্তিই অখণ্ডনীয় ও সর্ব্বত্রব্যাপী হইতেছে না। ইহাই যে কেবল একটী দৃষ্টান্ত, তাহা নহে। এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। জড়-জগতের প্রত্যেক দৃষ্টান্ত দ্বারাই এই স্বতঃ-সিদ্ধ নিরাকৃত হইতে পারে।

এ ত গেল জড়-জগতের কথা। চেতন-জগতেও কারণদর্শীকে প্রতি-প্রশ্নে নীরব হইতে হয়। চেতন-জগতে তাঁহাদের কেবল যুক্তি ও অনুমান লইয়াই তর্ক-বিতর্ক এবং তাঁহারা যে সকল নিয়ম বা উপায় উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা পান, তাহা কেবল ঘোর অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপণ ব্যতীত আর কিছুই হয় না। আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যেই বিজ্ঞানবিদ্ কারণবাদীকে আর একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—সমস্ত কারণবাদী এককণ্ঠে স্বীকার করেন যে, "কার্য্যের গুণ কারণের গুণাবলম্বী"—"কার্য্যের সত্তা কারণের সত্তা হইতে বিভিন্ন হইতে পারে না।" এক্ষণে বর্ত্তমান-বিজ্ঞান প্রমাণ করিতেছেন যে, চেতন-পদার্থ বা Organic substance জড়-পদার্থ বা inorganic substance হইতে উৎপন্ন হইতেছে এবং আরও স্বীকার করেন যে, কালে বিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে মনুষ্য কর্ত্তৃক চেতন-পদার্থ অচেতন-পদার্থ হইতে ইচ্ছামত সৃষ্ট হইতে পারিবে। যদি কারণবাদিগণের মতে কার্য্য, কারণের গুণাবলম্বী হয়, তবে চেতনসত্তা, জড়-সত্তা হইতে কি প্রকারে উৎপন্ন হইল? চেতন-পদার্থের সত্তা, জড়পদার্থের সত্তা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; তাহাদের মধ্যে মূলগত প্রভেদ

আছে এবং উভয়ের মধ্যে এক অলঙ্ঘ্য প্রাচীর বিরাজমান রহিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ হাক্সলে (Huxley) সাহেব ইহা বুঝিতে না পারিয়া কি বলিয়াছেন দেখুন;—

The properties of living matter distinguish it absolutely from all other kinds of things ; and the present state of science furnishes us with no link between the living and the un-living * * * of the causes which have led to the origination of living matter it may be said that we know absolutely nothing.

ইং "সজীব পদার্থের গুণাবলীও তাহার অপর সমুদয় পদার্থ হইতে বিভিন্ন হইবার কারণ এবং আমাদের জ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থা, জড় ও চেতন-পদার্থ মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম ; কিরূপে যে চেতনপদার্থ ইহজগতে উৎপন্ন হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারি যে, "আমরা কিছুই জানি না।"

এক্ষণে কারণবাদীকে অবশ্যই নীরব হইতে হইবে এবং তিনি অবশ্য বুঝিবেন যে, তাঁহারা কেবল কার্য্যকারণ সম্বন্ধে এই জগন্মণ্ডলের ঘটনাবলী বুঝাইতে যে চেষ্টা করেন, তাহা তাঁহাদিগের ভ্রমমাত্র। ইহা আরও শত শত দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতে পারে ; কিন্তু তাহা অনাবশ্যক। তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, যে শক্তি তাঁহারা হস্তস্থিত বলিয়া মনে করেন, তাহা অতি দুরারোহ পর্ব্বতশৃঙ্গে স্থাপিত এবং তাহার বিশ্লেষণ দ্বারা কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় করা মনুষ্যবুদ্ধির সম্পূর্ণ অসাধ্য। ইহাই বুঝিতে না পারিয়া হার্বার্ট স্পেন্সার সাহেব একস্থলে লিখিয়াছেন যে, "There is an Infinite and Eternal energy from which every thing proceeds" অর্থাৎ "এই চরাচর বিশ্ব এক অনন্ত ও অবিনাশিনী শক্তি হইতে নিঃসৃত হইয়াছে" ; এবং ইহাই বুঝিতে না পারিয়া কারণবাদীর একজন প্রধান-নেতা বলিয়াছেন, **"I think it must be allowed that in the present state of our knowledge, the adaptations in nature afford a large balance of probability in favour of creation by intelligence"**—অর্থাৎ "ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য বলিয়া বোধ হয় যে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের জ্ঞান যতদূর বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃতির সৃষ্টিকৌশল দেখিয়া একপ্রকার প্রতিপন্ন হয় যে, জ্ঞান দ্বারাই এই সৃষ্টি হইয়াছে।"

জন্ মিল্ এই কথা বলিয়াছেন। অন্যপরে কা কথা!

শ্রীনৃত্যগোপাল ভট্টাচার্য্য।

লীলা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

লীলা চক্ষের জল মুছিয়াছে, এখন তাহার বালিকা-স্বভাব ঘুচিয়াছে। লীলার হাসি এখন আর তেমন তরঙ্গায়িত নহে, চঞ্চল দৃষ্টি আর তেমন নির্ভয় নহে। লীলা যেন প্রতি পদক্ষেপে ত্রস্ত, যেন প্রতি কার্য্যে সন্দিহান। লীলার স্বভাবে কি-যেন একটা যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। সে সরল, নির্ভয়, বিশ্বস্ত, আমি-পৃথিবীর-নই-ভাবটুকু আর যেন লীলায় দেখিতে পাই না। সে যেন প্রতি কার্য্যে আশ্রয় চায়, প্রতি কথায় যেন কাহারও মুখ চাহিয়া থাকে। এখন তাহার হৃদয়ের আকুল রোদন, প্রাণের গভীর বেদনা কেবল একজনের পায়ে পৌঁছিতে পারিলেই হয়। সে একজন—জগতে

স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি, মুক্তি, আশা, ভরসা—বিপদে সম্পদ্, সম্পদে সুখ, সুখে আশা, আশায় সুফল, জীবনের একমাত্র সহায়—স্বামী অমূল্যকুমার। লীলা ইহার অধিক আর কিছু চায় না, ইহার অধিক আর কিছু বোঝে না।

পাড়ার লোকেরা কিন্তু বুঝিত অন্যরূপ। লীলার শ্বশুর-বাড়ী যাওয়ার সময় হইতেছে দেখিয়া ইদানী তাহারা লীলাকে নানারূপ বুঝাইতে, পড়াইতে, শিখাইতে, উপদেশ দিতে আসিত। কেমন করিয়া স্বামীকে ভেড়া বানাইতে হয়, কেমন করিয়া পাঁচখানা গহনা করিতে হয়, কেমন করিয়া একান্নবর্ত্তী সোণার সংসারে আগুন দিতে হয়,—এই সব বিষয়ক মূলমন্ত্র শিখাইতে তাহাদের বড়ই যত্ন ছিল। ঠাকুরমা তাহাদের পক্ষ-সমর্থন করিতেন, নীরদাও বাদ যাইত না। বিশেষ যে রাত্রে অমূল্যকুমার নীরদার সঙ্গে হেমন্তকুমারের বাড়ী আসে, সে রাত্রের ঘটনাটী নীরদার বড়ই গায়ে লাগিয়াছিল। স্বামী অপরাধ করিবে, আর স্ত্রী তাহার পায়ে ধরিবে,—এটা কোন্ শাস্ত্রে লেখে, নীরদা তাহা বুঝিতে পারিত না। এতদিন হৈমবতীর কাছে থাকিয়াও নীরদার মত-পরিবর্ত্তন হয় নাই। তবে হৈমবতীর মুখ ঝাপ্‌টায় সে বড় ভয় করিত; তাই মুখ-ফুটিয়া কোন বিষয় তাহাকে বড় মানা করিতে সাহস করিত না। আজ কিন্তু মুকুয্যের কি-একটা কথা লইয়া নীরদা আবার লীলাদের বাড়ী আসিয়াছে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দু-একটা উপদেশের কথা, দু-একটা জ্ঞানের কথা লীলাকে শিখাইয়া যাইবে সঙ্কল্প করিয়াছে।

তাই এ-কথা সে-কথা—পাঁচ কথার পর নীরদা লীলাকে বলিল,—"বলি, সে রাত্রের কথা মনে কর দেখি!"

লীলা জিজ্ঞাসা করিল,—"কোন্ রাত্রের কথা বলিতেছ?"

নীরদা বলিল,—"কেন, যে রাত্রে অমূল্যকুমার আমার সঙ্গে এখানে আসিয়াছিল।"

লীলার মুখ শুকাইল। আবার সে রাত্রে বুঝি লীলা কোন অপরাধ করিয়াছে; আবার বুঝি অমূল্যকুমার তাহাকে পায়ে ঠেলিলেন। লীলা কিছুই বুঝিতে পারিল না। অনিমেষ-নয়নে নীরদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তখন নীরদা বুঝাইয়া বলিল,—"বলি, এখনও বুঝিতে পার নাই? সে রাত্রে অমন করিয়া অপরাধী-অমূল্যকুমারের পায়ে পড়িতে গিয়াছিলে কেন?" নীরদার বড়ই ইচ্ছা ছিল যে, লীলা অমূল্যকুমারকে বেশ দু-কথা শুনাইয়া দেয়; আর নীরদাও সেই সঙ্গে সঙ্গে দু-চা'র কথা বলে। কিন্তু তাহা না হইয়া উণ্টা-শ্রী হইল। কোথায় অমূল্যকুমার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিবে, না—কোথায় লীলার মস্তক তাহার পায়ে লুটাইল!

লীলা মুখ তুলিয়া বলিল,—"কাহার অপরাধের কথা বলিতেছ, নীরদা? অপরাধের ছায়াও যে তাঁহাতে স্পর্শ করিতে পারে না! যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা কেবল আমার দোষে,—আমি সব কথা গুছাইয়া বলিতে পারি নাই বলিয়া। আমার বড় সৌভাগ্য যে, তিনি দয়া করিয়া আবার দাসীকে পায়ে স্থান দিয়াছেন!"

নীরদা দেখিল, লীলাও হৈমবতীর ছাঁচে ঢালা;—তেমন খেলয়াড় স্ত্রীলোক নহে। তবে এখনও ছেলে মানুষ, সময় থাকিতে থাকিতে বুঝাইলে এখনও হয় ত বুঝিতে পারিবে; তাই নীরদা বলিল,—"বলি আমরা ত মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, অত-শত বুঝি না;—তবে বুঝি যে, এই সংসার একটা হিসাবের মারপেচ বৈ আর

কিছু নয়! নিজের গণ্ডা বুঝিয়া লইতে না পারিলে চলিবে না। আর অমন করিয়া কথায় কথায় পায়ে পড়িলে ঠকিতে হইবে! অভিমান চাই, আব্দার চাই, চোখের জল চাই, মুখ ফিরান চাই!—যে স্ত্রী স্বামীকে কথায় কথায় উঠ-ব'স করাইতে না পারিল, নাকে দড়ি দিয়া, চোখে ঠুলি দিয়া ঘুরাইতে না পারিল, তাহার আর 'জারি' কোথায় রহিল? তাহার গায়ে পাঁচখানা গহনাই বা হইবে কিরূপে? সমাজে প্রতিষ্ঠাই বা হইবে কিরূপে? আর সে, সংসারের খেলায় জিতিবেই বা কিরূপে? তাই বলি, যদি নিজের ভাল চাও, ত বুঝিয়া চলিতে হইবে,—অমন করিয়া পায়ে পড়িলে চলিবে না!"

নীরদার মুখের দিকে চাহিয়া, সেই ডাগর-ডাগর পটোল-চেরা চোখ দুটি একটু বিস্ফারিত করিয়া লীলা বলিল,—"না নীরদা! আমি গহনা চাহি না, খেলার হার-জিত বুঝি না; তাঁহার পায়ে স্থান পাইলেই এ অভাগিনীর আশা মিটে! তাঁহার কার্য্য তিনি বুঝিবেন, আমি তাঁহাকে দেখিবার বা দেখাইবার কে? তাঁহাকে সুখী দেখিতে পাইলে আর আমি কিছু চাই না, তাঁহার মুখের হাসি ছাড়া আর আমি কিছু খুঁজি না। স্ত্রীলোকের ইহার বাড়া পৃথিবীতে আর কি সুখ আছে, নীরদা?—ইহার অধিক আমি আর কিছু জানি না,—আর কিছু চাই না। না-ই পাইলাম দুখানা গহনা—না-ই জিতিলাম সংসারের খেলায়! কি বলিব নীরদা!—কত কাঁদিয়াছিলাম, যেদিন বুঝিতে পারিলাম যে, তিনি আমায় পায়ে ঠেলিয়াছেন! আর আজ কি বুঝাইব, কত সৌভাগ্যবতী আমি,—তিনি দাসীকে শুধু পায়ে স্থান দেন নাই, আদর করিয়া হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন!"

হরি হরি! কোথাকার জল কোথায় গিয়া দাঁড়াইল! নীরদা বলিল,—"হইয়াছে! থাম ঠাকুরুণ! আমি তোমার কাছে মহাভারত শুনিতে আসি নাই! এমন জানিলে আসিবার সময় না-হয় দুটো ফুল হাতে করিয়া আসিতাম!"

লীলা বলিল,—"না নীরদা! এ মহাভারত নয়। আমি মিথ্যা বলি নাই। যেদিন নিরপরাধ হইয়াও, আমার সংসারে দাঁড়াইবার স্থান ছিল না, সেই দিন তাঁর চরণ ধ্যান করিয়াই বাঁচিয়াছিলাম। আর তাঁর চরণে আমার ভক্তি ছিল বলিয়াই বুঝি আমার এ বিপদ কাটিয়াছে! নীরদা! তোমারও একদিন স্বামী ছিল; বল দেখি, আমাপেক্ষা শতগুণ অধিক তাঁহাকে ভক্তি করিতে কিনা?"

নীরদা কথার-কাটাকাটি যাহাই করুক না কেন, সেও যে স্বামীকে ভক্তি করিত, এ কথা ঠিক। আজ অনেক দিনের পর সেই পুরাণো কথা জাগাইয়া লীলা নীরদাকে 'আপনার গায়ে হাত দিয়া' বলিতে বলিয়াছে, তাই নীরদার চক্ষে জল দেখা দিল। নীরদা বুঝিল, লীলা মিথ্যা কথা বলে নাই। নীরদার চক্ষে জল দেখিয়া লীলা বুঝিল যে, সে জিতিয়াছে। এ সংসারে যে রমণী, রমণীর মুখে স্বামী-ভক্তির কথা শুনিয়া স্বামী কি বস্তু, তাহা না বুঝিল, তার স্ত্রীজন্মই বৃথা!

লীলা জিতিল বটে, কিন্তু বুঝিতে পারিল, নীরদাকে অতীতের স্মৃতি মনে করিয়া দিয়া ভাল করে নাই। তাই তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়িয়া নীরদার আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

চক্ষের জল মুছিয়া নীরদা বলিল,—"জা'তে উঠিবার আয়োজন যত শীঘ্র হয়, তত ভাল। কিন্তু যেদিন হইতে হৈমবতী, মুকুর্য্যের কাছে, সকলের সমক্ষে সব কথা বলিবেন স্বীকার করিয়াছেন, সেইদিন হইতেই তিনি কেমন

হইয়া যাইতেছেন। তাঁহার স্বামী অদৃশ্য হওয়ায় তিনি শীর্ণ হইতেছিলেন; কিন্তু এখন যেরূপ হইয়া যাইতেছেন, তাহাতে যে আর বেশীকাল বাঁচিবেন, এরূপ আশা করা যায় না। মাঘমেলা প্রায় উপস্থিত। আবার রায়পুরে গোবিন্দ ঘোষের বাড়ীতে বারুণীর দিন মুকুয্যে জা'তে উঠিবার প্রস্তাব করিয়াছেন ও তোমার বাপের মত জানিতে পাঠাইয়াছেন। তোমার বাপকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, তাঁহার অমত নাই। এখন আমি যাই, আর বেলা নাই।"

নীরদা উঠিল, কিন্তু হৈমবতীর অবস্থা শুনিয়া লীলার মনে বড় আঘাত লাগিল।

বাস্তবিক মুকুয্যে হৈমবতীকে বড়ই বিপদে ফেলিয়াছিলেন। যে হৈমবতী একদিন বাপের বাড়ীতে স্বামীর নিন্দা শুনিয়া তাহাদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন, আজ সেই হৈমবতীকে সকলের সাক্ষাতে স্বামীর গুণাগুণ বর্ণন করিতে হইবে। হায়! ইহা অপেক্ষা যে সাধ্বী হৈমবতীর মৃত্যু ছিল ভাল!

তিনিও তাই ভাবিতেছেন,—"হায়! আমি মরিলাম না কেন? কোন্ মুখে, কেমন করিয়া স্বামি-নিন্দা করিব? যাঁর বিষণ্ণ-মুখ দেখিলে আমি ব্যথা পাই, যাঁর একটী দীর্ঘশ্বাসে আমি দশদিক অন্ধকার দেখি, যাঁর চক্ষে জল পড়িলে আমার বুকে শেল বাজে,—হায়! কেমন করিয়া আমি দশের কাছে সেই স্বামীর মাথা হেঁট করাইব?—আবার এদিকে একটী নির্দ্দোষ বালিকা,—সংসারের আবিলতা যাহাতে স্পর্শ করিতে পায় নাই,—সমস্ত জানিয়া শুনিয়া কোন্ প্রাণেই বা সেই সরলা সাধ্বীর সর্ব্বনাশ-সাধন করি? সত্য বলিলে, স্বামীর মাথা হেঁট, আবার সত্যের অপলাপ করিলে লীলার সর্ব্বনাশ;—হায়! আমি মরিলাম না কেন? মা জগজ্জননি! তোর দুঃখিনী মেয়েকে কোলে নে মা!"

হৈমবতীর বুকের ভিতর দারুণ দাবানল জ্বলিতেছে। হৃদয়ে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। ন্যায় ও সত্যের এবং প্রেম ও পতি-ভক্তির অনিবার্য্য ঘাত প্রতিঘাতে, সাধ্বী, প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে মুকুয্যে কিন্তু আয়োজনের ত্রুটি করেন নাই। আগামী মাঘ মেলায় জা'তে উঠিবার দিন ঠিক হইয়া গিয়াছে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল। আবার রায়পুরে বারুণীর মেলা বসিয়াছে। আবার তেমনি জিনিস-পত্রের আমদানি। আবার তেমনি লোকজনের সমাগম। কাপড়ে কাপড়ে গাঁট বাঁধিয়া, হাতে হাতে ধরাধরি করিয়া "ও নটো! কোথা গেলি রে," "ও হ'রের-মা! এইদিকে"-রবে চারিদিক্ ধ্বনিত করিয়া পিপীলিকা-শ্রেণীর মত মানুষের পাল চলিয়াছে। উদ্দেশ্য,—মেলা দেখা, ধুচুনি-চুবড়ি কেনা, আর তেলেভাজা বেগুনি-ফুলুরির শ্রাদ্ধ করা। তার পর গঙ্গাস্নানটা বাড়ার ভাগ। কয় মাগী অন্ধ, নাতিনীদের হাত ধরিয়া নিতান্তই ষোল-আনা পুণ্য-স্নান করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু হইলে কি হয়, চক্ষুরত্নে বঞ্চিত বলিয়া মেলা দেখা হইল না,—এ দুঃখ আর তাহাদের রাখিবার স্থান ছিল না।

আবার মনিহারী দোকানগুলার কাছে তেমনি ভিড়। দোকানদারেরা খরিদ্দার থামাইতে অবসর পাইতেছে না। এ উহার গা ঘেঁসিয়া চলিয়া যাইতেছে;—কাহারও দৃক্পাত নাই। তবে যুবতীরা, কোথাও ষণ্ড-পুরুষগুলোর নিকট হইতে চকিতের ন্যায় সরিয়া অন্য গুরুজনের পাশে দাঁড়াইতেছে, কোথাও বা

"পোড়ার-মুখো মিন্সের রকম দেখ!"—"অধঃপাতে যাও" বলিয়া পার্শ্বের পুরুষদের কল্যাণ-কামনা করিতেছে! মেলায় স্ত্রী-স্বাধীনতার পূর্ণবিকাশ। ক'নে-বৌ ঘোমটা খুলিয়াছে, তরুণীর মুখ ফুটিয়াছে, যুবতী কোলের ছেলে নামাইয়া জিনিস পত্রের দর করিতেছে। প্রৌঢ়া, 'দরে বনে' নাই বলিয়া দোকানদারের সঙ্গে বচসা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। অদূরে নব্য-বাবু চোখে আইগ্লাস লাগাইয়াছেন;—কাঁটাবনে পদ্মফুল খুঁজিবার জন্য! ভ্রাতা চোখে চসমা লাগাইয়াছেন,—মেলায় স্ত্রী-স্বাধীনতা দেখিয়া জাতীয় স্ত্রীচরিত্রের বিকাশ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য! আর গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া মিসনরি মহাশয় তে-মাথার মোড়ে কাঠের টুলে দাঁড়াইয়া গলা ফাটাইতেছেন,—কুলি-মজুর জড় করিবার জন্য!

রায়পুরের আজ ঘরে-ঘরে আনন্দোচ্ছ্বাস! যে সংবৎসর ঘরে আসে নাই, সে আজ ঘরে আসিয়া স্ত্রীপুত্রকে দেখিয়া প্রাণ-ঠাণ্ডা করিতেছে। এবাড়ী নূতন-জামাই আসিয়াছে; ও-বাড়ী নববধূ আসিয়াছে; পাশের-বাড়ী শ্বশুর-ঘর হইতে কন্যা আসিয়াছে;—প্রতিঘরেই আনন্দ কোলাহল। এখানে জামাই-ঠকানর সূচনা হইতেছে; সেখানে কুটুম্ব-ভোজনের আয়োজন হইতেছে; ওখানে হাসির স্রোতে ঘর ভাসিয়া যাইতেছে;—আজ রায়পুর দেখিয়া মনে হয়, বুঝি সুখ-মারুত-হিল্লোলে পৃথিবীর কান্নাকাটি রায়পুর হইতে উঠিয়া গিয়াছে! বুঝি রায়পুরে নিত্যই ষষ্ঠী সপ্তমী; আর বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিবে না!

কিন্তু সকলের অপেক্ষা আনন্দোচ্ছ্বাস হইতেছিল,—গোবিন্দ ঘোষের বাড়ী। গৃহদ্বার সুন্দর কদলীশাখায়, আম্রপল্লবে, পূর্ণকুম্ভে শোভমান। উপরে মধুর নহবৎ বসিয়াছে। অগণি লোকজনের সমাগম। ফাই-ফরমাস খাটিতে খাটিতে সনাতনের পায়ের সূতা ছিঁড়িয়া যাইতেছিল। গলায় পৈতা, হুঁকা-হাতে মুকুয্যে বড়ই ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া আনাগোনা করিতে-ছিলেন। টাকে সুগন্ধি তৈল মাখিয়া, পাশের ঝুলন্ত কোঁকড়ান চুলগুলি আঁচড়াইয়া পাকা আমের মত মুখে মধুর হাসি হাসিয়া গোবিন্দ ঘোষ সকলকে আপ্যায়িত করিতেছিলেন। বড় বড় মোড়লেরা ডাবা-হুঁকো অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। ছোট ছোট গাঁয়ে-না-মানে-আপনি-মোড়লেরা কলিকাতেই কাজ সারিতে-ছিলেন, আর সরফরাজি করিয়া বলিতে-ছিলেন, বুঝি তাঁহারা অনুগ্রহ না করিলে হেমন্তকুমার জা'তে-ঠেলা হইয়া মরিত! গোবিন্দ ঘোষ সকলকে যথাযোগ্য বিনীত সম্ভাষণ করিতেছেন। ওদিকে স্তূপাকার দানের-জিনিস সাজানো;—অসংখ্য ঘড়া, ঘড়ার উপর থাল, থালের উপর কাপড়, কাপড়ের উপর ষোল টাকা করিয়া সাজানো। আগন্তুকদের শুধু দেখিয়া তৃপ্তি হইতেছে না; কতক্ষণে করতল-গত হয়, তাই ভাবিতেছেন! এরি মধ্যে হেমন্তকুমারের ও অমূল্যকুমারের নামে 'ধন্য ধন্য' পড়িয়া গিয়াছিল। অভ্যাগতেরা বলিতে-ছিলেন,—"হবে না কেন? কত বড় ঘর! গাঁয়ের ভিতর ওঁদের না-খেয়ে-মানুষ কে?"

এরি মধ্যে সপত্নীক হেমন্তকুমার, লীলা ও হেমন্তকুমারের মাতা আসিয়াছেন। অমূল্য-কুমার, তাঁহার পিতা ও তাঁহাদের বাড়ীর আর আর সকলের আসিতেও বাকী নাই। নিম-ন্ত্রিতেরা অনেক আগেই আসিয়াছিলেন, কেবল হৈমবতী এ পর্য্যন্ত আসেন নাই। সকলেই উৎসুক-চিত্তে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। এমন সময় দূর হইতে বেহারার আওয়াজ শোনা গেল। তখনই একজন পাইক আসিয়া সংবাদ দিল,—"হৈমবতী আসিতে-ছেন।" দেখিতে দেখিতে পাল্কি ঘরের ভিতর

ঢুকিল। গোবিন্দ ঘোষের গৃহিণী সসম্ভ্রমে হৈমবতীকে হাত ধরিয়া তুলিলেন। হৈমবতীর শুধু একখানি রাঙ্গাপেড়ে-সাড়ী-পরা, হাতে নোয়া ও মাথায় সিঁদূর, গায়ে অলঙ্কারের লেশমাত্র নাই। তবুও তিনি উজ্জ্বল সধবার চিহ্নে দীপ্যমানা। হৈমবতী নামিয়াই লীলাকে কোলের কাছে লইয়া তাহার শিরশ্চুম্বন করিলেন। লীলাও তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া, চকিত হইয়া আপনার চোখের জল উপহার দিল। লীলা হৈমবতীর রোগের সময়ও তাঁহার এমন শীর্ণ বিবর্ণ মুখ দেখে নাই।

সকলে সমবেত হইলে মুকুয্যে প্রস্তাব করিলেন,—"আগামী কল্য বারুণী; শুভদিনে পুণ্যস্নানের পর হেমন্তকুমারের জা'তে ওঠা হইবে।" এ প্রস্তাবে কাহারও বড়-একটা অমত ছিল না, তবে আগন্তুকদের মধ্যে "হাত-ধোয়ার" দল কাণাকাণি করিতেছিলেন,—"এত লোকজনের মধ্যে এত ঘর-জোড়া করিয়া কলসী, থাল, কাপড়, টাকা রাখিবার দরকার? ও-গুলার আগেই বিলি-বন্দোবস্ত করিয়া দিলেই হয়।"

দেখিতে দেখিতে রাত্রি পোহাইয়া গেল। উষার কোলে মাথা দিয়া বিহঙ্গমকুলের প্রভাতী-সঙ্গীত উপহার লইয়া মৃদু-মধুর পবন-হিল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম আলোকচ্ছটা জগতে দেখা দিল। সেই আলোকচ্ছটা দেখা দিতেই গোবিন্দ ঘোষের বাড়ীর সমবেত কুলবধূরা তাহাকে মঙ্গলবাদ্যের সঙ্গে বরণ করিল। কাল শেষ-রাত্রে তাহারা শুভ প্রভাতের প্রতীক্ষায় বীতনিদ্র ছিল, আজ উষার হাসি দেখিবার পূর্ব্বেই শুভদিনকে জগতে সম্ভাষণ করিয়া আনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত। শুভদিনের প্রথম পদক্ষেপেই গোবিন্দ ঘোষের বাড়ীতে আনন্দ-কোলাহল, মঙ্গলধ্বনি। তার পর কথার স্রোত, পরিহাসের স্রোত, হাসির স্রোত শতধারে বহিয়া চলিয়াছে। সে স্রোতের তরঙ্গ, সে তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত যে দেখিল না, সে বুঝিল না; যে দেখিয়াও বুঝিল না, সে কিছুতেই বুঝিবে না।

কিন্তু সে উৎসবের মধ্যে কেবল হৈমবতীর মুখ দেখা গেল না। ইহার কারণ জানিবার জন্য কেহ কেহ উৎসুক হইল। লীলাও হৃদয়ের পূর্ণোচ্ছ্বাসে, আকুল-প্রাণে তাঁহাকে অন্বেষণ করিল। কাল বৈকালে ঠাকুর-মাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আর লীলাকে শুভ-আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য একবারমাত্র তিনি সমবেত জন-মণ্ডলীর মধ্যে দেখা দিয়াছিলেন। কিন্তু শুভ-আশীর্ব্বাদ করিবার সময়ই তাঁহার মুখখানি কাঁদ-কাঁদ দেখিয়া লীলা ভীত হইয়াছিল। পাছে তাঁহার সেই মলিন-মুখ আনন্দের স্রোত অবরোধ করে, এই ভাবিয়া তখনই তিনি অদৃশ্য হইয়াছিলেন।

গৃহের এক কোণে নির্জ্জনে অশ্রুরাশিতে সিক্ত হইয়া হৈমবতী ভাবিতেছিলেন, কেমন করিয়া তিনি স্বামীকে দশের সাক্ষাতে অপরাধী বলিবেন। এ চিন্তায় সতী, সকাতরে ভগবানকে ডাকিতেছিলেন,—"দয়াময়! এ দায় হইতে উদ্ধার কর!" পতিব্রতার সেই মর্ম্মান্তিক রোদন ভগবানের চরণে স্থান পাইয়াছিল। ধীরে ধীরে অভাগিনীর সকল দুঃখের শেষ হইয়া আসিল।

এদিকে আজ সকাল হইতেই আত্মীয়-কুটুম্ব-পরিবৃত হইয়া, প্রবহমান সুখের স্রোতে গা-ঢালিয়া, নিজে সুখী হইয়া, অপরকে সুখী করিয়াও লীলা উৎসুকচিত্তে হৈমবতীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। যখন শেষে দেখিল যে, হৈমবতী আসিলেন না, না-আসার কারণ কি, তাহাও কেহ বুঝিতে পারিতেছে না, তখন লীলা হৈমবতীর ঘরের দিকে চলিল। লীলাকে হৈমবতীর ঘরের দিকে যাইতে দেখিয়া গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রী তাহার অনুসরণ করিলেন

এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় যাইতেছ লীলা?"

লীলা উত্তর দিল,—"হৈমবতীর কাছে যাইব।"

গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রী লীলার হাত ধরিলেন; বলিলেন,—"তা থাক্, এখন গিয়া কাজ নাই।" শেষে লীলার নিতান্ত পীড়াপীড়ি দেখিয়া বলিলেন,—"তবে শোন, একটা কথা বলি;—কাল অনেক রাত্রে তোমরা শুইবার পর কোথা হইতে এক ক্ষেপা সন্ন্যাসী আসিয়াছিল। সে কখন গাহিতেছিল, কখন কাঁদিতেছিল, কখন তোমার, কখন বা হৈমবতীরও নাম করিতেছিল। শেষে বড় উৎপাত আরম্ভ করিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিতে আসিলে, সনাতন তাহার পাকা বাঁশের লাঠীর ঘা-কতক তাহার পিঠে দিয়াছিল। যাতনায় অস্থির হইয়া চীৎকার আরম্ভ করিলে, কি-জানি-কি ভাবিয়া হৈমবতী তাহাকে দেখিতে গেলেন। সেখানে গিয়া, সেই সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। অনেক যত্নে একবার চেতনা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পরই নিদ্রিত হইলেন; সেই অবধি সমভাবেই আছেন। এই মাত্র আমি দেখিয়া আসিয়াছি, এখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই।"

বুদ্ধিমান্ পাঠককে বলিতে হইবে না যে, ঐ ক্ষেপা-সন্ন্যাসী হতভাগ্য নীলরতন রায়;—পাপিষ্ঠ পাপের ফল হাতে হাতে পাইয়াছিল। কিন্তু তখনও তাহার মন হইতে মোহ অপসারিত হয় নাই; নীলরতন তখনও লীলার রূপে আকৃষ্ট। অধিক কি, সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর সহিত তাহার এই শেষ-সাক্ষাতের প্রধান উদ্দেশ্য, এখনও যদি লীলা লাভের কোন উপায় থাকে! পাপিষ্ঠের আরও অভিপ্রায়,—লীলা যে নির্দ্দোষ, তাহার চরিত্র যে নিষ্কলঙ্ক, একথাও যেন কিছুতে প্রকাশ না পায়! অন্ততঃ, হৈমবতী তাহা নিজমুখে প্রকাশ না করেন! অ-হ! মূর্ত্তিমান্ নরক এইরূপই বটে! করুণাময়ী হৈমবতী স্বামীর এই ভীষণ পরিণাম দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলেন।

লীলা কিন্তু তবু শুনিল না। গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রীকে টানিয়া লইয়া চলিল। গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রীও অগত্যা চলিলেন। তার পর হৈমবতীর ঘরে গিয়া দেখেন, হৈমবতী তখনও অজ্ঞান, অচৈতন্য। কিন্তু সেই সংজ্ঞাহীন মূর্ত্তি শীর্ণ বিবর্ণ হইলেও মহামহিমময়ী। মুখে অনৈসর্গিক কিরণ-রেখা। মস্তকে সিন্দুর-বিন্দু দেদীপ্যমান,—উজ্জ্বল হইতেও উজ্জ্বলতর! হাতের লোহা যেন বহুমূল্য অলঙ্কারকেও গঞ্জনা দিয়া বিভাসিত হইতেছে! সে মূর্ত্তি যেন বহুদিনের পর কি-এক হারানিধি পাইয়া অপনার ভাবে আপনিই অঘোর হইয়া রহিয়াছে। হৈমবতীর সে আনন্দময়ী মূর্ত্তি দেখিয়াও লীলা চক্ষের জল সংবরণ করিতে পারিল না। গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রীও চক্ষের জল মুছিলেন। তার পর অনেক ডাকাডাকিতেও হৈমবতী চক্ষু খুলিলেন না। তখন গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রী তাঁহার হাতে পায়ে হাত দিয়া দেখিলেন,—হাত ও পা শীতল হইয়া আসিতেছে। ঘোষগৃহিণী শিহরিলেন, লীলা শিহরিল! সেই মুহূর্ত্তেই গোবিন্দ ঘোষের কাছে সংবাদ গেল; পর মুহূর্ত্তেই সেই সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

এদিকে স্ত্রীলোকদের মধ্যে বড়ই আমোদ-আহ্লাদ চলিতেছিল। হলুদ মাখিয়া, হলুদ মাখাইয়া, ম্যাজেণ্ডার-মেহেদি-পাতার রঙ্গে আপাদ-মস্তক রঞ্জিত করিয়া রমণীগণ অপূর্ব্ব সাজে সাজিতেছিলেন। পুরুষদের মধ্যেও বড় কম হইতেছিল না। মুকুয্যে, সনাতনের পিঠ চাপড়াইতেছিলেন—তাহার তামাক দিতে দেরি হইতেছিল বলিয়া। সনাতন পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে হাসিয়া তামাক দিয়া, মুকু-

য্যের পায়ের ধূলা লইতেছিল। গোবিন্দ ঘোষের সেই স্বাভাবিক প্রেমের উৎস শত-ধারায় ছুটিতেছিল! আনন্দে অধীর হইয়া তিনি কি করিবেন, ভাবিয়া ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। মধ্যে মধ্যে মুকুয্যের সঙ্গে গাঢ়ালিঙ্গনে বদ্ধ হইতেছিলেন, আর চক্ষু বহিয়া আনন্দাশ্রু পড়িতেছিল। সমবেত লোকেরা খোসগল্প করিতেছিল, হাসিতেছিল, হাসিতে হাসিতে অপরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতে-ছিল; ঢলিয়া পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছিল, আবার উঠিতেছিল, আবার হাসিতেছিল, আবার পড়িতেছিল। সে-এক অদ্ভুত দৃশ্য!

হৈমবতীর পীড়ার সংবাদ রাষ্ট্র হইবামাত্র ধীরে ধীরে সেই উচ্ছ্বলিত আনন্দের স্রোত অবরুদ্ধ হইল। অভ্যাগতগণের মধ্যে হৈমবতীর পীড়া সম্বন্ধে, সন্ন্যাসী সম্বন্ধে নানারূপ গুরুতর তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল, লীলার অদৃষ্টে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের কিরণ হঠাৎ গাঢ়ন্ধাকারে আচ্ছন্ন হইল।

গোবিন্দ ঘোষ হৈমবতীর ঘরের দিকে দৌড়িলেন, মুকুয্যে পিছনে চলিলেন, সনাতনও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। সেখানে সকলে হৈমবতীর অবস্থা দেখিয়া যুগপৎ ভীত ও স্তম্ভিত হইলেন। জীবনের যে আশা নাই—একথা বুঝিতে আর কাহারও বাকী রহিল না। নীরদা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, লীলা গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল, গোবিন্দ ঘোষের স্ত্রী অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল।

* * *

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ধীরে,—লীলা! ধীরে! পৃথিবীর পথ বড় পিচ্ছিল; পা টিপিয়া টিপিয়া চল! একবার স্খলিত-পদ হইলে আর উঠিতে পারিবে না! চারি দিকে পাপের ছায়া! তুমি পাপ স্পর্শ না করিলেও পাপ তোমায় স্পর্শ করিবে! তাই বলি, অমন ক্ষুণ্ণমনা হইয়া চলিও না।

ওকি, কাঁদিতেছ কেন? আজ তোমার শেষ দিন, আজ তোমার জীবন-দীপ নির্ব্বাণ হইবে,—এ জনমে স্বামি-সুখ পাইলে না বলিয়া কাঁদিতেছ? সমাজে তুমি নির্দ্দোষ প্রতিপন্ন হইতে পারিলে না বলিয়া, আপন অদৃষ্টে ধিক্কার দিতেছ? হৈমবতী তোমার নির্ম্মল চরিত্রের কথা,—সতীত্বরত্নের কথা জগতে জানাইতে পারিলেন না বলিয়া মরিতে যাইতেছ? কল-ঙ্কিনী নাম লইয়া তুমি জীবন-ধারণ করিতে পারিবে না বলিয়া আত্মঘাতিনী হইতে যাই-তেছ,—না? কিন্তু কাঁদ কেন, লীলা? স্বামী অমূল্যকুমারের মুখ মনে পড়িতেছে? তাই, মরিয়াও তুমি সুখী হইতে পারিবে না, ভাবি-তেছ? কিন্তু কি করিবে, সকলই তোমার ভবিতব্য! তবে যাও সতি, সেই দিব্যধামে যেখানে রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে বিচ্ছেদ নাই সতীত্বের কণ্টক নাই!—তবে যাও লীলা, সেই মহালোকে,যথায় নির্ব্বিঘ্নে পতিপদ-পূজা করিতে পাইবে, সরলতায় সুখের মন্দাকিনী বহিবে; অসুররূপী নীলরতন রায় যেখানে নাই,—সেই পরম পুণ্যধামে প্রস্থান কর!

আবার বলি, ধীরে,—লীলা! ধীরে! ঐ সুন্দর-মুখে অবগুণ্ঠন টানিয়া দাও! আজিকার দিনে আর কাহাকেও দেখা দিও না। ঐ দেখ, শত শত চক্ষু অনিমিষে তোমারদিকে চাহিতেছে। তোমার ঐ শুভ্র নিষ্পাপ-হৃদয়ে কলঙ্কের কালিমা-রেখা স্পর্শ করিতে পারে না জানি, তবুও সতর্ক থাক! দেব-তারা অমর, তবুও এই রূপের আগুনে পুড়িয়া মরেন। আর সংসারের জীব, মায়া-মোহে জড়িত, সেই মানুষ-পতঙ্গেরা এই রূপের আগুন দেখিয়া কিরূপে স্থির থাকিবে? আহা,

অভাগিনি! কেন এমন রূপ লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলে?

* * *

কৈ লীলা, শুনিলে না? এখনও অন্যমনা! তবে—তবে, এই যে সম্মুখে ভাগীরথী। আহা, কোটি কোটি জীবের শত শত যুগের রাশি রাশি পাপ বিধৌত করিয়া কুলুকুলুরবে মা চলিয়াছেন। এত পাপরাশি সংস্পর্শেও মা-আমার স্বচ্ছ-নির্ম্মল-সলিলা, সুপবিত্রা। মা! তুই অনন্ত কালের সাক্ষী!—আজ মা তোর এই প্রশান্ত সুন্দর বক্ষে অভাগিনী লীলা তাহার দুঃখের বোঝা নামাইতে আসিয়াছে, দুঃখিনীর প্রতি সদয় হ' মা!

সাবধান লীলা! স্বামীর হাত ধরিয়া নামিও! দেখ, দেখ, তোমার দিকে এক ভণ্ড সন্ন্যাসী অনিমেষ-নয়নে চাহিতেছে! ও কি! ধর, ধর! ঐ যে হাত দেখা যায়! ঐ যে এদিকে চুল ভাসিয়া উঠিয়াছে! এদিকে! ওদিকে! কৈ?—আর নাই। সব ফুরাইল! হায়, কি করিলে লীলা! আজিকার দিনে এ কি করিলে! এখনও যে প্রভাত-সূর্য্যের ক্ষীণ-জ্যোতি! এখনও যে দশদিক্ আলোকমালায় বিভূষিত হয় নাই! তবে অন্ধকার কেন? হায়, কে বলিবে?—ভগবন্! তুমিই জান, অন্ধকার কেন!

* * *

লীলার সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য ভাগীরথীর প্রশান্ত অনন্ত সৌন্দর্য্যে মিশাইয়া গেল। অমূল্যকুমার, জলে ঝাঁপ দিলেন, সনাতনও ঝাঁপ দিল।—জল তোলপাড় হইতে লাগিল। কিন্তু হায়, কিছুতেই সে স্বর্ণ-প্রতিমা মিলিল না। আজ পূর্ণিমায় পূর্ণ অমাবস্যা! প্রভাত-গগনে সূর্য্যাস্ত!! উদ্বোধনের পূর্ব্বেই বিজয়া করিয়া সকলে বিষণ্ণ মনে ঘরে ফিরিল!

* * *

এখনও হৈমবতীর নিদ্রা ভাঙ্গে নাই। হায়, সে নিদ্রা কখনও ভাঙ্গিবেও না! পতির পাপে সতী মরিয়া জুড়াইল! হৈমবতীর যথারীতি সৎকার করা হইল। সৎকারের সময় অর্দ্ধরাত্রে শ্মশানে সকলে সবিস্ময়ে শুনিল, দিক্দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া কে বিষাদ-স্বরে, বেহাগে আলাপ করিতেছে;—

"লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥"

গায়কের সে স্বর বড় গম্ভীর, বড় করুণা-পূর্ণ, সে স্বর বুকে বিদ্ধ হয়। নৈশ-সমীর কাঁপাইয়া, জল-স্থল-ব্যোম প্রতিধ্বনিত করিয়া গায়ক আবার গাহিল;—

"ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥"
"বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥"

ধীরে ধীরে সেই স্বর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। তখন সেই সপ্তস্বর-পূর্ণ মহাগীতিতে যেন ইহ-জগৎ পূর্ণ হইল। দেখিতে দেখিতে সেই স্বর অগ্রসর হইতে লাগিল। শবদাহ-কারিগণ সভয়ে, সবিস্ময়ে, চিতার অস্ফুট আলোকে চিনিল, সন্ন্যাসী—নীলরতন রায়।

হঠাৎ উন্মত্ত বিকট চীৎকারে শ্মশান প্রতিধ্বনিত হইল। সেই শ্মশানে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত দগ্ধ যষ্টি লইয়া সন্ন্যাসী সৎকারকারীদিগকে আক্রমণ করিল। যে যেখানে পারিল, ছুটিয়া পলাইল। তার পর অর্দ্ধদগ্ধ হৈমবতীর শব কোলে করিয়া সন্ন্যাসী শ্মশানে বসিয়া রহিল!

* * * *

সহৃদয় পাঠক! লীলার অদৃষ্টসূত্র ধরিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে এতদূর আসিয়াছেন। ইহার পর লীলার জন্য ভবিষ্যতে কি আছে, যদি জানিতে ঔৎসুক্য থাকে, তবে আপনি একবার লীলার অন্বেষণ করিয়া দেখুন। আমাদের আর জানিবার ইচ্ছা নাই। অমূল্যকুমার প্রভৃতিকে দিয়া অনুসন্ধান করিয়াও লীলাকে পাই নাই। তবে আপনার অনুসন্ধানের ফল কি হইবে, জানি না। লীলার অনুসন্ধানের ভার আপনার হস্তে দিয়া, তাহার ভবিষ্যৎ-জীবনের ইতিহাস-সংগ্রহের ভার আপনার উপর রাখিয়া, আমরা এখন বিদায় গ্রহণ করিলাম।

তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি, যদি লীলাকে না বাঁচাইতে পারেন, তবেই সুখী হইব। জগতে যে আগে মরিতে পারিল, সে-ই সুখী।

সমাপ্ত।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র সেন।

সুগন্ধ।

নানারূপ ফুল হইতে ফরাশী দেশে অনেক সুগন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফরাশী দেশে থাকিতে আমি এই বিষয়ে যৎসামান্য তদন্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। তবে সে সময়ে শীতকাল ছিল, দেশ বরফে আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল, ফুল ছিল না, তাই ভাল করিয়া আমি তদন্ত করিতে পারি নাই। এখান হইতে জর্ম্মান দেশে কলোন নামক নগরে যাই। এই স্থানে জগদ্-বিখ্যাত ইয়ু-ডি-কলোন প্রস্তুত হয়। তাহাও মোটামুটি দেখিয়াছিলাম। এই সব দেখিয়াছি শুনিয়াছি বলিয়া তাই আজ সুগন্ধ বিষয়ে দুই চারি কথা বলিতে সাহস করিতেছি। আর এক কারণ এই যে, আজকাল দেশীয় আতর বা ফুলেল তৈলের প্রতি লোকের রুচি নাই;—মাথা বল, গুঁকা বল, তত্ত্ব বল, তাবাস বল, এখন আর ভাল ভাল সখের শিশিপূর্ণ ফরাশী দেশের এসেন্স না হইলে লোকের মন উঠে না।

সুগন্ধ দ্রব্যের অধিকাংশ—গাছের ফুল বা মূল বা পাতা প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন হয়। মৃগনাভি, খটাস প্রভৃতি দুই চারিটী বস্তু কেবল জন্তুদিগের শরীর হইতে পাই। কোন-রূপ ধাতব সুগন্ধ দ্রব্য আছে কিনা বলিতে পারি না; বোধ হয় নাই। ফল কথা, প্রায় সমুদয় সুগন্ধ উদ্ভিদ্ হইতেই পাই।

উদ্ভিজ্জ সুগন্ধকে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারি;—(১) তৈল; (২) বীর্য্য বা ইথার। এই দুইটী পদার্থ বৃক্ষ-শরীরে বর্ত্তমান থাকে, তাহাই মানুষে বাহির করিয়া লয়। দুইটীই বায়ুতে উবিয়া যায়। বায়ুতে সত্বর মিশিয়া যায় বলিয়া, তাই সুগন্ধ দ্রব্যের শিশির ছিপি খুলিলেই ঘর গন্ধে আমোদিত হয়, কিংবা বাগানে ফুল ফুটিলে চারিদিকে সুন্দর সুগন্ধ বাহির হয়। যে সকল বস্তু বায়ুতে উবিয়া যায়; ইংরেজী কথায় তাহাদিগকে 'ভোলেটাইল' পদার্থ বলে। গাছের ভোলেটাইল তৈল চোয়াইয়া বাহির করিতে হয়। গাছের ফুলে জল দিয়া, একটী পাত্রে রাখিয়া, পাত্রটীর মুখ বন্ধ করিয়া তাপ দিলে জল বাষ্পরূপ ধারণ করে। পাত্রটীর মুখ যাহা দিয়া বন্ধ করা হইয়াছে, তাহাতে একটী ছিদ্র থাকে; সেই ছিদ্রে একটী নল বসাইয়া দিতে হয়। অগ্নি হইতে দূরে অপর একটী পাত্র থাকে; তাহারও মুখ বন্ধ; তাহারও ঢাকনে ছিদ্র থাকে। সেই ছিদ্রে নলের অপর মুখ লাগাইয়া দিতে হয়। অগ্নির উপর ফুল ও জল সহিত যে পাত্র থাকে, তাহার ভিতরের জল উত্তাপে বাষ্পরূপ ধারণ করে; সেই বাষ্প নলে নলে

অপর পাত্রে গিয়া প্রবেশ করে। দ্বিতীয় পাত্রের ভিতর বাষ্প প্রবেশ করিলে, তাহার গায়ে শীতল জল সেচন করিতে হয়। শৈত্য পাইয়া বাষ্প পুনরায় জমিয়া যায়; বাষ্প জমিয়া পুনরায় জলে পরিণত হয়। যে ফুল সিদ্ধ করিবে, সেই ফুলের তৈল উঠিয়া বাষ্পের সহিত গিয়া অপর পাত্রে পড়ে। যেমন বাষ্প জমিয়া জল হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফুলের তৈলও জমিয়া যায়। তৈল জমিয়া জলের উপর ভাসিতে থাকে; সেই তৈল লোকে উপর-উপর উঠাইয়া লয়। গোলাপ, ল্যাভেণ্ডার, কমলা-নেবুর ফুল, দালচিনি, পিপারমেণ্ট প্রভৃতির তৈল লোকে এইরূপে প্রস্তুত করে। জল হইতে তৈল সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া লইতে পারা যায় না, অল্প পরিমাণে জলের সহিত রহিয়া যায়। যৎসামান্য পরিমাণে তৈল রহিয়া যায় বলিয়া জলও সুগন্ধযুক্ত থাকে। গোলাপ-জল, ল্যাভেণ্ডার-জল, পিপারমেণ্ট-জল এই-রূপে হয়।

কোনও কোনও বস্তুতে তৈল অতি সামান্য পরিমাণে থাকে। এত সামান্য পরিমাণে থাকে যে, তাহাকে জল হইতে পৃথক্ করা কঠিন কথা। সে নিমিত্ত সে সব তৈলের মূল্য অধিক। গোলাপ-ফুলে তৈল এইরূপ অতি সামান্য-ভাবে থাকে। এই তৈলের নাম আতর। এ দেশে গাজিপুর হইল আতর ও গোলাপ-জলের একটী প্রধান আড্ডা। গাজিপুরে থাকিতে আমরা গোলাপের বাগানে কখন কখন বেড়াইতে যাইতাম। একবার বেড়াইয়া আসিলেই শরীর সুগন্ধযুক্ত হইয়া পড়িত। প্রাতঃকালে গোলাপের বাগানগুলি দেখিতে অতি সুন্দর হয়,—ফুটন্ত ফুলে যেন আলো করিয়া থাকে। দশটার মধ্যে লোকে সব ফুল তুলিয়া লয়। যতগুলি ফুল, তাহার দ্বিগুণ জল দিয়া চোয়াইতে হয়। প্রথম বার চোয়াইলে যে গোলাপ-জল বাহির হয়, তাহার সহিত পুনরায় নূতন নূতন ফুল দিয়া যতবার চোয়াইবে, গোলাপ-জলও ততই উৎকৃষ্ট হইতে থাকিবে। আতর বাহির করিয়া লইতে হইলে, এই জলে কাপড় ঢাকা দিয়া রাত্রিকালে বাহিরে রাখিতে হয়। নিশার শীতলতা পাইয়া গোলাপের তৈল, অর্থাৎ কি-না আতর, অতি সূক্ষ্ম সরের মত উপরে ভাসিতে থাকে। প্রাতঃকালে ধীরে ধীরে তাহাকে পালক দিয়া উঠাইয়া শিশির ভিতর রাখিতে হয়। দিন দিন এইরূপে সমুদয় তৈলটুকু উঠাইয়া লইতে হয়। বিশ সহস্র গোলাপ ফুলে এক তোলা আতর বাহির হয় কিনা সন্দেহ। এক তোলা এরূপ বিশুদ্ধ আতরের মূল্য একশত টাকারও অধিক; কিন্তু এরূপ আতর অতি দুর্লভ পদার্থ। এক-বার খলিফা হারুণ-উল-রশিদের কীর্ত্তিভূমি বোগদাদ নগর হইতে আমার নিকট এইরূপ আতর আসিয়াছিল। ইহার গুণ এই যে, তৃণাগ্রে অণু-পরিমাণে ব্যবহার করিলে কাপড়-চোপড়ে অনেক দিন পর্য্যন্ত কাঁচা গোলাপের সুগন্ধ থাকে। বাজারে যে আতর বিক্রীত হয়, তাহাতে চন্দন-তৈল মিশ্রিত থাকে। বিলা-তের "অটো-ডি রোজ" অধিকাংশ তুরুস্ক-দেশে প্রস্তুত হইয়া থাকে। বলগেরিয়া প্রদেশে গোলাপের অনেক চাষ ছিল। ১৮৭৭ সালের রুষে-তুরুস্কে যুদ্ধের পর এই প্রদেশ স্বাধীন হইয়াছে। এক্ষণে এখানে কি পরিমাণে আতর প্রস্তুত হয়, তাহা বলিতে পারি না। পূর্ব্বে প্রতি বৎসর ৪৫ মণ অর্থাৎ ১৮০০ সের আতর প্রস্তুত হইত। এক সের আতর করিতে ৭৪ মণ গোলাপ-ফুলের আবশ্যক। তবেই বুঝিয়া দেখ, বলগেরিয়া প্রদেশে গোলাপ-ফুলের কিরূপ চাষ ছিল।

ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে

সৌরভ সন্নিবেশিত থাকে। পুদিনার গন্ধ পাতায় ও ডাঁটায়, দাল-চিনির ছালে, তেজ-পাতের পাতায়, চন্দনের কাষ্ঠে, লবঙ্গের পুষ্প-কলিতে, এলাচির বীজে, নেবুর ফলে, আদা ও মুথার মূলে, বেণার ঘাসে ও মূলে, গোলাপ মল্লিকা প্রভৃতির পাপড়িতে। আবার এক গাছেরই ভি ভিন্ন স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ সৌরভ বাহির হইয়া থাকে। কমলা-নেবুর পাতা হইতে একরূপ সুগন্ধ বাহির হয়, তাহাকে ফরাসী ভাষায় "পেটিটগ্রেন" বলে; ফুল হইতে বাহা হয়, তাহাকে "নিরোলি" বলে। ইহা ব্যতীত ফলের খোসা হইতেও এক প্রকার সুগন্ধযুক্ত তৈল বাহির হয়। যে সকল ফুলে তৈল অতি সামান্যভাবে থাকে, তাহা হইতে ফরাসীরা আর এক উপায়ে সুগন্ধ বাহির করিয়া লয়। তিলের তৈলে ভিজাইয়া তুলা অথবা চরবির উপর স্তরে স্তরে ফুল সাজাইয়া দিলে, ফুলের গন্ধ সেই তুলায় অথবা চরবিতে গিয়া প্রবেশ করে। তাহার পর সেই সুগন্ধযুক্ত তুলা বা চরবি সুরায় ভিজাইয়া রাখিলে, সুরা সৌরভ-বিশিষ্ট হইয়া পড়ে। ফরাসীরা সেই সুরা লইয়া নানারূপ গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করে। উদ্ভিদ্-শরীরের কোনও অংশে অধিক পরিমাণে তৈল থাকিলে তাহাকে পীড়ন করিয়া বাহির করিতে পারা যায়। কমলা নেবুর খোসা হইতে লোকে এই উপায়ে তৈল বাহির করিয়া লয়।

নানা স্থানে আমি পাঠকদিগকে বার বার আধুনিক রাসায়নিক-শাস্ত্র-অনুমোদিত মূল-পদার্থগুলির নাম মনে করিয়া রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্রের এগুলি ক খ স্বরূপ। যে সমুদয় নূতন জ্ঞানের প্রভাবে ইউরোপীয় জাতিরা আজ সসাগরা ধরার অধিপতি, এই নামগুলি মনে করিয়া না রাখিলে সে জ্ঞানলাভ করিবার উপায় নাই। এমন কি, এইরূপ প্রবন্ধ বুঝিতে পারাও কঠিন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমি চারিটী মূল-পদার্থের নাম বার বার করিয়াছিলাম,—অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও কার্ব্বন। অক্সিজেন, নাইট্রো-জেন ও হাইড্রোজেন—এ তিনটী বাষ্প। অক্সি-জেন ও নাইট্রোজেন দিয়া বায়ু গঠিত। অক্সিজেন নিশ্বাসের সহিত লইয়া জীব জীবিত থাকে। খাঁটি অক্সিজেন নিশ্বাস লইলে শরীরের কার্য্য অতিশয় শীঘ্র শীঘ্র হইয়া জীব মরিয়া যায়, সেজন্য অক্সিজেনের সহিত বায়ুতে নাই-ট্রোজেন মিশ্রিত থাকে। অক্সিজেন ও হাইড্রো-জেন মিশিয়া জল হয়। অপরাপর পদার্থের সহিত মিশিয়া অক্সিজেন কঠিন বস্তুতে পরিণত হয়। অপরাপর পদার্থের সহিত মিশিয়া নাই-ট্রোজেনও কঠিনরূপ ধারণ করে। এই আমা-দের সোরা নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও পটাস নামক ক্ষার দিয়া প্রস্তুত। কয়লাকে কার্ব্বন বলে। বৃক্ষদিগের কাষ্ঠ কার্ব্বন দিয়া গঠিত। চিনিতে অনেক কার্ব্বন থাকে। হীরা বিশুদ্ধ কার্ব্বন দিয়া গঠিত।

যে সমুদয় সুগন্ধযুক্ত তৈলের কথা বলিতে-ছিলাম, তাহারা কার্ব্বন ও হাইড্রোজেন দিয়া গঠিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে, ঐ দুই পদার্থ সমান পরিমাণে থাকিলেও বিভিন্ন বিভিন্ন বস্তু, বিভিন্ন বিভিন্ন স্বাদ-গন্ধের উৎ-পাদন করে। বিশুদ্ধ টারপিন-তৈল ৮৮ ভাগ কার্ব্বন ও ১২ ভাগ হাইড্রোজেন দিয়া গঠিত; অর্থাৎ কিনা, ১০০ সের টারপিন-তৈলে ৮৮ সের কার্ব্বন ও ১২ সের হাইড্রোজেন থাকে। নেবুর তৈল, কমলা-নেবুর তৈল, কাবাবচিনির তৈলও ৮৮ ভাগ কার্ব্বন ও ১২ ভাগ হাইড্রোজেন দিয়া গঠিত। তবে টারপিন-তৈলের একপ্রকার স্বাদ-গন্ধ, নেবুর তৈলের অন্যপ্রকার স্বাদ-গন্ধ হয় কেন? জগতের এ রহস্য বুঝা ভার! রাসায়-নিক শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে, বিভিন্ন

বিভিন্ন বস্তুতে মোটের উপর কার্ব্বন ও হাইড্রোজেনের ভাগ সমান থাকিলেও তাহাদের প্রত্তি অণুতে কার্ব্বনের ও হাইড্রোজেনের ভাগ সমান থাকে না। যথা,—মৌরির তৈল ও লবঙ্গের তৈল মোটের উপর সমানভাবে কার্ব্বন ও হাইড্রোজেন দিয়া গঠিত, কিন্তু ঐ দুই পদার্থের এক একটী অণু সমানভাবে গঠিত নয়। মৌরির তৈলের এক একটী অণু দশটী কার্ব্বনের পরমাণু ও ষোলটী হাইড্রোজেনের পরমাণু দিয়া গঠিত; লবঙ্গ-তৈলের এক একটী অণু ১৫টী কার্ব্বনের পরমাণু ও ২৪টী হাইড্রোজেনের পরমাণু দিয়া গঠিত। এ নিমিত্ত মৌরির তৈল একটী পদার্থ ও লবঙ্গ-তৈল আর একটী পদার্থ। এই নিমিত্ত মৌরির তৈলের একপ্রকার রূপ, রস ও গন্ধ; লবঙ্গ তৈলের অন্যপ্রকার রূপ, রস ও গন্ধ। পাঠক! একবার চিন্তা করিয়া দেখ, ইউরোপীয় জাতিরা সকল বিষয়ের কিরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা ও অনুধাবনা করিয়া দেখিয়াছেন। এই অনুসন্ধানের বলেই তাঁহারা আলকাতরা হইতে নানারূপ মনোহর রং প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই অনুসন্ধানের বলেই নানারূপ বস্তু প্রস্তুত হইয়া ভারতে আসিয়া ভারতের ধন লুণ্ঠিত হইয়া বিদেশে প্রেরিত হইতেছে। হাবা-গোবার মত আমরা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া আছি! ছি!!

হাইড্রোজেন ও কার্ব্বন ব্যতীত কতকগুলি সুগন্ধযুক্ত তৈলে অক্সিজেন বর্ত্তমান থাকে। তিক্ত-বাদাম ও দালচিনির তৈল এই জাতীয়। বাদাম পিশিয়া যে তেল বাহির হয়, সে এ তৈল নহে। পেশা বাদাম হইতে "স্থির" তৈল হয়; অর্থাৎ কিনা, সরিষা, নারিকেল প্রভৃতি তৈলের মত তাহা উবিয়া যায় না। তিক্ত-বাদামের তৈল—ভোলেটাইল, অর্থাৎ কিনা, তাহা উবিয়া যায়, আর তাহাতে এক প্রকার সুগন্ধ থাকে। উদ্ভিদ্-শাস্ত্রে বাদাম-গাছের নাম প্রুণস আমিগ্‌ডেলস (Prunus Amygdalus)। এই গাছের একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় আছে, তাহাকে অমরঃ (amara) বলে। এই সম্প্রদায় গাছের ফলে তিক্ত-বাদামের উৎপত্তি হয়। তিক্ত-বাদামকে ইংরেজীতে বিটার আমণ্ড (Bitter Almond) বলে। আমরা এই গাছের এখানে একখানি ছবি দিলাম।



উপরে প্রথম গাছটীর ছবি রহিয়াছে। যে গাছটী হইতে এই ছবি খানি আঁকা হইয়াছে, সে গাছটি আমাদের ছবি অপেক্ষা ২৪০ গুণ বড়। তাহার পর, নিম্নে এই গাছের একটী ফুলের ছবি রহিয়াছে। তাহার পাশে একটু ডাঁটাতে একটী পাতা ও দুইটী ফল রহিয়াছে। আবার তাহার পাশে বাদামের আঁটি বা বীজ (যাহার ভিতর শাঁস থাকে) ও তাহার নিম্নে ভিতরকার শাঁসের ছবি রহিয়াছে। প্রকৃত এই সকল দ্রব্য এখানকার এ ছবির চেয়ে ছয় গুণ বড়। পরপৃষ্ঠায় আবার আর একটী ছবি দিলাম। ইহা দালচিনি গাছের ছবি। তাহার ফুল, পাতা ও ফলও দেখাইলাম।

দালচিনির তৈলের শত ভাগে ৮২ ভাগ কার্ব্বন, ৬ ভাগ হাইড্রোজেন ও ১২ ভাগ অক্সিজেন থাকে। তিক্ত-বাদামের তৈলে কার্ব্বন ৭১ ভাগ, হাইড্রোজেন ১৪ ও অক্সিজেন

১৫ ভাগ থাকে। তিক্ত-বাদামের তৈলে এক প্রকার ভয়ানক বিষ থাকে; তাহাকে "প্রসিক" বা "হাইড্রোসিয়ানিক আসিড" বলে। অল্প-দিন হইল ভুলক্রমে এই বিষ খাইয়া এই কলিকাতা নগরে একটী কৃতবিদ্য অল্পবয়স্ক ডাক্তার মারা পড়িয়াছেন। সে নিমিত্ত তিক্ত-বাদামের তৈল হইতে এই বিষ দূর করিয়া তবে লোকে বাজারে বিক্রয় করে।



সুগন্ধ তৈল, তাহা হইলে, কার্ব্বন ও হাইড্রোজেন দিয়া নির্ম্মিত। কতকগুলিতে একটু আধটু আক্সিজেনও থাকে। জগতে এ তিনটী দ্রব্যের অপ্রতুল নাই। বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন রহিয়াছে; জলে হাইড্রোজেন ও গাছে কার্ব্বন যত চাও, তত আছে। তবে এই সব দ্রব্য হইতে একটু কার্ব্বন, একটু হাইড্রোজেন ও একটু অক্সিজেন লইয়া নানাবিধ সুগন্ধ প্রস্তুত করিলেই ত হয়? চাষ করিয়া লক্ষ লক্ষ ফুল লইয়া, চোয়াইয়া, সূক্ষ্ম পালকের আগায় অতি সন্তর্পণে অণু পরিমাণে গোলাপের আতর আহরণ করিবার আর আবশ্যক কি? বড় কঠিন কথা। তবে "মানুষের অসাধ্য কাজ নাই" এই ভাবিয়া মানুষে নিতান্ত হাল ছাড়িয়া দেয় নাই। চেষ্টার ক্রুটি নাই। আমাদের ঘি—যাহাতে ঠাকুরদের লুচি ভাজা হয়—তাহাও কার্ব্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দিয়া গঠিত। আবার চরবিও সেই সব পদার্থ দিয়া নির্ম্মিত। সুতরাং চরবি হইতে ঘৃত প্রস্তুত করার চেষ্টাটী নিতান্ত বিফল হয় নাই। সেইরূপ কোনও কোনও প্রকার সুগন্ধযুক্ত দ্রব্যের অনুকরণ করা কার্য্যটীও বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়াছে। এই আল্কাতরা হইতে যে "মেজেণ্টা" প্রভৃতি নানা রং হইতেছে, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহা হইতে আমাদের চিনির চেয়ে ২৫০ গুণ মিষ্ট চিনি হইতেছে। আবার ইহা হইতে গন্ধদ্রব্যও প্রস্তুত হইতেছে। এই আল্কাতরা লইয়া সাহেবেরা যে আরও কত কি করিবেন, তাহাই চিন্তার বিষয়! চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ-নক্ষত্র না গড়িয়া বসেন! আজকাল আল্কাতরা হইতে তিক্ত-বাদামের তৈল বাহির হইতেছে। গ্যাসের প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, পাথুরে-কয়লা হইতে গ্যাস প্রস্তুত করিবার সময় গ্যাস-ঘরে আল্কাতরা জমা হইয়া যায়। এই আল্কাতরা চোয়াইলে "ন্যাফথা" বলিয়া একটী তরল-দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। ন্যাফথা অনেকগুলি অপর বস্তুর সমষ্টি, তাহার মধ্যে একটীর নাম বেনজল। বেনজলের সহিত সোরার দ্রাবক বা নাইট্রিক আসিড মিশাইলে দুইটীতে মিলিয়া যে বস্তু হয়, তাহার গন্ধ ও আকার তিক্ত-বাদামের মত। কৃত্রিম তিক্ত-বাদামের তৈল বলিয়া ইহা বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। সাবান সুগন্ধযুক্ত করিবার নিমিত্ত ইহার ব্যবহার অধিক। কৃত্রিম তিক্ত-বাদামের তৈল অন্য উপায়েও হইতে পারে। ঘোড়ার ও গরুর মূত্রে এক প্রকার অম্ল পদার্থ আছে, যাহাকে রাসায়নিক পণ্ডিতেরা "হিপরিক আসিড" বলেন। এই হিপরিক আসিড গোমূত্র হইতে অনায়াসেই পৃথক্ করিতে পারা যায়। ইহার সহিত বালি ও দস্তার ক্লোরাইড মিশাইয়া গরম করিলে প্রথম কার্ব্বনিক অম্ল বাহির হইয়া যায়। তাহার পর ইহা হইতে এক

প্রকার তরল পদার্থ বাহির হইতে থাকে। এই তরল পদার্থের নাম হইয়াছে "বেনজন ট্রিল"। ইহার গন্ধ তিক্ত-বাদামের তৈলের মত।

অনেক প্রকার সুগন্ধ তৈল আছে, যাহা তরল নহে,—কঠিন। এ সমুদয়ে অক্সিজেন বর্ত্তমান থাকে। কর্পূর ইহার একটী দৃষ্টান্ত। অক্সিজেন অধিক পরিমাণে থাকিলে আরও কঠিন হয়। শালগাছের আঠা বা ধুনা তাহার দৃষ্টান্ত। কর্পূর-বৃক্ষের সকল ভাগই সুগন্ধময়। ইহার ডাল কুচি কুচি করিয়া লোকে জলে সিদ্ধ করে, কর্পূর উপরে ভাসিয়া উঠে, তাহার পর জল শীতল হইলে জমিয়া যায়। কর্পূরগাছে গর্ত্ত করিয়া দিলেও তাহাতে তরল তৈল জমা হয়, তাহার পর সেই তৈল জমিয়া শুষ্ক কর্পূর হয়। যাহা হইতে সুগন্ধ তেল বাহির হইয়া থাকে, ঈদৃশ অনেক প্রকার ঘাস আমাদের দেশে আছে, যথা ;—খস্‌খস্, কুষা ইত্যাদি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, উদ্ভিদ্-শরীরের দুই প্রকার পদার্থ হইতে সুগন্ধের উৎপত্তি হইয়া থাকে ;—প্রথম ভোলেটাইল তৈল, দ্বিতীয় বীর্য্য বা ইথার। এতক্ষণ তৈলের কথা বলিতেছিলাম, এক্ষণে ইথারের কথা বলিব। ইথার নানা রূপ আছে ও নানা কাজে লাগে। বিশুদ্ধ সুরা বা স্পিরিট লইয়া তাহার সহিত গন্ধকের দ্রাবক মিশাইয়া চোয়াইলে, সুরার ইথার প্রস্তুত হয়। স্পিরিট, গন্ধকের দ্রাবক ও সোরা এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া চোয়াইলে ডাক্তারখানার নাইট্রিক ইথার প্রস্তুত হয়। লৌহ পাত্রে শুষ্ক কাষ্ঠ চোয়াইলে, জল, আল্কাতরা, সিরকা বা ভিনিগার ও এক প্রকার অপেয় সুরা বাহির হয়। কাঠের স্পিরিট ভাল স্পিরিটের সহিত মিশাইলে "মেথিলেটেড স্পিরিট" হয়। খাবার নিমিত্ত নয়,—নানা কাজের নিমিত্ত, শস্তা দরে ইহা বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। কাঠের স্পিরিটের সহিত গন্ধকের দ্রাবক দিয়া চোয়াইলে কাঠের ইথারের উৎপত্তি হয়। আলু হইতে ব্র্যাণ্ডি প্রস্তুত করিবার সময়, আলুর ইথার বাহির হইয়া পড়ে। নানারূপ সুগন্ধ-যুক্ত ফুল-ফল চোয়াইয়া আমেরিকা ও ফরাসী দেশের লোকেরা অনেক প্রকার ইথার প্রস্তুত করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া পরিত্যক্ত জঞ্জাল প্রভৃতি হইতেও রাসায়নিক-বিদ্যা-প্রভাবে নানারূপ ইথার প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফুল হইতেই হউক আর জঞ্জাল হইতেই হউক, খাঁটি ইথার একা-এক শুঁকিতে ভাল নয়। তিন চারিটী ইথার মিশাইয়া একটী সুগন্ধের সৃষ্টি করিতে হয়। আজকাল কলিকাতার বাজারে মনোহর-সৌরভ পূর্ণ "কাশ্মীর-বোকে" বিক্রীত হইতেছে। ইহা একটী দ্রব্য নয়, তিন চারিটী দ্রব্য মিশ্রিত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। কনসার্টে যেরূপ সকল বাজনা গুলির শব্দ একত্রে মিশ্রিত হইয়া সুশ্রাব্য স্বরের উৎপাদন করে, গন্ধদ্রব্য গুলিও সেইরূপ একত্রে মিশ্রিত হইয়া সুমিষ্ট সুঘ্রাণে পরিণত হয়। তাম্বুরা-ওয়ালা যে এ কাণটায় মোচড় দিয়া সে কানটায় মোচড় দিয়া, একঘণ্টা ধরিয়া ঘ্যাং ঘ্যাং করিয়া, লোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত করে, তাহার কারণ এই যে, কোথাও একটু উচ্চ-নীচতা হইলে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হয়। ব্যবসাদার-গন্ধীকেও সেইরূপ গন্ধের সুর মিলাইতে হয় ; একটু উচ্চ নীচতা হইলেই সব মাটী হইয়া যায়। জগদ্বিখ্যাত গন্ধী 'ইউজেনি রিমেল" আমার একজন ভক্ত ছিলেন। গন্ধ-মিশ্রণ কি করিয়া করিতে হয়, তাঁহাকে আমি শিখাইতে বলিলাম। আমি বলিলাম,—"আমাদের দেশে নানারূপ ফুল আছে ; কি করিয়া সুমিষ্ট সুস্নিগ্ধ গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিতে হয়, আমাকে শিখাইয়া দাও।" তিনি বলিলেন "এ বিষয় কাহাকেও শিখাইবার যো নাই।

তাল-বোধের নিমিত্ত যেরূপ কাণ চাই, গন্ধ-বোধের নিমিত্ত সেইরূপ নাক চাই।” রন্ধনও সেইরূপ। মন্দ-রাঁধুনীকে ভাল-রাঁধুনি করা বড়ই কঠিন কথা। রন্ধনের মশলাতেও তাল আছে; লবণের একটু উচ্চ-নীচতা হইলে স্বাদের বড়ই তারতম্য হইয়া থাকে। কথা এই, সমুদয় জগৎ সামঞ্জস্য ভাবে তালে তালে চলিতেছে। কোথাও একটু বে-সুর হইলেই চারিদিকে বিভ্রাট উপস্থিত হয়। কি একখানি ফারসি পুস্তকে একবার পড়িয়াছিলাম যে, “জগতের একটী প্রাণীর অনিষ্ট করিলে, সমুদয় প্রাণীর অনিষ্ট হয়; যেমন শরীরের এক অঙ্গকে ব্যথিত করিলে সমুদয় অঙ্গ ব্যথিত হয়।”

জান্তব সুগন্ধ অতি চিরস্থায়ী। ইহার মধ্যে মৃগনাভিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এখানে মৃগনাভি মৃগের একখানি ছবি দিলাম।



কস্তূরী-মৃগ হিমালয়, চীন, তিব্বত প্রভৃতি শীত-প্রধান দেশে বাস করে। তুষারাবৃত হিমালয়ের উচ্চপ্রদেশে আমি অনেক ভ্রমণ করিয়াছি; কিন্তু জীবন্ত কস্তূরী-হরিণ দর্শন কখনও আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। একবার কেবল এই জাতীয় হরিণের একটী ছানা দেখিয়াছিলাম। একজন সাহেব তাহা পুষিয়াছিলেন। বেশ পোষ মানিয়াছিল। প্রতিদিন সকাল-বেলা জঙ্গলে চরিতে যাইত, সন্ধ্যা-বেলা বাটী ফিরিয়া আসিত। একদিন ছানাটী মরিয়া গেল। চাকরেরা অনুমান করিল যে, জঙ্গলে কি বিষ গাছ খাইয়াছিল। মৃগনাভি পুরুষ-হরিণের হয়, হরিণীর হয় না। হিমালয়ের উপরি-প্রদেশে এ হরিণ শীকার করা বড় বিপদের কথা। প্রাণটী হাতে করিয়া ইহার অনুসরণ করিতে হয়; কারণ একটু পা খসিলেই একবারে সহস্র সহস্র হাত নীচে গিয়া পড়িতে হয়। টাটকা অবস্থায় মৃগনাভির গন্ধ অতিশয় তীব্র। মৃগটী মারিয়া শীকারীরা মুখ ফিরাইয়া ইহাকে কাটিয়া লয়; তাহা না করিলে ইহার গন্ধে অজ্ঞান হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। পুরাতন হইলেও অনেকে ইহার গন্ধ একেবারেই সহ্য করিতে পারে না। ইতালি-দেশের লোক মৃগনাভির গন্ধ কিছুমাত্র ভাল বাসে না। মৃগনাভির গন্ধ অতি চিরস্থায়ী। রতিমাত্র বাক্সের কোণে পড়িয়া থাকিলে বহু কালাবধি সুগন্ধ বর্ত্তমান থাকে। আটশত বৎসর পূর্ব্বে মধ্য-এশিয়ায় একজন ধনবান্ মুসলমান একটী মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। চুণ-সুরকির সহিত তিনি মৃগনাভি মিশাইয়া দিয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত সেই মস্‌জিদে প্রবেশ করিলেই লোকে মৃগনাভির গন্ধ পায়। কুম্ভীরের মাংসে সামান্যভাবে মৃগনাভির গন্ধ আছে। অনেক গাছেও মৃগনাভির গন্ধ বর্ত্তমান থাকে। আমাদের দেশে কস্তূরী-দানা বলিয়া একটী ছোট গাছ আছে, তাহার বীজে মৃগনাভির গন্ধ। সে নিমিত্ত এই বীজ মাথাঘষার মসলায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমেরিকার উপকূলের দ্বীপ-সমূহ হইতে এই বীজ বিলাতে আমদানি হইয়া থাকে। বিলাতে প্রতি বৎসর প্রায় ত্রিশ হাজার তোলা মৃগনাভি আমদানি হইয়া থাকে। কিন্তু বিশুদ্ধ মৃগনাভি মিলা কঠিন।

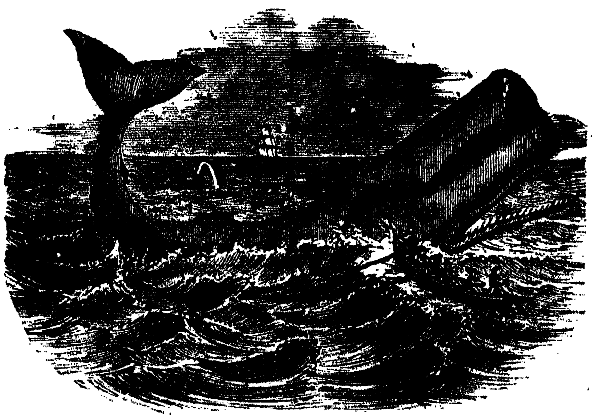
খট্টাশ-বিড়ালের শরীরেও একপ্রকার সুগন্ধ-যুক্ত দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। এই বিড়াল এসিয়া ও আফ্রিকায় বাস করে। ইহার দুই জাতি আছে। প্রাণি-তত্ত্বে ইহাদিগকে ভিভেরা বলে

(Viverra zibetha ও V. civetta) আমরা এখানে এই বিড়ালের একখানি ছবি দিলাম।



লোহিত-সমুদ্রের ধারে এই বিড়াল লোকে পুষিয়া রাখে। এখানকার কৃষ্ণকায়, কাফ্রি-অঙ্গনাগণের গাত্র হইতে ঘামের সহিত এক প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হয়; খট্টাশের সুগন্ধ মাখিলে তাহা ঢাকিয়া যায়।

"আমবার গ্রীস" বলিয়া একপ্রকার জান্তব সুগন্ধযুক্ত পদার্থ আছে। ইহার বাঙ্গালা নাম আছে কিনা বলিতে পারি না। এক প্রকার পীড়া হইয়া তিমি-মৎস্যের উদরে ইহার উৎপত্তি হয়। এখানে তিমি-মৎস্যের একখানি ছবি দিলাম।



এই পদার্থ সমুদ্রের জলে কখনও কখনও ভাসিতে থাকে; নাবিকেরা দেখিতে পাইয়া কুড়াইয়া লয়। ইহার গন্ধ অনেকাংশে মৃগনাভির মত।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

ন্যায়দর্শন।

(১২)

আত্মতত্ত্ব।

ফাল্গুন মাসের পর ন্যায়দর্শনে এই 'শ্রী' বাঁদিলাম। ফাল্গুন মাসের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া এই প্রবন্ধটী পড়িবেন।

ফাল্গুনের প্রবন্ধ ছিল—'আত্মা' সম্বন্ধে। বলিয়াছি, ন্যায়মতে আত্মা দ্বিবিধ—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। জীবাত্মা অসংখ্য, পরমাত্মা এক। এই পরমাত্মাই পরমেশ্বর। অনেক দর্শনেরই এই আত্মতত্ত্ব লইয়া মতভেদ। এই প্রসঙ্গে স্ব স্ব মতের পোষক কত গ্রন্থ নির্ম্মিত হইয়াছে, বিলুপ্ত হইয়াছে, হইতেছে এবং বর্ত্তমান আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না; সুতরাং যুক্তি যাহা আছে, তাহা লইয়া বিচার করিতে যাওয়া এ ক্ষেত্রে বিড়ম্বনা মাত্র। তবে ভগবান্ গৌতম, ন্যায়দর্শনে যেরূপ আত্ম-তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই যে সামঞ্জস্য-পূর্ণ এবং নানাশাস্ত্র-বিবাদে মধ্যস্থস্বরূপ, সেই তত্ত্বটুকু দেখাইবার জন্যই বর্ত্তমান যত্ন।

কি উপায়ে সংসার হইতে নিষ্কৃতি লাভ

করা যায়, জরা-মরণ-রোগ-শোকাদি-সম্ভূত দুঃখরাশির হস্ত হইতে কি উপায়ে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহার নির্দ্ধারণই দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। তাহার অনুপযোগী কোন প্রসঙ্গই 'দর্শনে' নাই। শুধু দর্শন কেন, হিন্দুশাস্ত্র মাত্রই মোক্ষোপায়-নির্দ্দেশক।

এই উপায় চতুর্ব্বিধ,—শাস্ত্রভেদে উপায়-ভেদ নির্দ্দেশ আছে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি এবং কর্ম্ম ও জ্ঞান।

ভগবান্, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।" ২০

গীতা, ৩য় অঃ।

—"জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ কর্ম্ম দ্বারা নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন।"

"তানি সর্ব্বানি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।"৬১

"এবা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥" ৭২

গীতা, ২য় অধ্যায়।

—"সর্ব্ব ইন্দ্রিয় সংযমন পূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবে।" ৬১

('মৎপরায়ণ হইয়া' অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "ব্রহ্মের সহিত আপনার অভেদ জানিয়া"; ব্রহ্মের সহিত আপনার অভেদ-জ্ঞানই তাঁহার মতে তত্ত্বজ্ঞান কিনা।)

—"এই যে ব্রহ্মভাব, ইহা পাইলে আর মোহগ্রস্ত হইতে হয় না। অন্তকালে ইহা লাভ করিলেও মুক্তিলাভ হয়।" ৭২

ভক্তি যে মুক্তির উপযোগী, এ কথা গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে কীর্ত্তিত আছে। এমন কি, জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিকে প্রকারান্তরে শ্রেষ্ঠই বলা হইয়াছে।

আর পূর্ব্বতন ব্যাখ্যাতৃগণ, গীতা হইতেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—জ্ঞান ও কর্ম্ম মিলিত হইয়াই মুক্তির উপযোগী।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান্ অর্জ্জুনকে কর্ম্ম করিতেও উপদেশ দিয়াছেন, জ্ঞানী হইতেও শিক্ষা দিয়াছেন। শুধু দ্বিতীয়াধ্যায়ে কেন, গীতার অনেক স্থলেই দুই ভাবেরই আভাস তাঁহারা দেখাইয়াছেন। উপনিষদের কতিপয় মন্ত্র এবং—

"উভাভ্যামপি পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাংগতিঃ
তথৈব জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্ম শাশ্বতম্।"

(পক্ষীরা যেমন উভয় পক্ষের সাহায্যে আকাশে গমন করে, সেইরূপ, জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়ের সাহায্যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি—মুক্তিলাভ হয়।)

মহর্ষি হারীত প্রভৃতির ইত্যাদি বচন, এই পক্ষের অনুকূলে উদ্ধৃত হইয়াছে। বোধায়ন প্রভৃতি প্রাচীনতম পণ্ডিতগণ এই প্রকারে জ্ঞান-কর্ম্মের সমুচ্চয় পক্ষ সমর্থন করেন।

যাঁহারা যে মতের পোষক, তাঁহারা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ—সর্ব্বশাস্ত্র হইতেই সেই মতের, সমর্থক প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

আবার এক পক্ষ অপর কর্ত্তৃক দূষিত হইয়াছে, তৎপক্ষ অপরের নিকট দাঁড়াইতে পারে নাই। এইরূপে সকলেই দূষিত এবং সকলেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, অথবা বুদ্ধি-বিশেষের গুণে হইতে পারেন।

ন্যায়-দর্শনেরও একটী নিজ পক্ষ আছে বটে, কিন্তু তাহা মধ্যস্থ পক্ষ। ভগবান্ গৌতমের প্রকৃত অভিপ্রায়—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥"

গীতা।

—"যে, যে রূপেই আমার প্রপন্ন হউক আমি তাহাকে সেইরূপেই অনুগৃহীত করি

হে পার্থি! মনুষ্যমাত্রেই সর্ব্বপ্রকারেই আমার পন্থা অনুবর্ত্তন করে।"

এবং

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে.পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈবিত্র্যাদৃজু-কুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।"

মহিম্নঃ স্তব।

—'বেদ, সাংখ্য, যোগ, শৈব শাস্ত্র, বৈষ্ণব মত—এইরূপ নানা প্রস্থান বটে, কিন্তু রুচি-ভেদে সরল কুটিল, যে, যে পথেই যাউক না কেন, জল যেমন সমুদ্রে যাইবেই, মানুষ তেমনই একমাত্র তোমাতেই পৌঁছিবে।"

অন্যান্য দর্শন স্বপক্ষ এত টানিয়া ধরিয়াছেন যে, অন্য পক্ষের সঙ্গে তাঁহার মিলিত হইবার ত কোন উপায়ই নাই, প্রত্যুত প্রভূত বিরোধ। ন্যায়দর্শন এ সম্বন্ধে অনেকটা উদার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—মধ্যস্থ। মধ্যস্থ আত্ম-বিবেচনায় সকল পক্ষ দেখিয়া একটা মীমাংসা করেন, ন্যায়-দর্শনও তাহাই করিয়াছেন। সে মীমাংসা বিবাদ-প্রবৃত্তগণের ভাল লাগিতে না পারে, উদাসীন বিচারক কিন্তু তাহা দেখিয়া প্রীত না হইয়া থাকিতে পারেন না।

বিবাদ প্রবল। এক পক্ষ অন্য পক্ষদিগকে বলিতেছেন,—"সাবধান! এ আমার স্থান, পদ-ক্ষেপ করিবে ত অপমানিত হইবে।" মধ্যস্থ স্থির করিয়া দিলেন,—"এই পন্থাটী সাধারণ; এখানে সকলেই পদক্ষেপ করিতে পারিবেন।"

প্রকৃত ক্ষেত্রে সেই পন্থা হইল,—'আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন' এইরূপ সাক্ষাৎকার।

যাহা আত্মা নয়, তাহাকে যে আত্মা বলিয়া ধারণা করা, তাহাই সকল দুঃখের নিদান।

কর্ম্ম কর ক্ষতি নাই, কর্ম্ম হইতেও মুক্তি হইতে পারিবে; কিন্তু যাহা আত্মা নয়, তাহাকে আত্মা বলিয়া ধারণা করিয়া কর্ম্ম করিলে, মুক্তি হইবে না; তবে কর্ম্ম করিতে করিতে যদি সে ধারণা গিয়া, আত্মা স্বতন্ত্র পদার্থ, এইরূপ সাক্ষাৎকার হয় ত মুক্তি হইবে। কথা হইতেছে এই যে, কর্ম্ম মুক্তির উপযোগী বটে, কিন্তু সকল কর্ম্ম নহে; যাহা নিষ্কাম কর্ম্ম, তাহাই মুক্তির উপযোগী। অন্ততঃ শাস্ত্রের উপদেশ এবং অনু-মান দ্বারা যাহারা আত্মাকে দেহাদি ব্যতিরিক্ত বলিয়া না বুঝিয়াছে, নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্তি তাহাদের হইতে পারে না। আহার, পরিচ্ছদ, ধন-রত্ন, বিলাস-উপকরণ এবং পুত্রাদি—এ সকল কামনা, যতদিন আত্মাকে দেহাদি ব্যতি-রিক্ত বলিয়া বুঝা না যায়, ততদিন যায় না। আত্মা নিত্য, সুখ অনিত্য এই অবধারণ যত দিন না হয়, কর্ম্ম ততদিন নিষ্কাম হয় না। সুতরাং—কর্ম্ম অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্ম মুক্তির উপ-যোগী—এই মত যাঁহাদের, গৌতম-প্রদর্শিত আত্মতত্ত্ব-বিজ্ঞান তাঁহাদের দূর-পরিহার্য্য পন্থা নহে, প্রত্যুত সুখ-সেব্য।

কর্ম্ম—যাগ-যজ্ঞাদি, বিষ্ণু-রুদ্রাদিরূপী পর-মেশ্বরেরই আরাধনা। জীবের অদৃষ্ট বশতঃ পরমেশ্বর অর্থাৎ পরমাত্মার তাদৃশ রূপ গ্রহণ হইয়া থাকে।

জীবাত্মার অনেকত্ব এবং কর্তৃত্বাদি জ্ঞান কর্ম্মের উপযোগী। "আমার যত্ন নাই, আমি এক" এই প্রকার জ্ঞান হইলে, কর্ম্ম করাই ঘটে না। সুতরাং পরমাত্মা এবং অসংখ্য জীবাত্মা যাঁহার উপদিষ্ট, সেই মহর্ষি গৌতম কর্ম্মবাদীর প্রতিকূল নহেন।

জ্ঞানবাদীর পক্ষেও দেখ,—ন্যায়াচার্য্য উদয়ন প্রভৃতির মতে, দেহাদি-ভিন্নত্বরূপে জীবাত্ম-সাক্ষাৎকার এবং যোগবলে পরমাত্ম-সাক্ষাৎ-কার হইলে মুক্তি হয়। এই মতে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়ই মোক্ষের উপযোগী।

বেদান্তীর মতে, জীব-ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞানই মুক্তির উপযোগী; মধ্যস্থ ন্যায়-শাস্ত্র বলিলেন,—

"হাঁ। মুক্তির উপযোগী বটে, তবে সাক্ষাৎকারণ নহে; উক্ত অভেদ-জ্ঞানরূপ যোগের অভ্যাস দ্বারাই পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হয়।"

দেহাদি-ভিন্নত্বরূপে যে জীবাত্ম-সাক্ষাৎকার, তাহা বাসনা-নিবৃত্তির হেতু; তাহার সঙ্গে জীব-ব্রহ্মের অভেদ-চিন্তনের কোন বিরোধ নাই, প্রত্যুত আনুকূল্যই আছে। তারপর পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার; তাহাই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ। জীবব্রহ্মের অভেদ-চিন্তার ফল—পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার; নিষ্কাম কর্ম্ম ও উৎকট ভক্তির ফলও পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার। অথচ দেহাদি-ভিন্নত্বরূপে জীবাত্ম-সাক্ষাৎকারের সঙ্গে কর্ম্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির মাখামাখি সম্বন্ধ। 'জ্ঞান ও কর্ম্ম একত্র মিলিত হইয়াই মুক্তির উপযোগী' যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের পক্ষে ঐ জ্ঞান—দেহাদি-ভিন্নত্বরূপে জীবাত্ম সাক্ষাৎকার, ইহাই ধরিয়া লইতে হইবে। *

এ সকল মতের লাঘব গৌরব বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার উদ্দেশ্য,—ন্যায়-মত কেমন সামাঞ্জস্য-পূর্ণ, তাহাই দেখান।

রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি, পরমাত্ম-সাক্ষাৎ-কারকে মুক্তির কারণ বলেন না। তাঁহারা বলেন,—মহর্ষি গৌতমের অভিপ্রায়, দেহাদি ভিন্নত্বরূপে জীবাত্ম-সাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণ। জীব-ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞানাভ্যাসও এই প্রকার জীবাত্ম-সাক্ষাৎকারের কারণ। তা যাহা হউক, এ পক্ষেও সামঞ্জস্যের ব্যাঘাত নাই;—দেহাদি-ভিন্নত্বরূপে জীবাত্ম-সাক্ষাৎকারই সামঞ্জস্যের সূত্র কিনা।

ভক্তিবাদীর পক্ষেও দেখ, সেব্য-সেবক-ভাব-জ্ঞান ব্যতীত ভক্তি হয় না। জীবাত্মা এবং পরমাত্মায় পার্থক্য এই ভক্তিভাবের মূলে বর্ত্তমান। সেবকের অনেকত্বও এই ভক্তি-রসোদ্রেকে যৎকিঞ্চিৎ উপযোগী। আর, দেহাদ্যভিমান-সত্ত্বে পার্থিব-বিষয়-সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ ঘটে না, পার্থিব-বিষয়-সম্বন্ধ বিচ্ছেদ না ঘটিলেও উৎকট ভক্তি হয় না; অতএব আত্মাকে দেহাদি-ব্যতিরিক্তরূপে সাক্ষাৎকার করাই ভক্তিরও মূল। ভক্তির ফলে পরমাত্মার অর্থাৎ উপাস্যের সাক্ষাৎকার হয়।

জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় পক্ষও অসম্ভব নহে। মহর্ষি গৌতম দেহাদি-ভিন্নত্বরূপে আত্ম-সাক্ষাৎকারকেই তত্ত্বজ্ঞান বা জ্ঞান বলিয়াছেন; তাদৃশ জ্ঞানের সহিত নিষ্কাম কর্ম্মের সমকালীনত্বে বিরোধ নাই।

অতএব যে উপায়ই অবলম্বন কর, যাহাই তোমার মনোমত হউক, অসংখ্য জীবাত্মা এবং এক পরমাত্মা—'জীবাত্মা দেহাদি ব্যতি-রিক্ত' এই গৌতম প্রদর্শিত তত্ত্ব সকল পক্ষেরই সঙ্গম স্থল। এই তত্ত্বে পৌঁছিতে কেহ বাধা দিবে না, কেহ ক্ষুণ্ন হইবে না। 'আত্মা এক,—যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই জীব'—এ সব বেদান্তের অদ্বৈত তত্ত্ব কর্ম্মেরও অনুকূল নহে, ভক্তিরও অনুকূল নহে; তবে জ্ঞানের পক্ষে উচ্চ তত্ত্ব বটে।

আর যাঁহারা পরমাত্মা মানেন না, কর্ম্মের পক্ষে এবং ভক্তির পক্ষে তাঁহারাও প্রকৃত অনুকূল নহেন। মধ্যস্থ ন্যায়মত কোন উপায়-কেই বঞ্চিত করেন নাই। শ্রুতি-স্মৃতির সঙ্গে, ভগবদ্ভক্তির সঙ্গে ন্যায়ের আত্মতত্ত্ব সবিশেষ সম্বদ্ধ।

পরমাত্মা সম্বন্ধেও ন্যায়ের মত এইরূপ উদার। ভগবান্ গৌতমের পদানুবর্ত্তী আচার্য্য উদয়ন এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, এ স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি;—

"শুদ্ধবুদ্ধস্বভাব ইত্যৌপনিষদাঃ, আদি-বিদ্বান্ সিদ্ধ ইতি কাপিলাঃ, ক্লেশকর্ম্মবিপাকা

* ভক্তি ও জ্ঞান-কর্ম্মের সমুচ্চয় পক্ষের কথা একটু পরিষ্কার করিয়া পরে বলিতেছি।

শর্ব্বৈরপরামৃষ্টো নির্ম্মাণকায়মধিষ্ঠায় সম্প্রদায়-দ্যোতকোঽনুগ্রাহকশ্চেতি পাতঞ্জলাঃ, লোক-বেদবিরুদ্ধৈরপি নির্লেপঃ স্বতন্ত্রশ্চেতি মহাপাশুপতাঃ, শিব ইতি শৈবাঃ, পুরুষোত্তম ইতি বৈষ্ণবাঃ, পিতামহ ইতি পৌরাণিকাঃ, যজ্ঞপুরুষ ইতি যাজ্ঞিকাঃ, সর্ব্বজ্ঞ ইতি সৌগতাঃ, নিরাবরণ ইতি দিগম্বরাঃ, উপাস্যত্বেন দেশিত ইতি মীমাংসকাঃ, লোকব্যবহারসিদ্ধ ইতি চার্ব্বাকাঃ, যাবদুক্তোপপন্ন ইতি নৈয়ায়িকাঃ।”

—(বেদান্তী—ব্রহ্ম, সাংখ্য—আদি-বিদ্বান্ সিদ্ধ, পাতঞ্জল—ক্লেশকর্ম্মাদ্য স্পৃষ্ট পুরুষবিশেষ, মহাপাশুপত—লোকবিরুদ্ধ ও বেদবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াও নির্লেপ ও স্বাধীন, শৈব—শিব, বৈষ্ণব—বিষ্ণু, পৌরাণিক—পিতামহ, যাজ্ঞিক—যজ্ঞ-পুরুষ, বৌদ্ধ—বুদ্ধদেব, দিগম্বর—অবিদ্যাদি আবরণ-শূন্য, মীমাংসক—মন্ত্র, চার্ব্বাক—রাজা, আর নৈয়ায়িক—যাহা উচিত হয়, তৎস্বরূপ বলিয়া থাকেন।)

অর্থাৎ য যাহা ভাবে, তার কাছে তিনি তাহাই।

এ প্রসঙ্গেও ন্যায়মতের মধ্যস্থতা সুব্যক্ত।

আজকাল না বুঝিয়া বঙ্গদেশেও দু দশজন ন্যায়মত দ্বেষী হইতেছেন। অনুরোধ করি, তাঁহারা ন্যায়-মতের গূঢ়-রহস্য অবগত হইয়া যেন দ্বেষ বা যাহা হয় পোষণ করেন।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

পরিত্যক্ত গেহ।

(১)

নীরব নির্জ্জন বিস্তৃত প্রান্তর
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপা এখানে সেখানে;
নিম্নদেশে তার "কাজুলিয়া" নামে
ক্ষুদ্রনদী এক বহে নিরন্তর।

(২)

সেই নদী-তীরে অনেক কালের
অতি জীর্ণ এক পরিত্যক্ত গেহ,
দাঁড়ায়ে নীরবে—যথা মৃতদেহ—
ল'য়ে লুপ্ত স্মৃতি-ছায়া অতীতের!

(৩)

নাই পূর্ব্বকার সে শ্রী, সে শোভন,
শ্রুতি-মধুকর জন-কোলাহল;
অনন্ত স্তব্ধতা, আঁধার কেবল
বাহিরে ভিতরে বিরাজে এখন!

(৪)

কাল স্রোত সবে নিয়াছে মুছিয়া,
অনিত্য-সংসার করিতে প্রমাণ!
জাগা'তে নরের মোহ-মুগ্ধ প্রাণ
যেন এই গেহ আছে দাঁড়াইয়া।

(৫)

কিছুকাল পরে মাটীর এ গেহ
হবে পুনরায় মাটী-পরিণত।
শেষ স্মৃতিটুকু, তা'ও হবে গত,
কোথায় কি ছিল জানিবে না কেহ;

(৬)

এরূপ মানব-প্রাণ হ'লে গত
প'ড়ে রহে শোভা-শূন্য দেহ-গেহ।
দিন দুই তার থাকে স্মৃতি-স্নেহ,
তাও অবশেষে হরে কাল-স্রোত।

(৭)

এ মর-জগতে অমর সে নাম,
সফল জনম, জীবন তাহার,
রাখিয়ে অক্ষয়-কীর্ত্তি আপনার
ল'য়ে আশীর্ব্বাদ যায় নিত্যধাম।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

জন্মভূমি।

৪র্থ ভাগ। } আশ্বিন। ১৩০১। { ১০ম সংখ্যা।

দুই বন্ধু।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রভাতে উঠিয়া অরুণ মাসীর বাড়ী যাইতেছিলেন; কিন্তু মিহির যাইতে দিলেন না। সমস্ত দিন মিহির অরুণের সঙ্গে সঙ্গে রহিলেন।

আজ মিহিরের সম্বন্ধের দিন; ক'নের ঘরে বহুবিধ দ্রব্য-সামগ্রী যাইতেছে দেখিয়া মিহির মনে মনে হাসিতে লাগিলেন। রাত্রি আটটার সময় সকলে সম্বন্ধ করিতে গেলেন।

অরুণকে বিমর্ষ দেখিয়া, মিহির আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই নদীতট হইতে বাটীতে আসিয়াছিলেন। দুইজনেই সদর-বাটীতে একবার বেড়াইলেন; তার পর বাটীর ভিতরে আসিয়া বসিলেন। অরুণ আসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িল; মিহির অরুণের নিদ্রা দেখিয়া একটু হাসিয়া একখানি পুস্তক লইয়া পড়িতে বসিলেন।

রাত্রি একপ্রহরের সময় সহসা সদর-বাটী হইতে কে মিহিরকে ডাকিল। মিহির বাহিরে আসিয়া দেখিলেন,—উমাকান্ত রায় উপস্থিত; তিনি একা আসিয়াছেন। মিহির যত্নের সহিত তাঁহাকে বসিতে আসন দিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিলেন। রায় মহাশয় ব্যস্ত হইয়া কহিলেন,—"বাবা মিহির! আমার তো ভারি বিপদ!"

মিহির। কি হইয়াছে মহাশয়?

উমা। বিবাহের কথা সবই তো শুনেছ; আমি অপারগ হয়েও তোমার বাপের কথামত হাজার টাকাতেই রাজি হয়েছি। আজ আবার সম্বন্ধ কর্ত্তে যেয়ে তোমার বাবা কোট্ ধ'রে ব'সেছেন,—"দেড় হাজার টাকা চাই।" আবার হয় তো,—হয় তো কেন বাবা! নিশ্চয়ই বিবাহের রাত্রে বল্‌বেন,—"দু হাজার বা চার হাজার টাকা চাই।" এখনও পার আছে; বিবাহের রাত্রে আর কোনও উপায় থাক্‌বে না! আমার আগে থাকৃতে সাবধান হওয়াই ভাল; তাই তোমার কাছে এলাম। তুমি বড় বুদ্ধিমান্ ছেলে;—আমাকে সদ্‌যুক্তি দাও।

মিহির সবিনয়ে কহিলেন,—"আমি আপনাকে কি সদ্‌যুক্তি দিব! এ সময়ে কি করা উচিত, আপনিই আমাকে আজ্ঞা করুন। যদি তাহা আমার সাধ্য হয়, অবশ্য তাহা করিব।"

উমা। এখন আর কোন যুক্তি নাই বাবা! আমি দূরদেশে আমার কিরণের বিবাহ দিব না, নিকটে তোমা বৈ আর কে পা[illegible]

আছে? আমার ইচ্ছা, আজই তোমার সহিত আমি কিরণের বিবাহ দেই;—অবশ্য তোমার যদি মত থাকে, তবেই হইবে! আজ বিবাহের একটী উত্তম দিন। আজকার সুবিধা যদি ছেড়ে দেই, কিরণ আমার অতল জলে ভাস্‌বে! বৃদ্ধের নয়নতারা চির-অস্ত যাবে! অন্ধের যষ্টি ভেঙ্গে পড়্‌বে! কিরণ আমার অপরিচিতের দেশে যেয়ে হা-হুতাশে মারা যাবে! তাই বলি বাবা! আমার কথা রাখ, আমি যা, বলি, শোন।

বৃদ্ধের চক্ষু জল-ভারাক্রান্ত। মিহির সে অশ্রু দেখিয়া হৃদয়ে কষ্ট পাইলেন। মিহির করযোড়ে কহিলেন,—"মহাশয়! আমি তো আমার পিতার আজ্ঞাধীন!"

বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"তবে কি আমার সোণার কিরণ অতল-জলে ডুবে মর্‌বে? মিহির! বড় আশা ক'রে তোমার কাছে এসেছিলাম।"

বৃদ্ধ গভীর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিলেন।

মিহির ধীরে ধীরে কহিলেন,—"আপনি স্থির হউন, আপনার আশা সফল হবে। আপনার কিরণের কোন বিপদ্ হবে না। আপনি আপনার কিরণকে যথাযোগ্য পাত্রে সমর্পণ করুন।

বৃদ্ধ কহিলেন,—"তোমা ব্যতীত আর কে পাত্র আছে বাবা?"

মিহির। কেন, অরুণ?

বৃদ্ধ। কোন্ অরুণ?

মিহির। আপনি কি জানেন না,—আমাদের অরুণ?

বৃদ্ধ। যোগ্যপাত্র বটে, কিন্তু—

মিহির। কিন্তু কি মহাশয়?

বৃদ্ধ। কিন্তু যদি তোমার আপত্তি থাকে?

মিহির। আপত্তি থাকিলে, আমি কথা উত্থাপন করিব কেন?

বৃদ্ধ। তাই আমি ভাব্‌ছি।

মিহির। কিছু ভাব্‌বেন না।

বৃদ্ধ। আমি ভাব্‌ছি, এই নিয়ে যদি তোমাদের মনান্তর ঘটে?

মিহির। এইজন্য মনান্তর ঘট্‌বে? স্বপ্নেও ভাব্‌বেন না যে, আমাদের মনান্তর ঘট্‌বে! মর্‌লেও ঘট্‌বে কিনা, জানি না!

বৃদ্ধ। সত্য বল্‌ছ?

মিহির। আপনি বৃদ্ধ, আমার পিতৃতুল্য; আমি ঈশ্বর সাক্ষী ক'রে বল্‌ছি, আমার কোন আপত্তি নাই; আমা হ'তে কোন আশঙ্কা নাই। আমাদের বন্ধুত্ব ঘুচিবার আশঙ্কা নাই; অরুণের সহিত কিরণের বিবাহ হ'লে আমি অন্তরে সুখী হ'ব।

বৃদ্ধ। বৎস! অরুণ তোমার এমন কে, যে, তার জন্য এত কর্‌ছ?

মিহির। অরুণ আমার কে, তা' আমি জানি না। আমি জানি, অরুণকে আমি বড় ভালবাসি; আমি জানি, অরুণ আমার প্রাণাধিক,—অরুণ যা'তে সুখী হয়, আমার তাই করা উচিত। আমি জানি অরুণ এ বিবাহে সুখী হবে, তাই আমি এ কথা তুলেছি। আজ বাবা, আপনাকে অধিক টাকা না চাহিলেও, আজকার সম্বন্ধ হ'য়ে গেলেও, আপনি আজ না আস্‌লেও আমি কিরণের সঙ্গে অরুণের বিবাহ দেওয়াতাম। অরুণ অন্তরে অন্তরে কিরণকে ভাল বেসেছে, আমি তা'র বহু নিদর্শন পেয়েছি। যেদিন পেয়েছি, সেই দিনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি,—"আমি কিরণকে বিবাহ কর্‌ব না।

বৃদ্ধ উমাকান্ত দেখিলেন, মিহিরের মুখ দিয়া, চক্ষু দিয়া যেন স্নেহ ও ভালবাসা উথলিয়া পড়িতেছে! তিনি ভীত, চকিত এবং স্তম্ভিত হইয়া, নিতান্ত বিমুগ্ধের ন্যায়, মিহিরের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন।

মিহির, বৃদ্ধ উমাকান্তকে বলিলেন,—"তবে আপনি শীঘ্র যান, সব উদ্যোগ করুন গে; আমি বর নিয়ে যাচ্ছি।"

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে উঠিলেন; তখন মিহির তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া কহিলেন,—"আমার সব বাচালতা ক্ষমা করবেন। আমার নিবেদন,—আমার এ সব কথা কস্মিন্ কালে কাহাকেও বল্‌বেন না;—প্রতিজ্ঞা করুন।"

ধন্য মিহির!

বৃদ্ধের প্রেমাশ্রু বিগলিত হইল। তিনি দ্রুত পদে সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মিহির বাটীর ভিতরে আসিতে আসিতে ভাবিলেন,—"বিধি আপনা হ'তেই সুবিধা দিয়েছেন; অরুণকে সুখী করবার এ-ই যথার্থ অবসর।"

মিহির অরুণের ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাঁহাকে তুলিলেন; তুলিয়া কহিলেন,—"বেড়া'তে যাই চল।"

অরুণ। এমন সময়ে বেড়া'তে যাওয়া?

মিহির। এই তো যথার্থ সময়! এমন পরিষ্কার রজনী! আকাশে চন্দ্রদেব হাসিতেছেন; পৃথিবী পুলকে প্রফুল্লময়ী; অসংখ্য কুসুম প্রস্ফুটিত;—মৃদুমন্দ সমীরণ বহিতেছে;—এমন সময়ে বেড়াবে না?

অরুণ। চল, তবে কবিবর! আর তোমার বর্ণনার কিছুই নাই?

মিহির। ঢের আছে! কিন্তু ভাবে এখন আমার হৃদয় বিভোর, সুতরাং কবি নীরব!

দুইজনে গৃহ হইতে বাহির হইলেন। পথে যাইতে যাইতে কেহ কোন কথাটী কহিলেন না। কিছুক্ষণ পরে দুইজনে একটী আম্রকাননে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। কাননে অসংখ্য আম্রবৃক্ষ, ভিতরে অন্ধকার; কেবল পত্রবিচ্ছেদ-পতিত কিরণ দেখিয়া তাঁহারা যাইতে লাগিলেন। কিছুদূর যাইয়া অরুণ কহিলেন,—"ঐ সামনে উমাকান্ত রায়ের বাড়ী নয়?" মিহির কহিলেন—"হাঁ।"

অরুণ পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন,—"এখানে কেন?" মিহির অরুণের হাত ধরিয়া কহিলেন,—"আজ কিরণের সহিত তোমার বিবাহ!"

অরুণ বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। জিজ্ঞাসিলেন,—"সে কিরূপ!"

মিহির। এর তো আর রূপান্তর নাই ভাই!

অরুণ। কেন এমন হইল?

মিহির। ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

অরুণ। এ যে আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না! এও কি হ'তে পারে? এও কি সম্ভব? যা হ'বার নয়, তাই? আমার অন্তরাত্মা কাঁপ্‌ছে! চল মিহির! ঘরে যাই।

মিহির। অরুণ, কেন আজ এ বিতৃষ্ণা?

অরুণ। আমার তৃষ্ণা ছিল বটে; কিন্তু সে আমার অন্যায় পিপাসা। ঈশ্বর সাক্ষী ক'রে বল্‌ছি,—আমি তখন জানি নাই যে, তোমার সঙ্গে কিরণের বিবাহ হবে। তা হ'লে আমি হৃদয়ে সে আগুন জাল্‌তাম না।

মিহির। তুমিও যেমন জান্‌তে না, আমিও তেমনি জান্‌তাম না; আমার পিতা-মাতা চেষ্টা ক'রেছিলেন। কিন্তু ভাই! ঈশ্বরের ইচ্ছা অন্যরূপ।

অরুণ। এও কি সম্ভব? আমি সত্য বল্‌ছি, আমি যে অবধি শুনেছি, সেই দিন আমি মন স্থির ক'রেছি,—আমার হৃদয় শান্ত হ'য়েছে।

মিহির। অরুণ! ঈশ্বরের ইচ্ছা নিশ্চয়ই অন্যরূপ; নচেৎ পিতা বিবাহরূপ এই ধর্ম্ম্য কার্য্যে প্রবঞ্চনার ফাঁদ পাতবেন কেন? কিরণের সহিত তোমার বিবাহ, ঈশ্বরের অভিপ্রায়! তুমি ভেবে দেখ, তুমি কিরণের রূপে মুগ্ধ, কিরণ ধর্ম্মতঃ তোমার পত্নী।

অরুণ। মিহির, আমি তোমার কোন কথা

বুঝ্‌তে পারছি না। তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার কথা রাখ্‌তে পার্‌লাম না; আমি চল্‌লাম।"

অরুণ দ্রুত-পদে প্রস্থান করেন দেখিয়া মিহির দৃঢ়রূপে তাঁহার হাত ধরিলেন। মিহির পরিষ্কার স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"ভাই অরুণ! জগতে তোমা বৈ আমার প্রিয়বস্তু আর কিছু নাই; তোমার অমঙ্গল ঘট্‌লে আমারও ঘট্‌বে। আমার কথা শোন;—ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিও না, তাহা হ'লে সুখী হবে না। তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়! তোমার শুষ্ক মলিন মুখ দেখ্‌লে আমার বুক ফেটে যায়; তোমার সহাস্য-মুখ দেখ্‌লে আমার বুকে বল হয়। যেদিন থেকে তুমি দুশ্চিন্তায় পীড়িত হ'চ্ছ, সেই দিন হ'তে আমার মনে সুখ নাই। তুমি একা ব'সে ভাব, আমি অন্তরে ব্যথা পাই। তুমি লুকিয়ে কাঁদ, আমি তা' দেখি; পাছে তুমি কষ্ট পাও, আমি আড়াল থেকে কেঁদে আসি! তুমি ঘুমিয়ে পড়, পাছে দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদে ওঠ, আমি তাই জেগে ব'সে থাকি! তোমার মুখে ঘাম হয়, আমি তোমাকে বাতাস করি।—আমি তোমাকে এত ভালবাসি! ভাল বেসে বল্‌তে নাই! কিন্তু আজ ঘটনার সূত্রে প'ড়ে বল্‌তে হ'ল। না বল্‌লে তোমার মন ফিরে পাই না! অরুণ! শোন ভাই! আমি প্রতিজ্ঞা ক'রেছিলাম, কিরণের সহিত কৌশলে তোমার বিবাহ দিব! বিধাতা আজ নিজেই সদয়—সুবিধা আপনিই উপস্থিত! কিরণ তোমার ধর্ম্মপত্নী! তা'র আমি প্রমাণ পেয়েছি, তুমি নিজে বুঝে দেখ! ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর যেয়ো না; কিরণকে বিবাহ ক'রে সুখী হও,—আমি তোমাদিগকে দেখে বড় সুখী হব।"

অরুণের আর বলিবার অবসর রহিল না; বৃদ্ধ উমাকান্ত ব্যস্ত হইয়া আসিয়া বর লইয়া গেলেন। পরদের জোড়ে, মাল্য-চন্দনে, হরিদ্রা-মুকুটে, শঙ্খধ্বনি, হুলুধ্বনি, মন্ত্রোচ্চারণে অরুণ ও কিরণের দুই হাত এক হইল। অরুণ ও কিরণে বাসর-ঘর আলোকিত করিল,—বাসরে আনন্দের তরঙ্গ উঠিল! মিহির নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে আসিয়া স্বীয় কক্ষে শয়ন করিলেন। আজ তাঁহার বুকের বোঝা নামিয়া গেল, তিনি আজ সুখে নিদ্রা গেলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রভাতেই অরুণের মাসীর বাড়ীতে অরুণের বিবাহ-সংবাদ দেওয়া হইল।

বেলা এক প্রহরের মধ্যেই বর-ক'নে আসিয়া উপস্থিত হইল, আনন্দের হুলাহুলী পড়িয়া গেল, চারিদিক্ শঙ্খধ্বনিতে পূর্ণ হইল! কত লোক বর-ক'নে দেখিতে আসিল। সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিল। চারিদিকে যেন আনন্দের স্রোত বহিল!

কিন্তু মুহূর্ত্তে সব নীরব হইল! আনন্দের নিত্যধামে নিরানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল! হর্ষের স্বর্ণপ্রতিমা যেন বিষাদে মলিন হইল! আজ পূর্ণিমার চাঁদ যেন রাহুতে গ্রাস করিল! সহসা মহেশপুর হইতে সংবাদ আসিল,—অরুণের জ্যাঠাই-মার সঙ্কট পীড়া;—বাঁচেন কি না! অরুণের সঙ্গে দেখা হইবে কিনা, সন্দেহ! তখনি অরুণ কাঁদিতে কাঁদিতে মিহিরের সহিত মহেশপুর চলিলেন। তখনও অরুণের কপালে অভিষেকের চন্দন মুছিয়া যায় নাই! তখনও বাসরের ফুল-হার গলায় শুকাইয়া যায় নাই! অহো! কি দুর্দ্দৈব! আজ বিবাহের সজ্জা বুঝি শ্মশানে যাইয়া খুলিতে হয়! যাহাই হউক, অরুণ, মিহিরের সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিলেন! যাহারা

মুখভরা হাসি লইয়া বর-ক'নে দেখিতে আসিয়াছিল, তাহারা বুকভরা বিষাদ লইয়া ঘরে ফিরিয়া চলিল।

সারা-রাস্তাটাই অরুণ কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়াছেন! আহা! আজ যে তাঁহার জননীর-অধিক জ্যাঠাই-মা তাঁহাকে জন্মের-মত ছাড়িয়া যান! তথাপি অরুণ ভাবিতেছেন,—ঈশ্বর এত নির্দ্দয় হইবেন না! তিনি যাইয়া জ্যাঠাই-মাকে অবশ্যই ভাল দেখিবেন। জ্যাঠাই মা যে তাঁহাকে কত ভাল বাসেন! কিন্তু মানুষের আশা কদাচিৎ সফল হয়। মানুষ যাহা চায়, কচিৎ তাহা পায়! মানুষ যা' চাহিত, তা'ই যদি পাইত, তাহা হইলে, অপর লোকের কথা ছাড়িয়া দাও, অরুণ জ্যাঠাই-মাকে দেখিতে পাইল না কেন? জ্যাঠাই-মাও মৃত্যুর কণ্টকময়ী শয্যায় "অরুণ অরুণ" করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন; একবার প্রাণাধিক অরুণের চাঁদমুখ দেখিতে পাইলেন না কেন? "কেন" ইহার উত্তর—অদৃষ্টের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ! ইহা যদি না মান, ইহার উপর আর উত্তর নাই।

অরুণ যাইয়া দেখিলেন, জলন্ত চিতায় জ্যাঠাই-মার দেহ দগ্ধ হইতেছে। তেমন দয়ার শরীর,—স্নেহের, করুণার, মমতার তেমন কোমল হৃদয়,—নিষ্ঠুর অগ্নি-শিখায় পুড়িয়া ছাই হইতেছে! অরুণ উন্মত্তের ন্যায় সেই জলন্ত চিতা পানে দৌড়িলেন। প্রচণ্ড শিখার সম্মুখে একবার স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু কৈ, জ্যাঠাই-মা ত তাঁহাকে একবারও ডাকিলেন না! আজ জ্যাঠাই-মার নয়নের মণি, হৃদয়ের নিধি, যত্নের ধন, স্নেহের বস্তু—অরুণ কত পথ হাঁটিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছে, কৈ, জ্যাঠাই-মা ত তাঁহাকে ভাল মন্দ একটা কথাও জিজ্ঞাসিলেন না! কে জিজ্ঞাসিবে, কে কথা কহিবে? যে জিজ্ঞাসিত, সে অরুণকে কাঁদাইয়া চলিয়া গিয়াছে!

অরুণ "জ্যাঠাই-মা! জ্যাঠাই-মা" ! বলিয়া সেখানে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। মিহির যাইয়া তাঁহাকে কোলে লইয়া বসিলেন। মিহিরের চক্ষু হইতে অবিরল-ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে একমাস কাটিয়া গেল। জ্যাঠাই-মার শ্রাদ্ধশান্তি চুকিয়া গেল। মিহির যেখা হইতে হঠাৎ একদিন একজন লোক আসিল;—মিহিরকে এখনি বাটী যাইতে হইবে; তাঁহার পিতা বিসূচিকা-রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। আবার দুই বন্ধুতে ছুটিলেন। কিন্তু এবারও বৃথা! মিহিরের সঙ্গেও তাঁহার পিতার দেখা হইল না। তিনি বাটীতে যাইয়া দেখিলেন, ধূলায় ধূসরিত হইয়া মা পড়িয়া কাঁদিতেছেন। অন্যান্য সকলেই কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতেছে। চারিদিকে যেন শোকের সিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে! শোকের মর্ম্মভেদী ভীষণ দৃশ্য !!

ঝড় বহিলে গাছের একটী ডাল ভাঙ্গিয়া থাকে না! সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিলে একটী তরঙ্গ উঠিয়া সমুদ্র স্থির হয় না; তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া থাকে! মানব-জীবনেও সেইরূপ একটী বিপদ হইয়া নিরস্ত হয় না। বিপদের পিছনে বিপদের করাল-মূর্ত্তি লুকাইয়া থাকে! একটী দেখা দিলেই আর একটী দেখা দেয়। অরুণ ও মিহির এই বিপদের প্রথম তরঙ্গে পড়িলেন,—তাঁহাদের সম্মুখে এখনও বিপদের সমুদ্র!

দুইটী তৃণ বিপদের স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে চলিল! দুইটীর সমান অদৃষ্ট! বিধাতা বুঝি নিভৃতে বসিয়া দুইটীর অদৃষ্ট-লিপি একইরূপ লিখিয়াছেন।

মিহিরের পিতৃবিয়োগের পর তাঁহার রাশি রাশি ঋণ বাহির হইল। চারিদিক হইতে লোক আসিয়া মিহির ও তাঁহার মাকে ব্যস্ত

রিয়া তুলিল। অসহায়া রমণী উমাকান্তের আশ্রয় লইয়া স্বামীর ঋণ-পরিশোধে যত্নবতী হইলেন। জমি, জায়গা, ভদ্রাসন, গহনাপত্র—সব বিক্রয় করা হইল। উমাকান্ত রায় স্বয়ং এক হাজার টাকা দিলেন। তথাপি একজনের নিকট দুই হাজার টাকা দেনা রহিল। স্বামীর নির্ব্বুদ্ধিতায় অনাথা বিধবা আজ পুত্রটীকে লইয়া গাছতলায় দাঁড়াইল! সহৃদয় উমাকান্ত অতি যত্নের সহিত মিহির ও তাঁহার মাকে নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন। মেদিনীপুরে মিহিরের ১৫৲ টাকা বেতনে একটী চাকুরী করিয়া দিলেন। দুধের ছেলে আজ লেখা-পড়ায় জলাঞ্জলি দিয়া অন্নচেষ্টায় প্রবাসে পড়িয়া রহিল!

অরুণ মহেশপুর গেলেন। যাইয়া দেখিলেন, জ্যাঠা-মহাশয় আবার বিবাহ করিয়াছেন। আজ তাঁহার দয়াময়ী, স্নেহময়ী জ্যাঠাই-মার স্থান কে অধিকার করিল? দেবীর সিংহাসনে আজ কে আসিয়া বসিল? অরুণ নীরবে কাঁদিয়া সারা হইতে লাগিলেন। কেহ আর তাঁহাকে ডাকে না। কেহ আর তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসে না। আজ জ্যাঠাই-মা বিহনে অরুণ সংসার-শূন্য দেখিলেন।

যে জ্যাঠা-মহাশয় ঝগড়া করিয়া অরুণকে লেখাপড়া শিখিতে বিদেশে পাঠাইয়াছিলেন, তিনিই আজ অরুণের লেখাপড়ার ব্যয় দিতে অস্বীকার করিলেন! কালের বিচিত্র গতি! অরুণের অনেক আশায় ছাই পড়িল! জ্যাঠা-মহাশয় তাঁহাকে ভাল-মন্দ কিছুই জিজ্ঞাসা করেন না; কি করেন?—অরুণ কাঁদিতে কাঁদিতে মহিষরেখা ফিরিয়া আসিলেন এবং সেখানে একটী মাষ্টারী করিতে লাগিলেন। ভিতরে ভিতরে এল, এ পরীক্ষার জন্ত প্রস্তত হইলেন। মিহিরও মেদিনীপুরে চাকুরী করিতে করিতে এল, এ পরীক্ষা দিবেন বলিয়া পড়িতে লাগিলেন। যথাসময়ে দুই জনে এল, এ পাশ করিলেন। দুঃখের ভিতর একটু সুখের সঞ্চার হইল। তাঁহাদের নিরাশ-হৃদয়ে যাবেক আশার আলো ফুটিল! কিন্তু সম্মুখেই ঘোর অমাবস্যার গাঢ় মেঘাবৃত রজনী! তাহাতে প্রতিমুহূর্ত্তে নিরাশার কঠিন বজ্র হানিতেছে!

সহসা উমাকান্ত রায় পরলোক-গত হইলেন; দুইজনেরই আশা-তরী সমুদ্রের মাঝখানে আসিয়া ডুবিয়া গেল! পাওনাদার টাকার জন্ত মিহিরকে জেলে দিবেন বলিয়া ভয় দেখাইল। মিহির মেদিনীপুর হইতে আসিয়া পড়িলেন। দুই বন্ধুতে পাওনাদারের হাতে-পায়ে পর্য্যন্ত ধরিলেন; কিন্তু সুদ খাইতে যাহারা অভ্যাস করে, তাহাদের হৃদয় ক্রমে লৌহ অপেক্ষা কঠিন হইয়া উঠে। মিহির ও অরুণের ক্রন্দনে সে কর্ণপাত করিল না। উমাকান্ত মরিবার কালে অরুণের নামে তাঁহার যা কিছু দান-পত্র করিয়া গিয়াছিলেন; অরুণ সেই সব বিক্রয় করিয়া পাওনাদারকে দেড় হাজার টাকা দিলেন! এখনও পাঁচশ টাকা দেনা রহিল।

এবার আরও দুর্দ্দিন দেখা দিল। মিহিরের চাকুরীটী গেল। এখন ভরসা কেবল অরুণের মাহিনা ১০৲ টাকা! কিন্তু দশ টাকায় ত চারিটী লোকের চলে না! কষ্টের অবধি নাই! কেবল সায়াহ্নে একবার হাঁড়ি চড়ে,—দুই বেলার সংস্থান কোথায়? গল্প কথা নয়, সত্যই কয়জনে সন্ধ্যাকালে কেবল চাল ফুটাইয়া উদর পূরণ করিতেন! লবণ ভিন্ন প্রায়ই কোনরূপ ব্যঞ্জন থাকিত না! মাটীর ভাঁড়ে জল, আর কলার পাতে ভাত। দারিদ্র্যের করাল-মূর্ত্তি! অতি ভীষণ সে মূর্ত্তি! ভুক্তভোগী ব্যতীত সে মূর্ত্তি আর কাহারও হৃদয়ঙ্গম হইবে না। যে সদা আলোকে থাকে, অন্ধকারের কষ্ট সে বুঝিবে কিসে? আজ উমাকান্তের বড় সাধের কিরণ ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির! উমাকান্ত দুধ,

ঘি, নবনী খাওয়াইয়া কিরণকে মানুষ করিয়াছেন, আজ সে কিরণ এক মুষ্টি অন্ন পায় না! অরুণ কিরণের পানে চাহিয়া অশ্রু ফেলিতেন। কিন্তু ধন্য সে কিরণ! সে স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া ক্ষুধার জ্বালা সহিয়া থাকিত। অরুণ ও মিহির দিন দিন কৃশ ও দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। মিহিরের মাকে ঠেলিয়া দিলে পড়িয়া যান। এ ঘোর অন্নকষ্ট অরুণ আর সহিতে না পারিয়া একদিন জ্যাঠা-মহাশয়ের কাছে গেলেন। নিজের অবস্থা জানাইলেন; কিন্তু দরিদ্রের কথায় কে কর্ণপাত করে? এ ঘোর কলিকালে সে নিয়ম উঠিয়া গিয়াছে। জ্যাঠা-মহাশয়ের করুণ হৃদয় দানবীর সংস্পর্শে এখন পাষাণ হইয়া গিয়াছে। সুধাভাণ্ড আজ ভুজঙ্গের ফুৎকারে বিষময় হইয়াছে। তিনি অরুণের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অধিক কি, ঘোর গ্রীষ্মকালের ঠিক দ্বিতীয় প্রহরে অরুণকে এক গণ্ডুষ জল খাইতেও বলিলেন না। অরুণ যে মুখে গিয়াছিলেন, সেই-মুখেই ফিরিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে কেবল জ্যাঠাই-মাকে স্মরণ করিয়া দামোদরের তীরে আসিয়া অঞ্জলি পুরিয়া জল খাইয়া ক্ষুৎপিপাসা দূর করিলেন। এ সংসার দুঃখীর কেহ নহে! হায় হায়! দরিদ্রের কথায় কেহ কর্ণপাত করে না।

দুঃখের তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে এইরূপে একটী বৎসর কাটিয়া গেল। তখন ভগবান্ মুখ তুলিয়া চাহিলেন। বিপদে মধুসূদন ভরসা। জগৎ-চিন্তামণি হরি, যিনি অতল সমুদ্র-তলে প্রস্তর খণ্ডের ভিতর পিপীলিকারও নিত্য আহার দেন, তিনি দয়া করিলেন;—অরুণের মাহিনা হইল ১৫৲ টাকা আর মিহির মহিষরেখাতেই একটী ১০৲ টাকা বেতনের কর্ম্ম পাইলেন। সাকল্যে ২৫৲ টাকায় তাঁহাদের দুই বেলা আহার চলিতে লাগিল। এক বৎসর পরে আজ অরুণ ও মিহির অন্নের সহিত ব্যঞ্জন খাইলেন। উভয়ের ওষ্ঠে মৃদু হাস্য-রেখা দেখা দিল, উভয়ের চক্ষেই অশ্রুবারি বহিল; উভয়েই জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

এইরূপে পাঁচটী বৎসর অতিবাহিত হইল। অবস্থার কিছুই হ্রাস বৃদ্ধি দেখা গেল না; বরং পাওনাদার পাঁচ শত টাকার জন্য বড়ই উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। এই সময়ে ইস্কুলের আবশ্যকে অরুণকে কলিকাতা আসিতে হইল। এখানে দশ পনর দিন থাকিয়া বাটী গেলেন; যাইয়া মিহির ও তাঁহার মাকে বলিলেন,—"দেখ, কলিকাতার এক সওদাগর আপীসের বড়-সাহেব আমাকে দেখে বড় পছন্দ করেছে। আসামে তাঁদের চা-বাগান আছে, সেখানে আমাকে যেতে হবে; পঞ্চাশ টাকা বেতন দিবেন। আমাদের ঋণ পরিশোধের জন্য তিনি এখনি পাঁচ শত টাকা দিতে চান; প্রতিমাসে বেতন হ'তে কুড়ি টাকা ক'রে কাটিয়া ঐ পাঁচ শত টাকা শোধ নেবেন। আমি যেতে মনস্থ ক'রেছি; গেলে সকল দিকেই ভাল।"

মিহির ও তাঁহার মা ইহাতে ঘোর আপত্তি করিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—"পেটে না খেয়ে ঋণ-পরিশোধ হোক, তথাপি তোমাকে কোথাও যেতে দিব না।"

কিরণ আড়াল হইতে সব কথা শুনিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইল। লুকাইয়া কাঁদিল, লুকাইয়া চোখ মুছিল; পাছে কেহ জানিতে পারে! তাহা হইলে কিরণ বড় লজ্জায় পড়িবে, কিরণের মাথা-কাটা যাইবে! কিরণ আর মুখ দেখাইতে পারিবে না! কিরণ চোখের জল মুছিয়া শয়ন করিল। প্রাতঃকালে অরুণ দেখিলেন, কিরণের চোখের জলে তাহার বালিশটী ডুবিয়া গিয়াছে। দেখিয়া অরুণও কাঁদিয়া ফেলিলেন। কিরণকে আশ্বস্ত করিয়া তাহার মুখ-চুম্বন করিলেন।

মিহির ও তাঁহার মার কোন কথাই অরুণ

শুনিলেন না। শীঘ্র যাইবার উদ্যোগ করিয়া লইলেন্। একটী ভাল দিন দেখাইলেন,—সন্ধ্যার সময় যাত্রা করিবেন। কক্ষ-মধ্যে অরুণ কিরণের কাছে বিদায় লইতেছেন,—কিরণ স্বামীকে প্রণাম করিতে গেল, সহসা কিরণের চক্ষু হইতে দুইটী মুক্তাফল ঝরিয়া অরুণের চরণযুগল অলঙ্কৃত করিল। অরুণের চক্ষুও জল-ভারাক্রান্ত। অরুণ কিরণের হাত ধরিয়া তুলিয়া সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিলেন এবং বলিলেন,—"কিরণ! আমি শীঘ্র ফিরিব। আমি প্রতিসপ্তাহে পত্র দিব।" কিরণ অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—"নারায়ণ তোমার মন-সাধ পূর্ণ করুন।" বাহিরে আসিয়া অরুণ, মিহিরের মাকে প্রণাম করিলেন; তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে অরুণকে কত আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারপর মিহিরের নিকট বিদায় লইয়া শুভক্ষণে নৌকায় উঠিলেন। যতক্ষণ নৌকাখানি দেখিতে পাওয়া গেল, মিহির তীরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সন্ধ্যার আঁধারের সহিত তাঁহার হৃদয়ও অন্ধকার হইয়া আসিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অরুণ কলিকাতায় আসিয়াই পাঁচ শত টাকা পাইলেন। যেমন পাইলেন, অমনি তাহা মিহিরকে পাঠাইলেন; মিহির সে টাকা দিয়া পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্ত হইলেন।

অরুণ পনর দিনে যাইয়া চা-বাগানে পৌছিলেন। তাঁহার-কার্য্য কলাপ দেখিয়া সাহেবেরা বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন; বাগানের সমস্ত কুলী তাঁহার সদ্ব্যবহারে তাঁহার একান্ত বশীভূত হইল। তিনি প্রতিমাসে মিহিরকে কুড়ি টাকা করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন; এখানে মিহিরও দশ টাকা করিয়া পান; সংসার খরচ পনর ষোল টাকা হইলেই চলিয়া যায়; সেইজন্য মিহির প্রতিবারেই লেখেন যে, কুড়ি টাকা পাঠাইবার কোন আবশ্যক নাই, দশ টাকা পাঠাইলেই যথেষ্ট হইবে। অরুণ কিন্তু সে কথা শোনেন না। কাজেই মিহির মহিমরেখার পোষ্টাপীস সেভিংস্-ব্যাঙ্কে চৌদ্দ পনর টাকা করিয়া প্রতিমাসে জমা রাখিতে লাগিলেন। প্রতিসপ্তাহে অরুণের পত্র আসিত; মিহির তাহা মার হস্ত দিয়া কিরণকে দিতেন।

দেখিতে দেখিতে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন একখানি পত্রে সংবাদ আসিল, অরুণ লিখিতেছেন,—"আমি আগামী কল্য এখান হইতে বাহির হইব। ভরসা করি, বাড়ী গিয়া সকলকে সুখী দেখিতে পাইব।" সকলেরই আহ্লাদ রাখিতে স্থান নাই।

কখনও কখনও যেমন আচম্বিতে বৃষ্টি আসে, তেমনি হঠাৎ মহেশপুর হইতে কিরণকে লইয়া যাইতে একটী লোক আসিল। এ আবার কি অদ্ভুত ব্যাপার! এক জন পরিচারিকা আর এক দরওয়ান উপস্থিত। হরকালী ঘোষ লিখিতেছেন,—"এখানে আমরা সকলেই বড় পীড়িত হইয়াছি; মুখে জল দেয়, এমন একটী লোক নাই। অতএব পত্রপাঠ বধূমাতাকে পাঠাইবে।" তিনি যাহাই করুন, অরুণের জ্যাঠা-মহাশয়! মিহির মার সহিত পরামর্শ করিয়া সেই দিনই কিরণকে মহেশপুর পাঠাইয়া দিলেন। কিরণ আসিতে সকলে যেন প্রাণ পাইল। রান্না-পাট, রোগীর ব্যবস্থা—কিরণ একাই সব কাজ করিতে লাগিল। তা'ছাড়া শাশুড়ীর দুই তিনটী পুত্র-কন্যাকে নাওয়ান, খাওয়ান,—কোন কাজেই কিরণ অবহেলা করে না। কিরণ বড় লক্ষ্মী-মেয়ে! যেমন রূপে, তেমনি গুণে! আজ-কালের সংসারে কিরণের মত একটীও মেয়ে দেখা যায় না।

এদিকে অরুণের আসিবার দিন কাটিয়া

গেল। যে দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই পঁহুছিবার কথা, তাহা হইতেও ৫।৭ দিন কাটিয়া গেল। ইহাতে মিহির ও তাঁহার মা বড়ই ভাবিত হইলেন। মহা শঙ্কিত হইয়া মিহির কলিকাতার আপীসে সংবাদ লইতে আসিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বৈশাখের অপরাহ্ণ। আকাশ পরিষ্কার দেখিয়া দক্ষিণে বাতাসে পাল উঠাইয়া একখানি নৌকা মহিষরেখা পানে যাইতেছে; বেলাবেলি মহিষরেখা পৌঁছিতে হইবে বলিয়া খুব জোরে-জোরে তিনটী দাঁড়ও পড়িতেছে। নৌকার ভিতর একটী অবগুণ্ঠনবতী কামিনী, পার্শ্বে একটী পরিচারিকা; নৌকার ঘরের বাহিরে একজন চাকর।

হঠাৎ পশ্চিমে আকাশে একখানি মেঘ উঠিল,—বাতাস বহিল। দেখিতে দেখিতে মেঘে আকাশমণ্ডল ভরিয়া গেল,—চারিদিক অন্ধকার হইল। নদীর জল কাল হইল, বাতাসে নদীতে ঢেউ দেখা দিল। সন্ধ্যা হইল, তখনও মহিষরেখা এক ক্রোশ বাকি। বাতাস আরও জোরে বহিতে লাগিল,—পর্ব্বতপ্রমাণ তরঙ্গ উঠিল,—নদীর জলে নৌকা ডুবিল; কে যে কোথায় ভাসিয়া গেল, কিছুই ঠিকানা নাই।

ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি আসিল। তীরে বৃক্ষতলে বসিয়া বিদ্যুদালোকে এক যুবা দেখিতে পাইলেন,—তরঙ্গের মধ্যে একটী মনুষ্য-দেহ ভাসিয়া যাইতেছে। আবার বিদ্যুৎ চমকিল, যুবা দেখিতে পাইলেন, মনুষ্য-দেহটী একটী স্ত্রীলোক। যুবা স্বীয় প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া সেই ভয়ঙ্কর তরঙ্গে ঝাঁপ দিলেন; ঝাঁপ দিয়াই দৃঢ়মুষ্টিতে রমণীর আলুলায়িত, শৈবালদলের ন্যায় ভাসমান, দীর্ঘ কুন্তলরাশি ধরিলেন; সবলে রমণীকে পৃষ্ঠে উঠাইয়া ভীম-বলে সেই ভীষণ তরঙ্গরাশি ঠেলিয়া সাঁতার দিয়া তীরে আসিয়া উঠিলেন। তখনও প্রবল বৃষ্টি হইতেছে; যুবা তাহাকে পৃষ্ঠে লইয়া দ্রুতবেগে চলিলেন।

রাত্রি যখন দ্বিপ্রহর, তখন যুবা রমণীকে লইয়া মহিষরেখার একটী বাটীর সম্মুখে আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিলেন; ভিতর হইতে কে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে গা?"

যুবা বলিলেন,—"শীঘ্র দরজা খোল মা! আমি মিহির।"

দ্বার উন্মোচিত হইল। যুবা গৃহমধ্যে রমণীকে শোয়াইলেন। মা প্রদীপ জালিয়া আনিয়া রমণীকে দেখিয়াই শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মিহির বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া দেখিলেন, রমণী কিরণ। মিহিরের হৃৎকম্প হইল।

মিহির দেখিলেন, কিরণের শ্বাস নাই। মিহিরের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল! তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রু বহিতে লাগিল। অরুণ বাটী আসিলে তাঁহাকে কি বলিবেন? কি বলিয়া তাঁহাকে শান্ত করিবেন? অরুণ যে তাঁহারই জন্য অকূলে ঝাঁপ দিয়াছেন! তাঁহাদেরই জন্য প্রাণের অধিক কিরণকে তাঁহাদের কাছে রাখিয়া অকূলে ভাসিয়াছেন!

মা ও ছেলে কিরণের পানে চাহিয়া চাহিয়া কত অশ্রু মোচন করিলেন!

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে কিরণের শ্বাস বহিল; সে অতি মৃদু। যাহাই হউক, এখনও যে কিরণের প্রাণ-বায়ু আছে, ইহাতে মিহির অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন। ঠিক প্রাতঃকালে কিরণের সম্পূর্ণ চৈতন্য হইল; কিরণ চক্ষু মেলিয়া দেখিল। সম্মুখে মিহিরকে দেখিতে পাইয়া লজ্জায় ধীরে ধীরে মাথার কাপড় টানিয়া দিল। মিহিরের মা শিয়রে বসিয়া এলোচুল

গুলি গুছাইয়া দিতেছিলেন, কিরণের মাথার কাপড় টানিতে দেখিয়া কহিলেন,—"লজ্জা কিসের মা? এখন মাথা খোলা থাক্, চুলগুলি শুকিয়ে যাক্।" মিহির আস্তে আস্তে বাহিরে গেলেন।

দুটী একটী করিয়া কিরণ কথা কহিতে লাগিল। মিহির সেদিন বাটী হইতে কোথাও গেলেন না; প্রতিমুহূর্ত্তেই কিরণের খবর লইতেছেন। মিহিরের মা স্নানাহার বন্ধ করিয়া কিরণের শুশ্রূষা করিতেছেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে কিরণ ঘর হইতে কাঁকে আসিয়া শুইতে চাহিল; মিহিরের মা বিছানা করিয়া দিয়া কিরণকে শোয়াইয়া কাপড় কাচিতে গেলেন। কিরণ শুইয়া আপনা-আপনি ভাবিতে লাগিল,—"তিনি তবে আজও আসেন নি? আস্‌বার দিন তো দিন দশ আগে ছিল! এমন কথার বে-ঠিক তো তিনি কখনও করেন নাঁ! তিনি কোথায় আছেন? কেমন আছেন?" কিরণ নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। রাত্রে শয়ন করিয়া কিরণ বোধ হয় একবারও চোখে-পাতায় এক করে নাই;—সারারাত নীরবে শুইয়া নীরবে স্বামীর কথা ভাবিল, নীরবে কত কাঁদিল।

প্রভাতে মিহিরের মা কিরণকে দেখিয়া বড় ভয় পাইলেন; ব্যস্ত হইয়া মিহিরকে ডাকিলেন। মিহির আসিয়া দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন; বলিলেন,—"মা! গ্রহ অল্পে ছাড়ে না; কিরণের যে ভয়ানক জ্বর! এ যে একেবারে হুঁস নাই।" মা ও ছেলের মুখ শুকাইয়া গেল।

সেই দিন হইতেই মহিষরেখার একজন বিজ্ঞ কবিরাজের হস্তে কিরণের চিকিৎসা হইতে লাগিল। জ্বর একদিনও বিচ্ছেদ হইল না, কিরণ একদিনও চোখ চাহিয়া দেখিল না; কেবল বিকারের খেয়ালে কত-কি প্রলাপ বকিতে লাগিল, কতবার স্বামীর সংবাদ লইল! কিন্তু এপর্য্যন্ত অরুণ আসিয়া পৌঁছিলেন না; ভাবনায় ও দুঃখে মিহির ও তাঁহার মার দেহ শুকাইয়া গেল। "কেন অরুণ আসিলেন না, কেন তাঁহার চিঠিপত্র পাওয়া যাইতেছে না; তিনি কোথায়, কেমন আছেন?"—তাঁহাদের মনে অমঙ্গলের কত চিন্তা আসিতে লাগিল। মিহিরের মা কিরণের সেবার একটুমাত্র ত্রুটী করিলেন না; স্বয়ং আহার-নিদ্রা ছাড়িয়া চব্বিশ ঘণ্টা কিরণের পাশে বসিয়া রহিলেন;—মিহিরের যতদূর সাধ্য, বোধ হয় তাহার অধিকও তিনি করিতে লাগিলেন। বিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয় বলিলেন,—'দ্যাথ বাবু! একুশ দিন না কাটিলে এ রোগে বিশ্বাস নাই;—ব্যারামটী বাতশ্লেষ্ম-জ্বর।" কৃষ্ণপক্ষে শশিকলা যেমন দিনে দিনে ক্ষয় পাইয়া যায়, কিরণও সেইরূপ দিনে দিনে ক্ষয় পাইতে লাগিল।

আজ একুশ-দিনের দিন। আজ কাটিলেই কিরণ বাঁচিবে বলিয়া ভরসা হয়। আজই কিন্তু রোগের বাড়াবাড়ি! সবই কুলক্ষণ! আজ সন্ধ্যা হইতে কবিরাজ মহাশয় আসিয়া রোগীর পাশে বসিয়া রহিয়াছেন; সম্মুখে মিহির। আজ আবার দিবাভাগ হইতে আকাশে মেঘ হইয়াছে, অল্প অল্প করিয়া সারাদিন বৃষ্টি হইয়াছে,—পথে-ঘাটে বড় কাদা। সন্ধ্যা না হইতে হইতেই চারিদিক্ অন্ধকার হইয়া আসিল; বিশ্রী ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতে লাগিল; সকলেই দরজা বন্ধ করিল। ডাকিলে হাঁকিলে কেহ আজ কাহারও সাড়াশব্দ পাইবে না! এমন দুর্য্যোগের রাত্রে কিরণের আজ প্রাণ লইয়া টানাটানি! আজ ঘরের বাহির হয়, কার সাধ্য?

ঠিক রাত্রি দুই প্রহরের সময় রোগীর লক্ষণ বড়ই খারাপ হইয়া আসিল! কবিরাজ মহাশয় নাড়ী টিপিয়া মুখবিকৃত করিলেন; মিহির ও তাঁহার মা নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

কবিরাজ মহাশয় স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া রোগীকে ঔষধ দিলেন। আবার দুই ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সহসা কবিরাজের মুখ একটু হর্ষোৎফুল্ল হইল! তিনি আস্তে আস্তে মিহিরকে বলিলেন,—"এই সময়ে নাড়ীটা দেখ দেখি?" মিহির কিরণের পায়ের তলায় হাত দিয়া বলিলেন,—"যেন গরম হ'চ্ছে।" সহসা কিরণ বিকারের খেয়ালে বলিয়া উঠিল,—"তিনি কি আজও এলেন না? একবার এনে দেখাও না গা?" সহসা সদর-দরজায় কে ধাক্কা দিয়া ডাকিতে লাগিল। মিহির আস্তে আস্তে উঠিয়া যাইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"কে গা?"

"শীঘ্র দরজা খোল, আমি।"

মিহির দ্বার খুলিয়া দেখিলেন,—অরুণ উপস্থিত! মিহির বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। সতীর প্রার্থনা কি ভগবান্ শুনিলেন? অরুণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"সব ভাল তো মিহির?"

মিহির। আস্তে কথা কও।

অরুণ। কেন?

মিহির। অত উতলা হয়ো না; কিরণের শক্ত ব্যারাম।

অরুণ। কোথায় কিরণ?

বলিতে বলিতে অরুণ কিরণের কক্ষে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কিরণকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল; তাঁহার গা-হাত-পা কাঁপিতে লাগিল; তিনি কিরণের শিয়রে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রভাতের উপক্রম হইল,—আকাশ পরিষ্কার হইয়া আসিল। কবিরাজ মহাশয় উঠিলেন; যাইবার সময় বলিয়া গেলেন,—"এখন ঘুম এসেছে, রোগ কেটেছে, কেহ ইঁহাকে বিরক্ত করিও না। একে আর মারে, কার সাধ্য?"

অনেক পরে সূর্য্যোদয় হইল। কিরণের রোগ কাটিয়া গেল; স্বামীকে দেখিয়া চিনিতে পারিল। ক্রমশ কিরণ সুস্থ হইয়া আসিল।

কিরণ সুস্থ হইলে অরুণ আত্ম-কাহিনী সবিস্তারে সকলকে শুনাইলেন। আসাম হইতে বাহির হইয়া কোথায় কত বিপদে পড়িয়াছিলেন, কিরূপে উদ্ধার পাইয়াছিলেন,—এসব কথা তন্ন তন্ন করিয়া বলিলেন। মিহিরও কিরূপ ভাবিত হইয়া কলিকাতা গিয়াছিলেন, আসিতে আসিতে ঝড়-বৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন, তারপর জলমগ্ন কিরণকে কিরূপে বাঁচাইয়াছিলেন, সমস্ত বলিলেন। শুনিয়া সকলে বিস্মিত ও পুলকিত হইল।

অরুণ কয়েক দিন পরে মহেশপুরে জ্যাঠা-মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। সেখানে একটী বড় মেয়ে দেখিয়া আসিয়া তাহার সহিত মিহিরের বিবাহ দিলেন; মেয়েটীর নাম প্রভা; প্রভা রূপেগুণে কিরণেরই সদৃশ হইল। মিহিরের মা বধূমুখ দেখিয়া বড় সুখী হইলেন।

কলিকাতার সওদাগর আপীসে দুই বন্ধুর উত্তম চাকুরী হইল; দুইজনে চিরজীবন একসঙ্গে থাকিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিলেন। কালে কিরণ ও প্রভার একটী পুত্র এবং একটী কন্যা হইল। কিরণ আদর করিয়া ছেলের নাম রাখিলেন, সুপ্রকাশ; প্রভা তাই দেখিয়া কন্যার নাম রাখিলেন, উষা। সুপ্রকাশ উষা অপেক্ষা চারি বৎসরের বড়।

বন্ধুত্বের সুখময় ফলস্বরূপ উষার সহিত সুপ্রকাশের বিবাহ হইল। "সোণার গাছে মুক্তার ফল ফলিল।"

সমাপ্ত।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ পাইন।

বার-ক্রম।

ছাত্র। একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব?

আমি। কি?

ছাত্র। একটী বিষয় আজ কয়েক দিন ধ'রে চিন্তা করিতেছি, কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে পারি নাই; তাই আপনাকে জানাইতেছি। মনে করিয়াছিলাম, আপনা-আপনি ঠিক করিয়া আপনাকে জানাইব এবং তাহাতে ভ্রম থাকিলে সংশোধন করিয়া লইব, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলাম না।

আমি। বল না কেন?

ছাত্র। বিষয়টী এই যে, "রবিবারের পর সোমবারই হয় কেন? সোমবারের পরেই মঙ্গলবার হয় কেন? ঐরূপ মঙ্গলের পর বুধ, বুধের পর বৃহস্পতি, তদনন্তর শুক্র, শুক্রের পরই শনি; আবার শনির পর রবি, আবার তাই-ই। এরূপ হয় কেন? এবং এইরূপ বার-পর্য্যায়ের বিপর্য্যয়ই বা ঘটে না কেন?"

ছাত্রের প্রশ্নটী শুনিয়া বড়ই খুশী হইলাম। বলিলাম, আর কিছুদিন জ্যোতিষ-শাস্ত্র পড়িলে আপনিই এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে পারিবে। যাহা হউক, তুমি যে তথ্যানুসন্ধানে চিত্তকে নিয়োজিত করিয়াছ, জানিয়া আনন্দিত হইলাম।

ছাত্র এ বিষয়টী জানিবার জন্য আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে।

ছাত্রের নিকট প্রশ্নের উত্তর না করিলে, ছাত্রের মনে অন্যরূপ ধারণা জন্মিতে পারে, তাই একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম,—"সূর্য্য-সিদ্ধান্তে আছে, ভগবান্ সূর্য্যদেবের নিকট ময়াসুর পাকে-প্রকারে এরূপ প্রশ্ন করেন।

"দিনাব্দ-মাস-হোরাণামধিপা ন সমাঃ কুতঃ"

অর্থাৎ দিন, বর্ষ, মাস ও হোরার অধিপতি সমান হয় না কেন? (দিন শব্দে বার)।

এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ সূর্য্যদেব বলেন;—

"মন্দাদধঃক্রমেণ স্যুশ্চতুর্থা দিবসাধিপাঃ।
বর্ষাধিপতয়স্তদ্বৎ তৃতীয়াশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
ঊর্দ্ধক্রমেণ শশিনো মাসানামধিপাঃ স্মৃতাঃ।
হোরেশাঃ সূর্য্যতনয়াদধোঽধঃক্রমশস্তথা॥"

অর্থাৎ (কক্ষানুসারী গ্রহগণের মধ্যে) শনির নিম্নক্রমে চতুর্থ (কক্ষাস্থিত) গ্রহ দিবসাধিপতি হয় এবং ঐরূপ শনির নিম্নক্রমে তৃতীয় গ্রহ বর্ষাধিপতি হয়। আর চন্দ্রের ঊর্দ্ধক্রমে গ্রহগণ ক্রমশঃ মাসাধিপ হয় এবং শনির নিম্নক্রমে গ্রহগণ হোরাধিপ হইয়া থাকে।

সুতরাং পঞ্চবিংশ কালহোরাধিপতিই পর-দিবসের বারাধিপতি হয়। এই নিয়মে গণনা করিলে বারের প্রচলিত নিয়ম (যাহা তুমি বলিয়াছ) তাহাই হইবে, অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই।

ছাত্র। ও আমি বুঝিতে পারিলাম না। একমাত্র বারাধিপতি লইয়াই আমার মনে এত গোল; তার উপর আবার মাস, বৎসর, হোরা!! হোরা কি? কালহোরাই বা কি? আবার মাস ও বৎসরের অধিপতিই বা কিরূপে জানা যাইবে?

আমি। একমাত্র কালহোরাধিপতি বুঝি-লেই বার, মাস ও বৎসরের অধিপতিত্ববোধে সমর্থ হইবে। কারণ কালহোরাধিপতি হইতেই ঐ সমস্ত ঘটিয়া থাকে।

ছাত্র। আগে বারাধিপতিই বুঝি।

আমি। এখন মন দিয়া শুন ও হৃদয়ঙ্গম কর।

এই যে অখণ্ড-দণ্ডায়মান চরাচর ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল অবলোকন করিতেছ, ইহা একমাত্র অখিলেশ্বর ভগবানের এক বিশাল রাজ্য। যেমন পার্থিব রাজাদের পাহারাওয়ালা আছে এবং তাহারা যেমন বদ্‌লাইয়া বদ্‌লাইয়া

ঘুরিয়া ফিরিয়া কাজ করে, ভগবানের রাজত্বেও তেমনিই আছে। তবে পার্থক্য এই যে, পার্থিব রাজাদের কর্ম্মকারকগণ কখন কখন স্বীয় বুদ্ধির দোষে অন্যায্য কার্য্য করিয়া তিরস্কৃত ও পদচ্যুত হয়, কিন্তু ভগবানের কর্ম্মচারিগণ কখনই অন্যায্য কার্য্য করেন না, সুতরাং তজ্জন্য তাঁহাদিগকে তিরস্কৃত বা পদচ্যুত হইতেও হয় না। কারণ, তিনি এমনতর ব্যক্তির উপর ভার বিন্যস্ত করিয়াছেন যে, আর কখনই তাঁহাদের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে না এবং তাঁহাদের কাজে গাফিলীও হইবে না—নিক্তির ওজনে চলিবে। এইমাত্র প্রভেদ।

ছাত্র। আজ্ঞে।

আমি। ঐ শাসক-শ্রেণীর মধ্যে যিনি একবৎসর কাল শাসন করেন, তিনিই বর্ষাধিপতি। ঐরূপ একমাস-শাসকের নাম, মাসাধিপতি; দিনশাসকের নাম, দিনাধিপতি এবং হোরাকাল-শাসককে কালহোরাধিপতি কহে। কিন্তু মাসাধিপতিই কালে বর্ষাধিপতি, বর্ষাধিপতিই হোরাধিপতি এবং হোরাধিপতিই সময়ে বর্ষাধিপতি হইতে পারেন। কারণ তাঁহারা সংখ্যায় সাত জন মাত্র। রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি; এই তাঁহাদিগের নাম। সংসারস্থ যাবতীয় পদার্থের শুভাশুভ-ঘটনাবলী তাঁহারা গ্রহণ করিয়া অবস্থিত অর্থাৎ তাঁহাদিগেরই করায়ত্ত, এই জন্যই ইঁহাদিগকে 'গ্রহ' বলে। গ্রহগণ ভগবানেরই অংশ-বিশেষ;—"গ্রহরূপী জনার্দ্দনঃ।" আকাশ-মণ্ডলেই ইঁহাদের বাসস্থান এবং স্বীয় স্বীয় কক্ষাতেই ইঁহারা পরিভ্রমণ করিয়া ভগবানের বিশাল রাজ্য রক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদের কক্ষার নিয়ম এইরূপ;—

"মন্দামরেজ্যভূপুত্রসূর্য্যশুক্রেন্দুজেন্দবঃ।
পরিভ্রমন্ত্যধোঽধঃস্থাঃ——————॥"

অর্থাৎ সকলের উপরে শনি, তন্নিম্নে বৃহস্পতি, তন্নিম্নে মঙ্গল, মঙ্গলের নীচে রবি, তদধঃ শুক্র, শুক্রের নিম্নে বুধ এবং বুধেরই নিম্নপ্রদেশে চন্দ্রের অবস্থান। এই গ্রহকক্ষা-সংস্থানটী বেশ মনে রাখিও।

ছাত্র। আজ্ঞে।

আমি। বরাহমিহির বলিয়াছেন;—

"হোরেত্যহোরাত্রবিকল্পমেকে
বাঞ্ছন্তি পূর্ব্বাপরবর্ণলোপাৎ।
কর্ম্মার্জ্জিতং পূর্ব্বভবে সদাদি
যৎ তস্য পক্তিং সমভিব্যনক্তি॥"

দীপিকাকার শ্রীনিবাসও বলিয়াছেন;—

"ততঃ প্রভৃতি জন্তুনাং সদসৎকর্ম্মসূচকঃ।
হোরাখ্যো বর্ত্ততে কালোঽহোরাত্রেঽন্ত্রলোপতঃ॥"

অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে যে সকল সদসৎ কর্ম্ম করা যায়, তাহারই পরিপাক অর্থাৎ ফল সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করে বলিয়া (কালকেই) হোরা বলে। "অহোরাত্র" এই শব্দের আদি ও অন্ত বর্ণ (অ ত্র) দ্বয়ের লোপ করিয়াই হোরা শব্দের উৎপত্তি।

তবেই হোরা শব্দে সময়—কাল। হোরা শব্দের আর যে অর্থ আছে, তাহা গণিতে ব্যবহৃত;—

"হোরা রাশ্যর্দ্ধলগ্নয়োঃ।"

হোরা শব্দে রাশির অর্দ্ধভাগ অর্থাৎ ১৫ অংশ বা সমস্ত লগ্ন।

যাহা হউক, হোরা শব্দে সময়মাত্রই বুঝাইয়াছে। তাহাতে বর্ষ, মাস, দিন, দণ্ড প্রভৃতি সংজ্ঞার সহিত বিরোধ হয় বলিয়া হোরা শব্দের লাক্ষণিক অর্থ আড়াই দণ্ড সময়;—

"হোরা সার্দ্ধদ্বিনাড়িকা।"

ছাত্র। বুঝিলাম, হোরা শব্দে—আড়াই দণ্ড।

আমি। পূর্ব্বে বলিয়াছি; হোরা শব্দে সামান্য কাল মাত্র; এখন বলিলাম, আড়াই দণ্ড। তবেই বিরোধ উপস্থিত। সুতরাং

আড়াই দণ্ডকে বিশেষরূপে বুঝিবার জন্য শুধু 'হোরা' না বলিয়া 'কালহোরা' বলিবে। অতএব কালহোরা শব্দে আড়াই দণ্ড।

ছাত্র। কালহোরা শব্দের অর্থ বোধ করিলাম। কালহোরা কিরূপে গণিতে হইবে?

আমি। আবার গণিতে ফেলিলে? শোন। কালহোরা গণিত করিতে গেলে, অগ্রে বারপ্রবৃত্তি দণ্ড গণিত করিতে হয়। যে সময়ে বারের আরম্ভ হয়, তাহাকে 'বারপ্রবৃত্তি' বলে। বারপ্রবৃত্তি-গণনায় নানা মত থাকিলেও চারিটী স্থান ব্যতীত অন্য বিশেষ উপায় নাই।

ছাত্র। কোন্ চারিটী?

আমি। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়ং ও রাত্র্যর্দ্ধ। কিন্তু যবনের মত অন্য সময়। যথা;—

"কেচিদ্বারং সবিতুরুদয়াৎ প্রাহুরন্যে দিনার্দ্ধাদ্
ভানোরর্দ্ধাস্তমনসময়াদূচিরে কেচিদেবম্।
বারস্যাদিং যবননৃপতির্দিঙ্মুহূর্ত্তে নিশায়াং
লাটাচার্য্যঃ কথয়তি পুনশ্চার্দ্ধরাত্রে স্বতন্ত্রে॥"

অর্থাৎ কেহ সূর্য্যোদয়ে, কেহ দিনার্দ্ধে, কেহ বা সায়ংকালে বারের আরম্ভ ধরিয়া থাকেন আর যবনরাজের মতে রাত্রির দশ মুহূর্ত্তে এবং লাটাচার্য্যের মতে রাত্রি-দ্বিতীয় প্রহর সময়েই বারের আরম্ভ হয়।

কিন্তু ভাস্করাচার্য্য বলেন,—

"অর্কোদয়াদূর্দ্ধমধশ্চ তাভিঃ
প্রাচ্যাং প্রতীচ্যাং দিনপপ্রবৃত্তিঃ॥"

অর্থাৎ দেশান্তরদণ্ডাধিক সূর্য্যোদয় কালে এবং দেশান্তর দণ্ডন্যূন সূর্য্যোদয় কালে যথাক্রমে মধ্যরেখার পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশে বার-প্রবৃত্তি হয়।

আমাদের দেশে বার-প্রবৃত্তিকাল তিন প্রকার গৃহীত হয়। যথা;—সূর্য্যসিদ্ধান্তাদি গ্রন্থের মতে অহর্গণাদি গণনায়,—

"বারপ্রবৃত্তিঃ প্রাগ্দেশে ক্ষপার্দ্ধেঽভ্যধিকে ভবেৎ
তদ্দেশান্তরনাড়ীভিঃ পশ্চাদূনে বিনির্দ্দিশেৎ॥"

অর্থাৎ মধ্যরেখার পূর্ব্বদেশে দেশান্তর-দণ্ডাধিক রাত্র্যর্দ্ধ সময়ে এবং তৎপশ্চিমদেশে দেশান্তর-দণ্ডন্যূন নিশীথ সময়ে বারপ্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

(২য়) স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মকর্ম্মাদি-সূচক বার সূর্য্যোদয় হইতেই গৃহীত হয়।

আর জন্মপত্রিকাদি প্রস্তুত করণ কালে যখন গ্রহগণের বল গণনা করিতে হয়, সেই সময়ে (এই কালহোরাধিপ-গণনায়) বার-প্রবৃত্তি গণনা করিবার জন্য তৃতীয়ের আবশ্যক হয়। ইহাতে একটু সূক্ষ্মতা আছে। মুহূর্ত-চিন্তামণিতে রামদৈবজ্ঞ বলিয়াছেন;—

"পাদোনরেখাপরপূর্ব্বযোজনৈঃ
পলৈর্যুতোনাস্তিথয়ো দিনার্দ্ধতঃ।
ঊনাধিকাস্তদ্বিবরোদ্ধৃতৈঃ পলৈ-
রূর্দ্ধং তথাধো দিনপপ্রবেশনম্॥"

অর্থাৎ মধ্যরেখা ও স্বদেশের অন্তরিত যোজনরূপ পলের সিকি বাদ দিয়া (পূর্ব্ব-পশ্চিমানুসারে) ১৫ পনর অঙ্কের সহিত যোগ ও হীন করিবে। পরে ঐ অঙ্ক তদ্দিবসীয় দিনার্দ্ধের সহিত যত কম বেশী হইবে, তত দণ্ড পরে বা পূর্ব্বে বারপ্রবৃত্তি হইবে। দীপিকা-কারের মতও ঐরূপই।

ঐ বারপ্রবৃত্তি শব্দের অর্থ বারারম্ভ বটে, কিন্তু যেখানে-সেখানে আরম্ভ নহে। যখন লঙ্কায় অর্থাৎ মধ্যরেখায় বারারম্ভ হইবে, তখনই সকল দেশেই বারপ্রবৃত্তি হইবে। এই বিষয়ে রত্নমালায় শ্রীপতি বলিয়াছেন;—

"বারপ্রবৃত্তিং মুনয়ো বদন্তি
সূর্য্যোদয়াদ্ রাবণ-রাজধান্যাম্॥"

(রাবণ-রাজধানী অর্থাৎ লঙ্কাতে সূর্য্যোদয় হইলেই বারারম্ভ হয়। ইহাই মুনিদিগের মত।)

ছাত্র। পূর্ব্বে কালহোরা শব্দের অর্থ

বুঝিয়াছি, এক্ষণে বারপ্রবৃত্তি শব্দের অর্থ বুঝিলাম; সংপ্রতি কালহোরাধিপতি-গণনার নিয়ম বলুন।

আমি। ৬০ ষাট দণ্ডে এক অহোরাত্র হয়, তাহা তুমি জান?

ছাত্র। আজ্ঞে।

আমি। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আড়াই দণ্ডে এক কালহোরা। আড়াইকে ২৪ চব্বিশ গুণ করিলে ষাট হয়, সুতরাং এক অহোরাত্রে ২৪ চব্বিশটী কালহোরা হয়।

"হোরেশাঃ সূর্য্যতনয়াদধোহধঃক্রমশস্তথা।"

এই বচন অনুসারে শনির নিম্নস্থ কক্ষচারী গ্রহবশে কালহোরার অধিপতি নিরূপিত হয়; সুতরাং প্রথমে শনি, তৎপরে বৃহস্পতি, তৎপরে মঙ্গল, তদনন্তর সূর্য্য, সূর্য্যের পর শুক্র, শুক্রের পর বুধ এবং বুধের পর চন্দ্র। আবার চন্দ্রের পর শনি। এইরূপে ঘুরিতে থাকে।

এক অহোরাত্রে ২৪ চব্বিশটী কালহোরা হয়, অথচ কালহোরার অধিপতি সাতটী মাত্র; সুতরাং ঘুরিতে থাকে। ঐ ২৪ কে ৭ সাত দ্বারা ভাগ করিলে ৩ তিন অবশিষ্ট থাকে; সুতরাং শেষ চতুর্থ বা প্রথমাবধি পঞ্চবিংশ অর্থাৎ সর্ব্বোর্দ্ধ কক্ষাস্থ গ্রহের নিম্নক্রমে চতুর্থ গ্রহই পঞ্চবিংশ কালহোরার অধিপতি। ঐ পঞ্চবিংশ কালহোরার অধিপতিই পরদিনের প্রথম কালহোরাধিপতি। প্রথম বলিয়া উঁহারই নামে বারের নাম।

মনে কর, আজ রবিবার। আজকার প্রথম অষ্টম, পঞ্চদশ এবং দ্বাবিংশ কালহোরাধিপতি রবি। ত্রয়োবিংশ শুক্র, চতুর্ব্বিংশ বুধ এবং পঞ্চবিংশ বা পরদিনের প্রথম কালহোরাধিপতি চন্দ্র। এই চন্দ্র প্রথম অধিপতি বলিয়া চন্দ্রের নামেই বারের নাম হইল। চন্দ্রের নামান্তর সোম, এই জন্য সোমবার বলে। ঐরূপে চন্দ্র অবধি গণনা করিলে পঞ্চবিংশ কালহোরেশ মঙ্গল হইবে। এই ভাবে গণনা করিলেই সমস্ত বারের নামকরণ হইবে।

মাসে ৩০ ত্রিশ দিন। ৩০ কে ৭ সাত দ্বারা ভাগ করিলে দুই অবশিষ্ট থাকে। গ্রহ-কক্ষাসন্নিবেশে চন্দ্র হইতে ঊর্দ্ধ ক্রমে দেখ, দুই দুই অন্তর দেখিবে। অর্থাৎ প্রথম চন্দ্র, দ্বিতীয় বুধ, তৃতীয় শুক্র ইত্যাদি। সুতরাং—

"ঊর্দ্ধক্রমেণ শশিনো মাসানামধিপাঃ স্মৃতাঃ"

এই বচনানুসারে মাসাধিপতি, চন্দ্রের ঊর্দ্ধ কক্ষাক্রমে হয়।

আর বৎসরে ৩৬০ তিন শত ষাট দিন হয়। উহাকেও সাত ভাগ করিলে তিন অবশিষ্ট থাকে। কাজেই—

"বর্ষাধিপতয়স্তদ্বৎ তৃতীয়াশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ"

এই বচনানুসারে শনির নিম্নক্রমে তৃতীয় গ্রহই বর্ষাধিপ হইবে।

ছাত্র। শনি হইতে নিম্নক্রমে এবং চন্দ্র হইতে ঊর্দ্ধক্রমে গণিত করিবার কারণ কি?

আমি। উভয়েই এক এক সীমায় অবস্থিত, সুতরাং গণনায় সুবিধা হইবে বলিয়া ঐ নিয়মে গণনা করা হয়।

শ্রীধীরানন্দ কাব্যনিধি।

কৃষ্ণকালী

বসন্ত-পূর্ণিমা-রাত্তি, বিমল চন্দ্রমা-ভাতি—
কৌমুদী বিধৌত ধরাতল।
রোহিণী মোহিনী-বেশে, মৃগাঙ্কের বামদেশে;
মৃদু হাসে তারকা-মণ্ডল।
কাঁপাইয়া কিসলয় মলয়-পবন বয়
থর থর কুসুম-কেশর;—
এত ধীর সঞ্চরণ, কাঁপে শুধু প্রাণ-মন,
প্রেমিকের হিয়া লঘুতর।

চঞ্চল চন্দ্রিকা তায়, তুলি' লহরী-লীলায়
ভেসে যায় কানন-কান্তারে;
গিরি, দরী,—মরুদেশ, পৃথিবীর পরিশেষ
সাগরের দূর পরপারে।
চকোর চকোরী ছুটী, সুধা-লোভে শূন্যে উঠি'
ক্রমে লুপ্ত আকাশের গায়।
শশাঙ্ক-কলঙ্ক-পাশে, কাল কাল বিন্দু ভাসে
কত যত্নে যেন দেখা যায়!
শ্যাম-প্রেম-কাঙ্গালিনী একে রাধা পাগলিনী,
যামিনীর মধ্যযাম-ভাগে।
নির্জ্জন যমুনা-তটে বাজে বংশী বংশীবটে
'রাধা, রাধা, রাধা' অনুরাগে।
সঞ্জীবনী-মন্ত্ররূপ, মুরলী মোহের কূপ
অনুরূপ নাহি ত্রিসংসারে;—
চেতনে হারায় চিত, অচেতনে সুচেতিত,
শবদেহে জীবন সঞ্চারে।
যে শুনেছে একবার, কি ছার সংসার তার,
সুখময় নিকেতন বন!
সাধে কি লো ও যমুনে! বহ তুমি আনমনে
উজানেতে উর্দ্ধগত মন!
বাঁশী-স্বর ভেসে আসে, পশিয়ে হৃদয়-বাসে
প্রাণে হানে পঞ্চশর-শর।
ব্যাকুলা সে কুলবালা, কোথায় জুড়াবে জ্বালা,
কেমনে বা, কোথা অবসর?
হৃদয়ের যত স্তর, ভেদ করি' সেই স্বর
প্রবেশিল রাধার মরমে।
লজ্জা গেল লজ্জা পেয়ে, ধৈর্য্য রবে কারে চেয়ে!
যায় প্রাণ, কি করে সরমে?
বলে সতী চিত্রলেখা, আর কেন চিত্রলেখা-
সম থাকি পাপ নিকেতনে?
চল্ লো, চল্ লো, চল্, মনঃ-প্রাণ সুচঞ্চল,
দেখে আসি মদনমোহন।
কাণ পেতে শোন্ সই! সঙ্কেতে ডাকিছে ওই
বংশী তার বংশীবট পাশে।
কি দিয়ে টানিছে প্রাণ, সহিতে পারিনে টান;
মান গেল, প্রাণ কেন হাসে?
চল্ লো, চল্ লো, চল্, বিলম্বে বিপক্ষ-বল
প্রবল হইবে, জাগে যদি।
মালতীর মালা দিয়ে সাজাইয়ে সে কালিয়ে
পার হব আশা-পূর্ণনদী।
তেই যতন করি', দূরে বৃন্ত পরিহরি'
হরি-মন হরিবারে হায়
গেঁথেছি প্রসূন-দলে, পাছে অরিদলে বলে,
হার হবে কেবল প্রহার!
জগৎ জাগন্ত নয়, প্রকৃতি প্রশান্তিময়,
অচেতন জীব নিদ্রাবেশে।
আর কি পাইব ছল, এই বেলা যাই চল্
দেখে আসি গোপনে প্রাণেশে।
মুখর মঞ্জীর খুলি, রত্ন-অলঙ্কার গুলি,
অভিসারে চলিলা কিশোরী।
দেহ যায় আগে আগে, পাছে ছায়া অনুরাগে
সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গিনী সুন্দরী।
অদূরে যমুনা-জল কলরবে কল কল;
কূলে তরু শ্যামল সুন্দর।
চরণে চরণ রাখি' পীতাম্বরে অঙ্গ ঢাকি'
তলেতে ত্রিভঙ্গ নটবর।
চূড়ার চালনি বামে, শিখি-পুচ্ছ-চন্দ্রদামে
কাঁপাইছে মৃদু সমীরণ;
হেলে দুলে সে চূড়ায় যেন বলে আয় আয়,
বাঁশীস্বর স্বর্গীয় স্বপন!!
ক্রমে সন্নিহিত তট, কাছে বংশী, বংশীবট,
বংশীধর অধরেতে হাসি।
শূন্য দেহ প'ড়েছিল, মহাশক্তি সঞ্চারিল
প্রাণ যেন প্রাণপণে আসি।
যে যাহারে ভালবাসে, সে মিলিলে তার পাশে
যত কথা নয়নে-নয়নে।
জানে সে আঁখির তারা, পীয়ে কি সে সুধাধারা
অপরূপ রূপ-দরশনে।
বাক্য নাহি স্ফুরে মুখে, অথচ কি মন-সুখে
হরে দোঁহে মিলনের কাল।
যে জন প্রেমিক নয়, সেই কয়—'বিষময়
বিরহের বিষম জঞ্জাল'।
চন্দন-চর্চ্চিত হার, যতন-প্রসূত তার,
পরাইয়া বনমালি গলে,
কমলা কমলমুখী, যেন স্বর্গ-সুখে সুখী,
প্রণমিলা শ্যাম-পদতলে।
তুচ্ছ করি' রতি-কামে, মদনমোহন-বামে
দাঁড়াইলা মদনমোহিনী।
তরুবরে স্বর্ণলতা, সাগরে নদী সঙ্গতা,
স্থির-মেঘে স্থির-সৌদামিনী!!
বিকম্পিত কলেবরে ভয়-বিজড়িত স্বরে
হেন কালে বলে চিত্রলেখা,—
"করাল কৃপাণ-পাণি, উর্দ্ধফণা যথা ফণি,
আসিছে আয়ান দেখ সখা!
কাঁপে মহী পদভরে, ক্রোধে দেহ থর থরে,
বহে শ্বাস সাপের গর্জ্জন!
জটিলা কুটিলা পাশে, হাত নাড়ে অট্ট হাসে,
কটুভাবে করিছে তর্জ্জন।"
কথা শুনি' কাঁপে কায়, ভাবি' রাধা নিরুপায়
ধরে পায় লোটাইয়া ভূমি;—
"রক্ষা কর রসময়! ভঞ্জন করহ ভয়,
রাখ প্রাণ, প্রাণনাথ তুমি!"

ক্রমে কলকণ্ঠ রোধ, পার্থিব পদার্থ-বোধ
শূন্য হলো,—স্থির আঁখি তারা;
ভাসাইল চন্দ্রানন, ভাসাইল শ্রীচরণ
নিরাধারা অশ্রুজল-ধারা।
ক্ষণেকে চেতন পেয়ে, সবিস্ময়ে শিহরিয়ে
মুছি' আঁখি বসন-অঞ্চলে,
দেখে স্বর্ণ-কমলিনী, যেন সুনীল নলিনী
ভাসিতেছে জাহ্নবীর জলে।
একি স্বপ্ন দরশন। কোথা সে মনোমোহন
নিকুঞ্জ-রঞ্জন রাকা-শশী?
শশাঙ্ক-শেখর-উরে, ও রমণী কে বিহরে!
গঞ্জনে অঞ্জনে রূপে মসী!
আলোলিত অলকক, লোল জিহি লক লক,
লেলিহান হৃদয়-প্রদেশে।
পরিধান বাঘছাল, দনুজ-কপাল-মাল
দলমল দোলে গলদেশে।
সুধাপানে ঢল ঢল, লোচন-চকোর-চল
সুশোভিছে চারু-চন্দ্রাননে!
নিষ্কলঙ্ক শশিলেখা, তার মাঝে যায় দেখা—
চন্দ্রবিম্ব বিমল দর্পণে!
চিক্কণ চিকুর-রাশি, কিয়দংশ অংস-বাসী—
অভিলাষ চরণে লুটায়!
মুখশোভা সুপ্রকাশি', অজ্ঞান-তিমির নাশি'
মৃদু হাসি অধরে মিলায়!
মুণ্ড-অসি-বরাভয় চতুর্ভুজে শোভাময়,
বরাভয় দান—ধর্ম্মশীলে।
ছিন্নমুণ্ড সে কৃপাণ, কাঁপায় পাপীর প্রাণ,
দৈত্যকুল সমূলে নির্ম্মূলে!
স্থির চক্ষে দেখে সতী, কে পূজেছে ভক্তিমতী
শ্যামা মার রাতুল চরণে,
হে যমুনে! তব জলে, নব নব বিল্বদলে
রক্তজবা রঞ্জিয়া রঞ্জনে।
আনন্দে অধীর প্রাণ, যোগিনীতে গায় গান,
অলক্ষিতে রুদ্র দেয় তাল!
ভৈরব, বেতাল, তালে, নাচে আপনার তালে
বাজাইয়ে কপাল-কঙ্কাল!
ঘুরে গেল অভিরোষ, আনন্দে আয়ান ঘোষ
লোটাইয়া পড়িল চরণে।
আয়ান-দেখিল কালী, রাধা দেখে বনমালী
শ্যাম—শ্যামা, লজ্জা নিবারণে!!

শ্রীশিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কাটোঙার ইতিবৃত্ত।

কাটোঙা, বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী। ইহা অজয়নদ ও ভাগীরথীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। এই নগরের নিম্নে ভাগীরথী অনেকটা শুকাইয়া গিয়াছে,—ফেব্রুয়ারি ও মার্চ্চ মাসে হাঁটিয়া নদী পার হওয়া যায়। খৃষ্টীয় ১৮৪৭ অব্দের জানুয়ারি মাসে এইখানে মহকুমা (সব্-ডিভিজন্) স্থাপিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান জেলায় ভাগীরথী-তীরে কালনা, কাটোঙা, দাঁইহাটা, ভাওসিংহ, মির্জ্জাপুর ও উদ্ধানপুর প্রধানতঃ লবণ, পাট ও কাপড়ের বাণিজ্যস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-রেলওয়ে-কোম্পানী লুপ্ লাইনে বোলপুর, আহ্মদপুর, সিন্থিয়া ও মল্লরপুরে ষ্টেশন খোলাতে ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী উপরি-উক্ত বন্দরগুলির বাণিজ্যের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। কাটোঙায় চাউল, দাল, তামাক, পাট, চিনি, লবণ, বিলাতি ও এতদ্দেশীয় কাপড়, কার্পাস, গুড় প্রভৃতির কারবার হইয়া থাকে। আমদানি ও রপ্তানি-দ্রব্যের পরিমাণ প্রায় সমান; ইহাতে বোধ হয় যে, বাণিজ্য দ্বারা এই স্থানের যথেষ্ট ধনাগম হইতেছে না। প্রতি বৎসর শীতকালে উদ্ধানপুরে এক মেলা বসে; কাটোঙায় গঙ্গাস্নানার্থী অনেক বৈষ্ণবযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। এই মহকুমা কাটোঙা, কাঠগ্রাম ও মঙ্গলকোট এই তিন থানায় বিভক্ত। এই নগরের সঙ্কীর্ণ-রাজপথ * এবং স্বল্পগবাক্ষ-বিশিষ্ট দ্বিতল ত্রিতল অনুচ্চ ইষ্টকালয়গুলির প্রতি দৃষ্টি করিলেই ইহা যে মুসলমান রাজত্ব-সময়ে স্থাপিত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহ বুঝা

* "ধনূংষি দশ বিস্তীর্ণঃ শ্রীমান্ রাজপথঃ কৃতঃ।" এই ৪০ হস্ত পরিসর-বিশিষ্ট রাজপথের বিষয় এখানে বলা হয় নাই; কাটোঙার পথগুলির মধ্যে যে গুলি প্রধান, সেই সকলকেই রাজপথ বলা হইয়াছে।

যায়। গঞ্জ-মুরশিদপুর নামের দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নবাব মুরশিদকুলি—জাফর খাঁর সময়ে ইহা প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-স্থানরূপে পরিণত হয়। যখন মুর্শিদাবাদে রাজধানী ছিল, তখন বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে মুর্শিদাবাদ রক্ষা করিবার জন্য কাটোঙায় সৈন্য-সংস্থাপনের আবশ্যকতা হইয়াছিল; এই নিমিত্ত এই নগরী মুর্শিদাবাদের 'দ্বার" বলিয়া পরিগণিত হইত। এক্ষণে ইহার পূর্ব্বশ্রী আর নাই।

কাটোঙার প্রাচীন নাম কণ্টকনগর। হিন্দুস্থানীরা নামের শেষভাগে অনেক সময় "বা" যোগ করিয়া থাকে। এই "বা"-এর উচ্চারণ (অন্তস্থ "ব" হওয়াতে) "ও-আ"। সুতরাং "কণ্টক" শব্দের অপভ্রংশ "কাঁট" শব্দে "বা" যোগ করিলে, "কাঁটবা" (কাঁটোআ) হয়। বাঙ্গালা ভাষার প্রাথমিক অবস্থায় "আ" এবং "য়া' ইহাদের উচ্চারণের অনেক পার্থক্য ছিল। "য়া"-র সংস্কৃতে উচ্চারণ—"ই-আ"। বাঙ্গালা ভাষায় অন্তস্থ "ব"-এর উচ্চারণ লোপ পাইলে, এই "ব"-এর পরিবর্ত্তে "ওআ" লিখিবার আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইল এবং "আ" ও "য়া"-র উচ্চারণে যখন কোন তফাৎ রহিল না, তখন শব্দের শেষে "আ" ব্যবহারের আপত্তি হেতু "য়া" তাহার স্থান অধিকার করিল। প্রাচীন দলিল-আদিতে আমরা অনেক সময় "ওআ" শব্দের স্থলে "ঙা' ("ও"র অন্ত্যে আকার দিয়া লেখা) দেখিতে পাই। এইরূপে কণ্টক-নগর কাঁটোয়ায় পরিণত হইয়াছে। অধুনা "কাঁটোয়া" লিখিতে চন্দ্রবিন্দুটীও দেওয়া হয় না। ইহার দ্বিবিধ কারণ হইতে পারে;—১ম, ইংরেজির অনুকরণ। যথা;—"Cutwa"; ২য়, বৈষ্ণব-কবিরা যে কাটোঙা লিখিতেন, তাহার "ঙা" স্থানে "য়া" পরিবর্ত্তন দ্বারা চন্দ্রবিন্দু বা আনুনাসিকের লোপ করা হইয়াছে। ইংরেজি পুস্তক দেখিয়া নগরাদির নাম লিখিতে যাইয়া, আমরা অনেক শব্দের জাতি নষ্ট করিয়াছি। নিম্নে কয়েকটী উদাহরণ দেওয়া গেল, যথা;—

আমরা "কাঠমাণ্ডো" স্থানে "কাটামুণ্ডু" লিখি, "মুম্বই" স্থানে "বোম্বাই" লিখি ইত্যাদি, ইত্যাদি। অন্তস্থ "ব"-এর উচ্চারণ-পরিবর্ত্তনে এক "কাঁটবা"ই যে "কাটোঙা" বা "কাটোয়া" হইয়াছে' তাহা নহে; এরূপ—

হিন্দি	"চাবল"	শব্দ-স্থানে বাঙ্গালা	"চাউল"
সংস্কৃত	"স্বামী"	স্থানে	"সোয়ামি"
,,	"দেবর"	স্থানে	"দেওর"
,,	"স্বস্তি"	স্থানে	"সোয়াস্তি"
,,	"দ্বি"	স্থানে	"দুই"
,,	"দ্বার"	স্থানে	"দুয়ার"
,,	"স্বর"	স্থানে	"সুর"

প্রভৃতি অনেক শব্দ দেখা যায়। আমরা এই প্রবন্ধে হাল্ আইন অনুসারে "কাটোয়া" না লিখিয়া বৈষ্ণব কবিদিগের দৃষ্টান্ত অনুসারে "কাটোঙা" লিখিলাম; আধুনিকেরা মাপ করিবেন।

কেহ কেহ বলেন যে, কাটোঙা বা কণ্টকনগরের প্রাচীন নাম চম্পকনগর ছিল; নিমাঞি, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, তাঁহার মাতা শচী দেবী আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, চম্পকনগর আমার পক্ষে এক্ষণে কণ্টকনগর হইল; এই হইতেই উহা কণ্টকনগর নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই প্রবাদটী কতদূর সত্য, তাহা বলা যায় না। অন্ততঃ কোনও বৈষ্ণবগ্রন্থে ইহার উল্লেখ নাই। বৈষ্ণব-কবিগণ কণ্টক-নগর বা কাটোঙাই লিখিয়াছেন, চম্পকনগর লিখেন নাই। ১৪৫৫ শকাব্দে (খৃঃ ১৫৩৩ অব্দে) শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের কিছুদিন পরে "চৈতন্যভাগবত" * গ্রন্থ রচিত হয়। এই

* "চৈতন্যভাগবত" এবং "চৈতন্যমঙ্গল" এই দুই গ্রন্থের নাম সম্বন্ধে অনেকেই গোল করেন। "চৈতন্য-

চৈতন্য-ভাগবতে "কণ্টক-নগর" এবং "কাটোঙা" এই উভয় নামেরই উল্লেখ আছে। ইহারও পরে (১৪৯৯ শকাব্দে) কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী-কৃত "চণ্ডী" রচিত হইলেও ধ-পতি ও শ্রীমন্ত সওদাগরের মঙ্গলকোটের সমীপস্থ উজনী গ্রাম (উজ্জয়িনী বা ঝিলু রাজার দেশ) হইতে নৌকাযোগে অজয়নদ বাহিয়া সিংহল-যাত্রার সময় উক্ত নদের উভয় তীরস্থিত হুসনপুর, পাঙ্গড়া, ব্যাকুল্যা, চরকি, অঙ্গারপুর, নগাঁ, উদ্ধানপুর প্রভৃতি গ্রাম অতিক্রম করিয়া নৌকা গঙ্গায় প্রবিষ্ট হইলে, গঙ্গার পারস্থ ইন্দ্রাণী নামক দেশের উল্লেখ দেখা যায়। কাটোঙা এই ইন্দ্রাণী-পরগণার অন্তর্গত। "শ্রীচৈতন্য-ভাগবত" গ্রন্থে কাটোঙা গ্রাম ইন্দ্রাণীর নিকটে অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ আছে, কিন্তু ইন্দ্রাণীর মধ্যগত বলিয়া উল্লেখ নাই। যথা,—

"ইন্দ্রাণী নিকটে কাটোঙা নামে গ্রাম
তথা আছেন কেশব ভারতী শুদ্ধনাম॥"

অজয়নদ এবং ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলের উত্তরাংশে শাঁকাই ও উদ্ধানপুর গ্রাম এবং দক্ষিণাংশে কাটোঙা নগর ও গঞ্জমুর্শিদপুর অবস্থিত। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ইন্দ্রাণী-পরগণার এরূপ উল্লেখ দেখা যায়;—

(১) "সম্মুখে উধনপুর, নৈহাটি কতদূর,
শাঁখারি-ঘাটে দিল দরশন।
পাইয়া গঙ্গার পানি, মহাপুণ্য মনে গণি,
পূজা কৈল গঙ্গার চরণ॥
মণ্ডনাহাট ডাইনে আছে, থাকিব হাটের কাছে,
আনন্দিত সাধুর নন্দন।
সম্মুখেতে ইন্দ্রাণী, ভুবনে দুর্লভ জানি
দেব আইসে যাহার সদন॥"

(২) "ডাহিনে লালিতপুর বাহিল ইন্দ্রাণী।
ইন্দ্রেশ্বর পূজা কৈল দিয়া ফুল পানি॥"

(৩) "লহনা খুল্লনা কাছে মাগিল মেলানি।
বাহিয়া অজয়নদ পাইল ইন্দ্রাণী॥"

কবি কাশীরাম দাস ও তৎকৃত মহাভারতের আদি ও স্বর্গারোহণপর্ব্বের শেষভাগে লিখিয়াছেন,—

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥"

এই ইন্দ্রাণী-পরগণার মধ্যেই বার-দুয়ারির ঘাট, গণেশমহাণ্ডার ঘাট, পীরের ঘাট প্রভৃতি ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী বারটী বাঁধাঘাট এবং ইন্দ্রেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ স্থাপিত ছিল। কাশীরাম দাস এই বার-ঘাটকেই "দ্বাদশ তীর্থ"

ভাগবত" কাটোয়ার ৭ ক্রোশ দক্ষিণস্থিত ও খড়িনদীর দক্ষিণতটে অবস্থিত দেনুড়গ্রাম-নিবাসী ঠাকুর বৃন্দাবন দাস কৃত এবং "চৈতন্য-মঙ্গল" শ্রীখণ্ডের নিকটবর্ত্তী কোগ্রাম-নিবাসী লোচনানন্দ দাস কৃত। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতের নাম প্রথমতঃ "চৈতন্য-মঙ্গল" রাখিয়াছিলেন এবং ঐ নামেই উহা আদৌ প্রচারিত হয়; এই নিমিত্ত কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনদাস-কৃত চৈতন্য-ভাগবতের পরিবর্ত্তে চৈতন্যমঙ্গলের উল্লেখ করিয়াছেন। লোচনানন্দ আপনার রচিত "চৈতন্যমঙ্গল" বৃন্দাবন-দাসকে দেখান। বৃন্দাবন গ্রন্থ খুলিয়া দেখিলেন, গৌরাঙ্গ যে দিবস সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে বিষ্ণু-প্রিয়ার সহিত বিহার বর্ণিত আছে। বৃন্দাবন ঐস্থলে বিহার বর্নন করেন নাই; এজন্য লোচনানন্দকে বলিলেন, "আপনি এস্থলে স্বাধীনভর্ত্তৃকাভাব বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু আমার বোধ হয়, প্রোষিতভর্ত্তৃকাভাব বর্ণনা করা উচিত ছিল।" এমন সময় বৃন্দাবনের মাতা নারায়ণী লোচনের মত সমর্থন করিয়া বলিলেন, "মহাপ্রভু রজনী-যোগে সন্ন্যাস-গ্রহণার্থ যাত্রা করিবেন বলিয়া আমি নিদ্রা না যাইয়া তাঁহার গমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, সেই সময় আমি গৃহের বাহির হইতে গৌরাঙ্গদেব ও বিষ্ণুপ্রিয়ার কথাবার্ত্তা সকলই শুনিয়াছি। আমি যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে লোচনের বর্ণনাই সত্য বলিয়া বোধ হয়।" মাতার কথা শুনিয়া এবং ঐ গ্রন্থের একস্থলে "অভিন্ন চৈতন্য মোর প্রভু নিত্যানন্দ" এই কবিতার্দ্ধ পাঠ করিয়া বৃন্দাবন দাস বলিয়াছিলেন, "আপনার "চৈতন্যমঙ্গল" গৌড়বাসীদিগের শ্রবণ ও লোচনানন্দ-দায়ক হইবে, আজি হইতে আমার রচিত "চৈতন্য-মঙ্গল" গ্রন্থের নাম "চৈতন্যভাগবত" হইল। সেই হইতেই বৃন্দাবনদাস-কৃত "চৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থ "চৈতন্য-ভাগবত" নামে পরিচিত হইয়াছে।

"সজ্জনতোষণী" হইতে সঙ্কলিত।

বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন এবং চণ্ডীকাব্যে এই ইন্দ্রেশ্বরের কথাই উক্ত হইয়াছে। বৃন্দাবন-দাসের পরবর্ত্তী সময়ের লোক হইয়াও মুকুন্দ-রাম ও কাশীরাম কাটোঙার কোন উল্লেখ না করিয়া ইন্দ্রাণীরই উল্লেখ করিয়াছেন কেন, ইহার কারণ এরূপ অনুমিত হয় যে, ভাগীরথী-তীরস্থ দ্বাদশ ঘাট ও ইন্দ্রেশ্বর শিবলিঙ্গ ইন্দ্রাণীর অন্তর্গত ছিল বলিয়া উহা সেইকালে যেরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, বিশ্বম্ভরের * সন্ন্যাস-গ্রহণ স্থান হইলেও তখনও কাটোঙা তত প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই; কাল-সহকারে যতই চৈতন্যসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অপরদিকে ইন্দ্রাণীর স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ ঘাটগুলি এবং ইন্দ্রেশ্বর-শিবলিঙ্গ যতই লোপো-মুখ হইতে চলিল; ইন্দ্রাণীর নামও ক্রমশঃ লোপ পাইয়া কাটোঙার নাম জাগ্রত হইয়া উঠিল। এখন ইন্দ্রাণী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধানের বিষয়ীভূত হইয়াছে।

"নিমাঞি-সন্ন্যাস" কথাটী যতদিন সুললিত স্বরে বাঙ্গালীর হৃদয়-তন্ত্রীতে বাজিতে থাকিয়া পুত্রহীনা জননীর শোকাবেগ উদ্বেলিত করিবে, ততদিন কাটোঙা ভাগীরথী-গর্ভে নিহিত হইলেও, সকলের স্মৃতি-পথে জাগরূক থাকিবেই থাকিবে; ততদিন—সর্ব্বসংহারক কাল, স্থানের ধ্বংস করিলেও নামের ধ্বংস করিতে পারিবে না।

১৪৩১ শকাব্দে (খৃঃ ১৫১০ অব্দে) উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিবসে ২৫ বৎসর বয়সে বিশ্বম্ভর গৃহত্যাগ করিয়া কণ্টকনগরে কেশব-ভারতীর নিকট সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেন। কেশব-ভারতীর প্রকৃত নাম গিরিপুরী-ভারতী। দক্ষিণ-সম্প্রদায়-মধ্যে ভারতী নামে এক শাখা সম্প্রদায় আছে; গিরিপুরী সেই শাখা-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন বলিয়া ভারতী আখ্যা প্রাপ্ত হন। সন্ন্যাস-গ্রহণকালে গৌরাঙ্গদেবের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম-করণ হয়, এই হইতেই তিনি শ্রীচৈতন্য নামে পরিচিত হন। এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে এইরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়;—

"শুন শুন আরে ভাই প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে কর্ম্মবন্ধ যায় নাশ॥
গঙ্গার হইয়া পার শ্রীগৌর সুন্দর।
সেই দিন আইলেন কণ্টকনগর॥
যারে যারে আজ্ঞা প্রভু পূর্ব্বে করেছিলা।
তাহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা॥
শ্রীঅবধূতচন্দ্র গদাধর মুকুন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য আর ব্রহ্মানন্দ॥
আইলেন প্রভু যথা কেশব-ভারতী।
মত্তসিংহ-প্রায় প্রিয়বর্গের সংহতি॥

পাইয়া উচিত নাম কেশব-ভারতী।
প্রভু-বক্ষে হস্ত দিয়া বলে শুদ্ধমতি॥
যত জগতেরে তুমি কৃষ্ণ বোলাইলা।
করাইলে চৈতন্য কীর্ত্তন প্রকাশিলা॥
এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সর্ব্বলোক তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন্য॥"
—শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড।

শ্রীচৈতন্যদেব কাটোঙায় কেবল একরাত্রি বাস করেন। পরদিন প্রাতঃকালে কেশব-ভারতীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া নীলাচলে (শ্রীক্ষেত্র-পুরুষোত্তমে) চলিয়া যান। ঐ রাত্রি তিনি হরি-সংকীর্ত্তন ও প্রেমভরে নৃত্য করিয়া অতিবাহিত করেন। যথা;—

"করিয়া সন্ন্যাস বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর।
সে রাত্রি আছিলা প্রভু কণ্টক-নগর॥

* মৃতবৎসা মাতার পুত্র বলিয়া নারীগণ প্রথমে ইহাকে 'নিমাঞি' এবং অত্যুজ্জ্বল গৌরকান্ত বলিয়া কেহ 'গৌরাঙ্গ' বলিয়াও ডাকিত। অন্নপ্রাশনের সময়ে ইহাঁর নাম 'বিশ্বম্ভর' হয়; পরে পঞ্চবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিষয়বাসনা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিবার সময়ে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামকরণ হইয়াছিল।

করিলেন প্রভু মাত্র সন্ন্যাস গ্রহণ।
মুকুন্দেরে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্ত্তন ॥
বোল বোল বলি প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য।
চতুর্দ্দিকে গাইতে লাগিল সব ভৃত্য ॥

* * * *

নাচিতে নাচিতে প্রভু গুরুকে ধরিয়া।
আলিঙ্গন করিলেন বড় তুষ্ট হঞা ॥
পাইয়া প্রভুর অনুগ্রহ-আলিঙ্গন।
ভারতীর প্রেমভক্তি হইল তখন ॥
পাক দিয়া দণ্ড কমণ্ডলু দূরে ফেলি।
সুকৃতি ভারতী নাচে হরি হরি বলি ॥

* * * *

এই মত সর্ব্বরাত্রি প্রভুর সংহতি ॥
নৃত্য করিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি ॥
প্রভাত হইলে প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
বলিলা গুরুর স্থানে বিষাদ করিয়া ॥
অরণ্যে প্রবিষ্ট মুঞি হইমু সর্ব্বথা।
প্রাণনাথ কৃষ্ণচন্দ্র মুঞি পাঙ যথা ॥
গুরু বলে আমিহ চলিব তোমা সঙ্গে।
থাকিব তোমার সাথে সংকীর্ত্তন-রঙ্গে ॥
কৃপা করি প্রভু সঙ্গে লইলেন তানে।
অগ্রে গুরু করিয়া চলিলা প্রভু বনে ॥”

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড।

শ্রীচৈতন্যদেব কীর্ত্তনের রঙ্গে নৃত্য করিয়াই কাটোঙায় অবস্থিতির রাত্রি যাপন করেন; এই নিমিত্ত ভাবগ্রাহী বৈষ্ণবেরা তদীয় নৃত্যের অবস্থাটী তথায় বিগ্রহরূপে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন। যে স্থানে গৌরাঙ্গ মস্তক-মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, সেই স্থান অদ্যাপি চিহ্নিত রহিয়াছে। কেশব-ভারতীর সমাজ (সমাধি) বলিয়াও তথায় একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু কেশব-ভারতী যে কাটোঙায় তনুত্যাগ করেন; তদ্বিষয়ে কিংবদন্তীর উপরই নির্ভর করিতে হইবে, বৈষ্ণবগ্রন্থে উহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। কাটোঙায় অবস্থান কালে যে মন্দিরটী গৌরাঙ্গদেবের বাসার্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেই মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। উহা অতি প্রাচীন ও সুদৃশ্য।

কাটোঙার নিকটবর্ত্তী মৌজে ঘোষহাটের অন্তর্গত জগাই-মাধাই-তলা। জগাই-মাধাইর * বাড়ী নবদ্বীপে ছিল। তাঁহারা কুলীনব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়াও অত্যন্ত মদ্যপ ও দস্যু ছিলেন; এমন কি, নবদ্বীপের লোক ইহাঁদিগের ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিত। সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বে গৌরাঙ্গদেব একদিন নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে নবদ্বীপের ঘরে ঘরে কৃষ্ণনাম শুনাইতে বলিলেন। তাঁহারা তাহাই করিতে লাগিলেন। দৈবাৎ তাঁহাদের সহিত জগাই-মাধাইর দেখা হইল। তাঁহারা ইহাঁদিগকে পরম পাতকী এবং হরিনাম শ্রবণের উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া “ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, বল কৃষ্ণ নাম” প্রভৃতি

* কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং ঠাকুর বৃন্দাবনদাস জগাই-মাধাইর পরিচয় এরূপ দিয়াছেন; যথা;—

“ব্রাহ্মণ-জাতি তারা নবদ্বীপে ঘর।
নীচসেবা নাহি করে নহে নীচের কূর্পর ॥”

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা।

“একদিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল।
মহাদস্যু প্রায় দুই মদ্যপ বিশাল ॥
সেই দুই জনার কথা কহিতে অপার।
তারা হেন করে হেন পাপ নাহি আর ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষণ।
ডাকা চুরি পরগৃহ দহে সর্ব্বক্ষণ ॥
দিয়ানে নাহিক দেখা যোলায়ে কোটাল।
মদ্য মাংস বিনা আর নাহি যায় কাল ॥
দুই জন পথে পড়ি গড়াগড়ি যায়।
যে যাহারে পায় সেই তাহারে কিলায় ॥

* * * * *

দুই জনে কিলাকিলি গালাগালি করে।
নিত্যানন্দ হরিদাস দেখে থাকি দূরে ॥
লোক স্থানে নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসে আপনি।
কোন্ জাতি দুই জন এ মতি বা কেনি ॥
লোকে বলে গোসাঞি ব্রাহ্মণ দুই জন।
দিব্য পিতা মাতা মহাকুলেতে উৎপন্ন ॥”

—শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড।

শুনাইতে লাগিলেন। মাতাল জগাই-মাধাই তখনও কৃষ্ণনাম শ্রবণের উপযুক্ত হন নাই, তাঁহাদের কাণে কৃষ্ণনাম ভাল লাগিত না, কাজেই তাঁহারা নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে মারিতে যাইতেন। একদিন তাঁহারা নিত্যানন্দকে প্রকৃতপক্ষেই প্রহার করিলেন। মট্‌কীর প্রহারে নিত্যানন্দের মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। তথাপি তিনি তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আরও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণনামই জয়যুক্ত হইল। জগাই মাধাই কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইলেন। সেই জগাই-মাধাই যে স্থানে সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হন এবং অবশেষে তনু ত্যাগ করেন, সেই স্থানই জগাই-মাধাই তলা। তথায় জগাই-মাধাইর সমাজ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ডাহাপাড়ার বত্বাধিকারীদিগের প্রদত্ত ভূমির উপস্বত্ব দ্বারাই তত্রত্য বিগ্রহের সেবা অনেকাংশে নির্ব্বাহ হয়।

নবদ্বীপের ন্যায় কাটোঙা এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান গুলিও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারকগণের প্রধান ক্রিয়াস্থল। এই কাটোঙারই দুই ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে শ্রীখণ্ড গ্রামে নরহরি ঠাকুরের নিবাস ছিল। তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি সেই গ্রামে বাস করিতেছেন। নরহরি ঠাকুর জাতিতে বৈদ্য এবং রায় রামানন্দ * জাতিতে কায়স্থ হইলেও চৈতন্যদেবের অনুগ্রহে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণকেই কৃষ্ণ নাম মন্ত্রদানে অধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের বংশধরেরা এখনও সেই অধিকারে বঞ্চিত নহেন। নরহরি ঠাকুর, মহাপ্রভুকে চামর ব্যজন করিতেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিবাস বর্দ্ধমানের অন্তর্গত চাখুন্দী গ্রামে। "চৈতন্যচরিতামৃত" প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা বৈদ্যকুলোদ্ভব কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিবাস কাটোঙার নিকটস্থ ঝামটপুর গ্রামে ছিল। "চৈতন্য মঙ্গল" গ্রন্থের রচয়িতা লোচনানন্দ দাসের নিবাস শ্রীখণ্ডের নিকটবর্ত্তী কো গ্রামে। লোচনানন্দ, নরহরি ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন।

কাটোঙাতে একটী প্রাচীন মস্‌জিদ আছে। এই মসজিদে সংলগ্ন এক প্রস্তর-ফলকে আরবি ভাষায় এইরূপ লিখিত আছে,—

"ইন্দল্ মশ্‌জিদা ফি ইন্দল্ ফা কানিল্
"আজুমে ফি সুলতানিল্ আকরামিল্ আম্-
"জাদে মহম্মদ্ ফররোখ-শেয়র পাদ্‌শা গাজি
'খল্লদাল্লাহোঁ আল্লা মুলকহোঁ আস্‌লতনা
"তাহেঁ মিনেল্-মহরমে সৈয়দ শাহ্-আলম্-খাঁ
"বাহাদুর।

'আল্‌ফা মেয়াতা সব-আ ইশ্‌রিণ।"

১০০০ + ১০০ + ৭ × ৭ + ১১২ = ২০ হিজুরি।*

উপরি-উক্ত লিপি দ্বারা ইহা স্থির হইতেছে যে, মহম্মদ ফররোখ-শেয়র যখন সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন (১১২৭ হিজরি সালে) সৈয়দ্-শাহ্-আলম-খাঁ এই মশ্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। আগ্রার যুদ্ধে জহান্দার-শাহ্‌কে পরাজয় করিয়া ১১২৪ হিজুরি সালে (১৭১২ খৃষ্টাব্দে) ফররোখ-শেয়র দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। সৈয়দ্-শাহ্-আলম খাঁ-বাহাদুর এই জহান্দার-শাহ্ বাদশাহের জনৈক উজীর ছিলেন। লাল-কুমারীর প্রেম বহ্নিতে

* ময়মনসিংহ জিলার অন্তঃপাতী টাঙ্গাইল মহকুমার মধ্যগত সিংহরাণী গ্রামে রায় রামানন্দের বংশধরেরা বাস করেন। ইহাঁরা বহুবংশীয়।

* "আল্‌ফা মেয়াতা সব-আ ইশ্‌রিণ" এই শব্দ দ্বারা যেরূপ ১১২৭ সংখ্যা উদ্ধার হইল, এইরূপ আরও অনেক আরবি, পারশিক ও উর্দ্দু শব্দ আছে, যাহাতে বৎসরের সংখ্যা স্থিরীকৃত হয়। যথা,—"কুল মোগল পোঁ" অর্থাৎ ১১৭৮ হিজরি সালে মীর কাশীম বাক্সারের যুদ্ধে পরাজিত হন। এরূপ, সিপাহী-বিদ্রোহের সময় কুমারসিংহের হাতে যে সময়ে গুলি লাগে তাহা "গোলি লাগি হাতমে, গোলি লাগি হাতমে" অর্থাৎ ১২৭৪ হিজরি সাল। বলা বাহুল্য যে, এই গোলিই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল।

সাম্রাজ্য-রূপ হবিঃ আহুতি-প্রদানানন্তর ফররোখ-শেয়রের আদেশে ছিন্ন-মস্তকোত্থিত রুধিরে প্লাবিত হইয়া জহান্দার-শাহ্ যখন অবৈধ ইন্দ্রিয়-প্রবণতার প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, ফররোখ-শেয়রের পিতা, পিতৃব্যগণ ও ভ্রাতাদিগের হত্যাপরাধে তদীয় প্রধান পৃষ্ঠপোষক খাঁ-নসরৎজঙ্গ-নবাব-জুলফকার-খাঁর দেহ যখন শত খণ্ডে বিভক্ত হইল, তখন সেই জহান্দার-শাহ ও জুলফকার-খাঁর পক্ষাবলম্বী সৈয়দ্-আলম্ খাঁ আর দিল্লীতে অবস্থান করা নিরাপদ মনে করিলেন না। তিনি দিল্লী পরিত্যাগ করিলেন এবং নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে কাটোঙায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অবশিষ্ট জীবন ধর্ম্মাচরণে অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্পে তিনি, কাটোঙার যে অংশ জঙ্গলময় ছিল, সেই অংশ আবাদ করিয়া বর্ত্তমান মশ্‌জিদ নির্ম্মাণ করিলেন। সেই সময়ে মুরশিদ-কুলি-জাফর-খাঁ সুবে-বাঙ্গালার দিয়ান ও নায়েব-নাজিম ছিলেন। জাফর-খাঁ এই বিষয় সম্রাট্ ফর্‌রোখ-শেয়রের গোচর করিলেন। সম্রাট্ সৈয়দ-শাহকে দমন করিবার চেষ্টা না করিয়া, বরং আহ্লাদ সহকারে মশ্‌জিদের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ ১৭,০০০৲ মুনাফার লাখেরাজ সম্পত্তি প্রদান করিলেন। এই লাখেরাজ-ভুক্ত এগারটী মৌজা ছিল। সৈয়দ-শাহ-আলম্-খাঁ ২৫০ জোয়ান সঙ্গে লইয়া আইসেন। তিনি যে জেরা (বর্ম্ম) পরিধান করিতেন, তাহা ৩।০ মণ লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত ছিল। এই লোহার জামা তাঁহার বংশীয় সফিওর্ রহমন্, কিছু দিন গত হইল, কাটোঙায় কোনও কর্ম্মকারের নিকট বিক্রয় করিলে, সেই কর্ম্মকার তদ্দ্বারা ছুরি, কাঁচি, দা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া উহার বিলোপ-সাধন করিয়াছে। সৈয়দ-শাহ্ মশ্‌জিদ ব্যতিরেকেও হুজরা, ভাগীরথী পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গ, ভাগীরথীর পাড়ে একটী পাথরের বাঁধা-ঘাট প্রস্তুত এবং মশ্‌জিদের তিন দিকে গড়খাই খনন করেন। সৈয়দ-শাহ-আলম-খাঁর পুত্র বাহারাম তৎসঙ্গেই কাটোঙায় আগমন করেন। কেহ কেহ বলেন, বাহারাম তাঁহার ঔরস-পুত্র নহেন, পোষ্যপুত্র; তিনি মহাধার্ম্মিক ছিলেন, স্ত্রী স্পর্শও করিতেন না, সুতরাং তাঁহার পুত্র হওয়া অসম্ভব। যাঁহারা শেষোক্ত মত সমর্থন করেন, তাঁহারা সৈয়দ-শাহ্ যে পূর্ব্বে সৈনিক-পুরুষ ও সংসারী ছিলেন, তাহা বিস্মৃত হন। যাহা হউক, সৈয়দ-শাহ্-আলম খাঁ-বাহাদুরের মৃত্যুর পরে সৈয়দ-শাহ্-বাহারাম মশ্‌জিদের দ্বিতীয় মুতওল্লি ও সম্রাট্-প্রদত্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। এই অবধি এই বংশেই মশ্‌জিদের মুতওল্লি পদ এবং সম্রাট-প্রদত্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব আবদ্ধ হয়। মশ্‌জিদ্‌টি এখন হতশ্রী হইয়া আছে এবং সম্পত্তিগুলি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। আমরা নিম্নে সৈয়দ-সাহেব বংশাপ্রদান করিলাম;—

সৈয়দ্ সাহ্-আলম্ খাঁ
|
বাহারম্
|
লালন্
|
গোলাম মোক্তাদির (ওরফে মুচি মিঞা) — হাড়ি মিঞা

গোলাম মোক্তাদির (ওরফে মুচি মিঞা)
|
এতিমর্-রহমান্ (এতিম্ মিঞা)
|
এক কন্যা
স্বামী—সৈয়দ-শাহ্-হাফিজ্-মহম্মদ্-আবদুল-সওার্ (হাফিজ সাহেব)

হাড়ি মিঞা
|
সফিওর্-রহমান্ (ইনি নিঃসন্তান)

এই হাফিজ্ সাহেবই এক্ষণ মস্‌জিদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন।

এদেশের এমন অনেক মশজিদ্ দরগা বা

কবর আছে, যাহাতে মুসলমান বীরপুরুষদিগের কীর্ত্তি ঘোষিত হইতেছে। সেই সকলের সংবাদ আমরা অতি অল্পই রাখি। পলাশী-ক্ষেত্রের যে স্থলে মীর-মদন-খাঁ (ইহাঁর প্রকৃত নাম সৈয়দ-শাহ্-আকবর-আলি) মেজর কিল্‌প্যাট্রিকের সৈন্যশ্রেণীর নিক্ষিপ্ত তোপে পদহীন হইয়া বীরোচিত মৃত্যুশয্যায় শায়িত হন, সেই স্থলে অদ্যাপি তাঁহার কবর বর্ত্তমান রহিয়াছে। চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকেরা রোগমুক্তির আশয়ে প্রতি বৃহস্পতিবারে ঐ কবর-সমীপে আসিয়া একত্রিত হয়। আমরা মীরমদনকে অনেক দিন ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু ইতর-লোকেরাও যে তাঁহার স্মৃতি জাগ্রত রাখিয়াছে, ইহাতে আমাদের শিক্ষাভিমানের প্রতি ঘৃণা জন্মে। এইরূপ পলাশী-গ্রামে সৈয়দ্-শাহ্-মনোয়ার-আলির কবর আছে; কিন্তু এই মহাত্মা কে ছিলেন, তদনুসন্ধান বিষয়ে এই প্রস্তাব-লেখকের অবকাশ বা সুবিধা ঘটে নাই। আমরা বিদেশীয়দিগের সংগৃহীত ও বর্ণিত বিবরণ পাঠ করিয়াই যখন ইতিহাসজ্ঞ বলিয়া আস্ফালন করিতে পারি, তখন আমাদের এই সকলের অনুসন্ধানেরই বা প্রয়োজন কি ?

ডাকাইতের উৎপাত-নিবারণ জন্য নবাব মুরশিদ্-কুলি-জাফর-খাঁ কাটোঙা ও কেন্দুয়া ডাঙ্গায় (গঞ্জ-মুরশিদপুরে) এক একটী থানা স্থাপন করেন। অজয় ও ভাগীরথীর সঙ্গমস্থলে কাটোঙার পরপারস্থ শাঁকাই গ্রামে একটী পুরাতন দুর্গের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয়। এই কেল্লাটী মৃত্তিকা-নির্ম্মিত। ইহার পরিধি অর্দ্ধ মাইল হইবে। ইহাতে ১৪টী কামান স্থাপিত ছিল। ইহাই কাটোঙার দুর্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ভারতবর্ষের প্রাচীন দুর্গগুলি প্রায়ই মৃত্তিকার প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত দেখা যায়। আসামীরা যখন মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেন, তখন বাঁশের কেল্লা প্রস্তুত করিতেন। বেশী দিনের কথা নয়, তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার বিষয়, বোধ হয়, অনেকেরই মনে আছে। মৃত্তিকা যেরূপ তোপের মুখে দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে, ইষ্টক বা প্রস্তর তদ্রূপ নহে। প্রসিদ্ধ ভরতপুরের দুর্গও মৃত্তিকার প্রাকারবেষ্টিত। মুসলমানেরা প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীরেরই যে অধিক পক্ষপাতী ছিলেন, আগ্রার দুর্গ দেখিলেই তাহা বুঝা যায়। ইংরেজেরা এই উভয়েরই পক্ষপাতী। তাঁহারা বহির্দ্দেশে মৃত্তিকা ও অন্তর্দ্দেশে প্রস্তর দ্বারা দুর্গ-প্রাচীর নির্ম্মাণ করেন। কলিকাতাস্থ ফোর্ট-উইলিয়ম-দুর্গ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কাটোঙার দুর্গের চতুর্দ্দিকে গড়খাই নাই। ছোট দুর্গ বলিয়াই বোধ হয়, উহা খানিত হয় নাই। বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে এক কাটোঙাতেই যে প্রাচীন দুর্গের চিহ্ন আছে, তাহা নয়; মেমারি ষ্টেশনের কয়েক মাইল দক্ষিণে কুলীন গ্রামের নিকটে একটী, আজমতশাহী পরগণার মধ্যগত ভাটাকুল গ্রামের নিকটে রামচন্দ্রগড় এবং রাণীগঞ্জের উত্তরে শেরগড় পরগণার মধ্যে অজয়নদের ধারে দুইটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকগণ অবগত আছেন যে, বর্গীর হাঙ্গামা-সময়ে কাটোঙা মারহাট্টাদিগের প্রধান আড্ডা ছিল। সেই সময়ে ইহাদের উৎপাত এত অধিক হইয়াছিল যে, "বর্গী আসিতেছে" এই কথা শুনিলেই কাটোঙা ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসীরা স্ত্রী পুত্র ও ধন-দৌলত লইয়া ভাগীরথীর অপর পারে যাইয়া আত্মরক্ষা করিত। অদ্যাপি ক্রন্দনশীল শিশুর ভয় উৎপাদন দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া নিদ্রাকর্ষণ করিতে হইলে বৃদ্ধারা বলিয়া থাকেন,—

"ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ুলো, বর্গী এলো দেশে !
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দিবো কিসে ।"

সুতরাং অধুনা বর্গী "জুজু" বা ভূতের স্থান অধিকার করিয়াছে।

উদ্ধানপুরে উদ্ধান দত্ত নামে জনৈক ধনী লোকের বাস ছিল। উদ্ধান দত্ত নিজ বাস্ত-বাটীর মৃত্তিকার নীচে অপর একটী বাড়ী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং "বর্গী আসিতেছে" এই সংবাদ শুনিলেই সপরিবারে সম্পত্তি লইয়া মৃত্তিকার নিম্নস্থ গৃহে যাইয়া বাস করিতেন। তাঁহার এক বিশ্বস্ত ভৃত্য "বর্গী দেশ হইতে চলিয়া গেল" সংবাদ দিত, এই সংবাদ পাইলে তাঁহারা মাটীর নীচে হইতে উঠিয়া আসিতেন। একবার বর্গী চলিয়া গিয়াছে ভাবিয়া এই বিশ্বস্ত ভৃত্য আনন্দে বংশীধ্বনি করিতেছিল, বর্গীর ইহাতে সন্দেহ হওয়াতে তাহারা এই ভৃত্যকে ধরিয়া বংশী-ধ্বনির কারণ জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কোন বিশ্বাস-যোগ্য উত্তর না পাওয়াতে ভৃত্যকে হত্যা করিয়া চলিয়া গেল। এবার উদ্ধান দত্ত আর সংবাদ পাইলেন না, অথবা সুড়ঙ্গের উপরিস্থিত প্রস্তরখণ্ড আর কেহ উঠাইল না; তাঁহারা মৃত্তিকা-নীচেই রহিয়া গেলেন, তদবস্থায় তাঁহাদের সকলের মৃত্যু ঘটিল। এই প্রবাদটী কত দূর সত্য, বলা যায় না। কিন্তু উদ্ধান দত্ত নামের সহিত উদ্ধানপুর গ্রামের সম্বন্ধ এবং "উদ্ধান" শব্দ "চুল্লী" অর্থ-জ্ঞাপক হওয়াতে এই প্রবাদের যথার্থতা বিষয়ে অনেকটা এরূপ আভাস পাওয়া যাইতেছে।

যাহা হউক, বর্গীর দৌরাত্ম্য অতি ভয়ানক ও অধিককাল স্থায়ী হইয়াছিল; এমন কি, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ তিলকচন্দ্র রায় এজন্য ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির নিকট দেয় মাল-গুজারি স্থগিত রাখিয়াছিলেন। দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ-শাহ মারহাট্টাদিগকে "চৌথ"-প্রদানে অসমর্থ হইয়া বড় উদ্বিগ্ন হন। এমন সময় শুনিতে পাইলেন যে, সরফরাজ খাঁকে যুদ্ধে নিহত করিয়া বিশ্বাসঘাতক আলিবর্দ্দি সুবে-বাঙ্গালার মসনদ্ অধিকার করিয়াছেন। বাদ-শাহ আলিবর্দ্দিকে দমন করিয়া সরফরাজ খাঁর পুত্রকে মসনদ্-প্রদান এবং প্রাপ্য রাজস্ব হইতে "চৌথ" আদায়ের অনুমতি প্রদান করিয়া মারহাট্টাদিগকে সুবে বাঙ্গালা অবরোধ করিতে অনুমতি দিলেন। এই সূত্রেই বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামার আরম্ভ হয়। মারহাট্টারা কখনও গঙ্গ-মুরশিদপুরে, কখনও বা কাটোঙায় থানা করিত।

১৭৪১ খৃষ্টীয় অব্দে বিরার-প্রদেশের মার-হাট্টা-রাজ রঘুজী ভোঁশলার জনৈক প্রধান কর্ম্মচারী ভাস্কর রাও-পণ্ডিত যখন প্রথম বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, সেই সময় নবাব আলিবর্দ্দি-খাঁ উক্ত মারহাট্টাদিগের সহিত যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজয় স্বীকার করিয়া ও সমু-দায় দ্রব্যজাত শত্রু-হস্তে প্রদান করিতে বাধ্য হইয়া, বিনা সম্বলে সমস্ত পথ মারহাট্টাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে, কখনও বা বৃক্ষের পত্র আহার করিয়া, কখনও বা অনাহারে মেদিনীপুর হইতে সাতদিবসে যেরূপে কাটোঙার দুর্গে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ইতি-পূর্ব্বেই মারহাট্টারা আসিয়া উক্ত নগর আগুন দিয়া পোড়াইয়া ফেলাতে খাদ্যদ্রব্যের অভাব বশতঃ আলীবর্দ্দির সৈন্যগণ যেরূপে অগ্নিতে অর্দ্ধদগ্ধীভূত তণ্ডুলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে, ইতিহাসে তাহা প্রধান স্মরণীয় ঘটনা। এতদ্বিষয়ে সৈয়দ্-গোলাম-হোসেন-খাঁ প্রণীত সায়র-অল্-মুতক্ষরিনের ইংরেজী অনুবাদক লিখিয়াছেন,—

"আলিবর্দ্দি খাঁ সসৈন্যে ক্ষেত্রের ঘাস ও বৃক্ষের পত্র আহার করিয়া, বিস্তীর্ণ আকাশ-রূপ চন্দ্রাতপের আচ্ছাদনে, শয্যাভাবে ভূমি-শয্যায় শ্রান্তিদূর করিয়া, বর্ষাকালের বৃষ্টিতে

পুনঃপুনঃ সিক্ত হইয়া, সপ্তদিবসে যে ভাবে মেদিনীপুর হইতে কাটোঙাতে হটিয়া আসেন, জগতের ইতিহাসে কেবল দুইটী ঘটনার সহিতই তাহার আংশিক তুলনা হইতে পারে ;—এক পারস্যরাজ সাইরসের পশ্চাদ্গমন ; অপর, মারেকাল-ডি-বেলিস্লের প্রেসনগর হইতে যাত্রা। সাইরস্ ও বেলিস্লে পার্ব্বতীয় প্রদেশ দিয়া হটিয়া যান এবং তাঁহারা শত্রুকর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ আক্রান্ত হন নাই। কিন্তু আলিবর্দ্দি পর্ব্বতের আশ্রয় প্রাপ্ত হন নাই, তিনি সমতলভূমির উপর দিয়াই পশ্চাৎপদ হন ; এরূপ নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থায় তাঁহাকে যেরূপ পুনঃপুনঃ শত্রু-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে হইয়াছিল, সাইরস ও বেলিস্লের তাহা হয় নাই।”

যাহা হউক, আলিবর্দ্দি এইরূপে কাটোঙার দুর্গে আশ্রয় লইয়া মুর্শিদাবাদ হইতে খাদ্য-দ্রব্য ও বস্ত্রাদি আনাইয়া সৈন্যদিগকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করেন। সংবৎসর-ব্যাপী বহু যুদ্ধের পর তিনি এই কাটোঙার দুর্গ হইতেই ১৭৪২ খৃষ্টীয় অব্দের অক্টোবর মাসে মারহাট্টাদিগকে পরাজয় করেন।

১৭৫৭ খৃঃ অব্দে, পলাশী-যুদ্ধের কয়েকদিন পূর্ব্বে, কাটোঙায় একটী কৃত্রিম যুদ্ধ হইয়াছিল। নবাব-পক্ষীয় কাটোঙার দুর্গের কেল্লাদার এবং ইংরেজ-কোম্পানির পক্ষীয় ক্লাইবের অধীনস্থ মেজর কুটের সহিত এই যুদ্ধ হয়। ক্লাইব পূর্ব্বেই জানিতেন যে, পলাশী ক্ষেত্রে যাওয়ার সময়ে পথিমধ্যে কাটোঙায় এক যুদ্ধ হইবে, সুতরাং তিনি কাটোঙার কেল্লাদারকে হস্তগত করিবার চেষ্টা দেখিলেন। কেল্লাদার বিনা যুদ্ধে পথ ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন না ; কিন্তু এইরূপ বন্দোবস্ত হইল যে, তিনি যুদ্ধ করিতেছেন ইহা লোককে দেখাইবেন, অবশেষে যুদ্ধে হারিয়া যাইবেন। নবাব-পক্ষীয় মীর-জাফর, দুর্লভরাম প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী ইংরেজের পৃষ্ঠ-পোষক। একাধারে লোকবল, বাহুবল, বুদ্ধিবল এবং অধ্যবসায়, কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও দূরদর্শিতা ইংরেজের প্রধান সহায় ;—এরূপ স্থলে কাটোঙার ন্যায় একটী ক্ষুদ্র দুর্গ কিংবা পলাশীর যুদ্ধ জয় করা অতি তুচ্ছ কথা ! যদি কেবলই শৌর্য্য ও বীর্য্যবলে এই সকল যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ক্লাইবের বীর্য্যকীর্ত্তি সমীচীন হইত সন্দেহ নাই ; কিন্তু বীরাধমেরাও যে সকল উপায় অবলম্বন করা অত্যন্ত হীন মনে করে, ক্লাইব সেই সকল উপায় অবলম্বন করিতে কোন অংশে ত্রুটি করেন নাই। পলাশীর-যুদ্ধ সম্বন্ধে কলিকাতা-রিভিউ-পত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই ;—

“মীরজাফর বিশ্বাসঘাতক না হইলে সম্ভবতঃ ক্লাইব বিনাশপ্রাপ্ত হইতেন। কোর্টেজ নির্ভীক মেক্সিকান্‌দিগকে যে সকল যুদ্ধে পরাজয় করেন, সেই সকলের সহিত এই যুদ্ধের কোন তুলনাই চলিতে পারে না ; কারণ, এতদুভয়ের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই স্থানে (পলাশী-ক্ষেত্রে) উল্লেখযোগ্য কোন যুদ্ধই হয় নাই। নবাবের পক্ষে যত সৈন্য ছিল, তত সংখ্যক যুদ্ধকৌশলানভিজ্ঞ অস্ত্র-শস্ত্রহীন লোকও যদি ইংরেজের প্রতিদ্বন্দ্বী হইত, তাহা হইলে তাহারাও নবাব-সৈন্যাপেক্ষা ইংরেজদিগকে কোন অংশে অল্প-বাধা প্রদানে অসমর্থ হইত না ; অথবা তাহারা নবাব-সৈন্যের মত অত্যধিক আশঙ্কাগ্রস্ত হইলেও অনায়াসে অপেক্ষাকৃত অল্প ক্ষতি সহ্য করিয়াই তফাৎ হইতে পারিত।”

পলাশীর যুদ্ধের আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। কাটোঙার দুর্গ জয় করিতে মেজর-কুট কিরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখা যাউক।

১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ১৭ই জুন তারিখে মেজর

আয়র-কুট্ ২০০ ইউরোপীয়, ৫০০ সিপাহি-সৈন্য এবং একটী বড় ও একটী ছোট কামান সহ কাটোঁওার দুর্গ-জয়াভিলাষে যাত্রা করিয়া সেই দিনই দ্বিপ্রহর রাত্রিতে তথায় উপস্থিত হন; ইতিপুর্ব্বেই নগরবাসীরা স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছিল, নগর-রক্ষার্থ কোন বন্দোবস্তই করা হয় নাই, সুতরাং কুট সাহেব নির্ব্বিবাদে নগর অধিকার করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে মেজর-কুট সসৈন্যে অজয়-নদের ধারে যাইলেন এবং যুদ্ধের তাৎকালিক অনিচ্ছা-জ্ঞাপক ও মিত্রতা-সূচক শ্বেত-পতাকা উড্ডীন করিলেন। অজয়-নদের পরপারেই শাঁকাই-গ্রামস্থ কাটোঁওার দুর্গ। কেল্লাদার প্রথমতঃ কয়েকটী কামান ছুড়িলেন ও পরে দুর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক নদের ধারে আসিলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার বন্দোবস্ত হইল। মেজর-কুট বিনা-যুদ্ধে দুর্গ পরিত্যাগ করিবার জন্য কেল্লাদারকে বলিলেন; কিন্তু কেল্লাদার তাহাতে সম্মত না হওয়াতে মেজর-কুট দুর্গ আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সিপাহীদিগকে নদ পার হইতে আদেশ দিলেন। সিপাহীরা বিনা-বাধায় পরপারে উপস্থিত হইয়া কোনও উন্নত ভূমির অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া দুর্গের সীমান্তবর্ত্তী মৃত্তিকার প্রাচীরে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। এদিকে ইউরোপীয় সৈন্যেরাও অজয়-নদের উর্দ্ধ দেশে যাইয়া হাঁটিয়া পার হইল। কেল্লাদার ইহাদিগকেও কোন বাধা দিলেন না; বরং তাহারা নদ পার হইলেই প্রাচীর-সংলগ্ন কুটীর-গুলিতে আগুন দিয়া সসৈন্যে উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মেজর-কুট অবিলম্বে দুর্গ অধিকার করিলেন। চৌদ্দটী কামান এবং বারুদ-গুলি, অস্ত্র-শস্ত্র প্রভৃতি অনেক যুদ্ধোপকরণ তাঁহার হস্তগত হইল। তথায় এত শস্য সঞ্চিত যে, দশ সহস্র লোকের এক বৎসরের খোরাক অক্লেশে চলিতে পারিত। এইরূপে মেজর-কুট কাটোঁওার দুর্গ জয় করেন। যাহা হউক, ইংরেজ-ঐতিহাসিকেরা ইহারই মধ্যে মেজর-কুটের বীরত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। তাঁহারা ইতিহাসে এরূপ আভাস দিয়াছেন যে, কেল্লাদার পূর্ব্বের বন্দোবস্ত অনুসারে রণভঙ্গ দেন নাই, যথাসময়ে তাঁহার প্রকৃতই যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল এবং প্রকৃত পক্ষেই যুদ্ধে হারিয়া পলায়ন করেন। যেরূপেই হউক, কাটোঁওার দুর্গ ইংরেজের হস্তগত হইল। এই স্থানে বসিয়াই ক্লাইব পলাশী-ক্ষেত্রে যাত্রা করিবেন কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন যে, এক হাজার ইউরোপীয় ও দুই হাজার এতদ্দেশীয় সৈন্য লইয়া নবাব-পক্ষীয় পঁয়ত্রিশ হাজার পদাতি ও পনর হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের সহিত প্রকৃতপক্ষে সম্মুখসমরে প্রবৃত্ত হওয়া উন্মত্ততা ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়; সুতরাং তাঁহার একমাত্র ভরসার স্থল—মীর-জাফর প্রভৃতির সহায়তা। সেই মীর-জাফরের পত্র না পাইয়া তিনি মহাবিপদ্-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। ১৬ই জুন তারিখে মীর-জাফরের যে পত্র প্রাপ্ত হন, তাহাতে লেখা ছিল যে, মীর-জাফরের বাহ্যতঃ নবাবের সহিত মিলন হইয়াছে, তিনি কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছেন,—ইংরেজের সাহায্য করিবেন না। এই সংবাদ জানাইয়া মীর-জাফর সেই পত্রেই ক্লাইবকে লিখিয়াছেন,—ইংরেজদের সহিত তিনি যে বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন, তদ্বিষয় কার্য্যে পরিণত করিবেন। ইহার পর ক্লাইব মীর-জাফরের আর কোন পত্র পান নাই। এদিকে ২০শে তারিখে কালনা হইতে ওয়াটস্ সাহেবের প্রেরিত লোক আসিয়া ক্লাইবকে বলিল,—ওয়াটস্ সাহেব গোপনে মীর-জাফর ও মীরণের সহিত একদিন সাক্ষাৎ করেন; তাঁহাদের কথাবার্ত্তা চলিতেছে—এমন

সময় নবাব-পক্ষীয় লোকেরা সেই স্থান দিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া মীর-জাফর ও মীরণ অমনি ওটাট্‌স্ সাহেবকে গুপ্তচর নামে অভিহিত করিয়া তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিবেন বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিলেন এবং আরও বলিলেন যে, যদি ইংরেজেরা আস্পর্দ্ধা বশতঃ ভাগীরথী পার হইতে সাহস করে, তবে তাহাদের সকলকেই বিনাশ করিবেন। ক্লাইব এই সংবাদ শুনিয়াই সিলেক্ট-কমিটির আদেশপ্রার্থী হইয়া লিখিলেন, নবাবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সমস্ত সৈন্যকে বিপদ্‌সাগরে নিক্ষেপ করা তাঁহার যুক্তিসিদ্ধ নহে। যদি মীরজাফর তাঁহাদের সঙ্গে যোগ না দেন, তবে তিনি সসৈন্যে বর্ষার অবসান পর্য্যন্ত কাটোওার দুর্গেই অবস্থান করিবেন, তথায় প্রচুর খাদ্য-সামগ্রীও রহিয়াছে; ইতিমধ্যে এদেশীয় কোন রাজা তাঁহাদের সহিত যোগদান বিষয়ে প্রবর্ত্তিত হইতেও পারেন। সেই দিন (১৯শে জুন) সন্ধ্যাকালে ক্লাইব মীরজাফরের এক পত্র পাইলেন, তাহাতেও তাঁহার সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল না। তিনি কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইলেন। মীরজাফর যদি কার্য্যকালে তাঁহার সঙ্গে যোগ না দেন, অথবা যদি তিনি যুদ্ধে পরাজিত হন, তবে এই পরাজয়-সংবাদ প্রদানার্থ একজন লোকেরও প্রাণ লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা নাই। ক্লাইব সৈন্তাধ্যক্ষদিগকে পরামর্শের জন্য আহ্বান করিলেন। তন্মধ্যে ক্লাইব ও অপর বার জনে ভাগীরথী পার হইয়া নবাবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার বিপক্ষে এবং মেজর-কুট ও অপর ছয় জন তৎপক্ষে অভিমত প্রকাশ করিলেন। সৈনিকপুরুষদিগের মতামত গ্রহণ করিয়াও ক্লাইবের উদ্বেগ দূর হইল না। আইভ্‌স্ এবং ক্রাফ্‌টন্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, ক্লাইব মীর-জাফরের পত্র পাইয়া অধিকাংশের মত অগ্রাহ্যপূর্ব্বক সাহসে ভর করিয়া তৎপরদিন প্রাতঃকালে (২২শে জুন) সৈন্যদিগকে ভাগীরথী পার হইবার অনুমতি দিলেন। ১৭৫৬ খৃষ্টীয় অব্দের ২৩শে জুন তারিখে পলাশী-ক্ষেত্রে যে নামমাত্র যুদ্ধ হইয়াছিল, যে যুদ্ধ ভারতের ভাগ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন-সাধনের মূলীভূত হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত কাটোওাতেই সেই যুদ্ধের আয়োজন, ইংরেজের বলাবল-স্থিরীকরণ এবং যেরূপে সিরাজদ্দৌলাকে পরাজয় করা যাইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছিল। এই প্রবন্ধের সহিত পলাশীর যুদ্ধের অপরাপর ঘটনার কোন সম্বন্ধ না থাকায় আমরা এস্থলে তত্তৎ বর্ণনে ক্ষান্ত হইলাম। যে যে কারণে পলাশীর যুদ্ধ ঘটে এবং যেরূপে ক্লাইব জয়লাভ করেন, তাহার বিবরণ পাঠার্থীদিগকে আমরা সৈয়দ্-গোলাম-হোসেন-খাঁ, আবিবেনেল,আইভ্‌স্, পার্কার, লুক্-স্ক্রাফ্‌টন্, ক্রম্‌, হেণ্টী প্রভৃতি লেখকদিগের গ্রন্থ পাঠ করিয়া সার-সঙ্কলন করিতে অনুরোধ করি; তাঁহারা যেন মার্স্‌মান্‌, লেথ্‌ব্রিজ, হাণ্টার প্রভৃতি ইংরেজের অথবা আমাদের বিদ্যাসাগর ও রমেশচন্দ্র দত্তের বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠ করিয়া এতদ্বিষয়ে কোনরূপ অপ্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত না হন।

কাটোওার দুর্গের নিকটে শাঁকাইগ্রামে এড্‌ডিস্ সাহেবের এক নীলের কুঠী ছিল। বর্গীর অত্যাচারের সহিত সম্যক্ তুলনা না হইলেও নীলকুঠীর অত্যাচার কিছু কম ছিল না। সেকালের অনেক জমিদার সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও প্রজাদিগকে অন্যদীয় অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেন। স্থানীয় জমিদার তাহাই করিলেন। নীলকুঠীর সহিত তাঁহারই লড়াই বাঁধিল। প্রথম, সর্দ্দার-পাইকের লাঠির লড়াই; তৎপরে মোকদ্দমা। নীলকুঠী অধঃপাতে গেল, জমিদারও নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন।

১৮৭১ খৃষ্টীয় অব্দে এই নীলকুঠীর কাজ একেবারে বন্ধ হয়। এখন সেই নীলকুঠির ভগ্ন অট্টালিকা পড়িয়া রহিয়াছে।

নিমাঞির সন্ন্যাস, আলম-শাহের মশজিদ, ডাকাইত-নিবারণের জন্য নবাব মুরশিদ-কুলি-খাঁর থানা-স্থাপন, দুর্গ, মারহাট্টাদিগের উৎপাত ও আলিবর্দ্দি কর্ত্তৃক তন্নিবারণ, লর্ড ক্লাইবের কাটোঙার দুর্গে অবস্থান ও নবাব সিরাজ-দ্দৌলার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ভাগীরথী পার হইয়া পলাশীর ক্ষেত্রে যাত্রা করিবার মন্ত্রণা-স্থিরীকরণ—এই সকল কারণে এই নগরী ইতিহাসের বিষয়ীভূত হইয়াছে। কিন্তু এ সকল গত কথা। অধুনা ইহা বাণিজ্য-স্থান ও মহাকুমা বলিয়াই পরিচিত। মহাকুমা বলিলেই এই স্থানে ডিপুটি-মাজিষ্ট্রেট্ ও মুন্সেফদিগের কাছারি, জেল-খানা, ত্রেজরি, দাতব্য-চিকিৎসালয়, * টেলিগ্রাফ ও পোষ্ট-আফিস, পুলিশের থানা, সব-রেজেষ্টরি, মিউনিসিপালিটী, লোকাল্-বোর্ড, স্কুল প্রভৃতি স্থাপিত আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। বাণিজ্য-স্থান বলিয়া এখানে অনেক ব্যবসায়ীর, এবং কতিপয় আফিস থাকাতে চাকুরেদের বাসই গণনীয়। আমাদের দেশে ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে শিক্ষার আদর অতি কম বলিয়াই অত্রত্য বিদ্যালয়টীর অবস্থা সন্তোষজনক নহে। আমরা পড়ি—পরীক্ষা পাশ করিতে, এবং পরীক্ষা পাশ করি—চাকুরির দায়ে; সুতরাং চাকুরি যাঁহাদের উপজীবিকা নহে, তাঁহারা সাধারণতঃ স্কুল ও কলেজি শিক্ষার আদর করেন না। অশিক্ষিত লোকের হস্তে ব্যবসায়-বাণিজ্য পড়াতে ইউরোপীয়দিগের সহিত প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশীয় লোকেরা পশ্চাৎপদ হইতেছেন। এক্ষণে দেশের চৌদ্দ-আনা বাণিজ্য বিদেশীয়দিগের হস্তে, অপর দুই-আনা কেবল এদেশীয়দিগের হাতে আছে; এই দুই-আনাও যে থাকিবে, তাহার সম্ভাবনা অতি কম। সকল বিষয়েরই সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত * জ্ঞান লাভ করিয়া, তাহা সামঞ্জস্যরূপে যথাভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেই প্রকৃত বিজ্ঞতা হইল। ইউরোপীয়েরা সাধারণতঃ এরূপ বিজ্ঞ এবং এ জন্যই তাঁহারা এত উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা সকলের স্বার্থের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থকে উপেক্ষা করিতে পারেন; কারণ, তাঁহারা জানেন যে, সাধারণের স্বার্থ রক্ষিত না হইলে ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষিত হইতে পারে না। আমরা নিজ নিজ স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত। কুশিক্ষা বা প্রকৃত শিক্ষার অভাব বশতঃ অপর দশ জনের সহিত যে আমাদের স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে, তাহা আমরা দেখি না, অথবা দেখিতে অক্ষম। বণিক্দিগের ভালরূপ লেখাপড়া শিক্ষার আবশ্যকতা আছে আমদানি-রপ্তানি কি কি নিয়মের অধীন, বাণিজ্য দ্রব্যের মূল্যের ইতর-বিশেষ কি কি অবস্থায় ঘটিয়া থাকে, এতদ্দেশীয় ও বিদেশীয় কোন্ কোন্ রাজবিধি-প্রণয়ন বা রাজকর-স্থাপন দ্বারা আমাদের ব্যবসার হানি হইতেছে,—এই সকল বিষয় সম্যক্ বুঝিতে হইলে বার্ত্তাশাস্ত্রে (Political economy) অভিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক; সুতরাং ব্যবসায়ও উচ্চশিক্ষা-সাপেক্ষ। সত্য বটে, দেশের সভা-সমিতিগুলি এতদ্দেশীয় বণিক্দিগের স্বার্থ-সংরক্ষণ উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অভাব ও অসুবিধা অবগতির জন্য রাজপুরুষদিগের নিকট সময়ে সময়ে আবেদন করেন; কিন্তু যে সকল লোক লইয়া এই সকল সভা-সমিতি গঠিত, তাঁহারা

* সংক্রামক জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব বশতঃ ১৮৬০ খৃঃ অব্দের এপ্রেল মাসে এখানে দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়।

* "সমষ্টিরীশঃ সর্ব্বেষাং স্বাত্মতাদাত্ম্যবেদনাৎ। তদভাবাৎ ততোঽন্যে তু জ্ঞায়ন্তে ব্যষ্টিসংজ্ঞয়া॥"

সাধারণতঃ বিজ্ঞ ও বহুদর্শী হইলেও তাঁহাদের তদ্‌বিষয়ক অভিজ্ঞতার অভাব বশতঃ ইংরেজ-ব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতায় সে আবেদন টিকিতে পারে না, সুতরাং তাঁহাদের উদ্যম প্রায়শই ব্যর্থ হয়। লেখা-পড়া শিখিলেই যে কেরানী-বাবু, মুন্সেফ-বাবু কিংবা ডেপুটি-বাবু হইতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। চাকুরি বড়ই হউক কি ছোটই হউক, উহা দাসত্ব ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। ব্যবসা স্বাধীন উপজীবিকা, দাসত্ব নহে। ব্যবসায়ীদের মধ্যে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক বিরল, এইজন্যই উহা আমাদের সমাজে নিন্দনীয়। যখন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকেরা বাণিজ্য ব্যবসায়ী হইবেন এবং তাঁহাদের উচ্চ-শিক্ষা তৎকার্য্যে প্রযুক্ত হইতেছে—ইহা সাধারণে দেখিতে পাইবে, তখনি সাধারণের তৎপ্রতি হেয়জ্ঞান ঘুচিবে। "গোলামের জাতি শিখেছে গোলামী", সুতরাং আমরা যে দাসত্ব অনেকাংশে পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনজীবিকা অবলম্বন করিব ও তাহার উপযোগী শিক্ষালাভে যত্নপর হইব, সে আশা সুদূর-পরাহত।

শ্রীরসিকলাল ঘোষ

টাইমন্ অব্ এথেন্স্।

(১)

এথেন্স নগরে টাইমন্ নামে এক মহা-সমৃদ্ধিশালী, উদার-হৃদয় ভূম্যধিকারী বাস করিতেন। দানশীলতায় তিনি চির-প্রসিদ্ধ;—মুক্তহস্তে দান করা তাঁহার দৈনিক কার্য্য ছিল। একে অতুল সম্পত্তি, তাহার উপর দানে আন্তরিক অনুরাগ;—টাইমনের বদান্যতায় কি দীনহীন পথের ভিখারি, কি ভাগ্যবন্ত সমৃদ্ধিশালী,—সকলেই প্রার্থিত ধন লাভ করিত। কাজেই, আপামর সাধারণ তাঁহার অনুগত ও বশংবদ হইয়া পড়িল। সদাশয় টাইমন্ সদাব্রত—অন্নসত্র খুলিয়া রাখিতেন;—তাহাতে আহূত, অনাহূত, ধনী, নির্ধন,—সকলেই চর্ব্ব-চূষ্য-লেহ্য-পেয়রূপে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া আহার করিত। অবারিত দ্বার হওয়ায়, তদীয় ভবনে অহর্নিশ যে কতবিধ লোকের সমাগম হইত, তাহার ইয়ত্তা নাই। ফলতঃ, মহাত্মা টাইমনের সাধু-চরিত্রে ও অতুলনীয় দানশীলতায়, এথেন্স নগরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কাহারও কোন অভাব রহিল না।—প্রীতমনে সকলেই তাঁহার উপাসনা ও স্তুতি-গান করিতে লাগিল।

অর্থাভাববশতঃ কোন কবি কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া জনসমাজে প্রকাশিত করিতে যদি সমর্থ না হইতেন, তিনি টাইমনের নামে তাঁহার কাব্য উৎসর্গ করিতেন;—তৎক্ষণাৎ সেই কবি আশাতীত ফল লাভ করিতেন। কারণ, প্রচারিত গ্রন্থ বিক্রয়ের যেমন সুবিধা হইত, বদান্য টাইমনের নিকট হইতে সেই কবির তেমনি প্রচুর অর্থও লাভ হইত। অধিকন্তু সেই কবির জন্য টাইমনের গৃহদ্বার নিয়তই উন্মুক্ত থাকিত। এইরূপ, যদি কোন চিত্রকর কোন চিত্র লইয়া টাইমন্‌কে দেখাইতে গিয়াছে এবং সেই চিত্রখানি তাঁহার রুচিসঙ্গত হইয়াছে কিনা, জানিবার জন্য মিথ্যা ভাণ করিয়া তদীয় প্রসাদ লাভে উৎসুক হইয়াছে, টাইমন্ তৎক্ষণাৎ তাহা কিনিয়া লইতেন। যদি কোন জহুরি কিংবা কোন বহুমূল্য-দ্রব্য-বিক্রেতা আপন আপন জিনিষের বিক্রয়ের সুবিধা করিতে না পারিত, তবে তাহারা লর্ড টাইমনের নিকট সেই গুলি আনিত এবং উচিত মূল্য হইতেও অনেক অধিক মূল্য প্রাপ্ত হইত। এইরূপে বিবিধ দ্রব্যে টাইমনের গৃহ

পূর্ণ হইল এবং এইরূপে চতুর্দ্দিক হইতে নানা প্রকারের লোক তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল। প্রতিভাশূন্য কবি, সৌন্দর্য্য-বোধহীন চিত্রকর, ধূর্ত্ত ব্যবসায়ী, তোষামোদকারী ধনী ও নির্ধন স্ত্রী-পুরুষ, একে একে অনেকেই আসিতে লাগিল। সেই সমবেত চাটুকারমণ্ডলী মনোমোহকর তোষামোদে, উদার-চেতা টাইমন্‌কে ভুলাইয়া রাখিত এবং আপনাদিগের স্বার্থ-সিদ্ধি করিত। তাহারা এতদূর পর্য্যন্ত বলিত, "আপনি ঈশ্বর সদৃশ; আপনারই অনুগ্রহ ও বদান্যতা আমাদের জীবন রক্ষার প্রধান উপায়;—এমন কি, আপনার কৃপায় এই নির্ম্মল বায়ু পর্য্যন্ত আমরা উপভোগ করিতে সমর্থ হইতেছি।"

প্রত্যহ এইরূপ হরেক রকমের জীব আসিয়া থাকে। তাহার মধ্যে অল্পবয়স্ক ধনি-সন্তানও আসিত। অপরিণামদর্শিতায় ও বিলাস-আড়ম্বরে কপর্দ্দকবিহীন হইয়া তাহারা ঋণগ্রস্ত, কেহ বা ঋণের দায়ে কারারুদ্ধ,—লর্ড টাইমন্ অমনি অর্থ দিয়া সেই হতভাগ্য যুবকগণকে উদ্ধার করিতেন। অবশ্য, এজন্য তাহারা টাইমনের যথেষ্ট প্রশংসা করিত। ধূর্ত্তগণ এইরূপে বিশিষ্টরূপ ঘনিষ্টতা করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে লাগিল। তাহারা আপনারা অর্থশূন্য, কিন্তু টাইমনের পূর্ণ ভাণ্ডারে অধিকার পাইয়া যথেচ্ছাচার করিতে লাগিল। এই দলের একজন শোণিতপায়ীর নাম ভিন্‌টিডিয়াস্। হতভাগ্য বিপুল ঋণজালে আবদ্ধ হইলে বদান্য টাইমন্ প্রভূত অর্থদানে তাহাকে উদ্ধার করেন।

টাইমনের অদ্ভুত দান দেখিয়া অর্থের আশায় নানা প্রকারের লোক নানা কৌশল আরম্ভ করিল। অনেক লোক প্রচুর লাভের আশায় বহু দ্রব্য তাঁহাকে উপহার দিবার নিমিত্ত আনিত। যদি টাইমন্ একটী কুক্কুর কিংবা একটী অশ্ব, কিংবা একটী অল্প মূল্যের কোনও একটী দ্রব্য পছন্দ করিতেন, তবে তদ্ব্যবসায়ী ধূর্ত্তগণ তৎক্ষণাৎ তাহা টাইমনের নিকট প্রেরণ করিত। এবং টাইমন্ সেই সকল দ্রব্যের দশগুণেরও অধিক মূল্য দিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেন। এইরূপে লর্ড লুসিয়াস্ একদিন চারিটী শ্বেতবর্ণ অশ্ব উপহার পাঠাইলেন। বলা বাহুল্য, টাইমন্‌কে একদিন ঐরূপ অশ্বের প্রশংসা করিতে তিনি শুনিয়াছিলেন। আর একদিন লর্ড লোকুলাস শুনিয়াছিলেন, টাইমন্ কতকগুলি শিকারী কুকুরের প্রশংসা করিতেছেন;—তিনি অমনি সেইরূপ কতকগুলি কুকুর তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। সরল ও সহৃদয় টাইমন্ এই সকল কপট বন্ধুর আন্তরিক অভিপ্রায় বুঝিতে পারিতেন না। কাহারও প্রতি অবিশ্বাস করিতে তিনি জানিতেন না। অনুগত জনের উপহার, তাহাদের আন্তরিক প্রীতির নিদর্শন জানিয়া তিনি সেই সকল দ্রব্যের বিনিময়ে বিস্তর অর্থ ও বহুমূল্য রত্নাদি প্রত্যুপহার দিতেন।

কখন কখন এই জীবগণ প্রত্যক্ষভাবেও স্বার্থসাধন করিতে লাগিল। টাইমনের যে-কোন দ্রব্য তাহারা প্রশংসা করিত। টাইমন্ যদি বস্তুতই ন্যায্য মূল্যে কোন দ্রব্য কিনিলেন, অমনি তাহারা বলিয়া উঠিল, "মহাশয়, অতি অল্প মূল্যে এই বস্তুটী লাভ করিলেন।" এইরূপ মিথ্যা প্রশংসায় তাহারা সরলমতি টাইমন্‌কে মুগ্ধ করিত। টাইমন অমনি সেই প্রশংসিত দ্রব্য সেই চাটুকার-কুক্কুরগণকে প্রদান করিতেন। একদিন এক ভূম্যধিকারী টাইমনের একটী অশ্বের প্রশংসা করিতেছিলেন; টাইমন্ ভাবিলেন, "দেখিতেছি, এ ব্যক্তির এই অশ্বটীর প্রতি লোভ হইয়াছে; অতএব ইহা এই ব্যক্তিকেই প্রদান করা কর্ত্তব্য।" এই ভাবিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সেই

অশ্বটি তাহাকে প্রদান করিলেন। তিনি জানিতেন, কোন দ্রব্য লাভের জন্য আন্তরিক ইচ্ছা না হইলে লোকে মন খুলিয়া তাহার প্রশংসা করে না, করিতে জানেও না। আপনার অন্তর দিয়াই টাইমন্ সকল লোকের অন্তর বিচার করিতেন। দান করিতে তিনি এতই ভাল বাসিতেন যে, চাই কি, যদি তাঁহার অধিক রাজ্য থাকিত, এবং কেহ তাহার প্রার্থী হইত, সেই রাজ্য পর্য্যন্ত দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না।

মহাত্মা টাইমনের বিপুল অর্থরাশি কেবলই যে, এইরূপ প্রতারক ও ধূর্ত্ত লোকদিগের সন্তোষার্থ ব্যয়িত হইত, এমন নহে,—অনেক সৎকার্য্যেও টাইমন্ মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার এক ভৃত্য এথেন্সবাসিনী এক রমণীর পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইয়াছিল। কিন্তু অর্থাভাব প্রযুক্ত কন্যার পিতা তাহাকে কন্যাদান করিতে আপত্তি করিলেন। কন্যার পিতা ধনী, ধনিগৃহেই তাঁহার আত্মীয়তা করিতে ইচ্ছা;—টাইমন্ একথা শুনিয়া সেই ভৃত্যকে প্রয়োজনীয় প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন। এবং সেই ভৃত্যের মনোনীত পাত্রীর সহিত বিবাহ দেওয়াইলেন। কিন্তু অধিক সময় ইহাই দেখা যাইত যে, তাঁহার প্রতারক বন্ধুবর্গ ও শঠ তোষামোদকারিগণই তাঁহার সেই অতুল ধনরাশির উপর আধিপত্য করিত। সরলমতি টাইমন্ তাহাদিগের চাতুর্য্য বুঝিতে পারিতেন না। তিনি হাসিলে তাহারা হাসিত; তিনি কাঁদিলে, তাহারা কাঁদিত। এইরূপ সকল প্রকারে তাহারা তাঁহার মন যোগাইত। টাইমন্ ভাবিতেন, "আমি যাহা কিছু করি, তাহা সকলেরই অনুমোদিত। অতএব আমার বাড়া ভাগ্যবান্ এ জগতে আর কে আছে?" ইহা ছাড়া, নিত্য পান ও ভোজন, নিত্য আনন্দ ও উল্লাস,—টাইমন্ সেই কপট বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে বসিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমি কত সুখী, কত ভাগ্যবান্!"

———

(২)

কিন্তু হায়, "চিরদিন কভু সমান না যায়!"—এইরূপ ব্যয়ে কুবেরের অক্ষয়-ভাণ্ডারও শূন্য হইয়া যায়;—টাইমন্ কোন্ ছার! এইরূপ অপরিমিত ব্যয়ে টাইমনের ধনাগার শূন্য হইতে লাগিল। তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই, তথাপি চৈতন্য নাই। কে-ই বা সাহস করিয়া তাঁহাকে সে কথা বলে? তাঁহার বন্ধুবর্গ প্রতারক, ধূর্ত্ত, স্বার্থপর ও অর্থগৃধ্নু—তাহারা যে তাঁহার চৈতন্য করিয়া দিবে, সে আশা বিড়ম্বনা মাত্র। প্রকৃত-বন্ধু টাইমনের একজন মাত্র ছিল। তিনি—সেই মহাত্মা টাইমনের কোষাধ্যক্ষ। নাম—ফ্লেভিয়াস্। ফ্লেভিয়াস্ অতি সজ্জন ও বিশ্বাসী। যথার্থই প্রভুর হিতেচ্ছা করেন। সেই ফ্লেভিয়াস্ অনেক চেষ্টা করিলেন; আয়-ব্যয়ের একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রভুর সমক্ষে দাঁড়াইলেন। সজল-নয়নে, কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন, "প্রভো! একবার নেত্রপাত করুন! সকলই যাইতে বসিয়াছে।"

টাইমন্ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কথা প্রসঙ্গে সে কথা উড়াইয়া দিলেন। ধনী ব্যক্তি আপনার ধনক্ষয়ের কথা শ্রবণ করিতে বধির হইয়া থাকেন। আগতপ্রায় আপন শোচনীয় অবস্থা সহজে বিশ্বাস করিতে চাহেন না। সেই মহোদয় কোষাধ্যক্ষ, অনেকবার অনেক প্রকারে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কোন প্রকারে প্রভুর চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিলেন না।

ফ্লেভিয়াস্ যখন দেখিতেন, শত শত লোকে প্রভুর গৃহ পূর্ণ;—আনন্দ উল্লাসে গৃহ নিনাদিত;—মদ্য-স্রোতে গৃহ-প্রাঙ্গণ প্লাবিত;—

আলোক-মালায় চারিদিক উজ্জ্বল
ফ্লেভিয়াস্ তখন নিভৃতে, নির্জ্জনে গিয়া বসিতেন। টাইমনের বিলাস-কক্ষে যে মদ্যস্রোত প্রবাহিত হইত, ফ্লেভিয়াসের নয়ন হইতে তাহার শত গুণ অশ্রু অজস্রধারে প্রবাহিত হইত! চাটুকারদিগের সেই আনন্দোল্লাস যখন তাঁহার শ্রুতিগোচর হইত, তিনি ভাবিতেন, "হায়! এই অর্থ যে দিন ফুরাইবে, সেই দিন হইতেই এ আনন্দ-উল্লাস আর শুনিতে পাইব না! পান ও ভোজনের নিমিত্ত আজ যে আনন্দধ্বনি, যে দিন উপবাসী থাকিতে হইবে, সে দিন আর এ আনন্দ-ধ্বনি থাকিবে না! শীতের শীতল বাতাসও যে দিন বহিবে, বসন্তের এই প্রিয় কোকিলকুলও সে দিন উড়িয়া যাইবে!"

প্রকৃতির এইরূপ রীতিই বটে!

---

(৩)

কিন্তু আর বেশী দিন এ ভাবে কাটিল না। শীঘ্রই টাইমন্‌কে আপনার অবস্থা বুঝিতে হইল। বুঝিতে হইল বটে, কিন্তু অর্থের অনাটন হইল বলিয়া প্রয়োজন কমিল না। একদিন টাইমন্ ফ্লেভিয়াস্‌কে আজ্ঞা করিলেন, "যে কোন প্রকারে হউক, আমার সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াও, টাকা সংগ্রহ কর!"

একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া ফ্লেভিয়াস্ বলিলেন, "ভূমি-সম্পত্তি আপনার অধিকাংশই বিক্রীত হইয়া গিয়াছে, তাহাতেই এতদিন খরচ চলিয়া আসিতেছে;—আমি আপনাকে পুনঃপুনঃ এবিষয় জানাইয়াছি। আপনি সে কথায় কর্ণপাতও করেন নাই। এখন অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ আছে, তাহা সমুদয় বিক্রয় করিলেও, আপনার সকল ঋণ পরিশোধ হইবে না!—ঋণ এত অধিক হইয়াছে যে, তাহার অর্দ্ধেকও পরিশোধ হওয়া কঠিন!"

এইবার টাইমন্ কিছু বিস্মিত হইলেন। কহিলেন, "কি! এথেন্স্ হইতে লাসিডিমন্ পর্য্যন্ত আমার ভূমি বিস্তৃত;—তাহার পরিণাম এইরূপ হইবে,—ইহাও কি সম্ভব?"

ফ্লেভিয়াস্ উত্তর করিলেন, "প্রভু, পৃথিবী সীমাহীন নহে; যদি এই পৃথিবীও আপনার অধিকারে থাকিত, তবে নিমেষ মধ্যে ইহাও বোধ হয়, আপনি দান করিয়া ফেলিতেন!—আপনার সম্পত্তি কতটুকু!"

টাইমন্ কিছু ব্যথিত হইলেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে আপনি আপনাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, "আচ্ছা, আমার এই বিপুল অর্থরাশি নিঃশেষিত হইয়াছে বটে; কিন্তু কোন অপব্যয়ে বা অপকর্ম্মে নষ্ট হয় নাই! কিংবা কোন অপাত্রেও তাহা দান করি নাই;—আমার প্রীতিভাজন বন্ধুবর্গের উপকারে ও পরিতোষার্থে তাহা ব্যয় করিয়াছি। এখন, আমিও সেই বন্ধুবর্গের নিকট হইতে, এই অসময়ে উপকার পাইব!"

ফ্লেভিয়াস্ প্রভুর এতদবস্থায় কাঁদিতে লাগিলেন। টাইমন্ তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন;—"তোমার রোদন করা বৃথা। দেখ, যদিও ধনহীন হইয়াছি, কিন্তু সে ধন বৃথায় যায় নাই; এতদিন এতগুলি বন্ধুর সর্ব্ব প্রকারে যথাসাধ্য উপকার করিয়া আসিয়াছি; অবশ্যই, তাঁহারাও কখন আমাকে এই অভাবের দিনে বিমুখ করিবেন না!" মনে মনে কহিলেন, "অর্থাগমের অন্য উপায় আর কি অবলম্বন করিব,—বন্ধুবর্গের নিকট ঋণ প্রার্থনা করি;—তাঁহারা কখন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না!"

এইরূপ ভাবিয়া তিনি কতকটা সুস্থ হইলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল, অভাব কালে তিনিও যেমন মুক্ত-হস্ত হইয়া দান করিয়াছেন;—আজ তাঁহার অভাবের দিনে, সেই

উপকৃত ব্যক্তিগণও তাঁহার প্রতি তদুপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিবে। কিন্তু হায়, টাই-মনের এই প্রথম হিসাবেই ভুল! এ সংসার যে ঋষির তপোবন নহে, টাইমন্ তাহা বুঝেন নাই। বুঝেন নাই যে, সকলেই কিছু, সকলের উপকার মনে রাখে না;—সকলেই সকলের জন্য হৃদয় দিতে চাহে না, পারেও না। আপন সুখের জন্যই সকলে লালায়িত। কেহ ইহা বুঝে না যে, সুখ আত্মপ্রতিষ্ঠায় নয়, আত্ম-বিসর্জ্জনে। স্বার্থপর লঘু-প্রকৃতি, নীচমতিগণ এই মহান্ ভাব উপলব্ধি করিতে পারে না। এই প্রকৃতি লইয়াই সংসারের একটা দিক্। সেই দেব-প্রকৃতি, উদার-হৃদয় মানবের সংখ্যা বড় কম। টাইমন্ এ কথা বুঝিতেন না। সেই জন্যই তাঁহার এই প্রথম হিসাবে ভুল!

(৪)

বন্ধুগণের নিকট হইতে অর্থ পাইবেন, এইরূপে আশ্বস্ত হইয়া টাইমন্ অনেক স্থানে দূত প্রেরণ করিলেন। লর্ড লুসিয়াস, লিউ-কুলাস্ এবং সিম্প্রোনিয়াস্—ইহাঁরা টাইমনের বিস্তর অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। টাইমন্ও মুক্তহস্তে অর্থরাশি প্রদান করিতে কাতর ছিলেন না। লর্ড ভিন্‌টিডিয়াসের নিকটও লোক পাঠাইলেন। কিছুদিন হইল, লর্ড টাইমন্ বিপুল অর্থরাশি দিয়া তাঁহাকে কারা-মুক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি তাঁহার পিতার মৃত্যুতে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছেন এবং অনায়াসে টাইমনের ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হইবেন;—অন্ততঃ এই ভাবিয়াই লর্ড টাইমন্ তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। এবং উপরি উক্ত বিশিষ্ট বন্ধুগণের নিকটও ঋণ চাহিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাঁহার এই অভাবের দিনে এই বন্ধুগণ কখন এতদূর অকৃতজ্ঞ হইবে না যে, তাঁহার সেই পূর্ব্ব উপকার বিস্মৃত হইতে পারিবে।

টাইমনের দূত লর্ড লিউকুলাসের নিকট গমন করিল। গত রাত্রে লিউকুলাস্ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, একটি রৌপ্যপাত্র তাঁহার হস্ত-গত হইয়াছে। হঠাৎ টাইমনের দূতকে দেখিয়া মনে করিলেন, "বুঝি বা স্বপ্ন সফল হইল! টাইমন্ নিশ্চয়ই কোন মূল্যবান্ উপহার পাঠাইয়া থাকিবেন!"

কিন্তু দূত যখন মনোভাব প্রকাশ করিল, এবং প্রভু যে অর্থ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন, সে কথা জ্ঞাপন করিল, তখন লিউকুলাস্ টাই-মনের প্রতি আপনার সেই কৃত্রিম বন্ধুত্বটুকুও পরিত্যাগ করিলেন এবং দূতকে বলিলেন, "তোমার প্রভুর অবস্থা শুনিয়া আমি বস্তুতই দুঃখিত হইতেছি। আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে—প্রায় সর্ব্বদাই আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম;—তাঁহার সেই বে-য়াড়া ব্যয়-বাহুল্যের কথা কত বলিতাম, সে সম্বন্ধে কত বুঝাইতাম, কিন্তু তিনি সে কথায় কর্ণপাত করিতেন না! বুদ্ধির গুণে এখন তাহারই ফলভোগ করিতেছেন! আমার দ্বারা কিছু হইবে না বাপু! দেখ, তুমি গিয়া তোমার প্রভুকে বলিও যে, তুমি আমার সাক্ষাৎ পাও নাই! কেমন, পারিবে না কি?"

এই সাক্ষাৎ সত্য কথাটি বলিবার জন্য সেই পুরুষপুঙ্গব, দূতকে কিছু অর্থও প্রদান করিলেন।

লর্ড লুসিয়াসের নিকট হইতেও দূত ফিরিয়া আসিল। লুসিয়াস্ টাইমনের অর্থে আপন উদর পূর্ণ করিয়াছেন; বিপুল ধন সঞ্চয় করিয়া-ছেন;—কিন্তু আজি দূতের মুখে লর্ড টাইমনের অবস্থান্তরের কথা শুনিয়া, হঠাৎ তাঁহার বিশ্বাস হইল না। কিন্তু যখন সকল কথাই শুনিলেন, কপটতার ভাণ করিয়া দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক

বলিতে লাগিলেন, "হায়, মহামতি টাইমনের আজি এই দুর্দ্দশা! আমি কি দুর্ভাগ্য! আমি শত প্রকারে তাঁহার দ্বারা উপকৃত হইয়াও এই অসময়ে তাঁহার কিছুই করিতে পারিলাম না! অহ! এ দুঃখ আর কোথায় রাখিব? দেখ, কাল আমি একটা বহুমূল্য দ্রব্য কিনিয়া সকল অর্থ ব্যয় করিয়াছি,—উপস্থিত আমার নিকট কিছুই নাই;—মহামতি টাইমন্‌কে আমার অভিবাদন জানাইয়া একথা বলিও।" মিথ্যা-বাদী লুসিয়াস্ এই বলিয়াই দূতকে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

এক সঙ্গে পান-ভোজন করিলেই কিছু সুহৃদ্‌লাভ হয় না! এই লুসিয়াস্ একদিন টাইমনের শরণাপন্ন হইলে, পিতা যেমন পুত্রকে রক্ষা করেন, টাইমন্‌ও তেমনই স্নেহে লুসিয়াসকে রক্ষা করিয়াছিলেন! প্রভূত অর্থ দিয়া তাহার অভাব দূর করিয়াছিলেন! টাইমনের অর্থে লুসিয়াসের ভৃত্যবর্গ অবধি প্রতিপালিত। টাইমনের অর্থে লুসিয়াসের ভাণ্ডার পূর্ণ; টাইমনের অর্থে লুসিয়াসের মনোহর প্রাসাদ, মনোহর পুষ্পোদ্যান, মনোহর সাজ-শয্যা।—আজি সেই টাইমনের এমন দুর্দ্দশার দিনে সেই কৃতঘ্ন পিশাচ-প্রকৃতি লুসিয়াসের কি কপট ও নিষ্ঠুর ব্যবহার! টাইমন্ যে অর্থ তাহাকে দান করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে তিনি যে সামান্য অর্থ তাহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, তুলনা করিলে, কোন গৃহস্থ, ভিক্ষুককে যেমন মুষ্টিভিক্ষা দিয়া থাকেন, টাইমনের প্রার্থনা বোধ হয়, তাহার অধিক হইবে না!

এমনিতর আর সকল উপকৃত ব্যক্তিও টাইমনের দূতদিগকে ফিরাইয়া দিল। কেহ পরিষ্কাররূপে অস্বীকার করিল; কেহ দুঃখের ভাণ করিয়া আপন অভাব জানাইল!

সংসার কেবল মাত্র পুণ্যাত্মার আশ্রম কিংবা ঋষির তপোবন নহে;—টাইমন্ এত দিনে তাহা বুঝিলেন। বুঝিলেন যে, আলোকের পার্শ্বে যেমন ছায়া থাকে, দেবতার পশ্চাতেও তেমনি পিশাচের প্রচণ্ড তাণ্ডব প্রকটিত হয়! তাঁহার ভাগ্যে আলোক মিলিল না; অস্পষ্ট আলোকের ভাণ ধরিয়া কেবলই ঘনীভূত ছায়া-রাশি তাঁহার চারিদিকে! পিশাচের ভ্রূকুটী-ভঙ্গীতে তিনি শিহরিলেন। অহহ! কি ভীষণ কৃতঘ্নতা!

---

(৫)

বসন্ত-সমাগমে, কোকিল-কূজনে যে কুসুম-কুঞ্জ নিয়তই কুহরিত হইত, আজি বর্ষার দুর্দ্দিনে তাহাদের চিহ্নমাত্রও নাই। টাইমনের সেই সৌভাগ্য দিনে যাহাদের কোলাহলে গৃহ পরিপূর্ণ থাকিত, আজ টাইমনের অভাবের দিনে, সে গৃহে কেহ একবার পদস্পর্শও করে না! যে জিহ্বা একদিন শত প্রকারে টাইমন্‌কে প্রশংসা করিয়াছে, আজ আবার সেই জিহ্বা টাইমনের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইল! একদিন যাহার কার্য্যাবলী দেখিয়া, "মুক্তহস্ত" "বদান্য" প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করিয়াছে, আজি তাহাকে, তাহার সেই সকল কার্য্যের জন্য, "নির্ব্বোধ" "অপরিণামদর্শী" ও "উন্মত্ত" বলিয়া সেই জিহ্বা ঘৃণা-স্রোত প্রবাহিত করিতে লাগিল!

টাইমনের গৃহ আজ শূন্য। আর সে পান-ভোজনও নাই, সে আনন্দ-উল্লাসও নাই;—দারিদ্র্যের করাল ছায়া সেই সৌভাগ্য-কিরণ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে! এখন দলে দলে লোক ফিরিতেছে;—কেহ খাদ্য-দ্রব্যাদির মূল্য-হিসাবে টাইমনের নিকট অর্থ পাইবে, কেহ বা বিলাস-বিভবের মূল্যের জন্য টাইমনের নিকট দাবী করিতেছে। এইরূপে দোকানদার, মদ্য-ব্যবসায়ী, সওদাগর,—নানা প্রকারের উত্তমর্ণ

আসিয়া, নানা প্রকারে টাইমন্‌কে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কেহ হ্যাণ্ডনোট, কেহ বন্ধকী-পত্র, কেহ সুদের হিসাব প্রভৃতি লইয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিল;—টাইমন্‌ তাহাতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। সেই উন্মত্ত কোলাহলের মধ্যে পড়িয়া মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। গৃহ তাঁহার কারাগার স্বরূপ বোধ হইল।

ঋণ এত অধিক যে, যদি টাইমনের শোণিতপাতে তাহা পরিশোধ করিবার হইত, তবে বিন্দু বিন্দু করিয়া প্রত্যেক মুদ্রার জন্য শোণিত দানেও তাহার পরিসমাপ্তি হইত না! এইরূপে অতি উচ্চ অবস্থা হইতে পতিত হইয়া, এবং অকৃতজ্ঞহৃদয়, নীচাশয় বন্ধুবর্গের নিষ্ঠুর ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িত হইয়া, কোমল-প্রকৃতি টাইমন্‌ নিদারুণ ক্লেশভোগ করিতে লাগিলেন।

---

(৬)

কি ভাবিয়া, উপস্থিত দুর্দ্দিনে, টাইমন্‌ এক পরিহাসকর বিষয়ের অবতারণা করিলেন! তিনি একটা কৃত্রিম মহাভোজের আয়োজন করিলেন! এবং পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধু বান্ধবগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু সহসা এ মহাভোজে, কেহ বড় বিশ্বাস করিল না। পশ্চিম-সমুদ্র-মধ্যে নিমগ্ন হইয়াও অস্তগত সূর্য্য যে এত কিরণ দিবে, এ কথা সহজে কেহ বিশ্বাস করিতে পারিল না। বিশ্বাস করিতে পারিল না বটে, কিন্তু নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়া, কি ভাবিয়া, দলে দলে আবার লোক-সমাগম হইল। যে লুসিয়াস্‌ ও লিউকুলাস্‌ প্রভৃতি কপটবন্ধু, টাইমন্‌কে দীন ভাবিয়া তাঁহার দূতকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাহারাও আজি সেই ভোজ-সভায় উপস্থিত হইল। নির্লজ্জ, অকৃতজ্ঞ-হৃদয়, নীচাশয়গণ আবার মনে করিল, "টাইমনের ধন অক্ষয়,—দৈন্যের কথা একটা ভাণ মাত্র। নিশ্চয়ই তিনি আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য এইরূপ একটা রহস্য করিয়াছিলেন! হায়! তখন যদি ইঁহার দূতকে প্রত্যাখ্যান না করিতাম, তবে না জানি, আজ পূর্ব্বাপেক্ষা ইঁহার কত অধিক স্নেহ ও অনুগ্রহভাজন হইতাম!"

শুষ্ক নির্ঝরিণী আবার স্রোতস্বতী হইয়াছে;—সুতরাং এই নির্লজ্জ, বেহায়াদিগের আবার আনন্দ-উল্লাস হইল! তাহারা দলে দলে আসিয়া টাইমন্‌কে মহা আপ্যায়িত করিতে আরম্ভ করিল এবং জনে জনে জানাইল,—"মহাশয়, যে সময় আপনার দূত আমার নিকট উপস্থিত হয়, দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সময় এমনই অবস্থায় ছিলাম যে, কিঞ্চিন্মাত্র দিয়াও আপনার উপকার করিতে পারি নাই! এজন্য যে, কি পর্য্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়া আছি, তাহা বলিতে পারি না। মহাশয় উদার-হৃদয়,—নিজ গুণে অধীনদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন!"

সিয়ানে-সিয়ানে কোলাকুলি হইল; টাইমন্‌ বলিলেন, "সামান্য বিষয়ের জন্য আপনারা এরূপ কুণ্ঠিত হইবেন না। কি বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম, আমার তাহা মনেও নাই!"

সেই নীচমতি, ভণ্ডগণ টাইমনের অভাবের দিনে একবারও সেই গৃহে আসে নাই; কিন্তু আজ মহাভোজের দিনে, পরম পুলকিত-চিত্তে, দলে দলে সেখানে আসিতে কিছু মাত্র লজ্জা বোধ করিল না। শ্রাবণের মেঘ ছাড়িয়া তৃষিত-চাতক কবে বারিশূন্য শরতের মেঘের পানে ধাবিত হয়?

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইলে সুমধুর সঙ্গীত আরম্ভ হইল এবং আহারের দ্রব্য-সামগ্রীও সজ্জিত হইতে লাগিল। খাদ্য-দ্রব্যগুলি তখন আবৃত ছিল। তাই কেহ কেহ বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে অবাক্‌ হইয়া তাহা

দেখিতে লাগিল ও মনে মনে কহিল, "টাইমন্ যদি ধনহীন হইয়াছে, তবে এরূপ বহু-ব্যয়-সাধ্য মহাভোজের আয়োজন করিলেন কি প্রকারে?"

কেহ কেহ আপনার চক্ষুকে পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করিতে লাগিল,—"যাহা দেখিতেছি, ইহা কি সত্য?" কিন্তু যখন টাইমনের পূর্ব্ব-ইঙ্গিত-মত ভোজন-পাত্র সকল উম্মোচিত হইল, তখন সকলেই টাইমনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের উপযুক্ত অভ্যর্থনাই হইয়াছে! বলা বাহুল্য, টাইমন্ তখন সম্পূর্ণরূপ নিঃস্ব; সেই অবস্থানুযায়ী কেবল মাত্র একটুকু করিয়া গরম জল তাহাদের সম্মুখে ধরিলেন! নিমন্ত্রিত নীচাশয়গণের হৃদয়ও সেইরূপ জলবৎ তরলং। এইবার তাহারা কিছু বিস্মিত হইল, এবং সেই বিস্ময়কে অধিকতর বিস্মিত করিয়া টাইমন্ বলিতে লাগিলেন, "কুক্কুরগণ! পাত্র উম্মোচন করিয়া, ভাল করিয়া দেখ্, উহার মধ্যে কি আছে!"

এইরূপ বলিয়া টাইমন্, সেই উষ্ণজল তাহাদের মুখে, চোকে, নাকে কাণে—সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া দিতে লাগিলেন। তাহারা ভয়-বিস্ময়-আতঙ্কে ব্যস্ত-সমস্ত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। স্ত্রী-পুরুষ, কে কাহার ঘাড়ে পড়ে, তাহার ঠিক নাই। টাইমন্ও তাহাদের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইয়া গর্জ্জিতে লাগিলেন,- "মিথ্যাবাদী, প্রতারক, অকৃতজ্ঞ, নীচাশয়গণ! হৃদয়ে হলাহল পুরিয়া, মুখে মধুর হাসি লইয়া আমাকে ঠকাইতে আসিয়াছ? শার্দ্দূল-প্রকৃতি হইয়া মেষের পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া আসিয়াছিলে? বসন্তের কোকিল, সময়ের দাস, নির্লজ্জ, বেহায়া, চাটুকার দল, দূর হ'! এখান হইতে অবিলম্বে প্রস্থান কর্।"

সেই সমবেত লোকমণ্ডলী তখন দ্রুত-প্রস্থানে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের তাড়া-তাড়ি-হুড়া-হুড়িতে কেহ বা আপন গাত্র-বসন ফেলিয়া গেল; কাহারও মাথার টুপি পড়িয়া রহিল; কোন স্ত্রীলোক আপনার রত্নালঙ্কার হারাইয়া গেল; কেহ বা কিছু অর্থও হারাইয়া পলাইল! উম্মত্ত টাইমনের হস্ত হইতে এবং তাদৃশ অদ্ভুত মহা-ভোজ হইতে ভালয়-ভালয় ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছে ভাবিয়া, এখন তাহারা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।*

হতভাগ্য টাইমনের মহা জীবন-নাটকে আর এক অঙ্ক প্রকটিত হইতে চলিল। সে দৃশ্য বড়ই মর্ম্মভেদী, বড়ই করুণাত্মক। সহৃদয় পাঠক আমাদের অনুসরণ কর;—ক্রমেই সে সকল কথা জানিতে পারিবে।

(৭)

দারুণ ঘৃণা ও মনস্তাপে, এইবার টাইমন্ চিরদিনের জন্য, লোকালয় পরিত্যাগ করিলেন। সমগ্র মানব জাতির উপর বিজাতীয় ঘৃণা করিয়া এবং দেশের প্রতি আন্তরিক বীতশ্রদ্ধ হইয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। উম্মত্ত টাইমন্ দারুণ অভিশাপে সকলকে অভিশপ্ত করিয়া গেলেন। তাঁহার সেই মর্ম্মান্তিক অভিশাপ এই;—"দেশ-উৎসন্ন যাক্; গৃহে গৃহে হাহাকার উঠুক; গৃহপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়ুক; প্রাসাদশ্রেণী সমগ্র নর-নারী লইয়া ভূমিসাৎ হউক; দুঃখ ও দারিদ্র্য, যুদ্ধ ও অত্যাচার, আধি ব্যাধি ও শোক তাপ, দেশবাসিগণকে জর্জ্জরিত করুক! এথেন্স্‌বাসী স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ সকলেরই অমঙ্গল হউক!"

এইরূপে অকৃতজ্ঞ দেশ ও পিশাচ-প্রকৃতি নরনারীর উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া, সেই সদাশয় টাইমন্ লোকালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক অরণ্যবাসী হইলেন। অরণ্য যদিও হিংস্র-জন্তু-সমাকীর্ণ; কিন্তু উপস্থিত, তাঁহার পক্ষে, এ

* এই স্থানের চিত্রটী পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।



টাইমনের কৃত্রিম ভোজ-সভা।

সংসার-অরণ্যের হিংস্র নর-নারী অপেক্ষা তাহারা শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

মানবের প্রতি টাইমন্ এতদূর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন যে, আপনাকেও মনুষ্য মনে করিয়া ঘৃণায় আপনি মরিয়া যাইতেন। যাহাতে মনুষ্যের সহিত কোন সাদৃশ্য না থাকে, তাহার জন্য শরীর অনাবৃত রাখিলেন। উলঙ্গ দেহে বন্য পশুর ন্যায়, উদ্‌ভ্রান্ত টাইমন্ বন্য পশু হইয়া রহিলেন! থাকিবার জন্য, মৃত্তিকা মধ্যে একটী মাত্র গুহা খনন করিলেন,—কোন প্রকার কুটীর বাঁধিলেন না। আপনার ছায়া লইয়া আপনি গভীর বনে একাকী দিন কাটাইতে

রা তাহা

লাগিলেন। কিন্তু সেই ছায়া দেখিয়াও, মধ্যে মধ্যে দারুণ ঘৃণায় অভিভূত হন। বুঝি, সেই মানব-ছায়ার রূপান্তর করিবার হাত থাকিলে, তিনি তাহাও করিতেন! বৃক্ষের ফল-মূল খাইয়া, নদীর জল পান করিয়া, টাইমন্ ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিলেন। ক্বচিৎ মনুষ্য দেখেন, ত মুখ ফিরান। যেখানে বন্য শ্বাপদগণ ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, টাইমন্‌ও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে! পশুর ন্যায় আহার, পশুর ন্যায় বিহার, পশুর সাহচর্য্য,—সমস্তই পশুর রীতি-প্রকৃতি লইয়া, সেই মহামতি টাইমন্ অরণ্যে জীবনের অবশিষ্ট-কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

কি পরিবর্ত্তন! হায়, কোথায় সেই জন-মানব কোলাহলপূর্ণ, বিলাসময়, সুসজ্জিত সেই অট্টালিকা, আর কোথায় আজি এই বিবিধ বৃক্ষরাজী-সমাকীর্ণ, হিংস্র-জন্তু-নিনাদিত, নিবিড় জঙ্গল! সমগ্র নর-নারীর উপর কোথায় সেই উদার সরল হৃদয়ের উন্মুক্ত প্রেম, আর কোথায় আজি সমগ্র মানবজাতির উপর নরক হইতেও বিজাতীয় ঘৃণা! কি অভাবনীয় পরিবর্ত্তন! কি নিষ্ঠুর ভবিতব্য!

সেই চাটুকারগণ আজি কোথায়? আজি এই নিবিড় জঙ্গলে নিদারুণ শীতল সমীরণে টাইমনের দেহ জর্জ্জরিত;—কোথায় আজি সেই কপট বন্ধুবর্গের সহৃদয়তা প্রকাশ? আর কোথায় বা আজি সেই অনুচরগণ?—বৃক্ষশ্রেণী কি আজি তাহাদের স্থান অধিকার করিবে? তিক্ত ও কষায় ফল মূল ভক্ষণে পীড়িত ও পিপাসিত হইলে নদীজলে কি টাইমনের তৃপ্তি হইবে? কিংবা বন্যজন্তুগণ তাঁহার হস্ত লেহন-পূর্ব্বক চাটুকারের ন্যায়, তাঁহার তোষামোদ করিবে? হায়, কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন! কি ভীষণ পরিণাম!

---

(৮)

একদিন ঘটনা অন্যরূপ হইল। টাইমন্ আপন আহার সংগ্রহের জন্য বৃক্ষমূল খনন করিতেছেন, এমন সময় মৃত্তিকা মধ্যে তাঁহার অস্ত্র কোন কঠিন দ্রব্য স্পর্শ করিল। তিনি চারিদিক্ খনন করিয়া সেই কঠিন দ্রব্য উত্তোলন পূর্ব্বক দেখিলেন, অগণিত স্বর্ণরাশি। সম্ভবতঃ কোন কৃপণ, নিরাপদ করিবার অভিলাষে এই অরণ্য-মধ্যস্থ মৃত্তিকা-মধ্যে তাহা প্রোথিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। আশা ছিল, সময়ান্তরে তাহা তুলিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু বোধ হয়, সে আশা পূর্ণ না হইতেই, হতভাগ্য কালের কোলে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। পৃথিবী আজি সেই রত্ন টাইমন্‌কে উপহার দিলেন।

টাইমন্ যাহা পাইলেন, ইচ্ছা থাকিলে তিনি পূর্ব্বের ন্যায় আবার তেমনই ধন-গৌরবে যশস্বী হইতে পারিতেন। আবার তেমনই চাটুকারবৃন্দে পরিবৃত হইয়া তেমনই সুখ-ভোগ করিতে পারিতেন। কিন্তু আর সে মন নাই, সে ইচ্ছা নাই। জগৎ সংসারের উপর তিনি এমনই চটিয়াছিলেন, কৃতঘ্ন নরনারীর উপর তাঁহার এমনই ঘৃণা হইয়াছিল যে, আর সংসারে ফিরিতে চাহিলেন না। স্বর্ণরাশি তাঁহার চক্ষে বিষ বোধ হইতে লাগিল। সেই স্বর্ণরাশি তিনি পুনর্ব্বার মৃত্তিকা মধ্যে ঢাকিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। আবার কি ভাবিয়া মনে মনে কহিলেন, "এই স্বর্ণ হইতেই সংসারে কত না অত্যাচার-উপদ্রব, হাহাকার ও অনর্থ! দস্যুর প্রবল প্রতাপ, প্রবলের অত্যাচার-অবিচার, নানাপ্রকার কুক্রিয়া, পাপ ও অশান্তি—এই অর্থ হইতেই সংসারের কত না জ্বালা! টাইমন্ মানব জাতির প্রতি এমনই বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন যে, সকল বিপদের আধার জানিয়া এবং ইহা দ্বারা বহুজনের বহুবিধ সর্ব্বনাশ হইতে

পারিবে ভাবিয়া, তিনি, সেই স্বর্ণরাশি, যাহাতে সংসারে পঁহুছিতে পারে, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। তাহা হইতে অবশ্যই কোন-না-কোন বিপদ্ ঘটিবে, এবং লোকগুলা আপনা-আপনি ক্রোধে ও বিদ্বেষের আগুনে জলিয়া-পুড়িয়া খাক্ হইবে, ইহাই টাইমনের মনোগত ভাব। টাইমন্ এখন এমনই নরদ্বেষী।

ঘটনাক্রমে কতকগুলি সৈন্য সেই বন-পথ দিয়া যাইতেছিল। এথেন্সের যাঁহারা নেতা, তাঁহাদের অবিচারে, বিরক্ত ও ক্রোধান্বিত হইয়া এ্যাল্সিবাইডিস সসৈন্যে এথেন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিতেছিল। টাইমন্ ইহা জানিতেন এবং জানিয়া বিশেষ সন্তুষ্টও ছিলেন। কারণ, এথেন্স্‌বাসী তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ধনপূর্ণ ভাণ্ডার, মনোরম প্রাসাদ, মনোহর পুষ্পোদ্যান, প্রভূত অর্থরাশি,—এথেন্স্‌বাসী-কর্ত্তৃক তাঁহার সকলই বিনষ্ট হইয়াছে। সুতরাং যে কোন প্রকারে এথেন্সবাসীর সর্ব্বনাশ হইলেই তাঁহার আনন্দ। টাইমন্ তখন সেই অগণিত স্বর্ণরাশি লইয়া সৈন্যাধ্যক্ষকে প্রদান করিলেন। বলিয়া দিলেন, "এই স্বর্ণরাশি তোমার সৈন্যমধ্যে বিতরণ কর। আমি ইহার প্রতিদানে কিছুই চাহি না।—কেবল এই দেখিতে চাই, তোমরা যেন সমগ্র এথেন্স্, ভূমিসাৎ করিতে সমর্থ হও। সমগ্র দেশ-বাসীকে হত্যা কর, মারিয়া ফেল, অগ্নিতে দাহ কর, গ্রামে গ্রামে আগুন জালিয়া দাও, ধূ ধূ করিয়া সব জলিয়া যাক্, সব ছাই হোক্!—দেখ, শ্বেতশ্মশ্রু দেখিয়া বৃদ্ধকে অব্যাহতি দিও না।—তাহারা সয়তান ও কুসীদজীবী! সুমধুর মুখে সুমধুর হাসি দেখিয়া দুধের শিশুকেও প্রাণে রাখিও না;—বড় হইয়া তাহারাও ভীষণ অত্যাচারী হইবে, কৃতঘ্ন পামর হইবে! চক্ষু ও কর্ণ এমনই করিয়া আবদ্ধ রাখিবে, যেন কোন করুণ দৃশ্য দেখিয়া, কিংবা কোনরূপ কাতর-বিলাপ শুনিয়া বিচলিত না হও! বালিকার ক্রন্দন, কোলের-শিশু-বুকে-চাপিয়া মায়ের করুণ-কণ্ঠ—সে মর্ম্মভেদী দৃশ্যেও তোমরা যেন কাতর না হও! একাদিক্রমে সকলকেই নিহত ও নগর ধ্বংস করিবে! এবং যখন এইরূপে সমগ্র দেশ জিত হইবে, আশীর্ব্বাদ করি, তখন যেন তোমারও মৃত্যু হয়! তাহা হইলে পাপ এথেন্স্ এবং চণ্ডাল এথেন্স্‌বাসীর নামও আর শুনিতে হইবে না।"

অহহ! কি ভীষণ পরিবর্ত্তন! টাইমন্ এখন ঘোর মানবদ্রোহী!

(৯)

এইরূপে যখন উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্তে, পশুর সাহচর্য্যে, টাইমন্ সেই অরণ্যমধ্যে দিন যাপন করিতেছিলেন, একদিন দেখিলেন, কে-একটী লোক দীনবেশে তাঁহার গুহাদ্বারে দাঁড়াইয়া আছে। সে ব্যক্তি অন্য কেহ নহে, টাইমনের সেই বিশ্বস্ত কোষাধ্যক্ষ, সদাশয় ফ্লেভিয়াস্। প্রভুর প্রতি একান্ত ভক্তি ও প্রীতি থাকাতে, চারিদিকে তিনি প্রভুর অনুসন্ধান করিতে-ছিলেন। ইচ্ছা, "যদি তাঁহাকে পাই, যে ভাবে তিনি থাকুন, তাঁহার সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব।"

ফ্লেভিয়াস্ যখন সেই অরণ্যমধ্যে সেই গুহাদ্বারে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রভুকে দেখিতে পাইলেন, শোকে ও দুঃখে তিনি নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। সবিস্ময়ে দেখিলেন, টাইমন্ যেমন উলঙ্গ হইয়া জন্মিয়াছিলেন, এখনও সেই-রূপ উলঙ্গ! পশুর মধ্যে পশুরও-হীন হইয়া দিন যাপন করিতেছেন! যেমন সমস্ত অর্থ ও সম্পদ্ বিনষ্ট হইয়া তাঁহার সকল গৌরব তিরোহিত হইয়াছে, তাঁহার আকৃতিও এখন সেইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন। কাতর-নয়নে ফ্লেভিয়াস্, এই মহা করুণ দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

ফ্লেভিয়াস্ ও বনবাসী টাইমন্।



দেখিতে দেখিতে তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। তিনি নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন, পারিলেন না। কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল।

টাইমন্ গুহাদ্বারে ফ্লেভিয়াস্‌কে এই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কিছুতেই ত চিনিলেনই না, অধিকন্তু সবিস্ময়ে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "কে এ ব্যক্তি? কেন আসিয়াছে? মনুষ্যের ন্যায় ইহার আকার দেখিতেছি! অতএব নিশ্চয়ই এ কোন বিশ্বাসঘাতক ও অত্যাচারী হইবে! দেখিতেছি, ইহার চক্ষে অশ্রু ঝরিতেছে!—তবে——তবে নিশ্চয়ই এ কোন মায়া লইয়া এখানেও আমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছে! মনুষ্য যে, মনুষ্যের জন্য কাঁদে, সে কেবল তাহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য! মনুষ্যে সমবেদনা, দয়া, প্রীতি, স্নেহ, মমতা, ইহা ত আমার কল্পনা বোধ হয়!"

অনেকক্ষণ পরে টাইমন্ ফ্লেভিয়াস্‌কে চিনিতে পারিলেন। চিনিতে পারিলেন, কিন্তু মনে করিলেন, ফ্লেভিয়াস্‌ও নিশ্চয়ই কোন দুরভিসন্ধি লইয়া আসিয়াছে! ফ্লেভিয়াস্ প্রভুর মনোভাব বুঝিলেন। তাই অতি দীনভাবে, কাতর-কণ্ঠে টাইমন্‌কে বলিলেন, "প্রভু, আমাকে অবিশ্বাস করিবেন না! আমি যথার্থই আপনার সেবা করিতে আসিয়াছি। কোন স্বার্থ নাই! অন্য কোন স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়াও আসি নাই! আপনার প্রতি একান্ত প্রীতি ও অবিচলিত ভক্তি—আমাকে এই খানে আনিয়াছে!"

ফ্লেভিয়াস্ নতজানু হইয়া অতি বিনীতভাবে নানা প্রকারে বুঝাইলে, টাইমন্ বলিলেন,

"পৃথিবীতে অন্ততঃ একজনও যে কৃতজ্ঞ-হৃদয়, ধর্ম্মপরায়ণ, সদাশয় মহাত্মা আছেন, তাহা বিশ্বাস করিলাম। কিন্তু দেখ, তুমি যদি মনুষ্য-দেহ না লইয়া অন্য দেহ ধারণ করিয়া এখানে আসিতে, তবে বুঝি, তোমায় রাখিতে পারিতাম! মনুষ্যের আকারও আমার চক্ষুঃশূল। উহার পানে আমি চাহিতে পারি না। যদি চাহি, সে ঘৃণার চক্ষুতে! মনুষ্যের কণ্ঠও আমার বিষ!—যদি কখন তাহা শুনি, তাহাতে আমার বুকের ভিতর দারুণ দাবানল উপস্থিত হয়! আমি পশুর দলে থাকিয়া, পশু হইয়া জীবন কাটাইব! যাও ক্লেভিয়াস্, নিজস্থানে প্রস্থান কর! মনুষ্য আমার চিরদিনের শত্রু!"

ক্লেভিয়াস্ তবুও অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন। শেষ, বিফল-মনোরথ হইয়া, বিষণ্ণ-মনে প্রস্থান করিলেন।

---

(১০)

গুণের পূজা পৃথিবীতে চিরদিন আছে, থাকিবেও চিরদিন। এমন একদিন আসিল, যেদিন দেশের চক্ষু ফুটিল। দেশের আপামর সাধারণ টাইমনের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিল। সেই বিপক্ষপক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষ এ্যাল্‌সিবাইডিস্ যথাসময়ে এথেন্স আক্রমণ করিলেন; এবং প্রভূত বল-বিক্রমে উক্ত নগরী ভূমিসাৎ করিতে উদ্যত হইলেন।—দেশবাসী ভীত, চকিত ও স্তম্ভিত হইল। তখন সকলে নিরুপায় হইয়া, অনুতপ্ত হৃদয়ে টাইমনের কথা স্মরণ করিতে লাগিল। টাইমন্ একজন মহা যোদ্ধা ও রণ-কুশল বীরপুরুষ ছিলেন। পূর্ব্বে দুই একবার এমন ঘটিয়াছিল যে, দেশ শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, আর টাইমন্ অপূর্ব্ব রণকৌশল ও অসাধারণ নির্ভীকতায় শত্রু-সম্মুখীন হইয়া, সেই দেশকে রক্ষা করিয়াছেন। আজ সকলে সেই মহাবীরের অভাবে অত্যন্ত কাতর হইল। এথেন্সের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও সেই মহাত্মার প্রতি যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া এখন তাঁহারা ব্যথিত হইলেন। এথেন্স্ মহাসভার সভ্যবৃন্দ এ বিপদে উপায়ান্তর না দেখিয়া, টাইমনের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু টাইমনের দুঃখের দিনে কেহ আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়ায় নাই। একবার 'আহা' বলিয়া একটা কথাও কহে নাই।—আজ দুর্দ্দিনে, আপনাদের বিপদ বুঝিয়া, সেই সদাশয় বীর-কেশরী টাইমন্‌কে ফিরাইয়া আনিবার জন্য, সকলে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল।

যদিও তাহারা টাইমনের প্রতি যথেষ্ট নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাহাদের ধারণা ছিল, টাইমন্ এ দারুণ বিপদে, কখনই দেশের প্রতি বিমুখ হইতে পারিবেন না;—নিশ্চয়ই তিনি সেই বিদ্বেষভাব বিস্মৃত হইবেন!

যখন তাঁহার সাক্ষাৎ মিলিল, সকলে অতি বিনীত ভাবে বিধিমতে অনুরোধ করিতে লাগিল;—"মহাত্মন্! আপনি দেশ রক্ষা করুন। আপনি কৃপা না করিলে, এ বিপদে আপনি সহায় না হইলে, আমরা কেহ প্রাণে বাঁচিব না, দেশও রক্ষা পাইবে না! আমরা আপনার প্রতি যে সব নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি; নিজ গুণে তাহা বিস্মৃত হউন! আবার আমরা আপনার সেই পূর্ব্ব গৌরব, পূর্ব্ব সমৃদ্ধি, পূর্ব্ব সম্মান—সকলই পূর্ব্বের ন্যায় করিয়া দিব;—আপনি সকলেরই শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতিপাত্র হইয়া থাকিবেন!"

কিন্তু বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ করিয়া, শিরোদেশে জলসেক করিলে কোন ফল নাই! টাইমন্, আর সে টাইমন্ নাই! মানব-জাতির অকৃতজ্ঞতায় মর্ম্মাহত, উন্মত্ত টাইমন, এখন অরণ্য-গুহাবাসী, উলঙ্গ, পশুর সাহচর্য্যে

উদ্‌ভ্রান্ত টাইমন্ ও এথেন্সবাসিগণ।



. the earth,
জীবনপাত করিতেছেন! ...the times."
ভীষণ প্রকৃতি ধারণ ————Tennyson.

সৈন্যাধ্যক্ষ ষড়্‌জ্যোৎস্নাময়ী। আকাশ পরিষ্কার, এথেন্স - নীলাকাশে চন্দ্র হাসিতেছে। গাছে কি...ছে ফুল, ফুলে ফুলে বড় শোভা! আকাশে নক্ষত্র-ফুল, কাননে এই বেলা, মল্লিকা,—মাঝে তুমি প্রেমময়ি! আজি যেন পূর্ণ হৃদয়ে, তোমার পূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখিতেছি! পূর্ণিমা-নিশীথে, পূর্ণচন্দ্রপানে, ঊর্দ্ধমুখে চকোর যেমন চাহিয়া থাকে, আজ আমিও তেমনি হৃদয়ের চির-আঁকাঙ্ক্ষা ঐ মুখপানে চাহিয়া আছি। এই মুক্ত বাতায়ন-পথে বসিয়া, এই কৌমুদী-বিধৌত নিস্তব্ধ নিশীথে আজি যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছি!

...রি-
...। দেখি,
..., এমন হৃদ-
...জমুক্ত, উন্মুক্ত
...।

...খি দুটী পানে চাহিয়া,
...ও স্বপ্ন দেখিতেছি! কি
...ধুর হাসি! এই জ্যোৎস্নায়
একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল?
...! কেহ কোথাও নাই, তবু এত সঙ্কু-
...কেন? এ বুকের ভিতর ও-মুখখানি
...লে কেন? এমন চাঁদনী রজনী, এমন
...নীরবতা, এমন নিভৃত নির্জ্জনস্থান,—
প্রাণের কথা বলিতে এমন অবসর আর কৈ?

আজি যখন তুমি আপন মনে বসিয়া, বিবিধ কুসুমে মালা গাঁথিতেছিলে, দূরে—তোমার দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া, তাহা দেখিতেছিলাম। দেখিতেছিলাম, এই কুসুমাধিক কোমল অঙ্গুলিতে, পুষ্পগুলি সূচী-বিদ্ধ হইয়া, কেমন মালাকারে পরিণত হইতেছিল! দেখিতেছিলাম, ঐ মধুর আঁখি দুটী যেন ধ্যান-নিমগ্ন হইয়া, কি-এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে! রক্তিম ওষ্ঠাধর কি মাধুরী-মণ্ডিত!—পূর্ণ বিকসিত শতদলের উপর বান্ধুলির অপূর্ব্ব সমাবেশ!

দেখিতে দেখিতে আমি আত্ম-হারা হইতেছিলাম। কত ভাবে তখন হৃদয় ভরিয়া গেল!—অর্দ্ধ জাগরণ, অর্দ্ধ তন্দ্রা; অর্দ্ধ চেতন, অর্দ্ধ অচেতন! তখন বহুদিনের এক অস্পষ্ট-কাহিনী স্মৃতিমাঝে অস্পষ্টরূপে হাসিতে লাগিল। ক্রমে সে অস্পষ্ট-ছায়া, পূর্ণ-অবয়বে জাগিয়া উঠিল। আজি সেই কাহিনী তোমাকে শুনাইব। এমন

* রাজকবি টেনিসনের ডে-ড্রিম (Day-Dream) নামক কবিতাটী পাঠ করিয়া, যে ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী সেই ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র।

আসিয়া এই মহাবৃক্ষের আশ্রয় গ্রহণ কর,—
সকল জ্বালার উপশম হইবে!”

একথার অর্থ কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না। সকলেই বুঝিল, দারুণ ঘৃণায় ও মর্ম্মান্তিক কষ্টে, নরদ্বেষী, উদ্‌ভ্রান্ত টাইমন্, এথেন্স্‌বাসী নরনারীকে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিতে পরামর্শ
উহার ...ছে! টাইমন্-জীবনের এই শেষ! এ
চাহি, সে স্বর্ণ, যদি মনুষ্য-জাতির প্রতি টাইমনের
বিষ!—যদি কথ... স্নেহ, মমতা,—পক্ষান্তরে বিদ্বেষ
বুকের ভিতর দারুণ ...কাশ পাইয়া থাকে, তবে এই
আমি পশুর দলে থাকি ...সমাপ্তি! কারণ, সদাশয়
কাটাইব! যাও ক্লেভিয়াস্, পরদুঃখকাতর টাইমন্,
কর! মনুষ্য আমার চিরদিনের ...টাইমন্, অতুলনীয়

ক্লেভিয়াস্ তবুও অনেক অ... মহাজীবনে
করিলেন। শেষ, বিফল-মনোরথ হইয়া ...নাই! এ
মনে প্রস্থান করিলেন আমরা
...গ্রহণ

(১০)

গুণের পূজা পৃথিবীতে চিরদিন আছে, থাকিবেও চিরদিন। এমন একদিন আসিল, যেদিন দেশের চক্ষু ফুটিল। দেশের আপামর সাধারণ টাইমনের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিল। সেই বিপক্ষপক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষ এ্যাল্‌সিবাইডিস্ যথাসময়ে এথেন্স আক্রমণ করিলেন; এবং প্রভূত বল-বিক্রমে উক্ত নগরী ভূমিসাৎ করিতে উদ্যত হইলেন।—দেশবাসী ভীত, চকিত ও স্তম্ভিত হইল। তখন সকলে নিরুপায় হইয়া, অনুতপ্ত হৃদয়ে টাইমনের কথা স্মরণ করিতে লাগিল। টাইমন্ একজন মহা যোদ্ধা ও রণ-কুশল বীরপুরুষ ছিলেন। পূর্ব্বে দুই একবার এমন ঘটিয়াছিল যে, দেশ শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে, আর টাইমন্ অপূর্ব্ব রণকৌশল ও অসাধারণ নির্ভীকতায় শত্রু-সম্মুখীন হইয়া, সেই দেশকে রক্ষা করিয়াছেন। আজ সকলে সেই মহাবীরের অভাবে যবনিকাপাত হইল! কেহ বুঝিল না, কেহ জানিল না, কিরূপে তাঁহার মৃত্যু হইল! অকৃতজ্ঞ সংসারের দারুণ অত্যাচার ও সেই প্রাণঘাতী জ্বালাময় উত্তাপ সহিতে না পারিয়া, হয়ত, তিনি আত্মহত্যা করিয়া থাকিবেন;—নয়ত মনুষ্যশক্তি অতিক্রম করিয়াও যে অচিন্তনীয় যন্ত্রণা তাঁহাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল,—মনে হইয়াছিল, এ জীবনভার বিড়ম্বনা মাত্র,—মৃত্যুই শান্তি;—হয়ত—হয়ত, সেই যন্ত্রণাই তাঁহার জীবনদীপ নির্ব্বাণ করিয়াছে! কেহ কিন্তু কিছুই বুঝিল না, কিছুই জানিল না! সকলে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া, নির্নিমেষ-নয়নে, সেই সমাধি-স্তম্ভ দেখিতে লাগিল!—স্তম্ভে যাহা লেখা ছিল, বিস্ময়ের সহিত বারংবার তাহা পড়িতে লাগিল! সকলেই বুঝিল, যাহা লেখা আছে, তাহা টাইমনের জীবনেরই অনুরূপ বটে! উন্মত্ত হইয়া হতভাগ্য যতদিন বাঁচিয়া ছিল, এবং মনুষ্যজাতির উপর যেরূপ বিজাতীয় ... গভীর বিদ্বেষের ভাব হৃদয়ে পোষণ
যখন ... মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ঠিক সেই ভাবেই
বিনীত ভাবে বি... জীবন-নাটক অতি
লাগিল;—“মহাত্মন্! আ...
করুন। আপনি কৃপা না করিলে,
আপনি সহায় না হইলে, আমরা কেহ দেখিয়া
বাঁচিব না, দেশও রক্ষা পাইবে না! আমরা পষ্ট
আপনার প্রতি যে সব নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি; নিজ গুণে তাহা বিস্মৃত হউন! আবার আমরা আপনার সেই পূর্ব্ব গৌরব, পূর্ব্ব সমৃদ্ধি, পূর্ব্ব সম্মান—সকলই পূর্ব্বের ন্যায় করিয়া দিব;—আপনি সকলেরই শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতিপাত্র হইয়া থাকিবেন!”

কিন্তু বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ করিয়া, শিরোদেশে জলসেক করিলে কোন ফল নাই! টাইমন্, আর সে টাইমন্ নাই। মানবজাতির অকৃতজ্ঞতায় মর্ম্মাহত, উন্মত্ত টাইমন্, এখন অরণ্য-গুহাবাসী, উলঙ্গ, পশুর সাহচর্য্যে

মনুষ্য-হৃদয়ের অতি সূক্ষ্মতম ইতিহাস! তাই টাইমনের সাধ, অনন্ত জলধির আকুল উচ্ছ্বাস, এবং সেই সঘন ফেন-পুঞ্জের প্রবল তরঙ্গ-ভঙ্গ তাঁহার সমাধি স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে শীতল ও পবিত্র করিবে!—যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তাঁহার প্রেতাত্মা ইহা দেখিতে থাকিবে যে, সেই উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল মহা সমুদ্রের, সেই গভীর ও গম্ভীর হৃদয়োচ্ছ্বাস, চিরদিন নিষ্কলঙ্ক ও নির্ম্মল হইয়া খর-তরঙ্গে বহিতেছে!

আমরাও এইখানে টাইমনের অপূর্ব্ব জীবন-নাটক সমাপ্ত করিলাম।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

উদ্বোধন।

"——We are ancients of the earth,
And in the morning of the times."
——Tennyson.

রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। আকাশ পরিষ্কার, নীল। নীলাকাশে চন্দ্র হাসিতেছে। গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে বড় শোভা! আকাশে নক্ষত্র-ফুল, কাননে এই বেলা, মল্লিকা,—মাঝে তুমি প্রেমময়ি! আজি যেন পূর্ণ হৃদয়ে, তোমার পূর্ণ সৌন্দর্য্য দেখিতেছি! পূর্ণিমা-নিশীথে, পূর্ণচন্দ্রপানে, উর্দ্ধমুখে চকোর যেমন চাহিয়া থাকে, আজ আমিও তেমনি হৃদয়ের চির-আকাঙ্ক্ষা ঐ মুখপানে চাহিয়া আছি। এই মুক্ত বাতায়ন-পথে বসিয়া, এই কৌমুদী-বিধৌত নিস্তব্ধ নিশীথে আজি যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছি!

কি সুন্দর তুমি!—বস্ত্রাঞ্চলে ও-মুখখানি ঢাকিও না। সরোবর-হৃদয়ে, কমলিনী যেমন প্রভাত-অরুণ-কিরণে ঈষৎ প্রোজ্জ্বল হইয়া, অল্পে অল্পে ফুটিতে থাকে, ঐ মুখখানিও তেমনি এই রক্তিম-আভাতে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে! যদি দেখিলাম, তবে প্রাণ ভরিয়া দেখি, দিবালোকে ও-শোভা দেখি নাই; এমন হৃদয়ের কাছে ধরিয়া, এমন লাজমুক্ত, উন্মুক্ত সৌন্দর্য্য কখনও দেখি নাই!

আবেগ-বিহ্বল ঐ আঁখি দুটী পানে চাহিয়া, আজি যেন জাগ্রতেও স্বপ্ন দেখিতেছি! কি অমৃত-মাখা মধুর হাসি! এই জ্যোৎস্নার উপর যেন একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল? লাজময়ি! কেহ কোথাও নাই, তবু এত সঙ্কুচিতা কেন? এ বুকের ভিতর ও-মুখখানি লুকাইলে কেন? এমন চাঁদনী রজনী, এমন মধুর নীরবতা, এমন নিভৃত নির্জ্জনস্থান,—প্রাণের কথা বলিতে এমন অবসর আর কৈ?

আজি যখন তুমি আপন মনে বসিয়া, বিবিধ কুসুমে মালা গাঁথিতেছিলে, দূরে—তোমার দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া, তাহা দেখিতেছিলাম। দেখিতেছিলাম, এই কুসুমাধিক কোমল অঙ্গুলিতে, পুষ্পগুলি সূচী-বিদ্ধ হইয়া, কেমন মালাকারে পরিণত হইতেছিল! দেখিতেছিলাম, ঐ মধুর আঁখি দুটী যেন ধ্যান-নিমগ্ন হইয়া, কি-এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে! রক্তিম ওষ্ঠাধর কি মাধুরী-মণ্ডিত!—পূর্ণ বিকসিত শতদলের উপর বান্ধুলির অপূর্ব্ব সমাবেশ!

দেখিতে দেখিতে আমি আত্ম-হারা হইতেছিলাম। কত ভাবে তখন হৃদয় ভরিয়া গেল!—অর্দ্ধ জাগরণ, অর্দ্ধ তন্দ্রা; অর্দ্ধ চেতন, অর্দ্ধ অচেতন! তখন বহুদিনের এক অস্পষ্ট-কাহিনী স্মৃতিমাঝে অস্পষ্টরূপে হাসিতে লাগিল। ক্রমে সে অস্পষ্ট-ছায়া, পূর্ণ-অবয়বে জাগিয়া উঠিল। আজি সেই কাহিনী তোমাকে শুনাইব। এমন

* রাজকবি টেনিসনের ডে-ড্রিম (Day-Dream) নামক কবিতাটী পাঠ করিয়া, যে ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইয়াছল, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী সেই ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র।

মধুর নীরবতা, এমন নিভৃত নির্জ্জন স্থান,— প্রাণের কথা বলিতে এমন অবসর আর কৈ? তবে শুনিয়া যাও, আমি অতি ধীরে ধীরে, অতি চুপি চুপি তাহা বলিয়া যাই।

জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, নানা আকারে, নানা পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে নূতন পুরাতন হইতেছে, পুরাতন আবার নূতনত্বে পরিণত হইতেছে। বসন্ত আসিয়া, নব পত্র-পুষ্পে, নব ফল-ফুলে বৃক্ষ-লতা সাজাইয়া দিতেছে। নিদাঘে তরুরাজি মৃতপ্রায়, হিমানীতে অর্দ্ধমৃত;—আবার সেই মধুমাসে, চারিদিকে আবার সেই শ্যাম-শোভা, সেই প্রীতি-প্রফুল্লতা!

তেমনি আবার জীবন ও মৃত্যু, উভয়ের প্রবাহ একই পথে পাশাপাশি ছুটিয়াছে। জীবন চলিয়াছে, মৃত্যু আসিতেছে; মৃত্যু চলিয়াছে, জীবন আসিতেছে;—জীবন ও মৃত্যু, উভয়েই চলিয়াছে, উভয়েই আসিতেছে!—গতি অবিরাম!

কবি-কল্পনা, এই জাগ্রত ও জীবন্ত সত্য লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চাহে না! এই দু'য়ের মাঝখানে নূতন সৃষ্টি করিতে চায়! কল্পনা, একটী প্রাসাদের চিত্র দেখাইল। সেখানে পরিবর্ত্তনের চিহ্নমাত্রও বিদ্যমান নাই! শত-বর্ষব্যাপিনী মোহ-নিদ্রায় সে প্রাসাদ নিদ্রিত! নূতন ও পুরাতন, জীবন ও মৃত্যু,—সেখানে কিছুই নাই!

কি জানি, কাহার কুহকে, সে প্রাসাদ, সকল নর-নারী, সকল বৃক্ষ বল্লরী ও গৃহপালিত পশু-পক্ষী লইয়া, গভীর নিদ্রায় অভিভূত! বৃক্ষ-লতায় আর পুষ্প ফুটিতেছে না, নূতন পত্রোদ্গমও হইতেছে না; যেমনি আয়তন, ঠিক তেমনি রহিয়াছে,—হ্রাস-বৃদ্ধি কিছুই নাই! যে রস-সঞ্চালনে বৃক্ষের সজীবতা ও স্ফুর্ত্তি, তাহা শুকাইয়া গিয়াছে; বৃক্ষ বাঁচিয়া আছে মাত্র, কিন্তু বাঁচিয়াও মৃতের ন্যায় অবস্থিত! পিঞ্জরের শুক, অর্দ্ধতান ধরিয়া, নীরব হইয়াছে; সেও সেই গভীর নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন;—এখনও তাহার ওষ্ঠদ্বয় তেমনি ঈষৎ উন্মুক্ত রহিয়াছে! কুসুম-কুঞ্জ নিদ্রা-নিমগ্ন! শেফালিকা-শাখায় মধুর-কণ্ঠ বিহগ মধুর গানে প্রাসাদ পূর্ণ করিতেছিল, সেও নিদ্রাভিভূত হইয়াছে! আধ-মুকুলিত যূথিকা কুঁড়িগুলি ফুটিতে ফুটিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, আর ফুটিতে পায় নাই! শ্যাম-দূর্ব্বাদলে শয়ন করিয়া, গাভী রোমন্থন করিতেছিল, সেও সেই অবস্থায় নিদ্রাভিভূতা;—এখনও তাহার মুখে সেই শুভ্র ফেনপুঞ্জ লাগিয়া রহিয়াছে! চঞ্চল হরিণ-শিশুটী ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, এখনও তাহার ঘুমন্ত-দেহে সে চাঞ্চল্যের ভাব বিদ্যমান!

এমনি নিদ্রায় সকলেই অভিভূত!—কিন্তু নিদ্রা হইলেও কাহাতেও নিশ্বাস বহিতেছে না! অথচ কেহই মৃতও নহে! জীবন আছে, কিন্তু জীবন-স্রোত নিস্তব্ধ! প্রাণ আছে, কিন্তু প্রাণের ক্রিয়া রুদ্ধ!—এমন নিদ্রা, কোন যাদুকরের মায়া-বিদ্যা বলিয়াই অনুভূত হয়!

সেই প্রাসাদ-শিখরে, পতাকা নিদ্রাবনত! বায়ু গতিহীন, শ্বাসহীন, তরঙ্গহীন! উন্মুখ উৎস, হ্রদ-গর্ভে নিমজ্জিত! গৃহ-প্রাঙ্গণে স্তরে স্তরে সজ্জিত দীপমালা, আভাহীন, শোভাহীন, প্রভাহীন, দীপ্তিহীন,—বৃষ্টির পর, ছিন্ন-মেঘ-কোলে বিজলী-বিকাশের ন্যায় অপরিস্ফুট ও ম্লান! গৃহ-মধ্যে, ঘটিকাগুলিও নিশ্চল! একটীও মক্ষিকা উড়িতেছে না! একটীও পিপীলিকা চলিতেছে না! বৃক্ষপত্রের একটুকুও মর্ম্মরশব্দ হইতেছে না! সকলই নীরব, নিঃস্পন্দ, নিদ্রাচ্ছন্ন!

গৃহে মহোৎসব হইতেছিল। সে আনন্দ-উল্লাস, সে নৃত্য-গীত, সকলই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! ভাণ্ডারপূর্ণ খাদ্য-সামগ্রী তেমনি অবস্থায় বিদ্যমান; ভাণ্ডার-স্বামী ভোজন করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত,—হস্তে এখনও সেই অর্দ্ধ-ভুক্ত খাদ্য-দ্রব্যটী বিদ্যমান! কাছারীতে বাজার-সরকার হিসাব দেখিতে দেখিতে নিদ্রাচ্ছন্ন, হস্তে এখনও হিসাবপত্র বিদ্যমান! যুবতী পরিচারিকা—গোপনে, নিভৃতে কোন যুবকের সহিত প্রণয়ালাপ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, উভয়ের হস্ত উভয়ের হস্তে এখনও সম্বদ্ধ; যুবক মুখ চুম্বন করিতে উদ্যত, যুবতী বস্ত্রাঞ্চলে রক্তিম মুখখানি লুকাইতেছে;—এখনও সে ভাব নিদ্রায়ও পরিস্ফুট!

রাজাও আপন পারিষদ ও আত্মীয়বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই নিদ্রায় অভিভূত। জীবনের একটুকুও চিহ্ন কোথাও বিদ্যমান নাই, অথবা কেহই মৃতও নহে! দূরাগত কোন শব্দ সেখানে পৌঁছিতেছে না। গর্ভস্থ শিশুর কর্ণে, সংসারের কোলাহল যেমন অস্ফুট, এই নিদ্রিত প্রাসাদের নিদ্রিত জন-মানবের কর্ণেও তেমনি সকলই অস্ফুট!

শত বর্ষ ব্যাপিয়া, এমনি নিদ্রায় সে প্রাসাদ নিদ্রিত! এই শত বৎসরে কোন পরিবর্ত্তন নাই! যেখানে যেমনটী ছিল, ঠিক তেমনি অবস্থায় রহিয়াছে; যে যেমন অবস্থায় ছিল, ঠিক তেমনি অবস্থায় নিদ্রিত!

প্রভাতের রবি-কিরণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু সে কিরণে সে দীপ্তি নাই! নিশীথের চন্দ্র-কিরণে প্রাসাদ স্নাত হইতে থাকে, কিন্তু সে চন্দ্র-কিরণ ম্লান ও অবসন্ন!

প্রাসাদের বহির্ভাগ জঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছে। দূর হইতে দেখিলে বোধ হইবে, যেন একটী ক্ষুদ্র বন, আর সেই প্রাসাদ-চূড়া; যেন কেহ বন-রাজি দেখিবার জন্য মস্তকোত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান!

শতবর্ষ-ব্যাপিনী সে নিদ্রায়, সে প্রাসাদ এমনি নিদ্রিত!

———

এই নিদ্রিত প্রাসাদের একটী কক্ষে একটী বালিকাও তেমনি নিদ্রায় অভিভূতা। শত বৎসরের নিদ্রা!

বালিকার অতুল রূপরাশি ঘুমাইয়া পড়িয়াও তবু অপূর্ব্ব জ্যোতিতে সে গৃহ আলো করিয়া রহিয়াছে! সেই স্ফুটনোন্মুখ যৌবনে, সে কুসুম-সুকুমার দেহে লাবণ্য যেন আর ধরিতেছে না! রূপ উছলিয়া পড়িতেছে! জ্যোৎস্না-স্নাতা নিদ্রালসা লহরী-বালা সাগর-বুকে যেমন ঘুমাইয়া পড়ে, আর তাহার সেই ঘুমন্ত লাবণ্যটুকু তবুও যেমন জাগিয়া থাকে, বালিকার সেই অসীম রূপরাশিও তেমনি সে গৃহ আলো করিয়া আছে! নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ কুন্তলরাজি আগুল্ফ-লম্বিত;—ললাটে, চিবুকে, কণ্ঠে, চক্ষে, সেই ঈষৎকুঞ্চিত কেশগুচ্ছ ইতস্ততঃ যে যেমন ভাবে পড়িয়াছিল, ঠিক তেমনি আছে। কুসুম-কোমল বাহুযুগল অলস-ভাবে পড়িয়া আছে। বসনখানি আলু-থালু হইয়া, সেই শোভাময়ীর দেহখানি ঢাকিয়া আছে। সেই কক্ষমধ্যে যে রত্ন-দীপ জ্বলিতেছিল, তাহা পরিম্লান ও জ্যোতিহীন। বালিকার সেই নিমীলিত আঁখি দুটী অপূর্ব্ব শোভার আধার! তবু সকলই স্তব্ধ! একটুকুও শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে না, বক্ষঃস্থল একটুকুও স্ফীত হইতেছে না; বক্ষের উপর যে কেশগুচ্ছ পড়িয়াছিল, একটুকুও বিচলিত হইতেছে না! আধ-ঢাকা, আধ-খোলা, সৌন্দর্য্যের এই জীবন্ত চিত্রখানি শতবর্ষ এমনি নিদ্রায় অভিভূত! জড়দেহে যেমন চৈতন্যের প্রকাশ, বালিকার সেই রূপও তেমনি, সেই নিস্তব্ধ প্রাসাদের

অশরীরী নিস্তব্ধতায় প্রেম মিশাইয়া দিয়াছে; রবি-কিরণেও উজ্জ্বল আলোক বর্দ্ধিত করিয়াছে! এ ভাব কেবল বুঝিবার, বুঝাই-বার নহে। সে মোহিনী মূর্ত্তি এমনি উপাদানে গঠিত! বালিকা ঘুমাইতেছে; শতবর্ষ ধরিয়া সেই শতবর্ষ-নিদ্রিত প্রাসাদের মধ্যে এমনি ভাবে ঘুমাইতেছে, কিন্তু একটীও স্বপ্ন আসিয়া সে নিষ্কলঙ্ক চাঁদমুখ রূপান্তর করিতেছে না। বোধ হইতেছে যেন, বিধাতার সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি এই বালিকা-মূর্ত্তি, পূর্ণ শান্তিপ্রবাহে নিমজ্জিতা! *

এইরূপে, সকলকে লইয়া, সে প্রাসাদ, শত বর্ষ-ব্যাপিনী নিদ্রায় অভিভূত!

শতবর্ষ কবে পূর্ণ হইবে? কবে আবার এই নিদ্রিতগণের এই মন্ত্রমোহের অবসান হইবে? কবে আবার ইহাদের কাল ও সময়ের জ্ঞান হইবে? দর্শন-বিজ্ঞান, কাব্য-ইতিহাস, সাহিত্য ও সমাজ প্রভৃতির জ্ঞানে পৃথিবী কতদূর অগ্রসর হইয়াছে,—এই নবীনা পৃথিবী কবে আবার তাহারা দেখিবে? পৃথিবীকে যেমনটী দেখিয়া তাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তেমনটী আর নাই, এই শতবর্ষে পৃথিবী আবার নূতন সৌন্দর্য্যে শোভাময়ী হইয়াছে!—কবে এই নিদ্রিতগণ আবার এই নূতন প্রাণে অনুপ্রাণিত, নূতন জ্ঞানে উদ্বোধিত হইবে!

সুখ এস, দুঃখ এস; আশা এস, নিরাশা এস; মঙ্গল এস, অমঙ্গল এস;—এই নিদ্রিত প্রাসাদে সকল জ্ঞান তিরোহিত!

আর, দেবতার প্রিয়সন্তান, অপূর্ব্ব পুরুষ তুমি! তুমিও এস! এই যাদুমন্ত্র ভেদ করিয়া, এই নিদ্রিত প্রাসাদ উদ্বোধন কর!

শতবর্ষ পূর্ণ হইল। কোন্ অজ্ঞাত সুদূর প্রদেশ হইতে, অজ্ঞাত এক অপূর্ব্ব পুরুষ সেখানে উপস্থিত হইলেন। রূপ-জ্যোতিতে তাঁহার মধুর অবয়ব প্রদীপ্ত, যৌবনের অমিত বিক্রমে, অতুল উৎসাহে, সে অপূর্ব্ব মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত। নানাদেশ, পাহাড়-পর্ব্বত, নদনদী অতিক্রম করিয়া, সেই অজ্ঞাত পুরুষ সেই প্রাসাদ-সমীপে উপস্থিত হইলেন।

ভাগ্য প্রতিকূল থাকিলে, কে কবে প্রেমের পথে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে? অদৃষ্ট শুভ না হইলে, প্রেমের জন্য প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটে না, সাধ পূর্ণ হয় না, আশা ফলবতী হয় না! কোথায়, কতদূরে, কোন্ হৃদয়ের সহিত এ হৃদয়ের সম্বন্ধ বাঁধা আছে, কে জানে! কে জানে, কত দিনে, কি উপায়ে, সে জীবনা-ধিক সর্ব্বস্ব ধন হৃদয়ের নিকট আসিবে। প্রেম অদৃষ্টের পশ্চাতে পশ্চাতে অনুধাবন করিতে থাকে।* কিছুই বুঝা যায় না, সকলই অস্পষ্ট! কতদিনে সেই অমূল্যনিধি হৃদয়ের নিকট পাইয়া, তাহাতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া, জীবন কৃতার্থ হয়! অপূর্ব্ব রহস্য-প্রকটন!

যুবক কেন সেখানে আসিলেন, কিছুই জানেন না। তাঁহার মনে হইত, নিয়তই কে যেন তাঁহার কাণে কাণে বলিত,—"ঐখানে চল; অমূল্যরত্ন লাভ হইবে!" কি সে রত্ন, তাহা জানেন না, তবু চলিলেন। অন্তরের অতি নিভৃত প্রদেশে কে যেন নিয়তই উত্তেজনা করিত; তাই সুদূর প্রদেশ হইতে অগণ্য নদনদী, পাহাড়-পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া, দেব-প্রেরিত সেই অজ্ঞাত পুরুষ সেই নিদ্রিত প্রাসাদ-সমীপে উপস্থিত হইলেন।

দেখিলেন, তাঁহারই মত শত শত লোক এই প্রাসাদ হইতে সে অমূল্য রত্ন লইতে আসিয়া, বিফল-মনোরথ হইয়া, প্রাণ হারাই-য়াছে। শত শত বীরের-মৃতদেহেও অস্থি-কঙ্কালে সে প্রাসাদের পথ আবৃত রহিয়াছে।

* "A perfect form in perfect rest!"

* "Love in sequel works with fate!"

বীরের হৃদয় কিন্তু তাহাতে বিচলিত হইল না। তিনি সেই নিদ্রিত নিস্তব্ধ প্রাসাদ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন,—"দেখিতেছি, এই দুঃসাধ্য কার্য্যে অনেকেই প্রাণ হারাইয়াছেন; কিন্তু আমি ফিরিব না। অনেকেই মাটি খনন করিয়া মরে, কোহিনূর লাভ একজনের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।"

যুবক, বাহিরের সে ক্ষুদ্র বন ভেদ করিয়া, প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আনন্দ ও উৎসাহে হৃদয় পূর্ণ হইল; মুখমণ্ডল রক্তিম আভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। আরও নিকটবর্ত্তী হইলেন, হৃদয়ের ভিতর দুপ্‌দুপ্‌ শব্দ হইতে লাগিল। অভীষ্ট বস্তু নিকটে পাইয়া, প্রাণের ভিতর যে ভাব হয়, ইহাও তদ্রূপ।

যুবক একেবারে সেই কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইলেন। শয্যায় সেই নিদ্রিতা বালিকার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া চরিতার্থ হইলেন।—"এই কি সে অমূল্যরত্ন? হৃদয় শান্ত হও!"—তবু বুকের ভিতর সেই দুপ্‌দুপ্‌ শব্দ। প্রতি শিরায় শিরায় তড়িৎ ছুটিতে লাগিল, হৃদয়ে সমুদ্রমন্থন আরম্ভ হইল।

যুবক নতজানু হইয়া, বালিকাকে স্পর্শ করিলেন। বলিলেন,—"আহা কি সুন্দর তুমি। উঠ প্রেমময়ি। আর ঘুমাইও না।" পূর্ণ-আবেগে বালিকার মুখচুম্বন করিলেন।

একটুকু স্পর্শ, একটিমাত্র চুম্বন! শতবর্ষের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল। যুবকের সেই স্পর্শে ও সেই চুম্বনে কি সঞ্জীবনী-সুরা মিশ্রিত ছিল, কে জানে! রবিকর-সংস্পর্শে নীহার-বিন্দু যেমন অদৃশ্য হয়, সেই মধুর চুম্বনেও তেমনি সে মায়া তিরোহিত হইল।

সেই চুম্বনের গুণে তখন সে নিদ্রিত প্রাসাদও জাগ্রত হইল। নিস্তব্ধ ও অচল ঘটিকাগুলি একেবারে সব বাজিয়া উঠিল। দাসদাসী ছুটাছুটি করিতে লাগিল, পিঞ্জরের শুক অর্দ্ধতান সম্পূর্ণ করিল; দীপমালা উজ্জ্বল হইয়া, প্রদীপ্ত হইল; বায়ু সঞ্চালিত হইল; হ্রদগর্ভে নিমজ্জিত উৎস আবার উর্দ্ধমুখ হইল;—চারিদিকে আবার মহা কোলাহল পড়িয়া গেল।

প্রাসাদ-শিখরে আবার সেই পতাকা উড়িতে লাগিল। কুসুম-কুঞ্জ মধুর সৌরভে পূর্ণ হইল। স্তবকে স্তবকে বেলা, মল্লিকা, অপরাজিতা ফুটিতে লাগিল। আধ-ফোটা যূথিকাকুঁড়ি গুলি প্রস্ফুটিত হইল; বৃক্ষবল্লরী আবার নূতন জীবন পাইয়া, শ্যামশোভায় সজ্জিত হইল। ভ্রমর গুঞ্জরিল, সেফালিকা-শাখায় পিক কুহরিল, সুশোভনা হরিণী চারিদিকে ছুটিতে লাগিল, গাভী রোমন্থনে প্রবৃত্ত হইল,—চারিদিকে আবার রুদ্ধ-জীবন-স্রোত প্রবাহিত হইল।

ভাণ্ডার-স্বামী অর্দ্ধভুক্ত খাদ্য-দ্রব্য আবার ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বাজার-সরকার হিসাবপত্র দেখিতে লাগিল; যুবতী পরিচারিকা আবার সেই যুবকের সহিত প্রণয়-কলহে প্রবৃত্ত হইল; প্রাসাদের সর্ব্বত্রই আবার নূতন দৃশ্য প্রকটিত হইল।

রাজা পারিষদবর্গের সহিত জাগ্রত হইলেন। কেহ বলিলেন, "আহারের পর অর্দ্ধঘণ্টা মাত্র নিদ্রা গিয়াছি।" রাজার নিকট ইতিপূর্ব্বে কেহ কোন বিল পাস্ করিতে আনিয়াছিল, এখন বলিল,—"মহারাজ, বিলখানা এইবার পাস করিয়া দিন। আমি অর্দ্ধঘণ্টাকাল ইহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি।"

কেহ বুঝিল না, শতবর্ষ ব্যাপিনী সে নিদ্রায় সকলে অচেতন ছিল।

রতনে রতন মিলিল। বীর বিনা এ অমূল্য রত্ন আর কাহার ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে! বীর-অঙ্কেই রমণী-রত্ন শোভা পায়।

বালিকা, যুবকের স্কন্ধে মস্তক স্থাপন করিল। যুবক স্নেহ-আলিঙ্গনে বালিকাকে বদ্ধ

করিলেন। উভয়েই উভয়ের হাতে হাত দিয়া, বাহুতে বাহুতে প্রেম-বন্ধন বাঁধিয়া সুদূর-প্রদেশে চলিয়া গেলেন।

সেই পুরাতন জগৎ বালিকার চক্ষে নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নবীন প্রাণে, নবীন জ্ঞানে জগৎ আবার নূতন হইয়াছে,—সে পুরাতনের চিহ্নমাত্রও বিদ্যমান নাই। তাই বালিকা চিনিতে পারিতেছিল না।

উভয়ে চলিতে লাগিল। পাহাড়-পর্ব্বত, নদ-নদী, বন-উপবন,—নানা স্থান অতিক্রম করিয়া উভয়ে অবিরাম গতিতে চলিতে লাগিল। যুবক, এক হস্তে বালিকার স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া, অন্য হস্তে দেখাইতে লাগিলেন,—কোথাও রবিকর-উদ্ভাসিত শ্রুতি-মধুর গিরিনির্ঝর; কোথাও অরণ্যানীর ঘনচ্ছায়া; কোথাও নয়ন-মুগ্ধকর তুঙ্গশৃঙ্গ, কোথাও "তমালতালে-বনরাজী-নীল" সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ,—প্রকৃতির সেই অপূর্ব্ব ছবি চারিদিকে দেদীপ্যমান।

তেমনই আবার মনুষ্যের অপূর্ব্ব-প্রতিভা-স্থজিত, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সকল দেখাইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে উভয়ে কতদূর চলিলেন!

কোথায়, কতদূর, কতদিন, কোথায় সে গতির শেষ, কে জানে, কে বলিতে পারে!

বালিকা সস্নেহে বলিল,—"প্রিয়তম! কি মধুর তোমার সে প্রেমচুম্বন! তেমনি চুম্বনের জন্য আবার শতবর্ষ ঘুমাইতে সাধ হয়।"

"আর ঘুমাইও না, প্রেমময়ি! এমনই সে চুম্বন!"

যুবক, আবার—আবার শত চুম্বনে সে মুখখানি রক্তিমাভ করিলেন।

আবার চলিলেন। কত দূর-দূরান্তরে চলিতে লাগিলেন। আকাশে নক্ষত্র জলিতেছে। তরঙ্গায়িত মেঘের উপর চন্দ্র ভাসিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে; নিদ্রাহীন, শ্রান্তিহীন সপ্তঋষি জাগ্রত-নয়নে জগতের পানে চাহিয়া আছেন। জাগ্রত নয়নে যেন জগতের ইতিহাস-পর্য্যালোচনায় নিবিষ্ট-চিত্ত।—সে আধ-আলো, আধ-আঁধার ঘুচিয়া ক্রমে পরিষ্কার প্রভাত হইল।

যুবক বলিলেন, "কি মধুর নিদ্রায় তোমার এই আঁখি দুটী ঘুমাইয়াছিল!"

বালিকা। কেমন মধুর ভাবেই বা সে সুখ-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল!

"কি ভাগ্যবান্ আমি,—আমার সে চুম্বনে তোমার মোহ-নিদ্রা অপসারিত হইয়াছে!"

"প্রিয়তম! সে মধুর চুম্বনে মৃতদেহেও জীবনী-সঞ্চার হয়!"

উভয়ে আবার চলিল। পূর্ব্বের রবি পশ্চিম-আকাশে চলিয়া পড়িল। সন্ধ্যার আধ-আলো, আধ-ছায়া, ক্রমে ঘনীভূত অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল।

এমনই কতদিন কতরাত্রি চলিয়া গেল, তথাপি চলিয়াছে, গতির বিরাম নাই।

"প্রিয়তম! আর কতদূর যাইব? তুমি আমাকে কোথায় লইয়া যাইবে?"

"চল প্রাণাধিকে, আমার পিতৃ-ভবনে! তোমাকে সেখানে লইয়া যাইব। এই নূতন জগৎ দেখিয়া তুমি এত বিস্মিত হইতেছ? সেখানে আরও কত দেখিবে। তখন না জানি, এই বিশাল আঁখি দুটী বিস্ময়-বিস্ফারিত হইয়া আরও কি মধুর শোভা ধারণ করিবে!"

আবার সেই মধুর চুম্বন, সেই সস্নেহ আলিঙ্গন! শ্রান্তিহীন, নিদ্রাহীন, ক্ষুধাতৃষ্ণা-হীন,—উভয়ে আবার চলিতে আরম্ভ করিল। রাত্রি যায়, দিন আসে; দিন যায়, রাত্রি আসে;—বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী, যুগের পর যুগ,—যুগ-যুগান্তর ধরিয়া দুইটী প্রাণ এক হইয়া, অনন্ত কালের জন্য, সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-পথে চলিতে লাগিল।

কে জানে, এ গতির সীমা কোথায়? অসীম-ব্রহ্মাণ্ড-পথে কে সে সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিবে?

চন্দ্র অস্ত যায়, ম্লান-জ্যোৎস্না আবরণে পৃথিবী ঢাকিয়াছে। কি নীরব, নিথর যামিনী! কি নিস্তব্ধ নিদ্রিত এ সংসার! কি সুন্দর তুমি প্রিয়তমে! এমনি নিশীথে, এমনি নিভৃতে, এমনি নিস্তব্ধতায়, সেই স্বপ্ন-বালার মত, যদি তোমাকেও নিদ্রিতা দেখিতাম, তবে না জানি, কত সুখে, কি সুধা-চুম্বনে, ঐ নিদ্রিত আঁখি-দুটী জাগাইয়া তুলিতাম! তেমন সৌভাগ্য কি আমার হইবে? জীবনের সর্ব্বস্ব তুমি,—হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া, হাতে হাত দিয়া, তোমাতে আমাতে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-পথে চলিতে থাকিতাম! জীবন অনন্ত, কাল অনন্ত, এ ব্রহ্মাণ্ডের পথও অনন্ত!—অনন্ত কালের জন্য দুটী প্রাণে এক মহাপ্রাণ হইয়া অনন্ত পথের যাত্রী হইতাম! ক্ষুদ্র এ সংসার-জ্ঞানে, আকাঙ্ক্ষা-বিহঙ্গ যেন চিররুদ্ধ রহিয়াছে! অনন্ত এ বিরাট-বিশ্বে, অনন্ত সে জ্ঞানজ্যোতি কিছুই দেখিলাম না, কিছুই জানিলাম না! পুরাতনের মধ্যে অন্ধ হইয়া, কেবল বাঁচিয়া আছি মাত্র। কৈ, সে নবীন প্রাণ, নবীন আকাঙ্ক্ষা, নবীন জ্ঞান, নবীন জগৎ?

কিছুই নাই! দিনের সমষ্টি মাত্র যেন এ দুর্লভ মানব-জীবন! আত্মা নিদ্রিত;—এ নিদ্রিত আত্মার তেমন উদ্বোধন কবে হইবে?

কিন্তু প্রাণাধিকে! বল দেখি, তেমনি উদ্বোধের জন্য, তেমনি নিদ্রা কি বাঞ্ছনীয় নহে?

"শতবর্ষব্যাপিনী সে নিদ্রা!"

তা হোক্। সংসারের কোলাহল হইতে আপনার প্রাণাধিক সাথীগুলিকে লইয়া, সকল আত্মীয়-স্বজনে মিলিয়া, তেমন নিদ্রা কি বাঞ্ছনীয় নহে? শতবর্ষ ব্যাপিয়া নিদ্রায় অচেতন থাকিব! আবার যখন জাগিব, দেখিব,—জগৎ নূতন! নূতন জগৎ, নূতন রবির—নূতন কিরণে উদ্ভাসিত! নূতন লোক, নূতন জ্ঞান, নূতন ভাষা, নূতন উন্নতি,—সকলই নূতন! সেই নূতন দেখিয়া আবার ঘুমাইব! আবার জাগিব; জাগিয়া দেখিব, নূতন জগৎ আরও নূতন, নূতন জ্ঞান আরও নূতন, নূতন প্রাণ আরও নূতন! আবার ঘুমাইব! যখন দেখিব, মানবে মানবে শত্রুতা বাধিয়াছে, কাহারও জন্য কাহারও হৃদয়ে প্রীতি নাই, স্নেহ নাই, দয়া নাই,—চারিদিকে হিংসার অনল, পাপের প্রবাহ, দারুণ রক্তপাত,—তখন ঘুমাইব! যখন দেখিব, মানুষ পশুর অধম, দেবতার আসনে পিশাচের অধিষ্ঠান, দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার, পুণ্যের উপর পাপের জয়লাভ,—তখন ঘুমাইব! যখন জাগিব, কি দেখিব?—দেখিব, জগৎ দেবতার লীলাভূমি! সংগ্রাম নাই, বিদ্রোহ নাই, হিংসা নাই, পাপ নাই! নবীন আলোকে চারিদিক্ উদ্ভাসিত; নবীন প্রাণে জগৎ অনুপ্রাণিত; নূতন জ্ঞানে জগৎ উদ্বোধিত;—মানবে মানবে প্রীতি, স্নেহ, সখ্য,—মহান্ ভ্রাতৃভাবে সকল মনুষ্য এক মহা-জাতিতে পরিণত! দুর্জ্জয় শক্তিতে দেবের সন্তান অমিত-তেজা, অমিত বিক্রমশালী!—আর দেখিব কি? আর দেখিব, নূতন দর্শন, নূতন বিজ্ঞান, নূতন কাব্য, নূতন ইতিহাস, নূতন সাহিত্য, নূতন সমাজ, নূতন প্রাণ, নূতন সভ্যতা! পুরাতনের উপর নূতনত্বের অপূর্ব্ব বিকাশ! মানবের সর্ব্বভেদিনী প্রতিভা, জগৎ হইতে জগদন্তর পর্য্যন্ত মহা তত্ত্বের আলোচনায় ধ্যান-নিমগ্ন! মানবের জ্ঞান, জগৎ হইতে জগদন্তর পর্য্যন্ত অনন্ত রহস্য-পরিপূর্ণ; সৃষ্টির মুখাবরণ খুলিয়া, তন্ন তন্ন করিয়া, সৃষ্টি-সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণে নিযুক্ত! মানবের চিন্তা সেই অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অগম্য, স্বপ্রকাশেও অপ্রকাশ,

অপ্রকাশেও স্বপ্রকাশ—সেই অনাদি অনন্তের জ্ঞানে, আত্মহারা—তখন জাগিব! শতবর্ষ নিদ্রায় থাকিয়া, এইরূপ নূতন জগৎ দেখিতে আবার জাগিব! জাগিয়া আবার দেখিব, সেই নূতন জগৎও আবার পুরাতন হইয়া আরও নূতন হইয়াছে! যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চির-উন্নতির পথে জগৎ এমনই চলিতে থাকিবে! আমরা একবার করিয়া উঠিব,—সেই নূতন প্রাণে অনুপ্রাণিত হইব। আজি ত এই নূতনত্বের প্রভাতকাল, আমরা ত অতি প্রাচীন, অতি পুরাতন! শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইবে, তখন যে নূতন মানবে এই জগৎ পূর্ণ হইবে, তাহারা আমাদের পানে চাহিয়া ভাবিবে, ইহারা কত পুরাতন!

এই সুপ্ত-আত্মা উদ্বোধন করিতে তেমন মহাজ্যোতি কি আসিবে না?

শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত।

শ্রীশ্রী৺গঙ্গা।

উৎপত্তি—ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত।

মাধুরী, মাধুরী, মাধুরী! আর কিছুই নাই,—কিছুই নাই; শুধুই মাধুরী! স্বর-লহরীর অনুপম মাধুরী ধীরে ধীরে—অতিধীরে, দ্রুত, দ্রুত,—অতিদ্রুত, অনন্তের অনন্ত আচরণে পর্য্যবসিত!

কার্ত্তিকী পূর্ণিমা। শ্রীগোলোক-ধামে শ্রীরাসমণ্ডলে রাস-মহোৎসব। ত্রিলোক-পতি শ্রীকৃষ্ণ মধ্যস্থিত রত্নপর্য্যঙ্কে আসীন, বামে শ্রীমতী রাধা; ব্রহ্মা ধর্ম্ম প্রভৃতি অমর-নিকর সভার চতুর্দ্দিকে সমবেত। স্বয়ং মহেশ্বর সঙ্গীতে সরত। স্বর-লহরী বিমল-শরৎ-কৌমুদী-সমুজ্জ্বল অনন্তপথে নাচিতে নাচিতে, ভাসিতে ভাসিতে যাইতেছে, আবার ফিরিতেছে, আবার উঠিতেছে, আবার যাইতেছে। কিন্তু মাধুরীর পুনরাবর্ত্তন নাই, শুধুই গতি, শুধুই বিস্তৃতি; পতন নাই, শুধুই উত্থান। সে লীলাময় লহরীর আদি—মাধুরী, মধ্য—মাধুরী, অন্ত—মাধুরী, মাধুরী বৈ তার আর কিছুই নাই।

আরও, আরও, আরও! স্থান নাই,—অনন্ত ক্ষুদ্র, মাধুরী অনন্ত। কুসুমে সৌরভ নাই, অমৃতে রস নাই, শ্রীমতীর রূপ নাই, চন্দনে স্পর্শ নাই, আকাশে শব্দ নাই,—সর্ব্বত্রই কেবল মাধুরী। গোলোকে রাসমণ্ডল নাই, রাসমণ্ডলে সে রাসোৎসব নাই, রাসোৎসবে দেবতা নাই, দেবতার হৃদয় নাই, হৃদয়ে চেতনা নাই,—সর্ব্বত্রই কেবল মাধুরী। পূর্ণ, পূর্ণতর, পূর্ণতম মাধুরী। আর ধরে না,—ধরে না,—ধরে না!

ধীরে, ধীরে, অতি ধীরে, স্বরলহরী শূন্যে মিলাইল। পূর্ণতম, পূর্ণতর, পূর্ণ-মাধুরী, মহেশ্বরের মহাজ্যোৎস্নায় মিশাইতে লাগিল।

সে মাধুরী লক্ষ লক্ষ বৎসর, কোটী কোটী বৎসর লীন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সেই মাধুরীর মধুর পরিণতি অনন্তকাল-স্থায়িনী। শঙ্করের সঙ্গীত শেষ হইল; মাধুরী ধীরে ধীরে লুকাইল। অন্ধকারময় প্রাসাদে একে একে দীপাবলী চিত্রশালায় জলিয়া উঠিল; জীবনী-শক্তি সঞ্চার হইল। পুত্তলিকাবলী একে একে, দু'য়ে দু'য়ে দলে দলে, নয়ন উন্মীলিত করিল। দেবতারা চেতনা পাইয়া চাহিয়া দেখিলেন, রাসপর্য্যঙ্ক শূন্য, শ্রীকৃষ্ণ নাই! শ্রীরাধা নাই! দেখিলেন, শ্রীরাসমণ্ডল জলময়!

সমবেত দেবগণ বজ্রভগ্ন-হৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন,—"একি! কি হইল!"

ব্রহ্মা, যোগবলে জানিলেন, সঙ্গীত-মাধুর্য্যেই বিমুগ্ধ হইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণ দ্রবীভূত হইয়াছেন।

তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ, শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেই

নয়নাভিরাম যুগল-মূর্ত্তি দর্শনে ব্যগ্র হইয়া নানাবিধ স্তব-স্তুতি করিতে লাগিলেন। শেষে প্রত্যাদেশ হইল,—

"সর্ব্বাত্মাহমিয়ং শক্তির্ভক্তানুগ্রহবিগ্রহা।
মমাপ্যস্যাশ্চ হে দেবা দেহেন চ কিমাবয়োঃ॥"

—"দেবগণ! দেহে আমাদের প্রয়োজন কি? আমি সকলের আত্মা, শ্রীরাধিকা আত্মশক্তি; ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবশতই আমাদের দেহ-ধারণ।"

তারপর দেবতারা অনেক করিয়া তাঁহার প্রসাদভাজন হইলেন। পুনরায় রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি গোলোকধামে আবির্ভূত হইলেন। নিরানন্দ দেবগণ আনন্দে পুলকিত হইলেন। সেই রাধাকৃষ্ণ-দ্রবময় জলপ্রবাহই গঙ্গা। গঙ্গাই শঙ্কর-স্বরমাধুরীর মধুর পরিণতি।

পরে শ্রীরাধার ভয়ে গঙ্গা শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমলে তিরোহিতা হন; ব্রহ্মাদির স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যথাসময়ে তাঁহাকে আবার নিঃসারিত করেন।

ভাবগত।

দৈত্যরাজ বলির যজ্ঞে, বামনদেব ত্রিপাদ-ভূমি গ্রহণ করিয়া বিরাট্‌মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন তাঁহার এক পদ ব্রহ্মাণ্ডোর্দ্ধ-কটাহ ভেদ করিয়া আরও ঊর্দ্ধে উত্থিত; তৎ-পদ-কমল-স্পর্শ-পবিত্র উপরিবাহিনী জলধারা সেই কটাহ-ছিদ্র পথে নিম্নে ধ্রুবলোকে নিপতিত, ধ্রুবলোক হইতে দেবমার্গে ব্রহ্মলোকে। এই জলধারাই গঙ্গা।

মতান্তর।

সুমেরু-দুহিতা মনোরমার গর্ভে হিমালয়ের ঔরসে গঙ্গার জন্ম। দেবতারা হিমালয়ের নিকট প্রার্থনা করিয়া ইহাঁকে স্বর্গে লইয়া যান।

সর্ব্বমত সমন্বয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে, লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং গঙ্গা বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীমন্নারায়ণের পত্নী; লীলাময়ের লীলা আমরা বুঝিতে অক্ষম। বৈকুণ্ঠে গঙ্গা ও সরস্বতীর পরস্পর কলহ হয়, লক্ষ্মী মধ্যস্থ হইয়া মিটাইতে যান। সরস্বতী, নিরপরাধা লক্ষ্মীকে অভিশাপ দেন, তুমি নদী ও বৃক্ষ-জন্ম প্রাপ্ত হইবে। লক্ষ্মী প্রতিশাপ দিলেন না। গঙ্গা ক্রুদ্ধ হইয়া সরস্বতীকে শাপ দেন, তুমি মর্ত্তলোকে নদী হইবে। সরস্বতীও গঙ্গাকে এইরূপ প্রতিশাপ দেন। স্বামী বৈকুণ্ঠপতি তখন আসিয়া লক্ষ্মীর প্রতি আদর প্রকাশ করেন এবং অপর পত্নীদ্বয়ের প্রতি বিশেষ ক্রুদ্ধ হন। এমন কি, তিনি বলিলেন,—"গঙ্গা ও সরস্বতী আমার নিকটে থাকিতে পারিবেন না। শুদ্ধ সত্যস্বরূপা লক্ষ্মীই আমার সহচারিণী হইবেন। গঙ্গা শিবজায়া হইবেন। আর সরস্বতী ব্রহ্ম-পত্নী হইবেন। বলা বাহুল্য, পূর্ব্বোক্ত অভিশাপ তিন জনকেই ভোগ করিতে হইবে।"

তারপর গঙ্গা ও সরস্বতী অনেক রোদন ও অনুতাপে এবং লক্ষ্মীর অশেষ অনুনয়-বিনয়ে মধুসূদন সদয় হইয়া শেষে বলিলেন,—"কলির পঞ্চসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তোমাদিগকে শাপ ভোগ করিতে হইবে; তারপর আবার এই স্থানে আসিবে। সরস্বতী স্বয়ং আমার পত্নী থাকিবেন, অর্দ্ধাংশে ব্রহ্মপত্নী হইবেন; গঙ্গাও স্বয়ং আমার পত্নী থাকিবেন, অর্দ্ধাংশে শিবজায়া হইবেন।"

ইহাতে বুঝা গেল,—"শ্রীকৃষ্ণের যেমন অংশাবতার, কলাবতার ইত্যাদি আছে, তদ্রূপ গঙ্গা প্রভৃতিরও অংশাবতার হয়। অংশাব-তীর্ণা গঙ্গাই ভাগীরথীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী ও শিবজায়া।"

এক্ষণে মনোযোগ করিয়া দেখ ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত-পুরাণাদি-মতের সামঞ্জস্য হইয়াছে;—

গঙ্গার প্রথম উৎপত্তি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে। তারপর বিষ্ণুপদে গঙ্গার

তিরোধান কথাও আছে। সেই গুপ্ত গঙ্গা কেমন করিয়া ব্যক্ত হইলেন, ভাগবতে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় চরণ-তিরোহিতা গঙ্গাই ব্রহ্মাণ্ড-উপরি-বাহিনী-হইয়াছিলেন, অথবা ব্রহ্মাণ্ডের উপরিভাগও শ্রীকৃষ্ণের চরণ-বহির্ভূত নহে এইরূপ ভাব বিবেচনা করিয়া লইতে হয়।

সরস্বতী-শাপাদির পর হিমালয়ের ঔরসে মনোরমার গর্ভে গঙ্গা অর্দ্ধাংশে অবতীর্ণা হন। শিব তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই অংশাবতীর্ণা গঙ্গা স্বর্গ-মর্ত্ত-সঞ্চারী জল-প্রবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

দেবতারা হিমালয় দুহিতা গঙ্গাকে চাহিয়া লইয়া যান, ইহার তাৎপর্য্যই "অংশাবতীর্ণা গঙ্গা স্বর্গস্থ জল-প্রবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।" পৃথিবীস্থ জল-প্রবাহেরও যে অধিষ্ঠাত্রী দেবী তিনিই, তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ হইতেই পাওয়া যায়।* গোলোক, বৈকুণ্ঠ, ধ্রুবলোক—এই সব স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং গঙ্গা।

পৃথিবীতে আবির্ভাব।

সূর্য্যবংশীয় প্রবল প্ররাক্রান্ত রাজা সগর, অশ্বমেধ-যজ্ঞ করেন। দেবরাজ মেধ্য অশ্ব অপহরণ করিয়া পাতালস্থিত সমাধিমগ্ন মহর্ষি কপিলের নিকট সেই অশ্ব বন্ধন করিয়া রাখিয়া যান। কপিলের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও হয় নাই; তিনি সর্ব্বব্যাপক পরম জ্যোতির পরমতত্ত্ব ভাবনায় বাহ্যজ্ঞান-শূন্য। অশ্বানুসারী ষষ্টি সহস্র সগর-নন্দন অন্বেষণ করিতে করিতে নানা চেষ্টার পর তথায় আসিয়া উপস্থিত। তাহারা কপিলকে চোর মনে করিয়া বিশেষ অপমান করিতে আরম্ভ করিবামাত্র তাঁহার তেজে ভস্মীভূত হইয়া যায়। সগরের বিশাল বংশের মধ্যে এক পৌত্র অংশুমান্ মাত্র অবশিষ্ট ছিলেন। অংশুমান্, ব্রহ্মতেজে দগ্ধ সগর-নন্দনগণের ভ্রাতুষ্পুত্র। সগর কোনরূপে কর্ম্ম-সম্পাদন করিয়া পৌত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া শেষগতি প্রাপ্ত হইলেন। পতিতপাবনী গঙ্গা ব্যতীত পিতৃব্য-দিগের উদ্ধারের উপায় নাই জানিয়া অংশুমান্ কিছুকাল রাজ্যভোগের পর স্বীয়পুত্র দিলীপকে রাজ্য দিয়া গঙ্গানয়নের জন্য কঠোর তপস্যা করেন; তারপর অকৃতকার্য্য হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হন। দিলীপও অংশুমানের পন্থা অনুসরণ করিলেন। তাঁহার ভাগ্যেও গঙ্গা আনয়ন করা ঘটিল না। দিলীপের পুত্র ভগীরথ। এই ক্ষণজন্মা পুরুষ, তপোবলে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গঙ্গা—সকলকেই সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। ইনিই পিতৃপুরুষগণকে নরক-যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন। এই মহাপুরুষের প্রসাদেই আমরা এই ঘোর কলিকালেও নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছি। এই মহাপুরুষের মহানুগ্রহেই কোটি কোটি পাপী মহাপাপী ইঁহার পবিত্র সলিল-স্পর্শেই বিশুদ্ধ হইতেছে। মহারাজ ভগীরথের তপোবলে, গঙ্গা, বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে তৃতীয়া তিথিতে ব্রহ্মলোক হইতে ভূমণ্ডল অভিমুখে অবতীর্ণা হন।

ভগীরথের আরাধনায় পরম প্রীত শিব, গঙ্গার বেগধারণের জন্য হিমালয়ে জটা বিকীর্ণ করিয়া বসিয়া বলিলেন, 'গঙ্গে! পতিতা হও'। গঙ্গা তাঁহার মস্তকে নিপতিত হইয়া এক বৎসর

* ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ দুই প্রকার;—এক প্রকার সাধারণে প্রচলিত, আর এক প্রকার ইদানীং অপ্রচলিত। এই অপ্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ, উদার প্রসিদ্ধ জমীদার ৺বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তকাগারে আছে। কোন্ খানি আসল, আর কোন্ খানি নকল, তাহা বলা এক্ষেত্রে সুকঠিন। যদি অপ্রচলিত খানিই আসল হয়, আর তাহাতে এ প্রকারে গঙ্গাৎপত্তির কথা যদি না থাকে, তবে ভাগবত-মতেই গঙ্গাৎপত্তি। অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অংশাবতার হিমালয়-গৃহে হয়, এ কথা সর্ব্বপক্ষেই সমান।

জটাজালে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন,—নির্গমের পন্থা পাইলেন না। পরিশেষে ভগীরথের প্রার্থনায় শিব, গঙ্গা ত্যাগ করিলেন।

জৈষ্ঠমাস শুক্লপক্ষ দশমীতিথি মঙ্গলবার হস্তানক্ষত্র শ্রীশ্রী ৺ গঙ্গা হিমালয়ের গঙ্গাদ্বার হইতে ভূতলে নিপতিত হন।

এই দিন অতি পবিত্র। এই তিথি দশহরা নামে অভিহিত। এই সব বার-তিথি-নক্ষত্রযোগে ভগীরথ-দশহরা হইয়া থাকে। এই বৎসর ভগীরথ-দশহরা হইয়াছিল। দশহরার গঙ্গাস্নান, গঙ্গাপূজা এবং মনসাপূজার বিধি আছে।

গঙ্গা ব্রহ্মলোক হইতে নিঃসৃতা হইয়া চারি ভাগে বিভক্ত হন। এই চারি ধারার নাম সীতা, অলকনন্দা, বংক্ষু এবং ভদ্রা। সীতা, ক্রমে গন্ধমাদন পর্ব্বত বহিয়া ভদ্রাশ্ব-বর্ষের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব-সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। বংক্ষু ক্রমে মাল্যবান্ পর্ব্বত বহিয়া কেতুমাল-বর্ষের মধ্য দিয়া পশ্চিম-সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। ভদ্রা, ক্রমে শৃঙ্গবান্ পর্ব্বত বহিয়া উত্তর-কুরুবর্ষের মধ্য দিয়া উত্তর-সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। আর অলকনন্দা ক্রমে হিমালয় পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া নানা ধারায় দক্ষিণ-সমুদ্রে মিলিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে পতিতপাবনী ধারাই ভাগীরথী এবং গঙ্গা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। হরিদ্বার হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত ইঁহার ভৌগোলিক বিস্তৃতি। ইংরেজেরা পদ্মাকে গঙ্গা বলিয়া থাকেন বটে; কিন্তু সে কথা তুলিবার কোন প্রয়োজন নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

মায়ের আগমন।*

সদানন্দ তত্ত্বনিধি মহাশয় (ভোলাদাস) প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে মণ্ডপ-প্রতিষ্ঠিত মায়ের আসনোপান্তে উপবিষ্ট হইয়া মায়ের শুভাগমন চিন্তা করিতেছেন,—"এবার কি উপায়ে মাকে আনিতে হইবে, হরিহরের হৃদয়-সরোবিলাসী চরণ-কমল কেমন করিয়া এই পাপভূমি সংস্পর্শ করিবে, কেমন করিয়াই বা ইন্দ্রাদি দেবগণের মুকুট-মণির আলিঙ্গন উপেক্ষা করিয়া সদানন্দের অনুরোধ রক্ষা করিবে" ইত্যাদি নানাবিধ অনুকূল প্রতিকূল বিতর্ক করিতেছেন। অপত্য-বৎসলা মায়ের দয়াময়ী নামটী মনে করিয়া একু

* কয়েক বৎসর যাবৎই বঙ্গবাসী, বেদব্যাস এবং জন্মভূমিতে মায়ের আগমন সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যায়িকা-নিবদ্ধ অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেক-প্রবন্ধেই মায়ের পূজার দুইটী আদর্শ চিত্রিত হইত। একটী চিত্রে প্রকৃত পূজার অবস্থা, অপরটীতে বিকৃত ও বিড়ম্বিত পূজার আকার প্রদর্শিত হইত। উদ্দেশ্য,—পাঠকগণের শিক্ষা লাভ হওয়া, কিন্তু পাঠ করিয়া রসাস্বাদ করা নহে। ভক্তি-রসাস্বাদের নিমিত্ত অন্যান্য বহুবিধ গ্রন্থ-প্রবন্ধাদিই বিদ্যমান রহিয়াছে, সুতরাং সেজন্য আমার বৎসর বৎসর প্রয়াস পাওয়া নিষ্প্রয়োজন। অতএব পূজার প্রকৃতাবস্থা আর বিকৃতাবস্থা প্রদর্শন করানই আমার লক্ষিত ছিল। প্রকৃত পূজার চিত্র দেখিতে পাইলে পাঠকগণ তাহারই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিবেন, ঐরূপ আশা ছিল। সে আশার ফল এ পর্য্যন্ত কতদূর হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু তথাপি এবার সেইরূপ প্রবন্ধ লেখা অনাবশ্যক মনে করি। কারণ, পূর্ব্বলিখিত প্রবন্ধাবলী পাঠে যাঁহাদের শিক্ষা অপর্য্যাপ্ত রহিয়াছে, ভবিষ্যতে তাঁহাদের অধিক কিছু হইবার আশা নাই, আর যাঁহারা প্রকৃত পূজার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের ত অভাবই নাই, সুতরাং সত্য-পূজা আর মিথ্যা-পূজার পুনর্ব্বর্ণন করা উভয়থাই নিষ্প্রয়োজন। অতএব এবার সে বিষয়ে নিবৃত্ত থাকিয়া মায়ের আগমন-তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করিব। সর্ব্বব্যাপিনী সনাতনী মায়ের আগমন-নির্গমন কিরূপে সম্ভবে, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিব। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎসরের উপদেশাবলী, যে সকল পাঠকের নিকট একেবারে অকর্ম্মণ্য হয় নাই, এই প্রবন্ধও তাঁহাদেরই বিশেষ উপকারী হইবে, এমত আশা করি।

একবার আশ্বস্ত হইতেছেন, আবার সেই পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎসরের ঘটনাবলী স্মরণ করিয়া আশা-ভরসা-শূন্য হইতেছেন; তাললয়-যুক্ত উদাত্তস্বরে একবার গাহিতেছেন,—"ডাক্ দেখি মন ডাকের মত, তবে কি মা রইতে পারে * * *" আবার হতাশ্বাস-কালে গাহিতেছেন,—"যার ভাবনা ভাব রে মন, সে ত নয় সদয়া তেমন। মা বটে তার নাইকো দয়া, শোন্ বলি তার দয়া কেমন; সে যে প্রসবিয়ে প্রাণহরে, ভুজঙ্গী সন্তানে যেমন * * *" এইরূপ নানাভাবের গান, নানাবিধ বিতর্কনা, নানাবিধ ভাবনা-চিন্তায় সদানন্দের পূর্ব্বাহ্ন অতীতপ্রায় হইল। এদিকে অধ্যয়নার্থী শিষ্য সুব্রহ্মণ্য যতি বৃহদারণ্যক পুস্তকখানি কক্ষে করিয়া গুরুর দৃষ্টিপাত-প্রতীক্ষায় পশ্চাদ্ভাগে মৌনীভাবে দণ্ডায়মান। দৈবাৎ সদানন্দ পশ্চাম্মুখ হইয়া উপস্থিত প্রিয়-শিষ্যের অধ্যয়ন-কাল অতীতপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ সমুৎকণ্ঠ হইলেন, এবং সুব্রহ্মণ্যকে বসিতে আদেশ করিয়া অধ্যয়নের অনুমতি করিলেন। শিষ্যও গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দণ্ডবৎ প্রণামান্তে সকৃতাঞ্জলি নিবেদন করিতে লাগিলেন;—

শিষ্য। ভগবন্! ভবদীয় চরণপ্রান্তে থাকিলেই আমার অধ্যয়নের ফলপ্রাপ্তি হয়। আপনার স্বাভাবিক বাক্যই বেদান্তার্থের সমুদ্দীপক, আর ব্যবহারাবলী তাহার উদাহরণ-স্বরূপ, অতএব গ্রন্থের শ্লোকাধ্যয়ন না হইলেও আমার অভীষ্টলাভ পক্ষে কোনই ত্রুটি হয় না। অদ্য ভবন্মুখারবিন্দ-নিঃসৃত যে বচনামৃত পান করিলাম, যেরূপ তৎপরায়ণতা দেখিলাম, তদ্দ্বারাই আমার অদ্যকার পাঠ-পিপাসা নিবৃত্ত হইয়াছে। অদ্য আর গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া গুরুদেবের নিত্যক্রিয়ার অন্তরায় হইতে উৎসাহী নহি। কিন্তু আপনার বর্ত্তমান সমাচারের দ্বারা আমার চিরসম্ভূত একটী সন্দেহের সমুদ্দীপনা হইয়াছে; সপ্রসাদ আদেশ পাইলে তাহা নিবেদন করিতে পারি এবং সে বিষয়ে যদি আমি কিছু শুনিবার পাত্র হই, তবে শুনিতে অভিলাষ করি।

সদানন্দ। বৎস! আমি প্রসন্নই আছি। যদি মা-সম্বন্ধীয় কোন কথা হয়, তবে উপস্থিত কর, আহ্নিক-কালের পূর্ব্বে সমাধার উপযুক্ত হইলে, এখনই বলিব।

শিষ্য। দেব! "উতামুং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি" "অহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ" ইত্যাদি ঋঙ্মন্ত্রপাঠ-কালে ভবৎপদপ্রান্তেই এইরূপ জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, মা স্বয়ং বলিতেছেন, তিনি সর্ব্বদাই ত্রিভুবন ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার কোথাও অভাব নাই, অসত্তা নাই, তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর-বাহিরে সমভাবে বিদ্যমানা,—তাঁহার সত্তাই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা, তিনি সত্তারূপা, চিদ্রূপতা, শক্তিরূপা, তিনি না থাকিলে কিছুই থাকিতে পারে না, তিনি দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, দশভুজাদি সমস্ত রূপেই সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বর্ত্তমানা রহিয়াছেন, তাঁহার রূপ নিত্য, অস্তিত্ব নিত্য সর্ব্বত্র থাকাও নিত্য। ইহার কোনটীরই কখনও অন্যথা হইবার নহে। এইরূপ, আরও বহুসংখ্যক ঋক্, যজুঃ, সাম এবং আথর্ব্বণ মন্ত্রাবলী অধ্যয়নে এই জ্ঞানই সুদৃঢ় হইয়াছে, সুতরাং জগদ্ব্যাপিনী মায়ের আগমন-নির্গমন উভয়ই তুল্যরূপে অসম্ভবপর। যিনি সর্ব্বত্রই সমভাবে বিরাজমানা, তিনি আর আসিবেন কি, যাইবেনই বা কি, কোন্ স্থান হইতেই বা কোথা আসিবেন, কোথা যাইবেন? মা ত প্রতিমাদির মধ্যেও বিরাজ করিতেছেন, বাহিরেও বিরাজ করিতেছেন; অতএব মায়ের অর্চ্চনাদি কালে শাস্ত্রোপদিষ্ট আবাহন, বিসর্জ্জন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠাদির তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিতে পারি না। আমি এই পরস্পর-বিরুদ্ধভাবে প্রতীয়মান শাস্ত্রের

সামঞ্জস্য করিতে অসমর্থ হইয়া বিমোহিত এবং সন্দিহান হইতেছি। তৎপর ভবদীয় অনুষ্ঠান দ্বারাও সেই সংশয় অধিকতর ঘনীভূত হইয়াছে। আপনি প্রতি বৎসরই এই শরৎ সময়ে মায়ের অভাব-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া দেহ-পরিত্যাগে যত্নবান হইয়া থাকেন। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎসরে সেই উত্তুঙ্গ গিরিশিখর হইতে দেহপাত করিয়াছিলেন; তৎপরে মা আসিয়া আমাদিগকে নাথবান্ রাখিলেন; গত বৎসরেও সেই সুগভীর পদ্মানদীর আবর্ত্তে আত্মবিসর্জ্জন করিলে, পূর্ণাভিলাষ হইয়া আমাদিগকে উজ্জীবিত করিলেন, আবার এবারেও সেইরূপ অবস্থাই সমীপবর্ত্তিনী বলিয়া বোধ হইতেছে। মায়ের শুভাগমনের অন্তরায়াবলী চিন্তা করিয়া এবারও সেইরূপ ব্যাকুল, সেইরূপ অধীর হইতেছেন বলিয়া মনে করিতেছি। তাই সন্দেহ হইতেছে,—মা কি তবে সর্ব্বব্যাপিনী নহেন? তাঁহার কি কোনখানে অভাব আছে? তিনি কি সাধারণ প্রাণীর মত গমনাগমন করেন? তাহা হইলে মায়ের কথিত শ্রুতিবাক্য-পরম্পরার কিরূপ সংস্থা হইবে, আর না হইলেই বা আবাহন বিসর্জ্জনের শাস্ত্র এবং ভবদীয় অনুষ্ঠানের মর্য্যাদা কি প্রকারে পরিরক্ষিত হয়, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না; অতএব, আমি ইহা শুনিবার উপযুক্ত হইলে, গুরুপ্রসাদ-লাভে হৃদয়ান্ধকার বিদূরিত করিতে অভিলাষ করি।

গুরু। বৎস! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা জ্ঞাতব্য বিষয়ই বটে; তুমি ইহা শ্রবণের উপযুক্ত পাত্র, তাহাতেও সন্দেহ নাই; কিন্তু এখন আমার সময় অতি অল্প, সুতরাং অতি সংক্ষেপে কয়েকটী কথা বলা যাইতেছে। তুমি অবহিতমনা হইয়া শ্রবণ করিলে ইহা দ্বারাই তৃপ্ত হইতে পারিবে।

বাবা! তুমি শ্রুতি হইতে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছ, তাহাই সত্য। মা সর্ব্বব্যাপিনী, সনাতনী, এবং সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমানা, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই; সুতরাং তাঁহার কোন স্থানে অভাবও নাই, আগমন-নির্গমনও নাই, ইহাও নিশ্চিত বিষয়। কিন্তু তথাপি অর্চ্চনাকালে প্রতিমাদি-বিম্বের মধ্যে তাঁহার আবাহন-বিসর্জ্জনানুষ্ঠান নিতান্ত প্রয়োজনবান্ হয়, তাই শাস্ত্রও তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন, উপাসকগণও তদনুবর্ত্তী হইয়া সেই নিত্য বর্ত্তমান, নিত্যোপস্থিত বস্তুকেই আবাহন-বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন এবং তদনুসারেই মায়ের আগমন-নির্গমন, ভাব-অভাব, আসা-যাওয়া ইত্যাদি ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে।

আবাহনের প্রয়োজন, তাঁহার বর্ত্তমান সত্তারই উপলব্ধি করা,—তিনি এই বিম্বাদিরঅভিন্নভাবে বিরাজ করিতেছেন, ইহা হৃদয়ের বিশ্বাসক্ষেত্রে সুদৃঢ়রূপে নিবদ্ধ করা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্বাত্মার সহিত এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত না হয়, কি, প্রতিবিম্বের প্রতি-অঙ্গে মায়ের শ্রী-অঙ্গ দৃষ্টিগোচর না হয়, ইহার মুখারবিন্দ হইতে মায়ের বাক্যমাধুরী শ্রুতিবিষয় না হয়, স্পর্শে মায়ের স্পর্শ, ঘ্রাণে মায়ের ঘ্রাণ, ত্বগিন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত না হয়, যতক্ষণ ইহার অচেতন-ভাব অন্তরাল করিয়া চৈতন্যময়ীর সচেতন-ভাব মনের দ্বারা অনুভূত না হয়, এবং দয়া-স্নেহাদি-সহচর গুণরাশির সহিত জগন্মাতার মাতৃত্ব-শক্তির উপলব্ধি না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই বিম্বমধ্যে মায়ের অস্তিত্বের উপলব্ধি হইতেছে, অথবা সেইরূপ বিশ্বাস হইতেছে, ইহা বলা যাইতে পারে না। এই বিশ্বাস পরিদীপনার নিমিত্তই বিদ্যমানা মাকেও আবাহন করিতে হয় এবং প্রতিষ্ঠিতা মায়েরও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়। আবাহন এবং প্রাণপ্রতিষ্ঠার দ্বারা উল্লিখিত-মত বিশ্বাসটী পরিপক্ব হয়।

অবশ্যই, শাস্ত্রাধ্যয়নাদি দ্বারা সকলেরই

মায়ের সর্ব্বব্যাপকতাদি সমস্তই পরিজ্ঞাত হয় সত্য, কিন্তু সেই জ্ঞান উপলব্ধি বা অপরোক্ষ জ্ঞান নহে ; তাহাকে শ্রাবণিক জ্ঞান এবং অনুমান জ্ঞান বলে, সুতরাং তাহা পরোক্ষ বা অপ্রত্যক্ষজ্ঞান। ঈদৃশ জ্ঞানের দ্বারা কোনরূপ ফললাভ হয় না, তৃপ্তিও পায় না। নিকটে জল আছে ইহা শুনিলে বা অনুমানে জানিতে পাইলে যেমন কখনও পিপাসাশান্তি বা তৃপ্তি সাধন হয় না, অথবা শ্রবণ এবং অনুমানের দ্বারা যেমন কাহার দিগ্‌ভ্রম অপনোদিত হয় না, মায়ের অস্তিত্বের শ্রাবণিক জ্ঞান এবং আনুমানিক জ্ঞানও তেমন কোন কার্য্যাবহ হয় না। জল পান করিতে পাইলেই পঞ্চপ্রাণ আপ্যায়িত হয়, প্রকৃত দিকের প্রত্যক্ষ হইলেই দিগ্‌ভ্রম বিদূরিত হয়। সেইরূপ জগন্মাতাকেও উপলব্ধি করিতে পারিলেই সর্ব্বাত্মা চরিতার্থ হয়, মন প্রাণ সমাপ্যায়িত হয়, পূজায় প্রবৃত্তি এবং পূজাধিকারও সেই সময়েই হয়। কিন্তু তাঁহার জলন্ত উপলব্ধি না হইয়া কেবল শ্রাবণিক জ্ঞান আর আনুমানিক জ্ঞান থাকিলে কোন ফলই হয় না, পূজাধিকার পূজাপ্রবৃত্তিও জন্মে না। তাই আবাহন, প্রাণপ্রতিষ্ঠাদি দ্বারা সেই বিশ্বাস সুদৃঢ় করিয়া পরে পূজারম্ভ করা বিহিত হইয়াছে, এবং এইরূপ বৈশ্বাসিক সত্তা-অসত্তা লইয়াই হিন্দু-সমাজে জগন্মাতার আগমন-নির্গমন-ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে।

এই কারণেই মানস-পূজার সময়েও (ভূতশুদ্ধির পরে) আর্য্য-উপাসকগণ স্বতোবিরাজমানা জগন্মাতাকে আপনার হৃদয়ে আবাহন এবং প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। মুসলমানাদি আধুনিক উপাসকগণও অনেক সময়ে তাঁহাকে হৃদয় মধ্যে আবাহন করিয়া থাকেন। কিন্তু হৃদয়মধ্যে অন্তরাত্মরূপিণী জগন্মাতার সত্তা কাহারই অস্বীকৃত বা শ্রাবণিক ও আনুমানিক জ্ঞানের অবিষয়ীভূত নহে, অথচ হৃদয়ে আবাহন-ব্যবস্থা সকলেরই আছে। অতএব স্বতঃসিদ্ধ বস্তুর আবাহন যে কেবল প্রতিবিম্বে পূজাকালেই করা হয়, তাহা নহে ; আর কেবল হিন্দুসমাজই যে তাহা করেন, এমতও নহে। শ্রাবণিক এবং আনুমানিক জ্ঞান থাকিলেও প্রত্যক্ষোপলব্ধি না করিতে পারিয়া যিনি যেখানে তাঁহার অভাব বোধ করেন, মা স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশবতী হইলেও, তিনি আপনার উপলব্ধিতে আনিবার নিমিত্ত সেইখানেই মাকে আবাহন করিয়া থাকেন। প্রতিমাতেও সেই ভাবেই আবাহন-বিসর্জ্জন করা হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত, আবির্ভাব তিরোভাব হইতেও মায়ের আগমন-নির্গমন পরিকল্পিত হয়। মায়ের আবির্ভাবই আগমন, আর তিরোভাব নির্গমন। সর্ব্বশক্তিময়ী, সর্ব্বগুণময়ী, সর্ব্বচৈতন্যময়ী মা সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজমানা হইলেও, সকল সময়েই তাঁহার সমস্ত শক্তি এবং সমস্ত গুণের সমান ভাবে ক্রিয়া দৃষ্ট হয় না। মায়ের স্রষ্টৃশক্তি বা রজোগুণের প্রাবল্য সময়ে স্থিতি-শক্তি বা সত্ত্বগুণ এবং সংহর্ত্তৃ-শক্তি বা তমোগুণের প্রবলতা থাকে না, তাহাদের ক্রিয়াও তেমন থাকে না। আবার স্থিতিশক্তির প্রবলতাকালেও রজঃ আর তমোগুণের প্রাবল্য থাকে না, এবং সংহর্ত্তৃ শক্তির প্রবলতা সময়ে রজঃ আর সত্ত্বগুণের তেমন আধিক্য থাকে না। যখন যে শক্তির প্রবলতা হয়, তখন তাহারই আধিপত্য হয়, পূর্ণমাত্রায় ক্রিয়াও জগতের উপরি তাহারই পরিদৃষ্ট হয়। এইরূপ প্রাবল্যাবস্থাই সেই শক্তির আবির্ভাব, এবং অপ্রাবল্যাবস্থাই অপর শক্তির তিরোভাব শব্দের অর্থ। অনন্ত-শক্তিময়ী মায়ের অনন্ত-শক্তি রাশিরই এইরূপ পর-পর-ক্রমে আবির্ভাব-তিরোভাব হইয়া আসিতেছে। 'মায়ের শক্তির আবির্ভাব' আর মায়ের আবির্ভাব' এই কথাদ্বয়ের অর্থতঃ কোন ভেদ নাই। শক্তি আর গুণাবলী দ্বারাই মায়ের সত্তা অনু-

ভূত হয়, কিন্তু তাহা বাদ দিয়া মায়ের সত্তা ধরিতে পারা যায় না, সুতরাং শক্তির আবির্ভাব-তিরোভাবই মায়ের আবির্ভাব-তিরোভাব। মায়ের স্রষ্টৃ শক্তির আবির্ভাবকালে ব্রহ্মাণী-রূপের আবির্ভাব এবং বৈষ্ণবী-রুদ্রাণী-রূপের তিরোভাব বলা যাইতে পারে, আবার অপর দুইটীর আবির্ভাবকালেও অবশিষ্ট দুইটী রূপের তিরোভাব ব্যবহৃত হয়। এজন্য আর্য্যগণ প্রাতঃসন্ধ্যানুষ্ঠানাদি-কালে মায়ের ব্রহ্মাণী-রূপ চিন্তা করিয়া থাকেন, মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় বৈষ্ণবীরূপ এবং সায়ংসন্ধ্যায় রুদ্রাণীরূপ ধ্যান করিয়া থাকেন। প্রাতঃকালে মায়ের রজঃশক্তির আবির্ভাব হয়, মধ্যাহ্নে তমঃপ্রধান সত্ত্ব, আর সায়াহ্নে সত্ত্বপ্রধান তমঃশক্তির প্রাবল্য হইয়া থাকে। জগতের মধ্যে মায়ের যে শক্তির প্রাবল্য থাকে না, তাহার উপলব্ধি করা দুঃসাধ্য, সুতরাং উপাসনাও দুঃসাধ্য। তাই মায়ের যখন যে রূপের ক্রিয়ার প্রবলতা অনুভূত হয়, তখন সেই রূপেরই চিন্তা করা যাইতে পারে। এই হেতুকে মূলীভূত করিয়া প্রত্যুষে এই জগতে ব্রহ্মাণীর আগমন এবং বৈষ্ণবী-রুদ্রাণীর নির্গমন বলা যাইতে পারে, আবার মধ্যাহ্নসায়াহ্নেও যথাক্রমে এক একটীর আগমন এবং অপর দুইটীর নির্গমন ব্যবহৃত হয়, তদনুসারে ইহাঁদের আবাহন বিসর্জ্জনও আছে।

সেইরূপ এই শরৎ সময়ে ভাদ্রীয় কৃষ্ণনবমী হইতে এই পৃথিবীতে মায়ের সেই সর্ব্বশক্তি সর্ব্বগুণের মূল-কারণ স্বরূপ মাতৃশক্তির আবির্ভাব হয়। ইহাঁর সুবিস্তীর্ণ বিবরণ পূর্ব্বেই * অবগত আছ, সুতরাং এখন আর বলিবার আবশ্যকতাও নাই, আমার সময়ও নাই। অতএব উল্লিখিত নিয়মে এই সময়েই মাতৃশক্তিময়ী মায়ের আবির্ভাব এবং আগমন কথা ব্যবহার করা হয়। আবার আশ্বিনীয় শুক্ল-দশমী সময়ে ইহার আপেক্ষিক কিছু অপ্রাবল্য হয়, এ নিমিত্ত তখন মায়ের তিরোভাব বা গমন করা ব্যবহৃত হয়।

উক্ত সমস্ত প্রকার আবির্ভাব-তিরোভাবই সাধারণ-হৃদয়ে কিছুই অনুভূত হয় না, যাহারা নিতান্ত দুর্ম্মেধা, নিতান্ত জড়, নিতান্ত তমসাচ্ছন্ন, এবং নিতান্ত রজোগুণোদ্ধত, তাহারা কোন কিছুই উপলব্ধি করিতে পায় না; রজস্তমোমল-বিধৌত হইয়া যাঁহাদের হৃদয় বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে উদ্ভাসিত হয়, এবং তাঁহার উপলব্ধির নিমিত্ত অতীব পিপাসার্ত্ত হয়, কেবল তাঁহারাই সেই জগন্মায়ের স্বরূপোপলব্ধির উপযুক্ত পাত্র, অন্য কেহ নহে উপলব্ধি না হইলে আনন্দও হয় না, তৃপ্তিও হয় না; পূজার্চ্চনাদিও একরূপ বিফলই বলা যাইতে পারে। সেই জন্য আমি প্রতি বৎসর এত ব্যাকুল হই। বিষয়-সংঘর্ষণ এবং কুসংসর্গাদি দ্বারা হৃদয় কলুষিত হয়, মার্জ্জনা করিলেও আবার কিছুকাল পরেই আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ হয়, মায়ের পিপাসা-পরিশূন্য হয়, তাই কি উপায়ে মাকে দেখিব, কেমন করিয়া হৃদয় উপযুক্ত হইবে, এই সকল চিন্তা করিতে করিতে হতাশ্বাস হইয়া পড়ি, উত্তপ্ত হইয়া পড়ি, অবশেষে আত্মবিসর্জ্জনও করি। এইরূপ করিতে করিতেই হৃদয়ের রজস্তমোমল কাটিয়া যাইতে থাকে, আত্মা উপযুক্ত হয়, পরে মায়ের দর্শন লাভ হয়। কিন্তু বাবা! এবার এই হৃদয়গহ্বরে যেরূপ চতুরশীতি কুণ্ডের অনুভব করিতেছি, তাহাতে সে আশা একেবারেই অস্তমিত হইয়াছে, তাই এত ব্যাকুল-ভাবে সর্ব্বদা ভাবনা-চিন্তায় নিমগ্ন থাকি।

মায়ের উল্লিখিত আবির্ভাব যদিও পৃথিবীব্যাপকই বটে এবং দৃষ্টিপ্রসন্ন হইলে, যে কোন স্থানেই মায়ের উপলব্ধি হইতে পারে, তাহা

* ১২৯৯ সনের ভাদ্রীয় এবং ১৩০০ সনের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ের বেদব্যাসপত্রে এবিষয় বিস্তারমতে লিখিত হইয়াছে।

সত্য, কিন্তু তথাপি পূর্ব্বোল্লিখিত মতে প্রতিমাতেই মায়ের সর্ব্বাঙ্গীন উপলব্ধি হয়; প্রতিমা ব্যতীত আর কিছুতেই সর্ব্বপ্রাণে মায়ের সমস্ত গুণের প্রত্যক্ষ করা যায় না। অন্য আধারে কেবল মনের দ্বারাই অনুভূতি করা যায়, কিন্তু চক্ষু কর্ণাদি দ্বারা নহে; এজন্য মাতৃদর্শনের নিমিত্ত প্রতিমাতেই মায়ের আবাহন করা বিশেষরূপে শাস্ত্রবিহিত, আর্য্যগণও তাহাই করিয়া থাকেন, সুতরাং আমিও তাহার অনুপাতী।

শিষ্য। ভগবন্! ভবদীয় কৃপাপ্রসাদে আমার হৃদয়ান্ধকার দূরীভূত হইয়াছে। শাস্ত্রের তাৎপর্য্যভেদে আমার যে দ্বৈধ ছিল, তাহা অপনোদিত হইয়াছে; এখন আর একটী কথা বুঝিতে পারিলেই কৃতার্থ হই। কথাটী এই,—ভগবানের উপদেশের শেষাংশ দ্বারা বুঝিতে পারিলাম যে, মায়ের আবির্ভাব এই সময়ে সকল স্থানেই হয়, কিন্তু তাহা উপলব্ধি করার সুষ্ঠুতর আলম্বন প্রতিমা। সেইজন্য প্রতিমাতেই তাঁহার আবাহন, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা হয়। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে কৃতাবাহনা এবং কৃতপ্রাণ-প্রতিষ্ঠা প্রতিমা আর সাধারণ কোন বস্তু—এই উভয়ই কি সমান? ইহাতে মায়ের আবির্ভাব সম্বন্ধে তৎকালে কোন বিশেষত্ব জন্মে না কি?

গুরু। অহোবত! অহোবত! তাহা ত নিশ্চয়ই জন্মে। পূজাকালে ভক্তের সোৎকণ্ঠ আবাহন এবং প্রাণপ্রতিষ্ঠার দ্বারা প্রতিমাতে মায়ের আবির্ভাব স্ফুটিত হইয়া পড়ে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে মায়ের সর্ব্বাঙ্গের জ্যোতি প্রকাশিত হয়,—প্রতিমা তখন মা-ময় হইয়া যায়; কিন্তু অন্য বস্তুতে যে মায়ের আবির্ভাব থাকে তা অপ্রস্ফুটিত। যেমন তাপ তাড়িতের আবির্ভাব মাত্রে থাকিলেও ঘর্ষণাদি উপায় দ্বারা সেই ঘৃষ্ট স্থানেই তাহা স্ফুটিত হইয়া পড়ে এবং ক্রিয়াও প্রস্ফুটিত হয়, সেইরূপ মায়ের ব্যাপক আবির্ভাবও ভক্তের মন, প্রাণ, নয়ন এবং মন্ত্ররূপ বাক্যের সংঘর্ষণ দ্বারা প্রতিমাতেই মায়ের আবির্ভাব ফুটিয়া পড়ে, ক্রিয়াও পরিদীপ্ত হয়; কিন্তু অন্যত্র নহে। এ নিমিত্ত ভক্তের আরাধিত প্রতিমাকেই মায়ের মত গৌরব করিয়া প্রণামাদি করিতে হয়, কিন্তু অন্যত্র নহে। ইহাই সাধারণ স্থান এবং প্রতিমাদি-পূজালম্বনের প্রভেদ।

এই অদ্ভুত ঘটনা কেন হয়, কি প্রকারে হয়, তাহাও অন্যত্র অন্যপ্রসঙ্গে (প্রতিমা পূজা রহস্যে) প্রকাশ করিয়াছি, তাহাই ধারণ করিয়া বোঝমা করিয়া লও। এখন আমার আহ্নিকের সময় উপস্থিত, অতএব এইখানেই থাকিল।

শিষ্য। ভগবন্! আমি কৃতার্থ হইয়াছি, আমার আর কোন সন্দেহ নাই। সাধকের মনঃপ্রাণের সংঘর্ষণে কিরূপে মায়ের আবির্ভাবের পরিস্ফুটন হয়, তদ্বিষয় ভবচ্চরণোপান্তে যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তৎসমস্তই স্মৃতিগোচর হইল। অতএব এখন আদেশ হইলে চরণ গ্রহণ করিয়া দেবের আহ্নিক নিরন্তরায় করি। এই বলিয়া মস্তক দ্বারা গুরুর চরণ দুখানি সংশ্লেষণ করিয়া সুব্রহ্মণ্য চতুষ্পাঠী-গৃহে প্রস্থান করিলেন। গুরু সদানন্দও আহ্নিকের নিমিত্ত যতমান হইলেন।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

আগমনী।

উৎসবের উষা-সাজে রাঙা হাসি ঝরে,
বিচিত্র জলদ মাঝে শারদ অম্বরে।
মধুর কুসুম-গন্ধ, সমীর আনন্দ-অন্ধ,
ঘুরিয়া বেড়ায় সুখভরে,
জাগাইয়া নবভাবে সুপ্ত চরাচরে।

সপ্তাশ্ব অরুণরথে তরুণ তপন,
কহ্লার শুনায় আসি' দেবী-আগমন।
গুঞ্জরি জাগায় অলি ঢল ঢল জলে ঢলি'
পদ্মকলি-প্রফুল্ল-আনন,
শারদ মঙ্গল-গীতি, উচ্ছ্বলিত মন।

রমিত বিপিনে জাগে বিহগের গীত,
উচ্চতানে দিঙ্মণ্ডল করিয়া মোহিত।
ফুল ফল ল'য়ে করে তরু-লতা স্তুতি করে,
কুতূহলে ত্রিলোক স্তম্ভিত,
আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ সবে উল্লাসিত।

চলে নিশা-সহচরী শুক-তারা সনে
অপনীত বিষাদের ছায়া সে বরণে,
শরতের শশধর কি উজ্জ্বল-স্নিগ্ধকর।
সপ্তর্ষিমণ্ডল তারাগণে,
ফুল্ল-চিত চলে সবে কাল-নিরূপণে।

চঞ্চলা প্রকৃতি কিবা আনন্দ-বিহ্বল,
কত খেলা করে ল'য়ে জলধর-দল!
চলিত আনন'পরে কভু বা দামিনী স্বরে,
বরষে আনন্দ অশ্রুজল,
ইন্দ্রধনু হেন ছটা বদনে বিমল।

এ উৎসব সনে মনে সতত উদয়,
মহামায়া। মহিমার তুমি মা! আশ্রয়।
দুর্গাসুর দর্প চূর্ণ, ব্রহ্মাণ্ড কল্যাণ পূর্ণ,
তোমার কটাক্ষে সব হয়;
আদ্যাশক্তি তোমাতেই সৃষ্টি স্থিতি লয়।

বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত মহামহিষ-নাশিনী,
দয়াময়ী মহেন্দ্রের শান্তি-বিধায়িনী।
করি' তুষ্ট ভগবতী সুরথ সাম্রাজ্য-পতি,
দুরন্ত অরাতিকুল জিনি';
বৈশ্য মোক্ষ পায় পূজি' কেশরী-বাহিনী।

পিতৃসত্যে বনবাসী রাজার কুমার,
অনুজ লক্ষ্মণ সাথে বহে অশ্রুধার;—
বিফল সমর হেতু সাগরে রহিল সেতু,
অগণন রাক্ষস-সংহার;—
প্রাণের পুত্তলি সীতা, না হেরি উদ্ধার—

লঙ্কার দুয়ারে কাঁদে রাম-নারায়ণ,
ত্রিভুবন-ত্রাস রণে অজেয় রাবণ।
বিধির বিধান ধরি' শঙ্করি তোমারে স্মরি'
সকাতর কমল-লোচন,—
সুসিদ্ধ হইল চণ্ডী অকাল-বোধন!

সাধকে সিদ্ধিদা সদা প্রসন্না জননী,
শুভদা বরদা মাতা সত্য সনাতনী।
রণে বনে শঙ্কটে বা, যে ভাবে ডাকিবে যেবা,
রাখ পায় পতিত-পাবনি!
মোক্ষদাত্রী, ত্রাণকর্ত্রী, তুমি কাত্যায়নী।

দশভুজে দেবায়ুধ প্রদীপ্ত-কিরণ,
চৈতন্যরূপিণী অঙ্গে বর-আভরণ।
মহামায়া মহেশ্বরী মহাকালার্ণব তরী
কুবের-কাঙ্ক্ষিত শ্রীচরণ,
জ্যোতির্ম্ময় যে আভায় দ্বাদশ তপন!

ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণতরে ভক্তহিত প্রাণ,
খড়-জড়ে ঘটে-পটে, হও অধিষ্ঠান!
ধন্য তত্ত্ব নিরূপণে আর্য্য শাস্ত্রকারগণে,
ব্যক্ত যা'য় দুর্লভ সন্ধান,
কি গাহিব নিরগুণি! তব গুণগান!

কি দিয়া পূজিব দেবি! নাহিক সম্বল,
নয়নে বহিছে সদা মোহ-অশ্রুজল।
প্রীতি, ভক্তি, হাস, ত্যাগ, সকলি বিষের বাস
সর্পসম উগরে গরল,
বসিয়া দুরন্ত রিপু হৃদে অবিরল।

সন্তাপ-হারিণি! তবে যদি দয়া হয়,
অনন্ত গরিমা ভরে হও মা উদয়!
কাল-দোষ বিনাশিয়া শুদ্ধ দৈব দীপ্তি দিয়া
কর সর্ব্ব সুমঙ্গলময়,
নিত্য সুখে হোক লয় অনিত্য বিষয়!

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত।

সমালোচনা।

রাবণ-বধ কাব্য। (প্রথমখণ্ড, ষষ্ঠ সর্গ পর্য্যন্ত) মেঘনাদ বধের পরবর্ত্তী ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। শ্রীহরগোবিন্দ লস্কর বিরচিত। মূল্য ১৲।

কাব্য সম্পূর্ণ না হইলে, প্রকৃত সমালোচনা করা যায় না। তবে, রাবণ-বধ, নূতন কবির নূতন কাব্য। কাব্যরচনা প্রথম বলিয়া নূতন কবি বলিতেছি না, এরূপ কাব্য শতসহস্র রচনা

করিলেও ইনি নূতন কবিই থাকিবেন; নূতন প্রকাশিত কাব্য বলিয়াও নূতন-কাব্য বলি নাই, শত-সংস্করণের পরও ইহা নূতন কাব্যই থাকিবে।

কবিশ্রেষ্ঠ শ্রীহর্ষ লিখিয়াছেন,

রর্ত্ম কর্ষতি পুরঃ পরমেক-
স্তদ্গতানুগতিকো ন মহার্ঘঃ।

প্রথমে পন্থা আবিষ্কার একজনে করে, তার পর তাহার 'গতানুগতিক' অনেকেই হয়। গতানুগতিকের নূতনত্ব নাই, পন্থা আবিষ্কারকের নূতনত্ব চিরদিনই থাকে।

কবি হরগোবিন্দ গতানুগতিক নহেন, পন্থা আবিষ্কারক, তাই তিনি নূতন কবি। যে কাব্যে নূতন কবির নূতনত্বের পরিচয়, তাহাই নূতন কাব্য; রাবণ-বধ এই জন্যই নূতন কাব্য।

ভাষা নূতন, ছন্দ নূতন, অনেক স্থলে ভাবও নূতন। অনুকরণ-প্রিয় বঙ্গভূমিতে বাঙ্গালা-ভাষায় এই নূতন গ্রন্থের যে সাধারণ্যে আদর হইবে, তাহা মনে করি না। তবে ইহা সম্পূর্ণ মনে করি, পণ্ডিত-কবি-সম্বন্ধে হরগোবিন্দ বাবুর শক্তি সবিশেষ সম্মানিত হইবে।

পদ্যে হ্রস্ব-দীর্ঘ ব্যবহারের অভাব নিবন্ধনই বাঙ্গালা ভাষায় হ্রস্ব-দীর্ঘ-উচ্চারণের ভেদ প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে, হরগোবিন্দ বাবু নূতন ধরণে নূতন-ছন্দের অবতারণা করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। স্বরে হ্রস্ব-দীর্ঘ-উচ্চারণ ভেদ নাই বলিয়া—কবি, সংযুক্ত-বর্ণ-সমাবেশে দীর্ঘ স্বরের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, দীর্ঘস্বরের ভরসায় তিনি ছন্দোবদ্ধ করেন নাই। পরে উদাহরণ দিতেছি।

বোধ হয়, কবির অভিপ্রায় এই প্রকার ছন্দ আরও হইলে, পদ্যে হ্রস্ব দীর্ঘ স্বর যোগ করিয়া, হ্রস্ব-দীর্ঘ-উচ্চারণ শিখান যাইবে। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির ইহাই প্রশস্ততম উপায় বটে।

ছন্দগুলি সংস্কৃতানুযায়ী; ভাষাও সংস্কৃতের অনুগত, কিন্তু কিছু কঠিন।

এই স্থানটী পড়িলেই কবির নূতনত্ব এবং ভাষাগত কিঞ্চিৎ কাঠিন্য উভয়ই উপলব্ধ হইবে:—

চমকি বিশ্ব নববীর্য্য সূর্য্য-
নৃপ রজনি-রাজ্য অবসন্নে।
উদিত উদয়-গিরি-কাঞ্চন-মঞ্চ
সুরঞ্জি নিরঞ্জন বর্ণে।
দীপ্ত রশ্মিকুল সৈন্যবৃন্দসম
ছুটিল ভয়ঙ্কর ছন্দে।
ঝটিতি বিভস্মিল——

ছন্দের অনুরোধে পাদপূরণের জন্য দুই একটী স্থলে অনাবশ্যক উপসর্গ ব্যবহার করিতে হইয়াছে, যথা,—উল্লিখিত পদ্যে 'বিভস্মিল',—'বি' অনাবশ্যক, 'সৌধ সুশৃঙ্গে'—'সু' অনাবশ্যক ইত্যাদি।

পরিশেষে প্রধান কবি হরগোবিন্দ বাবুকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তাঁহার নূতন ভাষা, নূতন ছন্দ এবং নূতন পারিপাট্যের আরও উন্নতি সাধন করিয়া ভাষার ও দেশের মুখ আরও উজ্জ্বল করুন।

গৃহ-লক্ষ্মী। শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, বি. এল্ প্রণীত। কলিকাতা, ৬০ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বসু, বি, এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নূতন সংস্করণ, মূল্য ৸০ আনা। "প্রকৃত গৃহলক্ষ্মী হইতে হইলে যে সকল গুণশিক্ষা আবশ্যক, স্ত্রীর নিকট কথোপকথন-চ্ছলে স্বামীর তদ্বিষয়ক উপদেশ"। পাশ্চাত্য শিক্ষার কল্যাণে, তথা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রচলনে, অনেক পুরাতন কথাও এখন আমাদিগকে নূতন করিয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে হয়। লক্ষ্মীস্বরূপিণী হিন্দু-রমণীকেও এখন আবার 'গৃহলক্ষ্মী' হইতে উপদেশ দিতে হয়। এ সব আমাদের গ্রহের ফের,

অথবা অদৃষ্টের জের! সীতা-সাবিত্রীর-দেশের হিন্দু রমণীকেও এখন "স্বামীকে ভক্তি করিও, ভালবাসিও" প্রভৃতি কথা, 'আদার পিঠে কালী' দিয়া, বুঝাইতে হয়! বিড়ম্বনার আর বাকি কি! কালের বশে, আর আমাদের বলিহারি-বুদ্ধির দোষে, এমন অনেক বিষয় এখন আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইতেছে। তাই একদিন আমাদের একজন সূক্ষ্মদর্শী, সমজ্‌দার লেখক অনেক দুঃখে লিখিয়াছিলেন,—"মাকে ভাল না বাস, ভক্তি না কর,—দোহাই তোমার, মাকে চোর বলিও না!" কথাটা বড় মর্ম্মান্তিক সত্য। এখন আমরা এমনই অদ্ভুত-জীব হইয়া পড়িতেছি বটে! এমন দিনে "গৃহলক্ষ্মী"র প্রচারে আমরা সুখী হইয়াছি। হিন্দুর নীতি-শাস্ত্রকার বহুকাল পূর্ব্বে যে সব অমৃতময়ী কথা বলিয়া গিয়াছেন, গ্রন্থকার তাহারই প্রতিধ্বনি-স্বরূপ, তাঁহার সাধের "গৃহলক্ষ্মী" প্রণয়ন করিয়াছেন। এ পুস্তক পাঠ-যোগ্য। লেখকের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও দূরগামী। সূক্ষ্ম-ভাবে, সরল প্রণালীতে বিচার করিবার শক্তি তাঁহার বেশ আছে। লেখক, লিপি-কুশল ও চিন্তাশীল; গ্রন্থের প্রায় সর্ব্বত্রই সে পরিচয় পাইয়াছি। তিনি ভাবিতে জানেন, ভাবাইতেও জানেন। আর একটা সুখের কথা এই, গ্রন্থকারের সহিত প্রায় সকল স্থলেই আমরা একমত হইতে পারিয়াছি। "যথা জলং বিনা পদ্মং পদ্মং শোভাং বিনা যথা। তথৈবচ গৃহং শশ্বদ্‌গৃহিণাং গৃহিণীং বিনা।"—তাঁহার এ উদ্ধৃত 'মটো'টী সার্থক হইয়াছে। কেবল, ত্রুটীর কথা একটী বলিব। "গৃহলক্ষ্মী"র ভাষা যেমনটী হওয়া উচিত ছিল, তেমনটী হয় নাই। ভাষা, আরও কিছু সরল ও প্রাঞ্জল হইলে ভাল হইত। যাহাই হউক, গ্রন্থকার সে উদ্দেশ্য সাধনের পথ অনেকটা পরিষ্কার করিয়াছেন—স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন-চ্ছলে। গ্রন্থখানিতে "বেশভূষা", "শ্বশুরঘর", "সাংসারিক অবস্থা গোপন", "স্বামীর বিদেশ যাত্রা", "সতীত্ব", "অসৎপতির চরিত্র সংশোধন", "পরনিন্দা—পরশ্রীকাতরতা", "শাশুড়ী ও পুত্রবধূ" এবং "গৃহিণীপনা" প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় পনরটী বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এ পনরটী বিষয়, ইস্তক কোণের 'ক'নে-বউ' হইতে পাড়াবেড়ানী বর্ষীয়সী 'রাঙাগিন্নী' অবধি শিখিতে পারেন। আর শুধু স্ত্রীলোকই বা কেন, অনেক পুরুষ-মানুষও ইহা পাঠে নিজে মানুষ হইতে পারিবেন, সঙ্গে সঙ্গে সহধর্ম্মিণীকেও মানুষ করিতে পারিবেন,—যদি তেমন সুকৃতির জোর থাকে। তখন তিনি দেখিবেন, সত্য সত্যই তাঁহার সংসারে গৃহলক্ষ্মীর আবির্ভাব হইয়াছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে "গৃহলক্ষ্মী"র স্থায়িত্ব কামনা করি।

ইন্দুমতী। (সামাজিক উপন্যাস) শ্রীযুক্ত যশোদালাল তালুকদার প্রণীত। কলিকাতা, ক্যানিং লাইব্রেরী হইতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা। বহিখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই বড় পরিপাটী।

সাহিত্য-সংসারের সুপরিচিত, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিতেছেন;—

"যশোদার প্রতি আমার বেশ-একটু স্নেহ আছে। স্নেহের চক্ষে সকলই ভাল—সুতরাং ইন্দুমতীও ভাল লাগিয়াছে। আর ইন্দুমতীকে ভালবাসি তাহার কবিত্বময়ী বেশভূষা ও লালিত্যময়ী ভঙ্গীর জন্য। তবে যশোদার বয়োবৃদ্ধির সহিত জ্ঞান ও গুণপনার বৃদ্ধি হইলে যে, তাহার উপন্যাস আরও ভাল হইবে, তাহা অবশ্য না বলিলেও চলে। কালে যে সেইরূপই হইবে, এমন আশাও করি ও আশীর্ব্বাদও করি।"

সরকার মহাশয়ের যে কথা, আমাদেরও সেই কথা। "ইন্দুমতী"র লেখক সাধারণের উৎসাহ পাইবার যোগ্য।

জনা। (পৌরাণিক দৃশ্য কাব্য) শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মিনার্ভা থিয়েটারে

অভিনীত। কলিকাতা, ৬ নং বিডন ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কোঙার কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ১৲ টাকা। "জনা" মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বান্তর্গত উপাখ্যান অবলম্বনে বিরচিত। গিরিশ-বাবু বড় বাহাদুর পুরুষ। কাব্যে, নাটকে, উপাখ্যানে এবং চুট্‌কি ও রঙ্গরসে—তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। চরিত্র-বিকাশে এবং রসাবতারণায় তিনি সিদ্ধ-হস্ত। অধিকন্তু সৌন্দর্য্য বোধে, অপূর্ব্বত্ব উদ্ভাবনে এবং লিপি-কুশলতায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ রঙ্গ-সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। রঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। প্রকৃত কবি ও নাটককারের যে যে গুণ থাকা আবশ্যক, গিরিশচন্দ্রে তাহার সম্যক্ পরিচয় পাই। "জনা" পড়িয়া বড় তৃপ্তিলাভ করিয়াছি; আরও তৃপ্তিলাভ করিয়াছি,—জনার অভিনয় দেখিয়া। "জনা"য় সূক্ষ্মদর্শী গ্রন্থকারের একটী অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী শক্তি দেখিলাম। সে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয়—তাঁহার বিদূষক। বিদূষকে, গিরিশচন্দ্রের মুন্সীয়ানার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিদূষক, জনৈক হরিভক্তি-পরায়ণ ব্রাহ্মণ। অথচ মুখে সেই জগদ্‌গুরু—কল্পতরুর নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত। পাঠক, বিদূষকের সে ব্যাজ-স্তুতিরএ কটু পরিচয় লউন;—

"অগ্নি। তুমি ত কিছু চাইলে না।

"বিদূষক। আজ যে দেখ্‌ছি তোমার ভারি বাড়াবাড়ি, হরি নিয়ে ছড়াছড়ি; তাই হ'চ্ছে ভয়, কৃষ্ণ দয়াময়, নাম ক'ল্লেই হন উদয়, কিন্তু যেখানে দেন পদাশ্রয়, সেখানে যে সর্ব্বনাশ হয়, এ কথা নিশ্চয়। * * *

"অগ্নি। * * * তুই কেমন ক'রে বল্লি যে, হরিনামে সর্ব্বনাশ হয়?

"বিদূষক। আমিই কি একলা জানি, তুমিই কি আর জান না? আমায় কি পেয়েছ ধানকাণা? শুনবে তোমার দয়াময় হরির গুণ-বর্ণনা!—পাথর চাপালেন মা-বাপের বুকে, তার পর বৃন্দাবন ঝুঁকে, গোপ-গোপিনীর হাড়ির হাল, যশোদা মাগী নাকাল; অবোধ রাখাল কেঁদে সারা, নন্দ বিরসে দিশেহারা; আর রাধা?—তাঁর কাঁদা সার, এক শ বচ্ছর দেখ্‌লেন আঁধার, এদিকে দয়াময় হরি যমুনা পার, কাণ দেবু না কথার কার, যেন কার কখনও ধারেন না ধার।"

এইরূপ আগাগোড়া একই সুরে চরিত্রটীর বিকাশ। 'বিদূষক' বলিলেই যেন একটা পেট-টালা, বেয়াড়া বামন ও রঙ্গ-ভঙ্গ-প্রিয় ভাঁড়ের চেহারা মনে হয়;—কিন্তু এ বিদূষক, কবির সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি ও গভীর চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। আর সেই তেজস্বিনী, আর্য্যরমণী জনার তেজোময়ী উক্তি এবং শক্তিধর কুমার প্রবীরের সেই বীরোচিত বাক্যে, জড়হৃদয়েও শক্তির সঞ্চার হয়। মূল গ্রন্থ হইতে 'জনা'র গল্পাংশ কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে গ্রন্থের কোন অঙ্গহানি হয় নাই। তবে দৃশ্য-কাব্যের প্রয়োজনানুরোধে ইহাতে দুই চারিটী অপ্রাসঙ্গিক দৃশ্যের অবতারণা করিতে হইয়াছে। নাটকে এ দোষ মার্জ্জনীয়। বিশেষ পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে দৃশ্য-কাব্য লিখিয়া কৃতকার্য্য হওয়া, বড় কম কথা নহে। কবি গিরিশচন্দ্র যে, সেই মূলের প্রধান অংশ বজায় রাখিয়া, "জনা"য় গুণপনা দেখাইতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার পরম শ্লাঘার বিষয়। সঙ্গীত রচনায়ও কবির যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা "জনা" হইতে একটিমাত্র গান পাঠককে উপহার দিতেছি;—

দেশমিশ্র—দাদ্‌রা।

"ঘরে কি নাইক নবনী।
কেন অমন ক'রে পরের ঘরে, চুরি করিস্ নীলমণি॥
ওরে, ক্ষিদে যদি পায়, মা ব'লে ডেকরে আমায়,
সইবে কেন পরে, কত কথা ব'লে যায়,
ওরে, পথে জুজু আছে ব'সে, যেওনা যাদুমণি॥
খেতে ব'সে ছড়িয়ে ফেলে দাও,
মুখে তুলে খাইয়ে দিলে কইরে যাদু খাও,
মন্দ বলে তবু কেন পরের বাড়ী যাও,
ওরে, ঘরে কি তোর মন ওঠেনা,
মিষ্টি কি পরের ননী॥"

একাধারে বাৎসল্য, স্নেহ, প্রেম ও ভালবাসার কি অপরূপ চিত্র! এই জন্যই বলি, বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বঙ্গের কৃতী কবি। "জনা" কাব্যামোদীর একান্ত পাঠ্য।

জন্মভূমি।

৪র্থ ভাগ। } কার্ত্তিক। ১৩০১। { ১১শ সংখ্যা।

তমস্বিনী।

উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"মরণ আর কি!"

"নে, ন্যাকামি রাখ্, আমাদের কাছে আর লুকোতে হবে না। আরসির গোড়ায় গিয়ে একবার দেখ্, মুখে আর হাসি ধরচে না।"

'মর্ ছুঁড়ি, হাস্‌লাম আবার কখন!" বলিয়া যে প্রথমে কথা কহিয়াছিল, সে দ্বিতীয়াকে চিম্‌টী কাটিল। যেখানে উরু মাংসল ও কোমল, সেইখানে দুটী কোমল অঙ্গুলি দিয়া চিম্‌টী কাটিল।

চিম্‌টী অনেক রকম, চিম্‌টীর নামও অনেক রকম। তবে চলিত রাম চিম্‌টী আর শ্যাম চিম্‌টী। রামের চেয়ে শ্যামের জ্বালা বেশী। এটা শ্যাম চিম্‌টী।

"উঃ গেলাম!" বলিয়া যে চিম্‌টী খাইয়াছিল, সে একটা পাল্‌টা চিম্‌টী কাটিল। তার পর, দুই জনে চিম্‌টীর স্থানে হাত বুলাইতে লাগিল, ও হাসিতে লাগিল।

বলিতে হইবে কি যে, ইহারা দুই জন অল্পবয়স্কা? বুড়ীরা কি পরস্পরে তামাসা করিয়া চিম্‌টী কাটে?

এ রকম তামাসার একটা বয়স আছে। যৌবনের মুখে সমস্ত শরীরে একটা কেমন অস্থিরতা হয়। যন্ত্রণায় একটা কেমন মধুরতা থাকে। অন্তরটিপ্‌নীতে কেমন সমস্ত শরীরে সুখ বোধ হয়। চিম্‌টীর জ্বালার সঙ্গে শরীরের মধ্যে কেমন চিন্ চিন্ করিয়া ওঠে—নেশা লাগে। তাই সমবয়সী তরুণীদের মধ্যে গা-টিপাটিপির এত ঘটা, চিম্‌টীর এত ছড়াছড়ি।

যে দুই জন পরস্পরকে চিম্‌টী কাটিয়া হাসিতেছিল, তাহারা সমবয়সী। বয়সে ঠিক সমান নয়, কেন না, এক জনের বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর, আর এক জনের অষ্টাদশ। যে প্রথম কথা কহিয়াছিল, সেই বয়ঃকনিষ্ঠা। কিন্তু দুই জনে এক ডিঙ্গীর যাত্রী, একই তরঙ্গে দুই জনে নাচিতেছিল। জীবনের জল যৌবনের বসন্ত বাতাসে তরঙ্গিত হইতেছিল। সেই হিসাবে দুই জনে সমবয়সী।

চতুর্দ্দশ বর্ষীয়ার নাম চারুবালা। আর এক জনের নাম মুক্তকেশী। দুই জনের পাশাপাশি বাড়ী। খিড়কীর দরজা দিয়া

সর্ব্বদা যাতায়াত আছে। দুই জনে অনেক দিনের ভাব। চারুবালার যখন বিবাহ হয়, তখন মুক্তকেশী ক'নে সাজাইতে প্রধান উদ্যোগী। বাসর জাগিতে আর বরকে ঠাট্টা করিতেও সে প্রধান। দুই জনে প্রায় নিত্যই দেখা হয়, দেখা হইলেই মনের কথা হয়।

আজিকার কথাটা এই। আজ চারুর বরের আসিবার কথা। তাহার বরের সঙ্গে এই সবে নূতন ভাব হইয়াছে। মাঝে তাহার বর কোথায় গিয়াছিল, কিছু দিন এখানে ছিল না। চারুবালার বর ফিরিয়া আসিয়াছে ও আজ রাত্রে আসিবে শুনিয়া মুক্ত সাত-তাড়াতাড়ি আসিয়াছিল। ইচ্ছা, চারুকে একটু ক্ষেপাইবে।

তা সেজন্য মুক্তর বাড়ী বহিয়া আসিবার আবশ্যক ছিল না। সে আসিয়া দেখিল, চারু আগেই ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। বর আসিবে বলিয়া বাড়ীর লোক তাহার পিছনে লাগিয়াছে। মুক্ত আসিলে চারু তাহাকে লইয়া একটা আলাদা ঘরে গিয়া বসিল। মুক্তর কথার জ্বালা যেমন, মধুরতা তেমনি।

মুক্ত বলিল, "আজ রাত্রে তোর ঘরে আড়ি পাৎব।"

চারু বলিল, "তা পাতিস্। আমি আলো নিবিয়ে শোব। অন্ধকার নইলে আমার ভাল ঘুম হয় না।"

"কবে থেকে লো? আলো নিবে গেলে ভূতের ভয়ে আঁৎকে উঠিস্ যে। তা আজকে আঁধার ঘরের মাণিক আস্‌বে বটে।"

"তা না হয় আলো নিভাব না, তুই সারা রাত ব'সে থাকিস্। আমি ত আর রাত জাগ্‌ব না, যেমন রোজ রাত্রে শুয়ে থাকি, তেমনি ঘুমিয়ে থাক্‌ব।"

"ওরে আমার খুকি! তা রাত্রে যখন কেঁদে উঠ্‌বি, তখন তোর বরকে তুলোয় কোরে দুধ খাইয়ে দিতে বল্‌ব।"

"দূর পোড়ারমুখি! আমরা তবু পদে আছি, তোর মত এখনো বেহায়া হইনি।"

"আমার আবার বেহায়াপনা কখন দেখ্‌লি?"

"কেন, সেই—সেদিন, মনে নেই? তুই মনে কোরেচিস্ আমি ভুলে গিয়েছি, না?"

মুক্ত হাসিতে লাগিল। কহিল, "আমাদের আর অত বাড়াবাড়ির বয়স নেই। তোদের এখন নতুন বয়স, তোদের সব সাজে।"

চারু তার সে কচি কচি মুখখানি গম্ভীর করিয়া কহিল, "আহা, তা ত ব । তিন কাল গিয়ে এখন এক কালে ঠেকেছে। তা আর এখানে থেকে কি হবে? বুড়ো ভাতার নিয়ে কাশীবাসী হও গে।"

বাস্তবিক, মুক্ত নিজেও বেশ জানিত যে, তাহার যৌবনের মধ্যাহ্ন জোয়ারে এখনও ভাঁটা ধরে নাই। তাহার প্রধান কারণ, মুক্ত-কেশীর এ পর্য্যন্ত সন্তান হয় নাই, হইবার বড় আশাও ছিল না। লোকে তাহাকে বন্ধ্যা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। থম্‌থমে জোয়ারের জল যেমন কূলে কূলে পূরিয়া আসে, তেমনি মুক্তকেশীর শরীর পূরিয়া আসিয়াছিল। তাহাতে সে আবার দোজবরের হাতে পড়িয়াছিল। দোজবরে নামে মাত্র, কারণ মুক্তর স্বামীর বয়সও তেমন অধিক নয় এবং প্রথম পক্ষ হইতে সন্তানাদিও কিছু ছিল না। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর যে জ্বালা, মুক্তর সেটা ছিল না, আদরটুকু সমস্তই ছিল।

কেবল একটা বড় জ্বালা ছিল। মুক্তকেশীর শরীরে নিত্য বাঁধা যৌবন, তাহাতে বরটাই একটু পর হইয়া পড়িয়াছিল। এমন স্বামী অনেক আছে, যাহাদের চক্ষে স্ত্রীর নিত্য নব যৌবন সহ্য হয় না। দু দিন যুবতী রহিল,

তাহার পর গণ্ডা দুই ছেলেপুলে হইল, গোল ফুরাইল। কিন্তু বন্ধ্যা স্ত্রী, যুবতী, সুন্দরী, ঘরে থাকা বড় বিপদ। রাত্রিদিন সামাল সামাল, রাত্রিদিন সাবধান। মুক্তকেশীর এই একটা জ্বালা ছিল।

দুইজনে এই রকম কথাবার্ত্তা হইতেছিল, এমন সময় সেই ঘরে আর একটী বালিকা আসিল। বালিকার বয়স দ্বাদশ বৎসর, নাম স্বর্ণময়ী। চারুবালার পিসতুতা ভগিনী। তাহাকে দেখিয়া মুক্ত ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, "আহা স্বর্ণর মুখখানি বড় শুকিয়ে গেছে। চারুর বর আজ রাত্রে আস্‌বে, আর ও বেচারির বিয়ের সম্বন্ধ পর্য্যন্ত হয় নি। তা তুই ভাবিস্ নে, আমরা সব যোগাড় কোরে শীঘ্রই তোর বিয়ে দিয়ে দেব এখন।"

স্বর্ণ কহিল, "আমায় নিয়ে কেন আবার মুক্ত দিদি? রাঙা দিদিকে জ্বালাচ্চ, ওকেই জ্বালাও।"

মুক্ত চাপিয়া ধরিল, "আচ্ছা তুই সত্য কথা বল্ দেখি, তোর বিয়ে কোর্‌তে ইচ্ছে করে কি না!"

"তোমার গায়ে হাত দিয়ে বল্‌চি, একটুকুও না।"

"মাইরি?"

"মাইরি।"

চারু মুক্তকে কহিল, "তুইও কি পাগল হ'লি না কি? ও কি নিজের মুখে বল্‌বে যে, ওর বিয়ে কর্‌বার বড় ইচ্ছে হ'য়েছে?"

স্বর্ণ বলিল, "মাইরি ভাই রাঙাদিদি, আমার বিয়ে করবার এতটুকুও ইচ্ছে নেই।"

"তবে কি কোর্‌বি?"

"কেন, মার কাছে থাকব।"

"চিরকাল কি আইবুড়ো থাক্‌বি না কি?"

"তা রইলুমই বা!"

"দূর হাঁদি! অমন অলক্ষণে কথা কি বল্‌তে আছে?"

এমন সময় চারুর দিদি তাহাকে ডাকিল;—"বেলা গেল, চারু, চুল বাঁধ্‌বি আয়।"

মুক্তকেশীও উঠিল, বলিল, "যাই ভাই, বাড়ী যাই, বেলা গিয়েছে। আপিস থেকে এসে যদি না দেখ্‌তে পায়, তবেই আর রক্ষা থাক্‌বে না।"

চারু হাসিয়া কহিল, "তাতে আর তার দোষ কি! তোমার মত রূপসী যুবতীকে না দেখ্‌তে পেলে রাগ হবে না? তোকে একলা ফেলে আপিসে কি কোরে যায়, তাই ভাবি।"

মুক্তকে অকারণে তাহার স্বামী মাঝে মাঝে সন্দেহ করে, অনেকে তাহা জানিত। তাই চারু একটু ঠেস্ দিয়া বলিল। মুক্ত বুঝিতে পারিয়া কহিল, "তুই আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিস্ নে।" বলিয়া, হাসিয়া মুক্ত চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বর্ণময়ীর বয়স যখন আট বৎসর, তখন তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। সেই পর্য্যন্ত সে মাতুলালয়ে থাকিত। চারুবালার পিতা স্বর্ণময়ীর মাতুল। স্বর্ণময়ীর মাতার সন্তান হইবে না হইবে না করিয়া এই একটী কন্যা হইয়াছিল। এই মেয়েটী লইয়া তিনি বিধবা হইলেন। ভাই বড় মানুষ। বিধবা, কন্যাকে লইয়া ভ্রাতার আশ্রয়ে রহিল। স্বর্ণময়ীর পিতা সামান্য চাকরী করিতেন, কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। স্বর্ণময়ীর বিবাহের ভারও মাতুলের উপর পড়িল।

প্যারীমাধব রায় স্বর্ণময়ীর মাতুল। কলিকাতায় প্যারীমাধব বাবু একজন জানিত-লোক। তাঁহার অপেক্ষা ধনী আরও অনেকে ছিল, কিন্তু তাঁহার মত বড়মানুষী অনেকে করে নাই। ইদানী একটু সাবধান হইতে

আরম্ভ করিয়াছিলেন। অর্থাগমও পূর্ব্বের অপেক্ষা কমিয়া আসিতেছিল।

চারুবালা তাঁহার আদরের মেয়ে। তাহার বিবাহে বিস্তর ব্যয় হইয়াছিল। এখন স্বর্ণময়ীর বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য, সেও বড় হইয়া উঠিতেছিল। প্যারীমাধব এবং তাঁহার গৃহিণী একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন।

স্বর্ণময়ীর মাকে অনেকে অনেক রকম কথা বলিত। তিনি সাহস করিয়া দু একবার কন্যার বিবাহের কথা ভ্রাতার সম্মুখে পাড়িয়াছিলেন। প্যারীমাধব কহিতেন, "তুমি কোন চিন্তা করিও না। আমি চারুর যেমন বিবাহ দিয়াছি, স্বর্ণেরও সেই রকম করিয়া বিবাহ দিব।" ভ্রাতার মুখে এমন কথা শুনিয়া স্বর্ণের মাতা এক রকম নিশ্চিন্ত থাকিতেন।

বিবাহের কথা মাঝে মাঝে হয়, কিন্তু পাকা সম্বন্ধ কোথাও হয় না। প্যারীমাধব বাবুর ইচ্ছা ধনীর ঘরে স্বর্ণময়ীর বিবাহ হয়। ধনী না হইলে সম্বন্ধ তুল্য হয় না। কিন্তু ধনীর গৃহ হইতে সম্বন্ধ বড় আসে না। প্যারীমাধব বাবুর কন্যা হইলে কোন চিন্তা থাকিত না। কিন্তু বিধবার কন্যাকে কোন্ ধনী ঘরে লইবে?

কথায় বলে লক্ষ কথা নহিলে বিবাহ স্থির হয় না। এক লক্ষ ছাড়া দশ লক্ষ কথা হইল, তবু স্বর্ণময়ীর সম্বন্ধ স্থির আর হয় না। এই দশ লক্ষ কথার কয়েক সহস্র কথা স্বর্ণও শুনিল।

স্বর্ণ ও তাহার মাতার শয়নগৃহ স্বতন্ত্র ছিল। একরাত্রে শয়নকালে স্বর্ণ বলিল, "মা।"

"কি মা?"

ঘরের কোণে মিটি মিটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। সেই আলোকে মাতা দেখিলেন, কন্যার চক্ষু দুইটি ছল ছল করিতেছে, জলে পুরিয়া আসিয়াছে।

ব্যস্ত হইয়া মাতা কন্যাকে কাছে টানিয়া লইলেন। বিধবার এই একমাত্র ধন। স্বর্ণ একটু চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে মা?"

স্বর্ণ তখন মুখ তুলিয়া মার দিকে চাহিল। বড় বড় চোক, চোকের কোলে জল। কহিল, "মা, তোমরা সব বিয়ে দেবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছ কেন?"

সচরাচর এমন কথা মেয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করে না, কিন্তু ইহাদের কথা আলাদা। বিধবা মাতা ও তাহার একমাত্র কন্যা—ইহাদের পরস্পরের নিকট প্রায় কোন কথাই গোপন করিবার থাকে না।

স্বর্ণময়ীর কথা শুনিয়া মাতা একটু হাসিলেন, স্বর্ণের মাথায় হাত দিয়া কহিলেন, "পাগলি, ব্যস্ত হব না? তুই কি এখন আর ছোট্টটী আছিস্? এখন বিয়ে না দিলে লোকে যে নিন্দা কর্‌বে।"

স্বর্ণময়ী কহিল, "বিয়েতে কি সুখ মা? আমার বিয়ে হ'লে আমি শ্বশুরবাড়ী যাব, তোমায় আর দেখ্‌তে পাব না। তুমিও তখন একলা থাকবে, তোমার কাছে কে থাক্‌বে মা?"

তখন মাতার চক্ষে জল ভরিয়া আসিল, কহিলেন, "তা কি কোর্‌ব মা? মেয়ে ত চিরকালই পরের ঘরে যায়।"

"কেন মা, বিয়ে কি না হইলেই নয়? তোমায় ছেড়ে আমি কখন থাক্‌তে পারব না।"

মাতা ক্ষীণ হাসিয়া কহিলেন, "অমন সবাই বলে মা, তারপর দু দিন শ্বশুর ঘর কর্‌লে সব ভুলে যায়।"

তখন স্বর্ণময়ী বলিবার কিছু খুঁজিয়া পায় না। কিন্তু কিছুতেই বিবাহের কথা তাহার ভাল লাগিতেছিল না। তাহার সমুদয় প্রকৃতি,

তাহার হৃদয়, তাহার শরীর যেন বিবাহের কথায় পীড়িত হইতেছিল। তাহার ব্যথিত হৃদয় হইতে উত্তর আসিল, "বিয়ের জন্য এত কেন, মা? শেষে আমার যদি তোমার মত দশা হয়!"

এই কথা শাণিত ছুরিকার ন্যায় জননীর হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। ঘরের প্রদীপ যেন নিভিয়া গেল, অন্ধকারে নানাবিধ বিকট শব্দে যেন তাঁহার শ্রবণ পীড়িত হইতে লাগিল। কন্যার মুখ ভুলিয়া গেলেন, এখনকার অবস্থা ভুলিয়া গেলেন। ঝঞ্ঝাতাড়িত সমুদ্রতরঙ্গের তুল্য পূর্ব্বকথাসমূহ স্মৃতিসমুদ্রে উদিত হইতে লাগিল।

স্বর্ণময়ীর মাতা কোন কথা কহিলেন না, কেবল স্থির বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। নিঃশব্দে স্থির চক্ষু হইতে গণ্ড বহিয়া দর দর ধারা বহিতে লাগিল।

তখন আর কোন কথা স্বর্ণের মনে রহিল না। মাতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, গণ্ডে গণ্ড রাখিয়া মাতার অশ্রু নিজের কপোল দ্বারা মুছাইয়া দিয়া, রুদ্ধ, ভগ্ন স্বরে কহিল, "কেঁদো না মা! আমি তোমার পাগল মেয়ে, আমার কথায় কি কাঁদ্‌তে আছে? কেঁদো না মা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। আমি আর কখন কিছু বল্‌ব না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীমতী মুক্তকেশী চারুবালার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া গজেন্দ্রগমনে যখন গৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন কর্ত্তা মহাশয় শ্রীমান্ শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়. আঁটা পোশাকে দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। এই মাত্র আপিস হইতে আসিয়াছেন, মাথায় কালো মখমলের টুপি রহিয়াছে, টুপির নীচে ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম। বাবু দাঁড়াইয়া গৃহিণীর পথ দেখিতেছিলেন।

শ্যামাচরণের বয়স চৌত্রিশ বৎসর। টুপি খুলিলে মাথার মাঝখানে টাক দেখা যায়। মাঝারি গড়নের মানুষ, মানানসই নেয়াপাতি ভুঁড়ি, রং শ্যামবর্ণ। গোঁফের একটু বাহুল্য আছে, দাড়ি কামান।

শ্যামাচরণ একটী ছোট রকম চাকরী করেন। বাড়ীতে আর কেহ নাই, এক স্ত্রী আর এক বিধবা মাসী। মাসী রাঁধেন, গৃহকর্ম্মের জন্য একজন দাসী।

গল্প করিতে করিতে মুক্তকেশীর অতটা স্মরণ ছিল না যে, এত বেলা গিয়াছে। এমন গল্প কিছু রোজ হয় না। চারুবালার শরীরে ও মনে যে আনন্দ, তাহার একটা তরঙ্গ যেন মুক্তর অঙ্গেও লাগিয়াছিল। চারুকে ডাকাডাকি না করিলে হয়ত মুক্ত আরও খানিক বসিয়া থাকিত। শ্যামাচরণও আজ একটু সকাল সকাল আসিয়াছিলেন।

কর্ত্তার সে তোলোপানা মুখখানা দেখিয়াই মুক্ত বুঝিতে পারিল যে, লক্ষণ ভাল নয়। এখন উপায়? নিজের মুখখানা ত আগে লুকান উচিত। থতমত খাইয়া মুক্ত ঘোমটা টানিয়া দিল। ঘোমটার ভিতরে সঙ্কুচিত হইয়া, পাশ কাটাইয়া অন্য দিকে যাইবার উপক্রম করিল।

কিন্তু মুক্তর ঠোঁটে সে টিপি টিপি হাসি আর তার চোকে সে ঢুলু ঢুলু ভাব কর্ত্তা দেখিয়াছিলেন। এমন মুখের ভাব কেন? শ্যামাচরণ রাগিয়া কহিলেন, "আমায় দেখে ঘোমটা দেবে না কেন? আর আমি চোকের আড়াল হ'লেই খেমটা নাচ হয়!"

ঘোমটা দিবার বিশেষ কোন কারণ ছিল না। মাসী ছিলেন রান্না ঘরে ও দাসী ছিলেন ময়রার দোকানে। শ্যামাচরণের

গলার আওয়াজ শুনিয়া মাসী একবার উঁকি মারিয়া দেখিলেন, তার পর দ্যাবা দেবীকে দেখিয়া আবার আগের মত পটল চিরিতে বসিলেন।

সম্ভাষণের ঘটাখানা দেখিয়া মুক্ত ফিরিয়া স্বামীর নিকট আসিল। শ্যামাচরণ সিঁড়ীর কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন। মুক্তর ঘোমটা একটু সরিয়া গিয়াছিল। একবার স্বামীর দিকে চাহিয়া তাঁহার চাপ্‌কানের হাতা ধরিয়া একটু টানিল। কহিল, "যা বল্‌বার হয় উপরে এসে বল। উঠানে দাঁড়িয়ে ঢলাঢলি কি না কোর্‌লেই নয়?"

মুক্তকেশী উপরে উঠিয়া গেল। কথা যাহা কহিয়াছিল, তাহা চুপি চুপি মুখ বাড়াইয়া। কথাগুলি ও সেই সঙ্গের ঈষদুষ্ণ নিশ্বাস শ্যামাচরণের জাঁকাল গোঁফ জোড়ায় জড়াইয়া গেল।

শ্যামাচরণও মনে করিলেন, উপরে যাওয়াই ভাল। মন্দ কথা যাহাকে বলা যায়, তাহার সম্মুখে না বলিলে তৃপ্তি হয় না। শ্যামাচরণও উপরে গেলেন। মুক্তকেশী যে তাঁহার কাপড় টানিয়া গিয়াছিল, আসলটা সেই টানেই শ্যামাচরণ উপরে উঠিলেন।

উপরে ছোট ছোট দুটি কুঠরী। একটীতে কর্ত্তা-গৃহিণী শয়ন করেন, আর একটীতে জিনিস-পত্র। কর্ত্তার বসা ও খাওয়া-দাওয়াও সেই ঘরে হয়। বাহির বাটীতে লোক-জন বসিবার একটী ঘর। মাসী নীচেই থাকিতেন, উপরে বড় একটা আসিতেন না।

উপরে বসিবার ঘরে একটী তক্তপোষ ছিল। তাহার পাশে মুক্তকেশী ঘোমটা খুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল। শ্যামাচরণ আসিয়া বসিলেন না, উদ্ধত স্বরে কহিলেন, "কোথায় যাওয়া হ'য়েছিল?"

মুক্তর ঠোঁটের কোণে সেই হাসি টুকু লাগিয়াছিল। কহিল, "কোথায় যাই, তুমি কি জান না?"

"রোজ রোজ পাড়া না বেড়ালে বুঝি চলে না? আর আমি যখন বাড়ী থাকি না, সেই সময় বুঝি বেড়ান মনে পড়ে?"

'এর নাম কি পাড়া বেড়াতে যাওয়া? চারুদের বাড়ী যাই, আর ত কোথাও যাই নে।"

"হ্যাঁঃ, চারু ত একটা ছুতা! ওদের বাড়ী রূপ দেখ্‌বার অনেকে আছে কি না, তাই রূপ দেখাতে যাওয়া হয়।"

এসব ঝগড়া ঝাঁটির কথা। মুক্ত ঝগড়া করিতে না জানে এমন নয়, কিন্তু এখন ঝগড়া করিবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কহিল, "তোমার কেবল ঐ কথা! কেন, রূপ দেখান ছাড়া কি আর কাজ নেই? আর রূপই বা কি ছাই?"

ছাই আর পাঁশ হউক, রূপই মুক্তর বিপদ, আর রূপই তাহার বল। সেই রূপ দেখিয়া ভালমানুষ শ্যামাচরণ সন্দিগ্ধ হইতেন, আবার সেই রূপের মোহেই সব ভুলিয়া যাইতেন। সন্দেহ-কারণ মুক্ত একটু চপল স্বভাব, সৌন্দর্য্যাভিমানিনী। তাহার রূপ দেখিয়া অপরের লুব্ধ হওয়া বিচিত্র নয়। শ্যামাচরণের সে ছোট বাড়ী খানিতে অতটা রূপ মানাইত না। তাই শ্যামাচরণের ভয় হইত। আরও মুক্তকেশীর সন্তান হয় নাই বলিয়া। ক্রমেই তাহার রূপ বাড়িতেছিল, সর্ব্ব শরীরে সৌন্দর্য্য যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। যদি জগতে সে রূপ দেখিবার আর কেহ না থাকিত, তবেই শ্যামাচরণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু এখন কেবল ভয়, কেবল সংশয়, কেবল মনের ব্যথা। এত যন্ত্রণার যে কারণ, সমুদায় সুখেরও সেই কারণ।

মুক্ত ত মুখে বলিল, "রূপ ছাই," আর

কাজে! আ ছি! ছি! রূপসীর এত খলকপটতাও আসে! মুক্ত কপট রাগের ভাণ করিয়া মুখখানি এমনি করিল যে, রূপের দুই একটী উপকরণ যাহা এদিক ওদিক ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সব আসিয়া তাহার মুখে একত্র হইল। সে মুখ দেখিয়া শ্যামাচরণের ইচ্ছা হইতে লাগিল,—কিন্তু তখনও তাঁহার রাগ পড়ে নাই। কহিলেন, "চিরকাল ঘোল-বছুরীর মত থাকলে কি চিরকাল স্বভাবও সেই রকম থাকতে হয়?"

তখন মুক্তকেশীর মূর্ত্তি ফিরিল, কহিল, "দেখ, তোমার কথা শুনে আমার এমনি ঘেন্না হয়, নিশ্চয় কোন দিন গলায় দড়ী দিয়ে মরব।" মুক্ত কাঁদিল না, কিন্তু তাহার চোকের পাতায় দু ফোঁটা জল মুক্তার মত টল টল করিতে লাগিল।

শ্যামাচরণ অমনি নরম হইয়া গেলেন,— "আমি আর তোমায় কি এমন মন্দ কথা ব'লেছি! পাছে লোকে নিন্দা করে, তাই একটু সাবধান কোরে দিই।" বলিয়া তক্তপোষে ধুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

এইটা যুদ্ধবিরতির লক্ষণ। বসিয়া আর ঝগড়া ভাল হয় না। মুক্ত আর একটু স্বামীর কাছে আসিল, আঁচলের একটু খানি কোণ তুলিয়া চোকের কোলে দিল, বলিল, "নিন্দা করবার মধ্যে তুমি! কেউ কখন একটা কথাও বলে না, তুমি বিনা দোষে মিছামিছি যা বলবার নয় তাই বল। তুমিই যদি এমন কোরে বলবে, তার চেয়ে আমার মরণ ভাল।"

হাজার হউক, মুক্তকেশী দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, তাহাতে আবার সুন্দরী; শ্যামাচরণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া মুক্তর হাত ধরিয়া বলিলেন, "আমি রাগের মাথায় কি বলি, তুমি কিছু মনে কোরো না। এবার যা হবার হয়েছে, আর কখন মিছামিছি তোমায় কিছু বলব না। তুমি চক্ষের জল ফেল না, লক্ষীটি।"

মুক্ত চক্ষের জল ফেলিল না, বলিল, "তা তুমি যদি বারণ কর, তা হ'লে না হয় আর চারুদের বাড়ী যাব না।"

তাহাও বলিতে শ্যামাচরণের সাহস হইল না। এত কালের আলাপ কি ধাঁ করিয়া বন্ধ করা যায়? বলিলেন, "না, না, তা কেন? যাওয়া আসা মাঝে মাঝে করবে, তার আর কি!"

কাপড় ছাড়িয়া, জলখাবার খাইয়া, পান চিবাইতে চিবাইতে শান্তমূর্ত্তি শ্যামাচরণ যখন আবার তক্তপোষে বসিলেন, তখন মুক্তকেশী আসিয়া তাঁহার পাশে বসিল। কহিল, "ওদের বাড়ী কেন আজ দেরি হ'ল জান?"

"কেন?"

"আজ চারুর বর আসবে, সেই কথাবার্ত্তা হচ্ছিল।"

"তা এতক্ষণ বলতে নেই বুঝি! তাই বল! চারুর নবীন বরটী, ভাব বসাতে ইচ্ছে হবে না কেন, বল! তাতে আবার তোমার কপালে এক বুড়ো দোজবরে মিন্সে জুটেছে।"

"আ মরি! এত রঙ্গও জান! তোমার কাছে একটা কথা ব'লে পার পাবার যো নেই" বলিয়া মুক্ত স্বামীকে একটা ঠেলা দিল। ঠেলা দিতে গিয়া—সাধ করিয়াই হউক আর হঠাৎই হউক—নিজে শ্যামাচরণের কোলে পড়িয়া গেল। তখন যাহা হইবার তাহাই হইল। শ্যামাচরণ স্ত্রীর মুখচুম্বন করিলেন। তাঁহার বড় বড় গোঁফে মুক্তর গাল ও গলা শুড়্‌শুড়্ করিতে লাগিল। সে হাসিয়া উঠিয়া বসিল। কহিল, "তোমার যে গোঁপ!"

"কেটে ফেলব না কি?"

"উনি সব কাজ প্রায় আমার কথায় করেন কিনা!"

আসলটা মুক্তর এমন ইচ্ছা ছিল না যে, শ্যামাচরণ গোঁফ কাটিয়া ফেলেন। শ্যামাচরণও তাহা জানিতেন। তামাসা করিয়া মুক্ত কতবার স্বামীকে বলিত, "দেখ, একদিন তুমি ঘুমিয়ে থাকবে, আর আমি তোমার গোঁপ কাঁচি দিয়ে কেটে দেব।"

শ্যামাচরণও হাসিয়া বলিতেন, "তা হ'লে ঘুম থেকে উঠে আমি তোমার নাক কেটে দেব।"

কিন্তু শ্যামাচরণের গোঁফ এবং মুক্তকেশীর নাক দুই এ পর্যান্ত বজায় ছিল।

শ্যামাচরণের, সে রাগ কোথায় গেল? রমণী স্পর্শ মাত্র যে বল হরণ করে, সেটা কি মিথ্যা কথা? এমন যে শক্ত মাটী শ্যামাচরণ, তিনি এক ফোঁটা চক্ষের জলে আর একটু অঙ্গস্পর্শে গলিয়া কাদা হইয়া গেলেন। তখন সে কাদায় যাহা ইচ্ছা তাহাই গড়িতে পারা যায়। ইচ্ছা হয় শিব গড়, ইচ্ছা হয় বানর গড়। সুন্দরীরা পূজা করিবার সময় শিবপূজাই বেশী করেন, কিন্তু গড়িবার সময় বানরের সংখ্যাই অধিক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

শিবাজীকর্ত্তৃক জাওলী-বিজয়।

(১৬৫৫ খৃঃ অঃ)

সাতারা বা সেতারা প্রদেশ (জেলা) মহারাষ্ট্র রাজধানী পুনার ১৩।১৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই প্রদেশের পরিমাণ (এজেন্সী সহ) ৫৮৩২ বর্গ মাইল। ইহা ১১ তালুকে বিভক্ত। "জাওলী" তাহাদের অন্যতম।

১। জাওলী।

জাওলী সাতারার পশ্চিমোত্তর অংশে সহ্যাদ্রির সানুদেশে অবস্থিত। এই প্রদেশ অতীব বন্ধুর, দুর্গম পর্ব্বতমালা পরিবেষ্টিত ও অরণ্য-সমাকীর্ণ। জাওলীর পরিমাণ প্রায় ৩৫০ বর্গ মাইল। সমস্ত বিভাগের নামানুসারে ইহার রাজধানীর নামও 'জাওলী'। জাওলী নগরী বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণরের গ্রীষ্মনিবাস,—মহাবলেশ্বরের ৩।৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই প্রদেশ পশ্চিম-ঘাট পর্ব্বত-শ্রেণীর সানুদেশে অবস্থিত ও পূর্ব্বে কঙ্কণের অন্তর্গত ছিল বলিয়া, দেশীয় ভাষায় ইহা সচরাচর "কঙ্কণ-ঘাট মাথা" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মাওলী ও তৎসদৃশ অপরাপর কয়েকটী বলিষ্ঠ ও শ্রম-সহিষ্ণু পার্ব্বত্যজাতি এই প্রদেশের অধিবাসী।

দাক্ষিণাত্যে যবনাধিকারের পূর্ব্ব হইতে জাওলী প্রদেশ "শিরকে" উপাধিধারী কোনও এক মারাঠা (মারহাট্টা) পরিবারের শাসনাধীনে ছিল। খৃষ্টীয় ১৪শ ও ১৫শ শতাব্দীতে দক্ষিণাপথে মুসলমানগণের আধিপত্য বিস্তারের সহিত মহারাষ্ট্রদেশের অধিকাংশ মুসলমানগণের করতলগত হইলেও, এই দুর্গমপ্রদেশ কিছুতেই তাঁহাদের অধিকারভুক্ত হয় নাই। কিন্তু ইহার অল্পকাল পরেই ইহা "শিরকে" পরিবারের হস্ত হইতে "মোরে" নামক অপর এক মারাঠা পরিবারের হস্তে পতিত হইয়াছিল।

২। চন্দ্ররাও মোরে।

যে বীর-পুরুষের চেষ্টায় মোরে বংশবিশেষ খ্যাতি লাভ করে, তিনি প্রথমতঃ বিজয়পুরের সুলতানের অধীনে একজন সামান্য পত্তি-নায়ক * ছিলেন। পরে তাঁহার কার্য্য-দক্ষতা ও সাহসিকতায় প্রীত হইয়া সুলতান্ ইয়ুসুফ্ আদিল সাহ (খৃঃ ১৪৮৯ অঃ ১৫১৫ অঃ) ক্রমশঃ তাঁহার পদোন্নতি করিয়া অবশেষে তাঁহাকে দ্বাদশ সহস্র হিন্দু-সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান

* অতি অল্পসংখ্যক সৈন্যের অধিনায়ককে পত্তি-নায়ক বলে।

পূর্ব্বক দুর্গম জাওলী প্রদেশ জয়-করণার্থ প্রেরণ করেন। "মোরে" বিশেষ পৌরুষ সহকারে যুদ্ধ করিয়া, শিরকে পরিবারকে সবান্ধবে পরাজিত করত জাওলী অধিকার করেন। তাঁহার এই কার্য্যে পরিতুষ্ট হইয়া সুলতান তাঁহাকে "রাজা চন্দ্র রাও" এই সম্মানসূচক উপাধি এবং সেই সঙ্গে জাওলী প্রদেশ জাইগীর স্বরূপ প্রদান করেন। রাজা চন্দ্ররাও মোরের সুশাসনে জাওলীর প্রজাগণ অল্পদিনের মধ্যেই সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপে এই প্রদেশ এক হিন্দু-শাসকের হস্ত হইতে অপর এক হিন্দু-শাসকের হস্তগত হয়।

রাজা চন্দ্ররাওয়ের বংশধরগণ বিজয়পুরের সুলতানকে অধীনতার চিহ্নস্বরূপ স্বল্পমাত্র কর প্রদান করিতেন এবং আবশ্যক হইলে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ব্যাপারেও সুলতানকে বিশেষরূপে সহায়তা করিতেন। এইরূপে মোরে-বংশীয় সামন্ত নরপতিগণ সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত নির্ব্বিরোধে এই প্রদেশ শাসন করেন। জাওলীর শেষ অধিপতি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের উপাধি অনুসারে "রাজা চন্দ্র রাও" নামেই ইতিহাসে পরিচিত। ইহাঁরই শাসনকালে ১৬৫৫ খৃঃ অঃ এই প্রদেশ মহারাষ্ট্র রাজ্য-সংস্থাপক শিবাজীর অধিকারভুক্ত হয়। যে প্রকারে শিবাজী জাওলী অধিকার করেন, তাহা বর্ণনা করাই আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

৩। জাওলী-বিজয়ের কারণ।

স্বদেশ-ভক্ত মহাত্মা শিবাজী জন্মভূমিকে মুসলমানগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে বিজয়পুরের সুলতানের অধীনস্থ প্রদেশ সমূহ ক্রমে ক্রমে অধিকার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সুলতান ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার পিতা সাহাজীকে (১৬৪৯ খৃঃ) কারারুদ্ধ করেন। পিতার কারাবরোধের সংবাদ পাইয়া শিবাজী দিল্লীশ্বর শাহজানকে পত্র লিখিয়া সাহাজীকে কারামুক্ত করেন। দিল্লীর দরবারে শিবাজীর এতাদৃশ প্রতিপত্তি দর্শনে বিজয়পুরের সুলতান মনে মনে কিয়ৎ পরিমাণে শঙ্কিত হইয়া তদবধি আর প্রকাশ্যভাবে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতেন না। এদিকে সুলতান, বহুদিন হইতে দিল্লীশ্বরের প্রাপ্য কর প্রদান করিতে অমনোযোগিতা প্রদর্শন করায় মোগলগণের সহিত বিজয়পুর-পতির যুদ্ধ ঘটিবার উপক্রম হইতেছিল। শিবাজীর সহিত শত্রুতা থাকিলে যুদ্ধ কালে তিনি সুলতানের বিরুদ্ধে মোগলগণকে সহায়তা করিতে কখনই বিমুখ হইবেন না, এইরূপ আশঙ্কাও বিজয়পুরাধিপতির মনে উদিত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত তিনি গোপনে শিবাজীকে দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে শিবাজীকে প্রায়ই (কুলাবা জেলার "মাহাড়" নামক কোনও একটী নগরে অবস্থান করিতে হইত। "মাহাড় নগর সহ্যাদ্রির পশ্চিম দিকে অবস্থিত। পুনা ও সাতারা হইতে মাহাড় নগরে যাইতে হইলে সহ্যাদ্রি অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। সুতরাং শিবাজীকে এই সময়ে সর্ব্বদাই ঘাট-পথে অর্থাৎ সহ্যাদ্রির গিরি-সঙ্কট দিয়া গমনাগমন করিতে হইত। বিজয়পুরের সুলতান এই সংবাদ অবগত হইয়া বাজী শ্যামরাজ নামক তাঁহার জনৈক হিন্দু-কর্ম্মচারীকে শিবাজীকে ধৃত করিবার জন্য নিয়োজিত করিলেন। ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে বাজী শ্যামরাজ মহাবলেশ্বরের সন্নিহিত পারঘাট নামক গিরিপথের নিকট লুক্কায়িত থাকিয়া গমনাগমন কালে শিবাজীকে সহসা আক্রমণ করিয়া ধৃত করিবেন সংকল্প করিলেন জাওলী-পতি চন্দ্ররাও মোরেও সুলতানের সন্তোষার্থে বাজী শ্যামরাজকে এ কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু ধূর্ত্তপনায় শিবাজীকে অতিক্রম করিতে পারে, তাঁহা

সমসাময়িকগণের মধ্যে এরূপ কেহ ছিল না। চতুর-চূড়ামণি শিবাজী বিজয়পুরপতির এই ষড়্‌যন্ত্রের বিষয় আনুপূর্ব্বিক সমস্ত অবগত হইয়া, একদিন বহু সংখ্যক মাওলী-সৈন্যসহ সহসা বাজী শ্যামরাজকে পারঘাটের নিকটে আক্রমণ করতঃ সসৈন্যে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন।

শিবাজী ও রাজা চন্দ্ররাও মোরের মধ্যে পূর্ব্বে কোনওরূপ অসদ্ভাব ছিল না; বরং আত্মীয়তাই ছিল। তথাপি বিজয়পুরের সুলতানের প্রিয়সাধন জন্য চন্দ্ররাও বাজী শ্যামরাজকে শিবাজীর বিরুদ্ধে সৈন্য লইয়া নিজ রাজ্যের মধ্য দিয়া গমন করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন এবং সুলতানের অসদভিপ্রায় অবগত হইয়াও শিবাজীকে তাহা জ্ঞাপন করেন নাই। বরং তিনি বাজী শ্যামরাজকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সাহায্যও প্রদান করিয়াছিলেন। চন্দ্ররাওয়ের এইরূপ ব্যবহারে শিবাজী অতিশয় দুঃখিত হইলেন; এবং পুনার অতি নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য প্রদেশের এরূপ এক জন পরাক্রান্ত অধিপতির বন্ধুত্ব হইতে অকারণ বঞ্চিত হওয়ায় তিনি নিজের পক্ষে অতিশয় দুর্ভাগ্যের কথা ও অশুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করিলেন। বিশেষতঃ এই পার্ব্বত্য প্রদেশ দিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদাই যাতায়াত করিতে হইত বলিয়া তিনি রাজা চন্দ্ররাও মোরের সহিত যাহাতে সন্ধি স্থাপিত ও পূর্ব্ব বন্ধুত্ব দৃঢ়ীভূত হয়, তজ্জন্য যত্নবান্ হইলেন। তিনি চন্দ্ররাওকে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনার নিকট আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার প্রত্যাশা করি। আশা করি, আপনি আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতিকূলাচরণ করিবেন না।"

বলা বাহুল্য, রাজা চন্দ্ররাও শিবাজীর এই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। শিবাজী যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সহিত আত্মীয়ের ন্যায় ব্যবহার ও তাঁহার অভিপ্রায় মত কার্য্য করিতে গেলে বিজয়পুরের সুলতানের বিরুদ্ধাচরণ করিতে হয়। নানা কারণে চন্দ্ররাও তাহা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। শিবাজীর ন্যায় রাজ-বিরোধী ব্যক্তির পরামর্শ অনুযায়ী কার্য্য করা তাঁহার মত ব্যক্তির পক্ষে উপযুক্ত নয়, এইরূপ বিবেচনা করিয়াও তিনি শিবাজীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা চন্দ্ররাও-য়ের এইরূপ উপেক্ষা সত্ত্বেও শিবাজী তাঁহার হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত করিয়া যবন-রাজ্যের উচ্ছেদপূর্ব্বক তাঁহাকে জন্মভূমির উদ্ধারসাধনে যত্নবান্ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুরদৃষ্টক্রমে তিনি কিছুতেই রাজা চন্দ্ররাওকে স্বমতে আনয়ন করিতে কৃতকার্য্য হন নাই। এইরূপ মতভেদের জন্য রাজা চন্দ্ররায়ের প্রতি শিবাজীর অসন্তোষ বর্দ্ধিত হইল।

৪। জাওলী-বিজয়ের উদ্যোগ।

এখন কিপ্রকারে রাজা চন্দ্ররাও মোরেকে বশীভূত করিবেন, এই চিন্তাই শিবাজীর হৃদয়ে বলবতী হইল। কারণ শিবাজী বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে হস্তগত করিতে না পারিলে তাঁহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সাধনে—স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবে। সুতরাং রাজা চন্দ্ররাওকে বশীভূত করিবার জন্য তিনি বহু চিন্তার পর প্রথমতঃ সাম ও পরে দণ্ডনীতি অবলম্বন করিতে মনঃস্থ করিলেন। তিনি ভাবিলেন যে, রাজা চন্দ্ররাওয়ের ভ্রাতা হনুমন্তরাওয়ের কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে চন্দ্র-রাও আর তাঁহার প্রতিকূলতাচরণ করিতে পারিবেন না এবং সেই সঙ্গে তিনি ইহাও স্থির করিলেন যে, চন্দ্ররাও তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মত হইলে তিনি বল-প্রয়োগ দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিবেন। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া

তিনি প্রথমতঃ উপযুক্ত সৈন্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন।

এই সময়ে শিবাজীর সৈন্যসংখ্যা কত ছিল, তাহা অবগত হইবার কোনও উপায় নাই। চন্দ্ররাও মোরের সৈন্যসংখ্যা তখন পদাতি ও অশ্বারোহী সহ প্রায় ১০।১২ সহস্রের অধিক ছিল না। ইহাদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার উপযুক্ত সৈন্যাদি সংগৃহীত হইলে, শিবাজী বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য "রঘুনাথবল্লাল সবনীস" (সংক্ষেপে রঘুনাথ পন্ত) নামক জনৈক বাক্‌পটু ব্রাহ্মণ ও "সাম্ভাজী কাওজী" নামক শিবাজীর একজন মাহালদার বা অনুচরকে দূতরূপে চন্দ্ররাওয়ের নিকট প্রেরণ করিলেন।* ভবিষ্যতে জাওলী আক্রমণ করা প্রয়োজন হইলে, তাহার আভ্যন্তরীণ অবস্থা অবগত হওয়া আবশ্যক বিবেচনায় তিনি দূতগণকে চন্দ্ররাও মোরের ক্ষমতা ও জাওলীর ছিদ্রাদি অনুসন্ধান করিবার জন্যও উপদেশ প্রদান করিলেন। জাওলী প্রদেশ পর্ব্বত ও অরণ্য-সমাকীর্ণ এবং অতিশয় বিঘ্নসঙ্কুল বলিয়া দূতগণ ১২৫ জন † অস্ত্রধারী মাওলী-সৈনিক সমভিব্যাহারে জাওলী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এইরূপে ১২৫ জন মাওলী সহ রঘুনাথ পন্ত সবনীস ও সাম্ভাজী কাওজী যথাসময়ে জাওলীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা চন্দ্ররাও তাঁহাদিগকে যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি তাঁহাদিগের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, দূতগণ শিবাজীর প্রস্তাব তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলেন। জাওলীপতি এই প্রস্তাবের কিরূপ উত্তর দিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু তৎপরে রঘুনাথ চন্দ্ররাওয়ের সহিত ও সাম্ভাজী কাওজী তাঁহার ভ্রাতা হনুমন্ত রাওয়ের সহিত বাহ্যতঃ বিবাহ সংক্রান্ত নানাবিধ কথাবার্ত্তা স্থির করিতে লাগিলেন এবং গোপনে জাওলীর প্রকৃত অবস্থা জানিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। তথায় কয়েক দিবস অবস্থিতির পর রঘুনাথ দেখিলেন, জাওলীর অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়, প্রজাগণের মধ্যে একতা নাই, নরপতি চন্দ্ররাও মাদক দ্রব্যে আসক্ত ও এত অসাবধান যে, তাঁহাকে গোপনে হত্যা করাও কিছুই দুষ্কর নহে। জাওলীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তিনি চন্দ্ররাওকে হত্যা করিতে সঙ্কল্প করিলেন; সাম্ভাজী কাওজীও এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

এইরূপ পরামর্শ করিয়া তাঁহারা শিবাজীকে লিখিলেন, "মহারাজের পুণ্যবলে চন্দ্ররাও সংক্রান্ত কার্য্য করিতেছি। যে প্রকারে পারেন, মহারাজ এ সময়ে স্বয়ং আসিতে চেষ্টা করিবেন। (জাওলী আক্রমণের জন্য) আপনি সসৈন্যে আমাদের সঙ্কেত মত মহাবলেশ্বরে* আসিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন। এবং আমরা সঙ্কেত করিলেই "নিসনী ঘাট" নামক গিরিপথে জাওলীতে প্রবেশ করিবেন।" † রঘুনাথ পন্তও সাম্ভাজী কাওজী চন্দ্ররাও ও তদীয় ভ্রাতা হনুমন্তরাওকে হত্যা করিবেন বলিয়া গোপনে যে পরামর্শ করিয়াছিলেন, এই পত্রে তাহার কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

* রঘুনাথ পন্ত শিবাজীর পিতা শাহাজীর এক জন সেনা-লেখক (সবনীস) ছিলেন। শাহাজী তাঁহার যে সকল বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর প্রতি শিবাজীর তত্ত্বাবধানের ভার প্রদান করিয়াছিলেন, রঘুনাথ তাঁহাদের অন্যতম। সাম্ভাজী কাওজী ক্ষত্রিয় ছিলেন। শারীরিক বলের জন্য তাঁহার বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল।

† গ্রাণ্টডফ্ সাহেবের মতে, পঁচিশ জন মাত্র মাওলী সঙ্গে লইয়া তাঁহারা গমন করিয়াছিলেন।

* মহাবলেশ্বর দাক্ষিণাত্যের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র।

† মল্হার রামরাও চিটনীস প্রণীত "শিবছত্রপতির সপ্ত প্রকরণাত্মক চরিত্র"—দ্বিতীয় প্রকরণ।

এ সময় শিবাজী রাজগড়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া তিনি বুঝিলেন যে, তিনি রাজা চন্দ্ররাওকে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা নিষ্ফল হইয়াছে। এখন জাওলী আক্রমণ ভিন্ন চন্দ্ররাওকে বশীভূত করিবার আর অন্য উপায় নাই। তিনি পূর্ব্বাবধিই এজন্য প্রস্তুত ছিলেন; সুতরাং রঘুনাথ পন্তের পত্র প্রাপ্তিমাত্র তিনি সসৈন্যে মহাবলেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এবং মহাবলেশ্বরে উপনীত হইয়াই রঘুনাথ পন্ত সবনীসকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "তোমাদের লিখন অনুসারে আমরা রাজগড় হইতে পুরন্দর দুর্গ হইয়া মহাবলেশ্বরে আসিয়া দেবদর্শনাদি কার্য্য সমাধা করিলাম।" *

রাজগড় হইতে জাওলী প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণে। কিন্তু শিবাজী সরল পথে না আসিয়া সসৈন্যে রাজগড় হইতে প্রথমতঃ পুরন্দর দুর্গে গমন করিয়াছিলেন। রাজগড় হইতে পুরন্দর দুর্গ প্রায় ২৪ মাইল পূর্ব্বোত্তরে, ও পুরন্দর হইতে মহাবলেশ্বর প্রায় ৩৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। সুতরাং শিবাজীকে প্রায় ৫৯ মাইল পথ বেষ্টন করিয়া মহাবলেশ্বরে আসিতে হইয়াছিল। † রঘুনাথ পন্তের পরামর্শ অনুসারেই তিনি এই বক্র পথে মহাবলেশ্বরে আসিয়াছিলেন এবং তথায় সসৈন্যে রঘুনাথ পন্তের সঙ্কেতের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

সাধারণ পাঠকগণের অবগতির জন্য এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক যে, বিনা রক্তপাতে কার্য্যোদ্ধার করা শিবাজীর প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি এতদিন পর্য্যন্ত তোরণা, চাকণ, সিংহগড় ও পুরন্দর প্রভৃতি দুর্গ এবং চাকণ * ও নীরা-নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ † বিন্দুমাত্র রক্তপাত না করিয়া কৌশল পূর্ব্বক হস্তগত করিয়াছিলেন।

জাওলীও সেই প্রকারে, সম্পূর্ণ বিনা রক্তপাতে না হউক, স্বল্প রক্তপাতে অধিকার করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, জাওলীর ছিদ্র অবগত হইয়া জাওলীবাসিগণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সহসা জাওলী আক্রমণ করিলে উহা অপেক্ষাকৃত অনায়াসে ও অল্প রক্তপাতে অধিকৃত হইতে পারে। সেই জন্যই তিনি সসৈন্য মহাবলেশ্বরে আসিয়া সহসা জাওলী আক্রমণ করিবার জন্য রঘুনাথ পন্তের সঙ্কেতের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

৫। জাওলী-বিজয়।

এদিকে শিবাজীর সসৈন্যে মহাবলেশ্বরে আগমন সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র রঘুনাথ ও সাম্ভাজী তাঁহাদের পাপ অভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করিতে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহারা চন্দ্ররাও ও তাঁহার দুই ভ্রাতা সূর্য্যরাও ও হনুমন্ত রাওকে কোনও বিশেষ গোপনীয় পরামর্শ করিবার অছিলায় নির্জ্জন স্থানে লইয়া

* মল্লার রামরাও প্রণীত পূর্ব্বোক্ত জীবনী—২য় প্রকরণ।

† গ্রাণ্টডফ বলেন,—Troops were secretly sent up the Ghauts, whilest Shiwojee, pretending to be other wise engaged proceeded from Rajgurh to Poorundar. From the latter place he made a night march to Mohabaleswar, at the source of Kristna, where he joined his troops assembled in the neighbouring jungles. p. p. 125. ইহা অসম্ভব নহে। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়গণের লিখিত বিবরণের এরূপ কৌশলের কোনও উল্লেখ দেখা যায় না।

* চাকণ দুর্গ নীরানদীর ৪৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

† "All these acquisitions were made without stir or bloodshed."—p. p, 114 Grant Duff.

গেলেন; এবং তাঁহাদের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে, রঘুনাথ পন্ত চন্দ্ররাও ও সূর্য্যরাওকে এবং সান্তাজী কাওজী হনুমন্ত রাওকে সহসা সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাতে হত্যা করিলেন। * এইরূপ দুষ্কর কার্য্যসাধন করিয়া তাঁহারা দ্রুতপদে রাজপ্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাঁহাদের সহচর অস্ত্রধারী মাওলীগণসহ কাননাভিমুখে পলায়নপর হইলেন। চন্দ্ররাওয়ের রক্ষিবর্গ এই আকস্মিক বিপদের জন্য প্রস্তুত না থাকায়, কেহই তাঁহাদিগকে বাধা দিতে সমর্থ হইল না। যে অল্প সংখ্যক প্রহরী তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়াছিল, তাহারা মাওলীগণের সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে অচিরেই ধরাশায়ী হইল। এইরূপে তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে নিকটবর্ত্তী গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। অবিলম্বে শিবাজীকে জাওলী আক্রমণের জন্য সঙ্কেত করা হইল। তিনি সঙ্কেত মাত্র বিদ্যুদ্বেগে সৈন্যসহ নিসনীঘাট অতিক্রম করিয়া চারিদিক হইতে জাওলী আক্রমণ করিলেন।

চন্দ্ররাওয়ের হত্যাসংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়ায় নগর মধ্যে যে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা প্রশমিত হইতে-না-হইতেই শিবাজীর জাওলী আক্রমণ-বার্ত্তা সকলের চিত্তে মহাভীতির সঞ্চার করিয়া দিল। তথাপি চন্দ্ররাও মোরের পুত্র বাজীরাও কৃষ্ণ মোরে ও তাঁহার দেওয়ান হিম্মতরাও যথাসম্ভব সৈন্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রায় দুই প্রহর পর্য্যন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন। অবশেষে হিম্মতরাও যুদ্ধে নিহত ও বাজীরাও কৃষ্ণ সপরিবারে ধৃত হইয়া বন্দী হইলে, জাওলী নগরী, (১৫৭৭ শকাব্দের—১৬৫৫ খৃঃ অঃ পৌষমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে) সম্পূর্ণ রূপে অধিকৃত হইল। তৎপরে শিবাজী তদ্দেশবাসিগণকে অভয় প্রদান করিয়া তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে বিশেষ মনোযোগী হইলেন।

মহারাষ্ট্র দেশের বখরকারগণ (স্বদেশীয় ইতিহাস লেখকগণ) জাওলী বিজয়ের যেরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা বর্ণিত হইল। এতৎসম্বন্ধে গ্রাণ্ট ডফ সাহেবের মত ও শিবাজীর চরিত্রের সমালোচনা বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

* গ্রাণ্ট ডফ সাহেবের ইতিহাসে সূর্য্যরাওয়ের কোনও উল্লেখ নাই।

বার্দ্ধক্য।

(১)

বল হে প্রবীণ তব কিসে অহঙ্কার?
এখনো বিলাসপাশ, এখনো আশার পাশ,
ষড়রিপু যুবা সম প্রবল তোমার।
কাঞ্চনের অনুরাগ, মদগর্ব্ব মোহরাগ,
এখনো কুটিল আঁখি বেঁধে অঙ্গনার!
শিশু যুবা সনে কি প্রভেদ তব আর।

(২)

আছে মাত্র,—শক্তিহীন প্রভেদ কেবল।
বাড়িয়াছে দেষাদ্বেষ, দয়া মায়া অবশেষ,
বিজ্ঞতা তোমার মাত্র কথার কৌশল।
ক্ষীণ তনু, ক্ষীণ শ্বাস, তত অভিলাষ-গ্রাস,
বয়সের সনে শুধু বাড়িয়াছে ছল।
কুটিল হয়েছ, ছিলে কৈশোরে সরল।

(৩)

কহ কে অবোধ আছে তোমার সমান?
ভাব তুমি রবে ভবে, ভুলে গেছ যেতে হবে,
শিথিল ইন্দ্রিয় তবু যৌবনের ভাণ।
বুদ্ধিমান্ অভিমান, উপদেশ কর দান
জান না তোমার সম নাহিক অজ্ঞান।
নিত্য চিতানল জ্বলে দেখেছ শ্মশান!

(৪)

শিশু যদি করে কভু 'ক' বলিতে ভুল ;
কতই শাসন কথা, দাও তারে কত ব্যথা
আজীবন মূর্খতা, দেখ, ভুলেছ বাতুল
ভবিষ্যতে ভেবে সারা, অর্থ হেতু দিশাহারা
অর্থ বিনা বার্দ্ধক্যে কোথায় পাবে কূল !
বারেক কি ভাব হবে অতুলে প্রতুল ?

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

ইন্দ্রপ্রস্থ।

আমাদের পুরাণাদি পাঠ করিলে জানা যায়, দুইটী রাজবংশ, অতি পুরাকাল হইতে যবনাধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারত-সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইঁহাদের প্রথম সূর্য্যবংশ, দ্বিতীয় চন্দ্রবংশ। ইক্ষ্বাকু হইতে সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সরযূতটস্থ অযোধ্যা-নগরীতে রাজত্ব করেন, আর কুরু প্রভৃতি চন্দ্রবংশীয় ভূপালবর্গ হস্তিনাপুর ইন্দ্রপ্রস্থ আদি স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ইন্দ্রপ্রস্থের বিষয় কিছু বলাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ইন্দ্রপ্রস্থ, প্রসিদ্ধ মুসলমান সম্রাট আক্‌বর সাহের রাজধানী বর্ত্তমান দিল্লি অথবা সাজিহানাবাদের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে অনতিদূরে ভগ্ন, বিকৃত ও পরিবর্ত্তিত অবস্থায় বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। এই মহানগরী ইন্দ্রপ্রস্থের স্থাপয়িতা—যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা।

ভাগবতপুরাণ ও সংস্কৃত ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায়, কলিযুগের ৬৫৩ ছয়শত তিপ্পান্ন বংসর অতীত হইলে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। * বর্ত্তমান সময়ে কলিযুগের ৪৯৯৫ বৎসর গত হইতেছে, অতএব বর্ত্তমান সময় হইতে ৪৩৪২ চারি হাজার তিনশত বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু ভাগবতপুরাণ ও রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, যে সময় রাজা যুধিষ্ঠির পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন, তখন সপ্তর্ষি মণ্ডল মঘানক্ষত্রে অবস্থিত ছিলেন, অধুনা উক্ত মুনিগণ কৃত্তিকানক্ষত্রে অবস্থান করিতেছেন।

সপ্তর্ষিমণ্ডল এক এক নক্ষত্রে এক শত বৎসর অবস্থান করেন, সুতরাং যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল ২১০০ দুই হাজার এক শত বৎসর মাত্র হইয়া পড়ে। অতএব কল্যব্দ ও পুরাণ ইতিবৃত্তের বচনে সম্পূর্ণ বিরোধ উপস্থিত হয়। এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে, কল্যব্দ অর্থাৎ কলির গত পরিমাণ যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই সত্য অথবা পুরাণ ইতিহাসের বচনই সত্য ? কেহ কেহ এস্থলে সপ্তর্ষিমণ্ডলের নক্ষত্রচক্রে অবস্থিতির কাল বাড়াইতে চান, কিন্তু তাহা হইলে জ্যোতিষের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বৃহৎসংহিতার সহিত বিসংবাদ হয়। যেহেতু এক এক নক্ষত্রে সপ্তর্ষিমণ্ডলের এক এক শত বৎসর অবস্থিতির বিষয় উক্ত সংহিতায় সুস্পষ্টভাবে লিখিত হইয়াছে। পুরাণ ইতিহাসের বচনের ন্যায় উক্ত জ্যোতিষ-সংহিতার বচনটীও নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। † এখন পুরাণ ইতিহাসের

* শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥ ৫১
রাজতরঙ্গিণী ১ম তরঙ্গ।

আসন্ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্‌দ্বিকপঞ্চদ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্যস্য ॥ ৫৬
রাজতরঙ্গিণী ১ম তরঙ্গ।

† একৈকস্মিন্নৃক্ষে শতং শতং তে চরন্তি বর্ষাণাম্।
প্রাগুত্তরতশ্চৈতে সদোদয়ন্তে সসাধ্বীকাঃ ॥ ৪
বৃহৎসংহিতা, ১৩শ অধ্যায়

বচনের সহিত কল্যব্দের অনৈক্য না হয়, অথচ প্রত্যেক নক্ষত্রে সপ্তর্ষিমণ্ডলের শতবর্ষ-অবস্থিতি-জ্ঞাপক বৃহৎসংহিতার বচনটীও যাহাতে সঙ্গতার্থ হয়, এইরূপ মীমাংসাই আশংসনীয়।

বস্তুতঃ অভিনিবেশ সহকারে বিবেচনা করিলে এই তিনটীর কাহারও সহিত কাহারও প্রায় অনৈক্য ঘটে না। মনে করুন, সপ্তর্ষিমণ্ডল গতিশীল, তাঁহাদের গতির বিরাম নাই, তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে মঘানক্ষত্রের শেষ অংশে ছিলেন, অনন্তর মঘা হইতে রেবতী পর্য্যন্ত গিয়া পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অশ্বিনী হইতে রেবতী পর্য্যন্ত গেলেন, তারপর পুনর্ব্বার অশ্বিনী ভরণীতে যথানির্দ্দিষ্ট সময় অবস্থিতি করিয়া কৃত্তিকায় উপস্থিত হইয়াছেন; সুতরাং মঘা হইতে রেবতী পর্য্যন্ত ১৮ অষ্টাদশ নক্ষত্র, পুনরায় অশ্বিনী হইতে রেবতী ২৭ সপ্তবিংশতি নক্ষত্র, আর অশ্বিনী হইতে কৃত্তিকা তিন নক্ষত্র, সমুদয়ে ৪৮ অষ্টচত্বারিংশৎটী নক্ষত্রে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল হইতে বর্ত্তমান মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যকাল পর্য্যন্ত সপ্তর্ষিমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়াছেন, অতএব ইহা দ্বারা যুধিষ্ঠির হইতে ৪৮০০ চারি হাজার আট শত বৎসর পাওয়া যায়; কিন্তু ভাগবতপুরাণ ও রাজ-তরঙ্গিণীতে স্পষ্টই আছে, ৬৫৩ ছয় শত তিপ্পান্ন বৎসর কলির গত হইলে কুরু-পাণ্ডবেরা আবির্ভূত হন, তদনুসারে ৫৪৮ পাঁচ শত আট-চল্লিশ বৎসরের পার্থক্য হইতেছে। এখন ভাবা উচিত, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে সপ্তর্ষি-মণ্ডল মঘানক্ষত্রের সর্ব্বশেষ অংশে ছিলেন ও কৃত্তিকার সর্ব্বপ্রথম অংশে আছেন, অতএব ইহাতেও ২০০ দুই শত বৎসর কমিল, থাকিল ৩০০ তিন শত বৎসর। তারপর সপ্তর্ষিগণ চান্দ্রমাস অনুসারী ৩৬০ দিনে যে বৎসর, তাহার একশত বৎসর এক নক্ষত্রে থাকেন। আমরা যে কল্যব্দ গণনা করি, উহা ৩৬৫ তিন শত পঁয়ষট্টি দিন ২০ বিশ দণ্ডে যে সৌরমাসানুসারে বৎসর, তাহার নিয়মে, সুতরাং ইহাতেও ৬১ বৎসর ৩ মাস ২৭ দিন ২০ দণ্ড কমিল; অতএব এখন ২০০ দুই শত ৩৫ বৎসর ৮ মাস ২ দিন ৪০ দণ্ডের পার্থক্য থাকিল, এরূপ গুরুতর বিষয়ে ২।১ শত বৎসরের ইতরবিশেষে কিছু আসিয়া যায় না। ইহা দ্বারা সিদ্ধান্ত হইল, যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান সময় হইতে ৪০০০ চারি হাজার ২০০ দুই শত ৫২ বৎসর পূর্ব্বে ভারত-সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। চারি হাজার বৎসরের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ পতিত থাকা অসম্ভব নহে।

বর্ত্তমান দিল্লি সহর হইতে একটী রাজপথ ফোর্ট বামে রাখিয়া যমুনাতীর দিয়া দক্ষিণাভিমুখে গিয়াছে, পুনরায় কুতপমিনারের নিকট হইতে উক্ত রাজপথটী পশ্চিমভাগ দিয়া দিল্লি সহরে প্রবেশ করিয়াছে। এই রাজপথের উভয় পার্শ্বে হিন্দু ও মুসলমান রাজগণের অতীত-কীর্ত্তির স্মৃতি-চিহ্নসমূহ বিরাজমান।

এই প্রসিদ্ধ রাজপথটী কিঞ্চিদধিক ১১ মাইল ব্যাপী, ইহার উভয় পার্শ্বস্থ প্রধান প্রধান ভগ্নাবশেষগুলি দূরদেশস্থ দর্শকেরা প্রায় দেখিয়া থাকেন। কিন্তু দূরে যে সকল ভগ্ন অট্টালিকা, মঠ, মন্দ রহিয়াছে, পথের দুর্গমতা-প্রযুক্ত কেহই উহা দেখেন না। আমরা চারি জন বাঙ্গালী প্রত্যূষে যমুনাস্নান করিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিলাম এবং সহর হইতে এক মাইল অতিক্রম করিয়া একটী প্রাচীন অট্টালিকার নিকট উপস্থিত হইলাম। স্থানীয় লোকে ইহাকে পুরাতন কেল্লা বলে। কথিত আছে, যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত মহারাজ যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা যমুনাতটে পাঁচটী বাটী নির্ম্মাণ করেন। প্রথম পাণিপ্রস্থ, দ্বিতীয় শোণপ্রস্থ, তৃতীয় ইন্দ্রপ্রস্থ, চতুর্থ তিলপ্রস্থ, পঞ্চম ভাগপ্রস্থ।

ইহার দুইটী কালপ্রভাবে যমুনাগর্ভে বিলীন হইয়াছিল, অবশিষ্ট তিনটীর নাম পরিবর্ত্তন ও সংস্কার সাধন করিয়া বাদসাহেরা স্বকীয় বিলাস-ভবনে পরিণত করিয়াছিলেন। আমরা যেটীর নিকট উপস্থিত, ইহা সেই পাণিপ্রস্থ অথবা যুধিষ্ঠিরের রাজপ্রাসাদ ছিল। পরে পাঠান ফেরোজ সা ইহাকে নিজ বাসভবনে পরিণত করেন। সুতরাং লোকে ইহাকে ফেরোজসা কোটলাও বলিয়া থাকে। ইহার গঠন-প্রণালী অতি পুরাতন, মুসলমান অট্টালিকার সহিত অণু-মাত্রও সৌসাদৃশ্য নাই। অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরে খিলানগুলি বিরচিত। অট্টালিকাটী দ্বিতল, উঠিবার সিঁড়ি আছে। উপরিভাগে অনুমান ৪০। ৫০ হস্ত পরিমাণে একটী লৌহ-স্তম্ভ প্রোথিত আছে। স্তম্ভের ৫। ৭ হাত ঊর্দ্ধে দেবনাগরাক্ষরে কি সকল লেখা আছে, কতকটা দৃষ্টিপথের অতীত বলিয়া অতি পুরাকালের অক্ষরগুলি পাঠ করিতে পারা গেল না। এই স্তম্ভটী পূর্ব্বে এখানে ছিল না, ইংরাজেরা কোথা হইতে আনিয়া প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছেন।

অনন্তর কিছু দূর শকট সাহায্যে গমন করিয়া আমরা আর একটী স্থানে অবতরণ করিলাম। স্থানীয় লোকে ইহাকে ইন্দ্রপথ বলে। ইহাই প্রকৃত ইন্দ্রপ্রস্থ।

বহুদূর ব্যাপিয়া একটী উচ্চ প্রাচীর। তাহার মধ্যস্থানে একটী প্রাসাদ, উচ্চশীর্ষে প্রাচীন হিন্দু-শিল্পীদিগের রচনা-প্রণালীর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অট্টালিকাটী সম্পূর্ণ হিন্দু-রীতিতে নির্ম্মিত। ভিত্তি, চূড়া প্রভৃতি সমুদয়ই হিন্দু-রুচির অনুরূপ। আমরা সোপান আরোহণ করিয়া অট্টালিকার উপরিভাগে উত্থিত হইলাম। পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিলে যমুনা-তরঙ্গিণীকে স্রোতস্বতী রজত-রেখার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এই অট্টালিকার বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য আমরা কিয়ৎকাল সেখানে প্রতীক্ষা করিলাম। ইহার চতুর্দ্দিকে কতকগুলি নিম্ন হিন্দু ও মুসলমানের বাস। দুই তিনটী বালক আমাদের নিকট আসিল, জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, এই স্থানের নাম ইন্দ্রপথ, কিন্তু অট্টালিকাটীর নাম বলিল সেরমণ্ডল। তারপর এক এক করিয়া অনেক গুলি স্ত্রী ও পুরুষকে ইহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম, সকলেই প্রায় এক উত্তর দিল। যাহারা এই স্থানের নাম ইন্দ্রপথ বলিতেছে, তাহারা হিন্দু ও মুসলমানের পুরাবৃত্তের কোনই ধার ধারে না, কেবল ঐ স্থানে বাস করে, তজ্জন্য স্থানের নাম ইন্দ্রপথ বলিয়া জানে। অবশেষে একটী কিছু বয়োধিক হিন্দু-বালকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে বলিল, "আগারি এহি মকান পাণ্ডবরাজকা থা, ফের বাদ্‌সা সের সা ওসকো আপন মকান কর্‌লিয়া"—বস্তুতঃ অট্টালিকার কতিপয় স্থানে পারসী অক্ষর উৎকীর্ণ দেখিয়া তাহার কথায় দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিল। বস্তুতঃ পাণ্ডবগণের সেই বহুকালের পরিত্যক্ত প্রাসাদমালার সংস্কার সাধন করিয়া বাদসাহ-গণ উহা আপন আপন নামে প্রসিদ্ধ করিয়া-ছিলেন এবং উহার গাত্রে পারস্য বর্ণমালায় মুসলমান ধর্ম্মপুস্তক কোরাণের উপদেশ সক-লের সহিত নিজ নিজ ইতিবৃত্ত অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন।

অনন্তর কয়েক পদ অতিক্রম করিয়াই আমরা হুমায়ুনটুম্বে উপস্থিত হইলাম। এটী খাঁটী মুসলমান-কীর্ত্তি। হুমায়ুনকে বোধ হয় সকলেই জানেন। ইনি সেই প্রসিদ্ধ আক-বর বাদসাহের পিতা। এই টুম্ব্‌ তাঁহারই সমাধি-মন্দির। দিল্লীশ্বর আকবর ভারতের সার্ব্বভৌমপদে আরূঢ় হইয়া কিরূপ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাঁহার পিতার সমাধি-মন্দির অবলোকন করিয়া উহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। টুম্ব অথবা

সমাধি-মন্দিরটী উচ্চ এবং সুবিস্তৃত বেদীর উপরিভাগে মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার চূড়া মুসলমান-রুচির অনুরূপ গম্বুজের আকৃতি। ভিত্তিগাত্র বিবিধ লতাপুষ্প ও অন্যান্য কারুকার্য্যে মণ্ডিত। ইহাতে হুমায়ুন বাদসাহ ও তদীয় বেগম এবং কতিপয় আত্মীয়ের সমাধি হইয়াছিল। প্রত্যেক সমাধি-চিহ্নের উপরিভাগে কোরাণের উপদেশ ও তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অঙ্কিত আছে। শুনা যায়, এই টুম-নির্ম্মাণে অসংখ্য অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল।

তার পর আমাদের অবলম্বিত রাজপথটী প্রান্তরের মধ্য দিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিল। কিয়দ্দূর গিয়াই আমরা একটী স্থানে অবতরণ করিলাম। স্থানটী স্নিগ্ধ-গম্ভীর, নিকটে মনুষ্যের বসতি নাই। চতুর্দ্দিকে অনুচ্চ প্রাচীর। উহার মধ্যে বৃক্ষরাজি ও প্রস্তরনির্ম্মিত হর্ম্ম্যমালা, পুষ্করিণী সমাধি প্রভৃতি বিদ্যমান। ইহাকে নিজামুদ্দিন বলে। ইহা মুসলমানদের একটী তীর্থ অথবা ধর্ম্মচর্চ্চার স্থান।

পুষ্করিণীটী, তত বড় নহে, তীর অতি উচ্চ, জল গাঢ় সবুজবর্ণ। বালকেরা সেই উচ্চতম তীর হইতে লম্ফ দিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিল ও কিঞ্চিৎ পুরস্কার আদায় করিল। অত্রত্য অট্টালিকাগুলি বিবিধ প্রকারের প্রস্তর নির্ম্মিত, বারাণ্ডাগুলি মর্ম্মর প্রস্তরে গ্রথিত। এখানে দুইটী পাঠশালা আছে। মৌলবী ও মুন্সী পর্য্যায়ক্রমে আরবী ও পারশী ভাষা এবং কোরাণের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিতেছেন। ইহার নিকটেই সুন্দর ছোট একটী সমাধি-বেদী। উহা শুভ্র প্রস্তরে গ্রথিত। এই বেদীর উপরিভাগে, সাজিহান বাদসাহের রূপবতী কন্যা জাহানরা বেগমের সমাধি হইয়াছিল। শুনা যায়, এই বাদশাহজাদী অতি সৌখীন ও পিতার অতিশয় প্রিয়পাত্রী ছিলেন। রাজনীতি পরিচালনে ইঁহার পূর্ণমাত্রায় অধিকার ছিল, আমরণ ইনি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন নাই। একখণ্ড দীর্ঘ শ্বেত প্রস্তরে ইঁহার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত পারসী ভাষায় লিখিত আছে। এখানে আকবর সাহের ভগিনী কুমালিনের ও তাঁহার ভ্রাতা মুজামিলেরও সমাধি হইয়াছিল। অন্য একটী গৃহের মধ্যে কোন বুজরুক ফকিরের অতি জাঁকজমকশালী এক কবর দেখিলাম। একখানি বহুমূল্য বস্ত্রে কবরটী আচ্ছাদিত। আরও কতিপয় প্রসিদ্ধ মুসলমান-ধার্ম্মিকের সমাধি চিহ্ন আছে। বোগদাদ প্রভৃতি স্থানের মহম্মদীয় তীর্থযাত্রীরা পূর্ব্বোক্ত গৃহের বারাণ্ডায় শয়ন করিয়া আছে। পূর্ব্ব দৃষ্টস্থান সমূহের ন্যায় এখানেও প্রদর্শক মুসলমানেরা কিছু পারিশ্রমিক লইল।

পুনরায় আমরা শকটে আরোহণ করিলাম, দ্রুতগামী শকটে কিছু ক্ষণের মধ্যে আমাদিগকে কুতপে উপস্থিত করিল। এই স্থানে কুতপমিনার অবস্থিত, সুতরাং এই স্থানকে সাধারণ-লোকে কুতপ বলিয়া থাকে। আমরা যখন কুতপে উপনীত হইলাম, তখন দিবা দ্বিপ্রহর। দিবাকরের প্রখর করে সকলেই ব্যাকুল। আমরাও পরিশ্রান্ত; বিশেষ আমাদের সঙ্গী একটী বাবু পিপাসায় প্রায় রুদ্ধকণ্ঠ; সুতরাং আমরা অগ্রে তত্রত্য বাজারে আম্র, দধি, মিষ্টান্নাদি ক্রয় করিয়া জলযোগ করত বিশ্রামান্তে আসিয়া কুতপমিনার প্রভৃতি সন্দর্শন করিলাম।

কুতপমিনার, পৃথ্বীরাজের ভগিনীর গঙ্গাদর্শনার্থ নির্ম্মিত মঞ্চ। এরূপ উচ্চ মঠ ভারতবর্ষে আর আছে কিনা সন্দেহ। ইহার উচ্চতা ১৫২ একশত বায়ান্ন হস্ত পরিমিত। গঠনপ্রণালী সুন্দর। অভ্যন্তর দিয়া উপরিভাগে আরোহণ করিবার জন্য ৩৩৬ তিনশত ছত্রিশটী সোপান আছে। উক্ত সিঁড়িগুলি পাকে পাকে

ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিয়াছে। মধ্যে মধ্যে আরোহিগণের বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য ফুকোর বা ছিদ্র আছে। আমরা কেহ সর্ব্বোপরি কেহ কেহ তিনভাগ, কেহ অর্দ্ধাংশ আরোহণ করিয়া ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহে অবতরণ করিলাম। এই কুতপ সন্দর্শনার্থ বড়ই কৌতূহল ছিল, আজ তাহা চরিতার্থ হইল। ইহার নির্ম্মাতা কে? এতদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। স্থানীয় লোকে বলিল, পৃথ্বীরাজই ইহার নির্ম্মাণ করেন, কিছুদিন পরে কুতবউদ্দিন বাদসাহ-পদে অধিরোহণ করিয়া উহার চূড়া ভিন্নভাবে গঠন করেন ও নিজের নামানুসারে উহার কুতপমিনার এই নামকরণ করেন। উহার উত্তরভাগে আর একটী মঞ্চ অর্দ্ধ-গঠিত অবস্থায় অবস্থিত আছে, উহাকে অসমাপ্ত মিনার বলে।

অনন্তর আমরা ভারতবর্ষের শেষ-হিন্দুসম্রাট্ মহারাজ পৃথ্বীরাজের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ ও যজ্ঞশালা সন্দর্শন করিলাম। রাজপুতানায় যে সকল সামন্ত-নৃপতি আছেন, ইহাঁদের কেহ সূর্য্যবংশ, কেহ চন্দ্রবংশ, কেহ যদুবংশ, কেহ বা অগ্নিবংশ বলিয়া পরিচিত। এই পৃথ্বীরাজ অগ্নিকুল-সম্ভূত ছিলেন। কথিত আছে, অর্ব্বুদপর্ব্বতে (আবুপাহাড়; এখানে এখন রাজপুতানার রেসিডেণ্ট বাস করেন) ব্রাহ্মণদের যজ্ঞাগ্নি হইতে এই মহাপরাক্রান্ত ক্ষত্রবংশের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই পৃথ্বীরাজের ভগিনীকেই মেওয়ার-রাজ্যের অধীশ্বর সূর্যবংশীয় বাপ্পারাওয়ের বংশধর মহারাজ সংগ্রামসিংহ বিবাহ করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জের অধীশ্বর মহারাজ জয়চন্দ্রের অলোকসামান্য রূপবতী কন্যা গুণগ্রামে বিমুগ্ধ হইয়া পিতার বিদ্বেষভাজন হইলেও ইহাঁরই গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিয়াছিলেন। * পৃথ্বীরাজ ১১১৫ শকাব্দে (১১৯৩ খৃষ্টাব্দে) বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং বর্ত্তমান সময় হইতে সাতশত বৎসরের সেই রাজপুরীর ভগ্নাবশেষ দেখিলে মহাকবি কালিদাসের বর্ণনা স্মৃতিপথে উদিত হয়;—

> বিশীর্ণতল্পা দৃশদো নিবেশঃ,
> পর্য্যস্তশালঃ প্রভুণা বিনা মে।
> বিড়ম্বয়ত্যস্ত নিমগ্নসূর্য্যং
> দিনান্তমুগ্রানিলভিন্নমেঘম্ ॥ ১১
>
> রঘুবংশ ১৬শ সর্গ।

অট্টালিকার প্রস্তরগুলি বিশীর্ণ, প্রাচীর সকল খসিয়া পড়িয়াছে, প্রভু-বিহীন (এই রাজপুরী) সূর্য্য অস্তাচলে বিলীন হইলে, প্রবল বায়ুর তাড়নায় ভিন্নমেঘ দিনান্তের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে।

পৃথ্বীরাজের যজ্ঞশালাটী কুতপমিনারের অতি সন্নিহিত। এখানে পৃথ্বীরাজ, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এক কান্যকুব্জেশ্বর ভিন্ন ভারতবর্ষের সমুদয় সামন্ত-নরপতি ইহাঁর অধীনতা অঙ্গীকার করিয়া এই মহাযজ্ঞে যোগ দিয়াছিলেন। যজ্ঞশালার পূর্ব্বদ্বারটী এত বৃহৎ ও সুন্দর গঠিত যে একটী মাত্র দ্বার দেখিয়াই সমুদয় রাজপুরীর বিশালতা অনুমান করা যাইতে পারে। দ্বারের উপরিভাগ কোন্ মুসলমান-নরপতির কোপানলে ভগ্ন হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। যজ্ঞশালাটী গোলাকৃতি, চতুর্দ্দিকস্থ পাষাণ-নির্ম্মিত ভিত্তি গাত্রে বিবিধ হিন্দু-দেবদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। কোথাও দধিমন্থন, কোথাও কৃষ্ণকালী, কোন স্থানে বা বস্ত্রহরণ। যজ্ঞাগারের মধ্যভাগটী অপেক্ষাকৃত উচ্চ, চতুর্দ্দিকে ঢালু। ঠিক মধ্যভাগে একটী লৌহদণ্ড প্রোথিত, কতিপয় হস্ত ঊর্দ্ধে দেবনাগরাক্ষরে অনেকগুলি

* দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ এবং কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্রের শত্রুতা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। অপমানোদ্দেশে জয়চন্দ্র রাজবাটীর সিংহদ্বারে পৃথ্বীরাজের এক দ্বারপালমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন। রাজকন্যা সেই মূর্ত্তির গলেই বরমাল্য অর্পণ করেন।

কথা লিখিত আছে। নিকটে হইল না বলিয়া কিছুই পাঠ করা গেল না। এই লৌহদণ্ড সম্বন্ধে একটী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে,যথা ;—

"মহারাজ পৃথ্বীরাজের অশ্বমেধ যজ্ঞের পূর্ব্বে ধনেশ্বর কুবের এই লৌহদণ্ড প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং এই প্রকার দৈববাণী হইয়াছিল, যদি মহারাজ পৃথ্বীরাজ বামহস্ত দ্বারা এই লৌহদণ্ড যজ্ঞাগারে প্রোথিত করিতে পারেন ও উহাতে যদি নাগরাজ বাসুকির মস্তক ক্ষত হইয়া শোণিত উত্থিত হয়, তবে রাজা চিরজয়ী থাকিবেন, নতুবা কোন বিজাতীয় শত্রুর হস্তে প্রাণ হারাইবেন। মহারাজ বামহস্তে লৌহদণ্ড প্রোথিত করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু বাসুকির মস্তক বিদীর্ণ হইয়া রুধির উদ্গীর্ণ হয় নাই। তজ্জন্য পাণিপথের শেষ-যুদ্ধে তাঁহার পতন হয়।" এই জনশ্রুতি দ্বারা পৃথ্বীরাজের অসীম বীরত্ব সূচিত করাই বোধ হয়, কিংবদন্তীরচয়িতার উদ্দেশ্য। অতএব ইহা বিশ্বাসযোগ্য কিনা, সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

যজ্ঞশালার নৈঋতকোণে বহুদূর-ব্যাপী স্থান, কারুকার্য্য-ক্ষোদিত প্রস্তরস্তূপ ও জঙ্গলে আবৃত। মধ্যে মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পথ আছে, কিন্তু ঐ সকল স্থান ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষলতায় এত দুর্গম যে, শ্বাপদাদি ভিন্ন অন্যের তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই। ইহাই পৃথ্বীরাজ-রাজভবনের ভগ্নাবশেষ। শুনা যায়, কোন বাদসাহ উক্ত রাজভবন বিচূর্ণ করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ কোন অপরিণাম-দর্শী মুসলমান-সম্রাটের ঈর্ষাপ্রযুক্ত যে এই রাজধানীর উত্তুঙ্গ প্রাসাদমণ্ডলী ভূমিসাৎ হইয়াছে, তাহা দেখিলেই অনুমিত হয়।

ইহারই নিকটে অনঙ্গপালের খনিত একটী কূপ আছে, সাধারণে ইহাকে অনঙ্গপালের কূপ বলে। ইহা দ্বারা বোধ হয়, পালবংশীয় নৃপতিগণও এক সময় এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার কিয়দ্দূরে আদম খাঁর প্রকাণ্ড সমাধিমন্দির। একটী ইংরেজ সপরিবারে এই সমাধিমন্দিরের উপরিভাগে বাস করেন। ইহার পর আমরা পৃথ্বীরাজ-রাজভবনের ভগ্নাবশেষ দক্ষিণভাগে রাখিয়া একটী সূক্ষ্ম রাজপথ দিয়া ৺যোগমায়ার মন্দিরে উপনীত হইলাম। মন্দিরে ও মন্দিরের নিকটে কয়েক ঘর নিঃস্ব ব্রাহ্মণের বাস। ইহাঁরা এই যোগমায়ার সেবক। ইহাঁদের জীবিকা ও দেবসেবার জন্য কিছু নিষ্কর ভূমি আছে। আমরা তখন পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া শক্তিপীঠের নিকট প্রণিপাত করত সেই মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত সুশীতল মন্দিরের অভ্যন্তরে উপবেশন করিলাম। ব্রাহ্মণেরা অতি যত্নে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন, আমরাও এই পবিত্র দেব-মন্দির প্রাপ্ত হইয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সুখী হইলাম। শুনা যায়, মহারাজ পৃথ্বীরাজ কর্তৃক এই শক্তিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিছুকাল গত হইল, দিল্লি-সহরের এক জন ধনী মর্ম্মর-প্রস্তর দ্বারা এই মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। আমরা উপবেশন করিলেই ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া একটি ব্রাহ্মণকুমারী বহুকালের পরিচিতার ন্যায় নিকটে আসিয়া বসিল এবং এক এক করিয়া আমাদের হস্ত টানিয়া লইয়া রাখীবন্ধন করিয়া দিল। কুমারীর বর্ণটী অতসীকুসুমের ন্যায় গৌর, শরীরটী স্থূল, চলিত কথায় যাহাকে নধর-দেহ বলে, সেইরূপ। চক্ষু দুইটী বড় বড়। আমাদের সঙ্গী একটি বাবু সমস্ত পথ, এই কুমারীর রূপের বর্ণনা করিতে করিতে আসিলেন, তিনি সুযোগ পাইলেই বালিকাকে "সাক্ষাৎ ভগবতী ও এরূপ সৌন্দর্য্য অল্পই দেখা যায়" ইত্যাদি বাক্যবিন্যাস দ্বারা তাহার সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ ব্যাখ্যা করিলেন। শক্তি-সন্নিধানে কুমারীগণ পূজনীয়া, অতএব

ভক্তির চক্ষে দেখিলে স্বতন্ত্রকথা। কিন্তু লৌকিক-দৃষ্টিতে তাহাতে এমন কোন চিত্তাকর্ষক লাবণ্য ছিল না, যাহাতে অতটা বিমুগ্ধ হওয়া যায়। তবে সত্য কথা বলিতে গেলে এক আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়নই তাহার শোভা। যদি কেহ বলেন, বর্ণ অতসীপুষ্পের সদৃশ ও নশ্বর দেহ, আকর্ণ-বিশ্রান্ত চক্ষু, তবে আর সৌন্দর্য্যের বাকী রহিল কি? তাহা হইলে আমরা কালিদাসের মেঘদূতের মতানুসারে বলিতে পারি, কুমারী তন্বী নহেন বরং স্থূলকায়া, শ্যামার অর্থ ভট্টিকাব্যের টীকাকারদের মতে তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, তাহা কতকটা বটে, শিখরদশনা অর্থাৎ চতুষ্কোণ-দন্তবিশিষ্টা নহে, পক্ক বিম্বের মত অত লাল ওষ্ঠও নয়, মধ্যভাগ একবারেই ক্ষীণ নহে, চকিত হরিণীর ন্যায়ও দৃষ্টি নহে। আর যে কয়টা কথা কালিদাস বলিয়াছেন, সেগুলির প্রতি আমাদের বাবুটী লক্ষ্য করিয়াছিলেন কিনা, বলিতে পারি না। আমরা তখন তৃষ্ণায় আকুল, কে বালিকার সৌন্দর্য্য দেখে? একটী ব্রাহ্মণ ইঁদারার সুশীতল মিষ্ট জল দিতে লাগিলেন, আমরা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উহা পান করিয়া ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে স্থানীয় ইতিবৃত্ত কিয়ৎপরিমাণে সংগ্রহ করত শক্তিপীঠের নিকট কিঞ্চিৎ প্রণামী দিয়া গাত্রোত্থান করিলাম।

সেখান হইতে আমরা দিল্লি-সহর অভিমুখে আসিতে পুনরায় এক স্থানে অবতরণ করিলাম। এই স্থানের নাম সবদরজঙ্গ। এখানে হুমায়ুন বাদসাহের উজীর মনসুর আলী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটী প্রকাণ্ড সুন্দর কারুকার্য্য-শোভিত মাদ্রাসা বা বিদ্যালয় আছে, ইহার চতুর্দ্দিকে উদ্যানরাজি ও বৃহৎ বৃহৎ সমাধিমন্দির আছে।

পুনরায় ওখান হইতে দিল্লি-সহর আসিতে, প্রায় দিল্লির সন্নিহিত আর একটী স্থানে কিছু দেখিবার আছে। এই স্থানকে সাধারণ লোকে যন্ত্রমন্ত্র বলে। মহারাজ মানসিংহ অত্যন্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রানুরাগী ছিলেন, আকবর বাদশাহের সেনাপতিত্ব গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লি অবস্থান কালে জ্যোতিষ্ক গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত দুইটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইহার একটী কতকটা কাশীর মান-মন্দিরের আকৃতি।

অনন্তর আমরা প্রান্তরবর্ত্তী রাজপথ দিয়া দ্রুতগামী অশ্বশকটে আরোহণপূর্ব্বক দিল্লীর পশ্চিম দ্বার দিয়া সহরে প্রবেশ করিলাম। রাজপথের উভয় পার্শ্বে অনেক দৃশ্য রহিল। বামভাগে অতি বৃহৎ একটী প্রান্তর লক্ষিত হইল। সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া যখন ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ করেন, তখন এই প্রান্তরে মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। দেশীয় করদ ও মিত্র রাজগণ উক্ত প্রান্তরে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। *

শ্রীশরচ্চন্দ্র কাব্যরত্ন।

টুয়েল্‌ফ্‌থ্‌ নাইট্‌।

(১)

মেস্যালিন নগরে দুই ভ্রাতা-ভগিনী বাস করিত। উভয়ে যমজ, একই সময়ে উভয়ে ভূমিষ্ঠ হয়। উভয়ের আকৃতি একরূপ; অঙ্গ-ভঙ্গি, চাল-চলন, কথাবার্ত্তা—কিছুতেই কোন পার্থক্য দৃষ্ট হইত না। কেবল মাত্র উভয়ের পরিচ্ছদের ভিন্নতায় উভয়ের প্রভেদ বুঝা যাইত। ভ্রাতার নাম—সিবাষ্টিয়ান্, ভগিনীর নাম—ভায়োলা।

---

* যুধিষ্ঠিরের কাল নির্ণয় আমরা নানা প্রসঙ্গে করিয়া আসিয়াছি। তাঁহার রাজসূয়-যজ্ঞকাল কলি-গতাব্দ ১০৭৫। এ সম্বন্ধে বিতণ্ডা এস্থলে করা অনাবশ্যক। ভ, স।

ভ্রাতা ও ভগিনী, একদিন জাহাজে করিয়া জলপথ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া সমূহ বিপদে পতিত হন। ইলিরিয়া দেশের নিকটে ঐ জাহাজ জলমগ্ন হয়। প্রবল ঝটিকায় বিধ্বস্ত হইয়া জাহাজ খানি এক পর্ব্বতোপরি নিক্ষিপ্ত হওয়ায়, আরোহিগণের জীবন-সংশয় হইয়াছিল, এবং শেষে অতি অল্পমাত্র ব্যক্তি রক্ষা পাইয়াছিল।

সেই জাহাজের অধ্যক্ষ, কতিপয় জীবিত আরোহীকে লইয়া অতি কষ্টে তীরে পঁহুছিয়াছিলেন। ভায়োলা তাহাদের মধ্যে একজন।

ভায়োলা অতি কষ্টে রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু সহোদরের কোন সন্ধান না পাইয়া ভাবিলেন, তিনি জলমগ্ন হইয়াছেন। ইহা স্থির নিশ্চয় জানিয়া একান্ত শোকাকুলা হইলেন। আপনার প্রাণরক্ষা হওয়াতে তাঁহার কিছুমাত্র আনন্দ হইল না, বরং ভ্রাতৃবিয়োগে একান্ত ব্যথিত হইলেন। জাহাজের অধ্যক্ষ বিধিমতে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "তোমার ভ্রাতা জলমগ্ন হন নাই। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যখন জাহাজ খানি পর্ব্বত-সংঘর্ষণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়, তখন সেই জাহাজের একটী মাস্তুল অবলম্বনপূর্ব্বক তরঙ্গের উপর দিয়া তিনি ভাসিয়া চলিয়াছেন।' তিনি যে রক্ষা পাইয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

ভায়োলা কিছু আশ্বস্ত হইলেন। তাহারপর তাঁহার ভাবনা হইল, "এক্ষণে কি করিব? গৃহ ছাড়িয়া দূরদেশে আসিয়াছি, সকলই অজ্ঞাত, অপরিচিত।" অতঃপর অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ইলিরিয়া দেশ সম্বন্ধে আপনি কি কিছু জানেন?"

অধ্যক্ষ। ইলিরিয়া নগরেই আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এখান হইতে তিন ঘণ্টার পথ আমার জন্মস্থান।

ভায়োলা। এখানকার রাজা কে?

অধ্যক্ষ। অর্সিনো এখানকার রাজা। তিনি অতি সদাশয় ব্যক্তি।

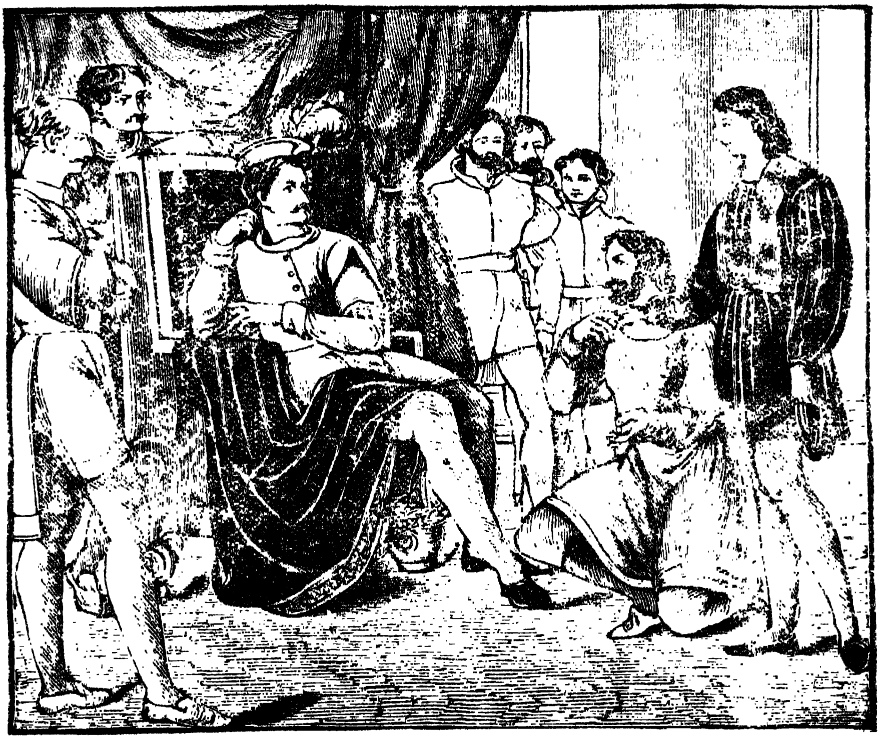
ভায়োলা। অর্সিনোর কথা আমার পিতার মুখে শুনিয়াছিলাম। অর্সিনো তখন অবিবাহিত ছিলেন।

অধ্যক্ষ। আজিও তিনি অবিবাহিত আছেন। একমাস হইল, আমি এখান হইতে গিয়াছিলাম। তখন শুনিয়া গিয়াছি, ইলিরিয়া-রাজ ওলিভিয়া নাম্নী একটি সুন্দরীর বিবাহার্থী হইয়াছেন। বড় লোকের কথা সকলেই শুনিতে পায়। শুনিয়াছি, ওলিভিয়া এক সম্ভ্রান্ত ধনীর কন্যা। এক বৎসর হইল, তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে। ওলিভিয়া আপন সহোদরের নিকট অবস্থান করিতেছিলেন, সম্প্রতি সে সহোদরেরও মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার প্রতি ওলিভিয়ার প্রগাঢ় স্নেহ ও অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল। সহোদরের শোকে একান্ত কাতর হইয়া, এক্ষণে তিনি নিভৃতে, নির্জ্জনে অবস্থান করিতেছেন। কাহারও সমক্ষে বাহির হন না, কিংবা কাহারও মুখাবলোকন করেন না। আপনার দুঃখে আপনিই মরিয়া আছেন।

ভায়োলা, ওলিভিয়ার দুঃখের সহিত আপন দুঃখের সাদৃশ্য দেখিয়া ওলিভিয়ার জন্য ব্যথিতা হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল এবং মুখে একরূপ প্রকাশও করিলেন, ওলিভিয়ার সাহচর্য্যে জীবনপাত করেন। অধ্যক্ষ সে কথা শুনিয়া বলিলেন, 'ওলিভিয়ার সহিত সাক্ষাৎ দুর্ঘট। ভ্রাতৃবিয়োগ হওয়া অবধি অন্য লোককে দেখা দেওয়া দূরে থাক্,—স্বীয় প্রণয়পাত্র ইলিরিয়া-রাজকে পর্য্যন্তও আপন ভবনে প্রবেশ করিতে দেন না।"

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধের পর, কি ভাবিয়া ভায়োলা এক উপায় অবলম্বন করিলেন; পুরুষের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া ইলিরিয়া-রাজের

ইলিরিয়া-রাজ-সভায়—পুরুষবেশে ভাওলা।



ভৃত্যরূপে নিযুক্ত হইতে সঙ্কল্প করিলেন। যুবতীর এই প্রকার আত্মগোপন ও ছদ্মবেশ নন্দার বিষয় বটে, কিন্তু সে অসহায় অবস্থা ববেচনা করিলে তাহা তত দোষাবহ নহে।

অধ্যক্ষকে সহৃদয় ও বিশ্বস্ত জানিয়া' ভায়োলা স্বীয় বাসনা তাঁহাকে জানাইলেন। অধ্যক্ষও ভায়োলার কথামত পুরুষপরিচ্ছদ আনাইয়া দিলেন। ভায়োলার ভ্রাতা সিবাষ্টিয়ান্ যে প্রকার পরিচ্ছদ ধারণ করিতেন, ভায়োলা সেই প্রকার পরিচ্ছদ আনাইলেন। পুরুষবেশে ভায়োলাকে ঠিক তাঁহার সহোদর সিবাষ্টিয়ানের মত দেখিতে হইল;—কোন অংশে কিছুমাত্র পার্থক্য রহিল না।

(২)

সেইরূপ পুরুষ-পরিচ্ছদে আত্মগোপন করিয়া ভায়োলা, যথাসময়ে, অধ্যক্ষ সমভিব্যাহারে ইলিরিয়া-রাজ-সদনে উপস্থিত হইলেন। রাজ-সরকারে অধ্যক্ষের কিছু প্রতিপত্তি ছিল। তিনি ভায়োলার নাম পর্য্যন্ত গোপন করিয়া, সিজারিও নামে তাঁহাকে ইলিরিয়া-রাজ অর্সিনোর নিকট উপস্থিত করিলেন।

পাঠককে মনে রাখিতে হইবে, ভায়োলা এক্ষণে সিজারিও নামে পরিচিত। ইলিরিয়া-রাজ অর্সিনো এই অভ্যাগত যুবকের অনুপম সৌন্দর্য্য, বিনীতভাব ও শিষ্টাচার প্রভৃতি দেখিয়া একান্ত প্রীত হইলেন। সিজারিও রাজ-সেবকের পদ প্রার্থনা করিলে, অর্সিনো হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে সেইপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

সিজারিও যে কর্ম্মের জন্য নিযুক্ত হইলেন, অতি সুচারুরূপে তাহা সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এবং সকল প্রকারে প্রভুর চিত্ত-বিনোদন করিয়া, অতি অল্প সময়ের মধ্যে, তাঁহার একান্ত স্নেহভাজন, বিশ্বস্ত ও প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। অর্সিনো সর্ব্বদাই সিজারিওর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া সুখী হইতেন। কোন কথা লুকাইতেন না। হৃদয়ের আবেগে হয় ত, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে লুক্কায়িত কোন অতীত রহস্যের কথাও সময়ে সময়ে বলিয়া ফেলিতেন। কিন্তু তাহাতে আনন্দিত বৈ অসুখী হইতেন না। ওলিভিয়ার প্রতি তাঁহার যে অনুরাগ, ক্রমে সে কথাও ব্যক্ত করিলেন। এমনই প্রগাঢ় বিশ্বাস, এমনই প্রগাঢ় স্নেহ।

অর্সিনো, সিজারিওর পার্শ্বে বসিয়া, নিঃসঙ্কোচে আত্ম-প্রণয়-কাহিনী প্রকাশ করিতেন। তিনি বলিতেন, "সিজারিও, ওলিভিয়াকে আমি কিরূপ ভালবাসি, তাহা কথায় ব্যক্ত করিতে পারি না। আজি কতদিন এ হৃদয়-মন্দিরে সে দেবী প্রতিমার প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। কতদিন তাঁহার ধ্যানে, আত্মহারা হইয়া আছি। গভীর গহনে আর সে মৃগয়ার সাধ নাই। সে ক্রীড়া-কৌতুক, সে আনন্দ-উল্লাস,—হৃদয়ের সে উন্মাদ-উচ্ছৃঙ্খলতা, সে চিরস্ফূর্ত্তি—কিছুই নাই। আপনার উপর এখন যেন আর কোন প্রভুত্ব নাই; যেন অতি দুর্ব্বল, আশা-ভরসাহীন, অবলম্বনশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। দেখ, ওলিভিয়া নিতান্ত হৃদয়হীনা; নহিলে আমার এ কঠোর সাধনা, তাঁহার জন্য আমার এ অপার্থিব ভালবাসা, সকলই উপেক্ষিত হইবে কেন? একবার প্রাণ ভরিয়াও যে তাঁহাকে দেখিব, সে আশাও মিটে না,—তাঁহার সম্মুখে যাইতেও নিষেধ! বুঝি, আমার এ দেহ পর্য্যন্তও তাঁহার ঘৃণিত! হায়, আমি কি হইয়া গিয়াছি! এখন কেবল প্রণয়ের আলাপে ও প্রেমের-সঙ্গীত-শ্রবণে একান্ত সাধ! দিন, এই ভাবেই কাটিতেছে।"

এইরূপ প্রায়ই হইত। এক কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, শতরূপ বিশ্লেষণ-ব্যাখ্যা করিয়া ইলিরিয়া-রাজ আত্ম-প্রণয়-কাহিনী বলিয়া যাইতেন, পুরুষ-বেশধারিণী ভায়োলা নিবিষ্ট-মনে তাহা শুনিতেন।

রাজা রাজকার্য্যে উদাসীন; দিবারাত্রি সিজারিওকে লইয়া কথোপকথনে প্রবৃত্ত;—রাজপারিষদগণ ইহাতে বিরক্ত হইল এবং মনে মনে সিজারিওর মুণ্ডপাত করিতে লাগিল।

(৩)

পুরুষবেশধারিণী ভায়োলা, সিজারিও নামে রাজার নিকট পরিচিত। রাজাও একান্ত বিশ্বস্তজ্ঞানে, হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সকল কথাই তাঁহাকে প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, সিজারিও পুরুষ নহেন, রমণী! তিনি জানিতেন না যে, সিজারিও যুবতী,—আত্ম-গোপন করিয়া তাঁহার দাসত্ব গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র। তিনি জানিতেন না যে, সিজারিও-সমক্ষে আত্মপ্রণয়-কাহিনী ব্যক্ত করিয়া, ধিকিধিকি তাহার হৃদয়ে কি আগুন জ্বালিয়া দিতেছেন!

বস্তুতই ব্যাপার এইরূপ দাঁড়াইল। ভায়োলা মনে মনে রাজার প্রতি একান্ত অনুরাগিণী হইয়া পড়িলেন।

ভায়োলার চক্ষে অর্সিনোর রূপ অতুল, গুণ অসাধারণ। ভায়োলা মনে মনে ভাবে, ভাবিয়া বিস্মিত হয়,—"আহা, এত রূপ, এত গুণ! তবু কি কারণে সে হতভাগী ওলিভিয়ার মন উঠে না! এমন মনোহর কান্তি,—শত্রুও না দেখিয়া থাকিতে পারে না,—আহা, এমন মোহনরূপে কাহার না চক্ষু জুড়ায়!"

পতঙ্গ, জলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হইল! ভায়োলা, অর্সিনোকে প্রাণান্তপণে ভালবাসিল!

একদিন ভায়োলা বলিলেন, "মহারাজ, আপনার এ দুর্লভ প্রেমের পরিচয় পাইয়া, আমি নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছি। সে রমণী নিশ্চয় দৃষ্টিহীনা, নহিলে আপনার এ অনন্ত গুণরাশি, কিছুই সে দেখিতে পায় না! ইহা নিতান্ত দুঃখের কথাও বটে। আচ্ছা প্রভু, আপনি ওলিভিয়াকে যেরূপ ভালবাসেন, অন্য কোন রমণী যদি আপনাকে সেইরূপ ভালবাসে, আপনি কি তাহাকে ভালবাসিতে পারেন? এ সংসারে, এমন রমণীও থাকিতে পারে! কিন্তু যদি আপনি সেই রমণীকে ভাল না বাসেন এবং যদি তাহাকে বলেন, "আমি তোমাকে ভালবাসিব না,"—তখন সে কি করিবে? সে নিশ্চয়ই নীরব থাকিবে।"

অর্সিনো এ কথা স্বীকার করিলেন না। তিনি বলিলেন, "আমি যেরূপ ভালবাসি, কোন রমণী এমন ভালবাসিতে পারে না। সিজারিও, ইহা নিশ্চয় জানিও, স্ত্রীলোকের হৃদয় বড় সঙ্কীর্ণ; এ উদার প্রেমের রাশি, সে ক্ষুদ্র হৃদয়-টুকুতে স্থান পায় না। ওলিভিয়ার প্রতি আমার যে ভালবাসা, কোন রমণী হৃদয়ে সেরূপ ভালবাসা থাকা অসম্ভব!"

ভায়োলা, প্রভুর বাক্য যথেষ্ট মান্যের সহিত গ্রহণ করিতেন। কিন্তু স্ত্রীলোকের হৃদয় সঙ্কীর্ণ এবং তাহাতে অর্সিনোর ন্যায় প্রগাঢ় ভালবাসা স্থান পাইতে পারে না,—এ কথা স্বীকার করিতে ভায়োলা প্রস্তুত নহেন। তিনি মনে মনে বুঝিলেন, ইহা তাঁহার প্রভুর যথেষ্ট ভ্রম। ভায়োলার হৃদয় নাকি অর্সিনোর জন্য উন্মত্ত, তাই তিনি বুঝিলেন, আসনো বা কতটুকু ভালবাসিতে পারেন, ভায়োলার ভালবাসা অসীম! অনন্তর বলিলেন, "প্রভু, এ সম্বন্ধে আমি কিছু জানি।"

অর্সিনো কহিলেন, "কি জান, বল দেখি?"

ভায়োলা। রমণী পুরুষকে কত ভালবাসিতে পারে, তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। প্রেম সম্বন্ধে,—আমরা পুরুষ, আমাদের হৃদয় যেরূপ, রমণী-হৃদয়ও তদ্রূপ। আমার এক স্নেহময়ী ভগিনী ছিল, সে কোন এক যুবককে ভালবাসিত। আমি যদি রমণী হইতাম, আপনাকে যেরূপ ভালবাসিতাম, সেও তাহার প্রণয়-পাত্রকে সেইরূপ ভালবাসিত।

অর্সিনো। তার পর?—এ প্রেমের ইতিহাস আমি আদ্যোপান্ত শুনিতে ইচ্ছা করি।

ভায়োলা। তারপর আর কি? সকল কথা আমি জ্ঞাত নহি। আমার ভগিনীর সে প্রেম-কাহিনী সকলেরই অজ্ঞাত ছিল। কেহ জানিত না, তিনি অতি গোপনে আপনার প্রেম হৃদয় মধ্যে লুকাইয়া রাখিতেন। কুসুম-কোরকে কীটের ন্যায় সেই গুপ্ত প্রেম, দিবা-নিশি তাঁহাকে দগ্ধ করিত। তবু মুখ ফুটিত না। চিন্তা-বহ্নি তাঁহার কুসুম-সুকুমার মধুর আকৃতিকে বিবর্ণ করিয়া ফেলিল; মুখখানি মলিন,—বিষাদ-প্রতিমার ন্যায় তিনি অবস্থান করিতেন। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত, যেন মূর্তিমতী সহিষ্ণু-প্রতিমা আশার সমাধি-স্তম্ভে বসিয়া, অসীম যন্ত্রণারাশি বুকে করিয়াও মধুর হাস্য করিতেছেন।

অর্সিনো। তার পর?—তোমার ভগিনী বোধ হয়, এই প্রেমের জন্যই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন?

ভায়োলা সে প্রশ্নের কোন পরিষ্কার উত্তর দিলেন না। যে প্রেম-কাহিনী তিনি প্রকাশ করিলেন, বস্তুতঃ, সে প্রেম-কাহিনী তাঁহার নিজের। অর্সিনোর জন্য দিবানিশি তাঁহার হৃদয় যে কিরূপ দগ্ধ হইতেছে, ইঙ্গিতে তাহাই ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু সে পুরুষ-বেশধারিণী

ভায়োলাকে, ইলিরিয়া রাজ কি প্রকারে রমণী বলিয়া চিনিতে পারিবেন ?

---

(৪)

রাজার সহিত ভায়োলার যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, সেই সময়ে এক ব্যক্তি সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। রাজা সেই আগন্তুককে ওলিভিয়ার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। আগন্তুক বলিল, "মহারাজ, আপনি আমাকে সেই মহিলার নিকট পাঠাইলেন বটে, কিন্তু সেখানে প্রবেশের অনুমতি পাইলাম না। পরিচারিকা আসিয়া বলিয়া গেল যে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। তিনি ইহাও বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, সাত বৎসর পর্য্যন্ত তিনি মুখাবরণ খুলিবেন না। কাহারও সহিত দেখা-সাক্ষাৎও করিবেন না। নিজ গৃহমধ্যে নিয়তই অবস্থান পূর্ব্বক মৃত সহোদরের উদ্দেশে অশ্রুবর্জ্জন করিবেন।"

রাজা। আহা, কি কোমল হৃদয়! মৃত ভ্রাতার জন্য যাহার হৃদয় এমনই শোকাকুল, না জানি, মদনের কুসুম-শরে সে হৃদয়ে কি প্রেমের উৎসই ছুটিতে থাকিবে!

তার পর ভায়োলাকে বলিলেন, "সিজারিও, আমার অন্তরের সকল কথাই তোমাকে বলিয়াছি; আমার মনোভাব তুমি সমস্তই জান। এইবার তুমি একবার ওলিভিয়ার নিকট যাও। যেরূপে পার, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিও। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া তুমি ফিরিও না।

ভায়োলা। যদি তাঁহার সাক্ষাৎ পাই এবং যদিই তাঁহার সহিত দুটা কথা কহিতে পারি, আমায় কি করিতে হইবে, কি বলিতে হইবে, আদেশ করুন।

রাজা। কথা প্রসঙ্গে তুমি আমার কথা পাড়িবে। তাঁহার জন্য এ হৃদয় কিরূপ তৃষিত, তাহা তুমি জান; দিবানিশি তাঁহার চিন্তায় কি ভাবে দিন কাটিতেছে, তাহা তুমি স্বচক্ষে দেখিতেছ। তাঁহার জন্য এই দুঃখ, এই যন্ত্রণা, এই ক্লেশ—এই সকল কথা আনুপূর্ব্বিক তাঁহাকে বলিও। তোমাকে শিখাইতে হইবে না;—আশা করি, তুমি সকল কথা গুছাইয়া বলিতে পারিবে। আমার মনে হয়, তোমারই মত এমনই সহৃদয় ও বুদ্ধিমান্ যুবকের দ্বারা এ কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারিবে।

ভায়োলা প্রভুর আজ্ঞা ঠেলিতে পারিলেন না। কিন্তু নিতান্ত ইচ্ছাপূর্ব্বক একার্য্যে ব্রতী হইলেন না। যাহার হৃদয়ে স্থান পাইবার জন্য দিবানিশি তাঁহার চিন্তা, তাহারই জন্য অন্য রমণীর প্রণয়-প্রার্থনা! ব্যাপার কি সামান্য? কিন্তু ভায়োলা তথাপি সম্পূর্ণরূপে আত্মভাব গোপন করিয়া, প্রভুর আজ্ঞা পালনে প্রস্তুত হইলেন।

(৫)

ভায়োলা যথাসময়ে ওলিভিয়ার ভবনে উপস্থিত হইলেন। ওলিভিয়ার এক ভৃত্য দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিল, সে ভায়োলাকে প্রবেশ করিতে দিল না। ভায়োলা অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া কহিল, ভৃত্য আপন কর্ত্রীকে জানাইতে গেল।

ওলিভিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আগন্তুক কে? কোথা হইতে আসিয়াছে?

ভৃত্য। তাহা জানি না। এই যুবককে আর কখন দেখি নাই। ইনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। আমি বলিলাম, আপনার শরীর বড় ভাল নাই, এখন দেখা হইবে না। তাহাতে আগন্তুক বলিল, 'আমি তাহা জানি, সেই জন্যই দেখা করিতে আসিয়াছি।' আমি বলিলাম, 'এখন

নিদ্রিত আছেন', তথাপি সে বলিল, 'তাহাও আমি জানি, কিন্তু তথাপি তাঁহার সহিত আমার একবার দেখা করিতেই হইবে। বিশেষ প্রয়োজন।' এখন কি করিব? যুবক দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছে। আমার বোধ হয়, আপনার সহিত দেখা না করিয়া সে ছাড়িবে না,—তা আপনি ইচ্ছা করুন আর নাই করুন।

ভৃত্যের মুখে এইরূপ শুনিয়া ওলিভিয়া কিছু বিস্মিতা হইলেন। তাঁহার মনে হইল, এই আগন্তুক নিশ্চয়ই ইলিরিয়া-রাজ অর্সিনোর নিকট হইতে আসিয়া থাকিবে। কিন্তু তাহার এরূপ জিদ্ দেখিয়া, ওলিভিয়া দেখা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু বলিলেন, "মুখাবরণ খুলিব না, একবার মাত্র তাহার কথা শুনিব।"

ভৃত্য, ভায়োলাকে প্রবেশের অনুমতি দিল। ভায়োলা সাধ্যমত পুরুষের প্রকৃতি অবলম্বন পূর্ব্বক, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পরিচারকের ন্যায়, ওলিভিয়ার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং অতি কোমল ও মধুরকণ্ঠে, পরিষ্কাররূপে বলিলেন, "সুন্দরি! আপনিই কি এই গৃহের কর্ত্রী? যিনি এই গৃহের কর্ত্রী, তাঁহারই সাক্ষাতে আমার কিছু বক্তব্য আছে, অন্যের নিকট কিছু বলিব না। যাহা বলিতে আসিয়াছি, তাহা অতি যত্নেই শিখিয়াছি।"

অবগুণ্ঠনাবৃতা ওলিভিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? কোথা হইতে আসিয়াছেন?"

ভায়োলা। আমি যাহা শিখিয়া আসিয়াছি, তাহাই বলিতে পারি, আপনার প্রশ্নের উত্তর শিক্ষা করি নাই।

ওলিভিয়া। আপনি কি কোন কৌতুকী পুরুষ নাকি?

ভায়োলা। না;—আমাকে দেখিয়া আপনার যেরূপ বোধ হইতেছে, আমি তাহা নহি।

ভায়োলা ঈষৎ ইঙ্গিতে প্রকাশ করিলেন যে, তিনি পুরুষ নহেন। কিন্তু ওলিভিয়া তাঁহার সে ইঙ্গিত বুঝিতে পারিলেন না।

ভায়োলা পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, "সুন্দরি! আপনিই কি এই গৃহের কর্ত্রী?"

ওলিভিয়া। হাঁ, এ গৃহ আমারই।

তখন ভায়োলার ইচ্ছা হইল, "ওলিভিয়ার মুখ খানি কেমন, একবার দেখিয়া লই। প্রভুর যাহা বক্তব্য আছে, তাহা পরে বলিব।"

এই ভাবিয়া ভায়োলা বলিলেন, "ঠাকুরাণি, একবার আপনার মুখাবরণ অপসৃত করুন, আমি ঐ মুখ খানি দেখিব, বড় ইচ্ছা হইতেছে।"

যে অর্সিনোর প্রেম ও ভালবাসায় ওলিভিয়ার হৃদয় একটুকুও বিচলিত হয় নাই, আজি সেই অর্সিনোর ভৃত্যের এ প্রকার দুঃসাহসের কথাতেও কিন্তু ওলিভিয়ার হৃদয়ে ভাবান্তর হইল। সেই অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে কটাক্ষপাতে পুরুষ-বেশধারিণী, পরমা সুন্দরী ভায়োলার রূপ-লাবণ্যে মোহিত হইয়া, বিরহিণী ওলিভিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার অনুরাগিণী হইয়া পড়িলেন!

ভায়োলা, ওলিভিয়ার মুখ দেখিতে চাহিলে, ওলিভিয়া বলিলেন, "তোমার প্রভু কি বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা বল। মুখের সহিতও তাঁহার কোন কথা আছে নাকি?"

তার পর তিনি অবগুণ্ঠন অপসৃত করিলেন। সাত বৎসর যে তিনি মুখাবরণ খুলিবেন না, অনঙ্গ-শরে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। তিনি বলিলেন, "তুমি যখন দেখিতে চাহিতেছ, তখন এই দেখ, আমি অবগুণ্ঠন মোচন করিলাম। দেখ দেখি, এ চিত্রখানি কেমন'?" *

ওলিভিয়া মনে মনে সেই পুরুষ বেশধারিণী ভায়োলাকে আত্মসমর্পণ করিলেন।

ভায়োলা সে ভুবনমোহিনী রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। বলিলেন, "কি মনোহর আপনার

* এই স্থানের চিত্রটী পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ওলিভিয়া ও ভায়োলা।



রূপ! কি সুন্দর মুখাবয়ব! কি অপূর্ব্ব ললাট! কি শান্ত অধর! কি অমৃত চিবুক ও বিশাল নয়ন-যুগল! মরি মরি, এ সৌন্দর্য্য-প্রতিমা কি এ পৃথিবীর? কিন্তু দেবি! যদি এ মধুর রূপের প্রতিকৃতি আপনি এ জগতে রাখিয়া না যান, তবে বুঝিব, আপনার অপেক্ষা কঠিন-হৃদয়া এ সংসারে আর নাই!"

ওলিভিয়া। না, আমি আমার প্রতিকৃতি রাখিয়া যাইব বৈ কি। কিন্তু তুমি কি আমাকে এই ভাবে প্রশংসা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছিলে?

ভায়োলা। আমি প্রশংসা করিতে আসি নাই। যাহা সম্মুখে দেখিতেছি, তাহাই যথার্থ বলিতেছি। আপনি বড় গর্ব্বিতা, কিন্তু তবু সুন্দর। আপনি বড় অভিমানিনী, কিন্তু তবু সুন্দর। আমার প্রভু অর্সিনো আপনাকে সমস্ত হৃদয় ভরিয়া ভালবাসেন; তাঁহার সে প্রকার ভালবাসা আপনার উপেক্ষণীয় হইল, ইহা বড় দুঃখের বিষয়। মানুষ যেরূপে দেবতার উদ্দেশে জীবন উৎসর্গ করে, তিনিও তেমনি আপনার উদ্দেশে হৃদয় উৎসর্গ করিয়াছেন!—তবুও আপনার হৃদয় দ্রব হইল না?

ওলিভিয়া। তোমার প্রভু ত আমার মন জানিয়াছেন, তবে আর কেন? তিনি ত বুঝিয়াছেন, আমি তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিব না। তিনি অতি সজ্জন, মহৎপ্রকৃতি ও সর্ব্বগুণান্বিত, তাহা আমি জানি। সর্ব্বত্রই সর্ব্বলোকে একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করে, তাহাও জানি।—তিনি ধীর, বীর, সাহসী, শিক্ষিত ও সদাশয়—এই সকলই সত্য; কিন্তু

দুর্ভাগ্য বশতঃ তবুও আমি তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিব না;—এ কথা কি তিনি এতদিন বুঝেন নাই?

ভায়োলা। আমার প্রভুর ন্যায় আমি যদি আপনার প্রণয়াসক্ত হইতে পারিতাম, তাহা হইলে নিয়তই আপনার দ্বারে অবস্থান করিতাম; একটুকুও নড়িতাম না। দিবানিশি আপনারই নাম আমার জপমালা হইত। নিস্তব্ধ নিশীথে "ওলিভিয়া" "ওলিভিয়া" বলিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকিতাম। ওলিভিয়া সঙ্গীতে নৈশপ্রকৃতি প্লাবিত করিতাম; পর্ব্বতে পর্ব্বতে তাহা প্রতিধ্বনিত হইত। আবার ডাকিতাম, আবার গাহিতাম!—দয়া প্রকাশ না করিয়া কি থাকিতে পারিতেন?

ওলিভিয়া। হয় ত তাহাতে কিছু ফল হইত। কিন্তু তুমি কে, তোমার পরিচয় কি?

ভায়োলা। আমি সম্ভ্রান্তবংশে জন্মিয়াছি বটে; কিন্তু গ্রহ-বৈগুণ্যে এখন দুর্দ্দশাপন্ন। যাহা হউক, আমাকে ভদ্রবংশজাত জ্ঞান করিবেন।

পাঠক জানেন, ভায়োলা ইলিরিয়া-রাজের নিকটও যেমন, এখানেও সেইরূপ সিজারিও নামে আপন পরিচয় দিলেন।

ওলিভিয়া, ভায়োলাকে বিদায় দিতে ইচ্ছা না করিলেও বিদায় দিলেন। বলিয়া দিলেন, "তুমি তবে এক্ষণে তোমার প্রভুর নিকট যাও। তাঁহাকে আমার অভিপ্রায় জানাইয়া বলিও, আর যেন তিনি বৃথা চেষ্টা না করেন। আর যেন তিনি কোন দূত প্রেরণ না করেন। তবে আমার এই কথাগুলি তিনি কি ভাবে গ্রহণ করিলেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। যদি তোমার আপত্তি না হয়, তবে—অন্য কেহ নহে, একবার তুমি আসিয়া সেই কথাগুলি বলিয়া যাইও।"

ভায়োলা বলিলেন, "আপনি সুন্দরী, কিন্তু কি নিষ্ঠুর হৃদয়া!"

ভায়োলা বিদায় গ্রহণ করিলেন।

(৬)

ভায়োলা ত প্রস্থান করিলেন, কিন্তু ওলিভিয়ার হৃদয়ে ভায়োলার মূর্ত্তি জাগিয়া রহিল। ওলিভিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "কি সুন্দর সৌম্যমূর্ত্তি! পরিচয় জিজ্ঞাসায় জানিলাম, ভদ্রবংশসম্ভূত বটে। তাহা ঠিক। সেই মধুর আকৃতি সেই সুধাপূর্ণ সুমিষ্ট কথা, সেই প্রশান্ত দৃষ্টি, সেই নির্ম্মল-হৃদয়, সে সকলই উচ্চবংশের পরিচায়ক বটে। আহা, এই সিজারিও যদি ইলিরিয়া-রাজ অর্সিনো হইত, কখনই তাহার প্রেম উপেক্ষা করিতাম না,—আজীবন তাহার দাসী হইয়া থাকিতাম!"

ভাবিতে ভাবিতে আপনার দুর্ব্বলতা বুঝিয়া আত্মধিক্কার করিতে লাগিলেন:—"আঃ ছি! ছি! আমি কি দুর্ব্বল হৃদয়া, কি অসার-প্রকৃতি! সহসা একবার দর্শনমাত্রেই আমি সিজারিওর রূপে আকৃষ্ট হইলাম!"

আবার সেই মুখ মনে পড়িল, সুন্দরী আত্মহারা হইলেন। আপনার দুর্ব্বলতা ভুলিয়া গেলেন। আপনার উপর যে দোষারোপ করিতেছিলেন, তাহা আর মনে স্থান পাইল না।

ওলিভিয়া চিত্ত স্থির রাখিতে পারিলেন না। রমণী-হৃদয়ের যে অপূর্ব্ব রহস্য—আত্মগোপন, ওলিভিয়া তাহা বিসর্জ্জন দিলেন। তিনি একবার মনেও ভাবিলেন না যে, তাঁহার অবস্থায় আর ইলিরিয়া রাজ অর্সিনোর সেই ভৃত্য সিজারিওর অবস্থায় কত প্রভেদ! প্রেমের রীতিই ত এই।

তখন ওলিভিয়া সিজারিওর প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া তাঁহার নিকট একটী অঙ্গুরীয়ক পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু দূতকে বলিয়া দিলেন, তুমি এই

অঙ্গুরীয়ক সিজারিওর হস্তে দিবে। বলিয়া দিবে, "আপনি ইলিরিয়া-রাজের নিকট হইতে এই যে অঙ্গুরীয়ক আমার ঠাকুরাণীর জন্য উপহার আনিয়াছিলেন, ভুলক্রমে ইহা আপনি লইয়া আসেন নাই।"

ওলিভিয়া এইরূপে ইঙ্গিতে সিজারিওকে প্রণয়ের প্রথম উপহার স্বরূপ সেই অঙ্গুরীয়ক পাঠাইয়া দিলেন; ভাবিলেন, সিজারিও তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন।

বস্তুতঃ তাহাই হইল। ভৃত্যের নিকট হইতে অঙ্গুরীয়ক পাইয়া ভায়োলা ভাবিয়া দেখিলেন, কৈ, ওলিভিয়াকে উপহার দিবার নিমিত্ত অর্সিনো ত তাঁহাকে কোন দ্রব্য দেন নাই;— তবে এ অঙ্গুরীয়ক কোথা হইতে আসিল? ভাবিতে ভাবিতে তখন সব বুঝিলেন। তাঁহার প্রতি ওলিভিয়ার সেই অনিমেষ-কটাক্ষ, সেই প্রেমপূর্ণ সম্ভাষণ প্রভৃতি মনে হইল। তখন তিনি সকলই বুঝিলেন। বুঝিলেন যে, যে মন্ত্রে তিনি অর্সিনোর অনুরাগিণী হইয়াছেন, এই ওলিভিয়া-ভুজঙ্গিনীও তাঁহার প্রতি সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে!

তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ভায়োলা ভাবিলেন, "হায়, ওলিভিয়ার কি ভ্রম! আমাকে পুরুষ ভাবিয়া আমাতেই আত্মসমর্পণ করিয়াছে! এ যে অসার স্বপ্নের মায়া মাত্র! হায় ছদ্মবেশ! আমি যেমন অর্সিনোর জন্য আত্মহারা, এই ওলিভিয়াও তেমনি আমার জন্য অকারণ দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিবে। অহো, নিষ্ঠুর ভবিতব্য!

(৭)

ভায়োলা প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া ওলিভিয়া সুন্দরীর সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন। বলিলেন, "মহারাজ, আর চেষ্টা করিবেন না। চেষ্টায় আর কোন ফল নাই। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, আপনি আর তাঁহাকে বিরক্ত করিবেন না।

কিন্তু অর্সিনো নিবৃত্ত হইলেন না। তাঁহার মনে হইল, সিজারিও চেষ্টা করিলে ওলিভিয়া-লাভ হইতে পারে। অতঃপর বলিলেন, "দেখ সিজারিও, কল্য তোমাকে আর একবার সেখানে যাইতে হইবে। আজি আমার মন বড় অস্থির। কাল তুমি যে একটী গীত গাহিয়াছিলে, তাহা আমার বড় মধুর লাগিয়াছিল। আজি একবার সেই গীতটী শুনাও দেখি। গানটীতে তেমন বৈচিত্র্য নাই বটে, কিন্তু তবু বড় সুন্দর, বড় মধুর। আমি এ গানটীকে বড় ভালবাসি।"

ভায়োলা মধুর স্বরে গান করিলেন;—

(ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ—মধ্যমান।)

কি সুখে রাখিব আর
এ ছার জীবন-ভার।
আর বীণা বাজিবে না,
ছিঁড়ে গেছে হৃদি-তার।
গেছে সুখ, গেছে আশা,
না মিলিল ভালবাসা,
অতৃপ্ত এ প্রেম-তৃষা,
বেঁচে থাকা যাতনার।
নিঠুরা রূপসী বালা,
মরমে দিয়েছে জ্বালা,
মিছা শুধু অশ্রু ঢালা,
জ্বালা নহে জুড়াবার।
আয় রে মরণ আয়,
জুড়াব তোমার ছায়,
কি আর বলিব হায়,
প্রাণ-হন্ত্রী সে আমার।
ফুটন্ত কুসুম-হাসি,
ও সুষমা রূপরাশি,
আর নাহি ভালবাসি,
চ'লেছি মরণ-পার।—

সখা কেহ কাঁদিও না,
মালা কেহ পরা'ও না,
আর মনে রাখিও না,
জীবনী এ অভাগার ॥

গানটীর ভিতর নিরাশ-প্রণয়ের ভাবটুকু বড় সরলভাবে পরিব্যক্ত। ভায়োলা নিজেও নাকি এইরূপ যন্ত্রণায় পুড়িতেছে, তাই গানের সঙ্গে সঙ্গে সেই সুকুমার মুখখানিও তেমনই ভাবান্তরিত হইতেছিল। অর্সিনো দেখিলেন, গীত গাহিতে গাহিতে সিজারিওর মুখখানি মলিন, করুণ আঁখি দুটী অশ্রুসিক্ত হইয়াছে। গান থামিলে, অর্সিনো বলিলেন, "সিজারিও, তোমার বয়স অল্প বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই তুমি এই বয়সে কাহাকে ভালবাসিয়াছ। বল দেখি, সত্য কিনা ?"

ভায়োলা। আপনার অনুমান মিথ্যা নহে।

অর্সিনো। সে রমণীর বয়স কত? রূপ কেমন ?

ভায়োলা। বয়সে ও সৌন্দর্য্যে আপনারই সমতুল্য।

অর্সিনো উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। তাঁহারই তুল্য বয়স ও তাঁহারই তুল্য কৃষ্ণবর্ণ,—এমন কোন রমণীর সহিত এই মধুরাকৃতি যুবকের প্রণয়, ইহাও কি সম্ভব? কিন্তু ভায়োলার কথার যথার্থ তাৎপর্য্য,—অর্সিনো তলাইয়া বুঝিলেন না। অর্থাৎ ভায়োলা যে তাঁহারই প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী, ইঙ্গিতে তাহাই ব্যক্ত হইল। অর্সিনো সে ইঙ্গিত বুঝিবেন কিরূপে ?

(৮)

প্রভুর আদেশ-মত ভায়োলা পরদিবস আবার ওলিভিয়া-সদনে উপস্থিত হইলেন। এবারে ওলিভিয়ার সাক্ষাৎ পাইতে কোন কষ্ট হইল না। রমণীগণ যখন স্ব স্ব প্রেমিকের নিকট হইতে আগত দূতগণের সহিত সানন্দচিত্তে কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন, ভৃত্যেরা সে ভাব একরূপ স্পষ্টই বুঝিতে পারে। পুরুষবেশধারিণী ভায়োলার সহিত ওলিভিয়ার কথাবার্ত্তা হইতে ভৃত্যেরা কিছু কিছু বুঝিয়াছিল। এবং সেই জন্য আজ তাঁহার আগমন মাত্রেই সম্মানের সহিত কর্ত্রীর সম্মুখে তাঁহাকে উপস্থিত করিল। ভায়োলা বলিলেন, "ঠাকুরাণি! আজি আবার আসিয়াছি। আমার প্রভু একান্তই আপনার অভিলাষী। মিনতি করি, তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করুন।"

ওলিভিয়া। সিজারিও, তাঁহার কথা আর আমাকে বলিও না। তাঁহার সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলিয়া দিয়াছি। তুমি অন্য কথা বল। দেখ, তোমার কথা শুনিতে আমি বড় ভালবাসি। তোমার কথা শুনিতে পাইলে, আমি স্বর্গের সঙ্গীতও শুনিতে চাহি না।

হৃদয় ফুটিয়া ফুটিয়া তবু যেন সঙ্কোচে ফুটিল না। কিন্তু চতুরা ভায়োলা স্পষ্টই বুঝিলেন। ওলিভিয়াও আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। আবেগভরে বলিয়া ফেলিলেন, "সিজারিও, সিজারিও, আমি তোমারই! আমাকে গ্রহণ কর! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকেই ভালবাসি! তোমা ছাড়া আর কিছু চাহি না।"

ভায়োলা একটী কথাও কহিলেন না। কিন্তু তাঁহার মুখখানিতে বিরক্তির ছায়া পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পাইল। প্রেমোন্মাদিনী ওলিভিয়া তথাপি বলিতে লাগিলেন, "সিজারিও, বিরক্তিভ্রুকুটী-রাশিতে পূর্ণ হইলেও ঐ মুখ খানিতে আমি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতেছি! আমি একান্ত তোমারই। তোমাকেই আত্মসমর্পণ করিয়াছি।"

ভায়োলা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আমি

আর আসিব না। প্রভু ইচ্ছা করেন, নিজে আসিয়া প্রণয় করুন। আমি আর তাঁহার দূতিগিরি করিতে আসিব না।"

ভায়োলা প্রস্থান করিলেন।

---

(৯)

এই সময় এক অভিনব ব্যাপার উপস্থিত হইল। ইলিরিয়া-রাজ অর্সিনো ব্যতীত অন্য এক ব্যক্তি ওলিভিয়ার প্রেমাভিলাষী হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও সে আশায় নিরাশ হইয়া অতি দুঃখে কালযাপন করিতেছিলেন।

সেই নিরাশ প্রেমিক শুনিলেন, গর্ব্বিতা ওলিভিয়া, সম্প্রতি অর্সিনোর এক ভৃত্যের প্রতি আসক্ত হইয়া তাহাকেই বিবাহ করিতে চায়। পূর্ব্ব হইতেই ঐ নিরাশ-প্রেমিক সকল সন্ধান রাখিতেছিলেন। এখন মনে মনে এক মতলব আঁটিয়া ভায়োলার আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যখন ভায়োলা ওলিভিয়ার গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে সহসা সেই ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বলিল, "তুমিই ওলিভিয়ার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী? এস, আমার সহিত তোমায় যুদ্ধ করিতে হইবে। পৃথিবীতে দুই ব্যক্তি ওলিভিয়ার প্রেমাকাঙ্ক্ষী থাকিতে পারে না। যদি বাঁচিয়া থাক, ওলিভিয়া তোমার।"

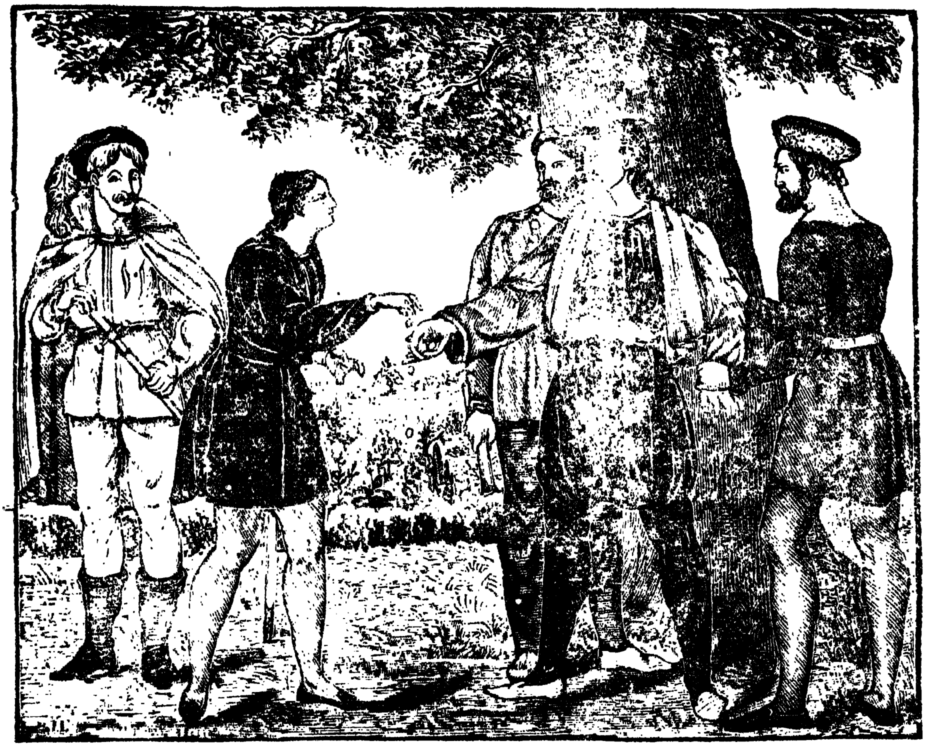
ভায়োলা সহসা এই প্রকার আক্রমণ দেখিয়া ভীত হইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলেন। তিনি আত্ম-গোপনের নিমিত্তই পুরুষবেশ ধারণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের কথায় একেবারে বসিয়া পড়িলেন। নিজের অসির প্রতি চাহিয়া যাহার ভয় হয়, যুদ্ধ কি তাহারে সাজে? একবার মনে করিলেন, 'আত্ম-পরিচয় প্রদান করি। আমি যে অবলা রমণী, এ ব্যক্তি তাহা জানে না। জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইব।' এইরূপ ভাবিতেছেন, পরক্ষণেই দেখিলেন, আর এক ব্যক্তি চকিতের ন্যায় সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং এই আসন্ন-বিপদে ভায়োলাকে রক্ষা করিলেন। এই নবাগত ব্যক্তি কে, ভায়োলা তাহা জানেন না এবং কেনই বা যে তিনি ভায়োলার পক্ষ-সমর্থন করিলেন, ভায়োলা তাহাও বুঝিলেন না। সেই নবাগত ব্যক্তি জলদগম্ভীর স্বরে ভায়োলার প্রতিদ্বন্দ্বীকে বলিলেন, "দেখ, সাবধান, এই যুবক যদি কোন প্রকারে তোমার অপকার করিয়া থাকে, তবে সে দোষ আমার মস্তকে চাপাইয়া আমার প্রতি যথেচ্ছা শাস্তিবিধান করিতে পার। কিন্তু যদি ইহাকে কিছু করিবে, আমি তোমাকে সহজে ছাড়িব না।"

ভায়োলা এই রহস্য কিছুই বুঝিলেন না। এই নবাগত ব্যক্তি যেন বহুদিনের পরিচিত ও কোন অকৃত্রিম সুহৃদের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন দেখিয়া, ভায়োলা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবেন, এমন সময় দেখিলেন, অন্য এক প্রবল শত্রুকর্ত্তৃক তাঁহার সেই অপরিচিত বন্ধু সহসা আক্রান্ত হইলেন। ঐ অপরিচিত ব্যক্তি পূর্ব্বে কোন গুরুতর অপরাধ করাতে রাজকর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন।

তখন সেই অপরিচিত ব্যক্তি ভায়োলাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "তোমার অন্বেষণে আসিয়া দেখ কি বিপদে পড়িলাম! এখন এক কাজ কর;—তোমার নিকট আমার যে অর্থ আছে, তাহা দাও। এখন বিশেষ আবশ্যক পড়িয়াছে। আমি এই বিপদে পড়িলাম বলিয়া তত দুঃখিত নহি; তবে তোমাকে, তোমার এই শত্রুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া যাইতে পারিলাম না, ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়!—তুমি এমন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলে কেন?"

ভায়োলা এই সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া ত অবাক্। তিনি পরিষ্কার করিয়া বলিলেন,

অপূর্ব্ব রহস্য।



"আপনি কে? আমি আপনাকে কখন দেখি নাই, চিনিও না। আপনি কবে আমার নিকট টাকা রাখিলেন? তবে আপনি আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন, এই জন্য আমার এই যৎসামান্য যাহা-কিছু আছে, আপনাকে প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন।"

ভায়োলার নিকট এইরূপ শুনিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়া যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "তুমি এমন নিষ্ঠুর ও অকৃতজ্ঞ-হৃদয়? আমি না তোমাকে মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচাইয়াছি? তোমার জন্যই ত এই ইলিরিয়া নগরে আসিয়া আমি এই বিপদে পড়িলাম! তুমি কি পূর্ব্ব-কথা সকলই বিস্মৃত হইলে?—এঁ্যা, আমাকে যে অবাক্ করিলে!"

রাজকর্ম্মচারীগণ আর অপেক্ষা করিল না সেই অপরাধীকে ধৃত করিয়া লইয়া গেল। যাইবার সময় তিনি আরও মর্ম্মান্তিক কষ্টে ভায়োলাকে পুনর্ব্বার বলিয়া গেলেন, "সিবাষ্টি-য়ান্, আমার এই বিপদের সময় তুমি আমাকে চিনিতেই পারিলে না? মানুষ এতই অকৃতজ্ঞ? অহো! তোমার এ ব্যবহার আমি জীবনে ভুলিব না।"

পাঠকের অবশ্যই স্মরণ আছে, ভায়োলার সহোদরের নাম—সিবাষ্টিয়ান্। এবং ইহাও স্মরণ আছে, দুই ভ্রাতা ভগিনীতে যমজ, এবং আকার ও অবয়বে, অধিক কি কণ্ঠস্বরেও পরস্পরের মধ্যে কোন ভিন্নতা ছিল না। ভায়োলা যখন শুনিলেন, সেই ব্যক্তি তাঁহাকে সিবাষ্টিয়ান্ বলিয়া সম্বোধন করিতেছে, ইচ্ছা

হইল, সকল বৃত্তান্ত স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করেন ; কিন্তু রাজকর্ম্মচারিগণ শীঘ্রই সে ব্যক্তিকে স্থানান্তরিত করিলে আর জিজ্ঞাসার সুবিধাও হইল না।

তখন তাঁহার মনে হইল, "তবে বোধ হয়, আমার ভ্রাতা জীবিত আছেন। এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাঁহার জীবনদাতা। আমি পুরুষবেশে, আমার সহোদর সিবাষ্টিয়ানের ন্যায় দেখিতে হইয়াছি। এই ব্যক্তি ভুলক্রমেই আমাকে সিবাষ্টিয়ান্ জ্ঞান করিয়া থাকিবে।" ভায়োলার মনে যুগপৎ বিস্ময় ও হর্ষ আন্দোলিত হইতে লাগিল।

---

(১০)

বস্তুতঃ ভায়োলার অনুমান সত্য। রাজকর্ম্মচারিগণ-কর্তৃক ধৃত সেই ব্যক্তির নাম—এ্যাণ্টোনিও। এ্যাণ্টোনিও এক জাহাজের অধ্যক্ষ। যখন ভায়োলা ও সিবাষ্টিয়ান্, দুই ভ্রাতা-ভগিনী মিলিয়া, জল-ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন, প্রবল ঝটিকায়, ইলিরিয়া নগরের নিকট যখন সেই জাহাজ জলমগ্ন হয়, সিবাষ্টিয়ান্ সমুদ্র-বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, এ্যাণ্টোনিও আপন জাহাজে তুলিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন। সেই অবধি এ্যাণ্টোনিওর সহিত সিবাষ্টিয়ানের একান্ত সৌহার্দ্দ। দু'য়ে এত ভাব ও ভালবাসা যে, সিবাষ্টিয়ান্ যেখানে যাইবে, এ্যাণ্টোনিও ছায়ার মত তাহার অনুগামী হইবেন। সিবাষ্টিয়ান্ একদিন ইলিরিয়া-রাজ অর্সিনোর রাজসভা দেখিতে ইচ্ছা করিলে, এ্যাণ্টোনিও তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নগরে আসিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে আসিয়া ঘোর সঙ্কটে পতিত হইলেন। এ্যাণ্টোনিও ইতিপূর্ব্বে বিবাদ-সূত্রে ইলিরিয়া-রাজের এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে আহত করিয়াছিলেন ; তিনি জানিতেন, যদি কখন কোন রাজ-কর্ম্মচারী তাঁহার সন্ধান পায়, তবে তাঁহার ঘোর বিপদ। —তাহা জানিয়াও কিন্তু প্রিয়বন্ধু সিবাষ্টিয়ানের অভিলাষ পূরণার্থ ইলিরিয়া নগরে আসিয়াছিলেন। রাজপুরুষগণও সন্ধান পাইয়া অপরাধীকে ধৃত করিয়া কারারুদ্ধ করিল।

এ্যাণ্টোনিও ও সিবাষ্টিয়ান্ ইলিরিয়া নগরে আসিলে, এ্যাণ্টোনিও বলিলেন, "সিবাষ্টিয়ান্, তুমি জান, এই নগরে কেহ আমাকে দেখিতে পাইলে কি বিপদ! দেখ, আমি এখানকার এই হোটেলটায় কোন রকমে অবস্থান করি, তুমি এই সুযোগে নগর ভ্রমণ করিয়া আমার সহিত সম্মিলিত হইতে পারিবে। আর এই অর্থ গ্রহণ কর, তোমার যাহা ক্রয় করিতে অভিলাষ হয়, ক্রয় করিও।"

এ্যাণ্টোনিও একটা হোটেলে অবস্থান করিলেন, সিবাষ্টিয়ান্ নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইল, সিবাষ্টিয়ান্ তথাপি ফিরিলেন না দেখিয়া, এ্যাণ্টোনিও চিন্তিত মনে তাঁহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত বাহির হইলেন। তখন নিজের বিপদকে বিপদ জ্ঞান করিলেন না। পথিমধ্যে যখন ভায়োলা ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীতে সংগ্রামের উপক্রম হইতেছিল, এ্যাণ্টোনিও সহসা সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং পুরুষ-বেশধারিণী ভায়োলাকে সিবাষ্টিয়ান্ ভ্রমে, তৎপক্ষ অবলম্বন করিলেন। পরে রাজপুরুষগণ কর্তৃক ধৃত হইলে, ভায়োলার নিকট অর্থ চাহিলেন ; কিন্তু ভায়োলার নিকট যেরূপ উত্তর পাইলেন ; তাহাতে বিস্মিত হইলেন। ভায়োলাকে সিবাষ্টিয়ান্ বলিয়া ভ্রম হওয়াতেই, ভায়োলাকে অকৃতজ্ঞ ও নিষ্ঠুর বলিয়া যে তিনি ভর্ৎসনা করিবেন ও মর্ম্মাহত হইবেন, ইহা কিছু বিচিত্র নহে।

যখন রাজপুরুষেরা এ্যাণ্টোনিওকে লইয়া চলিয়া গেল, ভায়োলার ভয় হইল, পাছে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আবার সংগ্রামের জন্য

তাঁহাকে আহ্বান করে। কারণ, সে ব্যক্তি, তখনও সেখানে দাঁড়াইয়া। ভায়োলা ভয়বিহ্বলচিত্তে সত্বর সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

(১১)

ভায়োলা প্রস্থান করিলে পর, সিবাষ্টিয়ান্ হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইলেন। ভায়োলার সেই প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিল, ওলিভিয়ার প্রেমাকাঙ্ক্ষী সেই সিজারিও কি ভাবিয়া আবার আসিয়াছে। উভয়ের আকার-প্রকার, চাল-চলন বেশ-ভূষার ত কোন পার্থক্য নাই। তখন সেই প্রতিদ্বন্দ্বী সিজারিও-ভ্রমে সিবাষ্টিয়ানকে আক্রমণ করিল। সিবাষ্টিয়ান্ এই অপরিচিত ব্যক্তির সহসা আক্রমণের কোন কারণ বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু তথাপি তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন, আত্মরক্ষা করিয়া শেষে অসি নিষ্কাসিত করিলেন।

সেই সময় হঠাৎ ওলিভিয়া সেইখানে উপস্থিত হইলেন। ওলিভিয়া, সিবাষ্টিয়ানকে আপনার পরম প্রেমাস্পদ সিজারিও জ্ঞানে সম্ভাষণ করিলেন। বলিলেন, "প্রিয়তম, তুমি এমন বিপদে পড়িয়াছ! এজন্য আমি যার-পর-নাই দুঃখিত। এখন এস, হৃদয়েশ! গৃহে যাই।"

সিবাষ্টিয়ান্ অধিকতর বিস্মিত হইলেন,—"এ রমণী কে? আমায় বা কেন ডাকে! কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া বিনা আপত্তিতে তিনি ওলিভিয়ার গৃহে উপস্থিত হইলেন। ওলিভিয়ার যত্নে ও সদ্ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত প্রীত হইলেন। ওলিভিয়াও এবার আশাধিক সন্তোষলাভ করিলেন। কেন না, পূর্ব্বে সিজারিও, প্রণয়-সম্ভাষণে কিছু বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখন ত আর সে ভাব নাই। পাঠক কিন্তু অবশ্যই সকল রহস্য বুঝিতেছেন। এ ব্যক্তি কিছু ভায়োলা বা সিজারিও নহে,—তাঁহার সহোদর সিবাষ্টিয়ান্। ওলিভিয়া সিজারিও-জ্ঞানে, সরল মনে প্রণয়ীকে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। সিবাষ্টিয়ানের মনে কিন্তু যুগপৎ বিস্ময় ও কৌতূহল জাগিতে লাগিল; তিনি এ অপরিচিতা সুন্দরীর এবংবিধ ব্যবহারে একান্ত প্রীত হইলেন।

কিন্তু মনে একটা খট্‌কা লাগিল। সিবাষ্টিয়ান্ ভাবিতে লাগিলেন, "আমি এ রমণীর সম্পূর্ণ অপরিচিত, অথচ নিতান্ত পরিচিত অন্তরঙ্গের ন্যায় ইনি আমার সহিত ব্যবহার করিতেছেন! আমি ত মনে-জ্ঞানে কখনও ইহাঁর প্রেমাকাঙ্ক্ষী হই নাই। প্রেমাকাঙ্ক্ষী হওয়া দূরে থাক্, কখন ইহাঁকে চক্ষেও দেখি নাই। অথচ ইহাঁর কথাবার্ত্তায় বোধ হইতেছে, যেন পূর্ব্ব হইতেই ইনি আমাকে ভালবাসেন! —ইহার তাৎপর্য্য কি?—তবে কি এ রমণী উন্মাদিনী? তাই বা বলি কেমন করিয়া? এই সুন্দর অট্টালিকা, এই মহামূল্য বৈভব, এই সকল দাস-দাসীর সেবাশুশ্রূষা, সকলই ত ইনি সুচারুরূপে উপভোগ করিতেছেন! কৈ, ইহার মধ্যে, কোথাও ত কিছু বিশৃঙ্খলা দেখিতেছি না। আমার প্রতি প্রণয় স্থাপন, ইহাই কি কেবল ইহাঁর উন্মত্ততা? কিছুই যে বুঝিতে পারিতেছি না।"

ওলিভিয়া দেখিলেন, সিজারিও এক্ষণে তাঁহার প্রণয়-ফাঁদে পড়িয়াছেন;—কিন্তু কি জানি, যদি এ ভাব অধিককাল স্থায়ী না হয় এই ভাবিয়া বলিলেন, "প্রিয়তম, আমার ইচ্ছা, আজি এই শুভ মুহূর্ত্তে তোমায় আমায় পবিত্র পরিণয়-বন্ধনে বদ্ধ হই। আমার এখানে পুরোহিত স্বয়ং উপস্থিত আছেন। তোমার মত কি?"

সিবাষ্টিয়ান্ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কলের পুতুলটীর মত সম্মতিপ্রকাশ করিলেন। সেই দিনই উভয়ের পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

সিবাষ্টিয়ান্ এইরূপে রূপবতী ভার্য্যা লাভ করিয়া বিশেষ সুখী হইলেন, এবং সেই সুখের কথা বলিবার জন্য প্রিয়বন্ধু এ্যাণ্টোনিওর নিকট যাইতে মনঃস্থ করিলেন। অতএব প্রিয়তমার নিকট ক্ষণকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহের বাহির হইলেন।

---

(১২)

ইতিমধ্যে ইলিরিয়া-রাজ অর্সিনো ওলিভিয়ার গৃহাভিমুখে আসিতেছিলেন, ভায়োলাও সঙ্গে ছিলেন। সেই সময় তাঁহারা দেখিলেন, রাজকর্ম্মচারিগণ এক ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া আনিতেছে। যখন তাহারা এ্যাণ্টোনিওকে রাজার সম্মুখে উপস্থিত করিল, এ্যাণ্টোনিও রাজার সহিত ভায়োলাকে দেখিতে পাইয়া, এখনও ভায়োলাকে পূর্ব্বের ন্যায় সিবাষ্টিয়ান্ ভাবিয়া বলিতে লাগিল, "মহারাজ, এই অকৃতজ্ঞ-হৃদয় যুবককে আমি সমুদ্র-বক্ষ হইতে বাঁচাইয়াছি, এবং নানা প্রকারে ইহার উপকার করিয়াছি; আজি এ পাষণ্ড আমাকে চিনিতে পারিতেছে না। অহো, কি কৃতঘ্ন! আজি তিন মাসকাল রাত্রিদিন আমরা উভয়ে একত্র অবস্থান করিয়াছি।"

এই সময় ওলিভিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সেই খানে উপস্থিত হইলেন। বন্দীর কথা রাজার আর কর্ণগোচর হইল না। তিনি হর্ষভরে বলিয়া উঠিলেন, "রাজ্ঞী স্বয়ং উপস্থিত! আ মরি মরি! কি রূপ! কি মাধুরিমা! ধরা-বক্ষে বুঝি বা স্বর্গের পারিজাত ফুটিয়া উঠিল!—কর্ম্মচারিগণ, তোমরা এই বন্দীকে এখান হইতে লইয়া যাও;—এ ব্যক্তি উন্মাদের ন্যায় প্রলাপ করিতেছে। এই যুবক—বিশ্বস্ত সিজারিও আজি তিনমাস কাল আমারই নিকট আছে!" এ্যাণ্টোনিওকে লইয়া কর্ম্মচারিগণ প্রস্থান করিল।

ওলিভিয়া, ভায়োলাকে দেখিতে পাইয়া, আপনার স্বামী সিজারিও জ্ঞানে তাঁহাকে প্রণয়-সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। অর্সিনো তাহা দেখিয়াই কোপ-প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। ওলিভিয়ার প্রেমালাপ ও মধুর-বচন হইতে ইলিরিয়া-রাজ সকলই বুঝিলেন। বুঝিলেন যে, বিশ্বাসঘাতক সিজারিও তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে,—তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়া আপনি ওলিভিয়ার প্রণয়াস্পদ হইয়াছে; ক্রোধে, দুঃখে অপমানে, অভিমানে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তিনি তখনই সে স্থান ত্যাগ করিলেন। যাইবার সময় অতি দৃঢ়তার সহিত বলিয়া গেলেন, "সিজারিও, ইতিপূর্ব্বে সেই বন্দী তোমাকে অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া গিয়াছে। আমিও এক্ষণে তাহাই বলিতেছি। বালক, তোমার এতদূর সাহস? এস, ইহার সমুচিত শাস্তি-বিধান করিব।"

রাজার সেই ক্রোধপূর্ণ বাক্যে বোধ হইল, যেন ভায়োলার মৃত্যু সন্নিকট। ভায়োলা কিন্তু মনে মনে বুঝিলেন, তাঁহার কোন ভয় নাই,—কারণ তিনি নিষ্পাপ। অধিকন্তু রাজা জানেন, ভায়োলা পুরুষ; কিন্তু যখন জানিবেন, ভায়োলা রমণী, আর সেই ক্ষুদ্র বুকটীতে যত ভালবাসা থাকিতে পারে, সমস্তই সে রাজাকে অযাচিত-ভাবে সমর্পণ করিয়াছে, তখন কি রাজা শাস্তির কথা আর মুখে আনিতে পারিবেন? বুঝি, ভায়োলা এইরূপ বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহার কোন ভয় হইল না।

ওলিভিয়া কিন্তু মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইলেন। ভায়োলাকে রাজার অনুসরণ করিতে দেখিয়া বলিলেন, "প্রিয়তম, সিজারিও! কোথায় যাও?"

সিজারিও-ও অম্লানবদনে উত্তর করিলেন, "আমি আপন জীবন অপেক্ষাও যাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহারই সঙ্গে যাইতেছি!"

ওলিভিয়া ভাবিলেন, রাজা নিশ্চয়ই তাঁহার স্বামীর প্রাণদণ্ডের জন্ম লইয়া যাইতেছেন। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। পুরোহিত উপস্থিত হইলেন। সিজারিও যে ওলিভিয়ার স্বামী, পুরোহিত তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। বলিলেন, "বড় জোর দুই ঘণ্টা মাত্র অতীত হইয়াছে, আমি সিজারিওর সহিত ওলিভিয়ার বিবাহ দিয়াছি।"

সিজারিও তাহা অস্বীকার করিলেন; কহিলেন, "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, ওলিভিয়াকে বিবাহ করি নাই।"

রাজা কিন্তু বিশ্বাস করিলেন, তাঁহার ভৃত্য সিজারিও নিশ্চয়ই ওলিভিয়াকে বিবাহ করিয়াছে এবং এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহার সেই জীবন-সর্ব্বস্ব, বহুদিনের বাঞ্ছিত ধনকে তাঁহার হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছে। কিন্তু যাহা হইবার, তাহা ত হইয়াছে, আর সে চিন্তায় ফল কি? একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ইলিরিয়া-রাজ অতি কষ্টে কহিলেন, "ওলিভিয়া! জানিলাম, তুমি অবিশ্বাসিনী,—তাই এই শেষ বিদায়!—আর তুই প্রভুদ্রোহী, অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক সিজারিও! ওঃ! পিশাচ, তোকে আর কিছু বলিব না,—তুই আর কখন তোর ঐ কুসুমাবৃত ভুজঙ্গ-হৃদয় লইয়া আমার সম্মুখে আসিস নে! পাপিষ্ঠ, তুই এই মুহূর্ত্তে এখান হইতে দূর হ'!"

ইত্যবসরে আর এক নূতন দৃশ্যের আবির্ভাব হইল। ঠিক সিজারিওর-ন্যায়-আকৃতি আর এক ব্যক্তি হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া, ওলিভিয়াকে পত্নী সম্বোধন করিল!

উপস্থিত সকলেই তুল্যাকৃতি দুই সিজারিওর প্রতি অবাক্ হইয়া, নির্নিমেষ-নয়নে চাহিয়া রহিল!

---

(১৩)

পাঠককে বোধ হয় আর বলিতে হইবে না,—এই নূতন সিজারিও অন্য কেহ নহেন,—ওলিভিয়ার স্বামী ও ভায়োলার সহোদর সেই সিবাষ্টিয়ান্!

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ দুইজনের এক আকৃতি, এক গঠন, এক পরিচ্ছদ, এক চাল-চলন,—সকলই একরূপ দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল। এদিকে ভায়োলা ও সিবাষ্টিয়ান্,—পরস্পরের মধ্যে পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা হইতে লাগিল। কারণ, ভায়োলা দৃঢ়বিশ্বাস করিতে পারে নাই যে, তাঁহার সহোদর জীবিত আছেন; এবং সিবাষ্টিয়ান্‌ও ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার ভগিনী জলমগ্না হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।—বিশেষ ভায়োলা যদি জীবিত থাকিবে, তবে সে এমন পুরুষবেশে এখানেই বা কোথা হইতে আসিবে? উভয়ের মনোমধ্যে এইরূপ বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। শেষে সকল রহস্যই প্রকটিত হইল। ভ্রাতা-ভগিনীর আর আনন্দের অবধি রহিল না। যথাসময়ে এ্যান্টোনিও-ও কারামুক্ত হইয়া সকল রহস্য অবগত হইলেন। ভ্রাতা-ভগিনীর তুল্যাকৃতি হইতে যে সকল ভ্রম হইয়াছিল, যখন তাহা তিরোহিত হইল, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ ওলিভিয়াকে লইয়া হাস্য-পরিহাস আরম্ভ করিয়া দিল। কেন না, তিনি অবলা রমণী হইয়া, পুরুষজ্ঞানে ছদ্মবেশিনী রমণীর প্রণয়াভিলাষিণী হইয়াছিলেন! নারীতে নারীতে স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ,—কৌতুক মন্দ নয়। কিন্তু ওলিভিয়া ইহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন না, ভগিনীর পরিবর্ত্তে না হয় ভাইকেই পাইয়াছেন,—লাভ বৈ ক্ষতি ত নাই!

ওলিভিয়ার এইরূপ বিবাহ হওয়াতে ইলিরিয়া-রাজ অর্সিনোর সকল আশা-ভরসা তিরোহিত হইল। তিনি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন।

কিন্তু যখন তাঁহার সেই স্নেহাস্পদ ভৃত্য—সিজারিও বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া রমণী-মূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন,—আ মরি মরি! কি ভুবন-মোহন রূপ! বিধাতা বুঝি নির্জ্জনে এ রূপের-প্রতিমা গড়িয়াছিলেন!—অর্সিনো নির্নিমেষ-নয়নে, হরষিত-মনে সে রূপ-সুধা পান করিতে লাগিলেন।

---

(১৪)

স্রোত ফিরিল। অর্সিনো ওলিভিয়াকে ছাড়িয়া ভায়োলাকে মন প্রাণ সমর্পণ করিলেন। তখন অনেক দিনের অনেক কথা রাজার স্মৃতিপথে আসিতে লাগিল। ভায়োলা কতবার কত প্রকারে তাঁহাকে জানাইয়াছে,—রাজাকে সে বড়—বড় ভালবাসে;—প্রতি কথায়, প্রতি ইঙ্গিতে জানাইয়াছে, অর্সিনোর মূর্ত্তি তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় টুকুতে ভরিয়া আছে! কিন্তু তবুও বুকের আগুন বুকে চাপিয়া, অতি বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় রাজার সকল আদেশ কেমন পালন করিয়া আসিয়াছে! এইরূপ অতীতের স্মৃতি রাজার মনে যত জাগরূক হয়, ততই তিনি ভায়োলার গুণে মুগ্ধ হইতে থাকেন। ভায়োলাকে তখনও তিনি 'সিজারিও" "বালক" বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন। হৃদয়ের পূর্ণ আবেগে কহিলেন, "সিজারিও, এতদিন আত্ম-গোপন করিয়া যথাথই তুমি বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত অনুচরের ন্যায় আমার সেবা করিয়া আসিয়াছ এবং এ পর্য্যন্ত আমাকে প্রভু বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছ;—আজি হইতে আমি যথার্থই তোমার প্রভু হইলাম,—এবং প্রাণাধিকে, আজি হইতে তুমি ইলিরিয়া রাজ্যের রাণী হইলে!"

এ প্রস্তাবে উপস্থিত সকলেই সুখী হইলেন। ওলিভিয়ার মনেও আনন্দ আর ধরে না। নিরাশ-প্রণয়ী ইলিরিয়া-রাজ যে স্বেচ্ছায়, সানন্দে ভায়োলাকে বিবাহ করিতেছেন, ইহাতে তিনি আন্তরিক সুখী হইলেন, এবং সকলকে আপন গৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই দিনেই শুভলগ্নে ইলিরিয়া-রাজ আসনোর সহিত ভায়োলার শুভ-উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

সমুদ্রে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া দুরদৃষ্ট-বশে, প্রবল ঝটিকায় জাহাজ জলমগ্ন হওয়ায়, দুই ভ্রাতা-ভগিনী পরস্পর পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন,—কেহ কাহারও জীবনের আশা করেন নাই; আজি অতুল আনন্দে ও একান্ত সুখে উভয়ে অপার ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া মনোমত পতি-পত্নী লাভ করিলেন। ইলিরিয়া-রাজ অর্সিনোকে বিবাহ করিলেন—ভায়োলা, এবং পরম রূপবতী ও ধনবতী ওলিভিয়াকে বিবাহ করিলেন,—সিবাষ্টিয়ান্।

রতনে রতন মিলিল।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

বুদ্ধদেব।

বুদ্ধদেবের প্রব্রজ্যা।

সিদ্ধার্থ একক;—ঊর্দ্ধে নীরব আকাশ
বসন্তের নিরোপম সুনীল বিস্তৃত;
নিম্নে হিমালয়-সুতা নির্ম্মল-সলিলা
অনোমা সুনীলা ধারা নীরবে বাহিতা।
নীরব আম্র-কাননে অনোমার কূলে
সিদ্ধার্থ একক; দাস দাসী অনুচর
ছিল শত সংখ্যাতীত বেষ্টিয়া যাহায়,
নক্ষত্রে বেষ্টিয়া শশী; ছিল অট্টালিকা
সুখ সম্ভোগে পূরিত; আজি সে একক।

রাজপুত্র, যুবা, দেহ শিরীষ-কুসুম-
সুকুমার সুকোমল, অভাব-উত্তাপ
করে নাই যেই অঙ্গ পরশ কখন
আজি সে একক এই বিপুল সংসারে ;
অনন্ত আকাশ তলে, আশ্রয়বিহীন !
সুচিকুরে সুবাসিত সজ্জিত মস্তক
এবে কেশহীন ; রত্ন কারুকার্য্যময়
বসন ভূষণ চারু শোভিত যে দেহে
এবে ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড কর্কশ মলিন।
হায় ! রাজপুত্র এই ভিখারীর বেশে
কোথা যাবে, কোন্ পথে যাইবে কেমনে ?
মানবের অন্নদাতা মাগিবে কেমনে
অন্নজল ; অন্নজল কে দিবে তাহারে ?
কিছুক্ষণ বসি যুবা আম্রবৃক্ষ মূলে,
মনোমার উপকূলে, উষার আলোকে
চাহিয়া প্রশান্ত মুখে নব বসন্তের
নব দিবসের চারু নয়ন উন্মেষ
ভাবিলেন ; দেখিলেন অতীতের পটে
সুখের কৈশোর, ক্রীড়া নব-যৌবনের—
পূরব-গগনে ক্রীড়া নব দিবসের,—
উষা-স্বরূপিণী গোপা, অঙ্কেতে তাহার
শিশুর সে সদ্যমুখ, উষার কুসুম
সদ্য সিক্ত নিরমল ; প্রভাত আকাশ
জনকের জননীর পবিত্র হৃদয়
স্নেহ নীলামৃতে ভরা অনন্ত অসীম।
নয়ন হইল সিক্ত, হইল হৃদয়
সিক্ত উচ্ছ্বাসের শান্ত করুণ প্রবাহে।
ধীরে ধীরে অতীতের পট মনোহর
হইলে অন্তর, ধীরে হইলে অন্তর
উষার মাধুরী শোভা, দেখিলা যুবক
নব রবিকর দীপ্ত আকাশের মত
অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ অনন্ত বিস্তৃত,—
পথহীন, ছায়াহীন, মরুভূমি মত।
এই মহা মরুভূমে— সিদ্ধার্থ একক !
দেখিলা মরুর প্রান্তে সিদ্ধার্থ কেবল
চারু উপবন এক ; শীতল ছায়ায়
শান্ত সরোবর তীরে জরা-ব্যাধিহীন
অনন্ত মানব শান্তি লভিছে নির্ম্মল।
ওকি মরীচিকা ? হায় ! অতিক্রমি মরু
কোন্ পথে, কত দিনে, যাইবে কেমনে
সিদ্ধার্থ সে উপবনে ? ছুটিল যুবক
চাহি উপবন পানে প্রফুল্ল বদনে
বেগে কারামুক্ত বন-বিহঙ্গের মত।
পূরব-দক্ষিণ মুখে নবীন সন্ন্যাসী
চলিলেন, নাহি জ্ঞান কোথায়, কেমনে
পদে পদে পদতল রক্ত শতদল
হইতেছে ক্ষত তৃণে মৃত্তিকায় দৃঢ়
নাহি জ্ঞান, বহিতেছে স্বেদ দরদর।
পথে শাকী, পদমা, ঋষি রৈবত আশ্রমে
লইয়া আশ্রয় ক্রমে বৈশালী নগরে
হইলেন উপনীত নবীন সন্ন্যাসী।
আরাড় কালাম ঋষি শিষ্যগণে ডাকি
কহিলেন, "দেখ ! দেখ ! অপরূপ রূপ !
কি আকৃতি মনোহর মনোমুগ্ধকর !"
তিন শত শিষ্য সুখে বেষ্টি ঋষিবরে
করিতেছে অধ্যয়ন। প্রণমি চরণে
সিদ্ধার্থ শিষ্যত্ব তাঁর করিলা গ্রহণ।
সমগ্র দর্শনশাস্ত্র করি সমাপন
দেখিলা সিদ্ধার্থ জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি
নির্ব্বাণের পথ নাহি সাধ্য দর্শনের
করে প্রদর্শন ; ছাড়ি বৈশালী সুন্দরী—
অতিক্রমি ভাগীরথী ; নিরাশ হৃদয়ে
পশিলেন "রাজগৃহে" পুরি মগধের।
সৌন্দর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে শৌর্য্যে ভারতে অতুল
রাজগৃহ, সুসজ্জিত রাজগৃহ সম
মনোহর শোভাময়। দক্ষিণ সীমায়
নীলাকাশে তুলি নীল বপু শিলাময়
শোভে পঞ্চ শৈল পঞ্চ প্রহরী ভীষণ
বেষ্টি চক্রাকারে সেই গিরিব্রজপুর
জরাসন্ধ নৃপতির খ্যাত রাজধানী,

দ্বাপরে ভারত বক্ষে কৃষ্ণ-ছায়া যার
করেছিল সমাচ্ছন্ন সবভ্র জলদ।
শৈলসুতা সরস্বতী চারু নির্ঝরিণী
বহি বহু নির্ঝরে সুধা সুশীতল,
বহিতেছে তর তর শৈল-পাদমূলে
ভক্তি যথা দেব পাদমূলে প্রবাহিতা।
দেখিলেন শাক্যসিংহ রহিয়াছে পড়ি—
ভগ্নশেষ রাজপুর, যথা ভস্মরাশি
শ্মশানে কঙ্কাল সহ, রহিয়াছে পড়ি
সেই মহারঙ্গভূমি, মৃত্তিকা মস্তণ
সে মহাক্ষেত্রের ; আর রহিয়াছে পড়ি
শৃঙ্গবাহি সে প্রাচীর, কারাগারে যার
অশীতি নৃপতি ছিল রুদ্ধ পরাক্রমে।
আরোহি পাণ্ডব শৈল দেখিলা কুমার
খুলিয়া প্রকৃতি দেবী কি শোভা ভাণ্ডার
রেখেছেন চারিদিকে ললিত-ভৈরব।
ভীষণ গগনস্পর্শি শৈল ছায়াতলে
একদিকে রাজগৃহ পুষ্পোদ্যান সম
শোভিতেছে নিরুপম ; ক্ষুদ্র পুষ্প বৃক্ষ
বিশাল বিটপিচয় বসন্তে পুষ্পিত,
সংখ্যাতীত রাজবর্ত্ম বঙ্কিম সরল
সুপ্রশস্ত ছায়ান্বিত, চারু ক্ষুদ্র পথ
উদ্যানের, সুরঞ্জিত চারু হর্ম্যাবলী
নানা বর্ণে অবয়বে শোভিতেছে যেন
বিচিত্র কুসুমচয়, শোভিছে দীর্ঘিকা
উদ্যানের অঙ্কে অঙ্কে শ্যাম মনোহর,
মরকত-বিমণ্ডিত আরসির মত।
চারিদিকে যত দূর যাইতেছে দেখা
শ্যাম সমতল ক্ষেত্র, চারু আচ্ছাদিত
বসন্তের নীলাকাশে মহা চক্রাকারে।
স্থানে স্থানে আম্রবন শোভিছে সুন্দর,
শোভিছে সুন্দর স্থানে স্থানে গ্রামাবলী,
শ্যামল সাগরে শ্বেত শ্যাম দ্বীপপুঞ্জ
ক্ষুদ্র মনোহর। ফেনপুঞ্জ শ্যামার্ণবে
স্থানে স্থানে পালে পালে শোভিছে গোপাল
বসন্তের নীলাকাশে ছায়াপথ মত
শোভিতেছে পুণ্যস্রোত নদ পঞ্চানন
দক্ষিণে শ্যামল ক্ষেত্রে ঘুরিয়া ফিরিয়া,
লুকাইয়া প্রকাশিয়া ; উত্তরে দক্ষিণে
শোভিতেছে শৈলদ্বয়, উভয় একক,
প্রাচীন কৃষ্ণাভ উচ্চ দেবালয় মত।
অস্তমিত দিনমণি ; দেখিলা কুমার
নীরব, নির্জ্জন, স্থির, শান্ত প্রকৃতির
শ্যামবক্ষে সন্ধ্যা ধীরে মাখিতেছে ছায়া
শান্তিময়ী সুগম্ভীরা সুকোমল কায়।
নীরব, নির্জ্জন, স্থির, বিশ্ব চরাচরে,
নীরব, নির্জ্জন, স্থির, শৈলের শেখরে
সিদ্ধার্থ একক সন্ধ্যা গগনের তলে।
প্রকৃতির শান্তমূর্ত্তি করিল সঞ্চার
সিদ্ধার্থের হৃদয়েতে শান্তি সুশীতল।
হইলা সিদ্ধার্থ ধীরে ধ্যানে নিমজ্জিত
কুমার প্রভাতে ধীরে পশিলা নগরে
নতশির, ছিন্নবাস, ভিক্ষাপাত্র করে।
কুজ্ঝটিকা ঢাকা স্বর্ণ গিরি শৃঙ্গ মত
সুদীর্ঘ উন্নত দেব-মহিমা-মণ্ডিত
নবীন সন্ন্যাসী মূর্ত্তি, বিস্তৃত নয়ন
কমল কোরক নীল, বিস্তৃত ললাট
প্রভাত-গগন-সম শান্ত সমুজ্জ্বল,
বিস্তৃত উরস অংশ, নাগরিকগণ
দেখিয়া হইল মুগ্ধ। গৃহকার্য্য গৃহী,
পথিক গন্তব্য স্থান, বণিক্‌ বিক্রয়,
মাতা স্তন্যপায়ী শিশু, শিশুগণ ক্রীড়া
ছাড়িয়া রহিল চাহি চিত্রার্পিত মত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

নান্নুর।

নান্নুরের এখন কিছুই নাই,—নাম পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ রূপান্তর-প্রাপ্ত; নান্নুর এখন নান্দুর বা নানুর;—তবু নান্নুরের ন্যায় সৌভাগ্য অল্প স্থানেরই আছে। নান্নুরে অট্টালিকা নাই, উত্তম পথ-ঘাট নাই, উৎকৃষ্ট বিপণাপণ নাই,—নান্নুর তথাপি সৌভাগ্যশালী। নান্নুর তৃণ-গৃহ-ভূয়িষ্ঠ একটী নাতিবৃহৎ নাতিক্ষুদ্র পল্লী-গ্রাম। কিন্তু নান্নুরের সৌভাগ্য নগরেও নাই। এই নান্নুরের বর্ত্তমান পরিচয় অদ্য কিঞ্চিৎ প্রদান করিব।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে লুপলাইন রেলপথে বোলপুর ষ্টেশন; বোলপুর বর্দ্ধমান হইতে ১৭ ক্রোশের অধিক নহে। বোলপুর হইতে পূর্ব্বমুখে ৫॥০ ক্রোশ রাজপথ অতিক্রম করিলেই নান্নুর গ্রাম। নান্নুর এখন বীরভূম জেলার অন্তর্গত। পূর্ব্বে কখন বীরভূম, কখন বর্দ্ধমান, কখন বা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গতও ছিল।

নান্নুর অতি প্রাচীন লোকালয়। বঙ্গ বা গৌড়দেশে তীর্থস্থান ব্যতীত এতাদৃশ প্রাচীন লোকালয় আর নাই,—এ কথা ঐতিহ্য-প্রমাণ-বলে * অসঙ্কোচে বলা যায়। যদিই থাকে ত এক বোলপুর আছে † পুণ্যশ্লোক নলরাজা অযোধ্যাধিপতি ঋতুপর্ণের সমকাল-বর্ত্তী। ঋতুপর্ণ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্বতন চতুর্দ্দশ পুরুষেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। ‡

নান্নুরে সেই নলরাজের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ আছেন, তাঁহার প্রচলিত নাম—নৈষধেশ্বর। একটী জলাশয় আছে, তাহার নাম নলগড়। লোক-প্রবাদ,—সেই জলাশয়টী নলকৃত নগর-পরিখারই লুপ্তাবশিষ্টচ্ছায়া। ভূগর্ভে অনেক পুরাতন ইষ্টকাময় ভিত্তিশেষ এখনও সেখানে মাঝে মাঝে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান নান্নুর-গ্রামের পশ্চিমভাগেই নল-রাজার এই সব কীর্ত্তিচিহ্ন আছে। এখন তৎসমীপে মুসলমানগণের বাসভূমি। কথিত আছে,—মুসলমানেরা এই নৈষধেশ্বর শিবের সম্মুখভূমিতে অত্যাচার-উপদ্রব করিত, অত্যা-চারকারীরা এক্ষণে প্রায় নির্ব্বংশ অথবা স্থানান্তরিত হইয়াছে।

আমি সম্ভাবনা করি, 'নান্নুর' শব্দটী 'নলপুর' শব্দেরই সংক্ষিপ্ত অপভ্রংশ। বীর-ভূম নামও বোধ হয় নলপিতা মহারাজ বীর-সেনের নাম হইতে উদ্ভূত।

শাস্ত্রে দেখা যায়, বীরসেনের বা নলের রাজ্য নিষধদেশে; নিষধদেশ বর্ত্তমান দক্ষিণা-পথের অন্তর্গত। বীরভূম-প্রদেশে নলের রাজ্য এ কথা অসঙ্গত বলিয়াই বোধ হইতে পারে বটে; কিন্তু এমনও ত হওয়া বিচিত্র নহে যে, নিষধাধিপতি নাগপুরের মধ্য দিয়া আসিয়া

---

* পৌরাণিকেরা 'ঐতিহ্য'কে প্রমাণ বলিয়া মান্য করেন। ঐতিহ্যের চলিত অর্থ—প্রবাদ। প্রবাদ দ্বিবিধ হইতে পারে;—এক, অন্যপ্রমাণ-বিরুদ্ধ; অপর, অন্য-প্রমাণের অবিরুদ্ধ। শেষোক্ত প্রবাদই 'ঐতিহ্য' প্রমাণ।

† রাজ্যভ্রষ্ট সুরথরাজা বলিপ্রদান সহকারে মৃণ্ময়ী প্রতিমায় মহামায়ার পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের পুরাতন নাম বলিপুর। 'বোলপুর' বলিপুরেরই অপভ্রংশ। এখানে অদ্যাপি সুরথেশ্বর শিব আছেন। একজন পণ্ডিত বলেন, সুরথের মৃণ্ময়-প্রতিমা-নির্ম্মাণ হইতেই, বাঙ্গালাদেশে মৃণ্ময়-প্রতিমা-নির্ম্মাণ সুপ্রচলিত। সুতরাং প্রবাদটী সমূলকই বোধ হয়।

‡ ঋতুপর্ণো নলসহায়োঽক্ষহৃদয়জ্ঞোঽভূৎ। ঋতু-পর্ণপুত্রঃ সর্ব্বকামঃ, তত্তনয়ঃ সুদাসঃ, সুদাসাৎ সৌদাসো মিত্রসহনামা। (তৎপুত্রঃ) অশ্মকনামাভবৎ। অশ্মকস্য মূলকো নাম পুত্রোঽভবৎ। মূলকাদ্দশরথঃ, তস্মাদিলি-বিলঃ, ততশ্চ বিশ্বসহঃ, তস্মাচ্চ খট্বাঙ্গো দিলীপঃ। খট্বাঙ্গতো দীর্ঘবাহুঃ পুত্রোঽভবৎ। ততো রঘুঃ, তস্মাদপ্যজঃ, অজাদ্দশরথঃ, দশরথস্যাপি শ্রীভগবানব্জ-নাভো জগৎস্থিত্যর্থমাত্মাংশেন রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন-রূপিণা চতুর্দ্ধা পুত্রত্বমযাসীৎ।

(বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ৪র্থ অধ্যায়।)

এই প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। তৎকালে প্রবল রাজাদের দিগ্বিজয়-প্রথা ত সুপ্রচলিতই ছিল।

পুরাণে দুইজন নলরাজার পরিচয় পাওয়া যায়;—একজন নিষধদেশাধিপতি এবং একজন অযোধ্যাধিপতি; অথচ দুইজনেই নৈষধ। এক নলরাজা নিষধদেশ সম্ভূত বলিয়া নৈষধ, আর এক নল নিষধ-রাজার পুত্র বলিয়া নৈষধ। যিনি নিষধ-দেশাধিপতি, তিনিই বীরসেন-পুত্র। বীরভূম নামের সহিত বীরসেন নামের প্রকৃত সম্বন্ধ থাকিলে, 'নান্নুর' গ্রামের নৈষধেশ্বর শিবলিঙ্গ, তথা নলগড় প্রভৃতি নলপুর-চিহ্ন নিষধাধিপতি নলেরই স্মারক হয়। কিন্তু বীরভূম নামের অন্য কারণ থাকিলে, নান্নুরের নলরাজা কে, তাহা ঠিক করা সুসাধ্য নহে।

নিষধাধিপতি নলরাজা ঋতুপর্ণের সমকালবর্ত্তী। অপর নলরাজা ঋতুপর্ণেরই বংশধর। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশ, কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নল *। আমরা কিন্তু বীরভূম নাম স্মরণ করিয়া এই নলকে বীরসেন-পুত্র ও নিষধাধিপতি বলিয়াই স্থির করিতেছি। ফলে দুই নলরাজাই অতি প্রাচীন। অন্যতরের সময় এই নান্নুর সুপ্রতিষ্ঠিত লোকালয় ছিল। এ অপেক্ষা প্রাচীনত্বের নিদর্শন আর কি? নান্নুরের সে নগরভাব এবং ঋদ্ধি-প্রতিষ্ঠা কতকাল ছিল বা কতকাল বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার নির্ণয় হয় না। তবে সেই নান্নুর আবার যখন অন্যবিধ সৌভাগ্যে স্ফীত হইয়াছে, সেই কাল এক প্রকার নির্ণয় করা যায়।

বঙ্গীয় কবিকুল-কোকিল চণ্ডীদাস ঠাকুর কিঞ্চিদধিক ৫০০ পাঁচ শত বৎসরের লোক। অনেকে অনুমান করেন ১৩৩৯ শকাব্দে তাঁহার প্রাদুর্ভাব। নান্নুর-গ্রাম চণ্ডীদাস ঠাকুরের সাধনা ও সিদ্ধিক্ষেত্র। অতুলনীয় পদাবলী-রচনা তাঁহার সিদ্ধির অন্যতম ফল। এই দরিদ্র চণ্ডীদাস ঠাকুর হইতেই নান্নুরের সৌভাগ্যোদয় হইয়াছে; এ সৌভাগ্য ধন-জনে নহে, বিপণাপণে নহে, শিল্প-স্থাপত্যে নহে, নগর-নাগরিতায় নহে,—এ সৌভাগ্য বাঙ্গালীর মনে; চণ্ডীদাস-সেবিতা মহাভূমির এ সৌভাগ্য, যতদিন বাঙ্গালী, যতদিন বাঙ্গালা ভাষা, ততদিন। নান্নুর-গ্রামের এই সৌভাগ্যই আমার লেখনী পবিত্র করিতেছে।

নান্নুর-গ্রামে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যে প্রবাদ আমি শুনিয়াছি, তাহার মর্ম্ম এই স্থলে বিবৃত করিতেছি;—

১। নান্নুর-গ্রামে চণ্ডীদাসের জন্ম কিনা, তাহা বলা যায় না; কিন্তু তাঁহার সাধনা ও সিদ্ধিস্থান নান্নুর।

২। বিশালাক্ষী-সেবক চণ্ডীদাস, নান্নুর-গ্রামে সাধনায় নিরত হইলে, বিশালাক্ষী দেবী তাঁহাকে দর্শন দেন এবং ভাবভঙ্গীতে সাধনা-বিশেষের অপর অঙ্গ শক্তি সংগ্রহ করিতে আদেশ করেন। রজক-কন্যা রামমণি বা রামী যে তাঁহার অনুগৃহীতা, বিশালাক্ষী দেবী এ কথাও চণ্ডীদাসকে বলেন।

৩। চণ্ডীদাস ঠাকুর রজকী রামীকে ইষ্ট-সাধনার শক্তিরূপে গ্রহণ ও বিশালাক্ষী দেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন।

৪। রজকী-সংসর্গাপরাধে চণ্ডীদাস ঠাকুর বহুদিন সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন।

৫। তাঁহার সিদ্ধিলাভ-বার্ত্তা এবং সিদ্ধি-সূচক অতুলনীয় পদাবলী রচনায় মুগ্ধ হইয়া কতিপয় সামাজিক ব্যক্তি তাঁহাকে পুনরায় সমাজভুক্ত করেন। কিন্তু তখনও বহুলোক অন্তরে অন্তরে তাঁহার বিরোধী ছিল।

৬। একদা চণ্ডীদাস ঠাকুরের আবাসে কোন ক্রিয়া। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ অনেকেই উপ

* বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ৪র্থ অধ্যায়।

স্থিত হইয়াছেন, কিন্তু ভোজনার্থ নহে ;—দর্শন ও নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ। ভোক্তা অতি অল্প। চণ্ডীদাসের তাৎকালিক অবস্থাই ঐরূপ। কিন্তু চণ্ডীদাসের তাহাতে কিছুমাত্রই অনুতাপ ছিল না। চণ্ডীদাস এক হস্তে অন্নপাত্র রাখিয়া অন্য হস্তে ভোক্তা কয়জনকে পরিবেশন করিতেছেন, দুই হস্তই কর্ম্মে ব্যাপৃত ; এমন সময়ে বহিঃপ্রাঙ্গণে রজকী রামমণিকে দেখিতে পাইলেন, দেখিয়াই ভাবাবেশে তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র স্খলনোন্মুখ হইল ; তখন চণ্ডীদাস আর দুই হস্ত প্রকট করিয়া বস্ত্র-সংবরণ করিলেন। দর্শনার্থী সামাজিকগণ এই অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে বিহ্বল হইয়া তাঁহার পদতলে নিপতিত হইল, এবং পুনঃপুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিল। তদবধি চণ্ডীদাস ঠাকুর সমাজ ও দেশ-দেশান্তরে বিশেষরূপে পূজিত ও আদৃত হইতে লাগিলেন।

৭। প্রথমে চণ্ডীদাসকে সমাজের নির্যাতন নানা প্রকারে সহ্য করিতে হইয়াছিল, তখন রোষাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া তিনি অভিশাপ দেন, নান্নুর-গ্রামে কেহ যেন তৎকৃত পদাবলী গানে কৃতী হইয়া জীবিত না থাকে। সে অভিশাপ সর্ব্বাংশে সত্য হইয়াছে।

৮। চণ্ডীদাসের ভিটা এবং বিশালাক্ষী দেবী অদ্যাপি নান্নুর-গ্রামের পূর্ব্বাংশে বর্ত্তমান।

৯। বিশালাক্ষী দেবীর পূজকেরা অধিকারী নামে খ্যাত।

১০। বিশালাক্ষী-মন্দিরের সমীপেই চণ্ডীদাসের ভিটা। কেহ কেহ বলেন, চণ্ডীদাসের ভিটা গ্রামের পশ্চিম ভাগে। আমার বোধ হয়, দুই প্রবাদই সত্য। বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির-সমীপে তাঁহার আশ্রম-গৃহের ভিটা ; আর গ্রামের পশ্চিমাংশে বোধ হয়, তাঁহার পূর্ব্ববাস-বাটীর ভিটা।

১১। বিশালাক্ষী দেবীকে, চণ্ডীদাস ঠাকুর তাঁহার পদাবলীতে 'বাশুলী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রামে কিন্তু কেহ বাশুলী বলে না। বাশুলী বলিলে সাধারণ লোকে বুঝেও না।

১২। গোপীগণের আরাধিতা দেবী কাত্যায়নীই বিশালাক্ষী। তিনি স্বয়ং চণ্ডীদাসের নিকটে বৃন্দাবন-লীলা বর্ণনা করিতেন, চণ্ডীদাস ঠাকুর তদনুসারে পদাবলী রচনা করিতেন।

১৩। নান্নুর গ্রামের দেড় ক্রোশ উত্তরে কীর্ণাহার গ্রাম। চণ্ডীদাস ঠাকুর, কৃষ্ণলীলা-বিবরণ-পূত পদাবলী কীর্ত্তন করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া সেই স্থানের তাৎকালিক ভূস্বামী এক পাঠানের অন্তঃপুরে গিয়া পড়েন। অন্তঃপুর-রক্ষক, অন্তঃপুর-মহিলাকুল সকলেই কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া ভক্তিভরে চণ্ডীদাস ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে ও নামকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করে। পাঠান নবাব এই সংবাদ পাইয়াই চণ্ডীদাস ঠাকুর প্রভৃতিকে বধ করিবার জন্য স্বয়ং পরিজন-সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুর-গৃহের ছাদ পড়িয়া বধোদ্যত নবাব এবং কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত চণ্ডীদাস ঠাকুর এবং হরিনামগান-শ্রবণরত অন্তঃপুরস্থ জনগণ সকলকেই নিষ্পেষিত করিয়া ফেলেল।

১৪। চণ্ডীদাস ঠাকুরের সমাধিস্থান কীর্ণাহার গ্রামেই। তথায় একটী পাট আছে। কয়েক জন বৈষ্ণব সেখানে থাকেন। সময়ে সময়ে মহোৎসবাদি হইয়া থাকে।

১৫। চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষ অষ্টমী তিথিতে চণ্ডীদাস ঠাকুরের তিরোভাব হয়। ঐ দিন নান্নুর-গ্রামে চণ্ডীদাসের ভিটায় বৈষ্ণবেরা উৎসব করিয়া থাকেন।

নান্নুর-গ্রামবাসী একজন ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"চণ্ডীদাসের প্রতি বিশালাক্ষীর আদেশ ছিল,—

"দক্ষিণ-দেশেতে না যাবে কদাচিতে
যাইলে প্রমাদ হবে।" *

কিন্তু উত্তর-দেশ কীর্ণাহার, সেখানে গিয়া চণ্ডীদাসের প্রমাদ ঘটিল কেন?"

আমি উত্তর করিলাম,—"শক্তি-প্রতিমাকে দক্ষিণভাগে রাখিয়া প্রণাম করিতে হয়, চণ্ডীদাস ঠাকুর তদনুসারে পশ্চিমশিরা হইয়া দক্ষিণমুখী বিশালাক্ষীকে প্রণাম করেন, প্রণামের পর যেমন তিনি পশ্চিমমুখ হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন, অমনি বিশালাক্ষী উক্তরূপ আদেশ করেন। তাহা হইলে 'দক্ষিণ-দেশেতে' শব্দের অর্থ 'ডাহিন দিকের দেশে।' পশ্চিমমুখ হইয়া দাঁড়াইলে, উত্তরদিক্ হয়—ডাহিন আর দক্ষিণদিক্ হয়—বাম, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব বিশালাক্ষীর আদেশের মর্ম্ম হইল,—উত্তরদিকে যাওয়া নিষেধ। চণ্ডীদাস ঠাকুরের ধারণা কি হইয়াছিল, কে জানে? যাই হউক, 'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।'

'ভ্রমিতে ভ্রমিতে নান্নুর-গ্রামেতে
যাইয়া প্রবেশ করে।'

চণ্ডীদাসের এই নান্নুর এখনও মন্দ গ্রাম নহে। ঐ দেশের মধ্যে ইহা একখানি ভাল গ্রাম। গ্রামখানি পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় এক ক্রোশ ও উত্তর-দক্ষিণে অর্দ্ধ ক্রোশের উপর হইবে। প্রায় ৩০০ শত ঘর গৃহস্থ গ্রামের অধিবাসী। সজ্জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ, উগ্রক্ষত্রিয় ও সদ্গোপই প্রধান। বাগ্দী প্রভৃতি ইতরজাতিও তথায় আছে। স্কুল আছে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত একটীও নাই।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

* এ পদের অপর অর্থ আছে, কিন্তু পূর্ব্ব-পক্ষ ও উত্তরপক্ষের সঙ্গে সে অর্থের কোন সম্বন্ধ নাই।

প্রেম।

(১)

কুঞ্জে
তৃণ-পুঞ্জে,
সাগরে
গিরি-গহ্বরে,
উঠে হাসি
রাশি রাশি;—
উঠে প্রীতি
নব গীতি,
সুধা নিঝরে,
নিতি নিতি।

(২)

গঙ্গে
নানা রঙ্গে,
মধু-প্রভাতে
পিক কুহরে,
চাঁদে, গগনে
ধীর সমীরে,
প্রেম-হাসি
রাশি রাশি,
বন-কুসুমে
কল-প্রবাহে,
প্রেম-স্মৃতি
নিতি নিতি।

(৩)

প্রাণে
চির জীবনে,
মধু মিলনে
প্রেম মায়া;—
তাপ-বিরহে
স্নেহ-ছায়া।
সেই করুণা,
প্রেম-যন্ত্রণা—
দুখ-অনলে
সুধা-প্রীতি,
নর-হৃদয়ে
ঢালে নিতি।

(৪)

গানে
সুখ-স্বপনে,
শিশু-সুহাসে
আধ-ভাষা,
রবি-কিরণে
নব আশা;—
মর-জগতে
প্রাণ নিতি,—
সেই মধুময়
সেই ছায়াময়
সেই প্রেমময়
সেই প্রীতি।

(৫)

ধীর-হিল্লোলে
নদী-কল্লোলে
স্নেহ-লেখা,
আঁখি-পল্লবে
প্রেম-আঁকা।
যতনে
জাগে যাতনা,
মরণে
রহে কামনা,
ধরি' চরণ
করি' স্মরণ,
কিবা মরণ
সুধা প্রীতি;—
সেই চরণে
নিতি নিতি।

শ্রীচুনিলাল গুপ্ত।

মলিনা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গঙ্গা-সৈকতে।

গঙ্গা-সৈকতে বসিয়া, এক চিত্রকর, শোভাময়ী প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য চিত্রফলকে অঙ্কিত করিতেছিলেন। তখন দিবা অবসান হইয়াছে, দূরে,—পশ্চিম নীল আকাশখণ্ডে অস্তমিত সূর্য্যের স্বর্ণ-কিরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল। সেই বিক্ষিপ্ত স্বর্ণ-কিরণে চারিদিক্ উজ্জ্বলীকৃত! সন্ধ্যার ম্লান-ছায়াটুকু এখনও তাহা মলিন করিতে পারে নাই।

গঙ্গার পরপারে সুন্দর মাঠ। তৃণশস্য-সমাচ্ছাদিত সেই মাঠের উপর শয়ন করিয়া, গাভী রোমন্থন করিতেছে। নদীতটে,—মাঠের প্রান্তভাগে, বৃক্ষব্রততিগুলি শ্যামশোভায় সমাকীর্ণ; পরস্পরে বুকে বুকে মিলিয়া প্রাণে প্রাণ বাঁধিয়া রাখিয়াছে। মধুরকণ্ঠ বিহগ শব্দ-তরঙ্গে আকাশ প্লাবিত করিতেছে; সেই মধুর শব্দ-তরঙ্গে সান্ধ্য জল-কল্লোল মিশিয়া, সৌম্য-সন্ধ্যার সেই অপূর্ব্ব মাধুরীটুকু আরও মধুর করিয়া তুলিয়াছে।

আর কোথাও কিছু নাই। চিত্রকর অতৃপ্ত-লোচনে সেই শোভা দেখিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া ভাবিলেন,—"ক্ষুদ্র মনুষ্য আমি, কি সাধ্য আমার এ জীবন্ত ছবি এ ক্ষুদ্র চিত্রপটে অঙ্কিত করি!" যতই দেখিতে লাগিলেন, হৃদয় আনন্দে পূর্ণ-হইল; চক্ষু মুদ্রিত হইল; বাহিরের সে রূপ তাঁহার অন্তরে জাগিল!

অন্তরে রূপ-জ্যোতি! কি মধুর! কি অনির্ব্বচনীয় সুন্দর! মুহূর্ত্তের জন্য চিত্রকর আত্মবিস্মৃত হইলেন!

চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন, সন্ধ্যার অস্পষ্ট-ছায়ায় সে ক্ষীণ আলো ক্ষীণতর হইয়াছে। চিত্রকর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, ভাবিলেন—"কি অমূল্য মুহূর্ত্তটুকু পাইয়াছিলাম! সংসারের কোলাহলে, অতৃপ্ত জীবনের এই অশান্তির মাঝে, এমন শুভ মুহূর্ত্ত আর কি মিলিবে? অন্তরে কি রূপ-জ্যোতি দেখিলাম! আ মরি মরি! কি রূপ! সে রূপ কি এই প্রকৃতির? এমন সন্ধ্যার আকাশতলে, এমনই গঙ্গা-সৈকতে, যতবার প্রকৃতির এই মধুর ভঙ্গি দেখিয়াছি,—কৈ, প্রাণে ত এমন সুখ অনুভব করি নাই! হায় সুখ! আজি কতদিন ধরিয়া, তোমার জন্য নানাস্থানে লালায়িত হইয়া ঘুরিয়া মরিয়াছি, কোথাও ত তোমার সন্ধান পাই নাই! আঃ! আজি জীবনের এ শুভ মাহেন্দ্র-যোগে, বুঝি সেই চির অভীপ্সিত বস্তুর অস্পষ্ট ছায়া পাইলাম!"

ভাবিতে ভাবিতে চিত্রকর আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চিত্রাঙ্কন।

সেই দিন, সেই গঙ্গা-সৈকতে বসিয়া, চিত্রকর যখন চিন্তানিমগ্ন, তাঁহার সম্মুখে একটী কুসুম-কমনীয়া বালিকা দাঁড়াইয়া ছিল। বালিকা, বিস্ময়-বিস্তারিত-নেত্রে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া ছিল। চাহিয়া চাহিয়া একবার আকাশ পানে চাহিল, তারপর প্রশান্ত আঁখি দুটী চারিদিক ঘুরিয়া আবার চিত্রকরের মুখপ্রতি ন্যস্ত হইল।

চিত্রকর চক্ষু মেলিলেন। কি দেখিলেন? দেখিলেন,—সৌন্দর্য্যের সীমারূপিনী, বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি—একটী বালিকা-মূর্ত্তি!

মুহূর্ত্তের জন্য চারিটী চক্ষের মিলন হইল।

আমি বুঝাইতে পারিব না যে, সেই মুহূর্ত্ত-টুকুর মধ্যে, পরস্পরের সেই দেখাদেখির ভিতর দিয়া কি হইয়া গেল! আমার মনে পড়ে, সেই অচ্ছোদ সরোবরে এমনই একদিন মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীকের শুভ সন্দর্শন ঘটিয়াছিল। এমনই একদিন পৃথিবীপতি দুষ্মন্তের চক্ষে, সেই আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার রূপরাশি প্রতিভাত হইয়াছিল। এমনই একদিন ভয়ঙ্কর দ্বীপমাঝে ফর্দিনন্দের সমক্ষে সেই প্রকৃতি-পালিতা মিরন্দার মূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছিল। সেই মুহূর্ত্তগুলি আজি আমার মনে পড়িতেছে। আমি বুঝাইতে পারিব না, এমন মুহূর্ত্ত গুলি বড়—বড় রহস্যপূর্ণ!

বলিতে পারি না, বালিকার সেই মুখ-খানিতে কি-একটু বেশী মাধুরী মাখান ছিল। ডাগর আঁখি দুটীতে অপূর্ব্ব শোভা! সমস্ত অবয়বে কি সৌকুমার্য্য!

সেই সুনীল আকাশতলে, সেই পূর্ণতোয়া গঙ্গা-সৈকতে, সন্ধ্যার সেই আধ-ছায়া, আধ-আলোর অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে, প্রকৃতির অতি প্রীতিপ্রদ সময়ে, সেই চারিটী বিশাল আঁখি পরস্পরের প্রতি অনিমিষ-নয়নে চাহিয়া রহিল!

মুহূর্ত্তের দেখা, কিন্তু সেই দেখা-দেখি হইতেই পরস্পরের হৃদয়ে যেন একটা আকর্ষণ হইল! কেহ কাহাকে চিনিত না—আজি এই প্রথম দেখা, কিন্তু তবুও বহুদিনের পরিচিতের মত হৃদয় হৃদয়ান্তরকে আজি চিনিয়া লইল! হৃদয় আজি যেন বাঞ্ছিতকে পাইয়া পরম তৃপ্তি অনুভব করিল!

কাহারও মুখে কোন কথা ছিল না। সেই সন্ধ্যার আকাশে নক্ষত্রগুলি যেমন উদ্যানস্থিত ফুটনোন্মুখ যূথিকা কুঁড়িগুলির প্রতি চাহিয়া ছিল, এ দৃষ্টিও তেমনই নীরব।

বালিকার পিতা গঙ্গায় সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেছিলেন। তাহা সম্পন্ন করিয়া কন্যাকে ডাকিলেন,—"মলিনা, এস মা, গৃহে যাই।"

বালিকা চকিতের ন্যায় ফিরিয়া চাহিল। আবার একবার সেই আঁখিযুগল আকাশপানে তাকাইল, তারপর—ধীরে ধীরে চিত্রকরের মুখ প্রতি—কিন্তু নয়নে নয়ন মিলিয়াই, চিত্রকরের চরণ প্রতি তাহা বিন্যস্ত হইল। সে দৃষ্টি বড় করুণ!

পিতা ডাকিলেন, কন্যা চলিয়া গেল। চিত্রকর মন্ত্রমুগ্ধের মত চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার চিত্র-পটে একটীও রেখাপাত হয় নাই! কিন্তু হৃদয়-পটে মাধুরী-মণ্ডিতা সারল্যের আধার, সেই নিষ্কলঙ্ক মুখখানি অঙ্কিত রহিল!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মলিনা।

নগেন্দ্রনাথ ভাগলপুর সহরের একজন প্রসিদ্ধ লোক। তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অপূর্ব্ব পরোপকারিতা, উদার স্বভাব ও বিদ্যানুরাগ, সেই সহরের মধ্যে তাঁহাকে প্রসিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। অর্থ-সঙ্গতি কিন্তু তাঁহার তেমন-কিছু ছিল না, সামান্যই আয় ছিল, তাহাতেই কিন্তু সচ্ছলে তাঁহার সংসার-নির্ব্বাহ হইত। সেই অল্প আয় লইয়াই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁহাকে সকলেই জানিত, সকলেই তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে সুখী হইত।

একটী অনাথা বিধবার কন্যাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। ভার্য্যা, আপন হৃদয়-গুণে স্বামীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস, ধর্ম্মে মতি, স্বামীতে ভক্তি, অতিথি-অভ্যাগতে সেবা,—সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী সে মূর্ত্তি! নগেন্দ্রনাথ দেখিতেন, তাঁহার সংসার-উদ্যানে স্বর্গের পারিজাত ফুটিয়াছে! সৌরভে ও সৌন্দর্য্যে তাঁহার গৃহ আলোকিত!

সেই স্নেহময়ী, সপ্তদশ বৎসর বয়সে, তাঁহার সোণার সংসার আঁধার করিয়া চলিয়া গেলেন! একটী মাত্র শিশু-কন্যা ছিল, তাহার বয়স তখন দুই বৎসর মাত্র। সেই শিশুকন্যাটীকে স্বামীর ক্রোড়ে রাখিয়া, স্বামীর পদধূলি মস্তকে লইয়া, সতী স্বর্গে চলিয়া গেলেন। দুঃখিনী জননী নগেন্দ্রনাথের গৃহে রহিলেন।

উভয়ে তখন সেই শিশুর মুখপানে চাহিয়া আবার বুক বাঁধিলেন। নগেন্দ্রনাথ মাতৃহারা শিশুর নাম রাখিলেন,—মলিনা। মলিনা তখন হইতেই পিতার আদরের ধন। দিদিমার সহিত তাহার বড় একটা বেশী ভাব ছিল না। সকল সময়েই সে, পিতার কাছে কাছে থাকিত, কখন তাঁহার কাছ ছাড়া হইত না। কেবল "রূপকথা" শুনিবার জন্য, রাত্রে দিদিমার নিকট শয়ন করিত। সেই এক রাজা ও "সু-রাণী" "দু-রাণী"র কথা, সেই তালপত্রের খাঁড়া, সেই মরণ-কাটী জীয়ন-কাটী, সেই ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর অদ্ভুত উপাখ্যান,—বালিকা সেই সব কাহিনী দশ বার করিয়া শুনিত; আবার অতি নিপুণভাবে পিতার নিকট সেই সকল গল্প করিত।

নগেন্দ্রনাথ সারাদিন বিদ্যাভাসে কাটাইতেন। কন্যাটীকেও সযত্নে লেখা-পড়া শিখাইতেন। সন্ধ্যাসমাগমে গৃহ হইতে কিছু দূরে গঙ্গা-তটে বেড়াইতে যাইতেন, মলিনা সঙ্গে সঙ্গে যাইত। গঙ্গা-তটে বসিয়া, পিতা প্রকৃতির শোভা দেখিতেন, কন্যা তাঁহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া, কুসুম-সুকুমার দেহখানি সৈকত-শয্যায় বিস্তৃত করিত, মধুরকণ্ঠে মধুর গীতি গাইয়া তাঁহার প্রাণ জুড়াইত। সেই সুমধুর কণ্ঠ, সন্ধ্যা-কল্লোলের সহিত মিশিয়া মধুর হইতেও মধুরতর হইত। যে শুনিত, সে-ই মুগ্ধ হইত, স্নেহ-পরিপ্লুত-অন্তরে বালিকার নির্ম্মল মুখখানি চুম্বন করিয়া যাইত।

মায়ের মত সেই অতুল-রূপ,—সেই মুখ, সেই চক্ষু, সেই গ্রীবা সেই সব; সেই চরণ-চুম্বিত নিবিড় কেশরাশি, সেই বীণানিন্দিত কণ্ঠস্বর, সেই সব; মায়ের মত সেই স্নেহ—শ্রাবণের গঙ্গার মত পরিপূর্ণ,—অপরিমেয়, কূল-প্লাবী! নগেন্দ্রনাথ তাহা দেখিতেন; দেখিতে দেখিতে তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইত। তখন সেই জলপূর্ণ আঁখি দু'টী উপর পানে তাকাইয়া মনে মনে কাহাকে কি জানাইত!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আত্ম-সমর্পণ।

মলিনা দ্বাদশবর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া, ত্রয়োদশে পদার্পণ করিয়াছে। চঞ্চল হরিণ-শিশুর মত, চঞ্চল কুন্তলরাশি দুলাইয়া আর সে বড় ছুটাছুটি করে না; সে উচ্চহাস্য, সে নিরর্থক কথাবার্ত্তা, সে সকল খুবই কমিয়া গিয়াছে। বালিকা এখন আর তত চঞ্চল নাই। অতুল রূপরাশি দিনদিন ফুটিয়া উঠিতেছে। সমস্ত অবয়বটীতে প্রতীয়মান হয়, যেন নিদ্রিত প্রণয়-দেবতা অল্পে অল্পে জাগিয়া উঠিতেছে! নিশা অবসানে যেন পূর্ণিমার আলোর সহিত অল্পে অল্পে উষার আলোক মিশাইতেছে! ঘোলাটে ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় ভূরি-কুসুমিতা মাধবী বল্লরীর ন্যায়, সে সুকুমার দেহোপরি তারুণ্যের লাবণ্যটুকু যেন ফুটিয়া উঠিতেছে!

নগেন্দ্রনাথ কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে ইচ্ছুক হইলেন; কিন্তু ভাবিলেন,—"আরও কিছুদিন যাক, মলিনা আমার আজিও বালিকা।" প্রকৃত কথা এই, মলিনা তাঁহার অমূল্যনিধি, তাহাকে একদণ্ডও চক্ষের অন্তরাল করিতে তাঁহার বুক ফাটিয়া যায়। বিগ্রহ-শূন্য মন্দিরের ন্যায়, পুষ্পপত্র-হীন দাবদগ্ধ বৃক্ষকাণ্ডের ন্যায়, তাঁহার হৃদয়-শ্মশান ধূ ধূ করিতেছে! একমাত্র কন্যার স্নেহবারি সেই শ্মশানমূল বিধৌত করিয়া

বুকের আগুন নিবাইয়া রাখিয়াছে! কোন্ প্রাণে তাহাকে পরের হাতে সমর্পণ করিয়া স্থির থাকিবেন?

নগেন্দ্রনাথ সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে গঙ্গায় যাইতেন, পিতার আদেশমত কন্যাও সঙ্গে সঙ্গে যাইত। পিতা তীরে নামিয়া সায়ংকৃত্য সম্পন্ন করিতেন, কন্যা তীরে বসিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিত।

প্রতিদিন ই এইরূপ হইত। একদিন, যখন গঙ্গা-সৈকতে বসিয়া সেই চিত্রকর প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া, ধ্যান-নিমগ্ন ছিলেন, অল্পদূর হইতে মলিনা তাহা দেখিতে পাইয়া, সেই স্থানে আসিল। কি দেখিল? দেখিল বড় প্রশান্ত ও সৌম্যমূর্ত্তি! যে মূর্ত্তি দেখিলে, তাহার চরণে মস্তক আপনা হইতে অবনত হয়, এ সেই মূর্ত্তি! সেই প্রতিভা-প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল, চিন্তারেখা-বিশিষ্ট সেই উন্নত ললাট, বিশাল-আয়তন সেই নিমীলিত আঁখি যুগল, গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ সেই মধুর অবয়ব,—সে সকলই মহত্ত্বের পরিচায়ক! বালিকা, তেমন রূপ আর কখন দেখে নাই! অবাক্ হইয়া, তন্ময়ভাবে দেখিতে লাগিল! দেখিতে দেখিতে তন্ময়ী হইয়া গেল!

যে শক্তিতে জগৎ জগদন্তরকে হৃদয়ের কাছে টানিতেছে, গ্রহ-উপগ্রহ সকলই যে শক্তিতে পরস্পরের পার্শ্বে পার্শ্বে ছুটিয়াছে, হৃদয়ে হৃদয়েও কি সেই আকর্ষনী শক্তি প্রবাহিতা? এবং ইহাও কি সেই আকর্ষণ, না, রূপের মোহ? সাগরাভিমুখী স্রোতস্বতী যেমন হৃদয়ের আবেগে, আত্মহারা হইয়া, মহাসাগরে আত্মবিসর্জ্জন করে, বালিকাও সেইরূপ সেই নৈশ-নীলাকাশতলে, সেই গঙ্গা-সৈকতে, সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব যুবকের চরণে মনে মনে আত্ম-সমর্পণ করিল!

কিন্তু কিছুই বুঝিল না। তাহার মনে হইল, অজ্ঞাতসারে কে যেন তাহার ক্ষুদ্র বুকটুকুর ভিতর একটী অপূর্ব্ব সুন্দর দেবতার মূর্ত্তি বসাইয়া দিয়াছে! বালিকা ভাবিল,—"গঙ্গা-তটে বসিয়া, মৃণ্ময় শিবমূর্ত্তি লইয়া, সচন্দন পুষ্পে তাহা পূজা করিতাম! কেমন করিয়া পূজা করিতে হয়—জানি না, কি বলিয়া তাঁহার আরাধনা করিব—তাহাও জানিনা; লোকে যাহা বলিয়া দিত, সেই মন্ত্রে শিবপূজা করিতাম! আজি কি হৃদয়-তটে এ সেই শিবমূর্ত্তি পাইলাম? কে ইহার পূজা শিখাইবে? কি দিয়া পূজা কবিব?"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিবাহ-প্রসঙ্গ।

সেইদিন গঙ্গা হইতে ফিরিয়া আসিয়া নগেন্দ্রনাথ দেখিলেন, কন্যার মুখখানি কিছু বিষণ্ণ, যেন কি চিন্তায় আত্মহারা। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা আমার! আজ তোর মুখখানি এমন মলিন দেখিতেছি কেন? কি ভাবিতেছ মা?"

মলিনা, বান্ধুলির লজ্জাস্থল সেই রক্তিম ওষ্ঠাধরে ঈষৎ হাসি আনিয়া, মুখখানি ভূমি-পানে নত করিয়া বলিল,—"কৈ বাবা, কিছুই ত ভাবি নাই।"

নগেন্দ্রনাথ কন্যাকে কার্য্যান্তরে পাঠাইয়া, সমাগত এক প্রতিবাসীর সহিত কন্যার বিবাহ-প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। মলিনার বৃদ্ধা দিদিমা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"মলিনা বয়সে আজিও বালিকা মাত্র। এখনও ত্রয়োদশবর্ষ উত্তীর্ণ হয় নাই। কিন্তু বুদ্ধি-বিবেচনায় তাহারি বয়স অতিক্রম করিয়াছে। আপনি ত সকলই জানেন। আপনার পুত্র সতীশ ও আমার কন্যা মলিনা উভয়েরই বাল্যকাল হইতে পরস্পরের

প্রতি ভাব ও ভালবাসা আছে, তাহা জানি; এবং বোধ হয় পরস্পরের সহিত বিবাহ হইলে পরস্পরে সুখী হইতেও পারে। এই বিবাহে আমার একান্ত ইচ্ছা। আমার শ্বশ্রূ-মাতা ঠাকুরাণীরও একান্ত ইচ্ছা। এখন আপনার অনুগ্রহ হইলেই হয়। আমি দরিদ্র, আর কিছুই দিতে পারিব না; কাঙ্গালের কুটীর আলো করিয়া এই যে মন্দার-কুসুম ফুটিয়াছে, সযত্নে ইহাকে আপনার গৃহে লইয়া যান, শত সুবর্ণমুদ্রাও ইহার সমতুল্য নহে!"

সতীশের পিতা কিছু ভাবিয়া বলিলেন,—"নগেন্দ্রনাথ, আমি তোমাকে বাল্যকাল হইতে জানি এবং বয়সে তোমার জ্যেষ্ঠ হইলেও তোমার হৃদয়ের গুণে তুমি আমার শ্রদ্ধার পাত্র। তোমার এ অভিলাষ আমি পূর্ণ করিব। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি অর্থের কাঙ্গাল নহি। আমি এই সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্তই আজি আসিলাম।"

নগেন্দ্রনাথ। এত ব্যস্ত হইয়া, এই রাত্রেই আসিবার কি প্রয়োজন ছিল?

"সে কথা তোমাকে পরে বলিব। এখন কথা এই, আমাদের একপ্রকার স্থির রহিল, একটা শুভদিন দেখিয়া এ কার্য্য সমাধা করা যাইবে। কিন্তু তুমি কিছু মনে করিও না, কন্যাকে আর বাড়ীর বাহির হইতে দিও না। যখন শীঘ্রই এক গৃহের গৃহিণী হইতে চলিল, বাহিরে যাইতে দেওয়া আর উচিত হয় না। আর তোমার কন্যাও কিছু নিতান্ত বালিকা নাই।"

নগেন্দ্রনাথ। আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই হইবে। আজি যে আপনি কি দয়া করিলেন, বলিতে পারি না। এই পিশাচের দেশে, বিবাহ উপলক্ষে, হতভাগ্য কন্যার পিতাকে পথের কাঙ্গাল হইতে হয়! আপনার এ দয়া চিরদিন আমার মনে থাকিবে।

সতীশের পিতা অধিক কিছু না বলিয়া চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নগেন্দ্র, অনেক দিন হইতে এই সম্বন্ধ চলিতেছে। শুনিয়াছি, সতীশও নাকি এই বিবাহের জন্য অনেককে বলিয়াছে। আজি যে হঠাৎ সতীশের পিতা দুই এক কথায় এ সম্বন্ধ স্থির করিয়া গেলেন?"

নগেন্দ্র। আমার সহিত অনেকবার এ কথা হইয়াছে। সে সকল আপনাকে বলি নাই। এখন আপনার ইচ্ছা কি? এ সম্বন্ধে আপনার বোধ হয় কোন আপত্তি নাই।

বৃদ্ধা। কোন আপত্তি নাই। এমন ঘরে ও বরে যে আমার মলিনার বিবাহ হইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। ভগবান্ দুটীকে মনের সুখে রাখুন,—এই রাত্রিকালে কায়মনঃপ্রাণে আমি প্রার্থনা করি।

বলিতে বলিতে বৃদ্ধার চক্ষু জলপূর্ণ হইল। অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে সে-গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সে অশ্রুপূর্ণ আঁখি নগেন্দ্রনাথ বুঝিলেন। অতীতের সেই সুখময়ী কল্পনা সহসা জাগিয়া উঠিল। কল্পনা! নগেন্দ্রনাথ তাহা কল্পনা বলিয়াই ভাবিতেন। তাঁহার হৃদয়কুঞ্জ আলো করিয়া, সংসার-উদ্যান সৌরভে মাতাইয়া, সেই যে পরিপূর্ণ শতদল তাঁহার গৃহ-সরোবরে ভাসিতেছিল,—দেখিতে দেখিতে নগেন্দ্রনাথ আত্মহারা হইতেন, এ কুহক-দুরিতপূর্ণ সংসারে থাকিয়াও স্বর্গের পবিত্রতা দেখিতেন। দেখিতেন, এ পৃথিবী সুন্দরী; চাঁদ সুন্দর, ফুল সুন্দর; চাঁদ ও ফুলের প্রতিবিম্ব লইয়া যে স্রোতস্বতী কুলুকুলু চলিয়াছে, তাহাও সুন্দর। তখন সেই সৌন্দর্য্যের মাঝে দেখিতেন, তিনিও সুন্দর! ভাবিতে ভাবিতে সকল সৌন্দর্য্যের সার সেই অপূর্ব্ব সুন্দর, বাক্য ও মনের অতীত সেই পরম সুন্দরকে তখন চারিদিকে দেখিতেন!—

নয়নে অশ্রু বহিত! বাক্য স্ফূর্ত্তি হইত না! কি অপূর্ব্ব সে যোগ! হায়! একজনের সঙ্গে সঙ্গে সে হৃদয়-মন্দির চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে, হৃদয়ের দেবতা তবুও আজি সে ভাঙ্গা-মন্দিরে বিরাজমান! তাই নগেন্দ্রনাথ ভাবিতেন, "সে সুখময়ী কল্পনা, রবিকরস্পর্শে নিহার-কণিকার মত সহসা অন্তর্হিত হইল! কেবল পোড়াইবার জন্যই তাহার ছায়া আজিও বর্ত্তমান! সে মূর্ত্তি স্নেহময়ী, প্রেমময়ী, আনন্দময়ী,—হায়, কি পাপে, কার অভিশাপে এত শীঘ্র তাহাকে হারাইলাম?"

গভীর সমুদ্রের ন্যায় সে হৃদয়। অন্তরের অন্তরে কি ভীষণ তরঙ্গ-ভঙ্গ, কে জানিবে, কিন্তু বাহিরে তাহার একটুও উচ্ছ্বাস নাই। আজি কিন্তু সংযমীর সে গাম্ভীর্য্য তিরোহিত হইল। বৃদ্ধার অশ্রুপূর্ণ আঁখি দেখিয়া, নগেন্দ্রনাথের চক্ষুও জলপূর্ণ হইল। তিনি কিছুই দেখিতে পাইলেন না। বাঁধ ভাঙ্গিয়া যেমন জলপ্রবাহ ভাসিয়া যায়, আজি তেমনই রুদ্ধ শোকাবেগ নগেন্দ্রকে ভাসাইয়া চলিল!

মলিনা অন্তরালে থাকিয়া সে দৃশ্য দেখিল! পার্শ্বে বসিয়া, ক্ষুদ্র অঞ্চলে পিতার চক্ষু মুছাইয়া দিল। মলিনার চক্ষে একবিন্দুও অশ্রু নাই!

বালিকা এখন শোকার্ত্তের অশ্রু মুছাইতে বসিয়াছে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বাল্য-প্রণয়।

সতীশচন্দ্র, মলিনার একজন বাল্য-সহচর। বয়সের প্রভেদ থাকিলেও উভয়ের বড় ভাব ও ভালবাসা ছিল। উভয়ে উভয়ের প্রতিবাসী। সতীশচন্দ্র রূপবান্, শ্রম-সহিষ্ণু, উৎসাহী ও বুদ্ধিমান যুবক। তিনি ধনীর সন্তান।

শৈশবে দুটীতে বেশ প্রণয় ছিল। কেহ কাহারও মুহূর্ত্তের বিরহ ভাল বাসিত না। উভয়ে উভয়ের মুখপানে চাহিয়া ভাবিত, এমন সুন্দর আর নাই! খেলাঘরের ধূলা-খেলা ছাড়িয়া এক একবার নির্নিমেষ-নয়নে পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া থাকিত। উভয়ে নীরবে উভয়ের প্রতি তেমন আত্ম-বিস্মৃত ভাবে চাহিয়া কি দেখিত, কি বুঝিত, তাহা কেবল তাহারাই জানে। দুই জনে কে কাহাকে বেশী ভালবাসে, তাহা লইয়া বাদানুবাদ চলিত। মলিনা বলিত, "আমি তোমাকে যেমন ভালবাসি, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে তেমন ভালবাস না।" সতীশ বলিত,—"আমি তোমাকে যেমন ভালবাসি, তাহার সিকিও তুমি ভালবাসিতে জান না।"

মলিনা। তাহা হইতে পারে। তোমার মত অত কথা আমি জানি না, তাহা হইলে বুঝাইতে পারিতাম, আমি তোমায় কত ভালবাসি।

সতীশ। আমি যতক্ষণ তোমার কাছে থাকি, ততক্ষণ তুমি আমায় ভালবাস। কিন্তু আমি সর্ব্বক্ষণ তোমায় ভালবাসি। তোমার ঐ নির্ম্মল মুখমণ্ডলে যে কি অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে পাই, তাহা বলিতে পারি না। মাষ্টার পড়াইতে আসেন, তোমার সঙ্গে খেলিতে পাই না, কাঁদিতে কাঁদিতে পড়িতে যাই; পড়িতে পারি না, ঐ মুখখানি মনে পড়ে! স্কুলে যাই, তোমায় ত দেখিতে পাই না, বুকের ভিতর কেমন করিতে থাকে! কখন ছুটী হইবে, কখন তোমাকে দেখিব, কেবল তাহাই ভাবি। ছুটী হইলেই আগে তোমাকে দেখিয়া, তবে গৃহে যাই। তুমি কি আমায় এত ভালবাস?

মলিনা গুছাইয়া সব কথা বলিতে পারিত না, কাজেই হারি মানিত। বুঝাইতে

পারিত না যে, সতীশের মূর্ত্তি বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু ভরিয়া আছে। বুঝাইতে পারিত না যে, মলিনা বালিকা হইলেও স্ত্রীজাতি। নিত্য যাহাকে গৃহদেবতার ন্যায় হৃদয়-আসনে বসাইয়া মনে মনে পূজা করে, বুক ফাটিলেও মুখে তাহার কাছে তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না— ব্যক্ত করিতে জানে না। মনে মনে পূজা করিয়াই সুখী। তুমি বুঝিতে পার আর নাই পার, সে তাহা দেখিবে না; সে ভাল বাসিয়াই সুখী। রমণী ব্যতিত এমন ভালবাসা আর কে বাসিতে পারে?

কিন্তু দুই জনের প্রায়ই এইরূপ ঘটিত। সতীশ নানা কথা বলিয়া, আপনার ভালবাসা বুঝাইত; বালিকা নীরবে শুনিত, ভাষায় আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু ব্যক্ত করিতে পারিত না। উভয়ের মধ্যে কলহও ছিল, অশ্রুপাতও ছিল; কিন্তু সে কলহ, প্রণয়ের অভিমান, সে অশ্রুপাত, মিলনের আকাঙ্ক্ষা!

সতীশ বনফুল তুলিয়া মলিনাকে বনদেবী সাজাইত, মলিনা মধুর কণ্ঠে মধুর-গীত গাহিয়া তাহাকে মুগ্ধ করিত। সে গীত কেমন? কোকিল যেমন ধীরে আরম্ভ করিয়া, ক্রমে উচ্চে—আরও উচ্চে—আরও উচ্চে তান তুলিয়া, মধুর শব্দ-তরঙ্গে আকাশ প্লাবিত করে, বালিকাও তেমনি সেই কোমল-কণ্ঠ ধীরে ধীরে আরম্ভ করিয়া অতি উচ্চে তুলিত; যেন তরঙ্গের পর তরঙ্গ ছুটিত! আর সেই সুকুমার-দেহখানিও সেই তরঙ্গে তরঙ্গে হেলিত, দুলিত, কাঁপিত! সতীশ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সে শোভা দেখিত।

বালক-বালিকার প্রণয় এইরূপ ছিল। বাল্য-প্রণয়ে এতই সরলতা এবং সারল্যে এত পবিত্রতা!

কিন্তু এ অবস্থা অতিক্রম করিয়া, জীবনের পথে আর একটুকু অগ্রসর হইলে, বাল্যের সে মোহন-ছবি আর বড় দেখিতে পাই বাল্যে যাহাকে অতীব সুন্দর দেখিয়াছি; কৈশোরে যাহার সৌন্দর্য্যে নির্ম্মাল্য দেখিয়া, জীবনের চির-সহচর করিতে ইচ্ছা করিয়াছি,—এখন ত তাহাকে কৈ, আর পাই না! হয়ত তাহার অভাবে এ জীবন মরুভূমি হইয়াছে, আশা—উৎসাহ—আকাঙ্ক্ষা, হয় ত সকলই উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে,—কিন্তু তথাপি এ কাতর-প্রাণের সে আকুল-আহ্বানের একটুকুও ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মিলে না!

তাই বলিতেছিলাম, বাল্য-প্রণয় বড় মধুর, স্বর্গাধিক মধুর। কিন্তু ইহতে বড় বিশ্বাস ও নির্ভর করিতে নাই!

সতীশ বড় হইলে, বাল্যের সঙ্গিনী মলিনাকে ভুলিল না বটে, কিন্তু এখন তাহার প্রাণে তেমন একটা বিশেষ ভাব কিছু নাই। মাঝে মাঝে মনে পড়িত—মলিনা সুন্দরী, সে মুখখানি নির্ম্মল। হৃদয়ের উপর সৌন্দর্য্যের যে একটা ক্ষমতা, সতীশের যদি কিছু মনে থাকে, তবে তাহা সেই সৌন্দর্য্যের মোহমাত্র!

মলিনা, সতীশকে ভাল বাসিত, আজিও ভালবাসে, কিন্তু সে ভালবাসা আর নাই! যে ভালবাসা, চিরদিনের জন্য উভয়ের মিলন আকাঙ্ক্ষা করে, এ সে ভালবাসা নহে। এ দুঃখপূর্ণ সংসার মাঝে, যে ভালবাসা, ধন্বন্তরীর সুধাভাণ্ডের ন্যায় অমৃত সিঞ্চনে প্রাণ শীতল করে, এ সে ভালবাসা নহে। শৈশবের সাহচর্য্যে যে ভালবাসা অতীত স্বপ্নের ক্ষীণ-স্মৃতির ন্যায়, তাহাই আজি বিদ্যমান।

সতীশের সহিত বিবাহের কথা হইতেছে, মলিনা তাহা সকলই শুনিল। শুনিয়া তাহার মনে বিশেষ একটা ভাব কিছু হইল না, তবে একটু ভাবনা হইল। সে ভাবনাটুকু কি?

সেই গঙ্গা-সৈকতে, সৌম্য-সন্ধ্যায়, সেই প্রশান্ত মূর্ত্তি,—বালিকার আঁখি দুটীর মাঝে

নিয়তই তাহা জাগিতেছে। মনে মনে ভাবিল, "সেই গঙ্গা-সৈকতে, সে দেবতার চরণে এ জীবন সমর্পণ করিয়াছি; যদি তিনি দাসী বলিয়া চরণে স্থান দেন, তবে তাঁহারই,—নহিলে আমি আর কাহারও নহি!"

বালিকা হৃদয়ের রহস্য কখন বুঝাইতে পারিব না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সুখ।

প্রফুল্লকুমার গৃহত্যাগী হইয়া, নানা তীর্থ, নানাদেশ পরিভ্রমণ করিলেন, কিন্তু যাহার অনুসন্ধানে দেশে দেশে ফিরিলেন, তাহা মিলিল না। পিতা মাতার একমাত্র সন্তান, বড় আদরের, বড় স্নেহের ধন।—ধনপূর্ণ ভাণ্ডার, স্নেহময়ী জননীর অযাচিত স্নেহ—কিছুই তাঁহার মন বাঁধিতে পারিল না। অকলঙ্ক চরিত্র, বিমল যশঃ, অসাধারণ বিদ্যা, কমনীয় রূপ,—কিছুরই তাঁহার অভাব ছিল না;—সেই চতুর্বিংশতি বর্ষ বয়সে সে সকলেরই তিনি অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল থাকিলেও তিনি প্রাণের ভিতর একটা মহা অভাব অনুক্ষণ অনুভব করিতেন।—"সুখ কৈ? প্রাণ ত কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। যাহা করি, সকলই ক্ষণিক সুখ দিতে সমর্থ, কিন্তু সে স্থায়ী সম্পূর্ণ সুখ কোথায়? প্রাণের ভিতর কেমন এক হাহাকার, অশান্তি ও অভাব! কোথায় যাইলে এ জ্বালা জুড়াইবে?" শাস্ত্রাভ্যাসে রত হইলেন, ভাল লাগিল না, দর্শনবিজ্ঞানে মনঃসংযোগ হইল না; অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্তি হইল না;—সুখ কৈ, সুখ কোথায়?

গৃহ ভাল লাগিল না। গগনবিহারী পক্ষী, কুলায় ছাড়িয়া, যেমন আকাশমার্গে উড়িতে থাকে, মধুর সঙ্গীতে নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত, বন উপবন প্লাবিত করিয়া আকাশ পূর্ণ করে, তাঁহার সাধ,—"তেমনি করিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াই! নূতন দেশ, নূতন লোক, নূতন রাজ্য, নূতন নিয়ম, সবই নূতন দেখিয়া বেড়াই; সেই নূতনত্বের মধ্যে ডুবিয়া দেখি যদি কিছু শান্তি পাই! তখন সেই শান্তিপূর্ণ প্রাণে শান্তির গান গাহিয়া বেড়াইব। সুখ কি মিলিবে না? যদি প্রেমেই সুখ থাকে, তবে সে প্রেম কি মিলিবে না? হৃদয়ে মাতার স্থান ঊর্দ্ধে, তাহার মূলে—ভক্তি; বন্ধু-বান্ধবের স্থান স্বতন্ত্র; তাহার মূলে—স্নেহ; দীনদুঃখীর স্থানও স্বতন্ত্র, তাহার মূলে—দয়া; কিন্তু সেই ভক্তি, স্নেহ, দয়া প্রভৃতির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে যে প্রেম, যাহা পাইলেই বাঞ্ছিত সুখ মিলিবে, তাহা কোথায়? সুখে-দুঃখে, আশায়-নিরাশায়, যে প্রেম অবিচলিত, অবিকৃত, অপরাজিত,—কৈ সে প্রেম? ভগবানে আত্ম-সমর্পণ কি সেই প্রেম? কিন্তু চিত্ত চঞ্চল, এ আসনে তাঁহাকে বসাইতে পারি না। তবে সুখ কি মিলিবে না?"

প্রফুল্লকুমার গৃহ ত্যাগ করিলেন। স্নেহময়ী জননী ও আত্মীয় স্বজন বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি মনে মনে বুঝিলেন, "বিবাহ করা হইবে না; হৃদয়ের এই অবস্থা—কে জানে বিবাহে আরও কি হইবে। সে পরীক্ষার মাঝে পড়িতে চাহি না। এ প্রাণ সুখ-শান্তি হীন, ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র প্রেমে ইহা শান্ত হইবে না। সেই মহাপ্রেম চাই। আমার এ বিশ্বগ্রাসিনী ক্ষুধা বালিকার প্রেমে পরিতৃপ্ত হইবার নহে!"

গৃহত্যাগ করিয়া অনেক দেশ ঘুরিলেন, কিন্তু কৈ, বাঞ্ছিত সুখ মিলিল না। অতৃপ্তির মাঝে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

তখন একদিন নির্জ্জন এক পার্ব্বত্য প্রদেশে

বসিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন। অদূরে নির্ঝরিণী মধুর শব্দে বহিয়া চলিয়াছে, মাথার উপর পক্ষীগণ সঙ্গীত-সুধা ঢালিয়া দিতেছে, চারিদিকে ক্ষুদ্র অরণ্যানীর স্নিগ্ধ শ্যাম-শোভা বিরাজ করিতেছে। নির্ম্মল উষা, বাল-সূর্য্যের স্নিগ্ধ কিরণ এখনও তরু-শির রঞ্জিত করে নাই। প্রফুল্লকুমার নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে সহসা দেখিলেন,—কে যেন তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান! আকৃতি নাই,—কেবল ছায়া মাত্র! সেই ছায়া-মূর্ত্তি প্রফুল্লকুমারের অন্তর বুঝিয়া বলিলেন,—"যুবক, সুখের ভিখারী তুমি! সুখ কিন্তু তোমার হৃদয়ে; সে হৃদয় সন্ধান না করিয়া, মিথ্যা এ দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছ! সুখ আত্ম প্রতিষ্ঠায় নাই, সুখ আত্ম বিসর্জ্জনে! তোমার চিত্ত চঞ্চল, এ চঞ্চল হৃদয় শান্ত কর। দার পরিগ্রহ কর, আত্মত্যাগে যত্নবান হও; চিত্ত শান্ত হইবে, সুখী হইতে পারিবে। চিত্ত শান্ত না হইলে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কাহারও ভাগ্যে সুখ মিলিবে না!"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রফুল্লকুমার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "ইনি যে-কেহই হউন না, ইঁহারই আদেশ পালন করিব। এত দিনে বুঝিলাম, মিথ্যা এ পর্য্যটন! সুখ আমার অন্তরেই বটে। হায়, কেন দেখিলাম না, কেন বুঝিলাম না? অন্তর সুখহীন না হইবে কেন? আমি যে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যই সুখের ভিখারী, পরের মঙ্গল-মন্দিরে আত্ম-বিসর্জ্জন ত করি নাই,—সুখ মিলিবে কেন? সুখ আত্ম-প্রতিষ্ঠায় নাই, আত্ম-বিসর্জ্জনে,—এতদিন কেন বুঝি নাই! এতদিন কি শিখিলাম? হায়, কেন বুঝিলাম না? দুঃখিনী জননীর সেই অশ্রু,—এখনও মনে পড়িতেছে! বন্ধুবান্ধবের সেই কাতরতা,—কেন সে সকল উপেক্ষা করিলাম?"

প্রফুল্ল, প্রবাস হইতে গৃহে ফিরিলেন। চিত্ত স্থির করিবার জন্য চিত্রবিদ্যা শিখিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক সময় একটু শান্তিলাভ করিতেন।

যে দিন আপনার ভ্রম বুঝিলেন, সেই দিন হইতে আবার মনের গতি ফিরিল। তখন আবার এই সুখশান্তি-হীন সংসারে প্রফুল্ল অনেক সুখের সামগ্রী দেখিলেন। যিনি বলিয়াছিলেন, সুখ আত্ম-প্রতিষ্ঠায় নাই, আত্ম-বিসর্জ্জনেই সুখ, তিনি সুখ দুঃখের অপূর্ব্ব রহস্য সম্যক্‌রূপে বুঝিয়াছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু দার-পরিগ্রহেই কি চিত্ত শান্ত হইবে? প্রফুল্ল তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

ভাবিতে ভাবিতে গৃহাভিমুখী হইলেন। ভাগলপুরে তাঁহার এক বিশেষ বন্ধু ছিলেন, একান্ত অনুরোধে পড়িয়া, প্রফুল্ল ভাগলপুরে উপস্থিত হইলেন।

বন্ধুর অনুরোধে কিছুদিন তাঁহাকে ভাগলপুরে থাকিতে হইয়াছিল। প্রথম দিন নানা-প্রকার কথা-বার্ত্তায় অতিবাহিত হইল। দ্বিতীয় দিন, প্রফুল্ল একাকী ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। দিবাবসানে গঙ্গার সেই মনোহারিণী শোভা দেখিয়া, সেই মধুর দৃশ্য চিত্রপটে অঙ্কিত করিতে বসিলেন।

সেই গঙ্গা-সৈকতে বসিয়া, তাঁহার যে চিত্রাঙ্কন হইল, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রফুল্লকুমার—সেই চিত্রকর।

নবম পরিচ্ছেদ।

আত্ম-হারা।

প্রফুল্লকুমার গঙ্গা-সৈকতে সেই বালিকাকে দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইলেন। তোমারা বিশ্বাস কর আর নাই কর, আমার বিশ্বাস, এক একটা

এমন মুহূর্ত্ত আসে, যখন জীবনের ছিন্ন-গ্রন্থি-গুলা সব এক হইয়া বাজিয়া উঠে। সহস্র ব্যাপারে নিযুক্ত করিয়া যে মন বাঁধিতে পারি নাই, মুহূর্ত্তের গুণে, একটী অতি সামান্য ব্যাপারেও সেই মন আপনি আকৃষ্ট হয়!

প্রফুল্লকুমার ভাবিলেন, "এই বালিকা কে, কেন আসিয়াছিল, কিছুই জানি না। তাহাকে দেখিয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি। এমন পুণ্যময়ী-মূর্ত্তি দেখিব বলিয়াই কি আজি হৃদয় এমন প্রফুল্ল ছিল? এমন রূপ দেখিব বলিয়াই কি অন্তরে তেমন রূপজ্যোতি দেখিলাম? সেই মুখ, সেই আঁখি, সেই দৃষ্টি—আর একবার কি দেখিতে পাই না? যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিলাম, একটী কথাও কহিতে পারিলাম না! ভগবান কি এতদিনে দয়া করিয়া, অন্তরের অভাব ঘুচাইবার এই পথ দেখাইয়া দিলেন?"

রহস্য এই যে, কেহ কাহাকে চিনিল না, জানিল না; মাঝখান হইতে উভয়ে উভয়ের আকর্ষণে বাঁধা পড়িল।

প্রফুল্ল বন্ধুর গৃহে ফিরিয়া সকল কথা প্রকাশ করিলেন। বন্ধুর নাম অমরনাথ।

অমরনাথ বলিলেন,—"প্রফুল্ল, এই ভাবে যে তোমার মন ফিরিবে, ইহাতে আমি সুখী হইয়াছি। কিন্তু ভাই, এ যে বিষম-সমস্যায় ফেলিলে! গঙ্গা-সৈকতে কাহার কন্যাকে দেখিয়া আসিলে? তাহারা কোন্ জাতি, কোথায় বাস,—কিছুই জান না, এমন অজ্ঞাত-কুলশীলা একটী বালিকাকে দেখিয়া কি একেবারে চিত্ত-সমর্পণ করিতে হয়?"

প্রফুল্ল। তুমি উপহাস করিবে, তাহা আমি জানিতাম। কিন্তু আমার বোধ হয় না যে, সে বালিকা কোন নীচবংশে জন্মিয়াছে। আমি জ্ঞাতসারে তাহাকে আত্ম-সমর্পণ করি নাই। আমি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না যে, আমার মনের ভিতর কি গোলমাল হইয়া গেল! আমার মনে হয়, সেই যে কুসুমময়ী-প্রতিমা এ হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে, তাহা হইতে আমি সুখী হইব! তুমি ভাবিও না। সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। আমার অন্তর বলিতেছে—সে আমার, আমি তার।"

অমরনাথ মনে মনে হাসিলেন। বুঝিলেন, যদি বা একপ্রকার রোগের উপশম হইল, আবার এক নূতন রোগের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু রোগ যখন আপনি ধরা দিয়াছে, বিশেষ ভাবনা নাই!

অধিক কিছু কথা হইল না। অমরনাথ বলিলেন,—"সে বালিকা কে, কাহার কন্যা, সমস্তই আমি সংবাদ লইব।" মনে মনে ভাবিলেন,—"প্রফুল্ল যেরূপ বলিতেছে, বালিকাটী কি নগেন্দ্রমিত্রের কন্যা মলিনা? মলিনাই ত প্রায় গঙ্গাতটে বেড়াইতে আসে। তাহাই কি হইবে? যদি তাহাই হয়, সকল দিকে মঙ্গল হয়। নগেন্দ্র বাবু সৎকুলীন, কায়স্থ-সমাজে সুপরিচিত; প্রফুল্লও একজন স্বরণা-স্বরের ছেলে;—দত্তবংশ খুব বিশিষ্ট ও বনিয়াদী ঘর। রূপে, গুণে, ধনে, মানে প্রফুল্ল-কুমারই মিত্রজ মহাশয়ের জামাতা হইবার যোগ্য। কিন্তু শুনিয়াছি, নগেন্দ্র বাবুর কন্যার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে,—তাহা হইলে কি হইবে? এবং সেই বালিকা যদি অন্য কাহারও কন্যা হয়, তাহা হইলেই বা কি হইবে?"

অমরনাথ এইরূপ ভাবিতেছেন। আর প্রফুল্ল ভাবিতেছেন,—"আর একবার কি দেখিতে পাই না?" পরক্ষণেই আবার ভাবিতেছেন,—"জীবনের এই চতুর্বিংশতি বর্ষ বয়সে আজি একটী ক্ষুদ্র বালিকার জন্য এমন ভাব কেন হইল? মানুষ বড়ই পরমুখাপেক্ষী, বড়ই আত্মনির্ভর শূন্য!"

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রতিমা।

সতীশচন্দ্রের সহিত মলিনার বিবাহ এক প্রকার স্থির। মলিনা আর বাটীর বাহির হইতে পায় না।

সকলেই বুঝিয়াছিল যে, এই বিবাহে বর কন্তা উভয়েই সুখী হইবে। কিন্তু বিবাহের প্রস্তাব হইতে হইতে মলিনার অবস্থা অতি শোচনীয় হইতে লাগিল। সেই গঙ্গা সৈকতে সেই যে দেবমূর্ত্তি,—বালিকা তাহা ভুলিতে পারিল না! মাতৃহীনা শিশুর যে মলিন মুখখানি দেখিয়া তাহার পিতা নামকরণ করিয়াছিলেন মলিনা, তাহা দিন দিন আরও মলিন হইতে লাগিল! শ্রাবণের আকাশের মত সে মুখখানি নিয়তই মেঘাচ্ছন্ন থাকিত। ডাগর আঁখি দুটী সতত জলপূর্ণ থাকিত! অধরের সে হাসি,—নির্ম্মল, শুভ্র শারদ-কৌমুদীবৎ, স্ফুটনোন্মুখ মল্লিকা কুসুমবৎ সেই যে হাসি,—তাহা কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে! সঙ্গিনীরা আসিয়া বিবাহ-প্রসঙ্গ লইয়া আমোদ করিত, মলিনার মলিন চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিত! তাহারা কেহ কিছু বুঝিত না। নগেন্দ্রনাথও বিশেষ কিছু বুঝিলেন না।

অমরনাথের সহিত নগেন্দ্রনাথের বিশেষ সম্প্রীতি ছিল, উভয়ে উভয়ের প্রতিবাসী, উভয়ে উভয়ের গুণে মুগ্ধ। অমরনাথ সন্ধানে জানিলেন, যে বালিকাকে দেখিয়া, তাঁহার বন্ধু আত্মহারা হইয়াছেন, সে নগেন্দ্রনাথের কন্যা মলিনা। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস যথার্থ কি না, জানিবার জন্য একদিন প্রফুল্লকুমারকে লইয়া নগেন্দ্রনাথের বাটীর দিকে আসিলেন।

তখন নির্ম্মল প্রভাতকাল। নগেন্দ্রনাথের বহির্বাটীর প্রাঙ্গণে নানাবিধ বৃক্ষবল্লরী। লতিকা ফুলভরে অবনতা;—বৃক্ষের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া, নানা ফুলে তাহা সাজাইয়া দিয়াছে। ঘুমন্ত কুসুম-কলিকার উপর শিশির পড়িয়াছে, রবি-কিরণ এখনও তাহা মধুর-চুম্বনে জাগাইয়া তুলে নাই;—কেবল প্রভাতের মৃদুল বায়ু মৃদু হিল্লোলে ব্রততীগুলি ঈষৎ কাঁপাইতেছে। সেই মধুরবিকম্পনে মধুরশোভা হইয়াছে। মধুমক্ষিকা স্থানচ্যুত হইয়া আকুলপ্রাণে ফুলের চারিদিকে ঘুরিতেছে। সেফালিকা-শাখে বসিয়া, সেই মধুর বিকম্পনের তালে তাল রাখিয়া, সুরে সুর মিলাইয়া, পাখী গাহিতেছে। সেই পরম প্রীতিপ্রদ সময়ে, প্রেমপ্রতিমা মলিনাবালা, প্রাঙ্গণে বৃক্ষব্রততীর মাঝে দাঁড়াইয়া আছে! মাধবী শাখা, বায়ু বিকম্পিত হইয়া, মলিনার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়াছে; ফুটন্ত গোলাপ, মলিনার সীমন্তে উঠিয়াছে! সেই ফুলের মাঝে, কুসুম-কোমলা সে প্রেমপ্রতিমা খানি কি মনোহারিণী!

মলিনা, প্রভাতে বাহিরের প্রাঙ্গণে আসিয়া তাহার যত্ন-রোপিত বৃক্ষলতাগুলি প্রতিদিন দেখিয়া যাইত।

সেই দিন সেই শুভ মুহূর্ত্তে, দূর হইতে প্রফুল্লকুমার ও অমরনাথ সেই দৃশ্য দেখিলেন। ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইলেন। দেখিলেন, সেই ক্ষুদ্র কুঞ্জমাঝে কে একখানি প্রতিমা স্থাপন করিয়াছে। বসনাঞ্চল ভূমে লুটাইতেছে, উন্মুক্ত কেশরাশি চরণ চুম্বন করিয়াছে, বিশাল আঁখি-দুটী সম্মুখে চাহিয়া আছে! মুখখানি মলিন, কিন্তু সে মালিন্যে সৌন্দর্য্য আরও বিকশিত! আরও নিকটবর্ত্তী হইলেন। দেখিলেন, প্রতিমা সজীব, বিধাতার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সীমারূপিণী একটী বালিকা-মূর্ত্তি!

অমরনাথ চিনিলেন। প্রফুল্লকুমারও চিনিলেন,—যে ধ্রুবতারা তাঁহার আঁখি-মাঝে জাগিতেছে, এই সেই!

"বাসনা, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি! হায়, এ আঁখির আবার পলক হইল কেন?"—প্রফুল্লকুমার আপনার মনে এইরূপ ভাবিতেছেন।

সহসা আবার চারিটী চক্ষের মিলন হইল! মলিনা, অঞ্চল গুটাইয়া ধীর-পদক্ষেপে প্রস্থান করিল।

অমরনাথ ও প্রফুল্লকুমার গৃহে ফিরিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রণয়-পরিণাম।

অমরনাথ সকলই বুঝিলেন। কিন্তু মলিনার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে, এজন্য কিছু চিন্তিত হইলেন।

সেইদিন প্রভাতে সংবাদ আসিল,—'প্রফুল্লকুমারের জননী মৃত্যু-শয্যায় শায়িতা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গৃহে ফিরিতে হইবে।' প্রফুল্ল আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া, কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন।

বহুদিনের পর পুত্রহারা জননী সন্তানকে কাছে পাইয়া, রোগ যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন। অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু এবার আর পুত্রকে বাটীর বাহির হইতে দিলেন না।

যেদিন প্রভাতে, সেই প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া, মলিনা দেখিল, তাহার আরাধ্য দেবতা তাহারই সম্মুখে, সেইদিন বালিকার ক্ষুদ্র বুকটুকুর ভিতর হর্ষ বিষাদের এক তুমুল ঝটিকা উঠিল। মলিনা অমরনাথকে বিশেষরূপ চিনিত তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকিত। অমরনাথ কতদিন নগেন্দ্র বাবুর নিকট কত বিষয়ে পরামর্শ লইয়াছে, কতবার তাঁহার বাড়ীতে আসিয়াছে। বালিকা ভাবিল—"অমর দাদা কি তবে উহাঁকে চিনেন?—চিনিলেই বা আমি কিরূপে সকল কথা জ্ঞাত হইব? কেন বা তিনি আসিয়াছিলেন? আমার মনের ভাব কি তবে তিনি বুঝিয়াছেন? বুঝিলেই কি আমার আশা মিটিবে?"

এইরূপ হর্ষ-বিষাদে বালিকার সেইদিন অত্যন্ত জ্বর আসিল। বালিকা-বয়সে কি এত ভাবিতে আছে? দুই চারি দিনের মধ্যে পীড়া বৃদ্ধি পাইল। নগেন্দ্রনাথ ভীত হইলেন।

অল্পদিনের মধ্যে বিকার দেখা দিল। চিকিৎসকও ভীত হইলেন। মলিনা কখন কাঁদে, কখন হাসে; কত-কি প্রলাপ বকিতে থাকে। নগেন্দ্রনাথকে সকলেই ভালবাসিত, এই বিপদের সময় সকলেই তাঁহার কন্যাকে দেখিতে আসিত।

প্রলাপ অবস্থায়, মলিনার মনের কথা প্রকাশ পাইল। সেই গঙ্গা-সৈকতে, সৌম্য সন্ধ্যায়, সেই ধ্যান-নিমীলিত-নেত্র দেবমূর্ত্তি! আর একদিন সেই নির্ম্মল উষায়, পথিপার্শ্বে অমরনাথের সহিত সেই আরাধ্য-দেবতা! সকল কথাই প্রকাশ পাইল!

নগেন্দ্রনাথ তখন সব বুঝিলেন। বুঝিলেন, এই জন্যই মলিনা দিন দিন এমন কৃশা হইতেছিল। অমরনাথ সেখানে উপস্থিত ছিলেন; তিনি বুঝিলেন, একই শরে দুইটী বিহঙ্গ বিদ্ধ হইয়াছে! নগেন্দ্রনাথ তখন সকল কথা শুনিলেন।

অনেক দিনের পর, সুচিকিৎসা-গুণে মলিনা আরোগ্য লাভ করিল। আরোগ্য লাভ হইল বটে, কিন্তু পূর্ব্বের সে শ্রী আর ফিরিল না। তেমন যে তপ্তকাঞ্চন রূপ—সে রূপ নিবিয়া গিয়াছে; তেমন যে বিম্বাধর—তাহা আভাহীন; তেমন যে কমল-আঁখি—তাহা কোটরগত; তেমন যে সুকুমার অঙ্গ-সৌষ্ঠব—তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; অস্থিগুলি যেন কেবলমাত্র চর্ম্মে আবৃত; দেহ শোণিত-শূন্য। তেমন যে

বর্ষার নিবিড় মেঘের মত সেই চরণচুম্বিত কেশরাজি, অগ্রভাগে ঈষৎ কুঞ্চিত, অল্প অঙ্গ-সঞ্চালনে সেই যে কুন্তলগুচ্ছ সর্পশিশুর ন্যায় দুলিয়া দুলিয়া সেই রক্তাভ চিবুক স্পর্শ করিত,—সে সকলই শ্রীহীন। সে শ্রীহীনা মূর্ত্তি দেখিয়া, মলিনাকে অতি কষ্টেই চিনিতে হয়!

তখনও মাঝে মাঝে কেহ মলিনাকে দেখিতে আসিত, কেহ সংবাদ লইত। সতীশের সহিত বিবাহের স্থির হওয়া পর্য্যন্ত, সতীশ আসিত না। একদিন কিন্তু নিজে ইচ্ছা করিয়া আসিল। আসিবার কারণ ছিল।

সতীশ অন্য এক বালিকাকে বিবাহ করিতে স্থির করিয়াছিল। সতীশের পিতার সেখানে অভিরুচি ছিল না। কিন্তু সতীশ ইদানীং কিছু বিদ্যাভিমানী হইয়াছিল, কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না। সতীশ ভাবিল,—"তুলনা করিয়া দেখিব, যদি আমার নির্ব্বাচিতা পাত্রী অপেক্ষা মলিনা সুন্দরী হয়, তবে পিতার কথানুযায়ী মলিনাকেই বিবাহ করিব, নহিলে নহে।" সেইজন্য মলিনাকে দেখিতে আসিল।

নগেন্দ্রনাথ কোন আপত্তি করিলেন না। অমরনাথের কথা যথার্থ হইলেও, এখনও তিনি কিছুই ঠিক করেন নাই যে, সতীশকে কিংবা প্রফুল্লকুমারকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন।

তিনি ভাবী জামাতা সতীচন্দ্রকে বিশেষ যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। গৃহমধ্যে মলিনার সেই শ্রীহীনা মূর্ত্তি দেখিয়া, যুবক ঘৃণায় মুখ ফিরাইল।

সতীশচন্দ্রের হৃদয়ে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল! এই তাহার ভাবী-পত্নী? দুই মাস পরে ইহারই সহিত না তাহার বিবাহ হইবে? এঁ্যা, এই রূপ? এই গঠন?

পিতার মুণ্ডপাত করিতে করিতে সতীশচন্দ্র গৃহে ফিরিয়া মাতার নিকট আস্ফালন করিতে লাগিল। মা বলিলেন,—"না বাবা! ও পাড়া-বেড়ানি কুৎসিতার সহিত তোমার বিবাহ দিব না।"

যথাসময়ে নগেন্দ্রনাথ একথা শুনিলেন। তখন বুঝিলেন,—সতীশচন্দ্র অন্যত্র বিবাহ করিতে চাহে, এইজন্যই তাহার পিতা অতি শীঘ্রই আমার মলিনার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিতে আসিয়াছিলেন। তখন তিনি মনে মনে প্রবোধ দিলেন,—"বিষম রোগে ভুগিয়া মলিনা এমন হইয়াছে, আবার শীঘ্রই ভাল হইবে; রোগে কে না হতশ্রী হইয়া থাকে?" কিন্তু তাঁহার সে প্রবোধ বাক্যে এখন আর কেহ বড় একটা আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না।

মলিনার দিদিমা তখন মাথায় হাত দিয়া বসিলেন।

মলিনা সকল কথা শুনিয়া বলিল,—"এই আমার বাল্য-সখার প্রণয়-পরিণাম!" ফলতঃ মলিনা আনন্দিত বৈ দুঃখিত হইল না।

হায় রূপ! তোমার পরিণাম এই?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

রূপ।

বুঝা গেল, সতীশচন্দ্রের সহিত বিবাহ হইবে না। কিন্তু তারপর? যে কারণে এখানে হইল না, প্রফুল্লকুমারও সেই কারণে বিবাহ না করিতে পারেন। নগেন্দ্রনাথ এখন তাহাই ভাবিতে বসিলেন।

অমরনাথও বিশেষ ভরসা দিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন,—"প্রফুল্লকুমার ধনীর সন্তান, তার উপর রূপবান্, বিদ্বান্, সচ্চরিত্র। সুখের ভিখারী হইয়া যে দেশে দেশে ঘুরিয়াছে, সে যে মুহূর্ত্তের দৃষ্টিতে আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছে, তাহার মূলে রূপমোহ।

অন্ততঃ আমার এই বিশ্বাস। এক্ষণে আপনার কন্যা যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে আমার আশা বড় কম। আপনি শীঘ্র বিবাহ দিতে চাহিতেছেন, বটে, কিন্তু আমার বোধ হয়, কিছু দিন বিলম্ব করিলে ভাল হয়। বিলম্বে, আপনার কন্যার সেই পূর্ব্ব রূপ ফিরিয়া আসিতে পারে।"

নগেন্দ্রনাথ কিন্তু বড় ভাবনায় পড়িলেন। অমরনাথ, উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রফুল্লকুমারকে এক পত্র লিখিলেন ;—

"ভাই প্রফুল্ল, তোমাকে অনেক দিন পত্র লিখি নাই, না লিখিবার কারণও ঘটিয়াছিল। তুমি পত্র লেখ নাই কেন? আশা করি, তুমি ভাল আছ।

পৃথিবীর সহস্র ঘটনা তুমি ভুলিয়া যাইতে পার, কিন্তু তোমার জীবনের সেই একটী দিন, বোধ হয়, তুমি কখনও ভুলিবে না। সেই যেদিন তুমি একাকী গঙ্গা-সৈকতে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলে—সে কথা কি মনে পড়ে? আমি তখন বুঝি নাই যে, তোমারই মত সে বালিকাও তোমার জন্য ব্যাকুলা।

মলিনা অত্যন্ত পীড়িতা হইয়াছিল। তোমার বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ, তাহাতে সে সংবাদ পাইলে, না জানি তুমি কি করিয়া বসিতে ;—বেগবান্ হৃদয়কে বিশ্বাস কি ভাই? তাই সে কথা তোমাকে কিছু লিখি নাই। মলিনার বাঁচিবার আশা ছিল না, অতি কষ্টে সম্প্রতি সে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। রোগ-শয্যায় বিকার-সময়ে সকল কথাই সে ব্যক্ত করিয়াছে। ছিঃ! এমন করিয়াও ক্ষুদ্র একটী বালিকাকে মজাইতে হয়?

তারপর, এখন ত সে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু যেখানে তাহার বিবাহের স্থির ছিল, সেখানে হইল না। এই বিষম পীড়ায় ভুগিয়া মলিনার সে রূপ আর নাই! যে রূপ দেখিয়া, গৃহ-ত্যাগীর আবার গৃহ-সুখে মন গিয়াছে, মলিনার সে রূপ-জ্যোতি নির্ব্বাপিত ; সে মুখশ্রী নাই, সে সৌকুমার্য্য নাই, সে কিছুই নাই। যেখানে বিবাহের কথা হইয়াছিল, সেখানে না হইবার ইহাই কারণ। পাত্রের পছন্দ হইল না।

আমার আশঙ্কা হয়, তুমিও হয় ত মুখ ফিরাইবে। এ শ্রীহীনা বালিকা তোমার মনের মত হইবে কি-না, বলিতে পারি না। সুখের জন্য তুমি দেশে দেশে ঘুরিয়াছ ; ভাগলপুরে যে তোমার সুখের সামগ্রী ছিল,—কে জানিত? এই বালিকাকে লইয়াই তুমি সুখী হইবে,—এ কথা আমি আজিও বুঝি নাই। যদি ইহার মূলে রূপতৃষ্ণা থাকে, তবে তোমার আশা মিটিবে না।"

প্রফুল্লকুমার অনেকবার এ পত্রখানি পাঠ করিয়া, মনে মনে হাসিলেন। শেষে এইরূপ উত্তর লিখিলেন ;—

"ভাই অমর,

তোমার পত্র পড়িয়া তোমাকে গালি দিয়াছি। নিকটে পাইলে, বোধ হয়, তোমাকে প্রহার করিতাম। তুমি না বুদ্ধিমান? আমার হৃদয়ের ভাব তুমি না বুঝিয়া অকারণ এইরূপ লিখিয়াছ!

মলিনা পীড়ায় ভুগিয়া কুরূপা হইয়াছে,—ইহাই তোমার পত্রের তাৎপর্য্য। যেখানে বিবাহের কথা ছিল, সেখানে হইল না। ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

তুমি স্বীকার কর আর নাই কর, সৌন্দর্য্য-পিপাসা মানুষের প্রাণে বড় বলবতী। এই অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী পৃথিবীর বুকে থাকিয়াও মানুষ চিরদিনই সৌন্দর্য্যের কাঙ্গাল। তাই যেখানে একটু সৌন্দর্য্য দেখে, মানুষ সেই-খানেই অবনত মস্তক। আমরা সকলেই সৌন্দর্য্যের উপাসক। নয়ন তৃপ্ত হয় না,

আশা মিটে না, সাধ পূর্ণ হয় না। তাই চিরদিনই মানুষ রূপের ভিখারী। রূপে মুগ্ধ নয়, কে ভাই? যে, রূপ দেখিয়া, রূপের চরণে দাসখত লিখিয়া দিতে চাহে, রূপের অভাবে সে মুখ ফিরাইবে না কেন? কিন্তু রূপ দেখিতে দেখিতে যে রূপে মজিয়াছে, সে রূপ কি কখনও তিরোহিত হয়?

রূপ কোথায়? তুমি যে তোমার গৃহিণীতে এত রূপ দেখ, সে রূপ কি তাঁহাতে, না তোমার অন্তরে? যদি তাঁহাতেই হয়, তবে বুকে হাত দিয়া বল দেখি ভাই, সেই প্রথম যৌবনে, পূর্ণ সরোবরে, পূর্ণ শতদল যেমন দেখিয়াছিলে, আজিও কি তেমনি আছে? কিন্তু তবু দেখ, পূর্ব্বাপেক্ষা তোমার ভালবাসা এখন শতগুণে বাড়িয়াছে। আর সহস্র কারণে কেন তোমার ভালবাসা বর্দ্ধিত হউক না, রূপের মোহ আজিও ঘুচে নাই। রূপ আমাদের অন্তরে। আমি সেই অন্তর হইতেই মলিনার রূপ দেখিয়াছি। তোমাকে কেন, কাহাকেও এ কথা বুঝাইতে পারিব না যে, সেই মুহূর্ত্তের দেখা হইতেই সেই বালিকা আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। আমি যদি অন্ধ হইতাম, তথাপি আমি অন্তরে তাহার রূপ দেখিতাম। মলিনা কুরূপা হউক, আর সুরূপা হউক, তাহার রূপ আমার অন্তরে!

আমার মাতা ঠাকুরাণী সকল কথা শুনিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা, যদি তাঁহাদের মত হয়, তবে আমরা ভাগলপুর হইতেই বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করিব।"

অমরনাথ পত্র পাঠ করিয়া আশাতীত আনন্দ লাভ করিলেন। আর নগেন্দ্রনাথ ও মলিনার দিদিমার আনন্দ দেখে কে? কিন্তু মলিনা? মলিনা ভাবিল,—"ঐ আবার কি নূতন বিপদ্!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"শুভ-দৃষ্টি।"

তা তোমরা যদি কিছু না বল ত, বিবাহের অগ্রেই আমি বর-কন্যার "শুভ-দৃষ্টি" করাইব।

মলিনা, বিবাহের কথায় কিছু চিন্তিত হইল বটে, কিন্তু যখন শুনিল, তাহার অমর দাদা ইহার মধ্যে আছেন, তখন একটু আশা হইল। কিন্তু তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? অমরনাথ কি অন্য পাত্র ঠিক করিতে পারেন না? আর মলিনা যাহাকে দেখিয়াছে, তিনি যে অবিবাহিত, তাই বা কে বলিতে পারে? বালিকা সময়ে সময়ে বড় ভাবে। কাতর-প্রাণে দেবতার কাছেও প্রার্থনা করে। দেবতার কর্ণে কি বালিকার সে মর্ম্ম-কাতরতা স্থান পাইবে না?

নগেন্দ্রনাথ চিকিৎসকের পরামর্শ মত নানাবিধ পথ্যে কন্যার দেহ পুষ্ট করিতে লাগিলেন। তাঁহার আশাও মিটিল। বিবাহের পূর্ব্বেই কন্যা আবার পূর্ব্বের রূপ ফিরিয়া পাইল।

পূর্ব্বের রূপ? না, তদপেক্ষাও মধুর হইল। সেই একটানা গঙ্গা-স্রোতে তখন ধীরে ধীরে যমুনা-ধারা আসিয়া মিশিতেছিল। সেই জ্যোৎস্নালোকের সহিত অল্পে অল্পে উষার আলোক মিশিতেছিল। সেই কুসুম সুকুমার কুমারী-দেহের উপর তারুণ্যের লাবণ্যটুকু ঘনীভূত হইতেছিল। সেই শারদীয় কৌমুদীর উপর একটু একটু করিয়া বিদ্যুৎ চমকিতেছিল। নিদ্রিত প্রণয়-দেবতা তখন অল্পে অল্পে অর্দ্ধনিদ্রা, অর্দ্ধ-জাগরণে নিমীলিত আঁখি খুলিতেছিলেন। বাল্যের অতীত অবস্থা, যৌবনের অর্দ্ধোদয়,—সেই অপূর্ব্ব সঙ্গমস্থলে বালিকার রূপরাশি উছলিয়া পড়িতেছিল।

সতীশ যদি তখন আসিয়া একবার দেখিত! যদি একবার আলুলায়িত কুন্তলা, নীল বসনা, প্রভাময়ী সেই বালার মুখ প্রতি চাহিয়া

দেখিত,—দেখিত যে, তাহার মনঃকল্পিত সৌন্দর্য্য-রাণী, মলিনার চরণ রেণুরও সমতুল নহে!

নগেন্দ্রনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া, অমরনাথ প্রফুল্লকুমারকে পত্র লিখিলেন। প্রফুল্লকুমারও যথাসময়ে জননী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে লইয়া ভাগলপুরে উপস্থিত হইলেন।

মলিনার এবার যথার্থ ভাবনা হইল। আর উপায় নাই, চারিদিক্ স্থির হইয়াছে। সে এখনও কিছুই জানে না যে, পাত্র কে? অনেক চিন্তা করিল, কিন্তু কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। অবশেষে একদিন দিদিমার কাছে কাঁদিয়া পড়িল,—"দিদি-মা! তোমার পায়ে পড়ি, আমি বিয়ে করব না।"

দিদিমা-বুড়ি বড় দুষ্ট, সব জানে, কিন্তু কিছুই না-ভাঙ্গিয়া বলিল,—"কেন বিয়ে করবিনি? বড় হয়েছিস্, এখন কি স্বয়ম্বরা হবি নাকি?"

মলিনা কাঁদিল। বুড়ি তবু কিছু ভাঙ্গিল না। শেষে বলিলেন,—"ছিঃ বোন্! বিয়ের কথায় কি কাঁদে? আমি আমার বিয়ের কথা শুনে আমোদে গলে পড়তুম। ভাল কথা, মণি! (বৃদ্ধা, মলিনাকে 'মণি' বলিয়া ডাকিতেন), তুই নাকি গঙ্গাতীরে কাকে দেখেছিলি,—তা'কেই বিয়ে করবি?"

মলিনা, চক্ষের জল মুছিয়া, দিদিমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। দিদি-মা বলিলেন,—"আমি সব শুনেছি, তোর ভিতর এত ছিল? সে যে ঐ বাগ্দীদের ছেলে, তার তিনটে বিয়ে!"

মলিনা রাগে, দুঃখে সে স্থান হইতে উঠিয়া গেল; নিভৃতে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। দিদি-মা রঙ্গ দেখিতে লাগিলেন। কারণ, তিনি শুনিয়াছিলেন, অমরনাথ ও বরের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন পাত্রী দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা প্রফুল্লকুমারকেও সঙ্গে আনিয়াছেন; সুতরাং শীঘ্রই মলিনার মুখে হাসি দেখিতে পাইবেন।

নগেন্দ্রনাথ শ্বশ্রূ-মাতাকে বলিলেন,—"মা, মলিনাকে পাত্রপক্ষ আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছেন, পাত্রও স্বয়ং উপস্থিত। মলিনাকে সাজাইয়া দিন।"

তখন মলিনার সঙ্গিনীগণ সাজাইয়া দিল। কেশবিন্যাস করিয়া দিল না, অলঙ্কার পরাইল না,—যে স্বভাব-সুন্দরী, তাহার সে সকলে প্রয়োজন কি? তাহারা মলিনাকে কেবল একখানি পরিষ্কার সাড়ী পরাইয়া দিল; কুন্তলরাজি এলাইয়া দিল; কণ্ঠে কুসুমহার দোলাইয়া দিল; কুসুমে কঙ্কণ গাঁথিয়া, হস্তে বাঁধিয়া দিল।

পরিচারিকা, মলিনাকে লইয়া বাহিরে আসিল। মলিনার বুকের ভিতর তখন সমুদ্র-মন্থন হইতেছিল।

অমরনাথ ইচ্ছা করিয়াই মলিনাকে প্রফুল্লকুমারের সম্মুখে বসাইলেন। উভয়েই অবনত-মুখ। মঙ্গলবিধি সম্পন্ন হইলে, সকলেই পাত্রীর রূপ-গুণের প্রশংসা করিলেন।

সেই অবসরে,—মলিনা একবার মুখখানি তুলিল। অতি ভয়ে ভয়ে, অতি চুপি চুপি, অতি সন্তর্পণে একবার আঁখি দুটী খুলিল। প্রফুল্লকুমারও সেই সময়ে মলিনার প্রতি চাহিলেন।

আবার সেই দেখা! কিন্তু সে দেখায় ও এই দেখায় কত প্রভেদ! মুহূর্ত্তের জন্য চারিটী পিপাসিত-আঁখি আবার মিলিল।

মলিনার হৃদয়ে আবার সমুদ্র মন্থন আরম্ভ হইল। কিন্তু এ মন্থনে ধন্বন্তরী-সুধা উঠিল! এ কি প্রহেলিকা, মায়া, না ইন্দ্রজাল?

মলিনা বাড়ীর ভিতর আসিল। দিদিমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মণি! বিয়ে করবি কিনা, এখন বল।"

মলিনা মুখখানি নত করিল। বুঝিল, দিদিমা সব জানিতেন।

বৃদ্ধা দেখিলেন, মলিনার অধরে হাসি আর ধরে না, নয়নে অশ্রু! সেই হাসি ও অশ্রুর অপূর্ব্ব সমন্বয় কি মধুর! দিদি মা সেই মাধুরিমা দেখিবার জন্যই সকল জানিয়াও কিছু ভাঙ্গেন নাই।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

স্থিতি-বিধায়িনী।

তারপর যাহা ঘটিল, সে কথা না বলিলেও চলে। তবু বলি, নহিলে আমার এ আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ হইবে না।

শুভদিনে, শুভক্ষণে, প্রফুল্লকুমারের সহিত মলিনার শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল। স্রোতস্বতী সমুদ্র-হৃদয়ে আপন হৃদয় মিশাইয়া কৃতার্থ হইল।

মলিনা বলিত,—"চিত্রকর! গঙ্গা-সৈকতে বসিয়া তেমন যাদুমন্ত্র কেন প্রয়োগ করিয়াছিলে?"

প্রফুল্ল। "কুহকিনি! তুমিই যাদুমন্ত্রে এ বন-বিহঙ্গকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়াছ!"

মলিনা। আমি পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া দিতেছি, পক্ষী উড়িয়া যাক্!

প্রফুল্ল। উড়িয়া কোথায় যাইবে? চারিদিকে তুমি, তোমাকে ছাড়িয়া সে কোথায় যাইবে? সেই উদার আকাশ, ঘন বন, তুঙ্গ শৃঙ্গ—সকলই ভুলিয়াছি, তোমার হৃদয়-মাঝে আজি প্রেমপাশে বন্দী! কি বিস্তৃত ও-হৃদয়! অপার রহস্য-নিলয়! প্রেমময়ি, আমি আপনা ভুলিয়াছি, তোমারই প্রেমের আলোকে বিশ্ব সমুজ্জ্বল দেখিতেছি!

মলিনা। আমি তোমার চরণ-রেণুরও সমতুল নহি।

প্রফুল্ল। তুমি আমার স্থিতি-বিধায়িনী।

মলিনা, প্রভাতে উঠিয়া অগ্রে স্বামীর চরণে প্রণাম করিয়া দেবতাকে প্রণাম করিত। প্রফুল্লকুমার জিজ্ঞাসা করিলে, বলিত,—"অগ্রে তুমি, পরে আর সব। তোমাকে প্রণাম না করিয়া ঠাকুর-প্রণাম করিলে, ঠাকুর-প্রণাম আমার সম্পূর্ণ হয় না।"

প্রফুল্ল মনে মনে ভাবিতেন,—"সুখে-দুঃখে, আশায়-নিরাশায়, এই প্রেম অবিচলিত, অবিকৃত, অপরাজিত! ইহাই এ দুঃখের সংসারে ধন্বন্তরি-সুধা! আজি এ চিত্ত শান্ত, এ হৃদয় তৃপ্ত! এই প্রীতি হইতেই সেই পরমা প্রীতি পাইয়া বিশ্বসংসার আপনার জ্ঞান করিব!"

সমাপ্ত।

শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত।

সমালোচনা।

পরিমল। (গীতি-কবিতা) শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। গরিবপুর চিকিৎসাপ্রকাশ-যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।০ আনা। গ্রন্থকার প্রথমেই স্বর্গীয় পিতৃদেবের চরণে "পরিমল" উৎসর্গ করিয়া বলিতেছেন :—

"দূরে রও—ঊর্দ্ধে রও তনয়ের অর্ঘ লও
হৃদয়ের চিরভক্তি অর্পিব চরণে; * * *
জানি না কোথায় স্বর্গ অথবা সে অপবর্গ—
মৃত্যু-পরে অনন্তের মহা সম্মিলন,
তুমি যে কোথায় আছ জানিব কেমন?
না বাবা, নহ ত দূরে, হৃদয়ের অন্তঃপুরে
নিত্য অশ্রুজলে সিক্ত করিব চরণ।
পাতি বুক ধরাতলে, ভাসি নয়নের জলে
কেঁদেছি অনেক দিন, কাঁদিব আবার;
যত দিন নাহি হয় স্মৃতির সংহার।
জ্বলুক শোকের বহ্নি, জ্বালাইব চিরদিন,
সেই শান্তি—সেই সুখ, জীবনে আমার।"

কথাটা বড় মর্ম্মান্তিক। "পরিমল" পড়িয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ফুলগুলির শোভা আছে, সৌরভও আছে। আর একটি সুখের কথা এই যে, গ্রন্থকার আধুনিক গীতি-কবিতার ছাঁচে "পরিমল" প্রণয়ন করেন নাই। ইহাতে সেই abstract ভাবের ধোঁয়া-ধোঁয়া ছায়ার একাধিপত্য নাই। তবে খুব cowcrede ভাবেরও প্রভাব নাই। কবি এ দুয়ের সামঞ্জস্যে, অনেকটা প্রাচীন কবিগণেরই পদানুসরণ করিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন। তবে একটা আক্ষেপের কথা এই, সুললিত-পদ-মাধুর্য্যে লেখক তেমন সৌভাগ্যশালী নহেন। "বর্ষ-বিদায়" শীর্ষক একটি কবিতার কিয়দংশ মাত্র আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম;—বুদ্ধিমান পাঠক, ইহা হইতেই আমাদের কথার প্রমাণ লউন;—

"অনন্ত কালের একটা কণিকা
বরষ চলিয়া যায়,—
সাথে শৃঙ্খলিত হাসি, হাহাকার,
ছিন্ন যুগপদে মায়া-ডোর-হার,
অতীতের আহ্বানে বর্ষ ধায়—
অর্ঘ দিতে কাল-পায়।
আয়ু-শতদল,—একটা তাহার
বরষ ছিঁড়িল দল;
এক বরষের জীবন টুটিল,
কর্ম্মক্ষেত্রে নর বারেক ভুলিল—
করমের মোহ, চাহিল ফিরিয়া
দেখিতে কালের কল।
অকাল বরষ শেষ দিনে ভানু
লুকা'ল অশিব ছবি!
আঁধারে আঁধারে লইয়া বিদায়,
অকাল বরষ অই চ'লে যায়!
নবীন বরষে, নবীন আলোকে
উঠিল নবীন রবি। * * * *
দানবের ছল্লা পে'ত না মানব,
পাপের মেলায় আর।
অই 'পুরোভাগে' কর্ম্মক্ষেত্র জাগে,
বুকে বাঁধি বল, চল চল আগে;
প'র না, প'র না পাতকের ফাঁসি—
ঐ রেখ' হাতে তরবার।"

কবিতাটি অতি সুন্দর, অতি হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু ইহার ভাব যেমন গভীর ও উদাত্তপূর্ণ, ভাষাটি কি তেমন সরল ও মনোজ্ঞ? "পরিমলে" এমন সুন্দর ও সুভাবপূর্ণ কবিতা অনেক আছে। "সংসার" "বনবাসে সীতা" "প্রত্যাখ্যানে" "উদ্ভ্রান্ত-প্রেম" প্রভৃতি কবিতায় কবির প্রগাঢ় চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু "কবির উপহার" "লর্ড টেনিসন" "জাতীয়-সম্মিলনী" "বসন্ত-পঞ্চমী" প্রভৃতি কবিতা আমাদের ভাল লাগিল না। সাময়িক কবিতায় কবি তেমন সিদ্ধহস্ত নহেন;—ঐ গুলি অনেকটা আন্তরিকতা-শূন্য। "বিধবার-বিয়ে" শীর্ষক কবিতায় কিন্তু তাঁহার স্বজাতি-প্রীতির সম্যক পরিচয় পাই;—

"কোন্ লাজে দিতে চায় বিধবার বিয়ে?
পুণ্য পবিত্রতা কেড়ে,
নারীর স্বধর্ম্ম ছেড়ে
দিতে চায় কার ধন কাহারে স'পিয়ে? *
"ধ্রুবমসি পতিকুলে"—
সে মন্ত্র যাইবে ভুলে
কুললক্ষ্মী চ'লে যাবে কুল তেয়াগিয়ে?
ধ্রুব তারা সাক্ষী করি
রহে পতি কুল ধরি;
মন্দাকিনী সিন্ধু এড়ি পড়িবে বহিয়ে?
কোন্ লাজে দিতে চায় বিধবার বিয়ে?
এক অদ্বৈত পতি,
সেই মতি,—সেই গতি,
হর-গৌরী আধ-আধ রহে যে মিলিয়ে!
এক আত্মা এক প্রাণ,
নাহি তার অবসান * * *
ধন, জন, পদ রূপ,
দেখে যেন ভস্ম-স্তূপ,
হৃদয়ে সাহারা যেন রেখেছে পুরিয়ে!
মরুভূমে প্রেম-নদী,
তবু বহে নিরবধি,
চির মমতার উৎস সংসার প্লাবিয়ে—
কোন্ লাজে দিতে চায় বিধবার বিয়ে?
সে ধৈর্য্য—সে কঠোরতা,
সুখে সেই নির্ম্মমতা,
সংসারে যোগিনী-মূর্ত্তি ফেলিবে মুছিয়ে;
বুকে সেই বজ্র-ব্যথা,
মুখে সেই নীরবতা,
দেখিবে না কোন দিন ব্রহ্মাণ্ড চাহিয়ে।
কোন্ লাজে দিতে চায় বিধবার বিয়ে?"

কবির এ মর্ম্ম-কাতরতা ও বীণার ঝঙ্কার,—আর কাহারও না হউক, হিন্দুর হৃদয় দ্রব করিবে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। তাঁহার লেখনী সার্থক হউক!

'পরিমলের' কবিতা সাজান ভাল হয় নাই। সাজাইবার গুণে, খণ্ড কবিতারও একখানি কাব্যের আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু 'পরিমল,' এ পন্থার অনুসরণ না করায় কেমন খাপ-ছাড়া হইয়াছে। সাময়িক, প্রাকৃতিক, আধ্যাত্মিক ও বিরহ-বিষয়ক কবিতাগুলি উল্‌টিয়া-পাল্‌টিয়া না দিয়া, শ্রেণী-বিভাগ করিয়া ছাপাইলেই ভাল হইত। যাহা হউক, "পরিমলের" কয়েকটী কবিতায় আমরা মোহিত হইয়াছি। মুখোপাধ্যায় মহাশয় আজীবন কবিতার অনুশীলন করুন, তিনি এ পদের যোগ্য ব্যক্তি। কারণ, তাঁহাতে প্রতিভা ও প্রেম আছে। কিন্তু আত্ম-তৃপ্তি, তথা জনসাধারণের পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াও যেন মনে না ভাবেন, "কবিতা লিখিব বলিয়া কবিতা লিখি নাই।" 'পরিমলের' 'প্রকরণে' এ কথা প্রকাশ। আমরাও তাই বড়-গলা করিয়া বলিতে পারি, মুখোপাধ্যায় মহাশয় বোধ হয় 'লিখিব মনে করিলে' আরও ভাল লিখিতে পারিতেন;—না? যাহাই হউক, তিনি ভাবে যেরূপ ভাগ্যবান্, ভাষায়ও সেইরূপ সৌভাগ্যশালী হইলে, আধুনিক গীতি-কবিতার স্রোত অনেক ফিরাইতে পারিবেন, এমন আশা করি। কবির "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" শীর্ষক কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া আমরা দেখাইতে চাই যে, তিনি কিরূপ ভাবুক, সহৃদয় ও উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতা-লেখক:—

"ভুলিব কেমনে সখি, ভোলা নাহি যায়;
সে ত গো বুঝেনি প্রেম, ঠেলিয়াছে পায়!
সে ত গো পতঙ্গ হ'য়ে দেখেনি কখন,
কি সুখ বহ্নির মুখে ত্যজিতে জীবন।
সে ত গো কজিজা ছিঁড়ে করেনিক দান,
সে ত গো পরের তরে হয়নি শ্মশান।
সে ত গো উল্কার মত জ্বলিতে জ্বলিতে—
পৃথিবীর বুকে এসে শিখেনি মিশিতে।
সে ত গো আমার মত চিতা সাজাইয়ে
দেয় নাই সুখ শান্তি অনলে ঢালিয়ে।
সে ত গো অমৃত ফেলে গরল কারণ—
করে নাই কোন দিন সিন্ধুর মন্থন।
সে ত গো বজ্রাগ্নি-আশে নবঘন পানে—
চেয়ে থাকে নাই কভু আকুল পরাণে!
সে ত সূর্য্যমুখী মত আকাশে চাহিয়ে—
অনল ভাস্কর পানে, মরেনি পুড়িয়ে।
প্রেম বিনিময়ে পেয়ে দুখ অশ্রুজল
সে ত গো হয়নি হেন প্রেমের পাগল!
জ্বলিতেছি, পুড়িতেছি তাহার কারণ,
সখিরে, অনলে তবু ঢালিব ইন্ধন।"

কবি বুঝিয়াছেন, সুখ আত্ম-প্রতিষ্ঠায় নহে,—আত্ম-বিসর্জ্জনে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এ অমৃতময়ী উক্তি সার্থক হউক। "পরিমলের" বহুল প্রচারে আমরা সুখী হইব।

কুল-বধূ। শ্রীযুক্ত শশিকমল সেন-বিরচিত। মূল্য ।০ আনা। স্ত্রী-পাঠ্য-গ্রন্থের মধ্যে এখানি মন্দ নয়। লেখাপড়া-জানা মেয়ে-ছেলেদের এ বই খানি একবার দেখা ভাল। অতএব ইহার বহুল প্রচারও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বইখানির আয়তন বিবেচনায়, দামটা কিছু বেশী হইয়াছে না?

জামাই-বরণ।—প্রহসন। "কলিরহাট" প্রভৃতি প্রণেতা কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা, ৬৩নং বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট, বসু প্রেসে প্রাপ্তব্য। মূল্য ।০ আনা। সজীব প্রহসন এখন সমাজে দু'বেলা দেখিতে পাই; কাজেই কেতাবের প্রহসন দেখিতে আর বড়-একটা সাধ নাই। "জামাই-বরণের" লেখক লিপি-কুশল। দীনবন্ধুর ছাঁচে ঢালা হইলেও, প্রহসন খানিতে একটু অপূর্ব্বত্ব আছে। সেই টুকই লেখকের বাহাদুরী। কিন্তু হাসি-মস্‌-করা বা রং সং ঢং তেমন পাকা নয়,—প্লটেও তেমন বৈচিত্র্য নাই।

জন্মভূমি।

৪র্থ ভাগ। } অগ্রহায়ণ। ১৩০১। { ১২শ সংখ্যা।

তমস্বিনী।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চারুবালার খুব বড়মানুষের ঘরে বিবাহ হইয়াছিল। তাহার বরের নাম রজনীকান্ত। বয়স বিশ বৎসর, দেখিতে মন্দ নয়। বর্ণ গৌর নয়, কিন্তু মুখের শ্রী ভাল, আর দেখিতে ভালমানুষ। রজনীকান্তের পিতার অগাধ সম্পত্তি, কিন্তু তাঁহার দুইটী দোষ (না গুণ?) ছিল। স্বভাবটা কিছু কৃপণ এবং সন্তানদিগের প্রতি শাসন কিছু কঠিন। শুধু সন্তানেরা কেন, কর্ত্তা মহাশয়ের ভয়ে বাড়ীশুদ্ধ লোক কাঁপিত। নামকরণের সময় বাপ মা নাম রাখিয়াছিলেন দীনবন্ধু, কিন্তু স্বভাবটা সে রকম হয় নাই। দীনবন্ধু বাবুর রাশ বড় ভারি, এমন কি চারু-বালার বাপ পর্য্যন্ত বেহাই মহাশয়কে একটু ভয় করিতেন।

সেইজন্য রজনীকান্ত বড়মানুষের ছেলে হইয়াও বিশেষ কোন রকম বড়মানুষী চাল শিখিতে পারে নাই। বাড়ীতে সব বিষয়ে কড়াকড়, ছেলে উপযুক্ত হইলেও বাপকে জুজুর মত ভয় করিত। বাড়ীর গাড়ী করিয়া রজনী-কান্ত স্কুলে যাইত ও সেই গাড়ী করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিত। অনুমতি ব্যতীত আর কোথাও যাইবার সাধ্য ছিল না। বাড়ীতে মাষ্টার পড়াইতে আসিত। সে কিছুদিন পূর্ব্বের কথা।

এই রকম ধরা-বাঁধায় রজনীকান্তের স্বভাব নির্দ্দোষ ছিল। কেবল কপালের দোষে বুদ্ধি একটু স্থূল। মাজিয়া ঘসিয়া সেটা আর সূক্ষ্ম হয় নাই। দীনবন্ধু বাবু বার কয়েক ধমক চমক দিয়া কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ধমকে বুদ্ধি বাড়ে না, যে টুকু বা থাকে তাহাও লোপ পায়। ছেলে যে পড়া শুনায় বিশেষ ভাল হইবে, দীনবন্ধু সে আশাও বড় রাখিতেন না। পাছে একেবারে মন্দ হইয়া যায়, এই তাঁহার ভয়।

রজনীকান্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিন চার বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে। মাষ্টারের উৎপাত এবং স্কুলের হাঙ্গামাও নিবৃত্ত হইয়াছে। এখন পূর্ব্বের মত আর তত কঠিন শাসন নাই, কিন্তু অভ্যাসবশতঃ ছেলে বাপকে আগের মতই ভয় করিত।

গৃহিণীও কর্ত্তার ভয়ে কাঁটা, কিন্তু পুত্রবধূকে আর বাপের বাড়ী রাখা ভাল দেখায় না—এ

কথাটা মধ্যে মধ্যে তিনি কর্তাকে স্মরণ করাইয়া দিতেন। দীনবন্ধু সে কথায় বড় একটা কাণ দিতেন না। দুই একবার চারুবালাকে শ্বশুর-বাড়ী লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু যখন বাপের বাড়ীর লোক আনিতে যাইত, তখন কর্তা নিজে তাহাকে পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার মনের কথাটা তিনি কাহাকেও বলিতেন না। কথাটা আর কিছু নয়, তাঁহার ইচ্ছা যে, পুত্র ও বধূ আর কিছুদিন পৃথক থাকে। আজকালের ছেলেগুলা নিতান্ত স্ত্রৈণ হইয়া যায়। দীনবন্ধু নিজে স্ত্রৈণ ছিলেন না, সুতরাং পুত্র স্ত্রৈণ হয় এমন ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। দীনবন্ধুর সৌভাগ্যক্রমে পত্নীবিয়োগ হয় নাই, অতএব দ্বিতীয় পক্ষে প্রবীণ পুরুষেরাও কেন এমন স্ত্রৈণ হয়, সে কথা তাঁহাকে বিবেচনা করিতে হয় নাই।

এ পর্য্যন্ত চারুবালার বেশী দিন শ্বশুরঘর করা হইয়া উঠে নাই। সেজন্য তাহার বিশেষ ক্ষোভও ছিল না। সে বাপের বাড়ীর আদুরে মেয়ে, শ্বশুরবাড়ী যাইবার জন্য বড় ব্যস্ত নয়। সহরে শ্বশুরবাড়ী হইয়া একটা সুবিধা হইয়াছিল, যখন তখন ক্রিয়াকর্ম্মের সময় দুই বাড়ীই আসা যাওয়া করিতে পারিত। তবু অবশেষে মেয়ে মানুষের শ্বশুর ঘরই নিজের ঘর হয়। একবার ভাল করিয়া চিনিলে বাপের বাড়ী আর তেমন মন টিকে না। দু দিনের তরে আসিলে অসুবিধা বোধ হয়, মনটা কেমন খুঁৎখুঁৎ করে।

চারুবালার এখনও সেদিন আসে নাই। শ্বশুরবাড়ী যাইবার বড় ইচ্ছাই হইত না। কিন্তু তবু তাহার মন একটু চঞ্চল হইয়াছিল। নবীন দম্পতির পরস্পর দর্শনানুরাগ বাড়িতেছিল। রজনীকান্ত জামাই মানুষ, তাহাতে আবার এ কালের মত জামাই নয়। আপনা আপনি শ্বশুর বাড়ী যাওয়া, কিংবা বিনা নিমন্ত্রণে রাত্রে চাঁদ মুখখানি দেখিবার জন্য উপস্থিত হওয়া,—এ সব তাহার ছিল না। নিজের ইচ্ছায় যত না হউক, বাপের ভয়ে রজনীকান্তকে এইরূপ করিতে হইত। আবার শ্বশুর বাড়ী নিত্য নিশি যাপনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা ভাল দেখায় না, এমন নিমন্ত্রণ করিতেও আসে না। এইরূপ নানা কারণে সে কালের মানুষ না হইয়াও রজনীকান্ত কতকটা সে কালের জামাইয়ের মত। এজন্য শাশুড়ী মহলে তাহার বিস্তর সুখ্যাতি এবং শ্যালী মহলে কিছু নিন্দা ছিল।

কালে ভদ্রে এই রকম দেখা, এইজন্য এই নব দম্পতির প্রেম এ পর্য্যন্ত তেমন প্রগাঢ় ও মুক্ত হইতে পারে নাই। লজ্জায় দুই জনের হৃদয় কিছু সঙ্কীর্ণ ছিল। রাত্রে প্রদীপ নিভাইয়া না শুইলে দুই জনেরই লজ্জা করিত, একটু বেশী চোকোচোকি হইলে দুই জনেই চক্ষু নত করিত, পরস্পরের সহিত একটু জোরে কথা কহিতে সাহস হইত না। যে দিন রজনীকান্তের নিমন্ত্রণ হইত, সে সহজে শয়ন করিতে যাইত না, বৈঠকখানায় কিংবা বাহিরের আর কোন ঘরে বসিয়া বাড়ীর ও পাড়া সম্পর্কের শ্যালা বাবুদের সহিত গালগল্প করিত। ডাকাডাকির পর শুইতে যাইত। শুইতে অনিচ্ছা নয়, নিন্দার ভয়। চারুবালারও সেই গতি। তাহাকেও অনেক সাধাসাধি করিয়া ঘরে শোয়াইয়া দিয়া আসিতে হইত। কোন কোন দিন মুক্ত থাকিত, কিন্তু অত রাত্রে নিজের ঘর শূন্য রাখিয়া সে বড় একটা আসিতে পাইত না, রাত্রে শ্যামাচরণও তাহাকে সহজে চক্ষের আড়াল করিতেন না।

কিন্তু প্রায়ই চারুবালাকে আগে গিয়া শুইতে হইত। খানিকক্ষণ সে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিত, তার পর রজনীকান্ত আসিত। আবার এ দিকে খুব ভোরে, কোন দিন কাক না ডাকিতে উঠিয়া চলিয়া যাইত। সেও

কেবল নিন্দার ভয়ে। চারুবালা কোন কোন দিন টের পাইত না, রজনীকান্ত কখন উঠিয়া চলিয়া যাইত। যেমন অল্পে অল্পে লজ্জা ঘুচিতে লাগিল অমনি ক্রমে ক্রমে দুই জনেরই একটা অভাব বোধ হইতে লাগিল। এক এক দিন চারুবালার অভিমান হইত, রজনীকান্ত আসিলে তাহার সহিত কথা কহিত না, পাশ ফিরিয়া বিছানার এক ধারে শুইয়া থাকিত।

রজনীকান্ত কাছে গিয়া একটু অপরাধীর মত জিজ্ঞাসা করিত, "কেন, কি হয়েছে? আমার উপর রাগ কেন?"

অভিমানিনীর মুখে কথাই নাই।

রজনীকান্ত তখন গা ঠেলা দিয়া বলিত, "আমি এত দিন অন্তর একবার কোরে আসি, তাহাতেও কি রাগ? তা না হয় আর আসব না।"

চারুবালা মড়ার মত।

রজনীকান্ত মানভঞ্জন শাস্ত্রে তেমন পণ্ডিত নয়। সে বেচারি আস্তে আস্তে গিয়া বিছানার আর এক পাশে শয়ন করিত।

সে ঘুমাইয়া পড়ে দেখিয়া চারুবালার মুখ ফুটিত। বলিত, "আমি কি তোমায় আস্‌তে বারণ করি যে, তুমি অমন কথা বলচ?"

"আবার কি কোরে বারণ কোর্‌বে? মাস খানেক পরে যদি এলাম, ত আমার সঙ্গে কথাই কবে না। আর কি দূর দূর কোরে তাড়িয়ে দেবে? তা না হয় যদি ইচ্ছে হয় ত তাই দাও। বাকি আর থাকে কেন?"

"মা গো, আমি কি তাই বল্লুম! তোমার কেমন মন, সব কথাই যেন উল্টো বুঝ্‌তে হয়।"

বলিতে মানিনীর কথা একটু জড়াইয়া আসিল। তখন রজনীকান্ত তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। এখন, চোকাচোকি হইলেই দুই জনের হাসি পায়। চোকে চোক মিলিতেই দুই জনের মুখে হাসি দেখা দিল। রজনীকান্ত আবার গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে সত্যি বল না?"

অমনি অভিমান উথলিয়া উঠিল, লজ্জা টুটিয়া গেল। "তুমি সকাল বেলা উঠে চলে যাও, আমায় কি একবার বলে যেতেও নেই?"

"তাই এত রাগ!"

রজনীকান্ত সেয়ানা হইলে রাগের কারণ গোড়াতেই বুঝিতে পারিত, কিন্তু সে একটু বোকা কি না, প্রেমবৈচিত্র্য সব সময় শীঘ্র বুঝিতে পারিত না।

এমনতর রাগারাগি যে দিন হইত, সে দিন তার পর আদরেরও কিছু বাড়াবাড়ি হইত, সকাল বেলা বিদায়ের পালাটাও তেমন সংক্ষিপ্ত হইত না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এককালে প্যারীমাধব রায় খুব সৌখীন লোক ছিলেন। সহরে যত রকম আমোদ ছিল, সমস্তই উপভোগ করিয়াছিলেন। এখন বয়স হইয়াছে, বৃহৎ পরিবারের চিন্তা অর্থচিন্তা—এই রকম নানা কারণে আর তেমন আমোদ-পরায়ণ ছিলেন না। কিন্তু বন্ধুমহলে রসিক লোক বলিয়া তাঁহার পসার ছিল, এবং তিনি নহিলে আমোদ ভাল জমিত না। এজন্য সর্ব্বদাই তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত, কিন্তু সকল সময় তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিতেন না। কখন শরীর অসুস্থ, কখন গৃহিণী যাইতে দিতেন না। পূর্ব্বে স্ত্রীর কথা প্যারীমাধব কাণেই তুলিতেন না, কিন্তু এখন স্ত্রীর বশীভূত হইতেছিলেন। লোকে এমন পর্য্যন্ত বলিত যে, তাঁহার কাণ পাতলা। আগে ছিল না, এখন হইয়াছে।

সব সময় বন্ধু বান্ধবের কথা এড়ান যায় না। এক দিন একজন বড় জমীদারের বাড়ী

প্যারীমাধবের নিমন্ত্রণ হয়। উপলক্ষ আর কিছুই নয়, কেবল পাঁচ জন বন্ধু মিলিয়া আমোদ করা। প্যারীমাধব যাইবেন কি না ভাবিতেছিলেন। গৃহিণী বড় চাপিয়া ধরিয়াছিলেন, কিছুতেই যাইতে দিবেন না। বৈকালে জল খাবার সময় প্যারীমাধব গৃহিণীর কথায় সায় দিলেন, কহিলেন, "আজ বাড়ীতেই খাব, নিমন্ত্রণে যাব না।"

গৃহিণী শুনিয়া আনন্দিত হইলেন।

সন্ধ্যার সময় প্যারীমাধব বৈঠকখানায় অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া আছেন, সটকার নল পাশে পড়িয়া রহিয়াছে, এমন সময় নীচে কে জিজ্ঞাসা করিল, "ওরে, বাবু বাড়ী আছেন ?" একজন চাকর উত্তর দিল, "আছেন।" আর অন্য কথার অপেক্ষা না করিয়া সে ব্যক্তি উপরে উঠিয়া আসিল। প্যারীমাধবকে দেখিয়া কহিল, "এই যে একলাটী বসে যে !"

প্যারীমাধব উঠিয়া আগন্তুকের সহিত জোরে সেকহ্যাণ্ড করিলেন। অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "বিলক্ষণ, গোবিন্দ কোথা থেকে ! তোমার ত এখন দেখা পাবারই জো নেই ! বস, বস !"

গোবিন্দচন্দ্র বসু একজন প্রধান কর্ম্মচারী। রাজকর্ম্মে বিশেষ প্রশংসিত। যেমন কর্ম্মে দক্ষ, তেমনি পণ্ডিত। কিন্তু আমোদ পাইলে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকিত না। কতক লোকে এই কারণে তাঁহার গ্লানি করিত। কেহ বলিত, সঙ্গ দোষে তাঁহার এমন দশা। ইয়ার লোকে বলিত, গোবিন্দ বাবুর প্রাণ বেশ সাদা।

গোবিন্দচন্দ্র বসিয়া অভ্যাস বশতঃ আল্‌বোলার নলটা মুখে দিলেন। বার কয়েক টানিয়া, মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, "কিছু নেই, পুড়ে গিয়েছে।"

প্যারীমাধব ডাকিলেন, "ওরে তামাক দিয়ে যা।"

পান তামাকু আসিলে পর গোবিন্দচন্দ্র কহিলেন, "তুমি যে বড় নিঝুম হয়ে বসে আছ ? ব্যাপারখানা কি ?"

"কি আর কোর্‌ব ? শরীরটা তেমন ভাল নেই, তাই চুপ করে বসে আছি।"

"শরীরের কথায় আর কাজ কি ! শরীরং ব্যাধিমন্দিরং। আর তোমার শরীরের অপরাধই বা কি বল !"

প্যারীমাধব তাকিয়া ঠেসান দিয়া জাগরিত সুখস্মৃতির ও সন্ধ্যাকালের আলস্যে চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত করিয়া স্মিতমুখে কহিলেন, "সে কথায় আর কাজ কি ভাই ? মজা যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। এখন বুড়ো হয়ে পড়া যাচ্চে।"

"বিলক্ষণ, তুমি বুড়ো হলেই ত গিয়েছি। আমরা ত তা হলে আর নেই।"

"তোমরা এখনো ছেলে মানুষ। আমরা বয়সেও বড়, আর তোমাদের চেয়ে দেখিছি শুনেছিও বেশী।"

"তা আর বল্‌তে, দাদা ! এখন আমাদেরও একটু দেখাও শোনাও। আমরা কি চিরকাল হাঁৎড়িয়ে মর্‌ব ?"

"দেখাতে হবে না ভাই, আপনি দেখ্‌বে। তুমি এমন ফেলাই বা যাও কি ?"

গোবিন্দচন্দ্র সহসা বলিলেন, "যা মনে করে এলাম, তাই যে ভুলে যাচ্ছি। বরদাদের বাড়ী যাবে না ? তোমার অবশ্য নিমন্ত্রণ হয়েছে।"

"হাঁ, নিমন্ত্রণ ত হয়েছে, কিন্তু আজ আর যাব না। শরীরটাও কেমন মাটী মাটী কোর্‌ছে, আর বাড়ীতে সব বারণ কর্‌ছে।"

"তাও কি হয় দাদা ? তুমি না গেলে কিছুই আমোদ হবে না। তুমি যদি না যাও ত আমিও যাব না। নাচ গাওনার বন্দোবস্ত নাকি বেশ ভাল হয়েচে।"

"আর ভাই, তুমিও যেমন! ষাঁড় ভাঁড় আর ভাল লাগে না।"

"বেশ বলেছ দাদা! বাকি রইল নামাবলী আর তুলসী মালা। কিন্তু এখন আর বেশী দেরী কোরো না, শীঘ্র এস। আমার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।"

"তুমি কি নিতান্তই ছাড়্‌বে না নাকি?"

"তোমায় ছাড়্‌লে আর বাকি রইল কি?"

"তবে একটু বস, কাপড় পরে আসি।"

গোবিন্দচন্দ্র শশব্যস্তে উঠিয়া প্যারীমাধবের হাত ধরিলেন, কহিলেন, "না ভাই, তা হবে না। অন্দরমহলে গেলে হাতছাড়া হবে। যা পর্‌বার হয় এইখানে পর।"

প্যারীমাধব কহিলেন, "তুমি আমায় বিশ্বাস কোর্‌চ না? বলচি কাপড় পরে এখনি আসচি।"

"তোমায় বিশ্বাস কোর্‌ব না কেন, কিন্তু তোমার যে লক্ষ্মী সরস্বতী মাথার মণি স্বরণী গৃহিণী ব্রাহ্মণী, তাঁকে বিশ্বাস নেই। বাবা, সন্ধ্যার সময় খাঁচায় ঢুক্‌লে আর উড়্‌তে পার্‌বে না। সোহাগ শিকলী বাজিবে পায় যখন, তখন কি আর পালাতে পার্‌বে? সে সব হবে না দাদা, অমনি একছুটেই এস। নেহাত যদি লজ্জা করে ত এই নাও আমার উড়ানী।" বলিয়া গোবিন্দচন্দ্র আপনার গলার উড়ানী প্যারীমাধবের গলায় দিলেন।

"হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ" করিয়া প্যারীমাধব হাসিলেন। তাঁহার সঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র যোগ দিলেন। হাসির ধমকে ঘর যেন ফাটিয়া গেল। হাসির শব্দ শুনিয়া গোটাকতক চড়ুই পাখী ভয় পাইয়া উড়িয়া গেল। হাসিতে হাসিতে প্যারীমাধবের পাঁজর ধরিয়া গেল। অনেক কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া কহিলেন, "আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়েছি।" তাহার পর ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন, "কাপড় নিয়ে আয়, আর বাড়ীতে বলে আয়, আমি রাত্রে বাড়ীতে খাব না।"

বরদাপ্রসাদ চৌধুরী যশোহর জেলায় মস্ত জমীদার। কলিকাতায় বড় বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতেন। পাড়াগাঁয়ে পড়িয়া থাকিলে কে কাহাকে চেনে?

প্যারীমাধব ও গোবিন্দচন্দ্র আসিলে চৌধুরী মহাশয় মহাসমাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। চৌধুরী মহাশয়ের আকৃতি হস্তীর ন্যায়, বুদ্ধি আরও কিছু স্থূল।

নিমন্ত্রণ বেশী লোকের হয় নাই। পার্টি খুব সিলেক্ট। বাছা বাছা পাঁচ ছয়জন বন্ধুতে মিলিয়া রাত্রিটা আমোদ আহ্লাদে কাটাইবার ইচ্ছা।

প্রথম অবস্থায় বাবুরা চেয়ারে ও সোফায় উপবেশন করিলেন। রাত্রে চৌধুরী মহাশয় মাটীতে বসিয়া আহার করিতেন না। রাঁধুনী ব্রাহ্মণকে রাত্রি দুপর পর্য্যন্ত বসাইয়া রাখিলে দোষ নাই, কিন্তু খানসামা!—ডিনর যথাসময়ে সম্পন্ন হইয়া গেল। তখন সকলেই গোলাপী রাগে রঞ্জিত।

সে সময় যে কথোপকথন হইতেছিল, তাহার অধিকাংশই ইংরাজী। গ্লাস দুই পান করিলে গোবিন্দচন্দ্র আর মোটেই বাঙ্গালা বলিতে পারিতেন না। চৌধুরী মহাশয় ইংরাজিতে একেবারে,—কিন্তু ফোঁটা কতক ব্রাণ্ডি পেটে পড়িলে যে সাতপুরুষে ইংরাজি জানে না, তাহারও মুখে ইংরাজি আসে।

হরিচরণ হাইকোর্টের উকীল। বয়স হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, প্রাণটা এখনও হামাগুড়ি দেয়। তিনি এ কালের ছেলেদের কথা বলিতেছিলেন। ব্রাণ্ডির গুণে প্রাণ ও মুখ খুলিয়া গিয়াছিল। "হত আমাদের কালে, ত জলবিছুটী দিয়ে ঠিক কোরে দিত! আজ কালের

বাবুরা গুরুমশায়েরকাছে কখন ত নাড়ুগোপাল হন নি।"

গোবিন্দচন্দ্র কহিলেন, "ওটা তোমার অন্যায়। ছেলে ছোকরার কিছু দোষ কিছু গুণ থাকবারই কথা। আমরাই কি এক কালে ছেলে মানুষ ছিলাম না?"

হরিচরণ স্পিরিটের মত জ্বলিয়া উঠিলেন। "আরে তুমি ত সব জান কি না! আপিসে সাহেবের মুখখানি আর বাড়ীতে বসে কোণে বই পড়া। এতে আর তুমি কি দেখবে বল? ভাগ্যিস্ প্যারীমাধবের সঙ্গে জুটে গিয়েছিলে, তাই যা একটু চোক কাণ ফুটেছে।"

প্যারীমাধব কহিলেন, "আরে তুমিও যেমন, গোবিন্দ নিজে ছেলে ছোকরার মধ্যে, ওর কথা শোন কেন?"

হরিচরণ তখন একটু ঠাণ্ডা হইয়া প্যারীমাধবের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমাদের সময় কি এখনকার কাণ্ড কিছু ছিল? উচ্ছন্ন যাবার এখন যে কত পথ হয়েছে, তার আর সংখ্যা নেই।"

এ কথায় আর কেহ অসম্মতি প্রকাশ করিল না। চৌধুরী মহাশয় মধ্যে মধ্যে শিরশ্চালন পুর্ব্বক "ঠিক বলেছ" বলিয়া কথায় সায় দিতেছিলেন।

হরিচরণ আরও গরম হইয়া বলিতে লাগিলেন, "সোজাসুজি গোল্লায় যাবার যে পথ আছে, সকলেই চেনে। কিন্তু এখন আবার নতুন রকম। কোন বেটা হেন হন, কোন বেটা তেন হন। আবার কত বেটা ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে গোল্লায় যায়।"

হরিচরণ বাবুর এক ছেলের ধর্ম্মের প্রতি কিছু অনুরাগ হইয়াছিল। কেহ বলিত ব্রাহ্ম হইবে, কেহ বলিত খৃষ্টান হইবে। তাহা শুনিয়া জাতিভয়ে পরম হিন্দু হরিচরণ ছেলেকে ডাকিয়া অনেক রকম শাসাইয়াছিলেন, বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবেন পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন। ছেলে উত্তরে একটী কথাও বলিল না, কিন্তু পিতৃবাক্যও শুনিল না, পূর্ব্বে যেমন যেখানে ইচ্ছা যাওয়া আসা করিত সেইরূপ করিতে লাগিল।

সেকালে আর একালে লাঠালাঠি কখন আর থামিল না। সে কালের লোক ভাল ছিল কি এখনকার লোক ভাল, বাপ ভাল কি ছেলে ভাল, পিতামহ ভাল কি পৌত্র ভাল, সে মীমাংসা করা দুষ্কর। কিন্তু একটী বিষয়ের নির্ণয় আছে। বৃদ্ধ ও যুবকে যত স্বভাব বৈপরীত্য, ততই পরস্পরের প্রতি বিরক্তি। পিতা দুর্জ্জন, পুত্র সুজন, অথবা পিতা সচ্চরিত্র, পুত্র অসচ্চরিত্র, এমন অবস্থায় সদ্ভাব অসম্ভব। আবার ইহাদের মধ্যে যে অপরের কুৎসা অধিক করে, সেই নিশ্চিত অধিক দোষী।

অবশেষে প্যারীমাধব, চৌধুরী মহাশয়কে কহিলেন, "বলি, তোমার আমোদ আহ্লাদ কই?"

চৌধুরী মহাশয় অমনি উঠিলেন, বলিলেন, "যা দেরি তোমাদের। নইলে সব প্রস্তুত।"

তখন সকলে উঠিয়া কিঞ্চিৎ স্খলিত গমনে আর এক প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। সে ঘরে ঢালা বিছানা, খুব পুরু গালিচার উপর ধবধবে চাদর পাতা রহিয়াছে, চারিদিকে বড় বড় নরম নরম তাকিয়া। মাঝখানে ষোল ডালওয়ালা বেলওয়ারি ঝাড়, তাহাতে ষোলটা মোমবাতি জ্বলিতেছে। সেই শীতল শুভ্র আলোকে গৃহ আলোকিত হইয়াছে।

"আঃ বাঁচলাম" বলিয়া চৌধুরী মহাশয়প্রমুখ বন্ধুগণ এক এক তাকিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিছানার উপর রূপার মুখনল ও যুঁইফুলের থোপনা সুদ্ধ আলবোলার নল পড়িল। ডিকাণ্টর গ্লাস বরফ প্রভৃতিও সঙ্গে সঙ্গে আসিল।

গৃহকর্ত্তা ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে, সরকার এয়েচে ?"

"আজ্ঞে গাড়ী নিয়ে গিয়েছে অনেক ক্ষণ, এই এলেন বলে।"

যে নর্ত্তকীকে রাত্রের জন্য বায়না দেওয়া হইয়াছিল, সরকার তাহাকেই আনিতে গিয়াছিল। বাবুরা বৈঠকখানায় বসিলে একটু পরেই নর্ত্তকী আসিয়া উপস্থিত হইল। সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারে ঢাকা, মুখে এক গাল পান। কাপড় চোপোড়ে নানাপ্রকার গন্ধসামগ্রী। ঘরে প্রবেশ করিয়া, মাথার কাপড় একটু সরাইয়া, পা ঢাকা দিয়া, ফিক্ করিয়া হাসিয়া ঘরের মাঝখানে বসিল।

প্যারীমাধব অনেক ঘাটে জল খাইয়াছিলেন। নর্ত্তকীকে দেখিয়া চিনিলেন, কহিলেন, "কি গোলাপ, কেমন আছ ?"

গোলাপ মর্ম্মভেদী বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "এই যেমন দেখছেন। আপনার দেখা পাওয়াই ভার। ক্রমে ডুমুর ফুলটী হয়ে উঠ্‌ছেন।"

"তা নয়। ছিলাম ফুল এককালে, এখন শুকিয়ে গাছতলায় পড়ে গিয়েছি। আর বয়সও হতে চল্‌ল।"

"আ হা হা, কথার কিবা শ্রী।" বলিয়া গোলাপ, চৌধুরী মহাশয়ের প্রতি কটাক্ষপাত করিল। তিনি বলিলেন, "কি হে, আস্‌তে এত দেরি হল কেন ?"

"কেন, যেই লোক ডাক্‌তে গেল, অমনি ত এসেচি। দেরি আবার কোথায় হল !"

"আমরা কতক্ষণ থেকে তোমার পথ চেয়ে বসে আছি।"

"আমার কত ভাগ্য !"

গোবিন্দচন্দ্র কহিলেন, "অত দূরে বস্‌লে কেন, একটু কাছে এসে বস না।"

"কেন, বেশ ত বসেচি।"

প্যারীমাধব বাবু সটকার নল হাতে করিয়া মুখনল গোলাপের মুখের কাছে ধরিয়া কহিলেন, "এটা একবার প্রসাদ কোরে দাও।"

গোলাপ হাসিয়া নল হাতে লইল। কহিল, "বলুন না কেন আপনাদের প্রসাদ পাই।"

গোবিন্দচন্দ্র একটু পরে কহিলেন, "এখন একটা গাও।"

"কি গায়িব বলুন।"

"কিন্তু বাজাইবে কে ?" চৌধুরী মহাশয়ের বুদ্ধি সহজেই স্থূল, তাহাতে সুরাপানে জড়িত বুদ্ধিতে বিষম সংশয় উপস্থিত হইল।

প্যারীমাধব কহিলেন, "হরিচরণ থাক্‌তে আবার জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয় ?"

"তাও ত বটে।"

বাঁয়া তবলা আসিলে হরিচরণ হাতুড়ি দিয়া খানিকক্ষণ ঠুক্ ঠাক্ করিয়া যন্ত্র বাঁধিয়া লইলেন। তার পর দুই চারিবার চাঁটি দিয়া গোলাপকে কহিলেন, "ধর।"

গোলাপ মৃদু মৃদু হাসিয়া কহিল, "কি গায়িব ?"

প্যারীমাধব ডিকাণ্টার ও গ্লাস তাড়াতাড়ি তাহার সম্মুখে ধরিয়া কহিলেন, "বাঃ, শুধু মুখে গায়িতে পার্‌বে কেন ? এক গ্লাস খেয়ে গাও।"

গোলাপ হাত নাড়িয়া অস্বীকার করিল, "না, আপনারা খান, আমি খাব না।"

"তাও কি কখন হয়! গায়িতে এখনি গলা শুকিয়ে যাবে। একটুখানি খাও।"

সকলের পীড়াপীড়িতে অবশেষে গোলাপ এক গ্লাস পান করিল। পরে প্রকোষ্ঠ ধ্বনিত করিয়া গায়িতে লাগিল। সঙ্গীতে মোহিত হইয়া শ্রোতৃগণ কিছু ঘন ঘন গ্লাস নিঃশেষ করিতে লাগিলেন।

ফরমায়েশ হইল, "নাচের সঙ্গে হউক।"

তখন উঠিয়া নর্ত্তকী নাচিতে লাগিল।

বাইজীর ধরণে নাচ, হস্ত ও অঙ্গভঙ্গী করিয়া তবলার তালে তালে নাচিতে লাগিল। তাহার শরীরে যেন লালসার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, যেন প্রতি পদক্ষেপে চারিদিকে তরল বিদ্যুৎ ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। চৌধুরী মহাশয় গোবিন্দচন্দ্রকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোলাপ একটা না দুটো? আমি দেখ্‌ছি দুটো।"

"তবে বাবা তোমার এখনো চোকের দোষ আছে। আমি দেখ ছি গোলাপময় ত্রিভুবন।"

নাচিতে নাচিতে গোলাপ তাহার সাড়ীর আঁচলা প্যারীমাধবের মুখের উপর ফেলিয়া টানিয়া লইল। আঁচলার জরিতে প্যারীমাধবের মুখে যেন কণ্টক বিদ্ধ হইল। তিনি কহিলেন, "মরার উপর খাঁড়ার ঘা কেন?"

হরিচরণ একজন বিখ্যাত বাজিয়ে, কিন্তু অতিরিক্ত সুরাপানে মাথার ও হাতের কিছুই ঠিক ছিল না। নৃত্য ছাড়িয়া গোলাপ যখন আবার গীত ধরিল, তখন হরিচণের একবার তাল ভঙ্গ হইল। গোলাপ তৎক্ষণাৎ গান বন্ধ করিয়া, ভ্রূভঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওকি?" হরিচরণের চমক ভাঙ্গিল। গুরু মহাশয়ের কাছে কাণমলা খাইলে বালক যেমন অপ্রতিভ হয়, হরিচরণ সেইরূপ অপ্রতিভ হইয়া আপনার দোষ স্বীকার করিলেন। গোলাপ আবার গায়িতে আরম্ভ করিল।

কিছুক্ষণ পরে হরিচরণ আবার তাল ঠিক রাখিতে পারিলেন না। গোলাপ গান বন্ধ করিয়া আর এক গ্লাস ব্রাণ্ডি পান করিল হরিচরণ দুই চারিবার তাহাকে গান করিতে অনুরোধ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন।

গোবিন্দচন্দ্র কোন ভাবে মুগ্ধ হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। যেমন করিয়া মাতালে কাঁদে, সেইরূপ কাঁদিতেছিলেন। প্যারীমাধ অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ ছিলেন, কহিলেন, 'ভাবে যে তেলাকুচো রে!"

সহসা মাতালের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। গোবিন্দচন্দ্রের স্বদেশবাৎসল্য সহসা উথলিয়া উঠিল। চক্ষু মুছিয়া গোলাপকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, জড়িত স্বরে কহিলেন, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী!"

গোলাপেরও আদব কায়দা ব্রাণ্ডির তেজে অন্তর্হিত হইতেছিল। গোবিন্দচন্দ্রের রকম দেখিয়া ও তাঁহার কথা শুনিয়া কহিল, "মর্ মিন্সে বলে কি! এই সময় বুঝি ওঁর জননীকে মনে পড়্‌ল!"

সাষ্টাঙ্গ হইয়া গোবিন্দচন্দ্র দেখিলেন বিছানার আর এক দিকে চৌধুরী মহাশয় অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছেন। তাঁহার নাসিকাগর্জ্জন বৃংহিতের ন্যায় শব্দিত হইতেছে।

সেই নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া গোবিন্দচন্দ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "The fittest survive!" বলিয়া স্বয়ং পাশ ফিরিয়া শয়ন করিলেন। (ক্রমশঃ।)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

ইন্দ্রপ্রস্থ

(২)

যেখানে মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, যমুনা-সন্নিহিত উক্ত স্থানকে আগম-বোড়ের ঘাট বলে। এই স্থান এখন ভীষণ শ্মশান। এখানে অবিশ্রান্ত মৃতদেহ-দাহ হইতেছে, দিল্লী-সহরের যাবতীয় গতাসুর এইখানেই সৎকার হইয়া থাকে।

যেখানে মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, যেখানে ময়দানব-নির্ম্মিত যজ্ঞশালার শোভা-সমৃদ্ধি সন্দর্শনে ঈর্ষা-পরবশ

হইয়া দুর্য্যোধন দারুণ পাশক্রীড়ার প্রস্তাব করিয়াছিলেন—যাহার বিষময় পরিণাম, ভারত-ভূমিকে বীরশূন্যা করিয়াছিল—সেই রাজসূয় ক্ষেত্রই বর্ত্তমান দিল্লী-সহর। আমরা ইহার যথাদৃষ্ট কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সময় হইতে সাজিহান বাদশাহের অধিকার পর্য্যন্ত দ্বাদশ বার এই মহানগরী ভগ্ন ও নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নির্ম্মিত ও পরিত্যক্ত রাজধানী-সমূহের ভগ্নাবশেষ ত্রিশ মাইল স্থান ব্যাপিয়া পতিত আছে। কাহার সাধ্য, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে! যে ত্রিশ মাইল ব্যাপিয়া এই মহানগরীর ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়, ইহার মধ্যে অনেক নৃপতির রাজধানী ছিল। ইহাঁদের কতকগুলি প্রসিদ্ধ এবং কেহ কেহ অপ্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ ভূপালগণের মধ্যে চন্দ্রবংশ-সম্ভূত যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা এখানে রাজধানী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহাদের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ, তদনুসারে এই প্রবন্ধেরও "ইন্দ্রপ্রস্থ" নামকরণ করা হইয়াছে। এই ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিৎ, জনমেজয় প্রভৃতি কতিপয় পুরুষ রাজ্য করিয়াছিলেন। তদনন্তর মৌর্য্যবংশীয় অশোক প্রভৃতি কতিপয় ভূপতি মগধে, ইন্দ্রপ্রস্থে, ও চিতোরে রাজত্ব করেন। পরে পালবংশীয় নৃপবর্গ, এখানে রাজধানী স্থাপন করিয়া ভারত সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ইহাঁদের অন্তর্দ্ধানের পর ডিলুনামা একজন হিন্দু-নরপতি এখানে রাজধানী নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার নামানুসারে এই নগরী দিল্লী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। মুসলমান সম্রাটেরা বহু চেষ্টায়ও এই নামের পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হন নাই।

ইহার পর আর একটী পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়বংশ দিল্লীতে রাজধানী নির্ম্মাণ করেন, ইহা সেই অগ্নিবংশ। এই বংশ-সম্ভূত মহাবীর পৃথীরাজ ১১৯৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অপ্রতিহত-প্রভাবে ভারতবর্ষের শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়া ক্ষত্রিয়ের উন্মুক্ত-স্বর্গদ্বার-সদৃশ মহাসমরাগ্নিতে জীবনাহুতি প্রদান করেন। সেই সময়েই ভারতবর্ষে প্রকৃত যবনাধিকার প্রবর্ত্তিত হয় এবং চিরদীপ্ত হিন্দু-গৌরবও অস্তাচলে বিলীন হইয়া যায়।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, যেখানে মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজসূয়-যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন; সেই স্থানেই বর্ত্তমান দিল্লীসহর অবস্থিত। এই সহরের নির্ম্মাতা মুসলমানসম্রাট্ সাজিহান বাদশাহ, সুতরাং ইহার অপর নাম সাজিহানাবাদ। সাজিহানাবাদ দীর্ঘে প্রস্থে প্রায় চারিক্রোশ-ব্যাপী হইবে। এখানে দেখিবার উপযোগী অনেক দ্রব্য আছে। এই সহরের চতুর্দ্দিক্ উচ্চ ও দৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত; ইহার অনেকগুলি দরজা আছে, প্রত্যেক দরজার ভিন্ন ভিন্ন নাম, যথা—কাশ্মীর-দরজা, আজমীঢ় দরজা, বোম্বাই-দরজা, কলকত্তা-দরজা প্রভৃতি। ঐ সকল দরজা হইতে পূর্ব্বোক্ত সহরসমূহে যাইবার রাজপথ আছে। দরজাগুলি বদ্ধ করিয়া দিলে কাহারও সহরে প্রবেশ করিবার যো নাই। দিল্লীর রেল্‌ওয়ে-ষ্টেশনে অবতরণ করিলেই একটী প্রাচীন উদ্যান দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এই উদ্যানটী মুসলমানসম্রাটগণের নির্ম্মিত এবং বর্ত্তমান ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত। উদ্যানটী রেলপথের সন্নিহিত এবং কিঞ্চিদূন একমাইল-ব্যাপী পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ। ইহাতে অনেক প্রকার পুষ্প ও ফলের বৃক্ষরাজি, পরিষ্কৃত রাজপথ, জলপ্রণালী ও বসিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য স্থানে স্থানে লৌহময় আসন রহিয়াছে। যাঁহারা জয়পুরের মহারাজের উদ্যান, উদয়পুরের মহারাণার "সজ্জন-বাগ ও ইডেন-গার্ডন প্রভৃতি

দেখিয়াছেন, তাঁহাদের দেখিবার উপযুক্ত নূতন কিছুই এখানে নাই ; তবে সেই বাদশাহদিগের সময়ের অতি প্রাচীন বৃক্ষশ্রেণীর গাম্ভীর্য্য-ব্যঞ্জিনী শোভা বেশ রমণীয়। এই উদ্যানে কয়েক জাতীয় বংশশ্রেণী আছে, তাহাও দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহে ; আর, এই উদ্যানের ঠিক মধ্যভাগে একপ্রকার শুভ্র-পুষ্পের ঝাড় আছে, সায়াহ্নে তাহাতে বহুসংখ্য শ্বেত-কুসুম বিকসিত হইয়া মনোহর সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া থাকে।

আর একটী দৃশ্য কেল্লা। ইহা দিল্লী সহরের পূর্ব্বভাগে যমুনা-তরঙ্গিণীর তীরে বিরাজমান। ইহা দেখিতে হইলে দিল্লী-জেলার মাজিষ্ট্রেটের অনুমতি-পত্র (পাশ) আবশ্যক। আমরা পাশ লইয়া কেল্লা অথবা ফোর্টের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। এই কেল্লায় এখন বহুসংখ্য ইংরেজ-সৈনিক বাস করে। পশ্চিম-দ্বার দিয়া কেল্লার ভিতরে প্রবেশ করিলেই সম্মুখে একটী অতি বৃহৎ লোহিত-প্রস্তর-নির্ম্মিত অট্টালিকা। ইহার নাম "দেওয়ান আম" অথবা "উজীরের দরবার"। এই অট্টালিকাটী একতালা, মধ্যভাগে একখানি অতি প্রকাণ্ড প্রস্তরাসন বিদ্যমান, ইহাতে উজীর অথবা বাদসাহের প্রধান অমাত্য উপবেশন করিতেন।

কালের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন, নিয়তির কি অপূর্ব্ব গতি! এক সময় অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, সৌরাষ্ট্র, মগধ, কোশল, পঞ্চাল, সিন্ধু, সৌবীর, পাণ্ড্য প্রভৃতি প্রদেশের অধীশ্বরগণ যে ক্ষেত্রে রাজসূয়-যজ্ঞোপলক্ষে তীর্থোদক দ্বারা সম্রাট্ যুধিষ্ঠিরকে অভিষেক করিয়া হস্তী, অশ্ব, সুবর্ণ, রৌপ্য, মণি-মাণিক্য, মুক্তা,প্রবাল,হীরক প্রভৃতি উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, আবার এক সময় এক উদয়পুরের মহারাণা ব্যতীত জয়পুর, যোধপুর, বিজয়নগর, ভুজ, কচ্ছ, ধারা প্রভৃতির অধিপতি সামন্ত রাজগণ বিচারপ্রার্থী হইয়া নানা উপঢৌকনসহ উজীরের যে সিংহাসনের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া প্রতীক্ষা করিতেন সেই ক্ষেত্র শূন্য ; তথায় সে সিংহাসন এখন পরিত্যক্ত শূন্য ভূমিতে অবস্থিত হইয়া সেই লীলাময়ের অনন্ত লীলার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে! তখন এই স্থানের কি শোভা,কি গাম্ভীর্য্য, কি ভয়াবহ ভাব ছিল,আর এখন ইহার কিঅবস্থা! তারপর আমরা বাদশাহের দরবার-গৃহ দেখিলাম। ইহা মর্ম্মর-প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং বিবিধ-কারুকার্য্য-খচিত। এখানে এখন আর সে ময়ূর-সিংহাসন নাই ; তাহা এখন সাগর-পারে। অনন্তর বাদশাহদিগের শয়নগৃহ, স্নানশালা এবং ভোজনাগার দেখিলাম। উহা সকলই শ্বেতপ্রস্তরে গ্রথিত। ভিত্তিগাত্রে নানা লতা-পুষ্প ক্ষোদিত ; পূর্ব্বে প্রত্যেক লতা-পত্রে ও পুষ্পদলে হীরা, পান্না, মতি বসান ছিল,এখন উহা খুলিয়া লইয়া কৃত্রিম শ্বেত, নীল, লোহিত প্রস্তর বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা বাদশাহ-ভবনের দ্বিতল-গৃহের গবাক্ষ-পথে যমুনাতরঙ্গ সন্দর্শন করিলাম! বাদশাহেরা যমুনাবক্ষ হইতে ভিত্তি গ্রথিত করিয়া স্ব স্ব বিলাসভবন প্রস্তুত করাইয়াছিলেন ; এখন যমুনা কিঞ্চিদ্দূরে সরিয়া গেলেও বর্ষাকালে গবাক্ষ-পথের নিম্নভাগ দিয়াই যমুনাস্রোত প্রবাহিত হইয়া থাকে।

রাজমহিলারা যে অংশে বাস করিতেন, দুগ্ধফেন-নিভ-মর্ম্মরপ্রস্তর-গ্রথিত নাতিবৃহৎ নাতিক্ষুদ্র সেই অন্তঃপুর-ভবনগুলির শিল্পনৈপুণ্য অতীব মনোজ্ঞ। এক এক বেগমের এক একটী গৃহ, গৃহের সম্মুখে পূর্ব্বভাগে পদচালনার নিমিত্ত বারাণ্ডা, উহার সম্মুখে মস্তক-সমান সহস্র সহস্র ছিদ্রবিশিষ্ট ভিত্তি। অপরাহ্নে যখন বিদ্যুদ্বিনিন্দিত-দেহ বেগমেরা সেই সকল বারাণ্ডায় পরিভ্রমণকালে কালিন্দীর লহরী-লীলা বিলোকন করিতেন, তখন চেষ্টা করিলেও কোন নৌকারোহী প্রবাসী তাঁহাদের সেই

নীলোৎপল-গঞ্জিত নয়নের অতিথি হইতে পারিত না। এইরূপ কৌশলই সেই সকল ভবন-নির্ম্মাণের আরও নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে। প্রত্যেক গৃহের পশ্চিম-দিকে দ্বারের বাম-দক্ষিণে গবাক্ষের নিম্নে গোলাপ-জলের ফোয়ারা। প্রত্যুষে বাদশাহ-প্রণয়িনীরা শ্রুতি-মধুর বাদ্যে প্রবোধিত হইয়া ঐ সকল গোলাপ-জলের ফোয়ারায় হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিতেন। এই অংশে আর একটী গৃহ আছে, উহার নাম "শীশমহল"। ইহার চতুর্দ্দিকের ভিত্তি কাচ দ্বারা গ্রথিত। ইহার পার্শ্বে বাদশাহের বসিবার একটী গৃহ আছে। যখন বাদশাহমহিলারা ফোয়ারায় স্নান করিয়া এই গৃহে বস্ত্র-পরি: বর্ত্তনাদি করিতেন, তখন পার্শ্বের গৃহ হইতে বাদশাহ স্বচ্ছ-কাচের অভ্যন্তর দিয়া সেই সদ্যঃ-স্নাত সুন্দরীগণের প্রত্যেক অবয়বের অনাবৃত সৌন্দর্য্য বিলোকন করিতেন। বাদশাহের অন্তঃপুরের সাধারণ নাম "মতিমহল"। এখন সেই শুদ্ধান্ত বিভাগে আর সে আনন্দপ্রবাহ প্রবাহিত নহে; এখন উহা নীরব, নির্জ্জন। কালপ্রভাবে ভুবনমোহিনীদের সেই দেবস্পৃহণীয় সৌন্দর্য্যরাশি অতীতের কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশে লয় পাইয়াছে, কে বলিতে পারে! আকবর বাদশাহের সময় এই অন্তঃপুরের মধ্যে "নাউ-রোজা"র বাজার বসিত, তাহাতে কোন পুরুষের গমনে অধিকার ছিল না, রূপসীরা সেই হাট আলো করিয়া পণ্যদ্রব্য সকল ক্রয়-বিক্রয় করিতেন। মণি, মুক্তা, প্রবালাদির ন্যায় সেখানে কখন কখন কোনরূপ কৌশলে রূপ-যৌবনের ক্রয়-বিক্রয়ও না চলিত, এমন নহে। বস্তুতঃ বাদশাহগণের এই নীতি-বিগর্হিত বিলা-সিতাই অধঃপতনের অন্যতম কারণ হইয়াছিল। অন্তঃপুরের একাংশে একটী কুমারী ইংরেজ-মহিলা বাস করিয়া থাকেন। এই প্রাসাদ-শ্রেণীর উত্তরদিকে কয়েকটী মসজিদ আছে, তন্মধ্যে "মতি মসজিদ"ই শ্রেষ্ঠ। এই মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত মসজিদের চূড়া সুবর্ণমণ্ডিত এবং ভিত্তিগাত্রে সুচারু পুষ্প-লতা ক্ষোদিত। ইহার আঙ্গিনাটীও শ্বেত প্রস্তরে গ্রথিত স্থানটী বড়ই নির্জ্জন এবং রমণীয়। বাদশাহ তাঁহার অন্তঃপুর-মহিলাগণের সহিত এই মসজিদে প্রাত্যহিক উপাসনা সম্পন্ন করিতেন। আমরা কেল্লা হইতে বহির্গমন-কালে দক্ষিণ-দ্বার দিয়া নির্গত হইলাম। কেল্লার মধ্যস্থ বিস্তৃত প্রান্তরে সশস্ত্র ইংরেজ-সৈনিকেরা কৃত্রিম সংগ্রাম করিতেছে, কোন স্থানে বহুসংখ্যক কামান ও গোলা রহিয়াছে।

আমরা দুর্গ বা কেল্লা হইতে বহির্গত হইয়া "জুম্মা মসজিদ" দেখিতে গেলাম। ইহা একটী অতি বৃহৎ উপাসনালয়। ইহার দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে সোপান-শ্রেণী ও দ্বার আছে, পশ্চিমদিকে ভিত্তিমাত্র। ইহার মধ্যভাগে বিবিধ কারুকার্য্য আছে। ইহা নির্ম্মাণে অসংখ্য অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল। বাদশাহগণ বহুসংখ্য মুসলমান-সহ প্রতি শুক্রবারে এখানে আসিয়া উপাসনা করিতেন। এই জুম্মা মসজিদের মধ্যভাগে নানা কারুকার্য্য আছে, পূর্ব্বে সকলেই যথেচ্ছক্রমে গিয়া উহা দেখিতে পাইত, হিন্দু-মুসলমানে কোন কোন পর্ব্বে বিবাদের সূত্রপাত হওয়া অবধি আর হিন্দুগণ অনুমতি-পত্র ব্যতীত ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না। বাদশাহদিগের কে একজন বংশধর দিল্লী-সহরে অবস্থান করেন, তাঁহারই নিকট পাশ লইতে হয়।

দিল্লী সহরের দৃশ্য-সমূহের মধ্যে আর একটী প্রাচীন দৃশ্য—অশোকস্তম্ভ। ইহা এই সহর হইতে কিঞ্চিদ্দূরে অবস্থিত। আমরা এক দিন একটী বাবুর সহিত দিল্লী-সহরের কাশ্মীর-দরজা দিয়া নির্গত হইয়া নগরীর সন্নিহিত পশ্চিমভাগে উত্তর-দক্ষিণে লম্বমান একটী

পর্ব্বতমালায় আরোহণ করিলাম। নগরের প্রাচীরের বহিঃস্থ জেলা-কোর্ট হইতে একটী রাজপথ বাহির হইয়া এই পর্ব্বতশ্রেণীর উপরিভাগ দিয়া বহুদূর গমন করিয়াছে। ইহার একটী শাখা পুনরায় সহরের রাজপথের সঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে। আমরা সহরে থাকিতে জানিতে পারি নাই যে, ইহার এত নিকটে কোন শৈলশ্রেণী আছে; শেষে আরোহণ করিয়া দেখিলাম, দিল্লী নগরী এই পর্ব্বতমালার উপত্যকা-ভূমিতে অবস্থিত। শৈলশ্রেণীর উপরিভাগ হইতে এই সহরের দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার প্রিয় নিকেতন ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী নির্ম্মাণের জন্য অতি উৎকৃষ্ট স্থানই নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। প্রকৃতির যাহা কিছু গম্ভীর দৃশ্য, সে সমুদয় এখানেই বিরাজমান। পশ্চিমে শৈলশ্রেণী, পূর্ব্বভাগে কলনাদিনী বেগবতী যমুনা, মধ্যে সমতলক্ষেত্রে বহুদূরব্যাপিনী এই মহানগরী নির্ম্মিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত শৈলমালার উপরিভাগস্থ রাজপথ বাহিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইতে বামদিকে "অশোকস্তম্ভ" উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া যেন সেই পুরাতন ভারত-সম্রাট্ অশোকের রাজ্য-শাসনের সাক্ষ্যদান করিতেছে। স্তম্ভটী প্রায় ৫০।৬০ হস্ত উচ্চ এবং নিম্নের পরিধিও অনুমান ৫।৬ হস্তের ন্যূন নহে। এই পাষাণ-স্তম্ভের দুই স্থান ভগ্ন হইয়াছিল, ইতিহাস-প্রিয় গুণগ্রাহী ইংরেজগণ ইহা জুড়িয়া এই স্থানে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাতে দেবনাগরাক্ষরে অশোকের রাজ্যের সময় ও বিবরণ প্রভৃতি উৎকীর্ণ আছে। একজন প্রসিদ্ধ রাজ-পুরুষ, পণ্ডিতগণ দ্বারা ইহা পাঠ করাইয়া উহার ইংরেজী অনুবাদ দেবাক্ষরের নিম্নে স্তম্ভগাত্রে ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়াছেন। ভ্রমণ-তালিকায় উৎকীর্ণ কথাগুলি লিখিয়া আনিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তখন সূর্য্য অস্তগত, সান্ধ্য-তিমির অনতিবিস্তৃত রাজপথটীর চিহ্ন প্রায় গ্রাস করিতেছে, স্থানটীও নিরাপদ নহে—হিংস্রজন্তু ও দস্যুভীতি উভয়ই আছে, সুতরাং দ্রুতপদে আমাদিগকে নগরাভিমুখে আসিতে হইল।

কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়াই রাজপথের পার্শ্বে পর্ব্বতোপরি একটী শ্মশানক্ষেত্র দেখিলাম। দিল্লী সমরে যে সকল ইংরেজ সেনা ও সেনাপতিগণের মৃত্যু হইয়াছিল, বহুদূর ব্যাপিয়া তাঁহাদের সমাধি-মন্দির সকল বিদ্যমান। প্রত্যেক সমাধি-স্তম্ভের উপরিভাগে সংগ্রাম-নিহত বীরগণের নাম, ধাম, জন্ম-তারিখ, মৃত্যুদিন, জীবনের সংক্ষিপ্ত ঘটনা ও কাহা কর্ত্তৃক নিহত ইত্যাদি ক্ষোদিত হইয়াছে।

দিল্লীর স্নানের ঘাটও মন্দ আমোদপ্রদ নহে। রাত্রিশেষে কুলবধূরা দল বাঁধিয়া কেহ চাউল, কেহ বুট, কেহ বা কয়েকখানি রুটী এবং কিঞ্চিৎ পয়সা লইয়া সুমধুর বামাস্বরে মুক্তকণ্ঠে যমুনা-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে কেল্লার উত্তর-দিকস্থ বাঁধা-ঘাটসমূহে গমন করিতে আরম্ভ করেন। এক এক দল যুবকও তাঁহাদের ঠিক পাশে পাশে ঐ সঙ্গীতে সুর বাঁধিয়া হাত-তালি দিতে দিতে যাইতে আরম্ভ করে। বলা বাহুল্য, এই সকল যুবতীর সহিত ঐ পুরুষ-দলের চেনা-পরিচয় নাই, কিন্তু কেহ কাহারও ব্যবহারে বিরক্ত নহে, বরং তরুণীরা ঐ সকল পুরুষের সঙ্গে যাইতেই ভালবাসেন। কোন কারণে পুরুষদিগের গমনে বাধা জন্মিলে রমণীরা অপেক্ষা করিয়া উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যান। যেন স্নানের ঘাটে স্ত্রী-পুরুষে কেমন একপ্রকার মাখামাখি মধুর ভাব। এই রমণীরা পুরুষদিগকে ভাইয়া সম্বোধন করেন। গমন-সময়ে কুল-মহিলারা পথিপার্শ্বস্থ অন্ধ আতুর-দিগকে চাউল, বুট, রুটী প্রভৃতি বিতরণ করিয়া

পূজোপকরণ ফুল বিল্বপত্র প্রভৃতি লইয়া যান। ঘাটে ব্রাহ্মণেরা চন্দন ঘসিয়া আয়না লইয়া বসিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকগণ ঘাগরা বা প্রাচীন-রীতিতে পরিহিত পোষাকী কাপড় ছাড়িয়া অতি পাতলা ছোট ছোট কাপড় পরিধান করিয়া স্রোতোবিশিষ্ট যমুনাসলিলে অবতরণ করেন, তখন সন্তরণ ও গাত্রমার্জ্জনার ধূম পড়িয়া যায়, পুরুষেরাও পাশে পাশে থাকেন।

এতক্ষণ আমরা দিল্লী-মহিলাদিগের রূপের বর্ণনা করি নাই, রূপের বিস্তৃত বর্ণনা করিবার অবকাশও নাই;—আমাদের এ অপরাধ অবশ্য মার্জ্জনীয়। সাধারণ দুই চারিটী কথায় বলিতেছি। ইহাঁদের পোনর আনা. তিন পাই গৌরাঙ্গী; প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সুন্দরী স্থূলকায়া; ইহাঁরা নানাজাতীয় খোপা বাঁধেন; অনেকের মুখ গোল, দন্তগুলি পরিষ্কার, ওষ্ঠাধর টুকটুকে লাল, স্নানের ঘাটে আসিতেও নানা সুবর্ণালঙ্কার ও রঙ্গিণ কাপড় ব্যবহার করেন। ইহাঁরা প্রায় সকলেই বলিষ্ঠা ও উৎসাহশীলা বোধ হয়। দুই চারিটী সুন্দরীর মুখে হাসি ধরে না। ঘাটে যাতায়াতে এ-পাড়া ও-পাড়ার রমণীদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে, "খুসী হ্যায়, রাজী হ্যায়" জিজ্ঞাসা ও তাহার উত্তরে "আনন্দ হ্যায়" এই উত্তর। যখন রমণীদল, দেহ মার্জ্জনা করিতে আরম্ভ করেন, তখন যুবকগণ স্নানের বাঁধাঘাটের মঞ্চ ও চূড়াসমূহের উপরিভাগ হইতে একটা একটা জীবন্ত অর্দ্ধ-যুবা বা পূর্ণ-যুবককে অতর্কিত ভাবে রমণীমণ্ডলীর ভিতরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, আর প্রমদাগণের মুখচন্দ্রবিনিঃসৃত সুধাময় উচ্চহাসির শব্দ উত্থিত হয়। ইহাঁরা স্নানকালে মস্তক নিমজ্জিত করেন না। বলেন,—"স্বামী মাথার মণি, মাথা ডুবাইলে স্বামীকে ডুবাইতে হয়।" স্নান শেষ হইলে ইহাঁরা গা মুছিয়া ব্রাহ্মণদের নিকট যাইয়া বসেন; ব্রাহ্মণেরা ললাটে চন্দনের ফোঁটা দিয়া দেন। সধবা হইলে, চন্দনের টীপের মধ্যে সিন্দূর-বিন্দু প্রদত্ত হয়। তারপর চুল আঁচড়ান হইলে পূজা ও স্তোত্রপাঠাদি শেষ করিয়া রমণীগণ দলবদ্ধ হইয়া মৃদুমন্দ গতিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করেন। যুবকদলও পশ্চাদ্গমন করেন। এই স্নানের ঘাট সকল হিন্দুদিগের একচেটিয়া; কোন মুসলমান বা অন্যজাতীয় লোকের এখানে আসিবার অধিকার নাই।

দিল্লীর হিন্দু-মহিলাদিগের মধ্যে অনেকের পূজা-অর্চ্চনায় বিশেষ আস্থা। অনেকে বাটী হইতে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, ঘণ্টা, প্রচুর পুষ্প, বিল্বপত্র প্রভৃতি লইয়া আসিয়া বেশ ঘটা করিয়া পূজা করিতে বসেন। অনেক ধনিক-মহিলা অশ্বশকটেও যমুনাস্নান করিতে আসিয়া থাকেন। ঘাট হইতে নগর-প্রবেশের পথে কয়েকটী সাধু-আশ্রম আছে;—চারিদিক্ প্রাচীরে ঘেরা, ভিতরে গণেশ, মহাদেব, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। স্নানোত্থিত মহিলারা আশ্রমের পূর্ব্বদ্বার দিয়া দলে দলে প্রবেশ করিয়া ঐ সকল দেব-মূর্ত্তিকে প্রণিপাত ও প্রদক্ষিণ করিয়া পশ্চিম-দ্বার দিয়া গমন করেন। ইহার মধ্যে একটী আশ্রম বেশ জাঁকাল, এখানে ভাগবত-পাঠ ও হিন্দুস্থানী ভাষায় কথকতা হয়। প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, আঙ্গিনায় উচ্চবেদীতে একটী স্থূলদেহ কথক, কথকতা করিতেছেন। বিষয়—অহল্যাহরণ। কথকটী প্রবীণ ও সুরসিক। যখন অঙ্গভঙ্গী করিয়া ইন্দ্র ও অহল্যার কথোপকথন বর্ণন করিতেছেন, তখন চতুর্দ্দিকস্থ তিন চারি শত মহিলা একযোগে হাসির তরঙ্গ তুলিতে ছিলেন, অল্পবয়স্কা বধূগুলি হাসিয়া হাসিয়া বয়স্যাদের গা'য় ঢলিয়া পড়িতেছে। গমন-কালে ইহাঁরা কথককে দুই চারি পয়সা দিয়া যান, তাহাতে কথকগণের বেশ

উপার্জ্জন হয়। দরজার নিকট একটী পঞ্জাবী বৈরাগী মীরা-মঙ্গল গান করিতেছেন। কোমল-প্রাণা যুবতীরা মীরার নামে মুগ্ধ হইয়া নিবিষ্ট-চিত্তে বসিয়া উহা শুনিতেছেন, গমন-কালে দুই একটী পয়সা প্রদান করিয়া যাইতেছেন।

দিল্লীর আর একটী দৃশ্য—আজব-ঘর। এখানে অনেক মৃত জন্তু বিবিধ দ্রব্য সুসজ্জিত আছে, দ্বারে একটী কাল-প্রস্তরের প্রকাণ্ড হস্তী আছে। দিল্লীর রাজপথগুলি বেশ প্রশস্ত। অপরাহ্নে কলিকাতার ন্যায় প্রত্যেক রাজপথই লোকে পরিপূর্ণ হয়। পণ্যবীথিকাগুলি নানা দ্রব্যে শোভিত। এখানকার জড়োয়া কাজ, চিত্র, সঙ্গীত ও নৃত্য ভারতবর্ষের মধ্যে উৎকৃষ্ট। হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ হওয়া অবধি হিন্দুরা প্রতিজ্ঞা করিয়া বিবাহাদি উৎসবে আর মুসল-মান-নর্ত্তকী (বাই) আহ্বান করেন না; সুতরাং নর্ত্তকীদের নৃত্য-বিভাগে কিছু ক্ষতি হইতেছে। এখানে অর্দ্ধসংখ্য হিন্দু, অর্দ্ধসংখ্য মুসলমান। হিন্দুদিগের মধ্যেই ধনীর সংখ্যা বেশী। কতিপয় ধনীর উত্তুঙ্গ অট্টালিকাসমূহ বিশেষ দর্শনীয়। এখানে নানাস্থানে ফোয়ারা থাকিলেও একটী ফোয়ারা দেখিবার যোগ্য। এই ফোয়ারাটী প্রসিদ্ধ বাঙ্গালি-ডাক্তার বাবু হেমচন্দ্র সেন এল্ এম্ এস মহাশয়ের ঔষধা-লয়ের সম্মুখে অবস্থিত।

ইন্দ্রপ্রস্থের কথা শেষ করা যায় না, কাজের অকাজের কত কথাই এ প্রবন্ধে লেখা যায়, কিন্তু আর না; পাঠকের ধৈর্য্যভঙ্গের সঙ্গের বিবাদ করা ভাল নহে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র কাব্যরত্ন।

বুদ্ধদেব।

পাণ্ডব-শৈলে অবস্থিতি।

নগরে অতিশয় কোলাহল;
মহা সমারোহে হইল পূর্ণিত পথ;
যোগীর চলিতে সাধ্য নাহি এক পদ।
উচ্চৈঃস্বরে নারীগণ আকুল কাঁদিয়া,
কেহ কহে—"নাহি জানি জনক-জননী
কেমন পাষাণ এর; এমন সুন্দর
সোণার পুতুল হায় করিল সন্ন্যাসী!"
কেহ কহে—"পিতামাতা থাকিলে কি আর
এমন সন্তান পারে হইতে সন্ন্যাসী?"
কেহ কহে—"না থাকে জননী ইহার,
হইব জননী আমি, প্রাণান্তে আমার
সন্ন্যাস করিতে আর দিব না কখন।"
"বাছা! বাছা!" বলি কাঁদে কেহ গলা ধরি',
কেহ কাঁদি' পদতলে যায় গড়াগড়ি।
নরপতি বিম্বিসার প্রাসাদ-শিখরে
উঠি দেখিলেন,—নেত্র ফিরিল না আর।
ভাবিলেন,—"একি চন্দ্র? ইন্দ্র দেবরাজ?
কিম্বা বিন্ধ্যাচলের এ অধিষ্ঠাতা দেব?
কিংবা দেব বৈশ্বানর? মানবে সম্ভব
নহে কদাচিৎ এই রূপ অপরূপ!
ভিক্ষান্তে পাণ্ডব-শৈলে ফিরিল সন্ন্যাসী;—
শুনি নরপতি,—সেই অপরাহ্নে তথা
আসিলেন পারিষদ রাখিয়া পশ্চাতে।
দেখিলেন বিম্বিসার;—নবীন সন্ন্যাসী
বসিয়া—স্বস্তিকাসনে গিরি-গুহা-দ্বারে
ধ্যানমগ্ন; দেখিলেন শৈল-বেদিকায়
স্বর্ণ-দেব-মূর্ত্তি যেন রয়েছে স্থাপিত।
কিছুক্ষণ পরে যোগী মেলিল নয়ন;
প্রণমিয়া শৈলস্থিত রাতুল চরণে—
রক্ত-শতদল-মূলে নীল সরোবরে
শরতের পূর্ণচন্দ্র পড়ি' সমুজ্জ্বল।

কহিলেন বিম্বিসার—"যোগিবর। তব
নিরখি এ দেবরূপ, দুর্লভ যৌবন
মুগ্ধ এ মগধ,—মুগ্ধ মগধ-ঈশ্বর।
সোণার যৌবনে তব দেখিয়া সন্ন্যাস,—
প্রথম বসন্তে ঘোর শিশির সঞ্চার
নিদারুণ—হাহাকারে পূর্ণ মম পুরী,
আকুল হৃদয় মম। আইস যুবক।
তেজিয়া নিষ্ঠুর এই অকাল সন্ন্যাস
কর রাজসুখ ভোগ এই রাজ্যে মম।"
উত্তরিলা শাক্যসিংহ ধীরে—"মহারাজ।
হউন চিরায়ু; সুখে করুন পালন
এই রাজ্য চিরদিন অমরপ্রতিম।
নাহি চাহি রাজ্যসুখ, চাহি শান্তি আমি;
হয়েছি সন্ন্যাসী আমি শান্তি-কামনায়।"
সবিস্ময়ে বিম্বিসার কহিলা আবার—
"একি কথা! সুকুমার অতি সুকোমল
পুষ্পনিভ এই দেহ সহিবে কেমনে
দারুণ সন্ন্যাস-দাহ? না, না, ত্যজি এই
কঠিন প্রস্তরাসন, জনশূন্য বন,
চল রাজপুরে মম। অশান্তি গৃহের
করে থাকে যদি শান্তি-প্রয়াসী তোমায়,
দিব শান্তি, বসি' অর্দ্ধ-সিংহাসনে মম
কর কামভোগ, তব পুরাও বাসনা।"
সিদ্ধার্থ ঈষৎ হাসি কহিলা—"নৃপতি!
হউক কুশল তব! কামের প্রয়াসী
নহি আমি; কামভোগ যা ছিল আমার
আছে কার ধরাতলে? রাজ্য সুখভরা,
সুখভরা রাজপুরী, পিতা পুণ্যবান্
পুণ্যবতী মাতা, প্রেমপুণ্য-স্রোতস্বতী
নিরুপমা পত্নী, নবপ্রসূত কুমার,
কত সুখৈশ্বর্য্য আর নাহি পড়ে মনে।
কামভোগে সুখ-শান্তি থাকিলে নিশ্চয়
পাইতাম আমি হায়! দিতাম কি ঝাঁপ
হায় রে! অকূল এই সন্ন্যাস-সাগরে।
নরনাথ! সুধা যদি ফলে গৃহশাখে
কে যায় খুঁজিতে তাহা বন-বনান্তরে?
নাহি কামসুখ ভূপ! বৃক্ষফল মত
হয় কাম বৃন্তচ্যুত অস্পৃশ্য গলিত।
উড়াইয়া মানবের পরম মঙ্গল
ঝটিকার মত কাম যায় মিশাইয়া
করি' দেহ জরাজীর্ণ মৃত্যু-কবলিত।
হয় যদি বেগবান্, ঝটিকার মত
কার সাধ্য করে জয়? অনন্ত অসংখ্য
কাম, পারে কি কখন লভিতে সকল?
রহিল অলব্ধ যদি একটীও হায়!
দগ্ধ কায় মন প্রাণ; হত লব্ধ যদি
কোথা তৃপ্তি? লবণাক্ত সলিলের মত
বাড়ায় পিপাসা কাম, করে প্রতারিত
মহা মরুভূমে কাম মরীচিকা মত।
প্রাচীন মগধপুরী দেখ ধ্বংসশেষ
পড়ি তব পদতলে, অতৃপ্ত কামের
কি আদর্শ বিভীষণ গিরিব্রজ-পুর
জরাসন্ধ নৃপতির! এই স্বর্ণপ্রসূ
বিস্তৃত মগধ-রাজ্য, রাজ্যের কামনা
পূরিল না; অষ্টোত্তর শত নরপতি
দিয়া বলিদান যজ্ঞে করিবে প্রচার
সাম্রাজ্য, ছুটিল বেগে অতৃপ্ত কামনা
মহা স্রোতস্বতী মত ভ্রমিতে ভারত।
পরিণাম তার ওই ক্ষুদ্র জন্মভূমি,
এই ধ্বংস রাজপুরী! কামি-মনোরথ
করাল কালের স্রোতে সাক্ষী ও শিক্ষক
কি ভীষণ! বসি' শৃঙ্গে শূন্য নরনাথ!
কামভোগী নরনারী সুধু হাহাকার
করিতেছে জন্ম-জরা-ব্যাধির পীড়নে।
আছে কোন্ ধর্ম্মপথ দুঃখী জীবগণে
এই দুঃখার্ণব হ'তে করিতে উদ্ধার?—
লভিতে উদ্ধার আমি খুঁজিব সে পথ।
ছাড়িয়াছি শাক্যরাজ্য, শাক্য-রাজপুরী—

সুখ-সম্ভোগের খনি,—লভিতে সে বোধ,
সেই জ্ঞান, মহা ধর্ম্ম করিতে প্রচার।
বিম্বিসার নৃপতির চক্ষু-আবরণ
পড়িল খসিয়া, জ্ঞান হইল উদিত।
করযোড়ে নরপতি কহিলা কাতরে—
"চাহে দুই ভিক্ষা দাস, লভিলে সে বোধ
বুদ্ধদেব! দেখা দিয়ে এই দাসে তব
করিবে উদ্ধার, আর রহি কিছুদিন
এই শৈলে, চরিতার্থ করিবে এ দাসে।"
রহিলেন শাক্যসিংহ। কিছুদিন পরে
মহামারী উপদ্রব বৈশালী-নগরে
উঠিল জ্বলিয়া বনে দাবানল মত;
হাহাকার-পরিপূর্ণ হইল নগর।
কালের সে ভীম ক্রীড়া করিতে বারণ
কত মুনি, কত ঋষি, যাগযজ্ঞ কত
করিলেন কত মতে, বারিবিন্দু নাহি
হইল পতিত সেই ভীম দাবানলে।
তখন বৈশালীবাসী করিল স্মরণ
নবীন সন্ন্যাসী সেই অপূর্ব্ব দর্শন;
লইল শরণ পদ-পঙ্কজে তাঁহার।
করুণ-হৃদয় যোগী সুসজ্জিত পথে
পল্লবে, কুসুমে, ঘটে, মঙ্গল-সঙ্গীতে,
অতিক্রমি' ভাগীরথী পশিলা নগরে;
হইল অচিরে শান্ত সেই মহাব্যাধি,
সলিল-প্রবাহে যেন ক্রীড়া অনলের,—
মানবের শক্তি-সিন্ধু অনন্ত অতল!
ফিরিয়া পাণ্ডব-শৈলে, শিষ্য সপ্তশতে
প্রতিষ্ঠিত রাজপুত্র রুদ্রকের কাছে
লভিলেন শাক্যমুনি সমাধিযুগল।*
কিন্তু দেখিলেন নহে নির্ব্বাণের পথ
এ সমাধি; চলিলেন অঙ্কে শিষ্য সহ
পুণ্যতীর্থ ধরাধামে খুঁজিতে সে পথ।

শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

* শৈব সংজ্ঞান ও অসংজ্ঞায়তন।

বাঙ্গালীর জাতীয় অভাব ও অবস্থা।*

প্রবন্ধের আরম্ভে মঙ্গলাচরণ-স্বরূপ আপনাদিগের নিকট সবিনয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। এ ক্ষমাভিক্ষা মৌখিক নহে, আন্তরিক। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এ ক্ষমাভিক্ষার কয়েকটী বিশিষ্ট হেতু আছে। প্রবন্ধের বিষয় এমন গুরুতর, তাহার বিস্তৃতি ও আয়তন এত সুদূরব্যাপী, বিষয়টী এত বিভিন্ন ভাবে আলোচিত হইতে পারে, বিষয়টীর সুমীমাংসার জন্য এত চিন্তা জ্ঞান ও গবেষণার প্রয়োজন যে, আমি যে সকল কথা যথাযথ বলিতে পারিব, এ স্পর্দ্ধা এক ক্ষণও করি না।

মানুষের আত্মাভিমান সত্য-সন্ধানের সুমহৎ অন্তরায়। গ্রীক জাতির নিকট অন্য সকল জাতি বর্ব্বর; মুসলমানের নিকট আর সকলে কাফের; খৃষ্টীয়ানের নিকট 'পেগান'। এই আত্মভিমানের বশে আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই যে, লাটিন জেনাসের ন্যায় সত্যেরও দুই মুখ। আমার দিকের মুখ যদি কেহ না দেখিল, তবে তাহার রক্ষা নাই। মত-ভেদ হইলেই মহামারি। আজও যে এরূপ না হইবে, তাহার সম্ভাবনা কোথায়?

আপনারা চিরদিন বাঙ্গালীর গুণানুবাদ শুনিতেছেন; আজ কিছু দোষ-কীর্ত্তন শ্রবণ করুন। অবশ্য বাঙ্গালীর যে কোন গুণ নাই, এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। এই ত্রিগুণাত্মক জগতে কিছুই একেবারে গুণহীন নহে। বাঙ্গালীও নহে। আমাদের জাতির গুণের তালিকা সম্ভবতঃ সকলেরই কণ্ঠস্থ

* সাবিত্রী-লাইব্রেরীর ১৪শ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, বি, এল মহাশয় কর্তৃক পঠিত।

আছে। দুই দশটা দোষ উদ্ঘাটন করিলে, বোধ হয়, কিছু উপকার হইতে পারে।

মানুষের পক্ষে আলোক অত্যাবশ্যক; অথচ মানুষের চক্ষু আলোক সহিতে পারে না। চক্ষুর সাধারণ ধর্ম্ম এই যে, আলোকের আঘাত লাগিলে কণীনিকা আপনা হইতেই সঙ্কুচিত হয়, পাছে অধিক আলোক প্রবেশ লাভ করে। আলোক যে পরিমাণে উজ্জ্বল, কণীনিকার সঙ্কোচও সেই পরিমাণে অধিক। মানুষের চক্ষুর সহিত আলোকের যে সম্বন্ধ, সত্যের সহিত মানুষের মনের সেই সম্বন্ধ। মনুষ্য-জীবন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সত্যের সম্পর্কে পরিবর্দ্ধিত; অথচ মানুষের সত্যের প্রতি বিদ্বেষ; মানুষ সত্যের সংঘাত সহিতে পারে না। সত্যের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য, মানুষ মন সঙ্কুচিত করিয়া রাখে, যেন সত্য না প্রবেশ করিতে পারে। বিশেষতঃ যদি এই সত্য অপ্রিয় সত্য হয়, তাহা হইলে সঙ্কুচিত নহে, মানুষ, মনের দ্বার সুদৃঢ় অর্গলবদ্ধ করিয়া রাখে; সত্যের শত আঘাতেও সে দ্বার উদ্ঘাটিত হয় না। অপ্রিয় সত্য বলা বড় দায়; মূলহীন নভঃস্পর্শী অভিমান বুক্ষে ঘা দেওয়া অতি দুঃসাহসের কার্য্য। এই সকল ভাবিয়াই বোধ হয় মহর্ষি মনু অপ্রিয় সত্যের উদ্ঘাটন নিষেধ করিয়াছেন। 'ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্'। বোল্‌তার চাকে লোষ্ট্রক্ষেপের ন্যায় ইহার ফলে তীব্র দংশনদাহ অবশ্যম্ভাবী। এ সম্বন্ধে মনীষী জনসনের উপদেশ বড় সারগর্ভ। নূতন গ্রন্থ প্রণয়নের পর তিরস্কার ভাজন না হইলে, জনসন বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিতেন— 'তবে বুঝি কোন সত্য কথা বলিতে পারি নাই।' বর্ত্তমান প্রবন্ধে দুই চারিটী অপ্রিয় সত্যের উল্লেখ থাকা সম্ভব; তাহার জন্য যাহা দংশন-দাহ, তাহা সহিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি।

প্রবন্ধের ভাষাও স্থানে স্থানে আপত্তির বিষয় হইবার সম্ভাবনা। অসংযত ভাষা বিশেষ দোষাবহ। কিন্তু মর্ম্ম-কথার উদ্গীরণ, সকল সময়ে সংযমের বল্গা মানে না। হৃদয়ের আবেগ অনল-অক্ষরে লিখিত হইতে চাহে। কিন্তু অনলের উত্তাপ এ উষ্ণদেশে তত প্রীতিপ্রদ নহে।

প্রবন্ধের বিষয় অতি বিস্তৃত ও ব্যাপক। ইহার সম্যক্ আলোচনা এই সন্দর্ভের ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে সন্নিবেশিত করা অসম্ভব। বিস্তৃতির দায়ে গভীরতা-হানির সম্ভাবনা (একে ত সে গুণে আমি হীন)। যে তত্ত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য এক শত কথা বলা উচিত, তাহা আমায় এক কথায় শেষ করিতে হইবে। সুতরাং প্রবন্ধটা সম্ভবতঃ ভাসা-ভাসা পল্লব গ্রাহী রকমের হইবে। এ দোষের জন্য আমার শক্তিহীনতাই প্রধানতঃ দায়ী; কিন্তু বিষয়েরও একটুকু দায় আছে।

প্রস্তাবিত বিষয়ের নিঃশেষ আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সে উদ্দেশ্য অন্যরূপ। স্বদেশ ও স্বজাতির প্রসঙ্গ লইয়া, আমার প্রাণ যে সংশয়, প্রমাদ, ভ্রান্তি, অশান্তি, আশা, উৎসাহ, উদ্যম, নিরাশায় আন্দোলিত হইতেছে, স্বদেশী ও স্বজাতির নিকট, তাহার কিছু কিছু বিবৃত করা; তাঁহাদের প্রাণের সহিত আমার প্রাণের কাহিনীর মেলন করিয়া দেখা এপ্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বোধ হয়, অনেক কথার বেশ সুমিল হইবে; ইহাতে আমি সবিশেষ আশ্বস্ত হইব; বুঝিব আমার প্রাণের বিকার কিছু অসাধারণ নহে। আর যাঁহাদের সহিত আমার কাহিনীর অমিল হইবে, তাঁহাদের কাছেও উপকারের আশা করি। হৃদয়ের বিকার সংক্রামক। আমার প্রাণের সংশয়, প্রমাদ, ভ্রান্তি, অশান্তি, আশা, উৎসাহ, উদ্যম, নিরাশা, তাঁহাদিগের প্রাণে সংক্রামিত হইবে। তাঁহারাও এ বিষয়ে চিন্তা-

স্রোত প্রবাহিত করিবেন। আর আমি অল্প-বুদ্ধি, যে সকল কথার মীমাংসা করিতে পারি নাই, তাঁহাদের সাহায্যে সে সকল কথা সুমীমাংসিত হইবে। এই উপকারের প্রত্যাশাই এ প্রবন্ধ-রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই অবসরে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল; নচেৎ সম্ভবতঃ আমার কথার বিকৃত ব্যাখ্যা হইবে। পূর্ব্বতন সমুন্নত অবস্থার তুলনায় বাঙ্গালী সর্ব্ব-বিধায় নিতান্ত অবনত হইয়াছে। আমরা ছিলাম আকাশে, এখন পাতালে ডুবিয়াছি। কিন্তু এই হীনতার যুগেও বাঙ্গালীর স্থান কোন কোন বিষয়ে অপর জাতির অপেক্ষা উর্দ্ধে। আমার বিশ্বাস, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে, বাঙ্গালী হীন হইলেও য়ুরোপীয় প্রায় সকল জাতির (আমাদের রাজার জাতি ইংরাজেরও) অপেক্ষা উচ্চে। বৌধিক বিষয়ে বোধ হয় বাঙ্গালীর অবস্থা মহারাষ্ট্রী ব্যতীত সকল ভারতীয় জাতির অপেক্ষা উন্নত এবং কোন কোন অংশে ইংরাজের সমতুল। সামাজিক অভাব বোধ হয় য়ুরোপের অপেক্ষা আমাদের সংখ্যায় বা পরিমাণে অধিক নহে। এ সকল কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। অনেকে এই ভাবিয়া মনকে চোক ঠারেন যে, আমরা হীন বটে; কিন্তু জগতে আমাদের অপেক্ষাও হীন জীব আছে। ঈসপের গল্পের শশক ঐরূপ ভেকের দুর্দ্দশা দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়াছিল। আমার বোধ হয় মানুষ শশকের অপেক্ষা উচ্চ জীব। ভেক-বিষয়িনী সান্ত্বনায় তাহার হৃদয় আশ্বস্ত হওয়া উচিত নহে। বাঙ্গালী যদি আধুনিক য়ুরোপ ছাড়িয়া প্রাচীন ভারতের সহিত আপনার তুলনা করে, তবে নিজের হীনতা উপলব্ধি করিতে পারে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রায়শঃ ঐ প্রণালীর অনুবর্ত্তন করিয়াছি। কারণ বাঙ্গালীকে আপন হীনাবস্থা হৃদয়ঙ্গম করাইবার উহাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

আর ভূমিকায় কাল হরণ না করিয়া প্রস্তাবের আলোচনা আরম্ভ করি।

প্রবন্ধের বিষয় বাঙ্গালী জাতির অভাব। অতএব জাতীয় অভাব সম্বন্ধে সাধারণতঃ কিছু বলা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বে কিছু লিখিয়াছিলাম।* এ স্থলে তাহার সারাংশ সন্নিবিষ্ট করিলাম।

অভাব অর্থে অপূর্ণতা। যে পদার্থের অসত্তায় যাহার পূর্ণতার হানি হয়, তাহাই তাহার অভাব। সকলের পূর্ণতার আদর্শ সমান নহে, অতএব সকলের অভাব এক-জাতীয় নহে। সুতরাং উদ্ভিদ্ কীট সরীসৃপ পক্ষী পশু মনুষ্য, সকলেরই অভাব বিভিন্ন। এইরূপ আবার সকল মনুষ্যের অভাব সমান নহে, যেহেতু সকলের পূর্ণতার আদর্শ এক নহে। যে বীর, সর্ব্বাভিভাবিনী শক্তি, সর্ব্বাতিরিক্ত রণ-কৌশল, সর্ব্বতোমুখ শৌর্য্য ভিন্ন তাহার পূর্ণতা নাই। যে ধর্ম্মপ্রাণ, লোকহিত চিত্ত-শুদ্ধি ঈশ্বর-সাক্ষাৎ ভিন্ন তাহার পূর্ণতা নাই। যে বিলাসী, কামিনী কাঞ্চন কৌতুক ভিন্ন তাহার পূর্ণতা নাই। সুতরাং সকলের অভাব ভিন্নপ্রকৃতির।

যেরূপ ব্যক্তিগত অভাব, সেইরূপ জাতিগত অভাব। কারণ জাতি, ব্যক্তির সমষ্টি মাত্র। জাতীয় পূর্ণতার আদর্শের ভিন্নতায়, জাতীয় অভাবের ভিন্নতা হয়। যাহা খৃষ্টান জাতির অভাব, তাহা মুসলমান জাতির অভাব নহে। যাহা মুসলমান জাতির অভাব, তাহা হিন্দু জাতির অভাব নহে। কারণ সকলের জাতীয় পূর্ণতার আদর্শ এক নহে। এইরূপ ফরাসী, রুষ, ইংরাজ, বাঙ্গালী, সকলেরই অভাব ভিন্নপ্রকৃতির।

---

* ১২৯৯ সালে অগ্রহায়ণ মাসে 'জাতীয় অভাব' নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহাতে এ বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা ছিল। কিন্তু বিষয় যেরূপ গুরুতর তাহাতে আলোচনা অধিকতর হওয়াই উচিত। জ, স।

অভাব সম্বন্ধে আর একটা কথা বলা উচিত। যে জীব যত উন্নত, তাহার অভাবের পরিমাণও তত অধিক। তরু লতা শত মুখে রস শোষণ করিয়া, পুষ্প পত্র ফল প্রসব করিয়া চরিতার্থ হয়। পশু পক্ষী, দেহের স্ফূর্ত্তি, উদরের পূর্ত্তি ও ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতাকে যথেষ্ট মনে করে। কিন্তু মানুষের অভাবের পক্ষে এ সকলই অতি অকিঞ্চিৎকর। শরীর মন আত্মা, ইহাদিগের পূর্ণ পরিণতি ভিন্ন, মানুষের অভাব-পূরণ হইবার নহে। সবল দেহ, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সরস হৃদয়, উন্নত নীতি, উদার অধ্যাত্মতা, এ সকলই মনুষ্যের পূর্ণতার উপাদান; ইহাদের অভাবে মানুষের অপূর্ণতা।

এইরূপ মানুষের সভ্যতার পরিমাণের সহিত, অভাবের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। অসভ্যের অপেক্ষা অর্দ্ধ-সভ্যের এবং অর্দ্ধ-সভ্যের অপেক্ষা সুসভ্যের অভাব অনেক অধিক।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, ব্যক্তির সমষ্টিই জাতি; যেমন বৃক্ষের সমষ্টি বন, জলের সমষ্টি জলাশয়। বৃক্ষ বা জলের যে স্বরূপ, বন বা জলাশয়ের স্বরূপ প্রায় তাহাই। এইরূপ মানুষের যাহা স্বরূপ, মনুষ্যসমষ্টি—জাতির প্রায় তাহাই। মানুষের স্বরূপ কি? মানুষ দেহসম্বদ্ধ চৈতন্য। দেহ ও আত্মা, এই উভয়ের সংযোগে মানুষ। আত্মা—মন, বুদ্ধি, বিবেক, অধ্যাত্মতা প্রভৃতি কতকগুলি শক্তিবিশিষ্ট। সুতরাং মানবপ্রকৃতির পূর্ণতা বলিলে দৈহিক মানসিক বৌধিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পূর্ণ বিকাশ বুঝায়।

এই সকল উন্নতির কোন একের বিকাশ অভাবে মানুষের মানুষত্ব সম্পূর্ণ হয় না; অতএব ঐ অবিকাশই মানুষের অভাব। এই অভাব ব্যক্তিভেদে দৈহিক, মানসিক, বৌধিক, নৈতিক অথবা আধ্যাত্মিক অভাব হইতে পারে।

জাতি যখন ব্যক্তির সমষ্টি, তখন জাতীয় অভাব অনেকাংশে ব্যক্তিগত অভাবের অনুরূপ হইবে। অর্থাৎ জাতির অভাবও জাতিভেদে দৈহিক, মানসিক, বৌধিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অভাবের এক দুই বা ততোধিক হইতে পারে।

মানুষ সমাজবদ্ধ হইলে, সমাজের সহিত তাহাদের আর কতকগুলি নূতন অভাবের উৎপত্তি হয়। এই সকল অভাব সমাজ-জন্য; সমাজবন্ধনের ফল। সমাজও যতদিন, এই সকল অভাবও ততদিন। সমাজের ধ্বংসে এ সকল অভাব পূরণের আর প্রয়োজন থাকিবে না। আর সমাজ যত উন্নত হইবে, এই সকল অভাবের সংখ্যা ও পরিমাণ তত বৃদ্ধি পাইবে। এই সকল অভাব কি?

সমাজ-জন্য অভাব প্রধানতঃ তিনভাগে বিভাজ্য;—আর্থিক বা বাণিজ্যিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক।

ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য খাদ্যসামগ্রীর প্রয়োজন। অসভ্য অবস্থায় এই প্রয়োজন সহজলভ্য বনফল বা বন্য পশুপক্ষী দ্বারা সিদ্ধ হয়। অর্দ্ধসভ্য অবস্থায়, বুদ্ধির ক্রমবিকাশের সহিত কৃষিপ্রণালীর আবিষ্কার হয়। তখন মানুষ কেবল মৃগয়ার বা প্রকৃতির অনিশ্চিত লাভ ও অনুগ্রহের উপর নির্ভর না করিয়া আপন সকৌশল আয়াসের ফল ভোগ করে। ক্রমশঃ সভ্যতার সহিত অভাবের পরিমাণ অধিক হইতে থাকে। একক মানুষ আপন ক্ষুদ্র শক্তি, কৌশল ও পরিশ্রমে সকল অভাবের পূরণ করিয়া উঠিতে পারে না। তখন বিনিময়ের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় আপনার শক্তি, কৌশল ও পরিশ্রমের বিনিময় দিয়া একে অন্যের শক্তি, কৌশল ও পরিশ্রমের ফলভোগ করে। ইহাই বাণিজ্য; বাণিজ্যের ফল অর্থসংগ্রহ—যাহাতে সমাজের ভাবী ক্ষুধার জ্বালা নির্ব্বাপিত হয়। বাণিজ্যের প্রবর্ত্তনায় ও প্রচারে যে সকল অভাবপূরণ

হয়, তাহাকেই বাণিজিক বা আর্থিক অভাব বলিতেছি।

দুর্ব্বলের উপর প্রবল চিরদিন প্রভুত্ব করে; বিশেষতঃ অসভ্য অবস্থায়। 'বুদ্ধি যার, বল তার'। মানুষের পক্ষে বুদ্ধিও বলের অংশ। অসভ্য অবস্থায় সমাজবদ্ধ মনুষ্যের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ ও বুদ্ধিমান্, সেই প্রভু বা রাজা হয়। প্রথমে এ প্রভুত্ব বংশগত না হইয়া ব্যক্তিগত থাকে। অর্থাৎ যখন যে প্রবল, তখন সেই রাজা। জরা বার্দ্ধক্য বা রোগে রাজা বলহীন হইলে অন্য প্রবল ব্যক্তি তাহাকে স্থানচ্যুত করে। ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত রাজা আপনার আত্মীয় স্বজনকে—ভ্রাতা বন্ধু পুত্র মিত্রকে প্রভুত্বের ভাগে অংশী করিয়া, আপনার দলে ভুক্ত করিয়া বল সঞ্চয় করে। তখন কেহ রাজাকে আক্রমণ করিলে, ইহারা রাজার সহায় হইয়া তাহার বিরোধী হয়। এইরূপে ক্রমশঃ রাজতন্ত্র হইতে রাজন্য-তন্ত্রের উৎপত্তি হয়। তখন রাজা একক প্রভু না হইয়া রাজন্যবর্গকে প্রভুত্বের ভাগী করেন। প্রজা এক প্রভুর স্থানে শত প্রভুর অত্যাচার সহ্য করে। তখন প্রতি সমাজ পীড়ক ও পীড়িত এই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। ক্রমশঃ পীড়িতেরা বল সঞ্চয় করিয়া পীড়কদের বল হ্রাস করে। ক্রমে প্রজাতন্ত্রের বিকাশ হয়। প্রজাতন্ত্রে প্রজাই রাজা। প্রজাতন্ত্রেও মানুষের রাজনৈতিক অভাব পূর্ণ হয় না। সমষ্টি ব্যক্তির উপর, অধিকাংশ অল্পাংশের উপর প্রভুত্ব করে। রাজনৈতিক অভাবের পূরক রাজতন্ত্র রাজন্যতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্রও নহে; অতন্ত্র বা তন্ত্রাভাব (Anarchism)। তখন মানুষের সকল বিষয়ে সর্ব্বতোমুখ স্বাতন্ত্র্য হয়।

এইবার সামাজিক অভাবের কথা বলি। জীবদেহের ন্যায় সমাজ-শরীরও সজীব; ইহারও শৈশব কৌমার যৌবন জরা আছে। যে জীব যত উন্নত, তাহার দেহপ্রণালীও তত বৈশিষ্ট্যশালী। এইরূপ যে সমাজ যত উন্নত, তাহার শরীররচনাও তত বৈষম্যময়। কারণ অন্যান্য পদার্থের ন্যায়, সমাজের বিকাশক্রমও অব্যাকৃত হইতে ব্যাকৃতে, অবিশেষ হইতে বিশেষে। যেমন সুস্থ জীবদেহে, পোষণ পালন চালন প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রিয়ার সুচারু সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমাবেশ আছে, এইরূপ সুস্থ সমাজশরীরেও জ্ঞান রক্ষা অর্থ ও সেবা নির্ব্বাহের জন্য বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সন্নিধান লক্ষিত হয়। বিভিন্ন-ক্রিয়া-নির্ব্বাহক শক্তির আশ্রয়ভূত, সমাজের অঙ্গস্থানীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়, বংশপরম্পরাক্রমে একই শক্তির অনুশীলনে সেই শক্তির সম্যক্ বিকাশস্থল হইয়া, সুব্যবস্থ সমাজে বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়। সুস্থ সমাজ-শরীরের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরস্পর-সাপেক্ষ হইয়া, একই মহাপ্রাণের অনুপ্রাণনে সজীব থাকিয়া একই মহা উদ্দেশ্যের সমাধানে নিযুক্ত থাকে। সে উদ্দেশ্য সামাজিক অভ্যুদয়। যতদিন না সামাজিক অভ্যুদয় পূর্ণ মাত্রায় সাধিত হয়, যতদিন না মনুষ্যসমাজ পশু ভাব বিসর্জ্জন দিয়া দেবভাবে অনুপ্রাণিত হয়, ততদিন সামাজিক অভাব দূর হয় না।

অতএব ব্যক্তিসমষ্টি বা জাতির এই কয়টী অভাব। দৈহিক, মানসিক, বৌধিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, বাণিজিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক। মানুষ যতদিন না সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিবে, ততদিন ঐ সকল অভাবের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি সম্ভাবিত হইবে না। এই সকল অভাবের স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিলে আর একটী সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সে সিদ্ধান্ত এই—আধ্যাত্মিক জীবন যেমন মানব আধারে সর্ব্বোচ্চ অবস্থা,

তেমনি মানব-সমাজের আধ্যাত্মিক অভাবের পূরণে, কোন অভাবের পূরণ অবশিষ্ট থাকে না; সকল অভাব নিঃশেষিত হয়। কারণ সকল অভাবেরই সম্পূর্ণ নিবৃত্তি আধ্যাত্মিকতা-সাপেক্ষ।

এই তত্ত্বটী পরিস্ফুট করিবার জন্য আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা একটী সুন্দর গল্প রচনা করিয়াছিলেন। আপনারা কেহ কেহ হয়ত সে গল্পটী জানেন না। গল্পটী এই। এক রাজা ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া (ধর্ম্ম আধ্যাত্মিকতার নামান্তর মাত্র) প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে যাহার যাহা অবিক্রীত থাকিবে, রাজা তাহাই কিনিয়া লইবেন। এক দিন দিবাশেষে, এক বিক্রেতা অলক্ষ্মীর এক প্রতিমা লইয়া উপস্থিত হইল। অলক্ষ্মী কে কিনিবে? তাহার প্রতিমা বিক্রয় হয় নাই। রাজা ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞায় বদ্ধ;—মন্ত্রীদের শত নিষেধ সত্ত্বেও অলক্ষ্মীকে কিনিয়া গৃহে তুলিলেন। সকলেই জানেন, যে ঘরে অলক্ষ্মী প্রবেশ করেন, সেখানে লক্ষ্মী থাকেন না। রাজাও তাহা জানিতেন। তিনি জাগিয়া অপেক্ষায় রহিলেন, লক্ষ্মী কখন যান। কতক্ষণ পরে দেখিলেন, একটী দিব্যাঙ্গনা অঙ্গ-জ্যোতিতে দিক্ আলোকিত করিয়া গৃহের বাহির হইতেছেন। রাজা জানিলেন, লক্ষ্মী তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন। যান। কিছুক্ষণ পরে শঙ্খ-চক্র-গদাধারী পদ্ম-পলাশ-লোচন পুরুষবরকে গৃহের বাহিরে যাইতে দেখিলেন। বুঝিলেন বিষ্ণু যাইতেছেন। যান। এইরূপে ক্রমে ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র চন্দ্র সকল দেবতাই একে একে রাজপুরী ছাড়িয়া গেলেন। শেষে এক শ্বেতাঙ্গ শুভ্রবসন নিষ্কলঙ্ক পুরুষ গমনোদ্যত হইলেন। রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? পুরুষ বলিলেন, আমি ধর্ম্ম। সকলে গেলেন, আমি থাকি কেন? রাজা বলিলেন, 'আর যে যান যাউন, আপনি যাইবেন না। আপনাকে পরিত্যাগ করি নাই বলিয়াই লক্ষ্মীত্যাগ হইয়াছে।' ধর্ম্ম বুঝিলেন। তাঁহার যাওয়া হইল না। ফিরিয়া রাজালয়ে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, লক্ষ্মী ফিরিয়া রাজপুরী প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। রাজা বলিলেন 'মা! ফিরিলেন যে?' লক্ষ্মী উত্তর করিলেন 'বাবা। ধর্ম্ম যেখানে আমি সেখানে। ধর্ম্ম ছাড়া আমি নই'। ক্রমশঃ বিষ্ণু ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি সকল দেবতাই আবার ফিরিয়া আসিলেন। রাজার ভাগ্য-লক্ষ্মী অক্ষুণ্ণ রহিল।

গল্পটী এই। গল্পটী গল্প বই আর কিছুই নহে; কিন্তু ইহার শিক্ষা বড় মধুর, বড় গম্ভীর-তথ্যপূর্ণ। ধর্ম্ম অর্থাৎ অধ্যাত্মতা অক্ষুণ্ণ থাকিলে, আধ্যাত্মিক অভাবের সম্পূর্ণ পূরণ হইলে, সকলই সিদ্ধ হয়; অপর কোন অভাবই অপূর্ণ থাকে না। যে অভাব পূরণের মূলে অধ্যাত্মতা না থাকে, তাহার একান্ত পূরণ কখনই সিদ্ধ হয় না।

সবল দেহ, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সরস মন, উন্নত নীতি, উৎকৃষ্ট সমাজ, অতুল বিভব, অতন্দ্র জীবন, অনুপম অধ্যাত্মতা—জাতীয় অভাব দূর হইলে মানুষের এই দেবতার অবস্থা লাভ হয়।

উপরে যে সকল সূত্র নির্দ্ধারিত হইল, অতঃপর বাঙ্গালী জাতির সম্বন্ধে তাহাদিগের প্রয়োগ প্রদর্শিত হইতেছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় 'বাঙ্গালীর অভাব ও অবস্থা' বাঙ্গালীর বর্ত্তমান অবস্থার অবধারণ করিতে গেলে, প্রধানতঃ বাঙ্গালীর জাতীয় অভাবের বর্ণনা করিতে হয়। কারণ সে অবস্থা অভাবেরই নামান্তর মাত্র। এমন অভাবময় অভাবাবচ্ছিন্ন অভাবঘন জাতি বোধ হয় পৃথিবীর কুত্রাপি কোন কালে দৃষ্ট হয় নাই। কি দৈহিক কি মানসিক কি বৌধিক কি নৈতিক কি আধ্যাত্মিক কি বাণিজিক কি রাজনৈতিক কি

সমাজিক সকল বিষয়ে এরূপ অভাব-পীড়িত অভাব-তাড়িত অভাব-কবলিত জাতি সর্ব্বদা সর্ব্বথা সর্ব্বত্র বিরল।

একে একে অভাবপুঞ্জের সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। সংক্ষেপে—কারণ অভাবপুঞ্জ অনন্ত হইলেও আমার শক্তি সময় এবং জিহ্বা অনন্ত নহে।

প্রথম বাঙ্গালীর দৈহিক অবস্থা। শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু স্বরচিত ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন। 'যে, শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন করিবে, কেবল তাহার শরীর পুষ্ট ও বলশালী হইলেই হইবে না। তাহার চাই শরীর-পুষ্টি ব্যয়াম মল্লযুদ্ধ অস্ত্রশিক্ষা অশ্বরোহণ সন্তরণ পদব্রজে দূর গমন—আরও চাই সহিষ্ণুতা। শীত গ্রীষ্ম ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রান্তি, সকলই সহ্য করিতে পারা চাই'। দৈহিক উন্নতির ইহাই আদর্শ; এইরূপ হইলেই দৈহিক অভাবের সম্পূর্ণ পূরণ হয়।

বাঙ্গালীর দৈহিক অবস্থা কিরূপ? সে অবস্থা ত আমাদের নিত্য প্রত্যক্ষের বিষয়। সে অবস্থা কিরূপ?

"শরীরং ব্যাধিমন্দিরং" এ কথা, বোধ হয় বাঙ্গলীর শরীরের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই রচিত হইয়াছিল। বাঙ্গালীর দেহ বহুতর রোগের চিরন্তন আবাস। কেহ কেহ বলেন যে, বাঙ্গালী জাতি অচিরকালে বিলুপ্ত হইবে। কথাটা যুক্তিসিদ্ধ বটে; কিন্তু করুণাময় ঈশ্বর কি ব্যাধিদলের উপর এতই অকরুণ হইতে পারেন, যে তাহাদের বাসগৃহটী (যাহার অপর নাম বাঙ্গালীর দেহ) একেবারে উৎসন্ন করিবেন? হায়! বাঙ্গালীর অবর্ত্তমানে নিরাশ্রয় ব্যাধি কাহার শরণাগত হইবে? কাহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিবে? দেখুন বাঙ্গালী সর্ব্বকালেই ব্যাধিগ্রস্ত। শৈশবে যকৃতের অভিবৃদ্ধি (Liver); যৌবনে অম্লাজীর্ণ (Dyspepsia) ও স্নায়ুদুর্ব্বলতা; প্রৌঢ়তায় মধুমেহ (Diabetes); বার্দ্ধক্যে—বাঙ্গালীকে এতদূর পহুঁছিতে হয় না। ঐ সকল রোগ ঐ সকল বয়সের অভিন্ন সহচর। ইহার উপর সর্ব্বকালেই ম্যালেরিয়ার ঘনিষ্ঠতা এবং ওলাদেবীর কৃপাকটাক্ষ।

ম্যালেরিয়া এবং ওলাদেবী—ইহাঁরা বিদেশিনী। দুর্ব্বল বাঙ্গালীর দেশে কিছুকাল যাবৎ, বাহুবলে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া, প্রচণ্ডবেগে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন; এখন সমগ্র দেশ তাঁহাদের করতলগত; তাঁহাদের শাসনে নিয়ন্ত্রিত; তাহাদের পীড়নে উৎপীড়িত। এই সর্ব্বনাশিনীরা বিকট বদন ব্যাদান করিয়া বাঙ্গালী জাতিকে উদরসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছে; কালানলসন্নিভ দংষ্ট্রাকরাল ভয়ানক বক্ত্রে, এ ভীষণারা সুধুই উদ্ঘোষিত করিতেছে—"কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ।"

বাঙ্গালী কত রোগজীর্ণ, তাহা তাহার পঠিত সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনস্তম্ভ দেখিয়া কতকটা অনুমান করা যায়। বিজ্ঞাপনের প্রায় চৌদ্দ আনা অংশ নানাজাতি রোগের নানাজাতি ঔষধের গুণানুবাদে নিয়োজিত। বোধ হয়, অন্য কোন জাতির সংবাদপত্রে এত চিকিৎসা সংগীত গীত হয় না। বাঙ্গালা দেশে, যত পেটেণ্ট ঔষধের প্রাদুর্ভাব, আর কোথাও সেরূপ আছে কি না সন্দেহ। এ দেশের পরেশ-পাথর পেটেণ্ট ঔষধ; ইহার সংস্পর্শে ধূলামুষ্টি স্বর্ণ-রেণুতে পরিণত হয়। শুনিয়াছি প্রত্যহ ডি গুপ্তের ঔষধ দেড় হাজার টাকার বিক্রীত হয়।

বাঙ্গালী নিতান্ত অল্পায়ু। গড়-পড়তায় বাঙ্গালীর আয়ুষ্কাল ২৫ বৎসর। (ইংরেজের ৩৫ বৎসর এবং সুইডীয়ের ৪২ বৎসর।) আমাদের অনেকেরই কাল পূর্ণ হইয়াছে; এখনও যে আমরা মরলোক হইতে অপসৃত

হই নাই, ইহা কেবল ঈশ্বরানুগ্রহ বলিতে হয়। ২৫ পার হইলেই যম যেন জটে ধরিয়া আছে, এই ভাবে বাঙ্গালীর জীবন নির্ব্বাহ করা উচিত।

বাঙ্গালায় শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা অত্যধিক। ১৮৯১ সালে সংগৃহীত লোকবিবরণী (Census Report) পাঠে জানা যায় যে গড়ে, দুইবৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশু, ১০০ জনের মধ্যে ৩৫ জন অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। ১৮৮৬ সালে সযত্নসংগৃহীত মৃত্যু-তালিকায় প্রকাশ যে, এই কলিকাতা-নগরীতে শিশুমৃত্যুর সংখ্যা গড়ে শতকরা ৪৮ জন; বস্তুতঃ এক বৎসরে একুনে যত বাঙ্গালী মৃত্যুর কবলিত হয়, তাহার অষ্টমাংশ চারি বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশু।

এ দেশে বৃদ্ধের সংখ্যা অত্যল্প। 'শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ'—এ কথা বেদে পড়া যায় বটে, কিন্তু উহার প্রয়োগক্ষেত্র বাঙ্গালাদেশ নহে। ৬০ বৎসরের অধিক বয়স্ক লোকের সংখ্যা শতকরা ৫ জন মাত্র। অতি বৃদ্ধ লোক ত ডুমুরের ফুলের মত বা সাহারায় তুষারের মত দুর্লভদর্শন। এ দেশে প্রৌঢ়েরাই বৃদ্ধের পদে উন্নীত। এখানে পুরুষের ৪০ পার হইবার পূর্ব্বেই চাল্‌শে; স্ত্রীলোক কুড়ি পার হইলেই বুড়ী।

বাঙ্গালীর দেহ নিতান্ত দুর্ব্বল। ব্যায়াম, মল্লযুদ্ধ, অস্ত্রচালন, অশ্বারোহণ, সন্তরণ, দূরগমন—দুর্ব্বল বাঙ্গালী এ সকলে পরাঙ্মুখ। সহিষ্ণুতা বাঙ্গালী-দেহ ছাড়িয়া গিয়াছে; ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রান্তি ক্লান্তি, বলহীন বাঙ্গালী-দেহ এ সকল সহিতে পারে না। আমার বোধ হয়, অত্যল্প বাঙ্গালীই একাদিক্রমে দুই ঘণ্টা কাল আপনার পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারে; অথবা উপাধানে অঙ্গ না হেলাইয়া বসিতে পারে। সেই জন্য ডন্‌ কুস্তি কপাটি মুগুর প্রভৃতি পূর্ব্বপ্রচলিত দেশীয় ব্যায়াম উঠিয়া গিয়াছে। ইস্কুল কলেজে গিয়া দেখুন, চত্বরে 'প্যারালেল বার' প্রভৃতি বিদেশী ব্যায়ামের উপকরণ অব্যবহারে উইদষ্ট হইতেছে। অঙ্গ-সঞ্চালনে বাঙ্গালীর বড় কষ্টবোধ। আপনারা বোধ হয় নাগর গোরু ও গ্রাম্য-গোরুর গল্প শুনিয়াছেন; বাঙ্গালীর প্রতি সে গল্প বেশ খাটে। এক সুস্থ গ্রাম্য-গোরু ও এক রুগ্ন নাগর গোরুর গ্রামের মাঠে এক দিন সাক্ষাৎ হয়। সবল গ্রাম্য-গোরু চারিদিকে ছুটিতে চায়। সে নাগর গোরুকে ডাকিয়া বলিল 'এস ভাই! কে কত দৌড়াতে পারে।' দুর্ব্বল নাগর গোরুর তাহাতে বড় মত নহে; সে বলিল 'দৌড়ে কি হবে ভাই! এস, শুয়ে শুয়ে কে কত লেজ নাড়িতে পারে।' বাঙ্গালীর সহিত পুচ্ছ-সঞ্চালনে পৃথিবীর যে কোন জাতি স্পর্দ্ধা করিতে সাহস করিবে, সে নিশ্চিতই পরাজিত হইবে।

চিরদিন এরূপ ছিল না। কিছু দিন পূর্ব্বেও দেশে একটা স্বাস্থ্য সবলতা তেজস্বিতার ভাব দেদীপ্যমান ছিল। শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন। 'পূর্ব্বে প্রত্যেক গ্রামে এক এক কুস্তির আড্ডা ছিল, ছেলে বুড়ো সকলে কুস্তি করিত। শীতকালে রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতে বয়ঃস্থ ও অল্পবয়স্ক ভদ্র লোকেরা ঐ সকল কুস্তির আড্ডায় যাইয়া কুস্তি আরম্ভ করিতেন। তাঁহাদের তাল-ঠোঁকার শব্দে অপর লোকের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। এখন বয়ঃস্থ দিগের কথা দূরে থাকুক, ১৫।১৬ বৎসরের বালকেরা পর্য্যন্ত অঙ্গচালনা করিতে বিমুখ।' পূর্ব্বে গ্রামে গ্রামে লাঠিয়াল, মাল, তীরন্দাজ প্রভৃতি দৃষ্ট হইত। এখন তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছেন—শৃগাল-কুক্কুর ভীত ছড়িধারী সৌখীন বাবুব্রজ। পূর্ব্বে প্রদেশে প্রদেশে ডাকাত ও বোম্বেটে বিচরণ করিত; এখন তাহাদের পরিবর্ত্তে স্থলচর ও জলচর সিঁদেল চোর। এ বিষয়ে ভূয়োদর্শী শ্রীযুত শিশিরকুমার ঘোষ এইরূপ লিখিয়াছেন।

'যাঁহারা ৫০ বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালী বৃদ্ধদিগকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা বাঙ্গালী জাতিকে কখনই চিরদুর্ব্বল বলিবেন না। ঐ সময়ে বাঙ্গালীরা দৈর্ঘ্যে বীর্য্যে ও অঙ্গদৃঢ়তায় ভারতীয় অন্যান্য যুদ্ধজীবী জাতির সমকক্ষ ছিলেন।' বাস্তবিক একশত বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের পিতৃপুরুষগণ দীর্ঘজীবী সবল এবং ভূয়োভোজী ছিলেন। দুই এক জন অতিবৃদ্ধ, যাঁহারা এখনও অবশিষ্ট আছেন, তাঁহাদের মুখে শুনা যায় যে, তাঁহাদের কৈশোর কালে ঐরূপ প্রাচীন লোক অনেক দেখা যাইত, এখন দুই এক জন তাঁহারা মাত্র আছেন। রাজনারায়ণ বাবু লক্ষ্য করিয়াছেন যে 'এক্ষণে পল্লী-গ্রামের বাজারে ভদ্রলোক বৃদ্ধ অধিক দেখা যায় না। ছোট লোক বৃদ্ধই অধিক দেখা যায়; ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে ভদ্রলোক অল্পায়ু হইয়া পড়িতেছেন।' তাঁহার মতে 'শারীরিক বলবীর্য্য বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা বিলক্ষণ অবনতি দৃষ্ট হইতেছে। সেকালের লোকদিগের সহিত তুলনা করিলে বর্ত্তমান লোকদিগের কিছুই বল নাই বলিলে হয়। * * একশত বৎসর পূর্ব্বে যে সকল লোক জীবিত ছিলেন, তাঁহারা যদি ফিরিয়া আইসেন, তাহা হইলে আমাদিগকে খর্ব্বাকার দেখিয়া আশ্চর্য্য হয়েন, সন্দেহ নাই।' পূর্ব্বে আশানন্দ ঢেঁকী প্রভৃতি যে সকল বাঙ্গালী বীরের কাহিনী শুনা গিয়াছে, সে কাহিনী অতিরঞ্জিত হইলেও তাহার মূলে যে সত্যের প্রশস্ত ভিত্তি নিহিত আছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

এখন সকলেই অজীর্ণের দায়ে স্বল্পাহারী; কিন্তু পূর্ব্বে অনেক লোক ২০।২৫ সের আহার করিতে পারিতেন। একটা কাঁটাল, দুই তিন থান ক্ষীর; এরূপ আহার ত অনেকের আমরাই শৈশবে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এ বিষয়ে সূক্ষ্মদর্শী ভূদেব বাবুর মত এই। "পূর্ব্বে লোকে যত খাইতে পারিত, এখন তত খাইতে পারে না, সকল লোকেরই এইরূপ বিশ্বাস এক্ষণকার ২০ পুরুষ পূর্ব্বে যে সকল ভোজ দেশে হইত, যাঁহারা তাহার দুই একটীর হিসাব দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন যে, পূর্ব্বে লোক খাওয়াইতে যত দ্রব্যের আয়োজন করিতে হইত, এখন সেই পরিমাণ লোক খাওয়াইতে তত দ্রব্যের আয়োজন করিতে হয় না।"

কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, বাঙ্গালী জাতি চিরদিনই ভীরু কাপুরুষ রণপরাঙ্মুখ। এ কথা প্রমাণসিদ্ধ নহে। সর্ব্বদর্শী বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন, 'বাঙ্গালী যে পূর্ব্বকালে বাহুবলশালী তেজস্বী বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই। * * সেন-বংশীয়েরা বাঙ্গালী রাজা হইয়াও বেহারের অধিকাংশের রাজা ছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক কথা। সেনগণের অধিকার যে, বারাণসী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল ইহারও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। * * মেগাস্থিনিস বলেন যে, গঙ্গারাঢ় (বাঙ্গালার অংশবিশেষ) রাজ্য এরূপ প্রতাপান্বিত ছিল যে, ইহা কখন শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত হয় নাই। * *' তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে 'স্বয়ং সর্ব্বজয়ী আলেগজাণ্ডার গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া গঙ্গারাঢ়ীদিগের প্রতাপ শুনিয়া সেই থান হইতে প্রস্থান করিলেন।' বাঙ্গালীদিগকে হীনবীর্য্য মনে করিবার একমাত্র কারণ এই যে মুসলমানেরা অতি সহজে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বস্তুতঃ মুসলমানেরা সহজে বাঙ্গালা জয় করে নাই— কেবল লক্ষণাবতীই সহজে জয় করিয়াছিল। তাহারা তিন শত বৎসরেও সমস্ত বাঙ্গালা জয় করিতে পারে নাই।' বঙ্কিম বাবুর সাক্ষ্য এই পর্য্যন্ত। অতঃপর রাজনারায়ণ বাবুর সাক্ষ্য গ্রহণ করুন। 'সমুদ্রসেন চন্দ্রসেন প্রভৃতি

রাজারা, যাঁহারা পাণ্ডবদিগের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন। রাজকুমার বিজয়সিংহ * * যিনি সিংহলে গমন করিয়া উক্ত উপদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন তিনি একজন বাঙ্গালী ছিলেন। দেবপাল ভূপাল মহীপাল প্রভৃতি সার্ব্বভৌম সম্রাট্ যাঁহারা কর্ণাট হইতে তিব্বত পর্য্যন্ত সকলকে করপ্রদ করিয়াছিলেন তাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন।'

এই তেজস্বী বিজয়ী মহাবল দীর্ঘায়ু প্রাচীন জাতি কি কারণে এই বর্ত্তমান দুর্ব্বল কাপুরুষ রোগজীর্ণ অল্পায়ু হেয় জাতিতে অবনত হইল? যে দুর্ব্বোধকারণ-পরম্পরার বিশ্লেষণে এ তত্ত্বের সুমীমাংসা হইতে পারে, তাহার অনুরূপ গবেষণা আমার নাই। বিশেষতঃ কারণের নির্দ্দেশ এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমি সুধুই বাঙ্গালীর অভাবময় অবস্থা বর্ণনা করিব।

সংপ্রতি বাঙ্গালীর আর্থিক বা বাণিজ্যিক অবস্থার আলোচনা করিতেছি। অর্থনীতির সিদ্ধান্ত মতে বাণিজ্যিক উন্নতিশীল জাতির জনসাধারণ দেহ-রক্ষার উপযোগী পর্য্যাপ্ত আহার সংগ্রহ করিয়া, দেহের অপটুতা প্রভৃতি দুর্দ্দিনে ব্যয়ের নিমিত্ত কিছু অর্থ সংস্থান করে। উক্ত জাতি অন্যান্য জাতির সহিত প্রভূত পরিমাণে কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের আদান প্রদান উপলক্ষে মোট যত টাকা মূল্যের রপ্তানি করে তদপেক্ষা অধিক টাকা আমদানি করিয়া দেশে অর্থাগম করায়। উক্ত জাতির মধ্যে লোকগণনায় কৃষিজীবীর অপেক্ষা শিল্পীর সংখ্যা অধিক। উক্ত জাতির কৃষিক্ষেত্র অতি প্রসবে খিন্না হইয়া উষরতা-প্রবণ হয় না। উক্ত জাতির শিল্প-কুসুম বিকসিত হইয়া দিব্য সৌরভে দিক্‌দিগন্ত সুরভিত করে। জাতির বাণিজ্যিক অবস্থা এইরূপ হইলে তাহার আর্থিক অভাবের পূরণ হয়।

বাঙ্গালী জাতির আর্থিক অবস্থা কিরূপ?

বাঙ্গালী বড় দরিদ্র। তাহার দারুণ অর্থাভাবের কথা আলোচনা করিলে মর্ম্মাহত হইতে হয়। সুধু বাঙ্গালী কেন? ভারতবাসী সকল জাতিই গভীর দারিদ্র্য-পঙ্কে নিমজ্জিত।

ভূতপূর্ব্ব রাজস্ব সচিব বেয়ারিং সাহেবের হিসাবে প্রত্যেক ভারত-বাসীর গড়ে বার্ষিক আয় ২৭ টাকা মাত্র। অর্থ-নীতি নিপুণ শ্রীযুক্ত দাদা-ভাই নাওরোজির মতে ঐ আয় ২০ টাকার অনধিক। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে 'বিশেষ অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ কর্ম্মচারী' কর্তৃক কিছু গোপন অনুসন্ধান হইয়াছিল। ঐ অনুসন্ধানের বিবরণী হইতে প্রকাশ যে বাঙ্গালার কোন কোন প্রদেশে কৃষিজীবীর বার্ষিক আয় ১৪ টাকার অনধিক। ঐ বিবরণীরই অন্যত্র প্রকাশ যে উত্তর পশ্চিমের কোন কোন গ্রামে লোক সাধারণের আয় গড়ে প্রতি বর্ষে ১০ টাকার অধিক নহে। এই আয়ে কি দেহ রক্ষা হইতে পারে? এই আয়ের ভিতর হইতেই ভারত-বাসীকে গড়ে ৪ টাকা হিসাবে রাজকর দিতে হয়। কোন দেশবাসীরই আয় এত অত্যল্প এবং রাজকর আয়ের তুলনায় এত অত্যধিক নহে।

	বার্ষিক আয়	...	রাজস্বদান
প্রতি ব্যক্তির ইংলণ্ডে	৩৪০	...	৩০
ফ্রান্সে	২৯০	...	৩৪
রুসিয়ায়	৫৪	...	১৪
তুরস্কে	৪০	...	৫
জাপানে	৬২	...	৪
ভারতবর্ষে	২৭	...	৪

ভারতবর্ষে প্রতি ব্যক্তির আয় প্রতি বর্ষে গড়ে ২৭ টাকা ধরা হইল। কিন্তু সম্ভবতঃ ঐ আয় ২০ টাকার অধিক নহে। ৪ টাকা রাজকর বাদ দিলে ২৩ টাকা অবশিষ্ট থাকে;

ইহারই মধ্যে আহার, ব্যবহার, পরিচ্ছদ, বাস-গৃহ, চিকিৎসা প্রভৃতি সকলই সারিতে হয়। এক আহারেই কত পড়ে দেখা যাক। পূজনীয় ভূদেব বাবু ইংরাজ ডাক্তারের অবধারিত জেল কয়েদীর দৈনিক বরাদ্দ খোরাকি দৃষ্টে, স্থির করিয়াছেন যে 'প্রতি কয়েদীর মাসিক খোরাকি খরচ ৪ টাকার ন্যূন হয় না। ঐ অবধারিত পরিমাণের ন্যূন হইলে কয়েদীর শরীর সুস্থ থাকিতে পারে না।' ভূদেব বাবু বিশেষ সাবধান ও সযত্ন গণনায় অবধারিত করিয়াছেন যে, 'পুরুষের আহারের ব্যয় ৪ টাকা স্থলে ৩ টাকা ধরিলেও এবং স্ত্রীলোকের আহার এক চতুর্থাংশ ন্যূন ও শিশু ও বৃদ্ধের আহার বার আনা অংশ ন্যূন ধরিলেও ২০ কোটি ভারত-বাসীর বার্ষিক আহারের ব্যয় ৪৫০ কোটি টাকা হয়।'

জেল কয়েদীর পরিচ্ছদের ব্যয় গড়ে বার্ষিক ৩ টাকা ১০ আনা। পুরুষ স্ত্রী শিশু বৃদ্ধ, ২০ কোটি ভারত-বাসীর পরিচ্ছদের ব্যয়, গড়ে বর্ষে ১ টাকা ধরিলেও ২০ কোটি টাকা। অতএব আহার ও পরিধেয়, এই উভয়ের বার্ষিক ব্যয় ৪৭০ কোটি। কিন্তু সমগ্র ভারত-বাসীর রাজস্ব বাদে বার্ষিক আয় (২৩ টাকা হিসাবে) ৪৬০ কোটি। অতএব এই খানেই ১০ কোটি টাকার অসদ্ভাব। সকলেই জানেন যে বাঙ্গালার জেলে ব্যয়-কুণ্ঠতার একশেষ প্রদর্শিত হয়। সেই জেলেরই বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ যে প্রতি কয়েদীর আহার পরিচ্ছদ ও চিকিৎসার বার্ষিক ব্যয় ত্রিশ টাকার অধিক। অর্থাৎ ৩০ টাকার অল্প আয়ে লোকের কয়েদীরও অধিক দুর্দ্দশা। কিন্তু ভারত বাসীর সর্ব্ব সমেত আয় * ২৭ টাকার অনধিক। ভারতের দারিদ্র্যের পরিমাণ বুঝুন।

* ইংলণ্ডের লোকেরা গড়ে প্রতি বর্ষে প্রত্যেক লোক ৪ পাউণ্ড মূল্যের মাদক দ্রব্য সেবনে ব্যয় করে; আমাদের গড়ে আয় ২ পাউণ্ডের অধিক নহে।

এখন বোধ হয় অনেকে বিশ্বাস করিতে পারিবেন যে হাণ্টার সাহেব কৃত গণনা, কল্পনা-মূলক বা অতিরঞ্জিত নহে। হাণ্টার সাহেবের গণনায় ৫ কোটি ভারত-বাসী অর্দ্ধাসনে জীবন যাপন করে। জন্মাবধি মরণান্ত এই হতভাগ্যেরা ক্ষুধার জ্বালা নিবৃত্তির সুখ অনুভব করিতে পায় না।

পূর্ব্বোদ্ধৃত রাজাজ্ঞাত বিবরণীতে এক-স্থলে লিখিত আছে যে, ভারতবর্ষে নির্ধন প্রজা সাধারণের মধ্যে অল্পাশন হইতে অনশন পর্য্যন্ত সাতটি ক্রমভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে। ভারতবাসীর সাত সংখ্যাটীর প্রতি বিশেষ পক্ষপাত। আমরা এতদিন শুনিতাম সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত সাম, সপ্ত স্বর, সপ্ত অর্চ্চি, সপ্ত দ্বীপ, সপ্ত লোক, সপ্ত স্বর্গ ইত্যাদি; আজ হইতে আর একটি সপ্তক আয়ত্ত করিলাম—সপ্ত অনশন।

ভারতবর্ষে যে কেবল শ্রমজীবীরা দরিদ্র, তাহা নহে; আমরা যাহাদিগকে মধ্য-বিত্ত বলি, তাহারা ও ঐ দশাগ্রস্ত। বাস্তবিক, এদেশে মধ্য-বিত্ত বলিয়া কোন শ্রেণী নাই। দুই চারি জন বড় মানুষ আর সকলেই দরিদ্র। আয়কর বিবরণীতে প্রকাশ যে ভারতে ৭০০ লোকের মধ্যে এক জনের আয় ৫০০ টাকার অন্যূন। আর ইংলণ্ডে শতকরা ৫ জনের আয় ১৫০০ টাকার অধিক। ইংলণ্ডের ৩ কোটি ৮০ লক্ষ লোকে এক পেনি হারে আয়-কর দিয়া ২ কোটি টাকা রাজস্ব সংগ্রহ হয়; কিন্তু ভারতের ২২ কোটি লোক ঐ হারে আয়কর দিয়া ২০ লক্ষ টাকাও রাজভাণ্ডারে দিতে পারে না। এ হতভাগ্য দেশে যে ১০।১২ বৎসর অন্তর একটি মহান্ দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, আর দুর্ভিক্ষের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া তাহার নিত্য সহচরী মহামারী আসিয়া উপস্থিত হইবে, ইহার আর বিচিত্র কি? এবং স্থানে স্থানে

যে অন্নকষ্ট প্রতিবর্ষেই অনুভূত হইবে, ইহাতে অসঙ্গতি কি? হাণ্টার সাহেবের গণনায় ১৮০০ খৃঃঅব্দ হইতে ১৮৮০ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের নানা স্থানে এগারবার দুর্ভিক্ষের উৎপাত ঘটিয়াছে; অর্থাৎ সাড়ে সাত বৎসরে এক একটি। ইহাদিগের মধ্যে ১৮৭৬ সালের দুর্ভিক্ষ সুবিশাল ভাব ধারণ করে। ঐ দুর্ভিক্ষের ফলে (ইংরাজ রাজপুরুষের) গণণানুসারেই ৫২ লক্ষ লোক অন্নাভাবে আকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। এ ঘটনা ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোন্ দেশে সম্ভাবিত হয়? কোন্ দেশে আর কঙ্কালসার দুর্ভিক্ষ মহাকালের প্রতিনিধি হইয়া, ৫২ লক্ষ নর-কপাল লইয়া পানপাত্র রচিতে পারে, ৫২ লক্ষ অস্থি-পঞ্জর গাঁথিয়া করতাল বাজাইতে পারে, ৫২ লক্ষ শবের উপর সর্ব্বগ্রাসিনী মহামারির সহিত ভৈরব তাণ্ডবে পৃথিবী কাঁপাইতে পারে?

ভারতবর্ষ হইতে প্রতিবর্ষে প্রায় ত্রিশকোটি টাকার শোষণ হইতেছে। এই শোষণ অনেক দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এরূপ ভাবে আর কিছুদিন গেলে, দেশ দেউলিয়া হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সকল সুব্যবস্থদেশে দেখা যায় যে আমদানির পরিমাণ রপ্তানির অপেক্ষা সমধিক। এই আধিক্যের পরিমাণ ইংলণ্ডে শতকরা ৩২; নরবেতে ৪২; ডেনমার্কে ৪০; সুইডেনে ২৪; ফ্রান্সে ২০; স্পেনে ৯; তুরস্কে ২৪; জাপানে ৭; কেবল ইংরাজাধিকৃত ভারতে এবং ইংরাজাধিষ্ঠিত মিশরে আমদানির অপেক্ষা রপ্তানির পরিমাণ অধিক। ১৮৮৮-৮৯ সালে মিসরে ৭ কোটি টাকা আমদানি হয় এবং ১০ কোটি টাকা রপ্তানি হয়; লোকসান ৩ কোটি। ঐ সালে ভারতে আমদানি হয় ৮০ কোটি, রপ্তানি হয় ৯৮ কোটি; লোকসান ১৮ কোটি। ১৮৯২-৯৩ সালে ভারত হইতে রপ্তানি হয় ১১০ কোটি, ভারতে আমদানি হয় ৯৫ কোটি। অন্যান্য দেশে যে হারে লাভ গণনা হয় তাহাতে ১১০ কোটি রপ্তানিতে ১৫ কোটি লাভ হওয়া উচিত। ইহা হইতে শ্রীযুত নাওরোজি স্থির করিয়াছেন যে গড়ে ভারতের বার্ষিক লোকসান ৩০ কোটি টাকা; ভূদেব বাবুর গণনায় ঐ ক্ষতির পরিমাণ ৩২ কোটি।

কৃষি-সর্ব্বস্ব ভারতবর্ষকে ঐ ক্ষতির টাকা স্বীয় উর্ব্বর-ক্ষেত্রজাত দ্রব্য দ্বারা পূরণ করিতে হয়। ভূমিতে একবারমাত্র ফসল উৎপন্ন হইলে এত দ্রব্য জন্মিয়া উঠে না, সেইজন্য অনেক ক্ষেত্র বর্ষে দুই তিন বার করিয়া কর্ষিত হয়। ইহার ভাবিফল—অতি-প্রসব-নিবন্ধন সু-উর্ব্বর ভারতভূমির উষর-প্রবণতা। যে ভূমিতে সুবর্ণ ফলিত, বোধ হয় শতবর্ষ পরে সেখানে কাঁকর ফলিবে মাত্র। ইহা ভবিষ্য ফল; বর্ত্তমান ফলও বড় শোচনীয়। ভারতবর্ষের প্রধান খাদ্যের উপাদান গম যব এবং চাউল ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ভারতবাসী দেশের সারশস্য গোধুম তণ্ডুলাদি বিদেশীকে দিয়া আপনারা মকাই বাজরা জোয়ারি প্রভৃতি খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে।

বিদেশীয় শিল্পের অযথা প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পের প্রায় মুলোচ্ছেদ হওয়ায় ভূতপূর্ব্ব শিল্পীদিগকে কৃষিশ্রম-জীবী হইতে হইয়াছে। এইরূপ কৃষিজীবীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। ১৮৭১ সালে সংগৃহীত লোক-বিবরণীতে ঐ সংখ্যা শতকরা ৫৬ জন অবধারিত হইয়াছিল; ১৮৮১ সালে ৬০ জন হয় এবং ১৮৯১ সালে ৬৫ জন হইয়াছে। ইংলণ্ডে কৃষি-জীবীর সংখ্যা শতকরা ১৩ জন মাত্র, স্কটলণ্ডে ১৭ জন, ইতালী ও আমেরিকায় ৪৪ জন এবং ফ্রান্সে ৪৬ জনের অধিক নহে।

ইহার ফল অন্যরূপেও বিষময় হইয়াছে। আহার্য্য দ্রব্যের মূল্য যে পরিমাণে বাড়িয়াছে, শ্রমীর শ্রমের মূল্য সে পরিমাণে বাড়ে নাই।

আইনই আকবরি পাঠে জানা যায় যে আকবরের রাজত্বকালে সাধারণ খাদ্য-সামগ্রীর যে দর ছিল, এখন তাহার দর আটগুণ, দশগুণ, খাদ্য বিশেষে বিশ গুণের ও অধিক হইয়াছে। কিন্তু শ্রমীর শ্রমের মূল্য আকবরের সময় অপেক্ষা তিন চারি গুণ বাড়িয়াছে মাত্র। দাদাভাই নাওরোজি ৪০ বৎসরের তালিকা সংকলন করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন, যে উক্ত কালের মধ্যে শ্রমের মূল্য কিছুই বাড়ে নাই বলিলে চলে। হাণ্টার সাহেবের মতে দুই পুরুষ পরিমিত কালের মধ্যে (৫০ বৎসর মধ্যে) চাউলের দর তিনগুণ বাড়িয়াছে। এ সকল কথা নিম্ন লিখিত তালিকা দৃষ্টে বেশ সপ্রমাণ হইবে।

শ্রমীর শ্রম মূল্য

	আকবরের সময় রোজ	১৮৯৪ সালে রোজ	কত গুণ বৃদ্ধি
রাজ	৶৫	৷৷০	৪
মজুর	⁄১৫	।০	৩৷৷
খরামি	⁄৫	।⁄৫	৪
ছুতোর	⁄১৫	৷৷⁄০	৫
পদাতি	৶০	।০	২

খাদ্য সামগ্রীর মূল্য।

	আকবরের সময় এক মণের দর	১৮৯৪ সালে এক মণের দর	কত গুণ বৃদ্ধি
গম	।⁄০	৩৲	৯৷৷
যব	৶১০	২৲	৯
চাউল	৶১০	৪৲	১৮
দাল	।৶১০	৩৸০	৮
ছোলা	৶১০	৩৶০	২৫
ময়দা	৷৷⁄০	৪৲	৭
ঘৃত	২৷৷৶০	৩৫৲	১৩
দুগ্ধ	৷৷৶০	৬৷৷০	১৷৷
দধি	।৶১০	৫৲	১০৷৷
লবণ	।৶১৫	৩৷৷০	৮

সকল দেশেই মধ্য-বিত্ত লোকের অবলম্বন প্রধানতঃ চাকরী। আমাদের দেশে সকল উন্নত চাকরীই ইংরাজের একচেটে। দুই একটা প্রসাদ স্বরূপ উচ্ছিষ্টাবশিষ্ট আমাদের ভাগে পড়ে। তাহাতেই ২০ কোটি লোকের চাকরীর ক্ষুধা মিটাইতে হয়। ১৮৭৮ সালের বিবরণ মতে প্রতিবর্ষে ভারত গবর্ণমেণ্ট ১১ কোটি টাকা কর্ম্মচারীদিগের বেতন হিসাবে ব্যয় করেন, তাহার মধ্যে বিদেশীয় কর্ম্মচারীরা পান ৯ কোটি আর দেশীয়েরা ২ কোটি মাত্র। ১৮৯০ সালের বিবরণ মতে ভারত গবর্ণমেণ্টের ১,০০০ টাকার ঊর্দ্ধ বেতন-ভুক্ত কর্ম্মচারী ৪৫,০০০; তন্মধ্যে দেশী লোক ১৭,০০০ এবং বিদেশী লোক ২৮০০০। আর ঐ ১৭০০০ দেশী লোকে ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বেতন পাইয়া থাকে এবং ঐ ২৮,০০০ বেদেশীয় লোক ১৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বেতন স্বরূপ পায়। ভারতের মোট বার্ষিক রাজস্ব যত আদায় হয়, তাহার অর্দ্ধাংশেরও অধিক টাকা বিলাতে পেন্‌সন ও বৃত্তিদানে ব্যয়িত হয়। যদি সাহারার মরুভূমে উষরতা দেখিয়া কেহ বিস্মিত না হন, তবে ভারতের দৈন্যেও বিস্মিত হইবেন না। রাজস্বের টাকা দেশে ব্যয়িত হওয়ায় এবং বিদেশে রপ্তানি যাওয়ায় কত ভিন্ন ফল, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন।

ভারতের শিল্পীদিগের অবস্থা বড় শোচনীয়; বিদেশী শিল্প দ্রব্যের অত্যুগ্র প্রতি-যোগিতায় দেশী শিল্প উৎসন্ন প্রায়। এখন—

ভারতের তন্ত্র নীরব সকল
দুখিনীর লজ্জা রক্ষে ম্যানচেষ্টার!
লবণাম্বু রাশি বেষ্টিত যে স্থল
জম্মে লিভরপুলে লবন তাহার

এখন,—

তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার
সূতা জাতা ঠেলে অন্নমেলা ভার

দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাক আর
হলো দেশের কি দুর্দ্দিন।
ছুঁচ সুতা পর্য্যন্ত আসে ভুঙ্গ হ'তে
দীয়াশলাই কাটি সেও আসে পোতে
প্রদীপটা জ্বালিতে, খেতে শুতে যেতে
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।

ভূদেব বাবু আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, "পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ অপর সকল দেশ অপেক্ষা অতি সমৃদ্ধিশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এখন ভারতবর্ষ অতি দরিদ্র দেশের মধ্যেই গণ্য হইয়াছে। পূর্ব্বে বিভিন্ন দেশীয় বণিকগণ ভারতবর্ষ হইতে অনেকানেক উপাদেয় দ্রব্য স্ব স্ব দেশে লইয়া যাইতেন, এখন ভারতবর্ষেই অপর দেশ হইতে ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যজাত সমানীত হয়। রাজনারায়ণ বাবুর কথাগুলি বড় ঠিক। 'ইংরেজের উপর আমাদের নির্ভর দিন দিন বাড়িতেছে। কাপড় পরিতে হইবে, ইংলণ্ড হইতে কাপড় না আইলে আমরা পরিতে পাই না। ছুরি কাঁচি ব্যবহার করিতে হইবে বিলাত হইতে প্রস্তুত না হইয়া আসিলে, আমরা তাহা ব্যবহার করিতে পাই না। এমন কি বিলাত হইতে লবণ না আসিলে আমারা আহার করিতে পাই না। দেশলাইটি পর্য্যন্ত বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া না আসিলে আমরা আগুণ জ্বালিতে পাই না।" বাস্তবিকই আমাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়।

আমাদের শিল্প কত উন্নত কত ভূয়িষ্ঠ ছিল, এখন কত অবনত কত সংকীর্ণ হইয়াছে। হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন যে "ষোড়শ শতাব্দীতে যখন য়ুরোপীয়েরা এদেশে প্রথম বাণিজ্যার্থে আইসে, তৎকালে ভারতবর্ষের স্থাপত্য, কারুকার্য্য, কার্পাস ও রেসমী বস্ত্রাদি, এবং স্বর্ণ ও জড়োয়ার অলংকারাদি শিল্পাংশে জগতে অতুলনীয় ছিল।' কিন্তু ভাগ্যনেমির নির্ম্মম বিপরিবর্ত্তনে এখন সে দিন গিয়াছে। এখন কোথায় সেই তুলনাহীন ঢাকাই মলমল, সেই মান্দ্রাজি মস্‌লিন, সেই শান্তিপুরে সূক্ষ্ম দুকূল, সেই আসামি ক্ষৌম বসন। কোথায় সেই প্রখ্যাত অসি চর্ম্ম বর্ম্ম, সেই মনোহর আস্তরণ, যবনিকা, চন্দ্রাতপ; সেই নয়নানন্দ স্বর্ণ, রৌপ্য, দারু, গজদন্তের কারুকার্য্য? সকলই ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ধ্বংস প্রায়। সুকুমার শিল্পের এই অবস্থা!

স্থূল শিল্পের দশা আরও শোচনীয়। পূর্ব্বে প্রতি গ্রামেই নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির নির্ম্মাতা তাঁতি, কর্ম্মকার, কাঁসারি প্রভৃতির অধিষ্ঠান ছিল। এখন তাহারা তাঁত, জাতা, হাতুড়ি ছাড়িয়া হলধর হইয়াছে। মুরসিদাবাদ জেলার অনেক স্থানে পিতল ও লোহার ব্যবসায় এককালে খুব প্রবল ছিল। রেশমের ব্যবসার ফলে মুরসিদাবাদ এককালে বিশেষ সম্পন্ন ছিল। জঙ্গীপুরের অধীন মির্জাপুর ও রামপুর হাটের অন্তর্গত মারগ্রাম প্রভৃতি পল্লীর তাঁতিরা রেশমের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়াই দিনপাত করিত। আজিমগঞ্জের উত্তরে কাঁসারিপাড়া পল্লীতে কতশত লোক লৌহ ও পিত্তলের দ্রব্য নির্ম্মাণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এখন সে সকল কোথায়? বুদ্‌বুদ চিরদিনের জন্য কাল সাগরে মিশাইয়া গিয়াছে। এখন সেই ভারতবাসী বিদেশী শিল্পীর মুখাপেক্ষী! একা বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যায় প্রতিবর্ষে প্রায় ৭ কোটি টাকার বিলাতী কাপড় কাটে। ১৮৮৯ সালে ভারতবর্ষে মোট ৩৪ কোটি টাকার বস্ত্র, ৫ কোটি টাকার ধাতু ও ধাতবদ্রব্য, ২ কোটি টাকার তৈল, ৮৮ লক্ষ টাকার লবণ এবং ৪১ লক্ষ টাকার ছাতা আমদানি হইয়াছিল। শিল্পের এই অবস্থা।

বাণিজ্যের অবস্থাও কম শোচনীয় নহে। ভারতের প্রায় সমগ্র বহির্বাণিজ্যই বিদেশীর

হাতে। জলপথে, য়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দূরদেশের সহিত বহির্বাণিজ্য ত আমাদের হাতে আদৌ নাই এবং স্থলপথে তিব্বত পারস্য কাবুল প্রভৃতির সহিত বহির্বাণিজ্যও আমাদের দুর্ব্বল হস্ত হইতে স্খলিত হইতেছে। অন্তর্বাণিজ্যের অধিকাংশ দেশীয়দের হাতে আছে বটে, কিন্তু তাহাও আর থাকে না। এখন বিদেশী বণিক গ্রামে গ্রামে কুঠি খুলিতে আরম্ভ করিতেছেন; বহির্বাণিজ্যের উপাদান দ্রব্যগুলি মধ্যবর্ত্তী দেশী বণিক্‌কে এড়াইয়া শীঘ্রই একেবারে জাহাজে উঠিবে। লৌহ অভ্র স্বর্ণ কয়লা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যের একাধিপত্য বরাবরই বিদেশীর হাতে। অতএব বোধ হয় এই ভাবে চলিলে, আর কয়েক বৎসরে হাট বাজারে পসরাদারি ভিন্ন আর কোন ব্যবসায়ই দেশীয়দিগের হাতে থাকিবে না।

এই ভারতবর্ষই একদিন পৃথিবীর বাণিজ্যের কেন্দ্রভূত ছিল। হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন। 'অতি প্রাচীন কাল হইতেই ইয়ুরোপের সহিত ভারতবাসীর বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। সলমনের বাণিজ্য-পোত ম্যালেবারের উপকূল হইতে মহার্ঘ পণ্য-দ্রব্যে পূর্ণ হইয়া আসিত। মধ্যকালের ইতালীয় ভূখণ্ডের সমৃদ্ধি বহুল পরিমাণে ভারতীয় বাণিজ্য হইতে উদ্ভূত। ঐ বাণিজ্যের ভাগী হইবার আশায় প্রণোদিত হইয়াই কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কৃত করেন এবং ভাসকো ডি গামা উত্তমাশা অন্তরীপ পার হইয়া নৌ-যাত্রা করেন। ভারতীয় বাণিজ্যের লোভেই য়ুরোপীয়েরা এ দেশে প্রথমে অধিষ্ঠিত হয়েন।' ফিনীসীয় বেবিলনীয় আরব্য পারসিক ও কার্থেজীয়েরা, সকলেই ভারতের সহিত ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কথিত আছে প্রতি বর্ষে গ্রীষ্মারম্ভে রোমকেরা ১২০ খানি বাণিজ্য-পোত ভারতাভিমুখে প্রেরণ করিতেন। অধিক দিন নহে, নবাব আলিবর্দ্দির সময়ে একা মুরসিদাবাদে প্রতি বর্ষে এক কোটি টাকার রেসমের কারবার হইত। এখন এ সকল উপকথা বা কল্পনা কাহিনী বলিয়া মনে হয়। যে ভারত পণ্যদ্রব্যের বারিধারা অজস্র বর্ষণ করিয়া সমগ্র পৃথিবীর বাণিজ্য তৃষ্ণা নিবারিত করিত, আজ সে দীন, হীন, মলিন, অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ।

এই দারিদ্র্য, বৃত্তিলোপ, শিল্পনাশ ও বাণিজ্য-হানির ফলে দ্রব্যাদি মহার্ঘ হওয়ায় জীবিকালাভ বড় কঠিন হইয়াছে। দিন ১০।১২ ঘণ্টা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পরিশ্রম করিয়াও লোক উদর পুরিয়া আহারের সংগ্রহ করিতে পারে না। নিজে পুষ্টিকর দ্রব্য খাইতে গেলে, ছেলে পুলে মানুষ করা যায় না, পুত্রের বিদ্যালয়ের বেতন দেওয়া হয় না, কন্যার বিবাহের সংকুলান করা যায় না। দুর্ভাবনায় লোকের মজ্জা পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া গেল। দারুণ অভাব অথচ ইংরাজি সভ্যতার সংসর্গে বিলাসিতা বিলক্ষণ বাড়িতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবন-প্রণালী মহার্ঘ্য হইতেছে। য়ুরোপীয় অভাব, য়ুরোপীয় প্রয়োজন সৃষ্ট হইতেছে, অথচ তাহার পূরণার্থ শিল্প বাণিজ্যের প্রবর্ত্তনা হইতেছে না। বোম্বাই এ বিষয়ে কিছু অগ্রসর হইয়াছে বটে কিন্তু বাঙ্গালা এ বিষয়ে বড় পিছাইয়া আছে। এ দেশে যাহা কল কারখানা দেখা যায়, তাহার ১৫ আনা ৩ পাই অংশ বিদেশীয়দের।

আমার এক পরম শ্রদ্ধাস্পদ আত্মীয়ের মুখে শুনিয়াছি যে ইদানীং কুলি মুটেরাও 'টিফিন' খাইতে হইলে আর মুড়ি মুড়কি খায় না, এক পয়সা মূল্যের গজা নিম্‌কি খায়। এ গল্প কথা নহে তাঁহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। বিলাসিতা কত বাড়িয়াছে বুঝুন।

ভারতবর্ষে প্রতি বিবাহে যত লোকের ভিড়, এরূপ আর কোথায়ও আছে কিনা সন্দেহ।

ইংরাজাধিকৃত ভারতে (১৮৭২ সালের লোক-গণনা অনুসারে) প্রতি বর্গ মাইলে ২১১ জনের বসতি, করদ ভারতে ৮৯ জনের মাত্র। বাঙ্গালা বিহারে আরও চমৎকার। বিহারে প্রতিবর্গ মাইলে ৪৬৫ জনের বসতি, বাঙ্গালায় ৪৩৮ জনের। কোন কোন প্রদেশে আরও অধিক ঘনতা। পাটনায় ৭৪২ জন, সারাণে ৭৭৮ জন, চব্বিশপরগণায় ৭৯৩ জন এবং হুগলিতে ১০৪৫ জন। ইংলণ্ডে যে এত ভিড়, সেখানেও প্রতিবর্গ মাইলে ২৬০ জন মাত্র বাস করে। জারমানিতে ১৮৯ জন এবং ফ্রান্সে ১৮০ জন। দুর্ভিক্ষ কমিসনের গণনায় স্থির হয় যে বাঙ্গালার প্রত্যেক লোককে অর্দ্ধ একারের উৎপন্ন দ্রব্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। সুতরাং জীবিকা বড়ই দুর্ম্মূল্য।

ভারতের দুর্ভর দীনতার কথা আলোচনা করিলে, কারলাইলের ভীষণ উপমাটা স্মরণ হয়। দেশব্যাপী দুই বিশাল তাড়িত কটাহে দুই প্রচণ্ড তাড়িত-শক্তি সঞ্চিত হইতেছে। শক্তিদ্বয় পরস্পর বিরোধী, এক পুষ্ট তাড়িত, অপর রুষ্ট তাড়িত। কবে বালকের অঙ্গুলি চালনে বিরোধী শক্তিদ্বয়ের প্রবল সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে। শক্তি-সংগ্রামের তুমুল আরাবে দিকচক্র বিকম্পিত হইবে; তাহার পর বিমান-চারীগণ আর সূর্য্যকক্ষায় পৃথিবী উপগ্রহের সাক্ষাৎ পাইবে না; পৃথিবীর উপাদান-ভূত পরমাণু আকাশের কোথায়ও নীহারিকারূপে বিপর্য্যস্ত থাকিবে।

অতঃপর বাঙ্গালীর রাজনৈতিক অবস্থার আলোচনা করিতেছি। শাসনতন্ত্রের বিবর্ত্তন-ক্রম এইরূপ;—প্রথম রাজতন্ত্র; পরে পর্য্যায়-ক্রমে রাজন্যতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র এবং অতন্ত্র। অতন্ত্রই রাজনৈতিক আদর্শ; এ অবস্থায় সকল প্রজারই অপরের ইষ্ট-সাপেক্ষ এবং অনিষ্ট নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন থাকে। প্রাচীন ভারতবর্ষে শাসন-তন্ত্র অনেকটা ঐ ধরণের ছিল। রাজশক্তি, শান্তিরক্ষা দুষ্টের দমন এবং বহিঃশত্রুর নিবারণ কার্য্যেই প্রযুক্ত হইত। ব্যবস্থা প্রণয়ন এবং বিচারকার্য্য বেদজ্ঞ ও শুদ্ধশীল ব্রাহ্মণদিগের হস্তে সমর্পিত ছিল। রাজা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতেন না। রাজশক্তি ধর্ম্মশাসনের অধীন ছিল। রাজ-শাসন প্রবলতর ধর্ম্মশাসনকে আত্মসাৎ করিয়া নিরঙ্কুশ হইতে পারে নাই। নিয়মিত রাজস্ব যথাকালে প্রদান করিলেই প্রজা-সাধারণের রাজার সহিত সম্বন্ধ ফুরাইত। অন্যান্য রাজকীয় ব্যাপার, প্রজারা স্বয়ং স্বগ্রামে, নিঃশব্দে পঞ্চায়ৎ বা গ্রাম্য সমিতির সাহায্যে নির্ব্বাহ করিত। নির্ব্বিরোধী শান্তিপ্রবণ অন্তঃ-শাসিত হিন্দুজাতি রাজার মুখাপেক্ষী ছিল না; সুতরাং রাজশক্তি একহস্ত হইতে হস্তান্তরিত হইলেও প্রজা সাধারণের কোন বিঘ্ন বিপত্তি ঘটিত না।

হিন্দু রাজার পর মুসলমান বাদসাহের শাসনকাল। মুসলমান রাজারা কেহ কেহ ঘোরতর অত্যাচারী ছিলেন; কেহ কেহ স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের প্রতি পক্ষপাতী হইয়া হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইতেন। কিন্তু তাঁহারা দেশের ধর্ম্মশাসন ও অন্তঃশাসনে হস্তক্ষেপ করিতেন না। দেওয়ানি বিষয়ে, প্রজারা আপনাদের বিচার-কার্য্য অনেক স্থলে আপনারাই সম্পন্ন করিত। নগরে, ফৌজদারি শাসন বাদসাহদিগের কর্ম্মচারী দ্বারা সম্পন্ন হইত বটে, কিন্তু গ্রামে ঐ শাসন (গুরুতম অপরাধ ভিন্ন) স্থানীয় জমিদারেরাই নিষ্পাদন করিতেন। অধিকন্তু মুসলমান-শাসনে বরাবরই পঞ্চায়ৎ এবং গ্রাম্য-সমিতি শাসন অক্ষুণ্ণ ছিল। অর্থাৎ প্রজা-সাধারণের স্বাতন্ত্র্যে রাজা কদাচিৎ হস্তক্ষেপ করিতেন। দেশের শিক্ষা, সমাজ, আচার ও ধর্ম্ম-প্রণালী অব্যাহত ছিল। ফলেও দেখা

যায়, হিন্দুজাতি ৫০০ বৎসরকাল, মুসলমানের অধীন থাকিয়াও অবশেষে সেই মুসলমানের উপরই প্রবল হইল দক্ষিণে মহারাষ্ট্র, পশ্চিমে শিখ এবং মধ্যে রাজপুত; আর সর্ব্বত্র বিপন্ন মুসলমান। এই অবস্থায় ভারতের সাম্রাজ্য-শক্তি, ইংরেজ-বণিকের করতলগত হইল।

পাঁচশত বৎসরের অত্যাচারে মুসলমান যাহা পারে নাই, ইংরাজ একশত বৎসরে তাহা সমাধান করিলেন। দেশের শৌর্য্য, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, সামর্থ্য, যাদুকর-মন্ত্রে, অগ্নিসংদগ্ধ কর্পূরখণ্ডের মত কোথায় উড়িয়া গেল। দেখুন, ইংরাজের আমলে, ধনপ্রাণ রক্ষার পূর্ব্বাপেক্ষা সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। ইংরাজ ভারতবাসীকে স্কুল, কলেজ, আপিস, আদালত, রেল, ষ্টীমার, পোষ্ট, টেলিগ্রাফ, টেলিফোঁ প্রভৃতি দিয়াছেন। ইংরাজের শাসন-প্রণালী বৈজ্ঞানিক-রীতি-সম্মত। আরও দেখুন, ইংরেজ সাধারণতঃ অত্যাচারী নহেন। কোম্পানির আমলে প্রথম প্রথম প্রবাসী শ্বেতাঙ্গপুঙ্গবেরা যে সকল অত্যাচার করিয়াছেন, যদিও জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা বিরল; তথাপি মোটের উপর ধরিতে গেলে স্পেনীয় এবং পোর্ত্তুগীজেরা আমেরিকায় যেরূপ অত্যাচার করিয়াছেন, ইংরাজ ভারতে তাহার কিছুই করেন নাই। অতএব ইংরাজ অত্যাচারী নহেন; কিন্তু ইংরাজের আওতা বড় ভয়ানক। এই আওতার প্রভাবেই আমেরিকা কেপকলনী, অষ্ট্রেলিয়া, নিউ-জিল্যাণ্ড প্রভৃতি মহাদেশ আদিম-নিবাসি-শূন্য হইতেছে। আমরাও ঐ আওতায় পড়িয়াছি। হিন্দুজাতি এখনও লুপ্ত হইতে আরম্ভ হয় নাই; কিন্তু লোপপ্রবণ হইতেছে।

ভারতে ইংরাজের শাসনতন্ত্র স্বৈরাচার-মূলক। কিছুদিন হইল, পার্লামেণ্ট সভায় ভারতীয় রাজসচিব এ কথা স্পষ্টাক্ষরে অঙ্গীকার করেন যে, ভারতে ইংরাজ-গভর্ণমেণ্ট মূলতঃ স্বৈরাচারী (In the main a despotism) সকলেই জানেন, রাজকীয় লেখনীর এক আঁচড়ে জুরীপ্রথা রদ হইয়াছিল; ব্যবস্থাপক-সভার এক অধিবেশনে মুদ্রাযন্ত্রের আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। এই সকল ঘটনায় ইংরাজের স্বৈরাচার অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। কিন্তু সকলে হয় ত জ্ঞাত নহেন যে, কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই সহরের বহিঃপ্রদেশে, মহারাণীর ভারতীয় প্রজাকে, যদি কোন রাজ-প্রতিনিধি বা রাজপুরুষ কারারুদ্ধ করিয়া রাখে, তবে রাজানুগ্রহ ভিন্ন তাহার মুক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই; আর কি সহরে কি মফঃস্বলে, ভারতের সর্ব্বত্রই, রাজ প্রতিনিধির ইচ্ছামতে, যে কোন ব্যক্তি ছয়মাস কাল নিরুপায় আবদ্ধ থাকিতে পারে। ইহাই ভারতের বিধিবদ্ধ আইন।

ভারতে রাজায় প্রজায় যথোচিত সদ্ভাব নাই। প্রজা রাজাকে স্নেহ-ভক্তির ভাবে দেখেন না, রাজা প্রজাকে বিশ্বাস করিতে পারেন না। এদেশে প্রবাসী নিগ্রো হটেন্-টট ইংরাজ-রাজের সখের সৈনিক হইতে পায়, আমরা পাই না। ইংরাজের চিরশত্রু রুষ ফরাসী এদেশে আসিয়া, ইচ্ছামত অস্ত্র-শস্ত্র রাখিতে পায়; আমাদের কিন্তু কালীপূজার খাঁড়াখানি গৃহে তুলিবার পূর্ব্বে লাইসেন্স লইতে হয়। আমরা যাহা করি, যাহা বলি যেখানে যাই—পুলিস-গোয়েন্দা তাহা রীতিমত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে। "ইংরাজ অস্ত্রবলে ভারত জয় করিয়াছেন, অস্ত্রবলেই জিত ভারত রক্ষা করিতে হইবে" ইহাই যে রাজপুরুষদিগের বিশ্বাস, এ কথা সেদিন প্রধান সেনাপতি তারস্বরে ঘোষিত করিয়াছেন।

ইংরাজ ভারতবাসীকে ভয় করেন; ভয়ের চক্ষে হেয় নগণ্য ভারতবাসী একটা ভীষণ

পদার্থ বলিয়া অনুভূত হয়। এই অবিশ্বাস-মিশ্রিত ভীষণতা-বুদ্ধি হইতে গুপ্ত পুলিশ লিপি, (Secret Police Circular) স-গুলি বন্দুক প্রয়োগ (Cartridge Circular), কয়েদীর উৎপীড়ন, দণ্ডনীতির কঠোরতা, ফৌজদারি আইনের ঘূর্ণচক্র, কঠিন দণ্ডাজ্ঞার ভূয়ঃপ্রচলন এবং পুলিস-কর্ম্মচারীর অসীম অধিকার বৃদ্ধি।

আমরা মহারাণীর প্রজা। সাম্রাজ্ঞীর ঘোষণামতে ভারতীয় প্রজার সর্ব্ববিষয়ে ইংরাজ-প্রজার সহিত তুল্যাধিকার। অথচ ইংরাজ স্বার্থপরতা-প্রণোদিত হইয়া, আমাদিগকে, সে অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। মহারাণী সাম্য প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু এদেশে রাজার-জাতি ইংরেজের পক্ষে এক আইন, আর প্রজার-জাতি ভারতবাসীর পক্ষে আর এক আইন; ইংরাজ-প্রজা যেন মহারাণীর সো-ছেলে। আমরা করভারে প্রপীড়িত, অথচ প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের অধিকারী নহি। দেখুন, আমাদের দেশে প্রণালী-বিশুদ্ধ জুরিপ্রথা নাই; শাসক ও বিচারকের কার্য্যভেদ সত্ত্বে ব্যক্তিভেদ নাই; বিচার-মুক্ত ব্যক্তির চরম অব্যাহতি নাই; দণ্ড-বিশেষে আপীল করিবার অধিকার নাই। এদেশে বিচারক শাসকের অধীন হইয়া থাকে, দণ্ডবিধানের শতকরা হিসাবে কর্ম্মোন্নতি হয়, আপীলে দণ্ডের পরিমাণ বাড়িতে পারে। এদেশের লোক 'নিজ বাসভূমে পরবাসী'; দেশে কর্ম্মার্হ হইবার জন্য, সাত-সমুদ্র তের নদী পার হইয়া বিদেশে পরীক্ষা দিতে যায়। উচ্চতর রাজ-কার্য্য, বিদেশীর ইজারাকৃত; তাহার গণ্ডীমধ্যে দেশীয়ের প্রবেশ নিষেধ। এদেশে বড় আদালতের প্রধান বিনিয়োগ—অত্যাচার-নিবারণে, লোকের ধন-মান-প্রাণ-রক্ষায়। এদেশে ব্যবস্থাপক-সভা অলীক ভাণমাত্র; প্রতিনিধি শোভার্থ, কর্ম্মার্থ নহে। শুল্ক আইন ও ফ্যাক্টরি বিধি একথার প্রমাণ। ইংরাজ বড় স্বজাতিবৎসল,—আগে স্বার্থ, পরে লোকহিত। ম্যানচেষ্টারের শ্রীবৃদ্ধি হউক, ভারত রসাতলে যাক তাতে ক্ষতি কি? কথায় বলে—"আপনি বাঁচলে বাপের নাম!"

এ দেশে বিচার-ব্যবহার বড় মহার্ঘ সামগ্রী। বিদেশীয়ের বিপক্ষে, দেশীয় কদাচিৎ ন্যায়-বিচার পায়; ওহারা, ওয়েব, ফুলতা, খানটাকুল-ব্যাপার এ কথার সাক্ষ্য। দেশীয়ের বিপক্ষে দেশীয় সর্ব্বদা সুবিচার পায় না। যাহার তদ্‌বির ('তদ্‌বির' বলিতে অনেক কথা বুঝায়) তাহারই জিত। এইটুকুতে আমরা ইংলণ্ডের সমকক্ষ হইয়াছি।

হিন্দু-রাজার কালে আমাদের অধিকাংশ বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য ছিল, এখন পারতন্ত্র্যের একশেষ হইয়াছে। আমাদের অষ্ট-পৃষ্ঠে নিগড়; আর এই নিগড়ের পরিমাণ দিন দিন বাড়িতেছে। পুলিস আইন, জেল-আইন, নিয়ত-দোষীর আইন, অবৈধ জটলার আইন, ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। হিন্দু-ব্যবস্থা-শাস্ত্রে অনেক দিন হইতেই হাত পড়িয়াছে; ধর্ম্মত্যাগের আইন এবং বিধবা-বিবাহের আইন স্মরণ করুন। সম্প্রতি পারিবারিক সম্বন্ধও আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে,—সম্মতির আইনে তাহার সূত্রপাত।

গ্রীক-ভাস্করের হৃদয়োচ্ছ্বাসে বিনির্ম্মিত 'লেওকুনের' মূর্ত্তি কখন দেখিয়াছেন কি? সুবৃহৎ অজগর মহাকায় পুরুষকে শতপাকে বেড়িয়াছে। পুরুষ পাক ছাড়াইবার প্রয়াস করিতেছে, অজগর রহিয়া-রহিয়া একবার হেলায় পাক একটু সুদৃঢ় করিতেছে। এই ভাস্কর্য্যের সহিত আমাদের রাজনৈতিক অবস্থার কোন সাদৃশ্য আছে কি?

রাজনৈতিক অভ্যুদয়ের জন্য যে সকল উপাদান আবশ্যক, দেশে তাহার অধিকাংশের

অভাব। সমগ্র ভারতবাসী একপ্রাণে অনুপ্রাণিত নহে,—এক আশা, উৎসাহ, উদ্যম, আগ্রহে প্রণোদিত নহে। ভারতময় এত বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, ভাষা ও ধর্ম্মের সন্নিবেশ যে, এ সকল সত্ত্বে জাতীয়তার উন্মেষ হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। এক রাজার অধীনতার ফলে এবং জাতীয়-সম্মিলনী-সভার স্থায়ী চেষ্টায় জাতীয়তা অভিমুখে আমরা যতটা অগ্রসর হইয়াছিলাম, কৌশলী ইংরাজ অতি সহজেই তাহার প্রতিবিধান করিয়াছেন। দেশময় সম্প্রতি গোহত্যা লইয়া হাঙ্গামা উপস্থিত। মসজিদের সম্মুখে বাদ্য বাজান হইবে না, সম্প্রতি এ রবও উঠিয়াছে। হিন্দু-রাজত্ব-কালে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, এই চতুর্ব্বিধ নীতি প্রযুক্ত হইত; ইংরাজের প্রধান নীতি দণ্ড, তাহার পর ভেদ। এই ভেদ নীতি কৌশলে প্রযুক্ত হইয়া সুদারুণ গৃহ বিবাদ উপস্থিত করিয়াছে। শুনা যায়, রাণী এলিজাবেথ প্রীতি পাত্রান্তরিত করিয়া প্রিয়পাত্রদিগের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেন; কেহই প্রবল হইতে পারিত না, তিনিই প্রবলা থাকিতেন। ইংরাজ হিন্দু মুসলমান সম্বন্ধে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন।

আমাদের সম্মিলন-প্রবণতা বড় অল্প। চিত্তসংযম, সহানুভূতি, আত্মত্যাগ, পরনিষ্ঠতা প্রভৃতি সম্মিলনসাধক সদ্‌গুণের এদেশে বড় অভাব। আমরা সকলেই নেতা হইতে চাই, কেহই নীত হইব না; সকলেই হাম-বড়, অন্য কাহাকেও বড় মানিব না। এ বিষয়ে আইরিশ জাতি আমাদের অনুকরণীয় হওয়া উচিত। আর ইহাও স্বীকার্য্য যে, নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে পারেন, এরূপ লোকও আমাদের মধ্যে বিরল। বাগ্মিতা, কার্য্য-তৎপরতা, লিপিকুশলতা, সাহস, উৎসাহ, ঔদার্য্য, তেজস্বিতা, পাণ্ডিত্য, সূক্ষ্মদৃষ্টি, আত্মত্যাগ, স্বদেশবাৎসল্য, সার্ব্বজনীনতা—এই সকল সদ্‌গুণমণ্ডিত নেতৃপুরুষ কোথা?

আমাদের অধিকাংশ সামাজিক ও রাজনৈতিক চাঁই স্বার্থসর্ব্বস্ব; তাঁহাদের কাছে আগে অহং, পরে দেশটেশ যাহা কিছু। ইংরাজ ভজিতে ইহাঁদিগের অগাধ নৈপুণ্য। যতদিন না ইংরাজ কৃপাকটাক্ষ করেন, প্রজার হিতার্থে কতই তুমুল গর্জ্জন। সব ভুয়া, 'তু' রবে ডাকিবার অপেক্ষা; যাহাকে ডাকে না সেই যায় না। সেক্ষপীয়র স্পষ্টবাদী ফ্যাকনব্রিজের মুখে যাহা বলাইয়াছেন, আমাদের চাঁই মহাশয়েরাও সেই কথা বলিতে পারেন।

যত দিন দরিদ্রতা, কহিব নিশ্চয়,
নাহি ভবে পাপী কেহ ধনীর মতন।
কিন্তু অর্থাগমসনে মত-বিপর্য্যয়—
ধনী হ'লে, নাহি পাপী যেমন নির্দ্ধন॥

ইংরাজ অপূর্ব্ব কৌশলী; আমাদের জাতির এই চিত্তদুর্ব্বলতা বিলক্ষণ বুঝেন। কাহাকেও মোয়া, কাহাকেও দিল্লীকা লাড্ডু, দেখাইয়া হস্তগত করিতেছেন। দেশের বড়-লোকের নামের শেষে কি এ বি সি ডি প্রভৃতি বর্ণমালা সংযোগ করিয়া দিতেছেন; তাঁহারা উপাধি-গ্রস্ত হইয়া মহা উৎফুল্ল হইতেছেন। মধ্যবিত্ত লোক ডেপুটি মুন্‌সেফি প্রভৃতি চাকুরির লোভে আত্মহারা হইতেছেন। কালেজের ছাত্রেরা এতদিন গরিব-প্রজার পক্ষ ছিল, সম্প্রতি তাহারাও জলবিহার ও বাগান-ভোজের লোভে এ দল ছাড়িয়া গিয়াছে। উচ্চাবচ আমাদের সকলেরই ফলতঃ ইংরাজ প্রভু। জমিদারের কলেক্টার প্রভু, উকীলের জজ-ম্যাজিষ্টর প্রভু, কেরাণীর আপিস সাহেব (সওদাগর বা সিবিলিয়ন) প্রভু; কুল-মজুরের প্লান্‌টার প্রভু, চাষীলোকের পুলিস সাহেব প্রভু এবং রাজা-মহারাজার ছোটলাট প্রভু। কাহারও স্বেচ্ছা স্বতন্ত্রতা নাই।

অতঃপর আমাদিগের সামাজিক অবস্থা আলোচিত হইতেছে।

সমাজ, সাঙ্গ সজীব পদার্থ। গুণ-কর্ম্মভেদে বিভিন্ন, সম্প্রদায়নিচয় সমাজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং ধর্ম্মভাব সমাজ-শরীরের প্রাণ। পূর্ব্বকালে ধর্ম্মময়তায় আমাদের সমাজ সজীব ছিল। সমাজের অঙ্গভূত সম্প্রদায় সকল, ধর্ম্মের অনুপ্রাণনে সামাজিক অভ্যুদয়সাধনে নিরত ছিল। ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতিভূ ছিলেন; স্তরবিন্যাসের অপূর্ব্ব কৌশলে, ধর্ম্মভাব নিম্নতম স্তরেও সংক্রামিত হইয়াছিল। হীন জাতির বর্ব্বরতা ক্রমশঃ সভ্যতায় উন্নীত হইতেছিল। ইহার শুভফল এ দুর্দ্দিনেও প্রত্যক্ষের বিষয়। অন্য সমাজের ইতরলোক অর্দ্ধ পশু, এ দেশের ইতরলোক (তাহাদের তুলনায়), দেবনর।

কালক্রমে সমাজের প্রাণটুকু প্রায় সকলই উড়িয়া গিয়াছে। প্রাণ দেহ ছাড়িলে, দেহের কি অবস্থা হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন। একবার, প্রাণ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিবাদ বাধে—ইন্দ্রিয়গণ অহমিকা করিয়া বলে 'আমরা বড়, প্রাণ ছোট। দেহে প্রাণ থাকে থাকুক, আমরা যাই।' এই বলিয়া একে একে চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ প্রভৃতি দেহকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তাহাতে দেহের কথঞ্চিৎ বিকলতা ঘটিল বটে, কিন্তু দেহের ধ্বংস হইল না, যেহেতু প্রাণ অক্ষুন্ন রহিল। অবস্থা বুঝিয়া একে একে ইন্দ্রিয়গণ ফিরিয়া আসিলে, প্রাণ দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইল। তাহাতে দেহ একবারে অবশ অচল হইল। চক্ষু, আর দেখিতে পায় না; কর্ণ, আর শুনিতে পায় না—দেহ মৃতবৎ হইল। তখন অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরা প্রাণের প্রাধান্য বুঝিয়া স্তুতি করিয়া প্রাণকে ফিরাইয়া আনিল। প্রাণই বড়, ইন্দ্রিয় ছোট।

দেহ বাসের উপযোগী থাকিতে, আর প্রাণ দেহ ছাড়ে না। নানা ব্যাধি বিপত্তির দীর্ঘকালব্যাপী উৎপাতে, দেহ জরাজীর্ণ ও রোগাকীর্ণ হইয়া বাসের অনুপযোগী হয়, তখন প্রাণ দেহ ছাড়িতে উদ্‌যোগ করে। আমাদের সমাজ শরীরের সর্ব্বাঙ্গে ব্যাধি; সমাজ জরাজীর্ণ ও রোগাকীর্ণ। এ সমাজে প্রাণ আর কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে? হিংসা, দ্বেষ, কপটতা, অবিশ্বাস, আত্মম্ভরিতা, এ সকল ত পূর্ণ মাত্রায় আছেই, তাহার উপর সহানুভূতি—যাহা সমাজের বন্ধনী, যাহার আকর্ষণে বিকর্ষণপর মানব-পরমাণু সম্মিলনপ্রবণ হয়, সেই সহানুভূতি, সেই সামাজিক ভ্রাতৃভাব, নাই বলিলেই হয়। আমাদের সমাজ প্রাণহীন হইবে না ত কি?

ফলও অনুরূপ হইয়াছে। সামাজিক বিধি ব্যবস্থা, একটা অর্থশূন্য আড়ম্বর মাত্রে পরিণত হইয়াছে;—জীবনীশক্তি নাই, শুষ্ক ঠাট্‌টা খাড়া আছে। একে একে দেখুন। জাতিভেদের মূল সূত্র গুণকর্ম্ম-বিভাগ নাই, জাতিভেদ আছে। জ্ঞানার্জ্জন, সমাজরক্ষা, কৃষি-বাণিজ্য এবং পরিচর্য্যা—এই চতুর্ব্বিধ কর্ম্মভেদ; এবং সাত্ত্বিক, সাত্ত্বিক-রাজসিক, রাজসিক এবং তামসিক—এই চতুর্ব্বিধ প্রাকৃতিক গুণভেদ; এতদুভয়ের উপর ভিত্তি করিয়া প্রাচীন জাতিভেদপ্রথা গঠিত ছিল। এখন সকলেরই কর্ম্ম চাকুরি আর সকলেরই প্রাকৃতিক গুণ তামসিক। আমার মনে হয়, যদি জাতিভেদ এ দেশে মৌলিক বর্ণভেদ সহকৃত না হইত, তবে অনেক দিন পূর্ব্বেই ঐ প্রথা অন্তর্হিত হইত।

এইরূপ বাঙ্গালীর বিশেষত্ব-সূচক অন্যান্য বিধি-ব্যবস্থা দেখুন। বিধবার বিবাহ নাই, বিলাসিতা আছে; ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য নাই, উপনয়ন আছে; আত্মার একীকরণ নাই, বাল্যবিবাহ আছে; প্রীতিসদ্ভাব নাই, একান্ন পরিবার

আছে। সমাজের প্রাণহীনতার আরও প্রমাণ চাহেন? দেখুন, জৈবিক উত্তরাধিকারমূলক উন্নতি-বিধায়ক কৌলীন্য-প্রথা কি জঘন্য-পশ্বাচারে পরিণত হইয়াছিল। হিন্দু-বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য পতিপত্নীর একীকরণ বিলুপ্ত হইয়া. তাহার স্থানে শতীকরণ, কোথাও কোথাও দ্বিশতীকরণ পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বাঙ্গালীর এতটুকু হৃদয় দ্বিশত মহিষীর বিশাল আবর্ত্তে পড়িয়া কোথায় তলাইয়া গিয়াছিল। সুবিধা এই টুকু ছিল যে, অধিকাংশ মহিষীর সহিত খাতায় নাম লিখার অধিক পরিচয় হইত না। ইংরাজের আমলে. বোধ হয় খোরপোষের মামলার দায়ে এবং আইন বলে দাম্পত্য-ঘনিষ্ঠতার ভয়ে (Restitution of conjugal Rights) বাঙ্গালী আর বড় বহুবিবাহে অগ্রসর হয় না। তাহার স্থানে পুত্রবিক্রয় আরম্ভ করিয়াছে। একটা ত ব্যবসায় চলা চাই। আগে বাঙ্গালী আত্ম-বিক্রয় করিত, এখন পুত্র বিক্রয় করে। পাঁটা পাঁটীর মত বাঙ্গালা দেশে যে পুত্র কন্যা বিক্রীত হইত, তাহা বোধ হয় আমাদের উত্তর-পুরুষেরা ধারণায়ও আনিতে পারিবে না। বহুবিবাহের যুগে তবুও নামতঃ বিবাহ চলিত ছিল, এই কন্যাদায়ের যুগে বুঝি বিবাহও উঠিয়া যায়। ইতিমধ্যেই কন্যার বিবাহের বয়স বাড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহার কি ফল আমরা আর কিছুদিনে অনুভব করিব। বোধ হয় আর কয়েক বৎসরে, নির্দ্ধন বাঙ্গালী পিতা, কন্যার বিবাহের দায় কন্যার গলায় বাঁধিয়া দিয়া; কন্যাকে সমাজচত্বরে চরিতে দিবে। কন্যা আপনার পথ আপনি খুঁজিয়া লউক; আপনার আহার আপনি খুঁটিয়া খাউক।

প্রাচীন ভারতে যে সকল কুৎসিত বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তাহাদিগের নিন্দাসূচক পৈশাচ রাক্ষস আসুর প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি পুত্রবিক্রয়ের নাম রাখিয়াছি দানব-বিবাহ; কারণ হৃদয়হীনতা স্বার্থপরতা ক্ষুদ্রতা নীচতা ঐহিকতা আত্মসর্ব্বস্বতা—বাঙ্গালীর দানবতার এরূপ দৃষ্টান্ত স্থল অতি বিরল।

সমাজ প্রাণহীন, সুতরাং সামর্থ্যহীন। সমাজের সংহত মতামত নাই; সমাজ যাহা ইষ্ট মনে করে, তাহার রক্ষণ, যাহা অনিষ্ট মনে করে, তাহার নিবারণের কোন শক্তিশালিতা নাই। সেই জন্য সমাজে যথেচ্ছাচারের প্রবর্ত্তনা; সমাজ কণ্টকে সমাজের সর্ব্ব অঙ্গ জর-জর, কণ্টক উদ্ধারের কোন উপায় নাই।

সমাজ-ব্যাধির আর এক প্রমাণ—ব্রাহ্মণের অধঃপতন। সেই শম দম তিতিক্ষা শান্তি সমাধানের আধার, সেই জ্ঞান বিজ্ঞান আস্তিক্যের আশ্রয়স্থল, সেই আধ্যাত্মিকতার অবতার, এখন আকাশ ছাড়িয়া মাটির সহিত মিশিয়া মাটির অধম হইয়াছেন। শাস্ত্র এখন তাঁহার সাপত্ন, সরস্বতী তাঁহার বিমাতা, আচার তাঁহার অরি, অসন্তোষ তাঁহার নিত্য সহচর এবং ঐহিকতা তাঁহার জীবনক্ষেত্র। আজ তিনি উদরান্নের জন্য লালায়িত, অর্থসংগ্রহের জন্য উদ্বিগ্ন, "স্ব-বৃত্তি"র জন্য উৎকণ্ঠিত। যে ব্রাহ্মণ যুধিষ্ঠিরের রাজপ্রসাদ ছাড়িয়া শিলোঞ্ছবৃত্তির অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরাই কি উপাধিভিক্ষার জন্য ম্লেচ্ছ রাজার দ্বারে তাঞ্জতসনে বিমণ্ডিত হইয়া যুক্তকরে দণ্ডায়মান? পূর্ব্বকালে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে লোকে মহোপাধ্যায় বলিত, এখন ইংরাজের কল্যাণে অধ্যয়নহীন হইলেও পণ্ডিতের উপাধি মহা-মহা উপাধ্যায়।

সকল সমাজেরই আচার আহার রীতি পরিচ্ছদ ব্যবহারাদিতে একটা বিশেষত্ব আছে। সেই বিশেষত্ব যুগবাহী-ভূয়োদর্শন-জনিত উপযোগিতা-জ্ঞানের ফল। ইংরাজের

অনুকরণে আমাদের সমাজের সেই বিশেষত্বের ক্রমশঃ লোপাপত্তি হইতেছে। আমরা বেশ-ভূষায়, আহারে আচারে—অধিক কি দৈনন্দিন জীবন প্রণালীতে ইংরাজের অনুকরণ আরম্ভ করিয়াছি। ইহার মোট ফল দেশের উপর বড় অনিষ্টকর হইয়াছে। রাজনারায়ণ বাবু ভার্ণ্যাকুলর বুড়ো এবং এংলিসাইজড্ বুড়োর যে তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা আমাদের বিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। ইংরাজ রাজকবি টেনিসন-স্রষ্টা বিদুষী রাজকুমারীর ধারণা ছিল যে, নারী নরের অপরিণত অবস্থা; এইরূপ অনেক ইঙ্গ-বঙ্গ বাঙ্গালীর ধারণা যে, বাঙ্গালী অনুন্নত অপরিণত ইংরাজ। বাঙ্গালীকে উন্নত পরিণত করা, তাহাকে ইংরাজ করার নামান্তর মাত্র। এ ধারণা বড় ভুল; বাঙ্গালীর আদর্শ নবীন ইংলণ্ডে নহে, প্রাচীন ভারতে।

ইংরাজী অনুকরণের আর এক ফল, বাঙ্গালা ভাষার দুর্দ্দশা। ইংরাজী আওতায় বাঙ্গালা বাড়িতে পাইতেছে না। অধ্যয়ন অধ্যাপন চিঠি পত্র বিষয়-কর্ম্ম কথোপকথন, সকল হইতেই আমরা যে ভাবে বাঙ্গালা বর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় আর কিছু দিনে নিমচাঁদের দশা প্রাপ্ত হইয়া ইংরাজিতে স্বপ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে থাকিব। তখন বাঙ্গালী নাম লুপ্ত হইবে। সকলেই জানেন, জাতীয়তার প্রধান অবলম্বন ভাষা; ভাষা বিলুপ্ত করিয়া দিন, জাতিও বিলুপ্ত হইবে। একবার রোমীয় সেনেট সভায় বিদেশ শাসন হইতে প্রত্যাগত সিসিরোর উপর দোষারোপ করিয়া কেহ কেহ বলেন যে, সিসিরো নিতান্ত অপদার্থ ব্যক্তি; তাঁহার শাসন কালে একটীও রণ জয় হয় নাই, একবারও যুদ্ধোদ্যম হয় নাই। সিসিরো উত্তর করেন যে, বিজিত দেশ যে উপায়ে চিরদিন রোমের অধীন থাকে, তিনি তাহার সুবিধান করিয়া আসিয়াছেন। দেশী ভাষার আলোচনা বন্ধ করিয়া ১০৬টী রোমীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। মহাজ্ঞানী সিসিরোর এই কথাটী সকলের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।

আমাদের সামাজিক প্রাণ-হীনতার শেষ উদাহরণ—আধুনিক সমাজ-সংস্কার-প্রণালী। সমাজ নেতৃ-হীন, সুতরাং যৎকিঞ্চিৎ সমাজ-সংস্কারের জন্য আমাদের বিদেশী রাজার শরণাপন্ন হইতে হয়। দেশময় দেব-সম্পত্তি উৎসন্নপ্রায়, দেবতা উপবাসী, সেবাইত মোহান্ত কুক্রিয়াসক্ত; সমাজ শক্তিহীন নিরুপায়। রাজকীয় বিধির আশ্রয়ভিক্ষা অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। এই কলিযুগের প্রারম্ভেই মহাত্মা ধর্ম্ম শাস্তৃগণ মিলিত হইয়া সমাজের অনুপযোগী কতকগুলি ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন বিধির প্রবর্ত্তনা করিয়াছিলেন। এখন আর এরূপ হওয়া সম্ভাবিত নহে, কারণ সমাজ নেতৃ-হীন।

আর সেরূপ মহাত্মা ব্যক্তিগণই বা কোথায়? বাঙ্গালী সমাজ-সংস্কারক এক প্রকার অদ্ভুত জীব। তিনি পাঁচজন নয়, দশ জন নয়, সমগ্র মানবজাতিকে উন্নতির পথে ঘোড়দৌড় করাইবেন, অথচ সংস্কারের মূলমন্ত্র আত্মোন্নতি, তাহা সাধন করিতে অগ্রসর নহেন। তাঁহার হৃদয়ে অজ্ঞান-অন্ধকার, প্রাণে প্রলয়-ঝটিকা, জীবনে ঢাক বাজান উদ্দেশ্য ফলও অনুরূপ হইতেছে। সংস্কার-কার্য্য অপচারে পরিণত হইতেছে। ভূদেব বাবু যথার্থই বলিয়াছেন;—"পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাবে যতগুলি ব্যাপার সংস্কার কার্য্য বলিয়া উল্লিখিত এবং আন্দোলিত হইতেছে, তাহার একটীও মনুষ্যের চিত্তশুদ্ধির অনুকূল নহে। সকলগুলিই অত্যধিক পাশব ভাবের অনুকূল, একটীও দিব্যভাবের অনুকূল নয়। একটিও ইন্দ্রিয় বৃত্তি-নিরোধের পক্ষ নহে; সকলগুলিই

ইন্দ্রিয়-বৃত্তির চরিতার্থতা-সম্পাদক।" কথায় বলে, ঢেঁকি স্বর্গে গিয়াও ধান ভাঙ্গে। বাঙ্গালী সংস্কার কার্য্যেও বাঙ্গালিত্ব ছাড়িতে পারে না।

অতঃপর বাঙ্গালীর বৌধিক (বা বুদ্ধি-বিষয়ক) অবস্থা আলোচিত হইতেছে।

চিন্তা-রাজ্যে বাঙ্গালীর অতুল কীর্ত্তি নব্য ন্যায়। পূর্ব্বে ন্যায়শাস্ত্রের আবাসভূমি ছিল মিথিলায়। বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে মিথিলা হইতে বৃহৎ ন্যায়ের গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া আনেন ; তদবধি বাঙ্গালায় (নবদ্বীপে) ন্যায়ের টোল প্রতিষ্ঠিত হয়। বাসুদেবের ছাত্র রঘুনাথ—ন্যায়ের সর্ব্বোত্তম গ্রন্থ দীধিতির প্রণেতা। তাহার পর পর্য্যায়-ক্রমে জগদীশ, গদাধর প্রভৃতির নাম লইতে হয়। ফলতঃ বাঙ্গালায় ন্যায়শাস্ত্র যেরূপ বিস্তৃতি ও প্রগাঢ়তা লাভ করে, এরূপ জগতে আর কোথায়ও হইয়াছে কি না সন্দেহ। চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও বাঙ্গালীর সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। নিদানকার মাধবকর এবং চক্রপাণি দত্তের নাম লইলেই যথেষ্ট হইবে। স্মৃতির চর্চ্চাও যথেষ্ট উন্নত ছিল। রঘুনন্দনের মত সর্ব্বদর্শী স্মার্ত্ত অন্য দেশে দুর্লভ। দায়-ভাগকার জীমূতবাহনের তুলনায় অন্য সকল নিবন্ধকার নিষ্প্রভ হইয়া পড়েন। স্মৃতি-শাস্ত্রে রঘুনন্দনের যে উচ্চ স্থান, তন্ত্রশাস্ত্রে কৃষ্ণানন্দনের সেইরূপ। উভয়ই বঙ্গভূমির ভূষণ স্বরূপ। ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশের বিদ্যা-বিষয়ক অবস্থার আলোচনা করিয়া শ্রদ্ধাস্পদ শিশির বাবু লিখিয়াছেন ;—"নবদ্বীপের তখন যে অবস্থা হইল, তাহা কোথাও কোন্ কালে দেখা যায় নাই। নবদ্বীপ নগর বিদ্যা লইয়া উন্মত্ত হইল। ভদ্রলোকে অন্য চিন্তা একবারে ছাড়িয়া দিল। সকলেরই মনের ভাব যে বিদ্যা উপার্জ্জনই জীবের প্রধান সাধন। যে পণ্ডিত, তাহারই জীবন সার্থক। যে পণ্ডিত, সেই মনুষ্য, সেই রূপবান্, সেই কুলীন ও সেই সুখী। * * স্ত্রীলোকে ঘাটে শাস্ত্র চর্চ্চা করিতেছে, বালক-গণ স্থানে স্থানে বিদ্যাযুদ্ধ করিতেছে, আর পড়ুয়াগণ নগর একবারে অধিকার করিয়া লই-য়াছে। প্রত্যেক গলিতে টোল, প্রত্যেক টোলে সহস্র সহস্র পড়ুয়া। পুঁথি তাঁহাদের ভূষণ, পুঁথি তাঁহাদের সঙ্গী বন্ধু ও বল"। চিন্তা-রাজ্যের রাজধানী নবদ্বীপ নগরের যে অবস্থা বর্ণিত হইল, তদানীন্তন বাঙ্গালার প্রায় সকল প্রদেশের প্রতি তাহা অল্প-বিস্তর খাটে। সেই সময়ে যে বিদ্যার বন্যা বাঙ্গালা দেশ প্লাবিত করে তাহার বেগ ক্রমশঃ মন্দীভূত হইলেও ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও প্রসারিত ছিল। গ্রামে গ্রামে টোল, নগরে নগরে পণ্ডিত-সমাজ, বোধ হয়, অনেকেই বালককালে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

তখন বিদ্যার অনুরোধে লোক বিদ্যা উপার্জ্জন করিত। দূরদেশ হইতে বিনা সম্বলে নিরবলম্বনে ছাত্রেরা বিদেশে বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে আসিত। অনেকে ন্যায়ের কূট তর্কের সমালোচনায়, অথবা স্মৃতির দুর্ব্বোধ মতামতের গবেষণায় চিরজীবন অতিবাহিত করিত। অনেকেই বোধ হয় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সাময়িক বুনো রামনাথের প্রসঙ্গ শুনিয়াছেন। নিরীহ ব্রাহ্মণ তিন্তিড়ীপত্রের ব্যঞ্জন সহকারে অন্ন আহার করিয়া চিন্তারাজ্যে বসতি করি-তেন। ইহা প্রায় ১৫০ বৎসরের কথা। আরও পরের কথা ধরুন। পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কেহ বিদ্যার গৌরব করিলে তিনি বলিতেন—'আমরা পঠদ্দশায় যাঁহাদের কাছে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছি, সেরূপ লোক আপনি দেখেন নাই, তাই আমার বিদ্যার গৌরব করিতেছেন। তাঁহারা বিদ্যার আড়ম্বর জানিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহাদের মত বিদ্যার গভীরতা ইদানীং দুর্লভ।'

পূর্ব্বে সমাজে বিদ্বানের যথেষ্ট সম্মান ছিল। 'যাঁহার কন্যা থাকিত, তিনি পণ্ডিত জামাইকে কন্যাদান করিতেন। বিদ্বান্ লোক পথে দেখিলে সকলে এক পাশ হইতেন।' ধনী ব্যক্তিরা বিদ্যার উন্নতিকল্পে ধনব্যয় করিতেন। প্রত্যেক শ্রাদ্ধের প্রধান অঙ্গের মধ্যে ছিল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বিদায়। বৃত্তি সাহায্য দিয়া টোলের প্রবর্ত্তনা নিত্য ঘটনার অন্তর্গত ছিল। 'অনন্তং বেদপারগে'; বেদজ্ঞকে দান গ্রহণ করাইলে অনন্ত পুণ্য, ইহাই প্রচলিত বিশ্বাস ছিল।

এখনকার অবস্থা কিরূপ? দুই বৎসর পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন বঙ্গীয় টোল পরিদর্শন করিয়া, যে বিবরণী প্রকাশিত করেন, তাহা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রায় উৎসন্নপ্রায়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, বাঙ্গালা দেশে যত টোল এবং টোলে যত ছাত্র ছিল, তাহার শতাংশও আছে কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মণ এখন উদরান্নের জন্য বিব্রত; জাতিব্যবসায়ে আর অন্নসংস্থান হইয়া উঠে না। সুতরাং ব্রাহ্মণের ছেলে এখন ইংরাজি ইস্কুলে প্রবেশ লাভ করিয়া, ঔষধ আইনের আশ্রয় লইতেছে। ফলে, সংস্কৃতচর্চ্চা দেশ হইতে একরূপ উঠিয়া যাইতেছে। দশখান গ্রাম খুঁজিলে একজন পণ্ডিত মিলে না। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণিও বাঙ্গালার অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন; তাঁহার মতে উপরোক্ত বর্ণনা কিছুই অতিরঞ্জিত নহে, বরং চিত্রে আর একটু কাল রঙ ঢালিলে সত্যতা আরও পরিস্ফুট হইত।

সংস্কৃতশিক্ষার অবস্থা এইরূপ। ইংরাজি শিক্ষার কি ভাব?

য়ুরোপ হইতে আমাদের প্রধানতঃ শিখিবার বিষয় বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের প্রভাবেই য়ুরোপ ধনশালী ও বলশালী হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য জাতিকে স্পর্দ্ধা করিতে পারিয়াছে। য়ুরোপের উন্নত শিল্প ও বাণিজ্য, উভয়ই বিজ্ঞানের ফল। বিজ্ঞান-সভার জাক-জমক সত্ত্বেও বলিতে হয় যে, আমাদের দেশে এখনও বৈজ্ঞানিকতার অঙ্কুরোদ্গম হয় নাই। আমরা কোন্ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছি? দেশে এত খনিজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ রহিয়াছে, কাহার গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া তাহার প্রকৃতি নির্দ্ধারণে সমর্থ হইয়াছি? দেশে বৈজ্ঞানিকতা বাস্তবিক প্রবিষ্ট হইলে কল-কারখানার অবস্থা নিশ্চয়ই সমুন্নত হইত। তাহা হইয়াছে কি?

বঙ্কিম বাবু আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে গর্দ্দভের সহিত তুলনা করিয়াছেন। বুঝিয়া দেখিলে এ তুলনা অসঙ্গত মনে হয় না। বঙ্কিম বাবুর উক্তি এইরূপ,—'এই সকল শিক্ষিত গর্দ্দভ জ্ঞানের ছালা পিঠে করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বেড়ায়;—বিস্মৃতি নামে করুণাময়ী দেবী আসিয়া ভার নামাইয়া লইলে তাহারা পালে মিশিয়া স্বচ্ছন্দে ঘাস খাইতে থাকে।' বাস্তবিক আমাদের বি এ, এম এ রা বড় শোচনীয় জীব। তাঁহাদের জ্ঞান জিহ্বাগত; মুখস্থ করিতে বেশ পটু, না হয় নাই বুঝিলেন। আজীবন ইংরাজির আলোচনা করিয়াও ইহাঁরা বাবু-ইংরাজির হাত এড়াইতে পারেন না।

যে প্রণালীতে বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে জ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ হইতেছে, তাহাতে একরূপ হওয়া কিছুই বিস্ময়কর নহে। প্রথম দেখুন, অতি উৎকট বিদেশী ভাষায় আমাদের শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। জিহ্বার আড় ভাঙিবার পূর্ব্বেই শিশুকে ইংরাজী আয়ত্ত করিতে হয়। ইতিহাস, ভূগোল, ব্যাকরণ, অঙ্কশাস্ত্র, বিজ্ঞান—সকলই বিদেশী ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া শিক্ষিত হয়। ইহাতে প্রকৃত

জ্ঞানার্জ্জন হইবার সম্ভাবনা কোথায়? আচার্য্য সিলি যথার্থই বলিয়াছেন,—"যদি ভারতবর্ষকে প্রকৃত জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিতে হয়, তবে ইংরাজী বা সংস্কৃতের সাহায্যে হইবে না, বাঙ্গালা হিন্দি প্রভৃতি ভাষা দ্বারা করিতে হইবে।" মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ওজস্বী ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন যে, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের জাতীয় ভাষায় জ্ঞান-বিস্তার না হইলে আমরা কখনও বহুবিষয়ে অভিজ্ঞ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিব না। যাবৎ জাতি-সাধারণের মধ্যে জাতীয় ভাষায় জ্ঞানরশ্মি বিকীর্ণ না হইবে, তাবৎ চারিদিকের গভীর অজ্ঞানান্ধকার কখনই বিলুপ্ত হইবে না।" কিন্তু এ বধিরতার যুগে এ সকল হিত-কথায় কে কর্ণপাত করে? বিশ্ব-বিদ্যালয় আপনার পথে সবেগে ধাবিত হইতেছেন। জ্ঞানবৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য নাই, মেধা সুতীক্ষ্ণ হইলেই যথেষ্ট। অতএব পরীক্ষা-সাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্য পরীক্ষার্থীকে সুদারুণ মেধা-ব্যায়ামে নিযুক্ত হইতে হইয়াছে। শরীর-পাত হয়, স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয়, আয়ুঃক্ষয় হয় ক্ষতি নাই, কোনরূপে পাশ হইতেই হইবে, নতুবা অধিকাংশ আয়ের পথ রুদ্ধ। ইংরাজ ঔপন্যাসিক ডিকেনস, এক স্থলে 'অকাল-পক্বতা আলয়ে'র (Forcing Institution) বর্ণনা করিয়াছেন। বোধ হয়, ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁহার আদর্শ। কি পুস্তক-নির্ব্বাচনে, কি পরীক্ষা প্রণালীতে, কি উপাধি-বিতরণে—সকল বিষয়েই ইহার মত অকাল-পক্বতার সহকারী আর কে আছে?

আমাদের স্বদেশীয় মনীষিগণ কেহ কেহ এ বিষয়ে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন। রাজনারায়ণ বাবু বলেন যে, এক হিসাবে বর্ত্তমান ইংরাজী শিক্ষার প্রণালী, মানুষ মারিবার কল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মাননীয় রানেদে মহোদয় অনেক আলোচনার পর বিশ্ববিদ্যালয়কে মহারাষ্ট্র-বালকের অকাল মৃত্যুর সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চিন্তাশীল শিশির বাবু পরিহাসচ্ছলে বিশ্ববিদ্যালয়কে বল্লাল সেনের সহিত তুলনা করেন। 'প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ বল্লাল, (এটাও পরিহাস) কৌলীন্য-প্রথার প্রবর্ত্তনা করিয়া ব্রাহ্মণ জাতির ধ্বংসের সূচনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ও ইংরাজী শিক্ষার প্রচার করিয়া বাঙ্গালী জাতির বিলোপ সাধনে উদ্যত হইয়াছেন।' আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি; আমার মত যদি কেহ গ্রহণ করেন, তবে বিশ্ব-বিদ্যালয়কে 'মেমারি-মাপক যন্ত্র' আখ্যা দিতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কবল হইতে উন্মুক্ত জীব যে বিশেষ মেধাশীল, এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।

এই প্রণালীর সহিত প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ব্রহ্মচর্য্য পদ্ধতির তুলনা করুন। ব্রহ্মচর্য্য ছাত্র-জীবনের নামান্তর, হিন্দুর চতুরাশ্রমের প্রথম আশ্রম। পূর্ব্বকালের অনূচান বালকের স্বাধ্যায়, বেদাভ্যাস, শাস্ত্রার্থ-জ্ঞান, সূক্ষ্মদৃষ্টি সর্ব্বজনবিদিত। তাহার পক্ষে বিদ্যাশিক্ষা ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার সহিত বিযুক্ত ছিল না। তাহার জন্য উচ্চতর-শিক্ষা-বিধায়িনী সভার প্রয়োজন হইত না। এখনকার ছাত্র-জীবন যেমন অনেক স্থলে বিলাসিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিশব্দ, তখন সেরূপ ছিল না। ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বাস করিয়া ইন্দ্রিয়-সংযম করিতেন; কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্যূতক্রীড়া, স্ত্রীসঙ্গ, পরনিন্দা, মাংসাহার প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতেন। নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি ব্যসন ও বিলাসিতা পরিহার করিতেন। তিনি ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবনধারণ করিয়া সংযতচিত্তে দেব-ঋষি পিতৃগণের তর্পণ ও অর্চ্চনা করিতেন। এইরূপ শিক্ষা ও অভ্যাসের গুণে তরুণ ব্রহ্মচারী সহজেই দশবিধ ধর্ম্ম লক্ষণে ভূষিত হইয়া গুরুর

শিক্ষা দীক্ষার সফলতা সম্পন্ন করিতেন। কেহ একালে সেরূপ ছাত্র দেখিবার আশা করেন কি ?

বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ফলাফল যেরূপ হইবার, তাহাই হইতেছে আমড়া-বৃক্ষে আম ফলিল না বলিয়া আক্ষেপ করা সঙ্গত কি ?

পূর্ব্বে শিক্ষা শুভঙ্করী ছিল, এখন অর্থকারী মাত্র হইয়াছে। শিক্ষার চরম জ্ঞানলাভ নহে ;—পাশ। আমার বিশ্বাস, যদি পাশ ভিন্ন বাঙ্গালীর অর্থাগমের সম্ভাবনা থাকিত, তবে এতদিনে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার্থী বিহনে অচল হইত। ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য যে চিত্তের স্ফূর্ত্তি, বৃত্তির অনুশীলন, তাহা আদৌ সিদ্ধ হয় না শিক্ষার অনুরোধে শিক্ষার পক্ষপাতী হইতে কেহ বাঙ্গালীকে দেখিয়াছেন কি ? কৈ, এত বড় দেশে এত লোকের মধ্যে একজনও বিদ্যাব্রতী আছেন কি ? য়ুরোপীয়েরা যাহাকে সাভাঁ (Savant) বলেন, অধুনা এদেশে সেরূপ জীবের কেহ সাক্ষাৎ পাইয়াছেন কি ?

বাঙ্গালায় মৌলিক চিন্তা নাই। কৈ, অদ্যাবধি বিজ্ঞান বা সাহিত্য বিষয়ে কোন বাঙ্গালী কিছু নূতন আবিষ্ক্রিয়া বা নূতন প্রবর্ত্তনা করিতে পারিয়াছেন কি ? আমাদের বিদ্যাসাগর অক্ষয়চন্দ্রেরাও পর-পথগামী বাঙ্গালী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোনও কাজে অগ্রসর হইতে পারে না। আমাদের সভা-সমিতি সংবাদ-পত্র ইংরাজের অনুকরণ ; আমাদের কন্‌গ্রেস নকলের নকল। বাঙ্গালীর স্বাধীন চিন্তা নাই। আমরা পড়া-পাখীর মত পরের কথার দ্বিরুক্তি করি। ভাব, অর্থ, প্রয়োগ, প্রত্যাহার না বুঝিয়া পরের কথা মস্তিষ্কে বহন করিয়া বেড়াই ; প্রয়োজন অপ্রয়োজনে আমাদের জিহ্বা সেই কথার উচ্চারণ করিয়া থাকে।

বাঙ্গালী পল্লব গ্রাহী। যে সকল বিষয়ের আমরা সদা সর্ব্বদা আলোচনা করি, তাহারও কোনটা তলাইয়া বুঝি কিনা সন্দেহ আমাদের জ্ঞান ভাসা-ভাসা সেক্ষপীয়র, মিণ্টন, ব্যাস, বাল্মীকি, কালীদাস, বেদ, বেদান্ত, গীতা, দর্শন, বিজ্ঞান, তত্ত্ব-বিদ্যা প্রভৃতি সকল কথাই আমাদের জিহ্বাগ্রে আছে, অথচ কোনটার দুই চারি পাতার অধিক আবৃত্তি করিয়াছি কি না, বলা যায় না। আমাদিগের বচনবিন্যাসে, প্রবন্ধ-রচনায়, গ্রন্থ-প্রণয়নে, আমাদের এক এক জনকে বিদ্যা-দিগ্‌গজ মনে করিতে হয় ; কিন্তু আমরা ভূষির মানুষ,—ভিতর সব ভূয়া, অসারতায় পরিপূর্ণ।

আমাদের দেশে বিদ্যার গৌরব হওয়া সম্ভব নহে। বিদ্যা অনাদর-অন্ধকারে ম্রিয়মাণা হইয়া অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। সেইজন্য এ দেশে গ্রন্থ রচনা সখ বা সৌখীনতার কার্য্য। পাঠকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লেখকের জীবিকা অর্জ্জনের সম্ভাবনা নাই। এখানে শিশুপাঠ্য পুস্তক ভিন্ন অন্য পুস্তক বিক্রয় হয় না। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা বৃত্তি দিয়া শত শত টোল সংরক্ষিত করিতেন, আমরা অযুত চেষ্টায়ও একটা ছাত্রবৃত্তি করিতে পারি না। আমাদের বিদ্যা-বিষয়ক অবস্থা হীন হইবে, বিচিত্র কি ?

অতঃপর বাঙ্গালীর মানসিক অবস্থার আলোচনা করিব। এ স্থলে মানস শব্দ ভক্তি, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি ভাবময়ী বৃত্তি এবং চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হইবে।

চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির উপাদান—স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্র, সঙ্গীত ও কাব্য। যাঁহারা বুদ্ধ-গয়ার ভগ্নাবশেষ, ভুবনেশ্বর ও জগন্নাথের মন্দির, কণরকের সূর্য্যগৃহ, এবং উদয়গিরিখণ্ডগিরির শিল্পি-ক্ষোদিত বিচিত্র পার্ব্বত্য প্রকোষ্ঠরাজি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন যে, এদেশে ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের এক সময়ে অসাধারণ উন্নতি

হইয়াছিল। সংস্কৃত কাব্য-নাটক পাঠে জানা যায়, যে পূর্ব্বকালের প্রেমিক-প্রেমিকারা প্রণয়ের প্রথমোচ্ছ্বাসে প্রায়ই প্রিয়-জনের মোহন-মূর্ত্তি আঁকিয়া, কলানুরাগের পরিচয় দিতেন। বাঙ্গালীর সঙ্গীতজ্ঞতার প্রমাণ—বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নব উদ্বোধনে কীর্ত্তনের সৃষ্টি। কাব্য ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর গীতি-কবিতা জগতের স্পৃহণীয়। জাতীয় অবসাদের দিনেও বাঙ্গালা-দেশে কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

এখন ? দেশ হইতে সঙ্গীতের চর্চ্চা এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। গায়কের কলকণ্ঠ যন্ত্রধ্বনির সহিত মিশিয়া, উদারা-মুদারা-তারায় আকাশ ছুঁইয়া, পাতালে ডুবিয়া, কদাচিৎ শ্রোতার হৃদয়রঞ্জন করে। সঙ্গীতজ্ঞের আর জীবিকালাভ সুলভ নহে। পট স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য, হীন-অনুকরণে জাতীয় বিশেষত্ব হারাইয়া অতি শোচনীয় দশাগ্রস্ত হইয়াছে। ইহারা চিত্তের প্রসাদ বা প্রসার সাধন না করিয়া বিকট জুগুপ্সার উদ্রেক করে। আর এ সকল উৎকৃষ্ট কলার পরিরক্ষণে বা উন্নতি-সাধনে আগ্রহই বা কাহার আছে ? দেশে সৎকাব্য কদাচিৎ প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হইলেও যথোচিত আদর হয় না। কাব্য-রস আস্বাদনের উপযোগী অনুশীলন দেশে প্রচলিত নাই ; সেইজন্য কাব্যগ্রন্থ বড়-একটা বিক্রয়ও হয় না।

বাঙ্গালীর হৃদয় বড় সঙ্কীর্ণ ; উদারতা বাঙ্গালা-দেশ ছাড়িয়া গিয়াছে। আমরা মত ভেদ সহিতে পারি না। সত্যের একদেশ মাত্র দেখিয়া সিদ্ধান্ত করি যে, সত্যের আকার ঐকদেশিক। সত্যের বিশ্বোদর ভাব না বুঝাতে আমরা বুঝিতে পারি না যে, সকল মতই আংশিক ভাবে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সকল মতই ঐকদেশিক রূপে সত্য। অন্ধদলের হস্তিদর্শনের গল্প বাঙ্গালীর সর্ব্বক্ষণ মনে রাখা উচিত।

আমরা গুণের গৌরব, প্রতিভার পূজা ভুলিয়া গিয়াছি। মন খুলিয়া কাহাকেও সুখ্যাতি করিতে পারি না। পরের জ্ঞান গৌরব মান-গৌরব, পদ-গৌরব ধন-গৌরব আমাদের অসহ্য। আমরা কাহাকেও বড় বলিতে সাহস করি না। অন্যকে ছোট করাই আমাদের অভ্যাস ; তাহা হইলেই আপনি বড় হইলাম। একজন বাঙ্গালী বিদ্বানের সহিত সেদিন বাদানুবাদ হইতেছিল। তাঁহার মতে বাঙ্গালী-লেখকের কোন গ্রন্থই পাঠোপযোগী নহে ; বাঙ্গালা-রচনা-রাজ্যের রাজা বঙ্কিমচন্দ্র পরস্বাপ-হারী। আর একজন বাঙ্গালী মনীষীর মতে বিদ্যাপতির পর আর বাঙ্গালা-দেশে কবির আবির্ভাব হয় নাই। ইহার অধিক সঙ্কীর্ণতা কি হইতে পারে ?

বাঙ্গালী তোষামোদ বড় ভালবাসে। তাহাতে তাহার আকাশস্পর্শী আত্মাভিমান আরও স্ফীত হয়। ত্রুটী-প্রদর্শন, দোষ সংশোধন, ভ্রম-আবিষ্করণ বাঙ্গালীর মর্ম্মান্তিক। আমাদের কোমল মর্ম্মে নিন্দা, বিষদিগ্ধ শেলের মত বাজে। সেইজন্য দেশে সমালোচনার যুগ এখনও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। শুনিয়াছি, বঙ্গ-দর্শন উঠিয়া যাইবার অন্যতম প্রধান কারণ—বঙ্কিমবাবু-কৃত কিম্ভূত-কিমাকার গ্রন্থের তীব্র সমালোচনা।

অথচ অপরের নিন্দায় সাবধান কর্ণপাত করিতে বাঙ্গালীর মত কেহই পটু নহে। অযথা-গালিগালাজকে অনেকে নির্ভীকতা মনে করেন। অনেক লেখক গালি বিক্রয় করিয়া তাহার লাভে জীবিকা অর্জ্জন করেন। রস-রাজের সময়ে যে প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সংযত ভাষার আবরণে এখনও তাহাই প্রচারিত আছে।

দয়া প্রীতি ভক্তি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বৃত্তি আমাদের মনে আর স্থান পায় না। তাহাদের পরিবর্ত্তে ঈর্ষা, দ্বেষ, ঘৃণা আমাদের মনোরাজ্য অধিকার করিয়াছে। গৃহের মধ্যে ভ্রাতায় ভ্রাতায়, পিতায় পুত্রে কলহ; বাহিরে সহানুভূতি হইবে কোথা হইতে? সেই জন্য বাঙ্গালীর সম্মিলন-প্রবণতা অতি অল্প। পূর্ব্বে এরূপ ছিল না! পূর্ব্বে একান্নবর্ত্তী বহু পরিবার পুরুষানুক্রমে এক ভিটায় বাস করিত। এখন ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই। প্রীতির পরিমাণ এইরূপ। দয়া ও দানশীলতার কথা ধরুন। "পূর্ব্বে যাঁহাদের সম্পত্তি থাকিত, তাঁহারা অতিথি অভ্যাগত এবং দীন-দুঃখীর সহায়তায় কিছুমাত্র কৃপণতা করিতেন না। অতিথি ফিরাইলে সমাজে কলঙ্কিত হইতে হইত।" "পূর্ব্বে ঘটী বাঁধা দিয়া লোক অতিথি-সেবার ব্যয় নির্ব্বাহ করিত, এক্ষণে অতিথি বাড়ী হইতে বেরুতে পারিলে বাঁচে।" এখনকার যাহা কিছু বদান্যতা, সকলই আড়ম্বরময়। অমুক চাঁদা পুস্তকে এত সহি করিয়াছে, আমার না করিলে ভাল দেখায় না। দুর্ভিক্ষে দান করিলে গেজেটে নাম উঠিতে পারে। এখন দাতার এই ভাব। এখন লোক দুই টাকা চাঁদা দিয়া সংবাদপত্রে তাহার আন্দোলন কথায়।

দয়ার পরিমাণ এই; ভক্তির পরিমাণ শূন্যতার অতি সন্নিকট। এ বিষয়ে বঙ্কিম বাবুর মত উদ্ধার করা ভাল। 'এখন শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তি—যাহা মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি, তাহা হীনতার চিহ্ন বলিয়া বোধ হইয়াছে। পিতা এখন 'মাইডিয়ার ফাদার' অথবা বুড়ো বেটা। মাতা বাপের পরিবার। বড় ভাই জ্ঞাতি মাত্র। শিক্ষক মাষ্টার বেটা। পুরোহিত চাল-কলা-লোলুপ ভণ্ড। যে স্বামী দেবতা ছিলেন, তিনি এখন কেবল প্রিয়বন্ধু মাত্র, কেহ বা ভৃত্যও মনে করেন। স্ত্রীকে আর আমরা লক্ষ্মীস্বরূপা মনে করিতে পারি না। * * কেহ কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিব না, সেই জন্য কেহ কাহারও অনুবর্ত্তী হইয়া চলিব না; কাজেই ঐক্যের সহিত কোন সামাজিক মঙ্গল সাধিত করিতে পারিব না। নৈপুণ্যের আদর করিব না; বৃদ্ধের বহুদর্শিতা লইয়া ব্যঙ্গ করি। তাই গৃহ নরক হইয়া উঠিতেছে; সমাজ অনুন্নত ও বিশৃঙ্খল রহিয়াছে, আপনাদিগের চিত্ত অপরিশুদ্ধ ও আত্মাদরে ভরিয়া গিয়াছে'। আমাদের হৃদয় সরস হইবার সম্ভাবনা কোথায়? আমাদের চিত্ত বিকট উষর মরুভূমি—কেবল সন্তাপের জ্বালা-মালা এবং নৈরাশ্যের প্রতপ্ত দীর্ঘশ্বাস। এই ক্ষেত্রেই নরদ্বেষকের উদ্ভব হয়।

অতঃপর বাঙ্গালীর নৈতিক অবস্থা আলোচিত হইবে।

গ্রীক লেখক আরিয়ান এই ভাবে পূর্ব্বকালের হিন্দুচরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন: 'তাহাদিগের বীরত্ব অসাধারণ, সরলতা এবং আড়ম্বরশূন্যতা বিস্ময়কর। তাহারা এত বিচারপর যে কখন আইন আদালতের সাহায্য গ্রহণ করে না; এত ন্যায়পর যে সম্পত্তি রক্ষার জন্য দ্বারে অর্গল অথবা সর্ত্তসিদ্ধির জন্য লেখ্য প্রয়োজন হয় না। ভারতবাসীকে কেহ কখন মিথ্যা কথা কহিতে শুনে নাই।' ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে আরিয়ান হিন্দুজাতির সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন। আকবর বাদসাহের সাময়িক হিন্দুচরিত্রের আবুলফজেল-কৃত সমালোচনা এইরূপ। 'হিন্দুজাতি ধর্ম্মপ্রাণ, সুশীল, বিনম্র, সদানন্দ, জ্ঞানপ্রিয়, ন্যায়পর, বিবিক্তসেবী, কর্ম্মকুশল, কৃতজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ, কঠোর-সংযমকারী এবং সর্ব্ব বিষয়ে অগাধ বিশ্বাস-যোগ্য। তাহাদের চরিত্র বিপদের সংঘাতে আরও উজ্জ্বল হয়। হিন্দু যোদ্ধা, কখন যুদ্ধে পৃষ্ঠ

প্রদর্শন করে না। হিন্দুরা শিক্ষকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন। তাহারা ঈশ্বরার্থে জীবন উৎসর্গ করা অতি যৎসামান্য মনে করে।' এ বর্ণনা আধুনিক হিন্দুচরিত্রের তুলনায় অতি-রঞ্জিত মনে হইলেও বাস্তবিক সত্যমূলক। অধিক দিন নহে একশত বৎসর পূর্ব্বে, এই বাঙ্গালীরাই কতদূর সত্যনিষ্ঠ ছিল; কেহ আদালতে সাক্ষ্য দিতে রাজি হইত না, পাছে হলপ লইয়া দৈবক্রমে মিথ্যা বলিয়া ফেলে। ধর্ম্মসাক্ষী সূর্য্যসাক্ষী তমসুক সন্ধান করিলে এখনও দুই এক খানা পাওয়া যায়। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা কেমন সরল, অমায়িক, কৃতজ্ঞহৃদয় ও শান্তপ্রকৃতিক ছিলেন। ইংলণ্ডের বড় মানুষদিগকে আরনল্ড সাহেব পশুস্বভাব বলিয়াছেন। আমাদের দেশের সেকালের ধনী লোকেরা (রাজনারায়ণ বাবুর মতে) অত্যন্ত বদান্য, দরিদ্রে দানশীল, অতিথি-সেবাপর, গুণানুরাগী ও দীনপ্রতিপালক ছিলেন। এখনকার অবস্থা কিরূপ?

দেশে অসরলতা পূর্ব্বাপেক্ষা যথেষ্ট বাড়িয়াছে। এখন পদে পদে খলতা, কাপট্য মনোভাব গোপনের জন্যই যে বাক্-সৃষ্টি, এ কথা বোধ হয় বাঙ্গালীর মন পরীক্ষা করিয়া রচিত হইয়াছিল। মুখে পীযূষবর্ষণ, হৃদয়ে ক্ষুর-ধার। আমাদের নিখিল জীবন ছদ্ম অভিনয়। ধর্ম্মে আস্থা নাই, ধর্ম্ম-সাধন করি; আচারে অনুরাগ নাই, আচার পালন করি; প্রাণে আত্মীয়তা নাই, মুখে আপ্যায়িত করি। বাঙ্গালায় কেবল বাহ্যিকতা, কেবল মৌখিকতা, কেবল ছদ্মময়তা।

দেশে কৃতজ্ঞতার বড় স্থান হয় না। পরের নিকট আমরা নিঃসঙ্কোচে উপকার গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু প্রত্যুপকার দূরে থাকুক, কৃত উপকার অঙ্গীকার করিতেও প্রস্তুত নহি; এরূপ করিতে আমাদের জিহ্বা কুণ্ঠিত হয়। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন যে, তিনি যাহার যত বেশী উপকার করিয়াছেন, তাহার নিকট তত অধিক প্রত্যপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সত্যবাদী লোক।

বিশ্বাসঘাতকতা বাঙ্গালী-চরিত্রের একটা প্রধান লক্ষণ হইতেছে। এ কথার প্রমাণ গৃহে, সমাজে, ব্যবসায়-স্থলে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে, দৈনন্দিন জীবনে, সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান। দেশীয় লোকের আয়ত্তাধীন একটাও যৌথ-কারবার সুফলোন্মুখ হইল না কেন?

বাঙ্গালীকে বড় একটা বিশ্বাস করা যায় না; তাহার উপর একান্ত নির্ভর করা যায় না। এ বিষয়ে আমার এক সহৃদয় বন্ধু আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম;—"আমাদের ধর্ম্মবল এত ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, সুদৃঢ় নৈতিক মেরুদণ্ড এরূপ শ্লথ হইয়াছে যে, আমরা পদে পদে নীচ লোভে পড়ি, স্বার্থে অন্ধ হই, বিশ্বাসের যোগ্য আর থাকিতে পারি না। * * গৃহে বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে; ইহার জন্য আদালতে মোকদ্দমা ধরে না। এখন কেহ বালক-পুত্র রাখিয়া জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠের মুখ চাহিয়া নিশ্চিন্তে মরিতে পারে না। অবীরা সহধর্ম্মিণীকে অন্নাভাবে উঞ্ছবৃত্তি করিতে হইবে না, এ আশ্বাস বুকে করিয়া কেহ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইতে পারে না। সেকাল আর নাই, যখন আপন সন্তান অপেক্ষা ভ্রাতৃপুত্রের অধিক গৌরব ছিল, যখন বিধবা ভ্রাতৃবধূ গৃহের সর্ব্বময়ী গৃহিণী ছিলেন।"

আমরা সংযম-শিক্ষা হারাইতেছি। কায়-মনোবাক্যের সংযম এখন কথার-কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অঙ্কুশ-তাড়িত বন্য হস্তীর মত বাসনা-তাড়িত হইয়া আমরা কি না করি? সেইজন্যই ইন্দ্রিয়-লালসা এত বেগবতী হই-

য়াছে। ব্যভিচার স্রোত দেশ প্লাবিত করিতে বসিয়াছে। এখন অলিতে-গলিতে পণ্য-স্ত্রী; মোড়ে মোড়ে মদের দোকান। সময় বুঝিয়া আমরা স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছি। ঘটনার খর-প্রবাহের প্রতিকূলতা করি, এমন সামর্থ্য নাই। মানুষ কালের দাস, আমরাই তাহার প্রমাণ-স্থল।

সংযম অভাবে এখন আমাদের বিলাসের প্রতি অনুরাগ বাড়িয়াছে। আরাম, আবেশ, আয়াস, আসবাব, ফিট্‌ ফাট্‌, পরিপাট্য প্রভৃতি বিলাসিতার প্রতি বেশী লক্ষ্য হইয়াছে আমরা ক্রমশঃ সুখের পায়রা হইতেছি; এতটুকু দুঃখপাতে, হিমক্লিষ্ট নলিনীর ন্যায়, মলিন হই। কষ্টের সংস্পর্শমাত্রে করুণ কণ্ঠরোলে গগন প্লাবিয়া দিই। কোথা সুখ, কেমন সুখ, কবে সুখ, কিসে সুখ—এই আমাদের ধ্যান জ্ঞান। দুঃখের দারুণ শিক্ষায় শিক্ষিত হইবার যোগ্য কঠোরতা আমাদের আর নাই।

আর, জীবনে ঘোর অতৃপ্তির সঞ্চার হইয়াছে। কেহ কিছুতে সন্তুষ্ট নহে। সকলেই বড়র উপর বড় হইবে। সকলেরই পুনর্মূষিকের দশা। মার্জ্জার-ভীত মুষিক শার্দ্দূল হইয়াছে, তাহাতেও দুরাকাঙ্ক্ষার শান্তি নাই। শার্দ্দূলের সিংহ হওয়া চাই। অবোধ মুষিক, গল্পে এরূপ করিয়াছিল, শোভা পাইয়াছিল; আমরা সুবোধ মানুষ, কোন্ লজ্জায় করি?

সেইজন্য অর্থের নিমিত্ত বিশ্বপণ প্রযত্ন। পৃথিবী রসাতলে যায়, ক্ষতি নাই, আমার কিন্তু অর্থাগম হওয়া চাই। আমরা দারুণ স্বার্থপর হইতেছি। তোমার পাঁচ লক্ষ গিয়া আমার যদি পাঁচ কড়া আসে, প্রস্তুত আছি। তোমার হাজে-মজে, আমার তাহাতে কি? নরশবে পদক্ষেপ করিয়া, নররক্তে সন্তরণ দিয়া, নর-কঙ্কালের কিঙ্কিণী গাঁথিয়া, নরমুণ্ডের মালা পরিয়া যদি কার্য্যসিদ্ধি হয়, তাহাতেও প্রস্তুত আছি।

এই নৈতিক পঙ্গুতার ফলে স্থায়ী উদ্যম, ব্যাপী চেষ্টা, সংহতসাধন, বাঙ্গালীর কর্ম্মায়ত্ত নহে। একান্ত উৎসাহ, অসাধারণ অধ্যবসায়, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, অসামান্য একাগ্রতা এবং অনন্যপর একনিষ্ঠতা—কর্ম্মসিদ্ধির এই সকল মূলমন্ত্র বাঙ্গালীর অভ্যস্ত নহে। এইজন্য আমাদের একটাও অনুষ্ঠান পরিণত বা স্থায়ী হয় না। আমাদের অধিকাংশ আয়োজন অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। এত সভা, সমিতি, সমাজ, স্মৃতিচিহ্ন, সামাজিক আন্দোলন, রাজনৈতিক অভ্যুত্থান, ধর্ম্ম-বিষয়ক আলোচনা, আর কোন্ দেশে অকাল-মৃত্যুর কবলিত হইয়াছে? আমরা খড়ের আগুন; সহসা চকিত করিতে, চমক লাগাইতে ভাল। প্রথমটা খুব প্রদীপ্ত হই, কত আলো হয়; পর-মুহূর্ত্তে সব অন্ধকার। আমরা অন্তঃসার-শূন্য আধ্মাত বেলুন; এতটুকু ছুঁচের ঘায় অপেক্ষা, তাহা হইলেই স্ফীতি সব গুটাইয়া, একটা কদাকার পিণ্ডমাত্র হই।

দার্শনিকেরা বলেন যে, মনুষ্য দেবতা ও পশুর সমষ্টি বা সমাবেশ। অধিকাংশ বাঙ্গালীকে দেখিলে মনে হয় মানুষে দেবভাবের লেশ নাই। নিরবচ্ছিন্ন পশুত্ব।

অতঃপর বাঙ্গালীর আধ্যাত্মিক অবস্থা আলোচিত হইতেছে। পূর্ব্বকালে বাঙ্গালীর প্রাণ, ধর্ম্মময় ছিল; জীবনের সর্ব্ববিধ কার্য্য-কলাপে ধর্ম্মভাব অনুস্যূত থাকিত। ভূদেব বাবুর ভাষায়, "প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া অবধি, রাত্রিকালে আবার শয্যাশায়ী হওয়া পর্য্যন্ত যে যে কার্য্য করিত, সকল কার্য্যই ঈশ্বরস্মরণপূর্ব্বক আরব্ধ হইত। কোথাও যাইতে, কিছু করিতে, কিছু খাইতে, একখানি সামান্য চিঠি লিখিতে,—কিছুই বিনা ঈশ্বর-স্মরণে করা হইত না।" সেকালে লোকের নামকরণেও এই ধর্ম্মময়ত্বের পরিচয় পাওয়া

যাইত। ছেলে-মেয়ের নাম এমিলি, জুলি, জ্যোৎস্না, সরোজ, সমর, শরৎ, যাহা হয় একটা রাখিলেই চলিতে পারিত। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা দেবদেবীর নাম ভিন্ন রাখিতেন না। দায়ভাগ—যদহা সকল দেশে, অধিক কি এই ভারতেরই অন্যত্র সামাজিক সৌকর্য্যের অনুযায়ী, কেবল এই বঙ্গদেশেই ধর্ম্ম ভিত্তির উপর স্থাপিত ছিল। মৃতধনে কে অধিকারী হইবে এ প্রশ্নের মীমাংসা, কে রক্তসম্বন্ধে ঘনিষ্ঠতর, এ সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর না করিয়া, কে পরলোকে সমধিক মঙ্গলকারী, তাহার উপর নির্ভর করিত। বাঙ্গালীর কাব্য—বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জয়দেব কৃত্তিবাস কাশীদাস ঘনরাম মুকুন্দরাম রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্র, সকল কবির কাব্যই ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে রচিত, ধর্ম্ম আখ্যানে পূরিত, ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় নিযুক্ত। এমন যে অশ্লীলতার চারুশিল্প বিদ্যাসুন্দর, তাহারও মেরুদণ্ড ধর্ম্ম লইয়া। বাঙ্গালী ধর্ম্ম এত ভালবাসিত যে, ধর্ম্মসংবৃত অশ্লীলতাও গলাধঃকরণে কোন আপত্তি করিত না। কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে বাঙ্গালীর চরম-কীর্ত্তি ভক্তিতত্ত্ব। শাণ্ডিল্যের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া গীতা ভাগবত পঞ্চরাত্র পুরাণ ইতিহাসে যে ভক্তিতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছিল, তাহার কেন্দ্রীভূত অস্তিত্ব বাঙ্গালীর বৈষ্ণব ধর্ম্মে। ঈশ্বরপ্রেমের নিগূঢ় রহস্য, ভগবানের সহিত সুমধুর ঘনিষ্ঠতা—ভক্ত রাধার কান্তভাবে ভজন, বাঙ্গালী অবতারের নিকট বিশ্ববাসী শিক্ষা করিয়াছিল।

সেকালে ধর্ম্মের অনুরোধে আমরা কত ত্যাগ স্বীকার করিতাম। কত বার ব্রত, সংযম নিয়ম, অনুষ্ঠান উপবাসের ক্লেশ সহ্য করিতাম। কত দান ধ্যান, ক্রিয়াকাণ্ড, কত অন্ন-সত্র জল-সত্র, কত পুষ্করিণী অতিথি শালা, কত দোল দুর্গোৎসব, কত বার মাসে তের পার্ব্বণের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতাম। এখন ক্রমশঃ এ সকল কথামাত্রে পর্য্যবসিত হইতেছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে সকল কাজ ঈশ্বরের প্রীতিসাধনার্থে করিতেন, আমরা সে সকল যতটুকু করি, তাহা গেজেটে নাম জাহির হইবার আশায়; অনেক স্থলে ইংরাজ প্রভুর প্রসাদার্থে; ইংরাজ এখন ঈশ্বরস্থানীয়। আর ধর্ম্মার্থে ক্লেশ-স্বীকার, সহিষ্ণুতাশিক্ষা, তপশ্চর্য্যা এ সকল এখন নীচ উপধর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

বাঙ্গালী ঈশ্বরভক্তির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। ঈশ্বরের সহিত মানুষের যে কোন নিকট সম্পর্ক আছে, ইহলোকের উপর একটা যে পরলোক আছে, মনুষ্যের ইহ জীবনই যে শেষ নহে, চক্রনেমিতে বিন্দুপাতের মত অতি অকিঞ্চন, আত্মা জড় শক্তির ক্রিয়াক্ষেত্র নহে, সজীব সচেতন চিদানন্দের বাস-ভূমি; দেহ যে জড় পরমাণুর সমষ্টিমাত্র নহে, জগন্নাথাধিষ্ঠিত দেবমন্দির আমরা এ সকল কথা বিস্মৃত হইয়াছি। সুতরাং দেশে নাস্তিকতার প্রবল প্রতাপ; ভিতরে একখান বাহিরে একখান ভণ্ডামির একাধিপত্য; ধর্ম্মে আস্থাহীনতা, লোক দেখান বাহ্য ঠাট রক্ষা; পরলোকে বিশ্বাসহীন ইহলোক-সর্ব্বস্বতা; ঈশ্বরের সিংহাসনে সয়তানের অধিষ্ঠান—এক কথায় ধর্ম্মজীবনের সর্ব্বাঙ্গীন অবনতি।

হিন্দু ধর্ম্মের সার লক্ষণ ঐহিকতার অভাব; আমাদের কিন্তু এই জীবনই চরমের চরম, অথচ আমরা হিন্দু নামধারী। শকুনি আকাশে উড়িলে কি হইবে, তাহার দৃষ্টি শ্মশানে শবের প্রতি।

অতএব আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা বড় শোচনীয়। ঐহিকতার সহিত চিরজীবী সংগ্রামে অধ্যাত্মতা পরাজিত হইয়া, এখন সর্ব্বোতোভাবে তাহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। পরাধীন জাতির গৌরবের শেষ রেখাটুকুও বুঝি মিলাইয়া যায়। ফলতঃ বাঙ্গালী

জাতিকে আধ্যাত্মিক হিসাবে মৃত বলিলে অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না।

আমরা পূর্ব্বকালের তুলনায় কত হীন হইয়াছি, তাহা আমাদের আদর্শের হীনতা বুঝিলে বুঝা যায়। আদর্শ ইন্দ্রধনুর সহিত তুলনীয়; তেমনি হৃদয়গ্রাহী, তেমনি নয়নরঞ্জন। ইন্দ্রধনুর দিকে যত অগ্রসর হওয়া যায়, ইন্দ্রধনু তত পিছাইয়া যায়; ইন্দ্রধনুর কেহ কখন লাগ পায় না। আবার ইন্দ্রধনু হইতে যত পশ্চাৎ হওয়া যায়, ইন্দ্রধনুও তত হটিয়া আসে। আদর্শও এইরূপ। জাতি যত উন্নত হয়, জাতীয় আদর্শ তত বড় হইতে থাকে, আদর্শের কখন সমতুল হওয়া যায় না। আবার জাতি যত ছোট হয়, জাতীয় আদর্শ সেই পরিমাণে খাট হইতে থাকে। আমাদের জাতীয় আদর্শ কত খাট হইয়াছে!

আমাদের বল বীর্য্যের আদর্শ ছিলেন ভীমার্জ্জুন, সংযমের ভীষ্ম, দানের কর্ণ, বদান্যতার বলি, ভক্তির প্রহ্লাদ, জ্ঞানের শঙ্করাচার্য্য, সহিষ্ণুতার হরিশ্চন্দ্র, পিতৃভক্তির শ্রীরাম, ভ্রাতৃপ্রেমের লক্ষ্মণ, ধর্ম্মের যুধিষ্ঠির, দেশভক্তির প্রতাপসিংহ, নেতৃত্বের গুরুগোবিন্দ, পাতিব্রত্যের সীতা সাবিত্রী। দেবর্ষি নারদ, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ, রাজর্ষি জনক, মহর্ষি ব্যাস, জীবন্মুক্ত শুক, ভক্তাবতার চৈতন্য, সর্ব্বতঃপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ—ইহাঁরা আমাদের জাতীয় আদর্শ ছিলেন। ইহাঁদের সিংহাসনে এখন যাঁহারা অধিষ্ঠিত, তাঁহাদের নাম ভাবিয়া দেখুন, বুঝিবেন আমাদের জাতি কত অধঃপতিত হইয়াছে। সেক্ষপীয়রের "নিদাঘ নিশীথ স্বপ্নের" অধিষ্ঠাত্রী পরিরাণী তিতানিয়া অবিরণের কিন্নর-মুখ হেলন করিয়া বটমের গর্দ্দভ-বদন চুম্বিত করিয়াছিলেন। আমরাও আদর্শের সম্বন্ধে সেই প্রণালীর অনুসরণ করি নাই কি?

বাস্তবিক আমরা বড় কু-কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এ জাতীয় অবসাদের কাল; জাতীয় জীবন বিরোধী শক্তির প্রভাবে শ্লথ হইয়া বিশ্লিষ্ট হইতেছে; এ সংঘাতের কাল নয়, বিশ্লেষের দিন, এখন দেশে মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে কেন?

"বাঙ্গালী-জাতির ভবিষ্যৎ কি?" এ প্রশ্নের মীমাংসা আমার সাধ্যাতীত। জাতীয় জীবনের ভবিষ্যগণনা একরূপ অসাধ্য-সাধন। জাতির অন্তস্তলে কোন্ শক্তি প্রচ্ছন্ন হইয়া কি ক্রিয়া সাধিত করিতেছে, তাহার জ্ঞান মনুষ্য-চক্ষুর অগোচর। দৃষ্ট অদৃষ্ট নানা শক্তি লইয়া জাতীয় জীবনের ক্রীড়া; অদৃষ্ট শক্তির অনভিজ্ঞ আমরা কিরূপে ভবিষ্যৎ-বাণী উচ্চারিত করিব? কাহারও বিশ্বাস,—বাঙ্গালী জাতি কয়েক শত বৎসরে বিলুপ্ত হইবে। আমি এ বিষয়ে কোনও মতামত প্রকাশ করিতে সাহস করি না। আমি এইটুকু বুঝি যে, যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহাই ঈশ্বরের ইচ্ছানুমোদিত। বাঙ্গালী জাতির বিলোপ যদি অবশ্যম্ভাবী হয়, বিলোপ হউক। গৃহীর ইচ্ছায় দীপ জলিয়া, গৃহস্থের কার্য্য সাঙ্গ হইলে, নির্ব্বাপিত হয়। বাঙ্গালী-দীপের যদি আলোকদান-নিয়তি সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, দীপ নির্ব্বাপিত হউক। কাহার কি ক্ষতি?

ছিল কত শত জীব, আজি নাহি আর,
কত শত নব জীব হইবে আবার।
ভাঙিতেছে পুরাতন, গড়িছে নূতন,—
জগতের নীতি এই মহা বিবর্ত্তন।

ঈশ্বর মঙ্গলময়, তাঁহার মঙ্গলনীতির এক রেখা ও বিপর্য্যস্ত হইবে না। তাঁহার মঙ্গল-ইচ্ছা পূর্ণ হউক। কে জানে, বাঙ্গালীর বর্ত্তমান অমঙ্গলে তিনি কি মঙ্গল-নিয়তির পূরণ করিতেছেন? জগতের নিয়তি অচিন্ত্য, দুরধিগম্য। জগৎ আমার সৃষ্টি নহে। যিনি জগতের নিয়ন্তা, জগতের গুরুভার তাঁহারই। যাঁহার জগৎ,—

—বজ্রাঘাত, ঝটিকা ভীষণ,
মহাসংহারক-মূর্ত্তি ঘোর দাবানল,
প্লাবন ভীষণ, নিত্য করি দরশন
জগতের সাধিছে কি অচিন্ত্য মঙ্গল ?

তিনি বাঙ্গালীর বর্ত্তমান অমঙ্গলে হয় ত কোন চিন্তাতীত ভাবী সুমঙ্গলের সূচনা করিয়াছেন। এই ভারতে ইংরাজ-অধিকার—ইহা দ্বারাই হয় ত ভারতের ভাবী অভ্যুদয় সাধিত হইবে। একভাষা, একজাতি, একসাম্রাজ্যের সূত্রপাত করিয়া, ভারবাসীর হৃদয়ে জাতীয় ভাব, বৈজ্ঞানিকতা ও জাতিগত স্বার্থের উদ্দীপনা করিয়া, হয় ত ইংরাজ অধিকারই ভারতের অজস্র কল্যাণ সাধন করিবে। ঘটনাচক্রের বিবর্ত্তন অতি দুর্ব্বোধ্য। আমাদের নিরাশ হওয়া উচিত নহে। অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, বাঙ্গালীর সর্ব্ববিষয়ে যে অভাবময় অবস্থা ঘটিয়াছে,—বাঙ্গালী যেরূপ অভাব-তাড়িত অভাব-পীড়িত অভাব-কবলিত হইয়াছে,—দৈহিক, মানসিক, বৌধিক, সামাজিক আর্থিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক—সর্ব্ব বিষয়ে বাঙ্গালীর অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর উন্নতি-বিধান সাধারণ মনুষ্য কর্ত্তৃক অসাধ্য। হারকুলিস ভিন্ন শতযুগের সঞ্চিত আবর্জ্জনা আর কেহ বিদূরিত করিতে পারে কি ? আমাদের আশা ভগবদ্‌বাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি স্বয়ং শ্রীমুখের বাক্যে অভয় দিয়াছিলেন—

যখন যখন হয়, ভারতে, ধর্ম্মের গ্লানি,
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, আপনারে সৃজি আমি।

আমরা তাঁহার আশাপথ চাহিয়া আছি। মনুষ্যের অসাধ্য বিষয়ে মানুষের ভরসা করি না। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার প্রসাদে মূকের বাক্‌স্ফূর্ত্তি হয়, পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করে। তাঁহার ভারতের প্রতি চিরদিন সদয় পক্ষপাত। ভারতবর্ষ তাঁহার প্রিয়তম লীলা নিকেতন। তিনি আর্য্যজাতির বিধুমিত গৃহভেদের দিনে, অনার্য্য-শক্তির উৎকট অভ্যুত্থানের মরণ-পণ সংগ্রামে, জ্ঞান-কর্ম্ম ভক্তির অর্থহীন প্রতিযোগিতায়, সনাতন ধর্ম্মের সকাম স্বার্থপরতার সময়ে, দেবকী জঠরে আবির্ভূত হইয়া সকল বিঘ্ন-বাধা-বিপত্তির সমাধান করিয়া জাতীয় জীবন তরি উন্নতির স্রোতে ভাসাইয়া লইয়াছিলেন। তিনি বৈদিক ধর্ম্মের প্রাণহীন অপচারে, প্রাণিহিংসার ভারতব্যাপী ঘোরাবর্ত্তে, জাতিভেদের নির্ম্মম নিষ্পেষণে, সংসারময়তার প্রবল প্রকোপের যুগে, সিদ্ধার্থরূপে প্রকটিত হইয়া অহিংসাপর কর্ম্মময় বৈরাগ্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞানহীন নাস্তিকতার কালে, অল্পদর্শী দার্শনিক সঙ্কীর্ণতায়, ভাবহীন অভ্যাস-কর্ম্মপরতায়, বৌদ্ধধর্ম্মের শোচনীয় অধঃপতনে, শঙ্কর স্বামীর রূপ পরিগ্রহ করিয়া বজ্রনাদে বেদান্তভেরী বিঘোষিত করিয়াছিলেন। তিনি এই বাঙ্গালা দেশেই, সিদ্ধান্তহীন তর্কযুদ্ধের প্রচুরতায়, লক্ষ্যভ্রষ্ট তান্ত্রিকতার প্রবলতায়, বহিরঙ্গ আচারানুষ্ঠানের বাহুল্যে, ভক্তিহীন জাতীয় হৃদয়ের অবসাদের দিনে, শ্রীগৌরাঙ্গে আবিষ্ট হইয়া অহৈতুক কৃষ্ণপ্রেম প্রচারিত করিয়া, জাতীয় জীবনে নূতন আশা উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিলেন। তিনি যুগে যুগে ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিয়াছেন ; এ যুগের ধর্ম্ম গ্লানি অক্ষুণ্ন থাকিবে কি ? আমরা তাঁহার উদ্দেশে নতশিরে বলি—

"সাধুজন-পরিত্রাণ বিনাশ দুষ্কৃতদের
করিতে সাধন,
স্থাপন করিতে ধর্ম্ম করি আমি যুগে যুগে
জনম গ্রহণ"

এই ভাগবত প্রভো, হবে কি বিফল ?
পূর্ণ-কাল, পূর্ণ ব্রহ্ম আসিবে কখন ?*

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

* এই অপূর্ব্ব প্রবন্ধের দুই এক স্থলে আমাদের মতভেদ আছে। জ, স।

যোগিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জাহানাবাদের নিম্ন দিয়া দ্বারকেশ্বর বহিয়া যাইতেছে। মাঘ ফাল্গুনে দ্বারকেশ্বরের জল কাচের ন্যায় পরিষ্কার হয়; সে পরিষ্কার জলে তীরের অসংখ্য তরুলতার ছায়া পড়ে,—এমন কি জলতলের বালুকণাগুলিও বুঝি গণিতে পারা যায়। নদীতে সম্বৎসরই জল থাকে,—নৌকা ডোঙ্গা করিয়া লোকে পার হয়।

ফাল্গুনের পূর্ণিমা রাত্রি। রাত্রি একপ্রহর অতীত হইয়াছে। চাঁদের আলোয় চারিদিক্ হাসিতেছে; নির্ম্মল শীতল বাতাস ধীরে ধীরে বহিতেছে; নদী-তীরের বন-লতা ধীরে ধীরে কাঁপিতেছে; লতায় লতায় ফুলের কলি ধীরে ধীরে মাথা দুলাইতেছে; নদীর জলে ধীরে ধীরে ছোট ছোট তরঙ্গ উঠিতেছে; তরঙ্গের নির্ম্মল হৃদয়ে চাঁদের আলো নানা রঙ্গে খেলিতেছে,—প্রকৃতির বড় প্রফুল্ল মূর্ত্তি।

সেই সময়ে একখানি ক্ষুদ্র তরণী ধীরে ধীরে জাহানাবাদ অভিমুখে যাইতেছে। তরণীর ভিতর বিজয় ও নলিনী; বাহিরে একটী দাসী। নলিনী পূর্ণ যুবতী, নলিনী সুন্দরী। স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া নলিনী স্বামীর কথা শুনিতেছে। চাঁদের আলো আসিয়া নলিনীর সুন্দর মুখে পড়িয়াছে,—তাহার বিম্বাধর চাঁদের আলোয় অতীব সুন্দর দেখাইতেছে; ফুল্ল নীল অপরাজিতার মত সুন্দর নয়নে চাঁদের আলো পড়িয়া অতীব শোভা হইয়াছে। সে ধীর বাতাসে নলিনীর সরু সরু কেশগুলি যেন আবেশে অধীর হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নলিনীর কপোলে আসিয়া পড়িতেছে,—আবার বুঝি নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। বিজয় কথা কহিতে কহিতে নিস্তব্ধ হইয়া নলিনীর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন; নলিনী জিজ্ঞাসিল, "থামলে যে? তুমি কি দেখ্‌ছ?"

বিজয় হাসিয়া নলিনীর মুখ খানি ধরিয়া কহিলেন, "তোমার মুখখানি বড় সুন্দর।"

নলিনী মৃদু হাসিয়া বসনে মুখ ঢাকিল।

বিজয় কহিলেন, "শোন শেষটুকু,—আমার বয়স তখন ১৫।১৬, তার বয়স ১৩। ১৪; সত্যই বল্‌ছি, সে তোমারই মত সুন্দর। তুমি রাগ করিও না। ছেলেবেলা থেকে দুজনে এক সঙ্গে খেলিয়েছি, বেড়িয়েছি, নদীতে সাঁতার দিয়েছি; সে সুখের ছেলে বেলা বড় সুখের ছিল,—বড় সুখে তাহা কাটিত। নলিনী সে সুখের একটী ছবি আঁকিতে গেলে সারা রাতটা কেটে যায়। আমাদের দুজনে বড় ভাব, সবাই তা জানিত। আমরাও জানিতাম। ছেলেবেলার ভালবাসা—আমি তাকে সেই ভাবে ভাল বাসিতাম। সে আমাকে কেমন ভাল বাসে, আমি তা বুঝিতে পারি নাই। আমি তখন বুঝি নাই যে, সে আমার ভালবাসাকে অন্য ভালবাসা ঠাওরাইয়াছিল।"

বলিতে বলিতে বিজয় একবার থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন "নলিনি, এখন বুঝছি, সে ভুল বুঝেছিল, ভুল বুঝে সেই অল্প বয়সে তার ক্ষুদ্র জীবনে, ক্ষুদ্র হৃদয়ে সে বিষম তুফান তুলিয়াছিল। ছোট ফুল, তীব্র কীটে দংশিয়াছিল! নলিনি! সব কথাই বুঝতে পারছ! মাঝের অনেক কথা বাদ দিয়ে বলি। সে একদিন সন্ধ্যার পর অন্ধকারে লুকিয়ে এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে বল্লে—"বিজয়, বিজয়, আমার চির দিনের আশা বিফল হ'লো।" সে নির্জ্জন গৃহে, দীপ তখন নিবিয়া যাইতেছে, তবু সে আলোকে দেখিতে পাইলাম, তাহার মুখে নিরাশার মলিন ছায়া, তাহার সুন্দর নয়নে নিরাশার ভীষণ ফোয়ারা উথলিয়া উঠিয়াছে। তার

মলিন মুখ দেখে আমার হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া গেল। আমি কাতর হইয়া জিজ্ঞাসিলাম,—"কি হইয়াছে?" সে তখন যেন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল! বড় কাতর হইয়া মর্ম্মান্তিক কষ্টে কহিল,—"আজও তুমি জানিতে পার নাই? তবে আমার আশা সফল হইবে কিরূপে? থাক্, তোমার আর সে কথা জানিয়া কাজ নাই।" সে আমার মুখের পানে স্থির নেত্রে একবার চাহিয়া দেখিল, দীপ-শিখা আর একবার জলিয়া উঠিল, তখনই নিবিল—গৃহ অন্ধকার হইল—সে অন্ধকারে সে কোথায় মিশিয়া গেল। আমি তাকে কত খুঁজিলাম, তার নাম ধরিয়া কত ডাকিলাম,—কিন্তু আর তাকে পেলাম না। তার পরদিন তার বিবাহ-দিন, সে কিন্তু নিরুদ্দেশ! এ জন্মে সে বিবাহ করিবে কিনা, জানি না। অভাগীর মা বাপ কেহ ছিল না! কেহ আর তার খোঁজ-খবর লইল না। এখনও আমার মনে তার সে নিরাশ-ভাব আঁকা আছে, আমি তাকে যেন চোখে চোখে দেখ্‌ছি!"

বিজয় নিস্তব্ধ হইলেন, নলিনীও আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। ধীরে তরণী চলিতে লাগিল,—ধীরে চন্দ্র-কিরণ আসিয়া সুধা বিতরণ করিল, ধীরে নিদ্রা আসিয়া আধিপত্য স্থাপন করিল, নীরবে ধীরে নলিনীর নিবিড়-আঁখি-পল্লব মুদ্রিত হইল, ধীরে বিজয়ও ঘুমাইয়া পড়িলেন।

শেষ প্রহরে তরণী আসিয়া জাহানাবাদের অপর পার শ্যামপুরের ঘাটে লাগিল।

বিজয় স্বপ্ন দেখিতেছেন, কোথায় বহুদূরে একখানি সোনার নৌকা যেন ডুবিয়া গেল! ঘুম ভাঙ্গিল। রাত্রি পোহাইল। সুখের চাঁদ অস্ত গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্যামপুরের ব্রজকিশোর দত্ত রেশমের কারবার করিতেন, তাঁহার মূলধন বড় ছিল না, তাই ঐ গ্রামের উদয়চাঁদ দত্তকে "ধনী" দাঁড় করাইয়া তিনি কারবার চালাইতেন; গ্রাম-সম্পর্কে উদয়কে তিনি "দাদা" বলিতেন।

ব্রজকিশোর যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, দোল দুর্গোৎসব এবং আত্মীয়-স্বজনের প্রতি-পালনেই ব্যয় করিয়া ফেলিতেন,—তিনি একটি পয়সা কখনও জমাইতে পারেন নাই,—আজ কালের কালে অবশ্য এটা তত ভাল নয়; কিন্তু ব্রজকিশোর বলিতেন,—"অসদ্ব্যয় ত করিতেছি না; আর আমার অদৃষ্টও কেহ কেড়ে নিতে পারিবে না।" একটী মাত্র পুত্র প্রসব করিয়া তাঁহার পত্নী পরলোক গমন করেন; ছেলেটীর কষ্ট হইবে বলিয়া তিনি তাহাকে তাহার মামার বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। পুত্রটীর নাম বিজয়।

উদয়চাঁদ দত্ত যেমন ধনবান্, তেমনি কৃপণ; দেব-ধর্ম্ম বা দীনদুঃখীর জন্য তিনি কখন একটি পয়সাও খরচ করিতেন না; অধিক কি, পয়সা খরচের ভয়ে তিনি ভাল খাই-তেন না, ভাল পারিতেন না। তাঁহার মত সুদখোর লোক, সমস্ত জাহানাবাদ পরগণায় বোধ করি কেহ ছিল না। সুদ খাইয়া খাইয়া তাঁহার হৃদয় পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন হইয়াছিল। কেহ একবার টাকা ধার লইলে আর রক্ষা নাই। সুদ, সুদের সুদ, তস্য সুদ, ধরিয়া তাহাকে একেবারে 'জেরবার' করিয়া ফেলিতেন। তাহার আর সে জন্মে ঋণ পরি-শোধ হইত না। কত লোক যে পৈতৃক ভদ্রাসন বিক্রয় করিয়া তাঁহার দেনা শোধ করিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই।

দেহ চিরকাল সমান চলে না। সারাটা জীবন খাটিয়া ব্রজকিশোর শয্যা লইলেন।

আজও তাঁহার শাশুড়ী আছেন, তিনি ব্যাকুল হইয়া বিজয়কে লইয়া আসিলেন; বিজয়ের মামাও আসিলেন,—রোগের চিকিৎসা হইতে লাগিল,—সেবা-শুশ্রূষার কোন ত্রুটী হইল না;—রোগ কিন্তু সে সব কিছু মানিল না; দিন দিন রোগ বাড়িতেই লাগিল। এদিকে উদয় দত্ত দু'বেলা যাতায়াত আরম্ভ করিল; ব্রজকিশোরের তখন বেশ জ্ঞান আছে; তিনি উদয়ের যাতায়াতের কারণ বুঝিয়া কহিলেন—"দাদা, অস্থির হচ্ছেন কেন, আমার দেনা তো এক পয়সা হবে না।" পাঁচ জনের সম্মুখে উদয় একটু লজ্জায় পড়িয়া গেল; তথাপ ভুজঙ্গের নিশ্বাসে বিষই বাহির হয়! উদয় একটু আমৃতা আমৃতা করিয়া বলিল,—'যদি—যদি দেনাই দাঁড়ায়, তখন, তাহ'লে—" ব্রজকিশোর একবার চক্ষু মুদিয়া, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ভগবানকে স্মরণ করিয়া কহিলেন, "দাদা, আপনি যাতে সন্তুষ্ট হন, করুন।"

যথাকালে উকীল ডাকাইয়া পাঁচজন ভদ্র লোক থাকিয়া এই মর্ম্মে একটী লেখা পড়া হইয়া রহিল, ব্রজকিশোর অবর্ত্তমানে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ ঋণের দায়ী।

পুত্র বিজয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া ব্রজকিশোর স্বর্গে গেলেন। বউটী ছোট বলিয়া বিজয়ের মামা এতদিন তাঁহাদিগকে শ্যামপুর পাঠান নাই। যখন তাহারা বড় হইল, তিনি সাজাইয়া গুছাইয়া পাঠাইয়া দিলেন, সে কথা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমরা পাঠককে জানাইয়াছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যত সব রেশমের দালাল মিলিয়া উদয় দত্তের রেশমের কারবারে মাসিক দশ টাকা বেতনে বিজয়ের একটী চাকুরী করিয়া দিল। মাসে দশ টাকা ব্যয়, একি কৃপণের প্রাণে সহ্য হয়? বরং সে, দেহ হইতে এক ওজন রক্ত-সংযুক্ত মাংস কাটিয়া দিতে পারে, তবু এক তোলা রূপা প্রাণ থাকিতে দিতে পারে না! উদয় বিজয়ের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া রহিল—দালালদের জন্য মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না; কিন্তু মনে মনে তাহার সর্ব্বনাশের কল্পনা করিল।

এইরূপে পাঁচ ছয় মাস কাটিয়া গেল। উদয়ের মুখে মধু, হৃদে বিষ! বিজয়ের সাধ্য কি যে, তাহা বুঝিতে পারে? চৈত্র-সংক্রান্তি কাটিল; এক দিন সকলের সাক্ষাতে উদয় বলিলেন,—"বাপু বিজয়, খাতাপত্র নিকাশ করিয়া তোমার বাপের দুই হাজার টাকা দেনা বাহির হইল!" যেমন আকস্মিক বজ্রাঘাতে লোকে চকিত হয়, যেমন সহসা সম্মুখে বিষধরের উগ্র-ফণা দেখিলে পথিক ভীত হয়, বিজয়ও সেইরূপ ভীত হইলেন। বিজয় চারিদিক্ অন্ধকার দেখিলেন! পিতার এক পয়সা দেনা নাই, একথা উদয়ের হাতে-পায়ে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিজয় কতবার বলিলেন, কত লোকের দ্বারা অনুরোধ করাইলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। পাষাণও গলে, লোহাও গলে, কিন্তু কৃপণের, সুদখোরের, অধার্ম্মিকের, নরাধমের, পাষণ্ডের নিষ্ঠুর হৃদয় গলে না! উদয়ের হৃদয় গলিল না, মনও টলিল না। অগত্যা বিজয় পৈতৃক জমি জায়গা বিক্রয় করিয়া পিতৃঋণ (?) পরিশোধ করিলেন।

ইহাতেও নিস্তার পাইলেন না নরহত্যাকারী কি একবার মাত্র নরহত্যা করিয়া নিরস্ত হয়? ভুজঙ্গ কি একবার মাত্র দংশন করিয়া হিংসা-বৃত্তির পরিতৃপ্তি করে? পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর এক মাস অতীত হয় নাই, উদয় বিজয়ের পিতার আবার এক দেনা বাহির করিল। দংশনের উপর দংশন, বড় তীব্র,

বড় যন্ত্রণাদায়ক। প্রথম বিষের জ্বালা এখনও কমে নাই, তার উপর আবার বিষের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

বিজয় দেনার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মিষ্ট হাসিয়া উদয় বলিতে লাগিল,—"তোমার বাপুতো কারও কথা শুন্‌তো না, নিজের ওজন বুঝে চল্‌তো না, পয়সা পেলেই খরচ কর্‌ত।" এ গৌরচন্দ্রিকা বিজয়ের ভাল লাগিল না; আসল কথাটা কি, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

উদয় একে একে দেনার পরিমাণ দেখাইতে লাগিল;—"এই ধর, প্রত্যহ পারাপারের খরচ ৵৹ আনা হিসাবে বৎসরে ২৫৲ টাকা এবং প্রত্যহ সেখানে ৵৹ হিসাবে জলখাবার খাওয়া—উহাতে ২৫৲ টাকা; বৎসরে ৫০৲ টাকা; এমন ৮ বৎসর মায় সুদে এখন ৫০০৲ টাকা।"

রেশমের কুঠী ছিল জানাহাবাদে, প্রত্যহ নদী পার হইয়া কুঠী যাইতে হইত।

বিজয়। নৌকা আপনার নিজের, বাবা বসিয়া যাইতেন, তার আবার পয়সা কি মহাশয়?

উদয়। তার সঙ্গে কথাই ছিল, তার নামে পারের ৵৹ আনা ও জলখাবার ৵৹ আনা খরচ পড়িবে।

বিজয়। তাঁর জলখাবারের পয়সা আপনি দিবেন বলিয়াছিলেন।

উদয়। উদয় দত্ত সে পাঠ পড়ে না।

বিজয় আকাশের পানে চাহিয়া রহিলেন; উদয় কহিল,—"তুমি ও সব বাজে কথা বিশ্বাস ক'রনি বাবা, কে সে কথার সাক্ষী আছে?" বিজয় মাথা নামাইয়া, উদয়ের মুখের পানে চাহিয়া, ঊর্দ্ধপানে হাত তুলিয়া বলিলেন, "সাক্ষীর কি প্রয়োজন? সাক্ষী ঐ ভগবান্, সাক্ষী আপনার অন্তরাত্মা।"

কথায় বলে,—"চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী," এও ঠিক তাই; পাষণ্ডের হৃদয় একবারও কাঁপিল না।

উকীলের বাড়ী যাইয়া বিজয় একখানি "অনৃডিম্যাণ্ড হ্যাণ্ডনোট" লিখিয়া দিলেন।

মনুষ্যজীবন এ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কেবল কঠোর পরীক্ষামাত্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিজয়ের এখন সময় মন্দ পড়িয়াছে,—কিছুতেই আর ভদ্রস্থতা নাই। জমি জায়গাগুলি সবই ত গিয়াছে, বাড়ীখানিও যায় যায়; কারণ পাঁচ শত টাকার হ্যাণ্ডনোট খানি মাথার উপর ঝুলিতেছে;—আবার গ্রহ দেখ, চাকুরীটীও গেল, খাবার সংস্থান পর্য্যন্ত ঘুচিয়া গেল। শুধু কি ইহাতেই গ্রহ কাটিল?—সহসা মাতুল মারা গেলেন। এখন বিজয়ের মাথার উপর আর কেহ নাই। সময় যখন মন্দ হয়, এইরূপেই হয়। গ্রহ একবার ধরিলে আর রক্ষা নাই।

সময় মন্দ বলিয়া বিজয় ঘরের বাহির হইতেন না। তাঁহার ধারণা ছিল, সময় মন্দ হইলে কাহারও দ্বারস্থ হইতে নাই। কিন্তু দারুণ কষ্টে পড়িয়া একবার ভাবিয়াছিলেন, কলিকাতায় যাইয়া একটী চাকুরীর সন্ধান করিবেন; কিন্তু তাঁহার ঘরে কেহ নাই, নলিনীকে একা রাখিয়া যান কি করিয়া? অন্য সময় হইলে নলিনীকে তাঁহার মাতুলালয়ে পাঠাইতেন; কিন্তু নলিনী এখন পূর্ণ দশমাসের গর্ভবতী। স্বামী স্ত্রীতে কেবল ভগবানের নাম করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

এই সময়ে উদয় দত্ত হ্যাণ্ডনোটের টাকার তাগাদা আরম্ভ করিল। তাগাদার উপর তাগাদা। ঘরে তিষ্ঠানো ভার হইল। অন্নাভাবে দিনান্তে যাহাদের উদর পূরণ হয় না, ৫০০৲ টাকা তাহারা পাইবে কোথায়? [illegible]

বিজয় দিনের মধ্যে দশবার যাইয়া উদয় দত্তের হাতে-পায়ে ধরিয়া কত অনুনয়-বিনয়, সাধ্য-সাধনা করিলেন, তথাপি দুরাত্মার হৃদয় ভিজিল না; বিজয়ের নামে নালিশ রুজু হইল, —বিনা আপত্তিতে মোকদ্দমাও ডিগ্রি হইল।

অনশনে, অর্দ্ধাশনে বিজয়ের আর সে মুখ-শ্রী নাই। তেমন সুন্দর মুখ মলিন হইয়াছে, চক্ষু কোটরে বসিয়াছে আর নলিনী? তার কথা আর কি বলিব? সে ত এখন সহজেই উঠিতে পারে না, তার উপর এ ভীষণ দারিদ্র্য! —যথাসময়ে সে একমুষ্টি অন্ন পায় না। স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া অম্লানবদনে সকল যাতনা সহ্য করে।

একদিন আষাঢ় মাসের শেষ সন্ধ্যা হইয়াছে; আকাশে বড় মেঘ,—ফোটা ফোটা জলও পড়িতেছে, অত্যন্ত শীতল বাতাস বহিতেছে, সেই সময়ে এক প্রকোষ্ঠের মধ্যে বিজয়ের কোলে মাথা রাখিয়া নলিনী শুইয়া আছে! নলিনীর মুখে বড় কাতর-ভাব! চক্ষেও মর্ম্মান্তিক কষ্টের চিহ্ন; তাহার বড় যাতনা হইতেছে,—সহজে শ্বাস ফেলিতে পারিতেছে না। বিজয় নলিনীকে তাহার এই কষ্টের কথা জিজ্ঞাসিলেন; নলিনী স্বামীর পানে চাহিয়া কিছু বলিতে পারিল না, কেবল তার চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল।

বিজয় সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন,—"ভয় নাই, ভগবানকে স্মরণ কর।"

বিজয় ধীরে ধীরে নলিনীর মস্তক একটী বালিশে রাখিয়া কহিলেন—"আমি এখনি দাই আনৃছি।" গৃহমধ্যে কেবল একটী দীপ জ্বলিতে লাগিল; বিজয় নলিনীকে একাকিনী রাখিয়া দ্রুতবেগে বাহির হইলেন।

বিজয় অতিশীঘ্র ধাত্রীকে ডাকিয়া আসিতেছেন; দূর হইতে দেখিলেন, তাঁহার দ্বারে আলো জ্বলিতেছে এবং চারি পাঁচ জন লোক সেখানে কথাবার্ত্তা কহিতেছে সহসা তাঁহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কি ভাবিলেন;—নলিনীর জন্যই তাঁহার যত ভয়! তিনি দ্রুত আসিলেন; আসিয়াই জিজ্ঞাসিলেন,—"কে তোমরা গা?"

তাঁহার কথায় কেহ কোন উত্তর দিল না; একজন বলিল,—"ইনিই বিজয় বাবু।"

বিজয় মাথা তুলিয়া দেখিলেন, স্বয়ং উদয় দত্ত তাঁহার পরিচয় দিতেছে।

বিজয় আবার দেখিলেন, অন্যান্য লোকের মধ্যে পুলিশের দুইজন কনষ্টবল।

বিজয় সমস্তই বুঝিলেন; ভয়ে তাঁহার প্রাণ অস্থির হইল। পুলিশের লোক তাঁহাকে ধরিতে অগ্রসর হইল; তিনি পিছাইয়া কহিলেন,—"একটু থাম, আমার ঘরে ভারি বিপদ, একবার দেখে আসি।"

উদয় দত্ত কহিল,—"আসামী ঘরে ঢুকিলে তোমাদের অধিকার কি?" কনষ্টেবলদ্বয় আবার অগ্রসর হইল। বিজয় চীৎকার করিয়া কহিলেন,—"প্রসব বেদনায় আমায় স্ত্রী মরমর,—সে বেঁচে আছে কিনা, একবার দেখিয়া যাইতে দাও।"

তাহারা কোন কথা না শুনিয়া বাঘের মত লাফাইয়া বিজয়ের হাত ধরিল। বিজয় তখনও কাতর হইয়া কহিলেন,—"তোমাদেরও তো স্ত্রী পুত্র আছে ভাই!—তোমরা আমার সঙ্গে চল, আমি তফাৎ থেকে দেখে আসি।"

একজন কনষ্টেবল কহিল,—"বিজয় বাবু! পুলিশের লোক কি আবার দয়ালু হয়?"

বিজয় তখন হাত ছিনাইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু পুলিশের বজ্রমুষ্টি কে শিথিল করিতে পারে? ক্রোধে, ঘৃণায়, লজ্জায়—ততোধিক নলিনীর দুঃখে বিজয়ের তখন বুদ্ধিলোপ পাইয়াছে; বিজয় চীৎকার করিতে লাগিলেন। সহসা বিজয়ের গৃহ হইতে গৈরিক বসন-ধারিণী

একটী স্ত্রীলোক বাহির হইয়া কহিলেন,—"বিজয়, বিজয়, তোমার কোন ভয় নাই, নলিনী নিরাপদে আছে—তোমার একটী পুত্র-সন্তান হইয়াছে।"

বিজয় ফিরিয়া চাহিলেন; বিস্মিত এবং স্তম্ভিত হইলেন। কে এ রমণী? বিজয় চিনিয়াও চিনিতে পারিতেছেন না। রমণী আবার কহিল,—"বিজয় ধর্ম্মের জয় হইবে, অধর্ম্মের ক্ষয় হইবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ,—যাও, উহারা যেখানে ইচ্ছা তোমাকে লইয়া যাক্! কোনও ভয় নাই।" এ কণ্ঠস্বর পরিচিত! তবুও কিন্তু বিজয়ের মনে আসিতেছে না।

বিজয় জিজ্ঞাসিলেন,—"কে তুমি?"

রমণী কহিল,—"আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?—আমি ভবানী।"

ছেলে-বেলার সব কথা তখন বিজয়ের মনে পড়িল।

ভবানী আবার কহিল,—"বিজয়! তোমার স্ত্রী-পুত্র আমার পরম স্নেহের বস্তু! যাও তুমি! কোন ভয় নাই! শিয়রে ভগবান্! আমি তোমাকে দেখিব।"

যাইতে যাইতে বিজয় মনে মনে ভাবিলেন,—"ভবানী যৌবনে যোগিনী সাজিয়াছে, আমাকে কিন্তু এখনও ভুলে নাই।"

দেনার দায়ে বিজয়ের কারাবাস হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিজয় আজ দুই দিন জেলে আসিয়াছেন। শোকে, দুঃখে, ঘৃণায় এ দুই দিন জলগ্রহণ করেন নাই; জেলখানায় কে বা তাঁহার যত্ন করিবে? এই দিন গভীর রাত্রে, যখন সব কয়েদী ঘুমাইয়াছে, বিজয় করতলে মুখ ঢাকিয়া একা বসিয়া কাঁদিতেছিলেন; এমন সময়ে হঠাৎ তাঁহার পৃষ্ঠে কোমল কর-স্পর্শ হইল। তিনি ধীরে ধীরে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, তাঁহার পশ্চাতে একটী স্ত্রীলোক। বিজয় সবিস্ময়ে তাহার মুখ পানে চাহিয়া কহিলেন,—"তুমি,—ভবানী?"

ভবানী সম্মুখে আসিয়া কহিল,—"বিজয়! কাঁদ কেন?"

বিজয় চক্ষু মুছিলেন, কিছু বলিলেন না। ভবানী আবার কহিল,—"বিজয়! কেঁদো না, তোমার স্ত্রী-পুত্র ভাল আছে;—আমি এই মাত্র তাদিগে দেখে আস্‌ছি।"

বিজয় স্ত্রী-পুত্রের কুশল-বার্ত্তা পাইয়া কতকটা আশ্বস্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"ভবানি! তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?"

ভবানী। যেখানে যখন ভগবান্ রেখেছেন।

বিজয়। তুমি এ বেশ ধরিয়াছ কেন?

ভবানী। আমার গুরুর উপদেশ।

বিজয়। এখন কি কর?

ভবানী। ভগবান্ যখন যা করান।

বিজয়। এদেশে কেন এসেছিলে?

ভবানী। দেশ-ভ্রমণ উপলক্ষে।

বিজয়। এখান থেকে যাবে কোথা?

ভবানী। কিরূপে বলিব?

বিজয়। তুমি কি আর সংসারী হবে না?

ভবানী। এই তো সংসারের সব কাজ কর্‌ছি, তবে আবার সংসারী নহি কিসে?

বিজয় ভবানীর মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন, কি কথা জিজ্ঞাসিতে গেলেন, কিন্তু ভবানী কহিলেন,—"বিজয়! উপবাসে দেহ কয়দিন থাকিবে?"

বিজয়। আমার স্ত্রী-পুত্র অনাহারে!

ভবানী। ঈশ্বর তাহাদের আহারের ব্যবস্থা ক'রেছেন; দয়াময়ের রাজ্যে কেহ না খাইয়া থাকে না। তুমি খাও,—তোমার মুখ-চোখ শুকিয়ে গেছে।

ভবানী কিছু ফলমূল মিষ্টান্ন আনিয়াছিল;

ভবানীর কথায় বিজয় তাহারই কিছু খাইলেন। বিজয়ের প্রাণ একটু শীতল হইল। বিজয় কহিলেন,—"ভবানি! এবার তোমাকে আট বৎসর পরে দেখিলাম। আমি তোমাকে অনেক খুঁজিয়াছি,—তোমার জন্য নির্জ্জনে ব'সে কত ভেবেছি! তুমি যে বেঁচে আছ, এ আমার বিশ্বাস ছিল না! তুমি যে আবার আমাকে দেখা দিবে, আমি এ স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

ভবানী। সবই ঈশ্বরের দয়া।

বিজয়। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

ভবানী। কি?

বিজয়। তুমি এখানে কিরূপে আসিলে?

ভবানী। সে কথা আর তোমার শুনিয়া কাজ নাই।

বিজয় চাহিয়া দেখিলেন, ভবানীর মুখে অপূর্ব্ব-গাম্ভীর্য্য ও চক্ষে দিব্যজ্যোতিঃ।

ভবানী। বিজয়! আমি চলিলাম। তোমার স্ত্রী-পুত্র ভাল আছে, তাহাদের কোন কষ্টই নাই। যদিও এ কারাগার, তুমি এখানে মনের অসুখে থেকো না, কিছুমাত্র ভেবো না, কারাবাসের জন্য দুঃখিত হইও না। বোধ হয়, তোমার পূর্ব্বজন্মের একটু পাপের সংস্কার ছিল, কর্ম্মভোগ হইলেই সে পাপের খণ্ডন হইবে। তুমি ধার্ম্মিক,—ধর্ম্ম তোমার সহায়! যে অবস্থায় যেখানেই থাক, জগদীশ্বরকে স্মরণ করিয়া মনের সুখে দিন কাটাইও; সন্তোষ ভোগ করাই পরম ধর্ম্ম।

ভবানী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

বিজয় ভবানীকে ভাবিয়া মুগ্ধ হইলেন,—একেবারে চমৎকৃত হইলেন। আপনা-আপনি বলিলেন,—"ভবানীর জীবনে কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উদয় দত্তের বাটীতে আজ লোকে "লোকারণ্য"—পুলিশ খানাতল্লাসী করিতেছে। জাহানাবাদের কাঞ্চনবেশ্যার বাটী হইতে উদয়ের পুত্র যাদব বাঁধা-হুঁকা চুরী করিয়া আনিয়াছে, কাঞ্চন যাদবকে ফৌজদারী সোপরদ্দ করিয়াছে। অর্থপিশাচ কৃপণ উদয়ের উপযুক্ত পুত্র যাদব মদ, গাঁজা, বেশ্যা—এ সকলেই মজবুত।

বাস্তবিক বাড়ী হইতে বাঁধা-হুঁকা বাহির হইল,—হুলস্থূল পড়িয়া গেল! সকলের মুখ শুকাইল;—যাদবকে নিশ্চয়ই জেল খাটিতে হইবে! উদয়চাঁদ অনেক টাকা ঘুষ দিয়া, অনেক হাতে-পায়ে ধরিয়া সে যাত্রা যাদবকে বাঁচাইলেন! কিন্তু ইহাতেই উদয়ের বুক ভাঙ্গিয়া গেল! আহা! কৃপণের অনেক কষ্টের ধন!

জেল-খাটা রদ্ হইল বটে, কিন্তু মারপিট্ করা অপরাধে যাদবের ৫০৲ টাকা জরিমানা হইল।

কাঞ্চন-বেশ্যার হাতে জব্দ হইয়া যাদব ও তাহার পাঁচ ইয়ারে যুক্তি স্থির করিল,—বেশ্যাটাকে শীঘ্রই নিশ্চিন্তপুর পাঠাইতে হইবে। পাপিষ্ঠদের যে কথা সেই কাজ। কয়দিনের মধ্যেই কাঞ্চনের দেহ রক্ত-স্রোতে ভাসিয়া উঠিল,—অমনি পুলিশে হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

তখন সেই পাঁচ ইয়ারেই যাদবকে ফাঁসী-কাষ্ঠে ঝুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু উদয় দত্তের বিপুল অর্থ, গ্রামের সেই গাছতলার ষষ্ঠীঠাকুরের সেবায়েৎ হইতে গ্রামের মাতব্বর মোড়ল পর্য্যন্ত সকলের উদরে অন্ন বিস্তর প্রবেশ করিয়া যাদবকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিল।

যাহাই হউক, শক্রেতে রটাইল,—উদয় দত্ত যেমন কৃপণ, তমনি তাহার দশ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে! বাস্তবিক কথা তা নয়, আমরা

গুপ্ত অনুসন্ধানে জানিয়াছি, মোট খরচ ৭১১১৭৮৶১৭॥ পাই।

পাপাশয় কৃপণের অর্থের এইরূপই দুর্গতি হইয়া থাকে।

উদয়, যাদবকে "ত্যাজ্যপুত্র" বলিয়া বাটীর বাহির করিয়া দিল। দুরাত্মার তাহাতে সংশোধন হইল না; বরং সে আরও প্রচণ্ড হইয়া উঠিল।

যাদবের স্ত্রীর নাম দামিনী। দামিনী রূপে গুণে লক্ষ্মী। এমন গুণবতী রমণী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্বশুর মহাশয়, স্বামীকে তাড়াইয়া দিয়াছেন, বধূর তাহাতে হাত কি? কিন্তু তা বলিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্য সে শ্বশুর বা শ্বশুরকুলের কাহাকেও অশ্রদ্ধা করে নাই। তথাপি স্বামীর বিরহ, সাধ্বীর প্রাণে সহিবে কেন? কিন্তু সেই বুদ্ধিমতী, মনের আগুনে মনে মনে জ্বলিত,—কাহারও কাছে কোন কথা বলিত না, কেহ তাহাকে কখনও এক বিন্দু চোখের জল ফেলিতে দেখে নাই। সে নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর জন্য ভগবান্‌কে ডাকিত।

মাতলামি ত শুধু-হাতে হয় না! একদিন চোরের মত লুকাইয়া যাদব দামিনীর কাছে আসিয়া তাহার গহনার বাক্স চাহিল! স্বামীকে দেখিয়া দামিনীর কত দুঃখ জাগিয়া উঠিল—শোকের সিন্ধু উথলিয়া উঠিল! দামিনী কোন কথা বলিতে পারিল না, কেবল অশ্রুবর্ষণ করিল! কিন্তু সে অশ্রুর মর্ম্ম কি পাষণ্ড যাদব বুঝিতে পারে?

যাদব আবার গহনা চাহিল। দামিনী বাক্স বাহির করিয়া করযোড়ে কহিল,—"তোমার চেয়ে কি আমার গহনা বড়? কিন্তু ভেবে দেখ, তুমি বিষয় আশয়ের কেউ নও; ভবিষ্যতে এই গহনাই তোমার ভরসা! আমি তোমারই জন্য এ সব বুকে ক'রে রেখেছি! একদিনের তরে এ সব আমার অঙ্গে উঠে নাই! এ সব নিয়ে কার জন্যে নষ্ট করবে? এখন এ সব নিও না।" দামিনীর চক্ষু দিয়া অশ্রু বহিল।

নরাধম যাদব সতীর মর্ম্মব্যথা বুঝিল না,—স্ত্রীর কোন কথা শুনিল না,—গহনার বাক্স তুলিয়া লইল। দামিনী স্বামীর পদতলে পড়িয়া, পদদ্বয় ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া কত বুঝাইল, কত মিনতি করিল! স্বামীকে যাইতে দিবে না বলিয়া তাহার পদযুগল ধরিয়া রহিল।

দুরাত্মা যাদব ক্রোধান্ধ হইয়া শাণিত ছুরিকা দেখাইল, দামিনী তথাপি পা ছাড়িল না;—কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"আমি তোমার ছুরীর ভয় করি না, তোমার হাতে আমার প্রাণ গেলে আমার জন্ম সার্থক! আমার এই দুঃখ, এখনও তোমার চৈতন্য হ'ল না? আহা! তোমার এই দুধের ছেলে! এর মুখ দেখেও কি তোমার মন গলে না?"

যাদব দামিনীকে পদাঘাতে গৃহে ফেলিয়া দিয়া গহনার বাক্স লইয়া চলিয়া গেল।

দামিনী ছিন্নলতার ন্যায় গৃহমধ্যে পড়িয়া রহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

একদিন বড় বাদলা! ঘরের বাহির হয় কার সাধ্য! রাত্রে আবার এত অন্ধকার যে, কোলের মানুষ দেখা যায় না! সে ভয়ঙ্কর সময়ে শ্যামপুরের একটী ক্ষুদ্র কুটীরে এক রমণী, কোলে তাহার পাঁচ বছরের ছেলেটীকে লইয়া, বসিয়া কাঁদিতেছে। মিট্ মিট্ করিয়া দীপটী জ্বলিতেছে,—বাতাসে তাহার ক্ষীণ শিখাটী কাঁপিতেছে। গহন-বনের ভিতর ক্ষুদ্র মল্লিকার কলি যেমন বাতাসে দোলে, এও ঠিক সেইরূপ দুলিতেছে! একটু জোর-বাতাস আসিলেই শিখা নিবিবে,—সেই সঙ্গে বুঝি অভাগীর

কোলের শিশুটীরও জীবন-দীপ নিবিবে। শিশুর চক্ষু মুদিত হইয়া আসিতেছে; জননী অঙ্গে হাত দিয়া দেখিলেন, বড় শীতল! ক্রমে আরও শীতল হইতেছে; অনাথার নয়ন-বারি নীরবে বহিতে লাগিল,—সে উচ্চ-ক্রন্দন করিয়া কি করিবে? কেহ ত তাহার উচ্চ-ক্রন্দন শুনিয়া এমন সময়ে তাহাকে দেখিতে আসিবে না!

কিন্তু সহসা একি! কে তাহার কুটীরে আসিল! কে তাহার সম্মুখে বসিল! এ যে রমণী! ইনি দেবী, না মানবী? ইহাঁর রক্তবর্ণ বসন; ইহাঁর নিবিড় কেশরাশি অসাবধানে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রমণী ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া কহিলেন,—"দেখি মা, তোর্ ছেলের হাত!"

মা জিজ্ঞাসিলেন,—"কে মা তুমি?" রমণী কহিলেন,—"আমি মা সন্ন্যাসিনী।"

ছেলের হাত দেখিয়া সন্ন্যাসিনী স্বহস্তে একটু ঔষধ মাড়িয়া তাহাকে খাওয়াইলেন! ঔষধের কি অদ্ভুত শক্তি! কিছুক্ষণ পরেই ছেলের নাড়ী আসিল। মা দেখিলেন বরফের মত শীতল হাত-পা আবার গরম হইতেছে,—মার প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল—চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রু বহিল! মা যে কি বলিয়া সন্ন্যাসিনীকে কৃতজ্ঞতা ও উপকার জানাইবেন, তাহা খুঁজিয়া পান না।

সন্ন্যাসিনী কহিল,—"মা, আর তোর্ ছেলের কোন বিপদ নাই; আমি যাই, আবার আসিব।"

মা কহিলেন,—"দেখো মা, আবার এসো, তুমিই এ অভাগিনীর ছেলেকে বাঁচালে; পায়ের ধূলা দিয়ে যাও মা।" সন্ন্যাসিনী কহিল,—"অমন কথা ব'ল না মা, আমি কি পায়ের ধূলা দিব মা? ভগবান্ তোমার ছেলেকে বাঁচাবেন।"

"আমি আবার আসিব" বলিয়া সন্ন্যাসিনী ধীরে ধীরে সেই কুটীর হইতে বাহির হইয়া অন্ধকারের মধ্য দিয়া চলিলেন। আর একটী কুটীরে যাইয়া প্রবেশ করিলেন,—তাহার ভিতর এক বৃদ্ধার মৃতদেহ! রমণী একাই তাহাকে লইয়া চলিলেন। এ কি তাঁর দেহের শক্তি, না—মনের শক্তি? নিকটেই শ্মশান! সে সময়ে শ্মশানের ভিতর প্রবেশ করে, কার সাধ্য? সন্ন্যাসিনী কিন্তু অবাধে সেখানে মৃতদেহ লইয়া যাইয়া দাহ করিলেন। তখন রাত্রি শেষ হইয়াছে—আকাশের মেঘ সরিয়া গিয়াছে—পূর্ব্বদিক্ একটু একটু পরিষ্কার হইতেছে। সন্ন্যাসিনী মৃতের সৎকার করিয়া হরিনাম করিতে করিতে আপনার মনে চলিলেন; হঠাৎ কে ডাকিল—"ভবানী—ভবানী,"—ভবানী চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে বিজয়। বিজয় কহিলেন,—"ভবানি, আমার ভ্রম ভাঙ্গিয়াছে, তুমি কখনই মানবী নহ—তুমি দেবী! দেবী-রূপে তুমি এ সংসার পবিত্র করিতেছ!"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নীরব অন্ধকার নিশি! দুষ্কার্য্য-সাধনের কি উপযুক্ত সময়! তাই সুযোগ বুঝিয়া দুরাত্মা যাদব সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া একখানা শাণিত ছুরিকা লইয়া লুকাইয়া উপরে উঠিল! পিশাচ আজ সত্য সত্যই কার বুকে ছুরি বসাইবে। যাদবের সঙ্গে আরও দু এক জন দুরাত্মা আসিয়াছে! দুরাত্মার সহায় দুরাত্মা! সৎকর্ম্ম একা করা যায়, অসৎকর্ম্ম একা হয় না।

উদয়চাঁদ দত্ত তখন শয্যায় গাঢ় নিদ্রামগ্ন—কক্ষমধ্যে প্রদীপ জ্বলিতেছে! দুরাত্মা যাদব সেই ঘরে ঢুকিল—প্রদীপ নিবাইয়া দিল; তার পর "ফিস্ ফিস্" করিয়া কাহার সঙ্গে কি কথা কহিল—অন্ধকারে আর কিছু দেখা গেল

না; কিন্তু হঠাৎ কাহার হৃদয়ভেদী উচ্চ চীৎকার রজনীর নীরবতা ভাঙ্গিল! তারপর সিঁড়ি দিয়া কাহারা যেন "দুপ্ দুপ্" করিয়া নামিয়া পলাইয়া গেল। আবার প্রদীপ জ্বালা হইল! একি ভীষণ লোমহর্ষণ দৃশ্য! উদয়ের বক্ষে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ—বিছানা দিয়া রক্ত-গঙ্গা বহিতেছে; উদয়চাঁদ মৃত্যুযাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছে—শীঘ্রই প্রাণবায়ু বাহির হইবে।

চারিদিকে "খুন খুন" বলিয়া একটা ভয়াবহ কোলাহল পড়িয়া গেল! সকলেরই মুখ ভয়ে শুকাইয়া গেল। দামিনী এক পাশের একটী কক্ষে তাহার দু'বছরের ছেলে সুশীলকে লইয়া শুইত; বাহিরের চীৎকারে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—উঠিয়া দ্বার খুলিল—সকলেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দৌড়িতেছে; কাহাকেই বা জিজ্ঞাসিবে? হঠাৎ এক দাসী আসিয়া কহিল—"বৌমা, পালাও, পালাও; দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ কি? খুন! খুন! এ রাক্ষসের পুরীতে আর থেকো না—সুশীলকে বাঁচাও।" দাসী উর্দ্ধশ্বাসে পলাইল। দামিনী কি করিবে? কোথা যাইবে? কি করিলে সুশীলের প্রাণ রক্ষা হইবে? মায়ের প্রাণ যাতনায় অস্থির হইল। দামিনী ঘুমন্ত শিশুকে বুকে তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে খিড়কী-দ্বার দিয়া বাহিরে আসিল! কিন্তু এ কি সর্ব্বনাশ! এ কোন্ দুরাত্মা, দামিনীকে ধরিতে হাত বাড়াইল? তাহার হাতে তীক্ষ্ণ ছুরিকা! দামিনী প্রাণাধিক শিশুটীকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল! দুরাত্মা দামিনীকে ধরে আর কি? সহসা কোথা হইতে ভবানী আসিয়া সেখানে আবির্ভূত হইল; ভবানী ক্রোধ কুটিল-নেত্রে সে দুরাত্মার পানে চাহিয়া কহিল,—"দূর্ হ নরাধম! যদি সতীর অঙ্গ স্পর্শ করিস্, এখনি দগ্ধ হইবি!" ভবানীর পানে চাহিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল! সে আস্তে আস্তে সেখান হইতে পলাইল। দামিনী কিন্তু মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেছিল! শিশু কাঁদিয়া উঠিল। ভবানী শিশুকে কোলে লইয়া দামিনীকে ধরিয়া লইয়া বিজয়ের বাটীতে পৌঁছিলেন।

সংক্ষেপে বিজয়কে সকল কথা শুনাইলেন। বিজয় ও নলিনী দামিনীকে অতিশয় যত্ন করিলেন; নলিনী সুশীলকে কোলে লইল—দামিনীর কিন্তু চোখের জল থামিল না।

তারপর, যেখানে উদয়চাঁদ মৃত্যুশয্যায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, ভবানী সেই খানে আসিলেন। তখন আত্মীয়, কুটুম্ব—স্ত্রী পুরুষে ঘর পূর্ণ—সকলেই আর্ত্তনাদ করিতেছে; কিন্তু কি বলিয়া?—"ওগো আমার কি ক'রে গেলে গো?" কেহ আর তাহার পরকালের জন্য একটা কথা কহিতেছে না। ভবানী কহিলেন,—"আহা! যাতে এঁর পরকালের কাজ হয়, এমন দু'টো কথা কেহ বল না গা?" একজন কহিল,—"আর বাছা, পরকাল! পরকাল নিয়ে কি ধুয়ে খাব? আমাদিগে একেবারে পথে বসিয়ে গেলেন।" সংসারের স্বার্থপরতা দেখিয়া ভবানীর চক্ষে জল আসিল।

ভবানী উদয়ের কাছে যাইয়া দেখিলেন, এখনও চৈতন্য আছে। তিনি উদয়ের কানে হরিনাম সুধা ঢালিতে লাগিলেন; সুকৃতিফলে মৃত্যুশয্যায় সে সুধাপান করিতে করিতে উদয়চাঁদ প্রাণত্যাগ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

পুলিশের অনুসন্ধানে খুনী বাহির হইল,—দুরাত্মা যাদব পিতৃহত্যাকারী। জাহানাবাদের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তদন্ত হইয়া মোকদ্দমা হুগলীর দায়রা সোপরদ্দ হইল; নরাধম যাদব হুগলীতে চালান গেল, আর এক সপ্তাহ পরে দায়রা বসিবে।

পর পর এই সব কথা দামিনী শুনিতে লাগিল, আর চখের জলে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। প্রত্যহ বিজয় সন্ধ্যা-কালে আসিয়া সব বলিতেন। এতদিন তবু আশা ছিল, কিন্তু যেদিন পতিপ্রাণা দামিনী শুনিল, আজ তার স্বামীর হুগলীতে চালান হইয়াছে, সেদিন তাহার সব আশা ফুরাইল। দামিনীর আহার নিদ্রা বন্ধ হইল, কাহারও সঙ্গে সে একটী কথা কহিত না; চব্বিশ ঘণ্টাই বসিয়া বসিয়া কাঁদিত। বিজয় ও নলিনী দামিনীকে সর্ব্বদা কত যত্ন করিতে লাগিলেন, কতরূপে বুঝাইতে লাগিলেন; কিন্তু পতির বিপদে সতীর প্রাণ কি সুস্থির থাকে? নলিনী জোর করিয়া দামিনীকে উঠাইয়া নাওয়াইতেন, —দামিনী কিন্তু দিনরাত আর্দ্র মস্তকে পড়িয়া থাকিত! আর আহার? সে কেবল পাতের কাছে বসা মাত্র! প্রাণের ভিতর যাহার দাবানল জ্বলিতেছে, তার কি আহারে রুচি থাকে? কিন্তু তা বলিয়া দেহে এত অনিয়ম সহিবে কেন? বিশেষতঃ দামিনী চিরকাল সুখে লালিত, পালিত। কখনও কোন কষ্ট সহে নাই। তাই সে শীঘ্র শয্যাগত হইয়া পড়িল। ছেলেটীকে যে কোলে লইয়া থাকিবে, দেহে এমন সামর্থ্য নাই। নলিনী কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্য সুশীলকে অযত্ন করে নাই। দামিনী নলিনীর স্নেহ যত্ন দেখিয়া তাঁহাকে কত আশীর্ব্বাদ করিতেন, ভগবান্‌কে তাঁহাদের মঙ্গলার্থে কত জানাইতেন।

একদিন দামিনী কহিলেন,—"ভাই নলিন, তুমি যা করছ, আমার মার-পেটের বোন্ এত করতো না; এ জীবনে তোমাদের ঋণ পরিশোধ করবার নয়!" দামিনী কাঁদিতে লাগিল।

নলিনীর চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল; বলিল,—"দিদি, অমন কথা ব'ল না।"

দামিনী। নলিন, কাছে স'রে এসো, একটী কথা বলব; জোরে বল্‌তে গেলে বুকে লাগে।

নলিনী কাছে সরিয়া বসিল; দামিনী কহিল,—"বোন্, কোন্ মুখে আমি জিজ্ঞাসা করব, কিন্তু না জিজ্ঞাসা ক'রেই বা থাকি কি ক'রে? ভাই, বুকের ভিতরটা যে আমার জলে যাচ্ছে।" নলিনী বলিল,—"বল না দিদি, আমাকে বলবে না?" দামিনী কহিল,—"বোন্, বলব বলব করি, বল্‌তে পারিনি; কত লোক আসে, পাছে শুনে কেহ তাঁর নিন্দা করে!" দামিনীর কণ্ঠরোধ হইল, চক্ষু হইতে অবিরল জলধারা বহিতে লাগিল; নলিনীও কাঁদিয়া আকুল হইল। দামিনী আবার কহিল, "আমার প্রাণটা বড় অস্থির হয়েছে! কেহ কি আমাকে তাঁর সংবাদ এনে দিতে পারে না? তিনি কেমন আছেন? হায়, আমি যদি পাখী হতাম নলিনি!—"দামিনী আর বলিতে পারিল না। নলিনীও দামিনীর অশ্রুতে অশ্রু মিশাইল।

সেই সময়ে বিজয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—তিনি হুগলী হইতে আসিতেছেন। তিনি দায়রার মোকদ্দমার জন্য তদ্বির করিতে গিয়াছিলেন; যাদবকে বাঁচাইবার জন্য তিনি প্রাণান্ত পণ করিয়াছেন।

বিজয়ের মুখে দামিনী স্বামীর সংবাদ পাইলেন। কিন্তু তাঁহার দক্ষিণ চক্ষু ঘন ঘন স্পন্দিত হইল, দামিনীর হৃদয়ে যেন নিরাশার করাল মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল। নলিনী কতরূপে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে লাগিলেন; কিন্তু দামিনী যেন শূন্যে ঘোর অন্ধকার মধ্যে কি সব ভীষণমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। যেন ভীষণবদন কাহারা, তাঁহার কেশমুষ্টি ধরিয়া তাঁহাকে সেই অন্ধকারে গভীর দুর্গন্ধময় কূপে নিক্ষেপ করিল!

এ সব কি কল্পনা! অথবা ঘোর বিপদের পূর্ব্ব সূচনা?

দশম পরিচ্ছেদ।

এখনও প্রায় এক প্রহর রাত্রি আছে ; চারিদিকে খুব অন্ধকার ; জেলখানার ভিতরে যাদব শুইয়া আছে ; হঠাৎ কে তাহার শিরঃস্পর্শ করিল। যাদব চমকিত হইয়া উঠিল, বুঝি তাহাকে জল্লাদ লইতে আসিয়াছে। তাহার প্রাণের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। মাথা ঘুরিতে লাগিল। প্রাতঃকালে যাদবের ফাঁশী হইবে

যাদব বেশ করিয়া চাহিয়া দেখিল, এ তো জল্লাদ নয়! তবে কে? যাদব উন্মাদের মত জিজ্ঞাসিল,—"কে তুমি, তুমিই আমাকে ফাঁশীকাষ্ঠে ঝোলাবে?"

যাদবের স্বর বড় রুক্ষ—বড় কর্কশ।

আগন্তুক আস্তে আস্তে কহিল—"চুপ কর, আস্তে কথা কও, আমি তোমাকে ফাঁশী দিব না।"

যাদব জিজ্ঞাসিল,—"তবে তুমি আমাকে বাঁচাবে?"

আগন্তুক। ঈশ্বর তোমাকে বাঁচাবেন।

যাদব। তুমি দেখছি ধর্ম্মভীরু লোক! তুমি আমাকে একটা খবর দেবে?

আগন্তুক। কি বল?

যাদব। আমার স্ত্রী পুত্র কেমন আছে জান?

আগন্তুক। কুশলে আছে, ভেবো না।

যাদব। তুমি তাদিগে কিরূপে জানিলে?

আগন্তুক। যাদব, আমাকে চিনিতেছ না, আমি ভবানী।

যাদব উন্মত্তের মত উর্দ্ধে চাহিয়া বলিতে লাগিল,—"ভবানি, ভবানি, এ পাপীর কাছে এলে কেন?" ভবানী নিরুত্তর। যাদব আবার কাতরস্বরে বলিতে লাগিল,—"হায় দামিনি! বাপ্ সুনীল! তোমাদিগে আমি এক দিনের জন্ম আদর করিনি, যত্ন করিনি! আমি কি পাপিষ্ঠ! আমার মত অদৃষ্ট কার ছিল! সংসারে কি দামিনীর মত পতিপ্রাণা রমণী আর আছে? তাকে আমি পায়ে ঠেলেছি! আমার সে সুনীল! আমার সে সুনীল! একদিনের জন্যে তাকে—ওহোহো, বুক ফেটে যায়, বুক ফেটে যায়,—"যাদবের কণ্ঠরোধ হইল।

আবার একটু পরে যেন ঘুমের ঘোর হইতে উঠিয়া যাদব বলিতে লাগিল,—"আমার স্নেহময়ী মা ভক্তিমতী স্ত্রী, অগাধ ধন, চাঁদপানা ছেলে! আমার কিসের অভাব ছিল? কিন্তু আমি পাপী—ঘোর দুরাচার; আমার পাপে, আমার দোষে, তারা সব আজ কোথায়, আমি আজ কোথায়? উঃ বুক যে ফেটে যায়! জল্লাদ, এসো; এ নরাধমকে—এ পিতৃঘাতী পশুকে ফাঁশী দাও! পৃথিবী আমার ভার সহে না, আমি সংসারে সকলকে বড় জ্বালিয়েছি, এবার ঘোর নরকের আগুনে, তাহার বিষমুখ কৃমিকীটের তীব্র-দংশনে জ্ব'লে পুড়ে মরতে চাই।" যাদব কাঁদিতে লাগিল; ভবানীরও চক্ষে জল আসিল; ভবানী গদ্গদ স্বরে কহিল,—"ঈশ্বর তোমাকে দয়া করুন।"

যাদব। আমাকে দয়া করবেন?—আমার মত পাপীকে? কখন না।

ভবানী। নিশ্চয়ই; পাপীকেই তাঁর অধিক দয়া।

যাদব ভবানীর মুখের পানে ফিরিয়া চাহিয়া দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসিল,—"একি সত্য কথা?"

ভবানী। সত্য কথা। যাদব, আর কালক্ষেপে আবশ্যক নাই; ঈশ্বরকে ডাক।

যাদব। কে আমাকে তাঁর নাম শিখাইবে? আমি আজন্ম তাঁর নাম করি নাই।

ভবানী। তাঁর নাম তিনিই শিখাইবেন। মনঃস্থির কর,—অন্তরে তাঁর নাম জপ কর।

ভবানী মনে মনে বলিলেন, "আরে আরে

মায়ার জীব! মরিতে এত ভয় কেন? যাদব, ইহ-জগতের রাজার বিচারে তোর প্রাণরক্ষা হইবে না, জানি; কিন্তু সেই রাজার রাজা, নিখিল-বিশ্বের অধীশ্বর তোকে কোল দিবেন, তোকে নবজীবন দান করিবেন! তাই আমি এখানে আসিয়াছি। হরিনাম-মন্ত্রে পরলোকে তোর আত্মার সদ্গতি করিতে আসিয়াছি। ইহজগতের কর্ম্মফল ভোগ করাই তোর মঙ্গল। বিকৃতি-বুদ্ধিতে তুই সেই মঙ্গলকে অমঙ্গল ভাবিস কেন?" যোগিনী যাদবের কর্ণকুহরে কৃষ্ণনাম শুনাইলেন।

জেলখানার অন্যান্য দ্বার সহসা "ঝন্‌ঝন্" করিয়া খুলিতে লাগিল; ভবানী ধীরে ধীরে যাদবের নিকট হইতে উঠিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইলেন।

যাদব মৃত্যুর পূর্ব্বে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অনেক টাকা খরচ করিয়া বড় বড় কৌন্সলী দিয়াও বিজয় যাদবকে বাঁচাইতে পারিলেন না। যাদবের পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছে—পাপ আর কত কাল সবে বল? জলের মত প্রমাণ হইয়া গেল যে, যাদব স্বহস্তে পিতৃহত্যা করিয়াছে,—শেষে যাদব নিজেও তাহা স্বীকার করিল, জজ সাহেব যাদবের ফাঁসীর হুকুম দিলেন।

প্রাণ-বিনিময়ে প্রাণ! মনুষ্যত্বের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ইহা অতি বীভৎস কাণ্ড বলিয়া বোধ হয়। জগতের অনিষ্টকারী ভীষণ দানবকে চিরজীবনের নিমিত্ত কারারুদ্ধ কর—প্রাণে মারিও না। তাহার প্রাণ লইবার তোমার কি অধিকার? তুমি যাহা দিতে পারিবে না, তাহা লইবে কেন? প্রাণ কেবল তিনিই লইবেন, যিনি ইহা আবার দিতে পারিবেন।

শোকে, দুঃখে, ভয়ে বিজয় হুগলী পরিত্যাগ করিলেন। প্রাণদণ্ডের হুকুম হইবার পর বিজয় জেলখানাতে যাদবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন; যাদব তখন ঘুমাইতেছিল, তাই দেখিয়া বিজয় কাঁদিয়া সেখান হইতে পলাইলেন; সেখানে বসিয়া যাদবের ঘুম ভাঙ্গাইয়া তিনি কি সুখের সংবাদ দিবেন? বাটীতে আসিয়া বিজয় কাহাকেও আসল কথা বলিলেন না—কেবল বলিলেন, এ বারের দায়রাতে বিচার হইল না। দামিনীর মন কিন্তু তাহাতে নিশ্চিন্ত হইল না—তথাপি আশা জীবনতোষিণী! মুমূর্ষু ও ডুবিতে-ডুবিতে বাঁচিবার আশা করে! সত্য কথা কিন্তু, দামিনীর হৃদয়ে বিশ্বাসও যতটুকু, অবিশ্বাসও ততটুকু! যতটুকু আলো, ততটুকুই অন্ধকার! যতটুকু আশা, ততটুকুই আশঙ্কা! ক্রমেই কিন্তু আশা কমিতে লাগিল, আশঙ্কা বাড়িতে লাগিল।

আশঙ্কার মুহুর্মুহুঃ আঘাতে দামিনীর দেহ ভগ্ন হইতে লাগিল—রোগ আরও চাপিয়া ধরিল! বিজয় ও নলিনী কতরূপে বুঝাইলেন, কতরূপে আশ্বস্ত করিলেন। কিন্তু কিছুতেই দামিনীর মন শান্ত হইল না। দামিনী আর শয্যা হইতে উঠিতে পারিল না—ছেলেটীকে যে কোলে লইবে, দেহে এমন সামর্থ্যও নাই। ছেলেটী সদাই বিজয়ের কাছে থাকে, আর নলিনী, দামিনীর সেবা লইয়া ব্যস্ত! নলিনী বোধ হয়, পেটের মেয়ে অপেক্ষা অধিক করিলেন! মানুষের সাধ্যে যতদূর হয়, তার অধিক বিজয়-নলিনী করিলেন।

প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া দামিনী নলিনীকে জিজ্ঞাসিতেন, বিজয় আবার কবে হুগলী যাইবেন? বিজয় আজ কাল করিতেন! কিন্তু তিনি হুগলীতে আর কার কাছে যাইবেন? বিজয় পতিপ্রাণার কাতরতা দেখিয়া ভাবেন আর কাঁদেন! তার বেশী আর কি করিবেন? তথাপি

তাঁহার সঙ্কল্প, প্রাণ থাকিতে এ অশুভ সংবাদ তিনি দামিনীকে শুনাইবেন না। যতই দিন যাইতে লাগিল, দামিনীর চিন্তা ততই, গাঢ় হইতে গাঢ়তম হইতে লাগিল। পতিপ্রাণা সাধ্বী দামিনী এ রোগ-শয্যায় পড়িয়া অহর্নিশ স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। এ সঙ্কটে দামিনী বিজয়কে আর লজ্জা করেন না। বিজয়কে সম্মুখে বসাইয়া স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করেন। সেই রোগ-শয্যায় পড়িয়া সতী সাধ্বী দামিনী বিজয় নলিনীকে কত আশীর্ব্বাদ করেন। ঈশ্বরের কাছে কত প্রার্থনা করেন।

একদিন সন্ধ্যাকালে দামিনী, বিজয় ও নলিনীকে কাছে বসিতে বলিলেন। তখন দামিনীর বড় কষ্ট হইতেছে; নলিনী কহিলেন,—"দিদি, একবার তোমার সুশীলকে নাও।" দামিনী হাত বাড়াইয়া প্রাণাধিক কুমারকে কোলে লইলেন; সুশীল মায়ের মুখচুম্বন করিল। দামিনীর প্রেমাশ্রু বিগলিত হইল। স্নেহের সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। দামিনী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—"নলিনি!" নলিনী কহিলেন,—"কেন দিদি?" দামিনী কহিলেন,—"বোন, আমি আর বাঁচিব না। আমার কাল পূর্ণ হ'য়েছে। তোমাদিগে আর কি বল্‌ব? আমার সুশীল তোমাদের ছেলে। নলিনি! আমার বড় সাধের সুশীল!" দামিনী কাঁদিয়া আকুল হইলেন—নলিনীও কাঁদিয়া আকুল হইলেন। দামিনী আবার কহিলেন—"বোন্, জগদীশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন, তোমার ছেলে দীর্ঘজীবী হ'ক, আমার সুশীলকে তোমাদিগে দিয়া গেলাম! নলিনি, আমার সুশীলকে কোলে নাও।" দামিনী সুশীলকে নলিনীর হাতে হাতে সঁপিয়া দিলেন। নলিনী সুশীলকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তখন দামিনীও যত কাঁদেন, নলিনীও তত কাঁদেন! বিজয় এ করুণ-দৃশ্য দেখিতে পারিলেন না; তিনি অস্থির হইয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন, তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; বাহিরে আসিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

কাঁদিতে কাঁদিতে অতিশয় মনের আবেগে দামিনীর মূর্চ্ছা হইল। নলিনী "দিদি দিদি" বলিয়া কত ডাকিলেন! বিজয় কতবার ডাকিলেন! কিন্তু দামিনী কোন উত্তর দিলেন না। "দিদি, তুমি আমাদিগে ফাঁকী দিয়া গেলে" বলিয়া নলিনী কাঁদিতে লাগিল। নলিনীর কোলে সুশীল ঘুমাইয়া পড়িল, বিজয় সুশীলের মুখের পানে চাহিয়া নীরবে কত কাঁদিলেন!

বিজয়, দামিনীর মুখে মৃত্যুর সব লক্ষণ দেখিলেন। কিন্তু একি! নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ জ্বলিয়া উঠিল! দামিনী হঠাৎ একবার হাসিয়া উঠিলেন। বিজয় ও নলিনী দেখিলেন, দামিনীর মাথার সিঁদূর দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে! দামিনীর সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন রূপের তরঙ্গ ছুটিতেছে! সতী এখনও প্রাণত্যাগ করেন নাই।

দামিনী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমিও যাচ্ছি।" আবার কিছুক্ষণ গেল, সহসা প্রভাতের কোকিল ডাকিয়া উঠিল,— কিছু পরেই অরুণোদয় হইবে।

দামিনী আবার বলিয়া উঠিলেন,—"না না প্রিয়তম, তোমার কিসের লজ্জা! আমি তোমার দাসী, দাঁড়াও দাঁড়াও।" দামিনী উঠিবার উপক্রম করিলেন।

বিজয় দামিনীকে ধরিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ ভবানী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"না, না বিজয়, আমি ধরছি।"

ভবানী স্বীয় অঙ্কে দামিনীকে শোয়াইলেন। বিজয় কহিলেন,—"পূর্ণ বিকার।"

ভবানী। দামিনীর বিকার কাটছে; দামিনীর এখন স্থির দৃষ্টি; স্থির বুদ্ধি; যাদব দামিনীকে লইতে আসিয়াছে; তোমার স্মরণ নাই, আজ যাদবের ফাঁসী?"

বিজয়ের সব কথা মনে পড়িল, নলিনী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

ভবানী ধীরে ধীরে দামিনীর কর্ণকুহরে কৃষ্ণনাম শুনাইতে লাগিলেন।

দামিনী একবার চাহিলেন, বলিলেন,—"নাথ, দুঃখ কর কেন? আমার মত ভাগ্যবতী কে?"

আর একবার মাত্র দামিনী হাসিলেন, চক্ষু মুদিলেন, তার পর নিঃশব্দে সতী-সাধ্বী অরুণোদয় কালে স্বামীর সহিত স্বর্গারোহণ করিলেন। সব ফুরাইল!

এখানে আর কয়েকটী কথা বলিব। যোগিনী-ভবানী পূর্ব্বে বিজয়ের প্রেমাকাঙ্ক্ষিনী ছিল। সে প্রেমে নিরাশ হইয়া ভবানী যৌবনে যোগিনী হয়। সে প্রেম এখন বিশ্বব্যাপী। তাই আর্ত্তের বিপদে ভবানী এখন বুক দিয়া পড়ে। প্রকৃতই ভবানীর প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ছিল। সেই কৃপাবলেই ভবানী অনেক অসাধ্যও সাধন করে। ভবানীর সাহায্যেই বিজয় কিছু দৈবধন পান। আজীবন তিনি সেই ধনের সদ্ব্যয়ই করিতে লাগিলেন। সেই ধনেই উদয় দত্তের ঋণ পরিশোধ ও যাদবের সাপক্ষে মোকদ্দমা করেন। ধর্ম্মপথে থাকিলে, যেরূপে হউক, মানুষের ভাগ্যলক্ষ্মী শেষে সুপ্রসন্ন হন। বিজয়েরও তাহাই হইয়াছিল। সমাপ্ত।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ পাইন।

এড়ী রেশম।

রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি, আসাম প্রভৃতি স্থানে এড়ী রেশমের চাষ হয়। ইহার পোকা রেড়ী বা এরণ্ড গাছের পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে। সেই জন্য এ রেশমের নাম 'এড়ী' বা "এণ্ডি" হইয়াছে।

২। এড়ী পোকার তিন চারিটী জাতি আছে; সকলেই একপ্রকার নিকৃষ্ট রেশমের গুটি বা কোয়া প্রস্তুত করে। তুঁত পোকা ও তসরের গুটি হইতে যেরূপ সূতা বাহির হয়, ইহা হইতে সেরূপ সূতা বাহির করিতে পারা যায় না। তুলার মত ইহাকে পিঁজিয়া সূতা কাটিতে হয়। এই তুলা হইতে যে কাপড় প্রস্তুত হয়, তাহা অনেককাল যায়; শীঘ্র ছিঁড়িয়া যায় না। সে নিমিত্ত এড়ী রেশমের ব্যবহার ক্রমেই বাড়িতেছে। এক্ষণে কিন্তু এ কাপড় অধিক পাওয়া যায় না।

৩। সুতরাং এ রেশমের আরও অধিক চাষ হইলে দেশের উপকার হইবে। ইহার চাষ বোধ হয় চারিদিকে অনায়াসেই হইতে পারে। কারণ,—(প্রথম) বীজের নিমিত্ত রেড়ীর চাষ এখন অনেক স্থানেই হয়; (দ্বিতীয়) গোরু বাছুরে রেড়ীর পাতা খায় না, সুতরাং যেখানে সেখানে এ গাছ জন্মিতে পারে, আর বেড়া দিয়া ইহাকে ঘিরিয়া রাখিতে হয় না; (তৃতীয়) অল্পদিন পাতা খাইয়াই এ পোকা গুটি প্রস্তুত করে; (চতুর্থ) এ পোকা প্রতিপালন করা কঠিন নহে।

৪। রেড়ীর গাছ হইতে লোকে এখন বীজ ভিন্ন আর কিছু পায় না। ইহার পাতা খাওইয়া রেশম উৎপন্ন করিলে, লোকে তখন এক গাছ হইতে দুইটী ফসল পাইবে। রেড়ীর পাতা এখন কোনও কাজেই লাগে না। প্রতি গাছের গুটিকত পাতা ভাঙ্গিয়া লইলে গাছটীও মরিয়া যাইবে না, অথচ নূতন একটী উপার্জ্জনের পথ হইবে। সুতরাং যেখানে এখন রেড়ীর চাষ হয়, সেই খানেই আবার ঘর ঘর এড়ী রেশমের চাষ হউক, এই আমার ইচ্ছা।

৫। আবার দেখ,—ইতিপূর্ব্বে গরিব লোকদিগের স্ত্রীলোকেরা কাটনা কাটিয়া দিনান্তে এক পয়সা দু-পয়সা উপার্জ্জন করিত।

বিলাতি সূতা, বিলাতী কাপড়ের আমদানিতে সে উপার্জ্জনের পথটী একবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাই কৃষক-রমণীদিগকে এড়ী পোকা প্রতিপালন করিতে শিখাইলে, তাঁহাদের দু-পয়সা উপার্জ্জন হইবে। অবসরক্রমে ইহারা আবার সূতা কাটিয়াও অনেকে প্রতিপালিত হইবে। এইরূপে আমাদের দেশের লোক লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে। এড়ী রেশম বিদেশে প্রেরিত হইয়া বিদেশের টাকা এ দেশে আসিবে। দেশে এ কাপড়ের ব্যবহার বৃদ্ধি হইয়া বিলাতি কাপড়ের ব্যবহার কম হইয়া যাইবে, যে টাকা দিয়া এখন আমরা বিলাতি কাপড় ক্রয় করি, সে টাকা বিদেশে না গিয়া দেশেই রহিয়া যাইবে। এড়ী রেশমের ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেক ভদ্রসন্তানও প্রতিপালিত হইবেন।

৬। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া এড়ী রেশমের চাষ বৃদ্ধি করিতে "ভারতীয় শিল্প-সমিতি" উৎসুক হইয়াছেন। এক্ষণে পরীক্ষার নিমিত্ত ভারতীয় শিল্প-সমিতি বিনামূল্যে এড়ী রেশমের বীজ বিতরণ করিতেছেন। কিন্তু এত লোকে বীজ চাহিতেছেন যে, চিরকাল বিনা-মূল্যে বীজ বিতরণ করা সমিতির সাধ্য নাই। সে নিমিত্ত এখন হইতে যাঁহাদিগের বীজের আবশ্যক হইবে, তাঁহাদিগকে যৎসামান্য মূল্য দিতে হইবে। আট আনার বীজ আর আট আনা ডাকমাশুল প্রভৃতির খরচ, মোট এক টাকা, দিলেই যথেষ্ট হইবে।

৭। কি করিয়া এড়ী রেশমের চাষ করিতে হয়, এইবার সেই কথা বলিব। কিন্তু এড়ী ও অপরাপর রেশমের কথা যাঁহারা ভাল করিয়া জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে বহরমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত "রেশম-বিজ্ঞান" নামক পুস্তক খানি পড়িতে অনুরোধ করি।

৮। রেশমের কীট মাকড়শার মত আপনার শরীরের ভিতর হইতে সূতা বাহির করে। ক্রমাগত পাক দিয়া সেই সূতা আপনার সর্ব্ব শরীরে জড়ায়। এইরূপে দিব্য একটী সূতার ঘর প্রস্তুত হয়। তাহাকেই কোয়া বা গুটি বলে। কীটটী এই কোয়ার ভিতর কিছুদিন নিদ্রা যায়। তাহার পর কোয়ার একদিক কাটিয়া প্রজাপতি হইয়া বাহির হয়। এই প্রজাপতি অণ্ড প্রসব করে। সেই ডিম ফুটিয়া পুনরায় পোকা জন্মে। সেই পোকা কিছুদিনের জন্য রেড়ীর পাতা খায়। তাহার পর পূর্ব্বরূপ আপনার গায়ে সূতা জড়াইয়া কোয়া প্রস্তুত করে। মোটামুটি এই হইল রেশমের চাষ।

৯। চাষ করিতে হইলে প্রথম জীয়ন্ত কোয়ার আবশ্যক। অর্থাৎ কিনা যে কোয়ার ভিতর-পোকা মরিয়া যায় নাই বা যাহার ভিতর হইতে প্রজাপতি বাহির হইয়া যায় নাই। এইরূপ কোয়া লইয়া একখানি ডালায় পাতলা পাতলা সাজাইয়া রাখিতে হয়। ডালায় না রাখিয়া একটী পাখীর খাঁচাতে সাজাইয়া রাখিলেও চলে। ঐ ডালা বা খাঁচাকে, রৌদ্র বা জল না লাগে এরূপ একটী পরিষ্কার স্থানে রাখিতে হইবে। ডালা বা খাঁচাতে কোয়া না রাখিয়া আর এক কাজ করিলেও চলে। এক গাছি সূতা লইয়া কোয়াগুলিকে আস্তে আস্তে বাঁধিয়া ফুলের মালার মত গাঁথিয়া কোনও পরিষ্কার স্থানে ঝুলাইয়া রাখিলেও চলে।

১০। ১৫ হইতে ৩০ দিনের ভিতর কোয়ার ভিতর হইতে প্রজাপতি বাহির হয়। প্রজাপতীরা, ডালা বা খাঁচা বা মালা, যেখানে বাহির হইবে সেই স্থানেই বসিয়া থাকিবে, উড়িয়া যাইবে না। প্রজাপতিরা কেহ কেহ উড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাহারা আবার ফিরিয়া আসিবে। প্রজা-

পতিয়া কিছু খায় না, সুতরাং ইহাদিগকে কিছু খাইতে দিতে হয় না। একদিন কি দুই দিন পরে প্রজাপতীরা ডিম পাড়িবে। ডিম পাড়িবার নিমিত্ত ডালা বা খাঁচার উপর কাগজ কি কাপড় বিছাইয়া দিলে ভাল হয়। কোয়ার যদি মালা গাঁথা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ডিম এই মালার উপর পাড়ুক, তাহাতে ক্ষতি নাই। ডিমগুলি দেখিতে পোস্তদানার মত। অনেকগুলি ডিম এক সঙ্গে জোড়া থাকে। ইহাতে এক প্রকার আটা থাকে, সেই আটায় ডিমগুলি কাগজে বা কাপড়ে বা মালায় বা খাঁচা কি ডালার গায়ে জুড়িয়া যায়। ডিম পাড়া হইয়া যাইলে প্রজাপতি দিগের জীবনের কার্য্য সমাধা হইল। তাহারা দুই চারি দিনে মরিয়া যায়। সে জন্য ডিম পাড়া হইয়া যাইলে প্রজাপতিদিগকে ফেলিয়া দিবে।

১১। ডিমগুলি কাগজে কি কাপড়ে কি মালায় কি ডালা বা খাঁচার গায়ে জুড়িয়া থাকে। নখ দিয়া খুঁটিয়া লইতে হয়। তাহার পর ডিমগুলিকে এক খানি ডালায় পাতলা করিয়া বিছাইয়া রাখিতে হয়। এমন স্থানে এই ডালা খানি রাখিবে, যেন পিপীলিকা, কি মাকড়শা কি ইঁদুরে না খাইতে পারে। ১০।১৫ দিনের মধ্যে ডিম ফুটিয়া পোকা বাহির হয়। একদিনেই সব ডিম ফুটিয়া পোকা বাহির হয় না। সমুদয় ডিম ফুটিতে তিন চারি দিন লাগে।

১২। ডিম ফুটিবার পূর্ব্বে কতকগুলি ডালা ঠিক করিয়া রাখিবে। সারি সারি স্তরে স্তরে তিন চারি থাক ডালা সাজাইয়া রাখিবার জন্য একটী বাঁশের মাচান প্রস্তুত করিবে। ডিম ফুটিবার সময় মাচানের বাঁশের খুঁটিতে কোনও রূপ আটা, লাগাইয়া দিবে, যেন খুঁটির গা দিয়া পিপীলিকা উঠিয়া পোকাদিগের অনিষ্ট না করিতে পারে। একটু সরিষার তৈলের সহিত ধুনা গলাইয়া লইলে অনায়াসেই এইরূপ আটা প্রস্তুত হয়। দুই চারি ফোঁটা আকন্দের আটা ইহার সহিত মিশাইয়া দিলে আরও ভাল হয়। খুঁটির গায়ে একটু টাটকা আলকাতরা অথবা রেড়ীর তেল লাগাইয়া দিলেও চলে।

১৩। যে দিন ডিম ফুটিতে আরম্ভ হইবে, সেই দিন বেলা একটার সময় কতকগুলি কচি কচি আস্ত রেড়ীর পাতা ইহার উপর রাখিয়া দিবে। এই পাতার উপর উঠিয়া পোকা সব পাতা খাইতে আরম্ভ করিবে। বেলা পাঁচটার সময় ডাঁটা ধরিয়া এক একটী পাতা আস্তে আস্তে তুলিবে। পাতার তলায় যদি অফুটন্ত ডিম লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে সে ডিমগুলি পুনরায় ডিমের ডালায় ঝাড়িয়া ফেলিবে। তাহার পর পোকাসহ পাতাগুলি অপর ডালায় রাখিবে। এই পোকার ডালা মাচানের সর্ব্বের নীচের শ্রেণীতে রাখিবে। ইহারা হইল প্রথম দিনের পোকা। ডালায় রাখিয়া পোকাগুলিকে এখন (অর্থাৎ বেলা পাঁচটার সময়) রেড়ীর পাতা কুচি কুচি করিয়া খাইতে দিবে। পোকাদিগকে চারি পাঁচ দিন কাটাপাতা খাইতে দিতে হয়। তাহার পর বড় হইয়া ইহারা আস্ত পাতা খাইতে পারে। প্রথম দিন পোকাদিগকে আবার রাত্রি নয়টার সময় খাইতে দিবে। এক ডালায় যেন অনেক পোকা না হইয়া যায়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে।

১৪। দ্বিতীয় দিন দিবা একটার সময় পুনরায় কতকগুলি আস্ত রেড়ীর পাতা ডিমের ডালায় রাখিয়া দিবে। আজিকার পোকাও সেইরূপ পাতার উপর উঠিবে ও পাঁচটার সময় তাহাদিগকে অন্য ডালায় লইয়া মাচানের দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাখিয়া দিবে। এইরূপে তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে যে সমুদয় ডিম ফুটিয়া পোকা হইবে তাহাদিগকে মাচানের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর বাঁশের উপর রাখিবে। চারি দিন

পরে আর বোধ হয় ডিম ফুটিবে না, সুতরাং অবশিষ্ট ডিমগুলি ফেলিয়া দিতে হইবে।

১৫। প্রথম দিনের পোকা চতুর্থ দিনের পোকা অপেক্ষা চারি দিনের বড়, সে নিমিত্ত অত্যাধিক আহার দিয়া চারি দিনের পোকাকে সমান ভাবে আনিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত আকারে ইহারা সমান হইয়া না উঠে, সে পর্য্যন্ত আগের পোকাদিগকে অল্প খাইতে দিতে হইবে ও শেষের পোকাদিগকে অধিক খাইতে দিতে হইবে। দুই চারি দিন প্রথম দিনের পোকাদিগকে দিবসে তিনবার, দ্বিতীয় দিনের পোকাদিগকে চারি বার ও তৃতীয় ও চতুর্থ দিবসের পোকাদিগকে পাঁচবার খাইতে দিবে। দুই চারি দিনের জন্য আহারের এইরূপ ন্যূনাধিক করিলে শেষের পোকারা বাড়িয়া প্রথম পোকাদিগের মত হইয়া যাইবে।

১৬। কয়দিনের পোকা একপ্রকার হইলে তখন সকলকেই এক সঙ্গে দিনে পাঁচবার করিয়া খাইতে দিবে, যথা প্রাতঃকালে ৫ টার সময়, ৯টার সময়, মধ্যাহ্ন একটার সময়, অপরাহ্ন পাঁচটার সময় ও রাত্রি ৯টার সময়। পোকা যখন ছোট থাকিবে, তখন পাতা কুচি কুচি করিয়া খাইতে দিবে। পোকা বড় হইলে, আস্ত পাতা খাইতে দিবে।

১৭। এড়ি পোকা চারিবার খোলশ ছাড়িয়া থাকে। চারি পাঁচ দিন অন্তর দেখিতে পাইবে যে, পোকা সব চুপ করিয়া রহিয়াছে। তখন বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের খোলশ ছাড়িবার সময় হইয়াছে। এ সময়ে পোকারা পাতা খায় না। সুতরাং এখন তাহাদের উপর পাতা দিবে না, তাহা হইলে পোকাদিগের অনিষ্ট হইবে। সুতরাং খোলশ ছাড়িবার নিমিত্ত এড়ী পোকাদিগকে চারিদিন উপবাস করিতে হয়।

১৮। ডালা হইতে পুরাতন পাতা ও মলমূত্র পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হয়। ডালায় আস্ত পাতা দিলে পোকারা যখন সেই পাতার উপর উঠিবে, তখন পাতার ডাঁটা ধরিয়া পোকাদিগকে অন্য ডালায় রাখিয়া পুরাতন ডালা অনায়াসেই পরিষ্কার করিতে পারা যায়। পোকারা যে কয়দিন কাটা-পাতা খায়, তখন একদিন অন্তর একবার আস্ত পাতা দিয়া পোকা দিগকে অন্য ডালায় রাখিবে। ডালা পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত আর একটী উপায় আছে। একটুখানি পুঁটিমাছ ধরা জাল পোকাদিগের উপর রাখিয়া সেই জালের উপর পাতা দিতে হয়। জালের ছিদ্র দিয়া পোকারা পাতার নিকট গিয়া উঠিবে। তখন সেই জালসহ পোকা অন্য ডালায় নাড়িয়া পুরাতন ডালা পরিষ্কার করিয়া ফেলিবে।

১৯। এইরূপে পোকাদিগকে প্রতিপালন করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে রেশম-পোকার সমুদয় কাজ শীঘ্র শীঘ্র হইয়া যায়; শীতকালে বিলম্ব হয়। গ্রীষ্মকালে ১৫ দিন পাতা খাইয়াই পোকারা কোয়া প্রস্তুত করে, শীতকালে প্রায় এক মাস লাগে।

২০। এড়ী পোকাদিগের কখন কোয়া প্রস্তুত করিবার সময় হইয়াছে, তাহাদিগের আকার দেখিয়া এ কথা বলা কঠিন। কোয়া প্রস্তুত করিবার সময় ইহারা আহার করে না। কোয়া প্রস্তুত করিবার সময় ইহাদিগের বর্ণ সবুজ হয়। কিন্তু সবুজবর্ণ হইবার পরেও ইহারা দুই এক দিন আহার করে। কোয়া প্রস্তুতের সময় ইহাদের দেহ কিছু ছোট হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহা ঠিক চিহ্ন বলিয়া ধরিতে পারা যায় না। কোয়া প্রস্তুত করিবার সময় পোকারা এ-দিক ও-দিক ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু অন্য সময়ে ক্ষুধা পাইলেও তাহারা এইরূপ করিয়া বেড়ায়। তবেই হইল, এড়ী কাটের কোয়া প্রস্তুতের সময় কখন্ হইয়াছে, তাহা

সঠিক বলিবার যো নাই। সে নিমিত্ত তুঁত পোকার পাকা কীটগুলিকে বাচিয়া বাচিয়া যেরূপ কোয়া বুনিবার বাঁশের জাফ্রিতে রাখা যাইতে পারে, এড়ী পোকার তাহা হয় না।

২১। এড়ী পোকার জন্য অন্য উপায় করিয়া দিতে হয়। শুষ্ক কাটি-কুটি অথবা বাঁশের কঞ্চি মাচানের এখানে ওখানে বাঁধিয়া দিলে, সেগুলিকে ধরিয়া কোয়া বাঁধিতে এড়ী পোকাদিগের সুবিধা হয়। ডালার উপর কঞ্চি প্রভৃতি ফেলিয়া দিলেও চলে।

২২। কোয়া বাঁধা হইয়া যাইলে, যদি ভিজা বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে ক্ষণকালের নিমিত্ত ইহাদিগকে রৌদ্রে দিলে ক্ষতি নাই। কিন্তু অধিক কালের নিমিত্ত রৌদ্রে দিবে না, তাহা হইলে ভিতরের পোকা মরিয়া যাইবে। অন্যান্য রেশমের পোকা মারিয়া তবে কোয়া হইতে সুতা বাহির করিতে হয়। কিন্তু এড়ী রেশমের তাহা নহে। এড়ী রেশমের সুতা বাহির করিতে পারা যায় না, ইহা পিঁজিয়া সুতা করিতে হয়। সুতরাং এ কোয়া হইতে প্রজাপতি কাটিয়া বাহির হইলে ক্ষতি নাই। এই প্রজাপতি পুনরায় পূর্ব্ববৎ ডিম্ব প্রসব করিবে, সেই ডিম্ব হইতে পোকা হইবে, আবার সেই পোকাকে প্রতিপালন করিলে তাহারা আবার কোয়া বাঁধিবে।

২৩। কোয়া হইতে প্রজাপতি বাহির হইয়া যাইলে সেই কোয়া বিক্রয় করিতে পারা যায়। অথবা পিঁজিয়া তাহা হইতে সুতা কাটিয়া কাপড় করিতে পারা যায়।

২৪। জীয়ন্ত কোয়া লইয়া আমাদের স্ত্রীলোকেরা একটী বাঁশের ঝোড়ার ভিতরে রাখিয়া দেয়। প্রজাপতি বাহির হইলে, প্রজাপতীদিগকে ধরিয়া এক হাত লম্বা নল বা কাঞ্চি বা ঘাসের ডাঁটায় বাঁধিয়া রাখে। কাঁধের নিকট এক দিকের পালক বাঁধিয়া দিলেই চলে। একটী নলে আটটী দশটী প্রজাপতী বাঁধিয়া রাখিতে হয়। এই অবস্থায় প্রজাপতিদিগের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাহার পর এই নলের গায়েই প্রজাপতীরা ডিম পাড়ে। সেই ডিম নেকড়ার ভিতরে রাখিয়া কোন স্থানে তাহারা ঝুলাইয়া রাখে। ডিম ফুটিলে কচি রেড়ীর পাতা হাতে রগড়াইয়া আরও নরম করিয়া শিশু পোকাদিগকে খাইতে দেয়। পাতা কাটিয়া খাইতে দেয় না। ফল কথা এড়ী পোকার চাষে কোনও গোলযোগ নাই। কোয়া হইতে প্রজাপতি বাহির হইল, ডিম পাড়িল, ডিম ফুটিল, পোকা বাহির হইল। পোকা গুলিকে ডালায় রাখিয়া, দিনের মধ্যে চারি পাঁচ বার তাহার উপর গুটিকত রেড়ীপাতা ফেলিয়া দিলে, মাঝে মাঝে ডালাগুলিকে পরিস্কার করিলে—বশ! এই হইল এড়ী পোকার চাষ। গোলযোগের মধ্যে এই যে, পোকাদিগের শরীর আছে, আর শরীর থাকিলেই ব্যাধি আছেন। একবার মড়ক পড়িল তো সব পোকাগুলি মরিয়া গেল। যাই হউক, এড়ী রেশমের অনেক গুণ। ইহার এক বার একখানি চাদর করিলে তো আজন্ম কাটিয়া গেল। এক বার একটী চাপকান করিলে তো ২৫ বৎসরের দায় নিশ্চিন্ত। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, এড়ী কোয়া হইতে রেশম বাহির করিতে পারা যায় না, ইহাকে পিঁজিয়া সুতা কাটিতে হয়। কিন্তু শুনিয়াছি যে, ইতালি দেশে কেহ কেহ ইহা হইতে রেশম বাহির করিবার উপায় আবিস্কার করিয়াছেন। তাহা যদি হয়, তো এ রেশমের চাষ করিলে আরও অধিক লাভ হইবে।

২৫। এড়ী কোয়া কি করিয়া কাটিয়া সুতা করিতে হয়, আপাততঃ সে কথা বলিবার আমার ইচ্ছা নাই। তবে নিত্যগোপাল বাবুর "রেশম-বিজ্ঞানের" গ্রন্থ হইতে পশ্চাৎ লিখিত সামান্য বিবরণটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"এণ্ডি কোয়া কাটাই। এণ্ডির লাট, কোষা রেশমের লাট কোয়ার ন্যায় সহজে কাটাই করা যায় না। উহাকে ক্ষার মিশ্রিত জলের সহিত ২।৩ ঘণ্টা কাল সিদ্ধ করিয়া এবং ভাল করিয়া ধৌত ও শুষ্ক করিয়া লইয়া পরে রেশমের লাটের ন্যায় সহজে কাটাই করা যাইতে পারে। যে ক্ষারের কথা বলা হইল, ঐ ক্ষার কদলীপত্র অথবা যে সে বৃক্ষের নব পল্লব শুকাইয়া অগ্নিতে জ্বালাইয়া সংগ্রহ করিতে হয়। এই ক্ষার জলের সহিত মিশ্রিত

করিয়া কোয়াগুলি ঐ জলে চটকাইতে হয়। পরে এক খণ্ড প্রস্তরের সহিত এক খানি কাপড়ে আল্গা করিয়া ঐ কোয়ার তালটী বাঁধিয়া উহা একটী হাঁড়ির মধ্যে রাখিতে হয়। হাঁড়িটী জলপূর্ণ করিয়া উহার উপর একটী সরা ঢাকা দিয়া ২।৩ ঘণ্টা কাল হাঁড়ি অগ্নির উপর বসাইয়া রাখিতে হয়। মধ্যে মধ্যে হাঁড়িতে জল ভরিয়া দিতে হইবে। পরে হাঁড়িটী অগ্নি হইতে নামাইয়া, উহার উষ্ণতা কিছু কমিলে, উহার মধ্য হইতে পুঁটলিটী বাহির করিয়া কোয়াগুলি হাত দ্বারা বলপূর্ব্বক চটকাইতে হয়। এইরূপ চট্‌কাইতে চট্‌কাইতে পরিষ্কার জল দ্বারা উহা ধৌত করিতে হয়। ধুইতে ধুইতে কোয়া গুলি পরিষ্কার হইয়া আসিবে। পরিষ্কার জল কোয়ার সহিত মিশ্রিত হইয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত ময়লা হইয়া বাহির হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোয়াগুলি ধৌত করিতে হইবে। পরে অতিরিক্ত জল বাহির করিয়া দিয়া ঐ গুলি রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া বস্তাবন্দি করিয়া রাখিয়া অবসর মত জলে ভিজাইয়া উহা হইতে টেকিয়া অথবা চরকার সাহায্যে সূতা বাহির করিয়া লইতে হয়। রেশমের লাট-কোয়া কাটাই করিয়া যে পরিমাণ লাভ হইতে পারে বলা হইয়াছে, এণ্ডি কাটাই করিয়া ঐ পরিমাণেই লাভ হওয়া সম্ভব। এণ্ডির সূত্র মটকার সূত্র অপেক্ষাও মজবুত। এ কারণ ইহার দাম সের-করা ৭।৮ টাকা; কিন্তু ঐ সূত্র বাহির করিতে জ্বালানি কাষ্ঠ প্রভৃতি লাগে বলিয়া ইহাতে খরচ অধিক পড়ে। তসর-কোয়ার লাট এণ্ডি-কোয়া অপেক্ষা কিছু সহজে কাটাই করা যায়। কিন্তু ইহাকেও কিছুক্ষণ ক্ষার মিশ্রিত জল দ্বারা সিদ্ধ না করিলে ইহা হইতে সহজে সূত্র বাহির করা যায় না।" *

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

* যদি কেহ এই রেশমের বিষয় আরও বিশেষরূপে অবগত থাকেন, তাহা হইলে লিখিয়া পাঠাইলে বাধিত হইব। লেখক।

জন্মভূমি ২য় বর্ষে ২৪৫ পৃঃ এসম্বন্ধে সূচনা-প্রবন্ধ প্রকাশ হয়। জ, স।

প্রয়াণ।

O Lord! now open me the
gates of night,
That I may get me gone,
and disappear.
——Victor Hugo.

আর কেন বসিয়া হেথায়?
সৌন্দর্য্যের সন্ধ্যা তুই,
সাথে ক'রে নিয়ে এলি
শত তারা, শত চাঁদ, দীপ্ত জোছনায়;—
যদি রে প্রভাত-কালে
সবই তা'রা গেল চ'লে,
শূন্যহৃদি, ভগ্নবুক, শুষ্ক-শীর্ণ-কায়,
আর কেন বসিয়া হেথায়? (১)
সুদূর সমুদ্র আশে
ছুটিলি তটিনী তুই;
দীর্ঘ এক সূত্র সম সরল যে শিশু-প্রাণে
আনিলি টানিয়া,
অকস্মাৎ গেল সে ছিঁড়িয়া!—
তপ্ত বালুরাশি মাঝে
একবিন্দু অশ্রুবারি গেল শুকাইয়া।
তাই বলি, তাই বলি, হায়,
বৃথা কেন বসিয়া হেথায়? (২)
যতনে জীবন সঁপি,
গঠিলি কবিতা-গৃহ,
প্রচণ্ড প্রলয়-ঝড়ে চূড়া তার পড়িল ভাঙিয়া;—
কল্পনা-কুসুম-রাশি
মাটিতে মিশিল আসি;
কালনিশা আইল ঘনিয়া।
সহস্র গৃহের মাঝে গৃহহীন কবি তুই,
সারা জন্ম কাঁদিবি কি, হায়?—
মিছে কেন বসিয়া হেথায়? (৩)
সেথায় ডাকিছে তোরে;—
নিতান্ত কাঙাল তুই,
ভালবেসে কেউ তোরে ডাকে না হেথায়;
তাই বুঝি ডাকিছে সেথায়।
স্মৃতির শ্মশানে যা'র
যন্ত্রণা-অনল-ভার,
কোথা সে পাইবে আর শান্তি-সোম-সুধা
বিনা সেই চরণের ছায়।—
আর কেন বসিয়া হেথায়? (৪)

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

সূচীপত্র।

—:০:—

চিত্র বা ছবীর সূচী পত্র।

শ্রীরামলাল বরাট

জন্মভূমি।

চতুর্থ ভাগ—চতুর্থ বর্ষ।

১৩০০ সালের—পৌষ হইতে ১৩০১ সালের অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত।

দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।

—০:০—

কলিকাতা।

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্ট্রীম-মেসিন প্রেসে

শ্রীকেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০১ সাল।

মূল্য ১৷০ এক টাকা চারি আনা।

ডাঃ মাঃ ।৶০ ছয় আনা।

শ্রীরামলাল বরাট